ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনামূলক

শিক্ষা—সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবন যাত্রা পরিচালনা বিষয়ে সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ
সম্পাদিত

বিষয়

পঞ্চম বর্ষ] কার্ত্তিক—১৩৪০ [১ম সংখ্যা

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনামূলক
শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবনযাত্রা
পরিচালনা বিষয়ে
সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ
সম্পাদিত

বিষয়

পঞ্চম বর্ষ] অগ্রহায়ণ—১৩৪০ [২য় সংখ্যা

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনামূলক

শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবনযাত্রা

পরিচালনা বিষয়ে

সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ

সম্পাদিত

বিষয়

পঞ্চম বর্ষ] পৌষ—১৩৪০ [৩য় সংখ্যা

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনামূলক

শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবনযাত্রা

পরিচালনা বিষয়ে

সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ

সম্পাদিত

বিষয়

পঞ্চম বর্ষ] মাঘ—১৩৪০ [৪র্থ সংখ্যা

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনামূলক
শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবনযাত্রা
পরিচালনা বিষয়ে
সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ
সম্পাদিত

বিষয়

প্রথম বর্ষ] ফাল্গুন—১৩৪০ [৫ম সংখ্যা

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনামূলক
শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবনযাত্রা
পরিচালনা বিষয়ে
সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভুষণ দত্ত, এম-এ
সম্পাদিত

বিষয়

প্রথম বর্ষ] চৈত্র—১৩৪০ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনামূলক

শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবনযাত্রা

পরিচালনা বিষয়ে

সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ

সম্পাদিত

বিষয়

পঞ্চম বর্ষ] বৈশাখ—১৩৪১ [৭ম সংখ্যা

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনামূলক

শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবনযাত্রা

পরিচালনা বিষয়ে

সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ

সম্পাদিত

বিষয়

পঞ্চম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ—১৩৪১ [৮ম সংখ্যা

ভারতের সাধনা

পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ হইল।

সাধারণ নিয়ম

প্রতি বাঙ্গলা মাসে ভারতের সাধনা প্রকাশিত হয়—কার্ত্তিক মাস হইতে বৎসর গণনা হইয়া থাকে; বৎসরের প্রথম হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইতে হয়—মূল্য বার্ষিক ৪৲, প্রতিসংখ্যা ।৵০, ডাক খরচ স্বতন্ত্র। মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে ডাক খরচ লাগে না। ।০ আনার ডাক টিকেট সহ পত্র লিখিলে নমুনা স্বরূপ ১ সংখ্যা পাঠান হয়।

ভারতীয় সাধনার স্বরূপ, শক্তি ও বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ—মানব জীবনের উৎকর্ষলাভে তাহার উপযোগিতা—এবং জাগতিক কল্যাণ এবং এতদ্দেশের প্রকৃতি ও লোকের প্রয়োজনাদির লক্ষ্যে, এই সাধনার মর্ম্ম ও কার্য্যকারিতা বিষয়ে প্রবন্ধ, আলোচনা, মন্তব্যাদি সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে।

প্রবন্ধাদি-প্রেরণ ও পত্রিকার মৌলিক নীতি বিষয়ে পত্র-ব্যবহার সম্পাদকের সহিত করিবেন; টাকাকড়ি, ও কার্য্যপরিচালন বিষয়ে চিঠি-পত্রাদি ম্যানেজার বা কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইবেন।

দেশের ধর্ম্ম, অর্থ, জ্ঞান ও স্বাস্থ্য সাধনার নির্দ্দেশক সমুদয় বিষয়ে বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে গৃহীত হয়।

কার্য্যালয় — **কার্য্যাধ্যক্ষ**—ভারতের সাধনা
৮৪নং বেচুচাটার্জ্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা।

TRUTH

A Weekly Magazine of Unique Interest for all Lovers of Truth.

Contains **News of the World** worth bearing in mind in all times, given in nutshells properly arranged and well-digested with comments highly suggestive and luminous—**exposition of the Hindu Shâstras** and interpretation of things from truly Hindu point of view form the special feature of the paper—**Stories** from ancient and folk lore expressed in ways both **pleasant** and **instructive**—Science, Medicine, Industry, Commerce and Statesmanship of the world indicative of the ebb and flow of the time have their quota in it.

Year begins in Baisak (April): Subscription Rs. 3/12 a year, **payable to**—*Manager, 32, Sukea Street, Calcutta.*

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনার মৌলিক নীতিতে
শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবনযাত্রা
পরিচালনা বিষয়ে
সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ
সম্পাদিত

বিষয়

পঞ্চম বর্ষ] আষাঢ়—১৩৪১ [৯ম সংখ্যা

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনার মৌলিক নীতিতে
শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবনযাত্রা
পরিচালনা বিষয়ে
সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ
সম্পাদিত

বিষয়

পঞ্চম বর্ষ] শ্রাবণ—১৩৪১ [১০ম সংখ্যা

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনার মৌলিক নীতিতে
শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবনযাত্রা
পরিচালনা বিষয়ে
সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত, এম-এ
সম্পাদিত

বিষয়

পঞ্চম বর্ষ]   ভাদ্র—১৩৪১   [১১শ সংখ্যা

ভারতের সাধনা

ভারতীয় সাধনার মৌলিক নীতিতে
শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবনযাত্রা
পরিচালনা বিষয়ে
সময়োপযোগী মাসিক পত্রিকা

বিধুভূষণ দত্ত, এম-এ
সম্পাদিত

বিষয়

পঞ্চম বর্ষ] আশ্বিন—১৩৪১ [দ্বাদশ সংখ্যা

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

পঞ্চম বর্ষ] কার্ত্তিক—১৩৪০ [১ম সংখ্যা

সাধনার পথে

যাত্রা-পথ

ভারতের সাধনার পঞ্চমবর্ষ আরম্ভ হইল। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ পত্রিকা পরিচালন করা নাকি যায় না, এ কথা অনেকের মুখেই শুনিয়াছি। এক উজান পথে ইহার গতি। আজ যে বিজাতীয় ভাবপ্রবাহ ভারতসত্তার ধ্বংস সাধন করিয়া ভারতের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ, সাহিত্য, ধর্ম্ম, অর্থ ও আর সকল প্রকার কাম্য বস্তুর উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে, যাহার আবেশভরে আত্ম-ভোলা হইয়া সকলে আজ এ সকলেরই চিরাগত মঙ্গলমূলের উচ্ছেদ সাধন করিতে অগ্রসর এবং যাহার বশে ভারতের সাধনাসিদ্ধ বিশুদ্ধ চরিত্রে আজ নানা দুরন্ত দুরাচার প্রবেশ লাভ করিয়াছে,—সমাজ-স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে, শরীর রোগ ও দুর্ব্বলতার আশ্রয়, গৃহ দ্বন্দ্বের, সমাজ বিবাদের স্থান, রাষ্ট্র ঘোর বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এক কথায় এই যে স্রোত বেগ আজ দুকুল ভাঙ্গিয়া মানব, মানব সমাজ ও মানব সভ্যতাকে এক অনির্দ্দেশ ধ্বংসের মুখে লইয়া চলিয়াছে, যাহার ইসারা পাইয়া আজ পাশ্চাত্য মনীষাও স্থানে স্থানে শিহরিয়া উঠিতেছে—'ভারতের সাধনা' এক মহান্ কর্ত্তব্য বোধেই তাহার প্রতিরোধ করিতে চাহে। এজন্য ভারতীয় সাধনার (Indian cultureএর) প্রকৃতির অনুবোধ এবং তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান লাভই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এই কালে ভারতবাসীকে তাহার সেই আত্মসংবিদ্ হইতে বিচ্যুত রাখিবার জন্য সমুদয় আয়োজনই হইয়াছে—অবস্থার বিপর্য্যয়ে, দীর্ঘ-কালের পরাধীনতা তাহাকে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন ও তার পরিরক্ষণের পক্ষে সমুদয় বাধাই দিয়া আসিতেছে; শিক্ষা দীক্ষা আধুনিক জীবন যাত্রা প্রণালী—কিছুতেই তাহার অনুকূল ব্যবস্থা নাই; ইহা ছাড়া, সে যে মানুষ নহে—সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য, শিল্প, কলা এবং ধর্ম্ম ও দর্শনে পর্য্যন্ত—যাবতীয় বিষয়ে

ইহারা সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে, বর্ব্বরের অবস্থায় রহিয়াছে—এইরূপ জঘন্য নিন্দার প্রচার কার্য্য এখন বহুধা চলিয়াছে। ইহার বাধা দান পক্ষেও ভারতীয় সাধনার স্বরূপ উপলব্ধিই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তাহা হইলেই উপস্থিত এই বিপদ্‌পাত হইতে আত্মরক্ষার সূচনা হইবে। এইরূপে আত্মস্থ ও আত্মনির্ভর হইয়া এ কালের সৃষ্ট সমাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক সর্ব্বপ্রকার জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইয়া, ভারতের স্বকীয় সাধনার আদর্শে এক সুস্থ ও সবল জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ক্রিয়াত্মক ভাবে ভারতীয় সাধনার মৌলিক নীতিতে সুশিক্ষার প্রচলন ইহাতে প্রধান ও প্রথম কার্য্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, সে জন্যই ইহার প্রথম প্রবর্ত্তন হইয়াছিল।

সত্য ও ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারতীয় সাধনা পরিপুষ্ট। এজন্য উহার এক অসাধারণ সঞ্জীবনী শক্তি আছে; জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়, পরা তত্ত্বের দৃষ্টিতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। 'ভারতের সাধনা' তাহারই সেবায় নিযুক্ত। আজ ভারতের এই দৈন্যের দিনে লোকে ইহাতে বিশ্বাস হারাইয়াছে। তথাপি যে কতিপয় সংখ্যক মহানুভব ব্যক্তি এই পত্রিকা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগের সমচিত্ততা ও সহানুভূতিই ভারতের প্রকৃত লোকচিত্তেরই পরিচয় দিয়া থাকে। পত্রিকা তাহা হইতেই যথেষ্ট আশা ও উৎসাহের সম্বল সঞ্চয় করিয়াছে। গ্রাহকগণকে আমরা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্র বলিয়া মনে করি না—সহকর্ম্মী ও সহযোগী বলিয়াই জানি। কারণ ভারতীয় সাধনার (culture এর) মৌলিক শক্তি বলে যে আত্মনিয়ন্ত্রণের ভাব ইহার অন্তরে রহিয়াছে, তাহাতে এক দিকে যেমন চতুর্দ্দিকের বিজাতীয় প্রভাব হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, অপরদিকে তেমনই উহার মহান্ দৃষ্টিতে আপন আপন জীবন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন এবং তজ্জন্য শিক্ষাদির ক্রিয়াত্মক ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ সকল উদ্দেশ্য পরিপূরণার্থে গ্রাহকগণই প্রকৃত পক্ষে আমাদের সহযোগী ও সহকর্ম্মী। পত্রিকার ত্রুটি বিচ্যুতি প্রদর্শন, ইহাকে অধিকতর কার্য্যোপযোগী করিবার পক্ষে মতামত জ্ঞাপন, উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ, এবং ইহার প্রভাব বিস্তার বা প্রচার পক্ষে দায়িত্ব ও অধিকার তাঁহাদের পূর্ণরূপেই রহিয়াছে।

প্রতিরোধ—

প্রায় সকল জাতিরই কোনও না কোনও একটা গুণ থাকে, তাহা তাহার নিজস্ব। তাহার উপর নির্ভর করিয়াই সে নূতন পথে অগ্রসর হইতে পারে। আর তাহা করিলেই তাহার সে গতি সহজ ও স্বাভাবিক হয়। ভারতবর্ষের সেই গুণ অসাধারণ,—উহাই তাহার ধর্ম্ম; নৈতিক ও ব্যবহারিক জীবনে সত্যপরায়ণতা ও সর্ব্ব জীবের হিতকামনা উহার লক্ষণ। ইহাই তাহার সাধনা বা 'কালচার'। ভারতবাসীর সমাজ ও জীবন-যাত্রার স্তরে স্তরে এখনও তার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। পরকীয় সাধনা ও বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে ভারত আজ সেই সাধনা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চলিয়াছে। তবুও ভরসা এই যে যুগে যুগে এই সাধনার বল ভারতকে নানা বিপদ ও অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠ রাখিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের এই চরম অবনতির মধ্যে ভারতে যে সকল আন্দোলন বা জাগরণের চিহ্ন দেখা দিয়াছে, তাহার মধ্যেও ভারতের এই (ধর্ম্ম) আন্দোলনকেই প্রধান স্থান দিতে হইবে। যে রাজনৈতিক আন্দোলন এখন সকলের মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহাও ঐ ধর্ম্ম আন্দোলনের ফল মাত্র।

পাশ্চাত্যের প্রভুত্ব এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের ভাবপ্রবাহ সম্পূর্ণ-

রূপেই আসিয়া এদেশকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছিল; আজিও তাহার বেগসম্বরণ হয় নাই, আর তাহাতে জাতীয় সত্তা, লোকের জীবনযাত্রা এবং সাধারণ ভাবধারাতে যে প্রচণ্ড আঘাত ও অনিষ্টপাত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাও বর্ণনীয় নহে। কিন্তু ভারতের অন্তর্শক্তি সর্ব্বপ্রথমেই তার প্রতিরোধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। আজও সেই প্রতিরোধের গতি নিবৃত্ত হয় নাই। ধর্ম্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের নামে যে যে আন্দোলন আজ শত বর্ষ পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাই ক্রমে ক্রমে বাহ্য দৃষ্টি হইতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, ভারতের অধ্যাত্মসাধনাকে সর্ব্বতোমুখীন করিয়া সম্পূর্ণরূপেই জয়যুক্ত করিতে চাহে। ইহার সূক্ষ্ম গতি সকল প্রকার বাধা বিঘ্নকে প্রতিরোধ করিয়াই চলিয়াছে—সাময়িক প্রতিকূলতাও সময়ে তাহার আনুকূল্য দান করে—যাহা সত্য মঙ্গল ও সুন্দর তাহার বৈশিষ্ট্য খোলে অসত্য পাপ ও কদর্য্যের প্রতিরোধে। ভারতের অখণ্ড ঐতিহ্য মহাভারত—সমগ্র মানবেতিহাসেরই প্রতীক—পাপ পুণ্যের চিরন্তন বিরোধক্ষেত্র, মহা কুরুভূমি! লক্ষ্য তার ধর্ম্মরাজ্য। ভারতের মানচিত্রেই সে কুরুক্ষেত্র স্পষ্টতঃ দৃশ্যমান; ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি খণ্ডপর্ব্বে ইহার অভিনয় হয়। অন্যত্র তাহা নয়। কারণ ভারতই একমাত্র ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার স্থান। এজন্য তার সাধনাও সার্থক।

একালে এই প্রতিরোধের প্রথম ক্রিয়া দেখা দেয় ব্রাহ্মসমাজাদির প্রতিক্রিয়ামূলক আন্দোলনে; বাহ্যতঃ ঐ আন্দোলন প্রচলিত হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধেই দণ্ডায়মান হইয়াছিল। কার্য্যতঃ উহা তাৎকালিক খৃষ্টান মিশনরী প্রভৃতির প্রভাবকেই খর্ব্ব করিয়াছিল; প্রকৃতপক্ষে উহা হিন্দুসমাজকে জাতীয়তার এক নূতন বল দান করিল। তথাপি ব্রাহ্মসমাজ পরজাতীয় প্রভাবকে একেবারে এড়াইয়া চলিতে পারে নাই। ভারতের স্বকীয় সাধনার দৃষ্টিতে এতদপেক্ষাও এক বলবত্তর আন্দোলন আনিলেন স্বামী দয়ানন্দ—বেদের ঐশ্বরীয় ভাব ও সর্ব্বপ্রমাণিকতা স্বীকার করিয়া আর্য্যসমাজ ভারতীয় সাধনার মৌলিক তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিল ও ভারতে এক নূতন শক্তির সূচনা করিল। তৎপর থিওসফীর বিশ্বসন্ধানী দৃষ্টি ভারতীয় ধর্ম্মে ও ভারতীয় সাধনায় যে শ্রেষ্ঠ তত্ত্বের সন্ধান পাইল তাহাতেও বিরোধী শক্তিনিচয়কে অবনত-মস্তক হইতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল প্রভৃতি বিদ্বৎসমাজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিবুধমণ্ডলে ভারতীয় সাহিত্য ও সভ্যতার অমূল্য সম্পদসৌরভ চতুর্দ্দিকে প্রসার লাভ করিতে লাগিল; তাহাতেও বিরোধীদিগকে হীনবল হইতে হইয়াছে। তার পরই বঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আবির্ভাব; এক দিকে বেদান্তের অমোঘ তত্ত্ব, অপর দিকে পৌরাণিক ধর্ম্ম ও মূর্ত্তি-উপাসনার পুরোহিত রামকৃষ্ণ-জীবনের মূর্ত্তাতত্ত্ব স্বামী বিবেকানন্দকে যে প্রেরণা দান করিল, তাহারই বলে তিনি পাশ্চাত্যের গর্ব্বস্ফীত বক্ষে ভারতের ধর্ম্ম ও সাধনার বিজয়কেতন প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিলেন। ভারতীয় সাধনার বলে বিশ্ববিজয়ের এই কালের এই যে মহতী আকাঙ্ক্ষা ও সূচনা, তাহাই স্বামী বিবেকানন্দের তাঁহার দেশবাসীর প্রতি শ্রেষ্ঠ অবদান। ভারতের ধর্ম্মসত্তা ও আধ্যাত্মিক শক্তির এই প্রতিরোধক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং তাহার প্রভাবেই এক প্রকার রাষ্ট্রিক চেতনা দেশ মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল, ক্রমে তাহা জাতীয় মহাসমিতির দেশব্যাপী আন্দোলনে পরিণত হয়; আর শিক্ষা ও অর্থনীতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইবার নিমিত্ত ক্রিয়াত্মক ভাবে স্বদেশী আন্দোলন ও নানা জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্ভব তাহাতেই হয়—আর্য্যসমাজের গুরুকুল

হরিদ্বার, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ, মাদ্রাজে থিওসফিষ্টদিগের জাতীয় বিদ্যালয়, কবি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—এ সমুদয়ই বিজাতীয় প্রভাবের প্রতিরোধে আত্মনিয়ন্ত্রণের বিবিধ রূপ প্রচেষ্টা মাত্র। আর বাঙ্গলার স্বদেশীভাব ও 'স্বদেশী আন্দোলন' দেশীয় শিল্পজাতের উৎপাদন ও ব্যবহার, অর্থের উন্নতি ও বিদেশীয় বস্তুর বর্জ্জননীতির অবলম্বনে সমগ্র ভারতের শিল্প, অর্থ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে বিপুল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে, তাহার প্রমাণ ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা। মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত খদ্দর আন্দোলন ও বিজাতীয় রাষ্ট্রশক্তিরসংস্রবত্যাগ সেই স্বদেশী ব্রতের চূড়ান্ত বিকাশ।

আজ রাজনৈতিক আন্দোলন আর সমুদয় আন্দোলনকে নিষ্প্রভ করিয়া তুলিয়াছে। কতকগুলি বিজাতীয় ভাব এই আন্দোলনে আসিয়া মিশিয়া ভারতীয় সাধনার বিমল আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রতিরোধমূলক ভাবে কলুষ লেপন করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অসামান্য চরিত্রনিষ্ঠা ও ত্যাগের গুণে ভারতীয় সাধনার প্রতীকরূপে গণ্য হইলেও তাঁহার বহুদিগুন্মুখীন কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি এই সমুদয় বিজাতীয় ভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই—তাঁহার শিক্ষা ও সঙ্গ এই দুইই ইহার পরিপন্থী হইয়াছে। ফলে সকল দিকেই আজ বিষম গোলমাল উপস্থিত। ভারতের সাধনাশক্তিকে এ সমুদয় গোলমালের মধ্যে আপন পথ বাছিয়া বাহির করিতে হইবে।

প্রেসিডেণ্ট পেটেল—

ভারতগভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট বিটলভাই পেটেলের মৃত্যু হইয়াছে। তিনিই ব্যবস্থাপরিষদের সর্ব্বপ্রথম নির্ব্বাচিত সভাপতি হন এবং এই পদে তিনি সমুদয় ভারতব্যাপী খ্যাতি ও সরকারী বেসরকারী সমুদয় লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করিয়া ছিলেন। সভাপতি থাকা কালীন তিনি যে প্রকারে উচ্চ নিয়মানুকূল বিধানে সভাপরিচালনা শক্তির পরিচয় দান করিয়াছিলেন—যে বুদ্ধিমত্তা, বিচারশক্তি ও নিরপেক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, সৎসাহস ও স্বদেশপ্রেমিকতাও সেইরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার এই কর্ম্মকুশলতার স্মৃতি ব্যবস্থাপরিষদের ইতিহাসে গ্রথিত থাকিবে। বিটলভাই গুজরাটের এক কৃষকগৃহে জন্মগ্রহণ করেন ও নিজ মেধাবলে ব্যবহারজীবিরূপে বোম্বাই হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। নাগরিক জীবন-বিধি ও রাষ্ট্রনীতিতে তাঁহার বিশেষ অধিকারই ছিল। পূর্ব্বে বোম্বাই সহরের মেয়ররূপে তিনি যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, পরে ব্যবস্থাসভাতে তাহাই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পরাধীন দেশে যাহারা রাষ্ট্রিক জীবনে নির্ভীক সাহসিকতা ও অকৃত্রিম স্বদেশপ্রীতির সহ রাষ্ট্রক্ষেত্রে কর্ম্মকুশলতা দেখাইয়া যাইতে পারেন তাঁহারা যে অপর দেশের তৎ তৎ ক্ষেত্রের লোকদিগ অপেক্ষা উচ্চতর গুণের অধিকারী তাহা বলাই বাহুল্য। বিটলভাই ও তাঁহার সহোদর বল্লভভাই উভয়েই মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক বল্লভভাইর ন্যায় গান্ধী-নীতির অনুসরণকারী ও অকৃত্রিম ভক্ত আর দ্বিতীয় কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। আজিও তিনি কারাগারে আবদ্ধ। বিটলভাইর চরিত্র ও পদবী-শক্তির সহযোগ পাইয়া গান্ধী-আন্দোলন বোম্বাই অঞ্চলে সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এ আন্দোলনের নিগ্রহভোগও তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি করিতে হইয়াছে। মহাত্মার পরবর্ত্তী কার্য্যপ্রণালীতে তিনি প্রত্যয় হারাইয়াছিলেন; এবং উহা যে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সর্ব্বথা পরিত্যজ্য তাহাই সর্ব্ব শেষে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার অন্তিম রুগ্ন শয্যার সঙ্গী ও শুশ্রূষাকারী সমনিগ্রহভোগী সুভাষচন্দ্র বসুও সহমত।

নারীরক্ষা আন্দোলন—

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী হিন্দুদিগের বর্ত্তমান নানা গুরুতর সমস্যার মধ্যে নারীনিগ্রহ প্রধান ও জাতির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্ম্মদাহকর ও কলঙ্কজনক বিষয়। ইহার প্রতিকারকল্পে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র চেষ্টা হইয়া থাকিলেও এ যাবত কাল সমবেত ভাবে বা রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে তেমন চেষ্টা কিছু হয় নাই। নারীনিগ্রহের মর্ম্মন্তুদ পাশবিক ব্যাপার বাঙ্গলার প্রায় প্রতি জিলাতে ঘটিয়া আসিতেছে; আজ কাল সংবাদপত্রের সাহায্যে তাহার কতক কতক প্রকাশ পায়। দেশের প্রচলিত কানুন উহার দমনে সমর্থ হইলে অথবা শাসনকর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে সমুচিত গুরুত্ব ও দায়িত্ব বোধ থাকিলে, এতকাল পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্ব থাকিতে পারিত না। বাস্তবিক ইহা রাজা প্রজা উভয়ের পক্ষেই তুল্যরূপে লজ্জাস্কর। নারীনিগ্রহে হিন্দুরমণীকেই প্রায়শঃ লাঞ্ছনা পাইতে হয়, আর পাশব বৃত্তির অশিক্ষিত মুসলমান হয় তাহার নিগ্রহকর্ত্তা; শিক্ষিত ভদ্রসম্পর্কিত মুসলমানকেও অনেক সময় এই পাপে লিপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে। কত দিন এই মহাপাপ এই হতভাগ্য দেশে চলিয়া আসিতেছে, এবং কত অসংখ্য ক্ষেত্রে ইহার তীব্র যাতনা সমাজবক্ষ সহ্য করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হিন্দুর সমাজব্যবস্থা ও নরমপ্রকৃতিতে এরূপ অনেক যাতনাই নীরবে সহ্য পাইয়াছে। হিন্দুজাতি স্বভাবতঃ সহনশীল। সম্প্রতি রাষ্ট্রক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক দাবী দাওয়ার প্রসার ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহা লইয়া পার্থক্যের সৃষ্টি হওয়াতে, হিন্দুজাতির মধ্যেও একপ্রকার আত্মসংরক্ষণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব জাগরিত হইয়াছে; নারীরক্ষার আন্দোলন তাহারই নিদর্শন। ক্ষোভের বিষয় ইহার মধ্যেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধের ভাব মধ্যে মধ্যে দেখা যাইয়া থাকে।—এক দিকে হিন্দু আন্দোলনকারীগণ যেমন মুসলমানের প্রতি তীব্র ঘৃণার ইঙ্গিত করে, অপর দিকে মুসলমান নেতারা যে কোনও হিন্দুজাগরণে উৎকণ্ঠিত হয়। বর্ত্তমান রাষ্ট্রপরিস্থিতিতে হিন্দু যেমন নানা দিকে নির্য্যাতিত হইতে যাইতেছে, তাহাতেও বিরোধকারীদিগের সুবিধা হইতেছে। কে বলিবে, আজ যে নারীধর্ষণের নূতন করিয়া বাড়াবাড়ি দেখা যাইতেছে, তাহা এই রাষ্ট্রিক পরিস্থিতিরই কুফল নহে?

বাস্তবিক নারীরক্ষা মানবধর্ম্মেরই এক প্রধান বিষয়। প্রাণীজগতেও ইহার স্বাভাবিক অনুভূতি দেখা যায়; যে পাপাত্মারা নারীধর্ম্মে ব্যভিচার আনে ও তাহার প্রতি জঘন্য অত্যাচার করে, তাহারা পশু অপেক্ষাও অধম। সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মব্যবস্থায়ই এই মহাপাতকের তীব্র নিন্দা রহিয়াছে এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এমন ন্যায়নিষ্ঠ ও উচ্চ মানব ধর্ম্মে অনুরাগী ব্যক্তি সকল রহিয়াছেন, যাহারা প্রাণপণে এই মহাপাপ দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হইবেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে বর্ত্তমান নানা দূষিত আবহাওয়াতে মানবপ্রকৃতির অনেক মাধুর্য্যই মুছিয়া যাইতেছে! নতুবা এরূপ আন্দোলনেরও প্রতিবাদ ও আক্রমণ শুনা যাইবে কেন?

বাহিরের আন্দোলন অপেক্ষা হিন্দুর আন্তরিক সাধনার শক্তিতেই আমরা অধিক বিশ্বাসবান। নারীর সম্ভ্রম ও নারীজাতির পবিত্রতা রক্ষণ হিন্দু সাধনার যেমন মৌলিক বিষয় এমন আর কাহারও নহে। হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজব্যবস্থাতে তাহার যেমন বিধান রহিয়াছে, এমনও আর কাহারও নাই। নারীচরিত্রের মহত্ত্ব ও মর্য্যাদার কাহিনী হিন্দুর ইতিহাস ও সাহিত্যে যেরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই! সেই সকল আদর্শই আজ হিন্দু নারীর গৌরব। তাহাই হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়াছে ও আজও করিতেছে। কারণ পরিণামে নারীই নারীকে রক্ষা

করিতে পারে, হিন্দুনারীত্বের আদর্শই তাহার অমোঘ অস্ত্র। একদিকে সমাজের দুর্ব্বলতার জন্য নারীকে সে আদর্শের শিক্ষা ও দীক্ষায় সমুচিতরূপে শক্তিশালিনী করিতে না পারায় ও অপর দিকে অদ্যকার প্রচলিত বিজাতীয় শিক্ষা দ্বারা তাহাতে অপঘাত আনিয়া নারীধর্ম্মে যে ধর্ষণ ও অত্যাচার আনয়ন করা হইতেছে, সহস্র দুর্বৃত্তের দলও তাহা করিয়া উঠিতে পারে না।

আফগানরাজ্য—

আফগান রাজ নাদীরশাহকে এক গুপ্ত ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। মুসলীম রাজ-তখ্‌তের চির অভ্যস্ত বীভৎস ব্যাপারের আর এক অভিনয় এ যুগেও হইল! নাদীর আমীর আমানুল্লার এক বিশ্বস্ত অমাত্য ও কর্ম্মচারী হইয়াও তাহার নির্ব্বাসনান্তে আফগানি স্থানে আসিয়া অশান্তি ও বিদ্রোহ দমনপূর্ব্বক স্বয়ং রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসেন। তিনি অদ্যকার ইউরোপীয় উন্নত রাষ্ট্রনীতির সহিত পরিচিত ছিলেন; শিক্ষা, শিল্প ও সমরবিভাগে রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন; পররাষ্ট্রের সহিত সুসম্বন্ধ রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিতেছিলেন। ক্ষুদ্র আফগান রাজ্যে আজ নাদীরের পক্ষে লক্ষাধিক উচ্চ সুশিক্ষিত সৈনিক পুরুষ বিরাজমান; শতাধিক বিমান-পোত রাজাদেশ প্রতীক্ষা করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান; মটর, রেল, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রাস্তা ঘাট, ম্যাডিক্যাল কলেজ, সামরিক শিক্ষালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এ সমুদায়েরই নাদীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন—কিন্তু তাই বলিয়া আমানুল্লার পক্ষীয় লোকেরা তাঁহাকে অব্যাহতি দেয় নাই। নাদীরের বিশ্বস্ত অনুচরদিগেরই একজন আমীর আমানুল্লার প্রতি অবিচারের এই প্রতিশোধ লইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আর ও দিকে আমানুল্লা,—যিনি এখন রোমে অবস্থান করিতেছেন,—নাকি ঘোষণা করিয়াছেন যে, নাদীর শাহের রাজত্ব ঘোর নৃসংশতাপূর্ণ, কেবল আফগান দিগের উপরে নহে—পার্শ্ববর্ত্তী সকল রাজ্যের পক্ষেই অতি ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল, যদি আফগানেরা চাহে যে তিনি নিজে রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া তাহার অভীপ্সিত সংস্কার ও উন্নতির প্রবর্ত্তন করেন, তবে তিনি সদাই ফিরিয়া আসিতে প্রস্তুত। কিন্তু উপস্থিত আফগান রাজ্যে আর নূতন গোলযোগ কিছু নাই—নিহত রাজার বিংশ বর্ষীয় পুত্র মহম্মদ জহির শাহ রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজ্যের সর্ব্ব শ্রেণীর প্রজারাই নাকি তাঁহার প্রতি ভক্তিসূচক বশ্যতা দেখাইতেছে। সৈন্যাধ্যক্ষ নাদীর-ভ্রাতা শাহ মামুদ তাহাতে অগ্রণী হইয়াছেন।

তুর্কে সংস্কৃতশিক্ষা—

নব সংস্কৃত তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। চারিজন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ বিদ্বান এজন্য তথায় নিযুক্ত হইয়াছেন। বেদ ও ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রগুলি নাকি সংস্কৃত হইতে তুর্কভাষাতে অনুবাদ করা হইয়াছে। এরূপ হইয়া থাকিলে সংস্কৃত ও হিন্দু দর্শনের লীলানিকেতন ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কিঞ্চিৎ চৈতন্য হওয়া উচিত। যে সংস্কৃতকে নব জাগ্রত বিদেশ সমূহ তাহাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রবর্ত্তন করিতেছেন, সেই সংস্কৃত তার নিজ দেশেরই নব্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ হইতে দিন দিন নির্ব্বাসিত হইয়া চলিয়াছে। আবার ইহা হইতে ভারতের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বাস্তব অবস্থারও পরিচয় ঘটে—ভারতের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কি কোন ব্রাহ্মণ বা মুসলমান বিদ্বান্ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যিনি তুর্কিতে গিয়া সংস্কৃত শিক্ষা দান করিতে পারেন—ইউরোপ হইতেই তারও আমদানী

করিতে হয়? পারিলে হিন্দুর—নহে মুসলমানেরও, তাহাতে গৌরব বাড়িত। বিদ্যার বহুদিগুন্মুখী অধিকার ইহাদের কাহারও কিঘটে না? অথবা কেবলমাত্র বেতন ভুক্ দাসমনোবৃত্তির লক্ষণই এইরূপ! কেবল রাষ্ট্রের ব্যাপারে নহে—শিক্ষা, সমাজ, ন্যায়, বিচার সর্ব্ব বিভাগেই ইহারা এরূপই বিকল ও বিকৃত!

জাতি-শক্তির পরিস্থিতি—

আজ যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে পৃথিবীতে এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাণিজ্যপ্রধান কোন্ দেশ? বিদ্যাবুদ্ধিও আবিষ্ক্রিয়াদিতে কে অধিক উন্নত?—তাহা হইলে জানিয়া ও বুঝিয়া এক কথায় ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। এই সময়ে কোনও জাতিই আর কাহাকেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মান্য ও ক্ষমতাশালী বলিয়া স্বীকার করে না। একটী জাতি নহে, কতকগুলি জাতিই শক্তিমান (Power) বলিয়া পৃথিবীর উপরে প্রভুত্ব করিয়া চলিতেছে। পূর্ব্বে যেমন এক একটী জাতি—যেমন স্পেন, ফরাসী, অষ্ট্রিয়, রোম, গ্রীক প্রভৃতি লোকেরা—এক এক সময়ে—প্রধান জাতি বলিয়া গণ্য হইত, এখন তেমন আর কেহ হয় না। কারণ পূর্ব্বে ঐ এক একটী জাতি এক একটী বিশেষ গুণের অধিকারী হইয়া তাহার চর্চ্চা ও উন্নতি দ্বারা আর সকলকে অভিভূত করিয়া তাহাদের উপরে উঠিয়া যাইত; এই ক্ষমতা বা গুণ অধিকাংশই ছিল রাজশক্তির বা ক্ষাত্র-শক্তির আয়ত্তাধীন। দেশের উন্নতি অবনতি সমুদায়ই ছিল রাজার ব্যক্তিগত ক্ষমতার সহিত অভিন্ন। বর্ত্তমান যুগে রাজশক্তি জাতীয় শক্তিতে পরিণত হইয়াছে; আর জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চ্চার সার্ব্বজনীন বিস্তার বশতঃ কোন গুণ বা ক্ষমতাই আর একটী জাতির আয়ত্তাধীন থাকিতেছে না। উপযুক্ত অবকাশ পাইলে—আত্মবিকাশের মুক্ত পথ মিলিলে—শিক্ষা ও ব্যবহারিক উপায়ে সকল জাতিই সকল প্রকার উন্নতি করিয়া লইতে পারে। ইহার উপরে যদি কাহারও কোনও উন্নত সংস্কার বা জাতীয় প্রাগ্‌শক্তি এমন থাকে যাহা সেই উন্নতির পক্ষে আরও অধিক সহায়ক হয়, তবে জাতীয় উন্নতির পক্ষে ঐরূপ সংস্কার আরও অধিক ফলদায়ক হয়। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় জাতি সমূহের মধ্যে আর কাহারও তেমন শক্তি কিছুই নাই ইহা মনে করিয়া, বাহিরের কোনও শক্তিশালী জাতি—আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে কেহ—এক্ষণে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাই মনে করা যাইতেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীব্যাপী এক অর্থসঙ্কট সমুদয় জাতির উপরেই আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে সকল রাষ্ট্রশক্তিই জড়সড়। কিন্তু এ যুগে সকল লোকের মধ্যেই নূতন জাতীয় ভাবের প্রভাব প্রবল। তাহারই বশে প্রায় সকল জাতিই আপন আপন অবস্থায় আত্মনিয়ন্ত্রিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহে। সর্ব্বপ্রথমে সভিয়েট রুশ সমুদয় পররাষ্ট্রিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া আপন মতে স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সমুদয় জগতে এক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে। তুর্কী, পারসীক, আফগান—ইহারাও নূতন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর এবং সকলেই শক্তি সঞ্চয়ে ব্যস্ত। শক্তিমান জাতিদিগের মধ্যে ইংলণ্ড তাহার বিপুলায়তন সাম্রাজ্য লইয়া সাম্রাজ্যবাদ সুরক্ষিত রাখিতেই ব্যস্ত, তাহার অর্জ্জিত ও অধীন দেশ সমূহের মধ্যেও আত্মনিয়ন্ত্রণের ভাব না দেখা দিয়াছে এমন নহে—উপনিবেশ স্থানগুলি সকলেই স্বপ্রতিষ্ঠিত, ভারতের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ে অবনত দেশেও সেজন্য এক সংঘর্ষ চলিতেছে। ফরাসী বিগত মহাযুদ্ধে প্রথম বিজয়ীর গৌরব লইয়া আপন স্বভাব-সিদ্ধ কলাকৌশল ও স্বকীয় শিক্ষা ও সমাজ-নীতির অনেক উন্নতি সাধন করিয়া লইতেছে বলিয়াই

মনে হয়। সর্ব্বোপরি এক নূতন জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় ইতালী এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্নের নেতৃত্ব জাতীয় অভ্যুদয়ের এক নূতন যুগের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছে; তদ্দৃষ্টান্ত আজ পরাভূত জারম্যান জাতিও পরাজয়ের সমুদয় ক্লেদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। এ যুগের কুবের-ভূমি আমেরিকা তাহার প্রধান সম্পদ অর্থ ও বাণিজ্যের সংশোধনে ব্যস্ত; আর সুদূর জাপান তাহার একান্ত পরিস্থিতিতে ধন ও অস্ত্রবলে কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছে, জাতিসঙ্ঘকে অগ্রাহ্য করিয়া চীন হইতে মাঞ্চুকো প্রদেশ অধিকার ও অদ্যকার তার জগতজোড়া বাণিজ্যের বিস্তারই তাহার পরিচয় দিয়া থাকে। এইরূপ সকল স্থানেই আজ শক্তি সঞ্চয়ের যে ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে পরস্পরের মধ্যে জগত-জোড়া সংঘর্ষের একটা আশঙ্কা খুবই আছে।

জাপ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি—

জাপানী বাণিজ্য দ্রব্য এক্ষণে পৃথিবীর বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। কেবল ভারতের মতন আত্মপক্ষসমর্থন ও আত্মরক্ষণে অক্ষম দেশের কথা নহে, ইংলণ্ডের ন্যায় জাতীয় শিল্পে উন্নত এবং বাণিজ্য প্রসার কামী দেশেও জাপান-জাত বস্তুতে বাজার বোঝাই হইয়া জঞ্জাল সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া আতঙ্কের রব উঠিয়াছে। জাপানীরা কৌশলী ও পরিশ্রমী; এজন্য অল্প ব্যয়ে অধিক জিনিস প্রস্তুত করিতে পারিতেছে; অনুকূল রাজশক্তির সহায়তায় তাহা পৃথিবীর বিপণীতে প্রেরিত হইতেছে। অল্প ব্যয়ে চিত্তাকর্ষক জিনিষ কিনিবার প্রলোভন কেহ বড় ত্যাগ করিতে পারে না। এজন্য বিলাতী বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্র স্বয়ং মাঞ্চেষ্টার সহরের রাস্তায় স্থানীয় কাপড়ের পরিবর্ত্তে জাপানী বস্ত্র বিক্রয় হয়। শিল্পে আত্মপক্ষ সংরক্ষণের কথা আজ কয়েক বৎসর হইল ভারতেও উঠিয়াছে। যে সকল বিদেশীয় দ্রব্যের ভারে ভারত এখন অবনত—নিজ সাধনার পরিপন্থী, স্বাস্থ্য ও সুখের হানিকর যে সকল বৈদেশিক ও বিজাতীয় পানীয়, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যজাত আজ ভারতের অন্তঃপুর পর্যান্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তাহাদের কথা নহে; কেবল মাত্র ভারতের নবজাত বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য একটা চেষ্টা এখন চলিতেছে; এবং সেজন্য বিদেশীয় আমদানী বস্ত্রের উপরে অতিরিক্ত কর ধার্য্য করাও হইয়াছে। উদীয়মমান জাপানী শিল্পে অবশ্যই ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আঘাত লাগিয়াছে। প্রতিবিধান কল্পে জাপ-গভর্ণমেণ্টের এক প্রতিনিধি মণ্ডল (deligation) দৌত্যকার্য্যে ভারতে আগমন করিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে জাপ-ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে একটা চুক্তি বা রফার কথাকাটাকাটি চলিতেছে। জাপগভর্ণমেণ্ট তাহার অনেক কথা সমর্থন করেন না বলিয়া চুক্তির চূড়ান্ত নির্দ্ধারণ কিছু হইতেছে না। বর্ত্তমান ভারতীয় ইতিহাসে এই ঘটনা এক অভিনব ব্যাপার। দিল্লির মোগল বাদশাহ দিগের গৌরবময় প্রতিপত্তির সময়ে দেশ-বিদেশের রাজ সরকার হইতে প্রীতি ও সম্মানের উপহার লইয়া বিদেশীয় দূতের সমাগম হইত। বাদশাহের শুভেচ্ছা ও অনুগ্রহ তাহাদের প্রার্থনার বিষয় থাকিত। এ দৌত্য সে জাতীয় নহে; ইহা অনেকটা একালে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রেরিত মিশন বা কমিশনের মতন। অন্য এক ভাবে দেখিতে গেলে, ইহাকে মুর্শিদাবাদের তদনীন্তন রাষ্ট্রপরিচালকদিগের, উদীয়মান বৈদেশিক বণিকপ্রতিভূর সহিত, পরামর্শ বা চুক্তি বৈঠকের তুলনা করা যাইতে পারে। উদীয়মান শক্তির সহিত বন্ধুত্ব রাখা রাষ্ট্রনীতির একটী লক্ষণ! ব্রিটিশ রাষ্ট্রে জাপ-প্রীতির লক্ষণ সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে অজাতশত্রু বাঙ্গলার নবীন নবাব ও ভারতে নব জাগ্রতির নিদর্শন সামান্য শিল্পায়োজনকে এক পর্য্যায়ে ধরিতে হইবে। জাপানকেও আবার সামান্য বণিক সম্প্রদায় বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না; রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা সে ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়া বসিয়াছে। জাতিসঙ্ঘের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চীনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্যোগী ইংরেজ মি. হেণ্ডারসন সেদিন স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, জাপানকে মাঞ্চোকু দখল করিতে দেওয়া একটা মহা ভুল হইল! আর একখানি ওসেকার জাপানী সংবাদ পত্রের স্পষ্ট উক্তি এই যে—"Japan should subjugate the east and conquer the world at the point of bayonet"—'ওসেকা মেইচি'।

যোগের শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা

স্বামী জ্ঞানানন্দ

আজকাল "যোগ" শব্দটীর বহুল আলোচনা শুনিতে পাওয়া যায়; কেহবা ইহার স্বপক্ষে কেহবা বিপক্ষে আলোচনা করেন। যাঁহারা ইহার স্বপক্ষে বলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ইহার তত্ত্ব অবগত নহেন। আর বিরুদ্ধবাদীগণের মধ্যে অনেকে ইহাকে একটি কিম্ভূত কিমাকার পদার্থের বাচক বলিয়াই ধারণা করিয়া বসিয়াছেন। বাস্তবিক "যোগ" একটা কিম্ভূত কিমাকার পদার্থ নহে, পরন্তু উহা ভগবৎ প্রাপ্তির ও সুসঙ্গতভাবে সংসার ধর্ম্মপালনের কৌশল। ভগবদ্‌গীতায় আছে—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" যোগই কর্ম্মের কৌশল [১]। কোন্ কর্ম্মের? সকল কর্ম্মেরই,—পারমার্থিকই হউক কি বৈষয়িকই হউক। যোগী হইয়া—যোগাভ্যাস দ্বারা শরীর ও মনের বল সঞ্চয় করিয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে; তাহা হইলেই নির্দ্দোষ ও সুষ্ঠুরূপে সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিবে।

যোগাভ্যাস দ্বারা বাসনারাহিত্য জন্মে। বাসনার প্রবলতাই ভ্রম, প্রমাদ ও মনশ্চাঞ্চল্য জন্মাইয়া কর্ম্ম-সুনির্ব্বাহের বাধাজনক হয়। একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করা যা'ক্। সকলেই অবগত আছেন যে, আজকাল অনেক সহরে, এমন কি কোন কোন গ্রামেও, সেবাব্রতধারী তরুণ সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা তত্তৎ স্থানে সংঘবদ্ধভাবে দেশী বিদেশী দুঃস্থ ও রুগ্ন ব্যক্তিগণের সেবা করিয়া থাকেন। ইহারা যে ভাবে মন দিয়া ও দরদের সহিত এই সেবাকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন তাহা দেখিলে মনে আনন্দ জন্মে। অনেকে মনে করেন, আপন জনেই মন ও দরদ দিয়া সেবা করিতে পারে, পরে পরের সেবা দরদের সহিত করিতে পারে না; কিন্তু তাহা ভুল। নিষ্কাম বা অনাসক্ত ভাব থাকিলেই সেইরূপ সেবা করা সম্ভব হয়। মাতাপিতা প্রভৃতি সকাম সেবকদিগের দ্বারাই বরং সুন্দররূপে শুশ্রূষা অসম্ভব হইয়া উঠে; আসক্তিজাত মোহ যাহার যত বেশী তাহা দ্বারাই কর্ম্ম তত বেশী অসম্ভব হয়; কারণ, তাঁহারা ত বাছার একটু এদিক্ ওদিক্ দেখিলেই অস্থির হইয়া পড়েন, শুশ্রূষা করিবেন কিরূপে? কিন্তু ঐ নিষ্কাম সেবকেরা, কেবল মানুষের প্রতি মানুষের দরদ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে সেবা করিয়া থাকেন; এ বিষয়ে তাঁহাদের কাম বা বাসনা না থাকায়, তাঁহারা আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত স্থির বুদ্ধির সহিত কাজ করিতে পারেন। তাঁহারা কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক, যেরূপ সুশৃঙ্খল ও বুদ্ধি বিবেচনা পূর্ব্বক সেবা করিয়া থাকেন, তাহাই তাঁহাদের প্রাণের দরদ ও কামরাহিত্যের প্রমাণ। আমি বলিতেছি না যে, ইঁহারা যোগসিদ্ধ বা সর্ব্বকামনা ত্যাগী। কিন্তু অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে ইহারা এই সেবা কার্য্য নিঃস্বার্থ ও অনাসক্ত ভাবেই করিয়া থাকেন। কেবল সেবা বলিয়া নহে; যে কোন কর্ম্মই

[১] যোগো [হি] কর্ম্মসু সর্ব্বকর্ম্মসম্পাদনবিষয়ে কৌশলম্ নৈপুণ্যম্ সর্ব্বোত্তমোপায়ঃ। অথবা কর্ম্মসু সর্ব্বকর্ম্মণাং [নির্দ্ধারে] যোগো যোগনামকং কর্ম্ম [হি] কৌশলং কুশলকরং মঙ্গলকরং পুণ্যজনকংবা।

হউক না কেন, আসক্তিজাত মোহ থাকিলেই বুদ্ধি বিচলিত হওয়ার সম্ভাবনা। যেখানে মোহ যত প্রবল, সেখানে ততই মন চঞ্চল। সুতরাং কাজ পণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা ততই বেশী। যোগ দ্বারা বিষয় রাশিতে নিষ্কাম ও অনাসক্ত ভাব ও বুদ্ধির স্থিরতা লাভ হয়, সুতরাং সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদনে যোগই এক মাত্র কৌশল—"যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।"

আচ্ছা যোগকে ত কর্ম্ম করিবার কৌশল বলা হইল; এই যোগ কি তাহাই এখন দেখা যাউক। গীতায় ঐ বাক্যটির দুই শ্লোক পূর্ব্বে আছে—"সমত্বং যোগ উচ্যতে।" সমত্বকে যোগ বলা যায়। কিসের সমত্ব? "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা" কর্ম্মের সিদ্ধিতে ও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইয়া [কর্ম্ম করিবে]। সিদ্ধিলাভে আহ্লাদে আটখানা হইবে না, অসিদ্ধিতে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইবে না, সকল অবস্থায় সমভাবাপন্ন থাকিবে]। অন্যত্র আছে, "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।" —দুঃখেও উদ্বিগ্ন হইবে না, আর সুখেও স্পৃহা রাখিবে না। এই ভাবই সমত্ব। ইহা কিরূপে সাধন করিবে?—"সঙ্গং ত্যক্ত্বা"—বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া।

এখন এই স্থলের সমস্ত শ্লোকগুলি মিলাইয়া দেখা যাউক।

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি **সঙ্গং ত্যক্ত্বা** ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা **সমত্বং যোগ উচ্যতে**॥
দূরেণ হ্যবরং কর্ম্মবুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥
বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥ *

অর্থ—হে ধনঞ্জয় (ধন বা ভোগ সমূহ জয় করিয়া যিনি ধনাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়াছেন; সুতরাং যিনি বক্ষ্যমাণ উপদেশের যোগ্যাধিকারী এমন পুরুষ, অর্জ্জুন), যোগস্থ হইয়া [সঙ্গ বা বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ কর, তাহা হইলেই কর্ম্মের সিদ্ধিও অসিদ্ধিতে সমভাবাপন্ন হইবে; এইরূপে] আসক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক সমভাবাপন্ন হইয়া কর্ম্ম করিবে; এই সমত্ব (বা সমভাবই) যোগ।

হে ধনঞ্জয়! [এই] বুদ্ধিযোগ (অর্থাৎ বুদ্ধির সাম্যভাব বা সমত্ব-বুদ্ধি) অপেক্ষা [বিষয়াসক্তি জাত সকাম-] কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট, সুতরাং [উক্ত সমত্ব] বুদ্ধিকেই অবলম্বন কর, যাহারা ফল হেতু (ফললাভাকাঙ্ক্ষায়) কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারাই কৃপণ হয় (পরকৃপাকাঙ্ক্ষায় দীনভাবাপন্ন ও কর্ম্মের নিষ্ফলতার চিন্তায় কাতর হয় এবং ভবিষ্যতের জন্য পাপপুণ্য কর্ম্মের ফল সঞ্চয় করিয়া রাখে)। [কিন্তু] যিনি [সমত্ব-] বুদ্ধিযুক্ত তিনিই পাপ ও পুণ্য উভয়ের অতীত হন (আসক্তি বা স্বার্থবোধ না থাকায় পাপ পুণ্য কিছুতেই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না)।

অতএব [সমত্বরূপ] যোগেতেই যুক্ত হও, যোগই কর্ম্মের কৌশল। পাতঞ্জল যোগসূত্রে আছে—"যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ।"
চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ।

শ্রুতিতে আছে—

* জহাতি—পরিত্যাগ করেন, এড়ান, অতিক্রম করেন (escapes, stands above).

"দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানং মুনীশ্বর।
যোগস্তদ্বৃত্তিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্॥" (১) শাণ্ডিল্যোপনিষদ্।

অর্থ –[অথর্ব্বা-ঋষি শাণ্ডিল্যকে বলিতেছেন] হে মুনিশ্রেষ্ঠ! চিত্তনাশের দুইটি [পূর্ব্বাপর] ক্রমানুযায়ী উপায় আছে, যোগ আর জ্ঞান। চিত্তের বৃত্তিরোধের নাম যোগ, আর সম্যক্ [বিচার দ্বারা] তত্ত্বানুসন্ধানের নাম 'জ্ঞান'।

এখানেও দেখা যায় যে, চিত্তবৃত্তির নিরোধই যোগ। 'চিত্তবৃত্তি' কি? বিষয় রাশিতে চিত্তের রতি বা প্রবৃত্তি-হেতু চিত্তের বিবিধ আকার প্রাপ্তি,—বিবিধ বিষয়সঙ্গ-হেতু এক চিত্তই সিদ্ধি অসিদ্ধি, লাভালাভ, মানাপমানাদি গণনায় সুখ দুঃখ বা রাগ-দ্বেষাদি রূপ বিবিধ আকারে পরিণত হয়, চিত্তের এই যে বিবিধ পরিণতি বা প্রকাশ, তাহাই চিত্তবৃত্তি; ইহাকেই চিত্তের চঞ্চলতাও কহা যায়। এই চিত্তবৃত্তি বা চিত্তচাঞ্চল্য নিরোধ করিতে পারিলেই সর্ব্বত্র সমদর্শন বা সমস্বরূপ স্থির-বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ 'যোগ' লাভ হয়। ইহাই দ্বন্দ্বরহিতাবস্থা। ফলতঃ "চিত্তবৃত্তি নিরোধ" আর 'সমত্ব' বা দ্বন্দ্বরাহিত্য একই কথা।

কঠোপনিষদে আছে,—

'যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তমাহ পরমাং গতিম্॥
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়-ধারণাম্॥

অর্থ।—যে অবস্থায় [পঞ্চেন্দ্রিয়-সাধ্য দর্শন শ্রবণাদি] পঞ্চপ্রকার জ্ঞান মনের সহিত [একীভূত অর্থাৎ মনেতে লীন হইয়া] অবস্থান করে (ইন্দ্রিয়গণ মনের সহিত একীভূত হইয়া আর বহির্বিষয়ে ধাবিত হয় না,) বুদ্ধিও কোন বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ত হয় না, সেই অবস্থাকেই পরমা গতি বলা হয়। এই স্থির ইন্দ্রিয়ধারণা (অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় গুলির অচঞ্চল অবস্থাকেই 'যোগ'-(পদবাচ্য) মনে করা হয়।

এখানেও চিত্তবৃত্তি-নিরোধের কথা বলা হইল; মনের অচঞ্চল অবস্থার সাধনই মনোবৃত্তির নিরোধ। বাস্তবিকই চিত্তবৃত্তি-নিরোধ না হইলে সমত্বলাভ হইতে পারে না।

বীচিবিক্ষোভহীন সাগরের ন্যায় বৃত্তিবিরহিত চিত্ত প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া থাকে; এই অবস্থাই সাম্যাবস্থা বা সমত্ব; সুতরাং চিত্তবৃত্তি নিরোধের অবস্থা আর সমত্বাবস্থা একই, সন্দেহ নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যোগের সংজ্ঞা সম্বন্ধে পাতঞ্জল সূত্র, গীতা ও শ্রুতি, সকলেই এক কথা বলিতেছেন।

• শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্থানে স্থানে সমত্ব সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যান আছে, তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥

[১] ক্রম—পর্য্যায়, পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়ম। তদ্বৃত্তিরোধ—তাহার [চিত্তের] বৃত্তিরোধ। অবেক্ষণ—পুঙ্খানুপুঙ্খ দর্শন, বিচারপূর্ব্বক তত্ত্বানুসন্ধান।

জ্ঞান বিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থ দ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুস্বপিচ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥*

অর্থ।—[যিনি] শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ ও মানাপমান প্রভৃতি সকল দ্বন্দ্ব বিষয়ে আত্মজয়ী (অর্থাৎ দেহাত্মবোধকে পরাভূত করিয়া নিজের দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত রাখিতে পারেন) [সুতরাং যিনি] প্রশান্ত (সর্ব্বদা স্থির চিত্ত এমন) ব্যক্তিরই পরমাত্মা (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ব্বিকার আত্ম-বোধ) সমাহিত (সম্যক্ রূপে অবিচলিত) থাকে (তাঁহার আত্মস্বরূপ বোধ কখনও অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হয় না) [কারণ] তাঁহার আত্মা জ্ঞান বিজ্ঞানেই তৃপ্ত (তিনি স্বভাবতঃই বিষয় সঙ্গ-নিস্পৃহ বলিয়া তাঁহার তৃপ্তির জন্য কোন পার্থিববিষয়ের প্রয়োজন হয় না, তিনি কেবল আত্ম-বিচারে ও পরমাত্মানুভূতিতেই পরিতৃপ্ত থাকেন), তিনি কূটস্থ (সর্ব্বাবস্থায় নির্ব্বিকার) [সুতরাং] জিতেন্দ্রিয়, তাঁহার নিকট মাটি, পাথর আর সোনা সবই সমান ; এমন (সমত্ব বিশিষ্ট) যে যোগী তাঁহাকেই যুক্ত (প্রকৃত যোগারূঢ়) বলা যায়। লোকে সাধারণতঃ কোন কোন ব্যক্তিকে উপকারিত্ব হেতু সুহৃৎ বলিয়া থাকে, যাহার সহিত মনের মিল হয় তাহাকে মিত্র বলিয়া থাকে, [কাহাকেও বা অপকারিত্ব হেতু শত্রু বলিয়া থাকে], কোন কোন ব্যক্তিকে উদাসীন (অর্থাৎ শত্রুও নয় মিত্রও নয় এরূপ) মনে করে, কাহাকে ও বা মধ্যস্থ (মীমাংসাকারী) বলিয়া মনে করে, কাহাকেও বা দ্বেষ্য মনে করে (এরূপ বিদ্বেষ যে, চোখের কোণেও দেখিতে পারে না), কাহাকেও সাধু আর কাহাকেও বা পাপী মনে কর ; কিন্তু যিনি [সর্ব্বত্র আত্মদর্শন বশতঃ] সকলকেই সমান দেখেন (কাহারও প্রতি যাহার বিদ্বেষ বা প্রীতি হয় না), এমন সমবুদ্ধি (সিদ্ধ) পুরুষই যোগীদিগের মধ্যে বিশিষ্ট। (মনন, অভ্যাস ও নিধিধ্যাসন, এই তিনটী যোগলাভের ক্রম, মনন দ্বারা সমত্ব বুদ্ধিলাভ করিতে হয়, অভ্যাস দ্বারা (by Practice) তাহা চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় এবং নিধিধ্যাসন দ্বারা (by constant meditation and exercise) ঐ সমত্ববুদ্ধি বা আত্মদর্শনকে স্বাভাবিক সংস্কারে পরিণত করিতে হয় ; যাহার আচরণে বা চরিত্রে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় এই সমত্বের সংস্কারটির পরিস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়, তিনিই বিশিষ্ট যোগী)।

এই সমত্বরূপ যোগ সম্বন্ধে শ্রুতি আরও বলিতেছেন, (যোগশিখোপনিষদে) –

"যোঽপানপ্রাণয়োরৈক্যং স্বরজোরেত সোস্তথা।

---

* আত্মা - আত্মবোধ, নিজবোধ, "আমি" বলিয়া বোধ। পরমাত্মা—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্ব্বিকার আত্মবোধ, ইহাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ। মোহমুগ্ধ জীব সাধারণতঃ সেই প্রকৃত আত্মস্বরূপকে ভুলিয়া দেহ মন ও বুদ্ধি-য়াদিতে আত্মবোধ করিয়া থাকে। এই শ্লোকে "জিতাত্মনঃ" পদে এই হীনতর আত্মবোধকে জয় করার কথা বলা হইয়াছে। প্রকৃত আত্মা বা "চিৎই" বিষয়সঙ্গ হেতু "চিত্ত"রূপে পরিণত হয়, পক্ষান্তরে যখন বিষয়সঙ্গ-জাত বৃত্তিসমূহের সম্যক্ রোধ হেতু সর্ব্বত্র সমত্ববোধ জন্মে, সুতরাং পরম স্থিরতাভাবের উদয় হয়, তখন সেই চিত্তই আবার চিৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। বাস্তবিকই 'চিৎ' আর চিত্ত দুই বিভিন্ন বস্তু নহে—আত্মা (নিজবোধ) যখন বিষয়সঙ্গহেতু স্বরূপচ্যুত হন তখনই তাঁহাকে 'চিত্ত' বলা হয়, আর যখন স্বরূপে অবস্থিতি করেন তখনই তাঁহাকে 'চিৎ' বলা হয়।

সূর্য্যচন্দ্রমসোর্যোগো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
এবং তু দ্বন্দ্বজালস্য সংযোগো যোগ উচ্যতে (১)

অর্থাৎ—অপান ও প্রাণবায়ুর (শ্বাস ও উচ্ছ্বাস বায়ুর), ঈড়া ও পিঙ্গলা (বাম ও দক্ষিণ নাসা) বাহিত শ্বাসদ্বয়ের, প্রকৃতি ও পুরুষের এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার এইরূপ সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বসমূহের যে সম্যক্ ঐক্য বা যোগ সংস্থাপন, তাহাকেই 'যোগ' বলা যায়।

যখন ঈড়া ও পিঙ্গলানাড়ীর শ্বাসও বন্ধ হইয়া যায় এবং মধ্যনাড়ীতে (সুষুম্নানাড়ীতে) প্রাণপ্রবাহ হয়, যখন শ্বাস ও উচ্ছ্বাস রুদ্ধ হইয়া স্বাভাবিক কুম্ভকাবস্থা আনয়ন করে, তখন চিত্তবৃত্তি সমূহ সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইয়া যায় ; তখনই স্বদেহাভ্যন্তরস্থ প্রকৃতি ও পুরুষের (চঞ্চল প্রাণ ও স্থিরপ্রাণের এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার (ভোক্তৃত্বাভিমানী আত্মা ও নির্লেপ সাক্ষী চিদাত্মার) ঐক্য সাধিত হয়। ইহারই নাম 'সমাধি' বা যোগ।

এই অবস্থায় কোন বাহ্য বিষয়ে জ্ঞান থাকে না, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে এই সমাধি ভঙ্গ হইয়া যায়, তখন বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসে। নিষ্ঠাবান্ সাধকের এইরূপ সমাধি পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে ; এবং ঐরূপ পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে কালক্রমে এমন সুন্দর একটি অবস্থা উপস্থিত হয় যে, সমাধি ভঙ্গেও তাহার রেশ অনুক্ষণ চলিতে থাকে। তখন বাহ্যজ্ঞান সত্ত্বেও একটি নির্লিপ্ত অবস্থা থাকিয়া যায় এবং সেই সিদ্ধপুরুষের পক্ষে শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখ মানাপমানাদি দ্বন্দ সমূহ তিরোহিত হইয়া যায় ও কেবল নিত্য পরমানন্দ বর্ত্তমান থাকে। এই অবস্থাকে 'জাগ্রত সমাধি' বা 'চৈতন্য সমাধি' বলা যায়)। এই যে প্রকৃতি ও পুরুষের তথা জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্য বা সংযোগ এবং সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ব সমূহের সমত্ব ভাব, ইহাই 'যোগ' পদবাচ্য।

রাসলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ

আদৌ মনে থাকে যে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন লীলা অষ্টম বৎসর বয়স করিয়াছিলেন। এই মাত্র মনে থাকিলে রাসলীলার সাধারণ (general aspect) গৃহীত কুভাব অনেকটা প্রশমিত হইবে। হৃদয়ে সত্যবৎ প্রতিভাত হইবে যে, শ্রীকৃষ্ণ পরা প্রেম (divine love) দ্বারা প্রেমাসক্তা (affectionate devotee) ব্রজ গোপিকাগণের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। যখন ধর্ম্মগ্রন্থ, সৎসঙ্গ, সৎ উপদেশ দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্য প্রশমিত হইয়া থাকে, তখন পরা শক্তির দ্বারা সকলি সম্ভব। পরাপ্রেম প্রকাশ পূর্ব্বক প্রকৃতি প্রশমিত করার জন্যই অবতার গ্রহণ, নতুবা ব্রহ্ম ত নিষ্ক্রিয় (inactive)।

(১) সূর্য—পিঙ্গলা নাড়ী ; চন্দ্র—ঈড়া নাড়ী। রজঃ—প্রকৃতি, রেতঃ চিৎ বা পুরুষ [রাজযোগ অধ্যায়ে বিশেষ প্রমাণ দ্রষ্টব্য]।

এই পরা প্রেমের কথা শ্রীমদ্ভাগবতে রূপক ভাবে (rhetoricaltly) বর্ণিত আছে। এই পরা প্রেমের আধ্যাত্মিকাভাস দিতে চেষ্টাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে প্রশ্ন করেন, "শ্রীভগবানের দ্বারা পরদারাভিমর্ষণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? "শুকদেব দেখিলেন যে, রাজা ভাগবতোক্ত রাস মণ্ডলের রূপকরহস্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কাজেই রাজার বোধার্থে তিনি, শিবোক্ত "রসোল্লাস" তন্ত্র হইতে যে স্থানে শিব দেবীকে রাস বিষয়ে বলিতেছেন, তাহাই আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন, যথা :—

শরীরে দেহানি স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কারণং।
তথৈবান্যং দেহং জ্ঞেয়ং ভাবদেহং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
কৃপালব্ধমিদং দেহং সহজং জন্ম জন্মনি।
অথবা সাধানালব্ধং কদাপি বা মহেশ্বরী ॥
ন সগুণং নির্গুণম্বা দেহমিদং পরাত্মিকে।
কুত্রাপি নহি দ্রষ্টব্যং লোকে বৃন্দাটবীং বিনা।
মৈথুনং সহ কৃষ্ণেণ গোপিকা চরিতঞ্চ যৎ।
তন্ন কামান্ কামাদ্বা ভাবদেহেন তৎকৃতম ॥

ভাবার্থ এই যে :—যে ভাবে শরীরে স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ দেহাদি আছে, তদ্রূপ অন্য দেহ "ভাবদেহ" বলিয়া আর একটী দেহ আছে। এই দেহ ঈশ্বরকৃপায় লব্ধ হয়, একবার লব্ধ হইলে সহজে জন্মে জন্মে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, অথবা হে মহেশ্বরী, কদাপি সাধনা বলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভাবদেহ সগুণ বা নির্গুণ নয়, এদেহ পরাত্মিক, বৃন্দা অটবী ভিন্ন কুত্রাপি লোকে দেখা যায় না। কৃষ্ণের সহিত মৈথুনে গোপিকাগণ চরিতার্থ হইলেন তাহা (মৈথুন) কাম বা অকামের বিষয় নয়, সে (মৈথুন) ভাবদেহের কৃত।

শিব বাক্য হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের মৈথুন ভাবদেহের মিলন ইহাতে ইন্দ্রিয়ের বিষয় কিছুমাত্র ছিল না। কৃষ্ণপ্রেমিকের কাছে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবক ভায়াদের মনঃপূত হইবে না বলিয়া পাশ্চাত্য ভাবুক প্রবর মনীষীদের ভাবৈকতা যথাস্থানে উদ্ধৃত হইল। বাইরন্ Haidee এবং Juan এর মধ্যে ভালবাসা বুঝাইতে গিয়া গাইয়াছেন যথা :—

Love was born with them
in them so intense
It was their very spirit--not a sense.

কবির ভাবের ভাষা অপর ভাষায় পূর্ণভাবে ব্যক্ত করা অসম্ভব, তথাচ চেষ্টায় ক্ষতি নাই। ভাবার্থ এই যে উভয়ের অতিতানিত প্রেম এত প্রগাঢ় ও গভীর ছিল যেন উভয়ের আত্মা প্রেমময় আত্মা—ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নয়।

শিব বাক্যের সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবৈকতা ত পাওয়াই যায়, উক্ত বাইরনের পদাবলীর সহিত শিববাক্যের ও বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবেরও একতা পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তা বিদ্যাপতির জীবনী দিয়া, ভাবের একতার (ভাবদেহের) বিষয় কিঞ্চিৎ

দেখাইব। বিদ্যাপতি মিথিলাধিপতি শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন। উক্ত রাজা ইহাকে বিহার প্রদেশান্তর বিসপী নামক একটী গ্রাম দান করেন। বিদ্যাপতি ১৪০০ হইতে ১৫০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। লছমী দেবী রাজা শিবসিংহের স্ত্রী। প্রবাদ যে, বিদ্যাপতি ও রাণী পরস্পরে প্রতি আসক্ত এইজন্য রাজা মহাক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার শূলদণ্ডের আজ্ঞা দেন। বিদ্যাপতি বলেন তাঁহার আসক্তি প্রাকৃতিক নহে। আরও বলেন যে রাজান্তঃপুরচারী না হইলেও রাণীর সমস্ত সংবাদ সকল সময়েই তিনি জানিতে পারেন। ইহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, রাণী এখন কি করিতেছেন?" বিদ্যাপতি তদ্দণ্ডে একটী পদ রচনা করিয়া রাজার হস্তে দিলেন। পদটী এই—

সুন্দরী করত সিনান
বাম করে কপোল, লুলিত কেশভার
কর নখে লিখু মহী, আখি জলধার।

তৎক্ষণাৎ রাজা অন্তঃপুরে গমন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বিদ্যাপতির নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন এরূপ ঘটনা সূক্ষ্ম বা কারণ দেহের (astral or Etherial body) যেহেতু, অধুনা পাশ্চাত্য দেশে Suspension of animation সম্ভব, এরূপ গবেষণা চলিতেছে। আমি কিন্তু বলি তাহা নয়। কর্ণাট রাজার মৃতদেহে শঙ্করাচার্য্য সূক্ষ্ম শরীরে যখন প্রবেশ করেন, তাঁহার নিশ্চেষ্ট স্থূল দেহ তাঁহার সূক্ষ্মদেহ প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। বিদ্যাপতির সূক্ষ্মদেহ যদি অন্তঃপুরে রাণীর নিকট গমন করিত, তাহা হইলে তাঁহার স্থূলদেহ সচেষ্ট থাকিত না, পদরচনাও করিতে পারিতেন না। জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতিরও এইরূপ ভাবদেহের ক্রিয়ার কিম্বদন্তীও আছে।

রামমণির উল্লেখে রায় রামানন্দ বলিয়াছেন:—

"ন সো রমণ না হম রমণী"

আবার অন্য পদে বলিয়াছেন:—

"রঙ্গকিনী রূপ　　　কিশোরী স্বরূপ"
"কামগন্ধ নাহি তায়"

আবার বলিয়াছেন:—

"তুমি কামহীনা রতি কাম গন্ধ নাহি তায়"

এসব কথায় বেশ বুঝিতে পারা যায় যে শিবোক্ত "ন সগুণং নির্গুণঞ্চ দেহমিদং পরাত্মিকে" অপ্রাকৃত দেহের কথা; "ভাবদেহং প্রকীর্ত্তিতম্"—ভাব দেহের কথা।

ন সগুণং নির্গুণঞ্চ এই দুইটি কথার ভাব গ্রহণ কর, বুঝিবে তাহার সহিত পার্থিব কামের (lust) কোন সম্বন্ধ নাই।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণকে 'অপ্রাকৃত নবীন মদন" বলিয়াছেন। আর বলিয়াছেন যে অপ্রাকৃত মদনে প্রাকৃত মদনের কার্য্য সম্ভবে না, অন্যথায় তাঁহার "মদন মোহন" নামই মিথ্যা হয়।

পাশ্চাত্য দেশবাসী Emerson, Carlyle এই দুইটী সুদূর দেশবাসী চিন্তাশীল মনীষীদ্বয়ের ঘটনার কথা এদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষিত অনেক যুবকই অবগত আছেন; ইহাদের প্রথম মিলনে উভয়ের কেহই একটী কথা মাত্র বলিতে পারেন নাই, কেবল একে অন্যের প্রতি চাহিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে Ben Jhonson এর একটী কবিতা মনে পড়িল "Drink to me with thine eyes."

এইরূপ সমোক্তি বৈষ্ণব পদাবলীতেও দেখা যায় যথা:—

"নয়নে নয়নে আমা পিয়ে" হাজার হাজার মাইল দূরস্থিত দুইটী দেশের একজন অপরের ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কবিদের একই ভাবে একই রূপ কথা বলা কি সম্ভব হয় না? আমার মনে হয় এই সব সম্বন্ধ ভাবদেহের (অপ্রাকৃত দেহের), প্রাকৃত দেহের নহে।

Emerson এবং Carlyle এর ব্যাপারের মত বিদ্যাপতিও চণ্ডীদাসের হইয়াছিল। প্রথম মিলনে উভয়ে কথা বলিতে পারেন নাই; যথা:—

"দুহু নিরখি দুহু কাঁদে"

দুই জনেই কাঁদিতে লাগিলেন; কথা কহিতে পারেন নাই।

যোগ শাস্ত্রে "বৈখরী" ভাষার কথা আছে, তাহার লক্ষণ যথা:—

"গুরুস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং
শিষ্যাস্তুছিন্ন-সংশয়াঃ"

ভাবার্থ এই যে, গুরু মৌন ভাবে আছেন কিন্তু শিষ্যদের সংশয় ছিন্ন হইল। এই সকল কথা তৎতৎ অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে বোধগম্য হয় না, যেমন বালক যুবাবস্থার ইন্দ্রিয়প্রেরণা রহস্য বুঝিতে পারে না, সেইরূপ সাধারণ লোকে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, অথবা বিশ্বাস করিতে চাহেন না।

সঙ্গীত শাস্ত্রেও বৈখরী ভাষার কথা আছে, আবার অবস্থা বিশেষেরও কথাও আছে। সে সকলের উল্লেখ এ স্থানে নিস্প্রয়োজন। কেবল মাত্র বলিয়া রাখি যে, যোগবল কষ্টসাধ্য, কিন্তু স্বরের বল তদপেক্ষা (মনোরম হেতু) সহজ সাধ্য।

এখন শিববাক্যের 'মৈথুনং সহ কৃষ্ণেণ' কথাটির ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখিতে হয়। কৃষ+ণক্—আকর্ষণে, অর্থাৎ যিনি আকর্ষণ করেন। সাংখ্য দর্শন ও বেদান্তে পাওয়া যায় গুণ ক্ষোভ হইলে বিকাশ (Evolution) হয়। প্রথম বিকাশকে সাংখ্য প্রকৃতি (Female principle of creation) বলেন, আর বেদান্ত তাহাকেই মায়া বা অবিদ্যা (Phenomenal emanation or illusion) বলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকৃতি বা অবিদ্যাকে আকর্ষণ করেন। ব্রহ্ম গুণাতীত (absolute); জীবকে গুণাতীত না করিতে পারিলে নিজের মধ্যে লয় করা সম্ভবে না। তাই জীবকে গুণাতীত করিবার জন্য অহরহ তিনি আকর্ষণ করিতেছেন। গীতায় তাই পাওয়া যায়— "ত্রৈগুণ্যঃবিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"।

এখন শিব বাক্যের "মৈথুনং সহ কৃষ্ণেণ" কথার ভাব বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। উক্ত শিব বাক্যে তিনটী মাত্র কথা আছে—কৃষ্ণেণ কথাটী একবচন বাচক, সহ শব্দের অর্থ সহিত অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত মৈথুনং। যত গোল "মৈথুনং" কথাটী লইয়া। উদ্বাহ তত্ত্বে পাওয়া যায় "মৈথুনে মিথুন শব্দ বাচ্য স্ত্রীপুংস সাধ্যে অগ্নাধ্যান পুত্রোৎপত্ত্যাদৌ।" অমর কোষে মিথুন শব্দের অর্থ:—'সঙ্গতং

রতং” আর “মিথুন রাশৌ” বিবাহ তত্ত্বে পাওয়া গেল—পুত্র উৎপাদন জন্য স্ত্রী পুরুষের সংযোগ। শিবোক্তিতে জানিতে পারিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপিকাগণের মধ্যে প্রাকৃত দেহের সম্বন্ধ ছিল না; সুতরাং “পুত্রার্থে মৈথুনং” এরূপ অর্থ প্রয়োগই হইতে পারে না। আর মিথুন রাশির অথবা আষাঢ় মাসের সহিত রাসলীলার কোন সম্বন্ধও দেখা যায় না—আছে কেবল সঙ্গীতের সম্বন্ধ। এখন “সঙ্গতং” এবং “রতং” এই দুইটী অর্থ গ্রহণযোগ্য কিনা দেখা যাক। সঙ্গত অর্থাৎ যুক্ত (United) বা সহিত (accompanied)। কণ্ঠসঙ্গীত অর্থাৎ গানের সহিত বীণাদি বাদনের সহিত ইহাদের তাল লয় রক্ষা করিয়া ছন্দে ছন্দে একাত্মা হইয়া মৃদাঙ্গাদি বাদনকে প্রচলিত ভাষায় সঙ্গত বলে। এই সঙ্গতে কামের (lust) গন্ধমাত্র নাই। ইহা কামবিহীন; সুতরাং সঙ্গতং অর্থ গ্রহণযোগ্য। তারপর রতং—রম+ক্ত=আসক্ত (devoted)। ভগবান গোপিকাগণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, “তোমাদের যোগমায়া অর্চ্চনান্তে শারদীয়া পূর্ণিমার যামিনী সমাগমে আমার সহিত বিহার করিতে পাইবে।” এই প্রগাঢ় উৎসর্গী কৃত অনুরাগ বাচক “রতং” অর্থ এস্থানে প্রযোজ্য হইতে পারে, কিন্তু মনের সঙ্কল্প (volition) বিকল্প (option) ভাব ধরিলে চলিবে না। সগুণ নির্গুণ ভাবের অতীত ভাব গ্রহণ করিতে লইবে। আমার মনে হয় যে শাস্ত্রে যাহাকে মনের নিরোধ অবস্থা (total cessation of every mental energy) তাহাই শিবোক্ত ভাবদেহ বুঝিতে হইবে। সুতরাং শিবোক্ত “মৈথুন” শব্দ শ্রীকৃষ্ণের ও গোপিকাগণের মৈথুন যৌনক্রিয়াবাচক নহে। ভাবদেহের মধ্যে হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।

কথা হইতে পারে যে, শিব একটী মাত্র কৃষ্ণের রাসে থাকার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ভাগবতে কেন্দ্রস্থ অর্থাৎ রাসমণ্ডলের মধ্যে একটীমাত্র কৃষ্ণের থাকার কথা সত্ত্বেও বহু কৃষ্ণের কথা ভাগবতে আছে যথা:—

“তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ’,

এ কিরূপ কথা হইল? একথার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে যখন বেদান্তাদি শাস্ত্রে জীবের ব্রহ্মে লীন হইতে পারিবার কথা পাওয়া যায়, তখন গোপিকাগণ রাসমণ্ডলে নিজ নিজ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়াছিলেম তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বহু কৃষ্ণের সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে শ্রীকৃষ্ণ যখন সর্ব্বব্যাপী (all pervading) তখন গোপিকাগণের মধ্যে মধ্যে তাঁহার থাকা অসম্ভব কিসে? সর্ব্বব্যাপীর কেন্দ্র সর্ব্বস্থানে (St. Augustin described the nature of God as a circle whose centre is every where and the circumfernce no where.

এখন বলিতে পারা যায় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা যৌন সংসর্গ নহে। শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলা বালক যেমন নিজ প্রতিবিম্ব লইয়া ক্রীড়া করে তদ্রূপ। ইহা আত্মায় রমণ * গুণ-ক্ষোভাপন্না গোপিকাগণকে সঙ্গীতের দ্বারা মনোজ্ঞ ভাবে নিস্ত্রৈগুণ্য (void of three attributes or forms of energy) করিয়া নিজের মধ্যে লয় করিয়া লওয়া এই রাসলীলার গূঢ় উদ্দেশ্য।

* যথা:—ষড়জে ষড়জে মিলন। গুণীগণ জ্ঞাত আছেন, রাগরূপ যখন পূর্ণভাবে বিকশিত হয় তখন সংসার অসার অনিত্য বোধ হয়, নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ হইয়া কেবল আনন্দমাত্র থাকে।

সমাগতা

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কলিকাতায় নবীন কুমারদের নিজেরই বাড়ী, নিতান্ত ছোট নয়। কয়েক পা তফাতে, পথের ধারে, ভাড়াটে ঘরে দোকানটি—সোণারূপার দোকান।

বাসার পুরাণ চাকর নয়ান মাহাতো, নবীনেরই বয়সি, তবে বয়সটি তার ঈষৎ কুব্জদেহের ভিতরে ভিতরেই বাড়িতেছিল,—তাবৎকালেও শ্মশ্রু গুম্ফের চিহ্ন মাত্র দেখা দেয় নাই।

পথেই দৈবাৎ নবীনের সহিত নয়ানের দেখা হইয়া গেল; অথবা ঠিক করিয়া বলিতে গেলে নবীনের সম্মুখে সে পড়িল। সে তখন হা করিয়া উপরদিক চাহিয়া তাড়াতাড়ি কি কাযে বাজারের দিকে যাইতেছিল। নবীন কে সে খেয়ালই করে নাই। নবীন সেখানটা হাটিয়াই যাইতেছিল। নয়ান সম্মুখে পড়িতেই, তাহার ভঙ্গী দেখিয়া, নবীন কুমার তাহাকে একটু জোরে একটি ধাক্কা দ্বারা সচেতন করিয়া লইয়া ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল:—"অ্যাই, বৌদি কেমন আছেন?" নয়ান হটাৎ সচেতন হইয়া আঘাতের স্থানটায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কাঁদিবার উপক্রমে বর্ষণোন্মুখ মুখটি নবীনের দিকে ফিরাইয়াই আকস্মিক উল্লাসে রৌদ্রদীপ্তবৎ করিয়া, "অই! ছুটো বাবু আইচো?" বলিয়াই দৌড়িবার উপক্রমে পশ্চাৎ ফিরিতেই, নবীনকুমার খপ্ করিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া একটু নাড়া দিয়াই অধিকতর ব্যগ্রভাবে শুধাইল:—"এই! যাচ্চিস্ কোথা, বৌদিদির খপর কি?" নবীনের ঈপ্সিত উত্তর না দিয়া নয়ান বলিল:—"অ-ই, তুমি আইচো তো খপোরটো দিতে যেচি বাকুলে, খপোরটা দিবো নাই? ধাকাল্‌ছো ক্যানে?"

নবীন এইবার একটু ক্রুদ্ধ হইয়াই বলিল:—"চুপ্ গাধা কোথাকার! যা জিজ্ঞেস্ কচ্চি উত্তুর দে, দিয়ে লাফাবি, -বড় বৌদি, কেমন আছেন বল দেখি?"

নয়ান,—'ভালই রইচে।' নবীন 'কে দেখ্‌চে?' নয়ান,—'আমিও দেখ্‌ছি সাবা যোনই দেখ্‌ছি!' নবীন,—'ওরে উল্লুক, ডাক্তার! ডাক্তার কে দেখ্‌চে?' নয়ান হাঁ করিয়া নবীনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—'এই ডাক্‌তোর ব'ল্‌ছ—ডাক্‌তোর কিসের লেগে দেখ্‌বেক, কি হৈচে?"

নবীন একটু সন্দিগ্ধ অথচ বিরক্ত ভাবে বলিল:—'ওরে উজ্‌বক! বড়গিন্নীর অসুখ করে নাই?' নয়ান বলিল,—'না তো:!' নবীন একটু অন্যমনস্ক হইল, কিছুই বুঝিতে পারিল না; জিজ্ঞাসা করিল,—"বড়বাবু কোথা?" নয়ান,—"বাকুলে রৈচে ঘুমুইচে কি জেগেই রইচে!" নবীন,—"মেঝবাবু?" নয়ান,—"মেঝেবাবু দেহাতে গেইছেন, আজোই আসেন কি কেলোই আসেন!" নবীন নয়ানের হাতটি ছাড়িয়া দিয়া বলিল:—"আচ্ছা যা, যেখানে যাচ্চিস্ যা। দোকানে কে আছে বল দেখি?" নয়ান মুক্ত হইয়া জোরে একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল:—"মহুরীরা রৈচে, আর কে রোইবে?"

অব্যবস্থিত মন লইয়া নবীন একটু দ্রুতগতি দোকানে গিয়া উপস্থিত হইল। এবং

সেখানকার চাকর বাকরদের আদর অভ্যর্থনায় বিন্দু মাত্র মনযোগ না দিয়া কর্ম্মচারী—দোকানের ক্যাসিয়ার ভুবন রায়কে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি গো রায় মশায়, এমাসে আমার টাকা পাঠান নাই কেন ?" রায় ;—"বড় গিন্নী মানা করেছিলেন বলে পাঠানো যায় নাই বাবু !" নবীন,—"ভাল বড় গিন্নীর কি কোনো অসুখ বিসুখ হয়েচে ?" রায়,—"আজ্ঞে, কৈ তাতো জানি না"। নবীন টেলিগ্রামটি দেখাইয়া বলিল,—"আরে মশায়, এই টেলিগ্রাফটা দেখুন দেখি, নীচে তো আপনারই নাম রয়েচে দেখচি, আপনিই টেলিগ্রাফ করেচেন আর আপনি জানেন না যে বড় গিন্নীর অসুখ করেচে কি না ? আশ্চর্য্য বটে !" রায় ;—"আমিতো ইংরিজি জানি না বাবু ! কেউ আমার নামটা লিখে দিয়ে থাকবে হয়তো ; আর হতেও পারে একটু আধটু অসুখ, আমি সে কথা শুনি নাই বাবু !" নবীন একটু হাঁসিয়া বলিল ;—"বুঝেচি ; যাক্ ও কথায় আর কাজ নাই, কিন্তু টাকা ঠিক্ ক'রে রাখবেন, কালই ফিরতে হবে !" রায় বলিল,—"যে আজ্ঞে !"

নবীনের বুকের বোঝাটা নামিয়া গেল, মুখটা একটু সরস হইল ; কিন্তু এইবার দারুণ লজ্জা সঙ্কোচ আসিয়া তাহার মনটাকে ঘেরিয়া ধরিল। সে যে একটা খুব বাহাদুরী কিম্বা সুকীর্ত্তি করিয়া যায় নাই তাহা সে জানিত, এ জন্য তাহার ভ্রাতৃজায়ারা যে তাহার মুখে গুড় দিবে না তাহাও সে বুঝিত। যে কর্ম্ম সে করিয়াছে তার জন্য সকলের কাছেই মন্দ মধুর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অনুযোগ পাইবারই সে অধিকারী, তৎসম্বন্ধেও সে নিশ্চিত। নবীন ভাবিয়া দেখিল "দাদারা এই লজ্জাজনক ব্যাপার সম্বন্ধে তা'র সঙ্গে স্পষ্ট আলোচনা কিছু করিবেনই না, মধ্যমা ভ্রাতৃজায়া তাহার অপেক্ষা কিছু বয়োজ্যেষ্ঠা হইলেও তাঁহার নিকট কোনো এক রকমে সারিয়া লওয়া চলিবে কিন্তু বড় বৌদিদি যদি কান দুটি ধরিয়া মলিয়া গালে ঠাস করিয়া একটি চড়াইয়া দেন তখন তো লজ্জায় মরিয়া যাইতে হইবে ? কিন্তু নবীনের এ কথা মনে উঠিল না যে, বড়বৌদিদি নয়, তার কান দুটি মলিয়া গালে ঠাস্ করিয়া চড় ইবার একজন আছে !'

লোকের মুখে যতই এবং যাহাই শুনুক, এতটা আসিয়া অন্ততঃ বড় বৌদিদির সঙ্গে একবার দেখা না করিয়া এবং তাঁহাকে একটি প্রণাম না করিয়া চুপে চুপে ফিরিয়া যাওয়ার কল্পনা নবীন মনেও আনিতে পারিল না, কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে তার কুকীর্ত্তি কালিমা মাখা মুখ খানা—সেই অপবিত্র, অশুচি, উপহারটা—লইয়া দেবতার সম্মুখে হাজির করিতেও সে পারিল না। লজ্জায় তাহার মাথা কাটা যাইতেছিল।

যাহা হউক এদিক্ ওদিক্ করিয়া কিছুক্ষণ কাটাইয়া যখন সন্ধ্যার সময় নবীন কোনো ক্রমে যাইয়া বৌদিদিদের পায়ের গোড়ায় একটি করিয়া প্রণাম করিয়া, প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার আশঙ্কিত কল্পিত;—'ছি ছি ! তুমি এমন ? তোমার এই কাব ঠাকুর পো ?' এই পড়ে, এই পড়ে ভাবিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিতেছিল এবং তদ্রূপ একটা প্রশ্নের একটা যা' হউক্ উত্তর খুঁজিয়া বাহির করিতেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছিল সে সময়, তাহার মেঝ বৌদিদির সেই শান্ত সরল হাসি এবং সংক্ষিপ্ত কুশল জিজ্ঞাসা ও সরলার মমতামণ্ডিত স্নিগ্ধ দৃষ্টি তাহার চিন্তার ভুল ধরাইয়া দিল,—ছোট দেবরটির জন্য তার বৌদিদিদের ক্ষমার ভাণ্ডার এখনো পূর্ণ—বাল্মীকির উদাত্ত স্বর সপ্তকের সীতা সৌমিত্রী গীতি তাঁদের কাণে এখনো অব্যাহত ? সরলার মাতৃবৎ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সহজেই ধরিয়া ফেলিল যে, নবীনের পূর্ব্ব স্বাস্থ্য কতকাংশ ক্ষুন্ন হইয়াছে, মুখ শুকাইয়াছে, চক্ষের নীচে কালীর দাগ পড়িয়াছে।

সরলা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'পশ্চিমের জল হাওয়া খুব ভাল বলে যে, ঠাকুর পো, তোমার চেহারা দেখে তা' তো মনে হয় না,—অসুখ, বিসুখ কিছু হয় নি তো ?' নবীন মনে মনে করিল,—স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও, এটার অনেকাংশের জন্য তুমিই দায়ী ;—অমন সাংঘাতিক টেলিগ্রাফও কি দিতে হয় ?' মনে করিল বটে, কিন্তু পাছে কথাটা কচলাইতে গিয়া অবাঞ্ছনীয় কিছু বাহির হইয়া পড়ে, যদি উত্তরে এই বাহির হয় যে, 'যে শক্ত জালে বাঁধা ছিলে তুমি, এত জোরে না টানিলে কি তোমায় বাহির করা যাইত ?' তাই, মনের কথা মনে চাপা দিয়া বলিল,—"সে কি কম দূর বৌদি,' তিন দিন, তিন রাত রেলে,—এ কি সোজা কথা ?"

* * * *

যতই হউক, দাদাদের সঙ্গে চাক্ষুষ করিতে নবীনের সাহস নাই। নবীন মনে মনে করিল, দোকানের তহবিল হইতে টাকাগুলি লইয়া কা'লই চম্পট দিবে। মনের সঙ্কল্প মনেই রাখিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া—নিশ্চিত বাধাটিকে খোঁচা দিয়া না তুলিয়া নবীন রাত্রি দশটার পর আহারান্তে বৌদি'র নির্দ্দেশ মত দ্বিতলের একটি কক্ষে শয়ন করিতে গেল। ঘরটি অন্ধকার ছিল। ঘরে ঢুকিয়া ইলেক্ট্রিকের সুইজটি টিপিয়া দিয়া বিছানার পার্শ্বে যাইলে, শয্যার উপরে একটি জিনিসের প্রতি নজর পড়িতেই নবীন চমকাইয়া উঠিয়া দুই হাত পিছনে হটিয়া গেল। বিছানার উপর নবীন যেটি দেখিল সেটি যে আপাদ মস্তক পরিধেয় বসনে আবৃত একটি স্ত্রীলোক, সেটি নবীন সেই তীব্র বৈদ্যুতিক আলোয় দেখিবা মাত্রেই বুঝিল। কিন্তু কে এ ? নবীন ভাবিল, সে ভুল বুঝিয়া তার মেঝ দাদার ঘরেই আসিয়া পড়ে নাই তো ? তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল, তার মেঝ বৌদিদি যে তাহার খাবার সময় আগাগোড়া সম্মুখে বসিয়া ছিলেন, এখনো তাঁর খাওয়া হয় নাই,—তিনি এরই মধ্যে এখানে আসিয়া পড়িবেন কখন এবং কি করিয়া ? তবে কি তা'র বৌদিদিদের কোনো আত্মীয়া ? এই খোলা ঘরে অন্ধকারে, একা ? মনে হয় না ! তবে কি, যে মামলার খরচা রায় সে অনেক আগেই দিয়া দিয়াছে, সেই পুরাণো মামলা আজ আবার নূতন করিয়া পুনস্থাপন করিতে বাদী আত্মপক্ষে স্বয়ং হাজির হইয়াছে ? কিন্তু তাহা হইলে, সে পক্ষের মাতব্বর উকিল বড় গিন্নীর কাছে নবীন কি কিছুমাত্র পূর্ব্বাভাস পাইত না ? নবীন স্বল্প সময়ের মধ্যে এ সকল সমস্যা সমাধান করিতে পারিল না। ব্যাপারটা কি, বুঝিবার জন্য বউ দিদিদের নিকট যাইবার অভিপ্রায়ে নবীন পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্বার সন্নিকটে আসিতে না আসিতে পশ্চাৎপদ মৃগকে ব্যাঘ্রী যেমন ধরে, সেই পালঙ্কশায়িতা রমণী ঝটিতি উঠিয়া নবীনকুমারের একটি হস্ত তেমনি করিয়া ধরিয়া বলিল,—"ফিরে চল্লে যে ? শোনো !" নাবিকের কর্ণে পোতাধ্যক্ষের বংশীরবের ন্যায় সে অকম্পিত স্বর নবীনের কর্ণে বাজিল—অনুজ্ঞা জ্ঞাপক, মধুর ! নবীন ফিরিয়া দেখিল,—ললিত কদম্বতরু সন্নিভ ঈষদ্দীর্ঘ দেহ সম্পন্না নবকিসলয় শ্যামলাঙ্গী—মহিমাময়ী মূর্ত্তি ! ব্যস্ততায় যুবতীর শিরোবাস অপসৃত হইয়া মস্তক অর্দ্ধ উন্মুক্ত এবং মুক্ত, দীর্ঘ কেশের কতকাংশ গুচ্ছে গুচ্ছে বক্ষঃ বিলম্বিত হইয়াছে, শ্রমহেতু ঘনশ্বাস বহিতেছে, উন্নত বক্ষোদেশ উন্নমিত অবনমিত হইতেছে, নাসাপার্শ্বদ্বয় ঘন কম্পিত হইতেছে। মরাল লাঞ্ছিত গ্রীবা ঈষন্মাত্র হেলাইয়া রমণী আয়ত প্রশ্নময় এবং অন্তর্ভেদী চক্ষু নবীন কুমারের মুখের উপর নিষ্পলকে ন্যস্ত করিয়া রাজেশ্বরী গৌরবে দাঁড়াইয়া আছে। সীমন্তে দীর্ঘ, স্থূল সিন্দূর রেখা ধক্ ধক্

জ্বলিতেছে, সাশ্চর্য্য বিস্ফারিত নেত্রে নবীন দেখিল ; এই বুঝি সে সিন্দুর রেখা ;—তাহার স্বহস্তেরই কীর্ত্তি—যাহা সে স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় একদিন সেই ক্ষুদ্র বালিকার অবিভক্ত কেশ ভিন্ন করিয়া স্বহস্তে আঁকিয়াছিল ? আর সেই সঙ্গে উচ্চারণ করিয়াছিল সেই মন্ত্র,—সেই নিত্য, সত্য, অভ্রান্ত, দীপ্ত মন্ত্র,—

শ্বশ্রাং ভব সম্রাজ্ঞী, সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব,
ননান্দরীতু সম্রাজ্ঞী, সম্রাজ্ঞী অধি দেবরিযু।

আর,—অস্থিভিরস্থীনি, প্রাণৈস্তে প্রাণান্, মাংসৈর্ম্মাংসানি ত্বচা ত্বচং সন্দধানি !

অনেকদিন নবীন ভুলিয়া ছিল, সে মন্ত্র—সেই হোমাগ্নি সমক্ষে পূত প্রতিজ্ঞা—দেতদ্ধৃদয়ংতব তদস্তু হৃদয়ং মম !' আজি স্মরণ হইল। স্পন্দিত হৃদয়ে, মৃদু কোমল কণ্ঠে নবীন বলিল,—'কিরণ ?'

নবীনকুমারের বিগত জীবনধারার শবকে অলক্ত রঞ্জিত পদদ্বয়ে বিদলিত করিয়া কিরণ গললগ্নবাসে স্বামীকে প্রণাম করিয়া পদধূলি মাথায় লইল এবং উঠিয়া স্বামীর হস্ত টানিয়া বলিল,—'এস !' নবীন অতীত জীবনকাহিনী সহ হতভাগিনী সমাগতাকে বিস্মৃতির স্রোতে বিসর্জ্জন করিয়া শৃগালাধিকৃত মেষবৎ নিঃশব্দে পত্নীর শয্যাতল আশ্রয় করিল।

হায়রে, সংসার আলানে মত্ত মাতঙ্গ বন্ধনের হেমনিগড়। রত্নাকরের রত্ন ভাণ্ডনিঃসৃত সুধা ! এই বৈদেহীর পুণ্যক্ষেত্রে তোমার পুণ্যধবল পূত দেহে কুশিক্ষা কালিমা লেপিয়া যে পাষণ্ড তোমার আদর্শ খর্ব্ব করিতে চায়, ভগবানের অফুরন্ত মেঘের ভাণ্ডারে তার জন্য কি একটি বজ্রও নাই ?

দিগ্‌দর্শন

গায়ত্রী

গায়ত্রীর তুল্য ত্রাণকর্ত্রী আর নাই। গায়ত্রী বেদমাতা ও ব্রাহ্মণপ্রসবিনী। ভারতের তেত্রিশ কোটি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র জাতি এই মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অচিরাৎ হিন্দুস্থান ব্রাহ্মণস্থানে পরিণত হইবে।

ভারতবাসী মাত্রেই গায়ত্রীর অভয় উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিলে, ইহকাল ও পরকালের অধীনতাপাশ ছিন্ন হইয়া যাইবে।

এমন একদিন ছিল যখন ইচ্ছা করিলে আর্য্যগণ পৃথিবীস্থ তাবৎ মানব জাতিকেই গায়ত্রী সূত্র দ্বারা গ্রথিত করিতে পারিতেন। এই শক্তি যাঁহাদের ছিল বা এখন আছে, তাঁহারাই সূত্রবিৎ।

ব্রাহ্মণ ! তুমি নিদ্রিত কোটি কোটি ভায়েদের প্রাণে নবজীবনের বীজ ও শক্তি বপন কর। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত কর।

বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র বিসর্জ্জন দিয়া, কিরূপে তুমি আপনাকে হিন্দু বলিয়া গৌরব করিতেছ।

বেদই হিন্দুত্বের প্রাণ। এই প্রাণ বিসর্জন দিয়া হিন্দু বাঁচিতে পারে না। গায়ত্রী ভগবদুপাসনা বিষয়ক সিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র। ইহা হিন্দুর জাতীয় উপাসনার সর্ব্ব প্রধান মন্ত্র।

গীতারূপ শ্রেষ্ঠ উপনিষদ্ বিদ্যা যখন স্ত্রী ও শূদ্রগণের ধর্ম্ম পাঠ্য হইতে পারিয়াছে, তখন স্ত্রী ও শূদ্রগণের ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ নিষেধক উক্তি গুলি প্রক্ষিপ্ত বুঝিতে হইবে।

পুরাকালে নারীগণের বেদের অধ্যাপনা ও সাবিত্রী মন্ত্রে অধিকার ছিল। সাবিত্রী অর্থে গায়ত্রী। ঋগ্বেদের বহু মন্ত্র নারী ঋষি কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল।

শূদ্র সত্যকাম জাবাল জারজ এবং দাসী পুত্র হইলেও মহর্ষি গৌতম তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়া ব্রাহ্মণ করিয়াছিলেন। (ছান্দোগ্য উপনিষৎ)।

আস্তিক হিন্দু মাত্রই গায়ত্রী মন্ত্রের অধিকারী। এই গায়ত্রীকে অবলম্বন ব্যতীত হিন্দুজাতির অস্তিত্ব রক্ষার আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

সমগ্র ভারতবর্ষ এই মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তপঃপরায়ণ হইলে বিধাতার আসন নিশ্চয়ই টলিবে, তখন ব্যক্তিগত ও জাতিগত মুক্তি ভারতবাসীর করতলগত হইবে।

গায়ত্রী ব্রহ্ম প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ। গায়ত্রীর মধ্যে যে "ধীমহি" পদটি রহিয়াছে, তাহার দ্বারা জপাতিরিক্ত ধ্যানের আবশ্যকতা সূচিত হইতেছে।

ওঙ্কার যুক্ত মহাব্যাহৃতি ত্রয়ের উচ্চারণ অর্থ এই যে সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়কারিণী শক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম যে ত্রিবিধ সাকার মূর্ত্তি ধারণ করেন, যে নির্গুণ ব্রহ্মকে আমরা এই ত্রিবিধরূপে উপাসনা করি, সেই পরম ব্রহ্মই এই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ—সমস্ত জগৎই [illegible] —তিনি ছাড়া এ জগতে আর কিছুই নাই। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য "ভূঃ" "ভূবঃ" ও "স্বঃ" [illegible], চিৎ ও আনন্দ এই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, সুতরাং সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই আমাদের উপাস্য।

তিনিই অহংরূপে ও এই দৃশ্য জগৎরূপে আবির্ভূত, সুতরাং আমাদের অহঙ্কারের বা কর্ত্তৃত্বের অবসর নাই।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন এক তিল মাত্র স্থান নাই, যেখানে তাঁহার কর্ত্তৃত্বের বা প্রভুত্বের অভাব।

তাঁহার কর্ত্তৃত্ব তাঁহাকে অর্পণ করিতে পারিলেই, এই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

ইহাই গায়ত্রীর সরল অর্থ এবং ইহাই ব্রাহ্মণত্ব।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

মন্তব্য :—গায়ত্রীমন্ত্র আর ব্রাহ্মণেরও অভ্যাস বা অধিকারে নাই; মর্ম্মও ইহার বড় কেহ জানে না। ব্যাপক ভাবে ভারতীয় সাধনা বা কাল্‌চারেতে ইহার শক্তিসন্নিবেশ ঘটিয়াছে। লেখকের উক্তি ও আকাঙ্ক্ষা ইহার ভিতর দিয়া সকল হওয়া সম্ভবপর ও বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। ভা, সা—সং।

———

আয়ুর্ব্বেদীয়-গ্রন্থমালা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম্-এ, এল্, এম্, এস্ লিখিত।

আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থমালার উপর প্রতিষ্ঠিত কেন না, আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস লিখিবার অন্য কিছু উপকরণ পাওয়া যায় না। সেজন্য আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থের সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, সে সকলের আলোচনা প্রসঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের অতীত ইতিহাসের পরিচয় আমরা পাঠকগণকে দিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গ ছিল। সে সকল অঙ্গের মধ্যে কায়চিকিৎসা নামক অঙ্গকে আয়ুর্ব্বেদের উত্তমাঙ্গ বলিতে পারা যায়। যে সকল মহর্ষি কায়চিকিৎসাকে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের মহনীয় কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন মহর্ষি আত্রেয় তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। আত্রেয়ের প্রধান শিষ্য অগ্নিবেশ, তাঁহার রচিত গ্রন্থ—

১। **অগ্নিবেশ সংহিত।**—টীকাকারগণ স্বমত সমর্থনের জন্য প্রাচীন অগ্নিবেশ সংহিতা হইতে যে সকল পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, দেখা যায়, বর্ত্তমান অগ্নিবেশ সংহিতায় সে সকল পাঠের উল্লেখ নাই। যথা,—চরক সংহিতার টীকায় চক্রপাণি লিখিয়াছেন,—

"[illegible]ক্তমগ্নিবেশেন— কর্ণ র্দ্ধং বা কণাশুণ্ঠ্যোরিতি।"

চক্রদত্তের সংগ্রহ [illegible] চরকসংহিতার উক্ত পাঠের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শিবদাস সেন ও '[illegible]' পরিভাষা বলিয়া উহা চর[illegible] পাঠ ইহা স্বীকার করিয়াছেন। চক্রদত্তের "ষড়ঙ্গ পরিভাষা"র [illegible] গৃহীত একমাত্র শিবদাস সেন বলেন।

মাধব নিদানের টীকায় [illegible] রক্ষিত লিখিয়াছেন,—

"বাতপিত্তকফৈঃ [illegible]শ-দ্বাদশ-বাসরান্।
প্রায়োঽনুযাতি মর্যাদা মোক্ষায় চ বধায় চ॥ ইতি—

অগ্নিবেশ মতে — "প্রায়োগ্রহণেন দ্বৈগুণ্যমিতি।"

শ্রীকণ্ঠ ও বৃন্দকৃত সিদ্ধিযোগ নামক গ্রন্থের টীকায় লিখিয়াছে,—

"তথাচ অগ্নিবেশঃ—

প্রবেপমানে জরিতে শীতে হৃষ্ট তনুরুহে।
কট্যূরুজঙ্ঘাপার্শ্বাস্থিশূলিনে স্বেদনং হিতম্॥" ইত্যাদি

(জ্বরাধিকারে)

এই সকল পাঠ এখন যে সকল অগ্নিবেশসংহিতা পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব প্রাচীন অগ্নিবেশ সংহিতা অন্যরূপ ছিল, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

যিনি সুশ্রুত সংহিতার প্রতিসংস্কার করিয়াছেন, তিনিও,

"ষট্সু কায়চিকিৎসাসু যে চোক্তাঃ পরমর্ষিভিঃ" ইত্যাদি বচনের দ্বারা অগ্নিবেশ সংহিতার পূর্ব্বসত্তা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাঙ্গ হৃদয় নামক গ্রন্থের রচয়িতা বাগ্‌ভট্টাচার্য্যও "তেভ্যোঽতিবিপ্রকীর্ণেভ্যঃ প্রায়ঃসারতরোচ্চয়ঃ" বলিয়া স্বীয় গ্রন্থের প্রস্তাবনায় স্পষ্টভাবে আমাদের কথারই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

"অঞ্জনা নিদান" নামে একখানি নিদানগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন উক্তগ্রন্থ মহর্ষি অগ্নিবেশের রচিত। সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। তাহার কারণ, অঞ্জনা নিদানের কতকগুলি পাঠ সুশ্রুতের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু চরক সংহিতার মধ্যে ঐ সকল পাঠ দেখিতে পাওয়া যায় না। যথা,—

"দূষয়িত্বা রসং দোষা বিগুণা হৃদয়ং গতাঃ
হৃদি বাধাং প্রকুর্ব্বন্তি হৃদ্‌রোগঃ তং প্রচক্ষতে॥" (সু, উ ৪৩ অ)

অপিচ—

গুদস্যদ্ব্যঙ্গুলে ক্ষেত্রে পার্শ্বতঃ পিড়কার্ত্তিকৃৎ।
ভিন্নোভগন্দরো জ্ঞেয়ঃ স চ পঞ্চবিধো মতঃ॥"

এই পাঠ মাধবের নিদানে দেখা যায় কিন্তু চরক সুশ্রুত বা বাগ্‌ভটের মধ্যে দেখা যায় না, অঞ্জনা নিদানে এই পাঠ আছে। হইতে পারে মাধব অঞ্জনা নিদান হইতে উক্ত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম নিদানকর্ত্তা বলিয়া মাধবের প্রসিদ্ধি আছে। তদ্ভিন্ন চক্রপাণি, বিজয় রক্ষিত বা শ্রীকণ্ঠ ইহাদের মধ্যে কেহই স্বরচিত টীকার মধ্যে অঞ্জনা নিদানের কোন পাঠ উদ্ধৃত করেন নাই। অঞ্জনা নিদানের রচনাও তাদৃশ গাম্ভীর্য্য পূর্ণ নহে,—এই সকল কারণে মহর্ষি অগ্নিবেশকে অঞ্জনা নিদানের রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাচার্য্যগণের প্রবৃত্তি দেখা যায় না। এই জন্য আমাদেরও সংশয় আছে।

যদিও অঞ্জনা নিদান মহর্ষি অগ্নিবেশের রচিত নহে বলিয়া স্বীকার করা যায়। তথাপি অতিসংক্ষেপে রোগ সকলের যেরূপ বর্ণনা অঞ্জনা নিদানে দেখা যায়, তাহাতে উহা অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের পক্ষে পরম উপাদেয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

২। **ভেলসংহিতা**।—ইহা আত্রেয় সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ। মহর্ষি ভেল অগ্নিবেশের সহপাঠী ও আত্রেয়ের অন্যতম শিষ্য।

তাঞ্জোর নগরীর রাজকীয় গ্রন্থাগারে ভেলসংহিতার হস্তলিখিত একখানি পাণ্ডুলিপি আছে। কিন্তু উহা সকলের পক্ষে সুলভ নহে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একখানি ভেলসংহিতা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়,—আয়ুর্ব্বেদে অনভিজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা উহা সম্পাদিত হওয়ায় গ্রন্থখানি এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তরী

১৬ প্রঃ।—ত্রিগুণ কি?

উঃ।—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ। এই ত্রিগুণ যখন সাম্য অবস্থায় থাকে তখন তাহাকে প্রকৃতি, প্রধানা বা অব্যক্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয়। যখন বৈষম্য উপস্থিত হয় তখনই জগৎ প্রপঞ্চ উদ্ভাসিত হয়। যাহা প্রকৃতির বিকৃতি অর্থাৎ দুধ হইতে দধিবৎ প্রধানার পরিণতি সমুৎপন্ন তাহাতে ঐ তিনগুণ ক্রীড়াশীল হয়। আত্মা ত্রিগুণাতীত। অর্থাৎ এই গুণ ত্রয় দ্বারা আত্মাতে কোন বিক্ষেপ বা বিকার জন্মাইতে পারে না। যেমন সোনায় জঙ্গ পড়ে না। লৌহপ্রভৃতিতে পড়ে। তেমনি জানিবে। সত্ত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ। রজগুণের চাঞ্চল্য ও তমের মোহভাব। শরীরত্রয় প্রকৃতির পরিণতি তাই উহারা তিনগুণের বশ। তমোরূপ আবরণ শক্তি। রজোরূপ বিক্ষেপশক্তি আর বিদ্যাশক্তি সত্ত্ব প্রকাশক। সত্ত্বগুণ দ্বারা রজতমকে অভিভূত করিলে জ্ঞান প্রকাশমান হন এবং তৎপর সত্ত্ব আপনাআপনি নিবৃত্ত হয়। তখন ত্রিগুণাতীত অবস্থা। গুণের বশীভূত জীব গুণাতীত শিব। যেমন ভূতে ধরিলে মানুষ কেমনটী হয়ে পড়ে আবার ভূত ছাড়িলে স্বকীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তেমনি গুণত্রয় রূপ ভূত ছাড়িয়া গেলে স্ব স্ব রূপকে প্রাপ্ত হয়, আত্ম দর্শন হয়।

—স্বামী মহাদেবানন্দ।

———

নব্য ভারতের রাষ্ট্রকাহিনী

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যতীর্থ

নব্য ভারতের রাষ্ট্র কাহিনী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, একটু আগেকার ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা দেখিতে পাই—বিক্ষিপ্ত পরস্পর কলহপরায়ণ, আত্মবিস্মৃত একটা মহামহিম জাতির শোচনীয় মর্ম্মান্তিক অধঃপতন। একদিকে দিল্লীর রাজশক্তির অধঃপতনের ফলে ইংরাজ, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, দিনেমার প্রভৃতি জাতির নানাভাবে আত্মপ্রকাশ ও ধর্ম্মযাজক, বণিক্ জলদস্যু প্রভৃতি বৈদেশিক শক্তির নানাবিধ মূর্ত্তিতে আবির্ভাব, এবং অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে এক বিরাট হিন্দুজাতির উদ্বোধন হয় ও তৎফলে ভারতের ভাগ্য লইয়া মারহাট্টা, ইংরাজ, ফরাসী—এই তিন জাতির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা—যাহাতে ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ জন্য বিধাতার বিধানে 'ইংরাজ'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্ব্বরী রাজদণ্ড রূপে।'

তৎপরে ইংরেজ বণিককোম্পানী শৌর্য্য, কৌশল, কূটনীতি প্রভৃতির আশ্রয়ে ও ভারতবর্ষের আত্মকলহ, ঈর্ষা, ষড়যন্ত্র প্রভৃতির সুযোগে এবং শিক্ষা, বহির্বাণিজ্য, রেলষ্টিমার, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার প্রায় যাবতীয় দ্রব্য সম্ভারে ভারতবর্ষকে পরিপূরিত করিয়া 'শোষণের জন্যই শাসন' এই নীতি অবলম্বনে য়ুরোপীয় সভ্যতার মাপকাঠিতে ভারত শাসন করিতে লাগিল। ইংরেজ কোম্পানীর শোষণ-মূলক শাসননীতির ফলে অন্তরালে একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল—যাহার ফলে ইংরেজ রাজত্বে হিন্দু-মুসমান শক্তি একত্র হইয়া কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহে আত্ম প্রকাশ করিল। শ্বেত ও অশ্বেতের বহু রক্তপাতের

পর বিদ্রোহের অবসান ঘটিলেও তৎফলে ভারতীয় রাষ্ট্রজগতের বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হয় এবং ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া 'ভারতসাম্রাজ্ঞী' নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন ও তাঁহার নামে ভারতীয় প্রজাসাধারণের নিকট এক ঘোষণাবলীর দ্বারা ভবিষ্যত রাজ্য শাসনের সহানুভূতিমূলক মূলনীতি প্রচারিত হয়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাবলীতে ভারতশাসন সম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি নীতি প্রধান :—

(ক) কাহারও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

(খ) আইনের নিকট কোন জাতিগত বৈষম্য থাকিবে না।

(গ) ভারতের সর্ব্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধিই ভারত শাসনের উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য হইবে। এতকাল যাবৎ উক্ত নীতি সমূহ কিভাবে কি পরিমাণে পালিত হইয়া আসিতেছে তাহা পাঠক বর্গকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

সিপাহীবিদ্রোহ ও কোম্পানীর রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে শান্তির আবহাওয়ায় সমাজে, ধর্ম্মে, রাজনীতি প্রভৃতি সর্ব্বদিকেই যেন একটা নূতন ভাবের সাড়া পড়িয়া গেল এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠমানব মহাত্মা রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া সেই সাড়া আত্মপ্রকাশ করিল ও তাঁহার প্রভাবে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতিক্ষেত্রে প্রসার লাভ করিল। পার্লামেণ্টের সমক্ষে তাঁহার সাক্ষ্যেই তদানীন্তন ভারতের রাজনীতিক আশা আকাঙ্ক্ষা প্রথম অভিব্যক্ত হয় বলিয়াই 'রামমোহন' কে প্রকৃত প্রস্তাবে নব্য ভারতের জন্মদাতা এবং বঙ্গদেশকে নব্য ভারতের মুক্তিবাণী প্রচারের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। আবার রাজা রামমোহনের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সংস্কারের বাণী বাঙ্গালাদেশেই প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তন করে—যাহার ভাবধারা পরবর্ত্তীকালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারতের, সর্ব্বত্র বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তর ভারতে, ছড়াইয়া পড়ে। এই ব্রাহ্মসমাজ একদিকে যেমন অন্যায় অত্যাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব হইতে অনেক শিক্ষিত ভারতবাসীকে মুক্ত করিয়া দেশের ও হিন্দুসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্ম সমাজ ও তাহার প্রচেষ্টা বিলাতী সমাজ ও সভ্যতার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। বিলাতী সমাজ ও সভ্যতা হইতে মুক্ত করিবার জন্যই ভগবানের অনুগ্রহে তৎকালে ভারতে জ্ঞান অবতার পরমহংস রামকৃষ্ণ ও তদীয় শিষ্য কর্ম্মযোগী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হন। তাঁহাদের নূতন শক্তি নূতন প্রেরণা জগতে এক নূতন সুর দান করিল। এই প্রকারে রামমোহন, কেশবচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, পরমহংস দেব, বিবেকানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি মহামানব গণের শিক্ষায়, এবং মাদাম ব্লাভাট্স্কী ও থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রচেষ্টায় ভারতে নব জাতীয়তা আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে—যাহার ফলে অত্যল্পকাল মধ্যেই ভারতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হইয়াছিল।

যদিও রামমোহনের সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলন বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে নাই, তথাপি পার্লামেণ্টের সমক্ষে তাঁহার সাক্ষ্যকে ভিত্তি করিয়াই যে পরবর্ত্তী শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় বলা অসঙ্গত নয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বাগ্মীপ্রবর রামগোপাল ঘোষ, সাংবাদিক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং প্রত্নতাত্ত্বিক রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নেতৃত্বে কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম ব্রিটিশ ভারতীয়

সভা স্থাপিত হয় এবং উহা প্রাতঃস্মরণীয় কৃষ্ণদাস পালের পরিচালনায় ক্রমশঃ সর্ব্বসাধারণের অভাব অভিযোগের আলোচনা ও রাজপুরুষদিগের নিকট আবেদন নিবেদনের কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত সভাই কলিকাতায় ও ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম রাজনৈতিক আলোচনা-সভা বলিয়া পরিগণিত হয়-যদিও প্রায় তৎকালে বোম্বাইনগরে জগন্নাথশঙ্কর শেঠ ও দাদাভাই নৌরজীর নায়কত্বে এবং মঙ্গলদাস নাথুভাই প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহযোগে 'বোম্বে এসোসিয়েসন' নামে অনুরূপ এক সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রকারে বিভিন্ন প্রদেশে প্রজা সাধারণের অভাব অভিযোগ ও দেশের উচ্চতর স্বার্থ লইয়া আন্দোলন ও রাজপুরুষগণের নিকটআবেদন নিবেদন দ্বারা গণআন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করাই এই সমস্ত সভাসমিতির উদ্দেশ্য ছিল—যে উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানের অখণ্ড জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিতে পারিয়াছে।

এক্ষণে এতৎপ্রসঙ্গে বাঙ্গলায় সুরেন্দ্রনাথের রাজনীতিক জীবনের কিঞ্চিৎ ঘটনা উল্লেখ করা আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। কারণ সুরেন্দ্রনাথের সিভিল সার্ভিস হইতে পদচ্যুতি ও তজ্জন্য বিলাতে 'আপিল' করিয়াও বিফলমনোরথ হওয়া, বিলাতে ব্যারিষ্টারী-অধ্যয়নেও অনসুমোদন প্রভৃতি ব্যাপার ও তৎপরে তাঁহার রাজনীতিক্ষেত্রে একনিষ্ঠ সাধনা ভারতের গণ আন্দোলন ও রাজনীতিক জীবনে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। তাঁহার ও আনন্দমোহনের এবং তৎসহকর্ম্মীদিগের চেষ্টার ফলে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নিখিল ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্বরূপ ভারতসভা (Indian Association) গঠিত হয়। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—(১) শক্তিশালী রাজনীতিক জনমতগঠন; (২) একই প্রকার রাজনৈতিক স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষার মূলে বিচ্ছিন্ন ও বহুধাবিভক্ত সমগ্র ভারতীয় জাতির একত্বসাধন; (৩) হিন্দুমুসলমানের সদ্ভাববৃদ্ধি; (৪) সময়োপযোগী সাধারণের আন্দোলনে জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ।

কিন্তু ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সিভিল সার্ব্বিস্ আন্দোলনের সময় ভারতের আত্মচৈতন্য-জাগৃতির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। সিভিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষার বয়সের সীমাবৃদ্ধি এবং বিলাতে ও ভারতে একই রকম সিভিল্ সার্ব্বিস্ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সুরেন্দ্রনাথ তখন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ভারতসভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারত সভাই সর্ব্বপ্রথম এই আন্দোলন আরম্ভ করিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মার্চ্চ টাউনহলে জনসাধারণের একটি বিরাট সভা আহূত হয়। কলিকাতায় এতদপেক্ষা বৃহত্তর জনসভা ইহার পূর্ব্বে আর দেখা যায় নাই। এই নবজাগ্রত ভাবধারা কলিকাতায় সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্ব ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রনাথ. আনন্দমোহন প্রমুখ কর্ম্মিগণ সর্ব্বভারতীয় স্বার্থকে আশ্রয় করিয়া খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক করিবার প্রেরণায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ভারতসভার প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই উদ্দেশ্য প্রচারকরিবার কার্য্যে কয়েকজন সঙ্গী লইয়া বহির্গত হইলেন। তাঁহারা বাঁকিপুর, মীরাট, এলাহাবাদ, আগ্রা লাহোর, দিল্লী, অমৃতসর, আলিগড়, কাশী, বোম্বে প্রভৃতি স্থানে মহতী জনসভা আহ্বান করিয়া সর্ব্বত্রই কলিকাতার সভার গৃহীত প্রস্তাব সমূহ পাশ করাইয়া লয়েন। এই আন্দোলনে আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা উত্তর ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান নেতা সার সৈয়দ্ আহাম্মদ সাহেবও যোগদান করিয়াছিলেন। এদিকে ইংলণ্ডের মহাসভার সমক্ষে সর্ব্বভারতের আবেদন উপস্থিত করিবার জন্য ভারত সভার মনোনীত প্রতিনিধি হইয়া বাগ্মীপ্রবর লালমোহন

ঘোষ মহোদয় বিলাত গমন করেন। লালমোহনের প্রতিনিধিত্ব ও সমগ্র ভারতের আন্দোলনের ফল অনেকটা সাফল্যলাভ করিয়াছিল। ইত্যবসরে দিল্লীর দরবারে দেশীয় রাজা মহারাজাগণের সহিত বিভিন্ন প্রদেশের ভারতীয় জননায়কগণ ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধিবর্গ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সেখানে জনসাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে জন্মভূমির নামে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া অসম্ভব কল্পনা নহে। এইরূপে নানাভাবে বিভিন্ন ধর্ম্ম, ভাষা ও সভ্যতা বর্ত্তমান থাকা সত্বেও কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বার্থে একতাবদ্ধ হইবার ভিত্তি প্রস্তত হইল। এই সামান্য আরম্ভের পরিণতি দৃষ্ট হয় পরবর্ত্তী বিপুলবল কংগ্রেসের মধ্যে।

জাতীয় ঐক্য বন্ধন দৃঢ়তার পক্ষে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধী আইন অতঃপর বিশেষ আলোচনার বিষয়ীভূত হইল। এই বিষয় আলোচনার জন্য টাউনহলে বিরাট্ সভা হইয়াছিল। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অপরিসীম উৎসাহের সহিত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় এই অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হইল। বিলাতে গ্লাডষ্টোন মহোদয়ের নিকট এই সম্বন্ধে সবিস্তারপত্রও প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার ফলে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটনের ভারত পরিত্যাগের পর লর্ড রিপণ রাজপ্রতিনিধি হইয়া এদেশে আসেন। লর্ড রিপণ ভারতে আসিয়াই সর্ব্বপ্রথম লর্ড লিটনের দুর্নীতিমূলক প্রেস্ আইন রদ করিয়া দিলেন। এই প্রকারে ভারতীয়গণ গণ-আন্দোলনের সফলতা প্রত্যক্ষ করিয়া শক্তি ও উৎসাহ লাভ করিল।

লর্ড রিপণের শাসন সময়ে লর্ড রিপণের অন্যতম সেক্রেটারী ইলবার্ট সাহেব একখানি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করেন। উক্ত আইনে প্রসঙ্গক্রমে দেশীয় হাকিমগণকে য়ুরোপীয়-দিগের অপরাধের বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ঐ বিল য়ুরোপীয়দিগের প্রবল আন্দোলনে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ইহা হইতে ভারতবাসীরা বুঝিতে পারিল শাসক সমাজে শুধু ভারতীয় বলিয়া তাঁহারা কত হীন এবং তাঁহাদের জন্মগত অপরাধ কত গুরু।

যখন এবম্বিধ ক্রমিক আন্দোলনে দেশবাসীর মন উত্যক্ত, সেই সময় আর একটি অশান্তিকর ঘটনা ঘটিয়া উঠে—ঘটনাটি হইতেছে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গলী'র সম্পাদক কর্ম্মবীর সুরেন্দ্রনাথের আদালত অবমাননার জন্য দুইমাস অশ্রম কারাদণ্ড। এই ব্যাপারে বাঙ্গলার তরুণসমাজে ও ভারতের নানাস্থানে অপরিসীম চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সকলেই অত্যন্ত মর্ম্মাহত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই প্রকারে ভারতীয় জনমত পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীতে লর্ড রিপণের অনুকূলতায় সংঘবদ্ধ হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল এবং তৎকালীন অবস্থার আলোচনার জন্য কলিকাতায় দিবসত্রয়ব্যাপী (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত) National Conference নামে এক নিখিল ভারতীয় সম্মেলন আহূত হয়। এই সভায় সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ ও বাগ্মীতার দ্বারা একটি সর্ব্ব ভারতীয় সংগঠনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন এবং তাহা সকলেরই হৃদয়স্পর্শ করে। তৎপরে ১৮৮৪খৃষ্টাব্দে এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে কলিকাতায় অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি আগমন করেন এবং তথায় সর্ব্বভারতীয় জাতীয় সঙ্ঘ স্থাপনের বিষয়ে তাঁহারা পরস্পর আলোচনা করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে 'National Conference'এর দ্বিতীয় অধিবেশন হয় এবং এই কন্‌ফারেন্সে ব্যবস্থাপক সভার সম্প্র-সারণ ও সংস্কারের দাবী করা হয় ও তজ্জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ঠিক এমনই সময়ে

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির (Indian National Congress) প্রথম অধিবেশন হয়। এই ভাবে জাতীয় কংগ্রেসের সূচনা হইল। তদবধি ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ করাচী কংগ্রেস পর্য্যন্ত কংগ্রেসের অধিবেশন প্রতিবৎসর সরকারের বিনা আপত্তিতে উৎসাহের সহিত ভারতের নানা স্থানে হইয়া আসিতেছিল।

প্রসঙ্গক্রমে এক্ষণে কংগ্রেস সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্ম বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া বিবর্ত্তনের ফলে আজ কংগ্রেস যৌবনের যে শক্তি ও তেজ লাভ করিয়াছে তাহার ক্রমপর্য্যায়ে তিনটি বিভাগ পরিলক্ষিত হয়—প্রথম ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, দ্বিতীয়, ১৯০৬ হইতে ১৯১৮ পর্য্যন্ত এবং তৃতীয় ১৯১৯ হইতে বর্ত্তমান কালপর্য্যন্ত। যখন স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন তিনি এবং কংগ্রেসের উদ্যোক্তারা বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে সেই বিনয়াবনত আন্দোলনকারী প্রতিষ্ঠানটি পঞ্চতাল্লিশ বৎসরের মধ্যে স্বাধীনতার দাবী করিয়া বসিবে।

কংগ্রেসের প্রথম বিভাগে কংগ্রেসআন্দোলনের চেয়ে ক্রন্দনরোলের ভাগই বেশী ছিল—যেন কংগ্রেস আবেদন আর নিবেদনের 'থালা বয়ে বয়ে নতশির' ছিল। তার পর ১৯০৬ সালে দাদাভাই নৌরজী কলিকতার কংগ্রেসের মঞ্চ হইতে 'স্বরাজে'র মন্ত্র প্রথমে উচ্চারণ করেন এবং তখন হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সুর একটু একটু করিয়া চড়িতে থাকে। কংগ্রেসের নবযুগের প্রবর্ত্তন হইল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে—ঐ বৎসর অমৃতসর কংগ্রেসে নূতন সুর উঠিল যে, যেখানে নিরস্ত্র নিরপরাধ জনতার উপর অকুণ্ঠায় হত্যালীলা চলে সেখানে আবেদন নিবেদন বা মিলন চলিতে পারে না। যেখানে রাউলাট্ আইনের নাগপাশে দেশের যুবকেরা বন্দী হয় এবং যেখানে সান্ত্বনা স্বরূপ 'মণ্টেগু মাকাল' দিয়া মুখবন্ধ করিতে চেষ্টা করা হয় সেখানে আঘাতের প্রতিকাররূপে কৃপার ভিখারী হইয়া রহিতে পারে না। তাই সেবার কংগ্রেসে বাঙ্গলার নায়ক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মুখ হইতে প্রথম প্রস্তাব হইল এবং তাহা লোক মান্য তিলকের দ্বারা সমর্থিত হইল—"The reform act is inadequate, unsatisfactory and disappointing. The congress urges that Parliament should take early steps to establish full Responsible Governments in India in accordance with the principle of self determination." দেশবন্ধু আরও বলিলেন—"We are not opposed to obstruction, plain downright obstruction, when that helps to attain our political goal." কংগ্রেসের পূর্ণস্বাধীনতার আদর্শের বীজ দেশবন্ধুর এই প্রস্তাবেই উপ্ত হয়।

১৯২৭ সালে মান্দ্রাজ কংগ্রেসের স্বাধীনতার আদর্শ সম্পর্কিত প্রস্তাব লইয়া পূর্ণস্বাধীনতার আদর্শই গৃহীত হয় এবং ১৯২৮সালে কলিকাতার কংগ্রেসে পূর্ণস্বাধীনতার আদর্শ নাকচ করিয়া Dominion status এর ভাষ্য গ্রহণ করিতে কংগ্রেসকে বলা হইলেও, বাঙ্গলার নেতৃত্বে ভারত বলিয়া উঠিল—পূর্ণস্বাধীনতাই আমাদের আদর্শ। তরুণদের আদর্শের অনুপাতে মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ প্রবীণগণের আদর্শ সংশোধিত করিতে হইল। তাই লাহোর কংগ্রেস বলিল—"কলিকাতা কংগ্রেসে তরুণ ভারতই সত্য কথা বলিয়াছিল। ইংরাজের আশ্বাসে, ফাঁকা কথার ফাঁকিতে আর বিশ্বাস

নাই। চলুক আজ হইতে স্বাধীন স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার প্রচেষ্টা।" তখন হইতে আইন অমান্য আন্দোলন ও বয়কট আরম্ভ হইল—যেই আন্দোলনের ফলে ভারতসরকারকে বাধ্য হইতে হইল কংগ্রেসের সহিত সাময়িক আপোষ বা সন্ধি করিতে। এই সন্ধির পরেই ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের ২৭—২৯ তারিখে করাচী বন্দরে বল্লভভাই পেটেলের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কংগ্রেস যে দেশের মধ্যে একটি বিশেষ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তাহাও করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে জানিবার সুযোগ হইয়াছিল। যদিও কংগ্রেসের শক্তিশালিত্ব জনসাধারণ বুঝিয়া আসিতেছিল, মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তনের পর হইতেই দেশের আপামর সাধারণ কংগ্রেসকে আপনার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে এবং আপনার বলিয়া জানিয়া ইহাতে যোগদান করিয়া ইহার মধ্য দিয়া আপনাদের ন্যায্য জন্মগত অধিকার দাবী করিয়া আসিতেছে—এই দাবী আবেদন নিবেদন বা ভিক্ষাপ্রার্থনার স্বরূপে নহে। এতদ্ব্যতীত কৃষাণ এবং শ্রমিকসম্প্রদায় কংগ্রেসে শক্তি প্রদান করিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ আইন অমান্য আন্দোলনে অদ্ভুত নারীজাগ-রণের ফলে কংগ্রেস বিশেষ শক্তি সম্পন্নও হইয়াছে। তদুপরি নওযোয়ানসভা, তরুণ সঙ্ঘ প্রভৃতি যুবক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠান সমূহও কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। কংগ্রেসে 'বানরসেনা'র কার্য্যও বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়। এইসকল শক্তি বৃদ্ধির ফলে করাচী কংগ্রেসে যে বৈশিষ্ট দেখা গিয়াছিল তাহা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। এই করাচী কংগ্রেস পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩১খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ণোদ্যমে কংগ্রেসের অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহার পর হইতেই বৃটিশ সরকার ও ভারতসরকার চণ্ডনীতি অবলম্বনে ও নানা ছলে কংগ্রেসকে চূর্ণচূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সরকারের এই চণ্ডনীতির ফলে কংগ্রেস পরাভূত হইলেও আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বোতাভাবে উহা পরাজিত হয় নাই। তাহার সাক্ষ্য গতবৎসরের ১৯৩২ দিল্লীর কংগ্রেস ও এ বৎসরের (১৯৩৩) কলিকাতায় ভারতীয় কংগ্রেসের অধি-বেশন। সরকার বুঝিতে পারিয়াছেন—'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী।'

একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে কংগ্রেস কোনও বস্তু নহে—যাহাকে অঘাতে চূর্ণ করা যায়। কংগ্রেস মানুষের মনে। সেই মনকে ধ্বংস বা বিলুপ্ত করিয়া দিতে না পারিলে কংগ্রেসের ধ্বংস অসম্ভব। কিন্তু মানুষের শক্তিতে পৃথিবীতে মানুষের মনের উপর এই প্রকার ধ্বংসসাধন কার্য্য সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া এযাবৎ প্রকাশ পায় নাই। সুতরাং ভারতবাসীর মনে যে জাতীয়ভাব নবোৎসাহে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাকে চূর্ণ করাও মনুষ্য শক্তির অতীত বলিয়াই মনে হয়। গত ৪ঠা জুলাই তারিখে বিলাতের ফ্রেণ্ডস্ হাউসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সংযুক্ত পার্লামেণ্টারী কমিটির অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত জয়াকরও এই ভাবের কথাই বলিয়াছেন—'বড়লাট এবং স্যার সেমুয়েল হোর মনে করিতে পারেন যে কংগ্রেসকে চূর্ণ করা হইয়াছে; কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্র যে জাতীয়তারভাব বিদ্যমান তাহা চূর্ণকরা অসম্ভব।"২১,৭৭০

লর্ড লিটনের কুশাসন রাষ্ট্রব্যাপারে স্বভাবতঃ উদাসীন ভারতবাসীকে সংঘবদ্ধ করিয়া যেমন নবজীবনের সূত্রপাত করিয়া দিয়াছিল এবং তৎফলে অচিরকাল মধ্যে যেমন জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেইরূপ লর্ড কার্জ্জনও প্রকারান্তরে লর্ড লিটনের ন্যায় ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রজীবনের দ্রুততর অগ্রসর করাইয়া দিল। লর্ড কার্জ্জনের শাসনকাল—১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ

পর্য্যন্ত। লর্ড কার্জ্জন যে সকল নূতন সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন তন্মধ্যে শিক্ষাসম্বন্ধীয় সংস্কার নীতি ও বঙ্গবিভাগই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন এক নূতন আইন প্রণয়ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন প্রণালীর একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নামে একটি কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কমিশনের সিদ্ধান্তঅনুযায়ী নিম্নলিখিত সংস্কারের ব্যবস্থা হইয়াছিল ঃ—(১) সিনেটের সদস্যসংখ্যা হ্রাস (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থ যুবকদের কলেজের বেতন বৃদ্ধি, (৩) কোন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করিবার পূর্ব্বে নানারূপ কঠোরনীতি অবলম্বন। এই নূতন শিক্ষাসংক্রান্ত আইনের বিধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্তির দরুণ দেশীয় শিক্ষিত সমাজে বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল সংস্কারে দেশের মধ্যে যতটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল জনমত অগ্রাহ্য করিয়া বঙ্গবিভাগের ফলে বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র তদপেক্ষা অধিক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। বিলাতী পণ্যবর্জ্জন বিশেষভাবে এই আন্দোলনের অঙ্গীভূত হইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশকে ও বঙ্গভাষাকে বিছিন্ন করিয়া বাঙ্গালীজাতির সর্ব্বনাশ সাধন করা হইতেছে বলিয়াই এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য সরকার চণ্ড-নীতির অবলম্বন করিয়াছিলেন। বঙ্গবিভাগের দরুণ যে আন্দোলন বাঙ্গলায় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার ঘাতপ্রতিঘাতে সমস্ত ভারত আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ভারতবাসীর মনে জাতীয়তার দিক হইতে ঐক্য ভাব আরও দৃঢ়ীভূত হইল। এই সময়টী এই জন্য 'স্বদেশীযুগ' নামে খ্যাত। এই আন্দোলনের সময় হইতে অর্থাৎ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতেই কংগ্রেসের মধ্যে নূতনশক্তি ও নবউৎসাহ জাগ্রত হইল। এইবৎসর হইতে কংগ্রেসের দ্বিতীয় পর্ব্বের সূচনা—পূর্ব্বেই তাহা উক্ত হইয়াছে।

লর্ড কার্জ্জনের শাসন সংস্কারের ফলে ভারতে এক বিপ্লববাদও চলিতে লাগিল। পরবর্ত্তী বড় লাট লর্ড মিণ্টো ঐ বিপ্লব আন্দোলন দমনের জন্য কঠোর নীতি প্রবর্ত্তন করিলেন। ঐ সময়ে বাঙ্গলাদেশের কয়েকজন নেতা বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিং দেশে শান্তির আবহাওয়া বহাইবার জন্য ধীর ও স্থির ভাবে মনোযোগী হইলেন। এই লর্ড হার্ডিংয়ের সময় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও মহারাণী মেরীর দিল্লীর দরবারে অভিষেক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়। এই দরবারে সম্রাট ভারত শাসন সম্পর্কিত পরিবর্ত্তন বিষয়ে কয়েকটি ঘোষণা করেন তন্মধ্যে—১। কলিকাতা হইতে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তর, ২। বঙ্গভঙ্গের পরিবর্ত্তন—এই দুইটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্রাটের এই অভিষেকোৎসব ও শাসনসম্পর্কে এইরূপ পরিবর্ত্তন সে সময় দেশের মধ্যে আনন্দের স্রোত বহাইয়াছিল।

এই দরবারের দুইবৎসর পরেই অর্থাৎ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে পৃথিবীব্যাপী মহাসমর আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে ভারতবাসী, ব্রিটিশ সরকারকে যথাশক্তি সাহায্য করিয়াছিল এবং তজ্জন্য ব্রিটিশসরকার ভারতবাসীকে অনেক বেশী পরিমাণ স্বায়ত্ব শাসনাধিকার প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তদানীন্তন ভারত সচিব মণ্টেগু সাহেব ভারতবর্ষের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়া কার্য্য করিবার জন্য ভারতে আগমন করেন এবং ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া সেই সময়কার বড়লাট চেমস্ ফোর্ডের (১৯১৬—১৯২০ সহিত মিলিত হইয়া

স্বায়ত্ত শাসনাধিকার প্রদান সম্পর্কে এক রিপোর্ট দাখিল করেন। উহাই মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট নামে খ্যাত। ঐ রিপোর্টকে অবলম্বন করিয়া ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে, ২৮শে ডিসেম্বর 'ভারত-গভর্ণমেণ্ট আইন' নামে এক আইন প্রণীত ও বিধিবদ্ধ হয়। এই বিধান অনুসারে ভারত সরকারের শাসনব্যবস্থা "বড়লাট ও তাঁহার পরিষদ" এবং ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদ নামে পরিচিত দুইটী ব্যবস্থাপক সভা লইয়া গঠিত হইয়াছে। এই বিধান অনুযায়ী (ক) দুইটী ব্যবস্থাপক সভাতেই বে-সরকারী সভ্য সংখ্যা বেশী থাকিবে—যাহারা জনগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন; (খ) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের মধ্যে অন্ততঃ শতকরা সত্তর জন সভ্য জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন; (গ) গভর্ণরের একটি শাসন পরিষদ্ বা কার্য্য নির্ব্বাহক সভাও থাকিবে; (ঘ) মন্ত্রিগণ প্রত্যেক স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে গভর্ণর কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন এবং নির্ব্বাচিত মন্ত্রিগণ ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী থাকিবেন ও যতদিন পর্য্যন্ত সভার সদস্যগণ তাঁহাদের কার্য্যের প্রতি আস্থাস্থাপন করিবেন, ততদিনই তাঁহারা মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন। এইরূপ দ্বিবিধ শাসন 'দ্বৈধশাসন' নামে অভিহিত। এই দ্বৈধ শাসনের জন্য প্রাদেশিক সরকারের বিভাগ গুলিকে দুই ভাগ করা হইয়াছে—(১) রক্ষিত বিভাগ ও (২) হস্তান্তরিত বিভাগ; (ঙ) বড় বড় প্রদেশ সমূহে প্রধান শাসনকর্ত্তারা "গভর্ণর নামে পরিচিত এবং তাঁহারা স্বয়ং সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন—যথা বাঙ্গলা মাদ্রাস, বোম্বে; অন্যান্য প্রদেশের গভর্ণরগণ বড়লাটের পরামর্শানুসারে সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। গভর্ণরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ সম্রাটকর্ত্তৃক সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন। (চ) ভারত সচিবের বেতন ভারতের রাজস্ব হইতে না দিয়া বিলাতের রাজকোষ হইতে দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। রাজভ্রাতা ডিউক্ অব্ কনট্ সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে ভারতবর্ষে আসিয়া এই সংস্কার আইন প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

উক্ত আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময় এইরূপ কথা হইয়াছিল যে, দশবৎসর পরে সংস্কার আইনের কার্য্য কি ভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে তাহার ফলাফল বিচার করিয়া আরও কি কি অধিকার দেওয়া যায় তৎসম্বন্ধে একটি কমিশন বসাইয়া পরে উহা নির্দ্ধারিত হইবে। বলা বাহুল্য এই সংস্কার আইন ভারতের অনেকের মনঃপূত না হওয়ায় উহা 'মন্টেগুজেমস্‌ফোর্ড মাখাল ফল' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ক্রমশঃ

কবীরের দোঁহা

মায়া

কবীর মায়া ডাকিনী, সব কাহূকোখায়।
দাঁত উখাড়ে পাপিনী, (জো) সন্তোঁ নেড়ে যায় ॥ ৮ ॥

ডাকিনী এ মায়া কবীর, সকলেরে গ্রাস করে।
দাঁত ভেঙে যায় সে পাপিনীর, সন্তপাশে গেলে পরে ॥ ৮ ॥

মোটী মায়া সব তজৈ, ঝীনী তজীন জায়।
পীর পয়গম্বর ঔলিয়া ঝীনী সবকো খায় ॥ ৯ ॥

স্থূল মায়ারে সবাই ছাড়ে, সূক্ষ্ম ছাড়া শক্ত অতি।
সূক্ষ্ম মায়া গ্রাসে সবায়, পীর প্যাগম্বর যোগী যতি ॥ ৯ ॥

—শিবপ্রসাদ।

ভ্রান্তি-বিনোদন—*

রাজবৈদ্য—শ্রীযুক্ত শক্তিচরণ রায় বিশারদ

হরে দয়ালো ভব মে শরণ্যঃ।
ধর্ম্মস্য বৃদ্ধিং জগতঃ কুরুষ্ব ॥
খলস্য নাশং সুবিপর্য্যয়ং চ।
সতাং প্রবৃদ্ধিং সদনুগ্রহস্ত্বম্ ॥

১। হে হরি তুমি দয়াময় তাই আমায় শরণ দাও। সমস্ত জগতের ধর্ম্মের বৃদ্ধি কর, খলের নাশ কর, খলের সকল চেষ্টা একেবারে বিফল কর ও সাধুদিগের বিশেষ করিয়া বৃদ্ধি কর। কেন না সাধুপুরুষদের উপর অনুগ্রহ করাই তোমার স্বভাব।

২। প্রথমেই **হরি** বলিয়া সম্বোধন করিবার কারণ কি? এত নামের মধ্যে এই নামটি বাছিয়া লওয়া হইল কেন? হৃ ধাতু হইতে হরি শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। হৃ ধাতুর অর্থ হরণ করা। যিনি মনুষ্যের পাপ চুরি করেন তাঁহাকেই হরি বলে। মনুষ্য মাত্রেরই পাপ বড় প্রিয়। মনুষ্য কখনই নিজের ইচ্ছায় পাপ ছাড়ে না। খলের ত আর কথাই নাই। অতএব মনুষ্যের পাপ চুরি করা ভিন্ন আর অন্য উপায়ই নাই। সেই জন্যই হরিরূপে শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করা হইল।

৩। হে হরি তুমি **দয়াময়** পৃথিবীর ঘোর দুর্দ্দশা দেখিয়া নিজগুণে আমার প্রতি দয়া কর। কলির এই বিপর্য্যয় বাঁদরামির বিরুদ্ধে লাগি আমার এমন কি শক্তি? তুমি দয়া করিয়া আমাকে **শরণ** দাও। তবেই বাঁদরামির প্রতীকার হইতে পারিবে।

৪। ভারতের এই ঘোর দুর্দ্দিনে তুমি **ধর্ম্মের বৃদ্ধি** কর কলিকালে পুণ্য চারি আনা মাত্র ও পাপ বার আনা থাকিবেই। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। অতএব কলিতে ধর্ম্মের সম্পূর্ণ জয় হইতেই পারে না।

৫। "কুরু" না হইয়া "কুরুষ্ব" হইল কেন? শ্রীহরি ফল নিজে গ্রহণ না করিলে সে ফল রক্ষা করিবার আর কাহারও সাধ্য নাই। সেই জন্যই আত্মনেপদী "কুরুষ্ব" হইল, পরস্মৈপদী কুরু হইল না।

৬। **খলের নাশ** কর। এই হিংসার স্থান মঙ্গলাচরণে হওয়া উচিত ছিল না। কেন না অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, অহিংসাই পরম তপস্যা ও অহিংসাই পরম জ্ঞান ও অহিংসা ভিন্ন আর বন্ধু নাই (১)। এখন দেখিতে হইবে নাশ কাহাকে বলে। খলের দেহ নাশ হইলে খল

* "হিন্দুধর্ম্ম ও উহা নাশের জন্য নাস্তিকগণের চেষ্টা"—প্রবন্ধের অনুবৃত্তি (চতুর্থ খণ্ড—৭ম সংখ্যা ভারতের সাধনা।)

(১) অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ অহিংসা চ পরং তপঃ। অহিংসা পরমং জ্ঞানং অহিংসা চ পরং সুহৃৎ।

যেমন খল তেমনই থাকে। তাহার খলত্ব নাশ হইলে প্রকৃত খল নাশ হয়। অতএব খলেরনাশ বলিতে খলত্বের নাশ বুঝায়। কাযেই শুনিতে হিংসা হইলেও খলনাশ অহিংসার চরম।

৭। সেইরূপ খলের **সুবিপর্য্যয়** হইলে অর্থাৎ সকল চেষ্টারই বিপরীত ফল দিবে। খল যতই দুষ্টামি করিতে যাইবে ততই মন্দ ফল না হইয়া সুফল ফলিবে।

৮। সতাং প্রবৃদ্ধিং কুরুষ। **সৎ** শব্দের দ্বারা সাধুপুরুষ, সৎ কর্ম্ম, সৎ সঙ্কল্প, সদিচ্ছা, সৎ আচরণ, সমস্তই বুঝায় অতএব এই সকল গুলিরই প্রবৃদ্ধি কর ইহাই প্রার্থনা। **প্রবৃদ্ধি** বলিলে বিশেষ বৃদ্ধি বুঝায়। ধর্ম্মের প্রবৃদ্ধি চাওয়া হইল না কেন? কলিকাল বলিয়া শ্রীহরির ইচ্ছায় ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতেই পারে না। কলিকালে বারআনা পাপথাকিবেই।

৯। হে হরি তুমি সদনুগ্রহ। সৎ বলিলে কি বুঝায় তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যাবতীয় সৎ বস্তুই তোমার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। তোমার অশেষ অনুগ্রহ না হইলে কোন মানুষই সাধুপুরুষ হইতে পারে না। তোমার অনুগ্রহেই সদিচ্ছা, সৎ সঙ্কল্প ও সৎ কর্ম্ম হইয়া থাকে। তোমার অনুগ্রহ বিনা এগুলি কখনই হইতে পারে না। আরও যাবতীয় সৎ বস্তু মাত্রেরই উপর তুমি অনুগ্রহ করিয়া থাক। ইহাই তোমার স্বভাব। যাবতীয় সৎবস্তু তোমার দয়ার উপর নির্ভর করে ও যাবতীয় সৎবস্তুর উপর তোমার দয়া স্বতঃই হইয়া থাকে। অতএব হে দয়াময় তুমি ধর্ম্মের বৃদ্ধি করিয়া সাধুদিগের বিশেষ বৃদ্ধি করিয়া ও খলের নিগ্রহ করিয়া পৃথিবীকে নাস্তিক ইন্দ্রিয়ারাম মনুষ্য-পশুর হাত হইতে রক্ষা কর।

কতকগুলি মোটা কথা।

১। **আচার**—১। আচারে মনুষ্যের পরম কল্যাণ হয়। অতএব কলির জীব অনাচার করিতেই ব্যস্ত।

২। জীব অহঙ্কার বশে দেহাভিমান করে অর্থাৎ দেহকে আপন মনে করে। জীবের সহিত দেহের কোনই সম্বন্ধ নাই। জীব ও দেহ একেবারেই ভিন্ন। তথাপি সেই ভিন্নদেহকে আপন মনে করে বলিয়া সেই ভিন্ন দেহের সঙ্গ হয় ও সেই ভিন্ন দেহ সঙ্গের জন্য জীব সংসারে ঘুরিতে থাকে। চিরকাল সংসারে ঘুরিতে ঘুরিতে যে মুহূর্ত্তে জীবের সেই সঙ্গ ঘুচিয়া যায় সেইক্ষণেই জীব মুক্ত হয়। এই জন্য সঙ্গই সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ ও সঙ্গই সংসার হইতে মুক্তির একমাত্র কারণ। কাজেই সঙ্গ হইতে বন্ধন ও মুক্তি দুইই হয়।

৩। **সঙ্গই ভালমন্দের একমাত্র কারণ** বলিলেই হয় (২) অতএব কাহার সঙ্গ করা উচিত, কাহার সঙ্গ করা উচিত নহে ইহাই মানুষের সকলের আগে দেখা উচিত। যে জিনিষের সঙ্গ করিলে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ হয় তাহাকেই সৎসঙ্গ বলা যায়। এই **সৎসঙ্গই আচার ও ইহাকেই দুর্জ্জন নাস্তিক ছুঁচিবাই** বলিয়া ঠাট্টা করিয়া আপনার নিদারুণ মূর্খতার ও অহঙ্কারের পরিচয় দেয়। উপনিষদে বলে আচার শুদ্ধ হইলে চিত্ত আপনা হইতেই শুদ্ধ হয়।

(২) চঞ্চলং হি মনো দুষ্টং সঙ্গাচ্চ পরিবর্ত্ততে।
সৎসঙ্গাৎ সাধুতামেতি দুঃসঙ্গাদ্ যাতি দুষ্টতাম্। আদি পুং

চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞান হইতে থাকে। শেষে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয় অর্থাৎ অজ্ঞান ও সংসারাসক্তি দূর হয়। (৩)

৪। এই **আচার তিন রকম—কায়িক বাচনিক ও মানসিক** অর্থাৎ দেহের, বাক্যের (কথার) ও মনের। আচার মনের জিনিষ বাহিরের নহে বলিয়া দুষ্ট লোক আচার উড়াইতে চাহে। আচার আগে বাহিরের জিনিষ, পরে বাহিরের ও ভিতরের (কথার), ও সকলের শেষে ভিতরের (মনের)। মনের আচার বাহিরের আচারের চেয়ে বড়। আবার বাহিরের আচার মনের আচার অপেক্ষা বড়। মনের আচারই আসল। কিন্তু বাহিরের আচার না হইলে মনের আচার হইতেই পারে না। অতএব **বাহিরের আচার মনের আচার অপেক্ষা বড়।** বাহিরের আচার ও মনের আচার এই দুইএর মধ্যে বিরোধ করা কেবল দুষ্টামি ভিন্ন আর কিছুই নহে। হিন্দু মাত্রেরই **বাহিরের আচার ও মনের আচার দুইটীই যথাসাধ্য পালন করা উচিত।** যদি কখনও দেখা যায় কাহারও **মনের আচার আছে কিন্তু বাহিরের আচার নাই** তাহা হইলে সেই লোক বড়ই **মন্দভাগ্য** বলিয়া জানিতে হইবে। তাহার সহস্র সদ্‌গুণ ভস্মে ঘি ঢালা হইবে—কাজে আসিবে না। বাহিরের আচারে প্রবৃত্তি না থাকায় তাহার দেহে **অহঙ্কার বিকটরূপে** বিরাজ করিতেছে ইহা স্পষ্টই জানা যায়।

৫। **আচার কলিকালের তপস্যা। তপস্যার প্রাণ কষ্ট স্বীকার।** এই তপস্যাই ভগবানের হৃদয়, মন ও দেহ। তপস্যা হইতেই সকল রকম কল্যাণ হয়। কলির মনুষ্যের সত্য নাই বলিয়া শ্রীভগবান অশেষ কৃপা করিয়া আচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আচারের জন্য যেটুকু কষ্ট করিতে হয় সেইটুকু স্বীকার করিলে কলির তপস্যা করা হইল। কষ্টেই কৃষ্ণ মিলে। কুন্ত বলে কষ্ট বিনা কৃষ্ণ নাহি মিলে।

৬। **হতভাগ্য কলির জীব কষ্ট করিতে চাহে না।** আমোদ আহ্লাদ করিয়াই জীবন কাটাইতে চাহে। কাযেই আচার না করিবার **ছুতা বাহির করাই তাহার কাজ।** হতভাগ্য কলির জীব কাযেই বলে এখনকার দিনে আচার করা অসম্ভব, আচার করিলে অহঙ্কার ও ঘৃণা করা হয়। ধর্ম্ম অন্তরের জিনিষ বাহিরের নহে। আচার ছুঁচিবাই ইত্যাদি। এইসব মিথ্যা ছুতা করিয়া নিজের বদমায়েসি ঢাকিতে চায়।

৭। আজকাল আচার পালন করাই যায় না ইহা একেবারেই মিথ্যা কথা। **সমর্থো ধর্ম্মমাচরেৎ**—ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম। **যথাসাধ্য ধর্ম্মপালন করিবে** ইহাই শাস্ত্রের আদেশ শাস্ত্রের অতিরিক্ত করিতে বলা দূরে থাক নিষেধই আছে। আত্মানং সততং রক্ষেৎ (দেহকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে)। পারা না পারা সম্বন্ধে শাস্ত্রের কি রকম দৃষ্টি ভাবিলেই অবাক্ হইতে হয়। নিজের বাড়ীতে যে রকম ধর্ম্মপালন করিতে হয় প্রবাসে অর্থাৎ **পরের বাড়ীতে তাহার অর্দ্ধেক ও রাস্তায় সিকি ধর্ম্ম** পালন করিলেই যথেষ্ট হইল। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে উশস্তি চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাইয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণ বাঁচিবামাত্র আর সেই চণ্ডালের হাতের জলও খাইলেন না। ধর্ম্ম শাস্ত্রে বলে **দুর্ভিক্ষের সময় প্রাণ যাইতে**

(৩) আহারশুদ্ধৌ চিত্তস্য বিশুদ্ধির্ভবতঃ স্বতঃ।
চিত্তশুদ্ধৌ ক্রমাজ্‌জ্ঞানং ক্রুট্যন্তি গ্রন্থয়ঃ স্ফুটম্। পাশুপতব্রহ্মোপ°.

বসিলে, বিপদে আপদে ও রোগে আচারের কথা ভাবিতেও নাই। এমন কি উৎসবে আচার সম্পূর্ণ পালন করিতে হয় না।

৮। **আচারের মূলে ঘৃণাও নাই অহঙ্কারও নাই।** অহঙ্কার করা ও পরকে ছোট করাই মানুষের স্বভাব। কাজেই মানুষ ছুতায় নাতায় অহঙ্কার করে ও ঘৃণা করে। তাই বলিয়া ভাল কার্য্যের নিন্দা হয় না। **ভাল কার্য্য করিলেই লোকে অহঙ্কার করে। সে স্বভাবের দোষ,** ভাল কার্য্যের দোষ নহে। তাই. মহাদেব বলিয়াছেন বিদ্যা, তপস্যা, ধন, সুন্দর দেহ, আয়ু ও কুল—এই ছয়টি সাধু পুরুষেরই গুণ। দুষ্টের এইগুলি দোষেরই কারণ হয় অর্থাৎ অহঙ্কার বৃদ্ধি করে (৪)।

৯। অহঙ্কার বাড়াইবার জন্য আচার করা অপেক্ষা আচার না করাই ভাল। সঙ্গ ত্যাগের **জন্য ভরত রাজা** শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মলাভ করিয়াও গায়ত্রী পর্য্যন্ত শিখেন নাই। আচারের ত কথাই নাই। আচার পালন করিলেই অহঙ্কার বাড়ে বলিয়াই আচার ছাড়া উচিত নহে, অহঙ্কার ছাড়িবার চেষ্টা করাই উচিত। সংসারের নিয়মই এই যে ভালর সঙ্গে মন্দ থাকে। মন্দের সঙ্গে ভাল থাকে। এই পৃথিবীতে সকল জিনিষই উল্টা পাল্টা গুণযুক্ত। অতএব **মোটের উপর যাহাতে কল্যাণ হয় তাহারই উপাসনা করিও** অর্থাৎ তাহাই করিও (৫)।

১০। **আচার করার সবই লাভ।** আচার করিলে শাস্ত্র মানা হয়। অতএব অহঙ্কার ছাড়া হয় ও ভগবানের কথা শুনার জন্য ভগবানের সন্তোষ হয়। কাযেই মোক্ষ হয়। কষ্টই আচারের একমাত্র ক্ষতি। কিন্তু এই কষ্টই পরম লাভ। কুন্তী বলে কষ্ট বিনা কৃষ্ণ নাহি মিলে।

১। **সেকাল ও একাল**—এখন লোকে কথায় কথায় বলে সে কালে এক জাত হইতে আর এক জাত হইত, বিধবা বিবাহ হইত, ক্ষেত্রজ সন্তান হইত, একস্ত্রীর পাঁচ স্বামী হইত, হিন্দুরা গোমাংস খাইত ইত্যাদি, ইত্যাদি।

২। একবার দুইবার যে জিনিষটি হয়, তাহাকে হয় বলিয়া বলাএকেবারেই মিথ্যা কথা। যথা যদি কোন কুপুত্র বাবাকে মারে তাহা হইলে ছেলেরা বাপকে মারে একথা হয় না। কোন পাপিষ্ঠ যদি কন্যাগমন করে ত এই কালে কন্যাগমন করাই দস্তর বলার ন্যায় মিথ্যা আর নাই। **লক্ষ লক্ষের ভিতর যাহা একবার হয় তাহাকে মিথ্যুক লোকই 'হয়' বলে,** যাহার সত্যের গন্ধ আছে সেই হয় না বলে। প্রত্যেক বিধির অপবাদ আছে (৬)। অর্থাৎ প্রত্যেক নিয়মেরই উল্টা আছে। ইহাই মায়ার নিয়ম। তাহাতে নিয়মের দোষ হয় না। কখনও কখনও বাঘিনী ও সিংহিনী মানুষের শিশুকে পালন করে। তাই বলিয়া আপন শিশুকে কেহ বাঘিনী সিংহিনীর হাতে সমর্পণ করে না ও **বাঘ ও সিংহেই মানুষের শিশু পালন করে একথাও হয় না।**

---

(৪) বিদ্যাতপোবিত্ত-বপুর্বয়ঃ কুলৈঃ। সতাং গুণৈঃ ষড়্ভি রসত্তমেতরৈঃ ভা° ৪। ৩। ১৭

(৫) বিপরীতগুণং সর্ব্বং যচ্ছে য়স্তদুপাস্যতাম্।

(৬) সাপবাদা হি বিধয়ঃ। (অপবাদ = উল্টা, সাপবাদ = উল্টাগুণযুক্ত বিধি = নিয়ম)।

৩। **মনে কর** পূর্ব্বকালে এই সব দুই একবার না হইয়া বরাবরই হইত। তাই বলিয়া একালে সেই সব করিতে হইবে তাহার কারণ কি? **একাল ত সেকাল নহে।** দেশ কাল পাত্রের উপর বস্তুর গুণ নির্ভর করে শাস্ত্র বরাবরই এই কথা বলেন। দেশ কাল হইতে বস্তু মাত্রই উৎপন্ন এখন আইনষ্টাইনের ধুয়া ধরিয়া সভ্যজগৎ বলিতে ব্যস্ত। অতএব ওকালে হইয়াছে বলিয়াই একালে হইতেই হইবে এমন কথা হইতেই পারে না। একালে উহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে।

৪। আমাদের শাস্ত্রে বলে কাল অনুকূল হইলে ধূলামুটিও সোণামুটি হয় ও কাল প্রতিকূল হইলে সোণামুটিও ধূলামুটি হইয়া যায়। ভীষ্মদেব পঞ্চপাণ্ডবকে বলিয়াছিলেন—যেখানে ধর্ম্মপুত্র রাজা অর্থাৎ ধর্ম্মই রক্ষক, পরম বলশালী ভীম গদা হস্তে রক্ষা করিতেছেন, যেখানে কৃষ্ণরূপী অর্জ্জুনই অস্ত্রধারী ও গাণ্ডিবই ধনু এবং এমনকি যেখানে স্বয়ং জগদীশ্বরই সহায় সেখানেও বিপদ ছাড়ে না। উঃ বুঝেছি, **সারা দুনিয়াই কালের বশে** ও কালের প্রভাবেই সমস্ত বিপদ দূর করিবার সমস্ত আয়োজনই ব্যর্থ হইয়াছে (৭)।

৫। বস্তুর ফলাফল বিচার করিতে গেলে দেশ কাল পাত্র মাত্রা প্রভৃতি সকল অবস্থারই বিচার করিতে হয়। দুএকটী উদাহরণ দিয়া দেখান যাইতেছে।

৬। **দেশ অনুসারে ফল,** যথা—খোলা যায়গায় রৌদ্র বৃষ্টি লাগে, ঢাকা জায়গায় লাগে না। চারিদিকে বন্যায় ডুবিয়া গেলে উঁচু জায়গা ডুবে না। যে দেশে খুব কলেরা হইতেছে সেই দেশে যাইলে কলেরা হওয়ার সম্ভাবনা। পুকুর ভরান জমিতে বাড়ী করিলে ভিত্ বসিয়া গিয়া বাড়ী ফাটিয়া যায়। উঁচু হইতে পড়িলে হাত পা ভাঙ্গিয়া যায়। সমান জমিতে পড়িয়া গেলে হাত পা ভাঙ্গে না।

৭। **কাল অনুসারে ফল,** যথা—মনে কর একটী লোক গঙ্গায় স্নান করিতেছে। এমন সময় দূর হইতে একটী কুমীর তাহাকে দেখিয়া ডুব মারিয়া ধরিতে আসিল। তখন কুমীর সেই যায়গায় উপস্থিত হইবার এক মিনিট পূর্ব্বে লোকটী যদি ডাঙ্গায় উঠিয়া যায় ত কুমীর কিছুই করিতে পারে না। আর যদি একটী মিনিট দেরী হয় ত লোকটীর কুমীরের হাতে প্রাণ যায়। অতএব মরা বাঁচা কেবল একটী মিনিটের উপর নির্ভর করে। সেইরূপ সাপ ছোব্‌লাইবার এক সেকেণ্ড আগে সরিয়া গেলে প্রাণ বাঁচিয়া যায়। সেইরূপ সরিয়া যাইবার এক সেকেণ্ড পরে উঁচু হইতে পাথর পড়িলে কিংবা গুলি মারিলে মানুষ মরে না। সমস্ত আয়োজন ঠিক থাকিয়াও এক মিনিট কি এক সেকেণ্ডে মরা বাঁচার তফাৎ হয়।

৮। **পাত্র অনুসারে ফল,** যথা—কাঠে আগুন লাগে বলিয়া জলে আগুন লাগে না। কঠিন জনিষ কাটিয়া দুই খণ্ড হয় বলিয়া জল কি হাওয়া কাটিয়া দুই খণ্ড হয় না। সাপে কামড়াইলে সাপ মরে না।

৯। **মাত্রা অনুসারে ফল,** যথা—পাতলা জিনিষে কাটে আর মোটা জিনিষে

(৭) যত্র ধর্ম্মসুতো রাজা গদাপাণির্বৃকোদরঃ। কৃষ্ণোঽস্ত্রী গাণ্ডীবং চাপং সুহৃৎ কৃষ্ণস্ততো বিপৎ
ভা° ১।৯।১৫

থেত্‌লাইয়া যায়, কাটে না। কিন্তু রেলগাড়ীর চাকা অত মোটা হইলেও উহার দ্বারা মানুষ কাটা যায়। হাল্‌কা জিনিষ তোলা যায় বলিয়া ভারি জিনিষ তোলা যায় না। লাঠি দিয়া মারিলে সাপ মরে কিন্তু ছড়ি দিয়া মারিলে সাপ কামড়াইয়া দেয় ও মানুষই মরে।

১০। **সেকালে ভাল, কাজেই একালেও ভাল, যাহারা বলে, তাহারা পাগল** সেকালের জিনিষ একালে খাটিবে কিনা জানিতে গেলে দেশকাল পাত্র মাত্রা প্রভৃতি বিচার করিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদে যেরূপ বমন ও বিরেচনের ব্যবস্থা ছিল একালের লোক তাহার শতাংশেই মরিয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদে ঔষধের যাহা মাত্রা তাহার অর্দ্ধেকও এখনকার কাহারও সহ্য হয় না। পূর্ব্বে ম্যালেরিয় ছিল না বলিলেই হয় এখন ম্যালেরিয়ায় ভরিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে গঙ্গার ধারা অন্যত্র প্রবাহিত হইত। পূর্ব্বে লোকে সংস্কৃত জানিত ইংরাজী জানিত না আর এখন লোকে ইংরাজীই পড়ে সংস্কৃতের ধারই ধারে না। পূর্ব্বে ফুটবল খেলা ছিল না আর এখন এই পৈশাচিক খেলার জন্য লোক পাগল। পূর্ব্বে বাইয়োস্কোপ প্রভৃতির নাম গন্ধও ছিল না, এখন বাইয়োস্কোপ ও সিনেমা, ব্যভিচার ও ডাকাতিতে দেশ ভাসাইয়া দিতে বসিয়াছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। কালে কালে অনেক তফাৎ হইয়াই থাকে। অতএব সেকালে ছিল কাজেই একালে থাকিবে একথা বলা কেবল মূর্খতার পরিচয়।

৩। **জাতি ও আচরণ**—১। যাহারা জাতি উঠাইয়া মানবজাতির সৃষ্টি করিতে চায়, তাহারা বলিতে চায় জাতি কিছুই নহে ও আচরণই সব। তাহারা একবার ভাবিবারও অবসর পায় না যে **এ কথার অর্থ ভগবান কিছুই নহে মানুষই সব।**

২। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের উপর মনুষ্যের জন্ম নির্ভর করে। **যাহার যেরূপ কর্ম্ম ভগবান তাহাকে সেইরূপ জন্ম দেন।** যে অনেক ধন দান করে সে ধনীর কুলে জন্মগ্রহণ করে। যে বিদ্যা উপার্জ্জনে প্রাণপণ চেষ্টা করে সে বিদ্বান্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করে। কাহার কর্ম্ম ফল কিরূপ ও কোন কুলে জন্ম হইলে তাহার কর্ম্ম ফলের ভোগ হয় ইহা ভগবানই ঠিক করিয়া দেন। কাজেই নাস্তিকেরা জাতি কিছুই নহে বলিয়া ভগবানকে উড়াইতে ব্যস্ত।

৩। এ জন্মের **আচরণ মানুষ নিজেই দেখিতে পায়।** অহঙ্কারে ভরপূর হইয়া নাস্তিক লোক নিজের দেখাই বড় করে ও ভগবানের বিচারকে উড়াইয়া দেয়।

৪। প্রকৃত প্রস্তাবে জাতি ও আচরণ দুইটার কোনটাই অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। দুইটির মধ্যে সাধারণতঃ জাতিই প্রধান। কিন্তু আচরণ এমন প্রবল হইতে পারে যে জাতির উপর উঠিয়া যায়। যথা **নরহত্যাকারী গোহত্যাকারী ব্রাহ্মণ।** তাহাকে দেশের বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। আবার **ভক্ত চণ্ডালকেও** পূজা করা উচিত। **যাহার পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম বিপরীত** তাহারই এরূপ বিপরীত দশা হয়। সে ই ব্রাহ্মণ হইয়া হত্যা করে ও চণ্ডাল হইয়া ভক্ত হয়। কর্ম্মফল বুঝা বড়ই কঠিন। যাহারা সামান্য রোগ বুঝিতে পারে না তাহাদের কর্ম্মফল বুঝিতে যাওয়া মদোন্মাদ (অহঙ্কার বশে পাগলামি) ভিন্ন কিছুই নাই। (জ্যোতিষ দেখ পং—২১)

৪। **একাকার ও সাম্য**-১। **একাকারই উচ্ছৃঙ্খল মানুষের প্রাণ** ও সর্ব্বনাশের প্রধান উপায় বলিয়াই মানুষ **সাদা চোখে একাকার ভাল বলিতে**

পারে না। তাই একাকারের পক্ষে বলিতে মানুষকে কতকগুলি **জুয়াচুরির দোহাই দিতে হয়।** যথা, সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান মানুষে মানুষে তফাত করা উচিত নহে। কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নহে। অহঙ্কার করা ভাল নয় ইত্যাদি। এই কথা গুলি যে কত বড় জুয়াচুরি তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়।

২। যে বলে মানুষ ঈশ্বরের সন্তান সে হতভাগ্য, সে হিন্দুত্বের গন্ধও রাখে না একথা আর কোনও হিন্দুকে বলিতে হইবে না। হিন্দুশাস্ত্র মতে **মানুষ ঈশ্বরের সন্তান নহে। কি মনুষ্য কি পশু কি জড়বস্তু সমস্ত জগৎ শ্রীভগবানের মুর্ত্তি।** তিনি এক হইয়া বহু হইয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বহু নাই। সবই এক। যাহারা অজ্ঞানী তাহারাই নানা অর্থাৎ ভিন্ন দেখে। (৮)

৩। কাজেই চুরি চামারি পরস্ত্রীগমন, ব্যভিচার, জুয়াচুরি, ন্যায় অন্যায় ভালমন্দ কিছুই নাই। সবাই যখন ঈশ্বর তখন কে কাহার চুরি করে? কে কাকে ঠকায়? পরস্ত্রী কেমন করিয়া হয়? পরপুরুষ কেমন করিয়া হয়? সেই পরমাত্মাই জগৎরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনিই বিশ্বের আত্মা, তিনিই প্রভু, তিনিই ঈশ্বর। তিনি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেন। তিনি নিজেই নিজেকে ত্রাণ (রক্ষা) করেন তিনি নিজেই নিজেকে চুরি করেন। তিনিই চোর, যাহার চুরি করেন সেও তিনি, আর যাহা চুরি করেন তাহাও তিনি (৯)। ঈশ্বর ত আর অন্যায় কি মন্দ করিতে পারেন না। তবে ন্যায় অন্যায় ভাল মন্দ কি করিয়া হইতে পারে? এই সব গূঢ়তত্ত্ব লইয়া ফক্কুড়ি করা চলে, বুঝা যায় তার কর্ম্ম নহে। শ্রীভগবান নির্হেতুক কৃপা করিয়া যাঁকে যতটুকু বুঝান তিনি ততটুকুই বুঝেন।

৪। **সকল মানুষ যদি ঈশ্বরের সন্তান হয় তবে সকল প্রাণীও ঈশ্বরের সন্তান।** অতএব মানুষ ও পশুতে ভেদ করা উচিত নয়। কাজেই **গরু জাব খায় মানুষও জাব খাবে।** জানোয়ারে হাগিয়া ছোঁচায় না মানুষও হাগিয়া ছোঁচাইবে না। জানোয়ার শীতে গায়ে কাপড় দেয়না, মানুষও শীতে গায়ে কাপড় দিতে পারিবে না। জানোয়ার গরম হইলে হাওয়া খায় না, মানুষও হাওয়া খাইবে না। জানোয়ার রান্ধিয়া খায় না, মানুষও রাঁধিতে পারিবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

৫। অবশ্য কাহাকেও কখনও ঘৃণা করা উচিত নহে। তাই বলিয়া **দোষকে ঘৃণা না করিলে** নিজের **সর্ব্বনাশ** ডাকিয়া আনা হয়। অর্থাৎ দোষের কার্য্যকে প্রাণপণে ঘৃণা করিবে। কিন্তু যে দোষ করে তাহাকে ঘৃণা করিবে না, দয়া করিবে ও উপেক্ষা করিবে। যদি ঘৃণা করা সকল সময়েই দোষ হইত শ্রীভগবান্ **ঘৃণার দৃষ্টি করিলেন কেন?** আমরা যেগুলি আমাদের **দুর্গুণ** বলি সেগুলি আমাদের **পরম বন্ধু।** কেবল মোড় ফিরাইয়া দিলেই হইল। যে কারণ হইতে রোগ উৎপন্ন হয় সেই কারণই কিছু পরিবর্ত্তিত হইলে সেই রোগ দূর করে। সেইরূপ

(৮) পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে। ভা° ১০।২।২৮

(৯) আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ।
ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ ভা° ১১।২৮।৬

মনুষ্যের যে যে কারণে সংসার বন্ধন হয় সেই সেই কারণেই তাহার মোক্ষ হয় যদি সেই কারণগুলি ভগবানের চরণে লাগান যায়। যথা অহঙ্কার কাম ক্রোধ ইত্যাদি সংসারবন্ধনের দৃঢ় কারণ। আবার এইগুলি ভগবানের চরণে লাগাইলে সংসার হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে। অতএব অহঙ্কার ঘৃণা প্রভৃতি যেমন শত্রু তেমনই মিত্র।

৬। **ভেদপ্রিয় ভগবানের অনন্ত ভেদ** সর্ব্বত্রই সকলে দেখিতে পায়। যে ইচ্ছা করিয়া দেখিবে না সেও না দেখিয়া থাকিতে পারে না। শ্রীভগবানের **ভেদ এত প্রিয় যে দুটী মানুষকে এক রকম করেন নাই।** একই মানুষের একই দেহের সব ভিন্ন ভিন্ন—চোখ, মুখ, হাত, পা, আঙ্গুল ইত্যাদি। অথচ শ্রীভগবান নিজেই ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধরিয়াছেন বলিয়া এই অনন্ত ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে এক বলিয়া মানিতে হইবে। ইহাকেই বলে জগৎ ভেদাভেদময়। অর্থাৎ জগতে ভেদের অন্ত নাই অথচ সবই এক। কাযেই জানিতে হইবে ভেদের ভিতর অভেদ ও অভেদের ভিতর ভেদ আছে। অর্থাৎ **সব জিনিষই একও বটে ভিন্নও বটে, ভিন্নও বটে একও বটে।**

৭। এই সংসার মায়ার সৃষ্টি। মায়ার কার্য্য বৈপরীত্যময়। অতএব অসংখ্য বস্তু একও বটে ভিন্নও বটে, ভিন্নও বটে একও বটে। সবই এক বলিলে শ্রীভগবান অনন্ত ভেদ করিয়াছেন এই কথা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। সবই ভিন্ন ভিন্ন বলিলে সমস্তই যে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি ইহা অস্বীকার করা হয়। অতএব সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন ও সমস্তই এক ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ইহা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য। মানুষ কখনও ইহা বুঝিতেই পারে না ধারণা করার ত কথাই নাই। অতএব প্রকৃত বৈপরীত্য ত্যাগ করিয়া সকল বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন মানিতে হইবে ও সমস্তই শ্রীভগবানের মূর্ত্তি মনে রাখিয়া সমস্তই এক জানিতে হইবে। **সর্ব্বত্র ভেদ বা বৈচিত্র্য স্বীকার করিয়া ভেদবুদ্ধি বা ভেদজ্ঞান ত্যাগ করাই জ্ঞানীর কার্য্য।**

৮। ভেদ স্বীকার করিয়া ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা। **ভেদ অস্বীকার করিয়া ভেদ রাখাই নাস্তিক ব্যবস্থা।** শাস্ত্রও ভেদাভেদ স্বীকার করেন। নাস্তিকও ভেদাভেদ মানে। তবে শাস্ত্র যেখানে ভেদের ব্যবস্থা করিয়াছেন নাস্তিকরা সেই খানেই অভেদ চাহে আর যেখানে শাস্ত্র অভেদ ব্যবস্থা করিয়াছেন, নাস্তিক সেখানে ভেদ চাহে। এক কথায় আচার, জাতি, সতীত্ব রক্ষার জন্যই শাস্ত্রের ভেদের ব্যবস্থা ও ঐগুলি নাশের জন্যই নাস্তিকের অভেদ ও সাম্যের ব্যবস্থা। নাস্তিকদের ভেদবুদ্ধির সীমা নাই। কাযেই **আচার জাতি সতীত্ব নষ্ট করিয়া** একাকার সৃষ্টি **করিবার জন্য নাস্তিকের অভেদ বা সাম্যের দোহাই** দিয়া জগৎ ফাটাইয়া ফেলে। উদাহরণ দিয়া উহা স্পষ্ট করা যাইতেছে।

৯। হিন্দুরা ভেদবুদ্ধিতে ভরা আর **মুসলমান খৃষ্টান** প্রভৃতি একেবারে ভেদবুদ্ধি রহিত—**অভেদ ও সাম্যের অবতার।** কাযেই কয়টা ভোট পাইবে এই লইয়া আজ চারি বৎসর মুসলমানেরা চীৎকারে আকাশ ফাটাইয়া ফেলিল। আমার এত গুলা **ভোট** চাই, আমার অতগুলা ভোট চাই এই বলিয়া কতই চীৎকার, কতই দরবার, কতই **কলহ** তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে। ইহাতেও যদি ঈশ্বরের সন্তান, অভেদ, **সাম্য,** সকলেরই সমান হক ইত্যাদি

প্রমাণ না হয় ত আর কিসে হইতে পারে? **হিন্দু তুমিই ধন্য! এই সোজার সোজা কথাও বুঝিতে পার না।**

১০। **অভেদ সাম্য ও একতার বলে** ভারতের মুসলমানেরা এতই **হীনবল** যে সাম্যবুদ্ধির চরম দেখাইয়া হিন্দুদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে তাহারা এই চারি বৎসর উদ্‌ব্যস্ত। এদিকে হিন্দুদের পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভাবে যতই ভেদবুদ্ধি দূর হইয়া একাকারের জ্ঞান হয় ততই **স্বদেশী, পিকেটিং, লুকাইয়া গুলিমারা, বোমামারা প্রভৃতি অকাট্য অভেদের ফল ফলিতে থাকে।** নিজের দেশের জিনিষ বেশী দাম দিয়া কিনিতে হইবে তবুও পরের দেশের ভাল জিনিষও সস্তায় কিনিব না, ইহাতেও যদি আপন পর করা না ছাড়িল তবে কিসে আপন পর করা ছাড়িবে? পিকেটিং করিতে গেলে ছুঁড়ি চাই. ছোড়ার কর্ম্ম নয়; ইহাতেও অভেদ সাম্য হইল না! অধিক বাড়াইয়া আর কি হইবে? যে যত ভণ্ড যত কদর্য্য, যত নাস্তিক সে ততই অভেদ সাম্য প্রভৃতির দোহাই দেয়।

১১। অলীক হিন্দুরা যেমন অভেদ ও সাম্যের বিকট চীৎকারে জগৎ ফাটাইয়া ফেলে, হিন্দুরা তেমন পারে না। তাহারা জানে যে **ভগবানই সর্ব্বত্র ভেদ করিতে আদেশ করিয়াছেন ও ভেদবুদ্ধি বিষবৎ বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন।** তাহারা জানে যে **পরের পয়সা পরেরই পয়সা** আপনার নহে। কাযেই পরের পয়সা দিলেও লয় না। অথচ আপন পয়সা যথাসাধ্য পরের কার্য্যে খরচ করিতে হয়। হিন্দুদের কাছে **পরের স্ত্রী একেবারেই পরের স্ত্রী** তাহাদিগের দিকে তাকাইতেও নাই। অলীক হিন্দুদের কাছে আপন পর উঠিয়া গিয়া পরের স্ত্রীর গায়ে হাত দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১২। জগতে সকল মানুষ সমান। মেয়ে পুরুষ সমান ইত্যাদি অভেদ বা সাম্য কখনও হয় নাই, হইবেও না, হইতে পারেও না। ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। যেখানে তাকাও সেইখানেই ভেদ। বৈষম্য আছে, থাকিবেই, যাইতেই পারে না। **মা ও স্ত্রী সর্ব্বদাই ভিন্ন থাকিবে।** বাপ ও ছেলে সর্ব্বদাই ভিন্ন থাকিবে। এখানে অভেদ কল্পনাও করিতে পারে এমন পাপিষ্ঠও বিরল। যত প্রকার ভেদ আছে সমস্ত মানিয়া ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করাই মানুষের উচিত।

৫। **নারীসঙ্গ।**—১। আমাদের শাস্ত্রে বলে **মনুষ্যকে মোহিত করিবার জন্যই** মায়ার দ্বারায় **নারীর সৃষ্টি।** মায়াই নারীরূপ ধরিয়া মনুষ্যের নিকট আসে। অতএব নারীসঙ্গের ন্যায় সর্ব্বনাশের কারণ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। নারী অগ্নি ও পুরুষ পতঙ্গ। কাযেই পুড়িয়া মরিবার জন্যই নারীসঙ্গের প্রয়োজন।

২। **কলিকালে** শাস্ত্রের বাক্য একেবারে হেয়। প্রকৃত ও বিশুদ্ধ আমোদের জন্যই ঈশ্বর নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। মোহের জন্য নহে। কাযেই **নারীসঙ্গে আমোদ প্রমোদে কাল কাটানই বিশুদ্ধ আমোদের সনাতন রাস্তা** ও একমাত্র উপায়। হরিনাম করার ন্যায় যাহাতে **অহরহঃ নারীসঙ্গ** করা যায় তাহার ব্যবস্থার জন্য **স্ত্রী স্বাধীনতা চাই।** স্ত্রীলোকদের

ঘরে আট্‌কে রাখা বড় অন্যায়। স্ত্রীলোকেরা হাওয়া খাইতে যাইতে পারে না, জুতা পরিতে পায় না ইহা বড় অন্যায়। ছেলে মেয়ে একসঙ্গে স্কুল কলেজ পড়ান হয় না ইহা মহাপাপ ইত্যাদি নানা প্রকার ছুতার সৃষ্টি হইয়াছে। নারীসঙ্গের প্রকৃত ফল কি বুঝিবার শক্তি নাই, কেবল ঈশ্বরের সন্তান, সাম্য, অভেদ প্রভৃতি লম্বা লম্বা কথার দোহাই দিয়া নারীসঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই ভাল নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা।

৩। কলিকালে জীব ও শাস্ত্র এই দুইএর মধ্যে কাহার কথা মানা উচিত সে বিষয়ে মানুষের সন্দেহ থাকিতেই পারে না। যদি অহঙ্কারে বুঁদ হইয়া নারীসঙ্গের ফলাফল দিয়াই বিচার করা যায় তাহা হইলেও নারীসঙ্গ কি ভয়ঙ্কর বিষ তাহা বুঝা মুস্কিল নহে। যে সব কথা মুখে আনিতে হিন্দু চাষাও লজ্জা পায় নারীসঙ্গ ফলে এখন সেই সব কথার কতই প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়। এক কথায় মান্য গণ্য লোকে অহঙ্কার করিয়া বলে **সতীত্ব উঠাইয়া দিয়া আমরা যথেচ্ছ ব্যভিচারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি** (*a*)। যাহাদের বেজন্মা হইবার সাধ হইয়াছে, যাহারা বাপের বেটা হওয়াই লজ্জার কথা মনে করে তাহাদের বুঝাইতে যাওয়া পাগলামী। শত হস্তেন বাজিনাম্ এই কথার অনুসরণ করিয়া তাহাদের কাছ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ।

৪। যেথানে নারীসঙ্গ প্রবলভাবে চলিতেছে সে সব দেশের কথ দূরে থাক্, যে **ভারতবর্ষে নারীসঙ্গের আধ আধ বুলি এখনও ফুটে নাই** সেথানেও ভদ্রলোকের মেয়ে ভদ্রলোককে অম্লানবদনে জিজ্ঞাস করিতে পারে **সতীত্ব বড় না নারীত্ব বড়।** ইহাই নারীসঙ্গের অপার মহিমা! নারীত্ব কথাটী সংস্কৃত। যে সব নারী নারীত্ব বড় না সতীত্ব বড় এই কথা বড়াই করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারে তাহারা যে সংস্কৃতের ধারও ধারে না ইহা আর বলিতেও হইবে না। নারীত্ব শব্দের সাধারণ সংস্কৃত অর্থ গ্রহণ করিলে **প্রশ্নটীর যাহা অর্থ হয় তাহা মনে করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে।**

৫। এখন নারীদের সাধ হইয়াছে তাহারা পুরুষের ন্যায় সকল কাযই করিবে। নারী নারী ও পুরুষ পুরুষ ইহাই শ্রীভগবানের সৃষ্টি। নারী সহস্র চেষ্টাতেও পুরুষ হইতে পারে না, নকল করিতে পারে। নারীর কার্য্য পৃথক্ ও পুরুষের কার্য্য পৃথক্। তাই বলিয়া নারী পুরুষের ন্যায় কিছুই করিবে না এমত নহে। চোখ কাণ প্রভৃতি দিয়া শ্রী ভগবান জানাইয়া দিতেছেন যে নারীও পুরুষের ন্যায় দেখিবে শুনিবে, খাইবে ইত্যাদি। **পুরুষের নিকট গ্রহণ করিয়া নারী সন্তান প্রসব করে।** কাজেই স্পষ্টই বুঝা যায় সংসার পালনের ভার নারীর উপর, সংসার চালানর ভার পুরুষের উপর। অর্থাৎ সংসার রক্ষার ভার পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের উপর। উভয়ে মিলিয়াই সংসার রক্ষা করে। তবে উভয়ের কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন। সেইরূপ পুরুষ ও স্ত্রী **উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্মকার্য্য করে** (১০)। যথা ৺গয়াধামে পিণ্ড দিতে গেলে পতি মন্ত্রপাঠ করে ও পত্নী

(*a*) Mr. H. G. Wells.

(১০) সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ।

পিণ্ডাদি প্রস্তুত করে ও দেয়। এইরূপ সর্ব্বত্রই পুরুষ ও স্ত্রী মিলিয়া মিশিয়া কায করে ও বিরোধ কোথাও নাই। **মেয়ে মর্দ্দা হইয়া** এখন সর্ব্বত্রই **বিরোধেরই** সৃষ্টি হইতেছে। **মর্দ্দা মেয়ের জন্য** বিদেশে অনেক **পুরুষই** কর্ম্ম হারাইয়া **নিরন্ন হইতেছে।** আবার **মর্দ্দা মেয়েও** মর্দ্দানি কমিলেই অর্থাৎ **যৌবন পার হইলেই** নিজের অন্ন হারাইয়া **বিপন্ন হয়। এখন জার্ম্মানীতে মর্দ্দামেয়েদের মর্দ্দামি কমাইবার চেষ্টা হইতেছে।**

৬। শাস্ত্রে বলে **কন্যাকেও অতি যত্ন করিয়া শিক্ষা দিবে।** এই কথার ছুতা পাইয়া নারীসঙ্গ-পাগলেরা বলে মেয়েদের স্কুল কলেজে পড়াইতে হইবে গান বাজনাও শিখাইতে হইবে। ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়িতে আরম্ভ করিয়া যেরূপ ব্যভিচারের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা একটী কথা দিয়াই বুঝা যাইবে। যে স্কুল বা কলেজে **ছেলেমেয়ে একসঙ্গে** পড়ান হয় সেখানে **ছেলেরা দলেদলে ঝাঁকে ঝাঁকে** ঢোকে। আর বেথুন কলেজ (কেবল মেয়েদের পড়িবার জন্য) প্রায় উঠিয়া যাইবার যোগাড় হইয়াছে। **শিক্ষা বলিলে ধর্ম্মশিক্ষা বুঝায়।** ব্যভিচার শিক্ষা কি বাইজী হইতে শিক্ষা বুঝায় না। হিন্দুদের শাস্ত্র ভিন্ন কিছুই পড়িতে নাই। শাস্ত্রই একমাত্র বিদ্যা—আর সব অবিদ্যা। যদি মানিয়া লওয়া যায় অবিদ্যা না পড়িলে এখন চলে না তাহাহইলে পুরুষদের অবিদ্যা পড়িলেই যথেষ্ট হইল। **অবিদ্যা শিখাইয়া মেয়েদের মাথা খাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই।** যাহাতে মেয়েদের ধর্ম্মে নিষ্ঠা হয় যাহাতে মেয়েরা শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িতে পারে এইরূপ শিক্ষা দেওয়াই পিতার কর্ত্তব্য।

৭। সর্ব্বত্রই দেখা যায় গোপনই সংরক্ষণের উপায়। যাহা রাখিতে হয় তাহা ঢাকিতে হয়। না ঢাকিয়া রাখিলে জিনিষ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। মানুষের শরীরই ইহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। ইহাতে ঢাকার ভিতর ঢাকা তার ভিতর ঢাকা, তার ভিতর ঢাকা, ঢাকার আর অন্ত নাই। শ্রীভগবান্ ঢাক পিটাইয়া বলিতেছেন যাহা কিছু মূল্যবান্ সব বিশেষ করিয়া ঢাকিয়া রাখিও তবেই থাকিবে নতুবা সব নষ্ট হইয়া যাইবে। দেহ চামড়া ও চবি দিয়া ঢাকা মাংস চামড়া দিয়া ঢাকা (fascia) তাহার তলায় হাড় আবার চামড়া দিয়া ঢাকা (periosteum)। তাহাতেও নিস্তার নাই। হৃৎপিণ্ড, ফুপ্‌ফুস্ (ফুসফুস্), প্লীহা যকৃৎ সমস্তই চামড়া দিয়া ঢাকা (pericardium, pleura and peritoneum)। মস্তিষ্কের চারিদিকে চামড়া (meninges) তথাপি মাথার দিকে চামড়া। সেইরূপ ফল মাত্রেই খোসা বা ছাল দিয়া ঢাকা, গাছমাত্রেরই ছাল আছে, পাতারও ঢাকা আছে। সেইরূপ হিন্দুর মেয়েকেও রক্ষা করিবার জন্য ঘরে ঢাকিয়া রাখিতে হয় যাহাতে নজরে খারাপ হইয়া না যায়। তাই মন্ত্র গোপন করিতে হয়, পণ্ডিত হইয়া নেকা সাজিতে হয়, ধনরত্ন লুকাইয়া রাখিতে হয়। গোপনই যে রক্ষা তাহা ঐ শব্দের অর্থ হইতে জানা যায় (গোপন বলিলে লুকান ও রক্ষা করা বুঝায়)। যদি বল ঢাকিতে হয় ত পুরুষদের ঢাকিতে হয় না কেন? যে রক্ষা করে সেই ঢাকে। চামড়া কি ঢাকিতে হয়? খোসা ও ছালকে কে ঢাকে?

৮। অনুকরণ করাই যাহাদের একমাত্র সম্বল, অন্ধের ন্যায় হাত ধরিয়া চলাই যাহাদের সতত অভ্যাস, হিন্দুশাস্ত্রে অবিচারিত অবিশ্বাসই যাহাদের একমাত্র বিচারের পরিচয় সেই অলীক হিন্দুরাই কেবল স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারে রব তোলে। স্ত্রীলোকেরা কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৎসর

শাস্ত্রের এই পৈশাচিক অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিতেছে। কথায় বলে মার চেয়ে যে আপন তাকে বলে ডা'ন। শাস্ত্র আপন কি অলীক হিন্দু আপন হিন্দুমাত্রই জানেন।

৯। **স্ত্রীস্বাধীনতা না হইলে জাতধর্ম্ম** মান থাকে না কেন? স্ত্রী- স্বাধীনতার ফলে স্বাধীনতার আমরা কি দেখিতে পাই? **স্ত্রীস্বাধীনতার ফলে** স্ত্রীলোক স্কুলে পড়িতে শিখিয়াছে, **স্ত্রী স্বভাব ছাড়িয়া পুরুষের** মত হইতে শিখিয়াছে, সভা করিতে শিখিয়াছে ও পিকেটিং করিতে শিখিয়াছে। এক কথায় **ব্যভিচারের তাণ্ডব নৃত্য** দেখা দিয়াছে। **সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্র** এই ব্যাভিচার নিবারণের জন্যই স্ত্রীস্বাধীনতা নিবারণ করিয়াছেন (১১)। শাস্ত্রের কথা ব্যর্থ হইবার নহে। ব্যভিচারের এমনই বাড় হইয়াছে যে সভ্য জগতে অনেকেই বলিতে চাহে যে **বিবাহ তুলিয়া দেওয়া** উচিত। স্ত্রীলোক বিষয় সম্পত্তি নহে যে এক যায়গায় বাঁধা থাকিবে, ইচ্ছা হইলেই সেই মুহূর্ত্তেই অন্যত্র যাইবে।

১০। ব্যভিচারের এত বাড় সত্ত্বেও ব্যভিচার জানে যে সে ব্যভিচার। তাই **সু-সাজিবার জন্যই ব্যভিচার না বলিয়া বিবাহ বলিতেই ব্যস্ত।** পরীক্ষা করিয়া বিবাহ, সাহচর্য্য বিবাহ ইত্যাদি কথা সৃষ্টি করিয়া ব্যভিচার আপনাকে ঢাকিতেই ব্যস্ত। সেইরূপ **নারীত্ব,** নারীপ্রগতি প্রভৃতি অনর্থক কথার সৃষ্টি করিয়া ব্যভিচার আপনাকে ঢাকিতেই চাহে।

১১। হিন্দুরা স্ত্রীলোকদের বাহির হইতে দেয় না ইহা একেবারেই মিথ্যা কথা। **বাবা, স্বামী কিম্বা উপযুক্ত পুত্রাদির সহিত হিন্দু স্ত্রীলোক** প্রয়োজন হইলেই **স্বচ্ছন্দে অন্যত্র যাইতে পারে** ও যাইয়াও থাকে। কেবল হাওয়া খোরী করিবার জন্য, স্কুল কলেজে পড়িবার জন্য যাইতে পারে না। **তীর্থে যাইতে কোন বাধা নাই।** এমন কি অন্যান্য জানা মেয়ে মানুষের সঙ্গে থাকিলে স্বামী পুত্র ভিন্ন অন্যের সহিত ও তীর্থে গমন করে।

১২। **নারীদুঃখে যে সব অলীক হিন্দুর হৃৎপিণ্ড গলিয়া খরস্রোতে প্রবাহিত হয়,** তাহারা স্ত্রীলোক হাওয়াখোরী করিতে যাইলে কি লাভ ও না যাইলে কি ক্ষতি তাহা একবার ভাবিবারও অবসর পায় না। স্ত্রীস্বাধীনতার যাহা আসল বিষময় ফল তাহা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অধিকন্তু দেখা যায় **ক্ষয় রোগ পরদাকে ভয় করে** ও স্বাধীন স্ত্রীকে ভয় করে না। পরদা স্ত্রী অবলা ও স্বাধীন স্ত্রী সবলা। তাই বলিয়াই কি ক্ষয় রোগ পরদা স্ত্রীকে ছাড়িয়া **মুখরা চোখরা প্রখরা স্বাধীন স্ত্রীকে আক্রমণ করে?** কিম্বা স্ত্রীলোকের সহিত লড়াই করিতে নাই এই শাস্ত্রের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া **ক্ষয় রোগ মেয়ে মর্দ্দার সহিতই লড়াই করে।** অবলা স্ত্রীলোকের সহিত লড়াই করে না!

(ক্রমশঃ।)

---

(১১) ন স্ত্রীঃ স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।

ছাত্র-সমাজের কয়েকটী কথা

(অগ্রহায়ণ, ১৩২৪—গুরুকুল, হরিদ্বার।)

শিক্ষা-বিজ্ঞানের কোনও মূল সূত্রের কথা নহে। বর্ত্তমান বাঙ্গলার ছাত্র সমাজের কয়টী বিপদের কথা মোটা কথায় বলিব। শিক্ষার পরিচালক বা কর্ত্তৃপক্ষগণের কোনরূপ পরিচালনার নিমিত্তও ইহা অভিপ্রেত নয়; সমাজ হিতৈষির মনোযোগ আকর্ষিত হউক ইহাই এই দূর প্রবাসীর প্রার্থনা। (কথাটা পুরাতন হইয়া উঠিলেও সমস্যাটা নূতনই আছে। এ জন্য এখনও উল্লেখ করা যাইতে পারে)।

আজ তিন বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে থাকা কালে, একজন প্রবীণ ডেপুটী কালেক্টর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আচ্ছা বলুন দেখি এখনকার কলেজের ছেলেরা লেখাপড়া ভাল শিখে, না আমাদের সময় ভাল শিখিত?" ইনি তাঁহার সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র ছিলেন; প্রতিযোগিতায় (Competition এর) ডেপুটী; কার্য্য-কাল প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

প্রশ্নকর্ত্তা অবশ্য মনে মনে উত্তর পোষণ করিয়াই ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কারণ সকলেই বলিবে—"সেকালের লোকে প্রকৃত লেখাপড়া শিখিত; এখন সব ভুয়ো। তখনকার এণ্ট্রান্স ফেইল করা লোক যে ইংরেজী লিখিত, এখন বি, এ পাশ করিয়া তা হয় না" ইত্যাদি।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিচরণ করিবার অপরাধে আমার উপর এই পরোক্ষ আক্রমণের আভাস পাইয়াও তখন আমাকে বলিতে হইল—

"আপনাদের সময়ই ভাল শিখিত।"

প্রশ্ন:—"তাহা হ'লে এখন শিক্ষাপ্রণালী ভাল নয়।"—অর্থাৎ এখন আপনারা ভাল শিখান না।

উত্তর:—"না, অনেক ভাল শিখাই।"

প্রশ্ন:—"তবেত ভাল শিখিবারই কথা।"

উত্তর:—"তবুও ত মন্দ হয়।"

প্রশ্ন:—"সে কেমন কথা? তবেকি এখনকার ছেলেরা আগেকার চেয়ে খারাপ?

উত্তর:—"না তা কেমন করিয়া বলি! (হাঁসিয়া) ক্রমবিকাশের (evolution) নিয়ম অনুসারেত আরও ভাল হইবার কথা।"

প্রশ্ন:—"তবে আর কিসের জন্য এমন হইতে পারে?"

উত্তর:—"তবে শুনুন, আর একটী কথাও উঠিতে পারে—তবে কি এখনকার পাঠ্য ও বিষয় নির্ব্বাচণাদির দোষ!" কিন্তু তাহাও নয়। এখনকার বিষয় ও শ্রেণী বিভাগাদির ব্যবস্থাতে খুব ভাল শিখিবারই পথ রহিয়াছে। কিন্তু বিষয়টী এই:—

"আপনি যখন পড়িতেন—আপনি অবশ্যই একজন ভাল ছাত্রই ছিলেন—তখন ভাল ছাত্রেরা সকলেই মনে মনে ভাবিতে পারিত যে কালে তাহারা 'ডেপুটী' হইবে বা অন্য কোনও

একটী বিশেষ পদবীর চাকুরী পাইবে। এবং সেই জন্য ভাল ছাত্রদিগের মধ্যে নিজ নিজ কলেজে এবং সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে একটা প্রতিযোগিতার ভাব চলিত; এবং সে জন্য তাহাদের অনেকেই প্রাণপণ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া পড়িয়া বিশেষ ভাল হইতে পারিত। আর এখন— ছাত্র যতই ভাল হউক না কেন, তাহার ভবিষ্যতে অন্ধকার। এদেশের লোকের শেষ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা যে 'ডেপুটী' তাহা হওয়াত দূরের কথা; কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষার কিছু হইবে, এই আশা বা উৎসাহ লইয়াই কেহ আর লেখাপড়া ধরিতে পারে না। দেখিতেছেনত এখনকার ভাল ছেলে হওয়ার পরিণাম—অর্দ্ধভুক্ স্কুলশিক্ষক বা অধ্যাপক হওয়া। এখন যে কেহ ভাল বা প্রকৃত লেখাপড়া শিখিয়া বাহির হয়, তাহা কেবল ছেলেদের নিজ নিজ বিশেষ কোন শক্তি বা সংস্কারের জোরে,— তাহাদের সংখ্যাও খুব কম।

'আর তখনকার যাহারা মধ্যম বা অধম শ্রেণীর ছাত্র ছিল, তাহারাও মনে মনে ভাবিতে পারিত যে কোনও রূপে এন্ট্রান্স পাশ করিতে পারিলেই একটা ভাল 'চাকুরি' পাওয়া যাইবে। আর এল-এ পাশ করিলেত আরও ভাল; বি-এ পাশ করিতে পারিলেত কথাই নাই—ওকালতী মুন্সেফী, আরও বড় বড় কত কি। আর এখনকার ভাল ছাত্রেরাই কোনও আশা লইয়া চলিতে পারে না; অন্য ছাত্রদিগের ত কথাই নাই।

'মোট কথা তখন যে সকল ছাত্র পড়া শুনা করিত, তাহাদিগের মনের মধ্যে সর্ব্বদাই কোনও না কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকিত; তাহাতে উদ্দীপিত হইয়া তাহারা প্রাণ-পণ পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়নাদি করিত এবং যাহারা যতদূর সম্ভব, ভাল শিক্ষা লাভ হইত। বর্ত্তমান ছাত্রদিগের অবস্থা বিপরীত। বাস্তবিক ইহাদিগের ভবিষ্যত দিকে চাহিলে, ইহাই মনে হয়— 'ইহারা কেন পড়াশুনা করিবে?' ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই। তাহাদিগের আর কোনও উৎসাহ নাই; প্রকৃত মনোযোগ ও যত্ন আছে, এমন ছেলে খুবই কম। ইহাদিগকে পড়ায় তাই পড়ে; পরীক্ষা দিতে হয়, তাই ইহারা পরীক্ষা দেয়। কোনরূপে 'বেগারশোধ' মাত্র। ইহাই সাধারণ অবস্থা; বাদ ছুট অবশ্যই আছে।

'বাস্তবিক ইহারা কেন পড়িবে বা পড়িয়া ভাল হইবে? ভাল হইবার জন্য প্রাণপণ খাটায়, বহিপুস্তকে মনোযোগ দেওয়ায়, লেক্চার শুনায়, সেই গতিশক্তি (motive force) ইহাদের কোথায়?

'তবে যে এত ছাত্র দলে দলে স্কুল কলেজ পূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, কোথাও আর স্থান সঙ্কুলান করা যায় না, একটীর স্থানে তিনটী ইউনিভার্সিটী হইতে যাইতেছে, তাহার কারণ **সস্তায় পাশ**। পাশ এত সহজ না হইলে আর এখন কেহ বড় পড়িতে আসিত না। সকলেই মনে করে কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া কয়েকটী বৎসর কাটাইতে পারিলেই পরীক্ষা দিবা মাত্র পাশ হইয়া আসিবে। সে জন্যই বর্ত্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রে এত ভিড়।"

ডেপুটী মহাশয় উত্তর শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন কিনা জানি না; তবে সেদিন তিনি অন্য আর কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করেন নাই। উত্তরেও আর অধিক কিছু বলিতে হয় নাই।

∴ ∴ ∴ ∴

ছাত্রমহলের এই প্রশ্নটা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। ইহা যে একটা

অতি গুরুতর সমস্যার বিষয়, তাহাও দিন দিন অধিক অনুভূত হইয়াছে। ছাত্রদিগের প্রতি চাহিলে, অজ্ঞাতেও আসিয়া এই প্রশ্নই মনে উঠিয়াছে —'ইহারা কেন পড়িবে ?' অনেক সময় বন্ধু-দিগের সহিত আলাপে ইহা বলিয়া ফেলিয়াছি। পূর্ব্বে ছাত্রদিগের অমনোযোগ ও অসাবধানতা দেখিলে যে স্থলে বিরক্তি জন্মিত, এখন সে খানে দয়া ও সহানুভূতি আইসে!

বর্ত্তমানে ইউরোপীয় নানা দেশে শ্রমিকুলের বেকার (unemployment) বলিয়া একটা গুরু সামাজিক অর্থনীতির প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। এ দেশেও যে তাহার অসদ্ভাব আছে, তাহা নহে; বরং ধরিতে গেলে উহা আরও গুরুতর রূপেই প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু আমাদের এই কৃতবিদ্য ছাত্রগণের এই বিষম ভাবী বেকার (unemployment) প্রশ্নের মত গুরুতর প্রশ্ন বুঝি আর কিছুই নাই। ইহা কেবল একদল মুটে মজুর বা শ্রমিককুলের উপস্থিত রুটির ব্যবস্থার প্রশ্ন নহে; এই যে একটা অতি বিস্তৃত জাতির ভবিষ্যৎ মনুষ্যত্বের কথা। সমগ্র দেশের ছাত্রকুল কি দেখিয়া মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইবে? কি আশায় তাহারা বুক বাধিয়া চলে? চলিতে চলিতে হয়ত হুচট্ খাইয়া পড়িবে। কিন্তু আবার উঠিবে, আবার চলিবে; এইরূপে উঠিয়া ও পড়িয়া শক্ত হইবে; এবং জীবন সংগ্রামের জন্য প্রকৃত প্রস্তুত হইবে। এইরূপে তাহাদিগের শিক্ষা সার্থক হইবে; এবং তাহাতে তাহাদিগের নিজ জীবন ও দেশের মুখ উজ্জল হইবে। কিন্তু কিসের জোড়ে ইহারা তাহা হয়!!

এই যে গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মূল কারণ এই যে, শিক্ষাকে এই কালে এখন পর্য্যন্ত চাকুরির একটা হেতুরূপে মাত্র ধরিয়া আসা হইতেছে। এদেশের বর্ত্তমান এই শিক্ষাপদ্ধতির ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেও ইহাই দেখা যায় যে চাকুরির নিমিত্ত লোকপ্রস্তুতকরণই ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। তাহাই এখন পরিবর্দ্ধিত হইয়া উপস্থিত আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু দেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; এক সময় ছিল, যখন কিছুমাত্র শিক্ষা পাইলেই. কোনও না কোনও চাকুরি জুটিয়া যাইত। কারণ তখন শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল কম; সে তুলনাতে চাকুরির পদ ছিল বহু। কিন্তু এখন শিক্ষিতের সংখ্যা কত সহস্রগুণ বাড়িয়া গিয়াছে; সে অনুপাতে চাকুরির সংখ্যা খুব কমই বৃদ্ধি পাইয়াছে, বলিতে হইবে। কাজেই স্কুল কলেজ হইতে বাহির হইয়া শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ কোথায় দাঁড়াইবে তাহার স্থান পাইতেছে না। শিক্ষাক্ষেত্রে থাকা কালেও কোন্ দিক চাহিয়া চলিবে. তাহা তাহারা স্থির করিয়া উঠিতে পারে না।

অনেক দেশেই এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা স্বতন্ত্র এবং প্রশ্নও গুরুতর। এইখানে লোক সংখ্যা অত্যধিক; এক প্রাচীন সভ্যতার বংশধর বলিয়া জনসাধারণ সাধারণতঃ অধিক বুদ্ধিমান, এবং শিক্ষালাভের উপযুক্ত; এবং সেজন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা অতিশয় বর্দ্ধিষ্ণু। কিন্তু শিক্ষিতের উপযোগী কর্ম্মক্ষেত্র অতিশয় সঙ্কীর্ণ ও অপ্রসারিত। অতি উচ্চ শাসনসংক্রান্ত পদবীগুলি দেশবাসিগণের পক্ষে রুদ্ধদ্বার; অন্যান্য উচ্চপদের আর আর অধিকাংশ কাজই তাহারা তাহাদিগের ভাগধেয় বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। ভারতবাসীর জীবনোপায়ের প্রধান অবলম্বন যে কৃষি, শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না; করা সঙ্গত কি না তাহাও বিবেচনার বিষয়। ভারতের জনবাহিনীর প্রধান অংশ কৃষাণ কুলই তাহা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ভারতবাসী জগতের ব্যবসায় ও বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে একপ্রকার

বহিস্কৃত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নানা বিদেশীয় জাতি আসিয়া তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সমর বিভাগে তাহাদিগের অধিকার নাই। কোনও বিদেশীয় রাজ্যে যাইয়া ভারতের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ আপনাদিগের শিক্ষার উপযোগী সম্মানের সহিত কোন জীবনোপায় করিয়া লয়, এমন সৌভাগ্য ও সুযোগ তাহাদিগের নাই। দেশীয় প্রাচীন শিল্প অনেকেই বিলুপ্ত; নুতন শিল্প ও কারখানাদির কাজে এখনও দেশবাসী অভ্যস্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। বিদেশীর প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে নানা বাধা পড়িয়া যাইতেছে। মোটকথা এদেশের কৃষি শিক্ষানভিজ্ঞ বিপুল কৃষাণকুলের হাতে, শিল্প প্রায় অন্তর্হিত, বাণিজ্য ও অধিকাংশ শিল্প এবং কারখানাদি প্রধানতঃ বিদেশীয় বণিক কুলের হস্তে, প্রধান প্রধান রাজকার্য্য ও বড় বড় চাকুরি প্রায় অধিকাংশ ইংরেজ রাজ পুরুষগণের জন্য; নৌ ও সমর বিভাগ সামান্যতর অশিক্ষিত দেশীয় ও বিশেষতঃ বিদেশীর শ্রেণীবিশেষের নিমিত্ত। এমতাবস্থায় দেশের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকবৃন্দকে প্রধানতঃ কতিপয়মাত্র সরকারী বা বেসরকারী নিম্নস্তরের চাকুরির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইতেছে। কাজেই ভারতীয় ছাত্রজীবনে এক বিষম সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শিক্ষা যেরূপ প্রসার বৃদ্ধি পাইয়া যাইতেছে, তাহাতে এতদ্দেশীয় জনবৃন্দের নিমিত্ত জাতীয় কর্ম্ম জীবনের সমুদয় গুলি বিভাগে সম্যক উন্মুক্ত করিয়া দিলে, তাহার সম্যক্ মীমাংসা হইতে পারে। তদভাবে মহাত্মা গান্ধী যে ভারতীয় ছাত্র মণ্ডলীর জন্য চরকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, বর্ত্তমান এই শিক্ষা-সমস্যা বিবেচনা করিলে এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থার সামাজিক দিক দিয়াও, তাহা অতি সমীচীন বলিয়া মনে করিতে হইবে। ইহাতে শিক্ষাকে কেবল একটা চাকুরির উমেদারীর প্রকারভেদ মাত্র মনে না করিয়া, যাহাতে দেশের বালক ও যুবকবৃন্দের প্রকৃত শিক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা হইতে পারে। তাহারা শিক্ষার নিমিত্তই শিক্ষাব্রত গ্রহণ করিবে; অন্য ফলের অপেক্ষা করিবে না। কিন্তু তাহার দ্বারা উদরান্নের ব্যবস্থা হইবে না বলিয়া, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চরকা বা তদ্ সদৃশ কোনও হস্তকরী বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে। তাহাতে উচ্চ মনোভাব (high thinking) ও সহজ জীবিকা (plain living) এই দুই এর সমাবেশ ভারতীয় শিক্ষিতের জীবন প্রকৃতই উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন পথে পরিচালনার নিমিত্ত চাকুরির মত ঘৃণার্হ ও অস্বাভাবিক কোনও লক্ষ্যের প্রয়োজন হইবে না।

(২)

দ্বিতীয় কথা **সহজ পরীক্ষা** ও **সস্তায় পাশ**। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আমাদের ছাত্রগণ যে এখন এত বহুল সংখ্যায় পড়িতে আইসে, তাহার প্রধান কারণই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সহজতা। ইহাতে এক সুফল ফলিতেছে, সন্দেহ নাই। সকলেরই পড়িবার দিকে একটা ঝোঁক আসিয়াছে। পড়া ও পরীক্ষার ভীতিতে আর কাহাকেও দূরে রাখিতে পারিতেছে না। বিশেষতঃ যে সকল সম্প্রদায়ের লোক এতকাল সমাজে অতি পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছিল, লেখা পড়া শিখাটাকে যাহারা বড় একটা কল্পনাতে আনিতে পারিত না, তাহারাও লেখা পড়ার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ফলে দেশ মধ্যে অনেক স্কুল কলেজের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভাবে কতক কাল চলিলে অচিরে বর্ত্তমান শিক্ষার বিশেষ বিস্তার হইয়া পড়িবে। বাস্তবিক বলিতে হয়, বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকাতে দেশে যেই দোষ সমাজে বদ্ধমূল হইয়া আছে,

বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা প্রণালীর গুণে তাহার কতকটা নিরাকরণ হইতেছে। তজ্জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ ধন্যবাদার্হ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু অন্যদিকে এই সস্তা পাশের নিমিত্ত ছাত্র-সমাজে বিশেষ করিয়া, উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে, এক গুরুতর দোষ বর্ত্তিয়া যাইতেছে। পরীক্ষা আর ছাত্রদিগের তেমন কোন বিবেচনার বিষয় নয়; এবং তাহারা শিক্ষার যতই উচ্চস্তরে আরোহণ করে, ততই আরও এই ভাব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে কেহ বড় মন দিয়া লেখাপড়া গ্রহণ করিতেছে না। বহিপুস্তক অনেকেই নিয়মিত রূপ পাঠ করে না; সকলে সকল বই ক্রয়ও করে না; অধ্যাপকের বক্তৃতা মন দিয়াও শুনে না; নিয়মিত রূপ উপস্থিতিও রাখে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কোনও লাভের প্রত্যাশার অভাবে বর্ত্তমান ছাত্রগণ হতাশ মনে অধ্যয়নের ভার বহন করিয়া চলিয়াছে; এক্ষণে বলিতে হইতেছে যে, গৃহীত কার্য্যে কোনওরূপ শ্রদ্ধা ভয় বা গুরুত্ববোধ না থাকাতে, তাহারা সাধারণতঃ পড়াশুনার কাজ অগ্রাহ্য ও অবহেলা করিয়া চলিতেছে। যাহারা বর্ত্তমানে এই ছাত্র-সমাজের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পর্কিত আছেন, তাহারা ইহা স্পষ্ট পরিলক্ষিত করিয়া থাকিবেন।

সত্যকথা বলিতে গেলে, বর্ত্তমানের শিক্ষাপদ্ধতি এতদ্দেশীয় যুবক ও বালক বৃন্দের স্বাভাবিক অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের কতদূর অনুযায়ী তাহা অতিশয় সন্দেহের বিষয়। প্রকৃতির বশে বা স্বাভাবিক ইচ্ছায় ইহারা উহা কেহ গ্রহণ করিতে পারে কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। এমতাবস্থায় বাহির হইতে কোনও চাপ না পড়িলে অন্তরে তাহা কেহ গ্রহণ করে না। ছাত্রগণ লেখাপড়া চালাইয়া যাইতেছে; পরীক্ষা দিতেছে; পাশ করিতেছে; কিন্তু এই লেখাপড়া ও শিক্ষা আর তাহাদিগের অন্তরের বিষয় হইতেছে না। ফলে শিক্ষার যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতেছে।

অঙ্কশিক্ষার্থী কোনও ছাত্র অঙ্ক কশিয়া যাইতেছে। জীবনে হাজার অঙ্ক কশিল; তাহার মধ্যে গুটিকতক অঙ্ক তাহার পরীক্ষাতে জিজ্ঞাসিত হইল; তাহার মধ্যে আবার গোটাকয়েক আঁক কশিয়া যে পাশ করিয়া গেল। অতঃপর সংসারে প্রবেশ লাভ করিয়া দেখিতে লাগিল যত হাজার হাজার অঙ্ক সে কশিয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে একটীও আর তাহার ব্যবহারিক জীবনে কোন কাজে আসিতেছে না। কিন্তু তাহা বলিয়া যে তাহার ছাত্র জীবনের সমুদয় অঙ্ক কশা বৃথা গিয়াছে তাহা নহে। বরং প্রত্যেকটী অঙ্ক সে যখন যতটুকু যত্ন ও মনোযোগ পূর্ব্বক কশিয়াছিল তাহার যেই পরিমাণ পরিশ্রম, অধ্যবসায়, মনের একাগ্রতা বা অন্তরের অকপট কর্ত্তব্য নিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছে, সেই পরিমাণেই তাহা তাহার জীবন পথে স্থায়ীরূপে কার্য্যকরী হইয়া আসিতেছে। জীবনের বহু স্থলে ও অনেক ব্যাপারেই ঐ সকল অঙ্কের নাম মাত্র সম্পর্ক নাই; কিন্তু সেই সকল স্থলেও ঐ সকল অর্জ্জিত গুণগুলি তুল্য রূপেই কাজ করিয়া যাইতেছে। বাস্তবিক কোনও একটী অঙ্ক কশার অপেক্ষাও এই অঙ্ক কশিতে যে মানসিক অনুশীলন ও শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহারই প্রভাব লোকের চরিত্রে স্থায়ী রূপে থাকিয়া যায় বলিয়া সহস্রগুণে অধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে।

সেইরূপ কোনও একটা পরীক্ষা পাশ করা অপেক্ষা ঐ পরীক্ষা পাশ করিতে যে অধ্যয়নাদির প্রয়োজন হয়, এবং তাহাতে যেই মনোযোগ, অধ্যবসায় প্রভৃতি আবশ্যক, তাহাই লোকের ব্যক্তিগত চরিত্রে একপ্রকার স্থায়ী শক্তি সঞ্চয় করিয়া যায় এবং পরে তাহাদিগের ব্যবহারিক জীবন ক্ষেত্রে

অধিক সুফল প্রদান করিয়া থাকে। এক্ষণে পরীক্ষা পাশ করাটা যদি একটা নগণ্য বিষয় হইয়া পড়ে—ছাত্রদিগের মনে কোনরূপ গুরু বিষয় বলিয়া প্রতিভাত না হয়, তবে অধ্যয়নাদিতে আর সেইরূপ মনোযোগ, অধ্যবসায়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্গুণ গুলির আবশ্যকতা থাকেনা; ছাত্রগণের ব্যক্তিগত জীবনেও তাহা প্রতিফলিত হইতে পারে না। বর্ত্তমান বাঙ্গলা দেশের ছাত্র সমাজে তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ছাত্রগণের চরিত্রে যে সকল মহৎগুণ থাকা একান্ত আবশ্যক এবং যাহা ছাত্রচরিত্রের সাধারণ অবস্থায় আসা অতি সহজ ও অবশ্যম্ভাবী, আমাদের ছাত্রগণ তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে।

শুধু ইহাই নহে; 'অলস মস্তিষ্ক সর্ব্বদাই সয়তানের লীলাভূমি।' ছাত্রগণ যখন পাঠে অমনোযোগ ও কর্ত্তব্যে অবহেলা করিবার সুযোগ পায়, তখন তাহাদিগের মন স্বতঃই নানা কুচিন্তারত হইয়া পড়ে। তজ্জন্য তাহাদিগের নৈতিক চরিত্রে কোনও গুরুতর দোষ নাও বর্ত্তিতে পারে, কিন্তু তাহারা যে বৃথা ঘুড়িয়া অথবা নানাপ্রকার গল্প তামাসাদি করিয়া সময় ক্ষেপ করিবার অবসর পায়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাঠে অবহেলা, ক্লাশে অনুপস্থিতি এবং প্রতিনিধি দ্বারা উপস্থিতি জ্ঞাপন, অথবা উপস্থিত থাকিয়াও লেকচারাদি না শ্রবণ করা, পাঠ্যপুস্তক না কিনিয়া বা না দেখিয়া পড়া চালান ইত্যাদি—ছাত্রজীবনের অতি গুরুতর দোষগুলি বর্ত্তমান ছাত্রগণ, পড়াশুনায় শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব বোধের অভাবে, অনায়াসেই করিয়া যাইতে পারে। বাস্তবিক কোনও মহৎবিষয়ে দোষ বর্ত্তিলে, সেই দোষও মহত্ব প্রাপ্ত হয়; ছাত্রগণের পবিত্র জীবনে যখন অধ্যয়নাদি পবিত্র ব্রতের অবহেলা বা অন্য কোন সুনীতির শৈথিল্য উপস্থিত হয়, তখন ঐ দোষ বহুধা বিভক্ত হইয়া সহজেই অতি গুরুতর হইয়া পড়ে। ভাল দ্রব্য নষ্ট হইলে তাহার পরিণাম ঐ রূপই হইয়া উঠে।

* * * * * *

পরীক্ষায় উচ্চ আদর্শের অভাবে ছাত্রগণের চরিত্র যেরূপ দুর্ব্বল ও দোষ সংস্পৃষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহা যেমন গুরুতর চিন্তার বিষয় ইহা প্রতীকারের চেষ্টা তেমনই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরীক্ষা একটু শক্ত করিতে গেলে আর পরীক্ষার্থী পাওয়া যাইবে না। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এখন যে এত অধিক সংখ্যক ছাত্র পড়িতে আইসে, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এত সহজ ও তাহা পাশ করা এইরূপ সস্তা বলিয়াই। যদি বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষ কতিপয় মুষ্টিমেয় মাত্র সংগ্যক অবস্থাপন্ন ও মেধাবী ছাত্রের মাত্র শিক্ষার বিধান করিতে চাহেন, তবে এই বর্ত্তমান অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এক আত্মঘাতী প্রয়াস হইয়া পড়িবে। সকলেই অবগত আছেন, টাকা অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে কিরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। নিম্নস্তরের পরীক্ষাগুলির ফিস্ যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম অধ্যাপনাদির ব্যয় সঙ্কুলন করিতে গিয়াও তাহাতে আশানুরূপ ফল হইয়া উঠিতেছে না। এইরূপ ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে পরীক্ষার মান খাট রাখিয়া সহজ পাশের প্রলোভন বজায় রাখিয়া চলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলম্বনীয় হইয়াছে।

বাস্তবিক পক্ষে 'শিক্ষা শিক্ষার নিমিত্ত, ইহাই যদি শিক্ষার আদর্শ হয়; এবং বিশ্ববিদ্যালয় যদি সেই ভাবেই শিক্ষার পরিচালনা করেন, এবং রাজশক্তি ও জনসাধারণ সেই ভাবেই তাহার প্রতি পোষকতা করেন, তাহা হইলেই শিক্ষা আশানুরূপ ফল প্রদান করিতে পারে এবং শিক্ষার্থীর

প্রকৃত কল্যাণের বিধান হয়। কি প্রকারে তাহা হইতে পারে তাহা সমাজনীতিজ্ঞ ও রাজনীতিজ্ঞের বিবেচনীয় বিষয়; দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন।

(৩)

তৃতীয় আর একটী কথা ছাত্রগণের একটা আকস্মিক অবস্থা লইয়া। ইহা তাহাদিগের ছাত্রজীবনের সাক্ষাৎ সম্পর্কিত কোনও বিষয় নহে। প্রথম লিখিত দুইটা বিষয়কে যদি যথাক্রমে ছাত্রগণের 'আধিভৌতিক' ও 'আধ্যাত্মিক' দুর্দ্দশা এই উপমানের দ্বারা আখ্যায়িত করা যায়, তবে এইটীকে 'আধিদৈবিক' এই নামে সূচিত করিলে মন্দ হয় না। কোন দৈবী বিপদের ন্যায় ইহা অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া তাহাদিগের উপর পড়িয়াছে।

সকলেই জানেন প্রায় বৎসর কাল হইতে আসিল, এদেশের ছাত্র সমাজে, বিশেষ বাঙ্গলায় ছাত্রবৃন্দ বর্ত্তমান "অসহযোগ' আন্দোলন দ্বারা কিরূপ আলোড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। যখন বঙ্গের কৃতীসন্তান মহাপ্রাণ চিত্তরঞ্জন দাস তাহার বহু সহস্র টাকার মাসিক আয়ের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া দীনবেশে নিজকে দেশসেবায় উৎসর্গ করিলেন, তখন কলিকাতা সহরের যাবতীয় কলেজ ও অনেক স্কুলের ছাত্রবৃন্দ স্কুল কলেজ ভাঙ্গিয়া আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইল। তৎক্ষণাৎ মফঃস্বলে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিল। সমগ্র বাঙ্গলা বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রবৃন্দ এক জাতীয় ভাবে উদ্‌বোধিত হইয়া উঠিল। মহাত্মা গান্ধী তাহা দেখিয়া উৎফুল হইলেন ও বলিয়া পাঠাইলেন—'বঙ্গদেশ হইতে আমি এইরূপই আশা করিয়াছিলাম; বিন্দুমাত্র কম নহে।' কিছুকাল এইভাবে কাটিল। কিন্তু তাহা সকলের মধ্যে স্থায়ী রহিল না। কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ অধিকাংশ ও তদ্দৃষ্টে মফঃস্বলের অনেক ছাত্র আবার স্কুল কলেজে ফিরিয়াছে। তাহাদের লইয়াই দেশের বর্ত্তমান ছাত্রসমাজ। এই ছাত্র সমাজকে, পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটি ঘোর বিপদ ব্যতীত, এই নূতন অবস্থায় আর এক নুতন সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। এইক্ষণে তাহারই উল্লেখ করা হইল।

অনেকেই এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—এই যে ছাত্রগণ দলে দলে কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং আবার দলে দলে ফিরিয়া কলেজে ঢুকিল, ইহাতে কি ইহাদের নৈতিক চরিত্রের একটা দুরবস্থা এবং এক বিষম জাতীয় চরিত্রহীনতা প্রকাশ পাইতেছে না? আবার কেহ হয়ত বলিবেন—আহা! ইহাদিগের দোষ কি আছে? ইহারা না বুঝিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল, এখন বুঝিয়া আবার ফিরিয়াছে; দোষ যত কিছু নেতাদিগের। আবার কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—বাঙ্গলার ছাত্র সমাজ কিছুতেই এইরূপ হীনবল হইতে পারে না; ইহারা গত কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে যেই জাতীয় শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল। সে জন্যই মহাত্মা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—'বঙ্গদেশের ছাত্রবৃন্দ হইতে তিনি ঐরূপই আশা করিয়াছিলেন। লোকমান্য তিলক মহোদয় কোনও বিষয়ে একচক্ষু বাঙ্গলার দিকে রাখিয়া অপর চক্ষুতে ভারতের অন্য সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ বিদেশ হইতে বর্ত্তমান আন্দোলনের উন্মেষ মাত্র পাইয়া, আশায় উৎফুল্ল হইয়া, বলিয়াছিলেন 'ভারতের—বিশেষ বঙ্গদেশের যুবকমণ্ডলী মধ্যে যে ভাব রহিয়াছে, তাহা হইতে নিরাশ হইবার কারণ নাই', ইত্যাদি। ইহারা হয়ত বলিবেন, ছাত্রগণ স্কুল কলেজ ছাড়িয়া যে পুনঃ তাহাতে ঢুকিয়াছে, ইহাতে হতাশ হইবার কোনও কারণই নাই; কারণ যাহারা কর্ত্তব্যের ডাকে একদিন ঐরূপ সারা দিতে

পারিয়াছিল, তাহারা যে প্রয়োজন হইলে পুনঃ আসিয়া সম্মিলিত হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রকৃত বিষয় যাহাই হউক এই আন্দোলন যে ছাত্রগণকে আর এক ঘোর বিপদসঙ্কুল অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে, এই দেশের সমগ্র ছাত্র সমাজ এক বিশেষ জাতীয় ভাবে প্রণোদিত হইয়াই বাহির হইয়া আসিয়াছিল। আর এই জাতীয়তার ভাব যে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নতি ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন পক্ষে—সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে—এক অসাধারণ সহায় ও মুখ্য ফলদায়ক উপায়, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। জাতীয়তা লোকের মনের গতি প্রসারিত করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধির পথ পরিষ্কার করে, লোকের ব্যক্তিগত কুসংস্কার বিদূরিত করিয়া চরিত্র বিমল ও পবিত্র করে; সঙ্কীর্ণতার হাত হইতে উদ্ধার করিয়া অন্তঃকরণ উদার করে; এবং সকলকেই আশা ও উৎসাহে উৎফুল্ল করিয়া কর্ম্মতৎপর ও তজ্জনিত এক অতুলনীয় আনন্দের অধিকারী করে; এবং লোক চরিত্রে স্বার্থান্ধতা উন্মুলিত করিয়া পরার্থসেবারূপ মহৎ ধর্ম্মের সূচনা করে। আবার প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত তাহার জাতির যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাও ব্যক্তিগত শিক্ষা বা ছাত্রজীবনের পক্ষে বিশেষরূপেই দ্রষ্টব্য। এক হিসাবে দেখিতে গেলে, বিধিবিহিত লক্ষ্য ও প্রয়োজন—ব্যক্তি-বিশেষকে জাতীয় ভাবে গঠিত ও বিভূষিত করা। ব্যক্তিকে জাতিতে পরিণত হইতে হইবে, অথবা জাতিকে ব্যক্তিতে আয়ত্ত হইতে হইবে, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ হইতে হইবে—অসম্পূর্ণকে পূর্ণতালাভ করিতে হইবে অথবা পূর্ণের ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে হইবে—ইহাই মানব জীবনের আদর্শ ও শিক্ষারও চরম লক্ষ্য। জাতীয়তা তার উত্তম উপাদান।

এই জাতীয়তাকে একবার জীবনে উপলব্ধি করা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। ছাত্রগণ যদি তাহা করিতে পারিল, তবে তাহারা জীবনের এক চরম আদর্শের আস্বাদন লাভ করিল, এই কথা বলিতে হইবে। অন্য বিষয় ছাড়িয়া দিয়া ছাত্রগণের উপস্থিত করণীয়—শিক্ষার সম্বন্ধেই ইহা বলা হইতেছে। এক্ষণে এই যে ছাত্রগণ এক জাতীয় ভাবে উদ্‌বোধিত হইয়া এক মহান্ আদর্শের প্রেরণায় আপনাদিগের জীবনের এক সাফল্য লাভ করিতে যাইতেছিল, তাহার বিবেচনায় বর্ত্তমান ছাত্রসমাজে কি এক মহা সঙ্কটের অবস্থায়ই না আসিয়া পড়িয়াছে!

* * *

বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে এদেশের ছাত্র সমাজকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ দেশের অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করিতেছে এবং বর্ত্তমান আন্দোলনের গূঢ় রহস্য অনেক পরিমাণে বুঝিয়াছে। এবং সেই জন্য এই জাতীয় ভাবকে প্রকৃত আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করিয়া ইহারা, তাহার উন্মেষ হওয়া মাত্র, স্বতঃই ইহাকে বরণ করিয়া লইয়াছে। এখনও ইহারা তাহা ছাড়ে নাই। ইহাদিগের সংখ্যা কম; তাহারা এখন জাতীয় সেবক বা কর্ম্মিশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। আর ফিরিয়া যায় নাই। অথবা দেহ ফিরিয়া থাকিলেও তাহাদিগের মন ফিরে নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ ইহার আস্বাদন পাইয়াছে; জাতীয়ভাবে উদ্বোধিতও হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদিগের মানসিক বল তত নাই; আন্তরিকতার অভাব আছে। ইহারা বাহির হইয়াছিল; কিন্তু এখন সকলেই ফিরিয়াছে। ইহাদিগের সংখ্যাই অধিক। আর এক শ্রেণীর ছাত্র আছে, তাহারা এইভাবে মোটেই বিচলিত হয় নাই। ইহারা হয় অতি শান্ত-

শিষ্ট—'সুশীল ও সুবোধ বালক, না খাইতে দিলে খায় না, না পরিতে দিলে পরে না' ইহাদিগের অনেকে অতি 'ভাল ছেলে' পাঠে আবিষ্ট, বাহিরের কোন ধার ধারে না। অথবা ইহারা কোন ঘোর স্বার্থে আবদ্ধ—সংসার ও পরিজনগণের চিন্তা, নিজ কোন লোকসানের ভয় কিংবা লাভের আশায় আশঙ্কা—প্রভৃতি কারণে ইহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বা বর্ত্তমান শিক্ষাতে যে এক বিকৃত দাসভাব (slave mentality) সৃজন করিয়া দেয় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে, ইহারা তাহা সম্পূর্ণ অর্জ্জন করিয়া বসিয়াছে; কিছুতেই তাহার হাত এড়াইয়া আত্মপ্রত্যয় বা আত্মনির্ভরত য় ইহারা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ইহাদিগকে এই আন্দোলনে বড় কিছু একটা পায় নাই। এই হিসাবে তাহারা উপস্থিত ছাত্র সমাজের গণনীয় বিষয় নহে।

যাহাদিগের কথা বলিতেছি তাহাদিগের মধ্যে দুইটী অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। হয় ইহারা নিজ আদর্শের বিফলতায় নিশ্চয় হইয়া সমুদয় আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছে; অথবা তাহারা সর্ব্বদাই একটা ঘোর উদ্বেগ ও মানসিক অশান্তি এবং মর্ম্মপীড়া ভোগ করিয়া আসিতেছে। এই উভয় অবস্থাই ছাত্রজীবনের পক্ষে অতি সাংঘাতিক। প্রথম অবস্থায় লোকের মন যে কেবল উপস্থিত লক্ষ্যের প্রতি বীতস্পৃহ ও উৎসাহবিহীন হইয়া যায় তাহা নহে; জীবনের প্রত্যেক বিষয়েই একটা বিরাগ ও অশ্রদ্ধা আসিয়া পড়ে। তাহাতে জীবন অসার হইয়া যায়। আর দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষকে চঞ্চল ও অব্যবস্থিতচিত্ত করিয়া, হয় কোনও নির্দ্দিষ্ট বা অনির্দ্দিষ্ট উচ্চ লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে এবং তাহাতে কাহারও কাহারও জীবনগতি বিশেষ কোন ভাল বা বিশেষ কোন মন্দ দিকে ফিরিয়া যাইতে পারে, অথবা ক্রমশঃ উদ্বেগের ভার সহিয়া সহিয়া ক্রমশঃ আরও অধিকতর হতাশা আনয়ন করিয়া লোককে পূর্ব্ববৎ অসারই করিয়া ফেলে। এই সকল অবস্থাই ছাত্রগণের উপস্থিত কার্য্য সাধন—শিক্ষার পক্ষে মহা অনিষ্টকর।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে এই উপস্থিত আন্দোলনঘটিত বিপদটি ছাত্রগণের উপর কোন দৈব ঘটনার ন্যায় নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ও অজ্ঞাত ভাবেই আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ ঘটনার উৎপত্তি ও ফলাফল নির্ণয় করা কঠিন; বর্ত্তমান দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রভাবও সমাজে কিরূপ ভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে বা করিবে এবং তাহার ফলাফল কি হইবে, তাহা নির্ণয় করাও যায় না ছাত্রজীবনের প্রধান লক্ষ্য যে শিক্ষালাভ তাহাতে এই অবস্থায় আপাততঃ কি এক ঘোর আশঙ্কার কারণ হইয়াছে, তাহাই মাত্র এখানে নির্দ্দেশ করা হইল। এই অবস্থায় যদি কেহ ইহার প্রতিকারের অভিপ্রায় করেন, তবে তাহাকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই দেশের অনেকের অবস্থার ন্যায় ছাত্রগণের দশাও অতিশয় জটিল। সহজে কোনও প্রতীকার করিয়া উঠা কঠিন। কোন দুরারোগ্য জটিল রোগগ্রস্ত দেহের ন্যায় অতি সাবধানে ইহার চিকিৎসার বিধান করিতে হইবে। কোনও সাময়িক রোগ লক্ষণ দেখিয়া তাহার প্রতিকার কল্পে সাময়িক কোনও ব্যবস্থা করিলে, বিশেষ লাভ হয় না। রোগের মূল কারণ স্থির করিয়া তাহার নিদান খুঁজিলেই প্রকৃত ব্যবস্থা হইতে পারে। আবার অনেক স্থলে রোগের প্রকৃতিও রোগীর শারীরিক অবস্থাদির অনুকূল ব্যবস্থা করিয়াই সবিশেষ ফল হইয়া থাকে; তদন্যথা প্রতিকূল আচরণে বিপরীত ফল দর্শিয়া থাকে। দুষ্ট ছেলে ও দুষ্ট ঘোড়ার শাসন বিধিতে অনেক সময় একই রূপ দেখা যায়। লোকচরিত্রে যাহা দেখা যায় সমাজপ্রকৃতিতেও অনেক সময় তাহাই লক্ষিত হইয়া থাকে।

আমাদের ছাত্রসমাজ যেরূপ আলোড়িত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাতে তাহাদিগের মধ্যে যেরূপ নানা বিকারের ভাব প্রবেশলাভ করিয়াছে, মূলগত প্রতিকার না হইলে কোনও স্থায়ী ফল ইহাতে হইবার নহে। আর ইহারা যেই যেই ভাবে উদ্‌বোধিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার অনুকূল প্রতিপোষকতা না করিলেও বিপরীত ফলই হইবে। এই জন্য সর্ব্বাগ্রে ছাত্রগণের প্রকৃত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—তাহাদিগের জীবনের গতি, চিত্তের আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয়তার আদর্শ কি—সর্ব্বাগ্রে তাহা গণনা করিতে হইবে। তাহা না করিয়া কোনও রোগের সাময়িক উপসর্গ মাত্রের চিকিৎসার ন্যায় ছাত্রসমাজের কোনও ক্ষণিক অভাব বা অভিযোগ লক্ষ্য করিয়া তাহার প্রতিকার কল্পে কোন ভাসা ভাসা ও বাহ্যিক এবং অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিলে বাস্তবিক কোনও সুফল হইবে না; ছাত্রসমাজেরও কল্যাণ বিধান করা হইবে না। মোটের উপর ছাত্রগণের মানসিক অবস্থা যে মহান্ জাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া চলিয়াছে, তাহাই তাহাদের প্রকৃতিগত এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থাঘটিত প্রধান ভাব কি না—এইটী সম্যক অবধারণ করিয়া, তাহার অনুকূলে কোন স্থায়ী ব্যবস্থা করিতে পারিলেই উপস্থিত ছাত্রগণের রক্ষা হইতে পারে। নতুবা তাহাদিগের অব্যবস্থিততা ও সর্ব্বনাশ নিশ্চিত। কিন্তু সেজন্য দেশের শাসনব্যবস্থাদির যেরূপ আশু পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা সহজ হইবে কি না কে বলিবে? তদভাবে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও বিশ্ববিদ্যালয়াদির ব্যবস্থা দ্বারা জাতিগত ভাবে ছাত্রগণের প্রকৃত উন্নতি বিধান ও জীবন চরিতার্থ হইতে পারিবে না। কেহ যদি নিজ নিজ পুত্র পরিজন বা ছাত্রকে প্রকৃত মানুষ করিতে চান, তবে এই ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়া অন্য কোনও সঙ্গত উপায়ে ছাত্রগণকে শিক্ষা দিবার বিধান করিতে হইবে। এ বিষয়ে সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ ও সাবধানতা আবশ্যক।

ক্রমে উপস্থিত ছাত্র সমাজের তিনটী অতি গুরুতর সঙ্কটের কথার উল্লেখ করা হইল। প্রথমটির অবশ্যম্ভাবী ফল হতাশা ও নিরুৎসাহিতা; দ্বিতীয় অবস্থার ফল অশ্রদ্ধা ও অবহেলা আর তৃতীয় অবস্থার বিষময় ফল আত্মপ্রত্যয়ে অভাব ও নিষ্কর্ম্মণ্যতা অথবা ঔদ্ধত্য অব্যবস্থিততা বা নৃশংসতা। এই ত্রিসঙ্কটে পড়িয়া আমাদিগের ছাত্রগণ উপস্থিত ও দূরবর্ত্তী উভয় প্রকার উদ্দেশ্য হারাইয়া চলিয়াছে। এই ছাত্রসমাজ দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা ও জাতির বংশধর বা সংরক্ষক!

রামায়ণতত্ত্ব

শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য

ইন্দ্রজিৎ

মকরাক্ষ নিহত হইলে রাবণ মহাবীর্য্য ও অতিরথ পুত্র ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। পিতৃভক্ত পুত্র পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া যজ্ঞভূমিতে গমন করতঃ অগ্নিতে হোম করিলেন। শুভসূচক লক্ষণ জ্ঞাত হইয়া রণস্থলে গমন করিয়া পিতৃব্য বিভীষণকে দেখিতে পাইয়া মেঘনাদ বলিয়াছিলেন—রাক্ষস! তুমি পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা এবং আমার পিতৃব্য; বিশেষতঃ তুমি এই রাক্ষসকুলে

জন্মিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছ। "কথং দ্রুহ্যসি পুত্রস্য পিতৃব্যো মম রাক্ষস। ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দ্দং ন জাতি স্তব দুর্ম্মতে। প্রমাণং ন চ সৌন্দর্য্যং ন ধর্ম্মো ধর্ম্মভূষণ॥ শোচ্যস্ত্বমসি দুর্ব্বুদ্ধে নিন্দনীয়শ্চ সাধুভিঃ। যস্তং স্বজন মুৎসৃজ্য পর ভৃত্যত্বমাগতঃ॥" —পুত্রের প্রতি এইরূপ বিদ্রোহাচরণ উপযুক্ত নহে। তোমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান নাই—জ্ঞাতিসৌহার্দ্দ নাই। তুমি আপনার জন ছাড়িয়া শত্রুর দাসত্বে ব্রতী। ইহা সর্ব্বথা নিন্দনীয়। আরও অনেক প্রকার তিরস্কার বিভীষণের উপর বর্ষিত হইয়াছিল। বিভীষণ যথোপযুক্ত উত্তর দিয়া বলিয়াছিলেন "কুলে যদ্যপ্যহং জাতো রক্ষসাং ক্রুরকর্ম্মণং গুণো য প্রথমো নৃণাং তন্মে শীলমরাক্ষসং॥"—আমি রাক্ষসকুলে জন্মিয়াছি সত্য কিন্তু তোমার ন্যায় নিদারুণ অধর্ম্ম কর্ম্মে আমি অনুরক্ত নহি। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে স্বজন পরিত্যাগে যে দোষ তাহা তাঁহার আচরণে আরোপিত হইতে পারে না; কেন না, তিনি পাপাচারী বা অধার্ম্মিক নহেন। **অধার্ম্মিক ভ্রাতাকে প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় পরিত্যাগ করাই উচিত** (ক)। ইন্দ্রজিতের পিতৃভক্তি ও স্বজনবাৎসল্য একদিকে যেমন মনোরম অন্য দিকে বিভীষণের সত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগ ততোধিক উপাদেয়। রামায়ণের প্রতিপাদ্য বিষয়ই হইতেছে ধর্ম্মের ইহলৌকিক সমন্বয়। ধর্ম্মের অনন্তায়তন সাধারণ লোকলোচনের অন্তর্ভুক্ত নহে। পিতামাতাকে ভক্তি করিতে হইবে ইহা অতি সত্য কথা এবং তাহা ইহলৌকিক। ইহলৌকিক দ্রব্য সীমাবদ্ধ ও পরিচ্ছিন্ন; সুতরাং ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ববোধে অজ্ঞ জনগণ ইহলৌকিক স্বভাব লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, অপরিচ্ছিন্ন ও অনন্তায়তন পারলৌকিক স্বভাবের সংবাদও রাখে না। ইন্দ্রজিৎ ইহলৌকিক পিতৃভক্তিতে আচ্ছন্ন, তাহার স্বজাতিবাৎসল্যও ইহলৌকিক। বিভীষণের সৌভ্রাত্র ও স্বজাতিবাৎসল্য ইহলোকে আবদ্ধ ছিল না; সেটি পারলৌকিক স্বভাবে আত্মহারা। তাই আপাতঃ মনোমুগ্ধকর পিতৃভক্তি দেখাইতে গিয়া ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইলেন, বিভীষণ পারলৌকিক দর্শনে লঙ্কারাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। অবশ্য তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিয়া এ রাজত্ব লাভ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মলাভ করা অতিশয় কষ্টসাধ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হরিশ্চন্দ্র, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি পৌরাণিক চিত্র তাহার দৃষ্টান্ত স্থল।

রামচন্দ্রও দশরথ রাজার পুত্র। দশরথ ধার্ম্মিক রাজা, তিনি ক্ষত্রিয়; সত্যরক্ষা তাঁহার প্রধান স্বধর্ম্ম। তজ্জন্য তিনি রামকে বনে দিয়াছিলেন—এবং নিজে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। রামরূপ পুত্রটিও পিতার ধর্ম্মপথ প্রোজ্জলিত করিবার জন্য পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অপার দুঃখক্লেশ ভোগ করিয়া অবশেষে শান্তিরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অন্য দিকে রাবণ রাক্ষস; তাহার ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্য ভোগই চরম লক্ষ্য। ইন্দ্রজিৎ রামাপেক্ষা পিতৃভক্তিতে কম নহেন কিন্তু তাঁহার পিতৃভক্তি ইহলোকেই আবদ্ধ ছিল। রাম রাজত্ব পাইলেন, দশরথ স্বর্গে গেলেন—আর ইন্দ্রজিৎ ও রাবণ বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। বঙ্গসাহিত্যের স্তম্ভস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রও একস্থানে এই সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন "দশরথ সত্য পালনার্থ রামকে বনে প্রেরণ করিলেন। * * * তিনি সত্য পালনার্থ আত্মপ্রাণ বিয়োগ এবং প্রাণাধিক পুত্রের বিরহ স্বীকার করিলেন। কিন্তু উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতির বিচারে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে দশরথ পুত্রকে স্বাধিকার চ্যুত এবং নির্ব্বাসিত করিয়া সত্য পালন করায় ঘোরতর অধর্ম্ম করিয়াছিলেন।" এই সিদ্ধান্ত কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপাদক রামায়ণ গ্রন্থের অনুসরণকারী

(ক) রাণা প্রতাপের নিজ ভ্রাতা শক্তসিংহকে পরিত্যাগের বিষয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

হিন্দু জনগণ অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন না। রামায়ণে ক্ষত্রিয়ের সত্য রক্ষাই প্রধানধর্ম—ইহা প্রতিপাদিত। দশরথ সত্যের জন্যই প্রাণত্যাগী; রাম সত্যের জন্য বনবাসী; সত্যের জন্যই বালীবধ, সত্যের জন্যই রাবণ বধান্তে বিভীষণের লঙ্কাভিষেক, সত্যের জন্যই লক্ষ্মণবর্জ্জন, সত্যের জন্যই সরযূতীরের হৃদয়বিদারক শেষ অভিনয়। দশরথ স্বধর্ম্ম অবহেলা করিলে রামায়ণ সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে গ্রথিত করিতে হইত। সত্যের জয়—সত্যই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের জয় ইহা হিন্দুশাস্ত্র তারস্বরে কীর্ত্তন করে। আমরা ইতি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে এই সত্য বা ধর্ম্ম কেবলমাত্র ইহলৌকিক দৃষ্টিতে আবদ্ধ নহে। এই সত্য ইহ ও পরলোক এই দুইকে লইয়া স্বস্থানে অক্ষয় রূপে প্রতিষ্ঠিত। কৈকেয়ীর বরলাভ একটা গৌণ কথা মাত্র; তাহার অবলম্বনে ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয়ের সত্য পালন রূপ স্বধর্ম্মের প্রভাব দেখাইবার জন্যই বাল্মিকীর লেখনী ধৃত হইয়াছিল। বেদে "সত্যঞ্চ ঋতঞ্চ" কথাগুলি সৃষ্টিতত্ত্বের মূল তত্ত্ব বলিয়া বর্ণিত। সেই সত্যকে বেদার্থবিৎ বাল্মিকী ক্ষুণ্ণ দর্শনে অবহেলা করিতে পারেন নাই; যদি তাহা পারিতেন তবে রামায়ণরূপ জগদুজ্জ্বলকর গ্রন্থখানি ইহলৌকিক চিত্রে নিবদ্ধ হইয়া অন্যান্য বিবিধ গাথার ন্যায় কালসাগরে ডুবিয়া যাইত। রামায়ণের এই সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমরা যতই ক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে সমালোচনা করি না কেন, তাহার মহিমা ও ক্ষমতা স্বতঃ প্রতিষ্ঠিত। মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই। ধন্য বাল্মিকি! ধন্য তোমার বেদজ্ঞান। আজ লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া তোমার সেই অমৃতনিস্যন্দিনী গাথা মানব জগৎকে মোহিত করিয়া রাজত্ব করিতেছে। অসত্য অনিত্য, সত্য নিত্য। দশরথের কার্য্য অধর্ম্ম হইলে রামায়ন ধ্বংস পাইত। বঙ্কিম বাবুর মস্তিষ্কও কালধর্ম্মে পাশ্চাত্য ভাবে যেন দূষিত হইয়া পড়িয়াছিল।

ইন্দ্রজিৎ যেরূপ ধর্ম্মসেতু রাবণের পুত্র, অঙ্গদও তদ্রূপ বানররাজ বালীর পুত্র। ইন্দ্রজিৎ শ্রুতির কুটচালে অভিচারে উন্মত্ত ও বিধ্বস্ত—বানর পুত্র বেদে অনভিজ্ঞ অঙ্গদ বেদার্থবিৎ রামের আশ্রয়ে যুবরাজ। ইন্দ্রজিৎকে শাসন করিয়া ধর্ম্মে আনয়ন অসম্ভব হইয়াছিল—রামকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আর অঙ্গদ নির্ব্বাক ভাবে রামের পরিচালনে ঐশ্বর্য্য লাভে শান্তি পাইয়াছিলেন। শাস্ত্রে কুট বুদ্ধি চালন দ্বারা পণ্ডিত মন্য হওয়ার পরিণাম রাবণ ইন্দ্রজিৎ ইত্যাদি, আর শাস্ত্র না জেনেও সরল বিশ্বাসীর শ্রেষ্ঠের আশ্রয় গ্রহণের পরিণাম সুগ্রীব ও অঙ্গদ। রামায়ণে (১) দশরথ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি মানুষ শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের প্রদ্যোতক, (২) বানর জাতি শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ—স্ত্রীশূদ্র দ্বিজ বন্ধুর ন্যায় পরিচালকের প্রত্যাশী (৩) আর রাক্ষস জাতি শাস্ত্রের বক্র অর্থকারী ইহকাল বাদী তার্কিক পণ্ডিত; এই ত্রিতয়ের চিত্রই বাল্মিকীর লেখনী দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে। সাহিত্য শব্দের যে অর্থ তাহাতে একমাত্র বেদভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থই সাহিত্য নামের যোগ্য নহে। সর্ব্বত্র সমন্বয় পূর্ণ যে জিনিষ তাহাই সাহিত্য শব্দের অভিধেয়; বেদ ছাড়া অন্য কুত্রাপি সে সমন্বয় নাই। সেই সাহিত্যে জগতের যাহা কিছু এখন পাশ্চাত্য মনীষিগণের কৃপায় আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে দেখা যায় যে বহু প্রাচীনকাল হইতেই শাস্ত্রের (শ্রুতি ভিন্ন অন্য কোনও জিনিসেই শঙ্করও শাস্ত্র মধ্যে গণ্য করেন নাই) নিগূঢ় তত্ত্বের সেবক ঋষিগণ আপাত বাদী ভাসমান তার্কিক পণ্ডিতগণের নিন্দাবাদে লিপ্ত। অন্য কথায়, আস্তিক্যবাদের বিবাদ—দেব ও অসুরের লড়াই। রামায়ণে আস্তিক্যের প্রতিষ্ঠা ও নাস্তিকের নিধন চিত্রিত। তত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যের অজ্ঞ জনগণের প্রতি কি গুরুতর কর্ত্তব্য তাহাও কিষ্কিন্ধ্যার চিত্রে চিত্রিত। ব্রাহ্মণ বাল্মিকী মনীষী, ব্রাহ্মণের মানব সমাজের প্রতি কি গুরুতর

কর্ত্তব্য তাহা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। আবার ব্রাহ্মণ যাহাতে তাঁহার এই গুরুতর কর্ত্তব্যটি নিরঙ্কুশে সমাধান করিতে পারেন—তজ্জন্যই ক্ষত্রিয় আদর্শ শ্রীরামচন্দ্র। "সারভাইভেল অফ দি ফিটেষ্ট (Survival of the fittest)" পরন্ত নিম্নকে উপরে তোলাই হিন্দুর শিক্ষা। যজুর্ব্বেদ রামায়ণে প্রধান, তাহা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—সেই যজুর্ব্বেদ বলিতেছেন—

যত্র ব্রহ্ম চ ক্ষত্র চ সম্যঞ্চৌচরতঃ সহ
তং লোকং পুণ্যং প্রজ্ঞেয়ং যত্র দেবাঃ
সহাগ্নিনা। (বৃঃ থঃ সং ২০।২৫।)

ব্রহ্ম শক্তি ক্ষত্র শক্তির দ্বারা পরিরক্ষিত না হইলে শ্রুতি প্রতিপাদিত বর্ণাশ্রম সমাজ অশ্বডিম্বের ন্যায় কল্পনা মাত্র। বাল্মিকী ভুল করিয়া আদর্শ ক্ষত্রিয় রামকে অঙ্কিত করেন নাই। আদর্শ ক্ষত্রিয়ের সত্য রক্ষাই ধর্ম্ম। কাজেই দশরথ রামকে স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার অবান্তর ফলে ব্রহ্ম শক্তির রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা। মুনিগণের প্রার্থনা রক্ষার জন্যই রামে ও রাক্ষসে যুদ্ধ।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ প্রণালী—যাহা ভারতের সাধনা'র এক বিশেষ লক্ষ্য—তাহা সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচনা-সাপেক্ষ।]

পাঞ্চরাত্র মত ও শঙ্করাচার্য্য

(৬)

এইবার দেখা যাউক, আমাদের আলোচ্য উৎপত্ত্যধিকরণে অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদের শেষ অধিকরণে এই নিয়মগুলি আচার্য্য শঙ্কর ও আচার্য্য রামানুজের মধ্যে কে কতদূর পালন করিতেছেন। কারন, এই অধিকরণেই পাঞ্চরাত্রমতের বিচার আছে। শঙ্করদ্বেষী পাঞ্চরাত্রমতানুসারিগণ এই অধিকরণটি প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া শঙ্করাচার্য্যের উপর নানারূপ আক্ষেপাদি করিয়া থাকেন। আর সেই আক্ষেপের উত্তরদানার্থ এই প্রবন্ধের অবতারণা।

আমরা দেখিতে পাই এই অধিকরণে চারিটি সূত্র আছে, যথা—

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। ৪২
ন চ কর্ত্তুঃ করণম্। ৪৩
বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ। ৪৪
বিপ্রতিষেধাচ্চ। ৪৫

শঙ্করাচার্য্য এই চারিটী সূত্রকেই সিদ্ধান্তসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মতের

খণ্ডনীয় অংশের খণ্ডন করিয়াছেন। ইহার প্রথম সূত্রে প্রথমান্ত পদ না থাকিলেও, ইহার পূর্ব্বে যে পত্যধিকরণ আছে, তাহাতে তৎপূর্ব্বাধিকরণ হইতে অনুবৃত্ত যে প্রথমান্ত ন-কার পদ, তাহাকে অনুবৃত্তি করিয়া ইহা হইতে অধিকরণ আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যে পশুপত্যধিকরণ আছে, তাহাতে ৫টী সূত্র আছে, যথা :—

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ। ৩৭
সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ। ৩৮
অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ। ৩৯
করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ। ৪০
অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা। ৪১

ইহার প্রথম সূত্র যে "পত্যুরসমঞ্জস্যাৎ" তাহাতেও প্রথমান্তপদ নাই, এ জন্য পূর্ব্বে যে "একস্মিন্ন সম্ভাবাধিকরণ" আছে, তাহার প্রথম সূত্রের প্রথমান্ত ন-কার পদটীর অনুবৃত্তি করা হইয়াছে, সেই অধিকরণের সূত্রগুলি যথা—

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ। ৩৩
এবং চাত্মাকাৎস্ন্যর্ম্। ৩৪
ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ। ৩৫
অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ। ৩৬

এই অধিকরণে "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" সূত্রের প্রথমান্ত ন-কার পদটী ইহার পরবর্ত্তী অধিকরণের প্রথম সূত্র "পত্যুরসমঞ্জস্যাৎ" সূত্রে অনুবৃত্তি করিয়া তদ্দ্বারা অধিকরণ আরম্ভ করিয়া মাহেশ্বর বা পশুপতি মত খণ্ডন করা হইয়াছে। আর সেই অনুবৃত্ত প্রথমান্ত ন-কার পদটিকে 'উৎপত্ত্যসম্ভ-বাৎ" সূত্রে অনুবৃত্তি করিয়া তদ্দ্বারা ভাগবত বা পাঞ্চরাত্রমতের দুষ্টাংশের খণ্ডন করা হইয়াছে।

এই ন-কারটীকে যদি অনুবৃত্তি না করা হইত, তবে "পত্যুরসমঞ্জস্যাৎ" সূত্র দ্বারা অধিকরণ আরম্ভ করা যাইত না, এবং সেই ন-কারটী যদি 'উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ' সূত্রে আবার অনুবৃত্তি না করা হইত, তাহা হইলে সেই সূত্রদ্বারা অধিকরণ আরম্ভ করা যাইত না। প্রথমান্তপদ পদ না থাকিলে বা উহা না থাকিলে অধিকরণ আরম্ভ হয় না, এবং অধিকরণারম্ভে তজ্জন্য যে প্রথমান্ত পদ অনুবৃত্তি করা হয়, তাহা পূর্ব্বাধিকরণের প্রথম সূত্রেরর কোন প্রথমান্ত পদই হয়, কিন্তু সেই অধিকরণের অন্তর্গত অন্য কোন সূত্রের প্রথমান্ত পদ নহে—এই নিয়মটী এস্থলে মান্য করিয়া শাঙ্করমতে সূত্রার্থ বা অধিকরণার্থ করা হইল।

বস্তুতঃ রামানুজাচার্য্য নৈকস্মিন্নধিকরণে এবং পশুপত্যাধিকরণে এই দুইটী নিয়মই পালন করিতেছেন, কিন্তু উৎপত্ত্যাধিকরণে তাহা পালন করিতেছেন না। তিনি পশুপত্যাধিকরণে বলিতে-ছেন—"নৈকস্মিন্ন সম্ভবাৎ' ইত্যতঃ ন ইতি অনুবর্ত্ততে" এই বলিয়া বলিতেছেন—"পত্যুঃ পশুপতেঃ মতং ন আদরণীয়ম্; কুতঃ অসামঞ্জস্যাৎ।" সুতরাং দেখা যাইতেছে "পত্যুরসমঞ্জস্যাৎ" এই সূত্রে প্রথমান্ত পদ নাই, এজন্য অধিকরণ আরম্ভ হয় না, আর তজ্জন্য পূর্ব্বাধিকরণের প্রথম সূত্র "নৈকস্মিন্ অসম্ভবাৎ' তাহার প্রথমান্তপদ যে নকার, তাহারই অনুবৃত্তি করিলেন, অধিকরণান্তর্গত 'নচ পর্য্যাযাদপ্য-বিরোধো বিকারাদিভ্যঃ"এই সূত্রের নকারের অনুবৃত্তি করিলেন না। অতএব বুঝা গেল অধিকরণারম্ভে

কোন প্রথমান্ত পদের অনুবৃত্তি করিতে হইলে তৎপূর্ব্বাধিকরণের প্রথম সূত্রেরই কোন প্রথমান্তপদের অনুবৃত্তি করাই নিয়ম। আর এই নিয়ম রামানুজাচার্য্য উৎপত্ত্যধিকরণে পালন করিলেন না। তিনি নিজে যে নিয়ম স্বীকার করিলেন তাহারই অন্যথা করিলেন।

আর প্রথমান্ত পদ ব্যতীত অধিকরণ আরম্ভ হয় না—এই নিয়মটী রামানুজাচার্য্যও অন্য স্থলে মান্য করিয়াছেন, কিন্তু তিনি "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" সূত্রে তাহা না করিয়া উহা হইতে অধিকরণ আরম্ভ করিলেন।

আর যদি বলা হয়—নকারের অনুবৃত্তি করা হইয়াছে, যেহেতু রামানুজাচার্য্য বলিতেছেন—"অত্র জীবস্য উৎপত্তিঃ শ্রুতিবিরুদ্ধা প্রতীয়তে" সুতরাং এই মতে "উৎপত্তেঃ অভাবাৎ পাঞ্চরাত্র-মতং ন সমীচীনম্' এইরূপ অন্বয় হইবে। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার বেদান্তসারেই বলিয়াছেন—"সাংখ্যা-দিবৎ পাঞ্চরাত্রমপি জীবোৎপত্ত্যভিধানাৎ শ্রুতিবিরুদ্ধত্বেন তদসম্ভবাৎ অপ্রমাণম্॥' কিন্তু ইহাতেও উদ্ধার নাই। কারণ, এই পদের সমস্ত অধিকরণে নকার দ্বারা পূর্ব্বপক্ষই খণ্ডন করা হইয়াছে। তাহার অন্যথা করিয়া ন-কারকে পূর্ব্বপক্ষে অন্বয় করা সঙ্গত হয় না।

আর যদি বলা হয় "অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা' এই পূর্ব্বসূত্রের "বা" পদ অনুবৃত্তি করিয়া উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষসূত্র করা হইয়াছে, তাহাও সঙ্গত হইবে না। কারণ, সেই "বা" শব্দের অর্থ "চ"কার—ইহা তিনিই বলিয়াছেন, যথা—"বাশব্দশ্চার্থে' ইত্যাদি। অতএব পূর্ব্বসূত্রের সমুচ্চার্থেয় বা-শব্দ পরসূত্রে পূর্ব্বপক্ষজ্ঞাপক করা সঙ্গত হয় না। আর তাহা করিলে অধিকরণারম্ভে পূর্ব্বাধিকরণের প্রথমান্তপাদের অনুবৃত্তি না করা রূপ দোষ আবার হইল। অতএব এই সূত্রে রামানুজাচার্য্যের ব্যাখ্যা কিছুতেই সঙ্গত হয় না।

তিনি "পত্যুরসমঞ্জস্যাৎ" সূত্রে অধিকরণ আরম্ভের জন্য তৎপূর্ব্বাধিকরণের প্রথম সূত্রের প্রথমান্ত 'ন'কার পদের অনুবৃত্তি করিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তী "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" সূত্রে অধিকরণ আরম্ভের জন্য সেই নকারের অনুবৃত্তি করিলেন না, অথচ "পত্যুরসমঞ্জস্যাৎ" সূত্রের যেরূপ আকার "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" সূত্রেরও আকার প্রায় তদ্রূপই। পত্যুঃ এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের পর অনমঞ্জস্যাৎ এই পঞ্চম্যন্ত পদ, আর উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ "উৎপত্তেঃ অসম্ভবাৎ" এই পদদ্বয়ের সমাস করায় উৎপত্তেঃ ইহা পত্যুঃ পদের ন্যায় ষষ্ঠ্যন্ত পদই হইল এবং অসমঞ্জস্যাৎ এই পঞ্চম্যন্ত পদের ন্যায় অসম্ভবাৎ এই পঞ্চম্যন্ত পদটী হইল। অতএব পত্যুরসমঞ্জস্যাৎ সূত্রের ন্যায়ই উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ সূত্রের অবস্থা হওয়া উচিত। অর্থাৎ নকারের অনুবৃত্তি করিয়া ইহা সিদ্ধান্তসূত্র করাই উচিত। কিন্তু রামানুজাচার্য্য তাহা করিলেন না।

কেবল তাহাই নহে, উক্ত পশুপত্যধিকরণের প্রথম দুইটি সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র করিয়াছেন এবং শেষ দুইটী সূত্রকে সিদ্ধান্ত সূত্র করিয়াছেন। আর এইরূপ করায় তিনি এই অধিকরণের এই পাদশেষে পাঞ্চরাত্র মত স্থাপিত করিলেন। যদি এ স্থলে রামানুজাচার্য্য পশুপত্যধিকরণে যেমন তৎপূর্ব্বাধিকরণের নকার অনুবৃত্তি করিয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়া নকার অনুবৃত্তি করিতেন, তাহা হইলে উৎপত্ত্যধিকরণের প্রথম সূত্র দুইটি আর পূর্ব্বপক্ষ সূত্র হইতেই পারিত না। অতএব পাঞ্চরাত্র মতের স্থাপনানুরোধেই রামানুজাচার্য্যকে এই কার্য্য করিতে হইয়াছে বলিতে হয়।

বস্তুতঃ এ পর্য্যন্ত আমরা বহু মতের বহু ভাষাই দেখিলাম, কেবল রামানুজাচার্য্য ভিন্ন উৎপত্ত্যধিকরণের প্রথম দুইটী সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ সূত্র করিয়া শেষ দুইটী সূত্রকে সিদ্ধান্ত সূত্র কেহই করেন নাই। অধিক কি রামানন্দভাষ্য, যাহা রামানুজ সম্প্রদায়েরই শাখাবিশেষ বলা হয়, তাহা-তেও এরূপ করা হয় নাই।

তাহার পর এই অধিকরণের "বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ" এই সূত্রে "বা" শব্দটীকে পূর্ব্বপক্ষনিরাসসূচক পদ বলিতে হইয়াছে। ইহাও প্রশস্ত পথ হয় নাই। 'বা" শব্দের বিকল্প অর্থই প্রধান, তৎপরে সমুচ্চয় অর্থ গ্রাহ্য। নিষেধ অর্থ—কদাচিৎ দেখা যায়। উহা এক প্রকার অপ্রসিদ্ধ বলাই চলে। এস্থলে অপর কোন ভাষ্যকারই এই পথ অবলম্বন করেন নাই। আর এস্থলে দুইটী সূত্রের পূর্ব্বের সূত্রেই একটী বা-শব্দ আছে, সেখানে তিনি নিজেই চকারার্থক বলিয়া বা-শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে—"বিজ্ঞানাদি ভাবে বা" সূত্রের বা-শব্দের দ্বারাই উহা সিদ্ধান্তসূত্র বলাও উচিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত অধিকরণের প্রধান যে দুইটী নিয়ম তাহা, এইস্থলে রামানুজাচার্য্য প্রতিপালন করিলেন না, অথচ অন্য আচার্য্যগণ তাহা করিয়াছেন।

তাহার পর এই ২।২ পাদটী পরমতখণ্ডনপাদ। এ পাদে পূর্ব্বপক্ষ সূত্রই নাই। ইহাতে রামানুজাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ সূত্র স্বীকার করিলেন। এতদ্ব্যতীত এই পরমতখণ্ডনপাদে স্বমতস্থাপনও তিনি করিলেন। এতদ্দ্বারা পাদসঙ্গতিরও নিয়ম লঙ্ঘিত হইল। পরমতখণ্ডন পাদে স্বমতস্থাপন ও বিশেষতঃ পাদশেষে স্বমতস্থাপন—পাদপ্রতিপাদ্যের বিরুদ্ধই হইল। কারণ, পাদশেষ উপসংহারস্থানীয়ই হয়। অতএব উপসংহারে পরমতখণ্ডন না করিয়া স্বমতস্থাপন করিলে সে পাদের প্রকৃতিরই ব্যতিক্রম করা হইল।

আর এই পাদ যে পরমতখণ্ডনপাদ, ইহাতে স্বমতস্থাপন অসঙ্গত, ইহা রামানুজাচার্য্য এই পাদের মহদ্দীর্ঘাধিকরণে শঙ্করব্যাখ্যাকে খণ্ডন করিবার কালে স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন। যথা—

"যৎ তু পরৈঃ ব্রহ্মকারণবাদদূষণপরিহারপরম্ ইদং ব্যাখ্যাতং তৎ অসঙ্গতম্ পুনরুক্তং চ। ব্রহ্মকারণবাদে পরোক্তান্ দোষান্ পূর্ব্বস্মিন্ পাদে পরিহৃত্য পরপক্ষপ্রতিক্ষেপো হ্যস্মিন্ পাদে ক্রিয়তে। চেতনাৎ ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিসম্ভবশ্চ "ন বিলক্ষণত্বাৎ" (২।১।৪) ইতি অত্রৈব প্রপঞ্চিতঃ, অতঃ হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং মহদ্দীর্ঘাণুহ্রস্বোৎপত্তিবৎ অন্যচ্চ তদভ্যুপগতং সর্ব্বম্ অসমঞ্জসম্ ইত্যেব সূত্রার্থঃ॥"

অর্থ সুগম। অথচ রামানুজাচার্য্য উৎপত্ত্যধিকরণে কি করিয়া পাঞ্চরাত্র মত স্থাপন করিলেন বুঝা গেল না। এ জন্য মনে হয়—রামানুজাচার্য্যের এই ব্যাখ্যায় পাদসঙ্গতিও লঙ্ঘিত হইয়াছে। আর তজ্জন্য উৎপত্ত্যধিকরণে রামানুজাচার্য্যের স্বপক্ষস্থাপনপ্রয়াস তাঁহার স্বমতেরই বিরুদ্ধ হইতেছে।

তাহার পর আর এক কথা। রামানুজাচার্য্য এই উৎপত্ত্যধিকরণে যখন তাঁহার পূর্ব্বতন শাঙ্কর ব্যাখ্যার খণ্ডন করিতেছেন, তখন শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বতন যে বোধায়ন ঋষি, যাঁহার মতে রামানুজাচার্য্য ভাষ্য রচনা করিতেছেন, তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি নিজ ব্যাখ্যা পুষ্ট করিলেন না। এরূপ স্থলে ত এরূপ করাই কিন্তু স্বাভাবিক ছিল। এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

বস্তুতঃ শাঙ্করভাষ্যের বৃত্তিকারসম্মত ব্যাখ্যাই সর্ব্বত্র রামানুজাচার্য্য গ্রহণ করিয়াছেন

ইহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। শঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ভাষ্যে সর্ব্বত্র সম্ভাবিত বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন, অথচ এই উৎপত্ত্যধিকরণে তাহা ত তিনি করেন নাই। এজন্য মনে হয় ইহাতে বৃত্তিকারের কোনরূপ পৃথক্ ব্যাখ্যা ছিল না। বৃত্তিকার ও শঙ্করাচার্য্য এস্থলে একমতই ছিলেন।

ওদিকে রামানুজাচার্য্যও এইস্থলে বোধায়নের ব্যাখ্যা শঙ্করব্যাখ্যার বিরুদ্ধরূপে প্রদর্শন করিয়া শঙ্করব্যাখ্যার খণ্ডন করিতেছেন না। শঙ্করাচার্য্য যেখানে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা দিয়াছেন সেখানে, রামানুজাচার্য্য বৃত্তিকারের মতে ব্যাখ্যা করিতেছেন বলিয়া রামানুজাচার্য্য নিজ ভাষ্যপ্রারম্ভে প্রতিজ্ঞা করায়, বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা নিদর্শনরূপে তিনি প্রদর্শন করিতে না পারেন, কিন্তু যেখানে শঙ্করাচার্য্য বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা দিতেছেন না, সেখানে শঙ্করাচার্য্যের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে হইলে রামানুজাচার্য্যের শঙ্করের পরিত্যক্ত বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়া স্বমত পুষ্ট করাই উচিত। রামানুজাচার্য্য বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা দেখিতে পাইলে কি তাহা শঙ্করার্য্যের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করিতেন না? ইহা না করা নিতান্ত অস্বাভাবিক কথা।

অতএব এই অধিকরণে বৃত্তিকার বোধায়নের ব্যাখ্যা ছিল না—ইহাই বলিতে হয়। আর তজ্জন্য এই অধিকরণে রামানুজাচার্য্যের যে ব্যাখ্যা, তাহা তাঁহার নিজের ব্যাখ্যাই বলিতে হয়। যে শঙ্করাচার্য্য প্রথম হইতে চতুর্থাধ্যায় পর্য্যন্ত বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি যে এস্থলে বৃত্তিকারের ব্যাখ্যা উপেক্ষা করিয়া কেবলই নিজমত বলিবেন, তাহাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। অতএব এই অধিকরণের রামানুজাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা বোধায়নসম্মতই নহে। আর তজ্জন্য উৎপত্ত্যধিকরণের ব্যাখ্যায় রামানুজাচার্য্যের কতকগুলি দোষ হইয়াছে, যথা—(প্রথম) অধিকরণরচনার নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়াছে, (দ্বিতীয়) পাদসঙ্গতি লঙ্ঘিত হইয়াছে, (তৃতীয়) স্বমতেরও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, (চতুর্থ) অন্য সকল ভাষ্যকারের সহিত বিরোধও ঘটিয়াছে। (পঞ্চম) নিজকৃত ব্যাখ্যা বোধায়ন ঋষির নামে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যায় কোন দোষই হয় নাই। অতএব এই ব্যাখ্যায় কাহার কতদূর ব্যাসানুসারিতা আছে, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

যদি বলা যায় রামানুজাচার্য্য, বোধায়নের ব্যাখ্যা, কোন স্থলেই শাঙ্করব্যাখ্যাখণ্ডনের জন্য প্রমাণরূপে উদ্ধার করেন নাই; কারণ, করিবার আবশ্যকতাও নাই; তাহার কারণ, তিনি ভাষ্যপ্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে, তিনি বোধায়নমতে সূত্রব্যাখ্যা করিতেছেন। অতএব উহার প্রদর্শন বাহুল্য মাত্র। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আক্ষেপ ব্যর্থ।

কিন্তু একথা সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা হইলে তিনি "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের 'অতঃ' শব্দের ব্যাখ্যার স্থলে বৃত্তিকারের মত উদ্ধার করেন কেন? বস্তুতঃ, তিনি অন্যত্রও বৃত্তিকারের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এজন্য ওরূপ আপত্তি সঙ্গত নহে। যদি ওরূপ স্থলে বৃত্তিকারের বাক্য উদ্ধৃত করা আবশ্যক হয়; তাহা হইলে তদপেক্ষা প্রয়োজনীয় এই স্থলে তাহা করা নিতান্তই আবশ্যক। বস্তুতঃ, যেখানে শঙ্করসম্মত দুইটী সূত্রকে রামানুজাচার্য্য একটী সূত্র করিতেছেন, যেখানে একটী সূত্রকে দুইটি সূত্র করিতেছেন, কিংবা একটি সূত্রকে পরিত্যাগই করিতেছেন, অথবা অতিরিক্ত সূত্র গ্রহণ করিতেছেন, অথবা অধিকরণের আরম্ভাদি লইয়া মতভেদ করিতেছেন, তদপেক্ষা প্রয়োজনীয় স্থল আর কি হইতে পারে? এরূপ স্থলে বোধায়নের ব্যাখ্যাকে

প্রমাণরূপে উদ্ধৃত না করিয়া "অতঃ" শব্দের অর্থস্থলে বা এতৎসদৃশস্থলে বৃত্তিকারের বাক্য উদ্ধার কখনই সঙ্গত হয় না। এই জন্যই মনে হয়, তিনি বোধায়নবৃত্তির যেটুকু পূর্ব্বাচার্য্যগণকর্তৃক সংক্ষিপ্ত আকারে রক্ষিতরূপে পাইয়াছিলেন, তদনুসারে নিজ বুদ্ধিবলে সূত্রার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, যে শাঙ্করমতখণ্ডনে তাঁহার জীবনপণপ্রয়াসসদৃশ প্রযত্ন দেখা যায়, তাঁহার ব্যাখ্যাদির দোষ দেখাইবার জন্য শাঙ্করচার্য্য অপেক্ষা প্রাচীন বোধায়নবৃত্তির বাক্য উদ্ধার সম্ভবপর হইলে কখনই তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইতে পার না। অতএব ওরূপ আপত্তি ব্যর্থ।

অবশ্য এ স্থলে বলিতে পারা যায়, যে শাঙ্কর ভাষ্যেও মহদ্দীর্ঘাধিকরণে পাদসঙ্গতির অপলাপ দেখা যাইতেছে। অতএব ব্যাসানুসারিতা সম্বন্ধে উভয় আচার্য্যই তুল্যমূল্য। বস্তুতঃ একথা এই মহদ্দীর্ঘাধিকরণে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, এই অধিকরণে এই খণ্ডনপাদে স্বমত স্থাপন করাই হইয়াছে। উৎপত্ত্যধিকরণে এই দোষ শঙ্করাচার্য্যের ঘটে নাই বটে; কিন্তু এই অধিকরণে, তাহা ঘটিয়াছে, অর্থাৎ এই মহদ্দীর্ঘাধিকরণের শঙ্করব্যাখ্যায় পাদসঙ্গতির হানিই হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও সূত্ররচনার যে সব নিয়ম আছে এবং যে নিয়মগুলি প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে, তদনুসারে এই মহদ্দীর্ঘাধিকরণে শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে রামানুজাচার্য্যের ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা করা বোধ হয় অসম্ভব। অর্থাৎ এই অধিকরণটীকে পরমতখণ্ডনপর করা সম্ভবপর হয় না। রামানুজাচার্য্যের ভাষ্যে এই নিয়মগুলি প্রতিপালিত হয় নাই, কিন্তু শঙ্করভাষ্যে উক্ত নিয়মগুলি পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইয়াছে এবং অনেক ভাষ্যেও অধিকাংশস্থলে প্রতিপালিত হইয়াছে। ফলতঃ অধিকরণরচনার নিয়ম মানিয়া শঙ্করাচার্য্যের পক্ষে রামানুজাচার্য্যের ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয় না—ইহা নিশ্চিত। কারণ, মহদ্দীর্ঘাধিকরণে একমাত্র সূত্র আছে, যথা—

"মহদ্দীর্ঘবদ্ বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্" (২।২।১১)

আর এই সূত্রেই অধিকরণের আরম্ভ করাই প্রয়োজন এবং শেষ করাও প্রয়োজন। যে হেতু ইহার পূর্ব্বসূত্র :—

"বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্" (২।২।১০)

এবং তাহার পূর্ব্ব সূত্র—

"অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ।" (২।২।৯)

এস্থলে উপর্য্যুপরি পূর্ব্ব দুটী সূত্রে দুইটী চকার এবং শেষসূত্রে "অসমঞ্জসম্" পদটী থাকায় এখানেই পূর্ব্ব অধিকরণের সমাপ্তির চিহ্নলাভ হইল। ইহা একটী বিশেষ নিয়ম, ইহার কথা সংক্ষেপানুরোধে পূর্ব্বে বলা হয় নাই। কিন্তু ইহা সূত্র আলোচনা করিলে স্বীকার্য্যই হইয়া উঠে। তাহার পর "মহদ্দীর্ঘবৎ" ইত্যাদি সূত্রের পর যে—

"উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ" (২।২।১২)

সূত্রটী রহিয়াছে, তাহাতেও "অভাবঃ" এই প্রথমান্তপদ রহিয়াছে বলিয়া সেখানেও অধিকরণ আরম্ভ করা আবশ্যক হয়। এজন্য "মহদ্দীর্ঘবদ্ বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্" সূত্রে অগত্যা একটী অধিকরণ আরম্ভ করা প্রয়োজন হইল। কিন্তু রামানুজাচার্য্য এই "মহদ্দীর্ঘ" ইত্যাদি সূত্রকে পরবর্ত্তী কতিপয় সূত্রের সহিত একাধিকরণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এখানেও রামানুজাচার্য্য-

মতে অধিকরণনিয়ম রক্ষিত হইল না, কিন্তু শঙ্করব্যাখ্যায় তাহা রক্ষিত হইল। পূর্ব্ব সূত্রে অধিকরণ শেষ এবং পরসূত্রে অধিকরণ আরম্ভ দেখিলে মধ্যবর্ত্তী সূত্রে পৃথক্ একটী অধিকরণ করা ভিন্ন আর উপায় নাই।

তাহার পর এটীকে শঙ্করভাষ্যের ন্যায় স্বপক্ষস্থাপনপর সূত্র না করিয়া পরপক্ষখণ্ডনপর সূত্র করিবার জন্য রামানুজাচার্য্য ইহার পূর্ব্বাধিকরণের শেষ সূত্রের "অসমঞ্জসম্" পদের অনুবৃত্তি করিয়াছেন। ইহাও কিন্তু প্রশস্ত পথ নহে। এস্থলে প্রশস্ত পথে প্রথমান্তপদের অনুবৃত্তি করিতে হইলে পূর্ব্বাধিকরণারম্ভক "রচনানুপপত্তেঃ নানুমানম্" এই সূত্র হইতে কোন প্রথমান্ত পদের অনুবৃত্তি করা উচিত ছিল। একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহা কিন্তু করা হয় নাই, বস্তুতঃ করিলেও খুব সুবিধা হইত না। বাহুল্যভয়ে এ বিচারে বিরত রহিলাম।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষখণ্ডনসূচক "অসমঞ্জসম্" পদের অনুবৃত্তি না করা যায়, এবং পরবর্ত্তী সূত্র হইতে পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভ প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইহাকে স্থাপনপররূপে ব্যাখ্যা করা ভিন্ন আর উপায় নাই। বস্তুতঃ, ইহাকে স্থাপনপররূপে ব্যাখ্যা করা যে অসঙ্গত, তাহা শঙ্করাচার্য্যও জানিতেন এবং তাহার ইঙ্গিতও তিনি করিয়াছেন, আর তদনুসারে তাঁহার ভাষ্যের টীকায় এ কথার উল্লেখও আছে; শঙ্করাচার্য্য যদি নিজ বুদ্ধিবলেই সূত্র ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা হইলে তিনি এই সূত্রটীকে পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিপাদের মধ্যে স্থাপিত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন। অথবা রামানুজাচার্য্যের ন্যায় পরপক্ষখণ্ডনপররূপেই ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। অথবা "ক্ষণিকত্বাচ্চ" এই ২।২।৩১ সূত্রকে শঙ্কর ভাস্কর মধ্ব নিম্বার্ক বল্লভ প্রভৃতি রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বাপর ভাষ্যকারগণ গ্রহণ করিলেও রামানুজাচার্য্য যেমন তাহা গ্রহণ করেন নাই, তদ্রূপ শঙ্করাচার্য্যও উক্ত "মহদ্দীর্ঘ" ইত্যাদি সূত্রকে পরিত্যাগই করিতে পারিতেন। এই সব কারণে আমাদের বোধ হয়, যিনি পাদসঙ্গতির পরিচয় রাখেন, তিনি ইচ্ছা করিয়া এরূপ পাদসঙ্গতিবিরোধী ব্যাখ্যার অনুসরণ করিতেন না—যদি সম্প্রদায়ানুরোধ না থাকিত। আমাদেরই যখন এইরূপ শক্তি আছে, তখন তাহার অন্যথা ব্যাখ্যা করিবার শক্তি নিশ্চয়ই শঙ্করাচার্য্যের যথেষ্ট ছিল। আর এই জন্যই বোধ হয়—শুকাদিসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যানুরোধে তিনি এই পাদসঙ্গতির ভঙ্গ করিয়াও পরপক্ষখণ্ডনপাদে এই সূত্রটিকে স্বপক্ষস্থাপনরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে সূত্রকারের অভিপ্রায় অনুসরণই শঙ্করাচার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য—ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বস্তুতঃ গ্রন্থের অভিপ্রায় অভিজ্ঞ গ্রন্থকার নিজে যতটা জানেন, ততটা অপরে জানিতে পারেন না। এজন্য সূত্রকাররচিত সূত্ররচনার নিয়ম অপেক্ষা সূত্রকারের অভিমত সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার বলই অধিক প্রবল হইয়া থাকে। বক্তার অভিপ্রায় তাঁহার বাক্যার্থবোধে প্রধানতম হেতু। আর তজ্জন্য শঙ্করাচার্য্য তাহাই করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহাও একটী প্রধান কারণ, যে জন্য বলিতে হয় ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করব্যাখ্যাই সূত্রকারসম্মত ব্যাখ্যা।

যদি বলা যায়, অধিকরণারম্ভে কোন পদ অনুবৃত্তি করিতে হইলে তৎপূর্ব্বাধিকরণের প্রথম সূত্র হইতে কোন পদের অনুবৃত্তি করা আবশ্যক কেন হইবে? পূর্ব্বাধিকরণের সূত্রগুলির মধ্যে যে কোন সূত্র হইতে কোন পদ অনুবৃত্তি করিলেও চলিতে পারে? অতএব "মহদ্দীর্ঘবৎ" ইত্যাদি সূত্র তৎপূর্ব্বাধিকরণের অন্তিম সূত্রের 'অসমঞ্জসম্" পদ অনুবৃত্তি করা অসঙ্গত হয় নাই, ইত্যাদি।

কিন্তু একথাও সঙ্গত নহে। কারণ, পশুপত্যধিকরণের "পত্যুরসমঞ্জসাৎ ২।২।৩৭" এই

অধিকরণারম্ভক সূত্রে "ন"কার অনুবৃত্তি করিয়া এই সূত্রকে অধিকরণারম্ভক সূত্ররূপে, এবং খণ্ডন সূত্ররূপে পরিগণিত করিবার জন্য তৎপূর্ব্বের "একস্মিন্নসম্ভবা"ধিকরণের অধিকরণারম্ভক সূত্র যে "নৈকস্মিন্নসম্ভবৎ" সূত্র, তাহার "নকারকে রামানুজাচার্য্যই অনুবৃত্তি করিয়াছেন। একথা তিনি নিজভাষ্যমধ্যে 'নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ইত্যতঃ"ন" ইতি অনুবর্ত্ততে' এইবাক্যে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। যদি অধিকরণারম্ভক সূত্রে পূর্ব্বাধিকরণের অধিকরণারম্ভক সূত্রের কোন পদই অনুবৃত্তি করা নিয়ম না হইত, তাহা হইলে "পত্যুরসমঞ্জস্যাৎ" সূত্রে "ন"কার অনুবৃত্তি করিবার জন্য তৎপূর্ব্বাধিকরণের প্রথম সূত্রের "ন"কার অনুবৃত্তি করিয়া তৎপরবর্ত্তী "নচ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ" এই শঙ্করমতের ৩৫সূত্র বা রামানুজমতের ৩৩ সূত্রের "ন"কারটীর অনুবৃত্তি করিলেই চলিত। 'পত্যুরসমঞ্জস্যাৎ" সূত্রের একটী সূত্র পূর্ব্বে এই "নচ পর্য্যায়াদ" সূত্রটী অবস্থিত এবং ৩টী সূত্রপূর্ব্বে "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" সূত্রটী অবস্থিত। নিকটবর্ত্তী সূত্র থাকিতে দূরবর্ত্তী সূত্রে যাইবার আবশ্যকতা কি? অতএব অধিকরণারম্ভে কোন অনুবৃত্তি করিতে হইলে তৎপূর্ব্বাধিকরণের প্রথম সূত্র হইতেই সেই পদের অনুবৃত্তি করা প্রয়োজন, ইহা রামানুজাচার্য্যই স্বীকার করিতেন; আর তজ্জন্য "মহদ্দীর্ঘবৎ" ইত্যাদি সূত্রকে খণ্ডনপর সূত্র করিবার জন্য তৎপূর্ব্বসূত্র হইতে "অসমঞ্জসম্" পদের অনুবৃত্তি করা রামানুজাচার্য্যের মতেই অশোভন বা অসঙ্গত হইতেছে। রামানুজাচার্য্যের পর প্রায় সমুদয় শঙ্করমতবিরোধী ভাষ্যকার রামানুজাচার্য্যের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং শঙ্করের পরবর্ত্তী ভাষ্যকার শঙ্করমতবিরোধী ভাস্করাচার্য্য তাহা করেন নাই, কিন্তু অনুসরণই করিয়াছেন—ইহাও দেখা যায়।

বস্তুতঃ, এই পাদে শঙ্করব্যাখ্যায় যেমন পাদসঙ্গতির ভঙ্গ হইয়াছে, তদ্রূপ উৎপত্ত্যধিকরণে রামানুজাচার্য্যেরও পাদসঙ্গতির ভঙ্গ হইয়াছে, দেখা যায়। তথাপি যদি দোষাধিক্য বিচার করা যায়, তাহা হইলে রামানুজাচার্য্যের ব্যাখ্যাতেই তাহা অধিক। কারণ, উৎপত্ত্যধিকরণটী পাদশেষের অধিকরণ, আর মহদ্দীর্ঘাধিকরণ পাদমধ্যস্থ অধিকরণ। পাদশেষের অধিকরণের দ্বারা পাদার্থের উপসংহার হয়। মধ্যবর্ত্তী অধিকরণের দ্বারা উপসংহার হয় না। অতএব উভয় আচার্য্যের ব্যাখ্যায় পাদসঙ্গতি ভঙ্গদোষ থাকিলেও দোষের মাত্রা রামানুজাচার্য্যের ব্যাখ্যাতেই অধিক বলিতে হয়।

ইহাই হইল সূত্ররচনায় সূত্রাক্ষরসংক্রান্ত নিয়মানুসরণে শঙ্করভাষ্যের ও রামানুজভাষ্যের এই অধিকরণসংক্রান্ত প্রামাণ্যবিচার। এ বিষয়ে উভয় পক্ষেই বহু কথা উঠিতে পারে, সমুদয় আলোচনা প্রবন্ধমধ্যে সম্ভবপর হয় না। সূত্রের অর্থ অবলম্বনে দোষগুণবিচার আর এস্থলে করা হইল না। ইহা আরও বৃহদ্‌ব্যাপার, এজন্য অদ্বৈতমার্ত্তণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থ দেখা যাইতে পারে। বস্তুতঃ এইরূপে সমগ্র উভয়ভাষ্য সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হইলে একখানি বৃহদ্‌গ্রন্থ হইয়া যায়।

যাহা হউক আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয়—ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরাশির মধ্যে শাঙ্করভাষ্য যতটা সূত্রকারাভিপ্রায়ানুসারী ও সঙ্গত, এতটা অন্য ভাষ্য নহে।

যদি কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি একার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে আমাদের ধারণার একটা পরীক্ষা হইয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে সূত্ররচনার এতাদৃশ ব্যাকরণবিষয়ে কেহ পরিশ্রম বোধ হয় করেন নাই। পূজ্যপাদ স্বর্গীয় লক্ষ্মণশাস্ত্রী মহাশয় একার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পূর্ণ হয় নাই। যাহা হউক, শঙ্করভাষ্যের অভ্যুদয়ে অন্য প্রাচীন

ভাষ্যসমূহ দিবালোকে তারকার ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছে এবং শঙ্করভাষ্যের সুশীতল ছায়ায় অপর ভাষ্যসমূহের আবির্ভাব হইয়াছে—ইহাই মনে হয়। শঙ্করভাষ্যের অভ্যুদয় না হইলে পরবর্ত্তী কোন ভাষ্যই আত্মলাভ করিতে পারিতেন কিনা—সন্দেহ। দ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত দ্বৈতাদ্বৈত সকল মতবাদের বীজই বেদমধ্যে আছে। এই সব মতবাদ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ছিল; অধিক কি শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমতও তাঁহার পূর্ব্বেও ছিল। তিনি উহার প্রচারকর্ত্তামাত্র। কিন্তু বৌদ্ধাদির প্লাবনে কেহই মস্তক উত্তোলন করিতে পারেন নাই। শঙ্করাচার্য্য সেই প্লাবন রুদ্ধ করিলেই অপর মতবাদের আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা হয়। ইতিহাস আলোচনা করিলে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। বস্তুতঃ একজন একটা পথ প্রদর্শন করিলে অনেকেই তদনুরূপ অন্য পথপ্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহা সহজ হয় না।

এক্ষেত্রে "শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা সমাজের তত উপকার হয় নাই, রামানুজাচার্য্যের দ্বারা তাহা হইয়াছে" এই প্রকারে তুলনামূলক মতপ্রকাশ করা কতদূর সমীচীন তাহা বুঝা যায় না। স্ব স্ব সম্প্রদায়ানুসারে সাধননিরত হইলে এ জাতীয় তুলনা প্রয়োজন হয় না। নিষ্ঠাবৃদ্ধির জন্য স্বমতের মাধুর্য্য মাত্র প্রকাশ করিলেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়। পরমতখণ্ডন করিয়া স্বমতের নিষ্ঠাবৃদ্ধি উদ্দেশ্য হইলে যুক্তিসঙ্গত বাক্যের প্রয়োগ করাই সমীচীন। আর এই প্রকার তুলনামূলক সমালোচনা করিলে তদ্বিরুদ্ধে অনুরূপ কথা শ্রবণ অনিবার্য্য হয়। পরকে আক্রমণ দোষ, কিন্তু আত্মরক্ষা দোষ নহে। প্রত্যুত না করাই দোষ। অতএব অনিচ্ছাসত্ত্বেই উত্তরদানচ্ছলে আমাদিগকেও এই তুলনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতমতপ্রচারের পর হইতে শঙ্করমতখণ্ডনে স্বজাতীয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে যেরূপ প্রয়াস দেখা যায়, আর বিশেষতঃ ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে এবং আসুরস্বভাবাপন্নগণের অভিসন্ধির ফলে এই প্রয়াস আজকাল যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, আর তাহার ফলে আত্মবিচ্ছেদ ও একতাভঙ্গ যেরূপ প্রবল হইয়াছে, সুতরাং জাতির ধ্বংসপথ যেরূপ প্রশস্ত হইয়াছে, তাহাতে আত্মরক্ষার জন্য, অধিক কি, সত্যরক্ষার জন্য, তাদৃশ প্রয়াসের প্রত্যুত্তরদান আবশ্যক মনে হয়। আর সেই জন্যই এই প্রবন্ধের প্রকাশ।

যাহা হউক যাঁহারা মনে করেন—শঙ্করাচার্য্য পাঞ্চরাত্রমতের প্রতি অবিচার করিয়াছেন, আমাদের মনে হয়—শঙ্করাচার্য্য ঠিক্ তদ্বিপরীতই করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য পাঞ্চরাত্রমতকে খুবই সম্মান করিয়াছেন। মনে হয়, পরবর্ত্তীকালে পাঞ্চরাত্রমতকে যাঁহারা বিকৃত করিয়াছিলেন, যাঁহারা দুরাগ্রহবশতঃ ইহাকে বেদনিরপেক্ষ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য সূত্রকারের অভিপ্রায় অনুসারে তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছেন। ইহাতে পাঞ্চরাত্রমতের উপকারই করা হইয়াছে।

আর যদি উৎপত্ত্যধিকরণের শাঙ্কর ও রামানুজ ব্যাখ্যার শেষ ফলাফল বিচার করা যায়, তাহা হইলে উভয় ব্যাখ্যার বড় বেশী পার্থক্য নাই। কেবল পথেই মতভেদ। কারণ শঙ্করকর্ত্তৃক পাঞ্চরাত্রমতে স্বীকৃত জীবের উৎপত্তি খণ্ডন করা হইয়াছে, রামানুজাচার্য্য বলিতেছেন—পাঞ্চরাত্র মতে জীবের উৎপত্তি স্বীকৃত হয় নাই। এজন্য উভয়েই জীবের উৎপত্তি নাই এ বিষয়ে একমত। শঙ্করাচার্য্য শাণ্ডিল্যের বেদনিন্দাকে নিন্দা করিয়া তাঁহাকে বেদবাহ্য বলিয়াছেন, রামানুজাচার্য্য বলিতেছেন শাণ্ডিল্য বেদনিন্দা করেন নাই। এজন্য উভয়েই বেদপ্রামাণ্যে একমত। এইরূপ

যদি তত্ত্বসম্বন্ধেও আলোচনা করা যায়, তাহা হইলেও দেখা যায় রামানুজমতও শাঙ্করমতেই পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়। শাঙ্করাচার্যের 'অনির্ব্বচনীয়' আর রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের 'বিশেষ' অভিন্ন হইয়া যায়। যাউক সে কথা, একথা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। অতএব উভয় আচার্য্যের মধ্যে যে আকাশ পাতাল মতভেদ, তাহা পথেরই মতভেদ, গন্তব্যস্থানের নহে, ইহাই আমাদের মনে হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে সমাজের উপকারাপকার তুলনা করিয়া কাহারো ব্যক্তিগত ভাবে নিন্দা করা বা উচ্চনীচভাব প্রদর্শন করা ভাল নহে। উভয়মত পরস্পরবিরোধী বলিয়া সত্য না হইলেও অধিকারিভেদে যে উপকারী তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। উভয়ই জগতের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

পুস্তক পরিচয়। "ভারত কি সভ্য"? মনস্বী সার জন উড্রফ্ প্রণীত "Is India Civilised নামক ইংরেজী পুস্তকের মর্ম্মানুবাদ। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত প্রবীণ লেখক শ্রীযুত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কৃত। অনুবাদ হইলেও পুস্তকে মৌলিক চিন্তা ধারারই যথেষ্ট পরিচয় আছে। এতদ্দেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রীক সাহিত্যের অসদ্‌ভাব বিস্তার, জাতীয় সংস্কৃতি বা সাধনাবিষয়ক সাহিত্যের অভাব অত্যধিক। যে কয়জন মনস্বী তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনা করিয়াছেন, প্রবীণ লেখক চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য। তাহার দ্বারা সম্পাদিত চট্টগ্রামের জ্যোতি পত্রিকা ইহার নিদর্শন। ভারতের সাধনার পাঠকগণও তাঁহার পরিচয় লাভ করিয়া থাকেন। অনুবাদ করিতে না গিয়া তিনি যে মৌলিক এমন কোন পুস্তক লিখিতে পারিতেন, তাহা অনেকে স্বীকার করিবেন। তথাপি একজন বৈদেশিক লেখকের প্রতি তিনি যে অনুচীকির্ষার ভাব দেখাইয়াছেন, তাহাও তাহার মহত্ত্বেরই পরিচায়ক—যে কৃতজ্ঞতার সহিত তিনি মূল লেখকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজ সমপ্রাণতা, স্বজাতি বাৎসল্যর ও ভারতীয় সাধনার প্রতি অকৃত্রিম প্রীতির পরিচয় দান করে।

মূল পুস্তক খানি কত অমূল্য গ্রন্থ, তাহা যাহারা উহা পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই জানেন। এই কালে ভারতের প্রতি যে না না প্রকার আপদ্ পাত ঘটিয়াছে ওঘটিতেছে, তাহার মধ্যে ভারতের সাধনা ও সভ্যতার উপর নানা দিকে যে না না রূপ আক্রমণ হইয়া আসিতেছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক। ইহাতে একদিকে যেমন বাহিরে বিদেশীয় লোকদিগের অন্তরে ভারতবাসীর প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি করে অন্য দিকে এদেশেই বিজাতীয় ভাবে প্রভাবিত বৈদেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া আপন সভ্যতা ও সংস্কারাদি উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত করাইতেছে। গ্রন্থকার এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হিন্দু জতিকে আত্মসংবিদ্ লাভ করিয়া, আত্ম শক্তি অর্জ্জন ও জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা দৃঢ়মূল করিয়া রাখিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। মূল ইংরেজী গ্রন্থ যাহারা পাঠ করেন নাই বা পাঠ করিতে পারিবেন না তাঁহারা, নরনারীনির্ব্বিশেষে, এই পুস্তকখানি জাতীয় সাধনার এক অমূল্য সংহিতা বলিয়াই পাঠ করিবেন, ইহা অনুরোধ। ভারতের সাধনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সহিত পুস্তকের যে বিশেষ ঐক্য আছে, তাহা পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। পুস্তকখানিকে এ পত্রিকাতে প্রকাশ করিবার কথাও একবার হইয়াছিল। ইহার অংশ বিশেষ সময় সময় এখানে প্রকাশ পাইতেও পারে, এজন্য অধিক বিস্তৃত সমালোচনা অনাবশ্যক। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পুস্তক খানি মুখ্যতঃ ভারতবর্ষের 'কাল্‌চার' (culture) লইয়া আলোচনা করিয়াছে; এই culture কথার অনুবাদ এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষাতে নানা প্রকারে হইয়াছে। 'ভারতের সাধনা'তে উহাকে 'সাধনা' নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; অনুবাদক মহাশয় এই 'কালচার' বিষয়ক পুস্তক খানিতে উহার এই পরিভাষা গ্রহণ করিয়া এক বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছেন।

"ভারতের সাধনা" ১ম খণ্ড—১০ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মাসপঞ্জি—কার্ত্তিক, ১৩৪০

ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের প্রথম ও একাধিক বার নির্ব্বাচিত বেসরকারী সভাপতি ভি, জি, পেটেলের দেহত্যাগ ঘটিল (২২।১০।৩৩); তিনি ভিয়েনাতে স্বাস্থ্য লাভার্থ প্রবাসী ছিলেন, রাজনৈতিক আন্দোলন বশে তাঁহাকে বিস্তর রাজনিগ্রহ ভোগকরিতে হয়, তাহাতেই নষ্টস্বাস্থ্য হইয়া ইউরোপ গমন করেন।

ই-আই-রেল পথে মোগল সরাইর নিকট বোম্বাই হইতে আগত কলিকাতার মেল ট্রেণে এক দুর্ঘটনা ঘটে (২৬।১০।৩৩)। একটা মোড় ফিরিতে গিয়া ইঞ্জিন খানি গাড়ী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; ফলে একখানি গাড়ী উল্টাইয়া পড়ে। কয়েকজন লোক আহত হয়।

উত্তর বঙ্গ রেলের শিলি ষ্টেশনে একটী সশস্ত্র ডাকাতি হয় (২৮।১০।৩৩); খাকি পটি ও লাল পাগড়ি পরিয়া বন্দুক ও পিস্তল লইয়া প্রায় ১৫ জন লোক ষ্টেশন আক্রমণ করিয়া ডাকের বেগ ও লোহার সিন্দুক লুটিয়া নিয়া যায়। একজন পিয়ন ও ডাক বাহক গুরুতররূপে আহত হয়; প্রায় ২০ মাইল দূরে ফুলবাড়িয়ার নিকট কয়েকজন বাঙ্গালী যুবককে সন্দেহে ধরা হইয়াছে।

কার্পাস বস্ত্র ও সূত্র ব্যবসায় লইয়া জাপানের সহিত ভারত গভর্ণমেণ্টের একপ্রকার রফা হইয়াছে—জাপান কতক ভারতীয় কার্পাস ক্রয় করিবে, আর কতক বস্ত্র এদেশে চালান করিতে পারিবে। ল্যাঙ্কাসায়ারের দাবী যে তাহার যেন জাপান অপেক্ষা কিছু অল্প শুল্কে ভারতে কাপড় রপ্তানী করিবার অধিকার পায়।

নভেম্বরের শেষ ভাগ হইতে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ মধ্যে বিমানযাত্রার ব্যবস্থা হইবে, মাদ্রাজ 'এয়ার টেক্সী সার্ভিস' ইহার ব্যবস্থা করিতেছে; ১০ ঘণ্টাতে যাত্রা শেষ হইবে, পথে ভিজেগাপাটম ও কটকে অবতরণের ব্যবস্থা থাকিবে।

উড়িষ্যা শাসন বিধি নির্দ্ধারক কমিটি তার তদন্তের রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে ইহাদের মতে কটক উড়িষ্যার রাজধানী হইবে, মহেন্দ্র পর্ব্বত গ্রীষ্মাবাস থাকিবে এবং গোপাল পুরের সমুদ্র সৈকতে একটী সার্কিট হাউস রাখিতে হইবে, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু এত সবের 'মেও' ধরিবে কে!—মধ্য ভারতের দিওয়াজ রাজ স্যর টুকোজে পুয়ার ভারত সরকার হইতে এই চরম পত্র পাইয়াছেন যে সত্বর যেন তিনি রাজ্যে ফিরিয়া আসেন, নচেৎ সরকার তাহার রাজ্যের শাসন ভার-গ্রহণ করিবেন, দিওয়াজরাজ এখন স্বাস্থ্যের নিমিত্ত পন্দীচেরীতে অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্ম বিচ্ছেদের প্রশ্ন জয়েণ্ট কমিটি স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিতে যাইতেছে। ব্রহ্ম হইতে ইহার নূতন প্রতিবাদ উঠিয়াছে, আর অনেকে এজন্য লণ্ডনযাত্রাও করিয়াছেন।

মিঃ চার্চ্চহিল জয়েণ্ট কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে গিয়া বলেন যে ভারত গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টে হস্তান্তরিক বিভাগ গুলিতে কিরূপ কাজ হইতেছে, তাহার পরীক্ষা করা দরকার, আর ফেডারেসনেতে যোগদান করিবার জন্য ভারতীয় রাজন্যবর্গকে যে বাধ্য করা হইতেছে তাহা অন্যায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কমিটি স্থির করিয়াছেন যে ব্যাঙ্ক অংশীদারগণের হওয়াই সঙ্গত; গভর্ণর ও ডেপুটী গভর্ণর গণের মধ্যে অন্ততঃ একজন ভারতবাসী হওয়া চাই; এজন্য কোনও আইন থাকার প্রয়োজন নাই; কমিটির মতে টাকার মান ১ শিলিং ৬ পেন্স থাকা উচিত;—প্রস্তাবিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মৌলিক কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে—সর্ব্বশুদ্ধ পাচকোটী টাকার অংশ ইহাতে থাকিবে, প্রতি অংশের মূল্য৫০০শত টাকা, যদিও অনেকের মত যে প্রতি অংশের মূল্য ১০০ টাকা হওয়া উচিত। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও পক্ষাপক্ষের প্রতিদ্বন্দিতায় শ্রেণীবিশেষের জন্য রক্ষাকবচ রাখিবার কথা এই ব্যাঙ্ক রচনার প্রসঙ্গেও উঠিয়াছে।

কলিকাতায় সনাতনধর্ম্ম মহাসম্মিলন ও আজমীরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন হইয়া গেল।

গুরুবায়ুর মন্দিরদ্বার উদ্‌ঘাটন আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর প্রধান অবলম্বন মিঃ কিলিপন একজন খৃষ্টান পরিণত-বয়স্কা মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, বঙ্গে গান্ধীবাদের প্রধান উপাসক শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত মেথরদিগের সুরাপান বিরুদ্ধে পনরদিন উপবাস প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন; মেথরদিগের উক্তি যে তাহারা যে কার্য্য করে, তাহার জন্যই তাহাদিগকে সুরাপান করিতে হয়।

বৈদেশিক

আফগান রাজ নাদীর শাহ গুপ্ত ঘাতকের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিলেন (৮।১১।৩৩)।

বেলুচিস্থানে সেণ্ডারম্যান দুর্গের নিকট কয়েক শত লোক দল বান্ধিয়া আসিয়া পুলিসের ঘাটি আক্রমণ করে (১৫।১০।৩৩); সরকারের ফৌজ সহ বহুক্ষণ যুদ্ধের পর তাহারা প্রতিহত হইয়া যায়।

শ্যামে বিদ্রোহ এখনও দমিত হয় নাই। ফলে শাসন ও রাজস্ব বিভাগের সঙ্কট অনুভূত হইতেছে। রাজা সিঙ্গেরাতে অবস্থান করিতেছেন। বিরোধী পক্ষে শক্তি হ্রাস হয় নাই। প্যালেষ্টাইনে ইহুদী বিদ্বেষ ভীষণ দাঙ্গাতে পরিণত হইয়াছে; ব্রিটিশ রাজ শক্তির বিরুদ্ধে তাহা প্রসার লাভ করিল, সামরিক শক্তি আত্মরক্ষায় নিয়োজিত হইয়াছে।

ইটালীতে জন্মহ্রাস হইতেছে বলিয়া আতঙ্ক উপস্থিত; ফেসিষ্ট রাজসরকার বিবাহিত দিগকে উৎসাহ দান করিতেছেন; নূতন শিশু জন্মিলে সরকার তাহাকে পোষাকাদি উপহার দান করিতেছে।

ফরাসীর রাষ্ট্র পরিচালক সভার অমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল। নূতন গভর্ণমেণ্টের পর-রাষ্ট্রনীতি পূর্ব্ববৎই থাকিবে। ম. এলবার্ট সেরেও নূতন রাষ্ট্র নায়ক হইলেন। প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ম. পেনলেভীর মৃত্যু ঘটিল।

ব্রিটিশ ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার জারমেনীস্থ সংবাদ দাতা মি নোএল পেণ্টার গুপ্তচর বলিয়া জ্যারম্যান পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত ও অভিযুক্ত। রাজস্ব সচিব মিঃ নেভিল চেম্বারলেন ঘোষণা করিয়াছেন যে, ডিসেম্বরের কীস্তিতে আমেরিকাকে যে সমরঋণ পরিশোধ করিতে হইবে তাহার মধ্যে ৭৫ লক্ষ ডলার দিবার প্রস্তাব হইয়াছে; প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাহাতে সন্তুষ্ট এবং ইংলণ্ডকে ডিফল্টারের লিষ্ট হইতে অব্যাহতি দিতে রাজি। প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডন্যাণ্ড আবার এক নূতন জাতীয় দল গঠনে তৎপর হইয়াছেন; জাতীয়তার নামে সর্ব্বদলের সম্মেলন সঙ্কট কালের তরণী। ব্রিটিশ যুক্ত রাজ্যের সমুদয় ইহুদী লণ্ডনে এক সভায় মিলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে যে যে পর্য্যন্ত জারম্যানিতে ইহুদীরা পূর্ণ সাম্য ও সমসত্ত্ব লাভ না করে সে পর্য্যন্ত তাহারা জারম্যান প্রস্তুত সমুদয় দ্রব্য বর্জ্জন করিবে। আইরিশ রাষ্ট্র পরিষদ্‌ সিদ্ধান্ত করিল যে ব্রিটিশ প্রিভিকৌন্সীলে আপীল প্রথা রদ করিতে হইবে। ভূতপূর্ব্ব জ্যারম্যান সম্রাট হার হিটলারের কার্য্যপ্রণালীতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন; জাতি সঙ্ঘের সঙ্গ ত্যাগে তিনি ততোধিক সুখী এবং এতদিন যে কেন জারমানী উহার সংশ্রব রাখিয়াছিল, তাহাতেই তিনি বিস্মিত; তিনি জারম্যানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, ইহাও বলিয়াছেন। অস্ত্রনিয়ন্ত্রণসভার সভাপতি মিঃ হেণ্ডারসনের পত্র জারম্যান পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। হিটলার বলিতেছেন যে, পর্য্যন্ত জারম্যান অপর শক্তিনিচয়ে সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত না হয় সে পর্য্যন্ত সে কোন সভা সম্মেলনে যোগদান করিবে না, কোন লীগের সংশ্রব রাখিবে না, কোনও সন্ধির সর্ত্তে স্বাক্ষর করিবে না। শূন্য হইতে বোমা নিক্ষেপ অথবা বিষবাষ্প প্রয়োগ হইতে আত্ম রক্ষার নিমিত্ত যদি কোনও ব্যক্তি বা কারখান আত্মরক্ষার উপায় করে তবে তাহাকে আয় কর দিতে হইবে না। এরূপ আত্মরক্ষার উপায়ে উৎসাহ দান কিন্তু ভার্সেলিস্ সন্ধি সর্ত্তের বিরুদ্ধ। জারম্যান বাঙ্ক গুলি কানুন দ্বারা রাজসরকার আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। সভিয়েট রুশ যে সকল জারম্যানকে ইঞ্জিনিয়ার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহাদিগকে বিদায় দিয়া তৎস্থলে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার দিগকে নিযুক্ত করিতেছেন। নির্ব্বাচনে হার হিটলা ও তাহার নাজিদল পুনঃ বিজয় লাভ করিলেন। আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে কৃষাণ বিদ্রোহের সূচনা হইতেছে, তাহা রাষ্ট্রনায়ক রুজভেল্টের রিকভারী নীতির বিফলতার নিদর্শন। অষ্ট্রিয়াতে নাজি প্রচেষ্টার বিরাম নাই, কিন্তু সর্ব্বত্রই উহা দমিত হইতেছে। সাইবিরিয়া প্রান্তর ভূমির দিকে জাপানী রাষ্ট্র পরিচালক দিগের তীব্র নজর রহিয়াছে বলিয়া রুশ সোভিয়েট সতর্ক হইতেছে—ইটালীতে সামাজিক আইন প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনা চলিতেছে—তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু দর্শন পড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

পঞ্চম বর্ষ] অগ্রহায়ণ—১৩৪০ [২য় সংখ্যা

সাধনার পথে

সকল দিকেই এক ক্রান্তির বাতাস বহিয়া চলিয়াছে—পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া, স্থিতিশীলকে অস্থিতিতে পরিণত করিয়া, সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া, রাষ্ট্রশক্তিকে উপেক্ষা করিয়া, শান্তিশৃঙ্খলাতে উচ্ছৃঙ্খলতা আনিয়া, জীবনে কামনার আগুন জ্বালাইয়া এই অভিযান।

প্রত্যভিযান

বলিবে—এই উন্নতির যাত্রা। জগত উন্নতির দিকে চলিয়াছে; আমার প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা, মানসিক গতি—এ সমুদায়ই সে উন্নতির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া চলিয়াছে। সাহিত্য কলা বিজ্ঞান ও লোকের মধ্যে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মেলামেশা—এ সমুদায়ইত এখন এক প্রকর্ষের স্তরে; ইহাতে চারিদিকে লোকের মনোবৃত্তিতে যে এক উল্লাসের চিহ্ন দেখা দিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? ইহারা মনে করে এ উন্নতি—এ উল্লাস জগতের অন্তর্নিহিত চরমনীতিরই প্রকাশ। ইহাদের ছাড়া আর কিছু নাই। ভারত আজ ইহাদের সংস্রবে আসিয়া আপন ইতিহাসে এক নূতন যুগ সৃষ্টি করিতে যাইতেছে—'ভারতের কৃষ্টি এক নব কলেবর ধারণ করিতেছে'। ইহার অনুকূল চেষ্টাই একালে সর্ব্বত্র চলিতেছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে রব উঠিয়াছে—কালের গতিই সেই উন্নতির দিকে; সর্ব্বত্র সকলে উন্নতির পথ ধরিয়া চলিয়াছে—ভারতকেও তাহাই করিতে হইবে! এ প্রগতির পথ এড়াইয়া চলে এমন সাধ্য তার কি আছে? উন্নতি, উৎকর্ষ, প্রগতি—সকলে ইহার তালে পা ফেলিয়া চল!

বাস্তবিক এ উন্নতিপথের যাহারা অগ্রদূত তাহারাই নাকি আজ ইহার পরিণাম দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে! এ সভ্যতা আপন হনন-ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়াছে! সমাজ বিশৃঙ্খল, রাষ্ট্রে বিপ্লব, ধর্ম্ম বিসার্জ্জিত, নীতি কদাকারপ্রাপ্ত—ইহাতেই উল্লাস, তাহাই উন্নতির গতি! শুধু ইহাই নহে—জ্ঞানে ও বিচারবুদ্ধিতে চরম সাম্য আর ধন ও জীবনোপায়ে ঘোর অসাম্য—সমাজনীতির এই বিপরীত ভাব আজ সকল দেশের রাষ্ট্র ও সমাজকে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। ফলে, ধনহীনের যে অভাব বিত্তবানের দৈন্য তাহাকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, খাদ্যের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও বুভুক্ষুর দল

দেশে দেশে অতিমাত্রায় বাড়িয়া চলিয়াছে, পণ্যে বন্দর ও বাজার ছাইয়া গিয়াছে তবু ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ। রাষ্ট্রশক্তি নানা কৃত্রিম উপায়ে ধন, শিল্প ও সমাজ রক্ষার জন্য অতিমাত্র ব্যতিব্যস্ত তবু সর্ব্বত্র অন্তর্বিপ্লবের প্লাবন উঠিয়াছে! মানবজগৎ ধ্বংস পাইতে বসিয়াছে বলিয়াই আজ অনেকের মনীষা আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে—আত্মকৃত ব্যাধিতে পাশ্চাত্য-পরিচালিত মানব আজ মরণের পথের যাত্রী ("Humanity is half crushed by the weight of progress it has made".—Burgson) পাশ্চাত্যের প্রধান সম্বল—জড়বিজ্ঞান ও যন্ত্রবল যাহাতে সে সমুদয় জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে, আর যাহা অদ্যকার এই সমুদয় উন্নতির মাপকাঠি নির্দ্দেশ করে, তাহা হিংসা ও বিবাদ এবং জিঘাংসার সাধন, কলঙ্কের আধার ও হীন দুর্ব্বলতার আশ্রয়! উত্তরোত্তর ইহার উন্মাদনায় লোকে অধীর হইয়াই চলিয়াছে, দুই চার জন ভাবুকের কথা কে শুনে?

ভারতের সভ্যতা বা সাধনার (culture) নিকট এই অভিযান, উন্মাদনা বা প্লাবন-গতির গুরুত্ব অত্যধিক—ভারত আজ অসারেই ইহার আধিপত্য মানিয়া লইয়াছে বটে—আপন শিক্ষা সমাজ রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম ইহার পায়ে সঁপিয়া দিতে বসিয়াছে! কিন্তু ভারতের অন্তরাত্মা জানে ইহা তাহার পক্ষে একটী বাহিরের জঞ্জালমাত্র—বাত্যাবিতাড়িত ধূলিনিক্ষেপ! সে একবার আপন অঙ্গ সঞ্চালন করিলেই উহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। যুগে যুগে সে ঐরূপ হইয়াছে—তার চির শাশ্বত রূপে অবস্থিতি লইয়াছে। আর সকল লোক যেমন উহাতেই গঠিত—উহাতেই তাহাদের স্থিতি ও অস্তিত্ব, ভারত সেরূপ নয়। সে উহাদ্বারা অভিভূত হইলেও অবিকৃত হয় নাই, হইতে পারে না। ভারতের অন্তর্দৃষ্টি উহার স্বরূপ বোধ করাইয়া দেয়, ভারতের সাধনা উহার প্রতিরোধ করিয়াছে, আজও করিতে চাহে। একমাত্র ভারতই তাহা করিতে সক্ষম। যাঁহাদিগের সত্য-দর্শন ভারতকে যুগে যুগে এরূপ বহু বিপদ্পাত হইতে রক্ষা করিয়া নব নব রূপে সাধনার পুণ্য-প্রভায় অভিসিঞ্চিত করিয়া অনুপম সম্পদের অধিকারী করিয়া গিয়াছে, সে তত্ত্বদর্শী ঋষিদিগের চিরসঞ্চিত সাধনাশক্তিবলেই ভারত সঞ্জীবিত রহিয়াছে ও এরূপ অনেক জঞ্জাল অপসারিত করিয়া চলিয়াছে। হয়ত আরও বহুক্ষণ এই ক্লেদকালিমা ভারতকে অভিভূত করিয়া রাখিবে—এ ধ্বংস-লীলার বিক্ষেপ আরও বহুদিন দেখিতে হইবে—কিন্তু প্রতিপদে ইহার গতি ও প্রকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া, এবং আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল ও আপন সাধনার গভীর তত্ত্ববোধে স্থিরধী বা প্রকৃত আস্তিক্য-বোধে বলীয়ান হইয়া এই পাপ অভিযানের প্রতিরোধ এখন হইতেই করিতে হইবে আপন শিক্ষা, সমাজ ও জীবনযাত্রা হইতে ইহার পাপ সংস্পর্শ বর্জ্জন এখনই করিতে হইবে, এবং অতি সহজেই তাহা হইতে পারে।

আধুনিকের গর্ব্ব—

বর্ত্তমান যুগ এক উন্নতির সময় একথা অনেকেই বলিয়া থাকেন—একালকে সেকাল অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় বলিয়াই ইহারা মনে করেন। ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ বলিয়াই ইহারা তাহার কতকগুলি কারণ প্রদর্শন করেন; সাধারণতঃ ইহাদের এ প্রমাণ লোকে অকাট্য বলিয়াই মনে করিয়া থাকেন—(১) একালে যেমন চলা চলতি ও গমনাগমনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তেমন সেকালে ছিল কি? এখন যেমন একই দেশের বিভিন্ন লোকের মধ্যে মেলামেশা সম্ভবপর হইয়াছে,

এক একটী দেশের মধ্যে একতার সৃষ্টি হইয়া সমুদয় দেশে বা এক একটী জাতির মধ্যে ঐক্যবন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেকালে অবশ্যই তাহা সম্ভবপর ছিল না। (২) লোকের জীবন ও সম্পদ রক্ষার উপায় এখন যেমন হইয়াছে—আইন কানুনের প্রচলন হইয়াছে, এমন তো সেকালে ছিল না; আমাদের পিতৃপুরুষগণ অবশ্যই সর্ব্বদা ধনপ্রাণ লইয়া শশব্যস্ত থাকিতেন। দেশের লোক চোর ডাকাতের ভয়ে সর্ব্বদাই জড়সড় হইয়া থাকিত। অন্য দেশে যেমন ছিল ভারতবর্ষে ততোধিক—ঠগী, পিণ্ডারীর বিবরণ ভারতের ইতিহাসে বহুল রূপেই কথিত আছে। (৩) তৃতীয় কথা, এক্ষণে সর্ব্বসাধারণ লোকে দেশের রাষ্ট্রপরিচালনার অধিকার লাভ করিয়াছে, পূর্ব্বে ইহারা রাজা বা শাসনকর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছানুরূপ শাসনবিধানের অধীনে একান্ত অধীন ভাবেই বাস করিত, এক্ষণে শাসনপদ্ধতি ইহাদের সকলের জনমত দ্বারা পরিচালিত হয়—সকলেরই franchise বা একটা মুক্ত আধিপত্য শাসনপদ্ধতির উপর আছে।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এ সকল কথাই ঠিক। কিন্তু এই কালের এ সমুদয় সুযোগ সুবিধার অন্তরালে যে সকল অবাঞ্ছনীয় বিষয়ের সমাবেশ রহিয়াছে, আর ইতঃপূর্ব্বের নানা উদ্বেগ ও অসুবিধার মধ্যে যে সকল বাঞ্ছনীয় ব্যাপার ছিল, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই ধরিতে পারা যায়। চলাচলতির ব্যবস্থায় একালে অনেক উন্নতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু সমগ্র মানবজাতির কয় জন সে সুবিধা ভোগ করিতে পারে? আর যাহারা পারে তাহারা কি এই সুযোগের দ্বারা অপর বহু লোকের দৈন্য, দাসত্ব ও দুর্দ্দশা আরও অধিক আনয়ন করে নাই? রেল, ষ্টিমার ও বিমানপোত—এপর্য্যন্ত ইহাদের দ্বারা যে সকল কার্য্য সাধিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে লোকের শাসন, শোষণ, সমরায়োজন, অলক্ষ্যে হত্যা ও ধ্বংসের কার্য্য যতখানি হইয়াছে, সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল তাহার মধ্যে কতখানি স্থান অধিকার করিতে পারে? যে লক্ষ্যে ইহাদের উন্নতি ও বিস্তার সাধন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহাতে তো ধ্বংস ও বিনাশই প্রধান। একালের এ সকল চলাচলতির কৃত্রিম ব্যবস্থাতে লোকে প্রকৃতির সুখসংস্পর্শ হারাইয়া শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক যে সকল অমূল্য সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার কথা আর এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় কথা ধনপ্রাণ পূর্ব্বপুরুষেরা নাকি নিরাপদে ইহা লইয়া বাস করিতে পারিতেন না। এক্ষণেই লোকে তাহা পারিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বিবিধ স্তরের আইন আদালত প্রতিষ্ঠিত আছে, শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ প্রহরী ও সেনাসন্নিবেশের উত্তম ব্যবস্থা আছে; কিন্তু ইহার মধ্যেই যে কৃত্রিমতার প্রভাব বাড়িয়াছে—বর্ত্তমান শিক্ষা ও বিচার-ব্যবস্থাদিতে কেবলমাত্র আইনকানুনের নীতি ব্যতীত আর কোন উচ্চ মানবনীতি—সদভিপ্রায়, প্রীতি ও মৈত্রীর ভাব—না থাকাতে লোকের মধ্যে যে বিদ্বেষ ও বিরোধের ভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে পরস্পরের হিংসার বৃদ্ধি ও ধনক্ষয় উভয়ই হইয়া আসিতেছে; তাই সেদিন পঞ্জাবের একজন ইংরেজ জমিদার এদেশের কৃষকদিগের দুরবস্থার কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে,—এদেশের বর্ত্তমান প্রবর্ত্তিত বিচারপদ্ধতিই ইহাদিগের এই শোচনীয় দুর্দ্দশার কারণ। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান সময়ে লোকের অর্থহরণের নিমিত্ত চোর ডাকাত অপেক্ষাও সাংঘাতিক নানা অপরোক্ষ কারণ বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত চুরি ডাকাতি দ্বারা লোকের মধ্যে পূর্ব্বে যে আতঙ্ক হইত, এক্ষণ যে তাহা হইতে ইহারা সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইয়াছে

তাহা নহে। রাজ্যশাসন, সাম্প্রদায়িক বিরোধ প্রভৃতি কারণে যে কোনও সময়েই লোকের ধনপ্রাণ আতঙ্কের বিষয়ীভূত হইয়া যে পড়িতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত অহরহ ঘটিতেছে। পূর্ব্বেকার চুরি ডাকাতির মধ্যেও লোকের আত্মরক্ষার নানা উপায় ও সামর্থ্য ছিল ; এবং অনেক স্থলে ঐরূপ চুরি ডাকাতি লোকের মধ্যে ঐরূপ শক্তি ও মানবোচিত নানা সদ্‌গুণের প্রসার বৃদ্ধি করিত ; আজ সকলকে অতি হীন ও নিঃসম্বল ভাবেই ধনপ্রাণে বঞ্চিত হইতে হইতেছে। আধুনিকের তৃতীয় গৌরবের কারণ রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিকতা। কিন্তু ইহাতেও লোকের দৃষ্টি খুলিবার জন্য বিবিধ রাষ্ট্রবিকার দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান এই গণতন্ত্রে যে প্রজাস্বাতন্ত্র্য নামে মাত্র, কার্য্যতঃ কতিপয় ব্যক্তি মাত্র দলপতিত্বের ছুতা ধরিয়া, ছলে বলে কৌশলে সাধারণ জনসত্তার মন ভুলাইয়া আপনারাই সমুদয় ক্ষমতা পরিচালনা করে, তাহা হাতেহাতেই ধরা পড়িতেছে—অধিকন্তু রাজভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মহান্ মানবোচিত সদ্‌গুণাবলী হইতে রাষ্ট্র এখন বঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে। আর এই গণতান্ত্রিকতার প্রভাব বলেই প্রায় সকল রাষ্ট্র হইতে ধর্ম্ম বিসর্জ্জিত হইয়াছে।

শিক্ষায় সরকারী নজর।—

বঙ্গের গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন দেশের সংস্কার কার্য্যে কিছু করিতে চাহেন। উপস্থিত শিক্ষার ব্যবস্থা ও অবস্থাতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন—দেশের লোকেরাও নহে। চাই শিক্ষা সমস্যার সমাধান—শিক্ষার সংস্কার। এই শিক্ষা সমস্যাতে সরকারের সংস্কার-চেষ্টা আজ নূতন কিছু নহে। লর্ডকার্জ্জনের মত সংস্কারকামী ও বহুদিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন রাজপ্রতিনিধি সর্ব্বাগ্রে এই শিক্ষাসংস্কারেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি এক শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। লোকে জানে উচ্চশিক্ষার সংস্কারসাধন তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। বঙ্গে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তির প্রভাবে সে কমিশনের যে প্রকার পরিণতি ঘটিয়াছিল, তাহাতে উহা দ্বারা উচ্চ শিক্ষার উচ্ছেদসাধন না হইয়া তাহার প্রসারসাধনই হইয়া আসিতেছিল। পরে আবার বিশেষ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপলক্ষ্য করিয়া আর এক কমিশন (স্যাডলার কমিশন) বহু ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ; তাহার আয়োজন, প্রসার ও বিপুলায়তন কার্য্যবিবরণী এখন অতীতের গর্ভে ডুবিয়া রহিয়াছে ! অর্থাভাবে উহার কার্য্য কিছু ফলবতী হইতেছে না বলিয়া মধ্যে সরকারের আক্ষেপ মাত্র শুনা যায়। স্যারজন এণ্ডারসন বর্ত্তমান এদেশের নানা জটিল রাষ্ট্রিক সমস্যার মধ্যে বিশেষরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াই বঙ্গের রাষ্ট্রকর্ণধার হইয়া আসিয়াছেন বলিয়া প্রথম হইতেই প্রকাশ —এবং অনেক ক্ষেত্রেই সে বিষয়ে তাহার কার্য্যকুশলতা ও ধীর নীতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শিক্ষার গুরুতর সমস্যা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই—ইতি পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সভাতে তিনি যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও শিক্ষাসংস্কারের আভাস পাওয়া গিয়াছিল— বোধ হয় তিনি পরীক্ষাপ্রথার পরিবর্ত্তন, পাঠ্যতালিকার পুনর্গঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলির সংস্কার, শিল্প ও বাণিজ্যাদির ক্রিয়াত্মক শিক্ষা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক অনেক বিষয়েই অভাবে বোধ করিয়া থাকেন।

এইবার দার্জ্জিলিং শৈলাবাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই গভর্ণর বাহাদুর আপন প্রাসাদে এক শিক্ষাসম্মিলন আহ্বান করেন। তথায় ২।৩ দিন ধরিয়া নানা বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। সম্মিলনের উপস্থিত কার্য্য দেখিয়া উহার বিষয়ে উচ্চ ধারণা কিছু পোষণ করা যায় না—কোনও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাব ইহাতে পরিলক্ষিত হয় নাই, তেমন কোন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্নের প্রভাবও ইহার উপরে

পড়ে নাই; অনেক অবান্তর কথারই অবতারণা হইয়াছিল। এ সকল উপলক্ষ করিয়া সরকার কোনও স্থিরীকৃত নীতিই ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য্যে পরিণত করিতে যাইতেছেন কি না, তাহা বুঝা যায় না। কার্জ্জন কমিশন ও স্যাডলার কমিশন অতি বিস্তারিত আয়োজনে যাহা করিয়া উঠিতে পারে নাই, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক্ষণে এমন হয়ত বদল হইয়া গিয়াছে, যাহাতে এই অল্পকালব্যাপী একটী মাত্র সম্মিলনের বলে তাহা সহজেই হইয়া যাইবে।

বাস্তবিক শিক্ষার সংস্কার কামনা ও তাহার আবশ্যকতার বোধ অথবা তাহার সমাধানের প্রয়োজনীয়তাই একমাত্র কথা নহে। কেমন করিয়া, কি উপায়ে এবং কি উদ্দেশ্যে সেই সংস্কার করিতে হইবে, তাহাই প্রধান কথা। এদেশে সংস্কারের এই সকল প্রচেষ্টাকে লোকে বড় সুনজরে দেখিতে পারে না। সাধারণতঃ সকলে ইহাতে উচ্চ শিক্ষার সঙ্কোচসাধন হইল বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করে। কিন্তু তাহাতে লোকের বা সরকারের কি লাভ বা লোকসান আছে, তাহা কেহ তলাইয়া দেখে না—মূল শিক্ষানীতিতে যদি কোনও দোষ থাকে তবে তাহার সঙ্কোচ সাধন হইলে দোষ বা ক্ষতি কি হইতে পারে? মোটামোটি কয়েকটী বিষয় লইয়া মাত্র ইহার বিচার হইতে পারে—বস্তুবিক শিক্ষাসমস্যা লইয়া যাহারা কথাবার্ত্তা কহেন, অথবা যাহারা এই ভাবে শিক্ষাসংস্কার করিতে চাহেন, তাঁহাদের ছাড়াও আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদিগের স্বার্থ ও শুভাশুভ এই শিক্ষাসমস্যায় অধিকতর বিজড়িত। দেশের লোকের প্রকৃত অভাব ও দেশ প্রকৃতির অবস্থার বিচারে, নিরপেক্ষ ভাবে শিক্ষার সংস্কার করিতে গেলেই ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কিছু থাকে না। অন্যথা উহা কেবল একদেশদর্শীর ক্ষণিক প্রয়োজনসিদ্ধির দৃষ্টিতে শিক্ষাপ্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন মাত্র সাধিত হইতে পারে। প্রকৃত শিক্ষার উৎকর্ষই যদি শিক্ষা পদ্ধতিরর লক্ষ্য হয়, তবে দেশের প্রকৃতি ও সংস্কার, জাতির সাধনা, লোকের জাগ্রতি ও আকাঙ্ক্ষা এবং বর্ত্তমান সময়ের সাধারণ প্রয়োজন ও দেশবাসীর অভাব—এ সমুদয়ের সম্যক লক্ষ্য করিয়া—শিক্ষাকে কেবল শিক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া—অন্য কোনও রাজনৈতিক বা সম্প্রদায়গত উচ্চ নীচ বা আভিজাত্যের গণ্ডীরেখা হইতে উহাকে মুক্ত রাখিয়া—নিরপেক্ষ ও প্রকৃত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির উপরে উহার ভার অর্পণ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে শিক্ষার যে উন্নতি লাভ হইবে, তাহাতে রাজা ও প্রজা উভয়েই তুল্যরূপ সুফলভোগী হইতে পারিবে।

বঙ্গের হিন্দু।—

বঙ্গের হিন্দুরা নানা কারণে বিপদ গণিতেছে। বিশেষ উচ্চ শ্রেণী হিন্দুরা নানারূপে বিব্রত হইয়া পড়িতেছে। বিগত কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা তাহাদিগের উপর দিয়া যেরূপ বহিয়া গিয়াছে, এমন আর কাহারও উপর দিয়া যায় নাই। সুশিক্ষা ও বুদ্ধি বলে, দেশহিতৈষণা ও ত্যাগ-শক্তি, অর্থবল ও কর্ম্মপ্রবণতা—এ সকল কারণেই ইহারা একালের ভারতবাসীর অগ্রণী হইয়া চলিয়াছিল—রাষ্ট্রের শাসন ও বিচার বিভাগে ইহারা বিশেষ পদবীও অধিকারও লাভ করিয়া আসিয়াছিল—রাজশক্তি যে তাহাতে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার কথা নহে। সম্প্রতি নানা কারণে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে যাইতেছে। হোয়াইট পেপার যে শাসন পদ্ধতির দিগনির্ণয় করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের অবস্থা যে অতিশ হেয় হইয়া পড়িবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে বলিবেন বর্ত্তমান গণতান্ত্রিকতার যুগে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটা

অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া পরিবর্ত্তনের সমর্থন করা হয়, সে গণতন্ত্র এদেশে সংস্থাপিত হইবে কি না বা হইতে পারে কি না, তাহাই বিবেচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সকল অবস্থার বিবেচনায় এই কথাই বলিতে হইবে যে, বঙ্গের হিন্দুদিগের উন্নতিই এই ভাবী অবনতির কারণ। এ উন্নতি বা অবনতি কোনটাই তাহার প্রকৃত স্বভাবেসম্ভব নহে—বাহ্যিক অবস্থার সৃজন মাত্র। গুণজ উৎকর্ষের উন্নতি বা অবনতি অপরের সাধ্যায়ত্ত নহে।

নীলনাগিনী।—

নীলনাগিনী মহাত্মা গান্ধীর বিদেশীয়া শিষ্যা—মার্কিন-বাসিনী। জন্মগত সংস্কারে সর্পক্রীড়ায় পারদর্শিনী বলিয়া প্রথমে তাহার খ্যাতি রটে; বিজাতীয় ও বিদেশীয় চমকে অভিভূত হইতে ভারতবাসী একালে অতিমাত্র অভ্যস্ত; বিশেষ ওই মহাত্মা গান্ধীর জগতব্যাপী নামে উহার এক উপরক্ষেত্র ভারতে এখন প্রস্তুত। অনেক বিদেশী বিদেশিনীর চরিত্র-বৈচিত্র্য—যাহা তাহাদের নিজ নিজ দেশে স্থান পায় নাই—তাহাই এক্ষণে এদেশে আসিয়া মহিমার শিখরে উঠিয়াছে। অচিরে এই বেদেনী ভারতে আসিয়া ভারতের বর্ত্তমান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিশীল ও কর্ম্মিমণ্ডলে যোগদান করতঃ নীল-নাগিনী (সর্পিনী) 'দেবী' বলিয়া পূজিত হইল—মহাত্মার আশ্রমে আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাইল। তাহার গুণ গরিমা ও ভারতের ভাগ্য ইহা হইতে নূতন করিয়া সূচিত হইতে গেল! সংবাদপত্র তাহার বিবরণে পরিপূরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু শীঘ্রই নাগিনীর পূতিগন্ধময় দুষ্কার্য্যাবলী আশ্রমের বায়ুমণ্ডল দূষিত করিয়া ফেলিল। অগত্যা মহাত্মা তাহার চরিত্র বিশোধনের জন্য নিজ অমোঘ অস্ত্র উপবাস ব্রত গ্রহণ করিলেন। তাহাতে দেশ-বিদেশ আর একবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কিন্তু নীলার চরিত্রলীলা আরও বিকট হইয়া উঠিল। সে এক্ষণে প্রকাশ্যভাবে নিজ প্রকৃতিসুলভ ব্যভিচারধর্ম্ম সহরে সহরে ও রাস্তায় রাস্তায় প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সেদিন এলাহাবাদ হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমন কালে আমাদের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ষ্টেশনে তাঁহার প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর এক প্রকোষ্ঠের সম্মুখে ভিড় দেখিয়া অনুসন্ধানে জানিলেন, বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের উপস্থিত পর্য্যায়ের প্রধান নায়িকা 'নীলনাগিনী দেবী' উহার ভিতরে। গাড়ীর জানালা দরজা বন্ধ করিয়া সে ভিতরে বসিয়াছিল;—টিকেট দেখাইবে না! পার্শ্ববর্ত্তী গাড়ী হইতে শুনা গেল—তাহার ভাষাতে সে ক্রমশঃ বিকট চীৎকার করিয়া বলিতেছিল—"আমি উঠিতে পারব না, আমি রাত্রির পোষাকে আছি—আমি নগ্ন—দূর হও এখান হইতে—যাও নরকে।" এই অভিনয় পরবর্ত্তী মীর্জ্জাপুর, মোগল সরাই, আসানসল, বর্দ্ধমান প্রভৃতি বড় বড় সকল ষ্টেশনে হইল—হাওরা ষ্টেশনে গাড়ী আসিতেই সে চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া প্লেটফর্ম্মের বাহিরে যাইতেছিল—কিন্তু টিকেট কলেক্টাররা বাহির হইবার দরজা বন্ধ করিয়া দিল, পুলিশ সাজেণ্ট নিতান্ত সম্ভ্রমশূন্য হইয়াই উহাকে ধরিয়া লইয়া গেল!

এই মহিলাই উপস্থিত রাষ্ট্রিক আন্দোলনে আসিয়া পতিত ভারতের উদ্ধার সাধনের প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া বসিয়াছিল!

আফগান কথা।—

আফগানিস্থান ও ভারতের সম্বন্ধ-নৈকট্য বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে একান্তই লুক্কাইত। ভৌগোলিক দৃষ্টিতে আফগান উপত্যকা হিমালয়ের ন্যায়ই ভারতের সীমান্ত-প্রাকার এবং উহার

অনেক অংশ ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত থাকাই সঙ্গত—হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত প্রদেশ সমূহ স্বভাবতঃ ভারতের অন্তর্গত। আজ যদি কোনও বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে সমুদয় এশিয়া খণ্ডের নূতন স্বভাবানুগ রাজ্য-বিভাগ ঘটে, তবে সমুদয় আফগান উপত্যকা না হইলেও হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত ভূভাগ ভারত সীমার অন্তর্গত হইবে। সামাজিক বা লোকের পারস্পরিক প্রভাবপ্রতিপত্তির দৃষ্টিতেও ভারত ও আফগানের সম্বন্ধ চিরন্তন কাল চলিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান সময় বৃটিশের প্রবল প্রতাপে সে ধারণাও লোকের হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে ; একটু কারণান্তর ঘটিলেই যে আফগান হইতে ভারতে নূতন নূতন বিপদ্‌পাত পুনরায় ঘটিতে পারে, তাহা ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক অবস্থা হইতেই কতকটা অনুমান করা যায়।

অতি প্রাচীন কালে ভারত ও আফগানের সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ ছিল। বর্ত্তমান আফগানের ইতিহাস ও ভাবপরম্পরায় যে কথা আজ সকলে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেও ভারতের পুরাবৃত্ত আজিও তাহার নিদর্শন বহন করিতেছে—হিন্দুর 'গান্ধার' পরবর্ত্তী গ্রীক অধিকারের অপ-ভ্রংশীয় নামেও আফগানিস্থানে আরোপিত হইয়াছিল। আর্য্য সভ্যতার শিশুশয্যা এই উপত্যকা বক্ষে রচিত না হইয়া থাকিলেও উহার উপকণ্ঠে যে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের বহু কীর্ত্তিচিহ্ন আফগানিস্থানের পর্ব্বতগহ্বর ও মৃৎগর্ভে এক্ষণে প্রত্ন-তাত্ত্বিকের কৌতূহল আকর্ষণ করিতেছে। তৎপর বহু যুগ ধরিয়া বিপুল বিবর্ত্তন আফ-গানের বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। গ্রীক, পারশিক, সিদীয়, শক্ প্রভৃতি বিবিধ জাতি আক্রমণের ঘূর্ণাবর্ত্ত উহার বক্ষে ছড়াইয়া চলিয়াছিল। হিউএনসং বর্ণিত কুশনরাজগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বহুকাল পর্য্যন্ত এস্থানেরাজত্ব করিয়াছিলেন; ইহাদের শেষ রাজগণ তুর্কীশাহ নামে অভিহিত হইতেন। তৎপর হিন্দুশাহ বংশীয় হিন্দুরাজগণ দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত আফগান ভূমের অধীশ্বর ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ঐ সময়ের পর হইতে আফগানিস্থানে যে বিপ্লব উপস্থিত হইল, তাহার বেগ আজও উপশম হইয়াছে বলা যায় না—ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ বিজয়ের কীর্ত্তিসমূহ ধ্বংস করিয়া, হিন্দুও ইরাণের ন্যায়ই অতি প্রাচীন এক জাতীকে নির্ম্মূল করিয়া, নবোদিত মুসলীম্ ধর্ম্মের প্রেরণায় ধ্বংস এ উৎপীড়নের প্রবাহ আফগান ইতিহাসকে যে রক্তরঞ্জিত করিয়াছে তাহারই বেগ আজিও শান্ত হয় নাই। তৎপর আফগানের দুদ্ধর্ষ প্রকৃতি ভারতকেও উৎপীড়ন করিয়াছে,—দাসত্বের প্রথম শৃঙ্খল পরাইয়াছে, যুগে যুগে ভারতের ভীতি সঞ্চার করিয়াছে, আজ ব্রিটিশ শক্তিকেও তাহাতে উদ্‌ব্যস্ত থাকিতে হয়। আফগান ব্যতীত আরও অনেক প্রকার পার্ব্বত্য জাতি এবং আফগান দিগেরও বিভিন্ন বংশের মধ্যে ও বিবাদ লাগিয়াই আছে। উজবেগ, কাফীর প্রভৃতি জাতির বিদ্রোহ ও অত্যাচারের কাহিনী মধ্যে মধ্যে শুনা গিয়া থাকে। কাবুলের সিংহাসন লইয়া কত রক্তপাত, হত্যাকাণ্ড, নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা ঘটিয়াছে, তাহার নিদর্শন এখনও চলিয়া যায় নাই। ক্রমাগত বিপ্লব ও রাষ্ট্র বিপর্য্যয়ের জন্য আফগান রাজ্য কোনও সংহত-শক্তি বা সংবদ্ধ রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা হইয়া উঠে নাই—কাবুল, কান্দাহার ও গজনীকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন রাজ্যের বৃত্তান্ত ইতিহাসে বর্ণিত আছে। এক সময় কাবুল দিল্লীর মোগল বাদশাহ দিগের সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল।

ভারতের ইতিহাসের সহিত মুসলীম আফগানিস্থানের সম্বন্ধ ভারতের পক্ষে মর্ম্মন্তুদ। গজনীর মামুদ কর্ত্তৃক লুণ্ঠনলীলা একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কাহিনী ; তৎপর ঘোর রাজ্যের

প্রতিষ্ঠা। ইহাদের প্রভাব-পরিণাম একমাত্র ভারতেই রহিয়া গিয়াছে; ধ্বংসের প্রতিমূর্ত্তি চঙ্গিশ খাঁর পরিচালিত মোগল অভিযানে আফগানিস্থান হইতে ইহাদের সমুদয় চিহ্নই বিলুপ্ত হইয়া যায়; তৎপর তৈমুরলঙ্গের আবির্ভাব; ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাহার বংশধর বাবর শাহ কর্ত্তৃক দীল্লির সিংহাসন অধিকৃত হয়, তদবধি কাবুলের সহিত ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পারস্ত সম্রাট নাদীর শাহ আফগান রাজ্য জয় ও মোগল প্রতাপের বিলোপ সাধন করেন। ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে আহম্মদ খাঁ নাদীর শাহকে হত্যা করিয়া আফগানিস্থানে একছত্র ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি আফগানিস্থানে এক নবযুগের সূচনা হয়। মোগল শক্তির অবসানে মহারাষ্ট্র শক্তির অভ্যুত্থানে শঙ্কিত হইয়া রোহিলখণ্ডের ভারতপ্রবাসী আফগানেরা এই আহম্মদ শাহকে ভারতে আহ্বান করেন এবং পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১ খৃঃ) উদীয়মান হিন্দু শক্তির অভ্যুত্থান আশা তিরোহিত হয়। কিন্তু অচিরে আহম্মদের মৃত্যুর পর আফগান রাজ্যে বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হয়। শীঘ্রই পূর্ব্ব ভারতে ব্রিটিশ শক্তি ও পঞ্জাবে শিখ জাতির আবির্ভাব হইল। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের প্রভাবে আফগানগণ দীর্ঘকাল নিরস্ত থাকিয়া ভারতে ব্রিটিশ শক্তির সমৃদ্ধির পক্ষে সহায়তাই করিয়াছিল। তখন প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ভারতে ফরাসী, ইংরেজ, মারহাটা ও রোহিলা প্রভৃতি আফগানদিগের মধ্যে ভারতের প্রভুত্ব লইয়া যে সংগ্রাম চলে তাহাতে অবশেষে ইংরেজ মহারাষ্ট্র শক্তিকে পরাভূত করিয়া ভারতে প্রধান ক্ষমতা লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গেইআফগানিস্থানে নানা বিপ্লব ও বিশৃঙ্খলার পর আহম্মদ খাঁর বংশধর সা সুজা কাবুলের সিংহাসন অধিকার করেন। তদবধি (১৮০৩ হইতে) সা সুজার হত্যা (১৮৪২) পর্য্যন্ত আফগান ইতিহাস ভয়াবহ ও রক্তরঞ্জিত হত্যা, প্রতারণা, বিদ্রোহ ও অন্তর্বিপ্লবের অবিচ্ছিন্ন বিবরণ। রুশ ব্রিটিশের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধও আফগানের এই সময়ে ঘটে। অতঃপর ব্রিটিশের আনুকূল্যে মহম্মদ দোস্তখাঁ আফগান রাজ্যে সুদীর্ঘ বিশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। তৎপর আর এক বিদ্রোহ পাঁচ বৎসরব্যাপী সংগ্রামের পর সের আলী সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার না করাতে যুদ্ধে পরাস্ত হন, আর মহম্মদ দোস্তের পৌত্র আবদার রহমান রাজা হইয়া কৌশলে সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৯০১ খৃঃ অব্দে তৎপুত্র হবিবুল্লা সিংহাসন আরোহন করেন কিন্তু ১৯১৯ অব্দে আততায়ীর হস্তে তাঁহার প্রাণনাশ ঘটে। তখন তাঁহার ভ্রাতা নসরুল্লা ছয় দিনের জন্য সিংহাসন ভোগ করেন; ভ্রাতুষ্পুত্র আমানুল্লা সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া রাজ্যে প্রাচ্য ভাবের নানা সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া রাজ্য ছাড়িয়া ইউরোপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিন দিনের জন্য তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইনায়েতুল্লা আমীর হন। কিন্তু বাচ্চাসাঁকো নামে এক অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তি হঠাৎ সামরিক বল অধিকার করিয়া কয়েক মাস রাজত্ব করিতে থাকেন। তৎপর আমানুল্লার অমাত্য ও সেনাধ্যক্ষ নাদীর খাঁ ইউরোপ হইতে আসিয়া বাচ্চাকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং আফগান রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। নাদীর নানা বিধ সংস্কারে আফগানিস্থানকে একটি আধুনিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করিবার চেষ্টাতে ছিলেন। কিন্তু আফগানের জাতীয় প্রকৃতি তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই—বিগত ৮ই নভেম্বর অপ্রত্যাশিত ভাবে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের চক্রান্তে তাঁহাকে প্রাণ দান করিতে হইয়াছে। তাহার বিংশ বংশীয় পুত্র জাহির শাহ এক্ষণে রাজ পদবী গ্রহণ করিয়াছেন।

আর্য্য মনোবিজ্ঞান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীমদ্ পণ্ডিত ব্রজভূষণ শরণ দেব

পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এক একটী দ্বারা পাচটী বিশেষ বুদ্ধির (শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বুদ্ধির) এক একটী বিশেষ বুদ্ধি নিপন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। এক একটী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা এক একটী করিয়া স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাচটী বিষয়ের পাঁচটি বিশেষ বুদ্ধি পাচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া উক্ত পাঁচটী বুদ্ধি বিশেষ বুদ্ধি আখ্যায় অভিহিত হইতে পারে। আর শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটী গুণ বিশেষের এক একটী গুন বিশেষও যথা ক্রমে শোত্র, ত্বক, চক্ষু রসনা ও ঘ্রাণ এই পাচটী ইন্দ্রিয়ের এক একটী দ্বারা গৃহীত হয়; এ রূপ গুণ বিশেষ বলিয়া উক্ত পাঁচটী গুণও শাস্ত্রে বিশেষ গুণ এই পারিভাষিক শব্দে ব্যবহৃত হয়। আর শব্দাদি যাহা কিছু গুণ রাশি তাহারা বৃক্ষ ছাড়িয়া ছায়ার মত আশ্রয় শূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং পাঁচটী বিশেষ গুণের অনুরোধে উহাদের পাঁচটী বিশেষ বিশেষ আশ্রয়ও নিরূপিত করা হইয়াছে এবং সেই বিশেষ বিশেষ পাচটী আশ্রয় ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম আখ্যায় অভিহিত হয়; উহারা ভূত এই পারিভাষিক শব্দ দ্বারা শাস্ত্রে পরিভাষিত হয়। গন্ধ যাহার বিশেষ গুণ তাহা ক্ষিতি (পৃথিবী); মধুর রস যাহার বিশেষ গুণ তাহা অপ্ (জল); পরকীয় রূপের প্রকাশকারী রূপ যাহার বিশেষ গুণ তাহা তেজ (অগ্নি); স্পর্শ (বাষ্প স্পর্শের মত ব ঈষৎ সুড় সুড়ি পাওয়র মত স্পর্শ) যাহার বিশেষ গুণ তাহা মরুৎ (বায়ু); শব্দ যাহার বিশেষ গুণ তাহা ব্যোম (আকাশ); উল্লিখিত পাঁচটী বিশেষ বুদ্ধির অনুরোধে পড়িয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংখ্যা বিশেষ পাচটী ইহা যেরূপ অগত্যা অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে, এইরূপ উল্লিখিত পাঁচটী বিশেষ (গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দের) অনুরোধে অগত্যা তাহাদের আশ্রয়ভূত পাঁচটী বিশেষ বিশেষ ভূতের অস্তিত্বও মানিয়া লইতে হয়। বহির্জগতে ষষ্ঠ বিশেষ গুণের (কোন একটী মাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয় এরূপ বিশেষ গুণের) ষষ্ঠ সংখ্যক বিশেষ বুদ্ধি অনুভব করিতে পারা যায় না। সেইজন্য ষষ্ঠ বিশেষ বুদ্ধির যাহা সাধন তাদৃশ ষষ্ঠ বহিরিন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করা যেরূপ যুক্তি ও অনুভব বিরোধী, বহির্জগতে ষষ্ঠ বিশেষ গুণ ও যত্ন বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয় না দেখিয়া পঞ্চ হইতে অতিরিক্ত ষষ্ঠ বহির্ভূতের অস্তিত্বও ষষ্ঠ বহিরিন্দ্রিয়ের মত মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য পাঁচটী বিশেষ গুণের পাঁচটী বিশেষ বুদ্ধি দ্বারা নিরূপিত পাচটী উক্ত বিশেষ গুণের অনুরোধে পড়িয়া তাহাদের বিশেষ বিশেষ আশ্রয়ভূত পঞ্চ ভূতের ব্যবহারিক অনুভব সিদ্ধ। ইউরোপীয় যন্ত্রানুভূতির সাহায্যে আর্য্য ঋষিগণ ভূতের (ক্ষিতি আদি ভূতের) বিভাগটা করেন নাই। এইরূপ আমরা মনে করি।

পঞ্চভূত আবার স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই ভাগে বিভক্ত। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সম্মুখে প্রতীয়মান স্থূল পাঁচটী ভূত যে পাঁচটী উপাদান হইতে তরঙ্গাকারে নিঃসৃত হইয়া আসিয়াছে, তাহারা বেদান্ত শাস্ত্রেও অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত সাংখ্য দর্শনে তন্মাত্র সূক্ষ্ম ভূত প্রভৃতি আখ্যায় প্রসিদ্ধ

ওই পাঁচটী সূক্ষ্ম ভূতের আবার প্রত্যেক টার উত্তম (প্রকাশ প্রধান) মধ্যম (ক্রিয়া প্রধান) অধম (জড়তা প্রধান) অংশ গুলি আছে। আর ওই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূতের মধ্যে যাহা সূক্ষ্ম অগ্নি, তাহার প্রকাশপ্রধান কতিপয় অংশের সমবায়ে আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয়টী নির্ম্মিত হয়। ওই অগ্নির বিশেষ গুণ রূপ। সূত্রগুলি শুক্ল হইলে সেই সূত্র রচিত বস্ত্রেও যেমন শুক্ল গুণের উদয় হয়, আমাদের চক্ষুও সেইরূপ আগ্নেয় বস্তু বলিয়া অগ্নির বিশেষ গুণ রূপটীও চক্ষুর অভ্যন্তরে সমবেত হইয়া থাকিতে পারে। উপাদান কারণের গুণটী উপাদেয় বা কার্য্য দ্রব্যের পৈতৃক বিষয় বলিয়া অগ্নির উপাদানে নির্ম্মিত চক্ষুর অভ্যন্তরে অগ্নির সহজাত স্বাভাবিক রূপ আছে আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয়টী প্রদীপের মত তৈজস বস্তু বিশেষ, সূক্ষ্ম অগ্নিতত্ত্বের প্রকাশ প্রধান শ্রেষ্ঠ সারাংশ সমূহে চক্ষু ইন্দ্রিয়টী নির্ম্মিত হয়। চক্ষু ইন্দ্রিয়েরও প্রদীপের মত রশ্মিপুঞ্জ আছে; স্থূল অগ্নি দ্বারা রচিত আগ্নেয় প্রদীপের রশ্মি নিচয়ের রূপ ও স্পর্শ যেমন আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয়। সূক্ষ্ম অগ্নিতত্ত্বের প্রকাশপ্রধান শ্রেষ্ঠ সারাংশ গুলির সমবায়ে নির্ম্মিত হয় বলিয়া প্রদীপের মত চক্ষুরও রশ্মিপুঞ্জ আছে। কিন্তু ওই রশ্মিপুঞ্জের রূপ ও স্পর্শ সূক্ষ্ম, সেইজন্য উহারা লৌকিক প্রত্যক্ষের উপযোগী বিষয় নহে। চক্ষুর তেজোময় (গোলক) যন্ত্রটী অতিশয় স্বচ্ছ। উহার ভিতর দিয়া চাক্ষুষ রশ্মি গুলি বাহিরে যাইয়া জালের মত বিকীর্ণ হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া বাহ্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ করিয়া থাকে। চাক্ষুষ রশ্মিগুলি বাহিরে আসিলেও উহারা সূক্ষ্ম সুতরাং প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না। স্থূল পঞ্চ-ভূতে রচিত পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর ছাড়িয়া ভোগ সাধন সূক্ষ্ম শরীর মাত্রে সুখাদি ভোগ বা অনুভব যেরূপ নিষ্পন্ন হইতে পারে না। এইরূপ সূক্ষ্ম শরীরের অবয়ব বলিয়া চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় গুলিও বাহিরে স্থূল আলোক ও বায়ু প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে অর্থাৎ স্থূল তেজোময় ধাতু সূর্য্য বায়ু প্রভৃতি দেবতার অনুগ্রহ না পাইলে উহারা (চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় গুলি) রূপাদি বহির্ব্বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। ইহা ভাবিয়া বিধাতা সূক্ষ্ম শরীরের ভোগ নিষ্পত্তির নিমিত্ত স্থূল পাঞ্চ ভৌতিক শরীরটী যেরূপ রচনা করিয়াছেন, এইরূপ স্থূল শরীরের বাহিরেও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গণের ভোগ সিদ্ধ (রূপাদি বিষানুভূতির নিষ্পত্তি) করিবার জন্য স্থূল করিয়া সূক্ষ্ম পঞ্চভূত রচনা করিয়াছেন। স্থূল পঞ্চভূতের অপেক্ষা না রাখিয়া সূক্ষ্ম শরীরের কোনও একটী অবয়ব বিশেষ বাইরে স্বকার্য্য (রূপাদি গ্রহণ) করিতে পারেনা। মনে হয় সেই জন্যই যেন বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বায়ু জল অগ্নি ও পৃথিবী আদি বস্তু গুলি স্থূল করিয়া বহির্জগত সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন শ্রুতিও বলিতেছেন—চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়গণ স্থূল সূর্য্যাদি দেবতার অনুগ্রহে অনুগৃহীত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য নিষ্পত্তি করিতে পারে। নতুবা নহে। তজ্জন্য ইহা বলিতে পারা যায় যে, আমাদের সূক্ষ্ম চাক্ষুষ রশ্মি সমূহ চক্ষু যন্ত্র হইতে বহির্গত হইলেও বাহিরের সৌর অথবা চান্দ্র আলোক অথবা অগ্নি প্রভৃতির স্থূল আলোকের অপেক্ষা না রাখিয়া রূপাদি জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। সৌরাদি স্থূল আলোকের সংসর্গ ছাড়িয়া চাক্ষুষ রশ্মিপুঞ্জ নিজের সূক্ষ্ম রূপা বা প্রভা সহকারে রূপাদি জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। কারণ, চাক্ষুষ রশ্মিপুঞ্জ সূক্ষ্ম অগ্নির প্রকাশ প্রধান কতিপয় অংশের সমবায়ে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহারা সূক্ষ্ম শরীরের অবয়ব বিশেষ। স্থূল বায়ু অগ্নি প্রভৃতির অপেক্ষা না রাখিয়া কোন ইন্দ্রিয়েরই স্বকার্য্য সম্পন্ন করিবার সামর্থ্য আদৌ নাই। স্থূল শরীরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ স্থূল পাঞ্চভৌতিক বায়ু সূর্য্য প্রভৃতির অপেক্ষা না রাখিয়া বাহ্য বিষয় অনুভব করিতে পারিবে না, সেই জন্যই যেন বিধাতার ভাবিয়া বিবেচনা করিয়া স্থূল করিয়া পঞ্চভূত সৃষ্টির

প্রয়োজনীয়তাটী আমাদের অনুভূতির ভিতর দিয়া লক্ষিত হয়। শিল্প চতুর বিধাতা চাক্ষুষ রশ্মিগুলি বাহিরে যাইয়া যেরূপে নীলপীতাদিরূপ প্রভৃতির জ্ঞান জন্মাইতে পারে, তাদৃশ উপযোগী করিয়া বাহিরেও সৌরাদি আলোক রশ্মিগুলি রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। বিধাতা চক্ষু যন্ত্রের অনিষ্ট সম্ভাবনায় উহার রক্ষার জন্য পক্ষদ্বয় রচনা করিয়াছেন। তাহার ফলে ধূলি কণাদি হইতে চক্ষু যন্ত্র পরিত্রাণ পাইয়া থাকে। চক্ষু যন্ত্র অতিশয় কোমল। ধূলি কণাদি আসিয়া উহার উপর পড়িলে চক্ষুর বেদনা অনুভূত হয়। মাকড়শার সূক্ষ্ম তন্তু ও চক্ষুর পর্দ্দায় পড়িলে উহা বেদনা অনুভব করে। আর বিধাতা ঘর্ম্ম জলাদি দ্বারা চক্ষুর অনিষ্ট সম্ভাবনায় উহার পক্ষদ্বয় রচনা করিয়া উপকার সাধন করিয়াছেন। পক্ষ দিয়া ঘর্ম্ম জলাদি অন্যদিকে পড়িয়া যায়। চক্ষু যন্ত্রের ভিতরে উহা প্রবেশ করিতে পারে না। পার্থিবাদি বস্তু আসিয়া চক্ষু যন্ত্রে সম্বন্ধ লইলেই যদি তাহাদের রূপাদি জ্ঞান হয়, তাহা হইলে চক্ষু যন্ত্রটীইত নষ্ট হইয়া পড়ে। সেই জন্য শিল্প নিপুণ বিধাতা যাহার দ্বারা চক্ষু ইন্দ্রিয় বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহার জ্ঞান জন্মাইতে পারে, বাহিরে প্রতিবিম্ব গ্রাহক তাদৃশ সৌরাদি কিরণ রাশি সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন। চক্ষু ইন্দ্রিয় সৌরাদি কিরণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর আকৃতি ও রূপ মাত্র গ্রহণ করে। এবং বিধাতা সৌরাদি কিরণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণে উপযোগী করিয়া চাক্ষুষ রশ্মিগুলিও সৃজন করিয়াছেন। যাহাদের দ্বারা চক্ষু যন্ত্রে বাহ্য বস্তুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ(সংযোগ সম্বন্ধ) না থাকিলেও ছায়া মাত্রে তাহার পরিচয়টা জ্ঞাতা আত্মার বা আমার অনুভূতির ভিতরে আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে। আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয়ের প্রদীপের মত রশ্মি পুঞ্জ আছে। ওই রশ্মিপুঞ্জ সাধন বিশেষ দ্বারা সংযত করিয়া যোগী চক্ষু হইতে অগ্নিও বাহির করিতে পারেন। পুরাণে ইহা শুনিতে পাওয়া যায় যে, দেবাদি দেব মহাদেব এক সময়ে চক্ষু হইতে ভীষণ আগ্নেয় রশ্মি রাশি বাহির করিয়া মদন ভস্ম করিয়াছিলেন। মহাভারতেও লিখিত আছে যে একজন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ কিছু দিন তপস্যা করিয়া সেই তপস্যার তেজ পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া চক্ষু চাহিয়া বৃক্ষোপরি একটী বকের দিকে কোন কারণ বশতঃ যেমনি ক্রোধ দৃষ্টিপান করিলেন, দর্শন মাত্রে অমনি বকটী পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইল। পুরাণাদি দ্বারাও প্রমাণিত হইতে পারে যে, চক্ষু হইতে রশ্মি বাহির হয়। চক্ষুর রশ্মি আছে। আর তাহা হইলে প্রদীপের সহিত চক্ষুর রশ্মি অংশে দৃষ্টান্ত ভাবও থাকিতে পারে। এবং চাক্ষুষ রশ্মি সমূহের রূপ ও স্পর্শ থাকাও সম্ভবে।

আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয় আলোকতরঙ্গ সহকারে দৃশ্যমান বস্তু হইতে রস গন্ধ স্পর্শাদি গ্রহণ না করিয়া রূপ জাতীয় বিশেষ গুণ মাত্র নিরূপণ করিয়া বাছিয়া গ্রহণ করে। আর তাহার জ্ঞান ও জন্মাইয়া থাকে। রূপ জাতীয় বিষয় বিশেষে চক্ষুর পক্ষপাতিতা পরিলক্ষিত হয়। সেই জন্য চক্ষুর বিষয় (রূপ) নিরূপণে সাহায্যকারী ও বিষয় গ্রহণে নিয়ামক এরূপ একটা কারণ বিশেষ অঙ্গীকার করা উচিত যে যাহার দ্বারা চক্ষু নিজের বিষয় নিরূপণে সাহায্য প্রাপ্ত ও বিষয় বিশেষের গ্রহণে নিয়মিত হইয়া আলোকে তরঙ্গে দৃশ্যমান বস্তু হইতে রস গন্ধ স্পর্শাদি গ্রহণ না করিয়া রূপ জাতীয় বিষয় নিরূপণ করিয়া বাছিয়া চিনিয়া রূপ মাত্রের জ্ঞান জন্মাইতে পারে। পণ্ডিতগণ চক্ষুর বিষয়ের নিরূপণে ও গ্রহণে সাহায্যকারী ও নিয়মক কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া দেখিয়াছেন যে চক্ষুর পূর্ব্বোক্ত স্বগত অসাধারণ সূক্ষ্ম রূপই কেবল মাত্র চক্ষুর বিষয়ের নিরূপণে ও গ্রহণে সাহায্যকারী ও নিয়ামক কারণ বিশেষ। আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয়টী আগ্নেয় বস্তু বলিয়া উহার স্বগত স্বাভাবিক রশ্মি

সমূহের (চক্ষু ইন্দ্রিয়ের) সহজাত নৈসর্গিক সূক্ষ্ম রূপ আছে। অগ্নিময় প্রদীপ যেমন স্বগত রশ্মির রূপ দ্বারা নিয়মিত হইয়াও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া স্বগত রূপের সমান জাতীয় (পরকীয় রূপ জাতীয়) বিষয় মাত্র বাছিয়া প্রকাশ করে। আমাদের চক্ষুর স্বগত যাহা সূক্ষ্ম রূপ আছে তাহার দ্বারা চক্ষুও প্রদীপের মত স্বগত রূপের সমান জাতীয় বিষয় (পরকীয় রূপ জাতীয় বিষয়) মাত্র দৃশ্যমান বস্তু হইতে বাছিয়া তাহা আমাদের অনুভূতির নিকটে প্রকাশ করে। অতএব চক্ষু প্রদীপের মত তৈজষ বস্তু বিশেষ। যদি বল, উষ্ণ স্পর্শ ও সূক্ষ্ম আগ্নেয় বিশেষ গুণ, সুতরাং আগ্নেয় চক্ষুর ও (চাক্ষুষ রশ্মি সমূহের ও) উষ্ণ স্পর্শ আছে, তাহার দ্বারা চক্ষু স্বগত স্পর্শের সমান জাতীয় বিষয়ই পরকীয় স্পর্শ জাতীয় বিষয়ই) বা গ্রহণ করিয়া তাহার জ্ঞান জন্মাইতে পারিবে না কেন? এইরূপ প্রশ্নোত্তরে বলিতে পারা যায় যে, বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা জীবের রূপরস গন্ধাদির অনুভব জনক অদৃষ্ট সহকারে ভোগ সাধন ইন্দ্রিয়গুলি রচনা করিয়াছেন। বিধাতা জীবের রূপানুভূতির জনক অদৃষ্ট বিশেষে চক্ষু ইন্দ্রিয়টী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সেইজন্য চক্ষু ওই অদৃষ্ট বিশেষ দ্বারা নিয়মিত হইয়া অগ্নির বিশেষগুণ রূপ তজ্জাতীয় বিষয় ছাড়া উষ্ণ স্পর্শাদি অগ্নির নৈসর্গিক বিশেষ গুণ হইলেও তাহা গ্রহণ করিতে পারে না ও তাহার জ্ঞান জন্মাইতে পারে না।

আমাদের শ্রোত্রেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম আকাশের প্রকাশ প্রধান সারাংশ সমূহের উপাদানে গঠিত হয়। কর্ণ বিবরের উপকারে ও অপকারে শ্রোত্রেন্দ্রিয়ও উপকৃত ও অপকৃত হয়। সেই জন্য সকল জীবের শ্রোত্রেন্দ্রিয় যে আকাশে প্রতিষ্ঠিত ইহা বুঝিতে পারা যায়। কর্ণ বিবর পরিচ্ছিন্ন ফাঁকটীই শ্রোত্রেন্দ্রিয়। ওই ফাঁক বা আকাশে শব্দও সমবেত রহিয়াছে। আর ওই শব্দই কর্ণ বিবরের বা শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের স্বগত অসাধারণ (সূক্ষ্ম) গুণ বিশেষ। পার্থিবাদি শব্দরাশি (কড় কড় মড় মড়াদি) বায়ু তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া কর্ণ পটহে ধাক্কা দিলে শ্রোত্র স্বগত উক্ত অসাধারণ শব্দ সহকারে স্বগত শব্দের সমান জাতীয় (পরকীয় পার্থিবাদি শব্দ জাতীয়) বিষয় মাত্র আমাদের অনুভূতির আলোকে আনিয়া উপস্থিত করে। আর জীবের শব্দানুভব জনক অদৃষ্ট বিশেষে নিয়মিত হইয়া শ্রোত্র আকাশের বিশেষ গুণ তজ্জাতীয় বিষয় মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহারই জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। শ্রোত্র শব্দায়মান বস্তু হইতে রূপাদি গ্রহণ না করিয়া শব্দ মাত্র গ্রহণ করে অতএব শ্রোত্রেও বিষয় বিশেষের গ্রহণে পক্ষপাতিতা পরিলক্ষিত হয়। সেইজন্য শ্রোত্রের বিষয়ের নিরূপণে ও গ্রহণে সাহায্যকারী ও নিয়ামক এরূপ একটা সহকারী নিয়ামক কারণ বিশেষ অঙ্গীকার করা উচিত যে, যাহার দ্বারা শ্রোত্রেন্দ্রিয় বিষয় নিরূপণে সাহায্য প্রাপ্ত ও বিষয়ের গ্রহণে নিয়মিত হইয়া শব্দায়মান বস্তু হইতে রূপাদি গ্রহণ না করিয়া নিরূপণ করিয়া বাছিয়া শব্দ মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহারই জ্ঞান জন্মাইতে পারে। পণ্ডিতগণ শ্রোত্রের স্বগত অসাধারণ সূক্ষ্ম শব্দটাকেই পার্থিবাদি শব্দ মাত্রের জ্ঞান উৎপাদনে তাদৃশ সহকারী ও নিয়ামক কারণ রূপে অঙ্গীকার করেন। আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয়টী তেজ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহা যেমন তেজের গুণরূপ সুতরাং তজ্জাতীয় বিষয় মাত্র প্রকাশ করে এইরূপ শ্রোত্রেন্দ্রিয় ও আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া আকাশের গুণ শব্দ সুতরাং তজ্জাতীয় বিষয় মাত্রের জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে।

আমাদের রসনেন্দ্রিয় আস্বাদ্যমান বস্তু হইতে গন্ধাদি গ্রহণ না করিয়া বাছিয়া রস মাত্র গ্রহণ করে। অতএব রসনারও বিষয় বিশেষের। (রসের) গ্রহণে পক্ষপাতিতাটা দেখিতে পাওয়া

যায়। উক্ত পক্ষপাত বিশেষের প্রতি এরূপ একটা কারণ বিশেষ অঙ্গীকার করা উচিত যে, যাহার দ্বারা রসনা নিজের বিষয় নিরূপণে সাহায্য প্রাপ্ত ও বিষয় গ্রহণে নিয়মিত হইয়া আস্বাদ্যমান বস্তু হইতে বাছিয়া রসমাত্র গ্রহণ করিয়া তাহারই জ্ঞান জন্মাইতে পারে। পণ্ডিতগণ রসনার স্বগত সূক্ষ্ম রস মাত্রই রসনার আস্বাদ্যমান বস্তু হইতে রূপাদি গ্রহণ না করিয়া রসের নিরূপণে ও গ্রহণে সহকারী ও নিয়ামক কারণ স্বরূপে নির্দ্দেশ করেন। আমাদের রসনেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম জলের প্রকাশ প্রধান শ্রেষ্ঠ অংশগুলির সমবেত ফলে উৎপন্ন হয়। সেই জন্য জলীয় সূক্ষ্ম রস ও রসনার অভ্যন্তরে থাকিতে পারে। উপাদানগত গুণটাই যে হেতু কার্য্য দ্রব্যেও সংক্রান্ত হয়, আমাদের রসনা স্বগত সূক্ষ্ম রস বা রস তন্মাত্র দ্বারা স্বগত রসের সমান জাতীয় (পরকীয় রস জাতীয়) বিষয় মাত্র (রসমাত্র) গ্রহণ করিয়া তাহারই জ্ঞান নিষ্পন্ন করে। আর রসনার অভ্যন্তরবর্ত্তী রস (রসতন্মাত্র) সূক্ষ্ম বলিয়া উহা আর রসনা দ্বারা অনুভূত হইবার যোগ্য নহে। আমাদের রসনেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম জল হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া (রসনা) জলের বিশেষ গুণ রস তজ্জাতীয় বিষয়েরও গ্রহণ করে ও তাহারই জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। যদি বল রসনা জলীয় বস্তু বলিয়া জলের গুণ বিশেষও তাহাতে সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহার ফলে রসনা রস জাতীয় (পরকীয় রস জাতীয়) বিষয় মাত্রের জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। আর রসনা জলীয় বস্তু বলিয়া জলের গুণ বিশেষ শৈত্যাদিও উহাতে থাকিতে পারে। তাহার দ্বারা রসনা স্বগত শৈত্যাদির সমান জাতীয় (পরকীয় স্পর্শ জাতীয়) বিষয় সমূহেরও জ্ঞান জন্মাইতে পারিবে না কেন? এই প্রকারের প্রশ্নোত্তরে বলিতে হইবে যে, বিধাতা জীবের রসনানুভবের সম্পাদক অদৃষ্ট সহকারে রসনেন্দ্রিয়টী সূক্ষ্ম জল বস্তুর প্রকাশ প্রধান শ্রেষ্ঠ সারাংশ গুলির সমবেত ফলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই জন্য উহা (রসনেন্দ্রিয়) জলীয় গুণ বিশেষ শৈত্য ও রূপাদি গ্রহণ না করিয়া জলীয় বিশেষ গুণ রস সুতরাং রস জাতীয় বিষয় মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহারই জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে।

আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় আঘ্রায়মান বস্তু হইতে রসাদি গ্রহণ না করিয়া বাছিয়া গন্ধ মাত্র গ্রহণ করে। আর তাহারই জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। ঘ্রাণেরও বিষয় বিশেষের (গন্ধ বিষয়ের) গ্রহণে পক্ষপাতিতা পরিদৃষ্ট হয়। অতএব ঘ্রাণের বিষয় বিশেষে পক্ষ পাতিতার প্রতি এরূপ একটা নিয়ামক কারণ বিশেষ অঙ্গীকার করিতে হয় যে, যাহার দ্বারা নিয়মিত হইয়া ঘ্রাণ আঘ্রায়মান বস্তু হইতে রসাদি গ্রহণ না করিয়া গন্ধ মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহারই জ্ঞান জন্মাইতে পারে। উক্ত প্রকারের নিয়ামক কারণটা ঘ্রাণের অভ্যন্তরবর্ত্তী স্বগত সূক্ষ্ম গন্ধ বা গন্ধ তন্মাত্র। উহার দ্বারাই নিয়মিত হইয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় স্বগত সূক্ষ্মগন্ধের সমান জাতীয় (পরকীয় গন্ধ জাতীয়) বিষয় মাত্রের জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম পৃথিবীর প্রকাশ প্রধান সারাংশ গুলির সমবায়ে নির্ম্মিত হয় বলিয়া পার্থিব গন্ধও ঘ্রাণের অভ্যন্তরে সংক্রান্ত থাকে। ঘ্রাণের অভ্যন্তরবর্ত্তী ওই সূক্ষ্ম পৃথিবীর গুণ বিশেষ সুতরাং উহাও সূক্ষ্ম। তজ্জন্য স্থুল গন্ধগ্রাহী ঘ্রাণ দ্বারা ঘ্রাণের স্বগত গন্ধ অনুভব করিতে পারা যায় না। যোগী যোগ বলে সূক্ষ্ম গন্ধ রূপ রস স্পর্শ শব্দাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

পৃথিবীর কঠিন স্পর্শ ও কটু তিক্তাদি গুণ বিশেষ থাকিলেও জীবের গন্ধ জ্ঞানের জনক অদৃষ্ট সহকারে বিধাতা সূক্ষ্ম পৃথিবীর প্রকাশ প্রধান স্বচ্ছ সারাংশে নির্ম্মাণ করিয়াছেন বলিয়া ঘ্রাণ পার্থিব স্পর্শাদি গ্রহণ না করিয়া গন্ধ মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহারই জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। আমাদের

ঘ্রাণেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া পার্থিব গন্ধ গ্রহণে উহার (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের) পক্ষপাত লক্ষিত হয়।

আমাদের ত্বগিন্দ্রিয় স্পৃশ্যমান বস্তু হইতে রূপাদি গ্রহণ করে না, স্পর্শমাত্র গ্রহণ করে। অতএব ত্বগিন্দ্রিয়েরও যে বিষয় বিশেষের গ্রহণে আসক্তি বিশেষ আছে ইহাস্পষ্ট রূপেই বুঝিতে পারা যায়। ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় বিশেষের (স্পর্শাদির) গ্রহণে উক্ত আসক্তি বিশেষের প্রতি এরূপ একটা নিয়ামক কারণ বিশেষ থাকাই চাই যে যাহার দ্বারা সংযত হইয়া ত্বক্ স্পৃশ্যমান বস্তু হইতে রসাদি গ্রহণ না করিয়া বাছিয়া স্পর্শ মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহার জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ হয়। ত্বকের অভ্যন্তর-বর্ত্তী ত্বক সংক্রান্ত সূক্ষ্ম স্পর্শ বিশেষ তাদৃশ নিয়ামক কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। আমাদের ত্বগিন্দ্রিয় সূক্ষ্ম বায়ু বস্তুর প্রকাশ প্রধান সারাংশে উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য বায়ুর গুণ বিশেষ (সূক্ষ্মতা গুণ বিশেষ] স্পর্শ ও ত্বগিন্দ্রিয়ে সংক্রান্ত হয়। উপাদান কারণের গুণটাই যে হেতু কার্য্য দ্রব্যের বিষয়। ত্বক স্বগত সূক্ষ্ম স্পর্শ সহকারে স্বগত স্পর্শের সমান জাতীয় (পরকীয় স্পর্শ জাতীয়) বিষয়মাত্র শীতস্পর্শ উষ্ণ স্পর্শাদি গ্রহণ করিয়া আমাদের অনুভূতির কেন্দ্রে আনিয়া উপস্থিত করে। স্পর্শ জ্ঞান জনক অদৃষ্ট সহকারে ত্বক নির্ম্মিত হইয়াছে। সেইজন্য উহা বায়ুর গুণ বিশেষ স্পর্শ তৎসজাতীয় বিষয় মাত্র [পরকীয় স্পর্শ জাতীয় বিষয় মাত্র] গ্রহণ করিয়া তাহার জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

বঙ্কিম প্রতিভা

(সাহিত্যে সামাজিকতা)

শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্ম্মা

সমগ্র মানব জাতির জীবন কথাই আনন্দের ইতিহাস। সংসারে যাহা কিছু হইতেছে, সবই যে প্রয়োজনের জন্য এমন বলিতে পারি না—আনন্দের জন্যও অনেক কিছু সজ্ঘটিত হইতেছে। অর্থের আকাঙ্ক্ষায় হত্যাকাণ্ড হয় বটে, আবার হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যও অনর্থক হত্যা কার্য্য চলিয়া থাকে।

আনন্দ উপভোগ প্রচেষ্টার প্রকাশ বহুধা বিসর্পিত। তন্ন তন্ন করিয়া তাহার পরিচয় দেওয়া চলে না। আর তাহার প্রয়োজনও নাই। সামাজিক মানব আমরা সমাজের মধ্যে দেখি সব আনন্দ স্বীকৃত হয় নাই। যাহার হৃদয়ে যাহা উত্থিত হইয়াছে, তাহাই গ্রাহ্য হয় নাই। বরং অগ্রাহ্যই হইয়াছে। কেবল অগ্রাহ্য নহে, তাহাকে দমন করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। এই অস্বীকার এবং শাসন, এই দুই ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, মনুষ্য জীবনের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কতকগুলি পরিবর্জ্জনীয়, কতকগুলি স্বীকৃত।

ইহারই নাম সামাজিকতা। ঘর সংসার করিয়া সমাজের মধ্যে বাস করিতে হইলে সব কিছুকে অঙ্গীকার করা যায় না। করিতে চাহিলে অনেক বিপ্লব, অনেক বিশৃঙ্খলতা আসিয়া পড়ে। সেই জন্যই ইচ্ছা মাত্রেই সভ্য মানবতার স্বীকৃত বস্তু নহে। ইহার উপর মনুষ্যত্বের কথা আছে। বিধি নিষেধ না মানিয়া, নীতি নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বৈর জীবন যাপন করিলে মানব অধঃপাতে যায়। ইহার জন্য আর যুক্তি তর্ক, প্রমাণ প্রয়োগ উপস্থাপিত করিবার প্রয়োজন নাই। নিত্যকার সংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। আর যে কেহ ইহা বুঝিতে পারে।

বিধিনিষেধ, নীতি নিয়ম সভ্য মানবতার স্বীকার্য্য বস্তু। সাহিত্যের ব্যাপারেও ইহার সম্পূর্ণ উপযোগিতা রহিয়াছে। ইহাকেই সাহিত্যে সামাজিকতা বলিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাহিত্য সৃষ্টিতে পদে পদে এই সামাজিকতাকে মানিয়া চলিয়াছেন। ঘটনা সংস্থানে যেখানে বিরুদ্ধ গতি আছে, সেইখানেই তিনি ঘটনার গতি ফিরাইয়া সমাজের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষকে দিয়াছেন, তাহার মনুষ্যত্বের চেতনা। বা চেতনা জাগ্রত করিবার ঘটনা সংস্থান উপস্থাপিত করিয়াছেন। শৈবলিনী রূপমুগ্ধা। রূপজ মোহ সংসারে সর্ব্বদা কুশলপ্রদ নহে। রূপে মজিতে দিলে, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিলে মানব সমাজকে নানা দিক দিয়া অসুবিধায় পড়িতে হয়। তাই তিনি শৈবলিনীকে ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে ফেলিয়া তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য বুদ্ধি জাগ্রত করিলেন।

রূপতৃষ্ণা যে মৃগতৃষ্ণিকা রোহিণীই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। গোবিন্দলালের অমন দেব-দুর্লভ রূপ যৌবন রোহিণীকে তৃপ্তি দিতে পারিল না। নিশাকরের আবশ্যক হইল। পতন এইরূপ নিম্নগই বটে। ইহাকে কবি কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিলেই চলিবে না। নিত্যকার সংসার ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ। কত শত ঘটনা ঘটিতেছে। একমুঠা ভাতের জন্য চুরি করিতে গিয়া ক্রমশঃ নরহন্তা হইয়া দাঁড়ায়। রূপ পিপাসায় শেষে বারবনিতা হইয়া পড়ে। তবে যদি এমন প্রশ্ন উঠে—হইলই বা। তাহা হইলে আর কথাই নাই, মরার বাড়া গাল নাই।

মানুষের ব্যবহারিক সুখ সুবিধা লইয়াই যে নীতি দুর্নীতির মূল্য এমন নহে। দুর্নীতির একটা নিজস্ব বিষ আছে তাহা দুর্নীতিককে অধঃপাতিত করে। বিষবৃক্ষ গ্রন্থের অন্যতম নায়ক দেবেন্দ্র নাথ তাহার উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য অপরের যতটুকু ক্ষতি করিয়াছিল, তদপেক্ষা অনেক অধিক অপকার করিয়াছিল—তাহার নিজের। দেবেন্দ্র তাহার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের জন্য অতৃপ্তির জ্বালায় জ্বলিয়া ব্যাধিতে জর্জ্জরীভূত হইয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিল। পরিচিত জগতে যদি অনুসন্ধান করি, তবে এইরূপ আত্মঘাতী দেবেন্দ্র কতশত দেখিতে পাইব।

রূপ ও সৌন্দর্য্যবুদ্ধি সম্বন্ধে দৃষ্টিভেদ আছে। একের যাহা ভাল লাগে, অন্যের তাহা পছন্দ হয় না। ফই ভালমন্দ লাগাই রূপ রসের একমাত্র নিয়ামক নহে। নাদির শাহের হত্যা করিতে ভাল লাগিত। সুতরাং ঐতিহাসিক কি বলিয়া যাইবেন নাদির তাহার রাজত্বকালে যাহা করিয়াছে, তাহা সঙ্গত ও শোভন? অন্ততঃ নাদিরের মনোবৃত্তির দিক দিয়া তাহা সমর্থন যোগ্য। ভাল লাগা মাত্রেই একটা মানদণ্ড নহে। হইতে পারে, ভাল লাগা কতকটা পরিমাপক; কিন্তু উহাকেই একমাত্র করিলে অনর্থককে বরণ করিয়া আনা হয়। ভাললাগার পরের কথা মানবতা। যাহা মনুষ্যত্বকে সমৃদ্ধ করে, বস্তুতঃ তাহাই রুচির।

ভাললাগারও একটা ক্রম আছে। শিশুকালে যাহা মিষ্ট বোধ হয়, যৌবনে তাহা হয় না। আবার যৌবনের প্রিয় বার্দ্ধক্যের পক্ষে অশোভন। বাল্যকালে নাচিতে খেলিতে ভাল লাগে। সেই তরল মন পরিণত হইলে গভীর চিন্তায়, ধ্যান ধারণায় আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। কাজেই ভাল লাগাকে কেন্দ্র করিয়া সৌন্দর্য্যের বিচার করিতে চাহিতে সংসারে যাহা শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি, তাহার ভাললাগাকেই আদর্শ করিতে হয়। আর তখনই দেখিতে পাই, দুর্নীতিতে, সমাজ বিরুদ্ধ ভাব ভাবনাতে, নাই রস নাই সৌন্দর্য্য।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সৌন্দর্য্যের যে আদর্শ স্থির করিয়াছেন, তাহা ব্যক্তিগত ভালমন্দ লাগা নহে, তাহাতে আছে একটা সার্ব্বভৌমিকত্ব। আছে, একটা শুভ শুদ্ধ শুচিতা। কুন্দনন্দিনীকে বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করাইতে পারা যায় না। কুন্দ তরুণী সুন্দরী। সে বিকলতা ভোগ করিবে কেন? কুন্দ অনুরাগিণী; তাহার অনুরাগকে সার্থকতা দান করা উচিত। হৃদয়াবেগ অন্ততঃ এইরূপে নির্দ্দেশই দিয়া থাকে। বঙ্কিম এই নির্দ্দেশকে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু এই খানেই থামিয়া যান নাই।

সংযম অপেক্ষা হৃদয়াবেগের উপযোগিতা খুব বেশী নহে। যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহাই করিতে হইবে, এমন ব্যবস্থা হইলে না থাকে সমাজশৃঙ্খলা, না থাকে মনুষ্যত্ব। যাহা খুসি তাহাই করিব, এই রীতি কাহারো পক্ষে প্রযোজ্য নহে। বালক, যুবক, কিশোরী বা তরুণী কাহারো পক্ষে এই নিয়ম খাটিবে না। ব্যাধি হইলে সদ্যজাত শিশুকেও তিক্ত ঔষধ খাইতে হয়। তরুণী রূপসীকেও সংযমহীনা হইতে নাই। হইলে কেবল যে সমাজেরই ক্ষতি হয় নহে, যে অসংযমী হয় তাহাকেও কষ্ট সহিতে হয়। ইহা মনগড়া কথা কাল্পনিকতা নহে, ইহা পরীক্ষিত সত্য।

কুন্দ মরিয়াছে। ঘটনাবশে মরিয়াছে। সিদ্ধান্তটা এইটুকুই নহে। ঔপন্যাসিক বঙ্কিম কুন্দকে মারিয়াছেন। তাঁহার সামাজিকতার আদর্শ বশে মারিয়াছেন। কুন্দ নগেন্দ্রের বৈবাহিক জীবনকে সুস্থ করিলেও করা যাইত, কিন্তু তাহাতে অসংযমকে প্রশ্রয় দেওয়া হইত। সাহিত্য ক্ষণিকের চিত্ত বিনোদন নহে, তাহা সার্ব্বকালীন। সাহিত্যকে বর্ত্তমানের ও উত্তরকালের বলিয়া দেখিতে হয়।

সমাজ ও সামাজিকতা বলিয়া যে কথাটা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সাহিত্য বিচারের দিক দিয়াও একান্ত অবান্তর নহে। রসের উপযোগিতা মনুষ্যত্বের স্বার্থক্ষেত্রে না হইলে তাহা একটা অবাস্তব বস্তু হইয়া উঠে। শুধু মস্তিষ্কের বিলাস, হৃদয়াবেগের পরিচর্য্যা এই সব লইয়া থাকিলে সাহিত্য ক্ষণিকের একটা প্রমোদ হইয়া দাঁড়ায়। এমন কি উহাতে সমাজ ও সভ্যতা সাময়িক ভাবে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে।

মানবতার পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধির জন্য যে সব আয়োজন চলিয়াছে, সাহিত্য তাহার মধ্যে অন্যতম। সেইজন্য সাহিত্যকে কখনো লঘু করিতে নাই, সখের করিতে নাই। সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হয় সাহিত্য যাহাতে একই কালে তুষ্টির ও পুষ্টির হয়। ইহার নাম সামাজিক দৃষ্টি। সমাজের উপযোগী হইলেই যে তাহা আনন্দের পরিপন্থী হইবে এমন নহে। কেহ তুচ্ছে আনন্দ পায়, কেহ মহতে। হিমাদ্রীর উত্তোলিতা, সিন্ধুর অসীমতা চটুল নহে বিরাট। ইহা মানব অন্তঃকরণকে মুগ্ধ করে। আবার লাস্যচটুলতা ইহাও আনন্দপ্রদ। এখন প্রশ্ন—সাহিত্য রসপরিবেশন করিবে কি?

হইতে পারে অবসর বিনোদন বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। বিশ্রান্তিও আবশ্যক।

বসন্তের প্রথম প্রবাহিত দক্ষিণানিলে যে সহর্ষ শিহরণ বহিয়া আনে, মানব মনের তৃপ্তি তুষ্টির জন্যও তাহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তাহার জন্য সাহিত্যের আশ্রয় লইবার উপযোগিতা নাই। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে লঘু প্রমোদের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে। সে সবের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। স্ফূর্ত্তির সহস্র দ্বার উন্মুক্ত। ইহার জন্য সাহিত্যের আশ্রয় লওয়া অনাবশ্যক। সাহিত্যকে একটা সমুন্নত পর্য্যায়ে রাখিয়া দেওয়াই ভাল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রচেষ্টা এই সব বিচার করিয়াই চলিয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। নহিলে তাঁহার উপন্যাস গুলিতে মাজা ঘসা থাকিত না। বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস গুলিতেই পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিস্করণী চলিয়াছে। এই যে পরিবর্ত্তন, ইহা কেবল মাত্রই কালানুগ নহে; সর্ব্বত্রই প্রায় সমাজানুগত। যেখানে যেমনটি করিলে মানবতা উপচীয়মান হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই দিকে দৃষ্টি দিয়া চলিয়াছেন। ইহাতে ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে সাহিত্যবিচারের সময় তাহা আলোচনা করিব। (ক্রমশঃ)

বিবাহ পদ্ধতি ও তাহার উদ্দেশ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র সিংহ

এই রূপে রাশিচক্রের গতির সম্বন্ধানুসারে শুভাশুভ গ্রহ গণ শরীরের স্বাস্থ্যের উপরেও অনুশাসন চালায়। দেখা যায় রোগবিশেষ আরোগ্য হইতে এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ বা ততোধিক সময় সাপেক্ষ করে। কেন? উত্তর সহজ—দেহস্থ যন্ত্র বিশেষের উপরেও গ্রহবিশেষের অনুশাসন আছে বলিয়া পাপগ্রহের সংযোগ বশতঃ শরীরের যন্ত্রবিশেষ বিকৃত হইয়া রোগ বিশেষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চন্দ্র-সূর্য্যের ক্রিয়ার জন্য যে রূপ জোয়ার-ভাটা ঘটিতেছে সেই রূপে গ্রহ নক্ষত্রাদির সঞ্চার বশতঃ আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ অবস্থ-পরম্পরার বিবিধ যোগাযোগে আমাদের বিবিধ সুখ-দুঃখ হইয়া থাকে। গ্রহ নক্ষত্রাদি যতদূরে থাকুক না কেন অনন্ত ব্যোমাকাশের সূক্ষ্ম আকরের মধ্য দিয়া উহাদের অধিষ্ঠিত লোকপালগণ নিজ নিজ সঞ্চার, স্থিতি ও সম্বন্ধ অনুসারে আমাদের ভাগ্যলিপি চালাইয়া থাকেন ও বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের মহাজ্ঞায় সার্ব্বভৌম নিয়মানুসারে জগতের বিশ্বজনীন সামঞ্জস্য স্থাপন করেন।

আবার দেখ—গ্রহাদির বলাবল গণনানুসারে যখন যাহা ক্লেশ আইসে তখন নানা উপায় সত্ত্বে সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যায়।

এই সকল নৈসর্গিক যোটকের জন্য বর এবং কন্যার কোষ্ঠী বিচারের প্রথা আবহমান কাল ভারতে চলিয়া আসিতেছে।

ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বিবাহসংস্কার দ্বারা বর-কন্যার (পুরুষ-প্রকৃতির) একীকরণ করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। স্থূল ভাবে সচরাচর নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি যোটন করিয়া দেখা হয়:—

সূর্য্য জাতকের আত্মা এবং চন্দ্র মন। পাত্র ও কন্যার কোষ্ঠীতে চন্দ্রের অবস্থান ও তাঁহার বলাবলের দ্বারা দম্পতীর কিরূপ মনোমিলন হইবে তাহা স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায়। গণ বা বর্ণ বিচারের দ্বারা স্বভাব বা প্রকৃতি জানিতে পারা যায় অর্থাৎ দেব-প্রকৃতি, মানব-প্রকৃতি কিম্বা রাক্ষস-প্রকৃতি (অসুর) নির্ব্বাচন করিতে পারা যায়। পাত্র ও কন্যা এক প্রকৃতির হইলেই সেই বিবাহ অতিশয় সুখজনক হয়; কারণ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পরস্পরের মনের গতি, সম্প্রীতি ও পবিত্র ভাব বিদ্যমান থাকিলে তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ সুস্থ সবল ও তৎস্বভাববিশিষ্ট হইয়া থাকে। যোটক-বিচার বা মিলন বিচার-সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু বচন-প্রমাণ আছে, তন্মধ্যে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য মাত্র দুইটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

১। একর্ক্ষা চ যদা কন্যা রাশ্যেকো চ যদা ভবেৎ।
ধন পুত্রবতী নারী ভর্ত্তা চ চির জীবকঃ ॥

অর্থাৎ বর ও কন্যার একরাশি ও এক নক্ষত্র হইলে নারী (কন্যা) ধন পুত্রবতী এবং (বর) চিরজীবী হইয়া থাকে।

২। যদি কন্যাষ্টমে ভর্ত্তা, ভর্ত্তুঃ ষষ্ঠে চ কন্যকা।
ষড়ষ্টকং বিজানীয়াৎ বর্জ্জিতং ত্রিদশৈরপি ॥

অর্থাৎ কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি অষ্টম এবং বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি ষষ্ঠ হইলে তাহা দেবতাদিগেরও বর্জ্জনীয়।

যোটন-বিচার-কালে ভাগ্যাদি-বিচার এবং বিপত্নীক ও বৈধব্য-বিচারও বিশেষ আবশ্যক। শ্রেষ্ঠ যোটন অর্থাৎ উত্তম মনোমিলনাদি হইলে দম্পতীর মধ্যে কেহ কৃষ্ণাঙ্গ ও কেহ গৌর বর্ণ হইলেও পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট দাম্পত্য-প্রণয় হইয়া থাকে; কিন্তু ইহার অন্যথায় অর্থাৎ যোটনের অভাব-স্থলে উভয়ে গৌরাঙ্গ হইলেও সর্ব্বদা কলহাদি হইয়া সংসারে বিষম অশান্তির সৃষ্টি হইয়া থাকে। দম্পতির মধ্যে একের ভৌম দোষ অর্থাৎ কোষ্ঠীর স্থান বিশেষ মঙ্গল গ্রহের অবস্থানজনিত দোষ থাকিলে এবং অন্যের তাহা না থাকিলে, যাঁহার এই দোষ থাকিবে তাঁহার অকালে পতি বা পত্নী হানি অবশ্যম্ভাবী। যথা :—

লগ্নে ব্যয়ে চ পাতালে যামিত্রে চাষ্টমে কুজে।
স্ত্রী জাতেঃ স্বামিনাশঃ স্যাৎ পুংসে জায়া বিনশ্যতি ॥

অর্থাৎ লগ্ন, দ্বাদশ, চতুর্থ। সপ্তম এবং অষ্টমে মঙ্গল গ্রহ অবস্থান করিলে স্ত্রী জাতকের স্বামী নাশ এবং পুং জাতকের পত্নী-বিয়োগ হইবে। কিন্তু উভয়ের এই ভৌম দোষ থাকিলে পরস্পরের দোষ খণ্ডিত হইয়া থাকে। এইরূপ বহু বিষয় কোষ্ঠী বিচারের দ্বারা স্থির করিবার নিয়ম জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে। কোষ্ঠী দৃষ্টে জারজ-দোষ, পতি বা পত্নী কর্তৃক ত্যাগ-যোগ কারাগার-যোগ, বংশনাশ-যোগ, ধননাশ-যোগ, যক্ষ্মাদি পীড়াযোগ, বন্ধ্যাত্ব, ক্লীবত্ব, আয়ুক্ষয়, রাজযোগ, সন্ন্যাস-যোগ প্রভৃতি যাবতীয় শুভাশুভ বিষয় জানিতে পারা যায়। সুতরাং বিবাহের পূর্ব্বে প্রাচীন ও হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুজনের দ্বারা শাস্ত্রানুসারে বর ও কন্যা নির্ব্বাচিত হইলে সংসার যে অধিকতর সুখময় হইবে তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পাঠকগণ কোন দম্পতীর বা ব্যক্তির নির্ভুল কোষ্ঠীর ফলাফল বিচার করিলে

উপরের লিখিত বিষয় সকল অনায়াসে জানিতে পারিবেন। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই এইরূপ ফলাফল প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঋষিবাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না, ইহা ধ্রুব সত্য!

জাতকের জন্মকালে চন্দ্র যে নক্ষত্রের যে পদে অবস্থিত থাকেন সেই নক্ষত্র পাদ যে রাশির অন্তর্ভুক্ত সেই রাশিই জাতকের জন্মরাশি। এবং জন্মকালে যে রাশি উদীয়মান থাকে তাহাই জাতকের লগ্ন। যোটক-বিচারে রাশি হইতেই প্রধানতঃ বিচার করা হইয়া থাকে এবং তাহাই অষ্টকূট বিচার বলিয়া খ্যাত। সুতরাং নক্ষত্রপাদই এই অষ্টকূট বিচারের মূল সূত্র। নক্ষত্র বা নক্ষত্রপাদ হইতেই গণবর্ণাদি নির্ণীত হইয়া থাকে। রাশি মেলক ব্যতীত লাগ্নিক প্রভৃতি গণনা দ্বারাও যোটক-বিচার করা আবশ্যক। ইহা অতীব বিস্তৃত বিষয়; সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্যক্ আলোচনা করা সম্ভবপর নহে।

দিন দিন পঞ্জিকায় কোন বারে, কোন তিথিতে, কোন নক্ষত্রে, কোন মাসে, কোন ঋতু প্রভৃতিতে, কখন কোন দ্রব্য খাইতে নাই, কোন কর্ম্ম করিতে নাই—ইত্যাদি ব্যবস্থা দেখিলে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ভায়ারা হাস্য প্রদর্শন পূর্ব্বক এই সকল বিধি নিয়মের উপেক্ষাই করিয়া থাকেন; ইহা যে তাঁহাদের অজ্ঞতার ফল তাহা ভাবেন না। তাঁহারা তাঁহাদের আদর্শ পুরুষকে (ধবল-কায়কে) এই সকল নিয়ম পালন করিতে দেখেন না বলিয়া তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক চির-আচরিত বিধি নিয়ম উপেক্ষা করিতে লজ্জা বোধ করেন না। বরঞ্চ এই সকল আচারকে অসভ্যতার পরিচয় মনে করিয়া, আদর্শ-পুরুষের ছাঁচে যথেচ্ছা আহার বিহার করিয়া নিজ নিজ দেহের এবং মনের গতি দুর্ব্বল করিয়া, সন্তান-সন্ততিকেও দুর্ব্বলদেহী দুর্ব্বল-মেধা এবং অল্পায়ু করিয়া থাকেন; এবং বাল্য বিবাহকে (তাঁহাদের আদর্শ পুরুষ দের মতবাদের সমর্থন করিয়া) দোষের মূল-কারণ মনে করেন।

আমার মনে হয়, বৈদিক সময়ে কর্ম্ম মার্গ অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্ম এবং জ্ঞানমার্গ অর্থাৎ উপনিষৎ বেদান্ত অনুশীল ধর্ম্ম কর্ম্ম উভয়ই প্রচলিত ছিল।

জ্ঞানমার্গে যাহারা বিচরণ করিতেন তাঁহারা প্রায়শঃ নিভৃত বনে তাহার অনুশীলন করিতেন। ইহাতে যোগাদি সাধনোপায় দ্বারা আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করিতেন এবং তৎপ্রভাবেই সর্ব্বশক্তি প্রাপ্ত হইতেন। কেহ কেহ মনে করেন বা করিতে পারেন, যে জ্ঞান-মার্গীদের সাত্বিক ভাবাবলীর স্ফূর্ত্তি ছিল না; কিন্তু আমি তাহা মনে করি না, যেহেতু কোন ভাবের অভাবে তদ্‌বিষয়ের বিধিব্যবস্থাদি দেওয়া অসম্ভব। যখন বিধি-নিয়মাদি (পদ্ধতি) দেওয়া হইয়াছে—দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তখন সাত্বিকভাব তাঁহাদের হৃদয়ে ছিল না বলা চলে না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সন্ন্যাসাবলম্বনে যুক্ত হইতেন [যথা, তৈলঙ্গ স্বামী]। কেহ কেহ বা জীবন্মুক্ত অবস্থায় ধর্ম্মপ্রচারের ব্রত ধারণ করিতেন [যথা, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব]।

কর্ম্মমার্গে অর্থাৎ যাহারা অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিতেন তাহারা পশু-হত্যা অধিক করিয়া মানব সভায় হিংসাপরায়ণ হইয়া পড়েন, সেই সময়ে বুদ্ধদেবের নৈতিক ধর্ম্মের শঙ্খনিনাদ বাজিয়া উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানব-হৃদয়ের মহৎ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল না। সত্য বটে বৌদ্ধধর্ম্ম মানব হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রধান উপাদান যে দয়া তাহার শিক্ষা দিল :—

'দয়াধর্ম্ম কি মুলহৈ পাপরূপ অভিমান
তুলসি, দয়া না ছাড়িও যব লগ ঘটমে প্রাণ।'—তুলসী দাস।

কিন্তু মনের সাত্ত্বিক ভাবাবলী— ভক্তি, প্রেম, বাৎসল্য, করুণা, সখ্যাদি—স্ফূর্ত্তি পাইল না। এই সাত্ত্বিক ভাবাবলীর স্ফূর্ত্তির অভাবই ব্যাসদেবের মত মনীষীর প্রাণেও শান্তি দেয় নাই। এই বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাস-নারদ সংবাদে পাঠ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু হিন্দুর প্রাজাপত্য উদ্বাহতত্ত্ব যাহাকে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বলে তাহা এই সাত্ত্বিক ভাবাবলীর স্ফূর্ত্তি সম্পূর্ণভাবে দিয়া থাকে। শাস্ত্রানুমোদিত প্রাজাপত্য ধর্ম্ম অর্থাৎ গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালিত হইলে ইহাতে মনের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী সকলের ধর্ম্ম-পিপাসা সম্যক চরিতার্থ হইয়া সহজে ধর্ম্মোন্নতি সাধন (মোক্ষ) হইয়া থাকে।

অমৃত বচন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, বি-এ, সি-ই]

পুরাকালের পঞ্চতত্ত্ব

পরমাণুর বিচ্ছিন্নাবস্থাই ঋষিদের নিকটে অগ্নিতত্ত্ব বলিয়া বিদিত ছিল। অন্য চারিটী তত্ত্বকে সাধারণ লোকে চারিটী বস্তুর স্থূলরূপ মনে করে, কিন্তু তাহা ভ্রম। উহা জড় পদার্থের কঠিন, দ্রব, বায়বীয় এবং আকাশিক অবস্থা। সুতরাং এই পঞ্চ তত্ত্ব—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ নহে, উহারা দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক ক্রমানুযায়ী পঞ্চ অবস্থা মাত্র।

চৈতন্য শক্তিই আদিশক্তি

এক্ষণে আমরা চিতিশক্তির আলোচনা ও পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইব। পূর্ব্বে আমরা যেরূপ প্রকৃতির শক্তিকে পর্দ্দার পর পর্দ্দা অপসারিত করিয়া পরীক্ষা করিয়াছি, এক্ষণে সেই প্রণালী দ্বারা চিতশক্তিও পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। এই উদ্দেশ্যে মৃত্যু, ট্রান্স (সমাধি) বা কোমা (coma) অবস্থায় জীবের কিরূপ অবস্থা হয় তাহার পরীক্ষা করা সমীচীন, যে হেতু মৃত্যুর সময়ে এই স্থূল শরীর সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হয় এবং অপর দুই অবস্থায় ইহা (অর্থাৎ স্থূল শরীর) কেবলমাত্র নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে। আমরা চৈতন্য শক্তির নিম্ন লিখিত সাধারণ লক্ষণ গুলি দেখিতে পাই—(১) বুদ্ধি বা জ্ঞানশক্তি, (২) সুখ দুঃখ অনুভব [ইহা দ্বারা অনুভূতি হইয়া থাকে এবং অনেক সময়ে ইহা হইতেই ইচ্ছাশক্তি ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য হইয়া থাকে।] (৩) সঙ্কল্প ও বিকল্প স্বভাব নানাবিধ মনোভাব এবং (৪) প্রাণ শক্তি [যদ্দ্বারা খাদ্যের পরিপাক হইয়া দেহের পোষণ হইয়া থাকে।]

বিদেহ আত্মা যখন রক্তরূপে অথবা ভূত-প্রেতাদিরূপে প্রকাশিত হয় তখন তাহাদিগের মধ্যেও উল্লিখিত গুণ সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। সমাধি বা মোহের (trance) অবস্থাতেও এই সকল শক্তির ক্রিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু অন্নময় কোষ অপসারিত বা নিষ্ক্রিয় হইলে এই সমস্ত শক্তি ব্যতীত অবিচ্ছিন্নদৃষ্টি, তিন মাপের বহির্ভূত স্থানে গমনের ক্ষমতা, ইন্দ্রিয়গণের উচ্চতর শক্তি

প্রভৃতি জাগিয়া উঠে। এতদ্দারা এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হয় যে পর্দ্দা সমূহ অপসারিত হইলে প্রকৃতির শক্তিসমূহ যেরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, চিতিশক্তির সেরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, পরন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে অক্ষুন্ন থাকে। উপরে আমরা যাহা উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতে যেন কেহ এরূপ অনুমান না করেন যে সকল জীবই মৃত্যুর পরে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুকালে জীবের যে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহা পরে আমরা বর্ণনা করিব এবং যে নিয়মাবলী দ্বারা এ সংসারে অসংখ্য জীবের ভবিষ্যৎ অবস্থা নিয়মিত হয়, তাহা ব্যাখ্যা করিব। এখানে আমাদের বিচারের উদ্দেশ্যে এই মাত্র বলা যায় যে, চিতিশক্তির নিম্নতর পর্দ্দা অপসারিত হইলে তাহার স্বাভাবিক শক্তির কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, পরন্তু তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, আমরা ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছি যেমন একটী যন্ত্র মাত্র যদ্দারা চিতিশক্তি চিন্তাদি মানসিক ক্রিয়া করিয়া থাকে। অতএব মন যে চিতিশক্তির ক্রিয়ার একটী পর্দ্দা তাহা বুঝা যাইতেছে। অতঃপর আমরা অন্য ভাব প্রকরণে দেখাইব যে চিতিশক্তি মন ব্যতীত কিরূপে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। এক্ষণে আমরা এই বিচারে আর এক পদ অগ্রসর হইবার জন্য একথা বলিতে পারি যে আত্মার প্রতি কোষ ক্রমশঃ অপসারিত হইতে থাকিলে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয় এবং অবশেষে নির্ম্মল রূপ প্রাপ্ত হইয়া উহা আদি শক্তি জ্ঞান ও আনন্দের আকার স্বরূপ হইয়া প্রকাশিত হয়।

যদি উল্লিখিত বিচার যথার্থ হয় তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে প্রকৃতির শক্তি সমূহের অস্তিত্ব চিতিশক্তির উপরেই নির্ভর করে। জীব এবং উদ্ভিদের বীজ সমূহ কিরূপে অঙ্কুরিত হয় এবং পরিবর্দ্ধিত হয় তাহা লক্ষ্য করিলে আমাদের উক্ত বিচারের যাথার্থ্য বিশেষরূপে দৃঢ়ীভূত হইবে। দেহে যাবৎ চিতিশক্তি বর্ত্তমান থাকে, তাবৎকাল প্রকৃতির শক্তি এবং ভূতসমূহ পরস্পরের সহায়ক হইয়া দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। পরন্তু চিতিশক্তি যে মুহূর্ত্তে দেহত্যাগ করে সেই মুহূর্ত্তেই দেহ বিপরীত ভাবাপন্ন হয় এবং প্রকৃতির সেই শক্তি ও ভূতসমূহ বিশ্লিষ্ট হইয়া আপনাদের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কথা যদি আত্মার সম্বন্ধে সত্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ইহা পরমাত্মা যিনি সত্য এবং পরম সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহার সম্বন্ধেও সত্য। এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই চৈতন্য শক্তির ধারার ঘাত প্রতিঘাতে সৃষ্ট এবং প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই বিশ্বজগতের পোষণ ও স্থিতির সুব্যবস্থার জন্য অপরিবর্ত্তনীয় এবং পরম জ্ঞানময় নিয়মাবলী সেই আদি কারণের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

আত্মা বা চৈতন্যশক্তির পরম-ভাণ্ডার

এই প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশে আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি যে আত্মা সচ্চিদানন্দময়। এক্ষণে আমরা আত্মার সচ্চিদানন্দময় অবস্থা যাহা এই সংসারে উত্তমরূপ অনুমান করিতে পারি, তাহার সামান্য আভাস দিতেছি। এতদ্দারা আমরা সেই আদি এবং পরম পুরুষের অবস্থা যৎ-সামান্যরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব। পরমানন্দদায়ক রূপ, অতি তীক্ষ্ণ এবং প্রকাশমান বুদ্ধি, অত্যুল্লাসকর মনোহর গীতিবাদ্য, পরম সৌন্দর্য্য এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত অতিশয় আনন্দময় অবস্থা যাহা মনুষ্যকে বিশেষরূপে আত্মহারা করিয়া থাকে—এই সকল বিষয় অনুভব

সম্ভব। যে মানুষ চৈতন্যের এক যৎসামান্য কিরণ বা কণামাত্র, এবং অতি অকিঞ্চিৎকর, সেই মানুষ যদি এরূপ অতুলানন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই পরম চৈতন্যাধারের যে কিরূপ অতুল সচ্চিদানন্দময় অবস্থা, তাহা আমাদের পক্ষে ধারণা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাঁহার ধাম নির্ম্মল সচ্চিদানন্দময়, নিত্য, অজর ও অবিনাশী। জগৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহার অধিবাসীর সহিত সেই পরম চৈতন্যাধারের ও তাঁহার ধামের যে কি সম্বন্ধ তাহা আমরা পরে ব্যাখ্যা করিব। এক্ষণে ইহা বলাই যথেষ্ট যে তাঁহার কিরণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান পরন্তু তাঁহার ধাম এইস্থলে জগৎ, মন ও মায়ার দেশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এইরূপ পার্থক্য দ্বারা সেই পরমস্রষ্টাকে কোনরূপে সীমাবদ্ধ করা হয় না। যেরূপ এক খণ্ড মেঘ অপার আকাশকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ এই দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মাণ্ডও সেই পরম পুরুষকে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না। ইহার পর আর এক অধ্যায়ে আমরা বিশেষরূপে এই বিষয় বর্ণনা করিব।

পরমার্থের উদ্দেশ্য

এই পুস্তকের প্রারম্ভে আমরা পরমার্থের যে কি উদ্দেশ্য তাহা বলিয়াছি। এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, কোথায় এবং কখন আমাদের জীবাত্মা সেই পরম পুরুষের নির্ম্মল চৈতন্য দেশে গমন করে তখনই সে অজর ও অমর হয়, এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও বাধাবিঘ্ন হইতে মুক্ত হইয়া সেই পরম পুরুষের অসীম আত্মা বা চৈতন্যশক্তি এবং তাহার ভাণ্ডারও অনন্ত দর্শনানন্দ-সাগরে নিমগ্ন থাকে।

আত্মা বা চৈতন্যশক্তি এবং তাহার ভাণ্ডার

এক্ষণে আমরা সেই পরম পুরুষের ধাম কোথায়, ধামপথের যাত্রী আত্মা এক্ষণে কোথায় আছে এবং কোথাই বা যাইবে তাহা স্পষ্টরূপে নির্ণয় করিব। এই দুইটী বিষয় নির্ণীত না হইলে কোন্ সাধনা দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত পদে উপনীত হইতে পারা যায় তাহা স্থির করা অসম্ভব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চৈতন্যশক্তিই এই রচনাতে আদিশক্তির স্থূল কারণ এবং প্রকৃতির সকল শক্তির অস্তিত্বই এই চৈতন্য শক্তির উপরেই নির্ভর করে। সুতরাং ইহা অনুমান করা অযথা হইবে না যে চৈতন্যশক্তি এবং প্রকৃতির শক্তির মধ্যে অনেকটা সমতা ও সামঞ্জস্য আছে। অধিকন্তু ইহা অনুমান করা অন্যায় নহে যে প্রকৃতির শক্তির ন্যায় চৈতন্যশক্তিও আপনার আদি ভাণ্ডার পরম পুরুষের শক্তিভাবাপন্ন এবং যখন চৈতন্যশক্তি ঘনীভূত হইয়া কেন্দ্রস্থ হয়, তখন তাহার অবস্থা ও স্বভাব অনেকটা আদি কারণের তুল্য হইয়া থাকে। যদি কেন্দ্র স্থানে আসিতে চৈতন্যশক্তি কোনরূপ বাধা বা বিঘ্ন না পায় তাহা হইলে কেন্দ্র স্থানেরও আদি ভাণ্ডারের অবস্থা সম্পূর্ণ এক রকম হইবে। দর্পণ (mirror) বা যব কাচের (Lens এর) দৃষ্টান্ত লইলে এই ব্যাপার সহজেই বুঝা যায়। সূর্য্যালোক যদি অপরিষ্কৃত কাচের ভিতর দিয়া একত্র ঘনীভূত হয় অথবা অপরিচ্ছন্ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা হইলে সেই আলোক সম্পূর্ণ শুক্লবর্ণ থাকে না তাহার বর্ণ কাচের গুণানুসারে পরিবর্ত্তিত হয়। আর কাচ যদি বেশ পরিষ্কৃত হয় তাহা হইলে প্রতিবিম্বিত বা প্রতিফলিত আলোকও শুভ্র হইয়া থাকে।

এই স্থূল জগতে এইরূপ সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য অতিশয় বিরল, কিন্তু এই সামঞ্জস্য মনুষ্যশরীরে বহু পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে হেতু এই পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রকার জীব অপেক্ষা মনুষ্যই উন্নততম। সুতরাং এ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডকে স্তরে স্তরে পরীক্ষা করিতে হইলে মনুষ্য শরীরকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক, তাহা হইলে আমরা জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিব। এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড যে কি ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত তাহাও বুঝিতে পারিব এবং সেই পরমানন্দের ধামই বা কোথায় তাহা নির্ণয় করিবার সুযোগ পাইব। সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র দ্বারাও এই বিশাল দৃশ্যমান জগৎ পরীক্ষা করা নিষ্ফল, যে হেতু এই রচনার অনেক নিম্নতর ঘাটের সূক্ষ্ম দেশের জ্ঞানলাভ করা আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভবপর নহে; সেই জন্য আমাদের সিদ্ধান্তপদ নির্ণয় করিতে হইলে চৈতন্য ভাণ্ডার হইতে আগত কিরণরূপী সুরত অংশ (আত্মা) বা চৈতন্যের বিকাশকেই পরীক্ষা করা আবশ্যক।

কবীরের দোঁহা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মায়া

ঝীনী মায়া জিন তজী, মোটী গঈ বিলায়
ঐসে জনকে নিকটসে, সব দুখ গয়ো হিরায় ॥ ১০ ॥

যে ছেড়েছে সূক্ষ্ম মায়া, স্থূল ঘাচে তার আপন হ'তে।
দুঃখ যত সব চলে যায়, এমন লোকের নিকট হ'তে ॥ ১০ ॥

মায়া আগে জীব সব, ঠাড় রহৈঁ কর জোরি।
জিন সিরজা জল বুংদ সে, তাসে বৈঠে তারি ॥১১॥

মায়ার কাছে যুক্ত করে, দাঁড়িয়ে থাকে প্রাণীগণ।
সৃজন যাঁহার এ তিন ভুবন, তাঁহারে হয় বিস্মরণ ॥১১॥

মায়া কে ঝক জগ জরৈ, কনক কামিনী লাগি।
কহ কবীর কস বাচি হৈ, কঈ লপেটী আগি ॥১২॥

মেতে কনক কামিনীতে, জগৎ জোরে মায়ার আঁচে।
আগুন বে'ছে জড়িয়ে তুলো, কবীর বলে কিসে বাঁচে ॥১২॥

মৈঁ জানূঁ হরি সে মিলূঁ, মো মন মোটী আন।
হরি বিচ ডারৈ অংতরা, মায়া বড়ী পিচাস ॥১৩॥

আমার মনে দৃঢ় আশা, মিলি গিয়ে হরির সনে।
মায়া অতি পিশাচিনী, তাঁহার মাঝে বিঘ্ন আনে ॥১৩॥

কবীর মায়া সূমকী, দেখনহী কা লাড়।
জো বা মেঁ কৌড়ী ঘটৈ, তো হরি তোড়ৈ হাড় ॥১৪॥
কৃপণগণের মায়া কবীর, কেবল মাত্র দেখতে মজা।
একটী কড়া কম্‌লে কড়ি, হাড় ভেঙ্গে দেয় হরি সাজা ॥১৪॥
য়া মায়া জগ ভরমিয়া, সবকো লগী উপাধ।
য়হি তারন কে কারণে, জগমেঁ আয়ে সাধ ॥১৫॥
মজেছে সব এই মায়াতে, কাট সহে সকল ধরা।
এই বিপদে তারণ কারণ, সাধুর নর-স্বরূপ ধরা ॥১৫॥

—শিবপ্রসাদ

সমাগতা

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

না নবীন, না টাকা, না সংবাদ—সুদূর আগ্রায়, একাকিনী সমাগতার যথন গণিতে গণিতে দিন গেল, টাকা কড়ি গুলি প্রায় সব গেল, নবীনকুমারের প্রত্যাগমনের আশাটি সম্পূর্ণরূপে গেল তথন,—"বনস্পতিং দূরনীতং সমীক্ষ্য—
হতাশ্রয়া খিন্না লতাবসন্না
ভূলুন্ঠিতা বেপমানা রুরোদ।" সমা আশ্রয়চ্যুতা বল্লবীর মত ধূল্যবলুন্ঠিতা হইল।

কাঁদিলেও দিন যায়, কিন্তু প্রাণ থাকে না। দিন যাইলে দিন আসিবে কিন্তু প্রাণ গেলে আর আসিবে কি? সমা উঠিল। পুরুষের ব্যবহারে তাহার অশ্রদ্ধা ছিল, এবার সেটি শতগুণ বাড়িল। ঘৃণা এবং আত্মগ্লানির আগুনে সমার হৃদয় উত্তপ্ত হইল। সে উত্তাপে নবীনে জড়িত অতীতের স্মৃতি অঙ্গারবৎ হইল। সমা ভাবিল,—'আমি পাগল হইয়াছিলাম! আর সমা উন্মত্ততায় ডুবিবে না—উন্মত্ততার প্রশ্রয় দিবে না!

"Let the dead past burry its dead
Act—act in the living present.
Perish ye not by fortune led"

সমা ভাবিল,—'দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্ম শক্ত্যা!' ধিক্ সে মনুষ্য ভাগ্য নির্ম্মাতার একদেশ-দর্শিতাকে! স্ত্রী অঙ্গে বল কৈ? আত্মরক্ষার শক্তিটুকুও নাই যে! কিন্তু তত্রাচ সমা

পিছাইবে না, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে। কি দেখিবে? পৃথিবীর সুবিস্তীর্ণক্ষেত্রে স্বাধীনতার মুক্ত বাতাসে, আত্মনির্ভরতার বলে সে আপনাকে পূর্ণ বিকশিত করিতে পারে কিনা। সে পূর্ণ বিকাশটি কি? অর্থ, সম্পদ, মান, খ্যাতি; যা—যা পুরুষে একায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে—এই সব? তা'ই!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মস্ত বড় আগ্রা সহর। সমা অনেক ঘুরিল, কোনো উপায় করিয়া উঠিতে পারিল না,—স্ত্রীলোকের কাজ কৈ? থাকিবে না কেন? আছে,—বাজারে ঘুনসীওয়ালী মালাঘুনসী বেচিতেছে, ভুজাওয়ালী ছাতু বেচিতেছে, কেহ তরকারীওয়ালী কদু কুমড়া, কেহ গাজর ভুট্টা বেচিতেছে, কেহ গোয়ালিন্, দুগ্ধ বেচিতেছে, কেহ কাণ্ডী ফেরী করিতেছে, কেহ বা বীরাঙ্গনা মূর্ত্তিতে বিপুল জাঁতা প্রবল বলে ঘুরাইয়া দাল, আটা, ছাতু তৈয়ারী করিতেছে। ক্ষেতে ক্ষেতে স্ত্রীমজুর পুরুষের সঙ্গে একত্রে অনেক কাজ করিতেছে; কেহ বা ইমারতে মিস্ত্রীকে মসলা যোগাইতেছে ইত্যাদি। কিন্তু সমা যে কাজ চায়, সে কাগজ কলম লেখা পড়ার পদ কৈ? সমা লেখা-পড়া কিইবা জানে? কিন্তু বেশী লেখাপড়ারই বা ঠাঁই কৈ? এত বড় একটা সহর কিন্তু কি আদালতে, কি আফিসে, কি বড় বড় দোকানে, কি কারবারের স্থানে একজনও স্ত্রীলোক নাই তো? সারিবন্দী পুরুষের মাঝখানে তাহাদের সংখ্যার দ্বিগুণ চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং মনঃ সংযোগের বিষয় হইয়া থাকা কয় দণ্ড সমার পক্ষে সম্ভব হইবে তাহা না ভাবিয়াই সমা স্থির করিল,—পুরুষগুলা অত্যন্ত স্বার্থপর, প্রতি কাজে, প্রতি কর্ম্মস্থানে, অন্ততঃ অর্দ্ধেক স্ত্রীলোক থাকা উচিৎ! সমার ঔচিত্য বোধে কেহই সায় দিল না। সমার কাজ জুটিল না। সমা মনে করিল,—দেশটা এখনো—hopelessly backward।

আগ্রায় অনেক বাঙ্গালী গৃহস্থের বাস। সমা মনস্থ করিল, তাঁহাদেরই মধ্যে দুই এক ঘরে দুই একটি টিউশনি,—নাচ গানই হউক আর লেখা পড়ারই হউক—জুটাইয়া লইয়া উপস্থিত কাজ চালাইয়া লইবে।

সমা শিক্ষিতা নবীনার সাজেই থাকিত। শিক্ষা মানে, জ্ঞানের বৃদ্ধি বা মানসিক উৎকর্ষই শুধু নয়, আজকাল পায়ের জুতাটি হইতে নাকের উপর জিরো পাওয়ারের চশমাটী পর্য্যন্ত ঐ শিক্ষার মানের ভিতর ধরিয়াই লইতে হয়।

সমা বাঙ্গালী বাবু খুঁজিয়া খুঁজিয়া অনেকের কাছেই টিউশনির কিম্বা কাজ কর্ম্মের উমেদারীতে গেল। স্বদেশীয়া দুঃস্থা ভদ্র মহিলা, সহানুভূতি সকলেরই কাছে পাইল কিন্তু কাজ কর্ম্ম কিছু পাইল না। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক তাঁহাদের কাছে পাইল, পরিষ্কার জবাব কিন্তু যাঁহারা কিছু অল্প বয়স্ক তাঁহাদের কাছে পাইল, কোথাও পরিচয় জিজ্ঞাসা, কোথাও একটু ক্ষীণ আশা, কোথাওবা একটু উপদেশ,—মধ্যে মধ্যে মনে পড়াইয়া দিবার জন্য; আর সর্ব্বক্ষেত্রেই পাইল একটি রকম-ফের চাহনি! সমা প্রাণপণ চেষ্টায় চক্ষের দৃষ্টির উপর একটা কঠোর ঔদাস্য আমন্ত্রণ করিয়া বসাইয়া সারা মুখটাকে পৌরুষ কার্কশ্য মণ্ডিত করিলেও সে কার্কশ্য তাহার বয়সের নবীনতার আকর্ষণটাকে ভ্রষ্ট চরিত্র অবৃদ্ধ গুলার লোলুপ, বিদ্যুতপূর্ণ দৃষ্টি হইতে তাহাকে আবৃত রাখিতে পারিল না। হায় রে, হতভাগ্যদের জাতীয় চরিত্র!

(ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদীয়-গ্রন্থমালা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম্-এ, এল্, এম্, এস্ লিখিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বৈদ্যসমাজে ভেলসংহিতার তাদৃশ সমাদর দেখিতে পাওয়া যায় না। বাগ্ভট্ট বলেন,—

"ঋষিপ্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্ত্বা চরকসুশ্রুতৌ।
ভেলাদ্যাঃ কিং পঠ্যন্তে তস্মাদ্গ্রাহ্যং সুভাষিতম্ ॥"

ভেলসংহিতার সমাদর বাগ্ভটের সময়েও ছিল না ইহাও বুঝিতে পারা যায়। কেহ কেহ বলেন ভেলসংহিতা ও ভালুকিতন্ত্র একই গ্রন্থ। কিন্তু সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্লনাচার্য্য একথা স্বীকার করেন না, তিনি বলেন দুইখানি পৃথক্ গ্রন্থ। ইহার প্রমাণ স্বরূপ সুশ্রুত সংহিতার জ্বরপ্রতিষেধ নামক অধ্যায়ের টীকায় দেখিতে পাওয়া যায়,—

"ইদানীং ভেল-ভালুকি-পুষ্কলাবতাদীনামাপতন্ত্রবিদাং মতেন বিষমজ্বরোৎপত্তিমভিধায়" ইত্যাদি (সু, টি, উ, ৩৯অ°)।

ভালুকিতন্ত্র ভেলসংহিতা হইতে পৃথক্ শল্যতন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। ইহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

ভেলসংহিতার অনেক পাঠ টীকাকারগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন দেখা যায়। ঐ সকল টীকাকারোদ্ধৃত পাঠের মধ্যে কয়েকটী পাঠের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা,—

নিদানের জ্বরাধিকারের টীকায় বিজয়রক্ষিত,

"ভেলেঽপি পৈত্তিকঃ পঠ্যতে,—
আমাশয়স্থঃ পবনো হ্যস্থিমজ্জগতোঽপি বা।
কুপিতঃ কোপয়ত্যাশু শ্লেষ্মাণং পিত্তমেব চ ॥" ইতি

চক্রদত্ত সংগ্রহের টীকায় শিবদাস,—

"নাগরং দেবকাষ্ঠঞ্চ ধন্যাকং বৃহতীদ্বয়ম্।
দদ্যাৎ পাচনকং পূর্ব্বং জ্বরিতায় জ্বরাপহম্ ॥

তাঞ্জোর রাজকীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থতালিকার রচয়িতা পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিত মিঃ বার্ণেল বলেন "ভেলসংহিতাকে প্রধান ভাবে অবলম্বন করিয়া বাগ্ভটাচার্য্য স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বার্ণেলের উক্তি কতদূর বিচারসহ তাহা বাগ্ভট ও ডল্লনের কথা হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়।

৩। **জতুকর্ণসংহিতা**।—জতুকর্ণও মহর্ষি আত্রেয়ের শিষ্য এবং অগ্নিবেশ প্রভৃতির সহাধ্যায়ী ছিলেন। জতুকর্ণ প্রণীত সংহিতা আত্রেয় সম্প্রদায়ের অন্যতম গ্রন্থ। বর্ত্তমানে উক্ত সংহিতা আর পাওয়া যায় না। জতুকর্ণ সংহিতার অনেক পাঠ অধিকাংশ টীকাকারগণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যথা চরকের টীকায় চক্রপাণি—

(ক) "তথাচ জতূকর্ণঃ —

পৃশ্নী গোকণ্টকগুড়ৈ মূত্রার্ত্তি বস্তিশূনম্বৎ।"

(চ, সূ, ২য় অ, টী,)

(খ) যদাহ জতূকর্ণঃ—

পক্ত্বাথাম্বুশতপ্রস্থে শতভাগমিতেননতু।

তৈলপ্রস্থং পচেত্তেন ছাগীক্ষীরেণ সংযুতম্॥ (চ, সূ, ৫ অ,)

(গ) "যদুক্তং জতূকর্ণে,—দোষাণাং ধাতূনামোজোমূত্র

শকৃদিন্দ্রিয় মলায়নানামষ্টাদশক্ষয়াস্তে লক্ষ্যা স্বগুণ ক্রিয়া নাশাৎ"

(ঘ) নিদান টীকায় বিজয় রক্ষিত—"জতূকর্ণেনাপ্যুক্তং জীর্ণস্ত্রয়োদশ দিবসঃ। ইতি (জ্বরাধিকার)।

(ঙ) "যদাহ জতূকর্ণঃ—আদ্যাশ্চতস্রো দুঃসাধ্যাঃ, যমিকা মোহতৃষ্ণাবতঃ সদ্যঃ প্রাণহৃৎ। (হিক্কাশ্বাসাধিকার)।

(চ) নিদান টীকায় শ্রীকণ্ঠ—"জতূকর্ণেহপ্যুক্তং-কুপিতেন বায়ুনা দীপস্তেবাগ্নে নির্বাপণং, পিত্তেনোষ্ণ জলবৎ ককেনাদুবৎ।" (ক্ষুদ্ররোগধিকার)।

শিবদাস চক্রদত্তের টীকায় ;—বহু স্থলেই জতূকর্ণের পাঠ উদ্ধৃত করিয়া স্বমতের সমর্থন করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়,—শিবদাসের সময়েও জতুকর্ণ সংহিতা সুলভ ছিল। শিবদাস টীকাকারগণের মধ্যে বহু পরবর্ত্তী কালের লোক, ইহা পরে দেখান যাইবে।

জতূকর্ণ সংহিতার পাঠ সমূহ প্রায় সকল টীকাকারগণ কর্তৃক উদ্ধত হওয়ায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে জতূকর্ণ প্রণীত গ্রন্থ বৈদ্যকগ্রন্থ সমূহের মধ্যে একখানি সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণ্য মহাগ্রন্থ।

৪'৫। **পরাশর সংহিতা ও ক্ষারপাণি সংহিতা।**-পরাশর ও ক্ষারপাণি—ইহারাও মহর্ষি আত্রেয়ের শিষ্য ছিলেন। পরাশর সংহিতা ও ক্ষারপাণি সংহিতার অনেক পাঠ নিদানের টীকা বিজয়রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠ দত্ত কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। চক্রদত্তের টীকায় শিবদাস সেনও উক্ত সংহিতা দ্বয়ের অনেক পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা গ্রহণী চিকিৎসা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে,—

(ক) "যদাহ পরাশরঃ-

নির্বাহয়েৎ সফেনঞ্চ পুরীষং যো মুহুর্মুহুঃ॥

প্রবাহিকেতি সাখ্যাতা কেশ্চিন্নিশ্চারকস্ত সঃ॥

(খ) কাসচিকিৎসা ব্যাখ্যাবসরে,—"যদাহ ক্ষারপাণিঃ

পিপ্পল্যামলোকং দ্রাক্ষা খর্জ্জুরং শর্করা মধু।

লোহোহয়ং সঘৃতোলীঢ়ঃ পিত্তক্ষয়জকাসজিৎ॥"

পরাশর সংহিতা ও ক্ষার সংহিতা শিবদাসের সময়ে সুলভ ছিল। কিন্তু এখন উহা সুদুর্লভ হইয়াছে।

৬। **হারীত সংহিতা।**—মহর্ষি আত্রেয়ের অগ্নিবেশাদি শিষ্যষট্‌কের অন্যতম শিষ্য হারীত।

চক্রপাণি বিজয় শ্রীকণ্ঠ ও শিবদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ টীকাকারগণ কর্তৃক হারীত সংহিতার পাঠ সকল উদ্ধৃত হওয়ায় জানিতে পারা যায়, উহাঁদের সময়ে হারীত সংহিতা সুলভই ছিল। বর্ত্তমানে স্বর্গীয় কালীশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক মুদ্রিত একখানি হারীত সংহিতা দেখিতে পাওয়া যায়। উহা দেখিলে মনে হয় না এই হারীত সংহিতা মহর্ষি আত্রেয়ের শিষ্য হারীতের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। বম্বে নগরীতেও একখানি হারীত সংহিতা মুদ্রিত হইয়াছে,—তাহাও বাঙ্গলার অনুরূপ।

প্রাচীন টীকাকারগণ কর্তৃক উদ্ধৃত হারীত সংহিতার পাঠ সকল বর্ত্তমানে মুদ্রিত হারীত সংহিতার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী পাঠ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক মুদ্রিত হারীত সংহিতা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, প্রাচীন হারীত সংহিতা হইতে উহা ভিন্ন—

প্রাচীন হারীত সংহিতার পাঠ,—

(ক) চরক সংহিতার টীকায় চক্রপাণি দত্ত,—

উক্তঞ্চ হারীতে—

"নানাপুষ্প প্রকারাণাং রসসারাত্মকং মধু।
তচ্ছৈত্যাৎ সৌকুমার্য্যাচ্চ সর্ব্বৈরুষ্ণৈর্বিরুধ্যতে॥" (চ, সূ, টী, ২৭ অ,)

(খ) নিদানের টীকায় বিজয় রক্ষিত,—

"তথাচ হারীতো ব্যাহরতি,—

চাতুর্থকো নাম গদো দারুণো বিষমজ্বরঃ।
শোষণঃ সর্ব্বধাতূনাং বলবর্ণাগ্নিনাশনঃ॥" (নি, টী জ্বরাধিকার)

(গ) উক্ত গ্রন্থের বিদ্রধি নিদানের টীকায়—

"ঊর্দ্ধং প্রভিন্নেষু মুখান্নরাণাং।
প্রবর্ত্ততেঽসৃক্‌সহিতোঽপি পূয়ঃ।" ইত্যাদি।

৭। **খরনাদ সংহিতা**।—ইহাও আত্রেয় সম্প্রদায়ের অন্যতম সংহিতা গ্রন্থ। বর্ত্তমানে খরনাদ সংহিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্বরনিদানের টীকায় ও অষ্টাঙ্গহৃদয়ের টীকায় খরনাদ সংহিতার পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। (ক) নিদানের জ্বরাধিকারের টীকায় বিজয় রক্ষিত কর্তৃক উদ্ধৃত পাঠ, যথা,—

"ইতি ষড়্‌রাত্রিকঃ প্রোক্তো নবজ্বর হিতোবিধিঃ।
অতঃপরং পাচনীয়ং শমনং বা জ্বরে হিতম্॥

(খ) অষ্টাঙ্গ হৃদয়ের টীকায় হেমাদ্রি কর্তৃক উদ্ধৃত পাঠ, "যদাহ খরনাদঃ—

রসশেষে হিতঃ স্বপ্নো ঘর্ম্মাম্বু লঘু ভোজনম্।"
(অ, হৃ, সূ, ৮ম স্থী, টী,)

হেমাদ্রি স্বকৃত টীকায় "খারনাদি" নামে কয়েকটী পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা খরনাদেরই অথবা খরনাদের পুত্রের কিনা তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

(ক্রমশঃ)

———

ভ্রান্তি-বিনোদন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাজবৈদ্য—শ্রীযুক্ত শক্তিচরণ রায় বিশারদ

৬। **বন্ধন।**—১। **বন্ধনই স্বাধীনতা আর স্বাধীনতাই বন্ধন।** বন্ধনেই মুক্তি, মুক্তিতেই বন্ধন। ইহা শুনিতে পাগলামি, দেখিতে বড়ই সত্য। প্রকৃত বন্ধন ও প্রকৃত স্বাধীনতা একই কথা। **ইহাই মায়ার খেলা।** বন্ধন কাহাকে বলে? স্বাধীনতা কাহাকে বলে? এই দুইটী কথা বিচার করিলেই, এই দুইটীর স্বরূপ জানিতে পারিলেই, এই কথাগুলি স্পষ্টই বুঝা যায়।

২। **মনের বন্ধনই বন্ধন। দেহের বন্ধন বন্ধন নহে।** মনের জয়ই স্বাধীনতা, মনের অধীনতাই অধীনতা। মনের বাড় হইলে মানুষের নাশ হয় ও মনের নাশ হইলেই মানুষের চরম উন্নতি হয় (১২)। **মনই আত্মার চোর** অর্থাৎ মনের বশে যাইয়াই মানুষ উচ্ছন্ন যায়। এই মনকে নাশ করাই মানুষের কার্য্য অর্থাৎ মনের বশে চলা দূর করাই মানুষের কাজ (১৩)। দান প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্য, যম, নিয়ম, বেদ ও কর্ম্ম সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য মন বশ করা। মন বশ করাই পরম যোগ (১৪)। **মনের বশে জগৎ চলে।** দেবতাদিও মনের বশে। **মন কিন্তু কাহারও বশে নহে।** মনই কঠোর দেবতা এই মনকে জয় করিতে পারিলেই সে দেবতারও দেবতা হইতে পারে (১৫)।

৩। **সেই জন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনাকে আস্টে পিস্টে বাঁধিতেই ব্যস্ত।** অধিকাংশ জিনিষই তাহার করিতে নাই। **(নিষেধ)।** কতকগুলি জিনিষ তাহাকে করিতেই হইবে **(বিধি)।** বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই বিধি নিষেধ দিয়া আপনাকে বাঁধিতেই ব্যস্ত। **সংযমই তাহার প্রাণ। নিয়মই তাহার জীবন। মন বশ করাই তাহার একমাত্র লাভ। মনের অধীন হওয়াই তাহার এক মাত্র ক্ষতি। মন্‌কা কহনা কভি নহি করনা।** প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে বলিতেছেন—হে রাজন্ (পিতা নহে) তুমি বাহুবলে **দশদিক জয় করিয়া** অর্থাৎ পৃথিবী স্বর্গ ও পাতাল প্রভৃতি জয় করিয়া নিজেকে **স্বাধীন** মনে করিতেছ, এটী তোমার একেবারেই **ভুল।** তুমি কাম ক্রোধাদির বশে অতএব **মনকে জয় করিতে পার নাই।** কাযেই তুমি মোহগ্রস্ত ও আমার কাছে তোমার কোন জারিজুরি খাটিবে না। (১৬)

---

(১২) মনসোভ্যুদয়ো নাশো মনোনাশো মহোদয়ঃ। জ্ঞমনো নাশমভ্যেতি মনোহজ্ঞস্য হি শৃঙ্খলা॥ মহোপ°। (১৩) প্রবুদ্ধোস্মি প্রবুদ্ধোঽস্মি দুষ্টশ্চোরোহয়মাত্মনঃ। মনো নাম নিহন্ম্যেনং মনসাস্মি চিরং হৃতঃ॥ মহোপ°।

(১৪) দানং স্বধর্ম্মো নিয়মো যমশ্চ শ্রুতানি কর্ম্মাণি চ সদ্‌ব্রতানি। সর্ব্বে মনোনিগ্রহ লক্ষনান্তাঃ পরো হি যোগো মনসঃ সমাধিঃ॥ ভাঃ ১১।২৩।৪৬ (১৫) মনোবশেহন্যে হ্যভবন্ স্ম দেবা মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি। ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্ যুঞ্জ্যাৎ বশে তং স হি দেবদেবঃ॥ ভাঃ ১১।২৩।৪৮ (১৬) দস্যূন্ পুরা ষন্ন বিজিত্য লুম্পতো মন্যন্ত একে স্বজিতা দিশো দশ। জিতাত্মনোহজ্ঞস্য সমস্য দেহিনাং সাধোঃ স্বমোহ প্রভবা কুতঃ পরে॥ ৭।৮।১১

৪। **অধীনতাই যে স্বাধীনতা ও স্বাধীনতাই অধীনতা** তাহা দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট হইবে। যে **সত্যের অধীন** যে মিথ্যা বলিতে ভয় পায়—সে স্বাধীন কি পরাধীন? আর যে সত্যের অধীন নহে যে মিথ্যা বলিতে আসিলে পিছায় না—সে স্বাধীন না পরাধীন? যে **চুরি চামারি** করিতে পারে না সে স্বাধীন? না চোর চামার স্বাধীন? যে চরিত্রবান্ যে ব্যভিচারের নামে শিহরিয়া উঠে সে স্বাধীন? না যে **পরস্ত্রীগামী** সে স্বাধীন? বিধি-নিষেধ মানিয়া বিধি নিষেধের অধীন হওয়া স্বাধীনতা? না বিধি নিষেধ না মানিয়া মনের কথা শুনাই স্বাধীনতা?

৫। যদি বল **দেহের বন্ধনই অধীনতা** ও দেহ কাহারও অধীন না হইলেই স্বাধীনতা হয়। প্রথমতঃ দেহ কাহারও অধীন নহে ইহা কখনও হইতেই পারে না। **দেহ** যে **ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা প্রভৃতির অধীন** তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। অধিকন্তু লোকে পয়সার জন্য করে না এমন কাজ নাই। অতএব **দেহ সর্ব্বদাই পয়সার বশে।** আর যাহার দেহ অন্যের বশে কিন্তু মন অন্যের বশে নহে সে অন্যের অধীন হইয়াও অধীন নহে। কিন্তু যাহার দেহ পরের বশে নহে কিন্তু মন পরের বশে সে স্বাধীন দেখাইলেও প্রকৃত পরাধীন।

৬। **মনকে বশে রাখাই স্বাধীনতা ও মনের বশে হওয়াই পরাধীনতা** ইহাই সর্ব্বজ্ঞ শাস্ত্রের আদেশ। সভ্য কলিতে এই সত্যের ঠাঁই নাই। এখন স্বাধীনতার এক অপরূপ অর্থ আরম্ভ হইয়াছে। সে অর্থ যে কি তাহা বুঝিবার যো নাই। স্ব ও অধীনতা এই দুইটী শব্দ হইতে স্বাধীনতা শব্দটী হইয়াছে। অতএব স্ব শব্দের অর্থের উপর স্বাধীনতা শব্দের অর্থ নির্ভর করে। শাস্ত্রে স্ব শব্দের দ্বারা পুরুষকেই বুঝায়। সভ্য কলি স্ব শব্দের দ্বারা কি বুঝে বুঝা বড় কঠিন।

৭। **কালেয় স্বাধীনতা** অর্থাৎ কলিকালের স্বাধীনতা কি? এই সভ্য কলিযুগে যে যত উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারিবে, যে যত বিধি নিষেধাতীত হইতে পারিবে অর্থাৎ যে যত নিয়ম কানুন না মানিয়া নিজের ইচ্ছামত চলিতে পারিবে, যে যত কামস্রোতে গা ভাসান দিতে পারিবে সে ততই স্বাধীন। অতএব স্ব শব্দ এখানে কাম ইচ্ছা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বুঝায় পুরুষকে বুঝায় না। আবার স্বাধীন দেশ বলিলে নিজের দেশের অধীন বুঝায়, পুরুষকে বুঝায় না। এক কথায় সভ্য **কলিতে** স্বাধীনতা শব্দে **স্ব শব্দ কাম, ইচ্ছা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও দেশ বুঝায়, পুরুষ বুঝায় না।**

৮। এই কালের অর্থ-বিপর্য্যয় ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সভ্য কলিতে যে স্বাধীনতা শব্দের উল্টা অর্থ করিয়াছে সেই উল্টা অর্থ ছাড়িয়া এখন দেখা যাউক যে "কালেয় স্বাধীনতা" কি অপরূপ বস্তু। নিজের **ইচ্ছামত চলিতে পারিলেই,** যা খুসী তা করিতে পারিলেই, মানুষ **স্বাধীন** হয়। কিন্তু মানুষের ইচ্ছামত করিবার শক্তি কতটুকু? মানুষ সর্ব্বদাই সুখের চেষ্টায় ঘোরে, কিন্তু সর্ব্বদাই দুঃখ পায় (১৭)। কে রোগ চায়? কে পুত্রশোক চায়? কে মনঃকষ্ট চায়? কে গরীব হইতে চায়? কে চায় না আমি ধনে মানে কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ হই? ইত্যাদি। কয়জনেরই বা ইচ্ছাপূর্ণ হয়? **মানুষ ইচ্ছার দাস** ইচ্ছা মানুষের দাস নহে। **কাযেই মানুষমাত্রই পরাধীন।**

---

(১৭) সুখায় দুঃখমোক্ষায় সঙ্কল্প ইহ কর্ম্মিনঃ। সদাপ্নোতীহয়া দুঃখমনীহায়াঃ সুখাবৃতঃ। ভাঃ ৭।৭।৪২

৯। **দেশ স্বাধীন বলিলে কি বুঝায়?** দেশ দেশের অধীন হয় না। **মাটি** কেমন করিয়া শাসন করিতে পারে? দেশ দেশের লোকের অধীন হয় না। দেশ যদি **সকলেরই** অধীন হইল তাহা হইলে অধীন হইল কে? দেশ যদি **কতকগুলি লোকের অধীন** হইল ত দেশের লোকেরা স্বাধীন বলা যায় কিরূপে? কালেয় বুদ্ধিতে এই সব বুঝা সুকঠিন! কাযেই উদাহরণ দিয়া স্পষ্ট করা হইতেছে।

১০। এখন দেশের লোকেরা স্বাধীন, দেশের লোকেরা রাজা, এই কথা বলিলে কেবল সংখ্যর্ষি শাসনই বুঝায় অর্থাৎ ভোটাভুটি করিয়া রাজ্যশাসন করা বুঝায়। **ভোটাভুটির ফলে ন্যায় অন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়িয়া লোকে দল বাঁধে** ও কতকগুলি দলের সৃষ্টি হয়। নিজের দলের প্রস্তাব হইলে দলের সকলকে পরাধীন হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়িয়া ভোট দিতেই হইবে। ভোটাভুটিতে যখন যে দল জিতে সেই দলই শাসন করে। **দেশ সকল সময় একটী দলের অধীন**। কখনও কখনও একটী দল সকল দলকে হারাইতে পারে না। তখন ২।৩টী দল মিলিয়া প্রধান হয়।

১১। এখন জার্ম্মাণি যে স্বাধীন দেশ একথা কেহই অস্বীকার করিবে না। এই স্বাধীন জার্ম্মানিতে নাজিদল বড়ই প্রবল হইয়াছে। তাহারা যাহা ইচ্ছা অত্যাচার করিতেছে ও সকলকেই নীরবে সহ্য করিতে হইতেছে। তাহারা জার্ম্মাণ দেশবাসীর বিষয় সম্পত্তি কাড়িয়া লইতেছে অনেকের রোজগার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অনেকের ধর্ম্মনাশ করিতেছে ও শেষে এই আইন করিয়াছে যে যে নাজিদলের বিরুদ্ধে যাইবে তাহারই জেল হইবে এমন কি প্রাণদণ্ডও হইতে পারে। **যত জার্ম্মান নাজিদল ভুক্ত নহে তাহারা যে স্বাধীন তাহাও কি বলিতে হইবে? আজ নাজিদলের যাহারা এই ঘোর অধর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক তাহারাও স্বাধীনভাবে এই ঘোর অধর্ম্ম করিতেছে।**

১২। **কালেয় রাস্তায় স্বাধীনতা নাই** স্বাধীনতা থাকিতেও পারে না; স্বাধীনতা বলিলে স্বাধীনতা বুঝায় না অধীনতা বুঝায়। যে যত বিধি নিষেধের অধীন, যে যত ধর্ম্মের অধীন, যে যত অধর্ম্ম ত্যাগ করে সে ততই স্বাধীন। যে দেশে যতই ধর্ম্মাধর্ম্ম মানিয়া চলে সে দেশ ততই স্বাধীন। ইহাই মায়ার খেলা। ইহাই মায়ার বৈপরীত্য। মায়ার বৈপরীত্য যে কি রকম সত্য তাহা বিজ্ঞানের দ্বারা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। শ্রীভগবান্ মানুষের নিজের শরীরেই সেই মায়ার খেলা অনবরত দেখাইতেছেন। তাই মলত্যাগ করিতে হইবে বলিয়াই ত্যাগ করিতে দেন না, হৃৎপিণ্ডকে জোরে চালাইয়া আস্তে আস্তে করেন, রক্তে চিনি বাড়াইয়া কমাইয়া দেন—ইত্যাদ (ডাক্তারী পঃ ১২।৫ দেখ)। তাই প্ল্যাঙ্ক বলিয়াছেন—পদার্থবিদ্যা দুইটী বিপরীত জিনিষের উপর খাড়া আছে। **এখন** কোন দেশই স্বাধীন নহে **সকল দেশই পরাধীন। সেই জন্যই কোন দেশেই সুখ** নাই। খাইবার যথেষ্ট আছে অথচ লোকে খাইতে পায় না। কত লোকের যে উপার্জ্জন বন্ধ তাহা আর বলা যায় না। এই জগদ্ব্যাপী দুঃখের প্রতীকারের কতই না চেষ্টা হইতেছে কিন্তু সবই ব্যর্থ। শাস্ত্রে বলে নিজের বশে থাকাই সুখ ও পরের বশে থাকাই দুঃখ (১৮)। **দুঃখ সাগরে পৃথিবীর সকল দেশ ভাসাইয়া শ্রীভগবান্ জানাইয়া দিয়াছেন সকল দেশই পরাধীন।** শাস্ত্র আও বলেন অধর্ম্ম হইতেই দুঃখ ধর্ম্মেই

সুখ (১৯)। কাজেই শ্রীভগবান্ ঢাক পিটাইয়া বলিতেছেন—সকল দেশেই ধর্ম্ম নাই, তাই এই জগদ্‌ব্যাপী দুঃখ।

৭। **গানবাজনা।**—১। আজ কাল গানবাজনা ও নাচ শিখাইবার এক ধুয়া উঠিয়াছে। ধুয়ার স্বভাব জ্ঞানলোপ করা। এখানেও তাহাই হইতেছে। ছেলে বুড়ো জ্ঞান হারাইয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়াছে। **৭২ বৎসরের বুড়ো সকলের সম্মুখে স-দাড়ি নাচিবার জন্যই পাগল।** কেন নাচে? **নাচিয়া কি লাভ?** এ সব ভাবিবার অবসরই নাই। এক কথায় **ধুয়োয় পড়ে নাচি** লাভ আবার কি? ধুয়োই লাভ।

২। ধুয়োর এক মস্ত গুণ যে ধুয়ার বস্তুকে একেবারে নির্দ্দোষ দেখায়। মায়াতেই সংসার সৃষ্ট। মায়ার বৈপরীত্য জন্য জগতে কোন বস্তু নির্দ্দোষ নহে। কিন্তু ধুয়ার বস্তু মায়াতীত কাযেই নির্দ্দোষ। মায়ার সংসারে থাকিয়া **ধুয়ার বস্তু মায়াতীত** হইল কিরূপে? জীবন্মুক্ত পুরুষ যেমন সংসারে থাকিয়াও মায়াতীত সেইরূপ ধুয়াধারী সংসারে থাকিয়াও মায়াতীত। **জীবন্মুক্ত পুরুষ মায়ার বশে না থাকিয়া মায়াতীত। ধুয়াধারী**মায়ার বশে থাকিয়া **মায়া না মানিয়াই মায়াতীত** এই মাত্র তফাৎ। ধুয়াধারী যখন নিজে মায়াতীত তখন তাহার সাধের ধুয়া বস্তু মায়াতীত হইবে ইহা আর বিচি কি?

৩। গান বাজনা ও নাচ কলাবিদ্যা। সর্ব্বশুদ্ধ চৌষট্টি কলা আছে। গান বাজনা ও নাচ উহাদের মধ্যে তিনটি। কাজেই এই তিন কলাও শিখিতে হয়। শাস্ত্রে গীতের অনেক প্রশংসা আছে। সংসার দুঃখে যে সব উত্তম লোক পীড়িত তাহাদেরই অনুগ্রহের নিমিত্ত ভগবান মহাদেব গীতবাদ্য প্রকাশ করিয়াছেন (২০)। কাজেই **গীতবাদ্য কেবল উত্তম লোকের জন্য** আর কাহারও জন্য নহে। গীতের দ্বারা **পরমপদ পাওয়া** যায়, অন্ততঃ রুদ্রলোকও পাওয়া যায় (২১)। অতএব গীত জনচিত্ত হরণ পরমানন্দ-বিবর্দ্ধন ও বিমুক্তি বীজ অর্থাৎ গীতের দ্বারা মানুষে চিত্ত বশীভূত হয়, পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় ও মুক্তি লাভ হয়।

৪। এখন দেখা যাইতেছে **গীত হইতে মুক্তিলাভ হয় বলিয়াই গীতের প্রশংসা।** কাযেই যে গীতের দ্বারা মুক্তি লাভ হয় সেই গীত অতি উত্তম। অন্য গীত ভয়ঙ্কর। কেন না মন বশ করিয়া কুপথে লইয়া যায়, ভগবদ্বিমুখ করিয়া দেয়। বাদ্য ও নৃত্য গীতের সহচর। **গীত বাদ্য ও নৃত্য কেবল ভগবানের সম্মুখে ও ভগবৎ প্রাপ্তির জন্যই করা যায়।** নতুবা এই তিনই বিষবৎ বর্জ্জনীয়। এমনকি ভগবৎ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেও সকল বাদ্য ভাল নহে। যথা **শিব মন্দিরে কর**তাল **বাজাইতে নাই।** সেইরূপ **সূর্য্যমন্দিরে শঙ্খ** আর **দুর্গামন্দিরে বাঁশী ও মাধুরী** বাজাইতে নাই। (২২)

---

(১৮) সর্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বং আত্মবশং সুখং।

(১৯) অধর্মমূলং বৈগুণ্যং বায্বাদীনাং প্রজায়তে। অধর্মাদ্ধি ভবেচ্ছোকো জনানাং নান্যথা ক্বচিৎ। চরক।

(২০) সংসার-দুঃখ-দগ্ধানাং উত্তমানামনুগ্রহাৎ। প্রভুনা শঙ্করেনাত্র গীতং বাদ্যং প্রকাশিতম্।৩৫

(২১) গীতজ্ঞো যদি গীতেন নাপ্নোতি পরমং পদম্। রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে।

(২২) শিবাগারে ঝল্লকং চ সূর্যগারেবংশীবাদ্যং মাধুরী চ ন বাদয়েৎ।

৫। **এখনকার গীতাদিতে ভগবানের সম্বন্ধও নাই। উত্তমাধমবিচারও নাই** অর্থাৎ যে গীতাদি করিল সে লোক ভাল কি মন্দ বিচার করিয়া দেখিবারও দরকার নাই। কাযেই এখনকার গীতাদি **বিষবৎ** ত্যাগ করা উচিত। অধিকন্তু এখনকার গীতাদি যে সব জিনিষের সম্বন্ধ করে তাহাতে উহা বিষের বিষ, হলাহল। **মহাদেব ভিন্ন এই দুর্জ্জয় বিষ কাহারও হজম করিবার যো নাই।** যখন সমুদ্র মন্থনে হলাহল উঠিয়া সমগ্র জগৎ ধ্বংস করিতে বসে তখন দেবতারা অন্য উপায় না পাইয়া মহাদেবের শরণাগত হন। মহাদেব সেই কালকূট হাতে মাড়িয়া তৎক্ষণাৎ খাইয়া ফেলেন (২৩)। কালকূট সেখানেও আপনার প্রভাব দেখাইতে ছাড়িল না। মহাদেবের গলা নীল হইয়া গেল। মহাদেব নীলকণ্ঠ হইলেন। ইহাই সাধুপুরুষের সর্ব্বোত্তম অলঙ্কার (২৪)।

৮। **কতকগুলি অলীক ছুতা।**—১। অলীক হিন্দুদের কতকগুলি অলীক অর্থাৎ মিথ্যা ছুতা আছে, যথা। (১) চিরকাল এক নিয়ম চলিতেই পারে না। পরিবর্ত্তন চাই। টেনিসনও বলিয়াছেন যে যতই ভাল রীতি হউক কালক্রমে উহাই খারাপ হইয়া যায় (a)। (২) দলপুষ্টি না হইলে কিছুই হয় না। অতএব যাহাতে অন্ত্যজেরা মুসলমান কি খৃষ্টান না হয় সেই জন্য অস্পৃশ্যতা ত্যাগ করিয়া অন্ত্যজের সহিত ব্রাহ্মণের এক হওয়া চাই। যখন শাস্ত্রের বিরুদ্ধে বলিবার আর কিছুই নাই তখনই কথাগুলি বড় কড়া বলিয়া আপত্তি।

২। **পরিবর্ত্তন—পরিবর্ত্তন** যে প্রয়োজন তাহা শাস্ত্রই বলিতেছেন ও **সেই জন্য শাস্ত্রে কলিকালের ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন।** অন্য কিছু পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইলে শাস্ত্র নিজেই তাহার ব্যবস্থা করিতেন। পরিবর্ত্তন যেমনই প্রয়োজন সংরক্ষণ (পরিবর্ত্তন না করা) তেমনই প্রয়োজন। ইহাই মায়ার খেলা। জগতের সৃষ্টি হইতে লোকে চোখ দিয়া দেখে, কান দিয়া শুনে, পা দিয়া চলে ইত্যাদি। **পরিবর্ত্তন চাই বলিয়া কি কান দিয়া দেখিতে হইবে,** চোখ দিয়া শুনিতে ও হাত দিয়া চলিতে হইবে? না চোখ দিয়া হাঁটিতে হইবে ও পা দিয়া দেখিতে হইবে।

৩। একটু তাকাইয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন সামান্য। **অধিকাংশ জিনিসেরই পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই।** পরিবর্ত্তন করিতে গেলেও পরিবর্ত্তন করিবার **যোগ্যতা থাকা চাই।** এই যোগ্যতা যে কি দরকার ও এই যোগ্যতার যে কত অভাব তাহা স্থূল আইনের চর্চ্চা করিলেই জানিতে পারা যায়। দেশের **বাছাই বাছাই লোক** যখন **এই সামান্য আইনই পরিবর্ত্তন করিতে পারে না,** তখন সূক্ষ্ম আইন পরিবর্ত্তন করিতে পারে এমন শক্তি কাহারও নাই।

দলপুষ্টি—দলপুষ্টি যে বিশেষ প্রয়োজন তাহা কেহ অস্বীকার করে না (২৫)। কিন্তু

(২৩) পপৌহ হালাহলং সদ্যঃ শিবায় জগতঃ শিবঃ॥

(২৪) তত্রাপি দর্শয়ামাস স্ববীর্য্যং জল কল্মষং। তচ্চকার গলে নীলং তচ্চ সাধোর্বিভূষণম্॥

(২৫) সংহতি কার্য্যসাধিকা।

(a) Lest one good custom should corrupt the world—Tennyson.

মায়ার খেলায় দল পুষ্টি যে সর্ব্বনাশের কারণ ইহাও মনে রাখিতে হইবে (২৬)। কে না জানে আঙ্গুল **সাপে কামড়াইলে সে আঙ্গুলই তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলিতে হয়?** কে না জানে যখন হাত কি পা পচিয়া যাইতে থাকে আর পচা কিছুতেই নিবারণ হয় না তখন প্রাণ বাঁচাইবার জন্ত সেই হাত কি পা কাটিয়া ফেলিতে হয়?

৫। হিরণ্যকশিপু বলিয়াছেন পরও হিতকারী হইলে ছেলের মত হয়। যেমন ঔষধ। নিজের দেহজাত পুত্র কখন কখন অহিতকারী হয়। যেমন দেহের রোগ। যে অঙ্গ অহিত অর্থাৎ প্রাণনাশকারী সে অঙ্গ কাটিয়া ফেলিবে যাহাতে অবশিষ্ট অঙ্গ সুখে জীবিত থাকে অর্থাৎ যাহাতে প্রাণ বাঁচে (২৭)। কথায় বলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে অর্দ্ধেক ত্যাগ করিয়া বাকি অংশ বাঁচায় (২৮)।

৬। কোথায় ত্যাগ করিতে হইবে ও কোথায় দলপুষ্টি করিতে হইবে তাহা লাভ লোকসানের উপর নির্ভর করে। **হিন্দুর কাছে ধর্ম্মই সর্ব্বস্ব।** প্রাণ যাক্ ধর্ম্ম থা'ক ইহাই হিন্দুর কামনা। ধর্ম্মের জন্ত একলা বনে বাস করাও ভাল তবু ধর্ম্ম খোয়াইয়া রাজা হওয়া ভাল নহে। হিন্দু জানে ধর্ম্মপালন করিলে ইহজন্মে তাহার যতদূর সুখ সম্ভব ততদূরই হইবে ও পরজন্মে পরমপদ মিলিবে। **যে সুখ ভাগ্যে নাই ধর্ম্মত্যাগ করিলেও সে সুখ মিলে না।** অতএব সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ধর্ম্মপালন ভাল ও সর্ব্বস্ব লাভ করিয়াও ধর্ম্ম খোয়ান উচিত নহে। ধর্ম্ম খোয়াইয়া যাহারা দলপুষ্টি করিতে যায় সেই মূর্খ নাস্তিকগণ জানে না **যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই জয়** (২৯) **কেননা স্বয়ং ভগবান্ ধর্ম্মের পক্ষে** (৩০)।

৭। হিরণ্যকশিপুর মত প্রতাপী হয় ও নাই হইবেও না হইতে পারেও না। যাহার ভ্রূভঙ্গিতেই (চোখরাঙ্গানিতেই) দেবতারা স্বর্গে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন সেই **হিরণ্যকশিপুকেও শিশু প্রহ্লাদের কাছে সকল রকমে পরাজিত**লাঞ্ছিত হইয়া শেষে প্রাণ হারাইতে হইল। লক্ষ লক্ষ পাপিষ্ঠ মিলিলে একজন সাধু হয় না। **একজন সাধু যাহা করিতে পারেন লক্ষ লক্ষ পাপিষ্ঠ তাহা করিতে পারে না।**

৮। অলীক হিন্দুদের ধর্ম্ম নাই ধর্ম্মের ভাণ আছে। অতএব উহারা কথায় কথায় ধর্ম্ম খোয়াইতেই ব্যস্ত। এই অলীক হিন্দুরা খৃষ্টান কি মুসলমান হইলে অর্থাৎ হিন্দুসমাজ হইতে বাহিষ্কৃত হইলে হিন্দুসমাজ সবলই হইবে। দুর্ব্বল হইবে না। হিন্দুদের উচিত যে **অলীক হিন্দুদের তাড়াইয়া আপন ধর্ম্ম রক্ষা করে।**

৯। **কড়া কথা**—কড়া কথা কাহাকে বলে? যে কথা **অক্ষরে অক্ষরে সত্য,** যাহার আর **উত্তর নাই** যাহা ঘাড় পাতিয়া মানিতেই হইবে অথচ যাহা নিজ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ যাহা **মানিতে বড় কষ্ট** হয় তাহাকেই **কড়া কথা** বলে। কথা প্রকৃত যতই কড়া হউক না

(২৬) সংহতি কার্য্যবাধিকা। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

(২৭) পরোঽপ্যপত্যং হিতকৃদ্‌যথৌষধং স্বদেহজোঽপ্যাময়বৎ সুতোঽহিতঃ। ছিন্দ্যাৎ তদঙ্গং যদুতাত্মনোঽহিতং শেষং সুখং জীবতি যদ্‌বিবর্জনাৎ। ভা। ৭।৫।৩৭।

(২৮) সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

(২৯) যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ। (৩০) ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

কেন যদি তাহার অনায়াসেই উত্তর দেওয়া যায় ত তাহা কড়া কথা নহে। আর যদি কথা একেবারে সত্য হয় ও তাহার জবাব না থাকে তাহাকে কড়া কথা বলিয়া জানিবে। এই কড়া কথার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে গেলে খাটি সত্য বলিলে কখনই চলিবে না অপর পক্ষের মিথ্যা অহঙ্কারের পুষ্টির জন্য **সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিলাইতে না পারিলেই কড়া কথা হয়।**

১০। যথা, অশ্রুতি-গ্রন্থিগুলির জন্য ডাক্তারী শাস্ত্র **ভগবান্‌কে গাধা** বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিল। **ইহা কড়া কথা নহে।** কেন না ইহা নাস্তিকদের পক্ষে। কিন্তু যখন দেখা গেল অশ্রুতিগ্রন্থিই সব তখন **ডাক্তারী শাস্ত্রকে মূর্খ নাস্তিক ধৃষ্ট বলিলে বড়ই কড়া কথা** হয়। কেন না কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু যদি সত্য উড়াইয়া দিয়া মিথ্যার আশ্রয়ে ডাক্তারী-শাস্ত্রের এই সদ্‌গুণের কীর্ত্তন করা না যায় তাহা হইলে আর কড়া কথা হয় না।

১১। অর্থাৎ এক কথায় ভগবান্‌কে শাস্ত্রকে ও সত্যকে যে যত গালি দিতে পার দেও। কোনও বাধা নাই। বরং ভাল। কিন্তু যদি **শাস্ত্রের পক্ষ** হইয়া **নাস্তিকের বিপক্ষে** বলা যায় ও তাহার **উত্তর করা না যায়** উহা অবশ্যই **বড়ই কড়া** কথা হইবে। জুয়াচোর লোকই কড়া কথা বলিয়া নিজের দোষ ঢাকিতে চায়। মানুষ হইলে মুক্তকণ্ঠে আপনার দোষ স্বীকার করে কিম্বা কথার উত্তর দেয়। **মানুষ কখনও কড়া কথা বলিয়া জুয়াচুরি করে না।**

২য় অধ্যায়—বিজ্ঞান ভ্রান্ত।

৯। **রসায়ন** (Chemistry)—১। রসায়ন চিরকালই বলে **পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন।** শাস্ত্র বলেন পদার্থ কেবল দেখিতে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু প্রকৃতই এক, কেন না শ্রীভগবান্ একাই অনেক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন (৩১)। সমস্ত পদার্থই শ্রীভগবানের মূর্ত্তি। কাযেই তাহারা প্রকৃতই এক। শ্রীভগবান্ ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। শাস্ত্র লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে এই সব বলিয়াছেন। আজ প্রায় ২৫০ বৎসর মাত্র রসায়নের উৎপত্তি। তথাপি অহঙ্কারে মত্ত ও অন্ধ হইয়া **রসায়ন এই লক্ষ লক্ষ বৎসরের সত্যকে হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে কলির ভেড়ার দল** শাস্ত্রকে পাগল, গাঁজাখোরী, অসভ্য, কুসংস্কার-পূর্ণ বলিয়া গালি দিতে লাগিল। কিন্তু আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল রসায়নকেও মানিতে হইয়াছে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ নাই **সোণা রূপা তামা লোহ পারা গন্ধক কয়লা প্রভৃতি** সবই এক পদার্থ—**সমস্তই হাইড্রোজেন হইতে উৎপন্ন।** কলির ভেড়াদের তথাপি চৈতন্য নাই অনুতাপ নাই। সোণা রূপা প্রভৃতি কঠিন পদার্থ। হাইড্রোজেন বায়ুর ন্যায় চঞ্চল। তথাপি এই বায়ুর ন্যায় চঞ্চল হাইড্রোজেন হইতে লৌহের ন্যায় কঠিন পদার্থও উৎপন্ন হইয়াছে।

২। **রসায়ন মতে পদার্থ দুই প্রকার—মূল পদার্থ ও মিশ্র পদার্থ।** মূল পদার্থ ৯২টী ও মিশ্র পদার্থ অসংখ্য। মূল পদার্থে একরকম পদার্থই পাওয়া যায়, দুই রকম পাওয়া যায় না। দুইটী কিংবা তাহার চেয়ে অধিক মূল পদার্থ মিশাইয়া মিশ্র পদার্থ হয়। যেমন সোণা,

(৩১) একোঽহং বহু স্যাম্। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

রূপা তামা লৌহ পারা গন্ধক কয়লা প্রভৃতি মূল পদার্থ। ইহাদের ভিতর অন্য কোন পদার্থ নাই। অর্থাৎ সোণাতে কেবল সোণা আছে রূপায় কেবল রূপা আছে ইত্যাদি। আর জল বায়ু কাঠ মাটি প্রভৃতি সমস্তই মিশ্র পদার্থ। জলের ভিতর দুইটী মূল পদার্থ আছে বায়ুর ভিতর মোটামুটি দুইটী মূল পদার্থ আছে ইত্যাদি। যখন সকল পদার্থই হাইড্রোজেন হইতে উৎপন্ন তখন আর মূল পদার্থ ও মিশ্র পদার্থ—এই ভেদ থাকিতেই পারে না। তা ছাড়া রসায়ন নিজেই বলে **৯২টী মূল পদার্থের মধ্যে অনেকগুলিই মিশ্র। যেমন পারা** ছয়টী পদার্থ মিশাইয়া হয়। তেমনই **দস্তা** ৭টী **সীসা** ৬টী **রাং** (টিন) ১১টী পদার্থ মিশাইয়া হইয়াছে।

৩। দেশ কাল অবস্থার উপর বস্তুর গুণ নির্ভর করে এই কথা শাস্ত্র লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া বলেন। বহুকাল ধরিয়া এই কথা অস্বীকার করিবার জন্য রসায়ন কতই না গোঁজা দিল। কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠিল না। শেষে স্থান অর্থাৎ দেশের উপর ও অবস্থার উপর বস্তুর গুণ নির্ভর করে একথা মানিতেই হইল।

৪। **অণুর[1] ভিতর পরমাণুর স্থান হিসাবে একই টার্টারিক অ্যাসিড চারি প্রকার[2]** হয়। চারি প্রকারই একই পরমাণু দ্বারা গঠিত। কোনও বিশেষ নাই। কেবল চারি প্রকারে অণুর ভিতরে পরমাণুর স্থান ভিন্ন ভিন্ন, এই প্রভেদ।

৫। Ethyl aceto-acetate (এথিল-অ্যাসিটো অ্যাসিটেট) এর গুণ **অবস্থার উপর নির্ভর করে। গুণের তারতম্য অনুসারে বস্তুর কোনই তারতম্য নাই।** কাযেই ভিন্ন আচরণ করিলেও দুইটীকেই একই বস্তু বলিতে হইবে। Ethyl aceto acetate এর (এথিল অ্যাসিটো অ্যাসিটের) পরমাণুগণ এক, অণুর ভিতর পরমাণুর স্থানও এক, অথচ **একই বস্তু এক সময় একরকম আচরণ করে ও আর এক সময়ে আর একরকম আচরণ করে।**

৬। শাস্ত্র বলেন, ভগবানের চরণ হইতে গঙ্গা বাহির হইয়াছেন (৩৩)। অতএব গঙ্গার জল অন্য জলের ন্যায় নহে। ইহা দেহ ও মনকে পবিত্র করে। রসায়ন এই কথা শুনিয়া কতকাল ধরিয়া পাগলের হাসি হাসিল। রসায়ন মতে সব জল এক (H_2O)। জলে জলে তফাত হইলে রসায়ন শাস্ত্রই মিথ্যা। কিন্তু **এই পাগলের হাসিও সত্যকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না।** আজ ৪।৫ বৎসর বাহির হইয়াছে যে গঙ্গাজলের কি আশ্চর্য্য মহিমা, রোগের বীজাণু (Bacteria) উহাতে তিষ্ঠিতেই পারে না। **Ethyl aceto acetate** (এথিল অ্যাসিটো অ্যাসিটেট্) যেমন **Ethyl acete acetate** (এথিল অ্যাসিটো অ্যাসিটেট্) **হইতে ভিন্ন সেইরূপ জলও জল হইতে ভিন্ন।** অর্থাৎ পদার্থ নিজেই নিজ হইতে ভিন্ন। **রসায়নের সাধের পাগলামি কালের বশে ভাঙ্গিয়া গেল কিন্তু শাস্ত্রের দ্বেষ অর্থাৎ সত্যের দ্বেষ ঘুচিল না।**

---

(৩৩) বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।

1. অণু = molecule পরমাণু = পরম + অণু—অণু অপেক্ষা ছোট, atom.

2. Four kinds of Ttartaric Acid owing to different positions of atoms in the molecules.

১০। পদার্থ বিজ্ঞান (Physics)—১। পদার্থবিজ্ঞানকে মোটামুটি দুই ভাগ করা যায়—নববিজ্ঞান (ইংরাজী ১৬৫০—১৯৮০ সাল) ও নব্য নববিজ্ঞান (ইংরাজী ১৯০০—১৯৩৩ সাল)। নববিজ্ঞান যাহা যাহা বলিয়াছে নব্য নববিজ্ঞান প্রায় সবই উল্টাইয়া দিয়াছে। **অর্থাৎ নব্য নববিজ্ঞান অনুসারে নববিজ্ঞান একেবারে ভুল।** অর্থাৎ ২৫০ বৎসরের অটুট অকাট্য সিদ্ধান্ত আজ ৩০ বৎসর হইতে একেবারে ভুল হইয়া গিয়াছে। **অথচ এই অটুট অকাট্য ভুলের উপর অটুট অকাট্য বিশ্বাস করিয়া** কলির ভেড়ার দল সনাতন শাস্ত্রের **অটুট অকাট্য সত্যকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। ধন্য ভেড়ার ভেড়ামি।**

২। পদার্থ (Matter), শক্তি (Force), অন্যোন্যাকর্ষণ Gravitation) (1) ও ভারহীন ভারবান্ পদার্থের তরঙ্গ (waves in Ether), তেজ (Energy) এই পাঁচটী বস্তুর উপর নববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ নির্ভর করে। **নব্য নববিজ্ঞান বলে শক্তি ও অন্যোন্যাকর্ষণ নাই।** এই দুইটী মিথ্যা হইলে **নববিজ্ঞানের বার আনা সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা হইয়া গেল।** Statics (স্থিতিবিজ্ঞান), Dynamics (গতিবিজ্ঞান), Hydrostatics (জলবিজ্ঞান) প্রভৃতি force (শক্তি) ও gravitation (অন্যোন্যাকর্ষণ) না থাকিলে থাকিতেই পারে না।

৩। **ভারহীন অথচ ভারবান্ পদার্থ।**—ইহা নববিজ্ঞানের ও নব্য নববিজ্ঞানের এক **অপূর্ব্ব কল্পনা।** নব ও নব্যনব উভয়েই বলে পদার্থ মাত্রেই ভারবান্ অর্থাৎ পদার্থ মাত্রেরই ভার আছে। ঈথার (Ether) পদার্থ। কাজেই ভারবান্ অথচ নব ও নব্যনব মতে ঈথার ভারহীন অর্থাৎ ঈথারের ভার নাই। অর্থাৎ **নব ও নব্যনববিজ্ঞান মতে ঈথারের ভার আছে ও ভার নাই।** এতখানি উল্টা পাল্টাও কলির সভ্য মানুষের পেটে অক্লেশে হজম হয়। কোনও রকম কাঁটা খোঁচা বাধে না। **ইচ্ছা থাকিলেই সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করিতে কোনও কষ্ট নাই।** "বাসনা-প্রেরিত জন" (৩৪)। ইচ্ছার বশে পারে না এমন কুকার্য্যই নাই। **Heisenberg হেইজেনবার্গ ও Dirac (দিরাক) ঈথারের তরঙ্গ স্বীকার করেন।** ইহারা আজকালকার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া সকলেই স্বীকার করে।

৪। পদার্থবিদ্যার পাঁচটী উপাদানের ভিতর তিনটীর এই দশা। বাকি রহিল দুইটী পদার্থ ও তেজ। এ সম্বন্ধে পদার্থবিদ্যার মত শুনিলে বুদ্ধিহত হইয়া যায়। পদার্থ নাই। পদার্থ ঈথারের তরঙ্গ মাত্র। পদার্থ আছে ঈথারের তরঙ্গও আছে। **পদার্থ নাই তেজ** হইতেই পদার্থ হইয়াছে। পদার্থ নাই **পদার্থ তড়িৎ শক্তি।** এই তড়িৎ শক্তি কখনও ঈথারের তরঙ্গ কখনও পদার্থ। অতএব **পদার্থ কখনও পদার্থ ও কখনও পদার্থ নহে** কেবল ঈথারের তরঙ্গ মাত্র।

(1) জগতের প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক অপর বস্তুকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ টানে। ইহাকেই অন্যোন্যাকর্ষণ বলে।

(৩৪) অকৃত্যং মন্যতে কৃত্যং সুগমঞ্চ সুদুর্গমম্। অসত্যং মন্যতে সত্যং বাসনা-প্রেরিতো জনঃ।

৫। **পদার্থ বিজ্ঞান পদে পদে আত্মার বৈপরীত্য দেখিয়াও দেখিতে রাজী নহে।** তাই পদার্থবিজ্ঞানের এত ধাঁধাঁ। তাই পদার্থবিজ্ঞানকে বলিতে হইয়াছে "আমরা যখন যেমন সুবিধা দেখি তখন তেমন বলি। আমরা যাহা বলি তাহা সত্য কি মিথ্যা আমাদের দেখিবার প্রয়োজন নাই। **আমাদের প্রয়োজন হইলেই আমরা তাহা ধরিয়া লই। তাহা মিথ্যা হয় হউক আর সত্য হয় হউক।** আমাদের কিছুই আসে যায় না।" সেই জন্যই **হ্যালডেন বলিয়াছেন** বৈজ্ঞানিকগণের **প্রত্যেক কথাই মিথ্যা ও বিজ্ঞানকে গেঁজেলি গল্পই বলা উচিত।**

১১। **গণিত (Mathematics)**—১। গণিত শাস্ত্রের ভুল তিন রকমে প্রমাণ করা যায়—(১) গণিতশাস্ত্রের দোষ ধরাইয়া দিয়া। (২) গণিতশাস্ত্রের যে সব ভুল পরে ধরা পড়িয়াছে সেই গুলি দিয়া ও (৩) গণিতশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের কথা দিয়া। প্রথমটী সাধারণের বেলা খাটে না। এমন কি যাহারা গণিতশাস্ত্র ভাল করিয়া পড়িয়াছে তাহারাও **গণিতশাস্ত্রের নামে পলায়ন করে।** ধৈর্য্য ধরিয়া মন দিয়া নিলে অনেকেই গণিতের প্রমাণের দোষ বুঝিতে পারে। কিন্তু এই বিলাসপ্রিয় কলিযুগে প্রায় কেহই মন দিয়া শুনিতে চায় না। অতএব **প্রথম উপায়টী কলিযুগে চলে না।** বাকীদুইটী উপায় দিয়া গণিতশাস্ত্র নির্ভরযোগ্য নহে তাহাই দেখান যাইতেছে।

২। **নিউটন** (Newton) একটী গণনার ভুল করেন। এই ভুল কেহই ধরিতে পারে না। কাযেই এই **ভুল-যুক্তিই অকাট্য প্রমাণ** বলিয়া পণ্ডিত মাত্রেরাই মানিয়া লয়। কিছুদিন পরে বেরনুই (Bernoulli) নিউটনের ভুল ধরাইয়া দেন। সত্যপরায়ণ নিউটন সেই ভুলটি চুপে চুপে হজম করেন। কাজেই তখনও সেই ভুলই অকাট্য সত্য বলিয়া চলিতে থাকে। কিছুদিন পরে নিউটন নিজেই চুপে চুপে ভুলটী সংশোধন করিয়া দেন। তখনই সকলে বুঝিতে পারে যে **নিউটনের অকাট্য প্রমাণটী অকাট্য ভুল।**

৩। লাপলাস (Laplace) তাঁহার বিখ্যাত মেকানীক্ সেলেস্ত (Mecanique Celeste) নামক গ্রন্থে কতকগুলি প্রমাণের ক্রটী করেন। কেহই তাহা ধরিতে পারে না ও তাহা অকাট্য বলিয়া চলিতে থাকে। শেষে **কোসি (Cauchy) ও গাউস (Gauss) লাপলাসের প্রমাণের দোষ ধরাইয়া দেন।**

৪। নিউটন ও লাপলাস এই দুইজনের ন্যায় গণিতজ্ঞ আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। ইহারা দুই জনেই ভুল প্রমাণ করিয়া তাহা অকাট্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অন্য সব গণিতজ্ঞ পণ্ডিতদের ত কথাই নাই। কাযেই দেখা যাইতেছে **গণিতের বিশেষ দোষ যে গণিতের ভুল প্রমাণ প্রায়ই অকাট্য প্রমাণ বলিয়া মনে হয়।** অর্থাৎ গণিত প্রমাণের ভুল কেহই ধরিতে পারে না। অতএব গণিতের প্রমাণ অকাট্য মনে হইলেও ঠিক কি ভুল বোঝা যায় না ও নির্ভরযোগ্য নহে।

৫। গণিতের প্রমাণ সত্য কি মিথ্যা ঠিক করা যায় কেন? ইহার কারণ এই যে **গণিত প্রমাণ চুপে চুপে এত কথাই ধরিয়া লয়** যে সে গুলির দিকে মানুষের দৃষ্টিই পড়ে না। এক কথায় **গণিত ধাপে ধাপে যায় না, লাফাইয়া লাফাইয়া চলে ও ভুল করে।**

ধাপে ধাপে যাইলে সেই ভুল ধরা পড়ে। তবে গণিত ধাপে ধাপে চলে না কেন? ইহার উত্তর গেরগন (Gergonne) দিয়াছেন। Gergonne বলেন "গণিতের প্রমাণ ভাণমাত্র। প্রথমে **উত্তরটী জানিয়া শেষে মিথ্যা করিয়া প্রমাণটী বসাইয়া দেওয়া হয়।** প্রমাণের দ্বারা উত্তরটী বাহির করা হয় না। অর্থাৎ গণিত আবিষ্কার করে না, আবিষ্কৃত বিষয়ের সম্মান দিবার জন্য প্রমাণের সৃষ্টি করে। **গণিতের প্রমাণ এমনই মিথ্যা যে উত্তরটী না জানিলে গণিতের প্রমাণ বুঝাই যায় না।**

৬। এডিংটন (Eddington) স্বীকার করেন যে গণিতের যুক্তি এখন যে কতই উল্‌টাইয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না। **চিরকাল যে সব যুক্তি অকাট্য ছিল এখন আর সে গুলি চলে না।** ভুল বলিয়া সেগুলি এখন ত্যাগ করা হইয়াছে। প্ল্যাঙ্ক (Planck) বলেন যতই গণিতের দ্বারা অকাট্য প্রমাণ কর না কেন তাহার উপর নির্ভর করা যায় না। একটুতেই তাহা উল্‌টাইয়া যায়। **গণিতে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।**

১২। ডাক্তারী বা চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medicine)—

১। ডাক্তারেরা লক্ষ লক্ষ মড়া কাটিয়া ঠিক করিল **উদরের চেহারা এই রকম।** যখন একস্‌রে (X-Ray) বাহির হইল তখন দেখা গেল যে লক্ষ লক্ষ বার চোখে দেখিয়া যাহা ঠিক করা হইয়াছে তাহা একেবারেই মিথ্যা।

২। পেটের মধ্যে নাড়ীভুড়ি জোঁকের মত নড়ে। ইহাকে intestinal peristalsis বা অন্ত্রের জলৌকস গতি বলে (অন্ত্র—নাড়ীভুড়ি। জলৌকস—জোঁক)। লক্ষ লক্ষ মড়া কাটিয়া ডাক্তারীতে **ঠিক হইল** এই জলৌকস-গতি উপর হইতে নীচের দিকেই হয় ও নীচের দিক হইতে উপর দিকে হইলে প্রাণ থাকে না। এখন একস্‌রে (X-Ray) দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এই কথা মিথ্যা। জলৌকস-গতি মায়ার বশে একবার উপর হইতে নীচে ও আবার নীচের দিক হইতে উপরের দিকে হয় ও তাহাতেই প্রাণ বাঁচে। অর্থাৎ নাড়ীভুড়ি একবার উপর হইতে নীচে ও আবার নীচে হইতে উপরে নড়িয়াই কার্য্য করে।

৩। ডাক্তারীমতে তিন প্রকার বম্নসা (nerve) আছে। একরকম দিয়া সুখ দুঃখ অনুভব হয়। দ্বিতীয় রকম দিয়া হাত পা নাড়া যায়। তৃতীয় রকমকে Sympathetic nervous system বা সাক্ষীগোপাল বম্নসাচয় বলে। সেইরূপ মনুষ্য শরীরে অসংখ্য গ্রন্থি বা বিচি (glands) আছে। এই গ্রন্থি (glands) দুই রকম। এক রকমের মুখ (duct) আছে অর্থাৎ তাহা হইতে রস বাহির হয়। দ্বিতীয় রকমের মুখ নাই (ductless) ও তাহাদিগকে অস্রুতি গ্রন্থি বলে।

৪। ডাক্তারেরা বহুকাল ধরিয়া এই Sympathetic nervous system ও ductless glands এর (সাক্ষীগোপাল বম্নসাচয়ের ও অস্রুতি-গ্রন্থির) **কোনও প্রয়োজন না** দেখিয়া অহঙ্কারে দিশেহারা হইয়া ঠিক করিল **ভগবান্ বড়ই** বোকা তাই বিনা প্রয়োজনে এত অসংখ্য জিনিষ শরীরের মধ্যে দিয়াছেন! **বুদ্ধির আধার ডাক্তারেরা** এতকাল পরে দেখিতেবাধ্য হইয়াছে যে Sympathetic nervous system and ductless glands **(সাক্ষীগোপাল বম্নসাচয় ও অস্রুতি-গ্রন্থি) দ্বারাই শরীরের সকল প্রধান কার্য্য হয়,** এমনকি চরিত্র ও বিদ্যাও এই গ্রন্থির উপর নির্ভর করে।

৫। এত বড় কথা ডাক্তারেরা দেখিতে পাইল না তাহার কারণ কি? ইহার কারণ ডাক্তারদের সত্য দেখিতে নাই। **যাহা মনের অনুকূল তাহাই সত্য আর অন্য সমস্তই মিথ্যা ইহাই** ডাক্তারী চরিত্র। "বাসনা প্রেরিতো জনঃ"। মায়াবশে জগৎসৃষ্ট হইয়াছে। মায়ার স্বরূপ বৈপরীত অর্থাৎ দুইটী উল্টা পাল্টা জিনিষ দিয়া একটী কার্য্য হয়। **এই মায়া জানিলেই নিজের বুদ্ধি কিছুই না, বুঝিতে হয়।** তাই এত আপত্তি। কিন্তু শত অপত্তি থাকিতেও ডাক্তারদের মানিতে হইয়াছে যে **মানুষের শরীরের সকল কার্য্যই বিপরীত।** যেমন **হৃৎপিণ্ড** কে একজন আসিয়া আস্তে আস্তে চালায় ও আর একজন তাড়াতাড়ি চালায় (vagus slows the heart whilst the sympathetic quickens it), **নাড়ীভুড়ির** গতি একজন নীচের দিকে করায়, আর একজন উঁচু করায় (vagus helps peristalsis while the sympathetic inhibits it)। **অস্ত্রুতিগ্রন্থি** গুলি দুই দলের (এক দল রক্তে **চিনি** বাড়ায় ও আর একদল চিনি কমায়, একদল **ক্যাল্‌সিয়ম** (যাহা চুণের ভিতর বিশেষ পাওয়া যায়—Calcium) বাড়ায় ও আর একদল ক্যালসিয়ম কমায়।

৬। উদর রোগে লবণ দেওয়া চিরকালই নিষিদ্ধ। ডাক্তারেরা বলিলেন লবণে প্রস্রাব করায়। অতএব লবণ উদররোগে মহৌষধ। লক্ষলক্ষ বৎসরের আয়ুর্ব্বেদের নিষেধ হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া **ডাক্তারেরা উদর রোগে লবণ দিয়া সুখে নরহত্যা করিতে লাগিল।** তাহার পর যখন উহাদের মধ্যে একজন বলিল লবণে বিশেষ ক্ষতি হয় তখনই ভেড়ার দলের হাসি উড়িয়া গেলও উদর রোগে লবণ নিষিদ্ধ বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

৭। কাযেই দেখা যাইতেছে মিথ্যা বলিতে ও অহঙ্কার করিতেই ডাক্তারী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শাস্ত্রে **অষ্টসিদ্ধি** আছে অর্থাৎ আট প্রকার গুণ চেষ্টার দ্বারা লাভ করা যায়। যথা পাথরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারা, পর্ব্বতের ন্যায় দেহ করিতে পারা, আকাশে উড়িতে পারা, যাহা চোখে দেখা যায় না তাহা দেখিতে পাওয়া ইত্যাদি। ডাক্তারীর প্রভাবে একটী নূতন সিদ্ধির সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার নাম **মিথ্যাত্বসিদ্ধি অর্থাৎ যাহা বলিব তাহা মিথ্যা হইবেই। কখনই সত্য হইবে না।** ডাক্তারী মিথ্যাত্ব-সিদ্ধি করিতেই জন্মিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

১৩। জীবন বিজ্ঞান (Biology)—১। জীবন বিজ্ঞান মতে জীবের অসংখ্য শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীর জীব অন্য শ্রেণীর জীবের অপেক্ষা উঁচু ও আর এক শ্রেণীর জীবের অপেক্ষা নীচু। নিম্নশ্রেণীর জীব হইতে উচ্চ শ্রেণীর জীব হইয়াছে। এইরূপ **বানর হইতে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে।** ইহা কই বলে ক্রমোন্নতি বা Evolution (এভলিউসন্)।

২। এই ক্রমোন্নতি-মত যে শাস্ত্র বিরুদ্ধ ইহা বলাই বাহুল্য। **এই ক্রমোন্নতি নিজেও মিথ্যা ও উহার নামও মিথ্যা।** ইংরেজী Evolution (এভলিউসন্) শব্দে ক্রম-বিকাশ বুঝায় না। নক্সা প্রভৃতি গোল করিয়া গুটাইয়া রাখা হয় ও একটু একটু করিয়া খোলা হয়। ইহাই Evolution (এভলিউসন্) শব্দের অর্থ। কাযেই **Evolution (এভলিউসন্) বলিলে যাহা ছিল তাহাই খুলিয়া দেখান বুঝায়, উন্নতি বুঝায় না।**

৩। ক্রমোন্নতি জগতের নিয়মের বিরুদ্ধ। **যাহা নাই তাহা আসে কেমন করিয়া?** রূপার গহনা ভাঙ্গিলে রূপাই পাওয়া যায় সোণা কি করিয়া পাওয়া যাইতে পারে? যদি সোণা পাওয়া যায় ত রূপার ভিতর সোণা আছে বলিতেই হইবে।

৪। এখনকার প্রসিদ্ধ জীবন-বিজ্ঞানবিৎ **হালডেন** বলেন **জীবন বিজ্ঞান যে মিথ্যা তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।** এডিংটন বলেন ক্রমোন্নতি-মত ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত। **যদি ক্রমোন্নতি থাকে ত ক্রমাবনতি অবশ্য আছে।** উঠিতে পারিলে নামিতেও পারে।

(ক্রমশঃ)

নব্য ভারতের রাষ্ট্রকাহিনী

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ কাব্যতীর্থ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যাহাই হউক লর্ড আরউইনের শাসন সময়ে (১৯২৬—১৯৩১), ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের শাসন সম্বন্ধে যে সংস্কারআইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহার ফলাফল পরীক্ষা পূর্ব্বক উহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন দ্বারা ভারতবাসীদিগকে আরও অধিকার প্রদান করা যায় কিনা তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য পার্লামেণ্ট মহাসভা এক কমিশন গঠন করেন। সার জন্ সাইমন্ ঐ কমিশনের সভাপতি ছিলেন বলিয়া উহা 'সাইমন্ কমিশন' নামে অভিহিত হয়। কোন ভারতবাসী ঐ কমিশনের সভ্য নিযুক্ত না হওয়ায় ভারতবাসী ইহার প্রতি বিরূপ ও বীতশ্রদ্ধ ছিল এবং ভারতের সর্ব্বত্রই মুষ্টিমেয় নরম পন্থিদল ও মুসলমান সমাজের বিশিষ্টাংশ ব্যতীত, বালক বৃদ্ধ, যুবা কৃষ্ণপতাকা হস্তে শোভা যাত্রা করিয়া ঐ কমিশনকে অস্বীকার করে। তাহাদের অস্বীকারের কারণ এই যে, ভারতবাসীদিগকে তাহাদের চিরবাঞ্ছিত স্বাধীনতার পথে সাহায্য করিবার কোন শক্তি সাইমন্ কমিশনের সদস্যদিগের থাকিতে পারেনা, থাকিলেও তাঁহারা সেইজন্য ভারতে প্রেরিত হন নাই। রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর কমিশন সম্বন্ধে ভারতবাসীদিগের পূর্ব্ব ধারণার সার্থকতা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত কমিশন ১৯২৮ও ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে দুইবার ভারতে আসিয়াছিল। কমিশনের রিপোর্টের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১০ই ও ২৪শে জুন যথাক্রমে প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য রিপোর্ট হইতে ভারতবাসীর মনে কোনরূপ আশা বা শান্তির সৃষ্টি হয় নাই। এতদ্বিষয়ে 'ভারতের সাধনা'র ১৩৩৭ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'সাইমন কমিশন ও ভারত সরকারের ডেস্‌প্যাচ' নামক প্রবন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইতি পূর্ব্বে লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের সময় 'রাউলট আইন' নামক এক দমননীতিমূলক আইন প্রবর্ত্তিত হইবার ফলে দেশামধ্যে ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি হওয়ায় অমৃতসর জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগে

এই আইনের বিরোধী এক জনসভায় ইংরাজ সৈন্যগণ গুলি বর্ষণ করিয়া সভা ভঙ্গ করিয়া দেয়। তাহার ফলে নবপ্রবর্ত্তিত স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী এবং রাজনীতিক দল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগী নাম গ্রহণ করিয়া নূতন ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে অস্বীকার করেন এবং রাউলট্ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া লর্ডরেডিং এর শাশনকালের (১৯২১—১৯২৬) প্রথম অবস্থায় মহাত্মা গান্ধী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই কঠোর দমন নীতির ফলে লর্ড রেডিং অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে মহাত্মাজীকে মুক্তি দেওয়া হয় ও রাউলট্ আইন তুলিয়া দেওয়া হয়।

ভারতের অশান্তি দূরীকরণ মানসে শাসকজাতি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া বিলাতে একটী পরামর্শ সভা বসাইবার সংকল্প করেন। তথায় প্রতিনিধিগণ যাইয়া আপন আপন পক্ষের কথা নিবেদন করিবেন, কিন্তু আলোচনায় তাঁহাদের স্থান থাকিবে না। ঐ সকল নিবেদনের মধ্য হইতেও সাইমন কমিশনের পরামর্শ হইতে বৃটিশ সরকার একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া বাহির করিয়া ভারতশাসনসংস্কারের একটি খসড়া প্রস্তুত করিবেন। পার্লামেণ্ট ভারত-সংস্কারের শেষ ভাগ্যবিধাতা হইবেন। এই প্রকার সর্ত্তে মহাত্মা গান্ধী ও জাতীয় দল সম্মত হন নাই এবং তাঁহাদের সর্ত্তেও বড়লাট্ মহোদয় সম্মত হইতে পারেন নাই। তাহার ফলে ভারতে সত্যাগ্রহ ও লবণ আইন ভঙ্গের আন্দোলন (৬ই এপ্রিল ১৯৩০) আরম্ভ হয় এবং তৎসম্পর্কে অসংখ্য নেতা ও কর্ম্মীর দল কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এইরূপে ভারতে অশান্তির ক্রমিক বৃদ্ধি হইতে থাকে। কিন্তু লর্ড আরউইনের আশ্বাসে কংগ্রেস ব্যতীত অন্যান্য জাতীয় দল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ গোলটেবিলের বৈঠকের উপকারিতায় কিয়ৎ পরিমাণে আস্থাবান হইলেও সুফল সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াই যেন গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে সেণ্ট্ জেমস্ প্রাসাদে গোলটেবিলের প্রথম অধিবেশন হয়।

উক্ত বৈঠকে দুইটী প্রধান বিষয়ের আলোচনা হয়—ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করা এবং ভারতবর্ষকে সংঘবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্ররূপে শাসিত হইবার ব্যবস্থা করা। ভারতের অনুন্নত সম্প্রদায় ও সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের সম্বন্ধেও একটা সমাধানের প্রচেষ্টা হইয়াছিল। এই কয়েকটি প্রস্তাব লইয়া আন্দোলন ও আলোচনার পর হট্টগোলে পরিণত হইয়া প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ভাঙ্গিয়া যায়। প্রথম গোল টেবিল বৈঠক সম্বন্ধে 'গোলটেবিল বৈঠক' শীর্ষক প্রবন্ধে 'ভারতের সাধনা'য় ১৩৩৭ সালের আশ্বিন সংখ্যায় আলোচনা করা হইয়াছে।

ইতোমধ্যে লর্ড আরউইন মহোদয় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ও অশান্তি দূরীকরণ মানসে মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তির পর তাঁহার সহিত দিল্লীতে একটী চুক্তি পত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কতকগুলি সর্ত্তে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসকার্য্যনির্ব্বাহক কমিটী অহিংস আইন লঙ্ঘন তুলিয়া লইয়াছিলেন এবং লর্ড আরউইন মহোদয়ও প্রায় সমুদয় অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করিয়া অহিংসা সত্যাগ্রহীদিগকে মুক্তিদিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং তদনুসারে কার্য্যও করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় লর্ড আরউইনের পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড উইলিঙ্ডনের ভারতে আগমনের পর নানারূপ সাম্প্রদায়িক বিরোধ, রাজদ্রোহমূলক হত্যাদির দরুণ ভারতে অশান্তির অনল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এবং গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্বন্ধেও গোলযোগ উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষই চুক্তি

অমান্যের জন্য পরস্পরকে দায়ী করেন। কংগ্রেস এই গোলযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটা নিরপেক্ষ সালিশী চাহিয়াছিলেন কিন্তু লর্ড উইলিংডন তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাজেই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করিবে কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করেন নাই বলিয়া উহার কার্য্য যে অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছিল একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল। প্রথম বৈঠকের উপসংহারে একথা স্বীকৃত হইয়াছিল এবং দ্বিতীয় বারের বৈঠকে কংগ্রেস পক্ষ যাহাতে যোগদান করিতে পারে সে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশও করা হইয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ হইতে দ্বিতীয় বৈঠকে যোগদান প্রথমতঃ সন্দেহজনক হইলেও পরে ঐ বিষয়ে উভয় পক্ষ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বৈঠকের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য ১২ই ভাদ্র ১৩৩৮, ইংরাজী ২৯শে আগষ্ট ১৯৩১, রাজপুতানা জাহাজে বিলাত যাত্রা করেন। গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়া মহাত্মা গান্ধী সুস্পষ্টভাবে পার্লামেন্টের সভ্য মণ্ডলীর সমক্ষে বলিয়াছিলেন যে গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত ভারতীয় সদস্যগণ কেহই ভারতীয় জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নহেন, ভারতের জনমত বহনের অধিকারও তাহাদের নাই—তাহারা সকলেই ইংরাজ রাজ সরকারের মনোনীত লোক। এতদ্ব্যতীত সাম্প্রদায়িক জটিলতা, কাশ্মীরের হাঙ্গামা, ভারতের নিত্য নূতন অত্যাচারও উচ্ছৃঙ্খলা প্রভৃতির জন্য বৃটিশ সরকার যে মূলতঃ দায়ী তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বিলাতের বিভিন্নস্থলে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন। মোটের উপর মহাত্মাজীর নির্ভীক ও অকপট বাণী ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞদিগের মর্ম্মস্পর্শ না করিলেও এবং রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে মহাত্মাজীর বিলাত যাত্রা বিফল হইলেও এবং গোলটেবিল বৈঠকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসিত না হইলেও তজ্জন্য গোলটেবিল বৈঠক প্রথম বারের ন্যায় হট্টগোলে পরিণত হইলেও, বর্ত্তমানে সমগ্র জগতের উপর মহাত্মাজীর একটা নৈতিক প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

গোলটেবিল বৈঠক দুইবার বিফল হইলেও নীতি হিসাবে বার বার তিনবার বৈঠক বসাইবার সার্থকতা অনুভব করিয়া বৃটিশ নেতৃ পক্ষ তৃতীয় বারের জন্য ইহার আহ্বান করেন। কিন্তু তাঁহারা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন যে উহার ভিতরকার চালাকী ভারতীয়গণ বুঝিতে পারিয়াছে। সুতরাং বৈঠকের উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়াছে। সেইজন্য গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনের উপসংহারে আবার তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের ঘোষণা সত্ত্বও ভারত সচিব স্যামুয়েল হোর প্রকাশ করিয়াছিলেন যে উহা না বসাইয়া বিবিধ সব্ কমিটির মন্তব্যের বলে পার্লামেন্টের সভ্যগণ হইতে কোনও যুক্ত কমিটির দ্বারাই চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া তাহা পার্লামেন্টে পেশ করা যাইবে। গোলটেবিল বৈঠকের সদস্যগণের মধ্যে সার তেজবাহাদুর প্রমুখ কতিপয় সদস্য চাঞ্চল্য প্রকাশ পূর্ব্বক অসহযোগের ভয় প্রদর্শন করিলে ভারতসচিব নিজমন্তব্য পরিহার করিয়া একটি ক্ষুদ্র গোলটেবিল বৈঠক বসানই স্থির করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোলটেবিলে চল্লিশ জন সদস্য বসিবার আয়োজন করা হইয়াছিল—তন্মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের মনোনীত সদস্য আঠার জন, ভারতীয় দেশীয় রাজ্য সকল হইতে এগার জন আর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের রাজনীতি বিশারদগণ হইতে এগার জন। উক্ত বৈঠকে যেন ভারতীয় "মনোনীত প্রতিনিধিরা" মোগল দরবারে এত্তেলা দিতে গিয়াছিলেন এবং মোগল বাদশাহ ধীরচিত্তে তাঁহাদের আরজী শুনিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়াছেন, এখন কর্ত্তব্য

সার্ব্বভৌম শক্তি স্থির করিবেন—এই কথা বুঝা গিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৈঠকে বাঁধন কষণের যে সব ফাঁকি রহিয়া গিয়াছিল তৃতীয় বৈঠকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান সদস্যগণকে ও রাজন্য-প্রতিনিধিবর্গকে সহায় করিয়া সেইগুলি পূর্ণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। মোটামুটি গোলটেবিল বৈঠকে নিম্নতম দাবী গুলি ছিল এই :—(১) ভারতবাসী পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সহিত কেন্দ্রিয় দায়িত্বের অধিকার চাহে, কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন চাহে না। (২) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে এবং কেন্দ্রিয় দায়িত্ব ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে। (৩) যদি রাজন্যরা ঐ সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে সম্মত হন ভালই নচেৎ তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া আপাততঃ কেবল ব্রিটীশ ভারতে কেন্দ্রীয় দায়িত্ব প্রবর্ত্তন করিতে হইবে; তাহার পর রাজন্যরা যখন ইচ্ছা করেন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে পারেন। (৪) যতটুকু বাঁধন কষণে রাখিলে স্বায়ত্তশাসন বা কেন্দ্রীয় দায়িত্বের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়, ততটুকু রাখিয়া অন্যান্য বিষয়ে ভারতকে আর্থিক সামরিক বৈদেশিক ইত্যাদি ব্যাপারে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ক্ষমতা দিতে হইবে। (৫) আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে দেশরক্ষা, সরকারী চাকুরী ও আইন সভায় ভোটাধিকার ও সদস্যপদ সম্বন্ধে জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ না করিয়া সংখ্যাল্প সম্প্রদায়গণের বিশেষ অধিকার সাব্যস্ত করিতে হইবে। কিন্তু স্যর স্যামুয়েল হোরের বক্তৃতায় এই সকল বিষয়ের আশার বাণী অস্পষ্ট দুর্ভেদ্য হেঁয়ালিতে পূর্ণ থাকায় অনেকেই নিরাশ হইয়াছিলেন। মর্ণিং পোষ্টের মত টোরী পত্রকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, স্যর স্যামুয়েল হোরের দান 'ভূয়াদান'—কড়া বাঁধন কষণ রাখিয়া অধিকারদান স্বায়ত্তশাসনাধিকার দান নহে। এইপ্রকারে গোলটেবিলের পালা সাঙ্গ হইয়া যায়। তবে গোলটেবিলের এই ব্যর্থতার কলঙ্করেখা বর্ত্তমান রাজনীতি বিশারদগণের পরিপক্কতারই পরিচয় রাখিবে।

এক্ষণে শ্বেতপত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এই আলোচনার প্রয়োজনীয়তা এই হিসাবে আছে। যে ভারতের বর্ত্তমান ভাগ্যবিধাতা স্যর স্যামুয়েল হোর ভারতবাসীকে যে শাসন সংস্কার দিবেন বলিয়াছিলেন তাহা তিনি শ্বেত পত্রের আকারে করিয়াছেন। অবশ্য উহা ঐ সম্বন্ধে শেষ কথা নহে, কেন না, তাহার পরও পার্লামেণ্টের জয়েণ্ট কমিটিতে উহার আলোচনা বাকী আছে এবং সর্ব্বশেষে খোদ পার্লামেণ্ট তাহার উপর বিচারে বসিবে ও বিচারের ফল যাহা হইবে তাহা ভারতবাসীর প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে। কিন্তু এই বিচারের ফল কবে জানা যাইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই তবে কতকটা আশ্বস্তের কারণ এই যে, যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রি-পরিচালিত 'পাইওনিয়ার' নামক সংবাদ পত্রের লণ্ডনের সংবাদদাতা শুনিয়াছেন যে জয়েণ্ট কমিটী শ্বেতপত্রের কোন রদ বদল করিবেন না বটে, তবে সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হইয়া কার্য্যে পরিণত হইতে এখনও পাঁচ ছয় বৎসর লাগিবে। এই পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেওয়া হইবে না। আরও ইহাও সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সংহিত রাষ্ট্রতন্ত্র ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন একই সঙ্গে দেওয়া হইবে। ভারতবাসী এই সংবাদ পাইয়া নিশ্চিতই নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে পারিবে, কারণ কোনরূপে পাঁচ ছয় বৎসর চোখকাণ বুজিয়া কাটাইয়া দিলেই তো একেবারে হাতে হাতে স্বরাজ!

শ্বেতপত্র সম্বন্ধে ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পেটেল বলিয়াছেন

—এই শ্বেতপত্রের দ্বারা ভারতের রাজপ্রতিনিধি বড়লাটকেই হোমরুল দেওয়া হইতেছে ভারতবাসীরা কিছুই পাইতেছে না। সুতরাং ইহাতে অসন্তোষ হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিই পাইবে। অসন্তুষ্ট ভারতবাসী যাহাতে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া হিংসার পথ গ্রহণ করে এই শ্বেতপত্রের দ্বারা তাহার চেষ্টা করা হইতেছে।" বস্তুতঃ শ্বেতপত্রে এমন প্রস্তাব করা হইয়াছে যাহাতে উহাকে "Mockery of progress" বলা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। এক্ষণে শ্বেতপত্রের বিশেষ বিশেষ বিধিগুলির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে :—

(১) শ্বেতপত্রের কোথাও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের এমন কি দায়িত্বপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের কথা নাই, অথচ প্রথম ও দ্বিতীয় গোলটেবিলে প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড এবং ভারতের আরইউন-গান্ধী চুক্তিতে লর্ড আরইউন এই কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন।

(২) শ্বেতপত্রে সংহিত রাষ্ট্রের কথা আছে বটে, কিন্তু কতদিনে তাহা হইবে বা রাজন্যরা না আসিলেও উহা হইবে এমন কথা নাই।

(৩) শ্বেতপত্রে ম্যাকডোনাল্ডের প্রতিশ্রুতি নীতি অনুসৃত হয় নাই। সেই নীতি হইতেছে যে, কতকগুলি বাঁধন কষণের সহিত ভারত শাসনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার হস্তে প্রদান করা হইবে। কিন্তু সংরক্ষণ ও বাঁধন কষণের ব্যবস্থা কতকাল থাকিবে তাহাও শ্বেতপত্রে কিছু নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তাহা পার্লামেণ্টের মর্জ্জির উপর নির্ভর করিবে।

(৪) সাইমন রিপোর্টের মত ইহাতেও কেন্দ্রে অপ্রতিহত ক্ষমতা, বিরাট দায়িত্ব, সিভিল সার্ভিসের প্রতি স্নেহ, বৃটিশ ব্যবসায়ির সুবিধা রক্ষা, সংখ্যাল্পের প্রতি দরদ, সীমান্তরক্ষা, শান্তি শৃঙ্খলরক্ষা, অর্ডিন্যান্স, দ্বৈতশাসন—সবই এই শ্বেতপত্রে আছে, বরং ইহাতে ভারতসচিবের, বড়লাটের ও প্রাদেশিক লাটদিগের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৫) বড়লাট বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন।

(৬) সংহিতরাষ্ট্র সম্বন্ধে শ্বেতপত্রের ব্যবস্থা এই যে, যতক্ষণ না রাজন্য বর্গের লোকসংখ্যার অন্যূন একার্দ্ধের প্রতিনিধিরূপে এবং সংহিতরাষ্ট্রের উর্দ্ধতন আইন সভায় (upper chamber) অন্যূন একার্দ্ধ সদস্য পদ পাইতে অধিকারিরূপে রাজন্যরা সংহিতরাষ্ট্রে প্রবেশ করিবার দলীল সহি করিবেন, ততক্ষণ সংহিতরাষ্ট্র গঠিত হইবে না।

(৮) কেন্দ্রে বা প্রদেশে শাসকদিগের কোন ক্ষমতার পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

(৯) কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বের আবহাওয়া সুপ্রতিষ্ঠিত না রাখিয়া প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তন করা হইবে না।

(১০) মন্ত্রীসভা ও আইনসভা সম্পর্কে প্রদেশের আর্থিক ব্যাপারে, প্রদেশের শান্তিরক্ষা সম্পর্কে, সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের স্বার্থসংরক্ষণ-ব্যাপারে সরকারী চাকুরিয়াদের অধিকার ও স্বার্থ সম্পর্কে ও ব্যবসায় ক্ষেত্রের পার্থক্য রক্ষা করা নিবারণকল্পে গভর্ণর তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

ইহা ছাড়া আরও অনেক বিশেষ বিশেষ বিধি আছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ এস্থলে প্রদর্শন করা সম্ভব নহে তবে মোটামুটি শ্বেতপত্রে যে ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহার স্বরূপ কি তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। এক্ষণে ভারতবাসীরা ভাবিয়া দেখুন তাঁহারা বৃটিশ শাসনের আরম্ভ

হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কতটা স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার পাইলেন এবং অচির ভবিষ্যতে কতটা পাইবার আশা করিতে পারেন ও তদবস্থায় তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি।

সম্প্রতি অমৃতবাজার পত্রিকায় জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির জনৈক ভারতীয় সাক্ষী শাসনসংস্কার বিষয়ে তাঁহার নিজের অভিমত যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে দেওয়া হইল :—

"ভারতের রাজনৈতিক দিক্‌চক্রবালে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের আভাসমাত্রও পাওয়া যাইবে না। সংহিত শাসন হইতে স্বায়ত্তশাসন কথাটিই ইচ্ছা করিয়া বাদ দেওয়া হইবে। একটা দুটো প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যের আখ্যা অর্জ্জন করিতে পারেন। সংহিত শাসন বা কেন্দ্রীয় দায়িত্ব রহিবে সুদূরবর্ত্তী আদর্শ মাত্র। চারি বৎসর পূর্ব্বে লর্ড আরউইন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের যে আশার কথা ঘোষিত করেন তাহার সম্ভাবনা আজ মাত্র এই টুকু। ... ... রক্ষণশীল দলের ক্ষিপ্ত দলকে তুষ্ট করিতে গিয়া সম্ভবতঃ শ্বেত পত্রের প্রস্তাবেও ছাট কাট করা যাইবে।"

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ভারতে যে জাতীয় আন্দোলন চলিতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি ও দেশের আর্থিক দুর্গতি অবসানের চেষ্টা। এখানে ভারতের এই সাধু চেষ্টার মূলে যদি সরকার বাধা দেন তথাপি ভারতবাসীদিগের কর্ত্তব্য হইবে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতি লাভের প্রচেষ্টা। কিন্তু এই বাধায় ইংলণ্ডের যে ক্ষতি হইবে সেই ক্ষতি ইংলণ্ড পূরণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এই স্বার্থমূলক দ্বন্দের মীমাংসার এখনও একটা সুস্পষ্ট পথ রহিয়াছে। এক্ষণে ইংরেজরাজ যদি সেই পথ অবলম্বন করেন তাহা হইলে বৃটিশ সাম্রাজ্য ধন ঐশ্বর্য্যে ও শান্তিতে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ হইবে। সেই পথ হইতেছে মহামান্য সম্রাটের পঁয়ত্রিশ কোটী কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ প্রজার প্রতি সমান আইন প্রবর্ত্তন ও সমান উন্নতি বিধানের চেষ্টা এবং ভারতের আশা আকাঙ্খা পূরণকরিবার সদিচ্ছা। মনে হয় উহাতেই ভারতের ও ইংলণ্ডের সংঘর্ষ দূর হইবে, উভয় দেশের মিলন হইবে। নচেৎ কুটিল রাজনীতির আবর্ত্তে পড়িয়া দেশের লোক ঘূর্ণীপাক খাইবে, তাহাদের মনের গতি বিক্ষিপ্ত হইবে এবং তাহার ফলে মনে হয় শাসক ও প্রজার মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমশই বাড়িয়া চলিবে এবং উভয় জাতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ মিলন অসম্ভব হইয়া উঠিবে। কূটনীতি যে সকল সময় সকল ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করে এমন কোন প্রমাণ নাই—ইহা ভাবিয়া কার্য্যকরা উচিত। প্রয়োজন হৃদয় পরিবর্ত্তনের। হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইলেই সার্ব্বভৌম রাজনীতিক সমস্যার সহজ সমাধান হইতে পারে। তাই মানবের অন্তর্নিহিত বিবেক বুদ্ধি বা অন্তরাত্মা, ডাক দিয়া বলিতেছে যে, ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিশ্বের এই বিরাট্ মানবীয় সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ কর, তোমাদের ভ্রান্তির ও বিফলতার কারণ কি তাহা তোমরা তোমাদের হৃদয়ের অনুসন্ধান কর; তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান করিবার সামর্থ্য জন্মিবে।

উপসংহারে রক্ষণশীল অপেক্ষাও রক্ষণশীল ও বৃটিশ জাতির পরমবন্ধু বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সম্প্রতি বিলাতী রেকর্ডী পত্রে ভারতের বিরুদ্ধে মহারথিদের দলের প্রচার কার্য্যের প্রতিবাদ করে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। মহারাজাধিরাজের অভিমত হইতেও যদি বৃটিশ জাতির চৈতন্য না হয় তবে আর বলিবার কি আছে?

তিনি লিখিয়াছেন—"India must have her voice in her own rule. You British, can not hope to rule such a calossal empire without the goodwill of the population. And this the policy of your reactionaries is losing you. The time has come for India to be given equal status in the British Empire."

অর্থাৎ শাসনকার্য্য পরিচালনে ভারতের কথা বলিবার অবশ্য অধিকার থাকা চাই। দেশের লোকের প্রীতি ব্যতীত, হে ইংরাজ তোমরা এত বড় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করিবার আশা করিতে পার না এবং তোমাদেরই প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রদায়ের নীতি তোমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্থ করিতেছে। এখন ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমান অধিকার দিবার সময় আসিয়াছে।

দিগ্‌দর্শন

হিন্দুর জাতির ভেদ
ও
সাম্যবাদ।

আজকাল সমাজ সমস্যাই যেন সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যাহার যতটুকু শক্তি তিনি সে সমস্তটুকুই সমাজের 'আবর্জ্জনা' দূর করিতে নিযুক্ত করিতেছেন। এই সংস্কার অর্থে যে কি তাহা ঠিক বুঝা শক্ত। লোকে যাহা কিছু করে সমস্তই সাধারণতঃ জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য। এই যে রাজনৈতিক আন্দোলন, এই যে স্বাধীনতা লাভের জন্য কারাবরণ, কত দুঃখ, কত কষ্ট সহ্য করা—ইহারও উদ্দেশ্য জীবিকা উপার্জ্জনের পথ সুগম করা। সমাজ সংস্কারের চেষ্টারও নাকি প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বাধীনতা লাভের পথের একটা কণ্টক দূর করা। আমার এক সংস্কারকামী বন্ধু আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন "এই অস্পৃশ্যতা দূর না করিলে এবং এই জাতিভেদ প্রথা দূর করিতে না পারিলে আমাদের দেশের কিছুতেই মঙ্গল নাই। আমাদের মধ্যে যদি এই অস্পৃশ্যতা পাপ না থাকিত তাহা হইলে ত আর আমাদিগকে ভাগ করিবার সুযোগ বিদেশী পাইত না। সুতরাং আমাদের সমাজে যতপ্রকার পৃথক পৃথক শ্রেণীবিভাগ আছে সমস্তই উঠাইয়া দিতে হইবে।

এরূপ যুক্তির যে কি উত্তর দেওয়া যায় তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারা খুবই শক্ত, তবে এই যুক্তি হইতে এটুকু পারা শক্ত নয় যে বিদেশী কখন কি বলিতে বুঝিতে পারে সে বিষয়ে আমাদের সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে। তথাপি বলিতে হয় যে সর্ব্বপ্রকার পার্থক্য দূর করা কি সম্ভব? যে অনবরতঃ ফাঁক খুজিতে চেষ্টা করিবে ফাঁক সে পাইবেই। হিন্দু মুসলমান সমস্যা ত আছেই; তাহার সমাধান হইতে পারে না যদি না উভয় সম্প্রদায়ই নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া ধারণা করিতে পারেন—এবং যদি বুঝিতে না পারেন যে দেশের স্বার্থই

তাঁহাদের স্বার্থ। ইহা ভিন্ন আর কোন প্রকারেই হইতে পারে না, তা প্যাকটই কর আর চুক্তিই কর কিছুতেই কিছু হইবার নয়। এই স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সমস্যাও ঠিক সেইরূপ। সকলেই যদি নিজেকে হিন্দু বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন এবং হিন্দু সমাজের স্বার্থ এবং তাঁহাদের স্বার্থ এক বলিয়া ধারণা করিতে পারেন তাহা হইলেই এ সমস্যার সমাধান সহজেই হইতে পারে অন্য কোন রকমেই হওয়া সম্ভব নয়। না হয় মানিয়াই লইলাম যে অস্পৃশ্যতা দূর করিলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে। কিন্তু স্ত্রীলোকদের জন্যও যে পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহাতে যে মানব জাতির মধ্যেই বিরোধের সৃষ্টি হইতেছে; এ বিরোধের হেতু দূর করিবার কি ব্যবস্থা সংস্কারক মহাশয়রা করিতে চান? এ বেলা শ্রেণীবিভাগ কি করিয়া তুলিয়া দিবেন? এই আবিষ্কারের যুগে এমন কিছু আবিষ্কার হইয়াছে কি যাহা দ্বারা সমস্ত পুরুষকে স্ত্রীলোকে পরিণত করা যাইতে পারে? অথবা সমস্ত নারীজাতি একদম পুরুষে পরিণত হইবে। যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে এই বিরোধ মিটাইবার কি ব্যবস্থা তাঁহারা করিতে চান? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কৌশলীর কৌশলের অভাব কোন মতেই হইতে পারে না। যাহারা সব সময়ে পরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, পরে কি ভাবিবে এই ভাবনা যাহার সর্ব্বক্ষণ, তাহার পক্ষে কোন বড় কাজ করা কখনই সম্ভব নয়; এবং এই ভাবে আপত্তি খণ্ডন করিয়া যদি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে এ স্বাধীনতা কখনও আসিবে না সুতরাং ইহার জন্য আর মাথা ঘামাইবার কোন আবশ্যকতা নাই।

রাজনৈতিক আন্দোলন এদেশে অনেক দিন হইতেই চলিতেছে, যে সময়ে কংগ্রেসের প্রথম সৃষ্টি হইল সেই সময়েই এ আন্দোলনের গোড়া পত্তন হইল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তখন হইতেই রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা হইতেছে। বঙ্গভঙ্গের পরে বাঙলায় যে আন্দোলন হইয়াছিল তাহার তীব্রতা নিতান্ত কম ছিল না; এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে বাঙলা যত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছে ভারতের আর কোন প্রদেশই তত সহ্য করে নাই। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে অন্যান্য সমস্ত প্রদেশই এই রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যাপারে বাঙলার নিকট শিষ্য। বাঙলা রাজনীতির সহিত সমাজনীতি কখনও মিশায় নাই। বাঙলা জানিত যে হিন্দুর সমাজ যে ভাবে গঠিত তাহাতে এই সমাজ-প্রথা কোন কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, বরং অনেক প্রকারে সহায়তাই করিতে পারে। করিয়াছেও যথেষ্ট।

কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত সামাজিক ব্যাপার সম্পূর্ণ ভাবেই মিশিয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমান সমাজ সংস্কারের চেষ্টা যেন রাজনৈতিক আন্দোলনকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। এই সামাজিক আন্দোলনের লক্ষ্য কি? ভেদাভেদ তুলিয়া দিয়া সকলকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিতে হইবে? অর্থাৎ সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে? ব্রাহ্মণে এবং পঞ্চমবর্ণে কোন পার্থক্য থাকিবে না? ভাল কথা। কিন্তু—সাম্যের দুন্দুভি ফরাসী দেশে বাজিয়াছিল এবং তাহার ফলে ফরাসী দেশের মাটী নররক্তে কর্দ্দমে পরিণত হইয়াছিল, দিন রাত সমানে হত্যা কার্য্য চলিয়াছিল। কিন্তু সাম্য সত্য সত্যই স্থাপিত হইয়াছিল কিনা তাহা বলা খুবই শক্ত। বর্ত্তমান সময়ে রুষের মত সাম্যবাদী আর কেহ নাই, এবং বর্ত্তমান সময়ে রুশদেশে সকলেই সমান—ছোট বড় কেহই নাই। এই সমতা আনিবার জন্য যে কত নরহত্যা করা হইয়াছে, কতজনপদ

শ্মশানে পরিণত করা হইয়াছে তাহার সংখ্যাও বোধ হয় কেহ করিতে পারে না। এই সাম্য যাহাতে চিরস্থায়ী হয় সে জন্য আজ রুশ বালক বালিকা কথা ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা পাইতেছে যে 'ঈশ্বর নাই।' হায়! ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকিলেত আর পুরাপুরি সাম্য হয় না। হয়ত ঈশ্বর প্রাধান্য দাবী করিতে পারেন সুতরাং তাঁহার অস্তিত্বই অস্বীকার করিতে হয়। যদি হাতে পাওয়া যাইত তাহা হইলে না হয় ফাঁসি দিয়া আপদ চুকাইয়া দেওয়া যাইত, কিন্তু তাহা যখন পাওয়া যাইতেছে না তখন অস্তিত্ব অস্বীকার করা ভিন্ন পন্থা নাই!

ইউরোপের এই সমস্ত বিপ্লবের হেতু আর্থিক ব্যাপারে ছোট বড়—কাহারও বা প্রচুর টাকা, কেহ বা খাইতে পায় না, সুতরাং সকলকে সমান করিয়া লইতে হইবে,—যত বড়লোক এবং তাহাদের সহিত যাহারা সংশ্লিষ্ট সকলকেই মারিয়া ফেল এবং তাহাদের যাহা কিছু সমস্ত লুঠিয়া লও। এদেশের আন্দোলনের সহিত নাকি এরূপ কোন সম্বন্ধই নাই—এ আন্দোলন নাকি সম্পূর্ণ সমাজ এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, ইহাতে আর্থিক ব্যাপারের কোন সম্বন্ধই নাই। যদি তাহাই হয় তাহা হইলে ত এ আন্দোলনের কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হিন্দু মাত্রেকেই মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতে হইবে,—মন্দির প্রবেশে বাধা থাকায় ধর্ম্মকার্য্যে বাধা হইতেছে। এই ভারতবর্ষেত বহু সংখ্যক মন্দির আছে যাহাতে সকলেই প্রবেশ করিতে পারে। দুই একটায় যদি কোণ কারণে সকলের প্রবেশের অধিকার নাই থাকে তাহাতে এমন কি ক্ষতি হইতে পারে? ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই আন্দোলনের মূলে ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। তারপর সামাজিক ব্যাপার—'পরস্পর আহার না কর ক্ষতি নাই যৌন সম্বন্ধেরও আবশ্যকতা নাই।' তবে কি চাই? 'আমাকে ছুঁইয়া স্নান করিও না।' এই পর্য্যন্ত! আর কি চাই? 'আমাদের বাড়ী ঘর ভাল নয় সে গুলো ভাল করিয়া দাও; আমাদের বাসস্থান অপরিষ্কার পরিষ্কার করিয়া দাও, আমাদের লেখা পড়া শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দাও, আমাদের ভাল ভাল পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিয়া দাও।' ভাল কথা, কিন্তু তোমরা বাড়ী ঘর ভাল কর না কেন? পরিষ্কার ভাবে থাক না কেন? ভাল কাপড় পড়িতে কে বাধা দেয়? লেখাপড়া শিখিতেই বা বাধা কি? 'পারি না, অর্থে কুলায় না।' সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গলদ কোথায়। ধর্ম্ম এবং সমাজ এ দুইটী কথা শুধু লোক ভুলান। ধর্ম্মের জন্য আবার গলদ কোথায়? বর্ত্তমান যুগের হিন্দুদের মধ্যে এমন লোক খুব বেশী নাই যাহার হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস আছে বা হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী কাজ করেন। আজকালকার হিন্দু সামাজিক ব্যাপারে যত উদার আর কোন সমাজে এত উদারতা মেলা ভার। সুতরাং একথা স্বীকার করুন আর নাই করুন, প্রকৃত গলদ আর্থিক ব্যাপার লইয়া, সমতা চাই—সেখানে, নজর মোটর ও বাগান বাড়ীর দিকে, লক্ষ্য মন্ত্রিত্বের প্রতি।

অর্থ উপার্জ্জন যে কেহ যে কোন উপায়েই করিতে পারে কাহারও পক্ষে কোন পথ রুদ্ধ নাই। তথাপি আর্থিক অবস্থা সকলের সমান নয়। আজ যদি দেশের সমস্ত অর্থ একত্রিত করিয়া সকলের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া যায় তথাপি সমান থাকিবে না—হয় কোন নবাবিষ্কৃত উপায়ের দ্বারা এই সমতা বজায় রাখিতে হইবে নতুবা আবার সেই ছোট বড়র উদ্ভব হইবে। সমান থাকিতে পারে না—এই কথাই বুঝাইবার জন্য Parable of the talmts; মানুষে মানুষে যতদিন পার্থক্য থাকিবে ততদিন ছোট বড়ও থাকিবে। দেবতা সমুদ্র জলে বিসর্জ্জন দাও,

মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, জাতিভেদ উঠাইয়াদাও, ব্রাহ্মণের পৈতা ছেঁড়—পার্থক্য কিছুতেই যাইবার নয়। এ কারসাজী ভগবানের, সুতরাং পারত ভগবানকে কোতল কর।

এ সমস্যা নূতন নয় এবং এই সমস্যা হইতেই সমাজেরর সৃষ্টি। পৃথিবীতে যত প্রকার মানব সমষ্টি আছে সকলেই এই সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছে এবং তদনুযায়ী সামাজিক নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছে। হিন্দু সমাজও এই নিয়মের বাহিরে নয়।

এই বিরোধ দূর করিবার জন্যই হিন্দুসমাজে জাতি বিভাগ। এই জাতি বিভাগের মূল উদ্দেশ্য কে কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে তাহা স্থির করিয়া দেওয়া এবং এমন ভাবেই নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া যে কে কি করিবে সে বিষয়ে কাহারও কিছু চিন্তা করিবারও নাই—জন্মিবার পূর্ব্বেই সমস্ত ঠিক হইয়া রহিয়াছে,—'কি করিব, কি করিব' করিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবার আবশ্যকতা নাই। এই নির্দ্দেশের ভিতরে পক্ষপাতিত্ব আদৌ ছিল না এবং এই ব্যবস্থার গুণে আর্থিক অবস্থা সকলেরই প্রায় সমানই থাকিত। 'দিগ্‌গজ পণ্ডিত' ব্রাহ্মণও যে ভাবে জীবন কাটাইতেন, একজন দিন মজুরেরও সেই ভাবে দিন কাটিত; বরং আর্থিক ব্যাপারে ব্রাহ্মণের অবস্থাই অনেক সময়ে খারাপ ছিল। পোষাক পরিচ্ছদও সকলেরই প্রায় একরূপ—ব্রাহ্মণের পোষাক ধুতি এবং নামাবলী, কৃষকের পোষাক ধুতি এবং চাদর। ব্রাহ্মণ গৃহিণীও রন্ধন প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় কাজ নিজে করিতেন, কৃষক পত্নীও সমস্ত নিজে করিতেন। এই হিন্দু সমাজটা ছিল ঠিক যেন একটা বিশাল পরিবার। এই পরিবারের প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক কাজের ব্যবস্থা এবং প্রত্যেকের স্বার্থ প্রত্যেকের স্বার্থের সহিত জড়িত—একজন না হইলে আর একজনের চলিবার উপায় নাই। হিন্দুর সমস্ত কার্য্যই সার্ব্বজনীন—হিন্দুর এমন কোন কাজই নাই যাহা পাঁচ জনকে না ডাকিয়া করা হয় বা পাঁচ জনকে না বলিয়া করা যায়—পূজাদি ধর্ম্ম-কার্য্যই হউক বা বিবাহাদি উৎসবই হউক। গ্রামে বিশেষ কোন একটা কিছু করিতে হইলে পাঁচজনে একত্রিত হইয়া, পাঁচজনে একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া করে, সেখানে জাতি বিচার নাই। এইরূপ মেলামেশা শুধু পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় মেয়েদেরও মেলামেশা করিবার ব্যবস্থা আছে। মেয়েদের এমন কতকগুলা ব্রত আছে যাহা পাঁচজনে একত্রিত হইয়া করিতে হয়। পল্লীগ্রামের এই যে মেলামেশা ইহা যে কত আন্তরিক তাহা বুঝিবার ক্ষমতা পাশ্চাত্য শিক্ষিত সংস্কারকামীদের নাই। সত্য সত্যই পল্লীগ্রামে ছোট বড় প্রশ্ন উঠিবারই অবকাশ নাই।

হিন্দু সমাজে পরস্পরের প্রতি যে সহানুভূতি তাহা যেমন আন্তরিক তেমনই চিরাচরিত নিয়মে বাঁধা। এবং হিন্দুর কর্ম্ম বিভাগ জাতিবিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত—নিজের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ব্যতীত অন্যের কর্ম্ম করিলে জাতি যাইত, সমাজে পতিত হইতে হইত এবং পরকালে নিরয়গামী হইতে হইত; যে যাহার জাতি ব্যবসায় লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। সুতরাং কর্ম্ম লইয়া কাড়াকাড়ি হইত না—ব্রাহ্মণও ধোবার কাজ করিতে যাইত না, কামারও কুমারের কাজে হাত দিত না। পারলৌকিক কার্য্যের ভার ব্রাহ্মণের, সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভের ব্যবস্থা বৈদ্য করিবেন, চাকুরী কায়স্থের সমাজের জন্য ধন সংগ্রহ করিতে বৈশ্য বাধ্য, ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্য উৎপন্ন করিবার ভার কৃষকের উপর; এইরূপে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে, সুতরাং কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং বন্ধন ছিল প্রীতি। এ সমস্ত ব্যবস্থা হইতে জমিদারও বাদ যাইতেন না, এমনকি রাজাও সমস্ত সামাজিক নিয়ম মানিয়া চলিতে বাধ্য। জমিদার এবং রাজার ঐশ্বর্য্য পরের উপকারের জন্য, দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য—নিজেদের ভোগের জন্য নয়। সকলেরই বিশ্বাস ছিল যে সর্ব্বোপরি একজন আছেন যিনি সকলের ভাল মন্দ কার্য্যের বিচার কর্ত্তা, তাঁহার নিকট পক্ষপাতিত্ব নাই এবং কোন কার্য্যই তাঁহার চক্ষু এড়াইবে না। সুতরাং হিন্দু সমাজে এই সাম্য স্থাপন করিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবার প্রয়োজন হয় নাই। পরন্তু সকলেই তাঁহার সহিত একই সূত্রে গ্রথিত এবং তিনিই সকলের এবং সর্ব্ব কার্য্যের নিয়ামক এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই এরূপ শৃঙ্খলা স্থাপিত হইতে পারিয়াছিল।

আজ ছোট বড়র প্রশ্ন উঠিয়াছে, সকলেই সকলের উপরে উঠিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। একথা একবারও মনে হইতেছে না যে সকলের দৈহিক শক্তি এবং মানসিক বৃত্তি সমান নয়। আজ সর্ব্বত্রই democracy কিন্তু সর্ব্বোপরি যে একজন Absolute monarch আছেন তাঁহার কথাত কেহ ভাবিতেছে না, তিনি যে অন্তরীক্ষে থাকিয়া সকল কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন তাহাত পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। আজ হিন্দু সমাজের জাতি বিভাগ তুলিয়া দিতে যাইতেছ, কিন্তু নূতন পদ্ধতিতে যে জাতি বিভাগের সৃষ্টি করিতেছ তাহাতে যে অবস্থা আরও ভীষণ হইবে, এ ব্যবস্থায় যে একদল একেবারেই পিষ্ট হইয়া যাইবে তাহা বুঝিতেছ কি? স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা আনিতেছ, সাম্যের নামে বিরোধের সৃষ্টি করিতেছ, সত্যের নামে মিথ্যার আশ্রয় লইতেছ!

শ্রীঅম্বিকাচরণ সেন

সুস্থ ও স্বস্থ

হিন্দুজাতির মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক পরিলক্ষিত হয়, এক সংস্কারকামী বা 'উদার', অন্য রক্ষণশীল বা 'অনুদার'। প্রথমতঃ দেখা যাক্ হিন্দু কে? হিন্দু তাহাকেই বলে যে পরধর্ম্মপ্রবণ নহে। পরধর্ম্ম অন্যধর্ম্ম নহে, অন্যধর্ম্মের ভাবদাস্য। অন্যধর্ম্মের ভাবদাস্যই অহিন্দুত্ব এবং এই পরধর্ম্মকেই গীতায় শ্রীভগবান্ ভয়াবহ বলিয়াছেন। অল্প কথায় বলিতে গেলে নিজত্বের কেন্দ্র বা গণ্ডী ছাড়িয়া যে কোনও কারণে পরকীয়ত্বের অভিমুখেই জিগমিষাই অহিন্দুত্বভাবে ভাবিত অথচ হিন্দু নামে পরিচিত—এই শ্রেণীর জনগণ উদার হিন্দু বলিয়া অভিহিত। এই উদার হিন্দুগণ সংস্কার প্রয়াসী। সংস্কার যুগে যুগে প্রয়োজনীয় ও শুভদায়ক হইলেও বর্ত্তমান উদার হিন্দুদিগের সংস্কারের রূপ দেখিয়া মনে হয় তাহা পরকায়। তাঁহারা চাহিতেছে অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন, একত্র পানাহার, বৈবাহিক সম্বন্ধের নিষ্ঠার অবলুপ্তি ইত্যাদি। যাহারা রক্ষণশীলতা অনুদার; তাহারা চাহিতেছে—সাত্বিক পার্থক্য, অস্পৃশ্যতার বিচার, বিবাহের দৃঢ় নিষ্ঠা ইত্যাদি। শেষোক্ত শ্রেণী বলে এই সব রক্ষিত না হইলে হিন্দু ক্রমশঃ তাহার হিন্দুত্বের শ্লাঘাকে হারাইয়া ফেলিবে। হিন্দুত্বের শ্লাঘায় প্লাবিত হইয়াই রাণা প্রতাপ মানসিংহের কন্যার সহিত তাঁহার পুত্র অমরসিংহের বিবাহ দিতে চাহেন নাই। মিবারকে শ্মশানে পরিণত করিয়াও ধনজন সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া প্রতাপসিংহ সিংহাসন

ছাড়িয়া পশুর সহিত বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন। এই হিন্দুত্বের আঘাতে, মানসিংহের উপস্থিতিতে অশুচি বোধ করিয়া গোবর জল প্রক্ষেপণ করিয়াছিলেন এই হিন্দুত্বের অভিমানে। আর ইহাও দেখা যায় উদার মানসিংহের ন্যায় লোকের দ্বারা হিন্দু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত হয় নাই—হইয়াছিল রক্ষণশীল বা অনুদার রাণা প্রতাপ বা মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীর শক্তিতে ও ভক্তিতে। রক্ষণশীল হিন্দু জীবনের অভ্যন্তরেই যুগে যুগ দেখা গিয়াছে স্বাধীনতার স্পৃহা। রাণা প্রতাপ হইতে মহারাজ সীতারাম পর্য্যন্ত ইহার জীবন্ত পরিচয়। কিন্তু তৎপরে যে উদার যুগের আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে দেখি শুধু আত্ম-অবিশ্বাস, আত্মদ্রোহ এবং একান্ত পরানুকারী বিলাস-বিভ্রম।

উদার হিন্দুগণ পানাহারে উদার কিন্তু গরীবের জন্য তাহারা যে বিশেষ চিন্তিত তাহাতো মনে হয় না। তাহারা থাকে সহরে, তৃপ্তি হয় ডিনারে ও কলের জলে, আর প্রয়োজন হইলে বিবাহ করে ফেরঙ্গ দেশের কন্যা তাহা যে শ্রেণীরই হউক!

অনুদার হিন্দুরা চাহে নাই সহজে নাগরিকের বিলাসজীবন যাপন করিতে পল্লী-অঞ্চল ছাড়িয়া। তাহারা সর্ব্ব শ্রেণীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া পল্লীতে বাস করিতে, পল্লীগ্রামে পুকুর কাটাইতে, পথ ঘাট প্রস্তুত করাইতে, উৎসব আনন্দের আয়োজন করাইত, প্রয়োজন হইলে টাকার সহায়তা দিত।

উদার অনুদারের তুলনায় দেখা যায়, অনুদার চাহে পল্লী, উদার চাহে নগর; অনুদারের নিকট অবাধগতি, উদারের নিকট কার্ডের পর কার্ড পাঠাইয়াও দর্শনে বাধা। উদার পন্থী দিতে জানে গালি ও জানে কেবল ভাঙ্গিতে, আর অনুদার জানে সহিতে ও বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া চলিতে। এখনও যে পল্লীগ্রাম গুলি কোন মতে পরাণ ধরিয়া আছে তাহা অনুদারের শ্রদ্ধায় ও প্রীতিতে।

কিন্তু বর্ত্তমানে উদার পন্থীদিগের মধ্যে যেমন উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে, অনুদার পন্থীদিগের মধ্যেও আছে অনার্য্যোচিত ক্লীবতা। কিন্তু হিন্দু চৈতন্যে সুস্থতা ও স্বাস্থতা—এতদ্ উভয়েরই প্রয়োজন হইয়াছে। আত্ম-অবিশ্বাসী উদার শ্রেণীকে হইতে স্বস্থ আর জড়প্রায় অনুদার শ্রেণীর হইতে হইবে সুস্থ। অভ্যুদয়ের জন্য আত্মঘাত, আবার আত্মরক্ষার জন্য কর্ম্মঠতা—কোনটাই সমীচীন নহে। সুতরাং হিন্দু-চৈতন্যে আত্মপ্রীতির সহিত প্রয়োজন বীর্য্যবত্তার—তবেই হিন্দু সভ্যতার সংরক্ষণ হইবে ও হিন্দুচৈতন্য সুস্থ ও স্বস্থ থাকিবে। এবিষয়ে উভয় দলকেই সমভাবে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপ নির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ প্রণালী যাহা ভারতের সাধনা'র এক বিশেষ লক্ষ্য—তাহা সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচনা-সাপেক্ষ।]

পাঞ্চরাত্র মত ও শঙ্করাচার্য্য

(৭)

খণ্ডন মণ্ডনের প্রতিবাদ।—

পণ্ডিত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় বিগত আষাঢ় মাসের ভারতের সাধনায় শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"নিম্বার্কাচার্য্য—সনৎকুমারসম্প্রদায়। দেবর্ষি নারদ নিম্বার্কাচার্য্যকে উপদেশ দিয়াছেন। ইহার আবির্ভাব কাল মধ্বাচার্য্যের কিছু পরে, এইরূপ অনেকে অনুমান করেন। অতএব এই নারদ দর্শন, আজ কালও সিদ্ধ মহাত্মারা যেরূপ দেবতাদি দর্শন করিয়া থাকেন, তদ্রূপই। পক্ষান্তরে এই সনৎকুমারের উপদেশ ব্যাসদেবও মহাভারত মধ্যে গ্রথিত করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রকে সনৎকুমার যে উপদেশ দিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য তাহার ভাষ্যও করিয়াছেন। এই সব দেখিলে মনে হয় সনৎকুমার ঋষির যে মত, তাহা শঙ্করের মত হইতে ভিন্ন নহে। অতএব ব্যাসের মত ঋষি সনৎকুমারের মত হইতে পারে না বলিয়া যে নিম্বার্ক ভাষ্যের দাবী তাহার মূল্য অধিক হইল না। যদি নিম্বার্কাচার্য্যের সঙ্গে মাধ্বাচার্য্যের মতভেদ না থাকিত, তাহা হইলেও নিম্বার্ক ভাষ্যের ব্যাসানুসারিতা একদিন বলবত্তর হইত কিন্তু তাহা হয় নাই।"

এই প্রবন্ধের প্রথম ভিত্তি এই যে "ইহার আবির্ভাবকাল মাধ্বাচার্য্যের কিছু পরে, এইরূপ অনেকে অনুমান করেন।" এই প্রবন্ধে রাজেন্দ্রবাবু মাধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব কাল নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি তিনি মধুসূদন সরস্বতীর "অদ্বৈত সিদ্ধি" নামক যে গ্রন্থের সম্পাদন করিয়াছেন তাহাতে লিখিয়াছেন যে মাধ্বাচার্য্য ১১৯৯ বা ১২৩০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩০৪ বা ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইহার দ্বারা ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তাঁহার কাল নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব রাজেন্দ্র বাবু অনুমান করেন যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের অভ্যুদয়ের কাল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে নয়। এই অনুমানের উপরই নির্ভর করিয়া তিনি পরবর্ত্তী বাক্য সকলে নিম্বার্কস্বামী সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব এই প্রথম উক্তি কতদূর সত্য—তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। এতৎ সম্বন্ধে প্রথমে আমি পরম পূজ্যপাদ ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রী১০৮ সন্তদাস বাবাজী মহারাজ প্রণীত 'দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত উক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"বঙ্গদেশে শ্রীভগবান নিম্বার্ক সম্বন্ধে অধিকাংশ লোক অনভিজ্ঞ। তৎকৃত বেদান্ত ভাষ্যে তিনি আপনাকে নারদ-শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীভগবান নিম্বার্ক প্রাচীন ঋষি; ভবিষ্য পুরাণে তাঁহার সম্বন্ধে ভগবান বেদব্যাস নিম্নলিখিত শ্লোকে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, যথা :—

উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যাকুলে তিথিরুপোষণে।
নিম্বার্কো ভগবানেষাং বাঞ্ছিতার্থ ফলপ্রদঃ॥

এই শ্লোকটীকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন না; কারণ ইহা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে অসাম্প্রদায়িক কাশীবাসী পণ্ডিত রচিত সুবিখ্যাত "নির্ণয় সিন্ধু" নামক স্মৃতি গ্রন্থে জন্মাষ্টমী

ব্রত বিচারে উদ্ধৃত করা হইয়াছে ; এবং আরও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত 'হেমাদ্রি' নামক গ্রন্থেও ভবিষ্য পুরাণের এই শ্লোক উদ্ধৃত করা আছে। (খ্যাতনামা পণ্ডিত-প্রবর ভরত চন্দ্র শিরোমণি সঙ্কলিত হেমাদ্রি নামক গ্রন্থ যাহা এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকে ভগবান বেদব্যাস শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে "ভগবান" বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা পাঠে ভগবান নিম্বার্কাচার্য্য যে প্রাচীন সিদ্ধ ঋষি ছিলেন, তৎবিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনি অরুণ নামক ঋষির পুত্র, সুতরাং আরুণি নামেও শাস্ত্র গ্রন্থে কোন কোন স্থলে বর্ণিত হইয়াছেন। নারদ ভক্তি-সূত্রে এই আরুণি ঋষিকে ভক্তিমার্গের প্রসিদ্ধ আচার্য্য শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছে। জয়দেব গোস্বামী এই নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার পূজিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ এ যাবৎ নিম্বার্কীয় বৈষ্ণবদিগের গদ্দিতে সালিমাবাদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। জয়দেবের স্থাপিত এক মন্দির তাঁহার জন্ম-স্থান কেন্দুয়া গ্রামে আছে ; তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি মোকদ্দমা হইয়া ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে তিনি নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে "টাট্টি" নামক নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের স্থানের (যাহা আকবরের গায়ক প্রসিদ্ধ তানসেনের গুরু নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত সিদ্ধ হরিদাস স্বামীর ভজন স্থান তাহার) গুরু পরম্পরা বিবরণে জয়দেব স্বামীর নাম উল্লিখিত আছে। এই জয়দেব স্বামী ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন বলিয়া বর্ত্তমানে স্থিরীকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত গুরু পরম্পরা বিবরণে জানা যায় যে জয়দেবের ৪৭ পুরুষ পূর্ব্বে এবং হরিদাস স্বামী যিনি ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের সময় প্রকটিত হইয়াছিলেন তাঁহার ৬৩ পুরুষ পূর্ব্বে শ্রীনিম্বার্ক আচার্য্য আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন ; সুতরাং তিনি যে শঙ্করাচার্য্যের বহু পূর্ব্বের লোক ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যায়। অতএব শ্রীনিম্বার্ক আচার্য্যকৃত বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যে যে শঙ্করাচার্য্যের মত খণ্ডন অথবা ভাষ্যের কোন উল্লেখ থাকা দৃষ্ট হয় না তাহা স্বাভাবিক বটে। পরন্তু শাঙ্কর ভাষ্যে ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিবার চেষ্টা দেখা যায়। এতদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে তিনি শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এবঞ্চ ভট্ট ভাস্কর, যিনি বেদান্ত দর্শনের এক ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তিনিও নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার প্রণীত ভাষ্যের বহু প্রাচীন একখানি হস্তলিপি গ্রন্থ সালিমাবাদের গদীতে বর্ত্তমান আছে, তাহাতে দেখা যায় যে গ্রন্থকার সর্ব্বপ্রথমে নিম্বার্কাচার্য্যকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। ভট্ট ভাস্কর যে বহু প্রাচীন কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহাও এইক্ষণকার পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমাদের সম্প্রদায়ে এইরূপ কিম্বদন্তীও পরম্পরারূপে চলি। আসিয়াছে যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য জন্মেজয়ের রাজত্বকালে প্রকটিত হইয়াছিলেন।"

ইহা দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে শ্রীশ্রী নিম্বার্কাচার্য্য ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন বলিয়া যে অনুমান তাহা কখনও প্রকৃত হইতে পারে না। ব্রত ও উপবাসের তিথি নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে নিম্বার্ক স্বামীর মত বহু পূর্ব্বে দেশব্যাপী রূপে প্রচলিত হইয়াছিল তাহা হেমাদ্রি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায়। ঐ রাজমন্ত্রী হেমাদ্রিরই সময় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ব্যাসদেব স্বামী আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ব্যাসদেব স্বামীর নাম বাঙ্গলা দেশের সকলের নিকট সুপরিচিত। মহামহোপাধ্যায় ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় রাজমন্ত্রী হেমাদ্রির কাল ১২৬০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে তিনি যাদব বংশ সম্ভূত মহারাজ মহাদেবের মন্ত্রী ছিলেন। মহাদেব ১২৬০

খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। যাঁহারা হেমাদ্রি প্রণীত চতুর্বর্গ চিন্তামণি নামক বিস্তৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাহারা অবশ্যই জানেন যে আর্য্য শাস্ত্রে তাঁহার কি অসাধারণ অধিকার ছিল। নির্ণয় সিন্ধু নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতি গ্রন্থ পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে শ্রীনিম্বার্ক স্বামী প্রবর্ত্তিত ব্রত উপবাসবিধি শিবাজী মহারাজের সময়ও সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে দক্ষিণ ভারতে গৃহীত হইত। এই সম্মান অপর কোনও বেদান্ত আচার্য্য পাইয়াছেন বলিয়া দেখা যায় না। অষ্টাদশ মহাপুরাণপ্রণেতা বেদব্যাস তাঁহাকে "ভগবত শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব রাজেন্দ্র বাবুর অনুমান যে নিম্বার্কাচার্য্য ত্রয়োদশ শতাব্দী বা তৎপরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা বিচারের সহ নহে। ভবিষ্য পুরাণ অষ্টাদশ মহা পুরাণেরই এক মহা পুরাণ এবং বেদব্যাসই তাহার রচয়িতা। এবঞ্চ শ্রীশ্রী জয়দেব গোস্বামী যে নিম্বার্ক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন তাহাও পূর্ব্বাবধি প্রসিদ্ধই আছে। শ্রীশ্রী জয়দেব গোস্বামীর পূজিত বিগ্রহ শ্রীশ্রী রাধামাধব জীউ শ্রী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্য গদি সালিমাবাদে এযাবৎ যে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা আমি স্বয়ং দেখিয়া আসিয়াছি। সেই গদীতে আচার্য্য ভট্টভাস্কর প্রণীত বেদান্ত ভাষ্যের প্রাচীন হস্তলিপি বর্ত্তমান আছে তাহাও আমি নিজ চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। উক্ত বেদান্ত ভাষ্যের প্রারম্ভে তিনি শ্রী নিম্বার্কাচার্য্যকে প্রণাম পূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ করিতেছেন দেখা যায়। উক্ত ভট্ট ভাস্কর যে শ্রী শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক তাহা রাজেন্দ্র বাবুর "শঙ্কর ও রামানুজ গ্রন্থ" পাঠে অবগত হওয়া যায়। আকবরের প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর "টাট্টি" নামক স্থান শ্রী বৃন্দাবনে এযাবৎ বর্ত্তমান আছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। সেই স্থানে অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় স্থানের মতন পূর্ব্বকাল হইতে গুরু পরম্পরা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তৎ দৃষ্টে জানা যায় যে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর ৪৯ পুরুষ উর্দ্ধে ও শ্রীহরিদাস গোস্বামী ৬৩ পুরুষ উর্দ্ধে শ্রী নিম্বার্ক স্বামী অবস্থিত। এই কথা ব্রজ বিদেহী মহন্ত মহারাজ সন্ত দাস স্বামী তাহার দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধান্তে লিখিয়াছেন এবং অমিও ঐ গুরু পরম্পরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে কেহ ইচ্ছা করিলেও তাহা দেখিয়া আসিতে পারেন। ইহা দ্বারা কি নিশ্চয় রূপে অবধারণ করা যায় না যে শ্রী নিম্বার্ক স্বামী ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে (এবং আচার্য্য শঙ্করেরও আবির্ভাবের পূর্ব্বে) আবির্ভূত ছিলেন? এই গুরুপরম্পরা আদালতেও প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়।

সকল ভাষ্যকারই তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন দেখা যায়। কিন্তু শ্রী নিম্বার্ক স্বামী বা তাঁহার শিষ্য শ্রী নিবাসাচার্য্যের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্করের মত বা আচার্য্য রামানুজের মতের খণ্ডন বা উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। এই কথা রাজেন্দ্র বাবু ও তাঁহার সম্পাদিত "অদ্বৈত সিদ্ধি" নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ইহাই অনুমান হয় যে শ্রী নিম্বার্ক স্বামী আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্বেকার আচার্য্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি শাস্ত্রের অধ্যাপক এবং জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ডাক্তার বেণীমাধব বড়ুয়া ডি লিট্ (লণ্ডন) মহোদয় নিম্বার্ক ভাষ্যের সহিত শঙ্কর ভাষ্যের তুলনা করিয়া ঠিক করিয়াছেন যে নিম্বার্কভাষ্যে যে সৌগত (অধুনা বৌদ্ধ) ও জৈন মতের উল্লেখ আছে তাহা আচার্য্য শঙ্করের বর্ণিত বৌদ্ধ ও জৈন মত অপেক্ষা প্রাচীন। এখনও আচার্য্য নিম্বার্ক প্রণীত ভাষ্যে কেবল মাত্র পাশুপত মতের উল্লেখ দেখা যায় কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর ও ভট্টভাস্করাচার্য্যের ভাষ্য পাশুপত মতের সহিত মাহেশ্বর মতেরও

উল্লেখ দেখা যায়। রাজেন্দ্র বাবু সম্পাদিত "অদ্বৈত সিদ্ধি" নামক গ্রন্থে শ্রী দেবাচার্য্যের কাল ১০৫৫ খৃষ্টাব্দ বলিয়া দেখা যায়। অদ্বৈত সিদ্ধির ভূমিকায় রাজেন্দ্র বাবু নিজেই লিখিয়াছেন "ইহার জন্ম সময় ১০৫৫ খৃষ্টাব্দ। ইনি নিম্বার্ক ভাষ্যের চতুঃসূত্রীর উপর বেদান্তজাহ্নবী নামক এক বৃত্তি রচনা করিয়া অদ্বৈত মত বিশেষ ভাবে খণ্ডন করেন। ইহার গুরু কৃপাচার্য্য। ইহার শিষ্য সুন্দর ভট্ট।" রাজেন্দ্র বাবু নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে শ্রী দেবাচার্য্যের ১২ পুরুষ উপরে শ্রী নিম্বার্কাচার্য্য অবস্থিত। সুতরাং রাজেন্দ্র বাবুর নিজ উক্তি মতেও শ্রী নিম্বার্কাচার্য্যের কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্দ্ধারিত হয় না। রাজেন্দ্র বাবু সম্পাদিত শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী প্রণীত "বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস" নামক গ্রন্থ আছে, তাহাতে শ্রী নিম্বার্কাচার্য্যের নিম্ন লিখিত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে:—"ধ্রুবক্ষেত্রে যে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গদি আছে, তাহার মোহান্ত আপনাকে নিম্বার্কের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন, নিম্বার্কের নিয়মানন্দ নাম দেখিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া মনে হয়। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মতে নিম্বার্কের অবস্থিতি কাল পঞ্চম শতাব্দী। ধ্রুব ক্ষেত্রের গদি অন্ততঃ ১৫০০ বৎসর কালের অধিক হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে— এই রূপ তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন। বাস্তবিক এই নির্দ্দেশ অসঙ্গত। ৺অক্ষয় বাবুও ইহা অত্যুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবশ্যই নিম্বার্কাচার্য্যের কাল নির্ণয় নিতান্ত দুরূহ। কারণ তাঁহার গ্রন্থ হইতে তাঁহার কাল সম্বন্ধে কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় বৈদান্তিক ভট্টভাস্করের মতবাদে নিম্বার্ক প্রভাবিত হইয়াছিলেন। মতসাদৃশ্যের ভাষ্য ও নাম তাদৃশ্য অসম্ভব নহে। বোধ হয় ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য্যের মতে প্রভাবিত হইয়া নিম্বার্ক বেদান্তপারিজাতসৌরভ প্রণয়ন করেন। ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য্যের কাল অষ্টম শতাব্দী। নিম্বার্ক ভাস্করের পরবর্ত্তী। তাই আমরা নিম্বার্কের কাল একাদশ শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।" এখনও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আচার্য্য নিম্বার্ককে একাদশ শতাব্দীতে আনা হইয়াছে। উক্ত পুস্তকেও স্বামীজী জোর করিয়া ১১১২ সংবৎকে ১১১২ শকাব্দে পরিণত করিয়া শ্রী দেবাচার্য্যের কাল ১১৯০ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সকল যুক্তির মূলে যুক্তি যে আচার্য্য নিম্বার্ককে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের পরে আনিতে হইবে। বস্তুতঃ শ্রীদেবাচার্য্য একাদশ শতাব্দী বা তাহার পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কিনা এবং নিম্বার্কাচার্য্যের অভ্যুদয়কাল কলি যুগের প্রারম্ভে কি ৫ম শতাব্দীতে তৎসম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া এই স্থানে অত্যাবশ্যক। রাজেন্দ্র বাবুর নিজ স্বীকারভিত্তি অনুসারে যখন শ্রীদেবাচার্য্য একাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন তখন কি প্রকারে তাঁহার দ্বাদশ পুরুষ পূর্ব্বে অবস্থিত আচার্য্য নিম্বার্ক স্বামীর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে থাকা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তৎসম্বন্ধে তাঁহার "খণ্ডন মণ্ডন" প্রবন্ধের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে না। এতৎ সম্বন্ধে এই স্থলে এই পর্য্যন্ত যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া আর অধিক বিস্তার করা হইল না।

পরন্তু রাজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন "অতএব এই নারদ দর্শন, আজকালও সিদ্ধ মহাত্মারা যেরূপ দেবতাদর্শনাদি করিয়া থাকেন, তদ্রূপই।" এই কথার অর্থ আমরা ঠিক বুঝিলাম না। যদি আধুনিক সিদ্ধ মহাত্মাদিগের দেবদর্শন সত্য বলিয়া রাজেন্দ্র বাবু স্বীকার করেন তবে ত্রয়োদশ শতাব্দী কেন এখনকার বর্ত্তমান শতাব্দীর লোক হইলেও শ্রীনিম্বার্ক স্বামীর নারদ শিষ্য হইতে

কোনও বাধা নাই। সুতরাং তিনি তাঁহার নিজ ভাষ্যে যে আপনাকে নারদ শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে দোষারোপ করিবার কোনও হেতু নাই। যদি "আধুনিক" সিদ্ধ মহাত্মা দিগের দেবদর্শন কাল্পনিক ও মিথ্যা সুতরাং শ্রীনিম্বার্ক স্বামীরও নারদ দর্শন মিথ্যা বলিয়া রাজেন্দ্রবাবুর মত হয় তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে অন্ততঃ বহুশত বর্ষ হইতে প্রচলিত সিদ্ধ এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের—যাহাতে বহু সিদ্ধপুরুষ পর পর হইয়া গিয়াছেন—প্রবর্ত্তক আচার্য্যকে, কেবলমাত্র রাজেন্দ্রবাবুর অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা কখনই প্রকৃতিস্থ লোকের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

তৎপরে রাজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "পক্ষান্তরে এই সনৎকুমারের উপদেশ ব্যাসদেবও মহাভারত মধ্যে গ্রথিত করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রকে সনৎকুমার যে উপদেশ দিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য তাহার ভাষ্যও করিয়াছেন। এই সব দেখিলে মনে হয়—সনৎকুমার ঋষির যে মত, তাহা শাঙ্কর মত হইতে ভিন্ন নহে।" রাজেন্দ্রবাবুর এই উক্তির সারবত্তা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বিজ্ঞানভিক্ষু নিজে বৈদান্তিক এবং বেদান্ত দর্শনের ভাষ্য রচনাও করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সাংখ্য দর্শনও নিজ কৃত ভাষ্য সহ প্রকাশ করিয়াছেন। তৎরূপ বাচস্পতি মিশ্র ও "সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী" "ন্যায় বার্ত্তিক তাৎপর্য্য", "তত্ত্ববৈশারদী", "ভামতী" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই কারণে বলা চলে না যে তাহারা সাংখ্য মতাবলম্বী ছিলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য সনৎসুজাত প্রকরণের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন বলিয়াই যে তত্রোক্ত উপদেশের সহিত এক মতাবলম্বী ছিলেন তাহা কি কারণে ধরিয়া লইতে হইবে, তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে না। বাস্তবিক ভগবান সনৎকুমারের উপদেশ ও তাহার উপরে আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্যে প্রকাশিত মতের মধ্যে কোনও বিরোধ আছে কিনা তাহা এই স্থলে বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। কেবল রাজেন্দ্রবাবুর উক্তি যে যুক্তিযুক্ত নহে তাহাই মাত্র এই স্থলে প্রদর্শিত হইল। অতঃপর রাজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে :—

"অতএব ব্যাসের মত ঋষি সনৎকুমারের মত হইতে পারে না বলিয়া যে নিম্বার্ক ভাষ্যের দাবী তাহার মূল্য অধিক হইল না।" রাজেন্দ্রবাবুর এই উক্তিটী পাঠ করিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। শ্রীনিম্বার্ক ভাষ্যে অথবা শ্রীনিম্বার্ক কৃত অন্য কোনও গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্ক স্বামী যে ঐরূপ "দাবী" করিয়াছেন তাহা আমরা এ যাবৎ অবগত নহি। আমরা এতদিন পর্য্যন্ত অবগত আছি যে পূর্ণব্রহ্মবিদ্যা যাহা ভূমা বিদ্যা নামে ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রসিদ্ধ আছে এবং তথায় বহু অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে তাহা ভগবান সনৎকুমার নারদ ঋষিকে উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই ভূমা বিদ্যার আংশিক ব্যাখ্যা ভগবান বেদব্যাস নিজকৃত ব্রহ্ম সূত্রে করিয়াছেন। তাহার সহিত নিজ সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ তিনি উল্লেখ করেন নাই। বস্তুতঃ ভগবান বেদব্যাসও যে শ্রী নারদ শিষ্য ছিলেন ইহাও প্রসিদ্ধই আছে। ভগবান সনৎ কুমারের মতের সহিত তাঁহার মত বিরোধ ছিল ইহার ইঙ্গিতও আমরা কোনও শাস্ত্র গ্রন্থে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তবে পণ্ডিত প্রবর রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় যখন এইরূপ বলিতেছেন তখন ইহার কোনও ভিত্তি থাকিতেও পারে। অতএব তিনি যদি ইহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন তাহা হইলে আমাদের ভ্রান্তি অপগত হইতে পারে। আচার্য্য শঙ্করের মত ঋষি সনৎ কুমার ও বেদব্যাসের মতের অনুবাদ, কি শ্রী নিম্বার্কাচার্য্যের মত তাঁহাদের মতের অনুরূপ তৎ সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার ইহা উপযুক্ত

স্থল নহে। তৎ সম্বন্ধে এই স্থানে কিছুই লেখা হইল না। রাজেন্দ্র বাবুর আর একটী উক্তি সম্বন্ধে দুই একটী কথা লিখিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করা যাইতেছে।

রাজেন্দ্র বাবুর শেষ কথা এই যে:—"যদি নিম্বার্কাচার্য্যের সঙ্গে মাধ্বাচার্য্যের মত ভেদ না থাকিত, তাহা হইলেও নিম্বার্কভাষ্যের ব্যাসানুসারিতা একদিন বলবত্তর হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই।" রাজেন্দ্র বাবুর এই উক্তিরও কি অর্থ তাহা আমরা বোধগম্য করিতে পারিতেছি না। রাজেন্দ্র বাবু ঐ প্রবন্ধেই লিখিয়াছেন যে মধ্বাচার্য্যের দুইবার ব্যাস দেবের সহিত দেখা হইয়াছিল এবং তিনি তাহার নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন তাহা "মাধ্বসম্প্রদায়ের কল্পনা মাত্র অর্থাৎ মিথ্যা। (এই সম্বন্ধে রাজেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্ত সত্য কিনা সেই সম্বন্ধে আমরা কোনও মত প্রকাশ করিতেছি না।) পরন্তু যদি তাঁহার কথা অনুসারে মধ্বাচার্য্য ব্যাস দেবের সহিত সাক্ষাৎকার নাই করিয়া থাকেন, তবে মাধবাচার্য্যের মতের সহিত নিম্বার্কাচার্য্যের মতের ঐক্য না হওয়াতে ঐসিদ্ধান্ত যে ব্যাস মতানুসারী নহে তাহা কিরূপে অবধারণ করা যায় তাহা আমাদের বোধগম্য হইল না। আর একটী কথা এই সম্বন্ধে আমরা রাজেন্দ্র বাবুকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি যে শিষ্যদের মধ্যে মতভেদ থাকা অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ মত নানা প্রকারের আছে এবং তাহার মধ্যে বিরোধও দৃষ্ট হয়। এইরূপ শঙ্কর সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের মধ্যেও অল্প বিস্তর বিরোধ আছে। একই শ্রুতি জগতের কল্যাণের নিমিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে কিন্তু তাহারই অর্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাবে করিয়াছে। এবং ইহা সর্ব্বত্র বিদিত আছে যে শিষ্যদিগের ধারণা শক্তির প্রভেদ অনুসারে আচার্য্যদিগের উপদেশরও তারতম্য হইয়া থাকে। অতএব কোন এক শিষ্যের মতের সহিত অন্য এক শিষ্যের মতের ঐক্য থাকা না দেখিলে যে সেই শিষ্য প্রকৃত আচার্য্যের শিষ্য নহে তাহা অবধারণ করা উচিত নহে। এই কথা রাজেন্দ্র বাবু চিন্তা করিবেন। আর বেদব্যাসের মতের সহিত শ্রী নিম্বার্কাচার্য্যের মতের যে ঐক্য আছে অর্থাৎ বেদান্ত দর্শনের নিম্বার্ক ভাষ্য যে বেদব্যাসের মতানুযায়ী তাহা অনেকে স্বীকার করেন না। এই ইঙ্গিত রাজেন্দ্র বাবু এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত লেখার সর্ব্বশেষ অংশে প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিছু সফলতা আমরা বুঝিতেছি না। আচার্য্য শঙ্করের মতও সর্ব্ববাদীসম্মত নহে। তাহারও বহু প্রতিবাদ ভারতবর্ষে হইয়াছে। কিন্তু উহা তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ে গৃহীত ও আদৃত হইয়াছে। প্রত্যেক আচার্য্যের মত সম্বন্ধে এই কথা খাটে। এইরূপ শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের মতও তাঁহার সম্প্রদায় মধ্যে অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হয়। সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কোন দুই আচার্য্যের মতের ঐক্য দেখা যায় না। সুতরাং সেই হেতুর উপর নির্ভর করিয়া কিরূপে বলা যায় যে শ্রী নিম্বার্ক ভাষ্যের ব্যাসানুসারিতা নাই। শ্রী নিম্বার্কাচার্য্যের মত কি তাহা ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক—এমন কি শিক্ষিত লোক পর্য্যন্তও অবগত নহেন। শ্রী নিম্বার্কাচার্য্য ঋষি ছিলেন এবং ঋষি সম্প্রদায়ে প্রচারের ভাব তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা উপযুক্ত শিষ্য ব্যতীত অপরকে ব্রহ্ম বিদ্যা দান করিতেন না। বর্ত্তমানকালে নিম্বার্ক ভাষ্য প্রচলিত হইয়াছে কাজেই তাহার ব্যাসানুসারিতা আছে কিনা তাহা নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক সুধীগণ বিচার করিবেন। এবং ভিত্তি হীন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা কতদূর সঙ্গত তাহাও সুধীগণ বিচার করিবেন।

শ্রীনৃসিংহদাস বসু।

পুস্তক পরিচয়

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।—তৃতীয় সংস্করণ। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ সঙ্কলিত। সঙ্কলন-গ্রন্থ হইলেও ইহাতে যে বিষয় বাহুল্যের সংযোজক এবং দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সমাহার রহিয়াছে, তাহাতে ইহাকে একখানি মৌলিক গবেষণাপূর্ণ বৃহৎ সংহিতা বলিয়াই মনে করিতে হয়। প্রথম দুই সংস্করণের বহুল পরিবর্দ্ধনে যে সকল অতিরিক্ত বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অন্বয়মুখে প্রতি শব্দের নিম্নে একটী সরল বঙ্গানুবাদ, প্রতি শ্লোকের আশয়, শ্লোকার্থও ব্যাখ্যা, প্রতি বিষয়ের ভাবার্থপূর্ণ ব্যঞ্জনা ও বিভাগ-চিত্র দ্বারা বহুবিষয়ের বিশ্লেষণ বিশেষরূপেই লক্ষণীয় হইয়াছে। উপরন্তু পাঠবিধি সহ সমুদয় মূল গীতা শ্লোক সমূহ একস্থানে বৃহৎ অক্ষরে প্রদত্ত হওয়ায় আবৃত্তি পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হইয়াছে; বিষয় সূচী, শব্দ সূচী অতি সুবিস্তারে দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বোপরি বিবিধ দার্শনিক বিষয় সমূহ এমন ভাবে গীতা-প্রসঙ্গে সুললিত কবিতায় পয়ার ছন্দে সন্নিবেশ করা হইয়াছে যে, গ্রন্থ খানিকে কেহ ভারতীয় চিন্তাধারা ও ভাবসম্পদের এক সুবৃহৎ কোষ (এন্‌সাইক্লোপিডিয়া) বলিয়া মনে করিতে পারেন—ভগবদ্‌গীতাকে মহাভারতের অংশ বিশেষ বলিয়া যাহারা জানেন, তাহারা এই নূতন সংস্করণে গীতার মধ্যে এক 'মহাভারতেরই' সৃষ্টি দেখিয়া পুলকিত হইবেন। সুবৃহৎ পুস্তক পৃষ্ঠ সংখ্যা প্রায় ১১০০; অন্যান্য বিষয়ের সহিত পয়ারসংখ্যা ১৬২৮৬; মূল্য মাত্র ৩৲ তিন টাকা। প্রাপ্তিস্থান ৬নং পাশিবাগান লেন, কলিকাতা।

মাসপঞ্জি—অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

হরিজন আন্দোলন।—মহাত্মা গান্ধী তাহার 'হরজন' আন্দোলনে সর্ব্বপ্রযত্নেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, কংগ্রেস কর্ম্মীগণও তাহাতে অনন্যভাবে যোগদান করিতেছে। সনাতনী হিন্দুদিগের ইহাতে বিষম বিক্ষোভ উপস্থিত, তাহাদিগের প্রতিরোধ আন্দোলন অনেক স্থানেই শক্তি সঞ্চয় করিতেছে: হরিজন নামীয় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও স্থানে স্থানে এই 'হরিজন আন্দোলনের' বিরোধ করে।

হিন্দুরাজ্যে মুসলমান দেওয়ান।—মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টের রাজস্বসচিব ও ভূতপূর্ব্ব ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সচিব শ্রীযুক্ত স্যার মহম্মদ হাবিবুল্লা ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইলেন।

ভারতীয়ের সামরিক পদবী।—দেরাদূনের সামরিক বিদ্যালয় (Indian Military Academy) ও ইংলণ্ড ক্রেনওয়েলের বিমান শক্তি শিক্ষালয়ে (Royal Air Force College) প্রবেশ লাভার্থে যোগ্যতা প্রাপ্তির নিমিত্ত আগামী ২৬শে মার্চ্চ তারিখে দীল্লিতে এক প্রতিযোগিতা পরীক্ষা গৃহীত হইবে। উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণের ১৫ জন আগামী আগষ্ট মাসে দেরাদূন ও ২ জন সেপ্টেম্বর মাসে ক্রেণওয়েলেতে ভর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে।

বঙ্গে শিক্ষার সংস্কার।—বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এবার দার্জ্জিলিং হইতে আসিয়াই খাস গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদে ৭ হইতে ৯ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত দিবস ত্রয় একটি শিক্ষা সংশোধিনী বৈঠক বসান। তাহাতে নানা আলোচনার বিষয়ের মধ্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে সত্বর একটি সরকারী বোর্ড গঠিত হইবে—ইহাতে মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার প্রদত্ত হইবে; ঐ বোর্ডকে সর্ব্ব শক্তিমান করা যাইবে, কেবলমাত্র তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক অবস্থার কোনও হাত না পড়ে তাহাই দেখিতে হইবে। শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যাধিক্য যাহাতে দেশে বাড়ে তাহার জন্যও বৈঠক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে।

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর আলোচনা।—বিলাতে জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির কার্য্যক্রমের জের এখনও চলিতেছে। বড় দিনের সময় পর্য্যন্ত কমন্স সভায় সভাসদ্‌গণের কার্য্যকাল বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আলোচনা প্রসঙ্গে কর্ণেল ওয়েজউড্ বিরোধে বলিয়াছেন যে, শ্বেত পত্রের সমর্থন করিবার লোক কয়েকজন ইংরেজ কর্ম্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত ভাইসরয় ব্যতীত কেহ হইতে পারে না—সাম্প্রদায়িক বিরোধের বিষ ইহা দ্বারা ছড়ান হইয়াছে—হিন্দুরা এক বাক্যে ইহার বিরোধী। রাষ্ট্রে ভেদ ইহাতে স্থায়ী হইবে, জাতীয় উন্নতির ইহা পরিপন্থী।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কথা।—প্রস্তাবিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে আর এক দফা রফার আভাস সেদিন (২৭ ১১-৩৩) রাজস্ব সচিব স্যর সুষ্টার এসেম্বলী সভাতে দিয়াছেন—সিলেক্ট কমিটি নাকি নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে অধিকাংশ অংশীদার ভারতবাসীই থাকিবে; আর তিনজন বড় কর্ম্মচারীর মধ্যে অন্ততঃ একজন ভারতবাসী থাকিবে।

গৃহহীনের সংখ্যাধিক্য।—মাদ্রাজ সহরে এক গভীর রাত্রিতে ৮ হাজার লোককে রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে—অন্য সহরে কিরূপ?

আর্থিক অবস্থার পরিদর্শন।—এ দেশের আর্থিক অবস্থার পরিদর্শনার্থে দুই জন ইংরেজ বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হইয়াছেন। একজন মিঃ ডেনিস্ এচ্ রবার্টসন অন্য একজন অধ্যাপক এ, এল্, বাউলী। ইহাদের খাদ্য বাবদ ভারত গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন ৬০ হাজার টাকা (২৫-১১-৩৩)।

নূতন ভারত ঋণ।—ভারত গভর্ণমেণ্ট নূতন ঋণ গ্রহণ কার্য্য খুলিবামাত্র ২৫ মিনিট কাল মধ্যে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; যত লোকে টাকা দিতে চাহিয়াছে তাহার শতকরা ৪৫ মাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে।

নিজামের বেরার লিপ্সা।—হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুর পুনঃ বেরারের অধিকার পাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন।

নৌবিভাগে বাঙ্গালির নিয়োগ।—গোরক্ষপুর প্রবাসী বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত আর্ এন্ লাহিড়ীর পুত্র শ্রীমান কৈলাস নাথ লাহিড়ী ইংলণ্ডে নৌবিদ্যা শিক্ষান্তে "বেঙ্গল পাইলট সার্ভিস্' বিভাগে নিযুক্ত হইয়াছেন।

স্বর্ণ রপ্তানি।—ইংলণ্ড স্বর্ণ মাল ত্যাগ করিবার সময় হইতে এযাবত (২-১২-৩৩) বোম্বাই বন্দর হইতে ১৫০৪৪৬১২৩০ টাকার স্বর্ণ রপ্তানী হইয়া গিয়াছে।

জাপান-ভারতে রাষ্ট্র-ব্যবসায়।—বিগত দুই মাস যাবত জাপান গভর্ণমেণ্টের যে বাণিজ্য দৌত্য নব দীল্লিতে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের সহিত চূড়ান্ত নিস্পত্তি এযাবত হইতেছে না। ভারত গভর্ণমেণ্ট (৪-১২-৩৩) এক চূড়ান্ত সর্ত্ত দিয়াছেন তাহাতে ওসেকার জাপ বণিকগণের অনেক দাবীই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, আর বলিয়াছেন যে আর দরাদরি করা অসম্ভব। সম্ভবতঃ এই অঙ্গীকার জাপ স্বীকার করিবে বলিয়া প্রতিনিধিরা আশ্বাস দান করিয়াছেন।

রাজ কর্ম্মচারী।—বঙ্গীয় সরকারের খ্যাতনামা হোম মেম্বার স্যর উইলিয়ম প্রেন্টিস্ এপিণ্টিসাইটিস রোগে অস্ত্রোপচার করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন (১১-১২-৩৩)। বোম্বাইর গভর্ণর পদ লর্ড ব্রেবোর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন (৯-১২-৩৩)।

গান্ধী-উক্তি।—গান্ধীজী সেদিন অমরাবতীতে এক সভায় বলিয়াছেন যে দেশের রাজনীতির মূল্য তাহার নিকট কিছু নাই কেবল মাত্র 'অস্পৃশ্যতা' আন্দোলনের কার্য্য করিলেই আর সমুদয় লাভ হইবে।" চরকা সম্বন্ধেও তাহার পূর্ব্বতন উক্তি এইরূপই ছিল।

বৈদেশিক

ব্রিটিশ কমন্স সভাতে বহির্বাণিজ্যসচিব মেজর কলভিল সেদিন (৮ ১২-৩৩) প্রকাশ করিয়াছেন যে, অনেক ঔপনিবেশিক বন্দরেই জাপানী পণ্যে ব্রিটেন পণ্যকে হারাইয়া বাজার দখল করিয়া বসিতেছে—কার্পাসবস্ত্র, সিমেণ্ট, সাইকল ও সাইকেলের অংশসমূহ, টিন ও লৌহ, ফেল হেট্, রবারের জুতা, সাবান ইত্যাদি দ্রব্যে প্রতিযোগিতা অধিক।

জ্যারমানীর ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ হার হিটলারের কার্য্যপদ্ধতির সমর্থনে এক ঘোষণা করিয়াছেন। হিটলার বলেন "আমরা আর ভার্সেলিসের সন্ধির আওতাতে বাস করিতে পারিব না"। নব নির্ব্বাচনে হিটলারের নাজিদলেরই জয় লাভ ঘটিল। নূতন নাজি গভর্ণমেণ্টে বেকারসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ইতালীতে সিগনোর মুসুলিনী 'চেম্বার অব ডেপুটি'র উচ্ছেদ সাধন করিয়া দেশমধ্যে এক প্রকার একালের উপযোগী সামাজিক ব্যবস্থা প্রথার প্রবর্ত্তন করিতে যাইতেছেন।

জাপানে খৃষ্টান ও অখৃষ্টান সকল দেশবাসীরাই বিদেশীয়ের ধর্ম্মপ্রচার করিতে দিতে নারাজ। জাপানী চরিত্রে অপর দেশীয় লোকের কোনও প্রকার প্রভুত্ব সহ্য করিতে পারে না, সকলেই সম্মান পাইতে ব্যগ্র।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট রুশ সহ দৌত্য-বিনিময়াদি সকল প্রকার রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমেরিকার তুলার দ্রব্যের প্রতিযোগী বিদেশীয় পাট ও কাগজের দ্রব্যের উপর অতিরিক্ত শুল্ক স্থাপন করা হইয়াছে।

বিদ্রোহান্তে শ্যামরাজ সপত্নীক রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন; অচিরে নব রাষ্ট্রসভার উদ্বোধন হইবে। স্পেনে নূতন বিপ্লবের আশঙ্কা।

জগতের বিভিন্ন শক্তিশালী জাতির বিমানশক্তি এইরূপ—গ্রেটব্রিটন ৮৫০; ফরাসী ১৬৫০; সোভিয়েট রুশ ১৪০০-১৫০০; আমেরিকা যুক্তরাজ্য ১০০০-১১০০; ইটালী ১০০০ ১১০০ ও জাপান ১৩৮৪।

———

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

পঞ্চম বর্ষ] পৌষ—১৩৪০ [৩য় সংখ্যা

সাধনার পথে

সাধনা-শক্তি

যে সকল লোক বা যে যে জাতি জগতে কোন প্রকার স্থায়ী সম্পদ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছে বা কোনও প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের কোন না কোনও বিশেষ সাধনার শক্তি ছিল। এ জগতে কত লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে, ইহাদের সকলেই মরিয়াছে ও মরিবে; কিন্তু ইহাদের কয় জন সংসারে কোনও প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে বা যাইতে পারে? সেইরূপ বহু জাতি জগতে উত্থিত হইয়াছে ও হইতেছে; অনেকেই বিলীন হইয়া গিয়াছে; ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে তাহাদের নাম মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; কাহারও কাহারও নাম আছে, কিন্তু অস্তিত্ব কিছুমাত্র নাই। কারণ এই যে, ইহাদিগের জাতীয় সাধনা বা 'কালচারে'তে এমন কোনও শক্তি নিহিত ছিল না, যাহা উহাদের সংরক্ষণ করিয়া চলিতে পারে। অর্থাৎ ইহারা কেহই চিরন্তন সত্যের ভিত্তিতে আপন জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে নাই,—এমন জাতীয় চরিত্র লাভ বা সংস্কৃতি অর্জ্জন করে নাই, যাহার ফল চিরকাল স্থায়ী হইতে পারে। প্রাচীন মিশর, সীরিয়া, এশিরিয়া, ইরাণ, গ্রীক এমন কি সেদিনের রোমকরা পর্য্যন্ত ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস ক্ষীণকণ্ঠে কাহারও কাহারও নাম কীর্ত্তন করে মাত্র; ঐতিহাসিক বিপর্য্যয়ে কত বিভিন্ন প্রকৃতির লোক তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছে! আবার যে স্থলে কোনও সত্যাংশেরও লক্ষ্যে কাহারও জাতীয় সাধনা পরিচালিত হইয়াছিল, পরোক্ষে হইলেও, তাহার প্রভাব পরবর্ত্তী কালের মানবসমাজে কতক পরিমাণে রহিয়া গিয়াছে। এই প্রকারেই দেখা যায় যে, প্রাচীন বৌদ্ধ ও ইহুদীদিগের ধর্ম্মপ্রভাব বর্ত্তমান খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মের উপরে রহিয়া গিয়াছে; প্রাচীন আর্য্যজাতির সমাজনীতি বর্ত্তমান কালের নানা উন্নতিশীল লোকদিগের রাষ্ট্রনীতি (Parliamentary form of Government) তে বিদ্যমান রহিয়াছে; প্রাচীন গ্রীকদিগের জ্ঞান বিজ্ঞান কলাদি বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার আধারভূমি

বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয় ; রোমকদিগের আইন কানুন (Law) বর্ত্তমান জগতের ব্যবস্থাশাস্ত্রের জন্ম দান করিয়াছে। সেইরূপেই প্রাচীন ফীনিসিয়ায় বাণিজ্যসাধনা, লীডিয়ায় নগররচনা, মিসরের স্থাপত্য, ব্যাবিলনবাসীর জ্ঞানচর্চ্চা, এশিরিয়ার শৌর্য্য, পারসীকের সাম্রাজ্যনীতি প্রভৃতি বহু জাতির বিশিষ্ট সাধনা-শক্তি পরবর্ত্তী মানবসমাজে অল্প বিস্তর প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাদের কাহারও জাতীয় সাধনা কোনও স্থানেই স্থির বা নিশ্চিত পরম্পরাক্রমে বিদ্যমান নাই—সে দৃষ্টিতে ইহারা সকলেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আজিও বহু জাতি ভূপৃষ্ঠের নানা স্থানে উন্নতির পথে অগ্রসর বা উন্নতির পদে অধিরূঢ় হইয়া আছে—ইহাদের জাতীয় সাধনাও আপন আপন বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান। কেহ অর্থনীতি, কেহ রাজনীতি, কেহ সমাজনীতি, কেহ ঐকান্তিক স্বদেশপ্রীতি প্রভৃতি গুণের বিশেষ অধিকারী এবং সেজন্য একএক প্রকারের জাতীয়তার বলে বলীয়ান্। তথাপি ইহাদিগের সাধনার মূলে যে কোনও উচ্চ নীতি নাই তাহা সহজেই ধরা পড়ে। প্রাচীন গ্রীকদিগের উচ্চ মানবীয়তার আদর্শ বা মধ্য যুগের খ্রীষ্টানদের ধর্ম্ম-আদর্শ বর্ত্তমান পাশ্চাত্যের জীবনাদর্শ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে—ঐহিক জীবনের ভোগসুখ ও লাভালাভের বিচার মাত্র ইহাদিগের গতি নির্দ্দেশ করে। একালের জড়বিজ্ঞান ও অর্থনীতি তাহারই সেবায় নিযুক্ত ও তদুদ্দেশ্য সাধনে সম্বর্দ্ধিত। এ সাধনা যে ক্ষণস্থায়ী ও আত্মঘাতী তাহার লক্ষণ ইতি মধ্যেই দেখা দিয়াছে। তথাপি বহ্ন্যুন্মুখীন পতঙ্গের ন্যায় আজ অনেকেই মহোল্লাসে তাহার পশ্চাদ্গামী হইয়াছে।

মানবীয় সাধনার পরাকাষ্ঠা পরিণতি ও সার্থকতা সম্পাদিত হয় একমাত্র সত্যের সংস্পর্শে। সত্য সনাতন, সকল সময়ে সমান, সকল অবস্থায় শাশ্বত ; কখনও তাহার ক্ষয় বৃদ্ধি নাই ; সত্যই ব্রহ্ম ও প্রকৃত বিজ্ঞানের স্বরূপ, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ ; সত্যেতে সকল বস্তু সাম্যাবস্থায় অবস্থিত, সত্যই সকলের ধর্ম্ম এবং সকলের শরণযোগ্য। ভারতের সাধনা এই সত্যের লক্ষ্যে পরিচালিত, সত্যের সম্প্রাপ্তিতে তাহার সার্থকতা। আর ভারতের জাতি ও ব্যক্তির চরিত্রে যে প্রকর্ষ সাধিত হইয়াছে,—তাহার সাধনা-সম্পদ বা cultural strength সত্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উহা চিরঞ্জীব। আজ বাহিরের জঞ্জাল আসিয়া তাহাকে সত্যভ্রষ্ট করিয়াছে, মিথ্যার আবেশে সে নানা প্রকারে অভিভূত। শিক্ষা ও জীবনযাত্রায় নানা দোষ স্পর্শিয়াছে। পাপ প্রবৃত্তি ও দুষ্কামনার প্রেরণায় সে নানা প্রকারে কলুষিত। সত্য-শক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াই তাহার অধঃপতন ও দুরবস্থা। আজ আশঙ্কা,—আর সকল জাতি যেমন ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, ভারতবাসীও বুঝি তাহাই হইবে। সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ, ধর্ম্ম—এ সকলই সে দুর্দ্দশার সূচনা করে। তবুও বলিতে হইবে, ভারতের চিরসঞ্চিত যে সত্যসাধনা তাহা হইতে সে কখনও সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইবে না। ভারতের ধর্ম্ম, সংস্কার ও ভাবপরম্পরা অতি দুর্দ্দিনেও সে সত্যকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিবে। ভারতের প্রকৃত সত্তা তাহারই সন্ধান দেয়। তাহাই ভারতের অবলম্বন ও শরণস্থানীয়। তদ্ভিন্ন যত কিছু জঞ্জাল সমুদয়ই অভারতীয়—সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

রাষ্ট্র-বৈগুণ্য।---

রাজনীতিকে অতিমাত্র বড় করিয়া আধুনিক জীবনযাত্রা কিরূপ বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ে এদেশে হিন্দুদিগের অবস্থা দেখিলে বিশেষরূপে বুঝা যায়। হিন্দুরা

নানা দিকে বিপদ গণিতেছে এবং চতুর্দ্দিকে ইহাদের যে সকল বিপদের আশঙ্কা, তাহাতে আতঙ্কেরও যথেষ্ট কারণ আছে। রাজনৈতিক হেতুতে হিন্দু বহুকাল হইতে নিপীড়িত, আজ সে পীড়ন কিছু মাত্র কমে নাই, বরং বর্দ্ধমান ; অধিকন্তু রাজনীতি হইতে সমাজ এবং সমাজ হইতে হিন্দুর ধর্ম্মে পর্য্যন্ত আজ দারুণ আঘাত লাগিতেছে। একালের পাশ্চাত্যের বৈদেশিক শাসনদণ্ডপ্রভাবে ভারতীয় জীবনের অনুপরমাণু ও প্রতি স্তরে রাজনীতির তীব্র প্রভাব যে ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও এদেশের নিতান্তই অপরিচিত এবং উহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ভারতে লোকের জীবিকা ও জীবন-যাত্রার সকল দিকে সকলের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল, রাজশক্তির তাহাতে অধিকার ছিল না রাজা রক্ষক মাত্র ছিলেন, শাসক নহেন ; ভক্ষক ত নহেনই। পক্ষান্তরে রাজশক্তি সমাজশক্তিরই অঙ্গরূপে সমাজের অন্যান্য শক্তির সহিত ঐক্য-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিল ; রাজসম্মান ও রাজমহিমা সমাজে সঞ্জীবনী রসের সঞ্চার করিয়া সমাজরক্ষারই অপূর্ব্ব সাধন ছিল। অদ্যকার রাজনীতিতে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র সে রাজসত্তাকে বর্জ্জন করিয়াছে—অনেক স্থলে নির্ম্মম আঘাতে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে—ভারতীয় হিন্দুর মর্ম্মে ইহাতে যে আঘাত পায়, এমন আর কাহারও নহে। সমুদয় হিন্দুর ইতিবৃত্তে রাজসত্তায় আঘাত বা রাজসম্মানের লাঘব অশ্রুত ; রাজসত্তা বিহনে প্রজাসত্তা অভাবনীয়। অপর সকল দেশের ইতিহাসে রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজার বহিষ্করণ, রাজার শিরচ্ছেদ প্রভৃতি অনেক দেখিতে পাওয়া যায় ; অদ্যকার প্রচলিত এই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র সেইরূপ বহু বীভৎস কাণ্ডের ক্রমপরম্পরায় প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুর রাষ্ট্রে রাজা ও প্রজা উভয়ই আবশ্যক। রাজপদের দায়িত্ব ও সুবিধা রাজার অধিকার নহে—ধর্ম্ম। প্রজার কর্ত্তব্য ও সুখস্পৃহা তাহার অধীনতা ও দাবীর বিষয় নয়—ধর্ম্ম। এই রাজধর্ম্ম ও প্রজাধর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয় হিন্দু সমাজের বৈশিষ্ট্য—মানব ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অবদান। নীতি হার—পরার্থে আত্মসমর্পণ ; ফল—সমাজের সংরক্ষণ। রাজা ও প্রজার আপন আপন ধর্ম্ম রক্ষার দ্বারা সে রক্ষা হয়—"ধর্ম্ম রক্ষতি রক্ষিতঃ'।

রাষ্ট্রকে কেবল রাষ্ট্রের ভাবে বাড়িতে দেওয়া এই যুগের লক্ষণ ; সে জন্য উহা এখন ধর্ম্ম ও নীতির উপরে আধিপত্য করিয়া বসিয়াছে, অর্থকে আপন সেবায় নিযুক্ত করিয়াছে, মোক্ষকে বা ব্যক্তিগত ও জাতিগত পরম শান্তিকে অগ্রাহ্য করিয়াই চলে। ভারতের অন্তরে এই সংস্কারগুলি বদ্ধমূল ; ভারতের চিত্ত রাষ্ট্রকে এই সকলের সেবাক্ষেত্র বলিয়া মাত্র জানে। তাই ইহাদের ব্যাঘাত দেখিয়া তাহাতে আঘাত লাগে। সত্য বটে আজ রাষ্ট্র-সংস্কারের নামে—একটা অজ্ঞেয় কিছু পাইবার জন্য, ভারতবাসী ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। একটী অনির্দ্দেশ পথ-যাত্রার উন্মাদনায় হাতের কাছের অনেক বস্তু সে ছাড়িয়া দিতেও প্রস্তুত। পরিণাম অনিশ্চিত, কিন্তু উপায়ের পথে বিপ্লব নিশ্চিত ও অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রথম ফলভাগী হইতে হইয়াছে, ভারতীয় সংস্কার ও সভ্যতার প্রধান সংরক্ষক ও উত্তরাধিকারী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুকেই। তাই শ্বেতপত্রের শাসনসঙ্কেতে সে আতঙ্কিত, সাম্প্রদায়িক বিবাদ সংঘটনে সে নিপীড়িত, সর্ব্বশেষে নিজ সমাজে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ লইয়া বিকট বিরোধে সে সর্ব্বস্বান্ত হইতে যাইতেছে! এ সমুদয়ই হইতেছে অদ্যকার প্রচলিত সেই গণতন্ত্রের নামে—অলীক সাম্য-প্রতিষ্ঠার প্রলোভন দেখাইয়া।

ইতিহাসে সত্য সঙ্কোচ।—

বাঙ্গালা সরকারের পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন-বিভাগ হইতে বালকবালিকাদিগের পাঠের

নিমিত্ত ভারতের ইতিহাস রচনা সম্বন্ধে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে নব-রচিত পাঠ্য পুস্তকে কোন অপ্রিয় সত্য ঘটনার উল্লেখ করা যাইবে না। ইতিহাসে "ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম" — এই নীতির সার্থকতা আছে কিনা জানি না; থাকিলে ইতিহাস হয় না।

যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ পাঠ্যপুস্তক হইতে বর্জ্জন করিবার কথা হইয়াছে তাহার মধ্যে মুসলমান রাজা ও বাদসাহ দিগের কথাই অধিক —যথা. আলাউদ্দীন খিলজী কর্ত্তৃক স্বীয় স্নেহশীল পিতৃব্যের হত্যা সাধনে সিংহাসন অধিকার, মহম্মদ তগলকের নির্ম্মম ও নির্ব্বুদ্ধির কার্য্য সকল, পরবর্ত্তী মোগল বাদসাহদিগের দ্বারা শিখ দিগের প্রতি নির্ম্মম অত্যাচার, রাজপুতদিগের অবমাননা, আওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক হিন্দুমন্দির ধ্বংস ও হিন্দুদিগের প্রতি 'জিজিয়া' কর স্থাপনা, ইত্যাদি। এত দিন এ সকল অপ্রিয় কথা ইতিহাসে অবাধে গ্রথিত হইয়া আসিয়াছিল এবং বোধ হয় একটু বেশী করিয়াই এই সকলের বর্ণনা হইয়াছে। কারণ একালের ইতিহাস সকলই প্রধানতঃ ইংরেজ ঐতিহাসিক দিগের লিখিত ভারতের ইতিহাসের অনুকরণে লিখিত, আর ইহারা রাজনৈতিক বিবরণকেই ইতিহাস বলিয়া জানেন (ইহাদের একজন প্রধান ঐতিহাসিক ফ্রিম্যানের মতে ইতিহাস বিগত রাষ্ট্রিক ঘটনা ভিন্ন আর কিছু নয়—"History is past politics". এই সকল ঐতিহাসিকেরা নব বিজেতার গর্ব্ব-দৃষ্টি লইয়াই ভারতের ইতিহাস লিখিয়াছেন। বিগত মুসলিম রাষ্ট্রের দোষাবলী প্রধানতঃ ইহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, এবং তাহা বিশদরূপে বর্ণনা করিবার কতকটা রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যও ছিল। বিজেতারূপে মুসলমানেরা যে এ দেশে অনেক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা অসত্য নহে, অসম্ভবও নয়; সকল বিজেতাই তাহা করিয়া থাকে। বরং অন্য দেশে বিজেতারা যে অত্যাচার ও ধ্বংসের বীভৎস লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন, ভারতের কোনও বিজেতা ততদূর করিয়া উঠিতে পারে নাই; মুসলমানেরাও নহে। কারণ ভারতের সাধনা ও সভ্যতা বিজেতাদিগেরও চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট করিতে পারে ও অনেক স্থলে করিয়াছে; আলেকজাণ্ডার হইতে ওয়ারেন হেষ্টিংশ পর্য্যন্ত ভারতের বিজেতৃ বৃত্তান্ত সাধারণতঃ এইরূপ। আবার রাষ্ট্রিক বৃত্তান্তই দেশের একমাত্র ইতিহাস নহে; উহা ত বাহ্যিক ব্যাপার। জাতীয় জীবনের প্রত্যেক দিকই প্রকৃত ইতিহাসের লক্ষ্য। লোকের সামাজিক জীবন, নৈতিক উৎকর্ষ ও ধর্ম্মনীতি, পরস্পর প্রীতি ও বদান্যতা, পরার্থপরতা, আর্থিক উন্নতি ও সচ্ছল জীবনযাত্রা -এ সমুদয়ই ইতিহাসের বিষয়ীভূত। মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে যে অনেক বদান্য-প্রকৃতি ধর্ম্মভীরু প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন, ইতিহাসে তাহার যথোচিত বিবরণ দেওয়া নাই—তাহাদিগের অত্যাচার নৃশংসতা ও নির্ব্বুদ্ধিতার বিবৃতি যেরূপ করা হইয়াছে, কর্ত্তব্য পরায়ণতা ও সদাশয়তার পরিচয় তেমন দেওয়া নাই; এজন্য আধুনিক ইতিহাস-লেখকগণই প্রধানতঃ দায়ী। এ বিষয়ে অধুনা প্রচলিত সর্ব্বজনবিদিত ঐতিহাসিক স্মীথ সাহেবের "অক্সফোর্ড হিষ্টরী অব্ ইণ্ডিয়া" নাম পুস্তকখানির সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান ভারতীয় 'স্কলার'দিগের আবিষ্কার চেষ্টাতে সত্য সন্ধানের চেষ্টা রহিয়াছে—অনেক বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার মৈত্র ও নিখিল নাথ রায় মহাশয় যে ভাবে মুর্শিদাবাদের এই সে দিনের মাত্র কাহিনীকে অসত্যের প্রলেপ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এরূপ কত কাহিনী যে মধ্য যুগের তমসাতে আবৃত রহিয়াছে, তাহার অন্ত নাই। আবার কিছুদিন পূর্ব্বে এই সকল ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে যে সমদৃষ্টি ও উদারতা এবং প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসা ছিল, আজ তাহাও

দেশে দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে। বিকৃত রাজনৈতিক চক্রে পড়িয়া দেশ আজ অনৈক্য ও বিদ্বেষের উসর ভূমি, সাম্প্রদায়িকতার বিষে সমুদয় ভূমি জর্জ্জরিত—শিক্ষা ও জ্ঞানভূমি তাহা হইতে মুক্ত নহে। অতি আধুনিক গবেষণায় কার্য্য সকলে তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

পাঠ্যপুস্তকের বিষয় নির্ব্বাচনে যে সত্যসঙ্কোচের প্রয়াস হইতেছে, তাহাতেও এই সাম্প্রদায়িক ভাবই বলবত। অন্যথা সত্য সত্যই ঐক্য-প্রতিষ্ঠার উদার ভাব প্রকৃত লক্ষ্য হইলে, অদ্যকার এই নানা বিদ্বেষ ও বিরোধের বায়ুমণ্ডল হইতে সম্পূর্ণ সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। আমরা বিশ্বাস করি একমাত্র সত্য ও সাধনার দৃষ্টিতেই দেশের কল্যাণ ও সকল শ্রেণীর লোকের মঙ্গল সাধন সম্ভবপর। এবং এদেশে এক দিন তাহা হইবে। এজন্য ইতিহাসকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। অপ্রিয় সত্যকে সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে। বাস্তবিক অনেক পাপ সঞ্চিত হইলেই বর্ত্তমান ভারতবাসীর ন্যায় দুর্দ্দশায় পড়িতে হয়। এ জন্য অতীতের অপকীর্ত্তির সমুদয় বোঝা জাতিকে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—এবং তিলে তিলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সে পাপ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। যাহারা ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্ম-বিদ্বেষের ইতিহাস শুনিয়া দুঃখিত হন, তাহারা ৺ অযোধ্যায় জন্মস্থান, কাশী ৺বিশ্বেশ্বরের মন্দির এবং মথুরার প্রাচীন কংস কারাবাস পাশে সমুন্নত মসজিদও বৃন্দাবনে ৺ গোবিন্দজীর ভগ্ন মন্দির দেখিয়া অবশ্যই শিহরিয়া উঠিবেন। যাহারা ইতিহাসের পৃষ্ঠ হইতে কোনও উৎপীড়নের কাহিনী তুলিয়া দিতে চাহেন, তাহাদের উচিত পূর্ব্বে এই উৎপীড়নের মূর্ত্তি গুলির উচ্ছেদ সাধন করা। অনৈক্য ও বিদ্বেষ বিসে জর্জ্জরিত ভারতবাসীকে একদিন সে অবস্থায় আসিতেই হইবে—সকল প্রকার অনৈক্যের চিহ্ন দেশ হইতে বিদূরিত করিতে হইবে—তখনই তাহাদের ইতিহাস পাঠ সার্থক হইবে। সে জন্য সত্য সত্যই নূতন করিয়া ইতিহাস রচনা আবশ্যক।

বাস্তবিক ভারতে এযুগের কোনও ইতিহাস রচনা হয় নাই; একমাত্র প্রাচীন ভারতেরই ইতিহাস আছে। একজন সমসাময়িক ব্যক্তি স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিলেন, গ্রীসের ইতিহাস লিখিলেন, রোমের ইতিহাস লিখিলেন—ভারতের ইতিহাস লিখিলেন না কেন?" উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ভারতবাসী মাত্রেরই পক্ষে মর্ম্মঘাতী। পরে তিনি তাঁহার 'স্বপ্ন লব্ধ ভারতের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে সে আক্ষেপ কতকটা মিটাইয়া যান। বাস্তবিক মধ্যযুগ হইতে ভারতের যে ইতিহাস তাহা—হিন্দু মুসলমান—সকলের পক্ষেই ঘোর কলঙ্ক জনক, কেহই তাহাতে গৌরব বোধ করিতে পারে না। পরিণাম তাহার বর্ত্তমান ঘোর দুর্দ্দশা! ইহা হইতে নিষ্কৃতির জন্য যে প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক তাহার জন্য ইতিহাসে সত্য-সঙ্কলন প্রয়োজন—সত-সঙ্কোচ নহে।

রামমোহন মৃত্যু শতবার্ষিকী।—

রাজা রামমোহন রায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের বৃষ্টল নগরে দেহ-ত্যাগ করেন। এই বৎসর তাহার শতবর্ষ পূর্ণ হইল বলিয়া ইংরেজী নিয়মে তাঁহার মৃত্যু-শত-বার্ষিকী উৎসব ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইতেছে। ভারত মৃত্যু মানে না, এজন্য এখানে মৃত্যুৎসব নাই। শ্রাদ্ধ আছে, তাহাতে পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির বিধান হয়। উৎসব ভারতে খুবই আছে; সে উৎসব হয় জন্মোপলক্ষে। ভারতে যে জন্মোৎসব আছে, তাহার তুলনা জগতে মিলে না,

ইতিহাস তাহার আয়ুষ্কাল নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম। উৎসবেরও আবার ব্যতিক্রম আছে—যে উৎসবে সকল লোক সমান ভাবে একমত হইয়া যোগদান করে ও যাহাতে শান্তি ও উৎসাহ আনে তাহা এক প্রকারের। আবার অনেক উৎসব আছে, তাহাতে কেবল বিরোধ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। অদ্যকার ভারতের অনেক উৎসবই এই জাতীয়। রামমোহনের মৃত্যু শতবার্ষিকী উৎসবে দেশের সকল লোককে সম-মত দেখা যাইতেছে না। এক শ্রেণীর লোক খুব উৎসাহ লইয়াই ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। ইহারা দেশের অগ্রণী, সকল কাজে নেতৃত্ব করেন বা সকল আন্দোলনকে জাগরিত রাখেন। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন তাহারা ইহার বিরোধ করিতেছেন, এমন কি এই উপলক্ষে মৃত মহাপুরুষের চরিত্রের নানা দোষ দর্শাইতেও কুণ্ঠিত হন নাই; ইহারা বর্ত্তমান দেশের অবস্থাতে উৎফুল্ল নহে, আধুনিক আন্দোলনে বিশ্বাস রাখেন না, উপস্থিত উন্নতিকে উন্নতি বলিয়া মানেন না। সুতরাং রামমোহন যে যুগের স্রষ্টা বলিয়া পূজিত হন, সে যুগের সহিত তাহার স্রষ্টাও ইহাদের কাছে নিন্দার পাত্র। বাস্তবিক মানুষের মধ্যে দোষ গুণ উভয়ই থাকিবে; কোনও মানুষই পূর্ণ নহে। রামমোহনকে সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন বলিয়া পূজা করা যেমন শ্লাঘ্য নহে, তাহার চরিত্রের কোন দোষ দেখাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ অপদস্থ করাও তেমনই দোষের।

রামমোহন যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে যুগ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন-যামের উষা কাল—ভারতের ইতিহাসের এক গুরুতর সমস্যার সময়। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াছে; ভারত বাহ্যত তাহার শাসন স্বীকার করিয়াছে; মনে ও চিত্তে—সাধনায় ও শিক্ষায় তাহার বশ্যতা লইবে কি না, এই প্রশ্নই তখন উঠিয়াছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (১৮১৭ খৃঃ অঃ); ডেভিড্ হেয়ার তাহার ঘড়ি মেরামতী কার্য্য ছাড়িয়া (রবার্ট ক্লাইভ যেমন কেরাণীর কলম ছাড়িয়া অস্ত্র ধরিয়াছিলেন) ভারতীয় মনের সংস্কার-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন—কলিকাতার ঘরে ঘরে গমন করিয়া বালক সংগ্রহও ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হইলেন। হিন্দুর ধর্ম্ম-দৃষ্টিকে উচ্ছৃঙ্খলিত করিতে (to "liberalize the religious outlook of the Hindus") তাহার তাৎকালিক সমীক্ষা (experiment) রামমোহনের অসীম প্রতিভা ও শক্তিমত্তা হইতে যে সহায়তা লাভ করিয়াছিল, রবার্ট ক্লাইভের কোনও বাঙ্গালী সহযোগীই তত দূর শক্তিশালী ছিল না। আর তখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার দ্বন্দ্ব লইয়া যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, (ডাঃ সিলীর ভাষাতে) সেরূপ বিতর্ক (controversy) ও জগতে আর কখনও উঠে নাই। পরিণাম তাহার পলাশীর পরিণাম অপেক্ষা কম প্রভাবের হয় নাই। সে বিতর্ক-যুদ্ধে রামমোহন সম্পূর্ণরূপেই ইংরেজী শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করেন আর এতদ্দেশীয় শিক্ষার বিরোধ করিয়াছিলেন;—"সংস্কৃত শিক্ষা উহার শিক্ষা-শ্রমের উপযুক্ত প্রতিদান দেয় না"; "বেদান্ত পড়িয়া লোক সমাজে চলিবার উপযুক্ত থাকে না,...পিতামাতাকে অগ্রাহ্য করে,"—ইত্যাদি তাঁহার তখনকার অতি কঠোর অভিমত ("The Sanskrit learing conceiled under this almost impervious veil is far from sufficient to reward the labour of acquiring it.... Nor will youths be fitted to be members of society by the Vedantic doctrine which teach them to believe that all visible things have no real existence, that a father and brother etc. have no real entity, they consequently deserve no real affection, and therefore

the sooner we escape them and leave the world the better".) সুখের বিষয় আজ রামমোহনের সমর্থিত প্রচলিত সে শিক্ষার সম্বন্ধেই ঐরূপ চরম অভিমত প্রকাশ করা চলে।— বর্ত্তমান শিক্ষার দুর্দ্দশা দেখিয়া ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীতে পরিচালিত হইলেই শিক্ষার সার্থকতা থাকে এবং সমাজ ও লোক-চরিত্র রক্ষা পায়, এই ধারণা দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে।

শিক্ষা অপেক্ষাও রাম মোহনের খ্যাতি অধিক নিবদ্ধ রহিয়াছে আর দুইটী বিষয়ে—তাহা সংস্কার, ধর্ম্মে ও সমাজে। এবং এই সংস্কারের প্রবর্ত্তক বলিয়াই রামমোহন যুগপুরুষ বলিয়া পূজিত হইতেছেন। বাস্তবিক রামমোহনের যুগটাই ছিল সংস্কারের—কেবল ভারতে নহে, ইংলণ্ডেও তখন বহু সংস্কারের প্রবর্ত্তন দেখা যায়—জেরিমে বেন্থাম তখন তদ্দেশের প্রচলিত ভাবধারার-বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া স্বাধীন চিন্তার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন ও ব্যক্তিগত সাধারণ জ্ঞানকে ধর্ম্মও ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত নীতিবাদের উপর স্থান দিয়া, নূতন করিয়া সমাজ ও ব্যবহারিক আচার গঠনের প্রেরণা দিয়াছিলেন। (আজ সেই স্বাধীন চিন্তাই জগতের নানা স্থানে ব্যভিচারে পরিণত হইয়াছে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থাতেও বহু সংস্কার তখন ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—"রোমান ক্যাথলিক ইমানসিপেসন",) "আইরিশ চার্চ্চ রিফর্ম্ম" পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দাসত্ব মোচন, ফ্যাকটরী আইন প্রভৃতি বহু রাষ্ট্র-সংস্কার তখন হয়। এই সকলের ক্ষুদ্র সংস্করণই তখন ভারতে সতীদাহ-নিরোধ, ভারতবাসীকে উচ্চ রাজ কর্ম্মে নিয়োগ প্রভৃতি সংস্কারে দেখা দেয়। সর্ব্বোপরি হিন্দুকলেজে তখন যে নব ইংরেজী ভাব-স্রোত বহিয়াছিল, তাহাতে উদ্বেলিত হইয়া হিন্দু যুবকগণ স্বীয় পৈতৃক ধর্ম্ম ভুলিয়া বিজ্ঞান ও সংস্কারের নামে আত্মহারা হইয়া চলিয়াছিল। রামমোহন সোৎসাহে সেই সংস্কারকে আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছিলেন।

ধর্ম্ম-সংস্কারে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের তৃতীয় খ্যাতি। ইংরেজীতে ইহাকে Theistic School of thought বলে। বাস্তবিক কিন্তু ব্রাহ্ম ভাব ও Theism এক কথা নহে— একেশ্বর (monytheism) বা বহু দেববাদে (Polyth-eism) থিজ্‌ম্ আছে; উহা সর্ব্বেশ্বর বাদ (Pantheism) ও নিরীশ্বর (atheism) বাদেরই বিরোধী। ব্রাহ্মভাব প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা; তাহাতে ঈশ্বরত্ব নাই; ঈশ্বরত্ব ব্যতীত Theism হয় না। ব্রহ্মের অন্য রূপ কল্পনাতে উহা নিরীশ্বর বা সর্ব্বেশ্বর বাদেরই অধিকতর সামিল। যাহা হ'ক রামমোহনের যে ব্রাহ্মমন্ত্রে দীক্ষা হইয়াছিল, প্রচলিত ব্রাহ্ম সমাজ বা ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। রামমোহন অসাধারণ মেধাবী ও উদ্যোগী ছিলেন; তৎকালে বর্দ্ধমান বাঙ্গলা দেশে শিক্ষার ও সভ্যতার (culture)র কেন্দ্রস্থান ছিল। আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা উচ্চ হিন্দু দিগের তখন শিক্ষার পরিমাপক ছিল, (এখন যেমন ইংরেজী শিক্ষা); রামমোহন যৌবনের প্রারম্ভেই আরবী শিক্ষার্থে বর্দ্ধমানে যান। কুলধর্ম্ম অনুসারে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন ও এক শালগ্রাম শিলা তাহার গলদেশে বান্ধা ছিল। দৈবাৎ একজন সন্ন্যাসী তখন বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী এক স্থানে আসেন। রামমোহনের অনু-সন্ধিৎসা-প্রকৃতি তাহাকে তথায় লইয়া যায়. দণ্ডী সাধুর নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে গলায় লম্বমান শালগ্রামের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া শ্লেষ ভাব প্রকাশ করেন; তাহাতে উত্তেজিত হইয়া তিনি শালগ্রাম শিলা নিক্ষেপ করিয়া ঐ সাধুর নিকট ব্রাহ্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হন। (এই কথাটী সেদিন রামমোহন রায়ের স্বগ্রামবর্ত্তী স্থানের একজন প্রবীণ বিশিষ্ট ব্যক্তি কথা প্রসঙ্গে ব্যক্ত

করিয়াছেন। এই রূপ অনেক কথা হইতেই রামমোহন রায়ের জীবনের প্রকৃত অনেক তত্ত্ব বাহির হইতে পারে—প্রচলিত জীবনকাহিনী পরবর্ত্তীকালের ঘটনালোকে অতিরঞ্জিত বা বিকৃত হইয়া থাকে।) এই ঘটনা হইতেই তিনি পিতা কর্ত্তৃক কুল ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই দীক্ষা যে পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্মমতের দীক্ষা নহে—বৈদিক ধর্ম্মেরই এক প্রকার ভেদমাত্র, তাহা বলা বাহুল্য। পরবর্ত্তী কালের ব্রাহ্ম মত প্রচারে রামমোহনের মন্ত্রদীক্ষার বীজ থাকিতে পারে, কিন্তু উহাতে তৎকালিক সমাজের স্বাধীন চিন্তার প্রভাবই অধিক, এবং সে জন্যই পরে অত্যল্প সময় মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজে বিভিন্ন বিভাগ ও মতবাদ প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কোনওরূপ শক্তি সম্পন্ন হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই।

বাস্তবিক কার্য্যফল দেখিয়া বিচার করিবার সময় আসিয়াছে বলিয়াই একালে রামমোহন চরিতের বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনা যাইতেছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এরূপ সমালোচনা প্রায় শুনা যাইত না। রামমোহন এদেশে পাশ্চাত্য-প্রসূত আধুনিকতার প্রসার সাধন করিয়া গিয়াছেন। সে আধুনিকতার গলদ আজ এদেশ অপেক্ষাও পাশ্চাত্য দেশ সমূহে অধিকতর ধরা পড়িতেছে—যাহারা সে আধুনিকতার মদিরায় এখনও মত্ত, তাহারাই উহা ধরিতে পারিতেছে না। নতুবা রামমোহন রায়ের ধীশক্তি ও কর্ম্মশক্তি অসাধারণ ছিল—শারীরিকবল ও মনের তেজ ও সাহস অসাধারণ ছিল, স্বদেশ ও বিদেশবাসীর উপর তাহার অসাধারণ প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল তিনিই তাৎকালিক দীল্লির বাদশাহ বংশধরের পক্ষে ব্রিটিশ-দত্ত বৃত্তি-বৃদ্ধির জন্য ইংলণ্ড গমন করিয়াছিলেন; পথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তাঁহার যশ-জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কমন্স সভার এক সিলেক্ট কমিটির সমক্ষে সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসীর পক্ষে তাহারই সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল। এদেশে একালে এরূপ শক্তি-সম্পন্নের দৃষ্টান্ত দুর্লভ। রামমোহন তাহার দেশ ও দেশবাসীকে ভালবাসিতেন এবং অন্তরের সহিতই ভালবাসিতেন। কিন্তু তাহার এই অসাধারণ শক্তিমত্তা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃত ভাবে তাহাদের স্বার্থ ও সত্তার সেবায় নিয়োজিত হইয়াছিল, কি যে বিরোধী শক্তিনিচয় এ যুগে ভারত-সত্তার উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইয়া আসিয়াছে, তাহারই সহযোগিতা করিয়াছিল, ইহাই বিচার্য্য বিষয়। সেই আত্মবিধ্বংসী কার্য্যপরম্পরার ফলে মৃতপ্রায় ভারতকে যে পরে স্বামী বিবেকানন্দ কতকটা সঞ্জীবিত ও উদ্বোধিত করিয়া যাইতে পারিয়াছেন তাহা সেই ভারতসত্তারই পরিচয়ে ও সেবা-তৎপরতায়। বিবেকানন্দ ও রামমোহনের প্রভাব-বলে ভারত চেতনা কোথায় কতখানি সাড়া দেয়, ভারতবাসী মাত্রেরই তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করা উচিত। সে চেতনার তারতম্য এ গুরুতর প্রশ্নের কিঞ্চিত সমাধান করিতে পারে।

যোগসাধনের প্রণালী ও প্রয়োজনীয়তা

স্বামী জ্ঞানানন্দ

গত কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "যোগের শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা" শীর্ষক পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে যোগের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দেখা গেল যে, তৎসম্বন্ধে শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শন সকল শাস্ত্রেরই বস্তুতঃ একই অভিপ্রায়। এখন প্রশ্ন, এই যে চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের কথা বলা হইল, ইহার প্রয়োজনীয়তা কি?—এইরূপ যোগ সাধন করিয়া লাভ কি?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবদ্বাক্য আছে—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাম্ অধিগচ্ছতি॥ ১

অর্থ।—যোগী, এইরূপে (যোগসাধন দ্বারা) মনকে সংযত করিয়া (চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া), সর্ব্বদা (জাগ্রদাদি সর্ব্বাবস্থায়) জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগসাধন দ্বারা আত্মস্থ শান্তিলাভ করেন (স্বীয় আত্মার মধ্যেই আরাম লাভ করেন) এবং পরিণামে মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

এমন সুখদায়ক যোগ কিরূপে সাধন করিতে হইবে? উপরি উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বেই আছে—

যোগী যুঞ্জীত সততম্ আত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরম্ আসনম্ আত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিন-কুশোত্তরম্॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগম্ আত্মবিশুদ্ধয়ে॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ২

---

১ যোগী এবম্ (এতদ্রূপেণ যোগসাধনেন) নিয়তমানসঃ (সংযতচিত্তঃ সন্—চিত্তবৃত্তীন্ নিরুধ্য) সদা (সর্ব্বদা—জাগ্রদাদি-সর্ব্বাবস্থায়াম্) আত্মানং (স্বীয়ম্ আত্মবোধম্ জীবাত্মানম্) [পরমাত্মনা সহ] যুঞ্জন্ (যুক্তং কুর্ব্বন্) মৎসংস্থাম্ (ময়ি সংস্থিতাম্ আত্মস্থাম্ আত্মমধ্যগতাম্) নির্ব্বাণপরমাং (নির্ব্বাণং মোক্ষঃ এব পরমং শেষসীমা পরিণামঃ যস্যা তাদৃশীং) শান্তিম্ অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)।

২ আত্মানং [পরমপদে] যুঞ্জীত (যুক্তং কুর্ব্বীত)। যতচিত্তাত্মা (চিত্তং চ দেহরূপিণম্ আত্মানং চ সংযম্য বিজিত্য)। অপরিগ্রহঃ (দানোপকার গ্রহণরহিতঃ সন্)। আত্মন (স্বস্য) স্থিরম্ আসনম্

[উপরি উদ্ধৃত শ্লোকসমূহের প্রথমটীতে সংক্ষেপে যোগসাধনের প্রণালী কহিয়া, পরবর্ত্তী চারি শ্লোকে তাহা কথঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া বলা হইয়াছে। নিম্নে এই শ্লোকসমূহের অর্থ দেওয়া যাইতেছে।]

অর্থ।—যোগী পরিগ্রহশূন্য হইয়া (কাহারও দান কিংবা কোন প্রকার অনুগ্রহের অধীন না হইয়া), নিরাশী (আকাঙ্ক্ষারহিত) হইয়া, দেহ ও মনকে জয় করিয়া, একাকী নির্জ্জনে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বদা আপনাকে (নিজ আত্মবোধকে) [পরমাত্মার সহিত] যোগ করিবেন। [তাহা কিরূপে করিবেন ?]—[নির্জ্জন] পবিত্র স্থানে, কুশের উপর মৃগচর্ম্ম ও তদুপরি বস্ত্র পাতিয়া, অতি উচ্চও না হয় অতি নিম্নও না হয় এইরূপ স্থির আসন প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং সেই আসনে উপবেশন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়ক্রিয়া নিরুদ্ধ ও মন একাগ্র করিয়া চিত্ত সংযত করিবেন (প্রত্যাহার ও ধারণাপূর্ব্বক ধ্যান অবলম্বন করিবেন); [এইরূপে] ব্রহ্মচর্য্যরত সেই সাধক আত্মবিশুদ্ধির জন্য, প্রশান্তচিত্ত ও ভয়রহিত হইয়া, শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সম (সরল) ও অচলভাবে ধারণপূর্ব্বক স্থির হইয়া (স্থিরাসনস্থ হইয়া), কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কেবল স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, মনঃসংযম (চিত্তনিরোধ) করত অবস্থান করিবেন।

ইহার কয়েক শ্লোক পরেই যোগসিদ্ধির লক্ষণ (শুভফল) সম্বন্ধে আরও আছে—

> যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
> যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।।
> সুখম্ আত্যন্তিকং যৎ তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ অতীন্দ্রিয়ম্।
> বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ।।
> যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
> যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।
> তং বিদ্যাদ্ দুঃখ-সংযোগ-বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
> স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিন্নচেতসা।। ৩

প্রতিষ্ঠাপ্য (প্রতিষ্ঠিতং কৃত্বা)। তত্র (তস্মিন্ আসনে) একাগ্রং মনঃকৃত্বা (ধ্যানম্ অবলম্ব্য)। যত-চিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ [সন্] চিত্তং বুদ্ধিম্ ইন্দ্রিয়ক্রিয়াং চ নিরুধ্য — ধারণাং প্রত্যাহারং চ সাধয়িত্বা) [প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলেই দেহের সুখদুঃখাদিভোগ দূর হয় – দেহ বিজিত হয়। এখানে প্রথম শ্লোকের 'যতচিত্তাত্মা' পদই পরে তৃতীয় শ্লোকে 'যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ' পদে বিশদীকৃত হইয়াছে]। প্রশান্তাত্মা [সন্] (প্রশান্তচিত্তঃ সন্) [অত্র 'আত্মা'পদং চিত্তবোধকম্]।

৩ যোগসেবয়া (যোগসাধনহেতুনা) আত্মনা (বিশুদ্ধচিত্তেন) আত্মনি (স্বস্মিন্ নিজমধ্যে) আত্মানং (আত্মস্বরূপং সচ্চিদানন্দরূপং পরমাত্মানম্) তুষ্যতি (তুষ্টঃ তৃপ্তঃ ভবতি) [যোগী ইতি শেষঃ]। অয়ং (যোগী) যত্র (যস্মিন্ অবস্থায়াং) অতীন্দ্রিয়ং বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ (ইন্দ্রিয়াতীতং বুদ্ধিমাত্রেণ গ্রহণীয়ম্ ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ-বিশুদ্ধবুদ্ধ্যা ধারণীয়ম্ ইত্যর্থঃ) আত্যন্তিকং (অন্তাতীতং পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তং) যৎসুখং তৎ অনুভবতঃ বেত্তি, যত্র স্থিতঃ [সন্] অয়ং (যোগী) [পরমানন্দলাভহেতোঃ তস্মাৎ] ন চলতি। দুঃখসংযোগবিয়োগং (দুঃখেন সহ সংযোগঃ-দুঃখসংযোগঃ তেন দুঃখসংযোগেন সহ বিয়োগং বিচ্ছেদং। তস্য অভাবঃ তং – সর্ব্বদুঃখসংযোগাভাব-

অর্থ।—যে অবস্থায় চিত্তবৃত্তিরোধহেতু, [সর্ব্ববিষয়বাসনা ও তজ্জনিত উদ্বেগ হইতে] উপরত (নিবৃত্ত বা বিশ্রামপ্রাপ্ত) হয়, [সুতরাং] যে অবস্থায় [যোগসাধনহেতু-বিশুদ্ধীকৃত] চিত্ত দ্বারা নিজের মধ্যেই আত্মস্বরূপ দর্শন (সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার) লাভ করিয়া আত্মতৃপ্ত হওয়া যায় ; [বৈষয়িক বা ঐন্দ্রিয়িক সুখ নিতান্তই ক্ষুদ্র, অনিত্য ও অসার বলিয়া একান্ত অগ্রাহ্য, কিন্তু] যাহা আত্যন্তিক সুখ বা পরমানন্দ তাহা ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু, [সুতরাং একমাত্র ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ] শুদ্ধবুদ্ধির গ্রাহ্য, এইটী যে অবস্থায় স্বয়ং তত্ত্ব অনুভব করিয়া জানিতে পারা যায় [অতএব] যে অবস্থায় স্থিত হইয়া সেই যোগী [পরমানন্দরূপ পরমার্থ লাভ বশতঃ] তাহা হইতে আর বিচলিত হন না ; যে অবস্থা লাভ হইলে আর কোন লাভকেই তাহা হইতে অধিক বলিয়া মনে হয় না ; এবং যে অবস্থায় স্থিত হইলে [ব্যাধি, পীড়ন ও বিয়োগাদি জনিত] গুরুতর দুঃখও মন বিচলিত হয় না ; [সুতরাং যে অবস্থায় কোন দুঃখেই দুঃখ দিতে পারে না] এমন দুঃখলেশশূন্য অবস্থাই যোগ নামে পরিজ্ঞাত। [যোগের এই ফলশ্রুতি বলিয়া তাহার কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে বলিতেছেন যে,] এ হেন যোগ সংশয়শূন্য হইয়া আশা ও উৎসাহযুক্ত চিত্তে সাধন করা কর্ত্তব্য।

আরও—

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখম্ উত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতং অকল্মষম্ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে ॥৪

অর্থ।—[এইরূপে] রজোগুণরহিত (বিষয়তৃষ্ণাশূন্য), [সুতরাং] প্রশান্তচিত্ত, নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভাবাপন্ন এই যোগীকেই উত্তম সুখ আশ্রয় করিয়া থাকে। বিগতপাপ যোগী এইরূপে সর্ব্বদা স্বীয় আত্মাকে (আপন নিজ বোধকে) ব্রহ্মে যোগ করিয়া (ব্রহ্মসত্তায় নিজবোধ স্থাপন করিয়া) অনায়াসে সেই ব্রহ্মযোগরূপ পরমসুখ ভোগ করিয়া থাকেন।

এই পরম সুখ লাভ করাই যোগের প্রয়োজনীয়তা। এই পরম সুখটী কীদৃশ বস্তু তাহাই এখন বিচার করিয়া দেখা যাক। একান্ত অভাবমোচন বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই জীবের একমাত্র আবশ্যকতা ; যাঁহার কোন অভাব নাই তাঁহার কোন দুঃখ নাই, সুতরাং কোন আবশ্যকতাও নাই। এখন তবে দেখা যাক, জীবের অভাবই বা কি ?—জীব চায় কি ? এই নিখিলভূতগ্রাম নিয়ত যে অভাবের তাড়নে অস্থির, সে কিসের অভাব ? কোন্ চিরাকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিবার জন্য জীব ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে ও অন্ধকারে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, অথচ না পাইয়া

রূপাবস্থাং দুঃখলেশশূন্যাবস্থাম্)। অনির্বিণ্ণচেতসা (নির্বেদশূন্যেন নৈরাশ্যজনিত-শিথিলতারহিতেন চিত্তেন—আশাজনিতোৎসাহযুক্তেন চিত্তেন)।

৪ শান্তরজসম্ (রজোগুণরহিতম্)। উপৈতি (প্রাপ্নোতি আশ্রয়তি)। ব্রহ্মভূতম্ (ব্রহ্মভাবাপন্ন)। অকল্মষম্ (নিষ্পাপম্)। আত্মানং (স্বীয়ম্ আত্মবোধং নিজবোধম্) যুঞ্জন্ (পরমাত্মনি যোজয়িত্বা) সুখেন (বিনায়াসেন) ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (ব্রহ্মযোগরূপম্) অত্যন্তম্ (অন্তম্ অতীত্য যৎ বর্ত্ততে তাদৃশং পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তং) সুখম্ অশ্নুতে (ভুঙ্‌ক্তে)।

নিরন্তর বিলাপ করিতেছে? জীবের সে চিরাকাঙ্ক্ষিত বস্তু সুখ বা আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেমন তেমন সুখ হইলেই হইবে না, আত্যন্তিক সুখ চাই—নিরন্ নিত্য সুখ চাই—সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তি চাই। জীব সংসারে যত কিছু কর্ম্ম করিতেছে, কেবল এই একই উদ্দেশ্যে, অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু সে অভীষ্ট বস্তু কোথায় আছে, কোথায় গেলে তাহা পাওয়া যাইবে, তাহা না জানিয়া—অন্ধকারে দেখিতে না পাইয়া, এখানে সেখানে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে। সে কখনও মনে করিতেছে, বুঝি ঐ রসগোল্লাটার মধ্যে, বুঝি ঐ পাকা আমটার মধ্যে, বুঝি ঐ দুধের বাটীতে কিংবা ঐ মাংসের ডিষে, বুঝি বা ঐ সুরার পিয়ালায় সুখটী লুকাইয়া রহিয়াছে; আবার ভাবিতেছে, ঐ সুন্দরীর সুন্দর অধপল্লবে, তাহার অনুরাগরঞ্জিত কপোলে ও ঐ কমনীয় ক্রোড়দেশে বুঝি সুখের পরাকাষ্ঠা; বুঝি বা ঐ সুকুমার শিশুর মুখচুম্বনে ও তাহার ঐ আধ আধ বুলিতেই সারসুখ নিহিত! সে কখন বা পরিচ্ছদে, কখন বা বিবিধ বিলাসিতায় সুখ অন্বেষণ করিতেছে; কখন বা সুখ-ধনের কাঙ্গাল হইয়া মান-যশের দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান হইতেছে; কখন বা সোনারূপার ঝন্‌ঝনানিতে মত্ত হইয়া তাহারই মধ্যে সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে! কিন্তু অহো! সবই যে বিড়ম্বনা! এসব যে নিয়তই দুঃখ ও বিঘ্নসঙ্কুল—ইহাদের উপার্জ্জনে দুঃখ ও উদ্বেগ, আর পরিণামেও বিপুল ক্লেশ ও পরিতাপ—ইহারা দুঃখেই জাত এবং দুঃখেই পর্য্যবসিত—ইহার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যে কেবলই দুঃখময়।

"আদিমধ্যাবসানেষু সর্ব্বং দুঃখম্ ইদং জগৎ।" [কুলার্ণবতন্ত্রম্]।

অর্থ।—এই জগৎ (গতিশীল বা চঞ্চল বিষয়রাশি) আদি, মধ্য ও অবসান [সর্ব্বকালেই] সম্পূর্ণ দুঃখসঙ্কুল (উহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও ক্ষয়, সবই দুঃখপ্রদ)।

"সুখং বৈষয়িকং শোক সহস্রেণাবৃতত্বতঃ।
দুঃখম্ এবেতি মত্বাহ নাল্পেঽস্তি সুখমিত্যসৌ॥" * [পঞ্চদশী]।

অর্থ।—বৈষয়িক সুখ বহু দুঃখে আচ্ছাদিত বলিয়া উহা দুঃখের মধ্যেই গণ্য, এই মনে করিয়া তিনি (সনৎকুমার) [নারদকে কহিলেন—"অল্পে অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র বিষয়ে সুখ নাই (ভূমা অর্থাৎ অসীম অখণ্ড নিত্য আনন্দ যাহা তাহাই সুখ; অনিত্য, সান্ত, ক্ষুদ্র বস্তুতে যে অনিত্য, খণ্ড, ক্ষুদ্র সুখ, তাহা সুখই নহে)।

বাস্তবিক বিষয়াসক্তেরা অজ্ঞানতাবশতঃ অনিত্য বিষয়রাশিতে যে সুখ অন্বেষণ করে, তাহা নিতান্তই অসার ও দুঃখপূর্ণ—তাহা সুখ নামেরই যোগ্য নহে। কিন্তু তথাপি প্রকৃত বোধালোকের অভাবে, প্রাকৃত বুদ্ধির সামান্যালোকে এই অসার তরল (চঞ্চল) বিষয়পরিপূর্ণ সংসার-স্রোতমধ্যে প্রকৃত আনন্দ বস্তুর ছায়া দর্শনে প্রতারিত হইয়াই, জীব সেই উপাখ্যানবর্ণিত কুকুরের মত উহাতেই সবেগে ঝম্প প্রদান করিতেছে। কিন্তু এই বিষরাশিতে প্রকৃত সুখ কোথায় পাইবে? কবি সত্যই বলিয়াছেন—

---

* শোকসহস্রেণাবৃতত্বতঃ—সহস্র সহস্র দুঃখ দ্বারা আবৃতত্ববশতঃ, বহু দুঃখে আচ্ছাদিত বলিয়া (বৈষয়িক সুখের সাধনে বা সংগ্রহে বিশেষ ক্লেশ, ফল লাভ না হইলে—বাঞ্ছিত সুখের উপাদানের অপ্রাপ্তিতে কিংবা বিনাশে শোক, উহার সাধনকালেও নিষ্ফলতা ও বিনাশের চিন্তায় উদ্বেগ, সুখবিশেষের ভোগের পর অবসাদ, অনুতাপ, ব্যাধিযন্ত্রণা প্রভৃতি বহু ক্লেশে জড়িত বলিয়া)।

"নিত্য সুখ নহে কিছু সাম্রাজ্য-প্রলাভে,
নিত্য সুখ নহে কিছু ভামিনীর ভাবে,
নিত্য সুখ নহে কিছু বিষয়-বিভবে,
নিত্য সুখ নহে কিছু কুলের গৌরবে,
নিত্য সুখ নহে কিছু হর্ম্ম্য-নিকেতনে,
নিত্য সুখ নহে কিছু বিপিন বিজনে,
নিত্য সুখ নহে কিছু রাজানুকম্পায়,
নিত্য সুখ নহে কিছু এই বসুধায়;
নিত্য সুখ একমাত্র **প্রেমিকের মনে,**
আর আছে প্রাণেশের নিত্য নিকেতনে।" [সদ্ভাবশতক]।

বাস্তবিক পার্থিব বা বৈষয়িক সুখ কেবল 'দিল্লীকা লাড্ডু'বৎ—"যো নেহি খায়া সো ভি পস্তায়া, আউর যো খায়া সো ভি পস্তায়া।" না খাইয়া যাহারা পস্তায় তাহারা উহার জন্য অতিমাত্র লালায়িত হয়, কিন্তু যাহারা খাইয়া পস্তায় তাহারা উহার অসারতা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া উহার প্রতি একান্ত বিরক্ত হয়। তবে খাইয়া পস্তানটা অবশ্য সহজ হয় না, বহু জন্ম জন্মান্তরব্যাপী ভোগের পর জীবের সেই সৌভাগ্য উপস্থিত হয়—দিল্লীর লাড্ডুর উপর বিরাগ জন্মে—বৈষয়িক ভোগরাশি যে নিতান্ত অনিত্য ও অসার সেই বোধ দৃঢ় হয়। তখনই সে প্রকৃত সুখ কোথায় আছে তাহার অনুসন্ধানে রত হয়, তখনই সে সেই নিত্যানন্দ ধামের—'প্রাণেশের নিত্য নিকেতনের'—পথ খুঁজিতে প্রবৃত্ত হয়। খুঁজিতে খুঁজিতে ক্রমেই আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপে যখন নিতান্ত ব্যাকুলতা—নিতান্ত প্রাণের টান—উপস্থিত হয়, তখনই তাহার পথপ্রদর্শক সদ্‌গুরু লাভ হয়। গুরুকৃপা হইলেই সেই সাধক যোগমার্গে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে এবং শীঘ্রই চিরবাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়া—সেই নিত্যসুখের আস্বাদ পাইয়া—কৃতার্থ ও ধন্য হয়। শ্রুতি বলিতেছেন—

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরা স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥" [কঠোপনিষৎ]।

অর্থ।—সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত একমাত্র (অদ্বিতীয়) প্রভু আত্মা (পরমাত্মা), যিনি একমাত্র [স্বীয়] রূপকেই [নিজ স্বভাবে লীলার ইচ্ছায়] বহুরূপে প্রকাশিত করেন, সেই আত্মাকে নিজ আত্মারূপে স্থিত বলিয়া যে জ্ঞানিগণ অপরোক্ষ অনুভব করেন, তাঁহাদেরই নিত্যসুখ লাভ হয়, আর কাহারও তাহা হয় না।

এই যে পরম পুরুষ বা পরমাত্মা, ইনিই আমাদের প্রাণের প্রাণ,—প্রাণারাম—প্রাণেশ, একমাত্র আশ্রয়। সে প্রাণারাম ভিন্ন, জীব! তোমার আশ্রয়নীয় আর কে আছে?—তাঁহার অপেক্ষা তোমার অধিক আপন আর কে আছে? তুমি তাঁহারই আত্মজ—তাঁহার স্ব-ভাব হইতেই জাত। "God created man after His own image" (ভগবান্ স্বীয় রূপের অনুমত করিয়াই মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন)। বাইবেলের এই উক্তির অর্থ কি? এখানে image বলিতে জড়ীয় মূর্ত্তি মনে করিবে না; তাঁহার জড়ীয় মূর্ত্তি নাই, আর বাইবেলের তেমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে না। তিনি পরম আত্মা—জড়াতীত সত্তা, আর জীব আত্মাও জড়াতীত সত্তা; সুতরাং

স্বরূপতঃ এক। কেবল স্বভাবের প্রভেদ—তিনি মায়ার অধীশ্বর আর জীব মায়ার অধীন। তাই, জীব! তিনিই যে তোমার সব—তিনি তোমার মাতাপিতা, তিনি তোমার কর্ত্তা ধাতা, তিনি তোমার সখা, তিনি তোমার স্বামী, এমন কি তিনিই তোমার স্ব-রূপ; তিনি ভিন্ন তোমার গতি নাই, অস্তিত্বও নাই। মাতা, পিতা, সখা, স্বামী, যে ভাবে ইচ্ছা তাঁহাকে ভজনা কর; একমাত্র তাঁহারই শরণ লও। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ" এই যে তিনি, তোমার হৃদয়ে বসিয়া, অনুক্ষণ বলিতেছেন, শুনিতেছ না? তিনি যে তোমাকে "এ'স এ'স" বলিয়া সর্ব্বদা আহ্বান করিতেছেন, সে মোহন বাঁশীর রব কি কাণে প্রবেশ করিতেছে না? সে যে আমার আনন্দের অনন্ত সাগর, স্বয়ম্ আনন্দস্বরূপ—পরিপূর্ণ আনন্দ, কেবল আনন্দ, বিমল আনন্দ, নিত্য আনন্দ; আর কোন্ কথা দিয়া প্রকাশ করিব? ভাষায় যে প্রকাশের শব্দ নাই! ভাই, একবার এসনা, একটীবার—মাত্র একটীবার তাঁহার বাতাস গায়ে লাগাও না, একবার পরীক্ষা করিয়াই দেখ না, তাহাতে কত আনন্দ—কত সুখ! পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে, তোমার নিজ হৃদয়ই তখন "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

অনিত্য সংসারের অসার বিষয়রাশি লইয়া আত্মা কি তৃপ্ত থাকিতে পারে? ইহাতে কি তাহার ক্ষুধা-পিপাসা মিটে? অবশ্য দেখা যায় যে, প্রায় সকলেই এই সব অনিত্য বিষয়সুখেই মত্ত হইয়া আছে!—যেন ইহাতেই পরিতৃপ্তি, আর কিছু চাহে না! মত্ত বটে, কিন্তু যথার্থ তৃপ্তি কৈ? আর কিছু চাহে না? চাহে বৈকি? অনুক্ষণই কেবল আরও চাহে—আরও চাহে! কিন্তু হত-ভাগ্যেরা যাহা চায় তাহা ত পায় না, আকাঙ্ক্ষিত যথার্থ সুখবস্তু কোথায় পাওয়া যায় তাহাও জানে না; তাই কায়ার অভাবে অগত্যা ছায়া লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবার চেষ্টা করে! সংসারে এমন কোন কোন লোক দেখা যায়, যাহারা আপন ঘরে সুখ না পাইয়া, স্বীয় অবস্থা কথঞ্চিৎ ভুলিয়া থাকার অভিপ্রায়ে, শুঁড়িদোকানে গিয়া সুরাপানে মত্ত হইয়া থাকে। সংসারাসক্ত মানবও তাই করে—নিজ ঘরে যে পরমানন্দ আছে তাহার সন্ধান না পাইয়া, অপরাপ্রকৃতির ভাটিখানায় চিত্ত-শুঁড়ি দ্বারা পচা অসার বিষয়জাত হইতে চোয়ান নিতান্ত অসার সুখরূপ সুরাপানে মত্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া আছে।

এই সুরার মাদকতাশক্তিও সামান্য নহে। কথিত আছে, একদা দেবরাজ ইন্দ্র কোনও কারণে শূকরযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই বরাহশ্রেষ্ঠ একটী বরাহীর সঙ্গ লইয়া তাহাতেই মত্ত হইয়া পড়িলেন এবং এইরূপে তাঁহার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। সেই শূকরীর গর্ভে তাঁহার অনেক গুলি শাবক উৎপন্ন হইল। এইসব শাবক সহ স্ত্রীসহবাস-সুখে বিভোর হইয়া শূকররাজ যেন পরম সুখেই বাস করিতে লাগিল। এইভাবে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইতে লাগিল. ওদিকে দেবরাজ্যের সিংহাসন শূন্য। দেবগণ বহুকাল অপেক্ষা করিয়াও যখন দেখিলেন যে, রাজা আর আসিতেছেন না, তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া তাঁহার স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, এক প্রকাণ্ডকায় শূকর তাহার শূকরী ও বহুসংখ্যক শাবকসহ ঐন্দ্রিয়িক সুখের নেশায় মত্ত হইয়া বাস করিতেছে। দেবগণ নিকটে যাইতেই সেই শূকর, 'ইহারা বুঝি বা আমার স্ত্রীপুত্রাদি কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে' এইরূপ মনে করিয়া, ক্রোধবিঘূর্ণিতা ক্ষনয়নে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিকট রব করিতে লাগিল! দেবগণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পরস্পর বলিতে লাগি-

লেন—"অহো! মায়ার কি প্রভাব! ইনি দেবরাজ হইয়াও অবিদ্যাপ্রভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া আছেন! মনে করিতেছেন যে, এই ভাবে, এই সুখেই অনন্তকাল হইতে আছেন, অনন্তকাল থাকিবেন! কি শোচনীয় মোহ! ইঁহাকে এখন প্রবুদ্ধ করা প্রয়োজন।" অতঃপর দেবগণ উঁহাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য নানা কৌশলে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফলতা লাভ হয় না। বেচারীই বা করে কি? শূকরদেহ—তমঃপ্রধান, নেশা আর ছুটিতে চাহে না। বহু চেষ্টার পর সে একবার বলিয়া উঠিল—"দেবগণ, আমার এখন কিছু কিছু মনে পড়িতেছে, আমি বুঝি দেবরাজ ছিলাম। কিন্তু দেখ, তোমরা আমাকে আর ঘাটাইও না। আমি আমার শূকরী ও তদ্‌গর্ভজাত আমার শিশু সন্তানগুলি লইয়া বড়ই সুখে আছি। স্বর্গে এমন সুখ আছে কিনা স্মরণ হয় না, আর স্মরণ করিতে ইচ্ছাও করি না। তোমরা আমায় এ সুখ ত্যাগ করিতে বলিও না! যদি বেশী গোলমাল কর, আমার এ সুখে বিঘ্ন জন্মাইতে চাও, তবে আমি তোমাদিগকে আমার সুদৃঢ় দংষ্ট্রা-ঘাতে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব।" ইহা বলিয়া সে পুনরায় তাহার পরিজন লইয়া মত্ত হইল—শিশুগুলিকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার শূকরীর ক্রোড়ে শয়ন করিল!

সংসারাসক্ত মানবগণেরও এই দশাই ঘটিয়া থাকে। সময়ে সময়ে কোন কোন ঘটনায় একটু প্রবোধ আসিলেও—একটু আত্মদৃষ্টি হইলেও, তাহা তখনই আবার মিলাইয়া যায়—আবার তখনই সে সংসারসুখে—ঐন্দ্রিয়িক সুখে মত্ত হইয়া পড়ে। মোহমুগ্ধ জীবগণ প্রকৃত সুখের নাগাল না পাইয়া এই দুঃখবহুল অসার সুখকেই একমাত্র সম্বল মনে করে। তাহাদিগকে সে নিত্যানন্দ পরমাত্মার সংবাদ বলিলেও তাহা গ্রাহ্য করে না, এবং মুখে যাহাই বলুক, মনে মনে তৎসম্বন্ধে বিশেষ সংশয় পোষণ করিয়া থাকে। কাজেই তাহারা সেই নিত্য নির্ম্মল সুখের আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও, এই আপাতমনোরম, অনিত্য ও দুঃখসঙ্কুল, অসার সুখকেই তৎস্থলবর্ত্তী মনে করিয়া ইহারই ভজনা করিয়া থাকে! তাহারা দুধের পিপাসায়, হাতের ধারে পাইয়া সুরার পিয়ালায় চুমুক দেয়, আর তাহার দুর্গন্ধে ও ঝাঁঝে একবার নাকমুখ সিটকাইয়া আবার তখনই চুমুক দেয়! এইরূপ পুনঃ পুনঃ জীবন ভরিয়া, জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া করিতে থাকে, কিছুতেই পিপাসা মিটে না বলিয়া। আহা! এতদপেক্ষা তৃষ্ণানিবারক সুমধুর পানীয় যে নিজের ঘরেই আছে, তাহাই যে বেচারী জীব ভুলিয়া গিয়াছে! মোহিনী অবিদ্যার মোহে পড়িয়া সে এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়া আছে! তাই সে চির অতৃপ্ত পিপাসা-শান্তির আশায় পুনঃ পুনঃ সেই মোহিনীর সুরাবিপণিতেই যাতায়াত করিতেছে! কিন্তু এত সেই তৃষ্ণানিবারক, সুশীতল, সুমিষ্ট পানীয় নয়, যে ইহাতে পিপাসা মিটিবে। দুর্ভাগা জীব জানে না—"শান্তি কোথায় আছে আর, [সে] অমৃতসাগর বিনা।" [তাই সে] "বিষয়-বিষের কুণ্ডে করে শান্তি অন্বেষণ, ভ্রমবুদ্ধি তার।"

এখন, জীবের এই দুর্গতি নিবারণের উপায় কি?—তাহার এই চিরন্তর পিপাসা নিবৃত্তির কৌশল কি? চিত্ত-শুঁড়ির বিনাশ সাধন করিতে না পারিলে আর ইহার অন্য উপায় নাই। ও বেটাই যত অনর্থের মূল। ওকে বিনাশ করাও একেবারে সহজ কথা নয়। জীব ঐ শৌণ্ডিকালয়ের অধিকারিণী অপরাপ্রকৃতির (অবিদ্যার) মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ এবং বিষয়-সুরাপানে বিভোর, সুতরাং স্বভাবতঃই দুর্ব্বলীকৃত। এই অবস্থায় সেই বলবান্ অসুরের সঙ্গে পারিয়া উঠাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। তবে তাহার ভিতরে যে চিৎশক্তি (কুণ্ডলিনী) ঘুমন্ত অবস্থায় আছেন তাঁহাকে একবার

জাগাইয়া লইতে পারিলে আর কোন ভাবনা নাই, সেই 'চিৎ'এর হাতে পড়িলে 'চিত্ত'-অসুরের অচির মরণ অনিবার্য্য। তাই বলি, ভাই, চিৎকে জাগাইয়া চিত্তবিনাশের আয়োজন কর—চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য যত্ন কর। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলেই যোগ সিদ্ধ হইল; তখনই সচ্চিদানন্দ আত্মার প্রকাশ। এই আনন্দস্বরূপ—রসস্বরূপ—আত্মার প্রকাশ বা অনুভূতি সিদ্ধ হইলেই কেবলানন্দ বা নিত্য-নির্ম্মল পরমসুখ লাভ হইয়া থাকে। ইহা লাভ করার জন্যই যোগের প্রয়োজন—চিত্তবৃত্তি-নিরোধের বা চিত্তনাশের প্রয়োজন। (জ্ঞানসাধন মঠ, মাদারীপুর)

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম্-এ, এল্, এম্, এস্ লিখিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৮। **বিশ্বামিত্র সংহিতা।**—বিশ্বামিত্র প্রণীত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কিনা তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এবং এই গ্রন্থও আর পাওয়া যায় না। তবে ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। চরকসংহিতার টীকায় চক্রপাণি বিশ্বামিত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, দেখা যায়। যথা—"যদুক্তং বিশ্বামিত্রেণ,—

(ক) 'তড়াগজং দরীজঞ্চ তড়াগাদ্ যৎ সরিজ্জলম্।
বলারোগ্যকরং তৎ স্যাদ্ দরীজং দোষলং স্মৃতম্॥ (চ, সূ, ২৭ অ,)

(খ) "যদুক্তং বিশ্বামিত্রেণ—

সূক্ষ্মকেশ প্রতীকাশা বীজরক্তবহাঃ সিরাঃ।
গর্ভাশয়ং পূরয়ন্তি মাসাদ্বীজায় কল্পতে॥ (সু, টী, সূ, ১৪ অ,)

শিবদাস সেন ও বিশ্বামিত্রের পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনি অর্কের বর্ণনাবসরে লিখিয়াছেন—

(গ) "যদাহ বিশ্বামিত্রেণ—

শ্বেতপুষ্পঃ কৃষ্ণপুষ্পো রক্তপুষ্পস্তথৈবচ।
পীতোঽন্যোঽপি বরস্তেষু কৃষ্ণপুষ্পের প্রকীর্ত্তিতঃ॥ (চক্র, টী, অর্শোরোগ)

৯। **অত্রি সংহিতা।**—ইহাও অতিপ্রাচীন সংহিতা গ্রন্থ, কেহ কেহ বলেন ইহা তাদৃশ প্রাচীন গ্রন্থ নহে। যেহেতু প্রাচীন টীকাকারগণের মধ্যে কাহাকেও অত্রি সংহিতার পাঠ উদ্ধৃত করিতে দেখা যায় না। শুনিতে পাওয়া যায়, পঞ্চনদ প্রদেশে অত্রিসংহিতা এখনও বর্ত্তমান আছে এবং উহা সুবৃহৎ গ্রন্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উক্ত সংহিতা গ্রন্থের অথবা কোন টীকাকার কর্ত্তৃক উহা হইতে উদ্ধৃত বচনের দর্শনলাভ অদ্যাপি আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই।

কায় চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তাহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, সে সকলের পরিচয় এই প্রবন্ধে প্রকাশিত করা হইল। অতঃপর শল্যতন্ত্রের পরিচয় প্রবন্ধান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

বঙ্কিম প্রতিভা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্ত বলাই দেবশর্ম্মা

সাহিত্য সৌন্দর্য্য—উপন্যাস

সৌন্দর্য্য কি তাহা লইয়া মত ভেদের অন্ত নাই, বিতণ্ডারও শেষ নাই। অন্ধ ছাড়া ফুল সুন্দর ইহা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু সাহিত্য কলা সম্বন্ধে কেবলই মতভেদ, অহরহই বিরোধ। কাহারো আদি রসকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়, কাহারো হয় ত্যাগপ্রবণতাকে। 'বিল্বমঙ্গল' ঠাকুর নরনারী যৌবনের জন্য উন্মত্ত হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্যদেব ষোড়শী সহধর্ম্মিণীকে পরিবর্জ্জন করিয়া আচণ্ডালে প্রেম বিলাইবার জন্য প্রবজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুদ্ধচেতা কুন্দশুভ্র চন্দ্রিকাতে বিমুগ্ধ, চোর যে সে অন্ধকারের কুটীলতাকেই আকাঙ্ক্ষা করে। মনোবৃত্তির চিত্রানুসারে সৌন্দর্য্যের ধারণা। তবে, সৌন্দর্য্যের একটা সার্ব্বভৌমিকতাও আছে। সাহিত্য কথায় সেই সার্ব্বজনীন রূপ-রসের দিকে দৃষ্টি দিয়া চলিতে হয়।

ভাল লাগার বিশেষ কোন মূল্য নাই। দশের দৃষ্টিতে যাহা অন্যায়, অন্যায়কারীর তাহা ভাল লাগে বলিয়াই করিয়া থাকে। অতএব তাহা তাহার কাছে সুন্দর এইরূপ সিদ্ধান্তকে মান্য করিতে হইলে সুন্দর ও কুৎসিতের মাঝে কোনও সীমা-রেখা থাকে না। এই অনর্থের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এবং তত্ত্বতঃও বটে—সৌন্দর্য্য বিচারে শুভের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। কিছুকে সুন্দর হইতে হইলে তাহার আগে তাহাকে হইতে হইবে সত্য ও শিব। শুধু সত্য নহে; সত্য ও শিব।

বাস্তবে যাহা ঘটিতেছে বা ঘটিয়াছে এমনই সত্য নহে। কেহ নৃশংস ভাবে হত্যা করিতেছে ইহাওত সত্য ঘটনা। ইহা সত্য, অতএব সুন্দর—এমন কাহারো সাহস নাই যে এমন সিদ্ধান্ত করিবে। সত্য হওয়া প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন শুভদ হওয়া। শুভ অর্থাৎ কল্যাণ। এই কল্যাণ ব্যক্তির আত্মিক কল্যাণ এবং সমাজ সংহতির কল্যাণ। পূর্ব্বে যাহাকে সামাজিকতা বলিয়াছি।

ভাল অনেক কারণে লাগিতে পারে। প্রবৃত্তির যাহা অনুকূল তাহাও প্রিয়। যাহা বিচিত্র—বহুভঙ্গিম তাহাও প্রিয়। আবার যাহা সাধারণের মাঝে একটু অসাধারণ তাহাও মিষ্ট। এই সর্ব্বশ্রেণীকেই সাধারণতঃ আমরা সুন্দর বলিয়া থাকি। কিন্তু এই গুলি স্বরূপতঃ সুন্দর নহে; প্রবৃত্তি, প্রকৃতি এবং রুচির তৃপ্তি, তুষ্টির দিক দিয়া সুন্দর। নিদাঘে শীতল জল—সুন্দর। আবার হীম শীতে উহাই কষ্টকর। প্রায় অধিকাংশ সময়ই প্রবৃত্তির তৃপ্তি তুষ্টি দিয়া আমরা ভাল মন্দের বিচার করিয়া থাকি, এই ভাল মন্দের অনুভূতি যথার্থ ভালমন্দের নিয়ামক নহে।

সকলের তৃপ্ত-তুষ্টির ধারণা সমান নহে বলিয়া প্রবৃত্তি অনুমোদিত সৌন্দর্য্যেরও একটা স্থির রূপ নাই। আবার প্রবৃত্তি অতৃপ্য বলিয়া তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতিও ভঙ্গুর।—আজ যাহা মিষ্ট

কাল তাহা তিক্ত। রোহিণী গোবিন্দলালের রূপে উন্মাদিনী হইয়া গার্হস্থ্য প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া কুলের বাহিরে গিয়াছিল। গিয়াছিল—ঠিক রূপের উপাসনার জন্য নহে। যৌবনের উক্ষিপ্ত তাড়নায়। রূপ পূজার জন্য যাইলে গোবিন্দ লালের প্রতি তাহার অনন্যনিষ্ঠ ভালবাসা রহিত। এবং তাহাকে ঘর ছাড়িয়া বাহিরেও ছুটিতে হইত না। রোহিণী যে সুখ, যে তৃপ্তি—নারীজীবনের রহিয়াছিল তাহা সে গার্হস্থ্য প্রতিষ্ঠানে তাহার খুড়াকে সেবা শুশ্রূষা করিয়াই লাভ করিত। রোহিণী যৌবন লালসায় মদক্ষিপ্তা হইয়া রূপের অনুসরণ করিয়াছিল। তাই সে হইয়াছিল প্রবঞ্চিতা। সে ছুটিয়াছিল এক আবাস্তর আলেয়ার পিছনে। তাই গোবিন্দলালের বাহুবেষ্টন পরিশেষে তাহার কাছে কঠিন বন্ধন বলিয়া মনে হইয়াছিল।

সৌন্দর্য্য—তাহা সাহিত্যেরই হউক, বা ব্যবহারিকই হউক, তাহা সত্যপ্রতিষ্ঠ, শুভ-অপেক্ষী, তাহা মহিমাব্যঞ্জক। এমন নিকৃষ্ট মনোবৃত্তি হয়ত খুবই কম আছে, যাহা নীচ কর্ম্মে উল্লসিত হয়। রাবণ অথবা দুর্য্যোধনের দুর্দ্দান্ত চরিত চিত্তে আনন্দ অপেক্ষা বিরক্তই হয় সমধিক। কিন্তু ভীষ্মের ভীষ্মব্রত, দধীচির অস্থিদান এই সব মহিম্ন অবদান-পরম্পরা মনুষ্য মাত্রকেই আনন্দ-পরিপ্লুত করে। যাহা মহিম তাহাই সুন্দর; যাহা শুভদ তাহাই সুন্দর, যাহা আত্মোৎসর্গে উদ্দীপিত তাহাই রসোদ্ভাসিত।

কেবল মাত্র নীতি,—শুষ্ক মাত্র হিতোপদেশে হয়ত সুন্দর নহে, তাই বলিয়া যাহা দুর্নীতি বা অহিতজনক তাহাও সুন্দর নহে। এই সুন্দর, এই অসুন্দর—এইরূপ একটা সীমা-রেখা টানিয়া দেওয়া যায় না। হয়ত বা প্রাকৃতিক বস্তুগত ব্যাপারে এমন একটী গণ্ডি আঁকিয়া দেওয়া যায়। যেমন পুষ্প সুন্দর, কিন্তু বিশুষ্ক ফুল মালিকা সুন্দর নহে। সঙ্গীত সুন্দর, কিন্তু কোলাহল কর্কশ; কাজেই অসুন্দর। কিন্তু এইরূপ পার্থক্য মানস সৌন্দর্য্য অথবা সাহিত্য সৌন্দর্য্য বিচারে প্রয়োগ করিতে পারা যায় না।

সাহিত্য-সৌন্দর্য্য বস্তু-সৌন্দর্য্য নহে, ভাব-সৌকুমার্য্য। চিত্তের সৌষ্ঠব। মানসিকতার বিচিত্রতা ও মহনীয়তা। "চন্দ্রশেখরের" গার্হস্থ্য সুখ-প্রতিষ্ঠার জন্য যখন কিশোর সঙ্গিনী এবং সমর্পিতাপ্রাণ শৈবলিনীকে প্রতাপ প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন সে ত্যাগ-মহিমা দেখিয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়া যাই। ইহাকেও সৌন্দর্য্য আখ্যা দিয়া থাকি। আর বাস্তবিকই ইহা মানসসৌন্দর্য্য। অপর পক্ষে, শৈবলিনীর লালসার উদ্দামতা দেখিয়া চিত্ত বিরক্তিগত হইয়া ভরিয়া উঠে। শৈবলিনীর অবৈধ অনুরাগ যে কাহারো পক্ষে রুচিকর নহে, এমন বলিতে পারি না। তবে শেষোক্তটী দীন কুণ্ঠিত। আর প্রথমটিতে রহিয়াছে এক পূর্ণতার ঐশ্বর্য্য। মানস সৌন্দর্য্য যাহা, তাহা লালসার দৈন্য নহে, মহত্তের মহিমা! লুণ্ঠনকারী নরপতিকে মনুষ্য জাতি ভয় করে; কিন্তু সম্ভ্রম করে, শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে—তাঁহাকে, যিনি দানের আতিশয্যে ভিক্ষুকের দৈন্যকেই বরণ করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মানস সৌন্দর্য্য অঙ্কিত করিতে গিয়া সর্ব্বত্রই মহিমার অনুসরণ করিয়াছেন। ক্ষুদ্রতাকে লালসার ভিক্ষুকতাকে কখনো তিনি অঙ্গীকার করেন নাই। "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে হরদেব ঘোষালের পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্য্যের ধারণা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রনাথকে পত্রে লিখিতেছেন:—রূপভোগ লালসা ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের

ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না ; তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না।

এই পত্রেই হরদেব ঘোষাল অন্যত্র বলিতেছেন :—প্রেম বুদ্ধিবৃত্তি মূলক প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণ সকল যখন বুদ্ধি বৃত্তির দ্বারা পরিগৃহিত হয়, হৃদয় সেই সময় গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট ও সঞ্চালিত হয়। * * * ইহার ফল সহৃদয়তা এবং পরিণাম আত্মবিস্মৃতি ও আত্ম-বিসর্জন। এই যথার্থ প্রণয়।

দৃষ্টান্তের বাহুল্যে লাভ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক স্থানেই মহৎ প্রকৃতিকেই যথার্থ সৌন্দর্য্য বলিয়াছেন। "কৃষ্ণকান্তের উইল" গ্রন্থখানি ভক্ত ও প্রকৃত ; প্রেমের এক যথার্থ দ্বন্দ্ব। রূপ সত্য, কি গুণ সত্য, এই সত্যের মীমাংসা করিতে করিতেই কৃষ্ণকান্ত উইলের ঘটনা সংস্থান পরিশেষে মহিমার নিকট আত্ম-নিবেদন করিয়াছে। ভ্রমরের মৃত্যুর পর গোবিন্দলাল আর একবার হরিদ্রা গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার ভাগিনেয় শচীকান্ত তাঁহাকে বিষয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে গোবিন্দলাল উত্তর দিয়াছিলেন :—এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র তাহা পাইয়াছি।

ইহাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের রসানুভূতির চরমাদর্শ বুঝিতে পারি। নিম্নাভিমুখী যে বৃত্তি গুলির আবেগকে আমরা সাধারণতঃ রস বলি এবং লালসারঞ্জিত নয়নে শরীর সংস্থানে যে সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করি, বঙ্কিমচন্দ্র সেই অতি সাধারণ এবং অতি নিম্নগ রূপ রসকে তাঁহার সাহিত্য সাধনার অঙ্গীভূত করেন নাই।

সাহিত্য সাধারণ নহে—অসাধারণ। সংসারের দশটা বস্তুতে যাহা পাওয়া যায়, সাহিত্যে তদপেক্ষা বেশী কিছু পাওয়া প্রয়োজন। আর তাহাতেই তাহার সার্থকতা। বসন্তের আবির্ভাবে যাহা পাওয়া যায়, শারদ চন্দ্রিকায় যাহা লভ্য, নব মাধবের কুহু এবং প্রাবৃটের কেকায় যে অনু-ভূতি উদ্রিক্ত হয়, সাহিত্য ততটুকু ত দিবেই। পরন্তু দিবে তদূর্দ্ধ আর একটুকু! সেইটুকু প্রবুদ্ধ আনন্দ -জ্ঞান-প্রযুক্ত আনন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র যাহাকে বলিয়াছেন "বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পরিগৃহিত।"

আনন্দের একটা ক্রম আছে। তাহা বুঝিতে বিশেষ প্রচেষ্টা করিতে হয় না। একদিন যে শিশু একটী লাড্ডুতে খুসি, সেই শিশুই যৌবন প্রাপ্ত হইয়া প্রথম বসন্তের মলয়স্পর্শে তদপেক্ষা সহস্রগুণ তৃপ্তি অনুভব করে; আবার আর একটু পরিণত বয়সে মলয়ের স্পর্শজনিত সুখানুভূতি অপেক্ষা বিশ্বরহস্য চিন্তার অনুধ্যান করিয়া কিম্বা পরার্থে আত্মবিসর্জন করিয়া আরও সুগভীর আনন্দে আপ্লুত হয়। এই যে ক্রমিকতা, ইহাকেই আনন্দের ক্রমবিকাশ বলিতেছি। এবং ইহাও স্থির যে প্রাথমিক আনন্দ অপেক্ষা শেষে তৃপ্তি অধিকতর সম্পূর্ণ, অধিকতর সুমিষ্ট।

লৌকিক আনন্দ অথবা সাহিত্যিক আনন্দ বিচারে অতৃপ্তির দিকটাও হিসাব করিয়া দেখিতে হয়। এতটুকু পাইলে এতখানি পাইবার ইচ্ছা হয়। না পাইলে ব্যর্থতাজনিত জ্বালা—প্রাপ্তির আনন্দকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেয়। লালসামূলক সুখ মাত্রই এইরূপ। তাহাতে তৃপ্তি যতটুকু অতৃপ্তি তদপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু উহা ছাড়াও অন্যবিধ আনন্দ রহিয়াছে, যাহাতে নৈরাশ্যজনিত জ্বালায় জ্বলিতে হয় না। অধিক কি ইহাতে নৈরাশ্যের অবকাশ মাত্র নাই।

আত্মোৎসর্গ মূলক আনন্দ সেই জাতীয়। সন্তানকে স্নেহ করিয়া জননীকে নৈরাশ্য-পীড়িতা হইতে হয় না। দাতা যিনি, তিনি দান করিয়াও ক্লিষ্ট হন না।

আনন্দের যাহা মহৎ প্রকাশ—যাহা চিত্তকে শান্ত করে, স্নিগ্ধ এবং উন্নত করে, তাহাই সাহিত্যের উপজীব্য। অসার আনন্দ সাহিত্যের বিষয়ীভূত নহে। বঙ্কিমচন্দ্রও কোথাও তেমন করেনও নাই। রোহিণীর লালসা ও ভ্রমরের প্রেম বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন:—এ স্নেহ নহে, এ ভোগঃ এ সুখ নহে—এ মন্দার ঘর্ষণ পীড়িত বাসুকি নিশ্বাস নির্গত হলাহল,—এ ধন্বন্তরিভাণ্ড-নিঃসৃত সুধা নহে।"

সৌন্দর্য্য স্বভাবানুকারী। বঙ্কিম এ কথাও বলিয়াছেন বটে! কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য-চিত্র কেবল মাত্র স্বভাবকেই অনুসরণ করিয়া চলে নাই। স্বভাবানুকারী অর্থে বাস্তব। যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি। ইহার নাম বস্তু-তান্ত্রিকতা। বাস্তবের প্রতিচ্ছবিও মনোমুগ্ধকর হয় বটে। কিন্তু তাহাতে বীভৎস রস সৃষ্টি হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা। এক শ্রেণীর সাহিত্যিক বাস্তবকে অনুকরণ করিতে গিয়া কদর্য্যতারও সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছেন। সাহিত্যে বাস্তবতা কতটু স্বীকার্য্য, কতটুকু পরিহর্ত্তব্য এখানে তাহার বিস্তৃত বিচার করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখিনা; বক্তব্য হইতেছে এই যে বাস্তবতা অপেক্ষা আদর্শের অনুসরণই অধিক। অথবা যাহাকে আদর্শ বলিতেছি তাহাই বাস্তব।

বঙ্কিম সাহিত্যে বাস্তবের অনুপম চিত্র দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা মানস চিত্র নহে। বারুণীর ঘাট আঁকিতে, নগেন্দ্র নাথের অন্তঃপুরের চিত্র অঙ্কিত করিতে বঙ্কিম যে কারুকুশলতা দেখাইয়াছেন, তাহা বাস্তবের নিখুঁত চিত্র অথবা বাস্তব অপেক্ষাও মনোহর। শিল্পের যথার্থ কুশলতা। মানস সৌন্দর্য্য চিত্র করিতে গিয়া বঙ্কিম সর্ব্বত্রই অসাধারণের অনুসরণ করিয়াছেন।

বাস্তবের একটা দিক সর্ব্বদাই আমাদের লক্ষ্যে পড়ে। আর এই সচরাচর দৃষ্ট বস্তুকেই বাস্তব বলিয়া থাকি। আর এই সচরাচরের অন্তরালে যে ত্যাগ-প্রবণ, সংযমী, স্নেহপ্রীতি উথলিত পরিশুদ্ধ মানব প্রকৃতি রহিয়াছে, তাহাকে দেখিতে চাহি না এবং দেখিতে পাইনা। পাই না বলিয়া তাহাকে অবাস্তব বলিয়া থাকি। প্রকৃত পক্ষে তথাকথিত বাস্তবের মত উহাও সত্য——একান্ত জাগ্রত বাস্তব। লাম্পট্যই মানবতার এক মাত্র সত্য-প্রকাশ নহে, শারীর আকর্ষণ বিহীন আত্মোৎসর্গ-মূলক অনুরাগই মনুষ্যত্বের অতি সাধারণ প্রকাশ। "চন্দ্র শেখর" উপন্যাসের অন্যতম নায়ক প্রতাপ নায়িকা এবং উপযাচিকা শৈবালিনীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়া একটা অসাধারণ কিছু করেন নাই। উপন্যাস পাঠকের চিত্তবৃত্তি সুস্থ মানবতার প্রতি নিবদ্ধ থাকিলে, ইহাকে অবাস্তব বা অসাধারণ বলিয়া বোধ হইবে না।

যাহা হউক, বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসে সাহিত্যের রস চিত্রগুলি সর্ব্বত্রই প্রায় পরিশুদ্ধ, পরিমার্জ্জিত। উহা এরণ্ডের মাঝে দ্রুম, দ্রুমেরমধ্যে অশ্বত্থবৃক্ষ।—উহাতে লতিকার কমনীয়তা নাই বটে, আছে বিরাটের মহিম্ন প্রকাশ, বঙ্কিম-সাহিত্যের রস সর্ব্বত্রই মহনীয়তায় অপূর্ব্বমান। রাজসিংহ উপন্যাসে সৌন্দর্য্যের ললামভূতা চঞ্চলকুমারী রাজসিংহের গলে বরমাল্য অর্পণ করিতে সমুৎসুকা, রাজসিংহ কিন্তু এই প্রণয়নিবেদনে বিহ্বল হইয়া পড়েন নাই। চঞ্চলকুমারীও সংযম সুস্থিরা, রাজসিংহও তাঁহার বয়োধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রীতির কুম্মাগারে ললনা কোথাও আত্মপ্রকাশ করিতে পায় নাই।

যে সৌন্দর্য্য এবং যে রসসাহিত্যের মধ্যবর্ত্তিতায় মানবচিত্ত আকর্ষণ করে, তাহা নিশ্চয়ই সাধারণ নহে। সাধারণ হইলে তাহার আর নিশ্চয়তা রহিল কোথায়? সাধারণতঃ যাহা দেখিতে পাই না, যাহার জন্ত চিত্ত মন আকুল, সাহিত্যিকের প্রজ্ঞা তাহারই দিব্য প্রকাশ প্রস্ফুটিত করিয়া দেয়। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই শৈবলিনীও রোহিণী, কিন্তু মানব অন্তঃকরণের নিভৃত আকাঙ্ক্ষা ভ্রমর এবং সূর্য্যমুখীকে দেখিতে। মানব মনের সেই গোপন বাসনাকে পরিব্যক্ত করিয়া ধরাই সাহিত্যিকের সাহিত্যিক ব্রত।

সাহিত্যে শিক্ষা যে চাই না এমন কথাও বলিতে পারি না। কতকগুলি বাধা ধরা নীতি নিয়ম না শিখিতে পারি, কিন্তু জীবনের উচ্চতম তত্ত্বগুলি, সৌন্দর্য্যের সু-উচ্চ বিকাশ গুলিও শিক্ষণীয় ব্যাপার। তাহাও শিক্ষার অঙ্গীভূত। একজন অকর্ষিত মন, একখানি উচ্চ শ্রেণীর কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় না। তাহা করিতে হইলে রসশাস্ত্রের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। যেমন তেমন কান লইয়া সঙ্গীতের রস গ্রহণ করা যায় না। তজ্জন্য একটি বিশেষ শ্রবণসামর্থ্যের আবশ্যক। রসেরও শিক্ষা আছে। সাধারণ প্রবৃত্তি, শিক্ষা, অভ্যাস এবং রসলিপ্সা লইয়া সে উচ্চতম রসানুভূতি সম্ভবপর হয় না, ইহা বুঝিবার জন্য কোনও যুক্তি তর্কের প্রয়োগ করিতে হয় না।

শিক্ষা কথাটা যখনই উচ্চারণ করি, তখন প্রচলিত শিক্ষার বিষয় আমাদের ধারণায় আসিয়া থাকে। কতকগুলি বিধি নিষেধ কিম্বা আক্ষরিক শিক্ষা। বস্তুতঃ শিক্ষা এমন সঙ্কীর্ণ নহে। মানবের জীবনের কতকগুলি অনুভূতি একান্ত অস্ফুট অবস্থায় থাকে, তাহাকেও প্রস্ফুট করিয়া তুলিতে হয়। সহজাত সংস্কাররূপে সকল ধারণা পরিস্ফুট হয় না। অনুশীলনের দ্বারা বিকশিত করিয়া তুলিতে হয়। সাধারণ জীবনের যে সংকীর্ণতায় আমরা সর্ব্বক্ষণ বসবাস করি, তাহাতে সামান্য জীবধর্ম্ম ছাড়া আর কতটুকুই আমরা জানি ও বুঝি। কতটুকুরই বা ধারণা করিতে পারি? পারি না। এই সব শিক্ষা করিতে হয়, অনুশীলন করিতে হয়।

সাহিত্যের ইহা একটি কর্ত্তব্য। কাজেই—শিক্ষা যে সাহিত্যের অঙ্গীভূত নহে, ইহা কেমন করিয়া বলিতে পারি। তবে সে শিক্ষার ভঙ্গীমাটা অন্যরূপ। তাহা, কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন, অস্ফুট ধারণার প্রস্ফুটন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "আনন্দমঠের" ঘটনা সংস্থানের উল্লেখ করিতে পারি। যে স্থলে ভবানন্দ মহেন্দ্রকে দেশমাতৃকার পরিচয় দিয়াছেন, সেই স্থানে যে কল্পনা, যে ভাবুকতা, যে আদর্শ প্রস্ফুরিত হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের বিশেষ পরিচয় ছিল না। এমনই অনেক কিছু। অনেক সুন্দর জিনিষ, অনেক মহৎ বস্তু আমাদের মনোবৃত্তির সহিত নিত্য পরিচিত নহে।

রচনা ভঙ্গিমাটাও সাহিত্যশিল্পের এক বিশেষ অভিব্যক্তি। প্রকাশ ভঙ্গিমায়, শব্দ মাধুর্য্যে অনেক—অতি সাধারণ বিষয় এক বিশেষরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এখানে কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব না। সাহিত্যের যে মানস সৌকুমার্য্য তাহাই আলোচ্য বিষয়। আর সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে, জীবন বৃন্তের যে উন্নত প্রকাশ, যে মহৎ ভাব, উন্নত আদর্শ, পুণ্যবস্তু পরিকল্পনা—ত্যাগ, স্নেহ, প্রীতি, ঔদার্য্য, ক্ষমা, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি সু-উচ্চ ভাব ও আশা আকাঙ্ক্ষা গুলি তাহাই সাহিত্যের পরম সম্পদ।

বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্যেও এই গুলি লইয়াই ঐশ্বর্য্যান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। উহা মনোবিশ্লেষণের জন্য মানব মনের যে জঘন্য পরিচয়, তাহাই প্রকট করেন নাই। স্থানে স্থানে কদর্যতার চিত্র অঙ্কিত হইলেও তাহা আসিয়াছে পরিপ্রেক্ষারূপে—উজ্জ্বলকে উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ করিতে এবং পাপের ভীষণতা পরিস্ফুট করিতে। 'বিষবৃক্ষের' দেবেন্দ্র অথবা হীরাকে দেখিয়া আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে লালসা ও বিলাস কি ঘৃণ্য, কি কুৎসিত, কতখানি অধোগামী। অপর পক্ষে প্রতাপের স্বার্থহীন নিষ্কলুষ প্রেম ও উদার আত্মত্যাগ দেখিয়া উপলব্ধি করিতে সক্ষম হই যে, মানবতা কি মহোচ্চ বস্তু, প্রেম প্রীতি কতখানি সমুচ্চ। লালসাই ভালবাসার সমুদয় বস্তু নহে। সৌন্দর্য্যের যথার্থ স্থান—মহিমায়। মনোবৃত্তির যে মহিম বিকাশ তাহাকে, প্রস্ফুট করিয়া তোলাই যথার্থ সাহিত্যকলা। আর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সাহিত্য তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য।

প্রশ্নোত্তরী

প্রঃ।—মহাবাক্য কি?

উঃ।—ঋগাদি চারিবেদে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব দ্যোতক যে সংক্ষিপ্ত ঋষিগণদৃষ্ট অসাধার অতুলনীয় বাক্য আছে তাহাই মহাবাক্য বলিয়া অভিহিত হয়।

১। ঋগ্বেদের মহাবাক্য "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" অর্থাৎ শুদ্ধ অন্তঃকরণে চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থায় অবাঙ্ মানস গোচর স্বয়ং প্রভ জ্ঞানের যে প্রকাশ হয় তাহাই ব্রহ্ম পদ বাচ্য।

২। সামবেদে "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ গুরু বলিতেছেন শিষ্যকে তৎ ত্বং অসি অর্থাৎ সেই ঈশ্বর যিনি সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কথিত হন তিনি ও তুমি—জীব অল্পশক্তি, অল্পজ্ঞ, বলিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান কর এই উভয়, তিনিও তুমি একই বস্তু হও অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরে মাত্র উপাধির ইতর বিশেষ, বস্তুতঃ একই বস্তু যেমন একজোড়াতে যে সাদা কাপড় থাকে তাহা একই কাপড় যদি অর্দ্ধকে কোন রঙে ছোপান যায় ও অপরখানি সাদা রাখা যায় বস্তুতঃ উভয় বস্ত্র একই বস্ত্র। রঙ্ বা উপাধির প্রভেদ মাত্র। তদ্বৎ জীব ও ঈশ্বর একই ব্রহ্ম। অবিদ্যা উপাধি, জীব মায়োপাধি, ঈশ্বর অবিদ্যা মায়াদি সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত হইলে নির্ম্মল তৎ পদবাচ্য ব্রহ্মই ব্রহ্ম। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ ঘটরূপ উপাধি দূর হইলে আকাশই আকাশ। তেমনি দেহরূপ ঘটে জীবাত্মা ও সর্ব্বত্র সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা; দেহঘট বিদূরিত হইলে পরমাত্মাই পরমাত্মা। যেমন রূপামিশান স্বর্ণ ও তামা মিশান স্বর্ণ। উভয় স্বর্ণে অবিশুদ্ধি আছে, অগ্নি সন্তাপে রৌপ্য ও তাম্র জ্বলিয়া গেলে উভয়েই বিশুদ্ধ স্বর্ণমাত্র। রৌপ্য যতই ভাল হউক উপাধি; এমনি মায়ায় শুদ্ধ সত্বে ঈশ্বর ও মলিন সত্বে জীব। উপাধিনাশে শিবত্ব তুল্য।

৩। যজুর্ব্বেদে "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমি যে চিদাত্মা সে ব্রহ্ম যে পরমাত্মা তাহাই ইহ। অর্থাৎ "আমি" দেহী দেহাদি বিলক্ষণ। দেহরূপ ঘটে আমিরূপ যে আত্মা তাহা ঘটাকাশবৎ মহাকাশ স্থানীয় পরমাত্মা বা ব্রহ্মই হই।

৪। অথর্ব্ববেদে—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" অর্থাৎ দেহঘটে এই যে ঘটাকাশবৎ আত্মা সে মহাকাশবৎ যে ব্রহ্ম তাহাই বটে।

প্রঃ :—মহাবাক্যের তাৎপর্য্য কি?

উঃ।—সর্ব্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত এই যে কেবল এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন তদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং তাহা সৎ অর্থাৎ চির অধিকারী দণ্ডাদিবৎ পরিণতিবিহীন বা নির্ব্বিকার ব্রণাদির ন্যায় কোন বিকার তাতে সম্ভবেনা। কিম্বা সমুদ্রের তরঙ্গবৎ চাঞ্চল্য ও ক্রিয়াবিহীন ব্রহ্মা নিষ্ক্রিয়। ক্রিয়াও বিকারই, বিশেষ চাঞ্চল্য রজোগুণাত্মক। ব্রহ্ম ত্রিগুণাতীত। ব্রহ্ম চিৎ বা চৈতন্যস্বরূপ তাহাতে মোহ বা জাড্য যাহা তমগুণের কার্য্য তাহার একান্তাভাব। সূর্য্য যেমন চির উদ্ভাসিত তেমনি আত্মা চির প্রকাশ। সত্বগুণের দ্বারা প্রকাশিত হন না যেমন সূর্য্য দর্শনার্থ লণ্ঠনের প্রয়োজন হয় না সূর্য্য স্বপ্রকাশ, নিজকেও অন্যকেও প্রকাশ করেন। সত্বের প্রকাশ গুণ চিদাভাস মাত্র। ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ বা সুখস্বরূপ; এই স্বরূপ জীবেরও স্বরূপ। মৃৎলিপ্তমণিবৎ অবিদ্যা আবরণে আবৃত জীব। মৃত্তিকা অপসারিত হইলে যেমন উজ্জ্বল নির্ম্মলমণি প্রকাশিত হয় তেমনি অবিদ্যা আবরণ অপসারিত করিলে শুদ্ধ অপাপ বিদ্ধ আত্মা প্রকাশিত হন অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপকে প্রাপ্ত হন। যেমন পাথুরে কয়লা ও অত্যুজ্জ্বল হীরক একই কার্ব্বন নামক পদার্থ, উত্তাপ ও চাপের আধিক্যে হীরক তৎ স্বল্পতায় কয়লা; তেমনি স্বল্পজ্ঞ জীবও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। [উত্তাপ ও চাপের দ্বারা ফরাসী রাসায়ণবিদ্‌গণ কয়লাকে হীরকে পরিণত করিয়াছেন] মনের মলিন সত্তায় জীব ও শুদ্ধ সত্তায় ঈশ্বর। এই জীব ব্রহ্মের ঐক্যতা প্রদর্শনই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য। এবং সর্ব্ব বেদান্ত শাস্ত্রের ককমাত্র লক্ষ্য। নদী সকল যতক্ষণ সমুদ্রে পতিত না হয় ততক্ষণ তাদের বিভিন্ন নাম ও রূপ গুণাদি থাকে। সমুদ্রে মিলিত হইলে আর তাহাদের কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। গঙ্গাদি নাম ও তটাদি বিশিষ্ট তরলাদি রূপ জলের মিষ্টতাদি ও তরল রূপ গুণাদিও অন্তগিত হয়। তেমনি জীব যতক্ষণ ব্রহ্মে মিলিত না হয় ততক্ষণ পৃথক্ পৃথক নাম রূপ গুণাদি থাকে, যখন ব্রহ্মে মিলিত হয় তখন নাম রূপাদি উপাধি বিলোপে ব্রহ্মই হইয়া পড়েন। পৃথক্ সংজ্ঞা থাকে না। এই মহাবাক্যের সত্যতা যুক্তিমূলে ও শ্রুতি প্রমাণে ও গুরু বাক্যের দ্বারা দৃঢ় করিতে হয়। উহা সঙ্কেত বাক্য, স্মরণ রাখা সহজ ও অর্থ ও সত্যতা হৃদ্বোধ হইলে বহু শাস্ত্র আলোচনা ও বহু গবেষণার হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়।

—স্বামী মহাদেবানন্দ।

কবীরের দোঁহা

মায়া

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কবীর য়া সংসার কী, ঝঠী মায়া মোহ।
জেহি ঘর জেতা বধাবনা, তেহি ঘর তেতা দ্রোহ ॥ ১৬ ॥

কবীর বলে এ সংসারের, মায়া মোহ সবই বৃথা।
যার বাড়ীতে যত আমোদ, তত হিংসা বিবাদ তথা ॥ ১৬ ॥

ভূলে থেয়হঁ আই কে, মায়া সংগ লুভায়।
সতগুরু রাহ বতাইয়া, ফেরি মিলুঁ তেহি জায় ॥ ১৭ ॥

মায়ার সনে প্রলোভনে, ছিলাম ভুলে এসে হেথা।
সৎগুরু পথ ব'লে দেছেন, আবার মিলন হ'বে তথা ॥ ১৭ ॥

সেই পাপন কী মূল হৈ, এক রুপৈয়া রোক।
সাধূ হৈবে সংগ্রহ করৈ, হারৈ হরি সা থোক ॥ ১৮ ॥

একটী মাত্র টাকার পুঁজী, শত পাপের মূল কারণ।
সাধু হ'য়ে ক'রলে জমা, হারায় হরির মত ধন ॥ ১৮ ॥

মায়া হৈ দুই ভাঁতি কী, দেখী ঠোঁক বজায়।
এক মিলাবৈ নাম সে, এক নরক লৈ যায় ॥ ১৯ ॥

দু'রকমের মায়া আছে, দেখেনিও বাজিয়ে ঠুক।
একটী মিলায় নামের সনে, অন্য নে' যায় নিরয় দিকে ॥ ১৯ ॥

য়া মায়া হৈ চূহড়ী, ঔ চূহড়ে কী জোয়।
বাপ পূত অরুঝায় কে, সংগ ন কেহু কে হোয় ॥ ২০ ॥

এই মায়া চণ্ডালিনী, ধর্ম্মপত্নী চণ্ডালের।
বাপ ছেলে দৈয় ফাঁদে ফেলে, হয় না সাথী একজনের ॥ ২০ ॥

মায়া কে সব বস পরে, ব্রহ্মা বিস্নু মহেস।
নারদ সারদ সনক অরু, গৌরী-পুত্র গণেস ॥ ২১ ॥

সবাই প'ড়ে মায়ার ফাঁদে, ব্রহ্মা বিষ্ণু উমাপতি।
নারদ সারদ সনক মুনি, গৌরী-সুত গণপতি ॥ ২১ ॥

—শিবপ্রসাদ।

ভ্রান্তি-বিনোদন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাজবৈদ্য—শ্রীযুক্ত শক্তিচরণ রায় বিশারদ

৩য় অধ্যায়—শাস্ত্রই একমাত্র সত্য।

১৪। **সত্য কি?**—১। যাহা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই **তিনকালেই এক রকম** থাকে, যাহা **সকল অবস্থাতেই এক,** যাহা সনাতন, যাহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই অর্থাৎ যাহা কমে বাড়ে না, তাহাকেই **সত্য** বলে। (৩৫) **কলিকালের** সত্য অন্যরূপ। একালে যাহা কেবলই বদলায় তাহাই সত্য ও **যাহা বদলায় না তাহাই মিথ্যা, কেননা পুরাতন।** আজ এককথা বলিলাম, কাল আর এক কথা, পরশু আবার অন্য কথা, তথাপি কথা একই রহিল কেবল **উন্নতি** হইল মাত্র। ইহা কলিকালেই সম্ভব। সত্যের একটুও মর্য্যাদা থাকিলে সম্ভব হইতে পারিত না।

২। **সত্যের মর্য্যাদা শাস্ত্রই দিতে জানেন।** আর কেহই জানে না। শাস্ত্র বলেন ব্রাহ্মণ ভুল কথা বলিবেন না। কেননা ভুল কথা বলিলেই ম্লেচ্ছ হয়। **ভুলই ম্লেচ্ছ** (৩৬)। **একটী শব্দ** সম্যক জানিয়া ঠিক ব্যবহার করিলে ইহকালে ও স্বর্গে **বাঞ্ছা পূর্ণ** হয় (৩৭)।

১৫। **অনুভব ভিন্ন জ্ঞান হয় না**—১। আমাদের শাস্ত্রে বলে অনুভব ভিন্ন জ্ঞান হয় না। অর্থাৎ যতই বিচার কর না কেন অনুভব না করিলে প্রকৃত জ্ঞান হইতেই পারে না। যে জিনিষ অনুভব করা যায় সেই জিনিষেরই প্রকৃত জ্ঞান হয় (৩৮)। না খাইলে খাওয়ার সুখ বুঝা যায় না। গাড়ী না চড়িলে গাড়ী চড়ার আনন্দ পাওয়া যায় না। সেইরূপ কষ্ট অনুভব না করিলে কষ্টের জ্ঞান হয় না, সুখ অনুভব না করিলে সেই সুখের জ্ঞান হয় না ইত্যাদি।

তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, যে মূঢ় (অজ্ঞান) যে ভগবান্‌কে অনুভব না করিয়াই বৃথা আনন্দ করিতে থাকে, তাহার আনন্দ কি রকম? পুকুরের পাড়ে আম গাছ থাকিলে তাহার ছায়া

---

(৩৫) সমানং ত্রিষু কালেষু সর্ব্বাবস্থাসু শাশ্বতম্‌। সনাতনং মতং সত্যং চীয়তে নাপচীয়তে। (৩৬) তস্মাদ্‌ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ। ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ। (৩৭) একঃ শব্দঃ সম্যগ্‌ জ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্‌ ভবতি। (৩৮) অনুভূতিঃ প্রমা প্রাণোঽপ্রমানুভূতি-বর্জ্জিতঃ। (প্রমা—যথার্থজ্ঞানং। অপ্রমা—অযথার্থজ্ঞানং)।

পুকুরের জলের উপর পড়ে। **সেই জলের ভিতর** যে **আম** দেখা যায় তাহা **খাইয়া** যে রকম **আনন্দ** হইতে পারে অনুভব না করিলে মিথ্যা আনন্দই হয় (৩৯)। অনুভবের দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, যিনি এই জগতের স্বরূপ (তত্ত্ব) অনুভব করিয়া জানিয়াছেন অর্থাৎ **যিনি শ্রীভগবান্‌কে অনুভব করিয়াছেন তাঁহার কৃপাদৃষ্টি মাত্রেই পশু পক্ষী কীটও মুক্তিলাভ করে।** জীব মনুষ্যদেহেই তরিতে পারে। পশুপক্ষী কীট-দেহে তরিতে পারে না) ৪০।

৩। **প্ল্যাঙ্ক** (Planck) **এডিংটন** (Eddington) প্রভৃতিও **স্বীকার করেন যে অনুভব ভিন্ন বিচারের উপর আসলে নির্ভর করা যায় না।** (e)। শাস্ত্র বলেন বিচারে বিশ্বাস করিবে না। খাটাইয়া দেখিবে (৪১)। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শাস্ত্রে বিশ্বাস করিবে বিচারে নহে।

১৬। **কার্য্য কারণ সম্বন্ধ ও বিচার** ১। কারণ হইতে কার্য্য হয় ও কার্য্য হইতে বস্তুর সৃষ্টি হয়। যেমন তুলা হইতে সুতা ও সূতা হইতে কাপড় হয়। এই তিনটী **দেখিতে ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু প্রকৃতই এক।** কেননা এ জগতে ভেদ নাই সকলই ভগবানের মূর্ত্তি। যদি কারণ কার্য্য ও বস্তু প্রকৃতই ভিন্নই হইবে তবে একটী হইতে আর একটী হইবে কেমন করিয়া? যাহাতে যাহা নাই তাহা হইতে সেটী কেমন করিয়া হইতে পারে? যেমন **রূপা তামা কি লৌহ দিয়া সোণার হার কেমন করিয়া হইতে পারে?** কিংবা সোণা দিয়া কি করিয়া কাঠের পুতুল করা যায়? সোণার হার বলিলেই সোণা দিয়া তৈয়ারী, কাঠের পুতুল বলিলেই কাঠ দিয়া গড়া বুঝিতেই হইবে। এই জন্য শাস্ত্র বলেন কার্য্য কারণ ও বস্তু এক। যেমন তুলা সুতা ও কাপড়। বিকল্প (ভেদ) নাই। ইহাকেই **ভাবাদ্বৈত** বলে (৪২)। কারণ হইতে কার্য্য কখনই ভিন্ন হয় না (৪৩) **যাহা কারণে নাই তাহা কার্য্যে নাই। যাহা কার্য্যে আছে তাহা কারণেই আছে।**

২। এই জন্যই বেদান্ত বলেন **প্রমাণের বিষয় প্রমাণেরই অন্তর্গত** অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহা প্রমাণেই আছে (৪৪)। যাহা প্রমাণের ভিতর নাই সেই জিনিষে সেই প্রমাণ পাওয়া যাইতেই পারে না। যেমন সকল মানুষই মরে; রাম মানুষ। অতএব রাম

---

(৩৯) অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে। প্রতিবিম্বিত-শাখাগ্র-ফলাস্বাদন-মোদবৎ। মৈত্রেয়। (৪০) যস্তানুভবপর্য্যন্তা বুদ্ধিস্তত্ত্বে প্রবর্ত্ততে। তদ্দৃষ্টি-গোচরাঃ সর্ব্বে মুচ্যন্তে সর্ব্বপাতকৈঃ। খেচরা ভূচরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্-দৃষ্টি-গোচরাঃ। সদ্য এব বিমুচ্যন্তে কোটি-জন্মার্জ্জিতৈরঘৈঃ। ত্রিপাদ।

(e) The most perfect world view would be no better than a bubble ready to busrt at the first puff of wind if on living contact with the world of sense is lost"—Planck "Universe in the Light of Modern Physics."

(৪১) প্রয়োগ-নিকষেণৈব শশ্বৎ কার্য্যং পরীক্ষণম্। (নিকষ—কষ্টি পাথর। শশ্বৎ—সর্ব্বদা)।

(৪২) কার্য্যকারণবস্ত্বৈক্য-দর্শনং পটতন্তুবৎ।

অবস্তুত্বাৎ বিকল্পস্য ভাবাদ্বৈতং তদুচ্যতে। ভা ৭।১৫।৬৩

(৪৩) কার্য্যং বৈ কারণাদ্ভিন্নং নোৎপন্নং হি কদাচন। দেবী ভা°

(৪৪) মানানাং স্ববিষয়াবভাসকত্বং আত্মসাপেক্ষম্।

মরিবে। এখানে রাম মরিবে এইটাই প্রমাণের বিষয়। সকল মানুষই মরে ও রাম মানুষ এইটী প্রমাণ। রাম মরিবে এই প্রমাণের বিষয়টী সকল মানুষই মরে এই প্রমাণের ভিতরই আছে অর্থাৎ যখন সকল মানুষই মরে বলা হইল তখন রাম মরে ধরিয়াই লওয়া হইল। রাম যদি পরশুরাম কি মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় অমর হইত তাহা হইলে রাম মানুষ হইয়াও মরিত না। কাযেই দেখা যাইতেছে প্রমাণ বা বিচার মাত্রই **আত্মসাপেক্ষ** বা **আত্মাশ্রয়দোষ-দুষ্ট** বা **অন্যোন্যাশ্রয়ী** বা **ইতরেতরাশ্রয়বান্** (Petitio Principii) অর্থাৎ ধরিয়া লইয়াই বিচার বা প্রমাণ করা হয়, **না ধরিয়া বিচার বা প্রমাণ করা যায় না।**

৩। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ লইয়া বিজ্ঞান বিষম মুস্কিলে পড়িয়াছে। বিজ্ঞান বরাবর জানিত **কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য অর্থাৎ একই কারণ হইতে একই কার্য্য হয়** ও হইতেই হইবে, অন্য কার্য্য হইবারই জো নাই। এই নিত্যতার উপর নির্ভর করিয়া মনের সুখে বিজ্ঞান ভগবান্‌কে উড়াইয়া দিল। যখন একই কার্য্যের একই ফল হইবে তবে ভগবান্ থাকিলেই বা কি, না থাকিলেই বা কি? তিনি ত আর কার্য্যের ফল উল্‌টাইতে পারিবেন না। **কাযেই ভগবানের দয়া ভক্তি প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা কথা।**

৪। আজ ২০।২৫ বৎসর মাত্র হইল বিজ্ঞান দেখিতে পাইতেছে **কার্য্য কারণ সম্বন্ধ অনিত্য** অর্থাৎ **একই কারণে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হয়।** এক-চক্ষু হরিণের ন্যায় বিজ্ঞান একটাই দেখিতে পায়, তাহার দুইটা দেখিতে নাই। কাযেই তাহাকে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য ইহা ছাড়িতে হইতেছে। অথচ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ ইহা ছাড়িলে বিজ্ঞানই থাকে না। **বিষম সমস্যা। দিশেহারা হইয়া বৈজ্ঞানিকগণ দুইদল হইয়াছেন।** একদল বলেন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য। আর একদল বলেন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ অনিত্য।

৫। **শাস্ত্র বলেন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য ও মায়াবশে অনিত্য** অর্থাৎ এক কারণ হইতে একই কার্য্য হয়, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য হয় না। কিন্তু কখনও কখনও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যও হইয়া থাকে। **ঈশ্বরের সাধারণ ইচ্ছাতেই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ নিত্য ও তাঁহার বিশেষ ইচ্ছাতেই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ উল্‌টাইয়া যায়।** তাঁহারই সাধারণ ইচ্ছায় **পবনদেব** হাওয়া দেন, **সূর্য্য** উত্তাপ দেন, **ইন্দ্র** বৃষ্টি দেন, **অগ্নি** দাহ করেন ও **যম** দণ্ড দেন (৪৫)। **কিন্তু** তাঁহারই ইচ্ছা হইলে পবন হাওয়া দিতে পারেন না, সূর্য্য উত্তাপ দিতে পারেন না ইন্দ্র বৃষ্টি দিতে পারেন না, অগ্নি পোড়াইতে পারেন না ও যম দণ্ড দিতে পারেন না। এই জন্যই **নৌকা জলে ডুবিলে** সাঁতার জানা লোক ডুবিয়া যায় ও সাঁতার না জানা লোকেও বাঁচিয়া যায়। এই জন্যই **পাহাড়ে আগুন** লাগিলে ২০।২৫ মাইল পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় তথাপি মধ্যে মধ্যে দু'একটা গাছ পুড়ে না। এই জন্যই **বৃষ্টিতে সর্ব্বত্র** ভাসিয়া যাইলেও এক্‌টুখানি জায়গায় বৃষ্টি হয়না।

৬। ভগবানের ইচ্ছায় বিষও অমৃতের ন্যায় হয় ও অমৃতও বিষের ন্যায় হয়। **বিষত্ব ও অমৃতত্ব বিষ বা অমৃতের গুণ নহে,** ভগবানের ইচ্ছায় হইয়া থাকে; ভগবানের ইচ্ছায়

(৪৫) মদ্‌ভয়াদ্ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ। বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি-র্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ।
ভা° ৩।২৫। ৪২

বিষ বিষ ও বিষই অমৃত। সেইরূপ ভগবানের ইচ্ছায় অমৃত অমৃত ও অমৃতই বিষ। সমস্ত জগৎ ভগবানের বশে। তাঁহার **ইচ্ছাতেই বস্তুর গুণ হয়** (৪৬)।

১৭। **নিঃসন্দেহ প্রমাণ কি?**—১। প্রমাণ চারিপ্রকার (১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান (৩) যুক্তি ও (৪) আপ্তোপদেশ বা আপ্তবাক্য। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটিতে **মোটামুটি কাজ** হয়, নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। কেবল আপ্তবাক্যই নিঃসন্দেহ প্রমাণ (৪৭)। **না ধরিয়া যে, মনুষ্য প্রমাণ বা বিচার করিতেই পারে না** তাহা এইমাত্র দেখান হইল। অতএব মনুষ্যের প্রমাণ বা বিচার নিঃসন্দেহ হইবে একথাই উঠিতে পারে না।

২। **যাঁহার কোনও জিনিষে আসক্তি নাই,** যিনি মনের দাস নহেন মনই যাঁহার দাস, যিনি ইচ্ছার বশে নহেন ইচ্ছাই যাহার বশে তিনিই সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া সত্য ধরিতে পারেন। সেই জন্য তাঁহার অজ্ঞান থাকে না, তাঁহার ভুল হয় না ও তিনি সকল জিনিষই ঠিক ঠিক দেখিতে পান। এই পুরুষকেই **আপ্তপুরুষ** বলে যিনি আসক্তি শূন্য, সত্যই যাঁহার প্রাণের প্রাণ সেই সত্যসর্ব্বস্ব, অজ্ঞানবর্জ্জিত ত্রিকালদর্শী ভ্রমপ্রমাদ-বর্জ্জিত পুরুষকেই আপ্তপুরুষ বলে (৪৮)। এককথায় **সত্যপুরুষই আপ্তপুরুষ**। এই সত্যপুরুষের কথা যে সত্য হইবে তাহা কি আর কাহাকেও বলিতে হয়?

৩। এই জন্যই শাস্ত্র বলেন—যে সব জিনিষ ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ যে সব জিনিষ চোখে দেখা যায় না, কানে শুনা যায় না, এককথায় যে সব জিনিস মানুষ জানিতেই পারে না সেই সব **ইন্দ্রিয়ের অগোচর জিনিষ যিনি** দিব্য চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পান অর্থাৎ **ভগবৎ কৃপায় দেখিতে পান তাঁহার কথা বিচার করিয়া উল্‌টান যায় না**(৪৯) যে সকল বিষয় মন ধারণা করিতে অক্ষম সেই সব বিষয়ে বিচার করিতে নাই। আপ্তপুরুষের কথা আশ্রয় করিয়া বিচার না করিলে কখনও কি সন্দেহ-সমুদ্র পার হওয়া যায়? (৫০)। অর্থাৎ সামান্য মনুষ্য **সূক্ষ্মবস্তু সম্বন্ধে কখনও বিচার করিবে না।** কেন না সে বিষয় তাহার বুঝিবার জো নাই। সে বিষয়ে দিব্যচক্ষুঃ আপ্তপুরুষের কথাই একমাত্র প্রমাণ।

১৮। **প্রত্যক্ষের ভুল।** শাস্ত্র বলেন চোখের দেখাতেও সন্দেহ থাকে। প্রত্যক্ষ প্রমাণও নিঃসন্দেহ নহে ও আপ্তবাক্যের কাছে চোখের দেখা কিছুই নহে। চোখের দেখা যে কিছুই নহে, চোখ যে কেবল মিথ্যা দেখে তাহার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

১। পৃথিবী সমতল দেখায় কিন্তু ভাঁটার ন্যায় গোল।

২। চাঁদ থালার মত দেখায় কিন্তু ভাঁটার ন্যায় গোল।

৩। রেল মোটার প্রভৃতি চড়িলে গাছ প্রভৃতি দৌড়াইতেছে মনে হয় ও কাছের সার গাড়ীর উল্টা দিকে ও দূরের সার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে দেখায়।

---

(৪৬) বিষায়তেঽমৃতং কুত্র বিষং চাপ্যমৃতায়তে। বিষবং অমৃতত্বং চ জায়তে হীশ্বরেচ্ছয়া। ঈশ্বরস্য বশে সর্ব্বং চরাচরমিদং জগৎ। কটাক্ষেণ বিভোস্তস্য স্বরূপেণাধিতিষ্ঠতি।

(৪৭) আপ্তোপদেশঃ প্রত্যক্ষং অনুমানং চ যুক্তিকম্। চতুর্বিধা পরীক্ষা স্যাৎ আপ্তবাক্যমসংশয়ম্।

(৪৮) আপ্তঃ সত্যঃ ঋষিপ্রোক্তঃ দিব্যজ্ঞান-সুসংযুতঃ। রাগদ্বেষাদিভির্মুক্তো ভ্রমাদিদোষ-বিচ্যুতঃ।

(৪৯) অতীন্দ্রিয়ানসংবেদ্যান্ ভাবান্ যে দিব্যচক্ষুষা। পশ্যন্তি বচনং তেষাং নানুমানেন বাধ্যতে।

(৫০) অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। অপ্রতিষ্ঠিত-তর্কেণ কস্তীর্ণঃ সংশয়াম্বুধিম্।

৪। রেলের লাইন দুইটী যতদূর দেখ ততই মিশিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

৫। পাহাড় অনেক দূরে থাকিলেও খুব কাছে মনে হয়।

৬। পাখা কিংবা চাকা বেশী ঘুরিলে দেখা যায় না।

৭। কাঠের ভিতর ছিদ্র দেখা যায় না। ছিদ্র না থাকিলে পেরেক ঢুকিত না।

৮। অন্ধকারে দড়িকে সাপ মনে হয়।

৯। ভূত দেখা।

১০। দাম গজাইয়া পুকুর ঢাকিয়া গেলে জল কি ডাঙ্গা বুঝা যায় না।

১১। আরসিতে মুখ দেখা।

১২। লাল চশমা পরিলে সাদা লাল দেখায় ও সবুজ কাল দেখায়।

১৩। লাঠি আধখানা জলের ভিতর ডুবাইলে ভাঙ্গা বোধ হয়।

১৪। পরিষ্কার জলের ভিতর টাকা পড়িলে টাকা যেখানে থাকে, তাহার চেয়ে উঁচুতে দেখায়।

১৫। দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ যন্ত্র (Telescope and Microscope) দ্বারা যত জিনিষ দেখা যায় শুধু চোখে সে সকল গুলিই দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৬। আলোক একটী বস্তু নহে। অসংখ্য বস্তুর সমষ্টি।

১৭। আলোক সাদা নহে। লাল হল্‌দে সবুজ প্রভৃতি মিলিয়া সাদা দেখায়।

১৮। বিজ্ঞান বলে চোখে উল্টাইয়া দেখায়।

১৯। আলো কম হইলেও দেখা যায় না বেশী হইলেও দেখা যায় না।

২০। সেইরূপ শব্দ কম হইলেও শুনা যায় না, বেশী হইলেও শুনা যায় না।

২১। উদরের চেহারা X'Ray দিয়া উল্টাইয়া গিয়াছে (পঃ ১২।১ দেখ)।

২২। নাড়ীভূঁড়ির গতি X'Ray দিয়া উল্টাইয়া গিয়াছে। (পঃ ১২।২ দেখ)।

১৯। **স্থূল সূক্ষ্ম**—১। বস্তু দুই প্রকার, স্থূল ও সূক্ষ্ম। যে বস্তু ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, যে বস্তু **ইন্দ্রিয়গোচর** অর্থাৎ যাহা দেখিতে পাওয়া যায় কি শুনিতে পাওয়া যায় কিম্বা অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুঝা যায় তাহাকে স্থূল বস্তু বলে। আর যাহা **অতীন্দ্রিয়**, যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, যাহা **ইন্দ্রিয়ের** অগোচর যাহা দেখিতেও পাওয়া যায় না, শুনিতেও পাওয়া যায় না কিংবা অন্য রকমে বুঝা যায় না তাহাকে **সূক্ষ্ম** বস্তু বলে। **চোখ মুখ নাক কাণ ইত্যাদি স্থূল, আর প্রাণ মন আত্মা ইত্যাদি সূক্ষ্ম।** এই জীবনে যে কর্ম্ম করা যায় তাহা স্থূল আর **প্রারব্ধ অদৃষ্ট সূক্ষ্ম।** **পদার্থ** স্থূল আর পদার্থের ভিতর ছিদ্র সূক্ষ্ম। **আলো** সাদা ইহা স্থূল আর আলো সাদা নহে উহা লাল হল্‌দে সবুজ নীল প্রভৃতি মিলাইয়া সাদা হইয়াছে ইহা সূক্ষ্ম।

২। লোকে মনে করে জগতে স্থূল বস্তুই আছে, সূক্ষ্ম বস্তু নাই কিংবা যদি থাকে ত অল্প। কিন্তু ইহার ঠিক বিপরীতই সত্য। অতি অল্প জিনিসই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায়। **অধিকাংশ জিনিষই ইন্দ্রিয়ের অগোচর** অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বুঝা যায় না। **আলোকের** খুব অল্প হইলে দেখা যায় না, বেশী আলো হইলেও দেখা যায় না। সেই রকম **শব্দ** আস্তে হইলেও

শুনা যায় না ? জোরে হইলেও শুনা যায় না কেবল মধ্যখানে একটু শুনা যায় মাত্র। দূরের জিনিস **দেখিতে পাওয়া যায় না।** দূরবীক্ষণ যন্ত্র [Telescope] দ্বারা কত অসংখ্য তারাই দেখা যায়, চোখে সেগুলি দেখা যায় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্র [Microscope] দ্বারা কত অসংখ্য জীবাণুই দেখিতে পাওয়া যায়, চোখ তাহাদের সন্ধানই পায় না ইত্যাদি। তাই শাস্ত্র বলেন প্রত্যক্ষ [অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু] অতি অল্প ও অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ [অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তু] অনেক। এমন কি যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা দেখি সেই **ইন্দ্রিয়ও পরোক্ষ** (দেখা যায় না)। এই পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ বিষয় জানিতে হইলে শাস্ত্র প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা জানিতে হয়। (৫১)

৩। প্রকৃত প্রস্তাবে **স্থূল ও সূক্ষ্ম এই ভেদ মায়ার খেলা ও মিথ্যা। কাজেই যে পরিমাণে মায়া কাটে সেই পরিমাণেই সূক্ষ্ম বস্তু স্থূল হইয়া পড়ে।** অর্থাৎ যাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। সংসার রক্ষার জন্য মায়া কতকগুলি জিনিস দেখিতে দেয় ও কতকগুলি দেখিতে দেয় না ! যেগুলি মায়া দেখিতে দেয় সে গুলিকেই সাধারণতঃ স্থূল বলে, আর যে গুলি দেখিতে দেয় না সে গুলিকেই সচরাচর সূক্ষ্ম বলে। শাস্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিবার উপায় বলা আছে। সেই উপায়ে **সিদ্ধিলাভ** করিতে পারিল **সূক্ষ্ম বিষয় স্থূল**হইয়া পড়ে। **শ্রীভগবানের কৃপা** লাভ করিতে পারিলে ত **আর কথাই নাই। এই জন্যই আপ্তপুরুষের কাছে সবই স্থূল ও তাঁহার কথা অভ্রান্ত।** শাস্ত্র বলেন শ্রীভগবানের লীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে যে পরিমাণে মায়া কাটে সেই পরিমাণেই মনুষ্য সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায় অর্থাৎ তাঁহার কাছে সেই পরিমাণেই সূক্ষ্ম বস্তু স্থূল হইয়া পড়ে (৫২]। মেঘ দূর হইলেই যেমন সূর্য্য দেখা যায় সেইরূপ অহঙ্কার দূর হইলেই মানুষের দৃষ্টি খুলিয়া যায় ও সূক্ষ্ম বস্তু স্থূল হয় [৫৩]। অন্ধ যেমন সূর্য্য দেখিতে পায় না সেইরূপ অহঙ্কারী ভাগ্যহীন মনুষ্য সম্মুখে জাজ্বল্যমান গুরুকেও দেখিতে পায় না [৫৪]।

৪। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদ যে নাই তাহা স্থূল দৃষ্টিতেও দেখা যায়। যাহার চোখের জ্যোতি খুব বেশী সে যতদূর দেখিতে পায় সাধারণ মনুষ্য ততদূর পায় না। শকুনি এই উভয়ের চেয়ে বেশী দূরে দেখিতে পায়। কাজেই যাহা **সাধারণ মানুষের কাছে সূক্ষ্ম** তাহা তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃসম্পন্ন মনুষ্য ও **শকুনি** উভয়ের **কাছেই স্থূল।** পেচা, বিড়াল ও বাঘ রাত্রিতে দেখিতে পায়, মানুষ পায় না। কোনও জন্তু মনুষ্য অপেক্ষা অনেক দূর হইতে শুনিতে পায় ও গন্ধ পায়। কাজেই **মনুষ্যের** পক্ষে যাহা **সূক্ষ্ম** বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর **পেঁচা প্রভৃতি** জন্তুর পক্ষে তাহা **স্থূল।** অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের শক্তির উপরে স্থূল সূক্ষ্ম নির্ভর করে।

---

(৫১) প্রত্যক্ষং স্বল্পমেব স্যাৎ অপ্রত্যক্ষমনল্পকম্। ইন্দ্রিয়াণি পরোক্ষাণিলভেরন্নাগমাদিভিঃ। চরক

(৫২) যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ। তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সংপ্রযুক্তম্॥ ভাঃ ১১।১৪।২৬

(৫৩) ঘনো যদার্কপ্রভবো বিদীর্য্যতে চক্ষুঃস্বরূপং রবিমীক্ষতে তদা। যদা হ্যহঙ্কার উপাধিরাত্মনো জিজ্ঞাসয়া নশ্যতি তর্হ্যনুস্মরেৎ॥ ভাঃ ১২।৪।৩২

(৫৪) শ্রীগুরুং পরতত্ত্বাখ্যং ভাস্বন্তং চক্ষুরগ্রতঃ। ভাগ্যহীনা ন পশ্যন্তি অন্ধাঃ সূর্য্যমিবোদিতম॥ ব্রহ্মাণ্ড ৪।৪৩।৯

২০। **সূক্ষ্মের প্রাধান্য**—১। স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার বস্তুর মধ্যে **সূক্ষ্মবস্তুই অধিক ও সূক্ষ্ম বস্তুই প্রধান।** চোখ মুখ নাক কাণ প্রভৃতির চেয়ে **প্রাণই** যে বড় তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। আজ ৩০ বৎসরের ভিতর বিজ্ঞানকে মানিতে হইয়াছে সূক্ষ্ম বস্তুই আসল। প্ল্যাঙ্ক বলেন বিজ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ততই স্থূল জগৎ হইতে সরিয়া পড়িতেছে ও সূক্ষ্ম জগতের দিকে যাইতেছে অর্থাৎ ক্রমশঃ ক্রমশঃ **বিজ্ঞান দেখিতেছে যে স্থূল বস্তু মিথ্যা ও সূক্ষ্ম বস্তুই সত্য। অতএব প্রারব্ধ** বা অদৃষ্টই প্রধান আর দৃষ্ট কর্ম্ম অর্থাৎ এই জীবনের কর্ম্ম তাহার কাছে কিছুই নহে।

২। রিসে (Richet) স্বীকার করিয়াছেন **সূক্ষ্ম বস্তু কেহই বুঝিতে পারে না।** কেবল কোন কোন মনুষ্যই বুঝিতে পারে স্থূল বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ দেখা যায় আর সূক্ষ্ম বস্তু দেখা যায় না। কাযেই স্থূল বস্তু বুঝা অপেক্ষা সূক্ষ্ম বস্তু বুঝা যে লক্ষ লক্ষ গুণ কঠিন তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হয় না অথচ আজকাল যে **মার্কামারা হতবুদ্ধি** সেও সূক্ষ্ম বিষয়ে মাথা নাড়া দিতেই ব্যস্ত, কিন্তু স্থূল বিষয়ে ভোঁ-দৌড়। ইহাই কালের মহিমা।

৩। মার্কামারা বলিতে পারে তাহাদের আর দোষ কি? **তাহাদের সূক্ষ্মবুদ্ধি আছে স্থূলবুদ্ধি নাই।** কাযেই তাহারা সূক্ষ্ম কথাই বুঝিতে পারে স্থূল কথা পারে না। তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহার **সামান্য টাকা** আছে তাহার অনেক টাকা নাই ইহা ত হইতেই পারে। সূক্ষ্মবুদ্ধি দিয়া কি স্থূল বিষয় কখনও বুঝা যায়? যে **চালনীর** দ্বারা সূক্ষ্ম বস্তু চালা যায় সেই চালনীর দ্বারা কি স্থূল বস্তু চালা যাইতে পারে? সরু মিহিন জিনিষ সরু গর্ত্তের ভিতর দিয়া যায়। মোটা জিনিষ সেই সব গর্ত্তের ভিতর দিয়া কি করিয়া যাইবে? (৫৫) মিহিন চালনীর দ্বারা মোটা জিনিষ চালা যায় না। সেইরূপ **সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা স্থূল বিষয় বুঝা যায় না।**

২১। **জ্যোতিষ Astrology)**—১। নব বিজ্ঞান ও নব্যনববিজ্ঞান উভয়েই স্বীকার করে যে, **বস্তুর নাশ নাই, বস্তুর মূর্ত্তি বদলায় মাত্র।** ইহাদের চেতন বস্তুর সম্বন্ধ রাখিতে নাই। কাযেই মানুষের কর্ম্মফল সম্বন্ধে নববিজ্ঞানে ও নব্যনববিজ্ঞানে কোনও কথাই নাই। তবে অচেতন বস্তু সম্বন্ধে যখন সর্ব্বত্রই নাশ নাই তখন মানুষের কর্ম্মফল যে আপনা আপনি নাশ হইবে ইহা কখনই সম্ভবে না। আরও **সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, কর্ম্মফলের নাশ নাই। রাম যদি শ্যামকে মারে** আর শ্যামও রামকে মারে তাহা হইলে শোধ বোধ হইয়া যায় বটে কিন্তু উভয়েরই আঘাত লাগে। সেটী শোধ যায় না। সেইরূপ একজন অপরের কাছে **ধার লইয়া** ধার শোধ দিলে ঋণ থাকে না কিন্তু দেওয়া লওয়টা থাকে। একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে যে এই রকম কোন কর্ম্মেরই নাশ নাই। প্রত্যেক কর্ম্মেরই ফল আছে। তাই শাস্ত্র বলেন **কর্ম্ম ভোগেই ক্ষয় হয়, ভোগ ভিন্ন কর্ম্ম কখনই নষ্ট হয় না** (৫৬)।

২। **কর্ম্মফল তিন রকম** ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। কোনও কোনও কার্য্যের ফল হাতে হাতে মিলে। অনেক কার্য্যের তখন তখন মিলে না, বিলম্বে মিলে। অধিকাংশ কর্ম্মের ফল কিন্তু

(৫৫) সূক্ষ্মাবগাহিনী বুদ্ধিঃ কথং স্থূলে প্রবর্ত্ততে।

(৫৬) নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম জন্মান্তরশতৈরপি। মন্তক্ত্যা তদ্ বহুস্বল্পং বপবীতমভক্তুতঃ॥ আদি°

ফলিতেই দেখা যায় না। **কর্ম্ম যখন নিষ্ফল হইবার জো নাই তখন যে কর্ম্মের ফল ফলিতে দেখা গেল না, তাহা তোলা রহিল।** পরে ফলিবে ইহা ভিন্ন আর কিছু হইবার উপায় নাই। অতএব এক জন্মেই মানুষ ফুরাইয়া যায় না। **জন্মান্তর আছে** মানিতেই হইবে। শাস্ত্র বলেন জন্মকোটিশতৈরপি (কোটি কোটি জন্ম)।

৩। জীবনের অধিকাংশ কর্ম্মের ফল সেই জীবনে মিলে না। সেই সেই কর্ম্ম তোলা থাকে ও তাহাদের **সঞ্চিত** কর্ম্ম বলে। সঞ্চিত কর্ম্ম সকল এক জীবনে ভোগ করা যায় না। কাযেই সঞ্চিত কর্ম্মরাশি হইতে সামান্য অংশমাত্র ভোগ করিবার জন্য জীব জন্মগ্রহণ করে। **সঞ্চিত কর্ম্মের এই অংশকে প্রারব্ধ বলে।** এই প্রারব্ধের নাম ভাগ্য, দৈব, কাল, অদৃষ্ট, স্বভাব ও প্রকৃতি।

৪। সঞ্চিত কর্ম্মের যে অংশ ভোগ করিবার জন্য জীব জন্মগ্রহণ করে সেই কর্ম্মকে **প্রারব্ধ** কর্ম্ম বলে। যাহা ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাকে **প্রারব্ধ** বলে (৫৭)। যাহা সঞ্চিত হইতে ভোগ করিবার জন্য ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাকে ভাগ্য বলে (৫৮)। যাহা ভোগ করিবার জন্য দেবতারা ভাগ করিয়া দিয়াছেন তাহাকে **দৈব** বলে, (৫৯) যাহা কাল বশে ফল দেয় তাহাকে **কাল** বলে (৬০)। যে কর্ম্ম দেখা যায় না, যাহা পূর্ব্ব জন্মেই হইয়া গিয়াছে তাহাকে **অদৃষ্ট** বলে (৬১)। যাহার উপর জীবের স্বভাব নির্ভর করে তাহাকে **স্বভাব** বা **প্রকৃতি** বলে।

৫। এই **প্রারব্ধ বা অদৃষ্ট সূক্ষ্ম।** সূক্ষ্ম স্থূল হইতে লক্ষ লক্ষ গুণ প্রধান বলিয়া অদৃষ্ট বা **প্রারব্ধ দৃষ্ট কর্ম্ম হইতে লক্ষ গুণ সবল।** অর্থাৎ প্রারব্ধ কোনওরূপে কাটান যায় না। **কাযেই স্বভাব বদলায় না ও নীচ নীচই থাকিয়া যায়।** কি করিয়া প্রারব্ধ কাটান যায় কি করিয়া স্বভাব পরিবর্ত্তন করা যায়, কি করিয়া জাতির ফল কাটে তাহা পরে বলা যাইবে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন এই **প্রারব্ধ কর্ম্মবশেই** মানুষের **জন্ম** ও **মৃত্যু** হয়। এই প্রারব্ধ কর্ম্মবশেই মানুষের **সুখ দুঃখ বিপদ আপদ** ও কল্যাণ হইয়া থাকে (৬২)। মানুষ অদৃষ্ট বশেই জন্মায় ও মৃত্যু লাভ করে। যাহাতে প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ ভাল করিয়া হয় জন্মাইবার সময় সময় সেইরূপ বাপ ও মা খুঁজিয়া মানুষ বলবান্ প্রারব্ধবশেই জন্ম গ্রহণ করে (৬৩)।

৬। **মানুষই** প্রারব্ধ বশে **পশু পক্ষী কীট বৃক্ষ প্রস্তর** প্রভৃতি হইয়া **অশীতি লক্ষ যোনিতে** ভ্রমণ করে। এই অশীতি লক্ষ যোনির ভিতর **মনুষ্যযোনিই কর্ম্মযোনি** ও বাকি সকল যোনিই **ভোগযোনি** মাত্র। অর্থাৎ পশু পক্ষী প্রভৃতি কেবল প্রারব্ধ ভোগ করিবার

(৫৭) প্র+আ+রভ্+ক্ত=প্রারব্ধ=যাহা বিশেষ করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। (৫৮) ভজ্+ণ্যৎ=ভাগ।

(৫৯) দেব+ষ্ণঃ=দৈব, দেবসম্বন্ধীয়।

(৬০) কাল=সময়। (৬১) ন+দৃষ্ট=অদৃষ্ট।

(৬২) কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব বিলীয়তে। সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে। ভা ১০।২৪।২৬।

(৬৩) লব্ধা নিমিত্তমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত। যথাযোনি যথাবীজং স্বভাবেন বলীয়সা। ভা-৬।১

(অব্যক্ত নিমিত্ত=অদৃষ্ট কারণ। ব্যক্ত=জন্ম। অব্যক্ত মৃত্যু।)

জন্যই জন্মায়। তাহারা নূতন কর্ম্ম করিতে পারে না, তরিতেও পারে না। তাহাদের সেই দেহের সঙ্গে সঙ্গে সেই দেহের প্রারব্ধ ক্ষয় হয় এই মাত্র। তাহারা মুক্তিলাভ করিবার জন্য জন্মায় না। মনুষ্য মুক্তিলাভ করিবার জন্যই জন্মায়, ভোগের জন্য নহে। অশীতি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন জীবের মুক্তির সময় আসে তখনই জীব মনুষ্যদেহ পায়। মনুষ্যদেহ মুক্তিদেহ ও অন্যান্য সকল দেহই ভোগদেহ। প্রারব্ধ ভোগ করিতে করিতে নূতন কর্ম্ম করিয়া জীব মুক্তি পাইতে পারিবে এইজন্যই জীব মনুষ্যদেহ পায়। অতএব মুক্তিদেহই কর্ম্মদেহ।

শাস্ত্রে বিশ্বাস ও যুক্তি

(লেখক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন শর্ম্মা)

"ভারতের সাধনার গত আশ্বিন সংখ্যায় "শাস্ত্র বলিতে কি বুঝায়" নামক শীর্ষে শ্রীযুক্ত স্মরজিৎ দত্ত এম এ, বি টি, মহাশয় রাজবৈদ্য শ্রীযুক্ত শক্তি চরণ রায় বিশারদ লিখিত "হিন্দু ধর্ম্ম ও তাহার নাশের জন্য নাস্তিকগণের চেষ্টা" নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ বিষয়ে রাজবৈদ্য মহাশয়ের কি বলিবার আছে জানি না, তথাপি আমি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াই ইহার উত্তর দিতে অগ্রসর হইলাম। এরূপ প্রবৃত্তির কারণ এই যে, যিনি শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার কিঞ্চিৎ ধারও ধারেন, শাস্ত্রের পক্ষ সমর্থন করিবার অধিকার তাঁহার অবশ্যই আছে, ইহা আমার ধারণা। প্রতিবাদক দত্ত মহাশয় তত্ত্বানুসন্ধানের বশবর্ত্তী হইয়াই প্রতিবাদ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেজন্য বৃথা তর্ক না বাড়াইয়া সরল ভাবেই উত্তর দেওয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য এই সকল বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা কি, তাহা আমরা কেহই অবগত নহি। তবে তিনি শাস্ত্রকে যে ভাবে দেখিয়াছেন তাহা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা শাস্ত্রকে যে ভাবে দেখা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি এবং সেই ভাবে দেখিলে কিরূপ মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়, তাহাই নিম্নে যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।

দত্তমহাশয় মনে করিয়াছেন যে, শাস্ত্রে অবিচারিত বিশ্বাস করিতে গেলে বুঝি যুক্তি বিচারের স্থান নাই। ইহা তাঁহার বুঝিবার ভ্রম মাত্র। এই ভ্রম হেতু তিনি নানাবিধ অনাবশ্যক তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। যুক্তি দুই প্রকার—(১) শাস্ত্রানুকূল ও (২) শাস্ত্র বহির্ভূত। শাস্ত্রবাক্যের মর্ম্ম বুঝিবার জন্য যে যুক্তি বিচার প্রয়োগ করা হয়,তাহাই শাস্ত্রানুকুল যুক্তি। এই যুক্তি সম্পূর্ণ শাস্ত্রানুমোদিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সত্য জ্ঞান লাভের পরম সহায়ক বলিয়া এই যুক্তিই অবলম্বনীয়। পক্ষান্তরে যে যুক্তি শাস্ত্রবাক্যে সন্দেহ করিয়া তাহার সঙ্গতি অসঙ্গতি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হয় সেই স্বাধীন যুক্তিকেই শাস্ত্র বহির্ভূত যুক্তি বলা হয়। ইহা শাস্ত্রের অননুমোদিত এবং

যথার্থ জ্ঞান ও কল্যাণ লাভের ঘোর পরিপন্থী বলিয়া সাতিশয় দোষাবহ। এ কারণ এই প্রকার যুক্তি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। শ্রী ভগবান্ কহিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধি মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ (১৬ ২৩)
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥" (১৬—২৪)

এই বাক্যের মর্ম্মার্থ এই যে, শাস্ত্রবিধি কোন মতেই ত্যাগ করিবে না, কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থার প্রমাণ স্বরূপ শাস্ত্রই অবলম্বন করিবে এবং শাস্ত্রবিধান জানিয়াই কর্ম্ম করিতে হইবে—নিজের স্বাধীন বুদ্ধি অনুসারে নহে। অতএব শাস্ত্র বাক্যে যে কখন ভ্রম হইতে পারে না এবং তাহাতে সন্দেহ করা পাপজনক ভগবদ্বাক্যে ইহা স্পষ্টই সূচিত হইয়াছে। এইরূপ বিশ্বাসকেই অবিচারিত বিশ্বাস বলে। কিন্তু শাস্ত্রবাক্য জানিতে হইলে অনেক স্থলেই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কেননা শাস্ত্রে বহু প্রকারের এবং আপাত বিরোধী বিধান সমূহ দৃষ্ট হয়; সেস্থলে কোন্ বিধান কাহার পক্ষে এবং কোন্ অবস্থায় উপযোগী তাহা যুক্তি দ্বারাই স্থির করিতে হয়। ইহাতে ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে, কিন্তু সে দোষ অপরিহার্য্য। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্র দেখিয়া ঔষধ নির্দ্ধারণ করিতে গেলে অনেক সময়ে প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করা যায় না কিন্তু তাহা বলিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রে কেহ অবিশ্বাস করে না ঔষধ নির্ব্বাচনে নিজের অক্ষমতা বিবেচনা করিয়াই ক্ষান্ত হয়, সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত বিরুদ্ধ বাক্য সমূহের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে না পারিলেও তাহাতে অবিশ্বাসের কারণ নাই। এতদ্ভিন্ন, শাস্ত্র যেমন বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন, সেইরূপ যুক্তিরও অশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠে আছে—

"যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণমিব ত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥"

উক্ত বাক্যের মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্মার বাক্য হইলেও তাহা যুক্তি সহ বিচার পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে; কেননা যুক্তি ভিন্ন প্রকৃত অর্থবোধ না হইয়া বিপরীত অর্থের প্রতীতি হয়। যে শাস্ত্র এই কথা বলিতেছেন, সেই শাস্ত্রবাক্য যে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এবং যুক্তিরই পক্ষপাতী তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বৃহস্পতিও কহিয়াছেন—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্য বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

অতএব শাস্ত্রোক্ত কোন একটি বাক্য অবলম্বন করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করা অসঙ্গত এবং অপরাপর বচনের সহিত মিলাইয়া যুক্তি পূর্ব্বক শাস্ত্রবাক্যের অর্থসাধন করিতে হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য। নতুবা বৃহস্পতি যখন স্বয়ং ঋষি ছিলেন, তখন বেদ ও ঋষিবাক্যকে ভ্রান্তিসঙ্কুল বলা এবং তাহার উপর ভ্রান্ত মানবের স্বাধীন যুক্তির প্রাধান্য দেওয়া যে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না তাহা সহজেই অনুমিত হয়। বস্তুতঃ শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া চলিতে হইলে শাস্ত্র বাক্যকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস এবং তাহার অর্থ বা অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য যুক্তিবিচার এই উভয়েরই প্রয়োজন। যেমন এক চক্র রথ গমন করিতে পারে না, সেইরূপ বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে কোন একটী ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের

অনুসরণ করা চলে না। যাহা হউক, শাস্ত্র বুঝিতে যখন যুক্তির প্রয়োজন, অথবা শাস্ত্রবাক্য ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত সে বিষয়ে কিছুমাত্র বিচারের অবকাশ নাই, তখন যুক্তিমাত্রকেই শাস্ত্রে অবিচারিত বিশ্বাসের বিরোধী বলা যাইতে পারে না। তথাপি উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটান অজ্ঞানতা অহঙ্কার অথবা অতিসন্ধিমূলক ভিন্ন আর কি বলিব? মনে করুণ এক সময়ে কোন ব্যক্তির অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সদগুণ রাশির প্রশংসা করা হইতেছে, সেই সময়ে তাঁহার সম্বন্ধে যদি কেহ বলে 'কিন্তু তাঁহার বর্ণ বড় কাল' তাহা হইলে এই বাক্যে যেমন ঐ গুণবান্ ব্যক্তির প্রশংসা খর্ব্ব করিবার বৃথা চেষ্টা প্রকাশ পায়, সেইরূপ 'শাস্ত্রবাক্য অভ্রান্ত, তাহাতে অবিচারিত বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত' এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রকে বহু দোষযুক্ত বলিয়া খ্যাপন করা শাস্ত্র মহিমার অপলাপ করিবার চেষ্টা মাত্র। প্রক্ষিপ্তের কথা পৃথক ভাবে উত্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রে অবিচারিত বিশ্বাসের প্রতিবাদ স্বরূপে নহে। অতএব এরূপ করিলে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতারই পরিচয় দেওয়া হয়। 'পিতৃ আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়' এই কথায় যদি কেহ পিতার দোষ দেখাইয়া প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হয় তবে তাহার পিতার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ পায় না কি?

দত্ত মহাশয় যে শাস্ত্রবাক্য সমূহের মধ্যে বিরোধ দেখিয়াছেন তাহা আপাত দৃষ্টিতে বিরোধরূপে প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাতে বিরোধ নাই। মহাভারতে লিখিত আছে :—

"বেদা ভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ নাসৌ মুনি র্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥

এই বচনে ইহা লক্ষ্য করা উদ্দেশ্য নয় যে বেদ স্মৃতি ও মুনিগণের মতসমূহ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভ্রান্ত—সুতরাং উপেক্ষণীয় এবং কেবল মহাজনের বাক্যই অবলম্বনীয়। ইহার মর্ম্ম এই যে, ঐ সকল বিরোধের মীমাংসা করা সাধারণের কর্ম্ম নহে। যাহারা মহাজন অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানী ও সাধু তাঁহারা হৃদয়গুহায় প্রবেশ করিয়া [হৃদি অয়ম্ = হৃদয়ম্ অর্থাৎ আত্মা; আত্মাতেই সকল তত্ত্ব বা জ্ঞান নিহিত আছে, এজন্য আত্মস্থ হইয়া] সকল বিরোধের সমন্বয় করিয়াছেন দেখিয়াছেন, এই হেতু তাঁহাদের উপদেশ মত কার্য্য করিলেই যথার্থ শাস্ত্রানুসারে কার্য্য করা হয় এবং বস্তুতঃ তাহাই প্রকৃত ও একমাত্র পন্থা। শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝা যে সর্ব্বসাধারণের কর্ম্ম নহে তাহা আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত এবং এ বিষয়ে বিচারের ভার উপযুক্ত ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হওয়া বিধেয়—যেমন চিকিৎসা পুস্তক দেখিয়া চিকিৎসা করা অপেক্ষা সুচিকিৎসকের হস্তে ভার অর্পণ করা কর্ত্তব্য। তবে জ্ঞানী অভাবে আমরা নিজে বুঝিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হই সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ শ্রদ্ধার প্রয়োজন। বিরোধের সমন্বয় বিষয়ে নিম্নে কয়েকটি উদাহারণ দেওয়া যাইতেছে। মনে করুণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এক স্থানে লিখিত আছে—'দুগ্ধ বলকারক' এবং অন্যত্র লিখিত আছে—'দুগ্ধ বলহানিকর'। এই দুই বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও উভয়ই শাস্ত্রবাক্য বলিয়া অভ্রান্ত, প্রথমে আমাদিগকে এইরূপ অবিচারিত বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, তৎপরে যুক্তি দ্বারা এই বাক্যদ্বয়ের সমন্বয় করিতে হইবে। দুগ্ধ সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে বলকারক এবং উদরাময় রোগীর পক্ষে বলহানিকর এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই সমন্বয় এবং ইহাই যুক্তির কার্য্য। তৎপরিবর্ত্তে একটি গ্রহণ করিয়া অপরটিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যুক্তির কার্য্য নহে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ত স্থানে স্থানে বিরোধ দৃষ্ট হয় [যেমন একস্থানে "সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ" বলিয়া অন্যত্র উক্ত

হইয়াছে "যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ"] তাহা বলিয়া কি ভগবদ্বাক্যকে সন্দেহ করিতে এবং কোন একটি বাক্যকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে? না, কোন্ বাক্য কি অর্থে প্রযুক্ত, যুক্তি দ্বারা তাহাই স্থির করিতে হইবে মাত্র? শেষোক্ত বাক্যই যে কর্ত্তব্য তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। অর্জ্জুন যখন স্বয়ং ভগবানের মুখে শুনিয়াও ভগবদ্বাক্যের সমন্বয় করিতে পারেন নাই [যথা "ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্॥"] তখন সাধারণ মানব যে বিরোধ দেখিবে তাহাতে কথা কি? আরও মনে করুন, কেহ বলিলেন 'স্ত্রী পুরুষের অধীন' এবং আবার কেহ বলিলেন—'পুরুষ স্ত্রীর অধীন'। স্ত্রী যে পুরুষের অধীন তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ও সর্ব্ববাদি সম্মত এবং পুরুষও যে স্ত্রীর অধীন তাহা নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই অল্প বিস্তর উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অতএব এই দুই প্রকার বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে উভয়ই সত্য। শাস্ত্রে কোথাও গুরুকে, কোথাও পিতাকে এবং কোথাও বা মাতাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। মোক্ষ লাভ সম্বন্ধে গুরুকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে, কুল ধর্ম্ম রক্ষা সম্বন্ধে পিতাকে এবং লালন পালন বা স্নেহ যত্ন বিষয়ে মাতাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রথমে যিনি মঙ্গলের ভার বহন করেন সেই মাতাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করাই স্বাভাবিক কার্য্য এবং কৃতজ্ঞতার সমধিক পরিচায়ক। কিন্তু জ্ঞান লাভই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া জ্ঞানের মার্য্যাদা দিবার জন্য মাতা অপেক্ষা শিক্ষাদাতা পিতাকে এবং জ্ঞানদাতা গুরুকে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ বলা হয়। মতভেদ স্থলে এইরূপে সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিলে বোধ হয় শাস্ত্র সম্বন্ধীয় অনেক বিরোধের মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া কথায় কথায় শাস্ত্রবাক্যকে ভ্রান্ত বা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করা মূঢ় বা বিক্ষিপ্ত চিত্তেরই পরিচায়ক এবং নাস্তিকতার লক্ষণ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব না মানিলেও প্রকৃত পক্ষে নাস্তিক হয় না, কিন্তু শাস্ত্র না মানিলেই নাস্তিক পদবাচ্য হইতে হয়। বেদ স্মৃতি পুরাণ এবং ইতিহাস (রামায়ণ মহাভারতাদি) এই সকলই শাস্ত্র অর্থাৎ অপৌরুষেয় বাক্য এবং যাবতীয় ঋষিবাক্য বা আপ্তবাক্য মাত্রই শাস্ত্র নামে অভিহিত। যিনি শাস্ত্র মানিয়া চলেন বা শাস্ত্রবিহিত আচার পালন করেন, তিনি ঈশ্বর না মানিলেও ঈশ্বরকে সহজে জানিতে পারেন, কিন্তু যিনি শাস্ত্র মানেন না অথবা শাস্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই যাহার প্রকৃতি তিনি ঈশ্বর মানিলেও ঈশ্বরদ্বেষী বলিয়া বিবেচ্য।

"ভারতগ্রন্থ চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক হইতে লক্ষাধিক শ্লোকে পরিণত" হইলেও উহাকে প্রক্ষিপ্ত ভাবিয়া অগ্রাহ্য করিবার প্রয়োজন নাই, কেননা পূর্ব্বগ্রথিত শ্লোক সমূহ হইতে এই শ্লোক গুলির মূল্য বড় কম নয়, ইহা একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। পরবর্ত্তী কালে প্রবিষ্ট শ্লোকগুলি যদি মূল শ্লোকগুলির তুল্য মূল্যই হয়, তবে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অপবাদ দেওয়ায় শাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন ভিন্ন আর লাভ কি আছে? এরূপ হইতে পারে যে পূর্ব্বে ঋষিরা স্ব স্ব নাম জাহির করিবার জন্য সহসা পৃথক গ্রন্থ রচনা না করিয়া অনেক সময়ে তাঁহাদের আবিষ্কৃত তত্ত্ব সমূহ এবং প্রয়োজনীয় উপদেশাদি কোন মূল গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিতেন এবং এইরূপেই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়িত। কিন্তু ইহাতে ক্ষতির আশঙ্কা কিছুই নাই, কেননা তাঁহারা সকলেই তত্ত্বদর্শী ছিলেন এবং তাঁহাদের বাক্যও অভ্রান্ত ছিল। অতএব এ বিষয়ে বৃথা সংশয় ও তর্ক উত্থাপন করা সুবিবেচনার কার্য্য নহে।

প্রবন্ধ লেখকের "বেদ ও পুরাণাদি শ্রীভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে এবং প্রতীবাদকারীর "চিন্ময় পুরুষ বেদরূপা জ্ঞানরাশি ব্রহ্মার হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ ও বিস্তার করিয়াছিলেন" এই দুই প্রকার বাক্য পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। বেদ ও পুরাণাদি ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মার হৃদয়কে আশ্রয় করিয়াছিল এবং পরে সেই হৃদয় হইতে উহার প্রকাশ ও বিস্তার হইয়াছে, এইরূপ বুঝিয়া লইলে আর বিরোধের আশঙ্কা থাকে না। এইরূপে ঋষি মুখনিঃসৃত বাক্য সমূহকেও ভগবন্মুখনিঃসৃত বলিয়া বুঝিয়া লওয়া অসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ শাস্ত্র মাত্রই ভগবানের মুখনিঃসৃত, কেবল ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী দিয়া আসিয়াছে এই মাত্র প্রভেদ। আবার ঐ সকল ভগবানের মুখনিঃসৃত না বলিয়া কর্ম্ম হইতে নিঃসৃত বলিলে অথবা দুই স্থলে দুই প্রকার বাক্য কথিত হইলেও বিশেষ কিছু আসিয়া যাইত না; কারণ সমস্ত ভগবান হইতেই নিঃশ্বসিত বা নির্গত হইয়াছে, এইটুকু লক্ষ্য করিয়া দেওয়াই উভয়ের তাৎপর্য্য। ভগবানের যখন কোন ইন্দ্রিয় নাই, অথচ তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া থাকেন ["অপাণিপাদো জবনো গ্রহিতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ"] অথবা যখন তাঁহার সমস্তটাই মুখ, সমস্তটাই কর্ণ, সমস্তটাই চক্ষু, সমস্তটাই হস্ত ও সমস্তটাই পদ ["সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি"], তখন তাঁহার মুখ ও কর্ণের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই—আমরাই তাহাতে ভেদ কল্পনা করি মাত্র। বাস্তবিক এই সকল তুচ্ছ বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করা অর্থাৎ আবরণ বা খোসা লইয়া টানাটানি করা বিজ্ঞোচিত কার্য্য নহে, তৎপরিবর্ত্তে সারভাগ (যদ্দ্বারা আমরা লাভবান্ হইতে পারি তাহা) গ্রহণ করিবার চেষ্টা করাই আমাদের ন্যায় সঙ্গত কার্য্য। শাস্ত্রই বলিয়াছেন—

"অনন্ত শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা দোহমম্বুমিশ্রম্॥"

এই অনন্ত শাস্ত্রের সকল কথাই যে সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে এমন নয়, প্রয়োজনানুসরে বাছিয়া লইতে হইবে মাত্র।

"শাস্ত্র শাসন করে, আজ্ঞা দেয়—বুঝায় না" এই বাক্যের প্রতিবাদে লিখিত হইয়াছে—"শাস্ত্র কেবল আদেশ দেয় না উপদেশও দিয়া থাকে এবং উপদেশেরও মধ্যে বুঝাইবার চেষ্টা আছে। এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে শাস্ত্রের আদেশ এবং উপদেশ বস্তুতঃ একই। শাস্ত্রের উপদেশ মৃদু আদেশ মাত্র। আর শাস্ত্র যেখানে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেখানে বুঝান উদ্দেশ্য নয়—প্রবৃত্তি দেওয়াই উদ্দেশ্য। 'এই কর্ম্ম করিবে' 'এই কর্ম্ম করিবে না' ইহাই আদেশ। আর 'এই কর্ম্ম করিলে স্বর্গে অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ হইবে, অতএব ইহকালে বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও ইহা করা কর্ত্তব্য' এবং 'এই কর্ম্ম করিলে নরকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, অতএব কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও উহা করা উচিত নহে' এইগুলি উপদেশ। এই যে উপদেশ এবং বুঝাইবার চেষ্টা, তদ্দ্বারা বাস্তবিক কি আমরা কিছু বুঝিলাম? কিছুই নহে। এখানেও বিশ্বাস না করিলে বুঝিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ এই উপদেশ কেবল বিধি ও নিষেধের ব্যাখ্যা বা বলিবার ভঙ্গিমা মাত্র। শাস্ত্র যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা বাস্তবিক লৌকিক বুদ্ধিগম্য নহে; সেই জন্যই বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। যাঁহারা ভগবৎ পরায়ণ সুতরাং ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই শাস্ত্রোক্ত আদেশ এবং

উপদেশের যথার্থ্য এবং মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন, কিন্তু বুঝাইতে পারেন না। শাস্ত্রোক্ত কোন্ কার্য্য কোন্ অবস্থায় কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য কেবল তাহাই যুক্তি বিচার দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার যে অলৌকিক ফল শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা বা তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করা লৌকিক যুক্তি বিচার গম্য নহে—তাহা কেবল অনুষ্ঠান সাপেক্ষ। যে ব্যক্তি কখন আম্র ভক্ষণ করে নাই সে যেমন যুক্তিবিচার দ্বারা আম্রের গুণ উপলব্ধি করিতে পারে না, সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মের ফলাফল যথার্থ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যুক্তিবিচারের কর্ম নহে—উহা শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধ পালনরূপ আচারানুষ্ঠান দ্বারাই সাধ্য। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে আচারের অশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং আচারকেই জ্ঞানলাভের সর্ব্বপ্রধান বা একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অতএব যাহা যুক্তিবিচার দ্বারা কোন মতেই উপলব্ধি হইতে পারে না এবং যাহা বুঝিতে গেলে যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াই বুঝিতে হয় শাস্ত্র তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন কেন? আরও যদি বলা যায় 'অমুক বনে কেবল দস্যুরাই আছে' তাহা হইলে যেমন সেই বনে পশু পক্ষী প্রভৃতি কিছুই নাই, অথবা দস্যুদিগের অধীনস্থ লোকজন, গৃহদ্রব্যাদিও নাই—এইরূপ বুঝিতে হয় না। তৎপরিবর্ত্তে যাহা প্রধান বক্তব্য, কেবল তাহাই মাত্র বলা হইয়াছে—ইহাই বুঝিতে হয়, সেইরূপ "শাস্ত্র আজ্ঞা দেয়—বুঝায় না' এ কথা বলিলে আজ্ঞা দেওয়াই যে শাস্ত্রের প্রাণ এবং একমাত্র উদ্দেশ্য—বুঝান (যদি মানিয়া লওয়া যায়) উদ্দেশ্যই নয়, কাজেই তাহা নির্দ্দেশের অযোগ্য, উক্ত বাক্যের এইরূপ অর্থই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অতএব উক্ত বাক্য দ্বারা শাস্ত্রের যথার্থ স্বরূপ ব্যক্ত হওয়ায় উহার প্রয়োগ সম্পূর্ণ সাধুসম্মতই হইয়াছে।

দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—"ঋক, সাম ও যজুঃ এই ত্রয়ের সমাহারই বেদ বলিয়া পরিচিত। অথর্ব্ব নামক বেদ পরে সংযুক্ত হইয়াছে।" তাঁহার এই কথাটি বিশিষ্ট ভ্রমেরই পরিচায়ক। বেদ প্রথমে এক মাত্র ছিল। প্রমাণ যথা—

"এক এব পুরা বেদ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নামা একোঽগ্নির্ব্বর্ণ এব চ।
পুরূরবম এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ॥" (শ্রীমদ্ভাগবত)

ভগবন্মুখনিঃসৃত বেদ সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মাই প্রাপ্ত হন। সেই সমগ্র বেদের নাম 'অথর্ব্ব' ছিল। সায়নাচার্য্যকৃত অথর্ব্ববেদের অনুক্রমণিকায় লিখিত আছে—

"অথর্ব্বাখ্যেন ব্রহ্মণা দৃষ্টত্বাৎ তন্নাম্না অয়ং বেদো ব্যপদিশ্যতে"

'অথর্ব্ব নামক ব্রহ্মা এই বেদের দ্রষ্টা বলিয়া তাঁহার নামানুসারে উহার নামকরণ অর্থাৎ বেদের নাম অথর্ব্ববেদ হইয়াছে।' আবার ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম 'অথর্ব্বন্' বা 'অথর্ব্বা' ছিল। ইনি ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ৯০ সূক্তে 'ভিষক্ অথর্ব্বন্ ঋষি' নামে পরিচিত। মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বাকে সর্ব্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠাস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা (অর্থাৎ সমগ্র বেদবিদ্যা) বলিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ তপস্যা দ্বারা যে সকল মূল সত্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেন, সে সমস্তই এই অথর্ব্ববেদ মধ্যে গ্রথিত হইত। এইরূপে বেদের কলেবর বর্দ্ধিত হইলে, পুরূরবার রাজ্যকালে সাধারণতঃ গদ্য পদ্য ও গান অনুসারে উহা তিন ভাগে বিভক্ত হয় এবং ঋক্

(পদ্য) সাম (গান) ও যজুঃ (গদ্য) নাম ধারণ করে। এই কারণেই বেদের নাম 'ত্রয়ী' হয়। সুতরাং 'ত্রয়ী' বলিলে গদ্য পদ্য ও গান এই তিনের সমষ্টিস্বরূপ মূল অথর্ববেদই লক্ষিত হইয়া থাকে। এই অথর্ববেদ ত্রিধা বিভক্ত হইলে বর্ত্তমান অথর্ববেদের অংশগুলি (যাহা সংক্ষিপ্ত আকারে বিদ্যমান ছিল তাহা) এই তিন বেদের মধ্যেই অনুস্যূত ছিল; যেমন ঋগ্বেদের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ, সামবেদের মধ্যে গান্ধর্ব্ববেদ এবং যজুর্ব্বেদের মধ্যে ধনুর্ব্বেদ নিহিত ছিল। তৎপরে দ্বাপরে বেদের আয়তন বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ব্যাসদেব পুনরায় সমগ্র বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন এবং বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করতঃ ঋক, সাম ও যজু নাম দিয়া অবশিষ্ট অংশগুলিকে অথর্ববেদ আখ্যাই প্রদান করেন। এই সময় হইতে যজ্ঞপ্রাধান্যে ঋক সাম ও যজুঃ এই তিন বেদকেই 'ত্রয়ী' বা 'বেদ' নাম দিয়া অথর্ববেদকে তাহার বহির্ভূত বলিয়া গণনা করা হয়। এই কারণেই যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় যজ্ঞপ্রধান বেদ হইতে অথর্ব্বের পৃথক্ উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তজ্জন্য অথর্ববেদকে বেদ নয় বলা অথবা উপবেদ বা নিকৃষ্ট বেদ বলিয়া মনে করা অতিশয় ভ্রান্তিমূলক। যজ্ঞের কর্ম্ম চতুর্ব্বিধ; যথা—হোতৃ, উদ্‌গাতৃ, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্ম। ঋগাদি বেদত্রয়ে প্রথমোক্ত তিন কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। চতুর্থ যে ব্রহ্মকর্ম্ম তাহা অথর্ববেদ সাপেক্ষ। অথর্ববেদোক্ত ব্রহ্মকর্ম্ম ব্যতীত ত্রয়ী বেদ বিহিত যজ্ঞকর্ম্ম অসম্পূর্ণ বা উহাদের অঙ্গহানি হয়। এজন্য অথর্ববেদকে বাদ দিলে উক্ত তিন বেদই অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। এই হেতুই ঋক, সাম ও যজুঃ হইতে অনন্যসাধারণ এই অথর্ববেদকে সম্পূর্ণ পৃথক করা চলে না এবং সাধারণতঃ 'ত্রয়ী' বলিলে অথর্ববেদকেও তন্মধ্যে গ্রহণ করিতে হয়; নতুবা 'ত্রয়ী' শব্দটি 'বেদ' বাচক না হইয়া বেদাংশের জ্ঞাপক মাত্র হয়। পক্ষান্তরে এই অথর্ববেদই সর্ব্ববেদ শ্রেষ্ঠ। ঋক, সাম ও যজুঃ যথাক্রমে পিতৃলোক, দেবলোক এবং মনুষ্যলোকের তৃপ্তি বিধায়ক; কিন্তু অথর্ববেদ এই সকল লোককে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়। অথ (মঙ্গল)+ঋ ধাতু (গমন করা)+বন্ প্রত্যয় করিয়া 'অথর্ব্ব' শব্দটি নিষ্পন্ন অর্থাৎ যে বেদ মঙ্গলস্বরূপ ব্রহ্মে লইয়া যায় তাহাই অথর্ববেদ। অথর্ব-বেদের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উক্ত বেদত্রয় কখনই ব্রহ্ম প্রাপ্তির সাধক হইতে পারে না। এই হেতু অথর্ববেদই শ্রেষ্ঠ বেদ। অথর্ববেদের অন্য নাম ব্রহ্মবেদ এবং উহা ত্রৈবেদিক ব্রহ্মকর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া সর্ব্ববেদের সার। এজন্য 'বেদ' বা 'ত্রয়ী' বলিলে প্রধানতঃ অথর্ববেদকে গ্রহণ করিয়া ঋক সাম ও যজুঃকে তাহার অন্তর্ভুক্তরূপে বিবেচনা করাই সঙ্গত কার্য্য। অতএব অথর্ব্বকে বেদবহির্ভূত বলিয়া বিবেচনা করা এবং "অথর্ব্ব নামক বেদ পরে সংযুক্ত হইয়াছে" এরূপ বলা নিতান্তই ভ্রমাত্মক সন্দেহ নাই।

ভাল মন্দ যাহা কিছু সমস্তই ভগবান হইতে আসিয়াছে। ভালগুলি ভগবানের সৃষ্ট, আর মন্দগুলি শয়তানের সৃষ্ট এরূপ মনে করা সঙ্গত নয়। কারণ ভাল অবস্থা-বিশেষে মন্দ এবং মন্দ অবস্থাবিশেষ ভাল হয়, এ দৃষ্টান্ত জগতে অপ্রতুল নয়। অতএব বেদও কর্ম্মকাণ্ড [ফলশ্রুতি হেতু] দোষযুক্ত এবং ভগবান তাহার নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া উহা ভগবানের মুখনিঃসৃত নয়, এরূপ সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন। ভগবান্ যেমন ফলশ্রুতি মূলক বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানের নিন্দা করিয়াছেন, সেইরূপ সন্ন্যাসমূলক জ্ঞানমার্গেরও নিন্দা করিয়াছেন। কর্ম্মের নিন্দা যথা—

"দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥" (২।৪৯)
"বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ।" (২।৪২)

* * * *

[তেষাং] "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥" (২।৪৪)

সন্ন্যাসের নিন্দা যথা—

"সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনি র্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥" (৫।৬)
"ন কর্ম্মনামরম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥" (৩।৪)

এইরূপ সন্ন্যাসের প্রশংসাও আছে, যথা—

"অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং **সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতে**॥" (১৮।৪৯)

অতএব কর্ম্ম বা জ্ঞানমার্গের নিন্দা করা যে ভগবানের অভিপ্রায় নহে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। অধিকারী ভেদে উভয়ই প্রশংসনীয়। কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের অধিকার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"আরুরুক্ষো র্মুনে র্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥" (৬।৩) [শম=কর্ম্মত্যাগ]
"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥" (৩।৩)

'কর্ম্ম' বলিতে আহার নিদ্রাদি অথবা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্ম বুঝিতে হইবে না, ত্যাগমূলক যজ্ঞকর্ম্মই বুঝিতে হইবে। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি" অর্থাৎ বেদবিহিত কর্ম্মই কর্ম্ম। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ এই পঞ্চবিধ যজ্ঞকর্ম্ম এবং তদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত লৌকিক কর্ম্মও কর্ম্ম নামে অভিহিত। আমাদের যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মই এই পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, গীতায় বৈদিক যজ্ঞকর্ম্মের সবিশেষ প্রশংসা এবং উহাকে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যথা—

"যজ্ঞোদানং তপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥"
"কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ (৩।১৫)
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥" (৩।১৬)
"ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন"—(২।৪৫)

অতএব 'বেদ সকল কর্ম্মফল প্রতিপাদক, তুমি ত্রৈগুণ্য রহিত বা গুণাতীত হও' ভগবানের এই কথায় বেদকে নিন্দা করা হয় নাই—বেদোক্ত ফলাকাঙ্ক্ষার নিন্দা করিয়া (কর্ম্মের নিন্দা নহে)

নিষ্কাম ভাবেরই প্রশংসা করা হইয়াছে মাত্র অর্থাৎ তুমি বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম নিষ্কামভাবে বা বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ অনুষ্ঠান কর তাহা হইলেই তুমি ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, ইহাই মাত্র লক্ষ্য করা হইয়াছে। যেমন ভগবান বলিয়াছেন—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥" (৩।৯)
"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥" (৩।১৯)

যাহা হউক বেদ সম্বন্ধে যে নিন্দা তাহা বস্তুতঃ নিন্দা নহে ; কেন না বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে ভগবানের সংসার চক্র সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয় না। মীমাংসা শাস্ত্রের একটী বচন আছে—

"ন হি নিন্দা নিন্দিতুং প্রবর্ত্ততে অপিচ তদিতরৎ স্তোতুম।
উদিতানুদিত হোমবৎ ॥"

'শাস্ত্রে যেখানে কোন বিশিষ্ট বাক্যের নিন্দা করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য নিন্দা নহে, পরন্তু অপর পক্ষের প্রশংসা করাই তাহার উদ্দেশ্য—যেমন একবার হোমের প্রশংসা করিয়া অনুদিত হোমের নিন্দা এবং পুনরায় অনুদিত হোমের প্রশংসা করিয়া উদিত হোমের নিন্দা করা হইয়াছে।' এস্থলে এক পক্ষের নিন্দা অপরপক্ষের প্রশংসার জন্যই করা হইয়াছে। প্রথম পক্ষের নিন্দা করা তাহার অভিপ্রায় নহে। অতএব অর্জ্জুনকে বুদ্ধিযোগে আরূঢ় করিবার জন্যই বৈদিক সকাম কর্ম্মের নিন্দা করিয়া নিষ্কামভাবের (জ্ঞানকাণ্ডের) প্রশংসা করা হইয়াছে—বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। ভগবানকে জানা বা পাওয়াই বেদসমূহের তাৎপর্য্য অর্থাৎ বেদোক্ত ক্রিয়া সমূহের যথার্থ ফল—ফলশ্রুতি উদ্দেশ্য নহে, উহা আবান্তর ফল মাত্র ; যেমন ফলভোগ করাই বৃক্ষ-রোপনের যথার্থ উদ্দেশ্য, কিন্তু ছায়া লাভ তাহার অবান্তর ফলমাত্র সেইরূপ। ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদ বিদেব চাহম্।" (১৫।১৫)
"বেদ্যং পবিত্র মোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ।" (৯।১৭)

অতএব ভগবানই যখন সকল বেদের বেদ্য এবং তিনিই ঋক, সাম ও যজুঃরূপী তখন বেদ ভগবানের মুখনিঃসৃত হইতে পারিবে না কেন তাহা বুঝা গেল না। আর প্রতিবাদক মহাশয় বলিতেছেন— "পুরাণাদি যে ভগবানের মুখনিঃসৃত নহে, তাহা সকলেই অবগত আছেন।" তাহা হইলে এ বিষয়ে শ্রুতি ও ভাগবত হইতে যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তিনি কি সে গুলির কোন মূল্য নাই বলিতে চান? না, সাধারণের অভিজ্ঞতাকে শাস্ত্রের স্পষ্ট বাক্য অপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, ইহাই তিনি বলিতে চান? বাস্তবিক এইরূপে শাস্ত্রের উপর নিজের সংস্কার বা বুদ্ধির প্রাধান্য দেওয়া আমাদের ধৃষ্টতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

একণে দত্ত মহাশয় যে শাস্ত্র হইতে বহু ও বিরুদ্ধ মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি সম্বন্ধে একে একে ভাবিয়া দেখা যাউক, সে সকলের কোন মীমাংসা হইবার উপায় আছে কিনা। (১) কলিতে পরাশরের মতই মত ইহা পরাশর কহিয়াছেন। ইহাতে অবশিষ্ট অষ্টবিংশতি সংহিতার মতে কার্য্য করা যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তাহা বুঝায় না। যে ব্যবস্থা পরাশরের সংহিতায় নাই অথচ

অন্য সংহিতায় আছে তাহা সেই সংহিতা অনুসারে পালন করিতে হইবে। কিন্তু যে ব্যবস্থা পরাশর সংহিতায় আছে ও অন্য সংহিতাতেও আছে অথচ উভয়ের মত ভিন্ন সেই ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরাশরের মতই অবলম্বনীয়। এতদ্ভিন্ন, কলিতে অন্যান্য সংহিতা অপেক্ষা পরাশরের মতই উৎকৃষ্ট উদ্ধৃত বচন সমূহে তাহাই মাত্র লক্ষিত হইয়াছে—অন্যান্য সংহিতার মতে কার্য্য করিলে মহাপাতক হইবে একথা বলা হয় নাই। পরন্তু অধিকার এবং প্রবৃত্তি ভেদে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সকল ব্যবস্থাই সমাজে চিরকাল গৃহীত হইয়া আসিতেছে এবং গৃহীত হইতে থাকিবে। আর শাস্ত্রোক্ত উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সকল আচারই স্বেচ্ছাচার অপেক্ষা শুভফলদায়ী। শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বোধে মানিবার প্রবৃত্তিই আমাদের বাঞ্ছনীয় বস্তু—শাস্ত্রবিচারে ভুল হইলেও বিশেষ কোন হানি নাই, কেননা ঐ প্রবৃত্তি ঠিক থাকিলে ভগবৎকৃপায় সমস্ত ঠিক হইয়া যায়। একটা কথা মনে পড়িল। এক ছাত্র প্রফেসরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "আমি এডিসনের মত ইংরাজী লিখিব? না মেকলের মত লিখিব?" তদুত্তরে প্রফেসর বলিলেন 'তুমি যাহার মত ইচ্ছা লিখিতে পার, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।' আমাদের কথাও তাহাই। আমরা যাহার মতেই চলি না কেন, তাহা আমাদের স্বাধীন মত অপেক্ষা উৎকৃষ্টই হইবে। আর অকিঞ্চন স্বার্থশূন্য ভগবৎপরায়ণ জ্ঞানী পুরুষের হৃদয়ই কষ্টিপাথর সদৃশ। কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য দেশ কাল পাত্র ভেদে কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বনীয় ও কোন্ ব্যবস্থা ত্যাজ্য ইচ্ছা থাকিলে এ সমস্ত বিষয় সেই কষ্টিপাথরে কষিয়া লওয়া যাইতে পারে। অধুনা ভারতের যথার্থ শাস্ত্র মানিয়া চলিবার লোকের যেরূপ অভাব ঘটিয়াছে, বোধ হয় শাস্ত্রজ্ঞ সাধু ও জ্ঞানী পুরুষের তাদৃশ অভাব ঘটে নাই। অতএব এবিষয়ে আমাদের ভাবিয়া আকুল হইবার কোন কারণ দেখি না।

পরাশর কহিয়াছেন—"সত্যযুগে তপস্যা শ্রেষ্ঠ, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিতে দান অর্থাৎ আত্মদানই শ্রেষ্ঠ।" এখানেও বিরোধাশঙ্কা নাই, কেননা কোন্ যুগে কোন ধর্ম্ম প্রধান ভাবে অবলম্বনীয় তাহাই মাত্র ব্যক্ত হইয়াছে—অন্যান্য যুগের ধর্ম্মকে নিষেধ করা হয় নাই। আর নিষেধ করা হইলেও, সেস্থলে শাস্ত্রানুসারেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের বিধানসমূহ নিবারিত হইয়া কেবল বর্ত্তমান যুগের বিধানই পালনীয় হইত, ইহাতেই বা বিরোধ কোথায়? কলিতে আত্মদান অর্থাৎ আত্মসমর্পণ বা শরণাগতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলা হইয়াছে বলিয়া তপস্যাদি ধর্ম্ম যে একেবারে উঠাইয়া দিতে হইবে এমন নয়, উহারা অপ্রধানভাবে অথবা শরণাগতির সাধনরূপে বা অন্তর্ভূত-রূপেই বিদ্যমান থাকিবে। গীতাতেও ভগবান্ বলিয়াছেন—"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ (১৮৷৬৬)।" এরূপ বলা সত্ত্বেও সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান একেবারে উঠিয়া যাওয়া তাঁহার অভিপ্রেত নহে। ভগবচ্ছরণাগতির মধ্যেই সকল ধর্ম্ম সামান্যতঃ বা প্রকারান্তরে বিদ্যমান্ থাকিবে, কেবল উহা স্বাধীনভাবে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত অনুষ্ঠিত না হইয়া ভগবানের বা গুরুর ["আচার্য্যং মাং বিজনীয়াৎ —শ্রুতি] আজ্ঞাধীনতায় তৎপ্রীতিসাধন উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হইবে এই মাত্র। কিন্তু যাহারা অহঙ্কারের আধিক্য বা প্রবৃত্তির অভাব বশতঃ শরণাগত হইতে অসমর্থ তাহারা স্ব স্ব প্রকৃতি অনুযায়ী সাধন করিলে তাহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়া অধর্ম্মরূপে বিবেচিত হইবে না। শরণাগতি অভাবে তাহাদের অন্যান্য ধর্ম্মই আচরণীয়। কিন্তু তাহারা শরণাগত সাধকের ন্যায় শীঘ্র পরাগতি লাভ করিতে পারিবে না, অনেক জন্মে সিদ্ধি লাভ করিয়া তার পর পরাগতি প্রাপ্ত হইবে। "অনেক জন্মসংসিদ্ধিস্ততো যাতি পরাং গতিম্" (৬৷৪৫)] এই মাত্র বিশেষ। নতুবা 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য

মামেকং শরণং ব্রজ' ভগবানের এই আজ্ঞাই যদি তাঁহার এক মাত্র আজ্ঞা হয় তবে তিনি পূর্ব্বে অর্জ্জুনকে কর্ম্ম সম্বন্ধে "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহকর্ম্মনঃ" (৩৮) জ্ঞান সম্বন্ধে "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" (৪।৩৫) যোগ সম্বন্ধে "তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন" (৬।৪৬) "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগ যুক্তো ভবার্জ্জুন" (৮।২৭) এবং ভক্তি সম্বন্ধে "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" (৯।৩৪) এই সকল আজ্ঞা দিয়াছিলেন কেন? তদ্দ্বারা কি ইহাই বুঝায় না যে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" এই আজ্ঞাটি তাঁহার চরম বা সর্ব্বপ্রধান আজ্ঞা হইলেও, অসমর্থ পক্ষে অধিকার ভেদে বা অবস্থা বিশেষে অন্যান্য আজ্ঞাও পালনীয়? অতএব শাস্ত্রে প্রকৃত পক্ষে বিরোধ না থাকিলেও, দেখা যাইতেছে আমরাই বুদ্ধির দোষে বিরোধ ঘটাইয়া থাকি।

বাস্তবিক সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে ত দেহযাত্রাই নির্ব্বাহ হইতে পারে না। যতক্ষণ দেহ মন বুদ্ধি থাকিবে ততক্ষণ উহাদের ধর্ম্মও অবশ্য বিদ্যমান্ থাকিবে; সুতরাং সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ হইতেই পারে না। অতএব 'ত্যাগ' বলিতে জ্ঞানাংশে ত্যাগ বলিয়া বুঝিতে হইবে—কর্ম্মাংশে বলিয়া বুঝিতে হইবে না। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এক বেদেরই দুই প্রকার বিভাগ। তথাপি কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গের বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু কেবল কর্ম্মকাণ্ড বিহিত ফলাভিসন্ধিযুক্ত কর্ম্ম দ্বারা অথবা কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল শ্রবণ মননাদি জ্ঞান সাধন দ্বারা কখনই মনুষ্য জীবনের চরম উদ্দেশ্যরূপ শান্তি বা মোক্ষলাভ হইতে পারে না। কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় মোক্ষ লাভের কারণ হয়। যোগবাশিষ্ঠের একটি বচন আছে—

"উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদম্॥"

জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয়ই যে এক মাত্র পন্থা—শুধু কর্ম্ম বা শুধু জ্ঞান নহে, ইহা ভগবান্ গীতায় বিস্তারিত ভাবেই বুঝাইয়াছেন এবং কর্ম্ম ও কর্ম্ম ত্যাগের অপূর্ব্ব সমন্বয়ও দেখাইয়াছেন। যথা—

"ন হি দেহভৃতাং শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্ম ফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ (১৮।১১)
"অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ॥" (৬।১)
"সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাহপি ন নিবধ্যতে॥" (৪।২২)
"যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাহপি স ইমাং ল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥" (১৮।১৭)
"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ। (৫।৮)
* * * * * *
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥" (৫।৯)
"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্ন কর্ম্মকৃৎ॥" (৪।১৮) ইত্যাদি।

জ্ঞান ও কর্ম্মের মিলন নিষ্কাম কর্ম্মে এবং নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু এই নিষ্কাম কর্ম্ম কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা সাত্ত্বিক বুদ্ধি অবলম্বনে কতকটা অনুষ্ঠেয় হইলেও, আত্মসমর্পণ বা শরণাগতি ভিন্ন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। এজন্য ভগবান্ ইহাকেই জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ের প্রকৃষ্ট বা

সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শরণাগতিতে স্বভাবতই কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ একত্র মিলিত। শরণাগত সাধকের নিজ ইচ্ছায় বা স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে কোন কর্ম্ম করা চলে না। কাজেই তাহাকে সর্ব্বকর্ম্মের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হয়, অথচ ভগবানের বা গুরুর আজ্ঞানুসারে ঘোরতর কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হয়। ইহাই কর্ম্ম অকর্ম্মের বা জ্ঞানকর্ম্মের মিলন এবং ইহাই ভগবানের যুগলমূর্ত্তি। সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ সম্বন্ধেও এইরূপই বুঝিতে হইবে। ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইলে অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হয় এবং ভগবদিচ্ছায় বহু ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেও হয়। অতএব ভগবদাজ্ঞানুসারে সর্ব্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করাকেই সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ বলে। [ভগবদাজ্ঞা তিন প্রকার; যথা—(১) শাস্ত্র আজ্ঞা (২) গুরু আজ্ঞা এবং (৩) ভগবানের সাক্ষাৎ আজ্ঞা অর্থাৎ যাহা সংস্কার দ্বারা অস্পৃষ্ট নির্ম্মল হৃদয়ে আপনা হইতে বা আত্মা হইতে উদয় হয়। এই তিন পর পর শ্রেষ্ঠ এবং বিরোধস্থলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর মান্য] মহাভারতে লিখিত আছে—

তদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্যজেতি চ।
তস্মাদ্ধর্ম্মানিমান্ সর্ব্বান্ নাভিমানাৎ সমাচরেৎ॥"

'ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর এবং কর্ম্ম ত্যাগ কর,' এই উভয় প্রকার বেদবাক্য আছে: অতএব এই সমস্ত ধর্ম্ম অভিমান শূন্য হইয়া আচরণ করিবে।' এইরূপেই সর্ব্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান এবং সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগের সমন্বয় করিতে হইবে। যাহা হউক, এ বিষয়ের তত্ত্ব এইরূপ; যথা ভগবানই একমাত্র সত্য বস্তু হইলেও তিনি লীলা বশে বহু হইবার ইচ্ছা করিয়া অজ্ঞান আশ্রয়ে এই বিশ্বরূপ হইয়াছেন বা সাজিয়াছেন। অজ্ঞান তাঁহারই শক্তি বিশেষ, পৃথক্ কোন বস্তু নহে। অতএব জগতে যে বহু ভাব বা পদার্থ দৃষ্ট হয়, সে সকল বস্তুতঃ বহু নহে একই এবং প্রত্যেক পদার্থের যে পৃথক পৃথক ধর্ম্ম প্রকাশ পায়, তাহাও বস্তুতঃ একেরই ধর্ম্ম পৃথক পৃথক পদার্থের ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মের এই পৃথক পৃথক ভাবকেই বহু ধর্ম্ম বা 'সর্ব্ব' ধর্ম্ম বলে। অজ্ঞানই বহু ধর্ম্ম প্রতীতির মূলকারণ। এক্ষণে ভগবান অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য বহু ধর্ম্ম বা বহু জ্ঞান ত্যাগ করিয়া এক জ্ঞানের শরণ গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। বহুর মধ্যে এই এক জ্ঞানই ভগবদ্‌জ্ঞান। জগতের যাবতীয় নাম রূপ ও ক্রিয়া সমস্ত একেরই অর্থাৎ ভগবানেরই প্রকাশ বা ধর্ম্ম, এই জ্ঞান আশ্রয় করিলে সর্ব্বপাপ অর্থাৎ অজ্ঞানাদি বা ভেদদৃষ্টি মূলক বহু জ্ঞানের মোহ বিনষ্ট হইয়া মোক্ষ লাভ হয়, ইহাই ভগবদ্‌বচনের তাৎপর্য্য। কিন্তু অহঙ্কারই এপথের প্রধান শত্রু। গুরু চরণে শরণাগতি অর্থাৎ গুরুর উপর নির্ভর করিয়া তচ্চরণে সমস্ত সমর্পণ ভিন্ন এই অহঙ্কার কোন মতেই নিবৃত্ত হয় না, কাযেই জ্ঞানলাভও হয় না। দেহ থাকিতে যখন অজ্ঞান ও সজ্ঞানের কর্ম্ম বা ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হইতে পারে না, তখন জ্ঞান মূলক ত্যাগকেই ত্যাগ বলা যায় এব, কর্ম্ম বা ধর্ম্ম ত্যাগের চেষ্টা অজ্ঞানেরই কার্য্য বলিয়া উহাও কর্ম্ম বা ধর্ম্ম পদবাচ্য। 'সর্ব্বধর্ম্ম' বলিতে—'সর্ব্ব' বা বহুত্ব বিষয়ক ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই লক্ষিত হইয়াছে। অতএব এই উভয়ই পরিত্যাজ্য। ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকাই সর্ব্বপ্রধান যথার্থ ধর্ম্ম। জ্ঞানী ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"ধর্ম্মাধর্ম্ম দু'টা অজা তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে বারণ ওরে মন জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি॥"

———

হিন্দুসমাজ—সেকাল ও একালে

(৭)

শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বসু বি-এস-সি, (লণ্ডন)

ত্যাগ ও দাক্ষিণ্যাদি যে সকল মহৎ গুণের উল্লেখ ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি, তাহা ব্যতীত হিন্দু সাধনার আর একটী মৌলিক নীতি সেকালে সমাজে বদ্ধমূল ছিল—তাহা **কর্ম্মবাদ**। লোক চরিত্রে সন্তোষ বিধান ও অন্যান্য শান্ত গুণ দান করিতে ইহার শক্তি অসাধারণ। যে ঐক্য ও সদ্ভাব পূর্ব্বে সমাজে বিরাজ করিত তাহার কারণ ছিল অনেকটা উহাই। যেমন কর্ম্ম করা যায়, তেমনই ফল লাভ হয়, একথা সকলেই জানে; কিন্তু আমাদের দেশের লোকে এতদপেক্ষা আরও একটু অধিক জানিত—যদি কেহ এই জগতে নিজ আকাঙ্ক্ষিত কোনও বস্তু লাভ করিতে না পারে বা বাঞ্ছিত কোনও বস্তুর ভোগলাভে বঞ্চিত থাকে, এবং এই জন্মের কর্ম্মের দ্বারা এইরূপ ভোগসুখ হইতে বঞ্চিত থাকিবার কারণ কিছু না পাওয়া যায়, তবে তাহারা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মের নিমিত্ত এইরূপ হইল বলিয়া সন্তুষ্ট থাকে; আর এই জন্মে কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিলে ভবিষ্যত জীবনে তাহার সুখফল ভোগ করিতে পারিবে বলিয়া আশ্বস্ত হয়। এইরূপ মত বাদকে কেহ কুসংস্কার বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য মতের যে সাম্যবাদ আজ নব্য ভারতের প্রতি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং যাহার ফলে বর্ত্তমান ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে আজ ঘোর বিবাদ ও লাঠালাঠি চলিতেছে, তাহার প্রধান কারণ—সেই সাম্যবাদও একটী কুসংস্কার মাত্র, এবং বোধ হয়, একটী নিকৃষ্টতর কুসংস্কার। এই বিষয়টী মদ্‌কৃত "বর্ত্তমান যুগের কুসংস্কার সমূহ" নামক ইংরেজী গ্রন্থে বিশদরূপে দেখাইয়াছি। অসাম্য প্রকৃতির একটী মৌলিক নিয়ম। বিভিন্ন লোকের মধ্যে, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে, একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে অসমতা থাকাই স্বাভাবিক; জগতের অধিকাংশ লোক বা সাধারণ জনতা কুসংস্কারপরিচালিত বলিয়া, সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের জন্যই ইহা বাঞ্ছনীয় যে, যে সকল কুসংস্কার দ্বারা সমাজের উপকার হওয়ার সম্ভাবনা তাহা লোকে মানিয়া চলিবে। অতীত জীবনের কর্ম্মফলে বিশ্বাস দ্বারা সমাজের যে কল্যাণ সাধন হইয়াছে, তাহার তুলনাতে বর্ত্তমান এই পাশ্চাত্যের দেওয়া সাম্যরূপী ভূতে বিশ্বাসকে নানা অকল্যাণের আকর বলিয়াই ধরিতে হয়। উহাতে আছে জড় অনুভূতি ও ইন্দ্রিয় সুখের প্রসার সাধন, আর তাহার প্রতিযোগিতায় সমাজে বিবিধ প্রকারের বিবাদ বিসম্বাদ!

আজ আমরা সরকারী দপ্তরের ভুক্তাবশেষ কতিপয় চাকুরীর পদবী ও ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় আসন লইয়া মারামারি কাড়াকাড়ি করিতেছি। ব্রিটিশ শাসনে এদেশের গ্রাম্য স্বরাষ্ট্রসংস্থা সমূহের বিলোপ সাধন ঘটিয়াছে, দেশের শিক্ষা ও অন্যান্য অনেক প্রকারের জাতীয় কার্য্যাবলী এক্ষণে ব্রিটিশের প্রতিষ্ঠিত আমলাতন্ত্রের শামিল হইয়া যাওয়াতে, বহুদিকে অনেক প্রকারের চাকুরীর নূতন নূতন পথ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহাতে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের বংশগত (ইহারা প্রধানতঃ আর্য্যবংশসম্ভূত, যদিও অনেক স্থানে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে) বুদ্ধির উৎকর্ষের

নিমিত্ত এই নূতন চাকুরীর ক্ষেত্রের অধিকাংশ অধিকার করিয়া বসিল। নিম্নশ্রেণীর অনার্য্য বংশীয় লোকেরা, সম্মুখ প্রতিযোগিতাতে ইহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না বলিয়া, সম্প্রতি মুসলমানদিগের মতন দাবী তুলিয়াছে যে, চাকুরীর পদবীগুলি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যার অনুপাতে বণ্টন করিতে হইবে—এ দাবী যে কতদূর অসঙ্গত তাহা সহজেই ধরা যায়। তথাপি বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট ও এদেশের প্রগতিশীল সংস্কারকেরা ইহার সমর্থন করিতেছেন। চাকুরীর জন্য এই যে লোকের অতিমাত্র ব্যগ্রতা ও ভিড়, তাহাতে কৃষি ও বাণিজ্যে যে সকল লোকের বিশেষ অধিকার ও অধিকতর উন্নতি করা সম্ভবপর এবং যাহারা উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত তাহারা উহা ছাড়িয়া দিয়াছে ; পক্ষান্তরে তাহাদের বংশানুগত সংস্কার ও যোগ্যতা হেতু ইহাতে বিশেষ উন্নতি করিতেও সক্ষম হইতে পারে ; তাহা হইলে অন্ততঃ আজ যে দরিদ্র ভদ্রলোক উমেদারের দল চাকুরীর জন্য দলে দলে অসহায় অবস্থায় ঘুরিতেছে, তাহাদের অপেক্ষা নিশ্চিন্ত মনে ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। এক্ষণে যদি এদেশে বাস্তবিক কোনও অবনত বা অচ্ছুত জাতি থাকে, তবে তাহা যাহারা এই দল বৃদ্ধি করিতেছে, তাহারাই। যতই অসম্ভব বলিয়া মনে হউক না কেন, আজ দেশের এই বিপরীত অবস্থাই উপস্থিত যে, এই তথা কথিত অচ্ছুতদিগের অধিকাংশ লোক দলে দলে এই চাকুরি লোলুপলোকদিগের দলে মিশিয়া প্রকৃত পক্ষে এই অচ্ছুত লোকেরা যে চাকুরীর জন্য যে ভিড় করিতেছে, তাহাতে আসিয়া যোগদান করিতেছে। এইরূপ প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করিয়া ইহারা যে উপার্জ্জন করে, তাহা কিন্তু সাধারণ কৃষক বা কারিগরদিগের উপার্জ্জন অপেক্ষা অধিক হয় না—অধিকন্তু উহাদের ইহাদের ন্যায় ভদ্রলোক বলিয়া (?) পোষাকাদির পারিপাট্যে ব্যয় বাহুল্য করিতে হয় না। এ সমুদয় কারণে দেশে আজ যে বিষম অর্থনৈতিক সঙ্কট উপস্থিত তাহাতে সকলেই যে আপন আপন প্রাণ বাঁচাইতে ব্যস্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? সমাজে কে কার গলায় ছুরি দিবে তাহা লইয়াই ব্যস্ত—নিজেত বাঁচি অপরের অবস্থা যাহা হউক না কেন —এই ভাব প্রবল। আজ কিন্তু শুনিতে পাই, লোক বলিতেছে—"ভারতে নূতন জাতীয়তা" প্রতিষ্ঠা হইতেছে। হায় ! রে জাতীয়তা ! যে জাতীয়তা একদিন সত্যসত্যই ছিল তাহাই না চুরমার হইতে বসিয়াছে। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে !

এতদ্ প্রসঙ্গে এ যাবত যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা হইতে এ কথা নিশ্চয়ই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে যে, মানব সাধনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান যে সর্ব্বজনের হিতৈষিতা তাহা অদ্যকার আমাদের এই পাশ্চাত্য দ্বারা ভারতীয় সাধনার পরাভব দ্বারাই প্রধানতঃ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত ভারত তাহার সাধনামূলক স্বরাজকে অক্ষুন্ন রাখিয়া ছিল এবং তাহাতে কোনও জাতি যতদূর উন্নতি সম্পন্ন হইতে পারে, ভারত তাহাই ছিল। আমাদের বর্ত্তমান সময়ের যত দুঃখ দুর্দ্দশা তাহার প্রধান কারণ সেই সাধনামূলক স্বরাজের উচ্ছেদ সাধন আর আমাদের নব্য ভারতের নেতৃবৃন্দই অধিকাংশ সে জন্য দায়ী। পাশ্চাত্য দেশের কোনও শাসনকর্ত্তৃপক্ষ যে তাহাদের নিজ সাধনার প্রবর্ত্তন করিতে যাইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই; কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে আমাদের দেশের এত সব নেতারা পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্যে প্রতারিত হইয়া তাহার সাহায্য ও সমৃদ্ধিতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন ! বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সেই সাধনামূলক রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠাই আমাদের সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য ও বাঞ্ছনীয়। সুখের বিষয় আজ এদেশে

নানাদিকে সেই জন্য আয়োজনের সূচনা দেখ যাইতেছে—রামকৃষ্ণমিশন, থিওসফিক্যাল সোসাইটী, গুরুকুল সমূহ, বোলপুর রাঁচি প্রভৃতি স্থানের ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় সমূহ উল্লেখ যোগ্য। ভারতের ভবিষ্যৎ ও সমুদয় সভ্য জগতের ভবিষ্যৎ এই সকল প্রতিষ্ঠানের কৃতকৃত্যতার উপর নির্ভর করিতেছে। ভারতের সাধনা প্রাচীন মানব সাধনার শ্রেষ্ঠ প্রতীক, ইহার প্রচার ও প্রবর্ত্তন দ্বারাই বর্ত্তমান মানব সমাজ তাহার অতি মাত্র ধনলীপ্‌সা, স্বার্থপরতা, হিংসা দ্বেষ ও সামরিক উৎপীড়ন, যাহাতে সে আজ ডুবিয়া উত্তরোত্তর নিম্নগামী হইতেছে, তাহা হইতে রক্ষা হইতে পারে। ইহার অন্তর্নিহিত নীতি সূত্রেই—আত্মত্যাগ, বিশ্বপ্রেম ও পরার্থপরতা—জগতের সনাতন সত্য নীতি। তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ইহাদের যে গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ছিল, আজিও তাহাই আছে, ভারতে ও প্রাচীন চীনে উহা প্রথম প্রথিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

স্বাধীনতা

শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

'পাশ্চাত্য রাজ্যে স্বাধীনতার যত সম্মান ও গৌরব, ভারতের লোকেরা তাহা ধারণা করিতে পারে না। কারণ ইহারা যে চির পরাধীন। স্বাধীন দেশের হাওয়াই আলাদা। সুয়েজ খাল পেরিয়ে গেলেই স্বাধীনতার মনোরম হাওয়া বেশ উপলব্ধি হ'তে থাকে।' ইত্যাদি পরীর গল্প আমাদের দেশীয় ইউরোপভ্রমণকারীদের মুখে শুনিয়া থাকি। স্বাধীনতার মাহাত্ম্যে আমেরিকা যে ইউরোপ হইতেও বহুদূর অগ্রবর্ত্তী তাহাও শুনি।

মিঃ এভারেট ভিন মার্টিন আমেরিকার একজন প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক। তাঁহার "লিবার্টি" (স্বাধীনতা) শীর্ষক যে বহু গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ ১৯৩০ইং সনের জুনমাসে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে জনসাধারণের আন্দোলন দ্বারা বহু বিষয়ে মানবসমাজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, এবং তদ্বারাই মানবগণ ক্রমশঃ উন্নত হইতেছে, ইত্যাদি যে সমস্ত গল্প প্রচলিত আছে তাহার মূলে কোন সত্য নাই, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয় না। একশত বৎসর পূর্ব্বেও স্বাধীনতার জন্য যে দ্বন্দ্ব চলিত, তাহার লক্ষ্য ছিল শাসক অভিজাতবর্গ ও ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি জনকতক লোকের উৎপীড়ন হইতে জনসাধারণকে মুক্ত করা। আর আজ উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণ হইতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষাই প্রধান সমস্যা হইয়াছে। ইহারা স্বাধীনতার অর্থ বুঝে কোনরূপ বিধি-বিধানের বাধা না থাকা, যখন যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার করা। তাহাদের কৃতকার্য্যের ফল অন্যের পক্ষে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে সে বিচার বিবেচনা তাহারা করে না। তাহাদের মধ্যে যে কয়টি ভাব প্রবল দেখা যায় তাহা এই :—

(১) 'হয় সমস্ত চাই, নয় কিছুই না।' —ইহাই তাহাদের নীতি। তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে অন্যকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কৌতুক লইয়া আছে ত সমস্তই হাসিয়া উড়াইয়া

দিবে। ভাবের মত্ততায় সহজে আত্মহারা হয়। সামান্য কোন ঘটনায় ক্ষেপিয়া ঘর দরজা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। ভাবে না যে তাহাদের অবলম্বিত উপায়ের পরিণাম কি দাঁড়াইবে।

(২) তাহারা যাহা ভাল মনে করে তদপেক্ষা ভাল যে আর কিছু থাকিতে পারে ইহা তাহারা বুঝিবে না। অজ্ঞ লোকেরা মনে করে যে তাহারাই সব চেয়ে ভাল বুঝে। তাহাদের ঐরূপ বিশ্বাস তাহাদের সাঙ্গোপাঙ্গোদের কাছেই আদর পায়। তাহারা একে অন্যকে ঐ ভাবেই অনুপ্রাণিত করে। এই প্রকার আবহাওয়ার মধ্যে বিশুদ্ধ স্বাধীনতা কখনো জন্মিতে পারে না।

(৩) যে কথা বেশী জোরের সহিত প্রচার করা যায় জনসাধারণ তাহাই পরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। এজন্য খাঁটি সত্য তাহারা জানিতে পারে না। তাহাদের অহমিকা ও ভ্রান্ত সংস্কারের যত প্রশংসা করা যায় ততই তাহারা উৎফুল্ল হয়, প্রচারকেরা জনপ্রিয় হইবার জন্য এই উপায়ই অবলম্বন করেন। এইরূপ প্রচারের ফলে জনসাধারণ নিজের চিন্তাশক্তি হারাইয়া ফেলে। ফলে তাহারা ভয়ঙ্কর কপটতায় জড়াইয়া যায়। কথিত আছে :—"তুমি সত্যকে জান, সত্যই তোমাকে মুক্ত করিবে।" জনসাধারণ সে পরম সত্যকে জানিতে পারে না। সত্যের উপরই যদি আমাদের স্বাধীনতা নির্ভর করে তবে জনসাধারণের দিকে তাকাইলে হতাশ হইতে হয়।

(৪) জনসাধারণ ভ্রান্ত মতের বশবর্ত্তী হইয়া যে কেবল একগুঁয়েমি করে এমন নহে, ভয়ঙ্কর দলাদলিও করে। যাহারা কোন দলভুক্ত হয় তাহারা সেই দলের মতানুযায়ী কাজ করিবার সময় ভাবে না যে তদ্দ্বারা অন্যের প্রতি মঙ্গলামঙ্গল কি হইবে। দলাদলিতে শুধু অসহিষ্ণুতা নহে, দলের বাহিরের লোকের চিন্তা ও আকাঙ্খার প্রতি নির্ম্মম তাচ্ছীল্যও প্রকাশ করে। সমাজবন্ধনের মূল যে একের প্রতি অন্যের দয়া ও মমতা তাহা ছিন্ন হইয়া যায়।

(৫) জনসাধারণের শাসননীতি যুক্তিমূলক নহে, বর্জ্জনমূলক। যাহার সঙ্গে তাহার মত মিলিবে না, তাহাকে সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিবে। এমন কি জনসাধারণের জন্য স্বাধীনতা আয়ত্তের যে এত আন্দোলন তাহার নাম পর্য্যন্তও তাহারা শুনিতে পারে না। তাহারা মনে করে যে তাহারা স্বাধীন, রাজত্ব তাহাদেরই হাতে। বর্ত্তমান যুগের উন্নতি সম্বন্ধে ধারণাও এইরূপ মোহের একটি কারণ বটে। তাহাদের বিশ্বাস, যুগে যুগে মানব সমাজ উন্নত হইতেছে, প্রত্যেক নূতন যুগ পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের অধীনতা পাশ খুলিয়া ফেলিতেছে, সমাজ ক্রমেই স্বাধীনতা ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইত্যাদি। ইতিহাস খুঁজিয়া এইরূপ ধারণার কোন মূল পাওয়া যায় না।

পাঠকগণ মিঃ মার্টিনের বর্ণিত পাশ্চাত্য অবস্থার সহিত আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া দেখুন। পাশ্চাত্য রাজ্যে জনসাধারণের স্বাধীনতার যে পরিণাম দাঁড়াইয়াছে আজ ভারতের নব্য তান্ত্রিকদের স্বাধীনতার পরিণামও কি ঠিক তাহাই নহে? সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, প্রকৃত স্বাধীনতার নামগন্ধও নাই;—আছে দলাদলি, পরনির্য্যাতন এবং জোরের সহিত মিথ্যা প্রচার দ্বারা স্বীয় দলপুষ্টির চেষ্টা। পরিণাম, সমাজের প্রত্যেক স্তরে ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকোপ। পরের সদগুণ ও উচ্চ আদর্শের প্রতি তাচ্ছীল্য প্রদর্শন। ইহাতে যে তাহাদের নিজেরই অমঙ্গল হইতেছে সেদিকেও তাহাদের লক্ষ্য নাই।

বিশুদ্ধ স্বাধীনতা লাভের উপায় চিন্তা করিতে গিয়া মিঃ মার্টিন একে একে ৫টি উপায়

লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রথম, সাধনার দ্বারাই স্বাধীনতা লাভ করা যায়। স্বাধীনতা ভগবানের দান নহে। সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতা কাহারো নাই, আছে কতগুলি অধিকার যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব। সুনির্দ্দিষ্ট বিধিব্যবস্থা, যুক্তি ও সংযমমূলক সভ্যতাতেই এইরূপ স্বাধীনতা সম্ভব। ইহাকে জ্ঞান, সাহস, সংযম ও সুবিচারের ফল বলা যাইতে পারে। এই স্তরে মানুষ পরস্বাপহরণ হইতে নিবৃত্ত থাকে, একে অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না, অন্যের আত্মোন্নতির সহায় হয়। দেশে তখন এমন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকের আবির্ভাব হয় যাঁহারা এমন ভাবে সমাজ সঙ্ঘটন করেন যে দেশের শাসন কর্ত্তার ও প্রত্যেক অধিবাসী স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন, অন্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। তখনই দেশের জনসাধারণ বিশুদ্ধ স্বাধীনতা সম্ভোগ করে। সাধারণ মানবসমাজ এইরূপ স্বাধীনতা লাভের উপযোগী গুণ ও বুদ্ধি বিচক্ষণতা কখনো লাভ করে নাই। আমাদের সন্দেহ হইতেছে, মার্টিন ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম এবং তদাশ্রিত সমাজ ব্যবস্থার কথা নিশ্চয়ই অবগত নহেন। হইলে এমন কথা কখনো বলিতেন না।

দ্বিতীয় উপায় প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী চলা। প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিলেও মানুষ স্বাধীন হইতে পারে। প্রাকৃতিক নিয়ম বুঝা এবং তদনুসারে চলাই মানুষের সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানের পরিচায়ক। তেমন ভাবে চলার অর্থ যাহার যেরূপ প্রকৃতি তদনুসারে চলা। প্রকৃতি অন্য কোনরূপ বাধ্যবাধকতা চাহে না। সভ্যতার নামেই মানুষ মানুষের উপর যত অধীনতার নাগপাশ জড়াইয়া দিতেছে। সভ্যতা যতই জটিল হইতেছে ততই অধীনতার বোঝা তাহার উপর চাপিতেছে, ততই বিধিবিধানের পরিমাণ বাড়িতেছে, ততই বাধ্যবাধকতার কণ্টকজালে মানুষ জর্জ্জরিত হইতেছে। কৃত্রিম জীবন যাত্রা মানুষকে এত অপদার্থ করিয়াছে যে এক বাটী খাদ্যের জন্য সে তাহার জীবন স্বত্ব বিক্রয় করে। এইরূপ সভ্যতা কেবলমাত্র দম্ভের স্তূপ। ইহা যাহাকে আনন্দ বলিয়া মনে করে, তাহা হয় মোহ, নয় পাপলীলা। প্রকৃতির সহজ আনন্দোপভোগই প্রকৃত সুখ। তথাকথিত সভ্যতা মানুষকে কলুষিত ও বলহীন করে, দাসত্বে আবদ্ধ করে। বস্তুতঃ এইরূপ সভ্যতা ছলে বলে অন্যের দ্বারা নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিতে, নিতান্ত অসার ও অনাবশ্যক বস্তু সঞ্চয় ও বাহ্যিক জাঁকজমক দেখাইতে মানুষকে প্রলুব্ধ করে। মানুষ যখন প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী চলে তখন স্বাধীন থাকে। কেবল স্বাধীন কেন, স্বাস্থ্যবানও সদ্গুণসম্পন্নও থাকে। কলুষিত সভ্যতার আওতায় না পড়িলে মানুষ বরাবর তেমনই থাকিত। স্বাধীন হইতে চাও ত আত্মস্থ হও, প্রকৃতিস্থ থাক; সভ্যতার ফাঁদে পড়িয়া নিজের সরল বৃত্তিসমূহকে বিনষ্ট করিও না। তোমার নিজের জীবন যাপনার্থ তোমার স্বাভাবিক অধিকার রহিয়াছে। তোমার বিবেক বুদ্ধিকে যদি তথাকথিত সভ্যতার পাপরাশির দ্বারা কলুষিত না কর তবে তাহাই তোমাকে সদ্ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় প্রদর্শন করিবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রভুত্বপরায়ণ লোকেরা আধুনিক সভ্যতার পাপ ও দাসত্বকে নিজেদের স্বার্থকর করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের কবল হইতে জনসাধারণকে মুক্ত করাই বর্ত্তমানে স্বাধীনতাকামীদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তৃতীয় উপায় ত্যাগ, অধিভৌতিক মোহ হইতে মুক্তি ও বাসনার সংযম। যখন আমি দৈহিক ভোগপিপাসা ও জাগতিক উচ্চাভিলাষকে সংযত রাখিতে পারি তখন আমি নিশ্চয়ই স্বাধীন। বাসনা এবং তাহার কাম্য বস্তুসমূহকে লইয়াই যত দ্বন্দ্ব তাহার ভিতর এ জগতের

কেহই স্বাধীন থাকিতে পারে না। অতএব স্বাধীন হইতে হইলে চাই তাহা হইতে মুক্তি। যে বস্তুর কামনাকে নিরুদ্ধ করিবে তাহা আর তোমার দিকে হাত বাড়াইবে না। এই মতাবলম্বীদের বিশ্বাস, মানবাত্মা ক্ষণিকের জন্য রক্তমাংসের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। রক্তমাংসই বন্ধন; মানবের সত্যকার অবস্থা, বা মনীষী প্ল্যাটোর মতে যথার্থ জ্ঞান লাভ করিবার প্রত্যেক চেষ্টাকে রক্তমাংসই পদে পদে বাধা দেয়। ইহা আমাদিগকে এমন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করায় যাহা আমরা পাপ বলিয়াই জানি, এবং ইহাই ক্ষণবিধ্বংসী মৃত্যুসমাকুল আধিভৌতিক জগতে স্থায়ী সুখদানের প্রলোভনে আমাদিগকে মত্ততা ও ধ্বংসের পথে চালিত করে। এইরূপ স্বাধীনতার মূলতত্ত্ব—'নেতি নেতি'। আমি স্বাধীন যখন আমি এই সমস্তের বাহিরে, আমার কার্য্য সমাপ্ত হয় এবং আমার উপর কোন কর্ম্মভার না থাকে। আমি রোগ হইতে মুক্ত যখন আমাকে কোন রোগ স্পর্শ করিতে না পারে, সংসারের দাসত্ব হইতে মুক্ত যখন সংসারে আমি না থাকি।

চতুর্থ উপায়—পুরাতন সমস্ত বিধিব্যবস্থা ধর্ম্ম ও সমাজ ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া নূতন কিছু গড়া। এই মত যাঁহাদের তাঁহারা বলেন, বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার ফলে অল্পসংখ্যক শক্তিশালী লোকই স্বাধীন। সমগ্র মানব সমাজের স্বাধীনতা কোথায়? অধিকাংশ মানবই ত বেতনভোগী চাকর, অন্নের কাঙাল মজুর। অর্থনীতি, সমাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্যক্ পরিবর্ত্তিত না হইলে, জনসাধারণকে খাটাইয়া অল্প কয়জনের স্বার্থসিদ্ধিই ত সার হইবে। অতএব এমন ব্যবস্থা চাই যাহাতে দরিদ্র শ্রমজীবিগণ স্বাধীন হইতে পারে, জন কতক উচ্চ শ্রেণীর লোক উপরে বসিয়া যেন সমস্ত সুখ সুবিধা ভোগ করিতে না পারে। এইরূপ মতাবলম্বীদের ভরসা ভবিষ্যৎ। বর্ত্তমান দুঃখ ও অসন্তোষের যুগকে ধ্বংস করিয়া সর্ব্ব-সুখময় যুগের কামনা আজ নূতন নহে। ভিক্ষুরা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন,—ভগবানের দিন আসিবে, তখন ভগবান ছাড়া আর কেহ শাসনকর্ত্তা থাকিবে না। বর্ত্তমানে ভগবানের দিন হইয়াছে বিপ্লব! আর পরমসাধক মহাপুরুষেরা হইতেছেন কুলিমজুর! ভগবানের সাম্রাজ্য হইতেছে কো-অপারেটিভ কমনওয়েলথ্!!

ইদানীং পাশ্চাত্যরাজ্যে মানবসমাজকে পূর্ণ স্বাধীনতাদানের জন্য যে সমস্ত আন্দোলন চলিতেছে তৎপ্রতি ঐভাবে তীব্র কটাক্ষ করিয়া মিঃ মার্টিন লিখিয়াছেন:—মানব মাত্রেরই জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার কল্পনা কতিপয় মোহাচ্ছন্ন লোকের পক্ষেই সম্ভব। যে জনসাধারণের জন্য ঐরূপ স্বাধীনতার কল্পনা করা হয় তাহারা উহার সম্পর্কই রাখে না। স্বাধীনতা লাভের এই চারিপ্রকার উপায়ের মধ্যে প্রথমোক্তটিই সুসঙ্গত। ইহা প্রথমতঃ গ্রীস দেশেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সমগ্র মানবজাতির সর্ব্বতোমুখী পূর্ণ স্বাধীনতা কল্পনামাত্র। মানুষ গুণ ও কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন রূপ স্বাধীনতা আয়ত্ত করিতে পারে। দায়িত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তির পরিপক্কতার ফলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেরূপ স্বাধীনতা সম্ভোগ করেন; রাজাধিপতিরাও তাহা সমর্থন করিতে বাধ্য হন, এবং ভবিষ্যতে যেন তেমন স্বাধীনতা প্রসার লাভ করিতে পারে তদনুযায়ী বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। কিন্তু সাধারণ মানবসমাজ এইরূপ স্বাধীনতালাভের উপযোগী বুদ্ধি বিচক্ষণতাদি গুণ কখনো লাভ করে নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মিঃ এভারেট ডিন মার্টিন কখনো ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অধ্যয়ন বা প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম্মমূলক সমাজনীতি আলোচনা করেন নাই। করিলে কখনো এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন না। তিনি যে স্বাধীনতার চিত্রকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করিতেছেন ঠিক তাহাই ত ভারত-

বাসীরা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া সম্ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপায় কোথায় কিভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তিনি তাহার উল্লেখ করেন নাই। সেই দুইটিও ভারতবর্ষেই সর্ব্বতোভাবে অবলম্বিত হইয়াছে। তাহা না হইলে প্রথমোক্ত উপায় সম্পূর্ণ সফল হইত না। তাঁহার শেষোক্ত উপায়ও ভারতবর্ষে বৌদ্ধেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা শুধু বিফল হইয়াছে এমন নহে, পরন্তু তাহার ফল ভারতবাসীর পক্ষে মারাত্মক হইয়াছে।

স্ব স্ব কুলপ্রথা শক্তি অনুসারে স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ ও ধর্ম্মচর্চ্চার সুবিধা ভারতবাসীরা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া নির্ব্বিরোধে সম্ভোগ করিয়াছে। মোছলমান বাদসাহগণও হিন্দুর রাষ্ট্রনীতি অনুসারে চলিতেন বলিয়া তাঁহাদের রাজত্বকালের ৭ শত বৎসরও ভারতের জনসাধারণ যথেষ্ট সামাজিক ও ব্যবসাবাণিজ্যসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছেন। প্রাচীনকালে বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা আসিয়া সর্ব্বদিকে ভারতের মহোচ্চ গুণরাশি এবং ঐশ্বর্য্যই দেখিতেন, অধিক দূরের কথা কি ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরা আসিয়া দেখিয়াছেন যে ভারতের জনসাধারণ সর্ব্ববিষয়ে সংযমী পবিত্র ও সামাজিক ও ব্যবসাবাণিজ্যাদি বিষয়ে সম্যক্ স্বাধীন ছিলেন। ত্যাগশীলতা ও আত্মসংযমই তাঁহাদের বিশিষ্ট গুণ ছিল। আত্মসংযমের বিধিব্যবস্থা মহর্ষিরা যাহা করিয়া দিতেন রাজা ও প্রজাসাধারণ সকলেই অবনত মস্তকে তাহা মানিয়া চলিতেন। রাজা কর সংগ্রহ করিতেন প্রজাসংরক্ষণের জন্য—প্রজাকে শোষণ ও দমন করিয়া নিজের যথেচ্ছ ভোগবিলাসের জন্য নহে। শিল্প বাণিজ্য কৃষি সমাজ প্রভৃতির কিছুতেই রাজা হস্তক্ষেপ করিতেন না, প্রজারা সেই সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। রাজা ও ব্যবস্থাপকগণ এইমাত্র দেখিতেন, কেহ যেন অন্যের ব্যবসাবাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত না করে। ফলে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতে রাজায় প্রজায় বা প্রজায় প্রজায় বিরোধ ঘটে নাই। আজ আমরা স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠতম যুগে উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া গর্ব্ব করি অথচ শিল্প বাণিজ্যাদির কথা দূরস্থাং, স্বধর্ম্মপালন, পুত্রকন্যার বিবাহদান ও নিজের সদাচার রক্ষা পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে করিবার উপায় রহিতেছে না, এমনই আইনের বেড়াজাল আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজায় প্রজায়, এক জাতির সহিত অন্য জাতির, এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের বিরোধ ও সংঘর্ষ ক্রমেই খাণ্ডবদাহের দাবানলের মত চারিদিকে হু হু জ্বলিয়া উঠিতেছে। তাই বিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট বিনীত প্রার্থনা, একবার নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখুন এই স্বাধীনতার অর্থ কি, মূল্যই বা কতটুকু।

———

অভিভাষণ—অশিক্ষিত ও নিরক্ষর

(শ্রীযুক্তা অনুরূপাদেবী)

কিছু বলার জন্য আসিনি, এসেছিলেম নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ, আর স্নেহাস্পদ বিনয়কুমার সরকারের বক্তৃতা শোনবার ইচ্ছায়। শুনে এত খুসী হয়েছি যে তাঁর অনুরোধ ঠেলতে না পেরেই তাঁর বক্তব্য বিষয়েই দু একটি কথা বলতে বাধ্য হলুম। অবশ্য এইটুকু থেকে তাঁর উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে না তা' জানি, তবু খুসী যে হয়েছি সেটুকু তো জানানো হবে।

তিনি আজ "ডানপিটে", "ত্যাঁদোড়", "ভবঘুরে"দের সমর্থন করে বেশ অনেকগুলি সারগর্ভ কথা আমাদের শুনিয়েছেন। সেই সব লোক, যাদের বাংলাভাষায় ঐরকম অভিধান দেওয়া হয়েছে, তাদেরই জয় গান কথাটা শুনলেই অদ্ভুত মনে হয় বটে! আমারও আরম্ভে তাই মনে হয়েছিল। মনে করেছিলুম বা রে, ঐ সব লোকেদের আবার কি গুণপণা থাকতে পারে, যা নিয়ে সাহিত্য সভায় বক্তৃতা দেওয়া যায়? যখন আমরা আমাদের ঘরের ছেলেদের দস্যিপণায় উত্যক্ত হয়ে উঠি তখনই না ঐ সর্ব্বপ্রথম বিশেষণটি তাদের তিরস্কার কর্ব্বার জন্যই তাদের উপর প্রয়োগ করে থাকি। নেহাৎ অসন্তুষ্ট না হলে আর কেউ দ্বিতীয়টিকে ঘরের সম্পর্কে কাজে লাগায় না। আর 'ভবঘুরে' কথাটার অর্থ বড় বেশী বিরাগাত্মক। ইংরেজি "ভ্যাগাবণ্ড" হিসাবেই এর ব্যবহার প্রায়শঃই হয়ে থাকে। এদের আবার এমন মধুর করে ব্যবহার করা যায়, তা জানতুম না। হ্যাঁ, উদাহরণগুলি বেশ চৌচাপটে দেখান হয়েছে বটে, ওরাই যে জগতের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিকারক আবিষ্কর্ত্তা এবং অগ্রগামী তা' অস্বীকার কর্ব্বার আর উপায় রইলো না। উনি নিজেও একজন ঐ দলের ভিতরেরই লোক এবং ওঁর হিসাবের তালিকায় পড়ে অল্পবিস্তর আমাদের সকলকেই ঐ তিনদলের মধ্যের কোন না কোন দলে অথবা কম বেশী গুণত্রয়ের মধ্যের কোন দুটি বা কোন তিনটি মিশ্রগুণের মধ্যেই এসে পড়তে হয়। ছোটবেলায় আমাদের যে দলটি ছিল তাদের মধ্যে "তেঁদড়ামীর" অভিযোগ একটা শুনেছি কি না মনে নাই, তবে 'ডানপিটে'র অপবাদ যথেষ্টই শোনা গেছে।

আমি আর আমার সমবয়সী একটি বোন আমরাই এ দলের অগ্রণী ছিলাম। 'মইয়ে চড়ে কয়েৎ বেল পাড়া' কুলচুড়ি, গাছে উঠে কাঁচামিঠা আম পাড়া এমনি সব অনেক কাজ কর্ব্বে আমাদের ওই অখ্যাতি (আজকের এই বক্তৃতার হিসাবে খ্যাতিই হবে হয়ত!) রটে গেছলো। অনেক সময় বাড়ীতে এমন আক্ষেপোক্তিও শুনতে হয়েছে "এ মেয়ে দুটো দেবীচৌধুরাণীর দল গড়বে। কারণ বৌ হয়ে ঘর করা তো ওদের দ্বারা ঘটবে না, দস্যি বউ কে সহ্য করবে?" আমার পিতামহ আবার আমাদের জন্য "প্যারালাল বার" প্রভৃতি তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন, গঙ্গার জলে সাঁতার কাটারও অবধি অধিকার আমাদের ছিল। কাজেই ডানপিটেরা যে একটু অগ্রগামী হয় তা' আমি জানি। আর ভবঘুরেমি? তা সুযোগ হয়ত সবার সব সময় ঘটে না; কিন্তু মনের মধ্যে

ভবঘুরেমির আকাঙ্খা আমাদের এবংশে সবদিনই ছিল, আজও আছে। তিন পুরুষে কখন এবংশে এক জায়গায় বাস করেন নি, যতদিনের খবর বার্ত্তা পাওয়া যায়। বেশীর ভাগ এক পুরুষেই তাও চেপে বসা যাকে বলে তাও কখন ঘটেনি। আমার বাবা বলতেন "এক জায়গায় চেপে বসা ভাল নয়, ওতে মনটা সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে, সংসার যে অস্থায়ী সেটা ভুলে যেতে হয়, মমতা বর্দ্ধিত হয় না, মায়ার বৃদ্ধি হয়।"

"তেঁদ্‌ড়ামী" (অবশ্য যে "sense" এ ও কথাটা আমরা ব্যবহার করি তার কথা বল্‌ছিনে; বিনয় বাবুর বক্তৃতার অর্থে) জিনিষটিও প্রত্যেকের ভিতর অর্থাৎ যিনি যতটুকু উন্নতি করেছেন তাঁহাদের মধ্যে কম বেশী আছেই। না হলে কেউই কিছু করতে পারতেন না। এইযে "নেতি" "নেতি" করে সমস্ত জিনিষটাকে তা' আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত বিশ্লেষণ এ "তেঁদড়ামী" নইলে হবেকি করে? বহুমত এবং বহুপথ এসকলই তো ঐ তেঁদড়ামির ফল। বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য সমাজ যা কিছু আজ দেখছি এ সবই বড় বড় তেঁদড়দের তেঁদড়ামীর ফল। বিনয় বাবুর বিশ্লেষণটী আমার সেই মহান্‌ প্রার্থনা বাণীটি:ক স্মরণ করিয়ে দিচ্চে,—

"অস্‌তোমাং সদ্‌গময়ঃ তমসো মাং জ্যোতির্গময়ঃ।" একমুহূর্ত্তে তিনটে অপাংক্তেয়কে পাংক্তেয় নয়, মর্য্যাদাশালী মহাত্মায় পরিবর্ত্তন করে তুল্লেন। অসৎ থেকে সৎ, অন্ধকার থেকে আলোকের উৎপত্তি হলো!—

অনেক কথা বলবার সুবিধা নেই, সময়ও কম। মোটে পাচমিনিট করে প্রত্যেকের জন্য সময় দেওয়া আছে—আমার জন্য ওঁরা সেনিয়ম ভাঙ্গতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু আমি নেই। দুএকটি কথা সংক্ষেপে বলে যাব। উনি যে "অশিক্ষিত" কথাটা না ব্যবহার করে "নিরক্ষর" কথাটা বলতে বলছেন এইটে আমি খুবই অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করি। লেখাপড়া না জানা মেয়ে পুরুষকে যারা অশিক্ষিত মনে করেন তাঁরা দুর্ভাগ্যক্রমে ওঁদের সম্যক পরিচয় পান নি। আমি চিরদিন ধরে তা' পেয়ে এসেছি বলে আমাদের প্রাচীন তন্ত্রের মেয়েদের এত বেশী সম্মান করি যা' নাকি নিজকেও করি না। শিক্ষা বলতে যা বুঝায় অর্থাৎ হৃদয়ের প্রসার, স্বার্থহীনতা নিষ্কাম কর্ম্মসাধনা, আত্মবিলোপ এবং পরলোকে দৃঢ়বিশ্বাস প্রযুক্ততায় ইহলোকে নিষ্ঠাপূর্ণ বৈরাগ্য, পবিত্র জীবনযাপন এযে তাঁদের মধ্যে কত দেখেছি তা'বলতে পারিনে। আর জ্ঞান? নিউটন জ্ঞানসাগরের কূলে উপলখণ্ড কুড়িয়ে "যার দেখা পান নি তা সেই অশিক্ষিতা মহীয়সীদের অন্তরকে অমৃতরসসিক্ত ও মহত্তর করে দিয়েছিল। তাঁদের বল্‌তে হবে অশিক্ষিতা আর পাঁচপাতা ইউরোপীয় ইতিহাস, দশপাতা এদিক ওদিক দুপাঁচখানা বই পত্তর পড়েই নীতিধর্ম্ম ত্যাগ সংযমকে ধিক্কার দিচ্চেন যাঁরা তাঁরাই হচ্চেন শিক্ষিত! তা' মান্‌তে পারিনে।

তারপর শুধুই আমাদের উচ্চারণের জন্মসূত্রে উচ্চ ভাবধারার মহৎ অধিকারে অধিকারিণী বা অধিকারীগণই নহেন; যাঁদের আমরা চতুর্থবর্ণের (কারণ বাংলায় পঞ্চমবর্ণ নাই) লোক বলি ঐ বর্ণের সর্ব্বনিম্নে স্থান দিই, তাদের ভিতরই কি শিক্ষা কিছু কম ছিল! না ছিলনা। কথকতা, যাত্রাগান এবং পুরাণ প্রচারের দ্বারা সমস্ত দেশটাই শিক্ষিত হয়ে উঠেছিল। উঠেছিল তার প্রমাণ এখনও আগের মত না হলেও পথে ঘাটে বিস্তর পাওয়া যায়। বড় বড় জ্ঞানের কথা, যেসব কথা অতবড় পণ্ডিত ম্যাক্সমুলর ধরতে পারেননি তারা তা জানে; জানে এবং অন্তরের সঙ্গেই জানে

দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়েছি। মনে মনে লজ্জা পেয়েছি, শ্রদ্ধা করেছি, যথাসাধ্য পুরস্কৃত করতে চেষ্টা করেছি। অনেকেই জানেন আমি কোন বিষয়েই "একৃষ্টি্র মিষ্ট" নই। যাদের সঙ্গে পানাহার সমাজবিধি নয়, আমি তাদের সঙ্গে খাই না, বিবাহেও জাতিভেদ মানি। কেন মানি, সে সব কথা অনেকবারই লিখেছি, সবাই জানে। অবশ্য প্রকারভেদ থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমার পিতৃ-পিতামহকে যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন, রাঁধুনী হিসাবেই নয়, আমাদের বাড়ীতে এদের স্থান ছিল মানুষ হিসাবেই। অনাথ পরিত্যক্ত শিশু, বিধবাবিবাহের সন্তান যাদের কোথাও স্থান হয়নি সে সব আমাদের বাড়ীতে পালিতই নয়, বাড়ীর ছেলের সঙ্গে সমান স্নেহে একত্র থেকে মানুষ হয়েছে। এখনও কেউ কেউ বেশ পদস্থ হয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করছে। চাঁড়াল, বাগ্‌দী ঝি ছেলে মানুষ করেছে তাদেরও আমাদের বাড়ীর প্রথায় "দিদি" বা "পিসী" বল্‌তে হতো। আমাদের একটী সমবয়সী মেথরাণী বাড়ীর নর্দ্দমা ধুতে আস্‌তো, আমরা তাকে আমাদের চুরি করা তেঁতুলের আচারের অংশ দিতাম। চাকরদের অসুখে ছেলেরা এবং ঝিয়েদের অসুখে মেয়েরা পালা করে সেবা করতো। কমবয়সী ভাই বোনদের ঝিরা উপন্যাস পড়ার শ্রোতা ছিল। তাদের ঘরের খবর জান্‌তে আমাদের দুটো দিনও ত্বরা সইতো না। "গরীবের মত নেই ছোটলোক"—এ, শিক্ষাটাই সে বাড়ীতে হতে পায়নি। আমরা এক সঙ্গে বসে ওই সব অনাথ, আশ্রিত এবং গরীব আত্মীয়দের সঙ্গে এক রকমের আহার্য্য খেয়েছি, একজোড়ার কাপড় পরেছি। আমাদের "রক্ষণশীল" বাড়ীতে প্রকৃত সাম্যবাদকে আমরা মূর্ত্ত রূপেই দেখেছি, তার ভিতর দিয়ে মানুষ হয়েছি। তাই জানি সুখের বা ফ্যাসানের কমিউনিজম্‌ আর ভারতীয় সাম্যবাদ ঠিক এক জিনিস নয়। আজ সমাজ সংস্কারকগণ খুব হৈচৈ করেও যেটাকে তার প্রকৃত রূপ দিতে পারচেন না, সেই জিনিসটাকে আমার স্থিরমস্তিষ্ক, দূরদর্শী, ধীরবুদ্ধি পিতামহদেব বহু পূর্ব্বেই, সমাজের ঢের বেশী জটিলতার দিনে, তাঁর সংসারে প্রতিষ্ঠা দিয়াছিলেন। পিতৃদেবও তাকে বর্ণে বর্ণে পালন করে গেছেন। "দাসদাসী" বলে কোন জিনিসই যেন সে বাড়ীতে ছিলনা। দাদা, দিদি, কাকা, মাসী সে ছিল কাপড়উলী ও পাড়ার গরীব গুব্‌বো সব্বাই। ব্রাহ্মণ বৈশ্য, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান যত নিষ্ঠাবানই হোন সে বাড়ীতে একত্র বসে বসানোর ব্যবস্থায় এক ছাদের মধ্যে না থেকেও একই পংক্তিতে অথচ ভিন্ন ছাদের তলায় ভোজ খেয়েছেন। বড় বড় পদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষ থেকে বর্ম্মী, শিখ, মুসলমান ভদ্রলোক, আবার পরম পণ্ডিত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ সে বাড়ীর আতিথ্যে কখনও অপরিতৃপ্ত হন্‌ নি। তাই আমরা জানি জাতি ধর্ম্ম, সমাজ সব বজায় রেখেও মানুষের সঙ্গে মানুষ হয়ে মেশা যায়, তাই আমরা সুযোগ পেয়েছি। সাক্ষর এবং নিরক্ষরের মধ্যে অনেকস্থলে জ্ঞানে গরীয়ান্‌ নিরক্ষরেরাই গড়পড়তায় হয়ত খুবই কম হবে না। আমি এক-বার ঘোড়ার গাড়ীতে একটি বেহালার বাক্স ফেলে আসি। কল্‌কাতা থেকে ভবানীপুরে ফের ফিরে গিয়ে লোকটি আমাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করে বল্লে "এইকরে লোককে তোমরা চোর তৈরি করো। যদি অন্য ভাড়াটে উঠ্‌তো আর নিয়ে যে'ত, চিরকাল ধরে তোমরা বলতে,' একটা চোরের গাড়ীতে উঠে এই হলো"! আমার পিতৃদেব একবার একজনকে ঘোড়া ধরতে বলে দেব দর্শনে যান। ফিরে এসে তাকে বখ্‌শিস দিতে গেলে সে চোখ পাকিয়ে জবাব দেয়, "তুমিও হিন্দু, আমিও হিন্দু। ঠাকুর দেখ্‌তে যেতে পারছ্‌না দেখে কর্ত্তব্য ভেবে তোমার ঘোড়া ধরেছি, তার জন্য আবার পয়সা

কি দেখাচ্ছো ? তোমরা ভাব গরীব হলেই ছোটলোক হয়, না ? এই তিরস্কার চিরদিন তাঁর স্মরণে ছিল।"ছোটলোক" শব্দটা তিনি গরীবদের সম্পর্কে কখনও ব্যবহার করতে দিতেন না। এবার রাঁচি হাজারী বাগের জঙ্গলে কোল-সাঁওতালদের গৃহসংস্কার (যেটাকে আমি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের প্রধান এবং প্রথম কথা) করতে গিয়ে দেখে বিস্ময় মেনেছি যে তাদের ঘরকন্না আমাদের ভদ্রলোকদের চাইতেইও অনেক বেশী পরিচ্ছন্ন। তাদের ধর্ম্মজ্ঞানও যথেষ্ট প্রবল। উপাস্যকে সগুণ-ব্রহ্মও বলা চলে।

পূজ্যপাদ পিতামহদেবের "সামাজিক প্রবন্ধ" হতে একটী গল্প বল্‌বো,—"একজন বহুদর্শী ইংরাজের সহিত এই বিষয়ে আমার কথোপকথন হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "যদি ছোটলোক হইয়া জন্মিতে হয় তবে ভারতবর্ষের ছোটলোক হইয়া জন্মান ভাল, অপর সকলদেশের ছোটলোকরা পশুভাবাপন্ন, তাহাদের তুলনায় ইহারা দিব্য ভাবাপন্ন।—

..."কিন্তু ভারতবর্ষীয়দের সুখ কৈ ?" ..."সত্যই জগতে সুখের পরিমাণ অধিক নয়—আর মানুষের সুখ বাহ্য বিষয় লইয়া অধিক, না আন্তরিক ভাবের অবস্থা লইয়া অধিক ? ঐ আড়ি-খানায় আড়ি লইয়া যাহারা গোলমাল করিতেছে তুমি কি তাহাদিগকে বিশেষ সুখভাগী মনে কর ? কিন্তু উহারাও ইউরোপীয় ছোটলোকদিগের অপেক্ষা অল্প দুর্বৃত্ত, সুতরাং অল্প দুঃখভাগী।" কোন সমাজের মূল প্রকৃতি বিরূপ তাহা সেই সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট কতগুলি লোককে ভাল করিয়া দেখাইলেই একপ্রকার মোটামুটি বুঝা যায়। সমাজের মূল প্রকৃতি এমনই প্রবল বস্তু যে উহা বহির্ভাগেও প্রকট হইয়া উঠে, কিন্তু উহা ভিতরেই গাঢ়তররূপে দৃষ্ট হয়। হিন্দু সমাজের মূল প্রকৃতি যে অন্তঃশাসন এবং শান্তি তাহা হিন্দুদিগের ভূতপূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান অবস্থাতে যেমন দেখা যায়, ঐ সমাজের নিয়ামক শাস্ত্রসমূহের মূল বিচার-প্রণালীতে তাহা স্পষ্টতর হইয়া থাকে।"

আমার মনে হয় তিনি সেদিনে যে নিরক্ষর সম্প্রদায়কে দেখেছিলেন, আজ তাদের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে এসেছে,—এর প্রধান কারণ সেই শান্তিপ্রিয় কৃষি এবং কুটিরশিল্পসেবী পরিবারিক জীবনের আনন্দে ও পবিত্রতায় গৌরবান্বিত জনগন আজ কলের কুলির দারুণ দুর্দ্দশায় এবং উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ জীবনে নিপতিত। সেখানে ইউরোপীয় অভদ্র সমাজের রূপ ফুটে উঠ্‌ছে। তবুও বল্‌বো এর বাইরে আজও অনেক সুখী এবং সুসভ্য নিরক্ষর বাস কর্‌ছে, যাদের উচ্চ নীতি ধর্ম্মজ্ঞান এবং ত্যাগ সুসভ্যদেরও অনুকরনীয়।

বল্‌তে গেলে অনেক কথাই মনে আসে। এসকল আলোচনায় নীরব থাকার দিন চলেও গেছে। হিন্দু সমাজ নীরব থেকেই চারকাল লাথি ঝাঁটা খেতে অভ্যস্ত হয়েছে;—আজও হচ্ছে;—কথা কওয়া তার স্বভাব নয়, কতকটা আলস্য আর কতকটা ধৃষ্টতায় উপেক্ষা করার অভ্যাস। কিন্তু সেটা এক্ষণে "ভূয-ধাতোরুকারস্য দোষ সম্পত্তয়েগুর্ণঃ" হয়ে গেছে। মোদ্দা প্রাচীন তন্ত্রের অনেক কিছুরই মত তার লোকশিক্ষার ব্যবস্থাটা খুবই ভাল ছিল, যার গুণে নিরক্ষর জনসাধারণ এদেশে অশিক্ষিত পদবাচ্য ছিল না। আজও তার যথেষ্ট প্রমাণ পথেঘাটে পেয়ে থাকি, অবশ্য নিত্যই কমে যাচ্ছে। (তবু ভদ্র সমাজের তুলনায় বেশী কমেনি। তারা আত্মীয়কে অন্ন দেয়, না খেয়েও দেয়, চুরি হয়ত পেটের দায়েই করে, জুয়াচুরি করে না।)

আর একটা কথা বল্‌বো। প্রাচীনের উপর যার শ্রদ্ধা আছে সেই হয় নবীনের পরম শত্রু এই মনোভাবটী ভাল নয়। যেহেতু নবীনের জন্ম প্রাচীনের কোলেই হয়ে থাকে। মা তার ছেলেদের শিক্ষা দিতে পারে, শাসন করতে পারে, কিন্তু ছেড়ে দিতে পারে না। (তালতলা সাহিত্য সম্মিলনে কথিত—লেখিকা কর্ত্তৃক প্রেরিত)।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপনির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রণালী –যাহা ভারতের সাধনা'র এক বিশেষ লক্ষ্য—তাহা সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচনা-সাপেক্ষ।]

পাঞ্চরাত্র মত ও শঙ্করাচার্য্য

খণ্ডন মণ্ডনের প্রতিবাদের প্রতিবাদ।

(১)

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

শ্রীযুক্ত নৃসিংহদাস বসু মহাশয় "ভারতের সাধনায়" আমার লিখিত "পাঞ্চরাত্রমত ও শঙ্করাচার্য্য" নামক প্রবন্ধের একটী প্রতিবাদ করিয়াছেন, ভারতের সাধনার সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে এই প্রবন্ধে তাহারই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

আমার উক্ত প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে বলিবার আবশ্যকতা হয় যে, বর্ত্তমানে লভ্য ১১।১২ খানি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের মধ্যে কোন্ ভাষ্যটী সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রায়ানুসারী। তদনুসারে আমি নিম্বার্কভাষ্যকেও ব্যাসাভিপ্রায়ানুসারী নয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। আর সেই কথা বলিতে গিয়া ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাবসময় সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম যে, "ইহার আবির্ভাবকাল মধ্বাচার্য্যের কিছু পরে—এইরূপ অনেকে মনে করেন।"

আমার এই কথাটীকে ভিত্তি করিয়া শ্রীযুক্ত নৃসিংহদাস বসু মহোদয় আমার ভুল দেখাইবার জন্য তাঁহার "খণ্ডনমণ্ডনপ্রতিবাদ" নামক প্রবন্ধে আমাকে কখন বা "কোন বিষয় বিশেষ চিন্তা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন" কখন বা "পণ্ডিতপ্রবর বলিয়া উপহাস করিয়াছেন" কখন বা "অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন" এবং পরিশেষে "ভিত্তিহীন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা কতদূর সঙ্গত তাহাও সুধীগণ বিচার করিবেন" বলিয়া আমাকে তিরস্কার করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবুর এই চেষ্টার জন্য আমি তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি যখন দয়া করিয়া আমার ভুল দেখাইবার জন্য এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, এবং উক্ত প্রকারে নিন্দাবাদ করিয়া আমার কতকটা পাপক্ষয় করিয়া দিয়াছেন, তখন তিনি আমার প্রকৃত

সুহৃদের কর্ম্মই করিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞও রহিলাম। তবে তিনি যেখানে অসঙ্গত কথা বলিতেছেন বলিয়া আমার মনে হইল, তাহারই কথা এস্থলে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

প্রথম কথা—আমার উক্ত প্রবন্ধে আমি ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্যের সময়সম্বন্ধে আমার কোন মত প্রকাশ না করিয়া "অনেকে অনুমান করেন" বলিয়া তাঁহার আবির্ভাবকালের একটা উল্লেখমাত্র করিয়াছি। বরং এ সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা হইয়াছে, তাহা আমি আমার অদ্বৈত-সিদ্ধির ভূমিকায় ২২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি, আর তাহাও শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবু দেখিয়াছেন—ইহা তিনি তাঁহার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। আমি তথায় লিখিয়াছি "শ্রীমন্নিম্বাকাচার্য্যের সময় রামানুজা-চার্য্যের সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয়।" রামানুজাচার্য্যের সময় বলিয়াছি "১০১৭ হইতে ১১৩৭ খৃষ্টাব্দ" (২১ পৃষ্ঠা)। এবং মধ্বাচার্য্যের সময় "১১৯৯ হইতে ১৩১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে" (২৭ পৃষ্ঠা)। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি কি করিয়া বলিলেন যে, "অতএব রাজেন্দ্র বাবু অনুমান করেন যে, শ্রীনিম্বার্কা-চার্য্যের অভ্যুদয়ের কাল চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে নয়"—ইত্যাদি। যদি কেহ কোন কথা তাহার নিজের মত বলিয়া বলে, আর সেই বিষয়ে "অপরের মত এই" বলিয়া অবার অন্য কিছু বলে, তাহা হইলে অপরের মতটী কি করিয়া যে তাহার নিজের মত হয়, তাহা বুঝিতে পারিলাম না !!!

তাহার পর আমি ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্যকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে নয়—"এই অনুমানের উপরই নির্ভর করিয়া ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্য সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছি"—ইহাই বা শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবু কেন বলিলেন তাহাও আমি বুঝিতে পারিলাম না। কারণ, অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকায় ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্যকে আমি ফলতঃ শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের কিছু পূর্ব্বে বলিয়াই যে নির্দ্দেশ করিয়াছি, তদনুসারেও ব্রহ্মসূত্রার্থবিষয়ে ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্য সম্বন্ধে আমার যে ধারণা, তাহাও অসঙ্গত হয় না। যাহাই হউক, নানাকারণে আমার ধারণা হইয়াছে যে, ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্য শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের কিছু পূর্ব্বেই হউন, অথবা সমসাময়িকই হউন, তাঁহার কৃত সূত্রার্থ সূত্রকারের সম্মত নহে বস্তুতঃ ইহাই আমার আলোচ্য প্রবন্ধের বক্তব্য ছিল। এক্ষেত্রে অপরের মতটাকে আমার মত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবু, আমাকে লক্ষ্য যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি আমার প্রতি যে সুবিচার করিবার ইচ্ছা করেন নাই, তাহাতেও কোন সন্দেহই হয় না, এবং এক্ষেত্রে তিনি আমার উক্তি যথাযথভাবে প্রকাশই করেন নাই। অধিক কি 'সত্য কি' তাহা নির্ণয় করিবার মনোভাবপ্রকাশও যে তিনি করেন নাই, তাহাতেও সন্দেহ হয় না।

বস্তুতঃ ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্যের সময় সম্বন্ধে আমি এখনও সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারি নাই, এবং শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবু যাহা বলিয়াছেন, অথবা নিম্বার্কসম্প্রদায় এ বিষয়ে যাহা বলিতেছেন, তাহাতেও কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই ; এজন্য "অনেকের মত" বলিয়াই আমায় প্রবন্ধে আমার বক্তব্যবিষয়ের প্রতি আমি মনোনিবেশ করিয়াছিল মাত্র। এখন যখন এ বিষয় এতাদৃশ আলোচনা হইতেছে, তখন সেই অপরের মতের দুই একটী চিন্তনীয় বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি, সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন—

প্রথম পদ্মপুরাণের কয়েকটী শ্লোকে চতুরাচার্য্যের যে ক্রম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা অনেকে সত্য বলিয়া মনে করেন, সুতরাং সেটীও একটী ভাবিবার বিষয়। সেই শ্লোকগুলি এই—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

এই ক্রমে বলা হইল—শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের পর শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য, তৎপরে শ্রীবিষ্ণুস্বামী তৎপরে শ্রীমন্ নিম্বাদিত্য। এস্থলে শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের পর যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। আর শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী সম্বন্ধে নানা মতভেদ থাকিলেও তিনি যে শ্রীমন্মধ্বের পর, তাহা প্রায় সকলেরই মত। এখন এই তিন আচার্য্যের ক্রম ঠিক্ থাকায় অনেকে মনে করেন—শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য্য সর্ব্বশেষে আবির্ভূত। অবশ্য ইহারও যে অন্যথা ব্যাখ্যা করা যায় না, তাহা নহে। যাউক, সে সব কথা আর তুলিব না, কেবল অপর মতের একটী মূলপ্রদর্শনই এস্থলে আমার উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় কথা,—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ২১খানি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বা বৃত্তি দেখিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার জীবনচরিতে দেখা যায়। অথচ রামানুজভাষ্য বা বেদার্থসারসংগ্রহে যে সব প্রাচীন আচার্য্যের ভাষ্যাদির নাম আছে, তাহাদের সকলের নাম তিনি করিতেছেন না। ইহাতে মনে হয়—তাঁহার সময় বহু প্রাচীন ভাষ্য লুপ্ত হইয়াছিল বা তিনি তাহাদের সন্ধান পান নাই। পক্ষান্তরে আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের সময়ের মধ্যে যে সব নূতন ভাষ্যাদি হইয়াছে, তাহাদের অনেকের নাম আছে। এস্থলে কি শঙ্করাচার্য্য, কি রামানুজাচার্য্য, কি মধ্বাচার্য্য—কেহই নিম্বার্কভাষ্যের নাম করিতেছেন না। অথচ নিম্বার্কভাষ্যটী রামানুজ বা মধ্বভাষ্যের ন্যায় অদ্বৈতবিরোধী বৈষ্ণবমতের ভাষ্য। এই জন্য অনেকে অনুমান করেন—নিম্বার্কভাষ্য মাধ্বভাষ্যেরও পরবর্ত্তী।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যে ২১খানি ভাষ্যের নাম করিয়াছেন তাহা এই—

১। ভারতীবিজয় ২। সচ্চিদানন্দ, ৩। ব্রহ্মঘোষ, ৪। শতানন্দ, ৫। উদ্বর্ত্ত, ৬। বিজয়, ৭। রুদ্রভট্ট, ৮। বামন, ৯। যাদবপ্রকাশ ১০। রামানুজ, ১১। ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চ, ১২। দ্রবিড়, ১৩। ব্রহ্মদত্ত, ১৪। ভাস্কর, ১৫। পিশাচ, ১৬। বৃত্তিকার, ১৭। বিজয়ভট্ট, ১৮। বিষ্ণুক্রান্ত, ১৯। বাদীন্দ্র, ২০। মাধবদাস ২১। শঙ্কর।

আমার মনে হয়—এই বিষয়টী ভাবিবার যোগ্য। যাহাহউক যাঁহারা ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্যকে শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের পরবর্ত্তী ভাবেন, তাঁহাদের বহু যুক্তির মধ্যে এই দুইটী বিশেষ বিবেচনা-যোগ্য যুক্তি। সুধীবর্গ এই বিষয়টী বিবেচনা করেন বলিয়া আমি আমার উক্ত প্রবন্ধে অনেকের মত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি মাত্র। আমার ধারণার কথা আমি অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকায় বলিয়াছি। দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবু সে কথাটী কোথাও উদ্ধৃত করিতেছেন না।

তৃতীয় কথা—কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব সুবিখ্যাত ব্যবহারজীবী বর্ত্তমানে পরমপূজ্যপাদ ব্রজবিদেহী মহন্ত শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাসবাবাজী মহারাজপ্রণীত দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবু যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে এইবার আলোচ্য।

ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা তাঁহাদের নির্দ্ধারিত সময়সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ

হইতে পারিলাম না। শ্রদ্ধাস্পদ বাবাজী মহারাজ যে যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়া অপরকে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে বলিয়াছেন, তাহাতে বহু সন্দেহের অবসর আছে, সুতরাং আমরা তাঁহার নির্দ্ধারিত সময়সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইতে অসমর্থ। কেন অসমর্থ, তাহার কতিপয় কারণ এই—

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সন্তদাস বাবাজীমহারাজ বলিতেছেন—

উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণে।
নিম্বার্কভগবানেষাং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ॥

এই ভবিষ্যপুরাণের "শ্লোকে ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে "ভগবান্" বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনাপাঠে ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্য যে প্রাচীন সিদ্ধঋষি ছিলেন, তদ্‌বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না," ইত্যাদি। অতঃপর এই শ্লোকের অপ্রামাণিকতা সম্বন্ধে কতিপয় আপত্তিনিরসনপূর্ব্বক বলিতেছেন—"আমাদের সম্প্রদায়ে এইরূপ কিম্বদন্তীও পরম্পরারূপে চলিয়া আসিতেছে যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য জন্মেজয়ের রাজত্বকালে প্রকটিত হইয়াছিলেন।" ইত্যাদি।

কিন্তু এই ভবিষ্যপুরাণের প্রামাণ্যটী বিরোধী-ঐতিহাসিক অংশে স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ, ইহাতে আকবর বাদশাহ, এমন কি মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রভৃতির কথা পর্য্যন্ত আছে। অতএব ভবিষ্যপুরাণের ধর্ম্মকথা কিংবা অবিরোধী-ঐতিহাসিক কথায় আস্থাস্থাপনে প্রবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু অন্যপ্রমাণের বিরুদ্ধ ঐতিহাসিক কথায় তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না, এবং বোধ হয় কোনও ঐতিহাসিকই তাহা করেন না। বস্তুতঃ মুদ্রিত ভবিষ্যপুরাণেও ঐ বচনটী এখনও আমরা পাই নাই। তথাপি মনে হয়, হয় ত উহা ভবিষ্যতের শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য্যের কথাও হইতে পারে, অথবা ভাষ্যকার নিম্বার্কাচার্য্য ভিন্ন অপর কোন নিম্বার্কাচার্য্যের কথাও হইতে পারে। কারণ, যদি অন্য প্রমাণে ইহার বিরুদ্ধ কথা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এরূপ কল্পনা ভিন্ন ভবিষ্যপুরাণের কোনরূপ প্রামাণ্য, এ বিষয়ে, আর রক্ষা করিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে অন্য যে সব বিরুদ্ধ প্রমাণ আছে, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। এই জন্য বলিতে বাধ্য হইলাম—পূজনীয় সন্তদাস বাবাজী মহারাজ যে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতেছেন ও হইতে বলিতেছেন, আমরা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না। বস্তুতঃ শ্রীমন্ নিম্বার্কস্বামীকে ভবিষ্যপুরাণে ভগবান্ বলায় কি করিয়া তিনি যে "প্রাচীন সিদ্ধঋষি" বলিয়া প্রমাণিত হন, তাহাও বুঝা কঠিন। কেন, তিনি কি ভগবদবতার হইতে পারেন না?

তাহার পর পূজনীয় বাবাজী মহাশয় বলিয়াছেন—"তিনি অর্থাৎ শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য্য অরুণ নামক ঋষির পুত্র, সুতরাং আরুণি নামেও শাস্ত্র গ্রন্থে কোন কোন স্থলে বর্ণিত হইয়াছেন। নারদভক্তিসূত্রে এই আরুণি ঋষিকে ভক্তিমার্গের প্রসিদ্ধ আচার্য্যশ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছে।" ইত্যাদি। এতদ্দ্বারাও তিনি বলিতে চাহেন—শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য্য প্রাচীন ঋষি, আর তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহাতেও আমরা নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিলাম না। কারণ, ঋষি আরুণিই যে শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য্য আরুণি, সে বিষয়ে প্রমাণ আবশ্যক আছে। যেহেতু আরুণি নামে একাধিক ব্যক্তি পুরাণাদিতে দেখা যায়।

যদি বলা হয়—শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য্য যে দুইজন হইতে পারেন, সেরূপ কল্পনা করিবার কারণ কি? তাহাহইলে বলিব, প্রথম কারণ—নিম্বার্কাসম্প্রদায়ের কিম্বদন্তী যে, তিনি জন্মেজয়

রাজার সমসাময়িক ছিলেন, আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাঁহার ভাষ্যমধ্যে এমন কোন কোন কথা আছে, যাহাতে মনে হয়—তিনি শঙ্করাচার্য্যেরও পরবর্ত্তী। শঙ্করাচার্য্যের নাম বা তাঁহার বাক্য ভাষ্যমধ্যে উদ্ধৃত না হইলেও বিচারভঙ্গী দেখিয়া সেইরূপই সন্দেহ হয়। যথা—নিম্বার্কভাষ্য ১।১।৪ সূত্রে দেখা যায়, বলা হইতেছে—

"তস্য তু বিবিদিষোৎপাদনেনৈব নৈরাকাঙ্ক্ষ্যাৎ ক্রত্বঙ্গং ব্রহ্ম ইতি তু বালভাষিতম্" অতঃপর "শব্দাঽবিষয়ং ব্রহ্ম ইতি বাক্যস্য বাচ্যং ব্রহ্মাভিপ্রেতং নবা……ইতি উপনিষদাং সিদ্ধান্তঃ।" ইত্যাদি।

এই বাক্যদ্বয় দেখিলে মনে হয়, গৌড়পাদ, কুমারিল, ভর্ত্তৃহরি, মণ্ডনমিশ্র ও শঙ্করাচার্য্যের সময়, পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তদর্শনের মধ্যে যখন ঘোর মল্লযুদ্ধ চলিতেছে, ইহা তখনকার কথা। যেহেতু শবর, বাৎস্যায়ন, ব্যাস, পতঞ্জলি প্রভৃতি প্রাচীনভাষ্যে এ ভাবের কথাবার্ত্তা নাই। "এতদ্ভিন্ন "বলিভাষিতম্" পদটী এস্থলে এতদর্থে একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। আর "ঔপনিষদ" পদটী একদেশী বেদান্তী ভর্ত্তৃহরি, এবং গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ে একটু বিশেষভাবে এই সময় প্রযুক্ত হইয়াছে—ইহা অভিজ্ঞগণ অবগত আছেন। এই জন্য মনে হয়—নিম্বার্কভাষ্য ইহাদের পরবর্ত্তী। অবশ্য এতদ্দ্বারা নিশ্চয়তাসহকারে ইহা বলা যায় না বটে, কিন্তু ইহাতে যে একটা সম্ভাবনা সূচিত করে, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন।

তার পর ওরূপ কল্পনা করিবার দ্বিতীয় কারণ এই যে, বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়, বেদান্ত, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনের কোন আচার্য্যই কেন ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্যের নামগন্ধ করিলেন না? শঙ্কর ভাস্কর যাদবপ্রকাশ শ্রীকণ্ঠ নীলকণ্ঠ মধ্ব বাচস্পতি উদয়ন গঙ্গেশ প্রভৃতি কেহই তাঁহার কোন উল্লেখ করিলেন না কেন? শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য ২১খানি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বা বৃত্তির নাম করিলেন, তিনিও কেন নিম্বার্কভাষ্যের উল্লেখ করিলেন না? শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য্যের দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন যদি এতই বড় হয়, তবে ইহাঁদের কেহই কি কোন সংবাদ দিলেন না! মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহেও কেন ইহা গ্রহণ করিলেন না! তিনি কত সাধারণের অপরিচিত মতের উল্লেখ করিলেন, আর নিম্বার্কদর্শনের নাম করিতে তিনি ভুলিয়া গেলেন! এই মতে যদি সাধারণের অজ্ঞাত বহু বড় বড় লোকের আবির্ভাব হইয়া গিয়া থাকে, তবে এই সব মনীষীবর্গও তাঁহাদিগের কোন কথাই বলিলেন না কেন? সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহজাতীয় আরো কয়েকখানি গ্রন্থ আছে, উহাদের মধ্যে কেহ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ হইতে প্রাচীন, কেহ বা অর্ব্বাচীন। আচ্ছা, তাঁহারাও কেন এত বড় মহনীয় সম্প্রদায়ের নামগন্ধ করিলেন না? ভাস্কর যাদবপ্রকাশের নামও এইসব গ্রন্থে করা হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাদের সম্প্রদায়ও নাই। তথাপি ভাস্করের মতখণ্ডন, রামানুজ ও বাচস্পতির গ্রন্থে আছে। যাদবের মতখণ্ডন রামানুজীয় গ্রন্থে আছে। এই ভাস্কর যদি নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্তই হন, তবে মূলপুরুষ নিম্বার্ক ভগবানের উল্লেখ না করিয়া ভাস্করের উল্লেখই বা করেন কেন? বস্তুতঃ এই সব বিষয় চিন্তা করিলে আমাদের উক্ত সন্দেহ আরও সুদৃঢ় হইয়া উঠে। তিনি যে শঙ্করাচার্য্যের পরে—এইটাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

আর এক কথা—বৌদ্ধ ও জৈনগণ যখন ভারতে প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল, যখন শবর বাৎস্যায়ন উদ্দ্যোতকর ঈশ্বরকৃষ্ণ যোগভাষ্যকার ব্যাস প্রভৃতি গৌরবন্যায় ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তখন যদি এই সম্প্রদায় ছিল, তাহা হইলে তাঁহারা উক্ত বন্যানিবারণে একটী অঙ্গুলি

উত্তোলনও করিলেন না কেন? জন্মেজয়ের সময়ের নিম্বার্কভাষ্যের টীকাটীপ্পনী প্রভৃতি করিয়া অবৈদিক ধর্ম্মান্তর গতিরোধ করিলেন না কেন? নিম্বার্কভগবানের শিষ্য শ্রীনিবাসভগবানের টীকা কেন সে গতির বাধা উৎপাদন করিল না? তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যের কোন গ্রন্থ কি নাগার্জ্জুন দিঙ্‌নাগ ও ধর্ম্মকীর্ত্তির দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণের উত্তর আছে? বা কোন বিচারযুদ্ধের প্রবাদ আছে? শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবু এইপথে যদি একটু আলোক প্রদান করেন, তবে আমাদের অনেক উপকার হয়। আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না, কেন "বঙ্গদেশে শ্রীভগবান্ নিম্বার্ক সম্বন্ধে অধিকাংশ লোক অনভিজ্ঞ"; কেন "নিম্বার্কাচার্য্যের মত কি, তাহা ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক—এমন কি শিক্ষিত লোক পর্য্যন্তও অবগত নহেন। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ঋষি ছিলেন এবং ঋষিসম্প্রদায়ে প্রচারের ভাব তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা উপর্যুক্ত শিষ্য ব্যতীত অপরকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিতেন না।"— ইত্যাদি। যদি ভগবান্ নিম্বার্কের কথা ভগবান্ ব্যাসদেবের মতই হয়; যদি ব্রহ্মসূত্ররচনা ঔপনিষদ মতপ্রচারার্থ হয়, যদি তন্মতপ্রচারার্থ ভাগবতাদি পুরাণের সৃষ্টি হয়, তবে সেই ব্রহ্মসূত্রের প্রচার আজ যেমন করা হইতেছে, পূর্ব্বে কেন তদ্রূপ বা তদতোধিক প্রচার করা হয় নাই? নিম্বার্ক ভগবানের শিষ্যসম্প্রদায় ত ব্যাসের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছেন। এই সব চিন্তা করিয়া আমাদের উক্ত সন্দেহ আরও দৃঢ় হইয়াছে। এই জন্যও মনে হয়—সাম্প্রদায়িক কিম্বদন্তী অনুসারে ভগবান নিম্বার্কাচার্য্য জন্মেজয়ের সমসাময়িক হইলে, অথবা ভবিষ্যপুরাণের উক্ত প্রমাণটী অভ্রান্ত হইলে দুইজন নিম্বার্কাচার্য্য হইয়া গিয়াছেন। একজন জন্মেজয়ের সমসাময়িক আর একজন শঙ্করাচার্য্যের পরে। অর্থাৎ রামানুজাচার্য্য বা মধ্বাচার্য্যের কিছু পূর্ব্বে বা কিছু পরে বা তাঁহাদের সমসাময়িক। আর নিম্বার্ক সম্প্রদায় যদি শঙ্কর রামানুজ ও মধ্ব প্রভৃতি অন্য সম্প্রদায়ের মত প্রবল ও উপযোগী হইত, তাহা হইলে ভারতের শিক্ষিতসমাজ তন্মতবিষয়ে অনভিজ্ঞও থাকিতেন না।

আর দুইজন হওয়া অসম্ভবও নহে; কারণ, শঙ্করাচার্য্য দুইজন বা তিনজন দেখা গিয়াছে। অধিক কি, তাঁহার গদিতে যাহারা বসেন, তাঁহাদের উপাধিই শঙ্করাচার্য্য হইয়া গিয়াছে। রামানুজাচার্য্যও দুইজন হইয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য ও নীলকণ্ঠাচার্য্যও একাধিক হইয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতগণের মধ্যেও এই ব্যাপার আছে। বাচস্পতিমিশ্রও দুইজন প্রমাণিত হইয়াছেন। প্রভাকরও দুইজন ছিলেন। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। অতএব দুইজন নিম্বার্ক কল্পনা অস্বাভাবিক কল্পনা হইতে পারে না।

আচার্য্যগণের আবির্ভাবকাল ও আমাদের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা, আমার ক্ষুদ্রসামর্থ্যে যতটুকু করিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে আমার মনে হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র সমরের পর, যেমন যাদবগণের মধ্যে কুরুক্ষেত্র সমরে কে বড় যুদ্ধ করিয়াছে বলিয়া বিবাদ হয়, আর তাহার ফলে যদুবংশের ধ্বংস হয়, তদ্রূপ কুমারিলকর্ত্তৃক বৌদ্ধবিজয়ের পর, শঙ্কর প্রভৃতি বৌদ্ধপক্ষ পরাজিত করিলে যখন বেদোক্ত ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন একটী গৃহবিবাদের আরম্ভ হয়। আর তাহারই ফলে ভাস্কর রামানুজ শ্রীকণ্ঠ মধ্ব প্রভৃতি মতবাদের আবির্ভাব হয়। আমরা ভাবিয়াছি—শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব না হইলে অর্থাৎ তিনি বেদান্তমত প্রতিষ্ঠিত না করিলে ভাস্করাদি কোন আচার্য্যেরই আবির্ভাব হইত না। ইহা যেন কৃতি পিতার অন্তর্ধানে তাহার পুত্রগণের মধ্যে সম্পত্তিবিভাগ লইয়া কলহবিশেষ। ইহারা যে কেবল শঙ্করমতই খণ্ডন করিয়া ক্ষান্ত হইলেন, তাহা নহে, পরন্তু পরস্পরে সম্প্রদায়ক্রমে পরস্পরের মতও খণ্ডন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ এইরূপে বেদান্তরাজ্যের ধ্বংসসাধনেই ইহারা

প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্যও এই সময়ের লোক। ইনিও সম্ভবতঃ সেই গৃহবিবাদের একটী পক্ষের নেতা। তবে তাঁহার পক্ষ তত প্রবল ছিল না বলিয়া তাঁহার সম্প্রদায় তত খ্যাতিলাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার সম্প্রদায়, অপেক্ষাকৃত সাধনভজননিরত ছিলেন বলিয়া কয়েক জন আচার্য্য ভিন্ন কেহই এদিকে মনোযোগও তত প্রদান করেন নাই—বোধ হয়। আর এই সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়গত বিশেষত্ব ত্যাগ করিয়া আজ যে সেই সম্প্রদায়ের এতাদৃশ প্রচারের চেষ্টা হইতেছে, অন্য কথায়, আজ যে নিম্বার্ক ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করিয়া স্বমতস্থাপন ও স্বমতপরিচয়প্রদান অপেক্ষা শঙ্করমতখণ্ডনে অত্যধিক আগ্রহ প্রকাশ করা হইতেছে,—স্থাপন অপেক্ষা খণ্ডনে অংশ বোধ হয় চতুর্গুণ বর্দ্ধিত আকারে পুস্তকে স্থান পাইয়াছে, তাহা বোধ হয়—সময়ের গুণ ভিন্ন আর কিছু নয়। যাহা হউক ইঁহাদের চেষ্টায় যদি এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের জীবনচরিত প্রভৃতি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজের প্রভূত উপকার হইবে। দার্শনিক রাজ্যে আর যে কোন নূতন সম্পদ উপলব্ধ হইবে, সে আশা আর বড় করিতে পারা যায় না—মনে হয়। ফলতঃ নিম্বার্ক ভগবান্ যে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে, তাহা কোন মতেই বুঝিতে পারা যায় না।

যাহা হউক, ভবিষ্যপুরাণের শ্লোকটীকে ভিত্তি করিয়া পূজনীয় বাবাজী মহারাজ, ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্যের সিদ্ধঋষিত্ব ও জন্মেজয়রাজ-সমকালীনত্বস্থাপনার্থ যাহা বলিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে আমাদের যাহা বলিবার আছে, তাহার কিছু কিছু বলিলাম, এইবার উক্ত ভবিষ্যপুরাণের শ্লোকের প্রক্ষিপ্ততাসম্ভাবনাবারণার্থ তিনি যাহা বলিয়াছেন তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

বাবাজী মহারাজ বলিতেছেন—"এই শ্লোকটীকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন না। কারণ, ইহা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে অসাম্প্রদায়িক কাশীবাসী পণ্ডিতরচিত সুবিখ্যাত—"নির্ণয়সিন্ধু" নামক স্মৃতিগ্রন্থে জন্মাষ্টমীব্রতবিচারে উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং আরও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত "হেমাদ্রি" নামক গ্রন্থেও ভবিষ্যপুরাণের এই শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। (খ্যাতনামা পণ্ডিতপ্রবর ভরতচন্দ্র শিরোমণি সঙ্কলিত হেমাদ্রি নামক গ্রন্থ যাহা এসিয়াটিক সোসায়িটী কর্ত্তৃক ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার দ্বিতীয় খণ্ডের ৭৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)" ইত্যাদি।

এতৎপ্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, সংস্কৃত কলেজের উক্ত হেমাদ্রি গ্রন্থে ঐ শ্লোকটী আমরা বহু অন্বেষণ করিয়াও পাই নাই। তবে নির্ণয়সিন্ধুতে উহা ভবিষ্যপুরাণের বচন বলিয়া উদ্ধৃত ও খণ্ডিত হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাইলাম। ইহা হইতে প্রথমেই মনে হইল, শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবু যে লিখিলেন, যে, "নির্ণয়সিন্ধু নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থপাঠেও অবগত হওয়া যায় যে, শ্রীনিম্বার্ক স্বামী প্রবর্ত্তিত ব্রত উপবাস বিধি শিবাজী মহারাজের সময়ও সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে দক্ষিণ ভারতে গৃহীত হইত। এই সম্মান অপর কোনও বেদান্ত আচার্য্য পাইয়াছেন বলিয়া দেখা যায় না" ইত্যাদি—ইহা কি করিয়া সঙ্গত হয়? কারণ, নির্ণয়সিন্ধুতে এই মতটী খণ্ডিতই হইয়াছে। আর খণ্ডন দেখিয়া মনে হইল—অপর আচার্য্য হইতে ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্যকে শ্রেষ্ঠ বলিবার জন্য শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবুর যে প্রয়াস, তাহা তাহার আগ্রহমাত্র। তবে তাঁহার এই আগ্রহ গুরুভক্তির দিক্ দিয়া প্রশংসনীয় বটে। (আগামী বারে সমাপ্য)

———

মাস-পঞ্জি—পৌষ, ১৩৪০

অর্থ—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল ধীরে ধীরে এসেম্ব্লী সভায় অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, লণ্ডন সহরে ইহার একটী শাখা স্থাপিত হইবে - এই একটী নূতন সর্ত্ত গভর্ণমেণ্টের আপত্তি সত্ত্বেও পাশ হইয়াছে (৯-১২-৩৩), এইরূপ হওয়াতে ভারতীয় ব্যাঙ্কের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বাড়িবে আর ইহাকে লণ্ডন ব্যাঙ্কের আতোয়াতে পড়িয়া থাকিতে হইবে না। পরে (২০-১২-৩৩) ব্যবস্থাপক সভা সমুদায়ে প্রায় পঞ্চাশটী বিলের সর্ত্ত পাশ করিয়া লইয়াছেন। টাকার মান ১ শিলিং ৬ পেন্স রাখাই স্থির।

এদেশে **কয়লার ব্যবসায়ের** নিয়ন্ত্রণ নিমিত্ত ব্যবসায়ী দিগের আগ্রহ হইয়াছে এবং সেজন্য কানুন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে যাহাতে কয়লার আমদানী কমে। একটী স্থায়ী কমিটি ইহার তত্ত্বাবধান করিবে।

কচুরি পনার অনুপকারিতা সম্বন্ধেই এ যাবত অনেক কথা শুনা গিয়াছে—সম্প্রতি ব্রিটিশ সাইন্স গিল্ডের সেক্রেটারী সি এলবাট মেরেল বলিতেছেন কচুরিকে অতি উচ্চ দরের সারে পরিণত করা যাইতে পারে, উহা ভগবানের দান বিশেষ, লোকের কল্যাণের কারণ।

মাদ্রাজ বিজগাপাটমে একটী নূতন বন্দর খোলা হইল (১৯-১২-৩৩)।

বাণিজ্য কর বিষয়ে একটী নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি এসেম্ব্লী সভাতে পেশ হইয়াছে, ইহাতে বহির্বাণিজ্যে শুল্ক বৃদ্ধি দ্বারা ক্ষুদ্র দেশীয় শিল্পের রক্ষার বিধান হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সরকারের প্রায় বিশ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে।

বাঙ্গলার উপকূলে **লবণ তৈয়ার ব্যবসায়** চলিতে পারে কিনা এই লইয়া কতক দিন যাবত আলোচনা চলিতেছে। এই উদ্দেশ্যে সরকারের নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ মিঃ এম-এস-পিট্ অভিমত দিয়াছেন যে কারবারের হিসাবে উহা লাভজনক হইবে না।

জাপ-ভারতের বাণিজ্য চুক্তি নূতন দিল্লীতে ভারতগভর্ণমেণ্ট ও জাপানী দূতগণের মধ্যে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার স্বাক্ষর কিন্তু ভারতে না হইয়া লণ্ডন সহরে হইবে।

রাষ্ট্র—নারীপক্ষে বেগম শা নওয়াজ জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে দাবী করিয়াছেন যে নব সংস্কৃত রাষ্ট্রে স্ত্রীগণ কেবল মাত্র নাম স্বাক্ষর করিতে পারিলেই ভোটাধিকার পাইবে। প্রত্যেক রাষ্ট্র পরিষদে তাহাদের জন্য আসন থাকিবে, এবং স্ত্রীলোক বলিয়া কোনও সরকারী কার্য্যে তাহদের অযোগ্যতা নিরূপিত হইতে পারিবে না। ভারতগভর্ণমেণ্টের উপস্থিত **ব্যবস্থা-সভার আয়ুষ্কাল** আগামী ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। ভারতগভর্ণমেণ্টের আইনসচিব স্যর ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রের স্থানে কলিকাতা হাইকোর্টের বর্ত্তমান এড্-ভোকেট্-জেনারেল স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ঐ পদে নিযুক্ত হইবেন। বিহার ব্যবস্থাপক সভাতে শ্রীযুক্ত রাজা-ধারী সিংহ সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগর ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইবে বলিয়া কথা চলিতেছে, কাশ্মীর রাজ্য তৎপরিবর্ত্তে সিয়ালকোট প্রাপ্ত হইবেন। **বড়লাট** লর্ড ওয়েলিংডন আগামী মে মাসে চারি মাসের ছুটিতে স্বদেশ গমন করিবেন, তৎস্থানে মাদ্রাজগভর্ণর স্যর জর্জ্জ ষ্টেনলী অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেলের কার্য্য করিবেন আর মাদ্রাজ গভর্ণরের শূন্য পদ তখন পূর্ণ করিবেন খান বাহাদুর স্যর মামুদ ওসমান্। ক্যাপিটেসন ট্রাইবুনেল নামক বিচার সমিতির নির্দ্ধারণে ভারতে ব্রিটিশ সৈন্য পোষণের খরচ বাবদ ইংলণ্ড কতক খরচ বহন করিবে, তাহাতে ভারতীয় গরীব করদাতাদের প্রায় দুই কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে।

শিক্ষা।—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আগামী ১৯৩৪ সনের পরীক্ষা সমূহে উপস্থিত হইবার জন্য প্রায় ১৫০ জন রাজবন্দী যুবককে প্রবেশাজ্ঞা দান করিয়াছেন। পুণা সহরের একজন উপাধিধারী গ্রাজুয়েট জুতা-মাজার কার্য্য গ্রহণ করিয়াছে; স্যর তেজ বাহাদুর শাপ্রুর জুতা পরিষ্কার করিয়া সে একদিন পাঁচ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। বাঙ্গলাতে উচ্চ হিন্দুদিগের শিক্ষাসমস্যার আলোচনা উপস্থিত হিন্দুসভার এক বৈঠক হইবার কথা চলিতেছে।

মহাত্মা গান্ধী।—তাঁহার হরিজন আন্দোলন-ভ্রমণ দাক্ষিণাত্যে সমাপ্ত করিয়া মধ্য প্রদেশে আসিয়াছেন। বোম্বাইতে নিখিল ভারতীয় বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘের বাৎসরিক সভাতে (২৯-১২-৩৩) এই মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে যে গান্ধী হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজের ভিত্তি উচ্ছেদ করিতে যাইতেছেন। আর পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সোভিয়েট ভাবাপন্ন অর্থনীতির প্রচার দ্বারা দেশে নূতন দুর্দ্দশা আনয়ন করিবেন। কাণপুরের আদি হিন্দু মহাসভা সঙ্কল্প করিয়াছে যে যুক্ত প্রদেশে ভ্রমণকালে তাহারা মহাত্মা গান্ধীকে বয়কট বা বর্জ্জন করিবেন; অবনত শ্রেণীর লোকদিগের প্রকৃত স্বার্থ বিরুদ্ধ বলিয়াও গান্ধীজীর এই আন্দোলনকে ইহারা অন্যায় বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। মধ্যপ্রদেশের অস্পৃশ্য সমাজ হইতে সরকারের নিকট এক আবেদন গিয়াছে যে গান্ধীর এই আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে অচ্ছুতদিগের কোনও গুরুতর সমস্যার সমাধান করিতেছে না। বঙ্গীয় বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘ হইতে এক তার গান্ধীজীর নিকট গিয়াছে যে, তিনি যেন বঙ্গদেশে না আইসেন, বাঙ্গলার অচ্ছুত সমস্যা বলিয়া কোন কিছু নাই; তিনি আসিলে ইহাদের লইয়া নূতন অশান্তি ও উদ্বেগ সৃষ্টির আশঙ্কা।

পীড়া—কলিকাতাতে এবার শীঘ্র শীঘ্র বসন্তের ব্যারাম দেখা দিয়াছে; এখানে প্রতি বৎসর প্রায় ৮০০ লোক এই রোগে মারা যায়; মহামারী হইলে বৎসরে তিন হাজার পর্য্যন্ত লোক মরে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্বাস্থ্যকর স্থানে এবার অতি তীব্র জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়াছে।

মৃত্যু।—তিব্বতের রাষ্ট্র ও ধর্ম্ম পরিচালক সুপ্রসিদ্ধ দালাই লামার মৃত্যু হইল (১৭-১-৩৩)। লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে একটী অপরাধীকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে; তাহার দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে এক আপীল মঞ্জুরীর আদেশও ছিল।

বৈদেশিক

বড় দিনের দিন রাজা পঞ্চম জর্জ্জ তাহার সাম্রাজ্যের প্রজাদিগকে বেতার বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন। একটি অতিকায় বিমানপোত বড়দিনের সম্বর্দ্ধনাপত্রাদি লইয়া ভারত, মালয় প্রভৃতি প্রতীচ্যদেশে গমন করিয়াছিল। ব্রিটিশ ও ফরাসীর মধ্যে একটী নূতন বাণিজ্যচুক্তি হইবার কথা চলিতেছে।

আইরিশ নীলকোর্ত্তা দলের নেতা জেনারেল ও ডাফী গ্রেপ্তার হইয়াছেন; সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন; কিন্তু পরেই ডি ভেলারার প্রাণ হানিকর কোনও বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে তাহাকে সামরিক বিচারাদালতে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে জারমান রাষ্ট্র-কর্ত্তার হার হিটলারের সাক্ষাৎ প্রস্তাব ফরাসী গভর্ণমেণ্ট অগ্রাহ্য করিয়াছেন—বলে সমুদয় প্রস্তাবই জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতাতে করিতে হইবে। জারম্যানীর পুনঃ সমর শক্তি সঞ্চয়ে ফরাসী ও বেলজিয়ম উভয়েই নারাজ। জারমান অভিমত এই যে, জাতিসঙ্ঘ ক্লৈব্য দশায় পরিণত, আর উহার প্রবৃত্তি উন্নতির পরিপন্থী বা প্রতিক্রিয়া মূলক। জাতি-সঙ্ঘের প্রস্তাবিত অস্ত্রনিয়ন্ত্রণে জারম্যানরা বাধ্য না হইলে তাহারা গোপনে যুদ্ধ আয়োজন করিতেছে বলিয়া ফরাসীরা ব্যক্ত করিয়া দিবে। ফরাসীর লেগনী ষ্টেশনে দুই খানি বড় দিনের যাত্রী পরিপূর্ণ এক্‌স্‌প্রেস ট্রেণে ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া বহুলোকের প্রাণ হানি ও অঙ্গ হানি ঘটিয়াছে (২৪-১-৩৩). এরূপ ভয়াবহ সংঘর্ষ বাষ্পীয় যানের ইতিবৃত্তে খুব কমই ঘটিয়াছে। উত্তর আমেরিকায় আর্ম্মিনীয়ান চার্চ্চের প্রধান যাজক লিটন টোরেণ আপন গীর্জ্জাতে ধর্ম্মোপদেশ কালে ঘাতকের হাতে প্রাণ হারাইয়াছেন—ইনি আধুনিক চিন্তাধারা ও সোভিয়েট্ মতের পক্ষাবলম্বী বলিয়া পুরাতন মতের লোকেরা এই কার্য্য করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। রূপার মান গ্রহণ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট দেশের অর্থ-সঙ্কটের লাঘব করিতেছেন; সঙ্গে সঙ্গেই দেশের কতিপয় সংস্থান ব্যতীত সকলকে সমুদয় স্বর্ণমুদ্রা সরকারী তহবিলে জমা দিতে আদেশ করা হইয়াছে—জাতির অপচয় মোচনের ইহা এক পন্থা।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

পঞ্চম বর্ষ]   মাঘ—১৩৪০   [৪র্থ সংখ্যা

সাধনার পথে

ধর্ম্মকে জাতীয়তার ভিত্তি বলিয়া ধরিবার সুখ্যাতি ও অখ্যাতি এ উভয়ই ভারতের আছে। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থা সমুদয়ই ধর্ম্ম-সংমিশ্রিত; অদ্যকার জাগতিক ভাবের সহিত তাহার মিল হয় না। আর ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা নানা প্রকারে অবনত বলিয়া, সেই ধর্ম্মকেই উহার অবনতির কারণ বলিয়া অনেকে ইহার নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই অধঃপতনের মধ্যেও একালে ভারতে যে জাগ্রতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহারও মূলে রহিয়াছে ঐ ধর্ম্মভাব; এজন্য উহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতেও কেহ পারিয়া উঠিতেছে না। কেবল এই যুগে নহে, সকল যুগে যখনই ভারতে কোনও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বিজাতীয় ভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে—অন্তর বা বাহির হইতে ধর্ম্মের উপর আক্রমণ চলিয়াছে,—প্রকৃত জাতীয়তায় আঘাত লাগিয়াছে, তখনই সেই ধর্ম্মের প্রেরণায় জাগ্রতি বশে ভারত আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া বসিতে পারিয়াছে। ভারতের কুরুক্ষেত্র সেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের মহা সমরের বিকল্প মাত্র। যুগে যুগে তাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিবে। পুরাণের বিস্তারিত কাহিনী এই সংগ্রামের খণ্ড ও অখণ্ড বিবরণই স্পষ্ট ও অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করিতেছে। এই সমুদয় সংঘর্ষের মধ্যেই ভারতের একটী বিশিষ্ট শক্তির পরিচয় রহিয়াছে; তাহা তাহার ধর্ম্ম ও সাধনা। যুগে যুগে সেই শক্তি ভারতকে পরিচালিত করিয়াছে। অবনতির মধ্যেও উন্নতির আদর্শ দেখাইয়াছে, নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়াছে। ভারতের প্রকৃত সত্তা এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার সেবায় নিয়োজিত। ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন স্তরেও ভারত এই আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষণ দেখাইয়া আসিয়াছে—ভারতের সভ্যতা ও সাধনা সাধারণ ভাবে মানবীয় সভ্যতার উপরে কত দূর প্রভাব

জাতীয়তায় অপঘাত

বিস্তার করিয়াছে, তাহার সন্ধান এখানে নাই করিলাম—ভারতের উপরে যে বাহ্যিক আঘাত ও আক্রমণ সময় সময় হইয়া আসিতেছে তাহাকেও অতিক্রম করিয়া ভারত আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া প্রতি যুগেই বসিয়াছে—এই ভাবেই প্রাচীন মিসর ও এশিরিয়াকে সে প্রতিহত করিয়াছিল, পারসীকের আক্রমণ-বেগের গতি ফিরাইয়াদিয়াছিল, গ্রীকদিগকে বিতারিত করিয়া আপন অধিকার বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। তখনও ভারতীয় ধর্ম্মের উপর কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই; বরং সে ধর্ম্মই এক অসাধারণ প্রতিক্রিয়া রূপে এ-সকলের উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। ধর্ম্মের বিপ্লব ভারতের অন্তর হইতেই সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ হয়—বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভবে ভারতীয় আর্য ধর্ম্মে যে আঘাত লাগে তাহাতেও ভারতের আত্ম প্রতিষ্ঠার হানি তেমন হয় নাই—সুদীর্ঘ কালের সংগ্রাম —বাদ বিবাদ, যুক্তি ও মীমাংসার ফলে ভারতের ধর্ম্ম তাহাতে নব নব কলেবর ধারণ করিয়া চলিতে থাকে। তাহাতে ভারতীয় সমাজে যে নূতন শক্তির বীজ পত্তন হয়, তাহাই পরবর্ত্তী কালে বৈদেশিক শাসন ও বিজাতীয় ধর্ম্মের আক্রমণ মধ্যেও নানাপ্রকারে ভারত-সত্তার সংরক্ষণ করিয়াছিল। এবং তাহাতে প্রণোদিত হইয়াই অবশেষে ভারত বৈদেশিক আধিপত্যকেও প্রতিহত করিয়া বসিয়াছিল। এযুগে পাশ্চাত্যের সংস্রবে আসিয়া ভারতে এক নূতন বিপদ-পাত ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই—নূতন গুরুতর সমস্যার উদ্রেক হইয়াছে। ভারত আজ সকল প্রকারেই অবনত—রাষ্ট্রে মেরুদণ্ডবিহীন, অর্থে দীন, সর্ব্বপ্রকার শক্তিরহিত, শিক্ষা ও সাধনাতে পরের নিকট বিক্রীত। তাহার বিরুদ্ধেও কিন্তু ভারত আত্মোন্মেষের পরিচয় দান করিয়াছে—তাহাই আজিকার ভারতের জাতীয়তা। ভারতীয় জাতীয়তার মূল অনুসন্ধান করিলে ভারতের মজ্জাগত সেই ধর্ম্মবীজেরই পরিচয় পাওয়া যায়—আর্য্য সমাজ, ব্রাহ্মসমাজ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের গঠিত জনমত এসমুদয়ই সেই ভারতের জাতীয়তা বীজ ধারণ করিয়া রহিয়াছে—ব্যক্ত চেতনস্তরের অন্তরালে অব্যক্ত চেতনার বিরাট ভূমির ন্যায় এ সকলের ধর্ম্মভাব ভারতের এক বৃহত্তর ধর্ম্ম ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাহারই প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন দিকে দেখা দিয়াছে—উহার সম্যক বিকাশে ভারতের প্রকৃত জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা একদিন হইবে। আজ সেই জাতীয়তার উপরই বিষম অপঘাত উপস্থিত; জাতীয়তাকে রাজনৈতিক মাত্র করিয়া তোলাতে এই অপঘাতের সৃষ্টি। এই চরম রাষ্ট্রিকতার সর্পদংশনে ভারতসত্তা এক্ষণে বিবশ—জাতীয়তায় অব্যবস্থা (choas), সর্ব্বত্র বিজাতীয় শিক্ষা ও দীক্ষা লইয়া, বৈদেশিক ভাবে প্রমত্ত রাষ্ট্র-পরিচালকগণের হাতে পড়িয়া ভারতসত্তা বিলুপ্ত প্রায়। কোনও স্থির দৃষ্টি বিহনে, স্বকীয় সুস্থভাব ছাড়িয়া ইহারা আপন ক্ষুদ্র দৃষ্টিও স্থির রাখিতে পারিতেছে না—রাষ্ট্র হইতে অর্থ, অর্থ হইতে সমাজ লইয়া ইহারা নানা প্রকার পরীক্ষণে ব্যস্ত, আর কেহ কেহ রাষ্ট্র হইতে ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দেওয়াই মাত্র কৃতকার্য্যতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন—প্রকৃত জাতীয়তার পরিস্ফুরণ যে ইহাতে কিছু হইতেছে না, তাহাই পদে পদে দেখা যাইতেছে—লোকের মধ্যে পার্থক্য ও বিরোধ বাড়িয়াই চলিয়াছে; উদ্বেগ ও অশান্তিতে সকলে সন্ত্রস্ত, উন্নতির সকল প্রকার আশাই বিলুপ্ত। এই অপঘাতের প্রকৃতি বুঝিয়া ইহার বিষময় প্রভাব হইতে সমাজদেহকে মুক্ত করিতে পারিলেই রক্ষা। জাতির প্রকৃত সত্তার সন্ধানে, ভারতীয় সাধনার অমৃত রস—যাহাতে ভারতের ধর্ম্ম চিরকাল সংরক্ষিত হইয়া ভারতকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে—তাহার সমুচিত সঞ্চরণেই এই বিষ অবসারিত হইতে পারিবে,—তাহাতে ভারত তাহার নব জাগ্রতির পথে আপন স্থান অধিকার করিয়া চলিবে।

উন্নতির উৎস।—

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবাসীরা বেশ কর্ম্মশীল ও উন্নতির দিকে অগ্রসর—বিগত বহু শতাব্দী ধরিয়া তাহারা এমন ছিল না—মৃতপ্রায় ভারতে আজ নূতন জীবনী শক্তির সঞ্চার হইয়াছে—পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞান ও নানা কর্ম্মতৎপরতার দিকে ভারতবাসী নূতন প্রেরণা পাইয়াছে। আজ পাশ্চাত্যের সংশ্রবে আসিয়াই তাহাদিগের ভাবী উন্নতির পথ পড়িয়াছে—এই ধারণা আজ এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে বদ্ধমূল। ইহারা বর্ত্তমান যুগকে মানব সভ্যতার এক উৎকৃষ্ট সময় বলিয়া মনে করেন, ক্রমবিকাশে অতিমাত্র আস্থা রাখেন—পূর্ব্বকালের লোকেরা অজ্ঞ ছিল, পূর্ব্বপুরুষগণ বর্ব্বরতায় নিমগ্ন ছিলেন, সামাজিক ব্যবহার, ব্যক্তিগত জীবনপ্রণালী, ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রে তাহারা নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল; আজ পাশ্চাত্যের নব জ্ঞানালোকে পৃথিবী তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছে, লোক নানাদিক কর্ম্মপ্রবাহে ছুটিয়াছে; সেই কর্ম্মপ্রবাহের তরঙ্গই ভারতে আসিয়া নব্যভারতের লোকবৃন্দকে নূতন ভাবে উদ্বোধিত করিয়াছে। আবার কেহ কেহ এই কথাই আরও প্রকৃষ্ট ভাবে বলিয়া থাকেন—পাশ্চাত্যের সংশ্রবে আসিয়া ভারতীয় জনতার জড়তা অনেকটা কাটিয়াছে; ভারতের সত্ত্বভাব এক হীন তামসিকতায় পরিণত হইয়াছিল, পাশ্চাত্যের রজঃ আজ তাহা কাটিয়া দিয়াছে। কথাটী শুনিতে বেশ। আর আজ লোক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন আত্মহারা হইয়া মাতিয়াছে তাহাতে নানারূপ উন্নতির ছায়া দেখিতে পাইবে, ইহাতেও আশ্চর্য্য কিছু নহে; যে শিক্ষা দীক্ষা ইহারা পাইতেছে, যে জীবনাদর্শে উদ্দীপ্ত হইয়াছে, তাহাতে উন্নতির প্রকৃতিবোধও তদনুযায়ীই হইবে। কিন্তু যে উন্নতিও কর্ম্মণ্যতার গৌরব আজ ইহার করিতেছে, তাহা ভারতের বিপুল জন সমাজের কোন্ স্তরের কতখানি পাইয়াছে, তাহাও দেখিতে হইবে। পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও জীবন-যাত্রায় যাহারা আত্মহারা হইয়াছে, তাহাদিগের কতক সংখ্যা বাদ দিলে ভারতের বিপুল জনতা কি একালে (ইহাদের প্রভাব ও প্রতাপে) আরও অধিক মুহ্যমান হয় নাই—যে সরল মানবীয় গুণ রাশিতে তাহাদের চরিত্র বিভূষিত ছিল, যে ধর্ম্ম-জ্ঞান ও সামাজিক কর্ত্তব্যবোধ তাহাদিগকে সর্ব্বদা কর্ম্মতৎপর রাখিত, দেশের স্বভাবজাত যে শিল্প ও চিরাগত ব্যবসায় ও বাণিজ্য তাহাদিগকে ধনৈশ্বর্য্যে জগতের সকল লোকের ঈর্ষা ও অনুকরণের পাত্র করিয়া রাখিয়াছিল, সে গুণ ও কর্ম্মণ্যতা অদ্যকার জনচরিত্রে কোথায় দেখা যাইতে পারে?

বাস্তবিক অদ্যকার লোকের যে কর্ম্মভাব ও তাৎকালিক লোকের কর্ম্মতৎপরতা—এই দুইএর মধ্যে একটী বিশেষ পার্থক্যই বিদ্যমান। এ প্রভেদ ইহাদের এই কর্ম্মের প্রকৃতিতে তত নহে, যতটা তাহার উৎসের—সেকাল ও একালের লোকের কর্ম্মপ্রবাহ যে কারণসূত্র হইতে উদ্ভব হইত তাহাতেই আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এই উৎস দুই প্রকারের—স্থূল ও সূক্ষ্ম। পাশ্চাত্য সূত্র ধরিয়া আজ যে কর্ম্মপ্রবাহ এদেশে দেখা দিয়াছে, তাহার মূল স্থূল দৃষ্টি ও স্থূল ভূমিতে—পাশ্চাত্যের স্থূল দর্শন তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে; আর ভারতে আবহমান কাল যে কর্ম্মপ্রবাহ চলিয়া আসিয়াছিল তাহার মূল সূক্ষ্মের ক্ষেত্রে। এই সূক্ষ্ম ভূমির অনুসন্ধান করিতে হইলে ভারতের সাধনার অন্তঃপ্রকৃতিতে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহাতে যে কর্ম্মের বীজ উপ্ত আছে, তাহাতেই ভারত চির সঞ্জীবিত ও চির উন্নতির পথের পথিক। আজও যদি বাস্তবিক কোনও কর্ম্মপ্রবণতা এদেশের লোকের মধ্যে থাকে, তবে তাহার উৎস সেইখানেই খুঁজিতে হইবে।

ভূমিকম্পের শিক্ষা—

মাসের প্রথম দিনে ভূমিকম্পের যে ধ্বংশলীলা হইয়া গেল তাহার বেগ সামলাইয়া লইতে এই অর্থ-দৈন্য ও ক্লেশ পীড়িত দেশবাসীর বহুদিন লাগিবে. স্থানীয় শাসনসংস্থাকে বেশ উদ্বেগ পাইতে হইবে। উত্তর বিহার ও নেপাল রাজ্যের দুর্দ্দশার সীমা নাই; প্রাণহানি অনেক ঘটিয়াছে; সহরের পাকা বাড়ী ভগ্নস্তূপে পরিণত, রাশি রাশি নরদেহ তাহাতে প্রোথিত! অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাদের উদ্ধার সাধনই হয় নাই, দেশের মধ্যে মর্ম্মন্তুদ হাহাকার উঠিয়াছে! যাহারা মরিয়াছে, তাহাদের ক্লেশের অবসান হইয়াছে, যাহারা বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই। রোগ শোক, অনাহার, আবাসহীনতা, শীত রৌদ্র বর্ষা সমুদয়েরই প্রকোপ তাহাদের উপর অতিমাত্রায় পড়িয়াছে। দেশের মধ্যে ইহাদের সাহায্য নিমিত্ত একটা সাড়া পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে ধন-সংগ্রহ হইতেছে, স্বেচ্ছাসেবকের দল ছুটিয়াছে, লক্ষ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে; বিদেশ হইতেও সাহায্য আসিতেছে। কিন্তু যে ক্ষতি হইয়াছে ও যাহা বিনাশ হইয়াছে, তাহার তুলনাতে তাহা নগণ্য। আর এই পৃথিবী-ব্যাপী দারুণ অর্থ ক্লেশের দিনে কত টাকারই বা যোগাড় হইতে পারে? বিহার প্রদেশের স্বকীয় রাজসরকার এযাবতকাল তাহার আর্থিক দৈন্য হইতে উদ্ধার পাইয়া উঠিতে পারে নাই—প্রদেশের আয়ের দ্বারা সরকারের খরচ কুলান হয় না। বিহার সাধারণতঃ গরীব প্রদেশ, তাহাতে অবস্থাপন্নের গৃহবাটী ও ধনহীনের চাষের ভূমি এই দৈব প্রকোপে উভয়ই উৎসন্ন গিয়াছে, এই সমুদয়ের ক্ষতিপূরণ করা সাধারণ অর্থ বা সাহায্যের সাধ্য নহে।

ভূমিকম্প আকস্মিক ব্যাপারের শ্রেষ্ঠ প্রতীক। স্থিতিশীলকে অস্থিরতার চমক্ দান করিতে এমন ঘটনা আর কিছু হইতে পারে না। ধরিত্রী সর্ব্বংসহা, জীবমাত্রকেই বক্ষে ধারণ করিয়া লালন ও পোষণ করিতেছে। জননীর ক্রোড়েও এত নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত কেহ নয়। তাহাতে যখন কম্পন দেখা দেয়—ভূপৃষ্ঠ আলোড়িত হয়, তখন মনুষ্যের এই চির নিরাপদ বোধেই সর্ব্বপ্রথম আঘাত লাগে—নিশ্চিন্ত ভাব হঠাৎ বিদূরিত হইয়া তাহাকে সন্ত্রস্ত করে, সমূহ বিপদ গণিয়া মানুষ ব্যাকুল হইয়া পড়ে। রক্ষার কথা—ভূকম্পন অধিক ক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঝড় বাতাস বা বন্যার ন্যায় কতক কালও স্থায়ী হইলে মানুষ ভূমিকম্পের ত্রাসে অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিত। ভূমিকম্পের সাধারণ ক্রিয়া সাংঘাতিক নহে—যানবাহনে চড়িয়া, রেল ষ্টিমারে গমনাগমনে লোকে উহা অপেক্ষা অধিক কম্পন অনুভব করে, দোলার দোলনে বা পদচারণে ভূকম্পন অপেক্ষা মানুষের অনেক অধিক দৈহিক সঞ্চলন ঘটে, কিন্তু মানবচিত্ত তাহাতে সন্ত্রাস পায় না—বরং আনন্দ ভোগ করে। কিন্তু ভূমিকম্পের ক্ষণস্থায়ী আন্দোলনে মানুষকে বিহ্বল করিয়া দেয়—স্থিরচিত্ত ও শান্ত ভাবে ব্যাঘাত লাগে বলিয়াই বিপদ গণে।

ভূমিকম্পকে দৈবঘটনা বলিয়া মানিয়া লইতে কেহ বড় দ্বিধা বোধ করে না। কার্য্যকারণ সম্বন্ধে ইহার নির্ণয় কিছু হয় নাই, আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিচারে কেহ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া ইহার কাল নির্দ্দেশ করিতে পারে না। প্রাচীন গ্রহাদির বিচারে জ্যোতিষমতাবলম্বীরা কখন কখন ইহার উৎপত্তির ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। দৈব কোপ বলিয়া মনুষ্যের পাপের ফলে এইরূপ ঘটনা ঘটে—বিজ্ঞ লোকেরা ইহার এইরূপ কারণ দিয়া থাকেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মন অবশ্যই তাহা মানিয়া লয় না। তবুও ভূমিকম্পের কারণ একটা আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

নৈসর্গিক সকল ঘটনার কারণ নির্ণিত হয় না; যাহা নির্ণয় করা যায়, তাহাও সঠিক ও সম্পূর্ণ রূপে নির্ণিত হয়, একথা বলা চলে না। কারণ নির্ণয় করা না গেলেও ফল ও উদ্দেশ্য কি তাহা ধরা যাইতে পারে—অনেক ফল হাতে হাতেই পাওয়া যায়—বর্ত্তমান ভূমিকম্পের ভীষণ সাক্ষাৎ ফল দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকেরা বিশেষরূপেই বুঝিয়াছে, বাকী অনেকদিন পর্য্যন্ত লোকে বুঝিবে—ইহার পরোক্ষ ফল লোকে বিশেষ শিক্ষা রূপেই ধরিয়া লইতে পারে। জগতের প্রত্যেক ঘটনা হইতেই লোকে কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করিতে পারে—ভূমিকম্পের মতন প্রচণ্ড ব্যাপার হইতে বিশেষ রূপেই তাহা গ্রহণ করিতে পারে। সর্ব্বপ্রথম মেদিনীর আকস্মিক আলোড়নে, ক্ষণিক হইলেও, যে চমক্ লাগিয়া থাকে তাহাই ভূকম্পনের প্রধান শিক্ষা—আমি যে ভাবে যে স্থানে স্থির নিশ্চিন্তে দিন যাপন করিতেছি, তাহা বাস্তবিক স্থির নহে, কোনও ক্ষণেই আমি নিরাপদ নহি, এ স্থিরতা বাস্তবিক স্থিরতা নহে—এই চেতনা জাগতিক সমুদয় অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করিতে চায়; এবং চায় বলিয়াই আত্মচৈতন্যে আঘাত লাগে; এ চেতনা স্থায়ী হইলে সংসারের যাদুকরী বিদ্যা চলে না, স্থিরজ্ঞানের প্রত্যক্ষ মোহ হাতে হাতে কাটিয়া যায়; এ সীমা ও সঙ্কীর্ণতার মহাপাপ বিদূরিত হয়, অজ্ঞানের আবেশ ছাড়িয়া যায়। যে যেই ভাবে আছি, তাহার দোষগুলি দেখিয়া লইবার এ এক উত্তম অবসর—এই দৃষ্টিতে ভূমিকম্প ব্যক্তি ও জাতিগত ভাবে প্রত্যেকেরই মহাপাপের দণ্ড বা তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ঐশ্বরীয় উপায়। রাজার পাপে এরূপ বিপদ্‌পাত ঘটে, এরূপ মতবাদ প্রচলিত আছে; সমুদয় দেশের রাজাই একক রক্ষক ও ভোক্তা; ব্যাপকভাবে সমুদয় দেশে এরূপ আপদ আসে বলিয়া রাজশক্তির কৃতকার্য্যতাতে এইরূপ দোষারোপ করিবার হেতু আছে—ব্যক্তিগত পাপের দণ্ড স্বরূপ নানাপ্রকার দুঃখপাতের ব্যবস্থা সংসারে আছে। রাষ্ট্র যে সময় সময় দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ হয়, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না; আর পাপের প্রকৃত নির্ণয় ও তাহার দণ্ডবিধান যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও প্রণালীতে হয়, তাহা স্থূল দৃষ্টিতে ধরিয়াও লওয়া কঠিন। এরূপ দৈববিপাকের ফল রাষ্ট্রকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রূপে ভুগিতে হয়—এজন্য রাষ্ট্রশক্তির চেতনাই ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হওয়া উচিত। ভূপৃষ্ঠে মানব নিসর্গের দুর্জ্জেয় শক্তির কতদূর বশীভূত ভূমিকম্পের ফলে মনুষ্যের এই জ্ঞান স্থিরতর হওয়া আবশ্যক—সৌর জগতের গ্রহ উপগ্রহকে এবং বিশ্বজগতের নক্ষত্র নিচয়ের সম্বন্ধে পৃথিবীর উপরে আধিপত্যকারী যে সকল শক্তি নিচয়ের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে ভূমিকম্পনের নির্ণয় কিছু হয় না—আধুনিক ভূতত্ত্ব-বিদেরা যে সকল তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাহাতে নানাবিধ অনুমানের সমাবেশ হইয়াছে মাত্র ভারতীয় লৌকিক দৃষ্টিতে এই কুটিল নিসর্গের ক্রিয়াকে অনন্ত বিশ্বশক্তির (কশ্যপের) সর্পরূপিণী কন্যা বাসুকীর কার্য্য বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। দুর্জ্জেয় শক্তিকে জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আনয়ন মাত্র ইহার তাৎপর্য্য, আর নৈসর্গিক শক্তিকে সর্ব্বদা মানিয়া চলা ইহার লক্ষ্য। প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়কে সাক্ষাৎ ভাবে মানিয়া লওয়া বৈদিক সাধনার প্রধান লক্ষ্য, লৌকিক মতে তাহা বদ্ধমূল করিয়া রাখা পৌরাণিক কাহিনীর উদ্দেশ্য। আধুনিক বিজ্ঞান নিসর্গের উপরে কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে বলিয়া তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়াই চলিতে চাহে। ভারতীয় ভাব ইহার বিপরীত। প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় ভারতীয় মন এই নিসর্গের আধিপত্য স্বীকার করে—আহার, বিহার বাসগৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে নিসর্গের সম্বন্ধ মানিয়া চলে।

প্রকৃতির প্রদত্ত সম্পদ মানুষ যেমন নানাপ্রকারে উপভোগ করে, প্রকৃতির ক্রিয়াতে নানা বিপদের সম্মুখীনও মানুষকে তেমনই হইতে হয়। এই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ দৈবী ক্রিয়া বা অনুষ্ঠানাদি দ্বারা হইতে পারে কি না (সমুদয় বৈদিক সাহিত্য ইহার সমর্থন করে) সে কথা এখানে নাই তুলিলাম—প্রকৃতির সহিত সর্ব্বদা সম্বন্ধ রাখিয়া চলিলে, এবং তাহার শক্তিমত্তা সম্বন্ধে সর্ব্বদা মন সচকিত থাকিলে, তাহার দেওয়া বিপদ্‌পাত হইতে অনিষ্ট কম ঘটে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। এরূপ করিলে বিপদ্‌পাতও কম ঘটে; আর ঘটিলেও তাহার সহনশক্তি মানুষের অধিকতর জন্মিয়া থাকে; এবং তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার নানা উপায় উদ্ভাবন হয়। এই ভাব হইতেই এদেশে জীবন যাত্রার প্রতি বিষয়ে নানাপ্রকার নিয়ন্ত্রণের বিধান আছে। গৃহ বা বাসভবন নির্ম্মাণ বিষয়ে যে বিধি ব্যবস্থা আছে, তাহা ভূমিকম্প প্রসঙ্গে বিশেষরূপে আলোচ্য হইতে পারে—সে সকল উপায় ও নিয়মের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতেও আধুনিক মস্তিষ্ক কুণ্ঠা বোধ করে। সম্প্রতি নেপাল রাজ্য হইতে যে ভূমিকম্পের বিবরণ আসিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, আধুনিক প্রণালীর বাটী প্রায় সমুদয়ই ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হইয়াছে; প্রাচীন প্রণালীতে নির্ম্মিত বাড়ীর বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই। হিমালয় প্রদেশের বাটী নির্ম্মাণের এ দেশপ্রচলিত পদ্ধতি ভূমিকম্পে আত্মরক্ষার পক্ষে উপযোগী—বৈদেশিক তত্ত্বানুসন্ধানকারীরা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন (আমেরিকার রোষ্টেরিস গবেষণা পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। জল, বায়ু, অগ্নি ও ভূমির অবস্থার অতি সূক্ষ্ম বিচারে ভারতীয় গৃহনির্ম্মাণ বিদ্যার নানা ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন প্রদেশে তাহা বিভিন্ন আকারে প্রচলিত ছিল। অবশ্যই এক্ষণে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভূমিকম্পপ্রধান দেশসমূহে গৃহনির্ম্মাণের বিশেষ ব্যবস্থা হইতেছে; গৃহপ্রাচীরের অন্তরে লৌহস্তম্ভের যোজনা দ্বারা এদেশেও স্থানে স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ হয়। কিন্তু তাহার ফলাফল এখনও অনিশ্চিত। আর ইহাতেও প্রকৃতির বিপরীত গতিরই অনুবর্ত্তন চলিতেছে—নিসর্গের উপরে আধিপত্যের দম্ভ; এবং স্বভাবশক্তির অনুকূলে চলিবার যে ভারতীয় চিত্তের প্রবৃত্তি তাহার প্রতিকূলতাই পদে পদে দেখা যায়। আর কয় জন লোকেরই বা এদেশে বর্ত্তমানে ঐভাবে চলিবার ক্ষমতা আছে? ভারতের অবস্থা এখন দুই পথেরই বাহির—"না ঘরকা না পরকা"। জনসাধারণের অবস্থা ঘোর তম বা জড়তাময়। প্রকৃত সত্যের সন্ধানে আত্মশক্তির উপলব্ধি করিয়া ভাল মন্দ বিচার করিয়া চলিবে—এ ক্ষমতা তাহাদের নাই। মুষ্টিমেয় ধনী পরকীয় ভাবে আত্মবিক্রয় করিয়া বসিয়াছে, জাতীয় সত্তা ও দেশের ভাবের সহিত তাহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। আর বিপুল জনতা সর্ব্বপ্রকারেই অক্ষম—দারিদ্র্য পীড়ার যাতনা ভোগেরই ভাগী। প্রকৃত অবস্থার বিচারে, জাতীয় সাধনার ভাবে আত্মসংবিদ লাভ করিয়া আত্ম নিয়মণ করিয়া জীবন যাত্রা চলিলেই সকল প্রকার বিপদপাত হইতে রক্ষা হইতে পারে। আজ যদি কোনও আত্মকৃত পাপের জন্য ভারতের উপর দৈব কোপ পড়িয়া থাকে, তবে তাহা তাহারসেই স্বকীয় ভাব বা স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকা।

কবি ও মহাত্মা—

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী উভয়েই আজ এদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পূজিত হইতেছেন—আন্তর্জাতিক খ্যাতিও ইহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। একজন কবি আর একজন নীতিবাদী; ইঁহারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ শক্তি রাখেন এবং নিজ নিজ মতের অসংখ্য উপাসক ইহাদের

আছে। বর্ত্তমান ভূমিকম্প লইয়া ইহাদের মতভেদ ও বিরোধ সকলেরই উপভোগ্য হইয়াছে। অবশ্যই ভূমিকম্পের নিদারুণ পরিণামে যাহাদের অন্তর কাঁদিয়াছে, এ সকল বাদ বিবাদ শুনিবার অবসর তাহাদের নাই—রাশি রাশি ভগ্নগৃহ স্তূপ ও মৃতদেহের অপসারণ ও নিরন্ন রুগ্ন ও গৃহহীন অসংখ্য লোকের দুঃখ নিবারণে তাহারা ছুটিয়া গিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী অপর কাহারও মতের প্রতীক্ষা রাখেন না—নিজ মনে যাহা ভাল বোধ করেন তাহাই বলেন ও তদনুরূপ কাজ করিয়া থাকেন, এবং তাহাই ঈশ্বরের বাণী ও প্রেরণা বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সততাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রকার কৃতকার্য্যতা বা অকৃতকার্য্যতার কারণ। ভূমিকম্পে অপর লোক যেরূপ বিচলিত হইয়াছে, মহাত্মা সেরূপ হন নাই, এইরূপ লক্ষণই দেখাইতেছেন; তাঁহার উপস্থিত গৃহীত কার্য্য—ভারতে অস্পৃশ্যতার উচ্ছেদসাধনরূপ ব্রতকেই তিনি অপর সকল কার্য্যের উপরে স্থান দিয়াছেন; আর ইহাই মাত্র বলিতে চাহেন যে ভূমিকম্প ঈশ্বরের ভারতবাসীর উপরে কোপ মাত্র প্রকাশ করিতেছে—সে কোপ এই অস্পৃশ্যতার বিদ্যমানতাজনিত। কবি ইহাতে আপত্তি ঘোষণা করিয়াছেন। বলেন নৈসর্গিক নিয়মে জাগতিক ব্যাপার ঘটে, তাহাতে ঈশ্বরের রোষ বা দয়া আরোপ করা চলে না। মহাত্মা যদি বলেন অস্পৃশ্যতার জন্য ঈশ্বরের রোষ প্রকাশ পাইয়াছে, তবে তিনি যে সনাতন হিন্দু প্রথার বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যদের মন্দিরের প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য ধর্ম্মহানি হেতুই বা সে আক্রোশ হইয়া থাকিবে না কেন? কবির কোমল কল্পনা ভূমিকম্পের প্রচণ্ড ব্যাপারে তেমন খেলার অবকাশ পায় না; ভারতীয় সাধনার সকল দিকের সহিত তিনি পরিচিতও নহেন, নইলে ভগবদ্ শক্তির করাল রুদ্র লীলার অন্তরালে তাঁহার করুণ হস্তের সংস্পর্শ দেখিতে পাইতেন। মহাত্মা সেকথা শুনিবেন না—তাঁহার ভগবান এখন অস্পৃশ্যতা ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইতেছেন না। তিনিও না। ইহাদের একদেশদর্শী দৃষ্টিতে বিরোধ হওয়াই স্বাভাবিক। সাধারণ লোক এই বিরোধকে উপভোগ করিয়াছে মাত্র—এবিষয়ে ইহাদের কাহারও মতানুবর্ত্তী হয় নাই।

বহির্বঙ্গ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন।—

বাঙ্গালার বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালীরা বৎসরে একবার সাহিত্যের নামে সম্মিলিত হয়। এবার বড় দিনের ছুটিতে গোরক্ষপুরে তাহা হইয়াছে। জন্ম ভূমির পরেই জাতীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ থাকা মানুষের স্বাভাবিক। সাহিত্যে জাতীয় সাধনা বা কলচারের প্রকৃষ্ট বিকাশ। বাঙ্গালার সাহিত্যে বাঙ্গালী যে উন্নতি করিয়াছে, দেশ বিদেশে তার যদি কোন খ্যাতি থাকে, তবে তার এই সাহিত্যের জন্যই। প্রবাসে বাঙ্গালীরা বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুশীলন করে; এবং বোধ হয় তাহাতেই বিদেশে স্বদেশ-বিচ্ছেদ জ্বালা অনেকটা ভুলিয়া থাকে। স্বদেশে তাহাদের মধ্যে যত ভেদ বিরোধ থাকুক না কেন, প্রবাসে বাঙ্গালী দিগের মধ্যে মিল ও ঐক্য আর সকল লোকের ঈর্ষার সঞ্চার করে। এইরূপ সম্মিলন দ্বার প্রবাসের বিভিন্ন স্থানের বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যে সেই ঐক্য ও প্রীতি আরও বৃদ্ধি পায় তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা কখনও এই প্রীতির আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাহারাই তাহা বুঝিতে পারেন। অন্য প্রদেশে বাঙ্গালীরা এইভাবে স্বজাতিদের সহিত মিশে এবং অপর প্রদেশীয় লোকের সহিত তেমন মিশে না বলিয়া—আপন প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতার মধ্যে থাকে বলিয়া—কেহ কেহ তাহাদের নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাতে

কেবল বৃহত্তর বঙ্গীয় ভাবের প্রসার সাধন হয় না, অথণ্ড ভারতীয় জাতীয়তারও সমৃদ্ধি করে। কারণ ভারতের জাতীয়তা একমাত্র তাহার সাধনার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত,—ভারতের অসাধারণ কৃষ্টি রসে তাহা সঞ্জীবিত। সাহিত্য সেই সাধনার উত্তম প্রকাশক ও বাহক। এযুগে বাঙ্গালা সাহিত্য সেই সাধনারই পরিপুষ্টি সাধন করিয়া চলিয়াছে। বহির্বঙ্গে বাঙ্গালী প্রবাসীদিগের প্রযত্নে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রভাব, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে। এযুগের শিক্ষা দীক্ষা ও বৈদেশিক ভাষা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক প্রদেশের লোককে অন্য প্রদেশ হইতে পৃথক করিয়া দিতেছে; তাহাতে জাতীয় সাধনার সাধারণ ভিত্তির উচ্ছেদ সাধনই হইয়া থাকে। তাহার মধ্যেও এক প্রদেশের সাহিত্যে যদি অন্য প্রদেশে দেশের স্বকীয় সাধনার কিঞ্চিন্মাত্রও প্রসারিত করিয়া দেশের লোকদিগকে আপন ভাবের প্রেরণা দেয়, তবে তাহাতেই জাতীয়তার সেই পরিপুষ্টি সাধন হয়। এই দৃষ্টিতে এইরূপ সম্মিলনের বিশেষ সার্থকতাই আছে। দুঃখের বিষয় অদ্যকার রীতি নীতি জীবন যাত্রা ও সাহিত্য ভারতীয় সাধনার ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে; তাহাতেই যত বিপদের আশঙ্কা, অন্যথা নহে।

সংস্কার-শক্তি।—

নব্য জাপানের উন্নতি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া থাকিবে। জাপান আজ এ যুগের মানব শক্তির প্রধান সাধন—বাণিজ্যের অধীশ্বর, সামরিক শক্তিতেও যে অন্য কোনও শক্তি অপেক্ষা হীনবল নহে, বরং অপর অপেক্ষা অধিক বল সঞ্চয় করিয়া বসিয়াছে বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। পৃথিবীর ভবিষ্যত ইতিহাসে জাপান একটা বিশেষ পরিচ্ছেদের সৃষ্টি করিবে একথাও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। জাপানের অভ্যুত্থানের মূল শক্তি কোথায় তাহা ভাবিয়া দেখার যোগ্য।

আজ এক শত বৎসরও হয় নাই যে জাপান এই উন্নতির পথে চলিয়াছে, আশি বৎসর পূর্ব্বেও জাপানের ঘোর দুরবস্থা ছিল—বহির্জগতের সহিত কোনও সম্বন্ধ উহার ছিলনা, দেশের লোক অন্তর্বিবাদে মগ্ন ছিল, ভূম্যাধিকারী সম্প্রদায় (শুগণগণ) বিভিন্ন ভাবে দেশ মধ্যে আধিপত্য করিয়া চলিত, সম্রাট নাম মাত্রে বিদ্যমান ছিলেন, রাষ্ট্রশক্তি হীনবল, জাতীয়তা বলিয়া কোনও পদার্থ ছিল না। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে কয়েক খানি আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ জাপান উপকূলে গিয়া উপস্থিত হয় এবং এই দাবী করে যে জগতের বাণিজ্য ক্ষেত্রে জাপানের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে হইবে। তাৎকালিক জাপানীরা তাহাতে ঘোর আপত্তি করিয়াছিল। আমেরিকানদিগের বিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহে যে একদল লোক তখন ইহাতে স্বীকৃত হয়, দেশবাসীর কাছে তাহাদিগকে বিশেষ নিগ্রহ পাইতে হইয়াছিল। তদবধি জাপান যে উন্নতি সাধন করিয়া বসিয়াছে, তখন যদি আমেরিকা তাহা বুঝিতে পারিত তবে তখন সে ঐরূপ কার্য্য করিত কিনা তাহা সন্দেহ (—বর্ত্তমান জগতের শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে জাপানই আমেরিকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী)। তখন আমেরিকা যে দাবী করিয়াছিল তাহা জাপানীরা অতি অসামাজিক ও বর্ব্বরোচিত বলিয়াই মনে করিত—কিন্তু তাহা হইতে জগতে এক নব শক্তির উদ্ভব হইল। তখন জাপানের লুপ্ত চেতনাতে যে আঘাত লাগে, তাহাতেই সমুদয় জাতির মধ্যে এক নূতন প্রেরণার সঞ্চার করে। সেই প্রেরণা কিন্তু জাপানকে আপন ভুলাইয়া পরকীয় ভাবে বিকাইয়া দিল না, বরং জাতীয় সংস্কারের ভিত্তিতে সকলের চিত্ত দৃঢ় বদ্ধ করিয়া এই নব শক্তির উদ্বোধন করিল—প্রধানতঃ দুইটী বিষয়ে তখন জাপানের পুনরাবর্ত্তন ঘটিল—

রাষ্ট্রে ও ধর্ম্মে। রাষ্ট্র নূতন করিয়া গঠিত হইল, শুগনরা নিজ নিজ ক্ষমতা ও আধিপত্য সম্রাটে আরোপিত করিয়া বৃহৎ জাপানী রাষ্ট্র শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিল; এক জাতীয় ঐক্য তখন হইতে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার মূল গ্রথিত হইল রাজসত্তার সংস্কার-জাত ভক্তি ও শ্রদ্ধার - যাহাতে জাপানী রাজার অস্তিত্বে আপন অস্তিত্ব মিলাইয়া দিয়া ধন্য বোধ করে জীবনে মরণে তাহার সঙ্গী যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব মনে করে। এতদপেক্ষাও গুরুতর পরিবর্ত্তন যাহা ঘটিল, তাহা তাহার ধর্ম্মে— যে প্রকারে বৌদ্ধ ধর্ম্ম তখন জাপানে চলিতেছিল, তাহাও এক প্রাচীন সংস্কার আরোপিত হইল, তাহা জাপানের প্রাচীন "সিণ্টু" ভাব। উহাই তখন হইতে জাপানের জাতী ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইল। এই ধর্ম্মে কোনও উপদেশিক বা পুস্তক নাই। ইহার শিক্ষা কেবলই জাতীয় শক্তি গঠনের অনুকূল—ইহার দ্বারা সকলেই মান করে যে জাপানীরা এক দেবংশজাত (দেবস্থান বলিতে প্রাচীনকালে জাপানীরা ভারতভূমিকে বুঝিত)। কয়েক বৎসর মধ্যে এই সিণ্টু ভাবই এক অসাধারণ সামরিক স্বদেশপ্রেমে পরিণত হইল—প্রকৃত ক্ষাত্রশক্তি সৃজন করিল। সেই শক্তি লইয়া জাপান সর্ব্বপ্রথম রুশ-জাপান যুদ্ধে অসীম বিক্রম দেখাইল, কোরিয়া দখল করিল ও এক্ষণে চীনের উপর কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ক্রমে সে আজ সর্ব্বতোমুখীন ক্ষমতা বিস্তার করিয়া বসিয়াছে এবং সকল দিকে আপন শক্তি প্রয়োগ করিতে চাহে। জাপান যে সংস্কার-শক্তিতে জগতে শক্তিমানের শ্রেষ্ঠ আসন, গ্রহণ করিয়াছে ইতালীতে মুসোলিনী সেই স্বদেশের সংস্কারের দোহাই দিয়াই জাতির আত্ম প্রতিষ্ঠায় ব্রতী, জ্যারম্যান হিটলারও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই আপন ধ্বংসশক্তি উদ্ধার সাধন করিতে চাহেন। ভারতের সংস্কারশক্তির তুলনা জগতে নাই, সে কিন্তু আজ তাহার বিলোপ সাধন করিতেই অতিমাত্র ব্যস্ত।

নাগরিকতা।---ভূমিকম্পের ন্যায় প্রচণ্ড দৈবী আঘাতে যে সকল বিষয়ে লোকের চৈতন্য হইতে পারে, তাহার মধ্যে নাগরিক জীবন যাপনের দোষ একটী। একালে অনেকেই আপন পৈত্রিক পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া বাস করিতেছেন। সহরে ছোট বা বড় ইষ্টকনির্ম্মিত পাকা বাড়ীতে বাস করিতে হয়। এই নাগরিক জীবন বঙ্গদেশে কতককাল যাবত আরম্ভ হইয়াছে. উত্তর ভারতে বহুদিন পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। এজন্য যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে কতকগুলি সহরের জন-সংখ্যা লক্ষাধিক। ঐ প্রদেশের গ্রামগুলিও সহরের ধরণে নির্ম্মিত—এক একটী পল্লীতে (কসবা) গৃহ বিন্যাস সহরের ন্যায়ই ঘন সন্নিবিষ্ট; মধ্যে মধ্যে অট্টালিকাও আছে। ভূমিকম্পে ঐ অঞ্চলেরই অধিক ক্ষতি হইয়াছে, বহু জীবননাশ ঘটিয়াছে। বাস্তবিক ভূমিকম্পে সহরেরই ভয় অনেক, পল্লী গ্রামের তেমন নয়। শুনিতে পাওয়া যায় উত্তর বিহারের যে সকল সহরের অট্টালিকা সমূহ ভগ্ন স্তূপে পরিণত হইয়াছে, তাহার কোন কোন স্থানে নূতন পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করা বা ভগ্ন ইমারত মেরামতে সরকার হইতে নিষেধাজ্ঞা হইয়াছে। এরূপ আজ্ঞা কতদিন কার্য্যকরী থাকিবে, বলা যায় না—পল্লীগ্রামের মত কুটীরে বাস করিয়া মানুষ কত দিন একালের ভোগ বিলাস হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে? পারিলে এ যুগের অন্য ব্যসন—মটর, সিনেমা, থিয়েটার—ইত্যাদিকেও বিসর্জ্জন দিতে হইবে। বাস্তবিক পাকা দ্বিতল ত্রিতল প্রভৃতি গৃহে বাসরূপ মহাপাপ যেমন ভূমিকম্পে ধরা পড়ে, একাল-প্রসূত এ সমুদয় ব্যসনগুলিরই সেইরূপ নিজ নিজ মহা পাতক আছে। তাহা যদি লোকে স্থায়ীভাবে কতকদিনও বুঝিয়া চলে, তবে ভূমিকম্প সার্থক হইল বলিতে হইবে। মোগল

বাদশাহদিগের গৌরবের দিনের বিশ্বব্যাপী খ্যাতির আকর্ষণে যে সকল পাশ্চাত্যদেশীয় পরিব্রাজকগণ এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহারা তখনকার এদেশের বড় বড় সেনাপতি ও রাজমন্ত্রীদিগের সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা ও বাস ভবন দেখিয়া বিস্মিত হইতেন - দ্বিতল ত্রিতল গৃহের একান্ত অভাব দেখিয়া, তাহারা ইউরোপীয় সহরগুলির উচ্চ উচ্চ প্রাসাদের তুলনায়, ভারতীয় জীবন প্রণালীর সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক ইহারা যে উচ্চ দ্বিতল, ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অক্ষম ছিলেন তাহা নহে—যাহারা তাজমহলের ন্যায় নির্ম্মাণকলার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা যে সৌন্দর্য্য ও প্রতিষ্ঠারবোধে বঞ্চিত ছিলেন, তাহাও নহে। বাস্তবিক এদেশের অনুকূল যে জীবন যাত্রা তাহাই তাহারা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। আজ সকলে বস্তু-তন্ত্রের মিথ্যা ভাণ করে, বাস্তবিক কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতাকেই অবহেলা করিয়া চলিয়াছে।

কংগ্রেস বনাম ফেডারেসন।—

বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রিক পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের স্থান অতি গৌণ হইয়া পড়িল। কংগ্রেসের প্রধান গৌরব—সে সমগ্র ভারতের লোকের মধ্যে একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতীয় জাতীয়তার সৃষ্টি করিয়াছিল। কংগ্রেসের শক্তিক্ষয়ে সে ঐক্য ও জাতীয়তায় ব্যাঘাত পড়িবে সন্দেহ নাই। কংগ্রেস চলিয়া গেলেও ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কার্য্য অবশ্যই চলিবে ; বিশেষতঃ নূতন শাসনসংস্কার প্রতিষ্ঠা হইতে যাইতেছে, তাহাতে ব্যবস্থাপক সভা গুলির কার্য্য ও তৎসম্পর্কীয় নানা আলোচনা-আন্দোলন চলিতে থাকিবে। যে রাজনৈতিক মনোবৃত্তি কংগ্রেসের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছিল, তাহাই অন্য ভাবে এই সকল সভার মধ্য দিয়া ক্রিয়া করিতে থাকিবে। সমগ্র ভারতের জন্য এক নিখিল রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠানের বিধানও এই নব-সংস্কারে আছে ; তাহা ফেডারসন —ব্রিটিশ ভারতও ভারতীয় রাজন্যবর্গে সম্মিলিত এক নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র। প্রকৃত জাতীয়তার দিক দিয়া সংগঠিত ও পরিচালিত হইলে এই ফেডারেসন কংগ্রেসেরই স্থান গ্রহণ করিতে পারিত। কংগ্রেস ও ফেডারেসন পরস্পর একাঙ্গ হইয়া উভয়েই সার্থক হইতে পারিত। কিন্তু ইহাদের উৎপত্তি ও লক্ষ্যের বিরোধিতায় ফলও বিপরীত হইতেছে।—জাতীয়তার আকাঙ্ক্ষিত ঐক্যের স্থানে জাতীয়তার ব্যাঘাতক অনৈক্য বৰ্দ্ধিত হইবারই সম্পূর্ণ আশঙ্কা রহিয়াছে। সমুদয় রাষ্ট্রসংস্কারের পরিণাম সকলদিকেই বিষম অনৈক্যেতে দেখা দিয়াছে—ব্যবস্থা-পরিষদের গঠন, সাম্প্রদায়িক ভেদ ও বিরোধ, এবং এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বীতা এ সমুদয়ই অনৈক্যের প্রতিপোষক—সঙ্কল্পিত ফেডারেশনে যে সেই অনৈক্যেরই প্রসার আরও বাড়িবে। এক প্রদেশের সহিত অপর প্রদেশে বিরোধ এবং দেশীরাজ্য ও বৃটিশ প্রজার মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি এই ফেডারেসন বা সম্মিলন হইতে হইবে ; তাহার লক্ষণ ইতি মধ্যেই দেখা দিয়াছে। রাজন্যবর্গ এ যাবত কাল ভারতীয় সাধারণ প্রজার ঈর্ষার পাত্র ছিলেন না, ভারতীয় প্রজারাও তাহাদের তেমন ছিল না। এখন বিশেষ রূপেই তাহা হইতে থাকিবে।

মৌলিকতা—ইংরেজী শিক্ষায়।—

প্রকৃত মৌলিকতা ইংরেজী-শিক্ষায় শিক্ষিত এদেশীয় লোকদিগ হইতে আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র—কোনও ইংরেজী শিক্ষিত ভারতবাসী প্রকৃত মৌলিক কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। মৌলিকতা বলিয়া একালের এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহা চলিয়াছে—যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের

উচ্চ উপাধি ইত্যাদি মিলিতেছে, তাহা অধিকাংশেই ইংরেজী ভাষাও ভাবের অনুবাদ ও অনুকরণ। তাহার মধ্যে ইতর বিশেষ বৈলক্ষণ্য কিছু অবশ্যই আছে। বিজাতীয় শিক্ষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে এদেশে যে মৌলিক চিন্তা দেখা গিয়াছে, তাহার তুলনা এখন বিরল। দৃষ্টান্ত স্বরূপে মুসলমান শাসন কালেও, বিশুদ্ধ সংস্কৃত শিক্ষার পরিবেষ্টনের মধ্যে নব্য ন্যায়, নব্যস্মৃতি, বৈষ্ণব দর্শন, অদ্বৈত-সিদ্ধি প্রভৃতির প্রণয়ন বঙ্গদেশ দেখাইতে পারে। তখন ঘরে ঘরে পণ্ডিত গণের নানা শাস্ত্রের টীকা টীপুনীতে যে মৌলিকতা দেখা যায়, অদ্যকার অধ্যাপনাক্ষেত্রে তাহা একান্ত দুর্ল্লভ। একালে নানা বৈদেশিক প্রভাবের মধ্যে দয়ানন্দ সরস্বতী ও রামকৃষ্ণ পরমহংস দুইটী বিশিষ্ট চিন্তা ও কর্ম্মধারায় প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। ইঁহাদের ইংরেজী বর্ণ শিক্ষা পর্য্যন্ত ছিল না কিন্তু মৌলিকতা বিশুদ্ধ ও বিশাল। তাহার প্রভাব নব্যভারত যতদূর পাইয়াছে, এমন আর কাহারও নহে।

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম্, এ, এল্ এম্ এস্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অগস্ত্য সংহিতা,—মহর্ষি অগস্ত্যপ্রণীত প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ।

মহর্ষি অগস্ত্য ভগবান্ ধন্বন্তরির শিষ্য ছিলেন,—দক্ষিণাপথে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। আয়ুর্ব্বেদের যেমন ভরদ্বাজ-সম্প্রদায়, ধন্বন্তরি-সম্প্রদায় প্রভৃতি সম্প্রদায়, তেমনি যে সকল বৈদ্য অগস্ত্যসংহিতা অবলম্বন করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তাঁহারা অগস্ত্য সম্প্রদায় নামে খ্যাতি লাভ করেন। এককালে ভারতে অগস্ত্য-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল।

যে সকল আচার্য্য অগস্ত্য-সম্প্রদায়কে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা অষ্টাবিংশতি; কেহ বলেন দ্বাবিংশতি কেহবা বলেন চতুশ্চত্বারিংশৎ। ইঁহাদের রচিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থও ছিল, সে সকল গ্রন্থের অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কোন কোন গ্রন্থ দ্রাবিড় ভাষাতেও রচিত হইয়াছিল। দ্রাবিড় ভাষায় রচিত গ্রন্থ দক্ষিণাপথে এখনও পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যাচার্য্য বঙ্গসেন স্বকীয় সংগ্রহ গ্রন্থের শেষে লিখিয়া গিয়াছেন,—

> ' অগস্ত্যসংহিতেয়ং প্রাক্‌খ্যাতা মজ্জন্মতস্ততঃ
> গদাধরগৃহে জন্ম লব্ধা মৎপ্রতিসংস্কৃতা।
> বঙ্গসেন ইতিখ্যাতো নাম্নাসৌ তদনন্তরম্
> গ্রন্থোঽয়ং সর্ব্বসিদ্ধান্তসারঃ শীঘ্রফলপ্রদঃ॥"

ইহার ভাবার্থ যথা,—আমার জন্মের পূর্ব্বে এই গ্রন্থ অগস্ত্যসংহিতা নামে খ্যাত ছিল, তারপর আমি ইহার প্রতিসংস্কার করিলে ইহার নাম হয় বঙ্গসেন। এই গ্রন্থ সকল সিদ্ধান্তের সার, ইহার যোগ সকল সদ্যঃ ফলপ্রদ।"

শল্যতন্ত্র

ঔপধেনবতন্ত্র ও ঔরভ্রতন্ত্র,—উপধেনব ও ঔরভ্র নামক মহর্ষিদ্বয় বিরচিত শল্যতন্ত্র প্রধান আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ। উক্ত মহর্ষিদ্বয় ভগবান্ ধন্বন্তরির শিষ্য ও সুশ্রুতের

সহাধ্যায়ী ছিলেন। বর্ত্তমানে ঔপধেনবতন্ত্র ও ঔরভ্রতন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, এমন কি উক্ত তন্ত্রদ্বয়ের পাঠসকল টীকাকারগণ কর্ত্তৃক যাহা উদ্ধৃত হইয়াছিল তাহাও এখন বিরল। সুতরাং উক্ত তন্ত্রদ্বয়ের কোন পরিচয়ই জানিতে পারা যায় না। কেবলমাত্র সুশ্রুতের—

"ঔপধেনবমৌরভ্রং সৌশ্রুতং পৌষ্কলাবতম্।
দোষাণাং শল্যতন্ত্রাণাং মূলান্যেতানি নির্দ্দিশেৎ॥"

এই শ্লোকের দ্বারা জানিতে পারা যায়, পরবর্ত্তীকালে যাহা কিছু শল্যতন্ত্র রচিত হইয়াছিল, সে সকলের মূল ঔপধেনব ও ঔরভ্রতন্ত্র প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন, ডল্লনাচার্য্যের লেখায় দেখিতে পাওয়া যায়,

"দোষোঽল্পোঽহিত-সম্ভূত জ্বরোৎসৃষ্টস্য বা পুনঃ।
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরম্॥"

সুশ্রুতের এই শ্লোকের ব্যাখায় তিনি বলিয়াছেন "ঔপধেনবমতমিদম্" অর্থাৎ ইহা মহর্ষি উপধেনবের মত।

সৌশ্রুততন্ত্র বা বৃদ্ধসুশ্রুত।—সুশ্রুত সংহিতা নামক প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের মূল সৌশ্রুততন্ত্র বা বৃদ্ধসুশ্রুত। যাঁহারা সৌশ্রুততন্ত্র এবং সুশ্রুত সংহিতা একই গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন,—তাঁহাদের ভ্রান্তিনিরসনের নিমিত্ত প্রমাণসকল 'আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস' প্রবন্ধে সুশ্রুত সংহিতার প্রসঙ্গক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সুশ্রুতসংহিতায় বিদেহাধিপতির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বহু পরবর্ত্তীকালের লোক, সুতরাং সৌশ্রুততন্ত্র বা বৃদ্ধসুশ্রুত এবং সুশ্রুতসংহিতা একই গ্রন্থ ইহা বিচারসহ নহে, সুশ্রুতসংহিতা পরবর্ত্তী কালে রচিত। শিবদাস সেনের সময়ে বৃদ্ধসুশ্রুতের অস্তিত্ব ছিল, ইহা অনুমান করিতে পারা যায়। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে হয়তো বা এখনও বৃদ্ধসুশ্রুতের সন্ধান মিলিতে পারে।

বৃদ্ধসুশ্রুত ও সুশ্রুতসংহিতা যে একই গ্রন্থ নহে, তাহা মাধবনিদানের আগন্তু জ্বরের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিজয় রক্ষিতের বাক্য হইতেও প্রতিপন্ন হয়। তিনি বলিয়াছেন,—"পুষ্পেভ্যো গন্ধরজসী ওজস্বিভ্যো যদানিলঃ"---ইত্যাদি পাঠ বৃদ্ধসুশ্রুতের। বর্ত্তমান সুশ্রুত ও বৃদ্ধসুশ্রুত যদি একই গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে উক্ত পাঠ বর্ত্তমান সুশ্রুতেও দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু তাহা পাওয়া যায় না।" সিদ্ধযোগ নামক বৃন্দরচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থের অর্শোরোগের টীকায় কবিরাজ শ্রীকণ্ঠ সেন পিপ্পল্যাদি তৈলের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"বৃদ্ধসুশ্রুতে তু তৈলেঽস্মিন্ চতুর্গুণং তোয়ং দর্শিতম্।" বর্ত্তমান সুশ্রুতসংহিতায় পিপ্পল্যাদি তৈল বলিয়া কোন পদার্থই দেখিতে পাওয়া যায় না। তদ্ভিন্ন চক্রদত্তের বাতব্যাধির টীকায় শিবদাস সেন কাকোল্যাদিগণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে "বৃদ্ধসুশ্রুতে তু কাকোল্যাদির্যথা,—বলিয়া একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সুশ্রুত সংহিতার কাকোল্যাদিগণের কোন শ্লোক দেখা যায় না, উহা সংস্কৃত গদ্যে লেখ (সু, সূ, ৩৯অ)। সুতরাং সৌশ্রুত সংহিতা ও বৃদ্ধসুশ্রুত, এবং সুশ্রুতসংহিতা ভিন্ন গ্রন্থ। উক্ত প্রাচীন গ্রন্থ বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না।

———

আর্য্য মনোবিজ্ঞান

পণ্ডিত—শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ শরণ দেব

পার্থিব গব্য ঘৃতে কুঙ্কুম চূর্ণ রাখিয়া দিলে কুঙ্কুম-চূর্ণের গন্ধ পূর্ণ অনুরাশির গন্ধ-সংক্রান্ত গব্য ঘৃত যেমন কুঙ্কুমের গন্ধ সংক্রান্ত বা গন্ধযুক্ত হইয়া বায়ু যোগে কুঙ্কুম-গন্ধটী আমাদের নাসিকার নিকটে আনিয়া অনুভূতির আলোকে প্রকাশ করে, এইরূপ ঘ্রাণও চম্পকাদি পুষ্পের গন্ধ-পূর্ণ অনুরাশি যুক্ত হইয়া উহাদের রূপাদি জ্ঞান না জন্মাইয়া গন্ধ মাত্রের জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। অতএব আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় গব্য ঘৃতাদির মত পার্থিব বস্তু বিশেষ।

জলীয় অনুরাশির সমবায়ে আমাদের রসনেন্দ্রিয় গঠিত হয়। আমাদের রসনেন্দ্রিয় জলজাত জলীয় বস্তু বিশেষ। শক্তু (ছাতু) ও জলের সংমিশ্রণে শক্তু-সংক্রান্ত জল যেমন শক্তুর একটা অপূর্ব্ব আস্বাদ জন্মাইয়া থাকে, শক্তুর আস্বাদ উৎপাদনে জল যেরূপ অসাধারণ কারণ বিশেষ, আমাদের রসেনেন্দ্রিয়ও এইরূপ আস্বাদ্যমান বস্তুর রূপাদি গ্রহণ না করিয়া রস মাত্রের জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। রসনেন্দ্রিয় আস্বাদবুদ্ধি উৎপাদনে অসাধারণ কারণ বিশেষ। অতএব শক্তু, সংক্রান্ত জলের মত রসনেন্দ্রিয়ও জলজাত বস্তু বিশেষ।

অন্ধকার গৃহে প্রদীপ রাখিয়া দিলে ওই প্রদীপ প্রকাশ্যমান বস্তুর গন্ধাদি গ্রহণ না করিয়া পরকীয় রূপ মাত্র প্রকাশ করে। চক্ষু ইন্দ্রিয়টীও প্রদীপের মত গন্ধাদি গ্রহণ না করিয়া দৃশ্যমান বস্তুর রূপের জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। এই জন্য আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয়টী যে প্রদীপের মত তেজোময় তৈজস বস্তু বিশেষ ইহা বলিতে পারা যায়।

শ্রুতি প্রমাণদ্বারাও যে তৈজস বস্তু ইহাও প্রমাণিত হয়। বেদে ইহা শুনিতে পাওয়া যায় যে মরণের পরে পার্থিব শরীর পৃথিবীতেই বিলীন হইবে। তেজোময় সূর্য্য বাম ও দক্ষিণ নেত্রের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়াছেন। সূর্য্যই তোমার চক্ষুর উপাদান। চক্ষু সূর্য্যের উপাদানে অনুগৃহীত বলিয়া উহা মরণের পরে তেজোময় সূর্য্যেই বিলীন হইবে। উপাদান কারণেই তাহার কার্য্যের লয় ঘটিয়া থাকে। চক্ষু তেজোময়ী সূর্য্য-প্রসূত বস্তু বলিয়াই শ্রুতি চক্ষুর তেজো-ধাতু সূর্য্যে লয়ের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অতএব চক্ষু যে তৈজস বস্তু ইহা শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে।

আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয়টী তৈজস বস্তু বিশেষ। অন্ধকারে বিড়ালাদি জন্তুর চাক্ষুষ রশ্মিগুলি বহির্গত হয়, ইহা আমরা দেখিতে পাই আমাদের চক্ষুর ও নৈসর্গিক রশ্মিপুঞ্জ আছে। কিন্তু আমাদের চাক্ষুষ রশ্মিগুলির রূপ বা প্রভা রাশি অনুদ্ভূত। সেই জন্য আমরা অন্ধকারে বস্তু দর্শন করিয়া নির্ণয় করিতে পারি না। আমাদের চাক্ষুষ রশ্মিগুলি উহাদের আশ্রয়ভূত তেজোময় গোলক যন্ত্র হইতে বাহিরে আসিয়া বাহ্য বস্তুর উপরে জলের মত ছড়াইয়া পড়িলেও চাক্ষুষ রশ্মি পুঞ্জের রূপরাশি অনুদ্ভূত বলিয়া উহার বাহিরের সৌরাদি কিরণ রাশির প্রভা বা রূপের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজের মধ্যে বাহ্য দৃশ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পাত করিতে পারে না। বিড়ালাদির চক্ষুর মত

আমাদের চাক্ষুষ রশ্মির রূপ উদ্ভূত থাকিলে আমাদের চক্ষু সৌর অথবা চান্দ্রাদি কিরণের অপেক্ষা না রাখিয়াও অন্ধকার গৃহে নিজের বিষয় রাশি স্পষ্টরূপে নিরূপন করিয়া বাছিয়া চিনিয়া লইতে সমর্থ হইত। আমাদের চাক্ষুষ রশ্মি রাশি উক্ত অনুদ্ভূত রূপশালী বস্তু বলিয়া উহারা উদ্ভূত রূপশালী সৌরাদি কিরণ রাশির অধীনে থাকিয়াই প্রকাশ্য বস্তুর রূপাদি গ্রহণ করে। আর আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয়টী প্রদীপের মত তৈজস বস্তু বলিয়া তাহার রূপের প্রত্যক্ষটা যে হওয়াই চাই এরূপ একটা কিছু বিশেষ নিয়ম থাকিতে পারে না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রীষ্ম ঋতুর উত্তাপে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি জলিয়া যায়। গ্রীষ্ম ঋতুর তাপ আছে ইহা আমরা অনুভব করি। সুতরাং গ্রীষ্ম যে উত্তাপশালী আগ্নেয় বস্তু বিশেষ ইহার আর অস্বীকার করিলে চলিবে না। গ্রীষ্মের রূপ কিন্তু অনুদ্ভূত বলিয়া উহা আমাদের প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় হইতে পারে না।

গ্রীষ্ম ঋতুর স্পর্শ (উষ্ণ স্পর্শ) উদ্ভূত বলিয়া আমরা উহা অনুভব করিতে পারি। আমাদের চক্ষু আগ্নেয় বস্তু হইলেও উহা হইতে নিঃসৃত রশ্মি রূপটীর গ্রীষ্ম ঋতুর রূপের মত অনুদ্ভূত বলিয়া উহা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সৌর কিরণ রাশি চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিফলিত হইলে উত্তপ্ত সৌর কিরণ রাশির রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। কিন্তু চন্দ্র মণ্ডলে প্রতিফলিত সৌর উত্তপ্ত কিরণ রাশির উষ্ণ স্পর্শটা অনুদ্ভূত বলিয়া প্রত্যক্ষ করিবার অযোগ্য হইয়া থাকে। অতএব বস্তুটী আগ্নেয় হইলে তাহার উষ্ণ স্পর্শটাও যে প্রত্যক্ষ হওয়াই চাই এরূপ ভাবের একটা অনুযোগ আর আগ্নেয় বস্তু বলিয়া বহির্নিঃসৃত চাক্ষুষ রশ্মিগুলির উপরে আসিতে পারে না। চাক্ষুষ রশ্মির উষ্ণ স্পর্শটা যেহেতু অনুদ্ভূত।

পাশ্চাত্য দেশবাসী অধুনাতন শরীর বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, বাহিরের সৌর অথবা চান্দ্র প্রভৃতি আলোক কণিকা গুলি চক্ষুর জালিময় পর্দায় পড়িয়া চক্ষু ইন্দ্রিয়ে পদার্থের একটী প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে। তাহার ফলে চক্ষু দ্বারা প্রতিবিম্বিত পদার্থের রূপ ও আকৃতি প্রভৃতির জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। চক্ষু প্রদীপের মত তৈজস বস্তু বলিয়াই যে, তাহার স্বগত রশ্মিপুঞ্জ আছে, ও তাহার চক্ষুর গোলক যন্ত্র হইতে বাহিরে যাইয়াই যে বাহ্য বস্তুর উপরে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ করে আর তাহার ফলে বাহ্য আলোক তরঙ্গ সহকারে দৃশ্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া তাহার জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে, এরূপ ব্যবস্থা অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয়টী স্ফটিকাদি পার্থিব বস্তুর মত একটী স্বচ্ছ যন্ত্র বিশেষ।

এইবার বিবেচনা কর, যে সকল পণ্ডিত চাক্ষুষ রশ্মির অস্তিত্ব মানিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে চাক্ষুষ রশ্মির আশ্রয়ভূত এরূপ একটা স্বচ্ছ যন্ত্রের অঙ্গীকার করা উচিত যে, যাহার ভিতর দিয়া চাক্ষুষ রশ্মিপুঞ্জ প্রতিফলিত হইয়া বাহিরে যাইয়া দৃশ্যের উপরে জালের মত বিকীর্ণ হইয়া ছড়াইয়া পড়িতে পারে। আর যে সকল পণ্ডিত চাক্ষুষ রশ্মির অস্তিত্বে অবিশ্বাসী তাঁহাদের মতেও চক্ষু যন্ত্রটীকে এরূপ একটা স্বচ্ছ বস্তু বলিয়া স্বীকার করা উচিত যে, যাহার ভিতর দিয়া বাহিরের আলোক কণিকা গুলি প্রতিফলিত হইয়া—চক্ষু যন্ত্রে বাহ্য পদার্থের প্রতিবিম্ব লইয়া—প্রতিবিম্বপাত করিতে পারে। উভয় প্রকার পণ্ডিত মণ্ডলীর মতে এরূপ একটা স্বচ্ছ বস্তু আপেক্ষিত হয় যে, যাহা না থাকিলে চাক্ষুষ রশ্মিগুলি বাহিরে যাইয়া দৃশ্যের উপরে সংলগ্ন হইতে পারে না। আর শরীর-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের অভিমত—আলোক কণিকাগুলিও চক্ষুযন্ত্রের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া চক্ষু যন্ত্রে

পদার্থের প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করিতে পারে না। দেখ, আলোক কণিকাগুলি চক্ষুর জালিময় পর্দ্দায় পতিত হইয়া ক্রমশঃ চক্ষু যন্ত্রে যদি পদার্থের প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে চাক্ষুষ রশ্মির অস্তিত্ববাদী পণ্ডিতগণের সমান অনুযোগ হইতে পারে যে, আমাদের চাক্ষুষী রশ্মিগুলিই বা কি জন্য উহাদের আশ্রয়ভূত স্বচ্ছ তেজোময় গোলক যন্ত্র হইতে বাহিরে যাইয়া স্বীয় বিষয়ের উপরে ছড়াইয়া পড়িয়া আলোক তরঙ্গ সহকারে বিষয়ের প্রতিবিম্বে প্রতিবিম্বিত হইয়া নিজের মধ্যে নিজের কেন্দ্রে আসিয়া মন দ্বারা স্বীয় বিষয়ের জ্ঞান জন্মাইতে পারিবে না। চাক্ষুষ রশ্মিগুলি বাহিরে যাইয়া বস্তুর জ্ঞান জন্মাইতে পারে না। চক্ষুর রশ্মিরাশি নাই। এ বিষয়ে বিশেষ কোনও হেতু প্রদর্শন করা যায় না। প্রত্যুত ইহা বলিতে পারা যায় যে, বিড়ালাদি জন্তুর চাক্ষুষ রশ্মি গুলি বাহিরে আসে ইহা আমরা দেখিতে পাই। তাহার তুলনায় চক্ষু জাতীয় পদার্থ মাত্রেও রশ্মিপুঞ্জ থাকা স্বাভাবিক। ইহা নিশ্চয় করিতে পারা যায়। যদি বল, বিড়াল ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি জাতিগুলি মনুষ্যাদি জাতি হইতে বিভিন্ন, সুতরাং উহাদের চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়েরও প্রভেদ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য পণ্ডিতেরাও বলিতে পারেন যে, যে জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের যাহা প্রতিনিয়ত বিষয়—সেই ইন্দ্রিয়ের সেই বিষয় গ্রহণের ব্যবস্থা না হইয়া তদ্বিপরীত ব্যবস্থাটাও ঘটিয়া যাউক ?—

নাসিকা ছাড়া চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় দ্বারা—কোনও এক জাতি বিশেষের (পশু পক্ষী প্রভৃতির) গন্ধ জ্ঞান হইয়া যাউক এইরূপ আপত্তিও আসিয়া পড়ে। যাহাই হউক, প্রদীপের সহিত চক্ষুর তুলনা করিতে গিয়া মাঝখানে অবান্তর প্রাপ্ত পদার্থ-বিদ্যার বিচারের গৌরবটা টানিয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। ইহা পদার্থবিদ্যার সমালোচক পণ্ডিতগণের বিচার্য্য বিষয় বিশেষ। চাক্ষুষ রশ্মির আস্তিত্বটা বিশেষরূপ অবগত হইতে হইলে ন্যায় দর্শনের ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

জৈন পণ্ডিতেরা বলেন, যাহা তৈজস বস্তু সে কখনও অন্ধকারের প্রকাশক হইতে পারে না। তৈজস প্রদীপ দ্বারা অন্ধকার প্রকাশিত না হইয়া বিনষ্টই হইয়া যায়। প্রদীপ রশ্মির বর্ত্তমান অন্ধকারের অবস্থিতি হওয়া সম্ভবে না। চক্ষু দ্বারা আমরা যখন অন্ধকার প্রত্যক্ষ করি, তখন চক্ষু আলোকের অপেক্ষা না রাখিয়াই অন্ধকার প্রত্যক্ষ করে। আমাদের চক্ষু তৈজস বস্তু হইলে তাহা স্বগত তেজসহকারে কখনও অন্ধকার দেখিয়া তাহা (অন্ধকার) কখনও আমাদের অনুভূতির ভিতরে আনিয়া প্রকাশ করিতে পারিত না। অর্থাৎ চক্ষুর স্বগত রশ্মি থাকিলে ওই রশ্মিপুঞ্জের রূপ বা প্রভা থাকাই স্বাভাবিক। আর চাক্ষুষ রশ্মিপুঞ্জ স্বগত প্রভা সহকারে অন্ধকারও কখন প্রত্যক্ষ করিতে পারিত না। কারণ আলোকের সমকালে এক জায়গায় মিলিয়া মিশিয়া অন্ধকার থাকিতে পারে না। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারা যায় যে আমাদের চাক্ষুষ রশ্মির রূপ অনুদ্ভূত বলিয়া শুধু উহার দ্বারা বস্তুর নীল পীতাদি রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না। দেখ হাঁড়িতে বালি দিয়া অগ্নি দ্বারা ওই বালুকারাশি উত্তপ্ত করিলে উহাদের অভ্যন্তরবর্ত্তী বহ্নি আছে ইহা সত্য, কিন্তু ওই বহ্নির রূপ অনুদ্ভূত। সেই জন্য উত্তপ্ত বালুকা কণাগুলি অন্ধকার গৃহে রাখিয়া দিলেও উত্তপ্ত বালুকার অভ্যন্তরস্থ বহ্নির অনুদ্ভূত রূপ দ্বারা যেমন গৃহের অন্ধকার নষ্ট হইতে পারে না। এইরূপ, আমাদের চাক্ষুষ রশ্মির রূপ অনুদ্ভূত। সেই জন্য বাহ্য আলোকের অপেক্ষা রাখিয়াই চক্ষু বস্তুর রূপাদি জ্ঞান

জন্মাইয়া থাকে। চক্ষু তৈজস দ্রব্য হইলেও উহার রূপ অনুদ্ভুত বলিয়া তৈজস চক্ষু দ্বারা অন্ধকার নষ্ট না হইয়া উহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আলোকের অপেক্ষা না রাখিয়াই চক্ষু অন্ধকার প্রত্যক্ষ করে। বিড়ালাদি জন্তুর মত চাক্ষুষ রশ্মির রূপ উদ্ভুত থাকিলেই উহার দ্বারা অন্ধকার প্রত্যক্ষ হইতে পারিত না, কারণ আলোক ও অন্ধকার ইহারা কখনও একই সময়ে এক জায়গায় থাকিয়া কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

যাহার দ্বারা শৈত্য ও তাপাদি জ্ঞান নিষ্পন্ন হয়, তাহা স্পর্শেন্দ্রিয়। আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়টী বায়ুজাত বায়বীয় বস্তু বিশেষ। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে চামর ব্যজন করিলে চামর উত্থিত বায়ু ঘর্ম্ম জলীয় কান্তি (রূপ) ও লবণাদি রসের অভিব্যক্তি না করিয়া জলীয় শীত স্পর্শ মাত্র আমাদের অনুভূতির সম্মুখে আনিয়া প্রকাশ করে। স্পর্শ জ্ঞানে বায়ুই একমাত্র অসাধারণ সাধন বিশেষ। চামর-উত্থিত বায়ুর মত আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ও বায়বীয় বস্তু বিশেষ। দেহের আপাদ মস্তক ব্যাপিয়া উপরিতন ত্বকের ভিতরে আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় রহিয়াছে। স্পর্শেন্দ্রিয়ে জলীয় পার্থিব ও আগ্নেয় বস্তুর সংসর্গ ঘটিলেও উহা (স্পর্শেন্দ্রিয়) জলীয় ও পার্থিবাদি বস্তুর রূপ রসাদি গ্রহণ না করিয়া বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ তৎ সজাতীয় (পরকীয় জলীয়াদি স্পর্শজাতীয়) বিষয় মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহার জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। চামর উত্থিত বায়ুর সহিত স্পর্শেন্দ্রিয়ের তুলনা করিলেও ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় বায়ুজাত বস্তু বিশেষ।

যাহার দ্বারা বায়ু তরঙ্গে সমুত্থিত ধ্বনি রাশি শুনিতে পাওয়া যায় তাহা শ্রোত্রেন্দ্রিয়। বধির ব্যক্তির চক্ষু রসনা ত্বক্ ও ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় অবিকল থাকিলেও সে শব্দ শুনিতে পায় না বা পারে না। আর অন্ধাদি লোকেও আবার শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের অবৈকল্য বশতঃ শব্দও গ্রহণ করিয়া তাহার জ্ঞান জন্মাইতে পারে। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, শব্দরাশি যে প্রদেশে গৃহীত হয়, তাহাও শব্দগ্রাহী একটা ইন্দ্রিয় বিশেষ। আর তাহা শোত্র আখ্যায় অভিহিত হয়। জীবের অদৃষ্ট বিশেষ শব্দরাশি শ্রোত্র প্রদেশেই (কর্ণ বিবর পরিচ্ছন্ন আকাশ প্রদেশেই) গৃহীত হয়। পটহ (এ দেশে চলিত ভাষায় ঢাকে) দণ্ডের আঘাত প্রদান করিলে পটহের অভ্যন্তরবর্ত্তী আকাশ আছে বলিয়াই উহা (পটহ) যেমন শব্দরাশির অভিব্যক্তি বা উৎপন্ন করে। এইরূপ আমাদের কর্ণ পটহও নানা রকমের শব্দবাহী বায়ু তরঙ্গের আঘাত প্রাপ্ত হইলে (কর্ণপটহ) শব্দ গ্রহণ করিয়া তাহার জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। অতএব পটহের অভ্যন্তরবর্ত্তী আকাশ প্রদেশের মত আমাদের শ্রোত্র আকাশ ছাড়া কিছুই নহে। একই মহাকাশ কর্ণ বিবর দ্বারা পরিচ্ছন্ন হইয়া বহু শ্রোত্র রূপে প্রতিভাত হয়। আর আকাশ সর্ব্বত্র সমানভাবে থাকিলেও শব্দ গ্রাহক অদৃষ্ট বশতঃ কর্ণ বিবর প্রদেশেই শব্দ রাশি গৃহীত হয়।

আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি যাইতেছি, আমি স্পর্শ করিতেছি, গন্ধ গ্রহণ করিতেছি, আমি রসাস্বাদ করিতেছি, ইত্যাদি রূপে দেখা শোনা প্রভৃতি মানসিক নানাবিধ বৃত্তি বা ভাবরাশি বিভিন্ন হইলেও কুসুম সমূহে সূত্রের মত আমি আমি এইরূপ যে একটা একটানা মানসিক ভাব বা অহম্ভাব, ইহা দর্শন স্পর্শন ও শ্রবণাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাব হইতে বৃহৎ বা বড় বলিয়া মানসিক তাবৎ বৃত্তির ভিতর দিয়া আমি আমি এইরূপে নিজের উৎকর্ষ বা গর্ব্ব খ্যাপন করে। আর ইহার নাম অহঙ্কার, অহম্বুদ্ধি, অহংজ্ঞান ইত্যাদি। এই অহঙ্কার আমাদের অন্তর্জ্জগতের

কর্ত্তা মালিক বলিয়া অহঙ্কর্ত্তা নামেও পরিচিত হয়। সাংখ্যবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলি অহঙ্কার বা অহংতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয়। অহংতত্ত্বই জ্ঞানেন্দ্রিয় নিচয়ের উপাদান। এই অহঙ্কার আবার অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। স্থূল জড় শরীর ও গৃহাদি বহির্বিষয়ে যে চেতন আত্মবুদ্ধি বা আত্মাভিমান, তাহা বহির্মুখ অহঙ্কার। আর যাহা অন্তঃকরণের জ্ঞান বা চৈতন্য বলিতে যাহা কিছু পরিচিত, তাহাকে বিষয় করিয়া, নিজের মধ্যে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পাত বা সম্বন্ধ বিশেষ ঘটাইয়া, নিজে অচেতন ও দৃশ্যভূত জড় বস্তু হইলেও আমি চেতন জ্ঞাতা— এইরূপে নিজেকে চেতন স্বরূপে অভিমান করে তাহা অন্তর্মুখ অহঙ্কার। ইহা সাংখ্য দর্শনে বৈকারিক (সাত্ত্বিক) অহঙ্কার আখ্যাতেও প্রসিদ্ধি লাভ করে। পাতঞ্জল দর্শনে অন্তর্মুখ অহঙ্কারটী অস্মিতা নামে পরিচিত হয়। ঘটে মৃত্তিকা যেরূপ অনুস্যূত থাকে। এইরূপ দেখা শোনা ঘ্রাণ লওয়া আস্বাদ করা স্পর্শকরা এই পাঁচটী ভাবের (জ্ঞানেন্দ্রিয় জাত ভাবের) পশ্চাতে পশ্চাতেও উক্ত অস্মিতা অনুস্যূত রহিয়াছে। অহম্ভাব বা আমাকে ছাড়িয়া দেখা শোনা প্রভৃতি আন্তরিক ভাবগুলি অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইতে পারে না। স্বপ্ন সময়েও আমি বা অহম্ভাব থাকে। সেই জন্য স্বপ্ন সময়েও চক্ষু দ্বারা দেখিতেছি শ্রোত্রে শুনিতেছি এইরূপে দেখা শোনার ভাবগুলি অন্তঃকরণে অনুভূত হয়। সুষুপ্ত অবস্থায় উক্ত অস্মিতা সৌষুপ্তনিবিড় অজ্ঞানে বিলীন থাকে। সেই জন্য আমিও আত্মহারা হইয়া থাকি। আমি আমি এইরূপে আমি আমাকে অনুভব করিতে পারি না। আর সৌষুপ্ত অজ্ঞানে অহঙ্কারের বিলয়ে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দেখা শোনা প্রভৃতি ভাবগুলি সুষুপ্ত দশায় অন্তঃকরণে আবির্ভূত ও অনুভূত হইতে পারে না। দেখা শোনা প্রভৃতি যাহা কিছু জ্ঞানেন্দ্রিয়-জাত ভাব রাশি অনুভূত হয়। সমূহ ভাব বা বৃত্তি দর্শনাদি বৃত্তির পশ্চাতে অনুস্যূত ভাবে একই আমি রহিয়াছি। দেখার আমিও স্পর্শ করার আমি ভিন্ন নহি। যে আমি দেখিয়াছি াম সেই আমিই এক্ষণে স্পর্শও করিতেছি। এইরূপে দেখার অতীত সময়ের আমি ও স্পর্শ করার বর্ত্তমান আমি উভয় কালেই অভিন্নরূপে প্রত্যভিজ্ঞাত (সেই আমিই এই আমি এইরূপে পরিজ্ঞাত) হইয়া থাকি। স্বপ্ন দশায় স্থূল দেহ মৃত আত্মার মত আমি মনুষ্য শরীরী এইরূপে দেহের উপরে আত্মা-ভিমান না থাকিলেও "আমি আছি" সূক্ষ্ম শরীরে অভিমান ঘটিয়া থাকে। আমার চক্ষু রহিয়াছে সম্মুখে হস্তী দেখিতেছি, শ্রোতে শুনিতেছি এই প্রকারে স্বপ্নেও অহম্ভাব বা আমিত্বের অনুগতিটা চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে পশ্চাতেও থাকে।

শুনিতে পাওয়া যায়, মৃত্যুকালে অহঙ্কর্ত্তা জ্ঞাত সূক্ষ্মদেহ অবলম্বন করিয়া স্থূল শরীর হইতে অন্যত্র গমন করেন। তখন তিনি সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী হইয়া থাকেন। স্থূল দেহে তাঁহার অভিমান তখন থাকে না। অহঙ্কর্ত্তা জ্ঞাত অহঙ্কার স্বপ্ন মূঢ় জীবের মত মরণের পরে স্থূল শরীরে অভিমান না করিলেও স্বপ্নে যেমন জ্ঞাত আমার চক্ষু আদি রহিয়াছে এইরূপে চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ের উপরে স্বপ্ন দ্রষ্টার স্বপ্ন সময়ে অভিমান প্রকাশ পায়। এইরূপ, মরণের পরবর্ত্তী সময়ে সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী অহঙ্কর্ত্তা জ্ঞাতা অহম্ভাবের স্বপ্ন দশার মত চক্ষু আদি তাবৎ ইন্দ্রিয়ের উপরে আমার চক্ষু আমার শ্রোত্র ইত্যাদি আবরণের অভিমানও থাকিতে পারে। সেই জন্য ইহাও বলিতে পারা যায় যে, মরণে স্থূল শরীর নষ্ট হইলেও সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী অহঙ্কারের চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়ে অনুগতিটা থাকে।

জাগরণ সময়েও আমি দেখিতেছি আমি শুনিতেছি এইরূপে চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় সেইখানে

জাত দর্শনাদি বৃত্তির পশ্চাতেও আমি রহিয়াছি। যেখানে জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলি সেইখানে আমি বা অহংমূর্ত্তি থাকে। মৃত্তিকা ছাড়িয়া ঘট যেমন স্বরূপতঃ কিছুই নহে। তথাপি নানারূপ ও প্রয়োজন গুলি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মৃত্তিকা হইতে ঘটের অতিরিক্ত একটা ব্যবহারিক অস্তিত্ব যেরূপ মানিয়া লইয়া ব্যবহার মার্গে চলিত হয়। এইরূপ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয়গণও স্বরূপতঃ অহঙ্কার ছাড়া কিছুই নহে। তথাপি জীবের শব্দাদি ভোগ বা অনুভব জনক অদৃষ্ট বিশেষ অহংতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে নাম রূপ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। মৃত্তিকা যেরূপ ঘটাদির পশ্চাতে পশ্চাতে কুসুম নিচয়ে সূত্রের মত অনুস্যূত বলা গিয়া থাকে। এইরূপ উক্ত অস্মিতাও জাগরণে স্বপ্নেও মরণে জ্ঞানেন্দ্রিয় গণের পশ্চাতে পশ্চাতে লাগিয়া রহিয়াছে। অতএব সাংখ্যবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, অহঙ্কার তত্ত্বটী জ্ঞানেন্দ্রিয় গণের উপাদান স্বরূপে নির্ণীত হইতে পারে।

মন্তব্য,—মন ইন্দ্রিয়টী ছাড়িয়া কোনও জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই বিষয় জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। সেই জন্য মন রূপ, রস, গন্ধাদি বিষয় জ্ঞানের যেমন সাধারণ কারণ বটে, সেইরূপ অহংকার ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের উৎপত্তির প্রতি সাধারণ নিমিত্ত কারণ হইতে পারে। কারণ, অস্মিতা (অহম্ভাব) ছাড়িয়া কোনও ইন্দ্রিয়টীই স্বয়ং প্রকাশ পাইতে ও স্বকার্য্য সাধনকরিতে পারে না। আমি আছি তাই আমার ইন্দ্রিয় গুলির উপরে আমার চক্ষু তোমার শ্রোত্র এইরূপ অভিমান আছে। সুষুপ্তি দশায় আমি আত্মহারা হইয়া পড়িলে শরীরের ইন্দ্রিয়গণের আর কোনও রকমের কার্য্য ও তাহাদের (ইন্দ্রিয়গণের) অস্তিত্বটাও অনুভূত হইতে পারে না। যে স্থানে ইন্দ্রিয়গণ রহিয়াছে সেই স্থানে অস্মিতা বা আমিও অনুস্যূত রহিয়াছি। চক্ষু আদি ইন্দ্রিয় গুলি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও কুসুম সমূহে সূত্রের মত এক আমি সকল ইন্দ্রিয়েই অনুগত রহিয়াছি। যে আমার চক্ষু সেই আমারই ত্বক্ আদি ইন্দ্রিয়গুলি। আমার মধ্যে প্রভেদ নাই : একই আমি অভিন্নরূপে দর্শনাদি বৃত্তি সমূহের ভিতর দিয়াও রহিয়াছি। চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গুলি অহঙ্কার তত্ত্বে বা আমাতে গাঁথা রহিয়াছে। অতএব অহঙ্কার তত্ত্ব চক্ষু আদি সমগ্র জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তির প্রতি সাধারণ কারণ হইতে পারে। অস্মিতা বস্তুটী আমাদের দেহাদির বাল্যাদি পরিণাম বিশেষের যেরূপ নিমিত্ত কারণ, দেহে অহম্ভাব না থাকিলে দেহাদির বাল্যাদি পরিণাম বিশেষ ঘটিতে পারে না। অস্মিতা না থাকিলে জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপে উক্ত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের পরিণামও ঐরূপ ঘটিতে পারে না। ঘটাদি কার্য্য উৎপত্তির প্রতি একই কুম্ভকার (যেমন নানাবিধ কার্য্যের নিমিত্ত কারণ হইতে পারে, এইরূপ এক অস্মিতাও নিমিত্ত কারণ বলিয়া চক্ষু আদি সমগ্র ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি করিতে পারে। ইহা কোনও দোষের বিষয় হইতে পারে না। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সূক্ষ্ম, পঞ্চভূতের প্রকাশ প্রধান সাত্ত্বিক অংশ সমূহের সমবায়ে উল্লিখিত উৎপত্তি প্রণালী অনুসারে উৎপন্ন হয়। এক একটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপাদানে পাঁচটী সূক্ষ্ম ভূত হইতে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ই যে উৎপন্ন হয় এরূপ নহে। সুতরাং সূক্ষ্ম পঞ্চভূতই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এক একটীর অসাধারণ উপাদান কারণ হইতে পারে। দেখ বটের বীজটী বট বৃক্ষের প্রতি নিমিত্ত কারণ বটে। তথাপি মৃত্তিকা জল বায়ু প্রভৃতি হইতে উপাদান রাশি না পাইলে বটের বীজটী যেরূপ বটবৃক্ষ রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া বটবৃক্ষরূপে পরিচিত হইতে পারে না এইরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণও সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতে উহাদের প্রকাশ প্রধান অংশ সমূহ না লইয়া কেবল

মাত্র অস্মিতা দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপে পরিচিত হইতে পারে না। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলির সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতেই উৎপন্ন হয়। আর উপাদান কারণ কারণ গুলির তারতম্যেই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি পরস্পর বিজাতীয় গ্রহণশক্তিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের গ্রহণ রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন গুলিও নিষ্পন্ন করে। এক অস্মিতার উপাদানে গঠিত হইলে জ্ঞানেন্দ্রিয়চয়ের সকল পঞ্চ প্রদীপের মত এক জাতীয় বিষয় গুলি গ্রহণ করিয়া তাহাদের জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ হইত। এই রকমের দোষ আসিয়া পড়ে।

আরো দেখ পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীরে সূক্ষ্ম ভূতের যাহা সারাংশ সমূহ তাহাদের অপকারে (অপচয়ে) ও উপকারে (উপচয়) জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলিও অপকৃত ও উপকৃত হয়। তজ্জন্যও ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, উপাদান গত পরমাণু রাশির হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে তাহাদের কার্য্যেরও যখন হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তখন জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলিও সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে নির্ম্মিত বস্তু বলিয়াই উহাদের অপকারে ও উপকারে অপকৃত ও উপকৃত হয়। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় গুলি পঞ্চভূত হইতেই উৎপন্ন হয়। অতএব উহাদের উপাদানে ভূত পঞ্চভূতের পঞ্চ সংখ্যার অনুপাতে উপাদান গত সংখ্যার অনুপাতে গণনা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংখ্যা বিশেষ পাঁচ, তদরিক্ত অথবা ন্যূনও নহে।

(ক্রমশঃ)

যোগ, ভোগ ও ত্যাগ

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, গীতারত্ন

একদিন ব্রহ্মা জীবনের কি প্রয়োজন তাহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। কল্পান্তে নারায়ণের নাভিকমলে সৃষ্টির শতদল বিকশিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রকটিত হইলেন সৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা। প্রবল রজোগুণের প্রেরণায় তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম চঞ্চল ও কর্ম্মোন্মুখ হইয়া উঠিল। কোন্ কর্ম্মে ইন্দ্রিয়ের ও মনের সার্থকতা, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া, ব্রহ্মা বড়ই অস্বস্থ ও ক্লিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

তখন সহসা দৈববাণী হইল, "তপঃ, তপঃ, তপঃ," তাহাতে ব্রহ্মার মনে তপঃ সংস্কার জাগিয়া উঠিল, তাঁহার ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হইল, মন নিষ্ক্রিয় হইল, রজস্তমহীন স্বাত্ত্বিক বুদ্ধিতে অতীত ও ভবিষ্যৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ইহাই যোগ, যাহাকে মহর্ষি পতঞ্জলি, "চিত্তবৃত্তিনিরোধ" বলিয়াছেন।

এই যোগ সাধনই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। যোগ সাধনা না করিলে, আমাদের আত্মস্মৃতি জাগিয়া উঠে না। মানব দেহ ভিন্ন যোগ সাধন হয় না, তাই মনুষ্যজন্ম এতই দুর্ল্লভ। আসক্তিবশে রাজা ভরত হরিণ-জন্ম গ্রহণ করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার হরিণ জন্মে

তিনি পুজা, মন্ত্র, জপ ও ধ্যান করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত, যদিও তাঁহার বেদমন্ত্র স্মরণে ছিল, কারণ পূর্ব্ব জন্মের শুভ কর্ম্ম ফলে তিনি জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চিত্তের স্রোতকে চিত্তের বৃত্তি বলে। কামনাই চিত্তের স্রোত। যাহার চিত্ত-স্রোত অধিক, তাহার চিত্তের চঞ্চলতাও অধিক।

অনাদিকাল হইতে আমরা লক্ষ লক্ষ জন্ম গ্রহণ ও লক্ষ লক্ষ দেহ ধারণ করিয়াছি, সেই সকল দেহের সংস্কার (অর্থাৎ সূক্ষ্ম অতৃপ্ত বাসনা) আমাদের চিত্তে গ্রথিত আছে। এই সংস্কারের অধীনতা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য সাধনা আবশ্যক।

যাঁহার চিত্তে সংস্কারের একটি মাত্র স্রোতও বিদ্যমান নাই, তাঁহারই চিত্তনিরোধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ মানব। যাঁহার চিত্তবৃত্তিনিরোধ হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

চিত্তের সংস্কার গুলিকে হৃদয় গ্রন্থি বলা হয়। ইহারাই অবিদ্যা-বন্ধন।

আমরা সকলেই সংস্কারের অধীন। এই সংস্কার আমাদের অবশভাবে কার্য্যে নিযুক্ত করে। কোন এক অজানিত শক্তির বশে বাধ্য হইয়া, আমরা সকল কার্য্য করিতেছি। সেই শক্তিকে চিনিতে পারিয়া, আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র শক্তিকে, সেই বিশাল শক্তির সহিত যুক্ত করিতে পারিলে, আমাদের দেহ মধ্যস্থ সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়, যাহার ফলে আমাদের অনন্ত সংস্কার রাশি ক্ষয় হইয়া যায়। যত দিন সংস্কার ক্ষয় না হয়, ততদিন মুক্তি নাই।

সংস্কার ক্ষয় হইলেই চিত্তশুদ্ধ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, চিত্ত-নিরোধ হয়। চিত্ত নিরোধ হইলেই যোগসাধন সম্পন্ন হয়।

জননী যোগমায়া আমাদের হৃদয়ে নির্ম্মল বুদ্ধিরূপে উদ্ভাসিত হইয়া, আমাদিগকে যোগাধিকার প্রদান করেন। তিনিই আমাদের নিত্যসিদ্ধা জননী যোগরাণী। তিনি দয়া করিয়া আমাদের নিকট হইতে বিয়োগের অভিনয় অপসারিত করিলে, আমরা যোগধারণা করিতে সমর্থ হই।

আমরা সর্ব্বদা বিষয়ের সহিত, অনাত্ম বস্তুর সহিত যোগের জন্য লালায়িত, যে যোগের পরিণাম দুঃখময় বিয়োগ। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া মানুষ এই বিয়োগান্ত যোগের আস্বাদন করিয়া, ক্ষত বিক্ষত হৃদয় লইয়া, এমন একটী যোগের সন্ধান করে, যাহার পরিণাম বিয়োগান্ত দুঃখ নহে। এইরূপ যোগই যথার্থ যোগ বা নিত্য শুদ্ধ যোগ। এই প্রকার যোগের দ্বারাই, আমাদের পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।

যোগ শব্দের অর্থ মিলন—দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যোগ। দ্রষ্টা ও দৃশ্য-বস্তু দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থ নহে, বাস্তবিক তাহা একেরই বিকাশ। যিনিই দ্রষ্টা, তিনিই লীলাবশে দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

সৎ, চিৎ ও আনন্দ সর্ব্ব সময়ে ও সর্ব্বস্থানে সদা বিদ্যমান ও নিত্য যুক্ত। এমন কোন স্থান নাই যেখানে চিৎ ও আনন্দের অভাব হইতে পারে।

ভক্ত ও ভগবানের মিলনই যোগের মহিমা প্রকাশ করে। সমাধি সেই যোগের ফল, যাহা সাধককে অভয়ানন্দ দান করে। জ্ঞানে ও অজ্ঞানে সকলেই তাহা চায়।

পূজ্যপাদ ঋষিগণ পুরুষার্থ বা মানবের অভীষ্ট পদার্থকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ। এই চতুর্ব্বর্গ ফললাভ করিতে হইলে, মানুষকে ঋষি প্রদর্শিত পথে চলিতে হইবে। "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—ইহার আর অন্য কোন পথ নাই।

চিত্ত শুদ্ধ হইলেই মানব আপনার ক্ষুদ্র স্বরূপ অবগত হইতে পারে। নিজের ক্ষুদ্রত্ব জ্ঞাত হইলে, তখন আর অহঙ্কার বা গর্ব্বের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং তখন বাধ্য হইয়া পরমেশ্বরের কৃপায় আত্মসমর্পন করিতে হয়, যিনি সর্ব্ব জীবের অন্তরেই অবস্থান করিতেছেন।

তিনিই সমুদয় ভুবন সৃষ্টি করিয়া পালন করিতেছেন এবং অন্তকালে রুদ্র মূর্ত্তিতে সংহার কার্য্য সাধন করিতেছেন। তাঁহা হইতেই সমস্ত দেবতার উৎপত্তি এবং ঐ সকল দেবতাতে যে কিছু শক্তি আছে, তিনিই তাহার হেতু। তিনি সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মারও জনয়িতা ও প্রতিষ্ঠাতা যোগসিদ্ধ যোগীর দেহ যোগাগ্নি দ্বারা বিনষ্টদোষ হইয়া নির্ম্মল হয়। নির্ম্মল শরীর যোগীর রোগ, জরা ও দুঃখ থাকিতে পারেনা।

মানবের বর্ত্তমান ভীতি গ্রস্থ অবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া, ব্রহ্মের নাম ও রূপাদির অবলম্বনে যোগাভ্যাস প্রদান করাই যোগের একমাত্র লক্ষ্য। কর্ম্মযোগই সেই উপায় প্রদর্শন করায়। কর্ম্মের কৌশলই কর্ম্ম যোগ। এই যোগের সাহায্যে নিজদেহ মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত আত্মাকে ধ্যানের দ্বারা দর্শন করিয়া, আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। আত্মবিদ্যা ও তপস্যার দ্বারা তাঁহাকে অনাত্ম বস্তু হইতে পৃথক করিয়া লইতে হয়। দেহ মধ্যস্থ আত্মাতেই আত্মার সাক্ষাৎ হয়। ইহাই প্রকৃত যোগ—জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারে বিনশ্বর ও অবিনশ্বর এবং কার্য্য ও কারণ উভয়ই আছে। উহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া এই বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। জীব ব্রহ্মের শক্তি, কিন্তু জীবের সুখ-দুঃখাদির অধীনতা আছে। অধীনতা থাকাতেই জীব বদ্ধ। ঈশ্বর জীবের সুখদুঃখের নিয়ামক। নিয়ামক পুরুষের অধীনতা নাই। ঈশ্বর নিয়মের অধীন বা স্বাধীন বলিয়াই মুক্ত। মুক্ত পুরুষের সহিত যুক্ত হইয়া, জীব সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ইহাই যোগ। কিন্তু যোগও ভোগ কি এক সঙ্গে হইতে পারে? নিশ্চয়ই হইতে পারে। মানুষ একেবারে পার্থিব বস্তুর ভোগ ত্যাগ করিতে পারে না, কারণ ইহা একেবারে অসম্ভব। ভোগ একেবারে ত্যাগ করিলে, মানুষের শরীর যাত্রা নির্ব্বাহিত হইবে না।

তবে কি করিয়া ভোগ করিলে, যোগ নষ্ট হয় না? ত্যাগের সহিত ভোগ কর অর্থাৎ ত্যাগ ও ভোগ একত্র কর।

"ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"—ইহাই ঋষির উপদেশ। জগৎকে ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর। মানুষ ত্যাগ করবে, আবার যোগ ও ভোগ করবে। ইহাই ভারতের আদর্শ এবং ঋষিদেব উপদেশ।

ভোগ না করিলে ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ না থাকিলেও ভোগ হয়না। মানুষ সেই জিনিসই প্রকৃত ভোগ করে, যাহা সে ত্যাগ করিতে পারে। ভোগের সহিত ত্যাগকে রাখতে হবে, তবেই যোগ সম্ভব।

উপনিষদের ঋষি উপদেশ দিতেছেন যে আত্মসম্মিত ভোগ কর! অনাত্ম বুদ্ধি বর্জ্জন দ্বারা

আত্মভোগ কর। ঈশ্বর জ্ঞানে জগৎ দর্শন কর। এবং ভোগের দ্বারা ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হও। ঈশ্বরই জগৎ প্রকাশ করিয়াছেন। এই জগতের সমস্তই তিনি।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং
যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"

—ঈশোপনিষৎ

চেতন আত্মাই এই জগৎ মূর্ত্তিতে বিরাজিত। এই জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, সে সমস্তই পরমেশ্বর বলিয়া উপলব্ধি করিতে হয়। সমস্তই সেই পরমেশ্বরের পরম মূর্ত্তি। সমস্তই ঈশ্বর জ্ঞানে হৃদয়ঙ্গম কর। তিনিই জন্মমৃত্যু-গতিসঞ্চারী জীব রূপে ও পরিণামশীল অচেতন জগৎ রূপে বিরাজিত। ইহাই প্রকৃত জগৎতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব।

এই জগতকে ত্যাগের সাহায্যে ভোগ কর। এই জগৎ মিথ্যা নহে, ইহা ঈশ্বরের চেতন মূর্ত্তি। জগতকে ঈশ্বর মূর্ত্তি বলিয়া দর্শন কর এবং এইরূপ দর্শন সাহায্যে তুমি আত্মতত্ত্বে প্রবেশ কর।

এই জগতকে কেহই ত্যাগ করিতে পারে না। পঞ্চভূতকে কেহই ত্যাগ করিতে পারে না, কারণ ইহাই যে জীবের দেহ। তবে কি ত্যাগ করিতে হইবে?

ত্যাগ করিতে হইবে অনাত্মবোধ। এই জগতকে আত্মময় বলিয়া, ঈশ্বরময় বলিয়া ভোগ করিবে।

অনাসক্তিই ত্যাগ, আসক্তিই ভোগ। যার মনে আসক্তি নাই, তাহার পক্ষে ভোগও ত্যাগ তুল্য বা এক পদার্থ। বিষয়-ভোগ তাহার বন্ধন নয়। যার মনে আসক্তি আছে, সে বাহ্যিক সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেও ভোগী।

গীতাতে সেই জন্য শ্রীভগবান দেবতাদিগকে নিবেদন করিয়া, ভোগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা না করিলে "স্তেন এব সঃ"—সে পরস্বাপহারী কৃতঘ্ন চোর। সেই জন্য জীবনের আদর্শ ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয়। যিনি ইহা বাস্তব জীবনে করিতে পারেন, তাঁহার দ্বারাই যোগ সাধন সম্ভব।

এই জগৎ মিথ্যা নয়। ব্রহ্ম যদি সত্য হন, তবে তাঁহার প্রকাশ জগৎও সত্য। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু মিথ্যা নয়। জগৎ অনাদি—ইহার আদি অন্ত নাই।

এই অনাদি জগতের একজন মাত্র কর্ত্তা, তিনি শ্রীভগবান। জগতে যাহা কিছু হইতেছে, সমস্তই তিনি করাইতেছেন। মানুষ নিমিত্তমাত্র, তাঁহার হাতের যন্ত্র মাত্র, তিনি যেমন চালাইতেছেন, ঠিক তেমনি চলিতেছে।

যে সামান্য কাজ আমি করিতেছি, তাহা আমার শক্তিতে নহে, কেবলমাত্র তাঁহার শক্তিতে সম্ভব হইয়াছে। তিনি যতটুকু করাচ্ছেন, ততটুকু কচ্চি। মানুষ যখন প্রকৃত কর্ত্তার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে মিলাইয়া দিয়া কাজ করে, তখনই সে কর্ম্মযোগ সাধন করে। তখন কর্ম্ম তাহার বন্ধনের কারণ হয় না। কর্ম্ম বন্ধন হয়, যখন মানুষ মনে করে যে সে কর্ম্মের কর্ত্তা—সেই কর্ম্ম করছে তার নিজ শক্তিতে।

কর্ম্মের ভিতর দিয়া যখন সে শ্রীভগবানের সহিত যোগ উপলব্ধি করে, তখন কর্ম্মের দ্বারা

সে মুক্তি লাভ করে। তখন সে প্রতি কার্য্যের ভিতর মুক্তির আস্বাদ পায়, আনন্দে তার জীবন ভরে যায়। জগতের সমস্ত কর্মধারার সহিত, তাহার জীবনের পূর্ণ যোগ হয়। তার প্রকৃতির ভিতর দিয়া শ্রীভগবান তাকে দিয়া কর্ম্ম করেন। যন্ত্রজ্ঞানে সে কর্ম্ম করে এবং তখন তার প্রতি কর্ম্মই যন্ত্রীকে দেখিয়ে দেয়, যিনি তার হৃদয়ে ব'সে তাকে কর্ম্ম করাচ্চেন।

কর্ম্মযোগের দ্বারাই মানুষ যোগ, ভোগ ও ত্যাগ একসঙ্গে ও একাধারেই করিতে পারে।

গীতাতে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন যে, "কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে।"

কৃপালু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগদ্বাসী সকলকেই এই উপদেশ দিতেছেন।

জগৎরূপ কর্ম্মচক্রকে ঈশ্বর বলিয়া দর্শন কর। কখনও কর্ম্মত্যাগী হইয়া আত্মঘাতী হইবে না।

উপনিষদের ঋষি সকলকে কর্ম্মকোলাহল হইতে দূরে পলাইতে নিষেধ করিয়াছেন। পলাইবার কোন পথই নাই, কারণ অনাত্মসংস্কারের পুলিন্দা বুকে লইয়া পলায়ন করা যায় না। সেই জন্য যাহারা বিপদে পড়িয়া অজ্ঞানতাবশতঃ আত্মহত্যা করেন, তাঁহাদের আবার ফিরিতে হয়, বহু কষ্ট পাইতে হয়, যতদিন না অনাত্মসংস্কারের আশ্রয়স্বরূপ বিষয়গুলিতে আত্মবোধ উন্মেষিত হয়।

উপনিষদের ঋষি উপদেশ দিতেছেন যে "কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ জিজীবিষেৎ"—কর্ম্মের দ্বারাই শাশ্বত জীবন ইচ্ছা করিবে—এইরূপ বলিয়া তাঁহারা জীবনের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। জগৎ ঈশ্বরের কর্ম্মময় ব্যক্ত মূর্ত্তি। কর্ম্মকে এমন করিয়া করিতে হইবে যাহাতে আত্মপ্রতিষ্ঠা সুসিদ্ধ হয় এবং অমৃতস্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা সকল কর্ম্ম নৈষ্কর্ম্যে পর্য্যবসিত হয়, তখন পাইবার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

চিরদিনই মানুষের দ্বিবিধ নিষ্ঠা আছে—কাহারো কর্ম্মে, কাহারো ভোগে এবং কাহারো ত্যাগে বা জ্ঞানে (অর্থাৎ অনাত্মভোগ ত্যাগে)।

কর্ম্মীরা কর্ম্মকে এবং ত্যাগমার্গীরা ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ বলেন। এই বিরোধের আর শেষ নাই এবং এই বিরোধ লইয়া বহু সম্প্রদায়ের গঠন হইয়াছে এবং এই বিরোধের পথও বহু প্রশস্ত হইয়াছে।

কিন্তু এই বিরুদ্ধবাদের অসারতা দেখাইয়া, জ্ঞান ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য করিয়া, মুক্তির প্রকৃত পথ উপনিষদে দেখাইয়া দিয়াছেন।

গীতাতেও শ্রীভগবান জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করিয়া বলিয়াছেন যে বালকেরাই জ্ঞান ও কর্ম্মে বিরোধ দেখেন, পণ্ডিতেরা দেখেন না।

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। গীতা—৫।৪

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছে—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ গীতা—৬।১

যিনি কর্ম্মফলের কামনা না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্মী হইলেও সন্ন্যাসী এবং তাঁহাকেও কর্ম্মযোগী নামে অভিহিত করা যায়।

অতএব পরমাত্মদৃষ্টিতে যোগ, ভোগ ও ত্যাগ একই পদার্থ।

ইহাই যোগ, ভোগ ও ত্যাগের একার্থত্ব।

যোগ, ভোগ ও ত্যাগের সাধনা একসঙ্গে হইতে পারে।

আজ বাঙ্গালীর যৌথ সংসার বা Joint family, এই যোগ ভোগ ও ত্যাগের অভাবে মৃত প্রায় ও শ্রীহীন।

বাঙ্গালীর Joint partnership business স্থায়ী হয় না এই যোগ ভোগ ও ত্যাগের অভাবে।

জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এবং জীবন সংগ্রামে আমরা সকলের পশ্চাতে পড়িয়া রহিতেছি, এই যোগ ভোগ ও ত্যাগের অভাবে।

এই যোগ ভোগ ও ত্যাগের অভাবে, আমরা আজ একাগ্র হইবার, একাত্ম হইবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি।

আজ আমরা যুক্তাহার ও বিহারশীল নয় এবং আমাদের সকল চেষ্টাও যুক্ত নয়, তাহার ফলে আমরা অযোগী হইয়া পড়িয়াছি।

আজ ইংরাজ জাতই প্রকৃত যোগী, তাঁহারা যুক্তাহার ও বিহারশীল, তাঁহাদের প্রায় সকল কর্ম্মই যুক্তভাবে সম্পাদিত হয়, যে যে যোগের প্রভাবে, তাঁহারা এই বিশাল সাম্রাজ্যে ভোগ করিতেছেন। আজ তাই তাঁহারা রাজার জাত এবং আমরা যোগের অভাবে ভিখারীর জাত। এই যোগ ভোগ ও ত্যাগের অভাবে আমাদের দেবতার পূজা প্রকৃত পূজা হয় না, হয় মাত্র রাজসিক আড়ম্বর বা তামাসিক গণ্ডগোল, তাহাতে না হয় গৃহস্থের মঙ্গল অথবা বিশ্বের কল্যাণ।

কবীরের দোঁহা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আঁধী আঈ জ্ঞানকী, ঢহী ভরম কী ভীতি।
মায়া টাটী উড় গঈ, লগী নাম সে প্রীতি ॥ ২২ ॥

লেগে জ্ঞানের ঝটকা প্রবল, ভ্রমের প্রাচীর ভূমে পড়ে
নামানুরাগ জাগল যখন, মায়াবরণ গেল উড়ে ॥ ২২ ॥

সমাজপতি-স্মৃতি সমিতিতে ১৩৪০, ২রা পৌষে পঠিত।

মীঠা সব কোই খাত হৈ, বিষ হ্বৈ লাগৈ ধায়।
নীব ন কোঈ পীবসী, সর্ব্ব রোগ মিটি জায়॥ ২৩॥
মিষ্টি সবাই ভালবাসে, ক্রিয়া তাহার বিষের প্রায়।
নিম কা'রো না লাগে ভাল, সকল ব্যাধি হরে যায়। ২৩॥

মায়া দীপক নর পতংগ, ভ্রমি ভ্রমি মাহিঁ পরংত।
কোঈ এক গুরু জ্ঞান তেঁ, উবরে সাধু সংত॥ ২৪॥
মায়া জ্যোতি পতঙ্গ নর, ঘুরে ফিরে তাতেই পড়ে।
গুরু জ্ঞানের প্রভাব বলে, কচিৎ সাধু সন্তরে॥ ২৪॥

—শিবপ্রসাদ।

সমাগতা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমা ভাবিল,—'থাক্, আর ও নষ্ট চরিত্র পুরুষ গুলার কাছে যাওয়ায় কাজ নাই, একবার গৃহস্থ বাড়ীর অন্দর গুলি দেখা যাক্ যদি কোনো বালিকার টিউসনি কিউসনি জুটিয়া যায়!' কিন্তু কি পোষাকে সেখানে যাইবে,—তাহার স্বাভাবিক, 'শিক্ষিতা মহিলার পোষাকে, কি দেশের পর্দা-ন্তরবাসিনীদের পোষাকে সে কথা সমার মনেই উঠিল না। সে নিজের পোষাকেই খুঁজিয়া পাতিয়া একটি গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বাড়ীর পুরুষেরা তখন আফিসে বা নিজ নিজ কায কর্ম্মে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। অন্দরে ঢুকিয়াই সমা সম্মুখে দেখিল এক খর্ব্বদেহা মাত্রাধিক স্থূলাঙ্গী, লোলমাংসবিশিষ্টা ষষ্ঠীপরা বৃদ্ধাকে। তিনি তখন আহারান্তে গতাবশিষ্ট দন্তগুলি খরিকা যোগে পরিষ্কার করিতেছিলেন। সমা যাইয়া একটি নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি মুখ-প্রক্ষালন করিতে করিতে বলিলেন,—'কে, গা?' সমা বলিল,—'আজ্ঞে আমারও বাড়ী বাংলা দেশ, আমি কিছুদিন হ'তে এই আগ্রা সহরেই আছি, এখানে একটি কায কর্ম্মের খোঁজে আছি।' বৃদ্ধা বলিলেন:—"ওমা, তা-ই ভাল, আমি বলি বহুরূপো বুঝি, তা' এ অন্দোরের ভেতর কেনই বা আস্‌বে? তা' বেশ, বাঙ্গলাদেশের কোন জেলার লোক মা তুমি?" পরিচয় সম্বন্ধে অনেকের নিকট সমাকে মিথ্যার আশ্রয় লইতেই হইয়াছে, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্নকারিণীর কথার টানে বুঝিল

যে, তাঁর বাড়ী যেখানে হউক অন্ততঃ চব্বিশ পরগণায় নয়, তাই বলিল,—"আজ্ঞে আমার বাড়ী চব্বিশপরগণার একটি গাঁয়ে ছিল, এখন অনেক দিন থেকেই বিদেশে আছি।" বৃদ্ধা বলিলেন,—"বটে? তা' তোমরা বুঝি খিষ্টেনদের মেয়ে?" একটুখানি ভাবিয়া দেখিল ইহাঁদের কাছে খ্রীষ্টান পরিচয় দেওয়ায় কোনো দোষই হইবে না, পক্ষান্তরে প্রকৃত পরিচয় দেওয়াও চলিবে না, বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ, আমরা আগে হিন্দু ছিলাম শুনেছি, আমার জন্মের আগে আমার বাবা ক্রিশ্চান হ'য়ে ছিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন,—"হুঁ, তা-ই বটে মা! তা' নইলে সিঁতেয় সিন্দুর নাই, হাতে নোয়া নাই! অত বড় সোমোত্তো মেয়ে, ভদ্দলোকের ঘরের হ'লে অমনি জুতো প'রে চস্‌মা প'রে রাস্তায় রাস্তায় বেড়াতে পারে কি, না দেয়? তা' মরুকগে, হলিই বা খিষ্টান্; ব'সো মা, ব'সো:—ও ও বউ মা! একটা কম্বলের আসন টাসন দাও তো, মেয়েটি বসুক!" বলিতেই এক পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্কা সুন্দরী একটি কম্বলের আসন হস্তে লইয়া বাহিরে আসিলেন। রমণীবক্ষে বাহুআশ্রিত অম্লান কুসুমস্তবকতুল্য একটি সুপ্ত শিশু স্তনপান করিতে করিতে অল্পক্ষণ নিদ্রিত হইয়াছে। বক্ষঃস্থিত অমৃতকুম্ভমুখে অমৃতধারা এখনো ঝরিতেছে, শিশুর নিদ্রালস অধর হইতে ভুক্তাবশিষ্ট ক্ষীরধারা চুয়াল বাহিয়া এখনো পড়িতেছে। রমণীর পশ্চাতে, অঞ্চল প্রান্ত ধরিয়া, ক্ষুদ্র যষ্টি হস্তে ধরিয়া আর একটি নধর সুন্দর শিশুও নাচিতে নাচিতে আসিল এবং একটি বাংলা ক্ষুদ্র পুস্তিকা হস্তে লইয়া একটি নয় দশ বৎসর বয়স্কা বালিকাও বাহির হইল। বৃদ্ধা বলিলেন,—"দাও মা, দাও, আসন খানা ঐ ধারির পাশে দাও; দেখো ছোঁয়া পড়ে না যেন, অবেলায় নাইলে, যে একরাশ চুল, চুল শুকোবে না, ছেলের গা বাল্‌সাবে! খোঁকা ঘুমুলো? যাও, যাও, এইবার খোঁকাকে শুইয়ে দিয়ে খেয়ে নাওগা; খাওয়ার অনিয়ম কল্লে ছেলের অসুখ করবে। বলে,—'খা খা, খা, য' দিন না হয়েচে ছা! শো, শো, শো য' দিন পাশে নাই পো!' হায়, হায়! কত কষ্টের ছেলে, এছেলেও মাকে গেরাহ্যি করে না!" বর্ষীয়সীর কথাগুলি সমস্ত সমার কর্ণে প্রবেশ করিল কিনা কে জানে, সে তখন মুগ্ধনেত্রে সেই প্রতিগমনশীলা, নির্বাক, শান্ত ফলভারাবনমিতা কদলী-তরুরূপিণী সুন্দরীকে দেখিতেছিল। সমা এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই,—অনতিদূরে রোয়াকের এক প্রান্তে, একটি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা একাকী বসিয়া নিঃশব্দে খেলা-সাতি লইয়া পুতুল খেলা করিতেছিল,—কাল্পনিক ঘরে পা ছড়াইয়া বসিয়া কাল্পনিক সন্তানকে কাল্পনিক স্তন্য পান করাইতেছিল, কাল্পনিক চুলায়, কাল্পনিক আগুনে ও কাল্পনিক পাত্রে নানাবিধ কাল্পনিক খাদ্য রন্ধন করিয়া কাল্পনিক লোকদিগকে পরিবেশন করিতেছিল এবং এইরূপে ভবিষ্যৎ জীবনের পূর্ব্বাভিনয় করিতেছিল। সমা আসনটি বিছাইয়া ধরিতে পা ঝুলাইয়া বসিবার কালে বালিকার প্রতি তাহার নজর পড়িল। সেই সময় সেই পঞ্চম বর্ষীয় শিশুটিও সেইখানে গেল। বালিকার খেলাসাতি সামগ্রীর মধ্যে একটী রবারের বল ছিল; বালকটি চিলের ছোঁ দেওয়ার ন্যায় বলটি উঠাইয়া লইল। বালিকা উঠিয়া সেটি পুনরুদ্ধারের অভিপ্রায়ে তাহার হস্ত ধারণ করিবা মাত্র বালক:—'আগাল্!' বলিয়া বলে হস্ত ছিনাইয়া লইয়া এবং বল্‌টি পিছনে লুকাইয়া ধরিয়া অন্য হস্তে সেই ক্ষুদ্র যষ্টি উদ্যত করিল। বালিকা সভয়ে পশ্চাতে হটিয়া বর্ষীয়সীকে বলিল,—'দেখ ঠাকু' মা, নিবু আমার বল্ নিলে!' বর্ষীয়সী বলিলেন,—"ছি, দিদি! ছোট ভাই, নিয়েচে, ওর ঠেঁয় কি কাঁদিয়ে কেড়ে নিতে আছে? ও নে'গ্ ওটা!" বালিকা বলিল, —"ওটা তো ওর নয়, ওর অনেক

বল্ আছে, ওটা সেদিন মামা আমাকে দিয়েছেন,—ও নেবে কেনে ?" বর্ষীয়সী বলিলেন,—"তুমি মেয়ে মানুষ, তুমি বল নিয়ে কি করবে দিদি ? তোমার মামা ভুল করেচেন, ও বেটাছেলের জিনিস, বেটাছেলেকে দাও, তুমি আপনার মেয়েছেলের খেলনা নিয়ে খেলা কর !" বালিকা প্রসন্ন বদনে নিরস্তা হইল।

ব্যাপারটি তুচ্ছ, কিন্তু সমার চক্ষে এই সামান্য বিষয়টি বৃহদায়ত (magnified) হইয়া প্রতিভাত হইল এবং ক্ষণেকের জন্য তাহার মনটীকে আচ্ছন্ন করিল ; সমা ভাবিল,—'বটে, স্ত্রী-জাতির আত্মবোধ আবৃতকারী বৃক্ষের এ-ই বীজ বপন বটে !'

সমা আপনার কথাটা পাড়িবার উদ্দেশ্য করিয়া বলিল,—"মা, আপনারা এত বড় বড় মেয়েগুলিকে স্কুলে দেন না ? এখানে তো মিশনারী গার্লস্কুল আছে !" বর্ষীয়সী বলিলেন,—"না বাছা ! মেয়ে ছেলেকে ইস্কুলে পড়্‌তে দেওয়ার রেওয়াজ আমাদের জেতের নাই, ইস্কুলে দিলে মেয়ে ছেলের বড্‌ডো বদ্‌সরোয়া হয়ে যায়। আর কিই দরকার মেয়েছেলের লেখা পড়া শিখে, মা ? ধর, বারো বছরে শ্বশুরঘর যাবে, পনেরো বছর হ'তে তুকুড়ি বচ্ছর পর্য্যন্ত ছেলে পেটে ধরবে আর ছেলে মানুষ কত্তে যাবে, তা'র মধ্যে গেরোস্তালীর কায কর্ম্ম আছে, মেয়ে মানুষের শেখবার অনেক জিনিস আছে মা, আমাদের জেতের ! আমরা তো মেয়েকে বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত আইবুড়ো রেখে রাস্তায় রাস্তায় বেড়াতে ছেড়ে দিতে পারবো না ? তোমার মা, বাপ বুঝি তোমার এখনো বিয়ে দেন নাই ?" শেষ কথা কয়টা সমার মুখের সমস্ত রক্তটা টানিয়া বুকে জড় করিয়া বুকটাকে একটু ভারি করিল, সমা একটি ছোট্ট কাসিয়া সেই ভাবটা একটু সরাইয়া নীচের দিকে চাহিয়াই বলিল,—"আজ্ঞে, আমাদের ধর্ম্মে বিবাহটা অন্যের দেওয়ার ব্যবস্থা নাই, ওটা আপন আপন স্বাধীন ভাবে বেছে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে !" বর্ষীয়সী একটু ঘৃণামিশ্রিত তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"তোমাদের ধর্ম্মে মা, বাপ বুঝি পর ? আহা, বেশ তোমাদের ধর্ম্ম মা !" সমা বলিল,—"আজ্ঞে মা, বাপ পর নন, খুবই আপনার বটেন, তবে জানেন কি,—আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে সব মানুষেরই আত্মার একটা স্বাধীনতা আছে, কেউই তাতে হাত দিতে পারেন না, দিলে, পাপ হয় !" বর্ষীয়সী এ সকল কিছু বুঝিলেন না, মুখে বলিলেন,—"ব-অ-ট ? তা' তোমার কি দরকার মা ? নরেন্‌কে খুজ্‌জো ?" নরেন বৃদ্ধার পুত্র,—কমিসিরিয়েটের কেরাণী। সমা বলিল,—"আজ্ঞে না, তাঁকে আমার তত প্রয়োজন নাই,—আপনাদের দুটি মেয়ে আছে দেখ্‌চি, এদিগে স্কুলে দেন নাই শুনলাম্, ঘরে যদি পড়াতে চান্ আমি সাধ্যমত যত্ন ক'রে এদিগে পড়াতে পারি।" বর্ষীয়সী একটু আশ্চর্য্য ভাবেই বলিলেন,—'তুমি পড়াবে ?" বলিয়া অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন,—'তা' তুমি তো অমনি পড়াবে না মা, তোমারও তো খাওয়া পরা আছে ?" সমা বর্ষীয়সীর কথা সমাপ্ত না হইতেই বলিল,—"আজ্ঞে, বেশী কিছু আমি এর জন্যে চাইনে, মাসে পনেরোটী ক'রে টাকা দিলেই আমি দুবেলা এসে দুটী মেয়েকেই প'ড়িয়ে যাই।" নচগানের কথাটা সমা মনেও আনিতে পারিল না—বলা দূরে থাক্। বর্ষীয়সী সাশ্চর্য্য ভ্রূভঙ্গে বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ ! মাসে পনেরো টাকা ! না মা ? নরেন্ আমার পঞ্চাশটী টাকা মাইনে পায়, উপুরি দু'পাঁচ টাকা আছে তাই কোনো রকমে সংসারটা চলে যায়, তার পর, বড় মেয়েটীর পাত্রর যোগাড় দেখতে হয়েচে, আমাদের কায়েতের ঘরে আজ কাল মেয়ের বিয়ে দিতে হাজার

হাজার টাকা খরচ হয়, মেয়ে লেকা পড়া জানে বলে তো তা'রা ঐ লেকা পড়ার খরচটা পণ থেকে বাদ দিয়ে নেবে না, বরঞ্চ লেকা পড়া জানা মেয়ের জন্যে আরও বড় লোকের ঘর খুজতে হবে, তা'তে আরও বেশী খরচ? ঐ মাসে পনেরো টাকা ক'রে, যে টাকাগুলো তোমাকে দোবো, সেটা থাকলে বিয়ের খরচা বেঁচে যাবে? আর আমাদের গেরোস্তো লোকের মেয়ের যে সামান্য একটু লেকা পড়া, তা' বাড়ীতেই মা বাপের কাছেই হয়, হয়েও আসচে। তুমি মা, তোমাদের জেতের বাড়ী, না হয়, খুব বড়লোকের বাড়ী চেষ্টা ক'রে দেখ,—তা'দের টাকার হয়গয় নাই?" নিরাশ হইয়া বৃদ্ধাকে নমস্কার করিয়া সমা উঠিল।

বৃদ্ধার কথাগুলি সমার শিক্ষা, সংস্কারের বিরুদ্ধ হইলেও, আজ বৃদ্ধার মিষ্ট মিষ্ট কথাগুলির বিরুদ্ধে তাহারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল না, বরং সেগুলির সম্মুখে মাথা নত করিয়াই দিল। যাহা হউক; আজি এতক্ষণকার নানা বিষয়ের মধ্যে একটা জিনিস যেন রাশিকৃত জঞ্জাল মধ্যস্থিত হীরক খণ্ডের মত সমার মনে চক্ চক্ করিতেছিল, সেটা, সেই শিশু এবং তা'র জননীর সম্বন্ধ। গৃহ হইতে বাহির হইবার কালে সমার অজ্ঞাতসারে তাহার করাঙ্গুষ্ট কনিষ্ঠার প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় পর্ব্ব কয়েকবারই ভ্রমণ করিল,—সে আজ তিন বৎসরের হইত!'

বিবাহ পদ্ধতি ও তাহার উদ্দেশ্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র সিংহ

যাঁহারা ইংরেজী সমাজনীতির পক্ষপাতী, তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে স্ত্রী এবং পুরুষকে মিশাইয়া এক করিলে দুই জনের যে সকল পৃথক্ পৃথক্ মনোবৃত্তি এবং রুচি আছে তাহার স্বাধীন এবং সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয় না। এ কথার প্রথম উত্তর এই যে, যদি তাহা না হয় তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? রুচি এবং মনোবৃত্তি কিসের জন্য? শুধু স্বাধীন স্ফূর্ত্তির জন্য, না জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য? যদি স্বাধীন স্ফূর্ত্তি লাভ ক'রতে গেলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করা না যায়, তাহা হইলে শুধু স্বাধীন স্ফূর্ত্তি লইয়া কি হইবে? যদি জীবনের উদ্দেশ্য সাধনার্থ স্বাধীনতা এবং স্ফূর্ত্তির পরিমাণ কম করিতে হয়, তাহাও কি করা উচিত নয়? সামাজিক জীবনের অর্থই ত তাই। দশজনে মিলিয়া একটি উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে কেহই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না সকলকেই কিয়ৎপরিমাণে আপন আপন স্বাধীনতা পরিত্যাগ করিতে হয়। অপরের সাহায্যে আপনার কর্ম্ম সাধন করিতে হইলে, অপরের কাছে আপনার কিয়দংশ বলি দেওয়া নিতান্ত ন্যায়-সঙ্গত। স্ত্রী ও পুরুষ মিলিয়া এক হইলে, দুই জনের যে পৃথক্ পৃথক্ রুচি ও মনোবৃত্তি আছে তাহার স্বাধীন ও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয় না, এ কথার কোন অর্থ নাই। প্রগাঢ় প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া পতি

এবং পত্নী একই উদ্দেশ্য সাধনার্থ একই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন। কিন্তু যিনি সেই কার্য্যটি যে রকম করিতে সমর্থ, তাঁহার তাহা সেই রকমে করিবার কোন বাধা নাই। মনে কর পতি এবং পত্নী উভয়েই অতিথিসেবায় নিযুক্ত। কিন্তু পতি কেবল অর্থোপার্জ্জন করিয়া অতিথি সেবার জন্য দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিয়া দিতেছেন। পত্নী স্বহস্তে সেই সকল দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সন্তানকে যেমন যত্ন করিয়া স্বয়ং ভোজন করাইয়া থাকেন অতিথিকে তেমনি স্বয়ং ভোজন করাইতেছেন। শাস্ত্রের ব্যবস্থাও তাই। পতি প্রাত্যহিক যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন, পত্নী সেই যজ্ঞের নিমিত্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিবেন। এখনও শ্রাদ্ধের সময়ে স্ত্রী পিণ্ড গড়িয়া দেন। আর এক কথা এই যে এক মনে, এক প্রাণে এক উদ্দেশ্যের অনুবর্ত্তী হইলে কি পতি কি পত্নী কাহারও পৃথক্‌ভাবে কার্য্য করিবার অভিরুচি হয় না। যতটুকু অভিরুচি হয়, প্রগাঢ়-প্রণয়-স্থলে সেটুকু যেমন অবিবাদে এবং প্রীতিকর প্রণালীতে চরিতার্থ করা যায়, প্রণয়ের অন্য অবস্থায় তেমন করা যায় না।

যাহারা ইংরেজী সমাজনীতির পক্ষপাতী তাহাদিগের সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা বলিতে চাই। প্রথম কথা এই যে হিন্দুরা পত্নীকে পতিতে এবং পতির কুলেতে চিরকালের জন্য অচলভাবে আবদ্ধ রাখিতে যত্নবান্। বিবাহের মন্ত্রে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।
ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা পতিকুলে ইয়ম্॥

আকাশ ধ্রুব, পৃথিবী ধ্রুব, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধ্রুব, পর্ব্বত সকল ধ্রুব এই স্ত্রীও পতিকুলে ধ্রুব।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হিন্দুশাস্ত্রকার পত্নীকে পতিতে এবং পতিকুলেতে বাঁধিয়া রাখিতে চান, এবং সেই জন্য পতি ও পত্নীর যোগকে চিরস্থায়ী যোগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজদিগের ঠিক সেই মত এবং সেই চেষ্টা নয়। তাহারা যে পতি পত্নীর সম্বন্ধ চিরস্থায়ী করিতে অনিচ্ছুক তাহা নহে। কিন্তু পতি এবং পত্নীর স্বাধীনতার দিকে এবং পৃথক্ পৃথক্ আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ এবং অভি-রুচির দিকে, তাহাদের অধিক দৃষ্টি; সেই জন্য তাঁহারা পতি এবং পত্নীর বিবাহগ্রন্থি যাহাতে সহজে খোলা চলে সেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দু বলেন—পতি এবং পত্নীর মধ্যে আজ যদি কোন অপ্রণয়ের কারণ থাকে, কাল তাহা অদৃশ্য হউক; কাল যদি অপ্রণয়ের কারণ হয় পরশ্ব তাহা অদৃশ্য হউক; মোট কথা, পতিপত্নীর মধ্যে সমস্ত অপ্রণয়ের কারণ বিনষ্ট হইয়া ক্রমেই তাহারা পরস্পরে মিশিয়া যাউক। ইংরেজরা বলেন—পতিপত্নী আজ পরস্পরের প্রণয়ে ভাসিতেছেন, কিন্তু কাল তাহাদের মধ্যে অপ্রণয়ের কারণ জন্মিতে পারে; যদি তাহাই হয় তবে পরশ্বই তাহারা যাহাতে দাম্পত্যবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন, আইনে এরূপ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। কিন্তু হিন্দুরা পতিপত্নীর বিরোধ ভাঙ্গিয়া তাহাদের দাম্পত্যগ্রন্থি আঁটিয়া দিতে চান। ইংরেজ পতিপত্নীর বিরোধ প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের দাম্পত্যগ্রন্থি খুলিয়া দিতে চান। হিন্দু সৃষ্টি এবং পালনের পক্ষপাতী, ইংরেজ প্রলয়ের পক্ষপাতী। হিন্দু এবং ইংরেজের মধ্যে এই প্রভেদটী অতি গুরুতর এবং ইহার তাৎপর্য্যও অতি গভীর। ইহার দুইটী তাৎপর্য্য আছে। একটী তাৎপর্য্য এই যে হিন্দুরা এমন বয়সে কন্যার বিবাহ দেন যে তখন তাহার পতি তাহাকে শিক্ষা দ্বারা আপনার মত করিয়া লইতে পারেন এবং সেই জন্য যত দিন যায় পত্নী ততই পতিতে মিশিতে থাকে, অর্থাৎ পতির

ভাবাপন্ন হইতে থাকে। কিন্তু ইংরেজরমণীর এমন বয়সে বিবাহ হয় যে, তখন তিনি নূতন শিক্ষা লাভ করিতে অক্ষম; সেই জন্য তাঁহার পতির সহিত অপ্রণয়ের কোন কারণ থাকিলে পতি তাহা নষ্ট করিতে অক্ষম হন; কাজেই যত দিন যায় কারণটি ততই প্রবল হইয়া উঠে। দুইটি জাতির মধ্যে কন্যার বিবাহের বয়সের প্রভেদবশতঃ তাহাদিগের দাম্পত্যনীতি ও প্রণালীর এত আকাশপাতাল প্রভেদ ঘটিয়াছে। আর একটী তাৎপর্য্য এই অধিক বয়সে রমণীর বিবাহ হয় বলিয়া তিনি পতি কর্ত্তৃক প্রয়োজনমত শিক্ষিত হইতে পারেন না। ইংরেজ একথা বুঝেন, কিন্তু বুঝিয়াও কেন তাহার প্রতিবিধান করেন না, অল্প বয়সে রমণীর বিবাহের ব্যবস্থা কেন করেন না, এ প্রশ্নের মীমাংসা বড় সহজ নয়। আমি যেরূপ বুঝি তাহা বলিতেছি। অনেক কারণে ইংরেজ অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দেন না। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ এই যে, অল্প বয়স হইতে স্ত্রী যদি পতির নিকট থাকে তাহা হইলে সে অবশ্যই পতির মানসিক শাসনের অধীন হইয়া পড়িবে। যদি তাহা হয়, তবে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায়। সংসার-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে, সমাজ-সম্বন্ধে, ধর্ম্মনীতি-সম্বন্ধে, সুরুচি এবং কুরুচিসম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে তাহার যেরূপ স্বাধীন শিক্ষালাভ হওয়া উচিত তাহা হয় না। সে যেন প্রভুর দাস হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা হইলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব থাকে কই? স্বাধীন মানুষের স্বাধীনতা থাকে না। এ কথার অর্থ এই যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য স্ত্রী এবং পুরুষ যখন মিলিত হইবে, তখন তাহারা পরস্পর স্বাধীন ব্যক্তির ন্যায় স্বাধীন থাকিবে বলিয়া মিলিত হইবে। কোন একটি কার্য্য বা উদ্দেশ্যকে প্রধান ভাবিয়া মিলিত হইবে না। স্ব স্ব প্রধান ভাবিয়া মিলিত হইবে। আত্মপ্রিয়তা ইংরেজীবিবাহের প্রণালীর মূল সূত্র। ইহাদের জীবনের চরম উদ্দেশ্য নৈসর্গিক প্রেরণাকে সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ করা। তাই ইংরেজবিবাহের গ্রন্থি খুলিয়া দিতে এত যত্নবান্। হিন্দুর বিবাহ মহদুদ্দেশ্যমূলক বলিয়া হিন্দু বিবাহগ্রন্থি আঁটিয়া রাখিতে চায়। কিন্তু বুঝিয়া দেখা উচিত যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যদি কোন অর্থ থাকে, তবে সেই স্বাধীনতাকে বড় করা ভাল না জীবনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য স্থির করিয়া সেইটীকে বড় করা ভাল? যদি তোমার স্বাধীনতা থাকে তবে এমন হইতে পারে যে তোমারই সুখ হইল আর কাহারও কিছু হইল না। কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া যদি পরোপকারী হইতে পার তবে তুমিও সুখী হইবে, অপরেও সুখী হইবে। এ জগতে একাকী থাকিবার উপায় নাই; যদি পাঁচজনকে লইয়া থাকিতে হইল তবে জীবনটা পাঁচজনের সেবায় উৎসর্গ করিতে পারিলেই এজগতে এ জীবনের কার্য্য একরকম করা হইল না? কিন্তু সেই মহৎকার্য্যসাধনার্থ যদি স্ত্রী পুরুষের মিলন আবশ্যক হয় তবে নিজ স্বাধীনতাকে বড় না করিয়া, সেই মহৎ কার্য্যটাকে বড় ভাবিয়া, স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইলেই ভাল হয় না? যদি বল—স্ত্রীপুরুষ মিলিত হয় হউক, কিন্তু যে মহৎ কার্য্যের উল্লেখ করা হইল সেই জন্যই যে তাহারা মিলিত হইবে এমন কি কথা আছে? ইহার উত্তর এই যদি স্ত্রী এবং পুরুষকে মিলিতেই হয় তবে সেই মহৎ কার্য্যোদ্দেশ্যে মিলিলে মিলনটা যত মহৎ এবং মনুষ্যত্ব-সূচক হয়, অন্য কোন উদ্দেশ্যে মিলিলে তত হয় না। একথা যদি ঠিক হয়, তবে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে বিবাহের দ্বারা জীবনের মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইলে যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে বা বিসর্জ্জন দিতে হয়, তবে যে মানুষ হইবে তাহার তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। মহদুদ্দেশ্য থাকিলেই মানুষের সহিত মানুষের প্রকৃত বিবাহ হয়—যেমন হারমোদিয়াসের

সহিত এরিষ্টজিটনের বিবাহ; যীশুখৃষ্টের সহিত সেন্টপলের বিবাহ, চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ, রামচন্দ্রের সহিত লক্ষণের বিবাহ।

আর এক কথা—ইংরেজের স্বাধীনতার ধূয়া কি জন্য? উত্তরে হয়ত বলিবে—অপরের দ্বারা স্বাধীনতা অপহৃত হয় বলিয়া, অপরে অত্যাচার করিয়া বা স্বার্থ-সাধনার্থ স্বাধীনতা নষ্ট করে বলিয়া। কিন্তু মনুষ্য-জীবনের মহৎ-কার্য্য-সাধনার্থ স্ত্রী-পুরুষের যে মিলন এবং মিশ্রণ হয় তাহাতে অত্যাচারই বা কোথায়, স্বার্থ সাধনার্থ অভিপ্রায়ই বা কোথায়? তাহাতে যদি স্বাধীনতার বিলোপ হয় সেত স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই মহৎ-কর্য্য-সাধনার্থ হইবে। অতএব সে স্বাধীনতা বিলোপের বিরুদ্ধে কাহারও কোন কথা কহিবার কিছু নাই। মহৎ কার্য্যের নিমিত্ত যাহা দেও তাহাত দূষণীয় দান নয়, তাহা মহৎ মনের মহৎ ও পবিত্র আহুতি। ইংরেজ সে মহৎ ও পবিত্র আহুতি দিবার নিমিত্ত বিবাহ করে না, হিন্দু করে।

বোধ হয় বুঝা গেল যে ইংরেজ প্রভৃতির বিবাহ-প্রথায় দাম্পত্য গ্রন্থি খুলিয়া দিবার যে ব্যবস্থা আছে তাহা ভাল নয়, এবং হিন্দু বিবাহ স্ত্রী-পুরুষের যে মিশ্রণ বা একীকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয় তাহা অতি উত্তম এবং অতি প্রয়োজনীয়। জগৎকে একই চক্ষে দেখিয়া যাহাদিগকে জগতের মঙ্গল সাধন করিতে হইবে, তাহাদের মিশিয়া এক হইয়া যাওয়াই শ্রেয়ষ্কর। কিন্তু যদি দুইটী হৃদয়কে মিশাইয়া ফেলিতে হয় তাহা হইলে একটি হৃদয়কে আপনার ভিতর মিশাইয়া না লইলে কেমন করিয়া সেই অপূর্ব্ব মিশ্রণ ঘটিয়া উঠিবে? এ সমুদয় কারণে বোধ হয় যে হিন্দু শাস্ত্রে পুরুষের বেশী বয়সে ও স্ত্রীর বাল্যাবস্থায় বিবাহের যে ব্যবস্থা আছে তাহা উত্তম এবং উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

যদি কেহ বলেন—এ পূর্ব্বকালের ব্যবস্থা এখন ও চলিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করি কেন চলিবে না? উপরে বুঝাইয়াছি যে, একান্নবর্ত্তী পরিবারে অনুরোধে কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ আবশ্যক। একান্নবর্ত্তী পরিবার ত এখন এদেশে আছে। তবে কেন সেই সকল পরিবারে কন্যার বিবাহ অল্প বয়সে হইবে না? আর যে সকল ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তি একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া একলাটি থাকেন বা থাকিতে ভালবাসেন, তাহাদিগের সম্বন্ধে ও যে, অল্পবয়সে কন্যার বিবাহ আবশ্যক এবং বিশেষ উপকারী। একান্নবর্ত্তী পরিবারে পতি অনেক সময়ে পত্নীকে আপনার ইচ্ছামত শিক্ষা দিতে পারেন না; অনেক সময় পরিবারস্থ লোকে পত্নীকে পতির শিক্ষার বিরোধী শিক্ষা দিয়া তাহার চেষ্টা অনেক অংশে বিফল করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহাকে পাঁচ জনকে লইয়া থাকিতে হয় না, তিনি নির্ব্বিরোধে এবং অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে পত্নীকে নিজের মনের মত করিয়া তুলিতে পারেন। যাহাকে লইয়া জীবনের সুখ-দুঃখ সকলি, যাহাকে লইয়া জীবনের অর্থ, যাহাকে লইয়া জগতের মুক্তি, তাহাকে গড়িবার মতন মহৎ, প্রীতিকার, এবং অবশ্যকর্ত্তব্য কাজ পুরুষের পক্ষে আর কি হইতে পারে? তাহাকে গড়িবার পক্ষে শত-সহস্র বিঘ্ন থাকিলেও তৎপ্রতি দৃক্ষেপ করাও মহাপাপ, বোধ হয়, কেহ বলিবেন যে শৈশবাবস্থায় কন্যা বিবাহিত এবং পতি-হস্তে সমর্পিত হইলে অপরিণত বয়সে সন্তান প্রসব করিয়া কন্যা স্বয়ং স্বাস্থ্য হারাইবে এবং সন্তান গুলিকেও রুগ্ন করিয়া ফেলিবে। আজকাল এই প্রকার কথা অনেকের মুখে শুনা যায়। কিন্তু বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতা যে প্রধানতঃ বাল্য-বিবাহের ফলে তাহা প্রমাণিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। ইহার প্রধান ও প্রকৃত কারণ ধর্ম্মহীনতা, ধর্ম্ম-পুস্তকাদির স্থানে আদিরসাত্মক উপন্যাস-গল্পাদি

পাঠ করিয়া যুবাবস্থার অযথা ব্যবহারে ক্ষীণবীর্য্যতা এবং যৌনবিধি ও নিয়ম-পালনে অনিচ্ছা ও অক্ষমতা।

দ্বিতীয় কথা এই যে শারীরিক প্রয়োজনে যে বিবাহ করে বালিকা পত্নী তাহার জন্য নয়। যে দেহের প্রয়োজনে বিবাহ করে সে পশু; বালিকা-রূপ পবিত্র বস্তু তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। যে নিজের অত্যাবশ্যককে অতিক্রম করিয়া উদার-ভাবে মনুষ্যত্ব ও বিশ্ব প্রকৃতির সহায়তা করে তাহার জন্য; আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে শাস্ত্রকারেরা বিবাহ করিতে বলেন সেই প্রকার পবিত্র উদ্দেশ্যে যে বিবাহ করে, বালিকা পত্নী তাহারই প্রাপ্য, তাই বলি—যদি বিবাহের অপব্যবহার নিবারণ করিতে হয়, তাহা হইলে পুত্রকে ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ড দেখাও; জ্ঞানবান্, বিদ্বান্ উন্নতমনা, মহৎ আশায় অনুপ্রাণিত করিয়া বেশী বয়সে তাহার বিবাহ দাও; কিন্তু অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে আপত্তি করিওনা। নীচ প্রকৃতির প্রকৃত শাসন বাহ্য শাসনে নাই। চোর বার বার জেলে যায়, তথাপি চুরি করিতে ছাড়ে না। নীচ প্রকৃতির প্রকৃত শাসন আধ্যাত্মিক উন্নতিতে। এখন এদেশে বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য তত মনে নাই বলিয়াই বিবাহের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ তত লক্ষিত হয় না; এই জন্য বিবাহের ফল কদর্য্য হইতেছে এবং সংসারধর্ম্ম প্রকৃতসৌন্দর্য্য হীন হইতেছে। এই নৈতিক অবনতি পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল। নৈতিক উন্নতিকর জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য অনুসরণ কর এবং লক্ষ্মীরূপা নারীর হৃদয়ে মিশিয়া থাক। দেখিবে—এদেশ আর সে দেশ নাই; দেশ ধর্ম্মবলে অমিত বল প্রাপ্ত হইয়াছে; হিন্দুর ঘরে জগতের সৌন্দর্য্য ফুটিয়াছে; সপত্নীক হিন্দু পূর্ব্ব পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া বীরপুরুষ হইয়াছে; দেশে রোগ নাই, ভয় নাই, হীনতা নাই—সকলেই উন্নত, সকলেই পবিত্র, সকলেই ধর্ম্মবীরোচিত।

হিন্দুবিবাহের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য বুঝিলেন। অতএব এখন বলা যাইতে পারে যে, হিন্দু-বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্মচর্য্যা এবং সে বিবাহপ্রক্রিয়ার ফল পতিপত্নীর সম্পূর্ণ একীকরণ। কিন্তু বিবাহ সামাজিক জীবনের ভিত্তি। অতএব ধর্ম্মার্থ সামাজিকতা একমাত্র হিন্দুর অবলম্বন এবং একমাত্র হিন্দুর লক্ষণ। সেই সামাজিকতা শিথীল হইয়াছে, উহাকে দৃঢ় কর; তাহা হইলে পদে পদে গান্ধিজীর সত্যগ্রহণ-ব্যবহার আবশ্যক হইবে না। আর বুঝিতে পারা গেল যে পতিপত্নীর সম্পূর্ণ একীকরণ, ইহাও একমাত্র হিন্দুর ধর্ম্ম। এই পতিপত্নীর সম্পূর্ণ একীকরণের অর্থ—সেই গুণের সাম্যাবস্থা আনয়ন করিয়া প্রকৃতিকে পুরুষ ব্রহ্মে লীন করা—যাহাকে মুক্তাবস্থা বলা যায়।

শাস্ত্রকারেরা উক্ত প্রকার বিবাহপদ্ধতি ছাড়া অন্য প্রকারে বরকন্যা নির্ব্বাচনের পদ্ধতির কথাও বলিয়াছেন, যদ্দ্বারা বর এবং কন্যার নৈসর্গিক বা প্রকৃতিগত ধর্ম্মের মিলন করিতে হয়, যাহাকে আমরা কোষ্ঠী-যোটক বলিয়া থাকি। এইরূপ যোটক এখনও অনেক প্রাচীন হিন্দুপরিবারে দেখান হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই প্রকার কোষ্ঠী-যোটকও আধুনিক নব্যশিক্ষিত চঞ্চলচিত্ত যুবকসম্প্রদায়ের মতে অর্থহীন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই সন্তানসন্ততির কোষ্ঠী পর্য্যন্ত প্রস্তুত করান না।

জন্মলগ্নানুসারে সকল জীবের জীবনের সর্ব্বপ্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ইহা হয়ত পাশ্চাত্য-শিক্ষিত যুবক যুবতী ভ্রান্ত ধারণা বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু ইহা আত্মজ্ঞানের (I am) মত সত্য।

জরায়ুস্থিত ভ্রূণ বর্দ্ধিত হইয়া জীবাত্মার প্রাক্তন কর্ম্মানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন লগ্নে ভূমিষ্ঠ হয়। যে লগ্নে বা মুহূর্ত্তে মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হয় সেই জন্মলগ্নানুসারে উহার যাবতীয় সুখদুঃখাদি নবগ্রহ কর্ত্তৃক যথাবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়। জন্মলগ্নে (জন্মকালে) নবগ্রহ ও নক্ষত্রাদি রাশিচক্রের যে গৃহে যে ভাবে অবস্থিত থাকে, উহারা আজীবন জীবকে তদনুরূপ ফলাফল প্রদান করে। লগ্নানুসারে গ্রহাদির যেরূপ সঞ্চার হইবে সেই অবস্থার মত উহারা জীবকে সুখদুঃখের ভাগী করে। এই প্রকার জ্যোতিষ্কগণনাকে ফলিত জ্যোতিষ বলে।

ফলিত জ্যোতিষ জীবের জীবনের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত করে। বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে রাজার উৎসাহের অভাবে ইহার বিস্তর অবনতি ও অনাদর দেখা যায়, তথাপি ভাল গণকের গণনা যথাযথ সত্য ঘটনায় পরিণত হইতে দেখা যায়। এজন্য এই শাস্ত্রকে অমান্য করা চলে না।

কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল স্বনামধন্য ৺উপেন্দ্রচন্দ্র বোস মহাশয়ের জামাতা—আলিপুরের উকিল ৺আশুতোষ সরকার মহাশয় ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যুর সময় তাঁহাকে ডাকিতে যাওয়ায় বলিলেন, "এখনও বিলম্ব আছে, আমি ঠিক সময়ে উপস্থিত হইব।" তিনি পরে শ্বশুরের মৃত্যুর ২১৪ মিনিট পূর্ব্বে দেখিতে আসিলেন। যে মুহূর্ত্তে মৃত্যু হইবে বলিয়াছিলেন সেই মুহূর্ত্তেই বোস মহাশয় মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

উক্ত ঘটনার পরের আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। আমার পরম বন্ধুবর স্বনামধন্য ৺তারকনাথ পালিতের বিধবা বনিতার শেষ-পীড়ার অবস্থায় তাঁহার পুত্রগণের অনুরোধে উক্ত সরকার মহাশয় গণনা করিয়া বলেন যে, রোগাবস্থায় ইঁহার দুইবার অস্ত্রাঘাত হইবে কিন্তু কোন উপায়ে এযাত্রা রক্ষা পাইবেন না। কোন্ মুহূর্ত্তে মৃত্যু হইবে তাহাও বলিয়া দিয়াছিলেন; ঘটনায় তাহাই প্রমাণিত হইয়াছিল।

বোস মহাশয়ের মৃত্যু ৩ শ্রাবণ, ১৩১২ সালে হইয়াছিল; তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র বোস মহাশয় (হাইকোর্টের উকিল) ২৩।২ বকুলবাগান রোডে বাস করেন এবং পালিত মহাশয়ের পুত্রগণ, ১৩নং বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীটে বাস করেন। ইচ্ছা করিলে পাঠকবর্গ ঘটনাবলীর তদন্ত করিতে পারেন। পাঠক যে স্থানে গণনার ফল অসত্য পাইবেন সে স্থলে জানিবেন যে গণকের দোষেই হইয়াছে, জ্যোতিষশাস্ত্রের দোষে নয়।

ফলিত জ্যোতিষের ফলাফল দ্বারা বুঝা যায় যে জীবনের ঘটনাবলী যতই কেন রহস্যময় হউক না, উহারা গ্রহাদির সঞ্চার বশতঃ ঘটিতেছে এবং উহারা পূর্ব্বাপর স্থিরীকৃত থাকে। ইহা হইতে বেশ বোধ হয় জীবের স্বাধীন সত্তা অনেক সময় দৈব ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইতেছে। জীবের কর্ম্মফল, গ্রহাদির শুভাশুভ দৃষ্টি, দৈব ইচ্ছা ও বিধাতার কার্য্য সকলই একসূত্রে গ্রথিত। মানবের বুদ্ধি বা স্বাধীন ইচ্ছা উহাদের সম্পূর্ণ অধীন। ইহা হইতে ব্রহ্মাত্মবাদও প্রমাণিত হয়।

দেবলীলা বিচিত্র, মানব কি তাহা বুঝিতে পারে? মানব এইমাত্র জানে—যেরূপে ভৌতিক শক্তিনিচয় অপরিবর্ত্তনীল নিয়মাবলী দ্বারা চালিত হইয়া জগতে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন করে, সেইরূপে গ্রহাধিষ্ঠিত লোকপালগণ নিজ নিজ জ্যোতিষ্কমণ্ডলের স্থিতি ও

সঞ্চার অনুসারে (কতকগুলি অখণ্ড আধিদৈবিক নিয়মানুসারে) সকলের ভাগ্যলিপি চালাইয়া সমাজ-জগতেও অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলতা স্থাপন করে।

বিশ্বের ইহা একটী অমোঘ সত্য যে গ্রহাদির বিবিধ সঞ্চার ও ভাববশতঃ যাবতীয় লোকের ভাগ্যলিপি অধিক পরিমাণে চালিত হয়। শুভ গ্রহের শুভ যোগ বশতঃ কেহ সংসারে নানা দিকে অশেষ সুখ ভোগ করে এবং কুগ্রহের কুযোগে কেহ নানারূপে নিগৃহীত হইয়া অশেষ কষ্ট পায়। একাদশ বৃহস্পতিতে জন্মগ্রহণ করিলে ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ করে, আবার শনির দশায় পতিত হইলে সর্ব্বস্বান্ত হয় বা প্রাণান্ত কষ্ট পায়। যাহার ধনস্থানে শনি থাকে, তাহার অর্থ চিরদিন উড়িতে থাকে এবং অনেক সময় বৃথা কাজে ব্যয় হয়। যাহার ধনস্থানে শনি এবং রাহু দুই পাপগ্রহ থাকে তাহাকে আজীবন ঋণ পরিশোধ করিতে হয় এবং সে কখনও ধনসঞ্চয় করিতে পারে না। যাহার পুত্রের স্থানে (পঞ্চম ঘরে) শনি থাকে তাহার পুত্র জন্মায় না, জন্মিলেও অধিক দিন বাঁচে না। যাহার ঐ ঘরে বৃহস্পতি থাকে, তাহার অনেকগুলি সুসন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং তাহাদের দ্বারা সে অশেষ সুখে সুখী হয়। যাহার জায়া গৃহে (সপ্তম ঘরে) শনি থাকে, তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইতে থাকে এবং সে কদাচ স্ত্রী লইয়া সুখী হইতে পারে না। যাহার ঐ গৃহে বৃহস্পতি থাকে সে পরমা সুন্দরী ও অশেষ গুণবতী ভার্য্যা পাইয়া অশেষরূপ সুখী হয়। জন্মকুণ্ডলীর ভিন্ন ভিন্ন গৃহে শুভাশুভ গ্রহ থাকিয়া সকলের সুখদুঃখ অশেষরূপ নিয়ন্ত্রিত করে।

গ্রহাদির বার্ষিক গতিতে বিভিন্ন ঋতুর আগমনে পৃথিবীর কোন সময়ে ফলফুলে শোভা পায়, আবার কোন সময়ে শীতগ্রীষ্মের আগমনে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে, সেইরূপ শুভাশুভ গ্রহাদির সঞ্চারবশতঃ প্রত্যেক মানবের জীবন কোন সময়ে অশেষ সুখপূর্ণ হয়, কখনও বা নানা দুঃখে পরিপূর্ণ হয়।

সমাজ

শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

সমাজবদ্ধ হইয়া চলা জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী সকলেরই স্ব স্ব সমাজ আছে। সমাজ ত্যাগ করিয়া কেহই থাকিতে পারে না। মানবও পারে না। সমাজ যাহার নাই, সমাজ শক্তি যাহার সুদৃঢ় নহে, এ জগতে তাহার জাতির অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব। সমাজ শক্তিহীন তেমন বহু জীবজন্তুর ধ্বংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কোন কোন দেশের মানবেরও গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়াইয়া উপরের দিকে যখন তাকাই তখন সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রাদির একটা বিরাট সমাজ দেখিতে পাই। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, উঁহাদের সমাজ বন্ধন অতিশয় সুদৃঢ়, তাই কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া ইহারা একই নিয়মে আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছে, কোথাও কোনরূপ ব্যতিক্রম নাই।

এইরূপ জীবজগতের কথা। অন্যান্য জীবের ও মানবের সমাজ সাধন প্রণালীতে পার্থক্য অনেক। পশুপক্ষীর জ্ঞানের স্তর হইতে মানবের স্তর যেমন বহু উচ্চ, তেমনই বহু ব্যাপক। পশু পক্ষীর জ্ঞান সীমাবদ্ধ, মানবের জ্ঞান অসীম। গৃহপালিত গো-মহিষাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বনের ভীষণ হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্র ভল্লুক বিষধর সর্প প্রভৃতি সকল ইতর জীবের প্রকৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তি মানব বুদ্ধির অধিগম্য। তাহাদের কাহার সহিত কিভাবে চলিতে হইবে মানব তাহা স্থির করিয়া লইয়াছে। কিন্তু মানব একে অন্যের প্রকৃতি ত সম্যক্‌রূপে জানিতেই পারে না; নিজেরও পারে না। কারণ মানবের মধ্যে দেবত্ব ও পশুত্ব দুইই রহিয়াছে। যে মানব বাহিক্ ব্যবহারে দেবতার অভিনয় করে, সেইই হয়ত ভিতরে ভীষণ পশু। যে এইক্ষণে দেবতার স্তরে আছে তাহার ভিতরের পশু কখন কোন্ সূত্র ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া যায়, সেই তাহা বুঝিতে পারে না। পারিলেও মন ও বুদ্ধির ভেল্কী হইতে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজিয়া পায় না। পশুর ভোগলালসার সীমা আছে, দুষ্কর্ম্মেরও সীমা আছে,—মানবের নাই। এজন্য মহর্ষিগণ মানবের গন্তব্যপথকে ক্ষুরধারের মতন ভয়াবহ ও দুস্তর বলিয়াছেন। সেই দুস্তর পথে মানব যেন নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে পারে তেমনই ভাবে মন্বাদি ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ সমাজব্যবস্থা করিয়াছেন।

সমাজের মূল সূত্র সঙ্ঘবদ্ধতা। সঙ্ঘবদ্ধতার মূল উপাদান প্রেম ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি। পরস্পরের মধ্যে প্রেম আছে ও সকলেই যথাসাধ্য কর্ত্তব্যপালন করেন বলিয়া আমরা মাতাপিতা ভ্রাতা ভগ্নী স্বামী স্ত্রী পুত্রকন্যা প্রভৃতির মধ্যে এমন সুদৃঢ় বন্ধন, এমন আত্মভাব দেখিতে পাই। প্রেমের দৃষ্টিতেই এক এক জন প্রাণের এত নিকট। শিশু মলমূত্রে লিপ্ত, ক্ষুধায় কাতর, অশ্রান্ত কাঁদিতেছে মা আসিয়া তাহার মলাদি মুছিয়া দেখিলেন, তাহাকে কোলে লইয়া স্তনের অমৃতধারায় তৃপ্ত করিলেন। আহা, প্রেমের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি!—শিশু বুঝিল এই আমার মা। খাইতে শুইতে নাইতে এত যত্ন করেন কে? ঠাকুরমা। এইরূপ প্রেম কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সাহায্য ও সাহচর্য্যের ভিতর দিয়া শিশু যেমন আপনার মা, ঠাকুরমা, ঠাকুরদা, ভাই, ভগ্নী, খুড়া, খুড়ি প্রভৃতিকে আপনার বলিয়া জানে, তেমনই সমাজের প্রত্যেকে অপর সকলের দ্বারা উপকৃত হইয়া তাহাদের সকলকে আপনার জানে। সমাজই তাহাদের অবলম্বন, সমাজই তাহাদের সমস্ত শক্তির উৎস। যেখানে একে অন্যকে আপনার জন মনে করে না, পরস্পরের মনের মিল থাকেনা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা সকলের স্বচ্ছন্দবাসের অনুকূল হয় না, সেখানে সমাজসঙ্ঘটন অসম্ভব।

দেশে কৃষক, শিল্পী, সাহিত্যিক্, বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক, রাষ্ট্রনীতিবিৎ, অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ প্রভৃতি বহু শ্রেণীর লোক থাকেন। তাঁহাদের সকলের মনোভাব একরূপ নহে। আবার কৃষক মাত্রেই এক ধর্ম্মী নহে শিল্পীরাও নহে। শিল্পের প্রকারভেদে শিল্পীদের অসংখ্য শ্রেণী ও সম্প্রদায় হইয়াছে, যেমন স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, তন্তুবায়, চর্ম্মকার ইত্যাদি। ইহারা সকলেই একত্র বাস করিতে বা এক সমাজে থাকিতে পারিবে না। কারণ, একের আচার প্রণালী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অন্যের মনোবৃত্তির অনুকূল নহে। সকলই স্ব স্ব মনোবৃত্তির অনুকূল অবস্থাই চাহে। বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে থাকিতে পারে না। মুচি মেথরেরা কখনো নিজেদের সমাজ ও যথেচ্ছ আচার ব্যবহার ছাড়িয়া ব্রাহ্মণের সমাজে সংযত আচার ব্যবহার লইয়া থাকিতে স্বস্তি বোধ করিবে না। মদ্য মাংসাহারে, কুৎসিৎ রঙ্গরসে ও যথেচ্ছ কামোপভোগেই তাহাদের আনন্দ। ইহা এক জন্মের শিক্ষা

বা সাহচর্য্যের দল নহে। বহু জন্মের, বহু পুরুষ পরম্পরার সংস্কার লইয়া মানবাত্মা নিজের অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে গিয়াই জন্মগ্রহণ করে। গর্ভস্থ ভ্রূণ পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি এবং তাঁহাদের পিতৃমাতৃকুলের ও সমাজের সংস্কারাদি প্রাপ্ত হয়;—ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। এই খানেই বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায় সৃষ্টির মূল।

পশ্চাত্যবাসীদের একই রকম পোষাক পরিচ্ছদ ও একই রকম আহার বিহারের প্রণালী দেখিয়া আমাদের কেহ কেহ মনে করেন যে উহারা এক জাতি,একধর্ম্ম ও এক সমাজভুক্ত—আমাদের ন্যায় এত জাতিভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, শ্রেণীভেদ তাহাদের মধ্যে নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে। তাহাদের মধ্যে বহু পার্থক্য ত আছেই, বরং তাহা অধিকতর সাংঘাতিক। একই খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী প্রোটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলকদের মধ্যে শুধু ধর্ম্মবিশ্বাসে নহে, আচারে ব্যবহারেও কত পার্থক্য; এবং তাহা লইয়া সুদীর্ঘকাল যাবৎ তাহাদের মধ্যে কত কাটাকাটি মারামারি হইয়া গিয়াছে। ইহুদিদের সঙ্গে তাহাদের চিরকালইত তেঁতুলে চাউলে সম্বন্ধ'। সুবিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক মিঃ বার্ট্রেণ্ড রাসেল বলেন,—

"It is a peculiarity of modern communities that they are divided into sects which differ profonndly in their morals and in their beliefs...... In our own day throughout the continent of Europe there is a profound division between socialists and others, which covers not only politics but almost every department of iife. In English-speaking countries the divisions are very numerous.......Owing to all these dfferences of out-look a person of given tastes and convictions may find himself practically an outcast while he lives in one sect, &c." (আধুনিক সম্প্রদায়সমূহের একটা বিশেষত্ব এই যে তাহারা নীতি ও ধর্ম্ম বিশ্বাসে একে অন্য হইতে গুরুতর ভাবে স্বতন্ত্র হইয়া যাইতেছে। আজি ইউরোপের সোসিয়েলিষ্ট এবং অন্যান্যদের মধ্যে শুধু রাষ্ট্রনীতিতে নহে জীবন-যাত্রার প্রত্যেক ব্যাপারে ঘোরতর পার্থক্য উপস্থিত। ইংরেজদের ভিতর এইরূপ ভিন্নভেদের রকম অনেক। এই সমস্ত পার্থক্যের ফলে একরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস ও রুচিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের লোকের কাছে তিষ্ঠিতে পারে না।)

বস্তুতঃ তথাকার সামাজিক ভেদবুদ্ধির তীব্রতা এত উৎকট যে একের সহিত অন্যের বসবাস পর্য্যন্ত অসম্ভব। মানুষে মানুষে বিচ্ছেদের ভাব ক্রমে সমাজে ও সমাজ হইতে পরিবারে প্রবেশ করিয়াছে; পিতামাতার সহিত পুত্র ও কন্যারা, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতাভগ্নীরা কোন সম্পর্ক রাখে না। পাশ্চাত্যের উপদংশ, ওলাউঠা, ম্যালেরিয়া, প্লেগ প্রভৃতি মারাত্মক দৈহিক ব্যাধির ন্যায় এই উৎকট ব্যাধিও অল্পদিন মধ্যে আমাদের দেশকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। যিনি কিঞ্চিৎ অর্থকরী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া উপার্জ্জনক্ষম হইতেছেন তিনিই স্বীয় পূর্ব্ব পুরুষের সুসজ্জিত সমাজ ও ভদ্রাসন ত্যাগ করিতেছেন, পিতামাতা ভাই ভগ্নীর সম্পর্কও রাখেন না।

এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম গণ্ডী সৃষ্টি করিয়া করিয়া কি কেবলই ভেদ বিচ্ছেদ ও বিদ্রোহের দাবানল জ্বালাইতে থাকিব? না—মা আমাদের দয়া ও কর্ত্তব্যের হস্ত প্রসার করিয়া

দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারই প্রসাদে বহু ভিন্নভেদের ভিতরও একতার সূত্র দেখিতে পাই, একে অন্যকে প্রাণের নিকটে পাইয়া শান্তিলাভ করিতে ও সুখের সৌধ গড়িতে চাই।

রজঃ ও তমোগুণের প্রভাবেই এই সমস্ত ভিন্নভেদের খেলা চলিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের প্রেম ও কর্ত্তব্য জ্ঞানও ভিন্ন ভিন্ন রকমের, এবং তদ্দ্বারাই এক এক স্তরের লোকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। কোন কোন স্তরের অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় তৎসমস্ত পশুর স্তর হইতে বেশী উচ্চে উঠে নাই। যে কোনরূপে ভোগবস্তু সংগ্রহ, যথেচ্ছ আহার বিহার, আমোদ উল্লাস ও ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিসাধনই তাহারা জীবন ধারণের লক্ষ্য মনে করে। এই হীনবুদ্ধির প্রভাবে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পরের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, এমন কি সুযোগ পাইলে পরকে ধ্বংস করিতেও কুণ্ঠিত নহে। তাহাদের জন্যই মানব সমাজ আজ ঘোর বিপন্ন। এইরূপ পশুত্বের কবল হইতে মানবতাকে দেবত্বের দিকে অগ্রসর করাই মহর্ষীদের প্রচেষ্টা।

সুদৃঢ় ভিত্তির উপর উৎকৃষ্ট লৌহ এবং প্রস্তরাদির দ্বারা বিরাট পঞ্চতল বা সপ্ততল সৌধ নির্ম্মাণ করিতে পারিলে আপনি কেমন আনন্দ লাভ করেন; সেই অটল দুর্ভেদ্য গৃহে বাস করিয়া ভীষণ ঝড় জল শীতাতপ ও ভূকম্পন তুচ্ছ করতঃ আত্মশক্তির কত গৌরব অনুভব করেন। কিন্তু তেমন একটি গৃহ প্রস্তুত করিতে কত অর্থের প্রয়োজন, কত সুদক্ষ স্থপতির কত কঠোর শ্রম ও বুদ্ধিবিচক্ষণতার প্রয়োজন, কিরূপ গুণ বিশিষ্ট কত দ্রব্যজাতের আবশ্যক আমার ন্যায় ক্ষুদ্রলোক কি তাহা ধারণা করিতে পারে? সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য খরকুটা দিয়া আমি গৃহ প্রস্তুত করি, আর কালবৈশাখীর প্রথম চোটেই তাহা উড়িয়া যায়। সমাজই জাতির আবাসগৃহ। ঐ সুদৃঢ় বিরাট সৌধে আর আমার খরকুটায় নির্ম্মিত অস্থায়ী ক্ষুদ্র গৃহে যতটা পার্থক্য, ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষীদের সঙ্ঘটিত সমাজে, আর ভোগমোহাচ্ছন্ন অর্ব্বাচীনদের সমাজে ততটা পার্থক্য।

এক পরিবারস্থ সব লোক যেমন গুণ ও কর্ম্মশক্তিতে সমান নহে, সমাজস্থ সকলও সমান নহে। গুণভেদে প্রকৃতিভেদে বর্ণভেদ এবং তদনুসারে ভোগবুদ্ধির তারতম্য সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিভিন্নতা একই দিনে ঘুচাইয়া সকলকে সমান করা অসম্ভব। অথচ সকলকেই অগ্রসর করা চাই। যে যে কার্য্যের যোগ্য তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োজিত রাখিয়া সকলে যাহাতে এক সঙ্গে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। বিভিন্ন স্তরের মানবগণ সঙ্ঘবদ্ধ থাকিয়া স্ব স্ব শক্তি অনুসারে একে অন্যের সাহায্য ও সাহচর্য্য না করিলে মানবের এত শক্তি বিকাশ হইত না। যেমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় কি?

মহর্ষিগণ মানবজাতিকে সুদৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ রাখিবার শ্রেষ্ঠতম উপায় উদ্ভাবন করিলেন—'বর্ণাশ্রমধর্ম্ম'। "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ যবন যে যে স্তরে আছ সে সেই স্তরে থাকিয়া যথাসম্ভব বিশুদ্ধ ভাবে আত্মকর্ত্তব্য করিয়া যাও। যিনি সংসারের সমস্ত ভোগলিপ্সা ভয় মোহ হইতে দূরে থাকিতে সমর্থ, যাঁহাকে কামক্রোধাদি রিপুগণ আক্রমণ করিতে পারে না; ধ্যান ধারণা অধ্যয়ন অধ্যাপনা যাঁহার পুণ্যকর্ম্ম, তিনি তাহা লইয়া থাকুন। তুমি তাহা পার না, গর্ব্ব গৌরব চাও, ভোগৈশ্বর্য্য চাও, বিশুদ্ধভাবে তাহারই সাধন কর, ক্রমশঃ ত্যাগ ও সংযমের দিকে অগ্রসর হও। কারণ, অন্য পন্থা নাই। তুমি ভালমন্দ বুঝ না, শৌচাশৌচ বুঝ না, তোমার অন্তর ভীরুতায় সঙ্কুচিত, মন অতিশয় দুর্ব্বল, কোন কার্য্য দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত করিতে পার না, পূতিগন্ধময় মৎস্যমাংস-

মৎস্যাদি খাইতেই তোমার লালসা, যতক্ষণ তুমি সেই অবস্থা ত্যাগ করিতে না পার ততক্ষণ তোমার গণ্ডীতে থাকিয়া দেখ, ত্যাগ সংযম ও সাধনার দ্বারা ঐ উপরের স্তরের লোকেরা কিরূপে পূর্ণমানবত্তার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তোমাকেও সেই পথেই যাইতে হইবে, সকলেরই গন্তব্য পথ এক। এই যে তোমাদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরভেদ তাহা গুণ ও কর্ম্মভেদেই হইয়াছে। গুণও কর্ম্মবুদ্ধি পূর্ব্বের জন্মান্তরের সাধনার ফল। অতএব যে যেই স্তরে আছে, সে সেই স্তরে থাকিয়াই সর্ব্বতোভাবে আত্মশক্তির উন্নতিসাধন কর। একে অন্যের সহায় হও, পাপের ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিও না, দয়া মমতায় অন্তর পূর্ণ রাখ, পরোপকারই সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম।" ইহাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বাণী।

এই মহোচ্চ বাণী তখন ভারতের সকল শ্রেণীর লোকেরা প্রাণের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সকলেই বুঝিয়াছিলেন'—সকলের এক মত, এক জ্ঞান ও একরূপ কর্ম্মশক্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অথচ সকলেরই একত্র বাস করিতে হইবে। গৃহে যেমন পিতামাতা, পুত্রকন্যা, ভ্রাতা ভগ্নী, প্রবীণ যুবক, শিশু, সকল স্তরের লোক থাকেন, গুরু লঘু জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বিচার থাকে, কেহ কাহারো পর নহেন, সকলেই দৃঢ় ঐক্যবন্ধনে থাকিয়া যথাশক্তি গৃহের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করেন, সমাজেও তেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি হইতে ম্লেচ্ছ চণ্ডালাদি সকলেই থাকিবেন; তাঁহাদের মধ্যে গুরু লঘু পার্থক্য থাকিবে, অথচ কেহই পর নহেন। সকলেই যথাশক্তি আত্মকর্ত্তব্য পালন করিয়া একে অন্যের সহায় হইবেন, সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও গৌরবান্বিত করিবেন।

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তরী

প্রঃ।—অহং, ত্বং, অয়ম্, ইদম্, অদঃ ও তৎ এই সকল শব্দের তাৎপর্য্য কি ?

উঃ।—ইদং বলিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুকে লক্ষ্য করে তাই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য দৃশ্য প্রপঞ্চ বা জগৎ শাস্ত্রে ইদং শব্দ দ্বারা লক্ষিত হয়। যাহা "এই যে" শব্দ দ্বারা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দেওয়া যায় তাহা ইদং ও অয়ং শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচরে যে বস্তু তাহা অদঃ শব্দ দ্বারা লক্ষিত হয়, যাহা "সেই যে" শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ব্রহ্ম বা আত্মা ইন্দ্রিয় গোচর নহে, তাই অদ অসৌ ও তৎ শব্দ দ্বারা তাহা লক্ষিত হয়।

ত্বং বলিতে তুমি ও অহং বলিতে আমি বুঝায়। যাহা উপস্থিত দ্বিতীয় ব্যক্তি আমি পদ বাচ্য মনে করেন তাহাকেই প্রথম ব্যক্তি তুমি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেন, কাজেই তুমি পদবাচ্য ও আমি পদবাচ্য বস্তু একই বস্তু। এই আমি বা অহং টী কি বা কে তাহা বুঝা আবশ্যক। সাধারণতঃ আমি বলিতে দেহ বুঝায় যেমন দেহ বিকল হইলে বলে—আমি বিকল হইয়াছি, দেহ আহার্য্য গ্রহণ করিলে বলে—আমি খাইয়াছি, দেহ গমন করিলে বলে—আমি যাইতেছি। বাষ্পপরিচালিত

"এঞ্জিন" নামধেয় যন্ত্রও বিকল হয়। জল কয়লারূপ আহার্য্য গ্রহণ ক'রে বাষ্পবলে গমনও করে। ইঞ্জিন বা রথ জাতীয় পদার্থ জড় বলিয়াই কথিত হয়, আমি তুমি বলিয়া কথিত হয় না। আমিত্ব বা অহংতা বা মমত্ব বা আমার-আমার যে ভাব তাহা ও আমিতে প্রভেদ সবাই করে, যেমন আমার ঘড়ি আমার চেন্ আমার কোট আমার আঙ্গুটী আমার গৃহ; আমি হইতে পৃথক আমি নই; তদ্রূপ আমার স্ত্রী আমার পুত্র আমার কন্যা আমি নই আমা হইতে পৃথক্। যাহা আমার পদবাচ্য তাহা আমি নহে আমি হইতে পৃথক্ ইহা স্বীকার্য্য। এখন পায়ে ব্যথা হইলে কি কোন অঙ্গবিশেষে ব্যথা হইলে লোকে বলে—আমার পায়ে ব্যথা, আমার মাথায় ব্যথা, আমার সর্ব্ব দেহে বেদনা হইয়াছে। যখন দেহ আমার পদবাচ্য তখন উহা আমি নই আমি হইতে ভিন্ন হইবে। রাস্তা চলিতে মটর চাপা পড়িয়া হাত বা পা ভাঙ্গিয়া গেল ডাক্তার তাহা কাটিয়া ফেলিলেন তখন যে হাত বা পা কাটা গেল তাহা যদি আমি হইত তবে সেই লোকের আমিত্বের স্বল্পতা বোধ হইত। হাতপা কাটা গেলেও কেহ আমি পদবাচ্য যাহা তাহার স্বল্পতা বোধ করে না। ইহাতে হাত পা আমি নই আমার—ইহা স্পষ্ট বলা যায়। হাত পা প্রভৃতি যেমন অন্য অঙ্গও তেমন। কাজেই অন্য অঙ্গও আমি নই। ঐ সমস্ত অঙ্গ যদি আমার হইল তবে দেহটা আমার আমি নই এটা ঠিক। কোট প্যাণ্ট যেমন আমার তেমনি দেহ আমার পদ বাচ্য খোলস বা রথ জাতীয় পদার্থ। কাজেই আমি খাইয়াছি আমি যাইতেছি আমি বিকল হইয়াছি বাক্য ভ্রমপূর্ণ বলিতে হয়। আমার দেহ খাইয়াছে যাইতেছে বা বিকল হইয়াছে। সময় সময় তাহা বলিয়াও থাকে। দেহদহন অহরহ হইতেছে। যদি দেহ আমি হইত তবে পিতা মাতার দেহ বা গুরুজনের দেহ দাহন কালে আঘাত করায় পিতৃহত্যা মাতৃহত্যা বা গুরুবধ জনিত পাপ হইত। তাহা হয় না, কাজেই পিতৃত্ব মাতৃত্ব বা গুরুত্ব দেহের ধর্ম্ম নহে, তাহা হইতে বিলক্ষণ আর কিছু। অন্ধও আমি বলে, খঞ্জও আমি বলে, হ্রস্বব্যক্তিও আমি বলে, দীর্ঘ ব্যক্তিও আমি বলে, বালকও আমি বলে, বৃদ্ধও আমি বলে, পুরুষও আমি বলে, স্ত্রীও আমি বলে—কাহারও আমিত্ব দেহসূচক নহে। দেহের অতিরিক্ত কিছু—তাহাকে দেহী বলে।

আজ যে চক্ষুষ্মান্ কাল সে অন্ধ সেজন্য তাহার আমিত্বের হানি মনে করে না। দেহেরই হানি দেখে। আজ যে পদসম্পন্ন কাল সে খঞ্জ হইয়া আমিত্বের কম হইয়াছে বোধ করে না, দেহেরই কম হওয়া মনে করে। পাঁচবৎসরের ব্যক্তি পঁচিশ বর্ষে হ্রস্ব হইতে দীর্ঘ হইল, আমিত্ব দীর্ঘ হওয়া মনে করে না, বা দীর্ঘ সকল পুরুষ রোগে কুব্জ হইয়া হ্রস্ব হইল দেহেরই দোষ দেখে আমিত্বের বরাই সমানই থাকে। ইলা দেবশাপে স্ত্রী হন। সেই ইলাবুধকে বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করেন আবার পুরুষ হইয়াও পুত্রোৎপাদন করেন; ইলার দৈহিক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, আমিত্বের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কি? রাজা ভিখারী হইলে দেহের সুবেশ সুকেশ দূর হইয়া কৃশ মলিন জটিল সন্ন্যাসী হইল—তার আমিত্বের কোন পরিবর্ত্তন হয় কি? ব্রাহ্মণ খৃষ্টান হইল—তাহার আমিত্বের কোন পরিবর্ত্তন হয় কি? এই সব পরিবর্ত্তনের মধ্যেও আমিত্বটা অপরিবর্ত্তনীয় কিছু। দেহাদি নামরূপ হইতে ভিন্ন। এই দেহ যদি আমি নয় তবে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কি দেহী আমি পদবাচ্য? না তাহাও বোধ হয় না, কারণ আজ তুমি সুলোচন কাল অন্ধ হইলে আজ শ্রুতিধর কাল বধির হইলে, আমিত্ব বরাবর অটুট থাকে। কাজেই ইন্দ্রিয় গণ আমি নহে। আমার চক্ষু আমার মন আমার বুদ্ধি ইত্যাদি আমি নহে। ইন্দ্রিয়গণ করণ মাত্র কর্ত্তা নহে। করণ কর্ত্তা হয় না যেমন বৃক্ষ ছেদন ব্যাপারে কুঠার করণ—কর্ত্তা

নহে। ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বস্তু অনুভব করিতে মনের উপস্থিতি আবশ্যক; মন অন্যত্র থাকিলে নিকট বস্তুও দেখা যায় না বা শুনা যায় না। অন্যমনস্ক হইলে পার্শ্ববর্ত্তী ঘটনাও কেহ ইন্দ্রিয় সাহায্যে জানিতে পারে না। আমি কাজ করি আমি ভোগ করি আমি কর্ত্তা ভোক্তা। ইন্দ্রিয় কর্ত্তা ভোক্তা নহে, কাজেই আমি ইন্দ্রিয় নহি। চক্ষু কর্ণের কাজ বা কর্ণ নাসার কাজ করিতে পারে না, যেমন কুঠার করাতের কাজ করিতে পারে না। কাজেই ইন্দ্রিয়গণের সংঘাতও আমি নই। সংঘাত সর্ব্বদাই পরতন্ত্র হয়, স্বতন্ত্র হয় না। যেমন ঘড়ী ইঞ্জিন ইত্যাদি। স্থূলদেহও সংঘাত। ইন্দ্রিয়াদি মনবুদ্ধিযুক্ত সূক্ষ্ম শরীরও সংঘাত, কাজেই পরতন্ত্র—কর্ত্তা নহে। আমি চেতন, জড় নই। এজন্য প্রাণ আমি হইতে পারে না, কারণ প্রাণ জড়। নিদ্রাকালে ঘড়ীর ন্যায় প্রাণবায়ুর কাজ চলে। ঘরে চুরি গেলে ঘড়ী বা প্রাণ কেহই তাহা জানিতে পারে না। উভয়েই তুল্য জড়। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হইলে লোকে বলে আমার প্রাণ যায়। কাজেই প্রাণ আমার—আমি নহে। যদি কেহ দীর্ঘকাল কোন কুৎসিৎ কঠিন ব্যারামে ভোগে তখন সে বলে এখন আমার প্রাণ যায় ত বাঁচি। প্রাণ গেলে যে বাঁচে সেই আমি। কাজেই প্রাণ আমি নহে। আমি প্রাণাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপার দেখিতেছি, কাজেই যেমন ঘটদ্রষ্টা ঘট হইতে ভিন্ন, তেমনি প্রাণাদির ব্যাপার দ্রষ্টা আমি ঐ সকল হইতে ভিন্ন। তবে মনই কি আমি? তাহাও নহে। কাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে লোকে বলে আমার মনে নাই বা মনে আছে; ইহাতে মন আমি নহে আমার জাতীয় পদার্থ। স্বপ্নকালে ইন্দ্রিয়গণ বিলুপ্ত হইলে, শ্রান্ত দুর্ব্বল মন ও বুদ্ধি যোগে কত কিছু দেখা যায়. এই একা মন করে না। একা বুদ্ধিও করে না। উভয়ের সংঘাতে ক্রিয়া হয়, এজন্য ইহারা করণকর্ত্তা নহে আমি নহে। মন বুদ্ধির কাজ বা বুদ্ধি মনের কাজ করিতে পারে না। মানসিক শক্তি ও বুদ্ধির বয়সাদি সহ হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়। চৈতন্যের হ্রাস বৃদ্ধি নাই জড়েরই হ্রাস বৃদ্ধি। "ক্লোরফরম" করিলে মন বুদ্ধি প্রতিহত হয় ইহাও উহাদের জড়ত্বের পরিচায়ক। কাজেই মন বা বুদ্ধি আমি নই। গাঢ় নিদ্রাকালে মনবুদ্ধি থাকে না মূর্চ্ছাদিকালেও থাকে না। কিন্তু আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম এই নিদ্রার সাক্ষী বা মূর্চ্ছার পর আমি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম বলে সাক্ষী দেয়। সেই আমি যে মন ও বুদ্ধি হইতে ভিন্ন তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এই আমি মনবুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণ হইতেও ভিন্ন। মৃত্যুর পর যে আমি সূক্ষ্ম শরীরস্থ থাকে তাহা বর্ত্তমান কালে "সাইকিক" বা ছায়া দর্শন অনুসন্ধান-কারী পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন। এই আমি বা তুমি দেহী। শাস্ত্রে ইহাকে আত্মা বলিয়া থাকে।

—স্বামী মহাদেবানন্দ।

———

শাস্ত্রে বিশ্বাস ও যুক্তি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(লেখক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন শর্ম্মা)

(২) কন্যাদান সম্বন্ধে রজস্বলা হইবার পূর্ব্বে বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য শাস্ত্রকারগণের ইহাই প্রধান অভিপ্রায়; তবে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সৎপাত্র বা চরিত্রবান পাত্র না পাইলে অপেক্ষা করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। সেস্থলে অসৎ পাত্রে কন্যাদান অপেক্ষা রজঃস্বলা কন্যাদান করাও ভাল, ইহাই মাত্র বুঝিতে হইবে। ইহাতে বিশেষ অপরাধ না হইলেও উপযুক্ত কাল অতিক্রম হওয়ায় কিঞ্চিৎ অপরাধ অবশ্যই ঘটিবে। আর সৎপাত্রের ভাণ করিয়া অর্থাৎ ধনবান্ রূপবান্ বা মনোমত পাত্রের অপেক্ষায় বিবাহ কাল অতিক্রম করিলে পূর্ণ অপরাধ ঘটিবে সন্দেহ নাই।

(৩) বিধবাবিবাহ আদৌ শাস্ত্রসম্মত নহে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাই বিধবার নিজের পক্ষে এবং সমাজের পক্ষেও মঙ্গল জনক। তবে কলিতে ব্যভিচারের আশঙ্কা করিয়া পরাশর বিধবাবিবাহ অনুমোদন করিতেও বাধ্য হইয়াছেন। কারণ ব্যভিচারিণী হওয়া অপেক্ষা পুনর্বিবাহ করাও ভাল; কিন্তু ব্যভিচার নিবারণ করিতে পারিলে উহা না করাই ধর্ম্মসঙ্গত। কেবল আপদ্‌কালের জন্য অর্থাৎ অসমর্থ পক্ষেই এই বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, নতুবা উহা প্রকৃত বিধান নহে। অতএব কন্যাদান এবং বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বিরোধ কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মনে হইতেছে।

(৪) নিয়োগবিধি সম্বন্ধে মনু দেবরকর্ত্তৃক এবং পরাশর স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কর্ত্তৃক নিয়োগের বিধান দিয়াছেন, কিন্তু পরাশর মনুর বিধানকে স্পষ্টতঃ নিষেধ করেন নাই। কাজেই উভয়ের মধ্যে যে কোন বিধান মানিলেও শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য হয় না। আর নিয়োগ বিধি যখন কলিতে নিষিদ্ধ তখন আর সে বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজনই বা কি ?*

(৫) শাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে গালা দিলে শূদ্রের পক্ষে যে কঠোর শাসন বিহিত হইয়াছে, তাহাতে কাহারও ভীত হইবার কারণ দেখিনা। কেননা পূর্ব্বের সে ব্রাহ্মণও নাই আর সে শূদ্রও নাই। এখন ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রায় সমান হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এবিষয়ে পূর্ব্বের সেই কঠোর ব্যবস্থা

* এই নিষেধ সম্বন্ধে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তদীয় "উদ্বাহতত্ত্বে" বৃহন্নারদীয় আদিত্য পুরাণ হইতে নিম্নলিখিত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

"কলৌত্বসবর্ণয়া অবিবাহত্বমাহ বৃহন্নারদীয়ং "সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্। দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসুপযমস্তথা॥ দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ। দেবরেণ সুতোৎপত্তির্ম্মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ॥ মাংসদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা। * * * ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ॥' হেমাদ্রি পরাশরভাষ্যয়োরাদিত্যপুরাণম্। 'দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ। দেবরেণ সুতোৎপত্তির্দত্তকন্যা প্রদীয়তে। কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ'। * * * এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ। নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ। সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ॥" যাজ্ঞবল্ক্যটীকায়াং বৃহস্পতিঃ কলাবিত্যধিকৃত্য 'অনেকধাকৃতাঃ পুত্রাঋষিভি র্যৈঃ পুরাতনৈঃ। ন শক্যাস্তেঽধুনা কর্ত্তুং শক্তিহীনৈরিদন্তনৈঃ॥"

চালান শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত হইতে পারে না, ইহা সহজেই বুঝা যায়। শাস্ত্রের অভিপ্রায় বুঝিয়াই কার্য্য করা কর্ত্তব্য কেবল অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করিলে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। এখনও "যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে" এই কথাটি স্মরণ রাখিতে হইবে। ভগবান্ যে মনুষ্যের বুদ্ধি দিয়াছেন তাহা অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করিবার জন্য নহে—প্রয়োগ করিবারই জন্য। কিন্তু পাছে বুদ্ধি বিপরীত দিকে ধাবিত হইয়া সমূহ অকল্যানের কারণ হয়, তজ্জন্যই অর্থাৎ দিগ্ নির্ণয় করিবার জন্যই ভগবান্ অশেষ কৃপা পূর্ব্বক শাস্ত্ররূপ অবলম্বন দিয়াছেন। প্রমাণ চতুর্ব্বিধ, যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, যুক্তি ও আপ্তবাক্য। সত্য নির্ণয়ে ইহাদের কোনটিই ত্যজ্য নহে—পরন্তু সকলগুলিই গ্রাহ্য। তবে আপ্ত বা শাস্ত্রবাক্য অভ্রান্ত বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ রূপে বিবেচ্য। অতএব শাস্ত্রের মূল নীতি জানিয়া তদনুসারেই অবস্থাসঙ্গত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। আর অবস্থানুসারে শাস্ত্রবিধি পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়া শাস্ত্রকারগণেরই অভিপ্রেত; যেহেতু তাঁহারাও ঐরূপ করিয়া গিয়াছেন, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই জন্যই শাস্ত্র বদলাইতে বদলাইতে চলিয়াছে। কিন্তু শাস্ত্র বাক্য সহসা বা বিশেষ কারণ ব্যতীত অমান্য বা অগ্রাহ্য করিবার অধিকার কাহারও নাই। আর শাস্ত্রই বলিতেছেন—"সমর্থো- ধর্ম্মমাচরেৎ"। সুতরাং শাস্ত্রবাক্য যে সকল স্থলে নিখুঁত ভাবে পালনীয় এবং অন্যথায় সমস্ত পণ্ড হয় এমন নয়—অসমর্থপক্ষে যথাসাধ্য পালন করিলেও ধর্ম্ম লাভ হয়। বাস্তবিক সাধ্যের অতীত কিছু করিতে বলা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে, সেজন্য শাস্ত্রবিধান অবস্থাসঙ্গতভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া লইলে শাস্ত্রানুসারে কোন দোষই হয় না, বরং তাহা করাই কর্ত্তব্য। অবস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। যাহা হউক শাস্ত্রকারগণ যে কারণে যে বিধি দিয়াছিলেন, সে সকল কারণের অনেকগুলিই এক্ষণে বিদ্যমান নাই। এজন্য এক্ষণে শাস্ত্রের সকল বিধিই অবশ্য পালনীয় নহে। অতএব দত্ত মহাশয় শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধীয় কঠোর বিধিসমূহ রাজবৈদ্য মহাশয়কে মানিয়া চলিতে হইবে বলিয়া যে আশঙ্কা করিয়াছেন, তাঁহার সে আশঙ্কা নিরর্থক হইয়াছে।

(৬) সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে যে পুরাণ ও স্মৃতিগুলির মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে, তাহাতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিগণ স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথাক্রমে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক পুরাণ স্মৃতি অবলম্বন করিবেন, এই অভিপ্রায়ই স্পষ্টতঃ ব্যক্ত হইয়াছে। যেমন উদ্দেশ্য তেমনই ব্যবস্থা, তবে আর বিরোধ কিরূপে হইল? এবং তাহাতে দোষই বা কোথায়? সকল বিধি যে সকলের পক্ষেই অবলম্বনীয় তাহা কে বলিল? আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে জ্বর, অজীর্ণ, বাত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রোগের ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ পথ্য ও নিয়মের ব্যবস্থা হইয়াছে; তাহা বলিয়া কি ঐ শাস্ত্রকে পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যসমূহ পরিপূর্ণ বলিতে হইবে? তন্ত্রোক্ত পঞ্চ মকার সম্বন্ধেও সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে পঞ্চ মকারের যে আধ্যাত্মিক অর্থ লিখিত আছে, তাহাই প্রধানতঃ সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণের অবলম্বনীয়, আর স্থূল পঞ্চ মকার প্রধানতঃ রাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিগণের জন্যই বিহিত হইয়াছে। সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ মকার সম্বন্ধে দুই প্রকার অর্থ নির্দ্দেশ করাতে, স্থূল সূক্ষ্মভেদে বিভিন্ন সাধনা বিহিত হইলেও বিরোধ জন্মে নাই।

(৭) ব্যাসসংহিতা প্রভৃতিতে কায়স্থকে অন্ত্যজ এবং নিষ্ঠুর অত্যাচারী বলা হইয়াছে।

কিন্তু বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে সে কায়স্থ নহেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। বঙ্গীয় সমাজে কায়স্থগণ এতাবৎকাল শূদ্ররূপে পরিচিত হইয়া আসিলেও তাঁহারা সৎশূদ্ররূপেই পরিচিত এবং অন্যান্য শূদ্রগণ হইতে উচ্চ সম্মান প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা অন্ত্যজ হইলে এরূপ হইতে পারিত কি? কখনই নহে। ব্যাসপ্রোক্ত কায়স্থ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বা অন্যত্র থাকিতে পারে অথবা বিলুপ্তও হইতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু উপরোক্ত কারণে বঙ্গীয় কায়স্থগণ কখনই সে কায়স্থ হইতে পারেন। আর ইহারা যে ব্রাহ্মণে আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়রূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন তাহার বিশেষ প্রমাণ ইঁহারা অবশ্য পাইয়া থাকিবেন। তাহা হইলে শাস্ত্রে উপরোক্ত কায়স্থের বর্ণনা দেখিয়া ইঁহাদের কুণ্ঠিত হইবার ও শাস্ত্র বচনকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন নাই। বরং সেরূপ করিলে তাঁহারা যে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট সাধারণের চক্ষে ইহাই প্রতীত হইবে। আর প্রক্ষিপ্ত হইলেও, ইহাদিগকে যখন কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত করা অসম্ভব, তখন ঐ সকল বচনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখাই তাঁহাদের উচিত। এইরূপ বৈদ্যোৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে যেরূপ লিখিত আছে, ইদানীন্তন বৈদ্যেরা যে সেই বৈদ্য নহেন, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। ঋগবেদ, আয়ুর্ব্বেদ এবং 'রাজ নির্ঘণ্টু' নামক বৈদিক অভিধান প্রভৃতিতে বৈদ্যের স্বরূপ স্পষ্টতঃ ব্যক্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান কালে তাঁহাদের আচার ব্যবহারও সেই স্বরূপের স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করে; অতএব ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের বৈদ্যের সহিত যখন এই বৈদ্যের কোন সম্বন্ধই নাই, তখন এই পুরাণের বৈদ্যোৎপত্তির বর্ণনা দেখিয়া বৈদ্যদিগেরও উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা অনাবশ্যক বলিয়াই মনে হয়।

(৮) পদ্মপুরাণের মতে পদ্ম পুরাণই সর্ব্বপ্রথম প্রণীত হইয়াছিল এবং বিষ্ণু পুরাণের মতে ব্রহ্মপুরাণই সর্ব্বাপেক্ষা আগের। এই মতবিরোধও প্রকৃতপক্ষে মতবিরোধ নহে। মনে করুন, একটা বাড়ীর পূর্ব্বাংশ ও পশ্চিমাংশ ভিন্নরূপ। সেস্থলে যদি কেহ বাড়ীর পূর্ব্বাংশকে লক্ষ্য করিয়া 'ঐ বাটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট' বলে এবং অন্য একজন পশ্চিমাংশকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ বলে, তাহা হইলে যেমন বিরোধ হয় না—এক কথাই বলা হয়, সেইরূপ পদ্মপুরাণকেই আদি বলা হউক আর ব্রহ্মপুরাণকে আদি বলা হউক, উভয়তঃ আদি বা মূল পুরাণকেই ভিন্ন ভিন্ন নামে লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। সেই আদি পুরাণ একমাত্রই এবং অষ্টাদশ পুরাণ তাহার অষ্টাদশ বিভাগ বা অধ্যায় মাত্র। আর যদি পদ্ম ও ব্রহ্মপুরাণকে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়াই ধরিয়া হয় তাহাতে বিরোধ ঘটিলেও তাহা গণনায় নহে; কেন না কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐরূপ বলা হইয়াছে ইহা নিশ্চয় বুঝিতে হইবে। পুরাণপাঠকর্ত্তার বিশেষ শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্যও পুরাণবিশেষকে আদি বা শ্রেষ্ঠ বলা হয়, তন্মধ্যে কোন অসদভিপ্রায় নাই। সেস্থলে সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে যাওয়াই ভ্রান্তি উৎপাদনের হেতু এবং তাহা শাস্ত্রকারগণেরও অনভিপ্রেত। বাস্তবিক মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সকল বাক্যই প্রযোজ্য এবং সকলই সত্য, সেখানে বিরোধ নাই। একটা গানে আছে—"যত অসম্ভব তোমাতে সম্ভব"। শাস্ত্রে কোথাও বেদকে এবং কোথাও বা পুরাণকে আদি বলা হইয়াছে, সেস্থলেও বেদ ও পুরাণের একত্ব বুঝিয়া লইতে হইবে (ইহার মর্ম্ম নিম্নে ব্যক্ত হইল)। নতুবা কোন একটি বাক্যকে সত্য এবং অপরটিকে মিথ্যা বলিয়া মনে করিলে ভুল বুঝা হইবে। এখানে

একটী গল্প মনে পড়িল। এক সময়ে সাত কাণা হাতী দেখিতে গিয়াছিল। যে ব্যক্তি হাতীর পায়ে হাত দিল সে বলিল 'হাতী থামের মত', যে উদরে হাত দিল সে বলিল 'হাতী জালার মত', যে কাণে হাত দিল সে বলিল 'হাতী কুলার মত' ইত্যাদি। এইরূপে তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। পরে কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি তাহাদের দ্বন্দ্বের এইরূপ মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, হাতী থামের মতও বটে, জালার মতও বটে, আর কুলার মতও বটে। তোমাদের সকলের কথাই ঠিক; কিন্তু হাতী শুধু থামের মত, কি জালার মত কিম্বা কুলার মত নয়—তা' ছাড়া আরও অনেক রকম। এইরূপ আমরা সাত কাণায় শাস্ত্রালোচনা করিতে গিয়া পদে পদে বিরোধ দেখিয়া পরস্পর পরস্পরে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া থাকি। অথচ সেখানে বিরোধ কিছুই নাই—সকল কথাই সত্য এবং হিতকর। সে যাহা হউক, ভগবান্ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে যে প্রণব নাদ উচ্চরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বেদ পুরাণাদি সকল শাস্ত্রই বীজ-ভাবে নিহিত ছিল। এখনকার বেদ পুরাণাদি ঈশ্বরের বাচক সেই সর্ব্বশাস্ত্ররূপী প্রণবেরই বিস্তার ও বিভাগ মাত্র। বেদ পুরাণাদির বিকাশ আগে পরে হইতে পারে, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না—সকলের উৎপত্তি কিন্তু একসঙ্গেই হইয়াছিল। আবার প্রণবের অ, উ, ম রূপ মাত্রা অনুসারে তদুৎপন্ন শাস্ত্রসমূহের সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়াও বিচিত্র নহে।

এইরূপ পুরাণসমূহে যে কোথাও বিষ্ণুকে, কোথাও শিবকে এবং কোথাও বা শক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, সেস্থলে বিষ্ণু শিব বা শক্তি বলিতে ঐ সকল মূর্ত্তির মূর্ত্তিমান্ সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ নির্গুণ পরমাত্মাই লক্ষিত হইয়াছেন—বিষ্ণু, শিব বা শক্তিরূপ সগুণ মূর্ত্তি লক্ষিত হয় নাই। পরমাত্মাই সকলের একমাত্র উপাস্য বস্তু—শিব, বিষ্ণু, শক্তি উপাস্য নহেন। শিব, বিষ্ণু, শক্তি এ সমস্ত পরমাত্মারই বিশেষ বিশেষ উপাধি, ভাব বা মূর্ত্তি মাত্র। এই সকল মূর্ত্তি অবলম্বনে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বরূপ পরমাত্মাকেই উপাসনা করিতে হয়। পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বোধে এই সকল মূর্ত্তির উপাসনা করিলে দেবতা উপাসনা করা হয়, ভগবানের উপাসনা হয় না; কাজেই তদ্দ্বারা নরকনিবারণ হয় না। কিন্তু দেশকালাতীত সীমারহিত পরমাত্মাকে সীমাবিশিষ্ট না করিলে উপাসনা হইতে পারে না। তজ্জন্যই নির্গুণ পরমাত্মাকে গুণযুক্ত করিয়া অর্থাৎ তাঁহার সগুণভাব অবলম্বনে এবং প্রকৃতিভেদে ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বা মূর্ত্তিতে উপাসনা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা নির্গুণ পরমাত্মাকে বিস্মৃত—সুতরাং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সগুণ ভাবেই আবদ্ধ হন তাঁহাদের জ্ঞান লাভ হয় না। সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাকেই সেই সকল ভাবের ভাবী বা সেই সকল মূর্ত্তির মূর্ত্তিমান বলিয়া উপলব্ধি করিলে তবেই প্রকৃত জ্ঞান জন্মিয়া পরিশেষে মুক্তিলাভ হয়। এই হেতু যিনি শিবের শিবভাবের উপাসক তাঁহার পক্ষে শিবকে সকল মূর্ত্তির মূর্ত্তিমান্ স্বয়ং পরমাত্মা বলিয়া—সুতরাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে জ্ঞান করা এবং শক্তি ও বিষ্ণুমূর্ত্তিকে সেই শিবরূপী পরমাত্মার শক্তি-মূর্ত্তি—সুতরাং তাঁহার অধীন বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়াই জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। এই শিবকে 'পরম শিব' বলিয়া এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের অন্যতম শিবকে এই শিবের শক্তিমূর্ত্তি বলিয়া ধারণা করিতে হয়। যাঁহারা শক্তির উপাসক তাঁহাদিগের শক্তিকেই শক্তিমান্ পরমাত্মারূপে ধারণা করিয়া বিষ্ণু ও শিবকে তাঁহার মূর্ত্তিবিশেষ—সুতরাং নিকৃষ্ট বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে। শক্তি যে

শক্তিমাত্র নহেন—শক্তিমান্ পরমাত্মা স্বয়ংই শক্তিনামে অভিহিত, তাহা গীতার "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ" এই ভগবদ্বাক্যেই স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। আর চণ্ডীতেও চণ্ডী যে স্বয়ং পরমাত্মাই, তদ্ভিন্ন অপর কেহ নহেন, তাহা দেবীসূক্তে বিশেষ ভাবেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিষ্ণু সম্বন্ধেও এইরূপই জানিতে হইবে। উপাসকদিগের শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা উৎপাদনের জন্যই উপাস্য বিষয়ে ঐরূপ শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট জ্ঞান শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। বাস্তবিক যখন একমাত্র পরমাত্মা ভিন্ন উপাস্য আর কেহই নাই, তখন উপাস্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব থাকিতেই পারে না। কেবল উপাসকদিগের কার্য্যের বা হিতের জন্যই পরমাত্মার মূর্ত্তিসমূহ পরিকল্পিত [এবং তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব আরোপিত] হইয়াছে এই মাত্র। যথা—

"উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"
"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

এক্ষণে পুরাণ মহাভারতাদি গ্রন্থে মুনি ঋষিদিগের চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল দোষ দৃষ্ট হয় সেগুলি কিভাবে দেখা আবশ্যক, এই প্রসঙ্গে তদ্বিষয়েও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ঐসকল গ্রন্থে দুর্ব্বাসার ক্রোধ, বশিষ্ঠের লোভ, নারদের বিবাদপ্রিয়তা ও ভৃগুর অহঙ্কারের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা উন্নত লোক দূরের কথা, সাধারণের মধ্যেও বড় একটা দেখা যায় না। এই সকল চরিত্র শিক্ষা দেওয়াই কি ধর্ম্ম গ্রন্থের বিষয় হইতে পারে? কখনই নহে। ভগবানের পরিচয় দেওয়া বা ভগবদ্ গুণকীর্ত্তনই এই সকল শাস্ত্র গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য্য। প্রথমতঃ, মনুষ্য তপস্যা সংযমাদি দ্বারা যতই উন্নতি বা জ্ঞান লাভ করুক না কেন, সে জ্ঞান কখনই তাহার নিজস্ব হয় না, বিশিষ্ট জ্ঞানী পুরুষও মুহূর্ত্ত মধ্যে অজ্ঞানী হইয়া পড়েন, এবং ইন্দ্রিয় ও রিপু দমন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, কেন না মনুষ্য মাত্রেই ভগবন্মায়ার নিত্য অধীন—ইহা মহা জ্ঞানী পুরুষদিগের চিত্তচাঞ্চল্য এবং পাশবিক আচরণ দেখাইয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ধর্ম্ম অর্থ যশ চরিত্র এ সকলের যে যাহা কিছু পায় তাহা ভগবানের ইচ্ছাতেই লাভ হইয়া থাকে, তাহার দ্বিতীয় কারণ নাই (সেস্থলে চেষ্টা কেবল উপলক্ষ্য বা প্রণালীমাত্র), তিনি যতক্ষণ রক্ষা করেন ততক্ষণ তাহা থাকে এবং যে মুহূর্ত্তে তিনি রক্ষা না করিবেন সেই মুহূর্ত্তেই উহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং মনুষ্যের কোন বিষয় এবং কোন অবস্থাতেই অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই এবং আমাদের প্রার্থনীয় বস্তু লাভ করিতে হইলে ভগবদাশ্রয় গ্রহণ করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ইহা দেখান হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞানী বা ভক্ত হৃদয়ই ভগবানের লীলার অবলম্বন। যেহেতু তাঁহারা ভগবানের জন্য মান,অপমান স্বার্থ ও সর্ব্বপ্রকার কামনা বাসনা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। তাঁহারা সমদর্শী এবং তাঁহাদের ভাল মন্দ বোধ কিছুই নাই। ভগবৎপ্রেরণাই তাঁহাদের সকল কার্য্যের মূল; কাজেই তাঁহারা ভাল মন্দ যাহা কিছু আচরণ করেন, সে সমস্ত ভগবানেরই—তাঁহাদের নহে এইরূপই বুঝিতে হইবে। তাঁহারা নিন্দিত আচরণ করিলেও ভগবানের ইচ্ছা জানিয়াই তাহা করিয়া থাকেন—ইন্দ্রিয়াদির বশে করেন না, যেহেতু তাঁহারা ভগবান্‌কে আশ্রয় করায় ইন্দ্রিয়াদিকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবানের ইচ্ছা জানিয়াই অজ্ঞানের বশীভূত হন, সুতরাং সে অবস্থাতেও তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভগবানেরই বশীভূত থাকেন, অজ্ঞানের বশীভূত হন না। যদি তাঁহারা

আমাদের মতই অজ্ঞানের বশীভূত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই মুনিঋষি পদবাচ্য হইতেন না এবং তাহা হইলে আর আমাদের সহিত তাঁহাদের প্রভেদ কি থাকিত? ভৃগু যে ভগবানের বক্ষে পদাঘাত করিলেন ও ভগবান্ তাঁহার পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিলেন, তাহাতে ভগবানের অশেষ মহাত্মা এবং ভৃগুর অশেষ ধৃষ্টতা বা নিদারুণ অহঙ্কারই খ্যাপন করিতেছে। ভগবান আদি গুরুগণেরও গুরু অর্থাৎ তিনিই যথার্থ গুরু এবং অন্যান্য গুরু তাঁহার প্রতিনিধি মাত্র। যাঁহার গুরুর প্রতি কিছু মাত্র শ্রদ্ধা আছে, তিনিই গুরুর বক্ষে পদাঘাত কখন কল্পনাও করিতে পারেন না। অতএব ইহা যে নিতান্ত পাশবিক আচরণ তাহাও কি আর বলিতে হইবে? কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা হইল তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য প্রচার করিবেন, যেহেতু ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আশ্রয়। সেজন্য তাঁহার ভক্ত ভৃগুকে অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা করিলেন। অজ্ঞানী দ্বারা কখনই ঐকার্য্য হইতে পারে না। ইহাতে ভৃগুর কোন অপরাধ হয় নাই, বরং ভগবানের কার্য্যে যোগদান না করিলেই তাঁহাকে অপরাধ ভাজন হইতে হইত। আর যদি তিনি স্ব ইচ্ছায় ভগবান্‌কে পরীক্ষা করিবার জন্য ঐকার্য্য করিতেন, তাহা হইলে যে তাঁহার অপরাধের সীমা পরিসীমা থাকিত না তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন দুর্ব্বাসা প্রভৃত ঋষিগণ অনেক সময়ে পাশবিক আচারণ করিলেও তাহা পরিণামে মঙ্গলই প্রসব করিয়াছে, ইহা একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। তৃতীয়তঃ মুনি ঋষিরা তপস্যাদি সাধন দ্বারা বিশেষ বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিলেও, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই। তাই ভগবান কহিয়াছেন—"যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।" নিজ চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া মুনি ঋষি হওয়াও সম্ভবপর কিন্তু তদ্দ্বারা ভগবানকে স্বরূপতঃ জানা বা পাওয়া যায় না। ইহা একমাত্র ভগবানের সুমহৎ কৃপাসাপেক্ষ। এই কৃপা লাভ করিতে হইলে নিজ চেষ্টার উপর নিভরতা অর্থাৎ অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া দীনভাবে কেবল ভগবানের মুখ চাহিয়া বা তাঁহার কৃপার উপরই সম্যক্ নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে হয়। এরূপ করিলে যথাকালে তাঁহার কৃপা লাভ হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন নিজের কঠোর প্রযত্ন দ্বারাও যে নিত্য পরমার্থ জ্ঞান লাভ বা মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না—ইহা শিক্ষা দেওয়াও অন্যতম উদ্দেশ্য।

এইরূপ রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার গণের চরিত্রেও বহু দোষ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইঁহাদের চরিত্র বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে; ইঁহারা যে ভগবানেরই অবতার বা স্বয়ং পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ নহেন এবং ইঁহাদের জন্ম ও কর্ম্ম সমস্তই অলৌকিক, ইহা আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা লৌকিক দৃষ্টিতে সে সকলের বিচার করিতে গেলে আমাদিগকে পদে পদেই ভ্রান্ত হইতে হইবে। ভগবানের বিশেষ বিশেষ অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করিবার বিশেষ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু ভগবান যে একজন নিশ্চয় আছেন, তিনি সর্ব্ব জীবের নিত্য সুহৃৎ অর্থাৎ তাহাদের রক্ষা ও কল্যাণ সাধনে সর্ব্বদা তৎপর এবং শরণাগত ব্যক্তিকে অদ্ভুত উপায়ে বিপদ হইতে ত্রাণ করেন—এইরূপে আত্ম পরিচয় দেওরাই তাঁহার অবতার গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহার জন্ম স্বেচ্ছাধীন জীবের ন্যায় প্রারব্ধ ভোগ করিবার জন্য নহে। তিনি অবতার রূপে দেহধারণ করিলেও, স্বার্থ বর্জ্জিত ও লোক হিতব্রত; এজন্য তাঁহার আচরণ, আপাত দৃষ্টিতে, দোষযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, কখনই প্রকৃত দোষযুক্ত হইতে পারে না। পরন্তু প্রকৃত শিক্ষাপ্রদ এবং

কল্যাণ সাধনই তাহার যথার্থ উদ্দেশ্য। তিনি ঘোরতর আসক্তির পরিচয় দিলেও আসক্তি বর্জ্জিত, তিনি পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা অস্পৃষ্ট ও নিত্য কলঙ্করহিত, তিনি প্রভূ এবং তাঁহার ইচ্ছায় ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে ও অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে পরিণত হয় (সুতরাং তিনি অধর্ম্মাচরণ করিলেও তাহা ধর্ম্মের ন্যায় কল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে) এইরূপ ভগবত্তার পরিচয় তিনি অবতাররূপে পদে পদেই প্রদান করিয়া থাকেন এবং ইহাই তাঁহার সর্ব্ববিধ আচরণের মুখ্য তাৎপর্য্য। এ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অবতার চরিত্র আলোচনা করিলে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি জন্মে। কিন্তু তাঁহার অলৌলিক জন্ম ও কর্ম্মরূপ মহিমা শ্রদ্ধাহীন বা অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের বোধগম্য নহে। শ্রীভগবানের লীলাকথাশ্রবণে তাঁহার সুমহৎ কৃপা এবং সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবের পরিচয় শ্রদ্ধাবান ও নির্ভরশীল সাধুগণই কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর যিনি তত্ত্বতঃ বা স্বরূপতঃ ঐ মহিমা অবগত হইতে পারেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না এবং তিনি ভগবানকেই প্রাপ্ত হন, ইহা স্বয়ং ভগবানই কহিয়াছেন। যথা—

'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥" (৪।৯)

এইরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে ভগবান্‌কে জানাই যে পুরাণেতিহাসের প্রধান তাৎপর্য্য এবং মনুষ্য প্রকৃতি শিক্ষা দেওয়া তাহার গৌণ উদ্দেশ্য, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আরও, শাস্ত্রোক্ত উপাখ্যান সমূহকেও গেঁজেলি গল্প বলিয়া মনে না করিয়া, তন্মধ্যেও কি নীতি এবং উপদেশ আছে এবং সেই গল্পের উদ্দেশ্যই বা কি, তাহারই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। নতুবা কেবল লৌকিক দৃষ্টিতে ঐ সকলের অর্থ গ্রহণ করিলে জ্ঞান লাভের পরিবর্ত্তে অজ্ঞান লাভ হয় এবং বিপরীত বুঝিলে অনর্থ জন্মিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান্ উদ্ধবকে কহিয়াছেন—

"কিং বর্ণিতেন বহুনা লক্ষণং গুণদোষয়োঃ।
গুণদোষদৃশির্দোষো গুণস্তুভয়বর্জ্জিতঃ ॥"

'গুণদোষের লক্ষণ আর বেশী বলিবার প্রয়োজন কি? এ বিষয়ে সার কথা এই যে, গুণদোষ দেখাই দোষ এবং গুণদোষ না দেখাই গুণ।' গুণদোষ দেখাই লৌকিক দৃষ্টি; ইহাই সংসারের মূল অর্থাৎ ইহার ফলে সংসার লাভ হয় এবং গুণদোষ না দেখিয়া সর্ব্বত্র গুণ দেখাই অলৌকিক দৃষ্টি (ইহারই নাম শ্রদ্ধা); এই সমদর্শনের ফলে গুণদোষ অতিক্রম করিয়া গুণাতীত অবস্থা বা মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। অতএব ব্যবহার অনুরোধে লৌকিক দৃষ্টি অবলম্বন অবশ্য প্রয়োজনীয় হইলেও, জ্ঞান লাভের জন্য অন্তরে অলৌকিক দৃষ্টিই অবলম্বনীয়। এই অলৌকিক দৃষ্টি অভ্যাসের জন্যই পুরাণেতিহাস পাঠের প্রয়োজন এবং তৎকারণেই লৌকিক দৃষ্টি অবলম্বনে শাস্ত্র পাঠ করা নিষিদ্ধ। এই সকল গ্রন্থে চিত্রিত চরিত্র ও বর্ণিত ঘটনা সমূহে গুণদোষ দেখার পরিবর্ত্তে কেবল গুণ দেখা অর্থাৎ সে সকলে অনন্ত ভাবময় ভগবানেরই বিচিত্র বিকাশ, মহিমা বা লীলা বোধ করিয়া তাঁহাতে মুগ্ধ হওয়া এবং অসম্ভব উক্তি বা ঘটনাসমূহকেও ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করা—ফল কথা, শাস্ত্র আশ্রয় পূর্ব্বক লৌকিক বুদ্ধির উপর নির্ভরতা ত্যাগ করাই অলৌকিক দৃষ্টি লাভের উপায় বা সাধনা। এরূপ সাধন দ্বারা অলৌকিক দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ সংসার ক্ষেত্রেও

উহাকে ব্যবহার করিতে পারিলে, তবেই লৌকিক দৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া যথার্থ জ্ঞানলাভ বা মোক্ষলাভের যোগ্য হওয়া যায়। বাস্তবিক যাঁহারা অনুরাগযুক্ত হইয়া একান্ত শ্রদ্ধাসহকারে অর্থাৎ ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহারাই শাস্ত্রকৃপায় (যেহেতু শাস্ত্র ভগবানেরই মূর্ত্তি) শাস্ত্র হইতে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিবেন। কিন্তু যাহারা অহঙ্কার বশতঃ শাস্ত্রকে বিচারের চক্ষে দেখিবেন, তাঁহারা শাস্ত্রালোচনায় সম্পূর্ণই অনধিকারী।

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ভিন্ন কেবল বুদ্ধি সাহায্যে শাস্ত্র বুঝিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তদ্দ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া দূরের কথা, বিপরীত জ্ঞান অর্জ্জন করিবারই বিশেষ সম্ভাবনা। শ্রদ্ধা অভাবে বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতেরা মূল তত্ত্বের সন্ধান না পাইয়া নাস্তিক হইয়া গিয়াছেন, এ দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নহে। দেখা যায় স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা, বন্দন, দান, ধ্যান প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় অনুষ্ঠানই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধামূলক। এমন কি, শাস্ত্রোক্ত সামাজিক বিধানসমূহ যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, তাহা বুঝিতে হইলেও শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের প্রয়োজন ; কেননা যুক্তি ঐ বিধানসমূহের গুণ ও দোষ উভয় দিকই লক্ষ্য করাইয়া দেয় বলিয়া তাহাতে সংশয় অবশ্যম্ভাবী। আরও, শাস্ত্র বা আপ্তবাক্য অবলম্বন ব্যতীত যুক্তি পঙ্গুর ন্যায় স্বয়ং কোন সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অসমর্থ এবং শাস্ত্র অবলম্বনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ভিন্ন অন্য গতি নাই। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।"

'গুরু ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান্, শাস্ত্রানুশীলন পরায়ণ এবং সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন' অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া শাস্ত্রানুশীলনকরিলে যথার্থ জ্ঞানলাভ করেন। কিন্তু অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রানুশীলন করিলে কোন ফল হয় না, যথা—

"অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥" (১৭।২৮)

পরন্তু শ্রদ্ধাহীন এবং সংশয়াত্ম ব্যক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, ইহাও ভগবান্ কহিয়াছেন ; যথা—

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥" (৪।৪০)

এই ভগবদ্ বাক্যানুসারে শাস্ত্রবাক্যে সংশয় যে সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জনীয় এবং তৎপ্রতি অবিচারিত বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না।

(ক্রমশঃ)

———

ভ্রান্তি-বিনোদন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাজবৈদ্য—শ্রীযুক্ত শক্তিচরণ রায় বিশারদ

৭। অহল্যা পাষাণী হইয়াছিলেন। কুবেরের পুত্র মণিগ্রীব ও নলকুবের জমলার্জ্জুন অর্থাৎ জোড়া অর্জ্জুন বৃক্ষ হইয়াছিলেন, সেইরূপ নহুষ রাজা সর্প, নৃগরাজ কৃকলাস, ইন্দ্রদ্যুম্ন গজেন্দ্র, হুহু-গন্ধর্ব্ব কুমীর হইয়াছিলেন। মনুষ্য পশু পক্ষী কীট ও জড় বস্তুর কোনই প্রভেদ নাই। সমস্তই এক পরমাত্মার মূর্ত্তি মাত্র।

৮। ডাক্তারী মতে রোগের বীজানু উদ্ভিদ পদার্থ (vegetable)। কিন্তু উহাদের মধ্যে অনেক গুলিই প্রাণীর ন্যায় আপনা হইতে নড়ে চড়ে। অর্থাৎ এই খানে উদ্ভিদই প্রাণীর ন্যায় আচরণ করে। অতএব উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভেদ নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে পশু ও বৃক্ষের ভেদ নাই। আবার মায়ার নিমিত্ত উহাদের ভেদ আছে। অর্থাৎ পশু ও বৃক্ষের মোটামুটি ভেদ আছে, প্রকৃত ভেদ নাই।

৯। জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা মানুষের এই প্রারব্ধ কর্ম্ম জানা যায়। যখন মনুষ্য জীবনের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্তই প্রারব্ধের উপর নির্ভর করে তখন এই প্রারব্ধ জানিবার যে উপায় থাকিবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই প্রারব্ধ গ্রহগণের দ্বারা সূচিত হয় অর্থাৎ জন্মসময়ে রবি চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু কেতু কোথায় আছেন তাহা হইতে মানুষের জীবনে যাহা যাহা হইবার জানা যায়। ইহাকে গ্রহগণের ফল বলে। এই সব গণনা অত্যন্ত কঠিন। এখন আর প্রায় কেহ সমস্ত ঠিক ঠিক গণিতে পারে না। তবে গণিয়া অনেকে অনেক কথা বলিতে পারে। যিনি যত আচারবান্, ভক্তিনিষ্ঠ ও নিষ্পাপ তিনি ততই ঠিক ঠিক গণিতে পারেন।

১০। গ্রহগণের ফল অর্থাৎ প্রারব্ধ কাটাইবার জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রেই নানা প্রতীকারের ব্যবস্থা আছে। ইহাদের গ্রহশান্তি বলে। গ্রহশান্তির সকল উপায়ের মধ্যে শ্রীভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস ও তাঁহার অনুকূল আচরণই শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্র বলেন যে মনুষ্য নিজের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য সদাই ব্যস্ত, যে আচারবান্‌ও হটিয়াও হটে না তাহার প্রারব্ধ কাটিয়া যায়। তাহার মন্দভাগ্য দূর হইয়া সৌভাগ্যের উদয় হয় (৬৪)। জ্যোতিষ শাস্ত্রেই আছে—এই জ্যোতিষ শাস্ত্রে গ্রহগণের নানা প্রকার মন্দ ফলের কথা বলা হইল তথাপি মুনিগণ নানা প্রতীকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, দেবতা

(৬৪) প্রতিকূলং তথা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে। মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যং উত্থানশীলানাম্‌।
মৎস্য।

ও ব্রাহ্মণের পূজা, গুরুবাক্য সমস্তক্ষণ কায় মনোবাক্যে পালন, সৎসঙ্গ, যজ্ঞ ও দানের দ্বারা গ্রহগণের দুষ্ট ফল কাটিয়া যায় (৬৫)।

১১। সংক্ষেপে জগতে কোন বস্তুর নাশ নাই। কাযেই কর্ম্মফলের নাশ নাই। দেখিতে পাওয়া যায় অধিকাংশ কর্ম্মেরই ফল সেই জীবনে মিলে না অতএব সেই কর্ম্মের ফল ভুগিবার জন্য জন্মান্তর অবশ্যই থাকিবে ও যাহাতে সেই কর্ম্মভোগ হয় সেইরূপ জন্মই হইবে। যে কর্ম্মবশে মানুষের জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ হয় সেই কর্ম্ম জানিবার উপায় থাকিবে না ইহা সম্ভব নহে। কাজেই জ্যোতিষ শাস্ত্র আছে। আরও বিশেষ বিশেষ চেষ্টার দ্বারা যখন কর্ম্মফল কাটান যায় তখন মানুষকে তাহার কর্ম্মফল জানাইয়া দেওয়ার বিশেষ দরকার। অতএব জ্যোতিষ শাস্ত্র যে আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। জ্যোতিষ গণনা বড়ই কঠিন।

১২। বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা জ্যোতিষ গণনা ঠিক হয় না। কাযেই আজকাল জ্যোতিষ গণনায় অনেক ভুল হয়। তথাপি এখনও জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা এত কথাই বলা যায় যে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা দোষগুণ বিপদ আপদ সহায় সম্পদ জানাইয়া দিয়া মানুষকে প্রকৃত কল্যাণের পথে প্রবৃত্তি দেয়, ইহাই জ্যোতিষের সার্থকতা। শাস্ত্রে বিশ্বাস আচার ও ভক্তির দ্বারা প্রারব্ধ কাটিয়া যায়, এই কথা মনে রাখিয়া মানুষের সর্ব্বদাই এগুলির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত।

১৩। জ্যোতিষ শাস্ত্রের এতগুণ আছে বলিয়াই উচ্ছৃঙ্খল কলির জীবের জ্যোতিষের প্রতি এত বিদ্বেষ। জ্যোতিষ মানিতে গেলেই কর্ম্মফল জন্মজন্মান্তর পরকাল আসিয়া পড়ে। কাযেই মজা করিয়া পাপ কর ও তার পর কলা দেখাইয়া পালাও সেই সাধের কথায় বাদ পড়ে। ইহাই জ্যোতিষের ও শাস্ত্রের বড়ই দোষ। পাপফল ভুগিতে হয় বলিয়া কলির জীবকে ভয় দেখাইয়া তাহার সুখের স্বপন ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করা উহাদের যারপর নাই অন্যায়। উহাদের ঢাক পিটান উচিত ছিল—

খাও দাও আর কাঁসি বাজাও।
ড্যাং ডেঙ্গিয়ে চলে যাও॥
মনের সাধে পাপ কর।
কলা দেখিয়ে সরে পড়॥

উহারা তাহাত করিলই না বরং পাপ হইতে দেশের সর্ব্বনাশ হয় ইহাই বলিতে লাগিল।

১৪। শাস্ত্রের কথায় দেশের সকল অকল্যাণের কারণ অধর্ম্ম বা পাপ ও অধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম পথে চলিলে দেশের সকল রকম কল্যাণ অনায়াসেই হইয়া থাকে। অধর্ম্ম হইতে বায়ু প্রভৃতি বিপরীত হয়। অধর্ম্ম ভিন্ন মানুষের কখনই শোক হইতে পারে না। যখন অধর্ম্ম দেশকে

---

(৬৫) যন্ত্রপাত্র তু নিশ্চয়েন কথিতং নানা বিধং দুষ্ফলম্। খেটানাং চ তথাপ্যশস্তি মুনয়ো নানা প্রতীকারকম্। দেব-ব্রাহ্মণ-পূজনেন গুরুবাক্সম্পাদনেনান্বহম্। সৎসঙ্গেন হুতেন দান বসুনা দুষ্টং ফলং নো ভবেৎ॥

অভিভূত করে অর্থাৎ যখন দেশ অধর্ম্মে ভরিয়া যায় তখনই ঋতু, বৃষ্টি, বায়ু, মাটি ও ঔষধ সবই বিকৃত হয়, অর্থাৎ তখনই গরমকালে বর্ষা, বর্ষায় জল নাই, অসময়ে শীত, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি অসময়ে বৃষ্টি প্রভৃতি হইয়া থাকে (৬৬)। ইউরোপ ও অ্যামেরিকার এখনকার অবস্থাই এই বাক্যের জলন্ত প্রমাণ।

২২। **বুদ্ধিভ্রান্ত ও তাহার উদাহরণ**—১। শাস্ত্র বলেন সংসারী মনুষ্যের বুদ্ধি বিপরীত, বেশ্যার ন্যায় নানারূপ ধরে ও সর্ব্বনাশ করে (৬৭)। রাজসিক পুরুষ কোন জিনিসই ঠিক জানিতে পারে না (৬৮)। বুদ্ধিমান ব্যক্তি শাস্ত্রেই বিশ্বাস করিবে বিচারে নহে (৬৯)। অর্থাৎ ঠিক ভুল ভালমন্দ পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্তই শাস্ত্রের দ্বারা ঠিক করিবে, বিচারের দ্বারা ঠিক করিবে না।

২। বিজ্ঞানের স্বীকার—অহঙ্কারে মত্ত হইয়া দুচারটি ঝুটো আবিষ্কারের মোহে অন্ধ হইয়া বিজ্ঞান এত দিন একথা কানেও ঠাঁই দেয় নাই। কাযেই পদে পদে ভুল করিয়া বিজ্ঞানকে ভ্রান্তিসাগরে ডুবিতে হইয়াছে। বিজ্ঞান যে কি রকম ভ্রান্ত তাহা পূর্ব্বেই স্পষ্ট করিয়া দেখান হইয়াছে (প'৯—১৭ দেখ)। এখানে আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। পদে পদে ঠেকিয়া, হাতে হাতে মত বদলাইয়া, ভুলের ভিতর ডুবিয়া বিজ্ঞানের উপর চৈতন্যের ছায়া পড়িয়াছে। তাই প্ল্যাঙ্ক, এডিংটন, জীন্‌স, রাসেল, টমসন্, হ্যালডেন প্রভৃতিকে মানিতে হইয়াছে মনুষ্য কি ভ্রান্ত, যতই বিচার কর না কেন সন্দেহ থাকিয়াই যায়।

৩। কোষ (Dictionary)—মানুষের বিচার যে কি রকম ভুল তাহা বিজ্ঞান হইতে যেমন স্পষ্টই বুঝায় ইংরাজী কোষ হইতেও তেমনই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। কত লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ মিলিয়া কত বৎসর ধরিয়া কত পরিশ্রম করিয়া এক একখানি কোষ লিখিয়াছেন। তথাপি প্রত্যেক খানিই ভুল পূর্ণ। Oxford Dictionary (অক্‌স্‌ফোর্ড ডিক্‌সনারি) প্রায় ২০০০ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মিলিয়া ৪৫ বৎসরে লিখেন। প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তাহাতেও ভুল। তাহার পরই Century Dictionary (সেঞ্চুরি ডিক্‌সনারি) বড়। সে খানিও

(৬৬) অধর্ম্মমূলং বৈগুণ্যং বায়্বাদীনাং প্রজায়তে। অধর্ম্মাদ্ধি ভবেচ্ছোকো জনানাং নান্যথা ক্বচিৎ। অধর্ম্মাভিভবাদ্দেশে বিকৃতিং যান্তি সর্ব্বথা। ঋতুর্বৃষ্টিস্তথা বায়ুঃ ভূমিরোষধিরেব চ। চরক।

(৬৭) নানারূপাত্মনো বুদ্ধিঃ স্বৈরিণীব গুণান্বিতা। তন্নিষ্ঠামগতস্যেহ কিমসৎকর্ম্মভির্ভবেৎ। ভা° ৩।২।১১।

(৬৮) কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং চ যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্। ভা° ১১।২৫।২৪।

(৬৯) মতিমানব তিষ্ঠেত আগমে ন তু হেতুষু। চরক।

ভুল। Reason Science & Shastras পুস্তকে ৬—১০ পৃষ্ঠায় কতকগুলি মাত্র ভুল দেখান হইয়াছে (a)। ইংরাজী বলিয়া সেগুলি এখানে দেওয়া গেল না।

৪। হোমিওপাথি (Homœopathy)—আয়ুর্ব্বেদ বলেন যে কারণে রোগ হয় সেই কারণে রোগ বাড়ে ও বিপরীত কারণে রোগ সারে। অর্থাৎ সমানে বাড়ে বিপরীতে সারে। (১০) যেমন ঠাণ্ডা লাগিলে গরম করিতে হয়, ঠাণ্ডা করিলে আরও বাড়ে। গরম হইলে ঠাণ্ডা করিতে হয়, গরম করিলে বাড়ে। পেটের অসুখ করিলে বাহ্যে বন্ধ করিবার ঔষধ দিতে হয়, বাহ্য করিবার ঔষধ দিলে বাড়ে। শাস্ত্র বলেন যে কারণে রোগ হয় সেই কারণেই রোগ কমিতে পারে যদি সেই কারণে চিকিৎসিত হয় অর্থাৎ সেই কারণের মোড় ফিরাইয়া দেওয়া যায় বা কিছু বদলাইয়া দেওয়া যায়। অর্থাৎ সমানে না বাড়িয়া কমে যদি সমান চিকিৎসিত হয়। (১১) ডাক্তারী মতে সমানে বাড়ে বিপরীতে কমে। হোমিওপ্যাথি বলে সমানে কমে। (a) হোমিওপ্যাথি মত একেবারেই ভুল। সমানে কমিতেই পারে না। সমান চিকিৎসিত হইলেই কমাইতে পারে। হোমিওপ্যাথি না জানিয়া ঔষধগুলি চিকিৎসিত করিয়াই লয়; তাই উহার ভিতর একটুকু সত্য আছে।

৫। কলিযুগে যে দিকে তাকাও দেখিবে ভুলে ভুলে ছয়লাব। কি কোষ গ্রন্থ, কি হোমিওপ্যাথি, কি ডাক্তারী, কি জীবনবিজ্ঞান, কি রসায়ন, কি পদার্থ বিদ্যা, কি গণিত কেহই আর বাদ যায় নাই। সকলেই ভুলেই ভুল। যাঁহারা মাথার মাথা, যাঁহাদের তুল্য বিদ্বান ও বুদ্ধিমান এখন মিলে না তাঁহাদেরই যখন এই দশা তখন সামান্য মনুষ্যের বুদ্ধি ও বিবেচনার কথা তোলাই পাগলামি। ভ্রান্ত বিচারের উদাহরণ পূর্ব্বে যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে। এখানে আরও কয়েকটা দেওয়া গেল।

৬। পৃথিবীর আয়ু—প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে টম্‌সন্ বলেন পৃথিবী মাত্র ৪০০০ বৎসর পরে নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে। সভ্যজগৎ পরের মুখে ঝাল খাইয়া শাস্ত্র গাঁজাখোরী বলিয়া ঠাট্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার ২০ বৎসরের মধ্যেই রেডিয়ম (Radium) আবিষ্কৃত হইল ও দেখা গেল

(a) To give just a glimpse of the curious mistakes—Lantern is explained to mean a case enclosing a light. It should be a light enclosed in a case. Toil is derived from dispute and strife (Oxford); others derive it from labour or tilling. To display is to betray (Oxford concise). Infliction is troublesome or boring experience (Oxford pocket). A blind alley is walled up at the end (Cassell's New English). To desert has a bad meaning in the active and a good meaning in the passive voice (Webster). Among gems of English are found to be of a glowing white (Webster) and station on a piece of railway.

(১০) সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধি কারকম্। বিপরীতঃ সদা কল্প্যো বিপরীতপ্রশান্তয়ে।

(১১) আময়ো যশ্চ ভুতানাং জায়তে যেন সুব্রত। তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্।

(a) Similia similibus curanter = like cures like.

শাস্ত্রই ঠিক আর বিজ্ঞান পাগল—যা মুখে আসে তাই বকে, পৃথিবী অন্ততঃ আর দেড় লক্ষ কোটী বৎসর থাকিবে। অর্থাৎ টমসনের পাগলামিতে সভ্য জগত পৃথিবীর আয়ু লক্ষ লক্ষ বৎসর স্থানে তিনমাস করিয়াছিলেন।

৭। পুষ্পকরথ—আজ ৪০ বৎসর আগেও পুষ্পকরথ লইয়া কত ঠাট্টাই না শুনা যাইত। ভেড়াবুদ্ধি নাস্তিকগণ বিজ্ঞান-গাঁজায় দম দিয়া ঠিক করিল অকাশ দিয়া উড়িয়া যাওয়া মানুষের পক্ষে কখনই সম্ভব নহে। তাহার ২০ বৎসর যাইতে না যাইতেই এরোপ্লেনে aeroplane) জগৎ ভরিয়া গেল। যতলোক পুষ্পকরথ গেঁজেলি বলিত তাহাদের মধ্যে এক জনও বলিল না "হায় হায় আমাদের কি দুর্ব্বুদ্ধি আমরা মূর্খের ধাড়ি। তবুও শাস্ত্রের উপর টেক্কা মারিতে যাই।"

৮। জটায়ুর রথভাঙ্গা—রামায়ণে আছে রাবণ সীতা হরণ করিয়া আকাশ দিয়া তীরবেগে যাইতেছিল তখন পাখী জটায়ু আসিয়া রাবণকে আক্রমণ করে ও রথ ভাঙ্গিয়া দেয়। পাখীতে রথ ভাঙ্গিয়াছে শুনিয়াই গেঁজেলি নাস্তিকগণ শাস্ত্র গাঁজাখোরি বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। এখন দেখা গিয়াছে সামান্য শকুনি আক্রমণ করিয়া এরোপ্লেন (aeroplane) ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। শকুনি কি করিয়া এরোপ্লেন ভাঙ্গিল সুবুদ্ধি নাস্তিকগণ ঠিক করুন্।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপনির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রণালী—যাহা ভারতের সাধনা'র এক বিশেষ লক্ষ্য—সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচনা-সাপেক্ষ।]

পাঞ্চরাত্র মত ও শঙ্করাচার্য্য
খণ্ডন মণ্ডনের প্রতিবাদের প্রতিবাদ।

[শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্য্যের সময়সংক্রান্ত]

(২)

যাউক ঐ সব কথা। আসল কথা এই যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত হেমাদ্রিতে ভবিষ্যপুরাণের উক্ত বচনটী থাকায় উহাকে যে "প্রক্ষিপ্ত বলিয়া কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন না" এ কথাটী কি করিয়া সঙ্গত হয়? হেমাদ্রি মহাপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া কি উহা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারিবে

না? অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের কথা বলিয়া প্রক্ষিপ্ত হইতে পারিবে না? অথবা উভয়রূপ বলিয়া প্রক্ষিপ্ত হইতে পারিবে না?

এক্ষণে প্রথম কল্পে দেখা যায়—যদি হেমাদ্রি মহাপণ্ডিত বলিয়া উহার প্রক্ষিপ্ততা বারণ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাহাও সম্ভব নহে; কারণ, হেমাদ্রির শতাধিক বৎসরের পূর্ব্বে উহা প্রক্ষিপ্ত হইলে, সম্প্রদায়বিশেষের আচারবিশেষ বলিয়া উহার প্রক্ষিপ্তা-অপ্রক্ষিপ্ততাসম্বন্ধে বিচার করিবার ইচ্ছা হওয়া প্রয়োজনীয় নহে, স্বাভাবিকও নহে। তৎপরে হেমাদ্রি তাঁহার এই গ্রন্থে যাবৎ পুরাণ হইতে নানা ব্রতবিষয়ক নানা বচন গুলি সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। কোথাও কোন বচনের প্রক্ষিপ্ততাদি বিষয় বিচার করিতেছেন না। ইহা যদি আচারবিশেষবিষয়ক না হইয়া তত্ত্ববিষয়ক কথা হইত, এবং যুক্তি অথবা প্রবলতর শাস্ত্রবিরোধী কথা হইত, তবে সে কথা সম্ভাবিত হইত।

এইবার দেখা যাউক দ্বিতীয় কল্পটী কিরূপ? বস্তুতঃ, প্রক্ষিপ্ততা-অপ্রক্ষিপ্ততার বিচার আজকাল যেমন কথায় কথায় উত্থাপিত করা হয়, পূর্ব্বকালে সেরূপ করিবার রীতি ছিল না। পূর্ব্বকালে উহা বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থলে কদাচিৎ করা হইত। যেমন শবরস্বামী ঔডুম্বর বেষ্টনকর্ত্তব্যতা বিচার করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—এক বিঘত বস্ত্র স্থলে যে দশহাত বস্ত্রের ব্যবস্থা, তাহা লোভী ব্রাহ্মণগণের লোভের ফল। এইরূপ কথা কদাচিৎ প্রাচীন কালে দেখা যায় বলিয়া দ্বিতীয় কল্পও স্বীকার্য্য নহে। অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা বলিয়া প্রক্ষিপ্ততার সম্ভাবনা নাই—এই কল্পও স্বীকার্য্য নহে। পূর্ব্ব কালে প্রক্ষিপ্ততা অল্প ছিল মাত্র, ছিল না—এমন নহে। শবরস্বামীর সময় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। অতএব দ্বিতীয় কল্পও সঙ্গত নহে। অর্থাৎ যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা বলিয়া প্রক্ষিপ্ত নয়—ইহা বলা চলে না।

তাহার পর তৃতীয় কল্পও সম্ভব নহে। যেহেতু প্রথম ও দ্বিতীয় কল্পের সম্মিলনেই এই কল্পের সম্ভাবনা। অতএব হেমাদ্রি মহাপণ্ডিত বলিয়া উক্ত ভবিষ্য পুরাণের বাক্য প্রক্ষিপ্ত নয় বলা যায় না, এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উহা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রক্ষিপ্ত নয় বলা যায় না এবং হেমাদ্রির মত পণ্ডিতও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াও প্রক্ষিপ্ত নয়—ইহাও বলা চলে না। বলিলে অনুমান ব্যাভিচার দোষ ঘটিবে। হেমাদ্রি উক্ত ভবিষ্যপুরাণের বচনটী গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, ঐ বচনটী হেমাদ্রির পূর্ব্বের সময়ের বচন, আর কত পূর্ব্বের বচন, তাহার কিন্তু স্থিরতা নাই। আর সেই বচনে নিম্বার্ক ভগবানের কথা থাকায় নিম্বার্ক ভগবান্ হেমাদ্রির পূর্ব্বের লোক; কত পূর্ব্বের লোক, তাহাও বলা যায় না।

পরমপূজনীয় বাবাজী মহারাজের কথা এই পর্য্যন্ত ছিল, আর তাহার বিষয়ে যাহা আমাদের বক্তব্য, তাহার কিছু কিছু বলিলাম। এইবার শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবুর কথা আলোচ্য।

শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবু বলিতেছেন—যে, "ভট্টভাস্কর ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রের একখানি ভাষ্য

প্রণয়ন করিয়াছেন।" আর আমিও আমার "আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ" নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছি যে, ভট্টভাস্কর শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক" তাহার পর "শ্রীশ্রীজয়দেবগোস্বামীপূজিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধামাধবজীউ শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্যগদি সালিমাবাদে এতাবৎ প্রতিষ্ঠিত আছেন।" "সেই গদিতে আচার্য্য ভট্টভাস্করপ্রণীত বেদান্তভাষ্যের প্রাচীন হস্তলিপি বর্ত্তমান আছে, তাহাও আমি (অর্থাৎ শ্রীনৃসিংহবাবু) নিজ চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। উক্ত বেদান্ত ভাষ্যের প্রারম্ভে তিনি শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যকে প্রণামপূর্ব্বক গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন দেখা যায়।" তৎপরে বলিতেছেন— "আকবরের প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর "টাটি" নামক স্থান শ্রীবৃন্দাবনে এযাবৎ বর্ত্তমান আছে।" "সেই স্থানে অন্যান্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের স্থানের মতন পূর্ব্বকাল হইতে গুরুপরম্পরা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, শ্রীজয়দেব গোস্বামীর ৪৯ পুরুষ উর্দ্ধে ও শ্রীহরিদাস স্বামীর ৬৩ পুরুষ উর্দ্ধে শ্রীনিম্বার্ক স্বামী অবস্থিত। এই কথা ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ সন্তদাস স্বামী তাঁহার দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তে লিখিয়াছেন এবং আমিও ঐ গুরুপরম্পরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি।" * * "ইহার দ্বারা কি নিশ্চয়রূপে অবধারণ করা যায় না যে, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে (এবং আচার্য্য শঙ্করেরও আবির্ভাবের পূর্ব্বে) আবির্ভূত ছিলেন? এই গুরুপরম্পরা আদালতেও প্রমাণরূপে গৃহীত হয়।" ইত্যাদি।

এই কথার মধ্যে দুইটী বিষয় ভাবিবার আছে। প্রথম—ভট্টভাস্কর নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত কিনা? অথবা ভট্টভাস্করকৃত সেই নিম্বার্কপ্রণাম কিনা? এবং দ্বিতীয়—গুরুপরম্পরার দ্বারা ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্যের সময় কত খৃষ্টাব্দ হয়?

প্রথম দেখা যায়—ভট্টভাস্কর খুব সম্ভবতঃ নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত নহেন বা তাঁহার কৃত নিম্বার্ক প্রণামও নহে। কারণ, তিনি প্রথমতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যমধ্যে নিজকে উপবর্ষমতাবলম্বী বলিয়াছেন। উপবর্ষ পাণিনির গুরু বর্ষ পণ্ডিতের ভ্রাতা, এবং কথাসরিৎসাগরের মতে তিনি নন্দরাজার সমসাময়িক। কোনও মতে তিনি আরও প্রাচীন। কিন্তু তাহা হইলেও জন্মেজয়ের সমসাময়িক বলিয়া কোন প্রবাদাদি নাই। জন্মেজয়ের বহু পরে পাণিনি ও উপবর্ষ। এখন নিম্বার্কস্বামী যদি জন্মেজয়ের সমসাময়িক হন, এবং সেই নিম্বার্কস্বামীর পর সেই সম্প্রদায়ে যদি উপবর্ষ হন, তাহাহইলে ভট্টভাস্কর, মূলপুরুষ নিম্বার্কস্বামীর নাম না করিয়া উপবর্ষের নাম করিয়া "তাঁহার মতাবলম্বী তিনি" —এরূপ কথা বলেন কেন? এরূপস্থলে কি করিয়া বলা যায়—ভট্টভাস্কর নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত, সুতরাং তিনিই নিম্বার্কস্বামীকে প্রণাম করিয়া ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন?

যদি বলা যায় তিনি নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, কিন্তু তাঁহার ভাষ্যারম্ভে নিম্বার্কপ্রণাম থাকায় নিম্বার্ক ভগবান্ ভট্টভাস্করের পূর্ব্বে, সুতরাং ভাস্করসমসাময়িক শঙ্করাচার্য্যেরও পূর্ব্বে? কিন্তু তাহাও সম্ভব হইবে না। কারণ, নিম্বার্কসম্প্রদায়ের গদিতে রক্ষিত ভাস্করভাষ্যের প্রারম্ভে নিম্বার্কপ্রণাম থাকায় এবং মুদ্রিত ভাস্করভাষ্যে তাহা না থাকায় এইরূপই মনে হইবে যে, নিম্বার্কমতাবলম্বী কোন লিপিকার পণ্ডিত, লিপিকালে নিজসম্প্রদায়গুরুকে প্রণাম করিয়া পুঁথির নকল করিয়াছেন। যেহেতু রামানুজাদি সম্প্রদায়েরও মঠাদিতে শাঙ্কর মতাদির পুঁথিতে এইরূপে রামানুজাদি আচা-

র্য্যের প্রণাম প্রারম্ভেই দেখা গিয়াছে। বস্তুতঃ, ইহা খুব স্বাভাবিকই বটে। শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবু এই নিম্বার্কপ্রণামটী স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু তাহা কি কোন শ্লোকদ্বারা করা হইয়াছে, অথবা কেবল মাত্র "শ্রীশ্রীনিম্বার্কভগবতে নমঃ" এই জাতীয় কোন প্রণামবাক্যমাত্রদ্বারা করা হইয়াছে, তাহা ত তিনি বলিতেছেন না। আমাদের বোধ হইতেছে, কোন শ্লোকদ্বারা করা হয় নাই; কারণ, তাহাহইলে শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবুর মত স্বসম্প্রদায়ানুরাগী ব্যক্তি যে, তাহা নকল না করিয়া গৃহে ফিরিতেন, তাহা যেন সম্ভবপর হয় না। তদ্ব্যতীত শ্রদ্ধাস্পদ মহান্ত মহারাজ যে, তাহা প্রচার করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন তাহাও মনে হয় না। এই হেতু উক্ত নিম্বার্কসম্প্রদায়ের গদিতে রক্ষিত ভাস্করভাষ্যের নিম্বার্কপ্রণামটীর দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, শঙ্করসমসাময়িক ভট্টভাস্করের পূর্ব্বে শ্রীমন্ নিম্বার্ক ভগবান্ আবির্ভূত। যদি পুঁথির নকলের সময় শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইত অথবা উহা ভাস্করের রচিত প্রণামশ্লোক বলিয়া মুদ্রিত পুস্তকেও থাকিত, অথবা যদি উহা নিম্বার্কসম্প্রদায়ের গদির পুঁথি না হইত, তাহা হইলেও কতকটা সম্ভাবনাধিক্য থাকিত। অতএব এই প্রমাণদ্বারা ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্য যে শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা নিশ্চয়রূপে প্রমাণিত হয় না।

তাহার পর ভট্টভাস্করের সময় আমি আমার "আচার্য, শঙ্কর ও রামানুজ" গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের সময় বলিয়া লিখিয়াছি বটে, কিন্তু উহা যে অভ্রান্ত তাহা বলিতে পারি না। সাম্প্রদায়িক কথা শুনিয়া ও সম্ভাবনা মাত্র দেখিয়াই লিখিয়াছি। এ বিষয়ে বিরুদ্ধ কথা বহু আছে। মনে হয়, আরও প্রমাণ প্রকাশ পাইলে তবে কোন অধিকতর সম্ভব সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে। অতএব ভট্টভাস্করের সমকালীন শঙ্করাচার্য্য বলিয়া এবং নিম্বার্কসম্প্রদায়ের গদিতে রক্ষিত ভাস্কর-ভাষ্যে নিম্বার্কপ্রণাম দেখিয়া নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে, নিম্বার্কাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। যেটা নিশ্চয় নয়, তাহাকে নিশ্চয় বলিয়া বলা সঙ্গত নহে। শঙ্করাচার্য্যের সময় আমি নির্ণয় করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাও যে একদিন উল্টাইয়া যাইতে পারে না—এরূপ বলিবার সাহস আমার নাই। ঐতিহাসিক ইহা পারে না।

এইবার দ্বিতীয় কল্পের কথা। শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবু বলিতেছেন—"গুরুপরাম্পরানুসারে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর জয়দেব গোস্বামী মহাশয়ের ৪৯ পুরুষ পূর্ব্বে এবং যোড়শ শতাব্দীর শ্রীহরি দাস স্বামীর ৬৩ পুরুষ পূর্ব্বে নিম্বার্ক ভগবান্ ছিলেন, সুতরাং শ্রীনিম্বার্কস্বামী ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে এবং আচার্য্য শঙ্করেরও আবির্ভাবের পূর্ব্বে অবস্থিত ছিলেন। এই গুরুপরম্পরা আদালতেও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় "ইত্যাদি।

আমরা এ কথাতেও নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না। কারণ, প্রথমতঃ আদালতে প্রমাণিত বহু গুরুপরম্পরা যে ঠিক্ নহে, তাহার বহু প্রমাণ আছে। আদালতে তদ্বিবের উপর অধিক নির্ভর করে। সেখানে জজসাহেবের সম্ভববোধের উপর ডিক্রি ডিসমিস্ হয়, অতএব সত্যানুসন্ধানের কালে তাহা একটা চিন্তনীয় বিষয় মাত্র, কিন্তু প্রমাণ বলা যায় না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবু কি প্রমাণ করিতে চাহেন? ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্য শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবুর গুরু বা গুরুস্থানীয় পরমপূজনীয় মহান্তমহারাজের মতানুসারে জন্মেজয়ের সমসাময়িক ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন? অথবা শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে—এইমাত্র, জন্মেজয়ের সম-

সাময়িক না হইলেও কোন ক্ষতি নাই, ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন ? অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে—কেবল মাত্র ইহাই তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন ? অথবা কেবল আমার ভুল প্রদর্শন করিতে চাহেন ? তবে তাঁহার লেখা হইতে আমার মনে হয়, তিনি আমার ভুল প্রদর্শন করিতে চাহেন—ইহা তিনি বলিলেও শ্রীমন্নিম্বার্কস্বামীর প্রাচীন ঋষিত্ব ও শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব—এই উভয়ই প্রমাণ করাও তাঁহার উদ্দেশ্য !

যাহা হউক, "ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে" ও "শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে" ইহারা এক কথা নহে। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবুর ব্যস্ততা উপভোগের বিষয় বটে। এখন গুরুপরম্পরা হইতে কি পাওয়া যায় দেখা যাউক। তাঁহার কথানুসারে শ্রীহরিদাস স্বামীর ৬৩ পুরুষ হইতে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর ৪৯ পুরুষ বাদ দিলে ১৪ পুরুষ ব্যবধান হয়। আর শ্রীহরিদাসস্বামীর ষোড়শ শতাব্দী হইতে শ্রীজয়দেব গোস্বামীর ত্রয়োদশ শতাব্দী বাদ দিলে ৩০০ শত বৎসর ব্যবধান হয়। সুতরাং ৩০০ বৎসরকে ১৪ পুরুষ দিয়া ভাগ দিলে এক এক পুরুষের ২১ বৎসর গড়পড়তা হয়। এখন ৪৯ পুরুষের সঙ্গে ২১ বৎসর গুণ করিলে ১০২৯ বৎসর হয়। উহা ১৩ শতাব্দী অর্থাৎ ১২৫০ হইতে বাদ দিলে ২২১ বৎসর হয়। অর্থাৎ এতদনুসারে ভগবান্ নিম্বার্কের সময় হয় খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী হয়। সুতরাং কলির প্রারম্ভের জন্মজয়ের সময় হইতে শ্রীনিম্বার্ক ভগবান্ বহু পরে হইয়া পড়েন। আর যদি বলেন—মহান্ত মহারাজের বাক্য ঠিক্ নহে, তাহা হইলে আমার মতে শঙ্করাচার্য্যের যে সময়, সেই সময়ের পূর্ব্বে হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহা হইলে উক্ত গুরুপরম্পরাটী অন্য ঐতিহাসিক প্রমাণদ্বারা সমর্থিত হওয়া আবশ্যক হয়। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে যাঁহারা দ্বারকা মঠের শঙ্করাচার্য্যের গুরুপরম্পরা বিশ্বাস করেন, কিংবা যাঁহারা কুড়ল মঠের গুরুপরম্পরা বিশ্বাস করেন, অথবা যাঁহারা গোবর্দ্ধন মঠের গুরুপরম্পরা বিশ্বাস করেন, কিংবা যাঁহারা যথাদৃষ্ট শৃঙ্গেরী মঠের গুরুপরম্পরা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা শঙ্করাচার্য্যকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অন্ততঃপক্ষে স্থাপিত করায় নিম্বার্কভগবানের পরে আর শঙ্করাচার্য্য হন না। আমি স্বয়ং কোন গুরুপরম্পরা পরীক্ষা না করিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি।

তাহার পর পিতাপুত্রের ব্যবধানে আর গুরুশিষ্যের ব্যবধানে একরূপ গড়পড়তা হয় না। পিতাপুত্রক্রমে ২০।২৫ বৎসর একপুরুষ ধরা যাইতে পারে, কিন্তু গুরুশিষ্যে ইহা নিতান্ত অনিয়ত। বৃদ্ধ গুরুর বালক শিষ্য হইতে পারে, আবার অল্পবয়স্ক গুরুর অধিক বয়স্ক শিষ্য হইতে পারেন। অথবা গুরুশিষ্য সমবয়স্কও হইতে পারেন। অতএব এই ২১ বৎসর এক এক পুরুষ ধরিয়া শ্রীমন্নিম্বার্কস্বামীকে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে স্থাপিত করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। অবশ্য অন্য প্রমাণ পাইলে ইহাকে পোষকপ্রমাণ বলিতে আপত্তি হয় না। সুতরাং আমিও শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবুর সহিত একমত হইতে পারিলাম না। ভারতের ৩য় শতাব্দীর অবস্থা আমি যতটুকু আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে সে সময় নিম্বার্কভগবানের আবির্ভাব সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারি না। কিন্তু শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবু শ্রদ্ধেয় মহন্তমহারাজের কথাও কি অমান্য করিবেন ?

তাহার পর শ্রীদেবাচার্য্য নিম্বার্কসম্প্রদায়ের একজন আচার্য্য, তাঁহার ১২ পুরুষ পূর্ব্বে ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্যের আবির্ভাব—ইহা শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবুও স্বীকার করিয়াছেন। এই শ্রীদেবাচার্য্যের সময় আমি অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকায় ও ৺প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয়কৃত বেদান্তদর্শনের ইতিহাসের

অনুসারে ১১৯০ খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছি। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবু লিখিতেছেন—"উক্ত পুস্তকেও (অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের ইতিহাসেও) স্বামীজী (অর্থাৎ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহাশয়) জোর করিয়া ("যুগরুদ্রেন্দু" অর্থাৎ) ১১১২ সংবৎকে ১১১২ শকাব্দে পরিণত করিয়া শ্রীদেবাচার্য্যের কাল ১১৯০ খৃষ্টাব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সকল যুক্তির মূল যুক্তি যে আচার্য্য নিম্বার্ককে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরে আনিতে হইবে। বস্তুতঃ শ্রীদেবাচার্য্য একাদশ শতাব্দী বা তাহার পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কি না এবং নিম্বাকাচার্য্যের অভ্যুদয়কাল কলিযুগের প্রারম্ভে কি ৫ম শতাব্দীতে, তৎসম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া এই স্থানে অনাবশ্যক। রাজেন্দ্রবাবুর নিজ স্বীকারভিত্তি অনুসারে যখন শ্রীদেবাচার্য্য একাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন, তখন কি প্রকারে তাঁহার দ্বাদশ পুরুষ পূর্ব্বে অবস্থিত আচার্য্য নিম্বার্ক স্বামীর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে থাকা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তৎসম্বন্ধে তাঁহার খণ্ডনমণ্ডন প্রবন্ধের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমাদের বোধগম্য হইতেছে না।" ইত্যাদি।

আচ্ছা! প্রথম কথা এই যে, যদি ১১১২ সম্বৎকে ১১১২ শকাব্দে পরিণত করাই শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবুর আপত্তিকর হয়, তাহা হইলে ১১১২কে সংবৎ ধরিয়াও ভগবান্ নিম্বার্কের সময় ৮০৩ খৃষ্টাব্দেই হয়। যেহেতু পূর্ব্বোক্ত এক এক পুরুষের গড়পড়তা যে ২১ বৎসর, তাহার দ্বারা যদি ১২ পুরুষকে গুণ করা যায়, তাহা হইলে ২১ × ১২ = ২৫২ বৎসর হয়; সেই ২৫২ বৎসর যদি ১১১২ সম্বৎ হইতে বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে ১১১২—২৫২ = ৮৬০ সম্বৎ হয়, তাহা হইতে ৫৭ বাদ দিলে ৮০৩ খৃষ্টাব্দ হয়। আর যদি ১১১২ শকাব্দই হয়, তাহা হইলে ৮০৩ স্থলে ৮৮১ হয়। আমার নির্দ্দেশ অনুসারে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম সময় ৭৮৬ খৃষ্টাব্দ। অতএব ভগবান্ নিম্বার্কাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হন কি করিয়া? এস্থলে শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবু নিজে বা তাঁহার অবলম্বন পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহন্ত মহারাজের কোন মতামত প্রদর্শন করিলেন না! কেবল আমার কথার পূর্ব্বাপর বিরোধ দেখাইবার জন্য প্রবৃত্ত! কেন? দেখাইলে যে একটা সন্ধান পাইবার সুবিধা হইত! তাহাতে পশ্চাৎপদ হইলেন কেন! আমি ত আমার খণ্ডনমণ্ডন প্রবন্ধে আমার মতে নিম্বার্কভগবান ত্রয়োদশ শতাব্দী বলি নাই; উহা "অনেকে অনুমান করেন" বলিয়া বলিয়াছি। আমার মতে যাহা তাহা ত শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবু অবগতই আছেন, অতএব শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবুর এতাদৃশ কথা কখনই শোভন হয় না বলিতে হইবে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পরে নিম্বার্ক ভগবান্ ইহার অনুকূলে যে সব যুক্তি আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, ঐতিহাসিক বিষয়নির্ণয়ে কোন আগ্রহ বা বিজিগীষা না লইয়া প্রবৃত্ত হওয়াই সঙ্গত। যাহা উক্ত শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবুর প্রতিবাদ পড়িয়া "শঙ্করাচার্য্যের পরে নিম্বার্কাচার্য্য" এই মত পরিবর্ত্তনের কোন আবশ্যকতা দেখিতেছি না। শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবু যদি উহা প্রদর্শন করেন, তবে অবনতমস্তকে তাহা মানিয়া লইব। আমি কোন বিষয়ে আগ্রহ পোষণ করিতে ইচ্ছুক নহি। এস্থলে সুধী পাঠক বেদান্তদর্শনের ইতিহাস প্রথম ভাগ ৩৫৩৭৭ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে নানারূপ চিন্তাসামগ্রী পাইবেন। বাহুল্যভয়ে সে সব কথার আর অবতারণা করিলাম না।

তাহার পর একটী কথা এই যে, শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবু আমার একটী ছাপার ভুল বাক্য দেখিয়া আমাকে অনেক কথাই শুনাইয়াছেন। আমি লিখিয়াছি—"ভারতের সাধনা" ৫৬৬ পৃষ্ঠা—"অতএব

এই নারদদর্শন আজকালও সিদ্ধমহাত্মারা যেরূপ দেবতাদর্শনাদি করিয়া থাকেন, তদ্রূপই। পক্ষান্তরে এই সনৎকুমারের উপদেশ ব্যাসদেবও মহাভারতমধ্যে গ্রথিত করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রকে সনৎকুমার যে উপদেশ দিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য তাহার ভাষ্যও করিয়াছেন। এই সব দেখিলে মনে হয়, সনৎকুমার ঋষির যে মত, তাহা শঙ্করের মত হইতে ভিন্ন নহে। অতএব "ব্যাসের মত ঋষি সনৎ-কুমারের মত হইতে (ভিন্ন) পারে না" বলিয়া যে নিম্বার্কভাষ্যের দাবী, তাহার মূল্য অধিক হইল না। যদি নিম্বার্ক চার্য্যের সঙ্গে মাধ্বাচার্য্যের মতভেদ না থাকিত, তাহা হইলে নিম্বার্কভাষ্যের ব্যাসানুসারিতা একদিন বলবত্তর হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই।"

এস্থলে "ব্যাসের মত ঋষি সনৎকুমারের মত হইতে পারে না" এই বাক্যে একটী ছাপার ভুল হইয়াছে। আমি লিখিয়াছিলাম—"ব্যাসের মত ঋষি সনৎকুমারের মত হইতে 'ভিন্ন' হইতে পারে না।" ভিন্ন শব্দটী ছাপা হয় নাই। এই ভুলটী ইহার পূর্ব্ববাক্য দেখিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সে প্রবৃত্তি নৃসিংহবাবুর হইল না? এই ভুলের জন্য তিনি আমাকে "পণ্ডিতপ্রবর" বলিয়া উপহাস করিয়াছেন। যাউক, ব্যক্তিগত কথার উত্তরদান এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এইরূপ উপহাস সহ্য করিলেই আমার পক্ষে ভাল।

বস্তুতঃ শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবুর এই কথায়, আমি পত্রিকাসম্পাদক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত মহাশয়ের নিকট আমার হস্তলিখিত প্রবন্ধটী দেখিতে যাই। প্রবন্ধপাঠে দেখা গেল উক্ত "ভিন্ন" শব্দটী হস্তলিখিত প্রবন্ধে ছিল, * কিন্তু মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ ছাপা হয় নাই।

তাহার পর আর এক কথা—ব্রহ্মসূত্র ২।২।১১ সূত্রটী "মহদ্দীর্ঘবদ্ বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্"। ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য স্বমতের পরিষ্কার প্রদর্শন করিয়াছেন। শঙ্করের পর ভাস্করাচার্য্যও তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু রামানুজাচার্য্য বলিলেন—এই পাদটী যখন পরমতখণ্ডনপাদ, তখন ইহার ব্যাখ্যায় স্বমতপরিষ্কার থাকিতে পারে না। এজন্য তিনি ইহার ব্যাখ্যা পরমতখণ্ডনপর করিয়াই করিয়াছেন। তাহার পর মধ্বাচার্য্যও তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য্যও তাহাই করিয়াছেন। এখন নিম্বার্কভাষ্য যদি প্রাচীন হইত, তাহা হইলে রামানুজাচার্য্য যখন ভাস্কর ও শাঙ্করব্যাখ্যায় দোষ দিয়া অন্যপথে ব্যাখ্যা করিতেছেন, তখন রামানুজ স্বামী কি স্বমতের দৃঢ়তার জন্য নিম্বার্কভাষ্যের উল্লেখ করিতেন না? কিন্তু রামানুজভাষ্যে কোন প্রাচীন ভাষ্যেরই এজন্য উল্লেখ নাই। আর শঙ্কর বা ভাস্করও এই সূত্রের নিম্বার্কানুযায়ী ব্যাখ্যার খণ্ডনও করিতেছেন না। শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রের আদ্যোপান্ত সূত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যার খণ্ডন করিয়াছেন। আর ভাস্কর যদি নিম্বার্কভগবানের পরে হন এবং নিম্বার্কসম্প্রদায়ভুক্ত বা তন্মতাবলম্বী হন, তবে তিনিও শঙ্করব্যাখ্যাকে এস্থলে নিম্বার্কব্যাখ্যানুসারে খণ্ডন করিতেন। ভাস্কর শঙ্করমত খণ্ডন করিয়াছেন ইহাও দেখা যায়, ইত্যাদি। কিন্তু এসব কিছুই দেখা যায় না। অতএব রামানুজাচার্য্যই এই পন্থা প্রদর্শনে প্রথম বলিতে হয়। আর নিম্বার্ক ভগবান্ তাঁহার পরে আবির্ভূত হইয়া সেই পথের অনুগামী হইয়াছেন।

যদি বলা যায়—নিম্বার্ক ভগবান্ ত রামানুজের শঙ্কর ও ভাস্করব্যাখ্যাখণ্ডনের ন্যায় কাহারও ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া নিজ ভাষ্য লিখিতেছেন না—ইহাই ত দেখা যায়। অতএব নিম্বার্ক ভগবানই পূর্ব্বে, শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজাচার্য্য পরে? কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, নিম্বার্কভাষ্যে শঙ্করমত

* মুদ্রাকরের অসাবধানতায় প্রোক্ত শব্দটী বাদ পড়িয়া যায়।—ভা, স,।

খণ্ডন স্পষ্টতঃ না থাকিলেও প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে, তাহা প্রথমেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার পর সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রামানুজভাষ্যের ভাষার সহিত নিম্বার্কভাষ্যের ভাষার ঐক্য রহিয়াছে।

যথা, রামানুজভাষ্যে দেখা যায়—

"সংপ্রতি পরমাণুকারণবাদস্যাপি অসামঞ্জস্যং প্রতিপাদ্যতে" এই কথা বলিয়া "ত্র্যণুকোৎপত্তিবাদবৎ অন্যচ্চ তদভ্যুপগতং সর্ব্বম্ অসমঞ্জসম্; পরমাণুভ্যো দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ জগদুৎপত্তিবাদবদ্ অন্যদপি অসামঞ্জসম্ ইত্যর্থঃ" এই বাক্যটী বলিয়া শেষে "অন্যচ্চতদভ্যুপগতং সর্ব্বম্ অসমঞ্জসম্ ইত্যেব সূত্রার্থঃ" এইরূপ বলা হইয়াছে;

আর নিম্বার্কভাষ্যে আছে—

"পরমাণুভ্যাং দ্ব্যণুকোৎপত্তেঃ অসামঞ্জস্যম্, তেভ্যঃ ত্র্যণুকোৎপত্তেশ্চ সুতরাম্ অসামঞ্জস্যম্ তদ্বৎ পরমাণুকারণবাদ্যভ্যুপগতং সর্ব্বম্ অসমঞ্জসং ভবতি।"

এস্থলে "সর্ব্বম্ অসমঞ্জসম্" এই পদদ্বয় এবং "তদভ্যুপগতম্" ও "পরমাণুকারণবাদ্যভ্যুপগতম্" পদদ্বয় একের অন্য হইতে গ্রহণের সূচক বলিয়াই বোধ হয়। আর শঙ্করের পূর্ব্বে যদি নিম্বার্কভাষ্য থাকিত, তাহা হইলে শঙ্কর যেমন তাঁহার ভাষ্যের সর্ব্বত্র অন্য মত খণ্ডন করিয়াছেন, তদ্রূপ নিম্বার্কমতেরও খণ্ডন করিতে বিস্মৃত হইতেন না। এই কারণে মনে হয়—নিম্বার্ক ভগবান্ যে কেবল শঙ্করের পরে, তাহা নহে, পরন্তু রামানুজাচার্য্যেরও পরে। অবশ্য এতদ্দ্বারা মধ্বাচার্য্যেরও পরে কি না বলা যায় না। তবে মধ্বাচার্য্য যখন তদুল্লিখিত ২১খানি ভাষ্যের মধ্যে নিম্বার্কভাষ্যের নাম করেন নাই, তখন তাহাও এই কারণে সম্ভবপর হইতে পারে। আমাদের বোধ হয়, এই প্রমাণ দুইটী খুব বলবত্তর প্রমাণ। বস্তুতঃ, মধ্বাচার্য্যও রামানুজাচার্য্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন। তিনিও "মহদ্দীর্ঘবৎ" সূত্রকে রামানুজাচার্য্যের ন্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যদি বলা যায় নিম্বার্কাচার্য্য তবে এই সূত্রব্যাখ্যা কালে কেন রামানুজাচার্য্যের নাম করেন নাই? তাহার উত্তর এই যে, নিম্বার্কভাষ্য অতি সংক্ষিপ্ত, তিনি কাহারও নাম করেন নাই। আর এই স্থলের রামানুজভাষ্যের ভাষা ও নিম্বার্কভাষ্যের ভাষা যদি দেখা যায়, তাহা হইলে ইহাই প্রতীত হয় যে, নিম্বার্কভাষ্যের ভাষা অতি সংযত সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ, রামানুজভাষ্যের ভাষা সেরূপ নহে। এরূপ ব্যাপার পরবর্ত্তী স্থলেই প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। অতএব শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য্য রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বে হইতে পারেন না ইহাই বলিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে হওয়া ত নিতান্ত দূরের কথা।

আর যদি শ্রীদেবাচার্য্য ও শ্রীনিবাসাচার্য্যের মধ্যে ১২ পুরুষ ব্যবধান না হয় তাহা হইলে শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্যের প্রায় সমসাময়িক। বস্তুতঃ শ্রীদেবাচার্য্যের মঙ্গলাচরণ শ্লোক হইতে পাঠকের সেরূপ কল্পনার প্রবৃত্তিও হয়। যেহেতু শ্লোকে শ্রীদেবাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য ও শ্রীনিবাসাচার্য্যকেই প্রণাম করিতেছেন, মধ্যবর্ত্তী কোন আচার্য্যকে প্রণাম করিতেছেন না। এজন্য শ্রীদেবাচার্য্যকে তাঁহাদের সমসাময়িক ও শিষ্য কল্পনা করা অসঙ্গত হয় না। শ্লোকটী যথা—

"নিয়মেন যদানন্দো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
তমহং নিয়মানন্দং বন্দে কৃষ্ণং জগদ্গুরুম্॥"

গ্রন্থসমাপ্তিতে আবার বলিতেছেন—

"শ্রীমৎ সনৎকুমারসন্ততিপদাশ্রিত শ্রীভগবন্নিয়মানন্দাদ্যাচার্য্যপদপঙ্কজমকরন্দভৃঙ্গ শ্রীদেবাচার্য্য-বিরচিতায়াং" ইত্যাদি।

গ্রন্থমধ্যে আছে—

"আদ্যাচার্য্যচরণৈঃ বেদান্তপারিজাতসৌরভপঠিতবাক্যচতুষ্টয়স্য এতন্মূলভূতস্য শ্রীনিবাসচরণৈঃ ভগবদ্ভিঃ বেদান্তকৌস্তুভে তদ্ভাষ্যে নিগদভাষিতত্বাৎ, অত্রাপি সূত্রব্যাখ্যামুখেন অস্মাভিরপি ব্যাখ্যাত প্রায়ত্বেন পৌনরুক্ত্যাপাতদোষাচ্চ নেহ ব্যাখ্যার্থম্ উদ্যুজ্যতে।" (২০১ পৃষ্ঠা চৌঃ সং)

এই জন্য মনে হয়, শ্রীদেবাচার্য্য ও শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্য্যের মধ্যে কোন সময়ের বিশেষ ব্যবধান নাই। এজন্য বেদান্তদর্শনের ইতিহাস প্রথম ভাগ দ্রষ্টব্য। মঠের গুরুপরম্পরা, গদি লইয়া মকর্দ্দমার ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রস্তুত হইতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং এইরূপ গুরুপরম্পরার প্রমাণও অতি দুর্ব্বল।

তৎপরে তিনি বলিতেছেন—"যদি আধুনিক সিদ্ধমহাত্মাদিগের দেবদর্শন সত্য বলিয়া রাজেন্দ্র বাবু স্বীকার করেন, তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কেন, এখনকার বর্ত্তমান শতাব্দীর লোক হইলেও শ্রীনিম্বার্কস্বামীর নারদশিষ্য হইতে কোনও বাধা নাই। সুতরাং তিনি তাঁহার নিজভাষ্যে যে আপনাকে নারদশিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দোষারোপ করিবার কোনও হেতু নাই।"

এতদুত্তরে আমার বক্তব্য, আমি দোষারোপ করিলাম কোথায়? সিদ্ধমহাত্মার দর্শন বলিলে কি দোষারোপ করা হয়? তাহাকে মিথ্যাদর্শন বলা হয়? বস্তুতঃ, এভাবে শ্রীমন্নিম্বার্কস্বামীকে নারদ-শিষ্য বলা শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবুর অভীষ্টই নহে; কারণ, তাহা হইলে জন্মেজয়ের সমসাময়িকত্ব সিদ্ধ হয় না। পরে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে শ্রীমন্নিম্বার্কস্বামী আবির্ভূত বলিলে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে হয় বটে, কিন্তু তাহাতেও জন্মেজয়ের সমসাময়িকত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব নিজে কিছু না বলিয়া রাজেন্দ্র বাবুর ভ্রমপ্রদর্শন করাই সুগম পথ !!! ইহাই কি বুঝিতে হয় না?

তৎপরে শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবু বলিতেছেন—'যদি আধুনিক সিদ্ধমহাত্মাদিগের দেবদর্শন কাল্পনিক ও মিথ্যা, সুতরাং শ্রীনিম্বার্কস্বামীরও নারদদর্শন মিথ্যা বলিয়া রাজেন্দ্রবাবুর মত হয়, তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে * * * কেবল রাজেন্দ্রবাবুর অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া (তাহাকে) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা কখনই প্রকৃতিস্থ লোকের পক্ষে সম্ভব হইবে না।"

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ইহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক কথা। যে যাহা না বলে, তাহাকে সে তাহা বলিয়াছে বলিলে সত্য উদ্ঘাটনের কি সহায়তা হইতে পারে? শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবুর নিকট এরূপ কথা আমরা আশা করি না।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবু স্বমতসমর্থনের জন্য বিজ্ঞানভিক্ষুকে বৈদান্তিক বলিতে চাহেন। ইহা এ পর্য্যন্ত শুনি নাই, আজ নূতন শুনিলাম। আমরা তাঁহাকে সাংখ্য-মতাবলম্বী বলিয়াই জানি। অতএব এ বিষয়ে নীরব থাকাই কর্ত্তব্য। কারণ, ইহার উত্তর দিতে গেলে পৃথক্ প্রবন্ধের প্রয়োজন হইবে। শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবুর এই কথায় আমরা বিজ্ঞানভিক্ষুর মতটী বুঝিবার জন্য আবার একবার চেষ্টা না করিয়া কিছু বলিলে তাহা উচিত হয় না।

তাহার পর কতিপয় কারণ প্রদর্শন করিয়া আমি আমার প্রবন্ধে মধ্বাচার্য্যের ব্যাসদেবসাক্ষাৎ-কারটী মাধ্বসম্প্রদায়ের কল্পনা মাত্র বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছিলাম। কারণ, যদি নিম্বার্কমত ও মাধ্ব-

মত উভয় মতই ব্যাসদেবের মতের সঙ্গে অবিরুদ্ধ হয়, অথচ যদি মাধ্বমতের সূত্রার্থের সহিত নিম্বার্কমতের সূত্রার্থের বিরোধ দেখা যায়, তাহা হইলে কাহার মতটী ব্যাসের মত, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়। এই আশয়ে আমি বলিয়াছিলাম—"যদি নিম্বার্কাচার্য্যের সহিত মধ্বাচার্য্যের মতভেদ না থাকিত, তাহা হইলে নিম্বার্কভাষ্যের ব্যাসানুসারিতা একদিন বলবত্তর হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই।" শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবু আমার এই কথাটী বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াছেন। কিন্তু কেন বুঝিতে পারিলেন না, তাহা আমরাও বুঝিতে পারিলাম না।

পরিশেষে এই প্রসঙ্গে আবার শ্রীযুক্ত নৃসিংহবাবু লিখিয়াছেন—"পরন্তু যদি তাঁহার কথা অনুসারে মধ্বাচার্য্য ব্যাসদেবের সহিত সাক্ষাৎকার নাই করিয়া থাকেন, তবে মাধ্বাচার্য্যের মতের ঐক্য না হওয়াতে ঐ সিদ্ধান্ত যে ব্যাসমতানুযায়ী নহে, তাহা কিরূপে অবধারণ করা যায়, তাহ আমাদের বোধগম্য হইল না।"

এই কথার উত্তরে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। বিচারক্ষেত্রে আগ্রহ বা ব্যস্ততা প্রায়ই প্রতিবন্ধক হয়। যাহার কথা খণ্ডন করিতে হয়, তাহার কথা বুঝিবার জন্য একটা ইচ্ছা ও ধৈর্য্য থাকা আবশ্যক। আমার উক্ত কথার অভিপ্রায় এই যে, যদি মাধ্বাচার্য্যের উক্ত প্রকার ব্যাসসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, তবে তাঁহার ভাষ্য ব্যাসসম্মত—ইহাই বলিতেই হইবে। আর যদি সাক্ষাৎকার নাই হইয়া থাকে, তবে 'তিনি নিজে তাঁহার ভাষ্য ব্যাসসম্মত বলায়' আমাদিগকে আপাততঃ তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রথম পথে ব্যাসানুসারিতা যত প্রবল হয়, দ্বিতীয় পথে তত প্রবল হয় না—এই মাত্র বিশেষ হয়। এখন নিম্বার্কভাষ্যও যদি ব্যাসসম্মত বলা হয়, এবং মাধ্বভাষ্য ও নিম্বার্কভাষ্য এই উভয় ভাষ্য সূত্রার্থবিষয়ে যদি পরস্পরবিরুদ্ধ হয়, তবে কাহার অর্থ ব্যাসসম্মত বলিতে হইবে? এ প্রশ্নও নিতান্তই স্বাভাবিক। মধ্বাচার্য্যের ব্যাসদর্শন মাধ্বসম্প্রদায়ের কল্পনা বলিলেও কি মধ্বসম্প্রদায়ের মতে মাধ্বভাষ্যের ব্যাসানুসারিতা অস্বীকার করা হয়? বস্তুতঃ তাহা হয় না। তাঁহারাও তাহা অস্বীকার করেন না। কারণ, ব্যাসদর্শন না হইলেও সম্প্রদায়ক্রমে লব্ধ হইলে তাহাতে ব্যাসানুসারিতার বাধা হয় না। তবে সম্প্রদায় অনুসারে লব্ধ কিনা তাহা স্বতন্ত্র কথা। আর তাহাও আমি আমার প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা ভাবি, যখন একজনের "ইহাই মত" বলিয়া একাধিক ব্যক্তি মতবিরোধ করেন, তখন অন্য প্রমাণ ভিন্ন কাহার কথা সত্য, তাহা বলা যায় না। শ্রীমন্নিম্বার্কস্বামীকে জন্মেজয়ের সমসাময়িক বলিবার উদ্দেশ্যই এই বোধ হয় যে, তাহা হইলে তাঁহার ব্যাসের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সম্ভব হয়, আর তাহা হইলে তাঁহার মতটা ব্যাসের মতই হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্যাসের সময়ও ব্যাসের মতের বিরোধীমত পোষণকারী ঋষি ছিলেন—ইহাও জানা যায়। অতএব তাহাতে নিম্বার্কমত ব্যাসমত হয় কি করিয়া? ব্যাসের মত জানিবার দুইটী পথ আছে—একটী বিচার, আর একটী সম্প্রদায়ানুগত্যনির্ণয়। দুঃখের বিষয় আমরা কোন পথেই নিম্বার্কমতকে ব্যাসের মত বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু ইহার কারণ আমি খণ্ডনমণ্ডন নামক আমার মূল প্রবন্ধে বিশদ্‌ভাবেই উল্লেখ করিয়াছি। এক কথায় ব্যাসমতানুগত্যতা শঙ্করমতেই অধিক।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

———

মাস-পঞ্জি—মাঘ, ১৩৪০

দৈব-দুর্য্যোগ।—

মাসের প্রথম দিন সমগ্র ভারতে বিষম **ভূমিকম্প** হইল; উত্তর বিহার, দার্জ্জিলিং শৈলঅঞ্চল ও নেপাল রাজ্যে ইহার ধাক্কা অত্যধিক হইয়াছে; মুজফরপুর, দারবঙ্গ, মতিহারী প্রভৃতি স্থানে পাকা বাড়ী নাই বলিলেই চলে; অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ও বিপুল সম্পত্তি নাশ পাইয়াছে। স্থানে স্থানে জমি ফাটিয়া জল-নির্গম ও বালুকারাশিতে বিস্তৃত স্থান ভরিয়া গিয়াছে; চলাচলের পথ বন্ধ, রেল পথ ভগ্ন, ভগ্ন স্তূপ হইতে মৃতদেহ ও ধন-সম্পত্তি উদ্ধার করিতে অনেক সময় ব্যতীত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত ও দারুণ শীতে গৃহহীন লোকের কষ্টের সীমা নাই—নানা স্থান হইতে সাহায্যকারী দেশ-সেবকগণ প্রপীড়িত স্থানে গমন করিতেছে।

দক্ষিণ ভারতে এই সময় ভয়ানক **ঝটিকাবর্ত্ত** চলিয়াছে; আর্কট, তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী প্রভৃতি স্থানে বহু লোকক্ষয়, পশু বিনাশ ও ঘরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে।

মৃত্যু।—

মাদ্রাজ হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ৫৭ বর্ষ বয়সে ও উৎকলের প্রবীণ কর্ম্মী মধুসূদন দাস ৮৮ বর্ষ বয়সে পরলোক গমন করিলেন।

প্রাণদণ্ড।—

চট্টগ্রাম সন্ত্রাসবাদী আসামী আর দুইটী যুবক স্পেশেল ট্রিবুনেলের বিচারে প্রাণদণ্ড পাইল; ইহারা গত জানুয়ারী মাসে এক ক্রিকেট খেলার ভূমিতে ইউরোপীয়দের উপর বোমা নিক্ষেপ করে; ৪[illegible] যুবকের মধ্যে দুই জনকে তখনই গুলির আঘাতে মারা হইয়াছিল।

চুক্তি।—

জাপ-ভারতের বাণিজ্য চুক্তির খসরা লেখা হইয়া গিয়াছে—স্বাক্ষর ইহার লণ্ডন সহরে হইবে। ইহাতে ভারতবাসীর মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে জাপানে ভারতীয় তুলারপ্তানি পুনঃ আরম্ভ হইয়াছে।

ডাকাতি।—

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে বঙ্গদেশে ৪৪টী ডাকাতি ঘটিয়াছে বলিয়া প্রকাশ—ইহাতে অন্যূন ২৩০০০ টাকা লুট হইয়াছে।

চুরি।—

মাদ্রাজ তিরুপুরের অবিনাশী মন্দিরের নটরাজ মূর্ত্তি অলঙ্কারাদিসহ চুরি যায়; দুইজন চোরের অল্প-কাল পরে মৃত্যু হওয়াতে, বাকী চোরেরা বিগ্রহ সহ আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে।

আইন।—

বাঙ্গলার সন্ত্রাস বাদীদিগের দমনার্থ আরও কড়া বিধানের ব্যবস্থা উপস্থিত বঙ্গীয়-ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থিত আছে। এই বিধানে সন্ত্রাস বাদে সমাবর্ত্তন সুকঠিন হইবে।

শ্রমিকের মতান্তর।—

কাণপুরের ট্রেড্ ইউনিয়ন সভাতে গান্ধী-নীতি ও কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতির ঘোর নিন্দাবাচক আলোচনা হয়; দুইপক্ষের তুমুল মনান্তর ও বিবাদে সভার কার্য্য পণ্ড হইয়াছে। বরদার কারখানার মজুরদের এক সাধারণ সভায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে বর্ত্তমান কংগ্রেজ স্বদেশীর নামে মজুরদের ধননিঃশেষ করিয়াছে; দলে দলে লোক নিঃশব্দে জেলে গেলেই স্বাধীনতা অর্জ্জন হইতে পারে না—প্রকৃত গঠন মূলক কার্য্য দ্বারাই তাহা অর্জ্জিত হইতে পারে।

বিমান যাত্রা।—

কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত নিয়মিত বিমান যাত্রা আরম্ভ হইল।

ব্যবস্থা সভা।—

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার বাণিজ্যকর বিধির এক নূতন পাণ্ডুলিপি উপস্থিত, তাহাতে জাপ-ভারতীয় বাণিজ্যচুক্তি ও বোম্বাই-ল্যাঙ্কেসায়ার বাণিজ্য-সন্ধিকে মানিয়া লওয়া হইবে। ভারতীয় রেলওয়ে বজেট ও গ্রাণ্ট দান বিষয়ে প্রস্তাব এই সময়ে হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্টের সাধারণ বজেট ফেব্রুয়ারীর শেষ ভাগে উপস্থাপিত হইবে।

বৈদেশিক বার্ত্তা

ব্রিটনের দক্ষিণাংশে ভয়ানক বাত্যা বহিয়া যায়, স্বয়ং রাজা ও প্রধান মন্ত্রীর গাড়ী চলিবার সময় ভগ্ন বৃক্ষ শাখার আঘাত পাইয়াছে - আয়র্লণ্ডে জেনারেল ও-ডাফী তাহার বেয়াইনী গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়াছে—ইংলণ্ডে সম্প্রতি ডাইভোর্স বা বিবাহ বিচ্ছেদ মোকদ্দমার সংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়াছে—বিগত ১৯৩৩ সনে সাত হাজার লোক রাস্তায় চলিতে গিয়া দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছে—জাপানী সস্তা দ্রব্যের ভয়ে ম্যাঞ্চেষ্টর চেম্বার অব কমার্স সভা গভর্ণমেণ্টের শরণ চাহিতেছে—সিঙ্গাপুরে নাবিক সম্মিলন বসিয়াছে; সিঙ্গাপুরকে ব্রিটিশের প্রতীচ্য অধিকার মধ্যে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আধুনিক নৌ-পীঠে পরিণত করাই উদ্দেশ্য—ব্রিটিশ সেনাবিভাগে নূতন যাহারা ভর্ত্তি হইতে যায় তাহাদের স্বাস্থ্যের ঘোর অবনতি দেখা যায়, অনেক সময় শতকরা ৬৫।৭০ জন প্রবেশার্থীকে উপযুক্ত স্বাস্থ্যবান দেখা যায় না; রমণীরা স্বহস্তপক্ক খাদ্য আপন জন দিগকে খাওয়ায় না, টিনেপুরা ক্রীত খাদ্য খাইতে হয় বলিয়া স্বাস্থ্য-হানি ঘটিতেছে, জেনেরেল স্যর সিসিল রোমারের এই মত। **জারম্যান** রাষ্ট্রপতিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সকলের জন্য অবারিত রাখিতে কুণ্ঠিত; প্রবেশার্থীর শারীরিক ও মানসিক প্রকর্ষ, নৈতিক চরিত্র ও জাতীয় বিশ্বস্ত-চিত্ততা দেখিয়া উচ্চ শিক্ষা মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে দেওয়া হইবে; ফলে প্রায় ছাত্র সংখ্যা অর্দ্ধেকে পরিণত হইতেছে। নবরাষ্ট্রে অন্ততঃ ৬০০ শত সংবাদ পত্রের প্রচলন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, রাষ্ট্রতন্ত্রের পক্ষপাতি দলকেও দমন করা হইতেছে। **অষ্ট্রীয়ায়** নাজি প্রভাব দূরকরণার্থ ডাঃ ডলফাসের চেষ্টা অক্লান্ত, তিনি অষ্ট্রিয়াকে অন্য সকল প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে চাহেন; তাহার অধীনস্থ "৪র্থ ব্যাটেলিয়ন" দল সর্ব্বপ্রকারে নাজি প্রভাব দূর করিতেই প্রস্তুত। **রুমানিয়াও** অষ্ট্রিয়ার দৃষ্টান্তে নাজি-শক্তির বিরুদ্ধে লাগিয়াছে; পররাষ্ট্র সচিব ম. টাইটোলেস্কি ইহার প্রধান বিরোধী; তিনি আজ মুসোলিনী ও হিটলারের পর্য্যায়ে দেশ মধ্যে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অষ্ট্রীয়া জাতি-সঙ্ঘের সমীপে অভিযোগ করিয়াছে যে জারম্যানী অস্ত্রশস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য করিয়া বিদ্রোহীদলের সহায়তা করিতেছে; এ বিষয়ে ডাঃ ডলফাস ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব ম, পল বনকারের মতামত পরীক্ষা করিতেছেন এবং বলিতেছেন যে অষ্ট্রীয়া আর জারম্যানীর অত্যাচার সহ্য করিবে না, এজন্য তাহার যাহা করিতে হয়, তাহাই করিবে। এদিকে অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ লইয়া জারম্যানী ও ফ্রান্সের মধ্যে যে মন কসাকসি চলিতেছে, তাহাতে ইউরোপের শান্তি ভঙ্গের ঘোরতর সম্ভাবনা—পূর্ব্ব এশিয়ায় **জাপানের** সামরিক কার্য্য পরম্পরায় সোভিয়েট রুশ বিচলিত হইয়াছে; জাপান অদ্যকার জগতের বাজারে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সামরিক দ্রব্য জাতের ক্রেতা।

নবেল পুরস্কার।—

এবারের পদার্থ বিদ্যার নির্দ্ধারিত 'নবেল প্রাইজ' পাইলেন প্রফেসার পি, এ, এম ডিরেক এবং ই, স্রুডিঙ্গার। বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটী প্রধান বিষয় "কোয়ানটাম্‌" থিওরী লইয়া ইহাদের খ্যাতি। ইহাদের একজন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতাধ্যাপক, আর একজন অকস্‌ফোর্ডের।

পোল্যাণ্ডের নূতন শাসন বিধি স্থিরতর আকার গ্রহণ করিল।

চীনে পীত নদে ভীষণ বন্যা হওয়ায় প্রায় ৬০ টী জিলা উৎসন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এক জেলাতেই প্রায় দশ হাজার লোক জলমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

নেপাল রাজ্য ভূকম্পনে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত—কাটামুণ্ড, পাটন, ভাটগাঁয়ের অত্যুচ্চ প্রসাদ সকল ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। পশুপতি নাথের মন্দির কোনওরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

পারসিক রাজসরকার শিল্পে আত্ম নিয়ন্ত্রণ জন্য সর্ব্বশেষ চেষ্টিত; সিরাজ, ইস্পাহান ও ইয়াজদ সহরে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হইতেছে।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

পঞ্চম বর্ষ] ফাল্গুন—১৩৪০ [৫ম সংখ্যা

সাধনার পথে

ভারতসত্তা ও আত্মসত্তা

দেশ-সত্তার আত্ম-সত্তার বোধ একালের জাতীয়তারও প্রধান লক্ষণ। একদিন ছিল যখন লোকে দল বাধিয়া বাস করিত; বিভিন্ন স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইত—তখন সেই দলের নামেই দেশের নাম হইল। ক্রমে লোকে বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী বসতি করিয়া লইল। দেশ তখন স্থায়ী নাম পরিগ্রহ করিল, আর দেশের নামেই লোকের পরিচয় হইতে লাগিল। দেশের সঙ্গে যতই সম্বন্ধ স্থায়ী হইল, লোকপ্রকৃতি ততই তাহার ভাবে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। আহার বিহার চাল-চলন ভাষা ব্যবহার সমুদয়ই সেই দেশের হইয়া গেল, দেশ সত্তায় আত্মসত্তা বিলাইয়া গেল। তার উপরে যখন বিভিন্ন লোকের সামাজিক সম্বন্ধ জটিলতর হইয়া উঠিল—ব্যবহারিক পার্থক্য ও রাষ্ট্রিক দ্বন্দ্ব বিভিন্ন স্থানের লোকের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল, তখন সেই দেশের নামেই পরস্পর বিবাদ ও সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইল। এই সংঘর্ষ দেশসত্তার আত্মবোধে সহায়ক হইয়া উঠিল। অন্যকার (পাশ্চাত্যের) জাতীয়তা এই ভাবে গঠিত।

দেশ-প্রকৃতি ও লোক-প্রকৃতি এই দুইএর সমন্বয়ে প্রকৃত জাতীয়তার সংগঠন হয়। দেশের অন্তঃশক্তি, জল বায়ু, ভৌগোলিক অবস্থা ইত্যাদির প্রভাব লোকের প্রকৃতি, আকাঙ্খা ও সংস্কার বলের সহিত মিলিয়া যে সমষ্টি-শক্তির সৃজন করে, তাহাই প্রকৃত জাতীয়তার আধার ভূমি। ইহার উপরে যদি কোন উচ্চতর আদর্শ—লোকাতীত বা পারমার্থের দৃষ্টি—ধর্ম্ম ও নীতি—লোকের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে, তবে তাহা সেই জাতীয়তায় এক নূতন জীবন রসের সঞ্চার করে। সেই আদর্শের প্রেরণায় যে জাতীয় কর্ম্মতৎপরতা তাহাই লোকের প্রকৃত সাধনা। এই সাধনা দেশ-সত্তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে, জাতীয়তাকে পুণ্যপূত করিয়া তুলে, আত্মসত্তাকে প্রকৃত জাতীয়তার সেবায় নিয়োজিত করিয়া,

কৃতার্থ করে। দেশ, জাতি ও ধর্ম্ম সমুদয় এক হইয়া তখন এক সাধনার (culture) অঙ্গীভূত হইয়া যায়। ভারতে ঐরূপ সাধনারই প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এ সাধনার কখনও বিনাশ হয় না—ইতিহাসের যুগবিপর্য্যয়ের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যেও উহা দেশ-সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দেয়—ভারতের তাহাই হইয়াছে। অদ্যকার নানা প্রতিকূল অবস্থা ও বিজাতীয় আবর্জ্জনার মধ্যে ভারতের সেই সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। ভারতকে আজ নিজ সত্তায় 'ভারতবর্ষ' বলিয়া গণ্য করিবার সমুদয় লক্ষণই বিলুপ্তপ্রায়—ভারত কেবল কোনও ভৌগোলিক সংস্থা নয়; ভারতীয় সাধনা রত জনগণের বিধিনির্দ্দিষ্ট জন্মভূমি। সেই মহান্ সাধনার ক্ষেত্র যে দেশ, তাহাই ভারতবর্ষ। ভারতীয় সাধনার সেই অতুল আদর্শ ভারতের গতি নির্দ্দেশক ধ্রুবতারা, যুগে যুগে দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুলিত চিত্ত ভারতবাসীকে ভারতের দেবতা আসিয়া সে পথের দিগ্‌ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাহার অনুদিষ্ট বিধি মানিয়াই ভারত—অন্যথা উহা হিন্দুস্থান বা পরকীয় ভাবে পরিচালিত 'ইণ্ডিয়া'। পরকীয় আদর্শে প্রভাবান্বিত, আত্মভোলা দেশ কালচক্রে আজ বাহ্যতঃ সর্ব্বপ্রকারই অবনত—প্রকৃত কিন্তু আপন সাধনার চির সঞ্জীবনী রসে জীবিত। আজ সে ভারতসত্তায় আত্মসত্তার সন্ধান করাই দেশবাসীর প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য।

ভূমিকম্প প্রসঙ্গে।—

উত্তর বিহার ভূমিকম্পে কত লোক মরিয়াছে ও কত গৃহ বাটী ও সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে এবং কত লোকে আঘাত পাইয়া এখনও পীড়িত ও শয্যাশায়ী হইয়া আছে, তাহার সঠিক সংবাদ এখনও প্রকাশ পায় নাই। প্রথমতঃ যেরূপ গুরুতর ও বিস্তৃতভাবে এই অনিষ্টপাত ঘটিয়াছে, তাহাতে সমুদয় সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা কাহারও পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। দ্বিতীয়তঃ যেরূপ জাতীয় শক্তি ও লোক মত প্রবল থাকিলে সকল প্রকার বিপদ্‌পাতে দেশমধ্যে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতে পারে, এ দেশে তাহার একান্ত অভাব—দৈন্য ও অবনতিতে এদেশের লোকের নৈতিক অবস্থা এমনই শোচনীয় যে, আকস্মিক বিবাদ ও দুর্ঘটনায় ইহাদের ব্যক্তিগত বা সমবেত ভাবে কিছু কর্ত্তব্য আছে, তাহা বড় কেহ বুঝিতে পারে না; দেশের কোটি কোটি জনবৃন্দের মানসিক ও আর্থিক দৈন্য দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আর এক কথা, যাহারা দেশের মধ্যে শক্তি সঞ্চালন করিতেছেন তাহাদিগের সহিত লোকের প্রকৃত অবস্থা, অভাব ও অভিযোগাদির কোনও চির জাগ্রত ও আন্তরিক সহযোগ বা সমপ্রাণতা নাই—আধুনিক শাসন-ব্যবস্থার সমুদয় বিষয়ই কৃত্রিম নিয়মে বাধা, প্রকৃত প্রাণের খেলা বা চিত্তের আকর্ষণ ইহাতে নাই; তাহাতে আবার কেবল মাত্র শাসন ব্যতীত জাতীয়তার অন্য কোনও প্রবৃত্তির স্বাভাবিক সংমিশ্রণ নাই। এই দেশের শাসন ব্যবস্থাতে এজন্য অনেক গুরুতর বিষয়ে যতখানি শাসনশক্তির নিয়োগ করা আবশ্যক, তাহার সমুচিত প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না—মানবীয়তার উচ্চ কক্ষে দয়া দাক্ষিণ্য ও সমপ্রাণতা প্রভৃতি যে সকল উচ্চ গুণের খেলা হয়, তাহা এরূপ অবস্থায় দুর্ল্লভ। ফলে আজও ভূমিকম্পের নিশ্চিত পূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। মোটামোটি বুঝা যায় অন্ততঃ দশ সহস্রেরও অনেক অধিক লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে; উত্তর বিহারের প্রায় সমুদয় স্থানের গৃহবাটী ভগ্নস্তূপে পরিণত ও বিস্তারিত কৃষিক্ষেত্র জল ও বালুকা রাশিতে প্রোথিত হইয়াছে। বহুদিন পর্য্যন্ত অনেক মৃত দেহই ভগ্নস্তূপ হইতে উদ্ধার হয় নাই। এক্ষণে যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা

নাই; আর আগামী বর্ষার সময় ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভূমির অবস্থা কি হইবে, তাহাও কেহ বলিতে পারে না।

ভূমিকম্প ব্যাপারে দেশের একটী বিষয়ের ক্ষীণ পরীক্ষা হইয়া যাইতেছে—তাহা লোকের দেশসেবার প্রবৃত্তি ও পীড়িতের সেবাস্পৃহা। ইতিপূর্ব্বে দেশ মধ্যে বিবাদ ও বিদ্বেষের বহ্নি চতুর্দ্দিকে জ্বলিতেছিল। সমাজও রাষ্ট্রে বিরোধ চতুর্দ্দিকে বাড়িয়াই চলিয়াছিল; ভূমিকম্প আজ সকল বিরোধীদলের এক স্থানে সম্মিলনের অবকাশ দিয়াছে। হয়ত এই বিষম দলাদলি ও ঈর্ষার জঘন্য স্বার্থ ও আত্মদ্রোহের প্রতিফল স্বরূপেই ঐশ্বরিক বিধানে এই মহাদণ্ড দেশের উপরে পড়িয়াছে। পীড়িতের সাহায্যে আজ চতুর্দ্দিক হইতে স্বেচ্ছাসেবকের দল ছুটিয়াছে; সমাজসেবক ও ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরাই এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন; অন্যদিকে এক পক্ষে স্বয়ং রাজ-প্রতিনিধি ও অপর পক্ষে জাতীয় রাষ্ট্রনেতারা সাহায্যার্থে অর্থ দান ভাণ্ডার খুলিয়াছেন—স্বতন্ত্র ভাবে কলিকাতা ও বোম্বাই সহরের মেয়রেরা তাহাদের স্ব স্ব নামে ঐরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। বিদেশ হইতেও অর্থ সাহায্য আসিতেছে। কিন্তু যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার তুলনাতে এ সাহায্য অতি সামান্যই বলিতে হইবে। আর শুনা যায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জাপানের ভূমিকম্পে পাশ্চাত্য দেশ সমূহ হইতে যে সাহায্য আসিয়াছিল, তাহার তুলনাতে এবারের ভারতের জন্য তত্তদ্দেশীয় লোকের সাহায্য অতি অল্পই হইতেছে। বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কট এই দৈন্যের কারণ হইবে; আর ভারতের দুর্দ্দশা বিষয়ে বিদেশের লোকের অজ্ঞতাও আর এক কারণ হইতেপারে—সাধারণতঃ ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা বিদেশীয় লোকের নিকট প্রচারিত হয় না; যাহা হয়, তাহা অনেক সময় বিকৃত হইয়া যায়। সে যাহা হউক, বিদেশীয় সাহায্য ব্যতীতই সকল দেশেরই স্ব স্ব নিয়ন্ত্রণ শক্তি থাকা উচিত। বিহারের নেতা রাজেন্দ্র প্রসাদও সেদিন এই কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বাহিরের নানা স্থান হইতে বিহারের বিপন্ন লোকদিগের সাহায্যার্থে অর্থ আসিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃত দেশের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে বিহার-বাসীকে আত্ম-নির্ভর-শীল হইতে হইবে। কেবল ভূমিকম্পের দুর্দ্দশার প্রতীকার কল্পে নহে—সকল বিষয়েই দেশের লোকের সেরূপ হওয়া আবশ্যক। তাহা যে এদেশের কোনও প্রদেশের লোকই পারিয়া উঠে না, ইহাই দুঃখের বিষয়। নেপালের ভূমিকম্প বিহার অপেক্ষাও অধিক ক্ষতি করিয়া গিয়াছে; ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অর্থ সাহায্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্বয়ং প্রধান রাজমন্ত্রী তাহার ধন্যবাদ দানান্তে ঐরূপ দান গ্রহণেঅস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন; এবং নিজ শক্তিতেই তিনিই রাজ্যে ধ্বংসের ক্ষতির পূরণ করিতে যাইতেছেন। জাপান ভূমিকম্পের প্রতীকার কল্পে যে অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োগ করিয়াছে, তাহার তুলনাতে বৈদেশিক বহুল অর্থদানও অতি সামান্যই বলিতে হইবে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় ভারত কি সাধারণ কাজ কি দৈব বিপদপাত কোনও বিষয়েই সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী না হইয়া পারে না।

চাকুরীতে ভারতীয় প্রকৃতি।—

গভর্ণমেণ্টের চাকুরীতে ভারতবাসীদিগকে নিযুক্ত করিবার যে নীতি তাহাকে 'ইণ্ডিয়ানাইজেশন্ অব সার্বিস' বলে। রাষ্ট্রসংস্কারের পরিকল্পনাতে এই কথার উল্লেখ আছে; দেশীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে এই বিষয়ে আলোচনা হয়। ক্ষুদ্র চাকুরী গুলি প্রায় সকলই দেশীয় লোকের জন্য আছে

বড় বড় চাকুরী ও সৈনিক বিভাগে দেশীয় সৈন্যের নিয়োগ লইয়াই প্রধানতঃ এই কথা উঠিয়া থাকে। বড় চাকুরী পাইয়া, এমন কি মাঝারি চাকুরীতেও লোকের 'ইণ্ডিয়ানাইজেসন' বা ভারতীয় প্রকৃতি রক্ষা পায় কি ক্ষুণ্ণ হয়, এই বিষয়টীই বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, ভারতের একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, সমাজ ব্যবস্থা আছে, লোকের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক রীতি, নীতি, রুচি ও ধর্ম্ম আছে। তাহার যে সংরক্ষণ ও পরিপুষ্টি সাধন তাহাকেই প্রকৃত 'ইণ্ডিয়ানাইজেসন' বলা চলে। এই কালের উচ্চ চাকুরী-জীবিদিগের দ্বারা তাহা যেরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছে ও হইতেছে এমন আর কাহারও দ্বারা নহে। মধ্যবিত্ত চাকুরী জীবিরাও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যুক্ত পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করিয়াছে, গ্রাম বা পল্লী ছাড়িয়া নগরবাসী হইয়াছে। আর যাহারা উচ্চ উচ্চ পদবীতে অধিরূঢ় হন, সাহেব সুবাদের সমকক্ষ হইয়া চলেন, তাহারাত হাব ভাব, চাল-চলন আহার বিহার বাসস্থান ইত্যাদি সমুদয় বিষয়ে ভারতীয় প্রকৃতিকে উল্টাইয়া না ফেলিয়াই পারে না। জাতীয়তার প্রধান সম্বন্ধ যে বিবাহ, ইহাদের তাহাতে ত অনেকেই ভারতীয় প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গিয়াছে; যাহারা তাহা করে নাই, তাহারাও এমন সঙ্গিনী চাহে যহারা ভারতীয় প্রকৃতিকে পরিহার করিয়া বিজাতীয় ভাবে চলা ফিরা করিতে পারে। এইরূপ অসংখ্য অভারতীয় ভাব এই চাকুরী হইতেই প্রসূত—তাহাতে ভারতীয় প্রকৃতি কোথায়?

বাঙ্গালীর সৈনিক বৃত্তি।—

বাঙ্গালী যুবকদিগকে সৈনিক বিভাগে প্রবেশাধিকার দিবার জন্য একটী প্রস্তাব এইবারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতে উঠিয়াছিল। প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বঙ্গীয় সরকার এই প্রস্তাব এক্ষণে ভারত গভর্ণমেণ্টের সকাশে উপস্থিত করিবেন, ভারতীয় ব্যবস্থা-সভাতে ইহার যথারীতি আলোচনা হইবে। সরকার পক্ষ প্রস্তাবটী কিরূপ চক্ষে দেখিতেছেন তাহা অনিশ্চিত। বাঙ্গালার উপরে এখন চতুর্দ্দিকে যেরূপ প্রকোপ পড়িয়াছে, তাহাতে ইহা সহজে ধার্য্য হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বাঙ্গালী কাপুরুষ বলিয়াই একালে গণ্য হইয়া আসিতেছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর আর বাঙ্গালী সৈন্যের নাম কেহ শুনে না—সে যুদ্ধে বাঙ্গালী যে ভীরুতা ও বীরত্বের চূড়ান্ত পরিচয় দিয়াছে ইতিহাসের ক্ষীণ ইঙ্গিতে তাহাই প্রকাশ। তার পর আর সে ইংরেজের পল্টনে প্রবেশাধিকার পায় নাই। বাঙ্গালী যুবক শিষ্টশান্ত হইয়া স্কুল কলেজে অধ্যয়ন রত রহিয়াছে, উচ্চপরীক্ষায় পাশ করিয়া সরকারী অপর কার্য্যে প্রবেশ লাভ করিয়া সুখে ও নির্ব্বিঘ্নে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছিল। বাঙ্গালীর এই শান্ত প্রকৃতি বাস্তবিকই সামরিকতার বিরোধী। কিন্তু এক্ষণে বাঙ্গালীকে আর এক বিপরীত কারণেই সৈনিক বৃত্তির অক্ষম করিবার আশঙ্কা হইতেছে—কয়েক বৎসর হইল বাঙ্গালী যুবকে বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—ইহারা খেলার প্রতিযোগিতায় সকলের সমকক্ষ, সন্তরণ ও দৌড়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সাহসিকতায় অগ্রশীল, জাতীয় সকল আন্দোলনে অপর সকলের পথপ্রদর্শক, কষ্ট-সহিষ্ণুতায় সক্ষম, আর কেহ কেহ এক বিভ্রান্ত পথে চলিয়া দেশের ও দশের ঘোর সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিয়াছে,—অপরকে প্রাণে মারিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, নিজে মরিতে আরও কম অধীর।

বাঙ্গালীর এই বিপরীত প্রভৃতি আজ সমুদয় বাঙ্গালীকে কলঙ্কের ভাগী করিয়াছে, বুঝিবা অপরে তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। সেইজন্যই ভয় হয়, বাঙ্গালীর পক্ষে ব্যবস্থা পরিষদের এই প্রস্তাব মন্তব্যেই থাকিয়া না যায়,—কার্য্যে আসিবে কি না! সরকারের পক্ষে উদাসীনতার ভাব আলোচনা-পরিষদের প্রসঙ্গে কতকটা দেখাও গিয়াছে।

বাস্তবিক কিন্তু বাঙ্গালী চরিত্রে সামরিক ভাব অভাবের বিষয় নহে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উহা উজ্জ্বল করিয়াই রাখিয়াছে—মুগল বাদশাহদিগের প্রবল প্রতাপের সময় বাঙ্গালার স্বাধীন ভূপতিদিগের (বার ভূঞা) বিভিন্ন রাজ্যে বাঙ্গালী ফৌজগণই রাজ্য রক্ষা করিত; অনেক স্বাধীনতার সমর ইহাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে। ইহারাই মগ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের দৌরাত্ম্য হইতে দেশ রক্ষা করিয়াছে। পরে বৃটিশের অধীনে নব প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালার জমিদার গৃহে বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী সর্দ্দার ও লাঠিয়ালেরা প্রকৃত সৈনিকেরই কার্য্য করিয়াছে। আজ তাহাদের বংশ ধরের কর্ম্মের অভাবে নিস্তেজ ও নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে। আর তাহাদের স্থানে পশ্চিম দেশীয় বরকন্দাজগণ জমিদার গৃহের শোভা বর্দ্ধন করে। আধুনিক বাঙ্গালার বড় লোকেরা (?) আপন গৃহের দারোয়ান, চাপরাশি, খানসামা, বেয়ারা হইতে আরম্ভ করিয়া মুটে মজুর প্রভৃতি সকলের নিয়োগ বিষয়ে বাঙ্গালার এই কর্ম্ম-শীল বীরবংশধরগণকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালার নিদারুণ দারিদ্র্য ও দুর্ব্বলতা এই মহাপাপের অন্যতম পরিণাম! নূতন ব্যবস্থা পরিষদে এই সকল বিষয়ও আলোচনা হওয়া আবশ্যক। গভর্ণমেণ্টের শান্তি রক্ষায় পুলিশ এবং কারখানার মজুরদিগের নিয়োগে যাহাতে বাঙ্গালীর পল্লী হইতে এই লুপ্তপ্রায় সামরিক শ্রম-জীবিদিগের বংশধরগণকে আর উপেক্ষা না করিয়া চলে, তাহা দেখিতে হইবে।

ভদ্র ও শিক্ষিত যুবকগণ হইতেই এক্ষণে সৈনিক সংগ্রহের কথা হইতেছে। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় (১৯১৫ অব্দে) বাঙ্গালী যুবকদিগকে লইয়া চন্দন নগরে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রথম একটী সৈনিক দল গঠন করেন; ইহারা খাস ফরাসীভূমে ভার্দ্দূনের বহুদিন ব্যাপী ভীষণ সমরে অসাধারণ বীরত্ব ও রণকৌশল দেখাইয়া ফরাসী জাতির বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ বাংলার কতিপয় স্বদেশ প্রেমিকের আত্যন্তিক আগ্রহের ও আন্দোলনে সরকার পক্ষ ৪৯ নং বেঙ্গল রেজিমেণ্ট নামক সৈনিকদল গঠন করেন। ইহারা মেস-পটিমিয়ার যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। দুঃখের বিষয় যুদ্ধের অবসানে সেই বঙ্গ সৈনিক বাহিনীর অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে।

আধুনিক প্রণালীর যুদ্ধ কার্য্যে—যেখানে কেবল শারীরিক শক্তি নহে, যুদ্ধ-কৌশল, মনের তেজ ও বুদ্ধির বল অধিক আবশ্যক,—বাঙ্গালী যুবকদিগের বিশেষ অধিকারই আছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালার যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে সামরিক স্পৃহার নব উন্মেষ দেখা যায়। যে গর্হিত কর্ম্মে ইহারা এক্ষণে জাতির কলঙ্ক আনয়ন করিতেছে, তাহার ভিতরে যে নির্ভয়শীলতা ও ইহাদের সাহসিকতার সামরিক ভাবও আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না; বেকারগ্রস্থ যুবক এবং দুর্বিনীত দুঃশীল লোকও সকল দেশে সর্ব্ব কালেই থাকিবে; ইহাদের জন্য সামরিক বিভাগই উৎকৃষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র। সকল মানুষের মধ্যেই এমন কোন গুণ আছে, যাহাকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ও কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে পারিলে তাহার সুফল ফলে, আর তাহাতেই তাহাদের জীবন সার্থক

হয়। সামরিক গুণের লোক এক শ্রেণীর মধ্যে সকল দেশেই অত্যধিক সংখ্যক থাকে, বাঙ্গালাতেও আছে। উপযুক্ত ক্ষেত্র উন্মুক্ত না থাকাতে ইহারা বিপথগামী হইয়া নানাপ্রকারে দেশের অনিষ্ট সাধন মাত্র করিতেছে। উচ্চতর আর এক রাজনীতির দৃষ্টিতে আজ জগতের পারিপার্শিক অবস্থার দিকে চাহিলে এক্ষণে প্রত্যেক দেশকেই আত্মনির্ভরশীল হইয়া থাকিবার অত্যাবশ্যকতা অতি সহজেই বোধ হইতে পারে। বিভিন্ন রাজ্য ও রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে যে প্রতিযোগিতা, স্বার্থপরতা ও বিজিগীষার ভাব আজ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বপ্রকার শক্তিতে সকল দেশকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই বিষয়ে বাঙ্গালার রাষ্ট্র পরিষদের এই আত্মদৃষ্টি সময়োচিতই হইয়াছে।

দেশকর্ম্মীর কারাবাস।—

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু পুনঃ দুই বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি কলিকাতাতে কয়েকটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা রাজদ্রোহ সূচক বলিয়া ধরিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে এই দণ্ড হইয়াছে। পণ্ডিতজী অদ্যকার দেশের জাতীয় রাষ্ট্রকর্ম্মিদিগের অগ্রণী—প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র সংস্থার বিরোধী। ইহারা আপন রাষ্ট্রিক আদর্শ ও কর্ম্ম পদ্ধতির কাছে দেশের ধর্ম্ম ও সমাজনীতি বিসর্জ্জন দিতেও প্রস্তুত। শাসন কর্ত্তৃপক্ষের এখন যে কর্ম্মনীতি তাহাতে সকল বিরোধকারীকে দমন করাই ইহাদের বিধি, তাহার শক্তিও অসীম। কিন্তু ধর্ম্ম এখন অবজ্ঞাত, সমাজ বল হীন। রাষ্ট্র ক্ষেত্রে কেহ কিছু করিয়া উঠিতে না পারিয়া এই কর্ম্মীদিগের সমুদয় শক্তিই এখন ধর্ম্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে লাগিয়াছে। পরিণামে সমাজ-সংরক্ষণেই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এবং ধর্ম্ম রক্ষিত হইলেই আর সমুদয় রক্ষিত হয়,—অদ্যকার এসকল লোকের মনোবৃত্তিতে এই ধারণা স্থান পায় না। এই কর্ম্মীদিগের আন্তরিকতা আছে, ত্যাগ ও পরার্থপরতা অসীম—অনেক ধর্ম্মধ্বজী ও সমাজ-সুবিধা-ভোগীর তাহা নাই। ধর্ম্ম বা প্রকৃত দেশ-সত্তার সেবায় নিয়োজিত হইলে উহা সার্থক হইত। উত্তর বিহারে ভূমিকম্পে ইহাদের কর্ম্মপ্রবণতার এক উত্তম অবসর দান করিয়াছে। যে সকল অসংখ্য দেশকর্ম্মী আজ রাজনৈতিক কারণে আবদ্ধ বা নিগ্রহ ভোগ করিতেছে' আজ এ অবকাশে তাহাদের অভাব বোধ হইয়া থাকিবে। পণ্ডিত নেহেরু ভূমিকম্পের সংবাদ পাইয়াই পীড়িত স্থানে ছুটিয়া গিয়াছিলেন এবং নিজে কোদালী লইয়া ধ্বংসস্তূপ পরিষ্করণে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ দৈব বিপদে শত্রু মিত্র সকলেরই একত্র সমাবেশ ঘটিয়াছে। সকল প্রকার বিবাদ ভুলিয়া অন্ততঃ কতকদিন সকলকে একত্র সাধারণের হিতসাধন ব্রতে সম্মিলিত হইবার অবসর দিলে, তাহাতে রাজনৈতিক সদুদ্দেশ্যও সাধন হইতে পারিত ভূমিকম্পের দৈব সম্পাৎ এক মহান্ মঙ্গলে সার্থকতা লাভ করিত। কিন্তু দৈব যে অন্তরের মধুর গুণকে টানিয়া বাহির করিতে চাহে, কৃত্রিম লোক-নীতি তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া চলে—শক্তিমানের কঠোরতা তাহাকে নির্ম্মম করিয়া তুলে।

রাষ্ট্র-পরিষদে খদ্দর।—

খদ্দর বলিতে চরকায় হাতে কাটা সুতায় দেশীয় তাঁতে হাতে বুনানো কাপড় বুঝায়। এক সময় ইহা জগতের প্রধান পণ্য ছিল, ভারত তাহার স্রষ্টা ও প্রধান অধিকারী ছিল। একালে বিদেশীয় মহাযন্ত্র-প্রসূত বিপুলপরিমাণ বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় তাহার বিলোপ সাধন হইয়াছে। মৃতপ্রায় জাতির অবনতির প্রতিচ্ছবির মতনই এই জাতীয় শিল্পটিও মৃতপ্রায় হইয়াছে।

বিংশশতাব্দীর জাতীয় জাগরণের উন্মেষে এই জাতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের প্রতি লোকের ঈষৎ নজর পড়ে। পরে মহাত্মা গান্ধী যে অসাধারণ আন্দোলনে জাতির পুনর্মুক্তির সন্ধান করিয়াছেন, তাহাতে এই উটজ শিল্পটিকেই তিনি প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সাধন বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তদবধি এই লুপ্তনামা দেশীয় শিল্পটী পশ্চিম ভারতে সাধারণ লোকের মধ্যে তখনও প্রচলিত খদ্দর নামে সমুদয় ভারতে প্রসার ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। খদ্দর প্রচলন নিমিত্ত আন্দোলন ও প্রচার যথেষ্ট হইয়াছে। ফল তদনুরূপ হইয়াছে, একথা বলা চলে না। প্রতিবন্ধক ইহার অনেক হইয়াছে এবং এখনও আছে। যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইহা টিকিবে কি না—অথবা প্রতিক্রিয়াতে আরও ধ্বংসের মুখে পতিত হইবে, ইহাই সন্দেহ হইতেছে। ইহার প্রধান বাধা আধুনিক লোকের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি; দ্বিতীয় বাধা বর্ত্তমান যন্ত্র শিল্পের প্রতিযোগিতা; তৃতীয় বাধা বৃহৎ শিল্প পরিচালকদিগের অসততা। প্রথমতঃ দেখা যায় দেশের লোকদিগের ভোগবিলাস ও অতিমাত্র আয়াস প্রিয়তা—আধুনিক ভাবে অগ্রসর দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকেও এইজন্য মহাত্মার প্রচারিত খদ্দর আন্দোলনে বিরোধী হইতে দেখা গিয়াছে; এমন কি আজ যে সকল খ্যাতনামা ও বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তি মহাত্মার সামাজিক আন্দোলনে অস্পৃশ্যতা ও মন্দির প্রবেশ ইত্যাদি কার্য্য কায়মনোবাক্যে সমর্থন করিতেছেন তাঁহারাই তাঁহার চরকার ঘোর বিরোধ করিয়াছিলেন। আর যে সকল অবস্থাপন্ন লোকেরা ধনাঢ্যতা ও আভিজাত্য গৌরবে স্ফীত তাহারা ত খদ্দর স্পর্শই করেন না। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক বর্ত্তমান মিল বা কাপড়ের কল গুলির প্রতিযোগিতা। কলের কর্ত্তৃপক্ষ দিগের কাহারও মনে এমন ভাব আইসে নাই যাহাতে তাহারা তাহাদিগের বিপুল মূলধন এক একটী কারখানাতে একস্থানে না খাটাইয়া বিস্তারিত ভাবে দেশের অগণিত জনগণের মধ্যে চরকা ও তাঁতে বণ্টন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে খাটাইয়া দেশ মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কেন্দ্রে এই বস্ত্রশিল্পের উন্নতি বিধান ও সংরক্ষণে ব্রতী হয়—তাহার সমুচিত ব্যবস্থা বিধানে পরিণামে যে তাহারা আর্থিক লাভবানও হইতে পারে, তাহা ভাবিবার অবসর তাহাদের হয় নাই। পক্ষান্তরে এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক মহাত্মা গান্ধীকে এই কলের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা লক্ষ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য করিবার মানসিক অসংলগ্নতাও চাতুরী দেখাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ইহাতে সমুদয় আন্দোলনে যে দুর্নীতি মহাত্মার হাত দিয়াই প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাও এরূপ মহান্ ব্যাপারের পক্ষে কম অনিষ্টকর হয় নাই—বোম্বাইয়ের অর্থদাতা কলওয়ালারা যে মহাত্মার সমর্থন তাহাদের কলের পক্ষেই এই দানের প্রতিদানে পাইয়াছে, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। এই মিল কর্ত্তৃপক্ষদিগের আর একটী ঘোরতর অসততা যৎসামান্য বিশুদ্ধ খদ্দরের বাজারকে একবারে ধ্বংসের পথে লইয়া গিয়াছে—ইহারা হাতে প্রস্তুত বিশুদ্ধ খদ্দরের অনুরূপ মোটা কাপড় রাশি রাশি মিলে প্রস্তুত করিয়া বাজারে খাঁটি খদ্দর বলিয়া চালাইয়াছে! এই অসদ্ ব্যবসায়ে বিদেশীয় জাপানীরা বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে দেশীয় খাঁটি খদ্দর সংরক্ষণ কল্পে এই শেষোক্ত প্রতিবন্ধককারীদের প্রতিকূলে এক আইন পাশ হইয়াছে, যাহাতে কোনও ব্যবসায়ী বা মিলের মালিক মিলের প্রস্তুত খদ্দর নামীয় কাপড় দেশীয় হাতে প্রস্তুত খদ্দর বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিলে তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে। যে খদ্দর নাম একদিন সরকারের ত্রাসের কারণ হইয়াছিল, তাহার অবনতিতে আজ তাহারই সহায়ক হস্ত প্রসারিত।

আইনের আর এক দফা।—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে বাঙ্গলার রাজনৈতিক সন্ত্রাসের উচ্ছেদ সাধনার্থ ফৌজদারী আইন সংশোধন বিলে আর এক কঠোর দফার সন্নিবেশ হইল—ইহাতে বিশেষ করিয়া যাহাতে এই সন্ত্রাসকারীদিগের দলে আর নূতন লোকের মিশিতে বাধা জন্মে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। ভীতি-স্বরূপে ইহাদের চেষ্টাতে কাহারও প্রাণহানি না ঘটিলেও ঘটনা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত এই আইনে থাকিবে। এই আইনকে সাধারণ আইন বলিয়া ধরা যায় না—ইহার বিধানও সাধারণ নহে। তথাপি কৌন্সীলে কেহ কেহ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন—বলেন, আইনের কঠোরতা এদেশে এই নূতন চলিতেছে না, অতীত ঘটনা হইতে যদি ইহার যুক্তি-যুক্ততা ধরিতে হয়, তবে ইহার ফলাফল বিষয়ে নূতন আশা কিছু হয় না। তথাপি যে অবস্থা তাহাতে আইন করা এক উপায় ইহা বলিতেই হইবে। প্রকৃত উপায় খুজিতে হইবে বিষয়ান্তরে—দেশের যেই অবস্থাতে বাঙ্গলার যুবক মনে এইরূপ দুরাশয়তা স্থান পাইয়াছে তাহার প্রতিবিধান করাই সর্ব্বোপরি আবশ্যক। সেজন্য প্রচলিত শিক্ষা ও লোকের আর্থিক দৈন্যকে প্রধান ভাবে দায়ী না করিয়া পারা যায় না।

রাষ্ট্র-চক্রের প্রতিক্রিয়া।—

আজ বিশ্বের সকল শক্তিশালী জাতিই মুখে শান্তির কথা বলিতেছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সকলে সমর ভীতিতে পীড়িত—অনেকে সমর আয়োজনও করিতেছে। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে নির্য্যাতিত জাতিদিগের মধ্যে প্রতিহিংসাবৃত্তির নিবৃত্তি কখনও যায় নাই; তাহারই ফলে আজ জ্যারম্যানীতে নাজিদিগের আবির্ভাব—ভার্সিলিসের সন্ধিসর্ত্তকে অমান্য করাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ও কার্য্য হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে ফরাসীর সহিত তাহার প্রধান দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের একটা ঐতিহাসিক ক্রম আছে—নেপোলিয়নের বীরপণাই সর্ব্ব প্রথম জ্যারমানের জাতীয় সত্তায় আঘাত প্রদান করে, সুপ্রসিদ্ধ ফ্রাঙ্কো প্রাসিয়ান সমরে জ্যারমানরা তাহার প্রতিশোধ লয়—বিগত মহাসমরে ফরাসী তাহারই আবার প্রতিক্রিয়া দেখাইয়াছে। নাজি প্রতিক্রিয়া ইহারই পরবর্ত্তী ক্রম নির্দ্দেশ করিতেছে।

স্বামী শিবানন্দ।—

রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দে বৃদ্ধ বয়সে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। যে সকল ভাগ্যবান পুরুষ পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের সংস্পর্শ লাভে ধন্য হইয়াছিলেন স্বামীজি তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। যে পরাজ্ঞান ও অধ্যাত্ম সাধনা ভারতের বৈশিষ্ট্য তাহা এ-কালে একমাত্র সাধু-মহাপুরুষদিগকে অবলম্বন করিয়াই রহিয়া গিয়াছে; এবং এই ঘোর বিপদপাতেও তাহা থাকিয়া যাইবে, এ ভরসা ইহারা দিয়া যাইতেছেন। নতুবা যে জড়বাদের তীব্র প্রভাব, কুশিক্ষা ও অবিদ্যার অতিমাত্র প্রচলন, দৈহিক সুখলিপ্সা ও রুচির বিকার এবং সাহিত্য ও কলার বিকৃত বিলাসে আজ দেশ ছাইয়া গিয়াছে, তাহাতে অধ্যাত্ম সাধনার লেশ মাত্র আর বিদ্যমান থাকিবার কথা নয়—যখন বৈদেশিক শিক্ষার মোহে দেশের শক্তিমান লোকেরাও মুগ্ধ ও তাহারই প্রচার ও প্রচলনের নিমিত্ত তাহাদিগের কায়মনচিত্ত নিয়োজিত করিয়াছিলেন, ধর্ম্মের নামে লোকে দেশের চির আচরিত সাধন-

পন্থা ত্যাগ করিয়া পরকীয় ভাবে উদ্ভ্রান্ত, স্বাধীন চিন্তা বলিয়া উচ্ছৃঙ্খলতাকে বরণ করিয়া লইতেছিল, তখনই রামকৃষ্ণ দেবের আবির্ভাব—সেই নিরক্ষর আধুনিক প্রভাব ও শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হিন্দু দেববিগ্রহের পূজারী নিভৃতজীবন ব্রাহ্মণের মধ্যে যে অধ্যাত্ম জ্যোতি প্রকাশ পাইয়াছিল তাহার আভায় যাহারা ক্ষণিকের তরেও বসিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাই ধন্য হইয়াছিলেন—যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ করিতে পাইয়াছিলেন তাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার মহান কার্য্যের অধিকার লাভ করিয়াছেন—রামকৃষ্ণ মিশন ইহাদের সৃষ্ট ও ধার্য্য বিষয়। স্বামী শিবানন্দ মিশনে "মহাপুরুষ" বলিয়া কথিত হইতেন। সাধনার প্রখরতায় ও সিদ্ধির মাধুর্য্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন কি না জানি না—ভবিষ্যতে তাঁহার স্থানে আসিবার কেহ আছেন কিনা তাহাও সন্দেহ। আধুনিকতার প্রভাব অদ্যকার সাধু সংস্থাগুলিকেও আক্রমণ করিয়াছে, এজন্যই আশঙ্কা।

গোসেবা—হননে কি পূজায়।—

হিন্দুরা গোসেবা করে—গোমাতাকে পূজ্য বলিয়া জ্ঞান করে—গোমাংস ভক্ষণ করে না অধিকন্তু গো-খাদককে হেয় মনে করে—গোমাংস ভক্ষণ শাস্ত্র ও রীতিবিরুদ্ধ মনে করে; ইহা লইয়া আজ কাল একপ্রকার বিরুদ্ধ গবেষণা চলিয়াছে। প্রাচীন ও দেশচলিত মতবাদ বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্ম নীতি ও আচারকে উল্টাইয়া একটা নূতন কিছু করা—একালের এদেশের গবেষণাকারীদের মৌলিকতার স্থায়ী একটী মাপ কাঠী। এই ভাবেই পাশ্চাত্যের প্রভাব ও ও অনুকরণে পরিপুষ্ট আধুনিক মনোবৃত্তির দ্বারা অনেক ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইয়াছে, অনেকে তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি আবার রাজনৈতিক আদর্শ ও আকাঙ্খাতে লোকের মন অতিমাত্র প্রলুব্ধ। হিন্দু রীতি নীতি ও ধর্ম্ম বিশ্বাসকে তাহা লাভের পক্ষে প্রতিবন্ধক মনে করিয়া ইহারা সর্ব্বপ্রথম তাহারই উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। চলিত সংবাদ পত্রগুলি প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়াই ব্যস্ত। ইহারা রটনা (propaganda) ব্রত লইয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন—রটনার মর্ম্মই মিথ্যাকে সত্যের আবরণে লোকের চক্ষে ধরিয়া তাহাদিগকে স্বমতে অনয়ন করা বা স্বকার্য্য সিদ্ধি করা। এযুগে বড় বড় রাষ্ট্র-সংস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র ঔষধ বিক্রেতা পর্য্যন্ত সকলেরই নাকি এই রটনা প্রধান সাধন ও অবলম্বন।

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার ইংরেজী দৈনিক এডভান্স পত্রিকাতে "কাউ এণ্ড ডিভিনিটি" বা হিন্দুদের 'গোকে দেবজ্ঞানে পূজা' বিষয় কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার একটীতে স্যার পি,সি, রায় যাঁহাকে লোকে আচার্য্যদেব বলিয়া বিশেষ নামে আখ্যাত করেন, অতি মাত্র ব্যস্ততা দেখাইয়া একটী 'রিজয়েন্ডার' বা উত্তেজনাসূচক সমর্থন প্রদান করিয়াছেন—বলিতে চাহেন—'গোঘ্ন' কথাতেই হিন্দুরা যে গোকে পূজা করিতেন না পরন্তু হনন ও ভক্ষণ করিত, তাহার প্রমাণ হয়। "আমি এবিষয়ে পরলোকগত প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ স্যার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি কোন দ্বিধা না করিয়া আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, "যস্মৈ গো হন্যতে স গোঘ্নঃ" অর্থাৎ প্রাচীনকালে অতিথি গৃহে আগমন করিলেই গোহত্যা করিয়া তাহার পরিবেশন করা হইত, এজন্য অতিথির নামই গোঘ্ন। আচার্য্যদেব আরও বলেন—ভবভূতির উত্তর রাম চরিতে

আছে—বশিষ্ঠ ঋষি একদিন বাল্মিকীর গৃহের ছাদের নীচে ("under the roof of"—তপোবন !) আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি ভোজন কালে গোবৎসের মস্তক চর্ব্বণ কালে মর্ম্মর শব্দ করিয়া গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে যজ্ঞে গোহত্যার বিবরণ আছে। প্রাচীন ভারতে গোমাংস ভক্ষণ প্রথা চলিত ছিল, স্বর্গীয় রাজেন্দ্র লাল মিত্র এবিষয় একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।—এই সকল কথা লইয়াই আচার্য্য দেব অতিমাত্র ব্যগ্রতার সহিতই একালে ও এদেশে গোভক্ষণের সমর্থনে অগ্রসর হইয়াছেন।

প্রাচীন ভারতে গোভক্ষণ চলন ছিল কিনা তাহা বিতর্কের বিষয় ; একালে হিন্দুদের গো-ভক্ষণ নিষিদ্ধ এবং ইহা হিন্দুত্বেরই একটী প্রধান লক্ষণ একথা নিশ্চিত। প্রাচীনকালের অনিশ্চিত বিষয়ের দোহাই না দিয়া এযুগেই লোকের রীতি নীতি ও স্বাস্থ্য এবং দেশের প্রকৃতিতে গোভক্ষণ সঙ্গত কিনা, এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইলেই আচার্য্য দেবের পক্ষে অধিকতর শোভন হইত। তাহা না করিয়া পরের মুখে ঝালখাইয়া কোন গুরুতর বিষয়ে হঠাৎ মতামত প্রকাশ করা একালেরই উপযোগী হইয়াছে। বৈদিক যুগে কি ছিল কি না ছিল, তাহার খোজ বা খবর কেহ রাখিতে চাহেন না, প্রাচীন ভারতের কৃষ্টি বা সাধনাতে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসও ইহাদের কাহার নাই; নিজ মত বা স্বপক্ষ পরিপোষণের সুবিধা হইলেই তাহার দোহাই, নচেৎ তার নামও করা হেয় জ্ঞান হয়। "গোঘ্ন" ব্যতীত আরও কত শত শত কথা রহিয়াছে, যাহার অর্থ ও মর্ম্ম সম্পূর্ণ অবিতর্কিত—যাহাতে হিন্দু সাধনার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি স্পষ্ট রূপে বুঝা যায়। যাহা একালের আচরিত ইহাদের আচার নীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, তাহার নাম ত একবার ভাবিতেও ভয় হয়। এক একটী শব্দের প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিতে কি ইহাদের সহিষ্ণুতা বা সাহস আছে? এই গো শব্দেরই সকল কথার মর্ম্ম কি ইহারা উদ্ঘাটন করিতে যাইবেন? প্রায় এক বর্ষ পূর্ব্বে স্বামী মহাদেবানন্দ জী এই বিষয় যে তত্ত্ব নির্ণয় 'শিবম্' পত্রিকাতে করিয়াছিলেন, এস্থলে তৎপ্রতি পাঠকগণের মনোযোগ একবার আকর্ষণ করা যাইতে পারে—

"গো" শব্দের তত্ত্বনির্ণয়।—

বেদে ও তৎসমসাময়িক ইরাণীয় জেন্দেবাস্ত গ্রন্থে "গো" শব্দের প্রয়োগ আছে। ইরাণীয়গণের "গো" শব্দ **প্রাণীবাচক** এবং তাঁহাদের চক্ষেও গো পূজ্য। বধের অযোগ্য। বর্ত্তমান পার্শী সমাজ গোবধ-বিহিত মনে করেন না।

সিরোজা ১। সিরোজা ১১।১৪ প্রভৃতিতে গো পূজ্য। গো হইতে সব প্রাণীজাত। জেন্দেবাস্ত "পুরুষ রেষ গো" "এবতৎ গো" ইত্যাদি উক্তি আছে; রেষ শব্দ রেতঃ বাজী। সেই গো হইতে ২৮০ প্রকার প্রাণী উৎপন্ন। Darmister ঐ সকল স্থানে গো শব্দ animal অনুবাদ করিয়াছেন। ইংরাজী verb to go গমনার্থক গম্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। cow শব্দ Kour Gous শব্দ হইতে উৎপন্ন। Cat, Cattle শব্দ 'কটগত্যা" গমনশীল এই অর্থে নিষ্পন্ন। Gew earth গো শব্দ হইতে আগত। যাহা গমনশীল তাহাই গো। বেদে গমনশীলতাকে অনুলক্ষ্য করতঃই গোশব্দ ব্যবহৃত। অমরসিংহ প্রণীত অমরকোষাভিধানেও গো শব্দ পশু, বাটী ও **অঘ্ন্যা অর্থাৎ হননের অযোগ্যা** পাওয়া যায়। স্বর্গেষু পশু বাগ্‌বজ্রদিগ্‌ নেত্র ঘৃনিভূজলে। লক্ষ্য দৃষ্ট্যা স্ত্রীয়াং পুংসি গৌঃ ইতি অমরঃ॥

মাহেয়ী সৌরভেয়ী গৌ রুস্রা মাতা চ শৃঙ্গিনী
অর্জ্জুন্যঘ্ন্যা রোহিণী স্যাৎ ইতি অমরঃ।
গৌঃ স্বর্গে চ বলীবর্দ্দে রশ্মৌ চ কুলিশে পুমান্
ইতি অমরঃ।

ঋগ্বেদে গো শব্দের প্রয়োগ

১ মণ্ডল ১৯ সূক্ত ১ মন্ত্র

প্রতি ত্যং চারু মধ্বরং গোপীথায় প্রহূয়সে।
মরুদ্ভি রগ্ন আগহি ॥

এখানে "গোপীথায়" অর্থ সোমপানায়।

অস্তার ইষুং দধিবে গভস্ত্যোরণং তশুমা
বৃষ খাদয়ে নরঃ। ১।৬৪।১০

এখানে "বৃষ খাদয়ে" অর্থ সোমপানায়।

ত্বমায়সং প্রতিবর্ত্তয়ো গোদিবো অশ্মানমুপনীত মৃভ্যা। ১।১২১।৯—এখানে "গো" অর্থ বজ্র।

যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ—এখানে "গাবো" অর্থ "নক্ষত্রসকল"।—১।১৫৪।৬

গোভির্মিমিক্ষুং দধিরে সুপারমিন্দ্রং জ্যেষ্ঠায় ধায়সে গৃণানা। ৩।৫০।৩—এখানে "গোভি" অর্থ "বেদবাক্য দ্বারা"।

Wi'son সাহেব গো অর্থ Cattle কহিয়াছেন।

ত্ত্বদ্ধি ইবাং মন্থুষে গা অবিন্দদ হন্ন হিং পপিবাঁ ইন্দ্রো অস্য। ৫।২৯।৩—এখানে "গা" অর্থ ধেনু (বৃষ্টিলক্ষণা)

বিয়ু মৃধো জনুষা দান মিন্বন্ন হন্। গবামঘবনৎসং চ কানঃ॥ ৫।৩০।৭—এখানে গব অর্থ বজ্রেন।

মরুতাং পুরুতমমপূর্ব্যম গবাম্ সর্গমিব হ্বয়ে—২।৫৬।৫ এখানে গবাং অর্থ উদকানাং।

ত্রিধাতু গা অধিজয়াসি গোষ্বিন্দ্র দ্যুম্নং সর্ব্বদ্ধেস্মে। ৬।৩৫।২—এখানে গা অর্থ Cattle এবং গোষু অভিসন্ত্রিযু শত্রুষু।

প্রব্রহ্মৈতু সদনাদৃতস্য বিরশ্মিভিঃ সমৃজে সূর্য্যোগাঃ। ৭।৩৬।১—এখানে গা অর্থ বৃষ্টির জল।

গোভির্বাণোঃঅজ্যতে সোভরীণাং রথে কোশেহিরণ্যয়ে গোবান্ধবঃ যুজাতাস ইষে ভুজে মহান্তেনঃ স্পর সে নু। ৮।২০।৮—এখানে গোভিঃ অর্থ স্তুতি শব্দের অথবা মরুদ্ভি এবং গো বান্ধব অর্থ পৃশ্নিমাতৃকাঃ।

অগ্নের্বর্ম পরিগোভির্ব্যয়স্ব। ১০।১৬।৭—এখানে গোভিঃ অর্থ চর্ম্মে।

আগুন্‌রশ্মিং তুব্যোজসংগেজঃ ৪।২২।৮—ইহার অর্থ as a horse is made to run fast by forcibly pulling the rein, এখানে গো শব্দ অশ্ববাচি।

বর্দ্ধয়তমোষধীঃ পিন্বতংগা অবরৃষ্টিং সৃজতং জীরদানু। ৫।৬২।৩—এখানে গা অর্থ cattle গবাশ্বাদীন্।

যস্য গাবা রুরুষা সূয় বস্যু অন্তরূ চরতো রেরিহাণা। ৬।২৭।৭—এখানে গাব অর্থ অশ্বেঃ।

ঈযুর্গর্গাবোনয়বসাদ গোপাযথা কৃতমভি মিত্রং চিতাসঃ। পৃশ্নি গাবঃ পৃশ্নি নিঃপ্রষিতাসঃ শ্রুষ্টিং চক্র নিযুতো বস্তুয়শ্চ।—৭।১৮।১০ এখানে গাব অর্থ মরুদ্‌গণের ঘোড়া এবং পৃশ্নিগাবঃ অর্থাৎ মরুদ্‌গণ।

গবে চ ভদ্রং ধেনবে বীরায়। ৮।৪৭।১২—এখানে ধেনু ও গো শব্দের প্রয়োগ থাকায় গো অর্থ cattle গ্রহণ অনির্ব্বাচ্য।

নিম্নলিখিত মন্ত্রে গো অবধ্য অঘ্ন্যা থাকা পরিদৃষ্ট হয়ঃ—

প্রশংসা গোষঘ্ন্যং ক্রীড়ং যচ্ছর্ধো মারুতং জম্ভে রসস্য বা বৃধে॥ ১।৩৭।৫

অদ্ধিতৃণমঘ্ন্যো বিশ্বদানীং পিবশুদ্ধমুদকমাচরন্তি। ১।১৬৪।৪০

শুচিঘৃতং নতপ্রমঘ্ন্যায়াং স্পার্হা দেবস্য মংহ নেব ধেনোঃ। ৪।১।৬

ইষান বর্ধদঘ্ন্যা পয়োভির্যুয়ং পাত স্ব স্তভিঃ সদানৈঃ। ৭।৬৮।৯

অভী মমঘ্ন্যা উতশ্রী নপ্তিঃধনবঃ শিশুং সোমমিন্দ্রায় পাতবে। ৯।১।৯

যো অঘ্ন্যায় ভবতি ক্ষীরমগ্নে তেষাং। ১০।৮৭।১৬

অনেক "গোঘ্ন" শব হইতে অতিথি আগমনে গো হিংসা হইতে বলিতে চাহেন, তাহা ঠিক নহে। গো অর্থাৎ গাং পৃথিবীং পদ্ভ্যাঃ হন্তি ইতি গোঘ্ন—যিনি অহরহ পৃথিবীতে পদাঘাত করিয়া বেড়ান তাঁকে গোঘ্ন বলা হইত। তাঁহারই অপর নাম অতিথি অর্থাৎ দুই তিথি এক স্থানে থাকেন না অনবরত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন যিনি তিনিই চতুর্থাশ্রমী।

অমর সিংহের সময়েও গোশব্দ পশুবাচক ও অঘ্ন্যা বলিয়া উক্ত। পাশ্চাত্য শিক্ষা মোহে সেই চির পরিচিত অর্থ ত্যাগে অনর্থকর অর্থ গ্রহণে কাহারও রুচি ঘটিয়া থাকিলে তাহা এতদ্বারায় সংশোধিত হইবে আশা করা যায়।

কেহ বৃহদারণ্যকের ৬।৪।১৮ মন্ত্রে "ঔক্ষণে বার্ষভনেবা" বাক্য দৃষ্টে সন্দিহান হইলে তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই বৃষ ও উক্ষ সাধারণতঃ প্রতিশব্দ গণ্য হইলেও এস্থলে বিকল্প পরিদৃষ্ট হয়। তথায় বৃষ্ ধাতুর পানার্থ গ্রহণে অর্থাৎ yet sucking milk এবং উক্ষ সেচন সমর্থ অথবা শৃঙ্গযুক্ত বা শৃঙ্গহীন সেচন সমর্থ পশু অর্থ হইবে। বৃষ শব্দ হইতে ইংরাজী Bull Bullaci Buraca Brihsa ইত্যাদি পদ এবং তাই Bull frog, Bull fly, Bull terrierz ইত্যাদি শব্দ পরিদৃষ্ট হয়। বৃহদ্ আরণ্যকে ১।৪।৪ মন্ত্রে বড়বেতরী ভবদ্ অশ্ব বৃষ ইতরো ব্যবহার আছে। বেদে ইন্দ্রকে বৃষ বলা হইয়াছে। মনুষ্যকেও বৃষ বলা হইয়াছে, সোমকেও বৃষ বলা হইয়াছে, পশুকেও বৃষ বলা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ১।৬৪।১০ মন্ত্রে "বৃষ খাদয়" সোমরসার্থে প্রয়োগ দেখান হইয়াছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ করা ঠিক নয় জন্য পাঠককে এইমাত্র দিগ্‌দর্শন করাইয়া ক্ষান্ত হওয়া গেল।

———

ধর্ম্মজীবনে ভারতের বৈশিষ্ট্য

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিদ্যাবিনোদ।

ধর্ম্ম ব্যতীত মানুষ তথাকথিত কোন সভ্য সমাজেই চলিতে পারে না। যাহারা বনে জঙ্গলে বাস করে, তাহারা ধর্ম্মের কোন ধার ধারে না; তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু সভ্য বা অৰ্দ্ধসভ্য নামধেয় মানুষ জানিতে চায় যে, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে? এবং কোথায় যাইবে? তাহারা এমন কি একটী বিশ্বাস চায়—যাহা অবলম্বন করিয়া অশেষ দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।

এখন জিজ্ঞাস্য—সেই বিশ্বাস কোথা হইতে পাওয়া যাইবে? উহার একমাত্র উত্তর—সুমহান্ ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই তাহা মিলিবে। মানুষ শুধু ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া—ধ্রুবতারা ধরিয়া জীবনের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ লাভ করিতে পারে। যেহেতু মানুষের মনুষ্যত্বের চরম বিকাশের মার্গ-দর্শকই হইল—'ধর্ম্ম'।

এই 'ধর্ম্ম' কথার মূল কি, অর্থাৎ কিরূপে 'ধর্ম্ম' কথার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাই দেখিব। পূর্ব্বে যে বিশ্বাসের কথা বলা হইয়াছে, আমার মনে হয়, সেই বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল*। সাধারণতঃ দুইটী বিশ্বাস হইতে 'ধর্ম্ম'কথার উৎপত্তি হয়। প্রথম বিশ্বাস—এই দৃশ্যমান জগৎ ও জীবগণ কিরূপে উৎপন্ন হইল? দ্বিতীয় বিশ্বাস—জীবগণ মৃত্যুর পরে কোথায় যায়? প্রথম বিশ্বাস হইতে জগতের কর্ত্তাস্বরূপ ঈশ্বর এবং সেই সঙ্গে দেবতা স্বীকৃত হইয়াছেন। আর দ্বিতীয় বিশ্বাস হইতে প্রেতলোক, পরলোক প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। ফলতঃ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি নানাবিধ উপায়েই এই প্রশ্ন দুইটীর মীমাংসা করিয়াছেন। তাহাতেই সমগ্র বিশ্বে বিবিধ ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। তবে সকল জাতির ধর্ম্মের বিশেষত্ব একরূপ নহে। পরে যথাস্থানে তাহা বলিব।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে "ধর্ম্ম" জিনিষটী (যদিও উহা জিনিষপদবাচ্য নহে) কি, সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে চাই। প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, "ধর্ম্মতত্ত্ব" অতীব জটিল ও কঠিন বিষয় এবং উহা বলিতে যে বিদ্যাবুদ্ধি ও শক্তির প্রয়োজন, তাহা আমার নাই। ইহা 'পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের ন্যায়' দুঃসাহস হইলেও সাধুগণের মার্জ্জনীয়—"ক্ষমা নাশাহি সাধবঃ।"

'ধর্ম্ম' কি, তাহা এক কথায় বুঝান যায় না। সাধারণতঃ বিবিধ অর্থেই ধর্ম্মকথার প্রয়োগ হইতে দেখা যায় এবং এসম্বন্ধে সুপ্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত নানা মুনির নানা মত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমেই দেখা যাক্, ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কি? ইহার ব্যুৎপত্তি অতি সুন্দর। 'ধৃ' ধাতু 'মন্' প্রত্যয়যোগে, ধর্ম্ম'শব্দ নিষ্পন্ন। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ—ধারণ বা পোষণ করা। অতএব যাহা বিশ্বের সকলকে ধারণ, পোষণ বা রক্ষা করে, তাহাই "ধর্ম্ম"।

*বিশ্বাসের গোড়ার কথা—সত্য (যার সত্তা আছে, তাহাই সত্য)। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেনঃ—"সত্যেতে ধর্ম্মের উৎপত্তি, দয়াতে বৃদ্ধি, ক্ষমাতে স্থিতি এবং লোভেতে বিনাশ হয়।

—"ধারণাৎ ধর্ম্ম উচ্যতে।" এই ধারণ হেতুই "ধর্ম্ম"—এই সংজ্ঞা হইয়াছে। আমাদের পঞ্চম বেদ "মহাভারতে"ও ঐরূপ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

"ধারণাৎ ধর্ম্ম ইত্যাহুঃ ধর্ম্মোধারয়তে প্রজাঃ।
যৎস্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥"

ইহার ভাবার্থ—ধর্ম্ম প্রজাসমূহকে ধারণ ও পোষণ করেন। সুতরাং যাহা ধারণসংযুক্ত তাহাই 'ধর্ম্ম'—ইহা সুনিশ্চিত।

ইহজীবনের যাহা কিছু সুখশান্তি, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ লাভ—সমস্তই ধর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধ হয় [ইহা আমাদের প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ হইতে সাধু মহাপুরুষগণ পর্য্যন্ত সকলেই বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সেই ভাবেই ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়াছেন। পৃথিবীর আর কোন দেশেই এরূপ নাই। ইহা ভারতের এক বৈশিষ্ট্য]। তাই বৈশেষিক দর্শনকার মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন :—

"যতো বা সাক্ষাদভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"

যাহা হইতে সাক্ষাৎ উন্নতি ও মুক্তির সিদ্ধি হয় অর্থাৎ যাহাতে নিজের ও সমাজের—দুইয়েরই উন্নতি হয়, তাহাই 'ধর্ম্ম'। বশিষ্ঠসংহিতায়ও এই মতের পরিপোষক উক্তি লিখিত আছে—"যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" যাহাতে ইহলোকের ও পরলোকের উন্নতি (কল্যাণ) হয়, তাহাই ধর্ম্মপদবাচ্য।

ভগবান্ শঙ্কর তদীয় গীতাভাষ্যে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন :—

'দ্বিবিধে হি ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ, তত্রৈক জগত স্থিতিকারণং প্রাণিনাং নিঃশ্রেয়স হেতুর্যঃ স্বধর্ম্মঃ।" অর্থাৎ 'জগতের স্থিতিকারণ এক বেদোক্ত ধর্ম্মের দুই রূপ :—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্ম। প্রবৃত্তিরূপ ধর্ম্ম প্রাণিগণের উন্নতি এবং নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্ম মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ।' (১)

ভগবান্ মনুর মতে—ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ—এই ১০টী ধর্ম্মের লক্ষণ ("ধৃতিক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"—মনুসংহিতা)।

আমাদের শাস্ত্রে আরও লিখিত আছে যে,—

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥"

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আপন আত্মার প্রিয়,—এই ৪টি ধর্ম্মের লক্ষণ। অন্যত্র আবার উক্ত হইয়াছে :—'যাহাতে জীবের মঙ্গল সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম।' ("য এব শ্রেয়স্কর, স এব ধর্ম্মশব্দেনোচ্যতে।")

উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সকলেই ধর্ম্মকে জীবের শ্রেয়ঃ ও নিঃশ্রেয়স লাভের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা কিছু মঙ্গলকর—

---

(১) প্রবৃত্তি মূল কর্ম্ম আপাততঃ মনোহর মনে হইলেও নিবৃত্তিমূল সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফলই বেশী শান্তিপ্রদায়ী এবং জীবমাত্রেরই পরিণামে শান্তিই একমাত্র কাম্য।

যাহা কিছু হিতকর—যাহাতে নিজের ও সমাজের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহাই 'ধর্ম্ম'।

আমাদের ধর্ম্মের মূল—ধর্ম্মের প্রাণই হইল—শাস্ত্র (বিধিনিষেধসূচক বাক্যই 'শাস্ত্র'। বলা বাহুল্য যে, এক এক বিষয়ের এক এক শাস্ত্র; জ্ঞানসমুদ্র মন্থন করিয়া এক এক শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। শাস্ত্রে বিধিনিষেধের অন্ত নাই; সমস্তের কারণ বুঝি না। কারণ, এখন আমরা কালান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি এবং দেশান্তরে বাস করিতেছি)—শাস্ত্রই ধর্ম্মতত্ত্বপ্রদর্শক চক্ষুঃস্বরূপ। পক্ষান্তরে আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ অনন্ত—অসীম। সেই অসীম শাস্ত্রসমুদ্রে অনন্ত রত্ন বিদ্যমান। উহা মন্থন করিয়া অনন্ত রত্নের সন্ধান করা খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। শাস্ত্রের বিশালতা দেখিয়াই দূর হইতে অনেকেই ফিরিয়া আসে। তথাপি আমরা একথা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, শাস্ত্র-সমুদ্রে যিনি যে রত্নের সন্ধানী হইয়া ডুব দিবেন, তিনি তাহাই পাইবেন। অর্থাৎ যিনি যে ভাবের ভাবুক (যেহেতু ভাবই ধর্ম্মের প্রাণ), আমাদের শাস্ত্রে তাঁহার জন্য তদনুরূপ বিধি ব্যবস্থাই রহিয়াছে। তাহাতে না আছে, এমন বিষয় নাই; অর্থাৎ সমস্তই আছে। [বলা বাহুল্য যে, এখানেও ভারতের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।] কিন্তু যেমন-তেমন ডুবারু হইলে চলিবে না; উপযুক্ত জহরীও হওয়া চাই। নচেৎ হীরকে কাচ-ভ্রম এবং কাচে হীরক-ভ্রম হইয়া মহা অনর্থ ঘটিতে পারে। তাহার ফলে, কাহারও 'সর্ব্বনাশ' আবার কাহারও বা 'পৌষমাস হইতে পারে।

যাহাই হউক, ধর্ম্মরক্ষা করিতে হইলে, ধর্ম্মের মূল যে শাস্ত্রে—উহার শুধু শব্দবিদ্‌মাত্র না হইয়া প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ হইতে হইবে। কেবল বহির্লক্ষ্য দেখিয়া শাস্ত্রে বিচার করা উচিৎ নহে। স্বল্পবুদ্ধি নিম্ন অধিকারীর জন্য বহির্লক্ষ্যের এবং সাধন পথের যোগী ও জ্ঞানী পথিকের জন্য অন্তর্লক্ষ্যের ব্যবস্থা আমাদের শাস্ত্রে রহিয়াছে। ইহা কেবল ভারতেই সম্ভব; পৃথিবীর কোন জাতির ধর্ম্মেই আর এরূপ দেখা যায় না। ইহাও ভারতের আর এক বিশেষত্ব।

এখানে ইহাও বলিয়া রাখি যে, বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্রগ্রন্থরাজিকে সমাশ্রয় করিয়াই জগতের যাবতীয় মহান্ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা—শাস্ত্রাচারাদি (সদাচার বুঝিতে হইবে; অন্ধ আচার নহে) অবলম্বন করিয়াই সকল ধর্ম্ম বিশেষতঃ আমাদের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সেই ধর্ম্ম আচরণের জিনিষ—অনুষ্ঠানের সামগ্রী। শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সদাচার পালনে ধর্ম্মভাব আবির্ভূত হয়। ভগবান্ মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"আচার প্রভবো ধর্ম্মঃ।"

বশিষ্ঠ সংহিতায়ও এরূপ লিখিত আছে যে;—

"আচার প্রভবো ধর্ম্মঃ ধর্ম্মাদায়ুঃ বিবর্দ্ধতে।
এতদ্ যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং স্বস্ত্যয়নং মহৎ॥"

ইহার অর্থ এই যে,—আচার হইতে ধর্ম্ম হয়, ধর্ম্ম হইতে আয়ুঃবৃদ্ধি হয়। আচার (সদাচার) যশোবর্দ্ধক, আয়ুষ্কর, স্বর্গসাধক ও কল্যাণকর।

অতএব ইহা একরূপ নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে যে সদাচার রক্ষায় ধর্ম্মরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষায় সমাজরক্ষা সমাজ রক্ষায় হিন্দুস্থানের (ভারতের) রক্ষা। অন্যথায় কর্ম্ম-জীবনই বলুন আর ধর্ম্ম-জীবনই বলুন (আমাদের পুরাণকার ভারত ভূমিতে কর্ম্মভূমি ও ধর্ম্মভূমি বলিয়া গিয়াছেন

এ প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি যে, পাশ্চাত্য দেশ বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়া সত্যকার কর্ম্ম-জীবন পাইয়া উহা সারা পৃথিবীতে তাহার কর্ম্ম-দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া তদ্দ্বারা কিছু কিছু দৈবীসম্পদ্ পাইয়াছে মনে হয়; কিন্তু তাহাতে যে পরিমাণ আসুরী সম্পদ্ লাভ হইয়াছে, উহার তুলনায় সত্যকার সুখশান্তি পাইয়াছে কিনা, সন্দেহের বিষয়)—কোনটিই সুখশান্তির হয় না; এমন কি, শ্রেষ্ঠ গতিও হয় না।

তাই আমাদের মহিমাময় তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তারস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন :—

"ধর্ম্মংচর, ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি।
ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু॥"

ইহার ভাবার্থ—'ধর্ম্মাচরণ কর; ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জগতে আর কিছুই নাই। যেহেতু, ধর্ম্মই সকল প্রাণীর মধু-স্বরূপ।' এমন মহান্ ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে, ধর্ম্মদ্বারাই মানুষ রক্ষিত হয়। আবার সেই ধর্ম্মকেই যদি নষ্ট করা হয় (ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ পথে চালিত হইয়া কার্য্য করিলেই ধর্ম্ম নষ্ট হয়) তাহা হইলে সেই মানুষই নষ্ট হয়। মহাভারতে উহার সুন্দর প্রমাণ রহিয়াছে।:—

"হতো ধর্ম্মো জনান্ হন্তি, ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।"

অতএব ধর্ম্মের বিধান জানিয়া উহার অনুষ্ঠান করিলে, মানুষ ইহজন্মে এবং মৃত্যুর পরপারে পরলোকে প্রশংসনীয় হয়, সুখে-শান্তিতে কাল কাটায় এবং মুক্তি-পথের পথিক হয় ("জ্ঞাতাচানু তিষ্ঠন্ ধার্ম্মিকং প্রশস্যত্যমো লোকে প্রেত্য বা")

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্মরক্ষায় সমাজ রক্ষা, সমাজ রক্ষায় ভারতের রক্ষা। তাহার গূঢ় কারণ এই যে, ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতি—এই ৩টী পরস্পরের সহিত এরূপ অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট যে, একের উন্নতিতে, বিশেষতঃ ধর্ম্মের উন্নতিতে, অন্য দুইটীর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। পরন্তু ধর্ম্মের অবনতি হইলে তৎসঙ্গে অপর ২টীরও অবনতি সুনিশ্চিত। সুতরাং ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতি —এই ৩টী পৃথক্ জিনিষ নহে। এজন্যই বোধ হয় দেখিতে পাই যে, পূজনীয় আর্য্য ঋষিগণের সকল কার্য্যের ভিতরেই ধর্ম্মভাব জড়িত রহিয়াছে। অর্থাৎ ভারতীয় আর্য্য জাতির সকল কার্য্যই ধর্ম্মভাব-প্রসূত। যেহেতু ভারত ধর্ম্মপ্রাণ দেশ—আমাদের দেশে ধর্ম্মই প্রধান। ধর্ম্মের নামেই এখানে লোকের প্রাণে সাড়া আসে কিন্তু অন্য জাতির অর্থাৎ পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে ইহার বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয় (এবিষয় পরে বলিব)—ইহাই ভারতীয় ধর্ম্ম-জীবনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

বস্তুতঃ সুপ্রাচীন যুগ হইতে এপর্য্যন্ত ভারত ধর্ম্মের দ্বারাই শাসিত হইয়া আসিতেছে। ইহা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারি যে, ধর্ম্মের বলেই এই ভারত আপনার অস্তিত্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তার কারণ আর কিছুই নয়, ধর্ম্মই হইল—ভারতীয় জীবনের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল। ধর্ম্মই পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, মানুষ প্রভৃতি যত প্রকার প্রাণী এবং স্থাবর-জঙ্গম-বিশিষ্ট এই চরাচর বিশ্বকে প্রকৃতিস্থ রূপে ধারণ করিয়া আছেন ("পূর্ব্বে যাহা ধারণাৎ ধর্ম্ম উচ্যতে,—বলা হইয়াছে, তাহা এখানে স্মরণ করুন)। ধর্ম্মেই এসকল প্রতিষ্ঠিত—ধর্ম্মই সকলকে ঊর্দ্ধে টানিয়া রাখিয়াছেন। ধর্ম্মই জাতির প্রাণ—ধর্ম্মই জাতির প্রধান অবলম্বন—ধর্ম্মই মনুষ্যত্বের ভিত্তি ("নিবৃত্তিধর্ম্ম তার ভিত্তি, প্রবৃত্তিধর্ম্ম তার-গৃহ-ছাদ-দেওয়াল, আর মুক্তি তার চূড়া।*"—অরবিন্দ)—ধর্ম্মের দ্বারাই

* ১নং টীকা দেখুন।

জাতির অধঃপতনজনিত আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলের নিরমন হইতেছে। সুতরাং ধর্ম্মের মত পরম হিতকর আর দ্বিতীয়টী নাই। তাই আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম্মকে একটী পরম পদার্থ বলা হইয়াছে। এবিষয়েও অন্যান্য দেশ হইতে ভারত জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছে। তাহার প্রধান কারণ হইল—আমাদের সমস্ত জীবনই ধর্ম্মক্ষেত্র। হিন্দুর জ্ঞান ও শিক্ষার মূলে এই মহৎ ও গভীর তত্ত্ব নিহিত ছিল (যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষার স্পর্শে কলুষিত হইয়া আমাদের জ্ঞান ও শিক্ষার বিকৃত ও অস্বাভাবিক অবস্থা হইয়াছে—এ বিষয়ে পরে আরও বলিব)। আমাদের ভারতজননী যে জ্ঞানের ও ধর্ম্মের (তদ্ভিন্ন শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার ছিল) অক্ষয় আকর ছিল, পৃথিবীর সকল জাতিই তাহা একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

যাহা হউক, ভারতের দৃঢ়বিশ্বাস যে, (অর্থাৎ আমাদের দেশের লোকের ধর্ম্মভাব এরূপ দৃঢ় হইয়াছে যে,) জীবনের সায়াহ্নে যখন মৃত্যুর ডাক আসিবে, তখন পার্থিব সকল জিনিষই পড়িয়া থাকিবে (যাহার জন্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ, পরস্পর অবিশ্বাস, গৃহীদের ভিতর কাটাকাটি মারামারি হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি চলিতেছে)—অন্তরঙ্গ আপন পরিজনের সহিত সম্বন্ধ চুকিয়া যাইবে—কিছুই সঙ্গের সাথী হইবে না, একমাত্র ধর্ম্মরত্নই তখন জীবের অনুগমন করিবে।

তাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ধর্ম্মই জাতির প্রধান অবলম্বন—আমাদের দেশে ধর্ম্মই প্রধান। সেই ধর্ম্ম জীবন যাপনই আমাদের দেশের লোক শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ জ্ঞান করে। ভারতমাতা যত যোগী, সাধু, মহাপুরুষ, সাধক, ভক্ত, ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং জগতের যেরূপ আদর্শ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাহার তুলনায় বিশ্বের আর কোন দেশজননীই সেরূপ, সেরূপই বা বলি কেন, উহার শতাংশের একাংশ পারিয়াছেন কিনা, সন্দেহ।

তাই বলি, ভাই! যতদিন ধর্ম্মদেব বর্ত্তমান থাকিবেন ততদিন জাতিও সঞ্জীবিত থাকিবে। তাহার কারণ, কোনও জাতি এবং তাহার ধর্ম্ম একই সূত্রে গ্রথিত—উভয়ের মধ্যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ (ইহার আভাষ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে)। কিন্তু মানুষ (এখানে আমাদের কথাই বলি) এমনই ভ্রমান্ধ ও শিক্ষা গর্ব্বে গর্ব্বিত যে, মহিমাময় পূজনীয় আর্য্য ঋষিগণের যোগলব্ধ দিব্যজ্ঞান—আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, অর্থাৎ তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিতে কুণ্ঠিত হই! আমাদের মনে হয়, ইহার প্রধানতম কারণ—বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে ধর্ম্ম-শিক্ষার কোন অবকাশই নাই (অথচ সাধারণের মধ্যে যতই ধর্ম্ম শিক্ষার বিস্তার হইবে, আধ্যাত্মিক আলোকও ততই সকলের মধ্যে বিকীর্ণ হইবে,—ধর্ম্ম ও নীতির দিকটা একেবারে অন্ধকারে আছে বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য কুশিক্ষার প্রভাবে আমাদের সেই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত টলিয়া গিয়াছে (এ বিষয়ে প্রবন্ধের শেষভাগে আরও বলিব)। তাহার ফলে হিন্দুধর্ম্মের গতি আজ রুদ্ধপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! হিন্দুর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্ব যে বেদাদি শাস্ত্রেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাও আজ আমরা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি?

সেইজন্যই স্বামী মহাদেবানন্দগিরি এক অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে বড়ই আক্ষেপের সহিত বলিয়া ফেলিয়াছেন,—"আজ আমাদের সমাজ-ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। তাই আমাদের আজ এমন দুর্গতি! আমাদের যে এমন হইবে, তাহার আভাষ শ্রীভগবদ্গীতার প্রথম

অধ্যায়েও পাওয়া যায়। গীতার বাণীই এইরূপ,—কলিতে সমাজ-ধর্ম ও কুলধর্ম নষ্ট হইবে, বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইবে,। আজ হইয়াছেও তাহাই।"

তাই বলি, যেদিন যেজাতির ধর্ম-দেব অন্তর্হিত হইবেন, সেদিন সেই জাতির পতন এমন কি ধ্বংস অনিবার্য্য।

সে যাহা হউক, সময়ের গুণে ও দেশের দুর্দ্দিন বশতঃ যদিও হিন্দুজাতির ধর্ম-বিশ্বাস শিথিল প্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—প্রাচীন আর্য্যজাতির বংশধর যদিও আজ কি অবস্থায় আসিয়াছে! তথাপি আমরা ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, ধর্ম্ম জগতে আমাদের আর্য্য ঋষিগণের সাধনা-লব্ধ জ্ঞান, আজিও জগদ্বাসীর উপজীব্য—তাপদগ্ধ বিশ্ববাসী আজও তাঁহাদের জ্ঞানামৃত আস্বাদনে তৃপ্তির—শান্তির সন্ধান পাইতে পারে। তাঁহাদের শান্ত-তপোবনের সামগানের প্রভাতী মূর্চ্ছনায় সমগ্র বিশ্ব জাগরণের প্রথম স্পন্দন আনয়নে সমর্থ হইয়াছিল—তাঁহাদের বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ আজিও জগতের সকল ধর্ম্মকে পথ প্রদর্শনে স্পর্দ্ধাবান্ [এখানে শুধু বেদের কথাই বলি। বেদ পৃথিবীর সভ্যজাতির ইতিহাসে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আমাদিগকে গর্ব্বিত করিয়া তুলিয়াছে। সমগ্র সভ্য জাতির জীবনব্যাপী বেদালোচনার বিশিষ্ট চেষ্টাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদকে এত আদরের সহিত ভালবাসেন কেন? অধ্যয়ন করেন কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নয়—কেবল বেদের অনির্ব্বচনীয় ও অফুরন্ত তত্ত্বদান। নানা দেশবিদেশের মনীষিবৃন্দ হিন্দুর প্রধানতম ধর্ম্মগ্রন্থ—বেদকে ভিত্তি করিয়াই বহু উপায়ে সাহায্য পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। ইহা হিন্দুধর্ম্মের প্রধান গৌরবের বিষয় নহে কি?]—তাঁহাদের সাধনা-শক্তি মৃত্যুর পরপারের সূক্ষ্ম হুসূক্ষ্ম সন্ধান পাশ্চাত্য জড়বাদীদের বৈজ্ঞানিক আয়োজনকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়েছে? সে সকল মহাতাপা মহর্ষির সুমহান্ আবিষ্কারে এখনও পৃথিবীর বিজ্ঞানের সকল স্পর্দ্ধাকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য ত কত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে যাহাই উৎপন্ন হউক না কেন, মানুষের প্রকৃত সুখ-শান্তি যে তাহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে না সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই। তাহাতে ভারতের সকল কামনার শ্রেষ্ঠ কাম্য—মানবাত্মার চিরন্তন গভীরতম কাম্য—অমৃত, আনন্দও অভয় (১নং টীকা দেখুন) হইতে বঞ্চিত; ইহা চিরসত্য ধ্রুবসত্য ও চিরঅমর। অথচ ভারতবর্ষে এই অমৃতের—আনন্দের সন্ধানই; ছিল ইহাই হইল কাজের কথা (পাশ্চাত্য দেশ একাজ-ও-কাজ করিতে যাইয়া কাজের গোড়াটাই হারাইয়া বসিয়াছে কিনা, চিন্তার বিষয়); একাজের তুলনায় আর সবই বাজের মধ্যে গণ্য। যদিও আমরা এখন উল্টারাস্তা ধরিয়া চলিতেছি—আজি যাঁহারা হিন্দুর চরম গন্তব্যটীকে অঙ্গীকারের বাহিরে ঠেলিয়া দিতে পারেন নাই, তাঁহারাও আজ সন্দিহান! তথাপি আমরা বলিব, হিন্দুর গৌরব-রবি আজিও অস্তমিত হয় নাই—উহা মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় এখনও চিরভাস্বরে সমুদয়কে সমুজ্জল রাখিয়াছে!

বলিতে কি, একদা এই ভারতই আত্মার বলে—ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্ হইয়া এবং ত্যাগ ধর্ম্মের রথে চড়িয়া যে জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারিবে? পৃথিবীর ইতিহাসই ইহার প্রধান সাক্ষ্য দিতেছে। ধর্ম্ম-জীবনে ভারতের সাধু মহাপুরুষগণ সাধারণ মানুষের

মধ্যে আধ্যাত্মিক আলোক বিকীর্ণ করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্ম তাঁহাদের প্রাণ হইতে জগতের—জগদ্বাসীর প্রাণে 'গিয়া-ডাক দিয়াছিল—এখনও দিতেছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তার কারণ ধর্ম্মের প্রাণেই হইল—'আনন্দ'। ধর্ম্মে যদি আনন্দই না থাকিত, তাহা হইলে লোকে ধর্ম্মের জন্য জগতে নিজের শ্রেষ্ঠ ধন—প্রাণ এত সহজে আর বিলাইয়া দিতে পারে না! পুরাকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত আমাদের দেশে কত রাজা-মহারাজা শুধু সুনগান্ ধর্ম্মের জন্যই—ধর্ম্ম-জীবন যাপনের জন্যই এ-ভাবে আপনাদিগকে বিলাইয়া দিয়াছেন, [ভারতের ধর্ম্ম-সাধনা নির্ব্যক্তিক; শুধু তাহাই নয়—ধর্ম্ম ব্যক্তিত্বের পারে গিয়াই পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝা সহজ নহে। তাই আমাদের দেশের মহাপুরুষগণের ধর্ম্ম জীবনের ঘটনাবলী বুঝাও সহজসাধ্য নহে। ধর্ম্মই মানুষকে ভাগবত জীবনে একান্ত নির্ভর শীল ও শরণাগত করিয়া তুলে। তার কারণ, ভারতের ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে কার্পণ্য নাই। উহা 'নেত নেতি' নহে (অর্থাৎ 'নাই-নাই' রব নহে। পাশ্চাত্যের রুশিয়া দেশের গীর্জ্জার সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—"ধর্ম্ম মানুষের অন্যতম নেশা মাত্র। ইহা দ্বারা ধর্ম্মের বিষয়ে রুশিয়ার মনোভাব সম্যক্ পরিচয় পওয়া যায় *)।—'অস্তি-অস্তি' (অর্থাৎ নিশ্চয়ই ধর্ম্ম আছে)। ভারতবাসী শুধু ভাগবত জীবনের জন্যই ধর্ম্মের সমাশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন]। আমাদের রামায়ণ-মহাভারত, বেদ-পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ, বৌদ্ধ-জাতক এবং এ-কালের ও সে কালের সাধু-মহাপুরুষগণের জীবনীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

যিনি আজ এক-তৃতীয়াংশ পৃথিবীর ধর্ম্ম-গুরু বলিয়া অবিসংবাদীরূপে স্বীকৃত হইয়াছেন, সেই ভগবান্ বুদ্ধদেবের কথা ঐতিহাসিক পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তিনি রাজপুত্র হইয়াও শুধু ধর্ম্মের জন্যই—বিশেষতঃ জীবের কল্যাণের—মুক্তির পথ নির্দ্ধারণের জন্য মায়াময় সংসারের জাল ছিন্ন করিয়া উত্তরকালে "বুদ্ধত্ব" লাভ পূর্ব্বক "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"—এই মন্ত্র-প্রচার দ্বারা অর্দ্ধ-পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কত দুর্দ্দান্ত জাতিকে ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় প্রদান এবং ধর্ম্মের শান্তি বারি সেচন করিয়া কত তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, " হে মানব, সর্ব্বজীবের প্রতি তোমার অপরিমেয় দয়ার ভাব জাগিয়া উঠুক। উঠিতে, বসিতে, শুইতে—সব সময়ই যেন মৈত্রীময় ভাবের মধ্যে তোমার মনের অবস্থান হউক। ধর্ম্মকে (সত্য, দয়া, অহিংসা, ত্যাগ প্রভৃতির সমষ্টি) তোমার বিচরণের প্রমোদকানন কর—ধর্ম্মকে তোমার আনন্দ কর—ধর্ম্মে তোমার প্রতিষ্ঠান হউক—ধর্ম্মই তোমার জ্ঞাতব্য বিষয় হউক—যাহাতে ধর্ম্ম ম্লান হইতে

* এক সময়ে উন্মত্ত রাষ্ট্র ধর্ম্মের নামে মানুষের রক্তে পৃথিবী প্লাবিত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু আজ সেই রাষ্ট্রই ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিতে উদ্যত। সোভিয়েট-রুশিয়া ত ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।'—"বঙ্গ [illegible]।

সম্প্রতি খবরের কাগজে দেখিলাম, স্পেনের গণতন্ত্রের রাষ্ট্রনায়কগণ তথাকার ধর্ম্মযাজক গণের বিশেষতঃ রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রভাব লোপ করিবার জন্য ব্যবস্থা [illegible]। এমন কি, তাঁহাদিগকে সেস্থান হইতে তাড়াইবার বন্দোবস্তও হইয়াছে।

এই সব লক্ষ্য করিলে বলিতে হয় যে, মারামারি [illegible] যতই বর্দ্ধিত হউক না কেন, পাশ্চাত্য দেশ হইতে এখন ধর্ম্ম হটিয়া যাইতেছে—দেশ ক্রমেই ধর্ম্ম-বিমুখ হইয়া উঠিতেছে।

পারে, এমন কোন বিতণ্ডা তোমার মনে স্থান দিওনা এবং সুভাষিত সত্যালোচনায় তোমার সময় অতিবাহিত হউক।" (শরচ্চন্দ্র রায়ের 'ভারতীয় সাধক')

এই অপূর্ব্ব মৈত্রী এবং কল্যাণকর সদ্ধর্ম্মের অমৃতবাণী শুনাইবার জন্য ভগবান্ বুদ্ধদেব এই ভারত ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বয়ং মধুর ধর্ম্মজীন যাপন করতঃ জগতের আদর্শ-স্থল হইয়া রহিয়াছেন।

এইরূপে ধর্ম্মভূমি ভারতমাতার বুকের সন্তান—'নানক" ("পরমেশ্বর এক, মানুষ ভাই ভাই" —এই সত্যটাই নানক প্রচার করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—"মানুষ বেদ ও কোরাণ পাঠে সাময়িক আনন্দ পাইতে পারে কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ না করিলে, কখনই মুক্তি পাইবে না।" তিনি আরও বলিতেন, আমি শুধু পবিত্র ধর্ম্মের কথাই জানি, আর কিছু জানি না। একমাত্র ঈশ্বরই সত্য,— আর সব অস্থায়ী।") "কবীর"—(তাঁহার ধর্ম্ম-জীবন হিন্দু ও মুসলমান সাধনার পবিত্র সঙ্গমতীর্থ।' অলৌকিক অধ্যাত্মিক জ্ঞান-প্রভাবে উভয় ধর্ম্মের সারসত্য সহজে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছেন—"আমার আত্মা সেই অদ্বিতীয় প্রভু রামেতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। গুরুর কৃপায় ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিয়া আমি অধ্যাত্ম-জ্ঞান ও জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছি। আমার আত্মা আনন্দ-রস লাভ করিয়াছে। আনন্দের ভারে আমার মন ঈশ্বরের চরণে প্রণতঃ হইয়া রহিয়াছে; অন্য ভাবনা আমার হৃদয় অধিকার করিতে পারে না।"—'ভারতীয় সাধক'।) "রাজা রামমোহন রায়"—('তিনি অতুল দৈবসম্পদ্ লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। সত্যের প্রতি অটল নির্ভর, ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, সর্ব্বজীবের প্রতি অপ্রমেয় প্রীতি, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ গুণরাজি বলিয়া উক্ত হইতে পারে।') "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ" (—'সাধনা দ্বারা তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 'ঋষি' এবং ভোগ, ঐশ্বর্য্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া পরিবারের মধ্যে এই ঋষি-জীবনই যাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি 'মহর্ষি'। জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ সাধনা দ্বারা তিনি দিবারাত্র ব্রহ্মানন্দ রসপানে বিভোর থাকিতেন—ব্রহ্মই তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান ছিলেন' (শরৎ রায়); তাঁহার পথ সত্যের পথ। এমন সত্যানুরাগী ছিলেন বলিয়াইত তিনি পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য পথের ভিখারী হইবার ভয় পর্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।) "মহাত্মা কেশব সেন" [তিনি "নববিধান ধর্ম্মের" সুবক্তা ও উদ্‌গাতা। যে পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, সেই ধর্ম্ম-পথে বিচরণ করিয়া তিনি বহু অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্ম সাধন করিয়াছেন। "অনন্ত পুণ্য-প্রেমের আধার, অদ্বিতীয় পরমেশ্বর, তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টির সম্মুখে এমন চিরবিদ্যমান ছিলেন যে, তিনি তাঁহাকেই জীবনের একমাত্র আদর্শ ও চালক করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "আত্ম পীড়ন দ্বারা ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ হইল। যাহারা ভয়ের কারণ ছিল, তাহারা এখন বন্ধু হইল। যে শ্মশানে বাড়ী আরম্ভ করা হইয়াছিল, সেই শ্মশানই ফল-ফুলে-শোভিত উদ্যানে পরিণত হইল।"—ভারতীয় সাধক।], ইদানীন্তনকালের ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধক "স্বামী বিবেকানন্দ"—[তিনি জলদমন্দ্রে জগতে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—"ধর্ম্মই ভারতের মেরুদণ্ড। প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ বিশেষ-বিশেষ নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে; আর ধর্ম্মই ভারতবাসীর সেই বিশেষত্ব। অন্যান্য স্থানে অন্যান্য অনেক কাজের মধ্যে ধর্ম্ম একটী। প্রকৃতপক্ষে উহা জীবনের অল্পাংশ মাত্র অধিকার করিয়া রহিয়াছে। যথা, ইংল্যাণ্ডে ধর্ম্ম, তাহাদের রাজনীতি-চর্চ্চার অংশ বিশেষমাত্র। * * * পাশ্চাত্য

অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। তাহাদের শক্তি হয়ত রাজনীতি বা কোন সমরনীতি অথবা বাণিজ্য-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—উহাই তাহাদের মুখ্য-জিনিষ। তাহা ভিন্ন অনেক গৌণ পোষাকী জিনিষ আছে। **তন্মধ্যে ধর্ম্ম অন্যতম।** কিন্তু ভারতে ধর্ম্মই জাতীয় হৃদয়ের মর্ম্মস্থল। এই ভিত্তির উপরেই জাতীয়-প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি, প্রভুত্ব প্রভৃতি যাহা কিছু, সমস্তই এখানে গৌণমাত্র। ধর্ম্ম এখানকার একমাত্র কার্য্য—একমাত্র চিন্তা।" [—বক্তৃতা হইতে] বর্ত্তমানে পণ্ডিচেরীতে সাধন-মার্গে সাধন নিরত সাধকপ্রবর "শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ"—(যোগনিরত এই সাধু মহাপুরুষের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন) প্রণীত 'ধর্ম্ম ও জাতীয়তা' নামক গ্রন্থে ভারতীয় ধর্ম্মের বিশেষত্ব এবং ধর্ম্ম জীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি পত্রে পত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"সমস্ত জগৎ আর্য্যদেশসম্ভূত ব্রহ্মজ্ঞানীর নকট জ্ঞান-ধর্ম্ম-শিক্ষাপ্রার্থী হইয়া ধর্ম্মভূমি ভারতমাতাকে তীর্থ মানিয়া অবনত মস্তকে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছে ও করিবে।" "মানবজাতির সমস্ত জীবন আমাদের বিশাল হিন্দুধর্ম্ম-বৃক্ষের আশ্রিত।" (—'ধর্ম্ম ও জাতীয়তা'), কালীমাতার পরমভক্ত সাধকপ্রবর "রামপ্রসাদ সেন" (তাঁহার শ্যামাবিষয়ক প্রসাদী সুরের সঙ্গীত দ্বারা এই তাপদগ্ধ সংসার-মরুভূমিতে এখনও লোকের তাপিত প্রাণ জুড়াইয়া দেয়), একালেও যুগাবতার ভগবান্ "শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব"—(ইনি সারাজীবনব্যাপী ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া ধর্ম্মের ত্রিবেণী-সঙ্গম স্থাপনপূর্ব্বক উহার পূত প্রেমের মন্দাকিনী-প্রবাহ দ্বারা জীব-হৃদয়েতে পাপরাশি বিধৌত করিয়া দিয়াছিলেন।) প্রভৃত মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে (ধর্ম্মভূমি ভারতমাতা) জগতের আদর্শধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করতঃ চিরগৌরবে গৌরবান্বিত ও সমুজ্জল করিয়াছেন।

পুরাকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আরও কত সাধু-মহাপুরুষ ও ভক্ত জন্মগ্রহণ [এখানে কাহার নাম বাদ দিয়া কাহারই বা নাম করিব? প্রত্যেকের সংক্ষেপ বিবরণ দিতে গেলেও একখানি বৃহৎ গ্রন্থের প্রয়োজন হয়। এখানে শুধু ২।৪ জন সাধকের নাম করিব মাত্র। নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ, পাইক পাড়ার রাজা লালাবাবু, পরম ভক্তিমতী মীরাবাঈ (তিনি রাজরাণী হইয়াও শুধু ধর্ম্মের জন্যই, জগৎস্বামী গিরিধর লালজীর জন্যই রাজ্যৈশ্বর্য্যের মায়া কাটাইয়াছিলেন), শঙ্করের সাক্ষাৎ অবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, বারদীর ব্রহ্মচারী, কাঙ্গাল হরিনাথ, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—আর কত নাম করিব—ইহাঁরা যেভাবে ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের আদর্শস্থল হইয়া রহিয়াছে ও থাকিবে এবং তাহাতে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষও ধন্য হইয়াছে। ইহাদের কাহারও ধর্ম্মের জীবন-কাব্যের অধ্যায়গুলি অধ্যয়ন করিলে [যদিও উহা পড়িয়া শেষ করা সম্ভব নহে, যতই পড়া যায়, ততই তাঁহাদের জীবনের নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইবে।], প্রতি ছত্র—প্রতি শব্দের অন্তরাল হইতে প্রচ্ছন্ন শাশ্বত সত্য, দয়া, ত্যাগ ও প্রেমভক্তি ফুটিয়া বাহির হইবে। এ মহাগ্রন্থের আর শেষ নাই!

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণবমত ও রাধা-কৃষ্ণ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু বি-এ

কোনও দার্শনিক বলিয়াছেন, "সৃষ্টির প্রথম হইতে জগতে দুইটি তত্ত্বের ধারা বহিয়া আসিতেছে। সাধনার দ্বারা দেবতার নাগাল পাইবার জন্য, দেবত্বের দিকে মানবের ক্রমোন্নয়ন (apotheosis); আর মানবের কাছে ধরা পড়িবার জন্য দেবতারও নরদেহে অবতরণ—যাহাকে বলে নরলীলা (anthropomorphism)."

বৈষ্ণব সাহিত্যে, তথা বৈষ্ণবধর্ম্মে আমরা উল্লিখিত ভাবদ্বয়েরই একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। ভক্ত ও ভগবান্—উভয়ের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক বৈষ্ণবগণ পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয় ও মহিমা-সমুজ্জ্বল। তাহা তাঁহাদের সাহিত্যকে জগতের রস-সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছে। বৈষ্ণবের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গে রাখালরূপে গোচারণ করিয়াছেন, দয়িতার জন্য নাপিতিনী সাজিয়াছেন। কালির রূপ ধরিয়া তিনি স্বামীর কাছে কুলবধূর মুখ রাখিয়াছেন—আবার রাজসভার মধ্যে কেশা-কৃষ্টা রমণীর লজ্জাও নিবারণ করিয়াছেন, তিনি কখনও ভক্তের সারথ্য করিয়াছেন, কখনও বা পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহারই মান বাড়াইয়াছেন। আর ভক্ত—সে তাহার জাতি-কুল, যশ-মান, লজ্জা-সম্ভ্রম, তাহার যথাসর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করিয়া—আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া আত্মহারার আনন্দটুকুই সম্বল করিয়াছে। সে বলিয়াছে—

অপযশ-ঘোষণা থাকু দেশে দেশে
সে মোর চন্দন-চুয়া।
শ্যামের রাঙা পায় এতনু সঁপিনু
তিল-তুলসী-দল দিয়া॥

(জ্ঞানদাস)

আবার সে কালের একজন শ্রেষ্ঠবংশজাত প্রসিদ্ধ যোদ্ধা নিজের সমস্ত মান অভিমান ভুলিয়া এই গোপাল নন্দনেরই চরণে মস্তক অবনত করিয়া বলিয়াছেন—

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি-মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" (গীতা)

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা কেবল মানুষ বলিয়াই ভাবেন তাঁহাদের কাছে বৈষ্ণবধর্ম্ম নিতান্ত অসার বোধ হইবে। কিন্তু তাঁহারা দেবতাই হউন, আর মানুষই হউন, বৈষ্ণবশাস্ত্র তাঁহাদের প্রেমকে যে ভাবে ব্যক্ত করিয়াছে তাহাতে দুর্নীতির ছায়াও নাই। তাহা অতি পবিত্র অতি মধুর—এইজন্য মধুর ভাবই বৈষ্ণব সাধনের চরম তত্ত্ব। যাহা হউক রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীকে রূপক ধরিয়া লইলে সকল জটিলতার নিরসন হইয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাই তিনি কৃষ্ণ। তাঁহার দেহের বর্ণ শ্যাম—যাহা আকাশে, সমুদ্রে, ধরণীর তৃণ আস্তরণে—জগতের সকল বৃহতে পরিব্যাপ্ত। তাঁহার মস্তকে আছে,

রামধনুর বর্ণবিশিষ্ট শিখিপুচ্ছের মুকুট—ইহা বিশ্বজগতের বর্ণসমষ্টির প্রতীক। অতএব শ্রীকৃষ্ণও বিশ্বাত্মার প্রতীক। তিনি উপনিষদের 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা'। তাঁহার হাতে আছে সপ্ত-স্বরা মুরজ মুরলী—তাহার স্বর সারা জগৎকে মোহিত করে। যমুনা পর্য্যন্ত আকুল হইয়া দুকুল ছাপাইয়া তাঁহার পদতলে উথলিয়া পড়ে। সেই প্রাণ-মাতানো বাঁশীর সাড়ায় গোপবধূরা সব ভুলিয়া তাঁহারই কাছে ছুটিয়া আসে। ইহা হইতে ব্যক্ত হইতেছে যে ভগবানের ডাক দুর্দমনীয়। তিনি সকলকেই ডাকিতেছেন—সকলকেই টানিতেছেন। যে কাছে আছে সে আগে যায়, এইমাত্র প্রভেদ—কিন্তু সকলকেই একদিন যে সেই প্রিয়তমের কাছে যাইতেই হইবে তাহার কোনও সন্দেহ নাই।

"নৃনামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব"

এই ঋষিবাক্য তাঁহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া। এযুগের কবিও বলিয়াছেন—

"আমার মিলন লাগি তুমি
আস্‌চ কবে থেকে
কত কালের সকাল সাঁঝে
তোমার চরণধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয়মাঝে
গেছে আমায় ডেকে।" (গীতাঞ্জলি)

আর রাধা—বৈষ্ণব সাধনার অন্তিম সীমা তিনি। আনন্দদাত্রী। শাস্ত্রকারগণ তাঁহাকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। তিনি "হ্লাদিনী শক্তি" "মহাভাব-স্বরূপিণী" ও "গোবিন্দানন্দিনী"। কবিরা বলিয়াছেন "রসবতী প্যারী"—"ব্রজরমনীগণ মুকুটমণি।" রাধা প্রধান গোপিকা, শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়তমা। বৈষ্ণবমতে অন্যান্য গোপিণীরা শ্রীরাধা হইতে পৃথক্ নহেন, তাঁহারই অঙ্গকান্তি। ভগবানের আবির্ভাবে যে জীবাত্মার মন ও ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে, যাহার মধ্যে নূতন জীবনের অভিব্যক্তি হয়, যে তাহার সমস্ত সত্তা লইয়া ভিতরে বাহিরে সেই প্রাণারামকে অনুভব করিবার চেষ্টা করে,—সেই জীবাত্মারই প্রতীক শ্রীরাধা।

এইখানে বৈষ্ণবদর্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের একটা মিলের সূত্র পাওয়া যায়। বোধ হয় এই মূলগত মিলের জন্যই ব্রহ্মদর্শনকে বৈষ্ণবমতে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হইয়াছে। কৃষ্ণ পরমাত্মা —আর রাধা জীবাত্মা। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যে মিলন, পরমাত্মাতে জীবাত্মার লীন হইয়া যাওয়া—এক কথায় পরমাত্মা ও জীবাত্মার অভেদ দর্শনই আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌছিবার অন্যতম পথের সন্ধান পাই বৈষ্ণব দর্শনে। পরমাত্মার ও জীবাত্মার যে শাশ্বত, সর্ব্বজনীন বিরহ আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে সেই বিরহই মূর্ত্ত হইয়াছে রাধা কৃষ্ণের মধ্যে। নিখিল প্রণয়িণী হিয়ার সমষ্টি শ্রীরাধা—আর নিখিল প্রেমিক জনের একীভূত মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। রাধা ও কৃষ্ণ কিন্তু পৃথক্ নহেন—ঐশ্বরিক লীলার জন্যই ভগবান্ দুই রূপ ধারণ করিয়াছেন। প্রেমিক-প্রেমিকাও যখন পরস্পরের জন্য নিজেদের অস্তিত্ব ভুলিয়া-যান তখন তাঁহাদের ভেদকে ঢাকা দিয়া বাড়িয়া উঠে প্রেম—তখন তাঁহারাও দুই দেহে এক হৃদয়। বিশুদ্ধ প্রেমই বৈষ্ণবের উপাদেয়।

রাধা-কৃষ্ণবাদের নিগূঢ় রহস্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে একটা কথা জানিবার বিশেষভাবে প্রয়োজন এই যে, - বৈষ্ণবের কাছে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ; তিনি ব্যতীত জাগতিক সমস্তই নারী বা প্রকৃতি। ভৌতিক দেহে আমরা যাহাই হই না কেন,—তুমি, আমি, এমন কি, জড়বস্তু পর্য্যন্ত সকলেই সেই পরমপুরুষের নায়িকা—আমরা সকলেই গোপীমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। পদকর্ত্তাগণ বৃন্দাবনের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় শুধু গোপবধূগণ নহে, যমুনা নদী, বৃন্দাকুঞ্জ, মালতী মাধবী লতিকা, তমাল ও নীপ তরু, ময়ুর-ময়ুরী, চাতক-চাতকী, হরিণ-হরিণী, শ্যামলী-ধবলী ধেনু - সকলেই যেন শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল। আর তিনিও সকলেরই মধ্যে নিজকে প্রকাশ করিতেছেন। সকলকেই উপভোগ করিতেছেন। সকলেই তাঁহার প্রণয়াস্পদ।

উল্লিখিত ভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়া Newman তাঁহার Soul গ্রন্থে বলিয়াছেন—"If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness it must become a woman, yes, however manly thou be among men. It must learn to love being dependent and must lean on God not solely from distress or alarm but because it does not like independence or loneliness." বাস্তবিকই নারীর মত কোমল হৃদয় না হইলে ভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারা যায় না। নারীর মত অসহায় ও পরনির্ভরশীল না হইলে ভগবানের উপরেই বা নির্ভরতা আসিবে কেন? মনের ভিতর পৌরুষের লেশমাত্র থাকিলে মানুষ সকল সময়ে ঈশ্বরের দিকে চাহিবে না। সেই জন্যই বৈষ্ণব শাস্ত্রের উপদেশ হইতেছে—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

বৈদান্তিক মায়াবাদী—তাঁহার চক্ষে এই জগৎ মিথ্যা, নিতান্ত অসার। কিন্তু বৈষ্ণব লীলাবাদী - তিনি জগতের সত্যতায় বিশ্বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলার অভিব্যক্তি এই জগৎ—তাঁহার লীলার মধ্যেই ইহার সার্থকতা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে, অথচ তাহাকে ব্যাপ্ত করিয়া এক দুর্জ্ঞেয় পরমপুরুষ বিরাজ করিতেছেন। শিশু যেরূপ তাহার খেলনা লইয়া ইচ্ছামত খেলিতে থাকে, সেইরূপ সেই নন্দদুলালও এই জগৎকে গড়িতেছেন, ভাঙ্গিতেছেন - উপভোগ করিতেছেন। আমাদের জীবনে ব্যক্তিগত, জাতিগত কোনও প্রয়োজন নাই—যাহা কিছু আমরা করিতেছি, যাহা কিছু আমাদের হইতেছে সবই তাঁহার লীলামাত্র—তাঁহারই ভোগের জন্য আমরা জন্মাবধি নিবেদিত। আমাদের তৃপ্তি যদি কিছু থাকে তবে তাহা তাঁহারই তৃপ্তি। আমার সত্তাটুকু পর্য্যন্ত আমার নয়, তাঁহার—ইহাই পরম বোধ। কবির কথায়—

ম'রে গিয়ে বাঁচ্‌ব আমি, তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।
সব বাসনা যাবে আমার থেমে
মিলে গিয়ে তোমারি এক প্রেমে।—(গীতাঞ্জলি)

শ্রীকৃষ্ণ আনন্দস্বরূপ—'আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি' তাহা তিনিই। এই সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে ভগবানের লীলা বা ইচ্ছা। উপনিষদে আছে—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়ম্।"

শ্রীকৃষ্ণেরও যখন ইচ্ছা হইল যে নিজের আনন্দকে অর্থাৎ নিজকে নিজেই আস্বাদ করিবেন, নিজকে নিজেই আলিঙ্গন করিবেন, নিজের মাধুর্য্য নিজেই উপলব্ধি করিবেন—তখনই পৃথক্ হইয়া পড়িলেন। জীবনদেবতাকে সম্বোধন করিয়া রবীন্দ্রনাথও এই কথাই বলিয়াছেন—

আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।
হে মোর দেবতা ভরিয়া এদেহ প্রাণ
কি অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান॥—(গীতাঞ্জলি)

সৃষ্টির আরম্ভ আনন্দ হইতেই। শ্রুতির মতেও—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।" সৃষ্টির প্রয়োজন এই জন্য যে, শুধু ভোক্তার দ্বারাই তো ভোগ নিষ্পন্ন হয় না, ভোগ্য বস্তুও থাকা চাই। এইখানে সাংখ্য-যোগের সহিত বৈষ্ণব মতের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। মহৎতত্ত্বের মধ্যে যখন আলোড়ন উপস্থিত হইল—যখন তাহার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিবার, নিজেকে জানিবার জন্য একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল,তখনই উহা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। এক দিকে রহিল ভোক্তা বা জ্ঞাতা (অহম্) অপর দিকে ভোগ্য বা জ্ঞেয় ও তৎসাধন (পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়)। যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণের প্রথম সৃষ্টি শ্রীরাধা—অন্যান্য গোপিকাগণ তাঁহারই অঙ্গচ্ছটা হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। শ্রীরাধার মধ্যে আনন্দের হ্লাদিনী শক্তির, আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে উহার আকর্ষণী শক্তির প্রকাশ। ভেদ এইখানে—নতুবা রাধাকৃষ্ণ দুই মূর্ত্তিতে এক।

বৈষ্ণবধর্ম্মে রাসলীলার স্থান অতি উচ্চে। উহার দ্বারা রূপকচ্ছলে যে নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রীমদ্ ভাগবতকার শিক্ষা দিয়াছেন তাহাই একটু বলিবার চেষ্টা করিব। পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার পতিপ্রেম স্থাপন অন্যতম সাধনপন্থা। এই দাম্পত্য সম্বন্ধকেই ইঙ্গিত করিয়া এখানে শ্রীকৃষ্ণ (পরমাত্মার প্রতীক) ও গোপবালাদের (জীবাত্মার প্রতীক) সমাবেশ করা হইয়াছে। রাসলীলার বর্ণনাস্থলে আছে—

অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ॥

রাসমণ্ডলীর প্রত্যেক গোপীর দুই পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ ; আবার সেই মণ্ডলের কেন্দ্রস্থলেও তিনি থাকিয়া বাঁশী লইয়া গাইতে আরম্ভ করিলেন। (লক্ষ্যার্থ এই—জীবাত্মা অসংখ্য, কিন্তু পরমাত্মা এক—তিনি সকলকে ব্যাপিয়া আছেন।)

ক্রমে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করিতে করিতে তাহাদের অন্তরে গর্ব্ব ও আত্মগরিমার উদয় হইল। তাহারা ভাবিল ভগবান যখন তাহাদের সঙ্গে বিহার করিতেছেন তখন তাহারা সামান্য নয়। কিন্তু হায়!

"প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তর ধীয়ত"—

শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। (লক্ষ্যার্থ এই—অহঙ্কার ঈশ্বর প্রাপ্তির পরিপন্থী। অহংবশবর্ত্তী মানুষ নিজের চিন্তায় বিভোর থাকে ; ভগবানের কথা তাহার মনেই থাকে না।)

তখন গভীর দুঃখে সমাচ্ছন্ন গোপীরা হতাশ হৃদয়ে তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু চারিদিকেই অন্ধকার! "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে" যিনি, তাঁহাকে আর পাওয়াই

যায় না। তাহার পর বৃথা চেষ্টায় অবসন্ন হইয়া গোপীরা বাহিরে অন্বেষণ ত্যাগ করিয়া কেবল ভাবিতে লাগিল—কেবল ভাবিতে লাগিল শ্রীকৃষ্ণের কথা! একেবারে আত্মসমর্পণ করিয়া হইয়া উঠিল—

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।

তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের সমস্ত চিন্তা, তাঁহার বিষয়েই তাহাদের বাক্যালাপ; তাহাদের দেহের স্পন্দন তাঁহার উদ্দেশে—এমন কি নিজের পৃথক সত্বা পর্যন্ত ভুলিয়া তাহারা তন্ময় হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গেল। কামনা করিয়া যাহাকে বাহিরে পায় নাই—তাহাই রহিল অন্তরের ধন হইয়া।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।

তিনি স্মিতমুখে আবির্ভূত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদের সহিত আবার নাচিতে গাইতে লাগিলেন। (লক্ষ্যার্থ এই—ঈশ্বরকে বাহিরে পাওয়া যায় না—ভিতরে খুঁজিতে হয়। তাঁহার চিন্তায় বিভোর হইয়া তদ্গত হইলে তাঁহার দেখা মিলে।)

নিম্নের পদটিতে বিরহ বর্ণনা করিয়া ভক্তকবি গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকে অতি সুনিপুণ ভাবে আঁকিয়াছেন—

চম্পক-দাম হেরি চিত অতি কম্পিত
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তরে
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥
বৃষভানু নন্দিনী জপয়ে রাতি দিনি
ভরমে না বোলয়ে আন।
লাখ লাখ ধনী বোলয়ে মধুর বাণী
সপনে না পাতয়ে কান॥
'রা' সহি 'ধা' পহুঁ কহই না পারই
ধারা ধরি বহে লোর।
সেহি পুরুষমণি লোটায় ধরণী পুনি
কো কহ আরতি ওর॥

এইরূপ বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যান্য পদাবলী পাঠেও উপলব্ধি হয় যে বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলতত্ত্ব মধুর ভাবটি কামাত্মক নহে, প্রেমাত্মক। আর একটি পদে রাধিকার ভাব চণ্ডীদাস অতি সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,—

এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥

সই কি আর বলিব তোরে।
বহু পুণ্য ফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলিল মোরে॥
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ
বিলম্বে বাহির হৈলু।
আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিলুঁ॥
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে॥
আপনার দুঃখ সুখ করি মানে
আমরা দুঃখের দুখী।
চণ্ডিদাস কহে বঁধুয়া পিরীতি
শুনিয়া জগৎ সুখী॥

এই পদটিকে রূপকও বলিতে পারা-যায়। রূপক ধরিলে ইহার অর্থ হইবে এইরূপ :—ভগবান্ মিলনের সুযোগ দিলেও আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি না। আমাদের চারিদিকে অজ্ঞানের অন্ধকার, বাসনার মেঘ। তাহার উপরে নানারূপ বাধা-বিপত্তি আছে—আত্মীয় স্বজন লাঞ্ছনা গঞ্জনা করে। কিন্তু ভগবান্‌কে পাইতে হইলে স্নেহের বন্ধন, মোহের জাল ছিন্ন করতেই হইবে—সাংসারিক ভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, লজ্জা-সম্ভ্রম, যশ-মান, সব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিতে হইবে।

সম্ভবতঃ সহজিয়া হইতেই, প্রক্রিয়ারস বা মধুর-ভাব বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার মূলনীতি হইতেছে, নিজের পত্নী ব্যতীত অপর নারীকে ভালবাসা ও তাহার মধ্যে ভগবানের প্রকাশ অনুভব করা। পরকীয়া প্রীতি যদিও সমাজ-বিগর্হিত, তথাপি তাহার মধ্যে সাধনার অনুকূল এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যাহা স্বকীয়াতে সম্ভবপর হয় না। মানুষ নিজের স্ত্রীকে ভালবাসিবে, তাহা স্বাভাবিক; স্ত্রী তাহার স্ব। কাজেই সেই ভালবাসা স্বার্থপূর্ণ—সকাম। পত্নীকে ভালবাসিতে কোনও বাধা নাই—কেন না তাহা রীতিবিরুদ্ধ নহে। অপরপক্ষে পরকীয়া প্রীতিতে স্বার্থের নামও নাই। যে আমার আত্মীয় নহে, তাহার উপর কোনও দাবী নাই—সেবা-যত্ন, আদর-আব্দার ইত্যাদি কোনও প্রতিদানের আশা তাহার কাছে রাখি না। এই প্রেমেরই উচ্চ অবস্থায় বলা সম্ভব যে, "ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে; আমার স্বভাব, তোমা বই কিছু জানিনে।" তাহা ছাড়া দূরত্বের ব্যবধানে ও নানাকারণে অন্য নারীর সহিত যৌন মিলন ঘটে না এবং অন্তরের মধ্যে প্রেমের যত বিকাশ হইতে থাকে ইন্দ্রিয়-লালসাও তত কমিয়া যায়। পরকীয়া প্রেম এইভাবেই নিষ্কাম ও উচ্চতর। পরন্তু সামাজিক শাসনকে জয় করিয়া ঐ প্রেম

আত্মলাভ করে বলিয়া তাহার স্থান অতি উচ্চে—উহা অতি বিশুদ্ধ ও মধুর ও অপার্থিব। বাঙ্গালীর প্রিয় কবি চণ্ডীদাস নিজের জীবনে উহা সবিশেষ বিকশিত করিয়া বলিয়াছেন,—

রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম,
কাম-গন্ধ নাহি তায়।

(আবার), পিরীতি-সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পিরীতি-আশ॥

এই পরকীয়া সাধনার চরম সীমায় উঠিয়া প্রেমের গতিকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া দিলে, সহজেই তাঁহাকে লাভ করা যায়—প্রেমাস্পদের মধ্যেও তাঁহার সত্তা প্রকাশিত হয়।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠকবির লেখায় বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম, জীবনদেবতা, অরূপ সুন্দর—সবই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি। সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ ক্ষুদ্রের জন্য বৃহতের প্রেমের ব্যাকুলতা প্রভৃতি ভাব বৈষ্ণব মতবাদের অনুকূল। বৈষ্ণব গীতাকারই প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর;
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে,
কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়-পুর।—(গীতাঞ্জলি)

কবীরের দোঁহা

(বিবেক)

ফূটী আঁখি বিবেক কী, লখৈ ন সংত অসংত।
জাকে সংগ দস বীস হৈঁ, তাকা নাম মহংত ॥১॥
বিবেক অন্ধ দেখে নাক' সন্ত কিম্বা অসন্ত সে।
দশ বিশ জন সঙ্গে যাহার, লোকে বলে মোহন্ত সে ॥ ১ ॥

সাধু মেরে সব বড়ে, আপনী আপনী ঠৌর।
সবদ বিবেকীপারখা, সো মাথে কে মৌর ॥২॥

সাধু আমার সবাই বড়, আপন আপন সীমানায়।
তার মাঝে যে মাথার মণি, শব্দ বিবেক যে খাটায় ॥ ২ ॥

জব লগ নাহি বিবেক মন, তব লগি লগৈ ন তীর।
ভবসাগর নাহাঁ তরৈ, সতগুরু কহৈ কবীর ॥৩॥

মনে বিবেক নাই যতদিন, ততদিন না উঠে তীরে।
ভবসাগর পার নাহি হয়, সৎগুরু এই ক'ন কবীরে ॥ ৩ ॥

গুরুপসু নরপসু নারীপসু বেদপসু সংসার।
মানুষ লাঈ জানিয়ে, জাহি বিবেক বিচার ॥৪॥

(১) গুরু-পশু নর-নারী পশু, বেদ-পশু সব এ সংসারে।
মানুষ ব'লে বুঝবে যে জন বিবেক নিয়ে বিচার করে ॥ ৪ ॥

কর বংদগী বিবেক কী, ভেষ ধরৈ সব কোয়।
বা বংদগী বহি জ নি (জঁহ) সবদ বিবেক ন হোয় ॥৫॥

বিবেকের পায় ক'রে প্রণাম, গৈরিক ধারী সবাই হয়।
সে প্রণাম তার যাকগে ভেসে, শব্দ বিবেক কোথায় নয় ॥৫॥

কহৈ কবীর পুকারি কৈ, কোই সংত বিবেকী হোয়।
জা মেঁ সবদ বিবেক হৈ, ছত্র-ধনী হৈ সোয় ॥৬॥

হেঁকে কবীর বলে যদি, সন্ত বিবেক কারুর থাকে।
যা'তে আছে শব্দ বিবেক, ধনী শ্রেষ্ঠ বলি তাকে ॥ ৬ ॥

সত্ত নাম সব কোই কহৈ, কহিবে মাহিঁ বিবেক।
এক অনেকৈ ফিরি মিলৈ, এক সমানা এক ॥৭॥

সবাই বলে সত্য নাম, বল তাহা বিবেক সনে।
বহুকে এক অনেক পাবে, এক মিশবে একের সনে ॥ ৭ ॥

সমঝা সমঝা এক হৈ, অন সমঝা সব এক।
সমঝা লাঈ জানিয়ে, জাকে হৃদয় বিবেক ॥৮॥

"সুবুঝ" যত সমান তারা, অবুঝ যারা এক সবায়।
"সুবুঝ" বলে তা'রেই জান, বিবেক ভরা যার হৃদয় ॥ ৮ ॥

—শিবপ্রসাদ

———

দশাবতার চরিত

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতিঃশাস্ত্রী

শ্রীরামচন্দ্র চরিত

হনুমান বৃত্তান্ত

হনুমানের অবয়ব ও বল। রামায়ণের বর্ণনা হইতে হনুমানের প্রকৃত স্বরূপ সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। **"সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ইঁহার অবয়ব।"** এই উক্তি হইতেও আমরা হনুমানকে অন্তরিক্ষাগ্নি অর্থাৎ Atmospheric electricity বলিয়া স্থির করিয়াছি। এই গভীরতত্ত্ব, স্বল্প মেধাবী ব্যক্তিগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেনা বলিয়া এবং এই গভীর নাভস তত্ত্ব সাধারণে প্রচার হইবার নিমিত্ত কবিবর উপাখ্যানাকারে নানা রূপকে নানা ভাবে হনুমানের অলৌকিক শক্তি ও অসীম অদ্ভুত অবয়বের অবতারণা করিয়াছেন।

প্রশস্ত ও অতিদীর্ঘকায় হনুমান রাম-সীতাকে জনগণ হৃদয়ে ভক্তি সহকারে পূজা করিবে বলিয়া স্বীয় বক্ষস্থল বিদীর্ণ করিয়া রাম-সীতার মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী হনুমান শরীরের বক্ষস্থলে (সৌরজগতের কেন্দ্রে) সূর্য্য ও শুক্ররূপী রাম সীতাকে দেখাইয়াছেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি ইহা বুঝিতে সক্ষম হয়েন। রামায়ণ উত্তরকাণ্ডের ৪০ ও ৪১ সর্গে রাম ও অগস্ত্যের কথোপকথনে হনুমানের কাহিনীর সমস্ত গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মনোযোগ সহ পাঠ করিলে সহজে উপাখ্যানের মর্ম্ম উপলব্ধি হইবে।

"সুবর্ণরূপী সুমেরু নামক পর্ব্বতে হনুমানের পিতা কেশরী রাজত্ব করিয়া থাকেন।" এ স্থলে হনুমানের পিতা বায়ুকে "কেশরী" আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কেশরী শব্দের অন্যতম অর্থ সিংহ ও অশ্বাদির স্কন্ধদেশ। কেশরী অর্থে সিংহ ও অশ্ব উভয়কেই বুঝায়। অশ্ব অর্থে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ধ্রুব সপ্তর্ষি সমন্বিত সুমেরু প্রদেশ বিরাট পুরুষের স্কন্ধ ও মস্তক রূপে কল্পিত, স্কন্ধদেশস্থ বায়ু রূপ রজ্জু দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত—যেরূপ জীবের মস্তক সহ সংযুক্ত স্নায়ু মণ্ডল সমস্ত দেহ পরিচালনা করে। "সুবর্ণময় সুমেরু বায়ুর রাজধানী" এই বর্ণনায় অনেক জ্যোতিষিক ব্যাপারও বর্ণিত হইয়াছে। এবং বায়ুর অদ্ভুত শক্তি দেখাইবার জন্য ইন্দ্র কর্ত্তৃক হনুমানের রামধনু ভঙ্গ রূপ অদ্ভুত উপাখ্যান রচিত হইয়াছে।

অন্যত্র কবিবর বাল্মীকী জাম্ববানের মুখ দিয়া কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ৬৬ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত উপলক্ষে (যদিও রূপকে) প্রায় সমস্ত ব্যাপার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। সেই বৃত্তান্তের কথঞ্চিৎ নিম্নে প্রকটিত হইল।

জাম্ববান্ বহু শত সহস্র বানর বাহিনীকে বিষণ্ন দেখিয়া হনুমান্‌কে বলিতে আরম্ভ করিল, "হে সমস্ত বানর কুলের শ্রেষ্ঠতম হনুমান্! হে **সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ**! তুমি একান্তে বসিয়া রহিয়াছ এবং কিছুই বলিতেছ না কেন? তুমি হরিরাজ সুগ্রীবের তেজ এবং বল দ্বারা রাম লক্ষ্মণের সমান। (হরি অর্থে এখানে বানর, সুগ্রীবও বানর কুলোদ্ভব; পশ্চাৎ সুগ্রীবের পরিচয় প্রদত্ত হইবে।) ভগবান কশ্যপের পুত্র মহাবল বিনতানন্দন গরুড় পক্ষিগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম;

তাঁহার পক্ষদ্বয়ের যে বল, তোমার বাহুদ্বয়ের বল সেইরূপ, তোমার বিক্রম তেজ তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে।"

হনুমানের জন্ম বৃত্তান্ত। জাম্ববান বলিতেছেন—"অপ্সরাগণের শ্রেষ্ঠা **পুঞ্জিকস্থলা** নাম্নী অপ্সরা অঞ্জনা নামেই বিশেষরূপে বিখ্যাতা; কেশরী-পত্নী সেই রমণী ত্রিলোক মধ্যে রূপে অনুপমা, তিনি অভিশাপ হেতু কামরূপিনী বানরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি **বানর শ্রেষ্ঠ মহাত্মা কুঞ্জরের দুহিতা।** এই অধ্যাত্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রূপকে আবৃত। রূপকালঙ্কার উন্মুক্ত হইলে সত্যতত্ত্ব বহিষ্কৃত হইবে। 'পুঞ্জিকস্থলা'—পুঞ্জিভূত পৃথ্বি ও জল পরমাণুরাশি", অপ্সরা—জলের সারভূতা পৃথ্বি ও জলতত্ত্বই প্রকৃতি এবং অগ্নি ও বায়ুতত্ত্বই পুরুষ। বিশ্বে এই দুই প্রকার পুরুষ ও প্রকৃতির লীলা চলিতেছে। অঞ্জন শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে অঞ্জনা। অঞ্জন=কৃষ্ণবর্ণ বা কজ্জল। অঞ্জন শব্দ অন্‌জ ধাতু হইতে উৎপন্ন; অন্‌জ ধাতুর অর্থ গতি প্রকাশ, প্রক্ষণ ও দীপ্তি। অঞ্জনা বা কৃষ্ণবর্ণ প্রকৃতি হইতে অরুণবর্ণদীপ্তির উদয়কে লক্ষ্য করিয়া উপাখ্যান রচিত। অঞ্জনার পিতারও কিছু পরিচয় আবশ্যক। তাঁহার পিতা মহাত্মা কুঞ্জর। কুঞ্জর শব্দের সাধারণ অর্থ হস্তী। ইহা পার্থিব সাধারণ হস্তী নহে। উক্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে গূঢ় অর্থ নিষ্কাশিত হইবে। (কু+জৃ=কর্ত্তৃবাচ্যে অন) কু অর্থে পৃথিবী এবং জৃ ধাতুর অর্থ জীর্ণ করণ। অর্থাৎ এই স্থুল পৃথিবীকে যিনি জীর্ণ করিতে পারেন বা পরমাণুতে পরিণত করিতে বা কারণে লয় করিতে পারেন, সেই সংবিৎ স্বরূপ পারমার্থিক অগ্নি।

মহাকবির সুলেখনী ও সুপ্রতিভা হইতে কিরূপ সুললিত আদিরসঘটিত কবিত্বপূর্ণ ভাষায় কপিরাজের জন্মকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে শুনুন :—

"একদিন সেই রূপ-যৌবনশালিনী ক্ষৌমাম্বরপরিধানা বিচিত্র মাল্য ও আভরণ ধারিণী কামিনী মানুষরূপ (?) ধারণ পূর্ব্বক বর্ষাকালীন মেঘতুল্য পর্ব্বতের শিখরদেশে বিহার করিতেছিলেন। পবনদেব সেই পর্ব্বতাগ্রে অবস্থিত বিশালাক্ষীর **রক্তবর্ণ দশাবিশিষ্ট** মনোহর বস্ত্র উড়াইয়া ছিলেন। তদনন্তর তিনি মানুষরূপার সুগোল সুগঠিত উরুদ্বয়, পীনোন্নত পয়োধর যুগল, সুশোভিত মনোহর আনন অবলোকন করিলেন। তখন সর্ব্বাঙ্গে মন্মথাবিষ্ট সমীরণ কামমোহিত হইয়া, সেই চারু মধ্যা, সুশ্রোনী আনন্দিতা শুভ সর্ব্বাঙ্গী যশস্বিনীকে বলপূর্ব্বক দীর্ঘ বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন।"

জাম্ববান পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"গুহাস্থলে (পরমব্যোমে) ব্যোম গুহায় তোমাকে প্রসব করিলেন। তুমি শৈশবাবস্থায় মহাবনে (ইন্দ্রের নক্ষত্র চক্ররূপ নন্দন কাননে) অবস্থিত ছিলে। (এই সঙ্গে জাম্ববান স্বীয় পরিচয়ও সংক্ষেপে কথঞ্চিৎ দিয়াছেন।) হে! "বানর সত্তম উঠ, মহাসাগর লঙ্ঘন কর। তোমার লঙ্কাগমন সমস্ত জীবগণের হিতকর তাহাতে সন্দেহ নাই। বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমণের ন্যায় তুমিও এক্ষণে মহাবেগে সমুদ্র লঙ্ঘন কর।"

এই বিবরণ হইতে হনুমানের প্রকৃত স্বরূপ বিজ্ঞ পাঠক মাত্রেরই সহজে উপলব্ধি হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

হনুমান নাম হইবার কারণ। হনু অর্থে গণ্ডস্থলের উপরি-ভাগ (চক্ষু ও অপাঙ্গের নিম্নভাগ)। হনু অর্থাৎ ঐ স্থান বিশেষ ভাবে উচ্চ হইলে বা হনু স্পষ্ট ভাবে থাকিলে হনুমান—বলা যায়। (অস্ত্যর্থে মতুপ্ প্রত্যয়ে পদটি সিদ্ধ)। কিন্তু রামায়ণে উক্ত নাম নির্দ্দেশের ভিন্ন কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। জাম্ববান বলিতেছেন—"তুমি শৈশবাবস্থায় মহাবনে (নন্দন কাননে) অবস্থিত ছিলে; একদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইতেছে দেখিয়া ফল বিবেচনায় তাঁহাকে গ্রহণেচ্ছু হইয়া লম্ফ দিয়া আকাশ মার্গে উত্থিত হইয়াছিলে। তিন শত যোজন গমন করিলে রবির তেজ দ্বারা সন্তপ্ত হইলেও বিশাদপ্রাপ্ত হইলে না। হে কপিবর তোমাকে অন্তরীক্ষে উপগত দেখিয়া ইন্দ্র কোপাবিষ্ট হইয়া তোমার উপর বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন শৈলের শিখরাগ্রে তোমার বাম হনু ভগ্ন হইয়াছিল। সেই হেতু তোমায় নাম হনুমান হইয়াছে। (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৬৬ অঃ।) এই উক্তি ও যুক্তি অত্যন্ত রহস্য পূর্ণ। হনুমানের অন্যতম নাম বজ্রকঙ্কট। কঙ্কট শব্দের অর্থ তনুত্রাণ বা সাঁজোয়া। বজ্র যাহার শরীর সাঁজোয়ার ন্যায় আবরণ করিয়া ত্রাণ করে। হনুমানের অপর একটি নাম অর্জ্জনধ্বজ, অর্জ্জন অর্থে শ্বেত বর্ণ জ্যোতি সেই শ্বেত বর্ণ জ্যোতি যাহার পতাকা স্বরূপ তিনিই অর্জ্জনধ্বজ। এই সকল নাম হইতেও প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। ভৌম জীব হনুমান ফল দেখিলে লম্ফ দিয়া ধরিতে যায়, সেই ঘটনা সহ উপমা দিবার জন্য উক্ত হাস্যরসোদ্দীপক আখ্যায়িকার সৃষ্টি। হনু বিশেষভাবে থাকিলেই হনুমান আখ্যা হয়, কিন্তু একটি ভগ্ন হইলে হনুমান নাম কেন হইল ?

ধ্রুব ও সপ্তর্ষি মণ্ডলই বিরাট পুরুষের মুখমণ্ডল। বেদ ও পুরাণের বহু স্থানে তাহার উল্লেখ দেখা যায়। উত্তরাকাশের ন্যায় দক্ষিণাকাশেও পরধ্রুব বা যাম্যধ্রুব বিদ্যমান। উত্তরধ্রুবে যে প্রকার কশ্যপ, মহেন্দ্র, অগ্নি, সপ্তর্ষি প্রভৃতি নক্ষত্র বিদ্যমান, দক্ষিণ বা পরধ্রুবে সেরূপ নক্ষত্রাদি নাই; দেখিতে ভগ্নপ্রায় ইহাই এক হনুভঙ্গের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়। ইহা দ্বারা সমস্ত ঊর্দ্ধ খগোলকে হনুমানের মুখ কল্পনা করা হইয়াছে।

ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নাম মহাহনু। (গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ১৫অঃ। "মুনিস্তোমুনিমৈত্রো মহানাদো মহাহনুঃ।")

বৃক্ষোকস ক্রোধান্বিত অসিতানন দন্ত বিকীর্ণ করিলে কৃষ্ণ মেঘ হইতে বিদ্যুতাভার ন্যায় প্রতিপন্ন হওয়ায় নাভস হনুমান সহ উপমিত হইয়াছে।

হনুমানের শক্তি ও আত্ম পরিচয় প্রদান।

শত (বহু) যোজন সমুদ্র (আকাশ সমুদ্র) লঙ্ঘনের জন্য হনুমানকে সহসা বেগে পরিপূর্ণ দেখিয়া বানরগণ ঈর্ষান্বিত হইল। হনুমান তেজে পরিপূর্ণ এবং সুমহৎ অপ্রমেয় দেহবিশিষ্ট হইলেন। তাঁহার মুখ প্রদীপ্ত ভৃষ্টপাত্রের (ভ্রস্জ ধাতু হইতে ভৃষ্ট; অর্থপাকও ভাগ; ভর্গ শব্দও এই ধাতু হইতে উৎপন্ন) ন্যায় হইলে তিনি বিধূমাগ্নের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে প্রফুল্ল রোমা (রশ্মিজাল বিস্তার পূর্ব্বক) হনুমান কপিগণকে বলিতে লাগিলেন।

'হুতাশনসখা আনিল পর্ব্বতাগ্র ভেদ করিয়া থাকেন; আমি সেই মারুতের পুত্র এবং লঙ্ঘণ বিষয়ে তাঁহার সমান। ইহার অর্থ বৈদ্যুতিক শক্তি ও গতি বায়ু অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

আমি বিস্তীর্ণ আকাশ স্পর্শী মেরুগিরিকে একবারও বিশ্রাম না করিয়া সহস্রবার প্রদক্ষিণ করিতে পারি। (সহস্র মহাযুগে এক শ্বেত বরাহ কল্প হয়। মৎস্য চরিত দ্রষ্টব্য।) আর বায়ুবেগে সঞ্চালিত সাগর দ্বারা সর্ব্বত্র, হ্রদ ও নদী সহিত (সপ্ত) লোক আপ্লাবিত করিতে পারি। পক্ষিকুল (গ্রহগণ) কর্ত্তৃক পরিসেবিত ভুজঙ্গভোজী গরুড় (সূর্য্য) যে সময়ে যতদূর গমনে সমর্থ, আমি সেই সময়ে তাহার সহস্রগুণ অধিক পথ গমন করিতে পারি। * * * আমি সমস্ত আকাশচারী গ্রহ নক্ষত্রাদি অতিক্রম, সাগর শোষণ ও পৃথিবী বিদারণ করিতে সমর্থ।" (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৬৭ সর্গ।)

এইরূপে স্বীয় অসীম ক্ষমতাসূচক বহু বাক্য বলিয়া সেই শত্রু সংহারকারী বেগবান **মনস্বী মহানুভব মহাত্মা** হনুমান লম্ফ প্রদানার্থে বেগদানে সমাহিতচিত্ত হইয়া মনে মনে লঙ্কাপুরী স্মরণ করিলেন।

মন্তব্য। ইহা পাঠ করিলে অন্তরীক্ষস্থ বৈদ্যুতিকাগ্নিই যে হনুমানের অববোধক তাহাতে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ভ্রান্তি-বিনোদন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাজবৈদ্য—শ্রীযুক্ত শক্তিচরণ রায় বিশারদ

২৩। মায়ার কার্য্য—(১) এই সংসার মায়ার সৃষ্টি। মায়ার স্বরূপ বৈপরীত্য (উল্টা পাল্টা)। শাস্ত্রে ইহা যেখানে সেখানে দেখা যায়। বিজ্ঞান এতকাল ইহা পাগলের কথা বলিত ও মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইয়া গোজা দিয়া উড়াইয়া দিত। আজ ২৫।৩০ বৎসর বিজ্ঞান সর্ব্বত্রই মায়ার বৈপরীত্য দেখিতে পাইয়া থমকাইয়াছে, তথাপি স্বীকার করে নাই। মাত্র মাস কতক হইল বিজ্ঞানকে মায়া মানিতে হইয়াছে।

২। ভগবান্ মায়া যেমন লুকাইতে ব্যস্ত তেমনই জানাইতে ব্যস্ত। যাহাতে মায়ার বৈপরীত্য স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হয় সেই জন্যই মানুষ শরীরের ভিতর সর্ব্বত্রই মায়ার খেলা করিয়াছেন। একটু তাকাইয়া দেখিলে মায়ার খেলা চারিদিকেই দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ একেবারে অন্ধ তাই দেখাইলেও দেখে না দেখিয়াও দেখে না। তাই এত স্পষ্ট জিনিস জানিতে পারে না। কয়েকটী উদাহরণ দিয়া বুঝান যাইতেছে।

শাস্ত্র—১। ঈশ্বর আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করেন, আপনিই আপনাকে রক্ষা করেন, আপনিই আপনার জিনিষ চুরি করেন। (১২) ২। যিনিই ভাব তিনিই অভাব অর্থাৎ যিনিই আছেন তিনিই নাই। (১৩) ৩। যিনিই লক্ষ্মী তিনিই অলক্ষ্মী অর্থাৎ যিনিই ঐশ্বর্য্য দেন তিনিই

(১২) আত্মৈব তদিদং বিশ্বং সৃজ্যতে সৃজতি প্রভুঃ। ত্রায়তে ত্রাতি বিশ্বাত্মা হ্রিয়তে হরতীশ্বরঃ। ভা° ১১।২৮।২ (১৩) ভাবাভাবস্বরূপা মা জগদ্ধেতুঃ সনাতনী। পদ্ম° (১৪) ভবকালে নৃণাং সৈব

ঐশ্বর্য্য নাশ করেন। (৭৪) ৪। যিনিই বিদ্যা তিনিই অবিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞান এক। (৭৫) ৬। মানুষ কাঠের পুতুল তথাপি তাহার পুরুষকার আছে অর্থাৎ তাহার কাজ করিবার শক্তি আছে। (৭৭) ৭। সত্য মিথ্যা আছে ও নাই, গুণ দোষ আছে ও নাই। (৭৮) ৮। গুণই দোষ ও দোষই গুণ। (৭৯) ৯। ভেদই অভেদ ও অভেদই ভেদ। (৮০) ১০। কামক্রোধাদি পরম রিপু ও পরম মিত্র। (৮১) ১১। দুনিয়া আপন ও পর (৮২)। ১২। মনই বন্ধের কারণ ও ও মনই মুক্তির কারণ। (৮৩) ১৩। সঙ্গই সর্ব্বনাশের কারণ ও সঙ্গই মোক্ষলাভের কারণ (৮৪)। (১৪) বন্ধনই মুক্তি ও মুক্তিই বন্ধন (প ৬ দেখ)। (.৫) কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নিত্য ও অনিত্য (প ১৬।৩-৬)। (১৬) কার্য্য কারণ ও বস্তু এক ও অভিন্ন (প ১৬।১)। (১৭) ঈশ্বরই মায়ায় মুগ্ধ করেন ও ঈশ্বরই মায়া কাটান (প ৫।১ দেখ)। (১৮) ঈশ্বরই নারী সৃষ্টি করিয়াছেন ও ঈশ্বরই নারী ভয়ঙ্করী বলিয়া ঢাক পিটাইতেছেন (প ৫।১ দেখ)। (১৯) মা ও স্ত্রী উভয়েই নারী। (২০) জ্ঞান করিলে জ্ঞান হয় না (৮৫)। (২১) কষ্ট করিলেই কষ্ট যায় (প ১৫ দেখ)। (২২) নিজের ক্ষতি করিলেই লাভ (প ২৬ দেখ)। (২৩) শাস্ত্র-বিষয়ে বিচার করিতে নাই ও করিতে হয়। (৮৬)। (২৪) প্রমাণের বিষয় প্রমাণেই আছে (প ১৬।২)। (২৫) না ধরিয়া প্রমাণ করা যায় না (প ১৬।২)। (২৬) স্থূল ও সূক্ষ্ম আছে ও নাই (প ১৯ দেখ)। (২৭) বাহিরের আচার মনের আচার হইতে বড় ও ছোট (প ১৪ দেখ)। (২৮) চণ্ডাল অস্পৃশ্য কিন্তু তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। (৮৭) (২৯) সৎকার্য্য করিলেই অহঙ্কার হয় অর্থাৎ সৎকার্য্যে অসৎফল। (৩০) সমানে বাড়ে ও সমানে কমে (৮৮)। (৩১) মানুষ মুক্তিদেহ পাইয়া বন্ধনের জন্যই ব্যস্ত (৮৯)। (৩২) মানুষ সুখের চেষ্টায় দুঃখ জড়াইয়া ধরে (৯০)। (৩৩) পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলে পূর্ণই থাকে।

লক্ষীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে। সৈবাভাবে তথালক্ষী-বিনাশায়োপজায়তে। সপ্তশতী° (৭৫) নিদানভূতা বিশ্বস্য বিদ্যাবিদ্যেতি গীয়তে। পদ্মঃ (৭৬) যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃপরংগতঃ। তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনাঃ। নারদ° (৭৭) ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। গীতা ১৮।৬১ (৭৮) মনশ্চেদুন্মনী ভূয়াৎ ন পুণ্য ন চ পাতকম্। যোগশিখা° (৭৯) ক্বচিদ্ গুণোপি দোষঃ স্যাৎদোষোঽপি বিধিনা গুণঃ। গুণদোষার্থনিয়মস্তদ্ভিদামেব বাধতে। ভা ১১।২১।১৬ (৮০) একোঽহং বহুস্যাম্। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন (৮১) এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ। ত এবাত্ম বিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতা পরে। ভা ১১।১২।৫ (৮২) আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি পরদ্রব্যাণি লোষ্ট্রবৎ (৮৩) মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। (৮৪) প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ। স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্। ভা° ৩।৫।২০ (৮৫) জ্ঞান তদেতদমলং দুরবাপমাহ নারায়ণো নরসখঃ কিল নারদায়। একান্তিনাং ভগবতস্তদকিঞ্চনানাং পাদারবিন্দ-রজসাপ্লুত-দেহিনাং স্যাৎ। ভা ৭।৭।২৭ (৮৬) আর্ষং ধর্ম্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা যঃ তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ (৮৭) প্রণমেদ্দণ্ডবৎ ভূমাবাশ্ব চাণ্ডালগোখরম্। (৮৮) সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধিকারকম্। বিপরীতঃ সদা কল্প্যো বিপরীত প্রশান্তয়ে। (৮৯) যঃ প্রাপ্য মানুষং লোকং মুক্তিদ্বারমপাবৃতং। গৃহেষু খগবৎসক্ত স্তমারূঢ়চ্যুতং বিদুঃ। ভা (৯০) সকল ইহ কর্ম্মিণঃ। সদাপ্নোতীহয়া মায়া অনীহারাঃ সুখং সুতম্। সুখানুধ্যাননিরতা জীবাঃ মায়া বিমোহিতাঃ। যথার্থসুখহেতুং তং ন ধ্যায়ন্তি হৃদীশ্বরম্। আদিপু°। T. 35—Thomson's Atom page 35. T. 227 Thomson P. 227.

বিজ্ঞান—(১) মানুষের শরীরের সকল কার্য্যই বিপরীত (প ১২।৫ দেখ)। (২) জীবাণু উদ্ভিদ হইয়া প্রাণীর ন্যায় আচরণ করে (প ২১।৮)। (৩) দুইটী বিপরীত বস্তু সর্ব্বত্রই আছে (হিন্দুধর্ম্ম* প° ৫৫ দেখ)। (৪) বিশ্বাস ভিন্ন জ্ঞান হয় না। মানিয়া লইয়াই জ্ঞান হয় (হিন্দুধর্ম্ম প ৫৫ দেখ)। (৫) বিজ্ঞানের সকল বড় আবিষ্কারই অবিচারিত অর্থাৎ আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে, বিচার করিয়া বাহির করা হয় নাই (প ১১।৫ ও T. 35)। (৬) গোলমালের ভিতরই নিয়ম ও নিয়মের ভিতরই গোলমাল থাকে (T.227) ইহাকেই বলে বিধি ও অপবাদ (নিয়ম ও তাহার ব্যতিক্রম)। তাই শাস্ত্রে বলে সাপবাদা হি বিধয়ঃ অর্থাৎ সকল নিয়মেরই উল্টা আছে। নিয়ম সর্ব্বত্র খাটে না. (৭) কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিত্য ও অনিত্য। (৮) পদার্থ পদার্থও বটে পদার্থ নয়ও বটে (প ১০।৪)। (৯) বস্তুর গুণ কখনও কখনও স্থান ও অবস্থার উপর নির্ভর করে (প ৯।৩ দেখ)। (1)

স্থূলদৃষ্টি—(১) স্ত্রীপুরুষ না হইলে, সৃষ্টি হয় না। (২) ক্ষুধা পাইলে খায়। কাযেই যতটুকুই ক্ষুধা ততটুকুই খাইবে। তাহা হইলে চলিবে না। ক্ষুধার অতিরিক্ত খাইয়া অতিরিক্ত অংশ বাহ্য করিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ ওজন করিবার সময় বামদিকে ২ সের ও ডান দিকে ৫ সের চড়াইয়া ৩ সের কমাইয়া দিলে সমান হয়। অর্থাৎ ২ সের ২ সের নহে, ৫ সের হইতে ৩ সের কমাইলে ২ সের হয়। (2) প্রয়োজন মত হইলে প্রয়োজন মত হয় না—অধিক লইয়া খানিকটা ত্যাগ করিলে প্রয়োজন মত হয়। (3) সেইরূপ তৃষ্ণায় অধিক খাইয়া মূত্রত্যাগ করিতে হয়। (৪) শরীর ধারণের জন্য যে যে জিনিষ প্রয়োজন কেবল সেই সেই জিনিষ সেই মাত্রায় থাকিলে শরীর থাকে না। অনেক বাজে জিনিস খাইতে হয় তবেই শরীর থাকে। (বেরথেল) Berthelot শ্রেষ্ঠ রসায়নবিৎ ছিলেন। শরীর ধারণের যে যে জিনিষ প্রয়োজন হয় মাত্র সেই সেই জিনিষ খাওয়াইয়া তিনি দেখেন দুদিনে শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গেল। আর সেই সেই জিনিষের সঙ্গে বাজে জিনিষ মিশাইয়া খাওয়াইলে শরীর বেশ থাকে। অর্থাৎ মাত্রা বা পরিমাণ (bulk)কে তুচ্ছ করা যায় না। যে যে জিনিষ প্রয়োজন সেই সেই জিনিষে সেই সেই জিনিষ হয় না—সেই সেই মাত্রায় সেই সেই জিনিষ হইলেই সেই সেই জিনিষ হয়। (৫) চিবাইয়া খাইলে ও রস করিয়া খাইলে উভয়ের ফলের অনেক তফাত হয়। আম ও আমের রস, ডালিম ও ডালিমের রস, বার্লি ও বার্লির রুটি অনেক তফাৎ। (৬) মিছরী চিনি ও বাতাসা একই জিনিষ কিন্তু তাহাদের ফল ভিন্ন ভিন্ন। (৭) ঘুম না হইলে প্রাণ বাঁচে না। অর্থাৎ বাঁচিবার জন্য মরিতে হয়। চলিতে গেলে যে দিকে যাইতে হয় সেই দিকে যাইতে নাই। পা তুলিয়া ফেলিয়াই পশু চলে, ডানদিকে ও বামদিকে পাখা ঠেলিয়া পাখী চলে, ডানদিকে বাঁকিয়াই সাপ চলে। অর্থাৎ দুইটি বিপরীত বস্তু মিশিয়া একটি হয়। সোজা এগুতে কেহই পারে না। (৯) বসিলে কি দাঁড়াইলে যে জিনিসের উপর বসা কি দাঁড়ন যায় সেই জিনিষও সঙ্গে সঙ্গে ঠেলে। নতুবা পড়িয়া যাইতে হইত। (১০) সেইরূপ ঘোড়া যখন গাড়ী টানে তখন গাড়ীও ঘোড়াকে টানে। নতুবা গাড়ী ঘোড়ার ঘাড়ের উপর যাইয়া পড়িত।

(1) Principle of Causality and principle of Indeterminacy.

(2) $a+b=/=a+b-a+b+c$.

অর্থাৎ একটী কার্য্য হইলে মায়ার বশে তাহার বিপরীত কার্য্য আপনা হইতেই হয়। (১১) স্থূল ও সূক্ষ্মের ভিতর সূক্ষ্মই প্রধান [প ২০ দেখ]। অথচ স্থূলই দেখিতে পাওয়া যায় সূক্ষ্ম দেখিতে পাওয়া যায় না। কাজেই স্থূলই প্রধান হওয়া উচিত ছিল। (১২) অদৃষ্টই প্রধান, দৃষ্ট কর্ম্ম (এ জীবনের কর্ম্ম) তাহার কাছে কিছুই নহে। (১৩) গাড়ীর চাকা ঘুরিবে বলিয়াই কসিয়া আটকাইতে হয়, ঢিলা হইলেই খুলিয়া পড়িয়া যায় ও প্রাণ যায়। (১৪) ফলের ছাল ছাড়াইয়া রাখিলে ফল শীঘ্রই নষ্ট হয়। অর্থাৎ ফলটীকে রক্ষা করিবার জন্য যাহার আদৌ প্রয়োজন নাই সেই ছালের দরকার (১৫) সেইরূপ শরীর চামড়া দিয়া ঢাকা। (১৬) সেইরূপ সংসার মায়ার আবরণ (চামড়া) দিয়া ঢাকা। (১৭) রাখিতে গেলেই ঢাকিতে হয়। হিন্দুমেয়েদের ঘরে ঢাকিয়া রাখিতে হয়, যাহাতে কুলোকে নজর দিতে না পারে। গোপন শব্দে রক্ষা করা ও ঢাকা দুইই বুঝায়।

২৪। **শাস্ত্রের বিরোধ**—১। মধ্যে মধ্যে শাস্ত্রে বিরুদ্ধ কথা পাওয়া যায়। অর্থাৎ শাস্ত্রের এক জায়গার কথা অপর যায়গার কথার সঙ্গে মিলে না। ইহাতে নাস্তিকগণের মহা আনন্দ। তাহারা মনে করে শাস্ত্রকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার ইহাই উত্তম অবসর। তাহাদের এই চেষ্টা যে কতখানি দুষ্ট তাহা তাহাদের আচরণে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ২। বিজ্ঞান ত পদে পদে ভুল। তবে সেই ভ্রান্ত বিজ্ঞানকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কথা দূরে থাকুক মানিতে এত ব্যস্ত কেন? সত্য মানুষ জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। তবুও এই মানুষকেই বিশ্বাস করিতে ব্যস্ত কেন? তবে আর আদালত কেন? সাক্ষ্য লওয়া কেন? শরীর চিরকাল থাকে না। তবে আর বাঁচা কেন? খাইলে কিছুক্ষণ পরে ক্ষুধা পায়? তবে আর খাওয়া কেন? সংসারে সকল জিনিষেই দোষ আছে। তাই বলিয়া কিছুই ত ত্যাগ করি না। তবে শাস্ত্রে যদি দু চারিটী ভুলই থাকে তাহা হইলেও শাস্ত্র হাসিয়া উড়াইয়া দিবার কারণ কি? কাজেই দেখা যাইতেছে যে শাস্ত্রবিদ্বেষই এই দুষ্ট চেষ্টার মূল। উচ্ছৃঙ্খলতাই এই শাস্ত্রবিদ্বেষের মূল ও বিপরীত বুদ্ধিই এই উচ্ছৃঙ্খলতার মূল।

৩। পূর্ব্বে যাহা লিখা হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া পড়িলেই বুঝা যাইবে শাস্ত্রই একমাত্র সত্য আর সব সত্যের ধারই ধারে না। যাহারা দুই চারিটি ভুলের জন্য এত বড় সত্যের মাথায় পদাঘাত করিতে পারে তাহাদের বুদ্ধি কি রকম দুষ্ট তাহাদের প্রকৃতি কি রকম নষ্ট তাহা সহজেই বুঝা যায়। মাছি ঘা খুঁজে, শূকর বিষ্ঠা খুঁজিয়া বেড়ায় (২১)। সেইরূপ ইহারা শাস্ত্র না মানিবার ছুতা খুঁজিয়া বেড়ায়, মায়ার বশে সংসারের সব জিনিষই দোষে গুণে হয়। কোন জিনিষই নির্দ্দোষ নহে (২২)। অতএব কেবল শাস্ত্রের বেলাই দোষে গুণে হইলে এত আপত্তি হয় কেন?

৪। এতক্ষণ ধরিয়াই লওয়া হইতেছে শাস্ত্রে দোষ আছে শাস্ত্রের কথা ভুল ইত্যাদি। অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, মনের দৌরাত্ম্য ছাড়িয়া, সত্যই ঈশ্বর ও ঈশ্বরই সত্য ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া সত্যকে মাথায় করিয়া রাখিয়া, মিথ্যাকে লাথি মারিয়া দূর করিয়া, স্থির চিত্তে দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে শাস্ত্রের এই আপাত (দেখ্‌তা) দোষই শাস্ত্রের গুণের প্রমাণ, শাস্ত্রের এই আপাত (দেখ্‌তা) ভুলই সত্যতার প্রমাণ।

(২১) মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি॥ (২২) মায়াস্পৃষ্টং জগৎ স্পৃষ্টং নির্দ্দোষং ন কদাচন।

৫। শাস্ত্র বলেন ভগবানই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তেজই জগতের কারণ ও কাল হইতে সকল বস্তু উৎপন্ন। এই তিনটি কথা দেখিতে যে বিরুদ্ধ (উল্টা পাল্টা) তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদের ভিতর প্রকৃত বিরোধ কিছুই নাই। ভগবানই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিই সূর্য্যরূপে সকল তেজের আধার ও তেজের দ্বারাই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন (৯৩)। তিনিই কালরূপী ও কালবশেই জগতের সৃষ্টি ও নাশ হয় (৯৪)। শাস্ত্রে আরও বলে মনই জগৎ ও মনই কর্ম্ম সৃষ্টি করে। এই মনই ভগবানের সৃষ্ট ও এই মনের আসক্তিই সংসারের কারণ। একই কথা নানা দিক হইতে দেখিয়া নানাভাবে বলিলে কথাগুলি দেখিতে পরস্পর বিরুদ্ধভাবে (উল্টা পাল্টা) ও ভুল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সকল গুলিই সত্য, বিরুদ্ধভাবে না বলিলে সমস্ত সত্য প্রকাশ হইত না ও ভুলই হইত। কাযেই বিরোধেই বিরোধ দূর হয় ও অবিরোধেই বিরোধ হয়। উল্টা পাল্টাই সোজা ও সোজাই উল্টা পাল্টা ইহাই মায়ার খেলা। ইহাই বুদ্ধির অগম্য।

৬। বিরোধেই বিরোধ দূর হয় ও বিরোধ না থাকিলেই বিরোধ হয়। এই কথা স্মরণ রাখিলে শাস্ত্রের বিরোধই শাস্ত্রের গুণ তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই মায়ার কার্য্য বুঝা একেবারেই অসম্ভব। শ্রীভগবান্ নির্হেতুক কৃপা করিয়া যাহাকে যত জানাইয়া দেন তিনিই ততটুকু জানিতে পারেন। ইহা গুরুমুখগম্য। লিখিয়া বুঝান যায় না। প্রাজ্ঞও স্বীকার করিয়াছেন বিশ্বাসেই এ২ কথা বুঝা যায়, বিশ্বাস না করিলে কিছুতেই বুঝা যায় না।

৭। জগৎ মায়ার বশে ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবান—চারিদিকে বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছেন। শরীরের ভিতর সর্ব্বত্রই বিরোধ। বাহ্যজগতে (বাহিরে) সর্ব্বত্রই বিরোধ (মায়ার কার্য্য পঃ ২৩ দেখ)। তেমনই শাস্ত্রেও সর্ব্বত্রই বিরোধ ইহাতে দোস না হইয়া গুণই হইয়াছে। এক কথায় অবস্থা ভেদেই ব্যবস্থা ভেদ ও ব্যবস্থা ভেদেই রূপভেদ হইয়াছে (রূপভেদ = বিরোধ)। মায়ার সংসারে একই ব্যবস্থা কখনই সর্ব্বত্র চলিতে পারে না। এই জন্যই শাস্ত্র নানা অবস্থায় নানা ব্যবস্থা করিয়া কাহার কোনটি ঠিক জানিবার জন্য জ্ঞানী গুরুর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৮। শাস্ত্র আরও বলেন যে, মনুষ্য প্রকৃতই আপনার কল্যাণ চাহে সে সর্ব্বত্রই ভ্রমরের ন্যায় খুঁজিয়া আপনার কল্যাণ বাছিয়া লইবে (৯৫)। শ্রীভগবানের অশেষ কৃপা ভিন্ন মানুষের কিসে কল্যাণ হয় কোন মানুষই বলিতে পারে না। কাহারও চুরি করিলেই কল্যাণ হয়। কাহাকেও ভগবানের নাম করিতে, জপ করিতে নিষেধ করিতে হয়। কাহাকেও মদ্য ও মাংস খাইতে বলিতে হয়। কিন্তু সকল সময়েই শাস্ত্রের গণ্ডীর ভিতর থাকিয়া চলিলে প্রকৃত কল্যাণ হয়।

৯। দুই একটী সামান্য স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা অবস্থাভেদ ব্যবস্থা ভেদ কথাটী বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে। মনে কর একজন বলিতেছে প্রয়াগরাজ পশ্চিমে ও আর একজনে বলিল প্রয়াগরাজ পূর্ব্বে। দুই জনের কথা দেখিতে বিরুদ্ধ কিন্তু দুইটীই সত্য। বরং দুইজনেই যদি প্রয়াগরাজ পশ্চিমে বলিত তাহা হইলেই মিথ্যা হইত। সেইরূপ প্রয়াগরাজকে কেহ উত্তরে কেহ দক্ষিণে কেহ

---

(৯৩) সূর্য্যাদ্ভাবন্তি ভূতানি সূর্য্যেণ পালিতানি তু। সূর্য্যে লয়ং প্রাপ্নুবন্তি যঃ সূর্য্যঃ সোঽহমেব চ। সূর্য্যোপনিষৎ ৪৪৫ পৃঃ। (৯৪) জন্মিনাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ।

(৯৫) অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ। সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষটপদঃ। ভা° ১১।৮।১২

পূর্ব্বোত্তর কোণে কেহ পশ্চিম দক্ষিণে বলিবে। তবেই ঠিক হইবে। অর্থাৎ বিরুদ্ধ কথা হইলেই ঠিক হয় বিরুদ্ধ না হইলেই ভুল হয়। তাই নানা মুনির নানা মত। তাই শাস্ত্রের বিরোধ। সেই-রূপ একই লোক ছেলে, ভাই, স্বামী, বাবা ইত্যাদি হয়। তাহাতে বিরোধ ত হয়ই না। বরং বিরোধ না হইলেই বিরোধ হয়। সেইরূপ একই জিনিষকে কঠিনও বলা যায় নরমও বলা যায়, সাদাও বলা যায় ময়লাও বলা যায়, বড়ও বলা যায় ছোটও বলা যায় ইত্যাদি, ইত্যাদি। কাযেই বিরুদ্ধ কথা না বলিলেই দোষ হয় ও বিরোধের দ্বারাই বিরোধ দূর হয়। ইহাই মায়ার কার্য্য। ইহাই মায়ার বৈপরীত্য।

১০। অবশ্য তাই বলিয়া পাগলামি ভাল নহে। বিরোধ নাই ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে মায়ার দ্বারা ইহার বিপরীতও সত্য হইবে অর্থাৎ বিরোধে বিরোধ আছে ইহাও সত্য। সেই-রূপ বিরোধে বিরোধ আছে সত্য হইলে বিরোধে বিরোধ নাই ইহাও সত্য। অর্থাৎ বিরোধে বিরোধ হইলেই বিরোধে বিরোধ আছে হইল। অর্থাৎ বিরোধে বিরোধ থাকেও বটে থাকেও না বটে। ইহা মনুষ্য বুদ্ধির অতীত। এই বৈপরীত্য মনুষ্য ধারণাও করিতে পারে না। অথচ মনুষ্য এমনই হতভাগ্য যে এই কথার উপর সর্ব্বদাই নিজ ঘোর দুর্ব্বুদ্ধিবশে টোকা মারিতে ব্যস্ত। বিরোধে কোন্‌খানে দোষ ও কোন্‌খানে গুণ ইহা নির্ণয় করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। শাস্ত্রে যেখানে যেখানে বিরোধ আছে সকল গুলি বুঝাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। অতএব দুচারিটী মাত্র বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে।

১১। শাস্ত্রে বলে গঙ্গাজল পান পবিত্র, পুষ্পকরথ, ক্ষীরোদসমুদ্র, হনুমান শত যোজন (৮০০ মাইল) সমুদ্র লাফ দিয়া পার হইয়াছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্ধ দুষ্টবুদ্ধি বিপরীতগামী মনুষ্য ইহার জন্যই শাস্ত্র গেঁজেলি বলিয়া শিয়ালডাক ডাকিতে থাকে। কেন না সেই সব সর্ব্বজ্ঞের মতে এইগুলি হইতেই পারে না। কিন্তু তাহারা জানিল কিরূপে? এই রকম হইতে তাহারা কখনও দেখেও নাই শুনেও নাই ইহা ঠিক। কিন্তু সেই সর্ব্বজ্ঞেরা যাহা দেখেও নাই শুনেও নাই সেই জিনিষই পরে হইয়াছে কি তাহার দেখেও নাই শুনেও নাই? তাহা যদি হয় তবে তাহারা একেবারে মূর্খ এই পর্য্যন্তই বলা যাইতে পারে। কে কবে মনে করিয়াছিল Rontgen ray, Aeroplane, Wireless Telegraphy, revision প্রভৃতি শত শত জিনিষ হইবে? মূর্খ অন্ধ মনুষ্যই এই গুলির জন্য শাস্ত্রে অবিশ্বাস করিতে পারে। কিন্তু এইগুলির মধ্যে প্রকৃত বিরোধ আদৌ নাই। কেবল এতদিন হইতে দেখে নাই এই পর্য্যন্ত। যে যে কথাগুলির ভিতর প্রকৃত বিরোধ আছে তাহাদের ভিতর কয়েকটী বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে।

১২। ভেদাভেদ আছে ও নাই—শাস্ত্র বলেন ভেদ আছে। আবার সেই শাস্ত্রই বলিল ভেদ নাই (২৬)। ক্ষীরোদসমুদ্র পুষ্পকরথ প্রভৃতি কেবল মূর্খের কাছেই বিরুদ্ধ। এই বাক্য দুইটি কিন্তু প্রকৃতই বিরুদ্ধ। ভেদবুদ্ধি সংসার বন্ধনের একমাত্র কারণ। ভেদবুদ্ধিই সকল অধর্ম্মের মুল। যাহার ভেদবুদ্ধি নাই যাহার আপনার নাই, পরকে ঠিক আপনার মত করে, যাহাকে পরেও বাপমার চেয়ে আপন দেখে, যাহার কাছে আসিয়া লোকে নিজের বাড়ীর চেয়ে সুখ স্বস্তিতে থাকে

(২৬) সর্ব্বথা ভেদকলনং দ্বৈতাদ্বৈতং বিদ্যতে। তেজবিন্দুপ°

সেই ভেদবুদ্ধি রহিত সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান পুরুষকে সাক্ষাৎ ভগবান বলিয়া জানিবে (৯৭)। আবার ভেদবুদ্ধি না থাকিলে মা স্ত্রী ও কন্যা এক হইয়া পড়ে, চুরি পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি গুণ হইয়া পড়ে ও পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা কিছুই থাকে না। আবার ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করিলে বিষে প্রাণ যায়, সাপের কামড়ে. বাঘের হাতে, কুমীরের মুখে, জলে ডুবিয়া আগুণে পুড়িয়া মরিতে হয়। অতএব ভেদবুদ্ধি রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি যেমন দোষের তেমনই গুণের, যেমন রাখা উচিত তেমনই ত্যাগ করা উচিত। তবে কি করা উচিত? সর্ব্বত্র ভেদ মানিয়া ভেদবুদ্ধি ছাড়িতে যাওয়া উচিত। পরের জিনিষ ছুইতে নাই। পরের স্ত্রীর দিকে তাকাইতে নাই। পরের দানও লইতে নাই। আবার পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি সকলকেই আপনার ন্যায় করিতে হয়। এমনকি বড় বজ্জাতকেও যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে নাই, সযতনে ব্যবহার করিতে হয়। নিজের লাভের বেলায় আপন পর করিবে। নিজের লোকসানের বেলায় আপন পর থাকিবে না। মানুষের মধ্যে সর্ব্বদাই দুইটী বিপরীত প্রবৃত্তি থাকে—একটী সৎপথে চলিবার ও একটী অসৎপথে যাইবার, একটী ভাল হইবার অপরটী মনের বশে চলিবার। যে মানুষ নিজেকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া সৎপ্রবৃত্তির দিকে হইয়া আপনিই আপনাকে জব্দ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে সেই মানুষই উদ্ধার পায়। নিজেই নিজের বিরুদ্ধে লাগা, নিজেই আপনা হইতে ভিন্ন হওয়া, অসৎ প্রবৃত্তি ত্যাগের একমাত্র ছুতা।

১৩। সত্যমিথ্যা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য গুণদোষ আছে ও নাই—শাস্ত্র বলেন সত্যমিথ্যা আছে ও সত্যমিথ্যা নাই। সেইরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য ও গুণদোষ আছে ও নাই। যাহাই বাক্যের দ্বারা বলা যায়, যাহাই মনে ভাবা যায় সেই সমস্তই মিথ্যা [৯৮]। সত্যমিথ্যাদি না থাকিলে যে জগত অচল হয় ইহা সহজেই বুঝা যায় [৯৯]। সভ্যজগতে সভ্যতার চাপে অনেকেরই এমন বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে যে তাহাদের পাপের ওকালতী না করিলে আর প্রাণ বাঁচে না। তাহাদের ব্যভিচার চুরি প্রভৃতি নিন্দা প্রাণে সহে না। সে সব লোকের কথা ধরিবার প্রয়োজন নাই। তবে সত্য মিথ্যাদি নাই কি করিয়া হইতে পারে? যতদিন মনুষ্য মায়ার অধীন থাকিবে ততদিন সত্যমিথ্যাদি থাকিবেই। কোন মনুষ্য যখন শ্রীভগবানের নির্হেতুক কৃপায় জীবন্মুক্ত মায়াতীত হইতে পারিবে তখনই তাহার সত্যমিথ্যা ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি থাকিবে না ও সেই পুরুষ বিধিনিষেধাতীত হইতে পারিবেন। মনুষ্য যতদিন বিধিনিষেধাতীত হইতে পারিবে ততদিন তাহার সত্যমিথ্যা ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি থাকিবে। মনুষ্যের ক্রমান্বয়ে তিনটী অবস্থা হয়—[১] সত্য মিথ্যা আছে [২] সত্য মিথ্যা আছে ও নাই [৩] সত্য মিথ্যা নাই। (১) মানুষ যতদিন মনের বশে চলে ততদিন তাহার সত্যের দিকে টান থাকিতেই পারে না। ততদিন তাহার প্রাণপণে সত্যপালন ও মিথ্যা ত্যাগ করা উচিত। এই রকম প্রাণপণে চেষ্টা করিতে করিতে শত সহস্র জন্মে (২) যখন সত্যে প্রকৃত

(৯৭) পরদুঃখেন যো দুঃখী সুখী পরসুখেন চ। সংসারে বর্ত্তমানোপি জ্ঞেয়ঃ সাক্ষাৎ হরিঃ স্বয়ম্। ভা° ২১।২১৩ পদ্ম পু°।

(৯৮) বাচা বদতি যৎ কিঞ্চিৎ সঙ্কল্পৈঃ কল্প্যতে চ যৎ। মনসা চিন্ত্যতে যৎ যৎ সর্ব্বং মিথ্যা ন সংশয়ঃ। তেজোবিন্দুপ°। (৯৯) সর্ব্বং সোঢ়ং অলং মন্যে ঋতেঽলীক পরং নরম্ ৮।২০।৪

টান হয় ও মিথ্যা প্রায় চলিয়া যায়—তখন সঙ্কল্প করিতে হয় প্রাণ যাইলেও নিজের জন্য মিথ্যা বলিব না। কিন্তু পরের জন্য প্রয়োজন হইলে মিথ্যা বলিব। সংসারী মনুষ্য নিজের এতটুকু প্রয়োজনেই মিথ্যা বলে ও ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য বিসর্জ্জন দেয় কিন্তু পরের বেলায় বড়ই সত্যবাদী সাজে। এই ভীষণ রোগ সত্য কথা বলিয়া সত্যের উপর টান করিয়া যায় না যাইতেও পারে না। এই ভীষণ রোগের একমাত্র ঔষধ সত্য মিথ্যার মোড় ফিরাইয়া দেওয়া (ন পুণাদি চিকিৎসিতম্ ?)। অর্থাৎ নিজের বেলায় প্রাণ দিব তবু সত্য ছাড়িব না কিন্তু পরের বেলায় বিশেষ প্রয়োজন হইলে মিথ্যা বলিতে রাজি। ইহা পড়িয়া বুঝিবার নহে করিয়া বুঝিবার জিনিষ। [৩] যখন সত্য মিথ্যার মোড় ফিরাইয়া দেওয়া যায় তখন মনুষ্য সত্বরই মায়াতীত ও জীবন্মুক্ত হয়। তখন তাহার সত্য মিথ্যা থাকে না।

১৪। মানুষ কাঠের পুতুল ও তাহার পুরুষকার আছে। যন্ত্রারূঢ় তথাপি শরণং গচ্ছ [গীতা ১৮।৬১।৬২]। কাঠের পুতুল কি করিয়া শরণ লইতে পারে? কাঠের পুতুলের কোনও শক্তি নাই তথাপি সকল শক্তি আছে। একথায় মানুষের পুরুষকার আছে ও নাই। ইহা কি রকম? মানুষকে জানিতে হইবে তাহার নিজের কোনই পুরুষকার নাই। ভগবদিচ্ছা ব্যতীত কোনও কার্য্যই হইতে পারে না। (হিন্দুধর্ম্ম ১৭পৃ ১২পৃ)। ইহা জানিয়া, ইহা সকল সময়ে মনে রাখিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। মনুষ্যের মৃত্যু কিছুতেই হঠে না। তথাপি সেই মৃত্যুও হঠাইবার চেষ্টা করা উচিত। যতখানি বুদ্ধি ও যতখানি শক্তি ততখানি চেষ্টা করিলেও যদি সেই মৃত্যু নিবারণ না হয় তাহা হইলে মানুষের দোষ নাই। আর যদি মানুষ দৈবের দোহাই দিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার দোষ হয় [১০০]। যদি আমার কিছু করিবার শক্তিই নাই তবে চেষ্টা করিব কেন? ভগবানের ইচ্ছাই এই মায়ার সংসারে আমার পুরুষকার না থাকিলেও আছে। অতএব নাই ও আছে এই দুইএরই মর্য্যাদা দিতে হইবে। পুরুষকার নাই ইহার মর্য্যাদার জন্য মানুষকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে সে কাঠের পুতুল। পুরুষকার আছে ইহার মর্য্যাদা দিবার জন্য মানুষকে সর্ব্বদা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। কাযেই কাঠের পুতুল মনে রাখিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হয়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন যে বলে আমি জানি না সেই জানে, আর যে বলে আমি জানি সেই জানে না। (১০১)

১৫। বিচার করিতে নাই ও করিতে হয়। মানুষের বুদ্ধি বিপরীত। এই বিপরীত বুদ্ধির দ্বারা বিপরীতই হইতে পারে, ঠিক বিচারত হইতেই পারে না। এই জন্য বিচার একেবারে ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে চলে কি রকমে। আমার ক্ষুধা পাইয়াছে কিনা যদি আমি বিচার না করিব তবে আমার হইয়া কে বিচার করিবে? আমার শীত করিতেছে ইহাও আমাকে বুদ্ধি দ্বারা ঠিক করিতে হইবে। এইরূপ সকল বিষয়ই। তবে আর কি করিয়া বুদ্ধি ও বিচার ছাড়া

---

(১০০) মৃত্যুর্বুদ্ধিমতাপোহ্যো যাবদ্ বুদ্ধিবলোদয়ম্। যদ্যসৌ ন নিবর্ত্তেত নাপরাধোঽস্তিদেহিনঃ। ভা° ১০।১।৪৮

(১০১) যস্যামতং তস্য মতং ন বেদ সঃ। অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্। মৈত্রেয়° ২।১১।

যায়? জড়ভরত বিচার ছাড়িয়া জড় হইয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও গায়ত্রী পর্য্যন্ত শিখেন নাই ও ব্রাহ্মণের আচার একেবারে পরিত্যাগ করিয়া পশুর ন্যায় থাকিতেন। তিনি ভাল জিনিষ সমস্তই ছাড়িয়াছিলেন বটে কিন্তু কৈ পা দিয়া চলা ত ছাড়ে নাই। রাজা বহুগণের পাল্‌কি বহিবার জন্য যখন তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায়, তিনি কোনও আপত্তি না করিয়াই পাল্‌কি বহিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কে বলিয়া দিল পা ফেলিয়া চলিতে হইবে? ইহা তাঁহার বুদ্ধিইত বলিয়া দিল। অতএব নিজের বুদ্ধি ও বিচার ছাড়িবার জো নাই। তাহাতে বিপরীত হয়ত হইবে। কি করা যাইবে? আবার দেখিতে পাওয়া যায় ক্ষুধা পাইলে, শীত করিলে জানিতে পারা যায়। তবে আর বুদ্ধি বিপরীত হইল কি রকমে?

মায়ার বশেই মনুষ্যের বুদ্ধি বিপরীত। মায়ার কার্য্য উল্‌টাপাল্‌টা (বৈপরীত্য)। অতএব মানুষের বুদ্ধি বিপরীতও বটে, সোজাও বটে। সংসার রক্ষার জন্য মায়ার সৃষ্টি। অতএব সংসার রক্ষার জন্য মানুষের বুদ্ধি সোজা ও সংসার হইতে উদ্ধার পাইতে গেলেই মানুষের বুদ্ধি বিপরীত। ইহা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। মানুষ ক্ষুধা পাইলে শীত করিলে জানিতে পারে বটে কিন্তু যখন অসুখ হওয়ার প্রয়োজন হয় তখন আর বুঝিতে পারে না। মানুষ বিচারের দ্বারা আপন প্রাণ সদাই রক্ষা করে কিন্তু মরিবার সময় যাহাতে মরিতে পারে তাহাই করে। এখন উপায়?

শাস্ত্র বলিতেছেন বুদ্ধি বিচার প্রভৃতি দুই রকম, (১) উচ্ছাস্ত্র ও (২) শাস্ত্রিত। যাহা শাস্ত্রের বশে নহে তাহাকে উচ্ছাস্ত্র বলে। যাহা শাস্ত্রের বশে তাহা শাস্ত্রিত। উচ্ছাস্ত্র পুরুষকার মহান্ অনর্থের মূল ও শাস্ত্রিত পুরুষকার পরমার্থ প্রদান করে। অতএব সর্ব্বদাই শাস্ত্র মানিয়া, শাস্ত্রের আজ্ঞা মাথায় করিয়া লইয়া শাস্ত্রের কাছে আত্ম সমর্পণ করিয়া শাস্ত্রের উপর টেক্কা না মারিয়া, শাস্ত্রকে অভ্রান্ত মনে করিয়া, শাস্ত্র ভুল হইতে পারে একথা মনের কোণে ঠাঁই না দিয়া তাহার পরে শাস্ত্র বুঝিবার জন্য বিচার করা উচিত। তাহা হইলে শাস্ত্রে যে সমস্ত দুর্জ্ঞেয় কথা আছে যাহা উচ্ছাস্ত্র বুদ্ধিতে গেঁজেলি বলিয়া মনে হয় সেই সমস্তই শ্রীভগবান্ নির্হেতুক কৃপা করিয়া ক্রমে ক্রমে বুঝাইয়া দিবেন। নতুবা এসমস্ত কথা মনুষ্যবুদ্ধির অগোচর। (ক্রমশঃ)

স্বামী রামতীর্থের জীবনী ও বাণী

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

বাংলায় স্বামী বিবেকানন্দের মত স্বামী রামতীর্থ পাঞ্জাবে সুপরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দের মত তিনিও জাপান আমেরিকায় যাইয়া বেদান্ত প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজি জীবন-চরিত লেখক অধ্যাপক পুরাণসিং [১] বলেন যে বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি

---

1. Puran singh: The story of Swami Ram Tirath.—Ganesh & Co. Madras.

সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ ও বিদেশে বেদান্ত প্রচারে যান। উভয়েই ব্যক্তিগত ও জাতীয় কর্ম্মজীবনে বেদান্তের বাণী প্রচার করিয়াছেন। ২

পাশ্চাত্য বিজয়ান্তে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া যখন ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে প্রচার ব্যপদেশে লাহোর যান তখন স্বামী রামতীর্থ ফোরম্যান্ খৃষ্টান কলেজে (Foreman Christian College) গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি তাহার ছাত্রগণের সহায়তায় স্বামীজির বক্তৃতার সমস্ত আয়োজন করেন। স্বামীজি লাহোরে যাইয়া ধ্যানসিংহের হাউলীতে অবস্থান করেন। তথায় তাহার 'বেদান্ত' বক্তৃতা তাহার শ্রেষ্ঠতম বক্তৃতাগুলির অন্যতম—তেজস্বিতা ও বাগ্মিতায় পূর্ণ। রামতীর্থ তাহার দৈববাক্-শক্তি, জলন্ত বৈরাগ্য ও ত্যাগ, ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ; প্রতিভাময়ী বুদ্ধিতে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। স্বামীজি সেবার গুরু গোবিন্দ সিংহের অমৃত উৎসব পরিদর্শন করেন ও পঞ্চনদ বাসীকে 'সিংহবিক্রম গুরু গোবিন্দের দেশবাসী" বলিয়া সম্বোধন করিয়া সহস্র সহস্র শ্রোতাকে মাতাইয়া তুলেন। রামতীর্থ, গুড্উইন সহ সশিষ্য বিবেকানন্দ জীকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ করেন। আহারান্তে স্বামীজি 'যাহা কাম তাহা রাম নহে, যাহা রাম তাহা নহে কাম' এই গানটী গাহিয়া সকলকে মোহিত করেন ৩ রামতীর্থ বলেন যে, গান গাইতে গাইতে স্বামীজি তাহার অর্থ ও অনুভূতি যেন সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। প্রস্থানের পূর্ব্বে রামতীর্থ স্বামীজিকে একটা সোনার ঘড়ি উপহার দেন, স্বামিজী উহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন ও পরে উহা রামতীর্থের পকেটে রাখিয়া বলেন 'আচ্ছা বন্ধু, আমি এই ঘড়ি এই পকেটে ব্যবহার করিব।" স্বামিজী রামতীর্থের জীবনে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে তিনি সন্ন্যাসশ্রমে কৃতসঙ্কল্প হন ও পরিশেষে ১৯০১ সালে ২৮ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন।

পাঞ্জাব ভক্তিমূলক বেদান্তের দেশ; তাই রামতীর্থ বেদান্তবাদী হইয়াও ভক্ত ও কবি সাধক ছিলেন। তাহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল তীরথরাম গোস্বামী। তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গুজ্রাণওয়ালা জেলার মুরলীওয়ালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েকদিন পরে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় অগ্রজ গোস্বামী গুরুদাসের ক্রোড়ে পালিত হন। পাঠশালায় শেষ করিয়া জেলায় উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এই সময়ে তাহার পিতা তীর্থরামকে ধর্ম্মামল নামক অবিবাহিত জনৈক শিক্ষকের নিকট রাখেন। প্রথম জীবনে ধর্ম্মামল জীবন গঠনে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিলেও পরে অনর্থক বহু নির্য্যাতন করিয়াছিলেন। তথাপি তাহাকে তিনি পিতার মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন ও কলেজে অধ্যয়ন কালে বৃত্তির কিয়দংশ ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়া আয়ের অধিকাংশ তাহাকে প্রদান করিতেন। তিনি ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাটিকুলেশন পাশ করিয়া লাহোরে মিশন কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজে দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অতিকষ্টে তাহাকে অধ্যয়ন করিতে হইত। তাহা সত্ত্বেও তিনি বৃত্তিলাভ করিতে করিতে যথাসময়ে এম, এ পাশ

২। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম কর্ম্মজীবনে বেদান্তকে বর্ত্তমান যুগের স্থষ্টি, সমষ্টি, ও জগতের মুক্তি-মন্ত্ররূপে প্রচার করেন। স্বামী রামতীর্থ তৎপদানুবর্ত্তী। তাহার পরে তিলক ও অরবিন্দ বেদান্তের এইরূপ ভাষ্য করিলেও বিবেকানন্দের সহিত উহাদের সকলের বিশেষ পার্থক্য আছে।

3. Life of Swami Vivekananda vol 111 pp. 199-20).

করেন ও মিশন কলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।৪ বাল্যকাল হইতে অতিশয় মেধাবী, কষ্ট সহিষ্ণু, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অমায়িক চরিত্রবান ছিলেন বলিয়া সাহেব অধ্যাপকগণও তাহাকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন—এবং তাহাদের কেহ কেহ তাহাকে ছাত্রজীবনে অর্থসাহায্যও করিতেন। জ্ঞান-তৃষ্ণা তাহার জীবনে এত প্রবল ও তীব্র ছিল যে, অশন বসনের পরিবর্ত্তে তিনি তৈল কিনিতেন ও ক্ষুধাতৃষ্ণা শীতগ্রীষ্মনিদ্রা সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া সূর্য্যাস্ত হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি অধ্যয়নে ডুবিয়া থাকিতেন। ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়া ছিল। শিক্ষা প্রদান করিতে তিনি এত ভালবাসিতেন যে, একটী উচ্চ গভর্ণমেন্টের চাকুরী প্রত্যাহার করেন। উচ্চ গণিত অধ্যয়ন মানসে বিলাত যাইবার জন্য সরকারের বৃত্তি প্রার্থনা করেন কিন্তু সেবার পুণায় পরাঞ্জপে সেই বৃত্তিলাভ করেন। কর্ম্মাধিক্যে ধ্যানভজনের নিমিত্ত অবসরের জন্য তিনি মিশন কলেজ ত্যাগ করেন ও অরিয়্যাণ্টেল কলেজে সামান্য কাজের চাকুরী গ্রহণ করেন, পরে তাহা ছাড়িয়া আলিফ্ ৫ নামে একটী পত্রিকা (প্রেসের নাম রাখেন আনন্দ প্রেস) প্রকাশ করেন। কিন্তু সর্ব্বশেষে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে চিরতরে লাহোর ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত ও অরণ্যবাসী হইলেন। ও ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

চিরকাল তিনি পাহাড়, অরণ্য ও নির্জ্জনতা অতিশয় ভাল বাসিতেন। অধ্যাপক জীবনে ছুটী পাইলেই তিনি কাশ্মীর, অমরনাথ, হরিদ্বার, ঋষিকেশ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ভ্রমণে যাইতেন ও নিঃসঙ্গ হইয়া ধ্যানধারণায় কালযাপন করিতেন। ছেলেবেলায় তিনি শঙ্খ ধ্বনি শুনিতে বড় ভালবাসিতেন ও শিক্ষকের নিকট ছুটী লইয়া মন্দিরে স্তোত্র পাঠাদি শুনিতে যাইতেন। ছাত্রজীবন হইতেই তিনি মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের একান্ত প্রেমিক ভক্ত হইয়া পড়েন। এই সময় একবার তিনি তার দরশন পান—কবি সুরদাস কৃত সুরসাগর পড়িতে পড়িতে তিনি সেই দর্শন পাইয়া বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া পড়েন; পরদিন ফণাযুক্ত একটী সাফ ঘরের মধ্যে দেখিয়া তাহার ফণার উপর শ্রীকৃষ্ণকে নৃত্য করিতে দেখেন। তিনি তাহার সমস্ত রাত্রি শ্রীকৃষ্ণের বিরহে এত কাঁদিতেন যে তাঁর স্ত্রী ভোরে উঠিয়া দেখিতেন তাহার সমস্ত বালিশ ভিজিয়া গিয়াছে। লাহোরে অবস্থান কালে তিনি দিবারাত্র কৃষ্ণের চিন্তায় বিভোর থাকিতেন ও কৃষ্ণ নাম শ্রবণে ভাবস্থ ও অশ্রুসিক্ত হইতেন। বাঁশি শুনিলে তিনি কৃষ্ণের মুরলি মনে করিতেন। রাবি নদীর তীরে তিনি তন্ময় হইয়া বেড়াইতেন এবং আকাশে সজল জলধরের কালবরণকে শ্রীকৃষ্ণের আভা মনে করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেন। 'হে কৃষ্ণ তুমি জলে স্থলে আকাশে ফুলে বাতাসে আছ—তুমি আমার দর্শন দাও—" এইরূপ তীব্র ব্যাকুলতায় 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইতেন। তাহার কৃষ্ণোন্মত্ততা দেখিয়া জনৈক বন্ধু বলেন "স্বামীজি, কৃষ্ণত তোমার হৃদয়ে রহিয়াছে তুমি অন্যত্র

৪। ভগ্নী নিবেদিতা ওকাকুরার সহিত অজন্তা দর্শন করেন। ওকাকুরা এই দর্শনে প্রীত হইয়া ভারত ও জাপানের মধ্যে আর্ট, শিল্পকলা, দর্শন প্রভৃতির আদন প্রদানের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাহার বিখ্যাত "Ideas of দি East" নামক পুস্তকের একটী সুন্দর উপক্রমনিকা ভগ্নী নিবেদিতা লিখিয়া দিয়াছেন।"

5. Lecturs of Swami Ramtirtha publisheb by the Natyan & Co. Madras.

কোথায় তাহাকে খুঁজিতেছ।" তৎশ্রবণে তিনি নিজের জামা শার্ট ছিড়িয়া নখ দ্বারা বুক ছিড়িতে আরম্ভ করেন ও তদবস্থায় অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তাঁহার শিষ্য স্বামী নারায়ণ তাঁহাকে একদিন বলিতে শোনেন যে, 'আহা আজ তাঁর দর্শন (শ্রীকৃষ্ণের দর্শন) পাইলাম। আমার স্নান করিবার কালে তিনি আসিয়া আমাকে পূর্ণ দর্শন দিলেন।'

স্বামী রামতীর্থের একনিষ্ঠ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একাগ্রতার বিষয়ে ছাত্রজীবনের একটা সুন্দর গল্প আছে। তাঁহার গণিতের প্রতি অতিশয় অনুরাগ ছিল। একদিন রাত্রে উচ্চ গণিতের কয়েকটা গভীর জটিল প্রশ্নের সমাধান সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে করিবার পণ করিলেন ও তাহা না পারিলে নিজের মস্তক ছেদন করিবেন—সেইজন্য একটা ধারাল ছোরা বিছানায় রাখিয়া দেন। রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই প্রায় সবগুলি প্রশ্নের জবাব মিলিল, কিন্তু একটা আর কিছুতেই হইলনা—অরুণ কিরণ জানালার ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তীরথ্‌রাম সত্য পালন করিবার জন্য ছোরা লইয়া যেই উহা গলায় বসাইতে আরম্ভ করিলেন, গলায় রক্তপাত হওয়ায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন ও তদবস্থায় সেই প্রশ্নের সমাধান মানসপটে জ্যোতির অক্ষরে লিখিত দেখেন। তৎপরে তাহা লিখিয়া রাখেন। এই সমাধান এত মৌলিক হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক মুখার্জ্জি তাহাতে আশ্চর্য্যাম্বিত হইয়া যান।

তিনি ছাত্রজীবনে অতি অল্পবয়সে দ্বারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কয়েকটা সন্তানও হইয়াছিল।

সন্ন্যাসী হইয়া রামতীর্থ কেদার বদরী প্রভৃতি দুর্গম তীর্থ পর্য্যটন করেন। তিনি গরবলে (Tehri Garwal) এ প্রায়ই থাকিতেন। চিরতুষার পাহাড় চরাই করিতেন কখন বা তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বত গহ্বরে ধ্যান নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার কাগজ কলম পেন্সিল, দোয়াত প্রভৃতিকে তিনি জীবন্ত মনে করিয়া স্নেহপূর্ণ নামে ডাকিতেন, তাহাদের সহিত কথা বলিতেন। গঙ্গাতীরে আপন মনে বসিয়া এত বিভোর হইয়া থাকিতেন যে, আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বুক ভিজিয়া যাইত, এইরূপে তিনি অজ্ঞাতসারে বহুদিন অনাহারে কাটাইতেন। তিনি হাসি ও আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। যে তিন বৎসর তিনি হিমালয়ে বাস করিয়াছিলেন মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় তিনি প্রকৃতির সহিত একত্বানুভব করিয়া থাকিতেন। তিনি ভাববশে বলিতেন "সমস্ত প্রকৃতি আমার শরীর, নদীগুলি আমার শিরা, ও পাহাড়গুলি হাড়; আমি শিব, মালাবার ও করোমণ্ডল উপকূল আমার ২টী পা, রাজপুতানার মরুভূমি আমার বুক, বিন্ধ্যাচল আমার কটিবন্ধ। আমি পূর্ব্ব পশ্চিমে হাত বিস্তার করিয়া আছি। হিমালয় আমার জটাজুটধারী মস্তক, তার মধ্য দিয়া গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। আমি ভারতবর্ষ, আমি পক্ষী, পত্র, মানব, আমি ঈশ্বর"।

টেরীর মহারাজা তাহার অনুরক্ত ভক্ত ও সেবক ছিলেন। তাহারই অনুরোধে ও সহায়তায় তিনি জাপানে বিশ্বধর্ম্ম সভায় যোগ করিবার জন্য ১৯০২ সালে যাত্রা করেন; সঙ্গে শিষ্য স্বামী নারায়ণ ছিলেন। কিন্তু জাপানে সেই সভা হয় নাই, তাই তিনি জাপান হইতে আমেরিকা যান। বিখ্যাত জাপানী পণ্ডিত ওকাকুরা এইরূপ একটী সভা আহ্বান করিবার মানসে কলিকাতায় আসিয়া ভগ্নী নিবেদিতার সহিত পরামর্শ করেন ও স্বামী বিবেকানন্দকে সভাপতি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ওকাকুরা স্বামীজির সহিত সেবার বুদ্ধগয়া ও কাশীধাম বেড়াইয়া আসেন কিন্তু

দৈবক্রমে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাইমাসে স্বামীজির শরীরত্যাগ হওয়ায় ওকাকুরা সেই সংকল্প পরিত্যাগ করেন।

১৯০১ সালে রামতীর্থ পাহাড় হইতে মথুরায় নামিয়া আসেন এবং তথায় স্বামী শিবগুণ আচার্য্য যে ক্ষুদ্র বিশ্বধর্ম্ম সভা আহ্বানকরেন তাহার দুই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। জাপান যাত্রা তাহার পরে। ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবা বশিষ্যতে—উপনিষদের এই মহামন্ত্র গান করিতে করিতে রামতীর্থ জাপানে উপস্থিত হন। প্রথমে তিনি একটী বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী বক্তৃতা দিলেন তাহাতে তাহার খুব নাম হইয়া যায়। টোকিও রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক তাহা শুনিয়া বলেন "ইংলণ্ডে মোক্ষ মূলরের বাড়ীতে ও অন্যত্র আমি বহু পণ্ডিত ও দার্শনিকের সঙ্গলাভ করিয়াছি কিন্তু তাঁহার মত এমন মহা পুরুষ দেখিনাই, তাঁহার দর্শনের তিনিই মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। তাঁহার ভিতর বেদান্ত ও বৌদ্ধধর্ম্ম মিলিত হইয়াছে। তিনি প্রকৃতই দার্শনিক ও কবি।" জাপানে তিনি আরও কয়েকটী বক্তৃতা দেন।

রামতীর্থ বালকের মত অতি শিশুস্বভাব সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। জাপানে একপ্রকার ছাতা পাওয়া যায়, তাহাকে কখনও লাঠি কখনও বসিবার আসন রূপে ব্যবহার করা যায়। তাহার একটী তিনি ক্রয় করেন ও একটী খেলনার মত তাহা লইয়া খুব আনন্দ করিতেন। জাপানে মাত্র দুই সপ্তাহ থাকিয়া পুণার প্রোফেসার ছাত্রের সার্কাসের সহিত তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। জাপানে তিনি সিদ্ধির কৌশল (secret of success) নামক একটী সুন্দর উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা দেন। কর্ম্ম, আত্মত্যাগ, আত্মবিস্মৃতি, বিশ্বপ্রেম, প্রফুল্লতা, নির্ভীকতা, আত্মবিশ্বাসই তাহার মতে সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায়। আত্মবিস্মৃতির একটা সুন্দর গল্প তিনি বলিতেন। ২টী রাজপুত একবার মোগল সম্রাট আকবরের নিকট চাকুরী প্রার্থনা করে। তোমরা কি বিষয়ে অভিজ্ঞ—প্রশ্ন করিলে তাহারা তাহাদের উজ্জ্বল ২টী বিদ্যুৎপ্রভ তরোয়াল কোশ হইতে নিষ্কাসিত করিয়া ধরেন। আকবর তাহাদের বীরত্ব প্রকাশ করিতে আদেশ করিলে উভয়ে উভয়ের বক্ষে তাহা প্রবেশ করাইয়া দেয় ও মৃত্যু আলিঙ্গন করে। তিনি বলেন এইরূপ আত্মবিস্মৃত না হইলে সিদ্ধি করতলগত হয় না। আত্মনির্ভর সম্বন্ধে একটা গল্প তিনি বলেন। দুই ভাই পিতার অতুল সম্পত্তি অংশ করিয়া লয় ও পরে একটা উচ্ছন্ন যায় অপরটা কুবের সম সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তাহার উন্নতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন আমি চাকরদের সর্ব্বদা বলিতাম "এস এস" আর আমার ভাই বলিতেন "যাও যাও"। অর্থাৎ আমি কর্ম্ম ক্ষেত্রে থাকিয়া চাকরদের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতাম আর ভাই নিজে বিছানায় শুইয়া তাহাদের কর্ম্মে যাইতে আদেশ করিতেন। তিনি বলেন আত্মবিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ হইলে কর্ম্মে সিদ্ধ হওয়া যায়।

আমেরিকার সানফ্রন্সিসকো বন্দরে জাহাজ থামিলে তিনি অবতরণ করিলেন কিন্তু সঙ্গে কোন লাগেজ ছিল না। তাহাকে এইরূপ অবস্থায় সদানন্দ দেখিয়া জনৈক উৎসুক আমিরিকান জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় আপনার লাগেজ কই?" "আমার শরীরে যাহা আছে তাহা ছাড়া আমার কোন লাগেজ নাই" উত্তর হইল। "আপনি টাকা কড়ি কোথায় রাখেন?" আমার সঙ্গে কোন অর্থ নাই"। "তবে আপনি কিরূপে বাঁচিয়া থাকেন"! "আপনি সকলকে ভাল

বাসিয়া জীবন ধারন করি"। যখন আমি পিপাসার্ত্ত বা ক্ষুধার্ত্ত তখন কেহ না কেহ আমাকে জল ও আহার প্রদান করেন"। "কিন্তু আপনার কোন বন্ধু আমেরিকায় নাই?" "আপনিই একমাত্র আমার আমেরিকান বিশ্বাসী বন্ধু" এই বলিয়া রামতীর্থ তাঁহাকে এমন প্রেমালিঙ্গন দিলেন যে সেই অপরিচিত মার্কিন তাঁহার চিরবন্ধু হইয়া উঠিলেন।

জনৈক বৃদ্ধ মার্কিন মহিলা স্বামী রামতীর্থের সহিত দেখা করেন ও তাঁহার পারিবারিক দুঃখকষ্টের বর্ণনা করিতে করিতে কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি মহিলার সম্মুখে আসনবদ্ধ হইয়া ধ্যানস্তিমিতলোচনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভদ্রমহিলা রামতীর্থকে তাহার হৃদয়বিদারক ক্রন্দন স্বত্ত্বেও নিশ্চল প্রস্তর দেখিয়া ও তাহার নিকট হইতে কোন সমবেদনাব্যঞ্জক কথা বা করুণ দৃষ্টি না পাইয়া ক্রোধে বলিয়া উঠেন—"বাস্তবিকই ভারতবাসীরা এত অসভ্য ও গর্ব্বিত!" তাহাতে রামতীর্থ প্রেমপূর্ণ আরক্ত লোচনে তাহাকে 'মা' নামে সম্বোধন করিয়া তাহার চিরঅভ্যস্ত 'ওঁ' উচ্চারণ করিতে থাকেন। তাহাতে সেই ভদ্র মহিলার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল ও অভিনব আনন্দ রাজ্যে উন্নীত হইলেন। তিনি যেন জ্যোতির্ম্ময় শরীরে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং নিজকে জগতের 'মা' রূপে অনুভব করিলেন। তাহার সমস্ত দুঃখ তিরোহিত হইল ও তিনি আনন্দে পূর্ণ হইলেন। সেই দিন হইতে তিনি সর্ব্বদা ওঁ উচ্চারণ করিতেন ও নিজকে 'মা' ভাবিলেই এক দৈবীশক্তি অনুভব করিতেন। সেই মহিলা ভারত তীর্থে পর্য্যটন করিতে আসিয়াছিলেন।

তাঁহার আনন্দ যেন সংক্রামক ছিল। সর্ব্বদা জাগ্রত ও স্বপ্নে "ওঁ" জপ তাঁহার স্বভাবের একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ওঁকার গানের আনন্দে তিনি যেন সদা মাতিয়া থাকিতেন এবং যিনি তাঁহার নিকট গিয়াছেন তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন ও আনন্দ লাভ করিয়াছেন। দেব-সঙ্গীতের ন্যায় উহা এত মিষ্ট ও আনন্দ এবং শান্তির আকর ছিল। জাপানে ট্রামে যাইতে তিনি ওঁকার গান করিতেন ও লোকে শুনিয়া বিমুগ্ধ হইত। আমেরিকায় কোন স্বাস্থ্যাবাসের নিকট অবস্থানকালে বহু রোগী তাঁহার সেই ওঁকার গান শুনিয়া নীরোগ ও পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার হিলারের অতিথিরূপে শাস্তাস্প্রিংএ অবস্থানকালে তিনি আমেরিকার সাধারণ কুলীর মত পরিশ্রম করিতেন ও জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া আনিয়া গৃহপতির জ্বালানী সরবরাহ করিতেন। একবার উচ্চ শাস্তা পাহাড় ১১ আরোহণ করিয়া বহু প্রতিযোগী আমেরিকানকে পরাস্ত করিয়া প্রথম হন। প্রাইজ্ প্রদত্ত হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। আর একবার মারাথন রেসে ত্রিশ মাইল দৌড়াইয়া প্রথম হন। কিন্তু লাহোরে যখন ছাত্র বা অধ্যাপক ছিলেন তাঁহার স্বাস্থ্য অতিশয় রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিল—কেবল প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে তিনি স্বাস্থ্য লাভ করেন। তিনি পাখীর মত স্বাধীন আনন্দে থাকিতেন।

১১। উহা প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য ও উচ্চে ১৪৫০০ ফিট ছিল। স্বামী অভেদানন্দও আমেরিকার একটি উচ্চতম পাহাড় চড়াই করিয়াছিলেন।

আমেরিকায় স্বামী রামতীর্থ বেদান্ত ও ভারত সম্বন্ধে বহু বক্তৃতা প্রদান করেন। ভারতের জাতিব্যথা দূর করিবার জন্য একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। যে দুই বৎসর তিনি আমেরিকা বাস করিয়াছিলেন তিনি উপদেশ ও বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন ও অবশিষ্ট সময় পাহাড়ে নির্জ্জনে আনন্দে প্রকৃতির একটী শিশুর মত প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকিতেন। লালা হরদয়াল এম, এ আমেরিকা হইতে 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, বহু কালিফোর্ণিয়া বাসী তাঁহার নিকট হইতে নূতন জীবন লাভ করিয়াছিল। তাঁহাকে বহু লোকে উন্নত হিন্দুযোগী ও সন্ন্যাসী রূপে শ্রদ্ধাভক্তি করিত।

জনৈক মহিলা তাহার অন্তরের দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহার নিকট হইতে শান্তি ভিক্ষা করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে কি মূল্য দিতে হইবে জানিতে চাহেন। তিনি বলেন—"আনন্দের রাজ্যে তোমার মার্কিন ডলার চলে না। তোমাকে সেই দেশের মুদ্রা দিতে হইবে।" তিনি স্বীকৃত হইলে রামতীর্থ তাঁহাকে একটী নিগ্রো শিশু দেখাইয়া বলেন" ইহা লইয়া সন্তানবৎ প্রতিপালন কর।" ভদ্রমহিলা নিগ্রোদের প্রতি জাতীয় ঘৃণা প্রযুক্ত স্বভাবে উত্তর করিলেন—'অসম্ভব'। তখন তিনি বলিলেন তবে শান্তি লাভ তদপেক্ষা কষ্টকর।" কিন্তু পরে তিনি মহিলার অশান্ত চিত্তকে তাহার অমানুষিক প্রেমপ্রবণ শক্তিতে চিরশান্ত করিয়া দেন।

আমেরিকায় তিনি যে সব বক্তৃতা প্রদান করেন তৎসমুদায় তাঁহার অনুগত শিষ্যা সাঙ্কেতিক লেখনবিৎ পি, হুইট্‌মান ১২ নামক ভদ্রমহিলা লিখিয়া রাখিতেন। তৎসমুদায় ৪ খণ্ডে তৎশিষ্য স্বামী নারায়ণ কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌ Swami Rama Tirtha Publication League হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। বহুলোকে তাঁহার বক্তৃতায় ভারতের অবস্থার বিষয় শুনিয়া ভারতের সেবা করিতে আসিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় কেহই আসে নাই। মার্কিন সাধু থোরো সত্যই বলিয়াছেন "যে লক্ষ লক্ষ লোকে শারীরিক পরিশ্রম ও বীরত্ব বরণ করে—কিন্তু লক্ষের মধ্যে একটীও আধ্যাত্মিক জীবনের অসীম সাহসিকতা আলিঙ্গন করিতে পারে না।" তিনি সর্ব্বদা প্রেমেও আনন্দে শরীরজ্ঞানশূন্য হইয়া অদ্বৈত জ্ঞানে অতিবাহিত করিতেন। তিনি দৈব আবেশে গাহিতেন—"সূর্য্য আমার ছবি, মানুষ আমার প্রতিরূপ, তারকামণ্ডল আমার চোক্ষের পলক, সুবাসিত কুসুম রাশিই আমার হাসি, নাইটিংগেল পাখী আমার গান, বিশ্বপ্রাণ আমার নিশ্বাস, শীতের রাত্রির শিশিরপাত আমার অশ্রু, বহমান নদী আমার গতি, রামধনু আমার ধনুক, জ্যোতি রাশিতে আমি চলি "॥

সান ফ্রান্‌সিস্‌কোতে বক্তৃতা প্রদান কালে তিনি যখন গর্জ্জিয়া উঠিতেন "আমিই ঈশ্বর" তখন অনর্গল আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইত; দৈবজ্যোতিতে মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত আর বাহুযুগল বিস্তার করিয়া যেন সমস্ত জগৎকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইতেন। সাধারণ সমক্ষে বক্তৃতাকালেও তিনি কৃষ্ণের একবার মাত্র নাম শ্রবণে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন।

১২। তাহাকে তিনি কমলানন্দ নাম দিয়াছিলেন। তিনি পরে ভারতে আসিয়াছিলেন

হরিদ্বারে অবস্থানে একবার কদম্ব বৃক্ষমূলে শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাস্নানকালে তাহার বংশীধ্বনি শ্রবণে উন্মত্তবৎ বিচরণ করিতেন। বশিষ্ঠাশ্রমে তিনি কৃষ্ণ বিরহে আকুলভাবে কাঁদিতেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিখ্যাত দর্শনাধ্যাপক উইলিয়স জেমস্ (William James) তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি রামতীর্থের সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, ইনি আধ্যাত্মিক রাজ্যের এক অতুল প্রতিভাবান্ মহাপুরুষ সদা দেহজ্ঞান শূন্য হইয়া উচ্চভাবের রাজ্যে বসবাস করেন। ১৯০৫ সালে তিনি আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করেন ও তেত্রিশ বৎসর বয়সে ১৯০৬ সালে দেহত্যাগ করেন।

তাহার সেক্রেটারি মিস্ টেলার যখন তাহাকে সানফ্রান্সিস্কো সহরের গ্রেট প্যাসিফিক রেলরোড কোম্পানির ম্যানেজারের নিকট কমমূল্যে একখানি টিকিট কিনিতে লইয়া যান, তিনি বলেন যে, তাঁহার হাঁসি এত মধুর ও আনন্দদায়ক যে, তাহাকে আমি একখানি পুলম্যান গাড়ী বিনাভাড়ায় দিতে পারি। পুরাণসিংহ যখন টোকিওতে তাহাকে ব্যারন নাইবো কাণ্ডোর নিকট নিয়া যান তখন বাক্যালাপের মধ্যভাগে তিনি উঠিয়া তাহার স্ত্রী ও ছেলেদের ডাকিয়া আনিয়া বলেন যে, স্বামীজির সঙ্গলাভে এত আনন্দ ও শান্তি পাওয়া যায় যে, আমি একলা তাহা ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না, নাইবো তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি সংসার ত্যাগ করিলেন কেন? তিনি বলিলেন যে জগৎ জোড়া এক সুবৃহৎ পরিবার আন্বষণ করিতেই আমি গৃহত্যাগ করিয়াছি।

তিনি অতিশয় সুরসিক ছিলেন এবং নানাশব্দের অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ করিতেন। আমার নাম রাম টিরথ্—I অর্থাৎ আমি হচ্ছে মানুষের অহংরূপ অজ্ঞানান্ধকার। I তুলিয়া দিলে সত্যলাভ হয়, টিরথ্-এর I তুলিয়া দিলে হয়—রাম টর্থ অর্থাৎ রামই সত্য।
তিনি বলিতেন disease দূর করিতে হইলে Dis ছাড়িয়া at ease হও অর্থাৎ আনন্দে ঈশ্বরে বিচরণ কর তাহাই প্রকৃত সুখ। Holy হইতে হইলে whole হইতে হইবে অর্থাৎ পূর্ণ বা অনন্ত হইতে হইবে। কারণ একমাত্র তিনিই পবিত্র। atonement অর্থে আর কিছু নয় at-one-ment—অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত এক হও। Understanding মানে standing under—অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে বাস কর তাহা হইলে প্রকৃত জ্ঞান হইবে। Swami মানে So am I অর্থাৎ আমি সেই। Om অর্থে Oh am অর্থাৎ আমিই সেই। তিনি বলিতেন ঈশ্বর Mr. Miss or Mrs নহে তিনি Mystery 'হিন্দু' কথা তাহার কর্ণে যেন কঠিন শ্রুত হইত—তিনি হিন্দুর 'হ' তুলিয়া দিয়া বলিতেন—হিন্দু নয় ইন্দু অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র। রামজানের পরে মুসলমানদের ইদ্ উৎসব হয়। মহম্মদ ঐ দিন অন্দরের চাঁদ দেখিয়াছিলেন তাই মুসলমানেরা মহম্মদের সেই শুভদিন স্মরণ করিয়া বাহিরের চাঁদ দেখে। তিনি বলেন ভিতরের চাঁদ না দেখিলে বাহিরের চাঁদ দেখিয়া কি লাভ?

(ক্রমশঃ)

প্রশ্নোত্তরী

প্রঃ।—দেহী কি ?

উঃ।—দহ—ভস্মীকরণে যাহা ভস্মীভূত হয় তাহাই দেহ। অথবা যাহা ত্রিতাপদগ্ধ হয় তাহাই অনিত্য পাঞ্চভৌতিক দেহ। পিপীলিকা হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত যত দেহ আছে তাহার যে এক নিত্য অধিষ্ঠাতা তিনিই দেহী। তথাচ গীতায়—

"অন্তবন্ত ইমেদেহা নিত্যাশোক্তাঃ শরীরিণ!" অর্থাৎ এই দেহ ধ্বংসশীল দেহী নিত্য ধ্বংসশীল।

তথাচ "দেহী নিত্যনবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।"

অর্থাৎ হে ভারত! সকল দেহে দেহী নিত্য ও অবধ্য।

প্রঃ।—আত্মা অন্য অন্য অর্থে প্রয়োগ হয় কি না!

উঃ।—আত্মা শব্দ দেহ, দেহী, হৃদয়, মন, বুদ্ধি, অর্ক, ব্রহ্ম, ইত্যাদি অর্থে এবং প্রয়োগ দেখা যায়। সাধারণতঃ আকাশ হইতেও ব্যাপক পরমাত্মা অর্থে এবং কোন কোন স্থানে জীবাত্মা বা দেহী অর্থে ব্যবহৃত হয়।

—স্বামী মহাদেবানন্দ।

শাস্ত্রে বিশ্বাস ও যুক্তি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(লেখক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র মোহন শর্ম্মা)

অবশ্য শাস্ত্রে যে কোন দোষ নাই বা থাকিতে পারে না, সে কথা আমরা বলি না। নির্দ্দোষ বস্তু জগতে নাই এবং জগতে দোষের এমনই প্রভাব যে, স্বয়ং ভগবানও জগতে আসিয়া দেহ ধারণ করিলে দোষযুক্ত হইয়া পড়েন (যদিও তাহা প্রকৃত নহে) ইহাও তিনি লীলাচ্ছলে দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু দোষ আছে বলিয়াই শাস্ত্রকে ভ্রান্ত এবং শাস্ত্রবাক্যকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে প্রবৃত্ত হওয়া দুশ্চেষ্টা মাত্র। শাস্ত্রে দোষ থাকিলে তন্মধ্যে যে অমূল্য রত্ন নিহিত আছে তাহা ত্রিভুবনে কোথাও নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দোষগুলি বাছিয়া ফেলিয়া রত্ন উদ্ধারেই প্রযত্ন করেন এবং যাহারা নির্ব্বোধ তাহারা, নারিকেল ফলের কঠিন ত্বক দন্ত দ্বারা ভেদ করিতে না পারিয়া অখাদ্য বলিয়া বিবেচনা করার ন্যায়, কেবল দোষ দেখিয়াই পশ্চাৎপদ হয় এবং শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং রত্ন লাভে বঞ্চিত হয়। মনুষ্যের ভোগ এবং অপবর্গ এই দুইই প্রয়োজনীয় বলিয়া শাস্ত্রে উভয়ই উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ভোগ এবং অপবর্গ পরস্পর বিরুদ্ধ, এই জন্যই বিরুদ্ধ বাক্যের সমাবেশ। ভোগলিপ্সুগণ যাহাতে স্বর্গাদি লাভ ভিন্ন সহজে মোক্ষমার্গের সন্ধান না পায় অথচ মুমুক্ষুগণের ভোগের প্রতি বীতরাগ জন্মিয়া তাহারা মোক্ষমার্গে অগ্রসর হইতে পারে অর্থাৎ একদিকে সংসার রক্ষা এবং অপর দিকে ভগবৎপ্রাপ্তি—এই উভয় দিক লক্ষ্য রাখিয়া শাস্ত্র প্রণীত হওয়ায় উহা সুগ-বোধ্য হয় নাই। এই হেতু অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন না হইলে শাস্ত্রের বাহ্যাবরণ ভেদ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। শাস্ত্র যে সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্য করিয়া লিখিত হয় নাই অর্থাৎ সকল কথা খুলিয়া বা বুঝাইয়া বলা হয় নাই, ইহাই শাস্ত্রের প্রধান দোষ। কিন্তু

দুঃখের বিষয় এই যে, একদিক দিয়া দেখিলে যাহা দোষ বলিয়া মনে হয়, অন্য দিক দিয়া দেখিলে তাহাই আবার গুণরূপে প্রতীত হয়। খুলিয়া না বলাতে যে দোষ হইয়াছে, খুলিয়া বলিতে গেলে (যাহা বলাই যায় না) আরও অধিক দোষ হইত। পরন্তু গোপন করা যে অনেক সময়ে মঙ্গলেরই কারণ হয় তাহা সকলেই জানেন। অতএব শাস্ত্রের এই দোষকে যথার্থ দোষ বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না। যাহা হউক, কোন্ উপদেশ সংসার রক্ষার জন্য এবং কোন্ উপদেশ ভগবৎপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভের জন্য তাহা অবধারণ করিতে হইলে বিচারের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু তাহাতেও শাস্ত্রে অবিচারিত বিশ্বাসের পক্ষে কোন ক্ষতি হয় না।

এক্ষণে প্রক্ষিপ্তবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। দত্ত মহাশয় বলিতেছেন—"যাহারই সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিবার শক্তি আছে, তিনি হস্তে লিখিত অথবা প্রকাশিত শাস্ত্র সংস্করণে স্বমত পোষক শ্লোক প্রবেশ করাইয়াছেন। কিন্তু এরূপ মনে করিয়া লইবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না। দেখিতেছি প্রক্ষিপ্তবাদে তিনি কিছু বেশী দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন। একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, পুরাণ রচনা করিবার শক্তি কোন লৌকিক পণ্ডিতেরা থাকিতে পারে না। তাঁহার সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিবার শক্তি থাকিলেও তিনি শত চেষ্টাতেও ঐরূপ ভাব আনিতে সক্ষম হইবেন না। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীর ভিন্ন ঐরূপ ভাব আসা সম্পূর্ণই অসম্ভব। আর পুরাণগুলির ধারা সব এক রকম দেখিয়া সকল পুরাণই যে একজনের রচিত তাহা সহজেই অনুমিত হয়। অন্যান্য পুরাণের ভাষা হইতে ভাগবতের ভাষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার এবং সাতিশয় কঠিন বলিয়া, একজনই উহা রচয়িতা কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হয়। কিন্তু বেদব্যাস সকল পুরাণ সরল ভাষায় লিখিয়াছেন বলিয়া যে তিনি কঠিন ভাষায় লিখিতে পারেন না এরূপ মনে করাও সঙ্গত নয়; কারণ আমাদের সাধারণের মান-দণ্ড দ্বারা তিনি পরিমেয় নহেন। আর স্বমত পোষক শ্লোক মূল গ্রন্থ মধ্যে প্রবেশ করাইলেও তাহা শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গে ঠিক মিলন করা বড়ই কঠিন, কোন মতেই খাপ খাইবে না। ইহা আমাদের মত সাধারণ লোকে ধরিতে না পারিলেও, জহরী যেমন জহর চিনিয়া লয়, সেইরূপ শাস্ত্রপ্রাণ সাধুরা অনায়াসেই চিনিয়া লইতে পারেন। কোন্‌টি আসল ও কোন্‌টি নকল তাহা তাঁহার প্রাণই বলিয়া দেয়, যুক্তি বিচারের বিশেষ আবশ্যক হয় না। এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বে লোকের শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল এবং অনেকেই শাস্ত্র জানিতেন। কাজেই প্রবেশ করাইতে গেলে ধরা পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকায় ঐ কার্য্য করা তত সহজ ছিল না। স্বার্থ ও বিদ্বেষ ভিন্ন লোকে সহসা ঐরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না এবং স্বার্থ ও বিদ্বেষ কেবল সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী ও জাতিভেদ বিষয়েই সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু যেখানে প্রকৃত ধর্ম্ম সেখানে উহাদের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু এই দুইটি বিষয়েও আমরা যত প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিয়া লই তাহার অনেক গুলিই প্রক্ষিপ্ত নয়; তবে কিঞ্চিৎ যে অবশ্যই আছে, ইহা আমরা অস্বীকার করি না। শাস্ত্রে যে সাম্প্রদায়িক (অর্থাৎ উপাস্য দেবতা সম্বন্ধীয়) গোঁড়ামী দৃষ্ট হয় তাহা বস্তুতঃ গোঁড়ামী নহে, পূর্ব্বে তাহার কিছু আভাষ দেওয়া হইয়াছে। তখন রহিল কেবল জাতিভেদের কথা। যাহা কিছু প্রক্ষেপ তাহা কেবল এই বিষয়েই দেখা যায়। অতএব দত্ত মহাশয়ের শাস্ত্র মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বাক্যের আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয় ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ক্ষত্রিয়াদিকে শূদ্রত্বে পরিণত করিবার প্রচেষ্টা এবং মেধাতিথি কল্লুকাদির স্বার্থ ও বিদ্বেষ

মূলক অপব্যাখ্যা দেখিয়া তদানীন্তন পণ্ডিতগণ কর্তৃক স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত জাতি সম্বন্ধীয় বচনাবলীর কিছু না কিছু রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়না। তাৎকালিক পণ্ডিতবর্গ যে ব্রাহ্মণেতর বহু জাতির উৎপত্তিকাহিনী রচনা করিয়া পুরাণ মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছেন এবং তৎপরবর্ত্তী কালের বা আধুনিক স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা যে স্মৃতিবচন সমূহকে বিকৃত এবং কোথাও বা বিলুপ্তও পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন তাহা সাধারণের নিকটেও অল্প বিচারেই ধরা পড়ে। এ বিষয়ে কোন্‌টি যথার্থ প্রক্ষিপ্ত ও কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত নয় তাহা যুক্তি দ্বারাই অবধারণ করিতে হইবে। যে বাক্য শাস্ত্রোক্ত অপরাপর বাক্যের সহিত কোন প্রকারেই মিল করা যায় না, যাহা অপ্রাসঙ্গিক এবং এবং যাহা শাস্ত্রকারগণের অনভিপ্রেত বলিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিলে অন্যায় হয় না। কিন্তু আমাদের বুঝিবার ভ্রম হওয়া খুবই সম্ভবপর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। যাহা হউক্, কেবল জাতিভেদ বিষয়ক 'প্রক্ষিপ্ত' দোষ হেতু সমগ্র শাস্ত্রকে দূষিত বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা অতীত দোষাবহ সন্দেহ নাই। পরন্তু এই অবিশ্বাসের যুগে শাস্ত্রের প্রতি লোকের যাহাতে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মে, তাহারই উপায় করা আবশ্যক এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রক্ষিপ্ত বাদের কথা এক্ষণে উত্থাপন না করাই শ্রেয়স্কর। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রমধ্যে কোন্‌গুলি প্রক্ষিপ্তবাক্য তাহার বিচার এবং শাস্ত্রবাক্যকে ভ্রান্তবোধে তাহার প্রতি অবিচারিত বিশ্বাস স্থাপন কর্ত্তব্য কি না ইহার বিচার—এই দুইটি এক কথা নহে এবং উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। প্রক্ষিপ্ত বাক্য অর্থাৎ যাহা শাস্ত্র বাক্য নয় তাহাকেও অবিচারিত বিশ্বাসে মানিয়া লইতে হইবে, মূল প্রবন্ধে বোধ হয় এ কথা বলা হয় নাই। দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—"এক্ষণে শাস্ত্র বলিতে কি বুঝায় তাহাই বিবেচ্য। শাস্ত্র নামধেয় প্রচলিত মুদ্রিত তথা হস্তলিখিত গ্রন্থরাশি ও উক্ত বচন মাত্রকেই কি শাস্ত্র বলিয়া 'অবিচারিত বিশ্বাসে' মানিয়া লইতে হইবে? কিন্তু কোন্‌গুলিকে তিনি প্রকৃত শাস্ত্র বলেন সে বিষয়ে তিনি কোন উল্লেখ করেন নাই, তৎপরিবর্ত্তে কেবল শাস্ত্রসমূহের দোষ কীর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। ন্যায় শাস্ত্রমতে ইহাকেই বিতণ্ডা বলে। এইরূপ বিতণ্ডা আশ্রয় করিয়া তিনি প্রকারান্তরে সমগ্র শাস্ত্রকেই দোষযুক্ত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। ইহা জিজ্ঞাসুর উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই। অতএব তিনি তত্ত্বানুসন্ধানের বশবর্ত্তী হইয়াই লিখিয়াছেন, উল্লেখ করা সত্ত্বেও, তাঁহার লেখার ভঙ্গিমা দেখিয়া অন্যরূপই মনে হয়। তথাপি তিনি যে এই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই পরম আশ্বাসের এবং আনন্দের বিষয়।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নহি অথবা সাধক বা ভগবদ্ভক্তও নহি। এজন্য যাহা যাহা বলিলাম তাহাতে ভ্রম প্রমাদ ঘটা খুবই সম্ভবপর। তথাপি আলোচনা মনের আবেগ বশতই করা হইল। ইহাও একপ্রকার ধৃষ্টতা। ইহার জন্য পাঠকবৃন্দের নিকট এবং অপ্রিয় কথার জন্য দত্ত মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এক্ষণে দত্ত মহাশয় ইহার মধ্য হইতে দোষগুলি ত্যাগ করিয়া ভালটুকু (যদি কিছু থাকে) গ্রহণ করিলে সুখী হইব।

———

সমাজ

(২)

শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

"মহর্ষিদের শাস্ত্র অভ্রান্ত ভগবদ্বাণী বলিয়া পূর্ব্বে রাজা প্রজা সকলেই অবনত মস্তকে মান্য করিলেও এখন করিব কেন? তখন তাঁহারা কয়েকজন মাত্র জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন, এখন অনেকেই করেন, বরং বেশী করেন বলিয়া মনে হয়। কারণ, তখন ঋষিরা গুরুর নিকট যাহা কিছু শিক্ষালাভ করিতেন, ইদানীং বিদ্বান ব্যক্তিরা কত বিরাট বিরাট গ্রন্থ পাঠ করেন, কত নূতন তত্ত্ব অবগত হন; সুতরাং পুরাকালের ঋষিদের পুরাতন বিধিব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া নবযুগের জ্ঞানী লোকদের শাস্ত্রগ্রহণ করিব না কেন? ইঁহাদেরে মহর্ষি বলিয়া পূজাই বা করিবনা কেন?—"ইত্যাদি প্রশ্ন আজকাল পাঠশালার বালকদের মুখেও শুনা যায়। এই সমস্ত প্রশ্নমীমাংসার পূর্ব্বে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দেখা আবশ্যক মহর্ষিত্বলাভ বা বিশুদ্ধ জ্ঞানোপলব্ধির স্তর কিরূপে আয়ত্ত করা যায়। বহু গ্রন্থপাঠ বা শাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারা তাহা হয় না। বেশভূষার পরিবর্ত্তন বা কলাকচুসিদ্ধ খাইতে অভ্যস্ত হইলেও হয় না। সাধনা বলে দেহ ইন্দ্রিয় মন অহংজ্ঞান এবং বুদ্ধির (মনাত্মক মহত্তত্ত্ব) স্তর পর্য্যন্ত অতিক্রম করত ভগবানের পরা প্রকৃতিতে লীন হইলেই বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ করা যায়:—

> তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।—গীতা
>
> নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুশ্রুতেন
>
> যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।—উপনিষদ্

সৃষ্টির স্তরসমূহকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক। কথাটা একটু বিশদ করিয়া বলা আবশ্যক। বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্তরে অবস্থিত সচ্চিদানন্দবিভব পরমাত্মা বা পরাশিব অশব্দ, নির্ব্বিষয়, নাম ও রূপহীন। এই অসীম ও শান্ত অবস্থায় 'একোঽহম্ বহুস্যাম'—পরশিবের এই ইচ্ছা বা কাম প্রথমতঃ যে বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য উপস্থিত করিল তাহা হইতেই বিন্দু বা ঘনীভূত শক্তির উদ্ভব, তাহা হইতে শক্তিতরঙ্গের উদ্ভব। ইহাই বিশ্বসৃষ্টির মূল। এই শক্তি পরশিব হইতে স্বতন্ত্র নহেন। পরশিবই শক্তিরূপে প্রসারিত। সাধকেরা ক্রমে প্রণব মনঃ, অহঙ্কার বুদ্ধি ও প্রকৃতির স্তর উপলব্ধি করিতে থাকেন। এই সাধনার গতি ঊর্দ্ধগামিনী। ইহাকে আধ্যাত্মিক সাধনা বলা হয়। ঊর্দ্ধদিকে ক্রমশঃ বুদ্ধির স্তর পর্য্যন্ত যতক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিজিত না হয় ততক্ষণ বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয় না। বুঝিবার সুবিধার জন্য নিম্ন ও ঊর্দ্ধ বলা হইল। স্থূল ও সূক্ষ্ম বলিলেই ঠিক হইত। আত্মার সাধনায় যাঁহারা অগ্রসর হইতে থাকেন, অর্থাৎ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর স্তর অতিক্রম করিতে থাকেন ততই তাঁহাদের এক একটা বন্ধন কাটিয়া যায়। আধিভৌতিক সাধনার গতি নিম্নগামিনী। ইহার সাধকেরা স্থূল ভৌতিক বিষয়ে ক্রমশঃ অধিকভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। যেমন, এক ত্যাগনিষ্ঠ সংযমী যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষা দেওয়ার সময় মনে করিতেছিলেন, পরীক্ষা পাশ করিয়া ৫০ টাকার একটা চাকরী পাইলেই তাঁহার যথেষ্ট

হইবে। ক্রমে একশ, দু'শ, হাজার দুহাজার পাঁচহাজার পাইয়াও তৃপ্তি নাই। আরো চাই, আরো চাই করিয়া উদ্ভ্রান্ত—মহাজনী, ব্যাঙ্ক, জমিদারী, কলকারখানা ইত্যাদির বিস্তার দ্বারা বিলাসব্যসন ও প্রতিবেশীর উপর প্রাধান্য স্থাপনের লোভে অস্থির হইয়া উঠেন। সেই অবস্থায় বহু শাস্ত্রালোচনাই করুন, আর দেশ বিদেশের রাশি রাশি গ্রন্থই পাঠ করুন, বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ অসম্ভব। তাই এখনও কোন জ্ঞানী মহাপুরুষের সন্ধান পাইলে, আধিভৌতিক ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্বলাভ করিয়াও অনেকে নিজেদের সেই সমস্ত জ্ঞান গরিমা ভুলিয়া গিয়া উঁহারই চরণতলে আশ্রয় লইয়া থাকেন।

আধ্যাত্মিক সাধনা বলে যাঁহারা মানবত্তার সর্ব্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করিতেন তাঁহাদের অন্তর আত্মপর, ভাবাভাবের দ্বন্দ্বমোহে মথিত হইত না। স্বার্থবুদ্ধি লইয়া কাহাকেও নীচে চাপিয়া রাখা বা কাহাকেও উচ্চে তুলিয়া ধরার জন্য তাঁহারা সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য করিতেন না। যাহার যেমন শক্তি ও সংস্কার তাহাকে তদনুসারে আত্মোন্নতি সাধনের পথে অগ্রসর করাই তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিত। পরন্তু একের কার্য্যক্রম যেন অন্যের স্বার্থ বিরোধী বা পীড়াদায়ক না হয় তাহাই দেখিতেন। এইজন্য আধিভৌতিক বিষয়নিমগ্ন লোকেরাও তাঁহাদের উপদেশানুসারে নিজেদের কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন বোধ করিতেন। কারণ, সকল বিষয়ে সমান দৃষ্টি রাখা এবং সকল কার্য্যের ফলাফল যথাযথ নির্দ্ধারণ বিষয়ী লোকেদের পক্ষে দুরূহ।

যোগসিদ্ধ মহর্ষিরা কি ভাবে চলিতেন? রাজা ধনী বা অন্যকোনরূপ বিষয় বৈভবশালী কাহারো কাছে তাঁহাদের কিছু কাম্য থাকিত না, অন্নবস্ত্র বা গৃহের জন্য তাঁহারা পরের দ্বারস্থ হইতেন না। স্বাভাবিক বনের ফলমূলে জীবন ধারণ, বৃক্ষবল্কলে দেহরক্ষা ও তরুতলে শয়ন করিয়া তাঁহারা জীবন কাটাইতেন। সুতরাং তাঁহাদের আচরণে অন্যের ঈর্ষা দ্বেষ করিবার মতন কিছুই পাওয়া যাইত না। 'তাঁহাদের শাস্ত্র মানিব কেন'—বলিয়া সন্দেহ বা অশ্রদ্ধার ভাব তদানীন্তন গৃহস্থাশ্রমী ক্ষত্রিয়াদি বহুগুণসম্পন্ন শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ লোকেদের মনেও স্থান পাইত না। তাঁহারা ছিলেন ত্যাগ ও সংযমের আদর্শ, রাজা প্রজা সকলেই তাঁহাদের সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ত্যাগ করিব না কিছুই, অন্যের সর্ব্বস্ব ছলে বলে কৌশলে অপহরণ করিব, সংযমের সম্পর্ক রাখিব না, কেবলই ভোগের গণ্ডী বাড়াইব, অতৃপ্ত লালসার তাড়নায় 'আরো চাই, আরো চাই' করিয়া ঘুরিব, 'তিনি কেন শক্তিশালী হইয়াছেন, কেন উচ্চস্তরে আছেন, তাঁহাকে দুর্ব্বল করিয়া নিম্নস্তরে নামাইয়া দিতে হইবে,'—ইত্যাদিরূপ কলুষিত ভাব তখন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কাহারো অন্তরে প্রবেশ করিত না।

ব্রাহ্মণদের অনধিগম্য কিছুই ছিল না। ইচ্ছা করিলে তাঁহারা বিজ্ঞান চর্চ্চা, সংহারাস্ত্র আবিষ্কার সংগ্রাম দ্বারা লোকসংহার, ব্যবসা বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রীয় কূটনীতির দ্বারা পরের সর্ব্বস্বপহরণ, সবই করিতে পারিতেন। সেদিকে তাঁহারা গেলেন না। সাধনা বলে একদিকে চরম মুক্তি বা ভগবৎ সাযুজ্য লাভ, অন্যদিকে সমগ্র জীব সমাজকে বিশুদ্ধ ভাবে অগ্রসর করাই হইল তাঁহাদের জীবনের ব্রত। তাঁহাদের সাধনার দুইটি ধারা লক্ষ্য করা যায়—একটি নিজেদের উন্নয়ন, অন্যটি ভগবৎকৃপালব্ধ জ্ঞানালোকদ্বারা নিম্নস্তরে যাহারা আছে তাহাদিগের উন্নতির বিশুদ্ধ পথ প্রদর্শন। বস্তুতঃ তাঁহাদের সাধনার প্রভাবে সর্প ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র জন্তুরাও অহিংসার পরাকাষ্ঠা দেখাইত। সাধনা বলে যাঁহারা উচ্চ স্তরে আরোহণ করেন অসাধারণ দৈববল তাঁহাদের করায়ত্ত হয়। সিদ্ধ মহাপুরুষদের অলৌকিক শক্তির কথা সকলেই বিদিত আছে। তাঁহাদের কোপকটাক্ষে আধিভৌতিক প্রবল

ক্ষমতাও পর্য্যুদস্ত হইয়া যাইত। কিন্তু জগতের কল্যাণ ব্যতীত অন্য কোনরূপে তাঁহারা সেই শক্তি ব্যবহার করিতেন না। মহাতপা অগস্ত্য ঋষি অসুরদের দমনের জন্য সমুদ্র শোষণ করেন, কিন্তু পত্নীর বহু অনুনয় বিনয়েও তাঁহার অলঙ্কার সংগ্রহের জন্য স্বীয় তপোবলের এক কণিকাও প্রয়োগ করিলেন না। তৎপরিবর্ত্তে ভিক্ষা করিলেন।

ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেই বুঝিলেন ব্রাহ্মণ্য সাধনা সকল স্তরের লোকের পক্ষে সম্ভব নহে, পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি বা বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ এবং তদ্দ্বারা কোন্ স্তরের মানব কিরূপ কর্ম্মের যোগ্য তাহার বিচার করা সহজ সাধ্য নহে, জন্মজন্মান্তরের বহু সাধনা সাপেক্ষ। অজ্ঞ মানব নিজেই নিজের শক্তিপরিমাণ করিতে পারে না। অতএব ঋষি প্রদর্শিত পথে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে সাধনা করিয়া অগ্রসর হওয়াই সকলের কর্ত্তব্য। তাঁহাদেরও সাধনার লক্ষ্য হইল ত্যাগ ও সংযম, পরস্বাপহরণের পরিবর্ত্তে যথাসাধ্য পরকে সাহায্যদান, পরোপকার, এবং সর্ব্বজীবে দয়া প্রদর্শন। এই লক্ষ্য হইতেই তাঁহারা ব্রাহ্মণ রক্ষা সর্ব্বোপরি প্রধান কর্ত্তব্য মনে করিতেন। কারণ, ব্রাহ্মণ যে শক্তিবলে তাঁহাদের তথা সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণ করিতেন তাহা তাঁহাদের বাহু বল বা অর্থবলের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। পক্ষান্তরে দেহধারণ ও অর্থসংগ্রহের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকিলে অধ্যাত্ম সাধনায় তেমন সুসিদ্ধ হওয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে অসম্ভব হইত। তারপর ক্ষাত্রশক্তি, অর্থশক্তি ও শ্রমশক্তির উৎকর্ষ সাধন। ক্ষত্রিয়কে রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্র, বৈশ্যকে রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও শূদ্র এবং শূদ্রকে রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন। এই প্রণালীতে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া হিন্দু সমাজ সুখে শান্তিতে চলিয়া আসিয়াছে। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদেরাও অন্ততঃ পনর হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদ সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া নির্ণয় করিতেছেন। তৎপূর্ব্বে বহুকাল ঋষিদের শ্রুতি স্মৃতিতেই বেদ অবস্থান করিতেন। ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে ঋষিরা কত শক্তিশালী ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে লোকের শ্রুতি ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস হওয়াতেই বেদের আক্ষরিক সঙ্কলনের প্রয়োজন হইয়াছে। যে পাশ্চাত্য আধিভৌতিক সাধনার বৈভব আমাদিগকে বিস্ময়বিমূঢ় করে তাহা কত দিনের? পাশ্চাত্যদের ধর্ম্ম শাস্ত্রমতে পৃথিবির সৃষ্টিকালের পরিমাণ মাত্র ৪ হাজার বৎসর। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কেহ বৃক্ষশাখায়, কেহ বা গর্ত্তমধ্যে কাল কাটাইতেন বলিয়াও তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন। তাহাও বেশীদিনের কথা নহে। ইউরোপের ইতিবৃত্তে দেখা যায় তথায় সভ্যতার আলোক প্রবেশ করিয়াছে আড়াই হাজার বৎসরের বেশী নহে। সারজন উড্রফ লিখিয়াছেন ইংলণ্ডের লোকেরা স্নান শিক্ষা করিয়াছেন এই সেই দিন ভারতবর্ষের লোকের কাছে। গ্রীস দেশীয় পিথাগোরাস, সক্রেটিশ, প্ল্যাটো, এরিষ্টোটেল প্রভৃতি মনীষি পণ্ডিতগণের দার্শনিক গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে মনে হয় তখন তাঁহারা ভারতের আদর্শই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর এক এক দেশে এক একটা সম্প্রদায় গঠিত হইয়া সঙ্কীর্ণ স্বার্থসেবায় বিভ্রান্ত হইতেছে, বাহ্য দৃষ্টিতে মনোরম সাম্য ও স্বাধীনতার আন্দোলন তুলিয়া সমাজকে ছিন্নভিন্ন করিতেছে। ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থার আভাস দেওয়ার জন্য মিঃ বার্ট্রেণ্ড রাসেলের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি। আমেরিকার খ্যাতনামা লেখক এভারেট ডিন মার্টিন দেখাইয়াছেন যে তথাকার সভ্যতা ও স্বাধীনতার পরিণামও ক্রমেই অধোগামী হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন, ইউরোপের মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময় হইতে দশ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অনুদারতার প্রাবল্য যে ভাবে বাড়িয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে

হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যাহারা উদারপন্থী বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহারাই বেশী অনুদার হইয়া পড়িয়াছেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে বহু অত্যাচার প্রশ্রয় পাইয়াছে। পূর্ব্বে স্বাধীনতার আন্দোলনের লক্ষ্য হইত রাজা বা ধর্ম্মযাজকের স্বেচ্ছাচার হইতে জনসাধারণের মুক্তি; আর এইক্ষণ বর্ব্বর জনসাধারণের অত্যাচার হইতে ভদ্রলোকের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সমস্যাই গুরুতর।

জার্ম্মণরাজ্যে ইতিমধ্যেই তথাকথিত সাম্য ও স্বাধীনতার গতি ফিরাইবার আয়োজন হইতেছে। আর আমাদের দেশের লোকেরা পাশ্চাত্যের আপাত মনোরম দৃশ্যে প্রলুব্ধ হইয়া উধাও ছুটিয়াছেন। তাঁহাদের কল্যাণে আমাদের সেই মগোচ্চ সমাজের কি দুর্গতি! কি ভীষণ প্রলয়ের স্রোতে তাহার সর্ব্বস্ব ভাসিয়া যাইতেছে! সর্ব্বনাশের গ্রাস হইতে ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কি আপনার প্রাণ কাঁদে না? উত্তর পাই—'সত্য যুগ আর ফিরিয়া আসিবে না। সুতরাং পুরাতন ভাব ও কার্য্য প্রণালী লইয়া বসিয়া থাকাও চলিবে না। তখন ভারতবর্ষের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সম্পর্ক ছিল না; ভারতের মুষ্টিমেয় শক্তিশালী লোকেরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেন। এইক্ষণ নদী পর্ব্বত সাগর মরুভূমি কিছুই আর এদেশকে অন্যদেশ হইতে পৃথক্ রাখিতে পারে না, বিজ্ঞান সমস্ত দূরত্ব ও পার্থক্য ঘুচাইয়া ফেলিয়াছে। পৃথিবীর সকল স্থানের লোকেরা তাহাদের নানারূপ বিদ্যা-বুদ্ধির জ্ঞানবিজ্ঞান কল কৌশল লইয়া আসিতেছে, তাহাদের সহিত সংঘর্ষে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহাইত চাই। কিন্তু কি উপায়ে! তাহার নামে কেবল পরানুকরণ ও আত্মধর্ম্মার্জ্জনইত চলিতেছে, আত্মরক্ষা এবং আত্মপ্রকাশের চেষ্টা কয়জন করেন তাহার সন্ধানত পাই না। আপনাকে যাহারা হারাইয়া ফেলে, আপনার দেশ জাতি ধর্ম্ম আচার প্রথা যাহারা ত্যাগ করে তাহাদের কি পরের সহিত সংঘর্ষে বাঁচিবার শক্তি থাকে?

তাঁহারা আরো বলেন, জন্মগত পার্থক্য, উচ্চ নীচ শ্রেণীভেদ, তদনুযায়ী বিভিন্ন সাধন প্রণালী ও আচার প্রথা রক্ষা আর চলিবে না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এক সময়ে প্রয়োজন থাকিলেও এখন আর নাই। কারণ, ইদানিং বর্ণভেদ নাই, ধর্ম্মভেদও নাই, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ এইক্ষণ মূর্ত্তিমান ব্যভিচার! সুতরাং ব্রাহ্মণ রক্ষাও সমাজের কর্ত্তব্য নহে।—সত্য বটে, ভোগ মোহের প্রলোভনে অল্পদিন মধ্যে অন্যান্য বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণ সন্তানও স্বধর্ম্ম সদাচার ও কৌলিক প্রথা বর্জ্জন-পূর্ব্বক অর্থাহরণের জন্য দাসত্বের গভীর কূপে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু হিন্দু! এই পথেই কি তোমার শ্রেয়ঃলাভ হইবে? ভোগমোহের এই পরিণাম কত দিনের? অত্যন্ত পতন একশত বড় জোর দেড়শত বৎসরের। সন্মুখের দেড়শত বৎসর এই সমস্যার সমাধান কি ভাবে করিবে, ব্রাহ্মণাদি সকলেই অর্থের মোহে বিভ্রান্ত হইয়া ধ্বংশের মুখে সর্ব্বতোভাবে আত্মাহুতি দিবেন, না আপনাকে ও আত্মধর্ম্মকে রক্ষার জন্য স্ব স্ব আশ্রমে ফিরিতে আরম্ভ করিবেন.—কে বলিবেন? বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আশ্রয়ে বিরাট হিন্দুসমাজ বহু সহস্র বৎসর (আধুনিক গণনানুসারেও অন্ততঃ ১৫ হাজার বৎসর) শান্তিসুখে কাটাইয়া আসিতেছিল,—ইহা যেমন সত্য, স্ব স্ব বর্ণধর্ম্ম ত্যাগের দলে অল্পকালের মধ্যে তাহার যে অশেষ দুর্গতি বিধাতার দণ্ড উপস্থিত হইয়াছে তাহাও সত্য। অতএব কোন পথ বাঞ্ছনীয়?

(ক্রমশঃ)

ভূমিকম্প কাহিনী

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বি-এ, কাব্যতীর্থ

গত ১৫ই জানুয়ারী দুই ঘটিকা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় কলিকাতায় যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহার বেগ ও দীর্ঘক্ষণস্থায়িত্ব দেখিয়া অনেক বিশেষজ্ঞকেও বলিতে হইয়াছে যে, এতাদৃশ ভূমিকম্প সম্ভবতঃ ভারতে আর কখনও হয় নাই। কিন্তু কিছুক্ষণপরে যখন চতুর্দ্দিক হইতে তার যোগে সংবাদ আসিতে লাগিল, তখন বিহারের ভূমিকম্পের তুলনায় কলিকাতায় ভূমিকম্প নগণ্য বলিয়াই মনে হইল। কারন উত্তর বিহারে ভূমিকম্পের দরুন ধনজন ও গৃহাদির যেরূপ হানি হইয়াছে এবং তথায় যেরূপ হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে—উহা কেবলমাত্র অনুমানের বিষয়।

এই ভূমিকম্পের পূর্ব্বে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে পঞ্জাবের কাংগড়া জেলায় প্রলয়কারী ভূমিকম্প হইয়াছিল। সেই সময় সমগ্র উত্তর ভারতে ইহার প্রকোপ ন্যুনাধিকভাবে অনুভূত হইয়াছিল। পশ্চিমে আফ্‌গানিস্থান ও সিন্ধু হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে পুরী পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু কাংগড়া ও মসুরী জেলাতেই বিশেষভাবে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা প্রকটিত হইয়াছিল। হিমালয় পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতে 'চটান' ধসিয়া যাইবার দরুণ ঐ ভূমিকম্পের সৃষ্টি হইয়াছিল—ইহা অনেকের ধারণা যাহাই হউক্ সেই ভূমিকম্পে ঐ দুই জেলায় প্রায় বিশহাজার লোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল।

ভূমিকম্পের আটবৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বারই জুন তারিখে আসামে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। ঐ ভূমিকম্পের ফলে শিলং ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল সমূহে বাসো যোগী গৃহ ছিল না বলিয়া অনেকেরই ধারণা। আসাম-অঞ্চলে মধ্যে মধ্যে ভূকম্প হইয়া থাকে। কিন্তু ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের তুলনায় তত্রত্য অন্যান্য ভূমিকম্পকে তুচ্ছ বলা যায়।

মোটের উপর বিগত দুই শতকের মধ্যে ভারতে আরও পাঁচবার উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্প হইয়াছিল,—১৭২০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে, ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায়, ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ ও আরাকানে, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কচ্ছপ্রদেশে এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে।

উপরি উক্ত ভূমিকম্প সমূহের ফলে হাজার হাজার গৃহ নষ্ট ও বহুলোক হতাহত হইলেও এইবার ভূমিকম্পে উত্তর বিহারে ধনজনের যাহা ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেকার ভূমিকম্পের ক্ষতি অপেক্ষা অধিকতর বলিয়াই প্রত্যক্ষদর্শীদিগের বর্ত্তমান ধারণা।

ভূমিকম্পের প্রকোপ ভারতবর্ষ অপেক্ষা জাপানে অধিকতর ভয়াবহ। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে টোকিয়ো ও ইয়োকাহামা সহরে ইহার প্রকোপ ভয়ঙ্করভাবে অনুভূত হইয়াছিল। দ্বিপ্রহরের সময় টোকিয়োতে ভূমিকম্প আরম্ভ হয় এবং পাঁচমিনিটের মধ্যে প্রায় দুই

লক্ষ নগরবাসী ঘর পতনের দরুণ প্রাণবিসর্জ্জন করে। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিকাণ্ড ও ঝটিকা আরম্ভ হয়। সুতরাং জাপানীদের অবস্থা যে তখন কীদৃশ ভীষণ হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। উক্ত ভূমিকম্পের ফলে ইয়োকোহামায়ও প্রায় এক লক্ষ লোকের প্রাণহানি হইয়াছিল। ধনসম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ বার হাজার কোটি টাকা মূল্যের হইয়াছিল।

বিগত দুই শতাব্দীর পূর্ব্বেও জগতে ভূমিকম্প হইয়া থাকিবে কিন্তু তাহার ইতিহাস জানা বর্ত্তমানে কষ্টকর। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগালে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে মোটামুটি ষাটহাজার লোক মরিয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাদৃশ ভূমিকম্পে পর্ত্তুগালের ইতিহাসে অদ্বিতীয় বলিয়া কথিত হয়।

দক্ষিণ ইটালীকে ভূমিকম্পের দেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ২৮শে ডিসেম্বর মেশিনা'তে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহা চল্লিশ সেকেণ্ড মাত্র স্থায়ী হইলেও উহাতে এক লক্ষ লোকের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছিল। য়ুরোপে এতাদৃশ প্রলয়কর ভূমিকম্প এ পর্য্যন্ত আর হয় নাই বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন।

বিগত দুই শত বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে সকল ভূমিকম্প হইয়াছে ও তাহাতে হতাহতের মোটামুটি সংখ্যা যাহা পাওয়া গিয়াছে; তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

স্থান	ইং সাল	মৃতের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা
লিস্‌বন	১৭৫৫	৬০০০০	
কলেব্রিয়া	১৭৮৩	৩০০০০	
নেপলস্‌	১৮৫৭	১২৩০০	১৪০০
জাপান	১৮৯১	৯৯৬০	২০০০০
জাপান	১৮৯৬	২৯০০০	৫০০০
ভারতবর্ষ	১৯০৫	২০০০০	
মেসিনা	১৯০৮	১০০০০০	
মধ্যইটালী	১৯১৫	৩০০০০	
চীন	১৯২০	১০০০০০	২০০০০০
জাপান	১৯২৩	১৪২০০০	১০৩৭০০

ভূমিকম্পের কারণ নির্দ্ধারণকল্পে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জাপানে একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সমিতির অনুসন্ধানের ফল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে অধ্যাপক 'মিলনে' এই সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে 'রবার্টহুক্‌'ও এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করিয়াছিলেন এবং প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রিষ্টলে 'ইলেকট্রিসিটি'র সহিত ভূমিকম্পের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক 'ইয়ং' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, যে প্রকারে শব্দ বায়ুর সহিত তরঙ্গের সাহায্যে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বিস্তৃত হয় সেই প্রকার ভূমিকম্পও এক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া তরঙ্গ উৎপাদন করে এবং সেই তরঙ্গের সাহায্যে উহা বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। আইরিশ একাডেমির অধ্যাপক 'মেলেট্‌' গণিতের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের অনেকটা পুষ্টি বর্দ্ধন করিয়াছেন।

মধ্যযুগের পণ্ডিতগণের ধারণা আগ্নেয়গিরিই ভূমিকম্পের প্রধানতম কারণ। তৎসমর্থনকল্পে তাঁহারা বলিয়াছেন ইটালীও জাপানেই অতিকতর ভূমিকম্প হয় এবং তথায় আগ্নেয়গিরিও রহিয়াছে। আগ্নেয়গিরির নিম্নভাগ হইতে প্রবলবেগে গন্ধক বাষ্প প্রভৃতি উত্তপ্ত পদার্থ সমূহ উপরদিকে উৎক্ষিপ্ত হয়, এবং উৎক্ষেপনের প্রবল আঘাতে পৃথিবীর কম্পন হইয়া থাকে।

কিন্তু কাহারও কাহারও মতে উহাই একমাত্র কারণ নহে। পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতে 'চট্টাল' ধসিয়া যাওয়ার দরুণও প্রবল ভূমিকম্প হইয়া থাকে। পদার্থবিজ্ঞানবেত্তা অধ্যাপক 'জীন' বলেন যে আল্‌পস্ এবং হিমালয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক পাহাড় এবং ইহাদের গঠন এখনও চলিতেছে। কোনও ভাগ উপরে উঠিতেছে, আবার কোনও ভাগ নীচে ধসিয়া যাইতেছে। ভূকম্পের এই কারণের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের অনেক বিদ্বান্ কর্ম্মচারী অভিমত দিয়াছেন যে ভারতের এই ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল নেপালের পার্শ্ববর্ত্তী কোনও স্থান হইবে। যদিও এই বিষয়ে অনেক গবেষণা চলিতেছে ও চলিবে, তবে আধুনিক বিদ্বান্‌গণের অনুমান এই যে, হিমালয়ের কোন স্থান হইতে শিলাখণ্ডের নিম্নপতনের দরুণই এই প্রকার প্রলয়কারী ভূমিকম্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

আজকাল সূক্ষ্মযন্ত্র দ্বারা (Seismograph and Sesmometer) ভূকম্পেরকেন্দ্র এবং উগার গতি নির্দ্ধারণের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু প্রাচীনকালের বিদ্বান্ মণ্ডলী এবং থিউসিডাইড্, অরস্ত, লিবী, প্লীনী প্রভৃতি মহোদয়গণ এই সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়া গিয়াছেন আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে অর্থাৎ পুরাণে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবী বাসুকীর ফণার উপর অবস্থিত এবং যখন বাসুকী ফণা বদলাইতে যান, তখনই পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। জাপানীদের মতে পৃথিবী মৎস্যের পৃষ্ঠোপরি স্থিত এবং যখন মৎস্য অশান্ত হইয়া উঠে তখনই ভূমিকম্প হয়। প্রাচীনযুগে ভূমিকম্প হইলে জাপানে দেবালয়ে পূজা অর্চ্চনার ধূম পড়িয়া যাইত। কারণ জাপান সম্রাট্‌দের এই ধারণা ছিল যে, অন্যায়ের দরুণই দেবী কুপিত হইয়াছেন। এইজন্য রাজ্যশাসনের কঠোর নিয়মগুলির পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাঁহারা মনে করিতেন।

ভূমিকম্পের পরে অদ্ভুত অদ্ভুত ভূমিকম্পবিষয়ক গুজবও উঠিয়া থাকে। লিস্‌বনের ভূমিকম্পের পর এই রব উঠিয়াছিল যে প্রোটেষ্ট্যাণ্টদিগের আগমনের কারণেই তথাকার ভূমিকম্পের উদ্ভব। এইবার ভারতে যে ভূমিকম্প হইয়াছে তাহাতেও এই ধরণের কথা শুনা যাইতেছে। কেহ কেহ রব তুলিয়াছে যে কাঞ্চন-জঙ্ঘা আবিষ্কারের চেষ্টার দরুণ দেবাদিদেব মহাদেব কুপিত হইয়া ভূমিকম্পরূপ অনর্থ ঘটাইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী গত ২রা ফেব্রুয়ারী হরিজন সংবাদপত্রে 'বিহার ও অস্পৃশ্যতা' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন সেই প্রবন্ধের সারকথা এই যে,—অস্পৃশ্যতা পাপের পরিণামেই ভূমিকম্পের উৎপত্তি। তিনি বলিয়াছেন—যাঁহারা অস্পৃশ্যতা নিবারক তাঁহারা যেন মনে করেন ভূমিকম্প অস্পৃশ্যতা পাপের প্রতিক্রিয়া। মহাত্মাজীর এবম্বিধ উক্তির ফলে অন্যভাবের কানাকানি কথাও শুনা যাইতেছে। তাহা হইতেছে—মন্দিরের অস্পৃশ্যদিগকে নিষিদ্ধ দেহমন লইয়া দেবতার মন্দির কক্ষে প্রবেশ করাইবার পাপের প্রতিক্রিয়াই এই ভূমিকম্প।

যাহাই হউক্ এক্ষণে কেবল ভূমিকম্পের কারণ বা তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেই লোকের মনে শান্তি আসিবে না। আজ তো এই প্রশ্নই প্রথমতঃ মনে উদিত হয় যে কি প্রকারে প্রলয়কারী

ভূমিকম্পের দুর্ঘটনা হইতে লোকের প্রাণ ও সম্পত্তি সুরক্ষিত হইতে পারে। prevention is better than cure অর্থাৎ রোগের উপশম অপেক্ষা রোগের প্রতিষেধ অপেক্ষাকৃত ভাল—এই নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তো এতদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। এইজন্য প্রয়োজন একদিকে ভূতত্ত্ববিদ্ ও জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের ভূমিকম্প সম্বন্ধে গ্রহণাদির ন্যায় পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারণের উপায় উদ্ভাবন করা যায় কিনা তদ্বিষয়ে গভীর গবেষণা। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন গৃহাদি ও রেল লাইন প্রভৃতি এমন ভাবে নির্ম্মাণ করিবার নিয়ম উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে ভূমিকম্পে সহজে লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না পারে। জাপান দ্বিবিধ উপায়েই চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এইজন্য জাপানে একদল যেমন ভূমিকম্পের তত্ত্বনিরূপণে মনোযোগী আছেন, অন্যদিকে তথাকার ইঞ্জিনিয়ারগণ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে ভূমিকম্পের ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গৃহাদি ও রেল লাইন কি প্রকার হওয়া উচিত, নলকূপ কি প্রকার স্থানে বসান কর্ত্তব্য ইত্যাদি। ভারতের ও অন্যান্য দেশের জাপান হইতে এতদ্বিষয়ক শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপনির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ প্রণালী যাহা ভারতের সাধনা'র এক বিশেষ লক্ষ্য—সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচনা-সাপেক্ষ।]

প্রেরিত পত্র *

মাননীয় ভারতের সাধনা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

আশ্বিন মাসের "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত লিখিত "অবতার বাদ" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িয়া বুঝিলাম যে তিনি শাস্ত্র ভাল করিয়া না পড়িয়া এবং শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হইয়া তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ও তাহার কদর্থ করিতে বসিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "হিন্দু শব্দ সংস্কৃত শব্দই নহে।" ইহাতে বুঝা যায় যে তিনি সংস্কৃত ভাষার অভিজ্ঞ নহেন। তিনি একবার "শব্দার্থ চিন্তামণি" খুলিয়া দেখিয়াছেন কি তাহাতে হিন্দু শব্দ আছে কিনা?

নগেন্দ্রবাবু গীতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে শ্রীভগবান নিজেকে সৃষ্টি করেন এবং সাধুদিগের রক্ষা ও দুষ্টদিগের বিনাশের নিমিত্ত এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য প্রতি যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তিনি কিন্তু বলিয়াছেন যে "অবতার

সম্বন্ধে গীতায় যে নিয়ম উক্ত হইয়াছে—প্রথম তিন অবতারে সে নিয়ম পালিত হইতে পারে না" অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম্ম ও বরাহ অবতারে শ্রীভগবান দুষ্টের দমন বা সাধুদিগের রক্ষা করেন নাই। এই কথা শুনিয়া হিন্দুগন বিশেষতঃ যাঁহারা শাস্ত্র কিছু কিছু পড়িয়াছেন হাস্য সংবরণ করিতে পারেন না। হিন্দু মাত্রেই অবগত আছেন যে শ্রীভগবান মৎস্য রূপ ধারণ করিয়া রাজা সত্যব্রত এবং অন্যান্য ঋষি দিগকে প্রলয় সলিল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন ও বেদতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, কূর্ম্মরূপে মজ্জমান সুমেরু পর্ব্বত পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া সমুদ্র মন্থন করাইয়াছিলেন ও মহালক্ষ্মীকে উদ্ধার করিয়া শ্রীহীন স্বর্গরাজ্যে মহালক্ষ্মীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বর্গরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বরাহরূপে দৈত্য হিরণাক্ষ্যকে বধ করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করিয়াছিলেন।

নগেন্দ্রবাবুর বামন অবতারের ব্যাখ্যা যেমন অদ্ভুত তেমনই ভ্রমাত্মক। তিনি লিখিয়াছেন "বামনরূপী বিষ্ণুর আদেশে বলি প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা কথার অপরাধে নরকবাসে দণ্ডিত হইলেন।" এই অপরূপ তত্ত্ব তিনি কোথায় পাইলেন? শ্রীভগবান বলিতেছেন :—

ইন্দ্রসেন মহারাজ যাহি ভো ভদ্রমস্তুতে।
সুতলং স্বর্গিভিঃ প্রার্থ্যং জ্ঞাতিভিঃ পরিবারিতঃ ॥
রক্ষিষ্যে সর্বতোঽহং ত্বাং সানুগং সপরিচ্ছদম্।
সদা সন্নিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ভবান্ ॥

—হে মহারাজ ইন্দ্রসেন, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি জ্ঞাতিগণের সহিত দেবাকাঙ্ক্ষিত সুতলে গমন কর। তথায় আমি অনুচর দিগের সহিত সর্ব্বদা তোমাকে রক্ষা করিব। সেখানে তুমি সর্ব্বদাই আমাকে নিকটে দেখিতে পাইবে।

এত কৃপা করিয়াও শ্রীভগবান ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি প্রহ্লাদকে বলিলেন :—

বৎস প্রহ্লাদ ভদ্রং তে প্রযাহি সুতলালয়ম্
মোদমান সপৌত্রেণ-জ্ঞাতীনাং সুখমাবহ।
নিত্যং দ্রষ্টাসি মাং তত্র গদাপাণিমবস্থিতম্ ॥

বৎস প্রহ্লাদ, তোমার শুভ হউক। তুমি সুতলালয়ে গমন করিয়া পৌত্রের সহিত বাস কর ও জ্ঞাতীগণের সুখ বর্দ্ধন কর। তথায় আমাকে সর্ব্বদাই গদা হস্তে বিচরণ করিতে দেখিতে পাইবে।

অপরূপ নরক বটে! বুদ্ধি এইরূপ অপরূপ না হইলে ও শাস্ত্রে এইরূপ অপরূপ জ্ঞান না থাকিলে শাস্ত্রের বিপরীত অর্থ করা এবং শ্রীভগবানের অবতারকে—"বঞ্চক" বলা চলিবে কেন!

বামনদেব প্রথমে বলিরাজের নিগ্রহ করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু কেন করিয়াছিলেন? বলিরাজকে বরুণ-পাশে বদ্ধ করিলে ব্রহ্মা বামনদেবকে বলিয়াছিলেন—"হে ভূতভাবন নারায়ণ এই হৃতসর্ব্বস্ব বলিরাজের বন্ধন মোচন করুণ। ইনি নিগ্রহের যোগ্য নহেন। তখন শ্রীভগবান বলেন—

ব্রহ্মন্ যমনুগৃহ্নামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষো স্তব্ধো লোকং মাং চাবমন্যতে ॥

হে ব্রহ্মণ আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করি। ইহাতে মোহান্ধ পুরুষগণ আমার অবমাননা করিয়া থাকে।

নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন "এক অবতার বর্ত্তমান থাকিতে আর এক অবতারের আবির্ভাব হইবার কথা গীতায় উক্ত হয় নাই ও এরূপ হইবার কোন প্রয়োজন ও নাই।" 'এক সময়ে দুই অবতার হইতে পারে' এই কথা গীতায় নাই বলিয়া যে যুগপৎ দুই অবতার হইতে পারে না ইহা কিরূপে প্রমাণিত হয়? বিশেষতঃ 'এরূপ হইবার কোন প্রয়োজনও নাই' ইহা তিনি কিরূপে বুঝিলেন? যে সকল বিচার পরায়ণ পুরুষ পুত্র কন্যার সামান্য পীড়া হইলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন, যাঁহারা সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ কালে ইঞ্জিনীয়ারের আশ্রয় গ্রহণ করেন ও মোকদ্দমা করিতে হইলে অসহায় হইয়া উকীলের চরণে পতিত হন সেই সকল বিচারধ্বজী মনুষ্য শাস্ত্রের বিচার করিতে শাস্ত্র পড়া প্রয়োজন মনে করেন না বা বামনদেব বলিরাজকে নরকে পাঠাইলেন কি সুতলে পাঠাইলেন জানা আবশ্যক মনে করেন না, কিন্তু পরশুরাম শ্রীভগবানের অবতার নহেন ও শ্রী-ভগবানের যুগপৎ দুই অবতার হইবার কোন প্রয়োজনও নাই বলিতে ব্যস্ত। ইহা অপেক্ষা ধৃষ্টতা ও অহঙ্কারের পরাকাষ্ঠা আর কি হইতে পারে। পরশুরাম দুষ্ট ক্ষত্রিয়কুল বিনাশার্থ কালরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাহার কার্য্যও সিদ্ধ হইল তাঁহার সংহার মূর্ত্তিও লোপ পাইল এবং তাঁহার অবতারত্ব শ্রীরামচন্দ্রে বর্ত্তিত হইল। এ কথা তিনি সামান্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িলেও দেখিতে পাইতেন।

নগেন্দ্রবাবু যে অপরূপ বিচারবলে বলরামকে লেসেপ্সের (সুয়েজ ও পানামা নহরের খননকর্ত্তা ইঞ্জিনীয়ার) সমকক্ষ বলিয়া প্রমাণ করাইয়াছেন তাহার সেই অপরূপ বিচারবুদ্ধি সহসা লোপ পাইল কেন? তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে বলরাম এবং লেসেপ্সের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। বলরাম একাকী এক মুহূর্ত্তে হলের মুখে যমুনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন কিন্তু লেসেপ্সকে সুয়েজ ও পানামা নহর নির্ম্মান করিতে কতদিন লাগিয়াছিল ও কতলোক লাগিয়াছিল তাহা তিনি জানেন না কি? বিচারবুদ্ধি এত প্রবল না হইলে বলরাম অবতার কিনা এ প্রশ্ন উঠিতে পারে কি?

তিনি বলেন 'বুদ্ধ অবতার হইলেও তাঁহার উপাসনা হিন্দুধর্ম্মে নিষিদ্ধ।' কিন্তু একথা কোথায় আছে? তাঁহার উপাসনা নিষিদ্ধ হইলে জয়দেব তাঁহার স্তব করিতেন কি? যখন হিন্দুগণ প্রকৃত ধর্ম্ম ছাড়িয়া কেবল যাগযজ্ঞ ও পশু বলির পক্ষপাতি হইয়া উঠিলেন এবং আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ-গণ ব্রাহ্মণত্বের দাবি করিতে লাগিলেন তখনই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই অলীক ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য অস্বীকার করেন ও যজ্ঞে পশুহত্যার নিন্দা করেন।

নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন অবতার রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কাহারও পূজা হয় না। পুরুষোত্তমে জগন্নাথের পূর্ব্বেই প্রত্যহ মহাসমারোহে হলধরের পূজা হইয়া থাকে তাহা কি কি তিনি শুনেন নাই। মথুরায় বরাহ মন্দির প্রসিদ্ধ। যশোর জেলায় মচন্দপুর গ্রামে গাজিরহাটে বামনদেবের পূজা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন নৃসিংহ চতুর্দ্দশী ও বামন দ্বাদশী উপলক্ষে কোটি কোটি বৈষ্ণব অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে নৃসিংহ ও বামন পূজা করিয়া থাকেন এবং আপদে বিপদে গৃহস্থগণও নৃসিংহ কবচ ধারণ করিয়া থাকেন। তীর্থরাজ প্রয়াগে অক্ষয়বটমূলে দশাবতারের মূর্ত্তি আছে তাঁহাদের নিত্যপূজা হইয়া থাকে। অতএব রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য অবতারের পূজা হয় না একথা তিনি কিরূপে বলিতে পারিলেন?

তিনি বলেন যিনি ইচ্ছাময় তাঁহার ইচ্ছাতেই ধর্ম্মের সংস্থাপন, শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন হইতে পারে। এজন্য তাঁহাকে মানব দেহ ধারণ করিতে হইবে কেন। কথাটি ঠিক কিন্তু 'কেন'র উত্তর দিবার স্থান এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নাই। তিনি যদি প্রকৃত সত্য পিপাসু হন ত 'শাস্ত্র মানিব কেন?' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। তাহাতে এই 'কেনর' উত্তর আছে। তিনি বলিতে পারেন কি তিনি প্রত্যহ ভাত খান কেন? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই ত তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে।

ইন্দ্র বলিতেছেন

দৃষ্টৈব কিং ন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম
সর্ব্বাসুরাণরিষু যৎপ্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতা
ইত্থং মতির্ভবতি তেঽহিতেষুসাধ্বী॥

—মাতঃ! তুমিত দৃষ্টি মাত্রেই অসুরগণকে ভস্ম করিতে পারিতে কিন্তু তাহা না করিয়া শত্রুগণের অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছ যাহাতে শত্রুগণও তোমার অস্ত্রাঘাতে পূত হইয়া উৎকৃষ্ট লোকে গমন করে। শত্রুগণের প্রতিও তোমার ঐরূপ সাধ্বী মতি অর্থাৎ কৃপা রহিয়াছে।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে শ্রী ভগবানের ইচ্ছায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইলেও তিনি দুষ্টদের কৃপা করিবার জন্য অবতীর্ণ হন। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে অদ্যকার হিন্দুর ধমনীতে হিন্দু শোণিত প্রবাহিত হইলেও তাহারা বীভৎস অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া কূপমণ্ডুক জ্ঞানের স্পর্দ্ধা করিয়া শাস্ত্র চর্চ্চা না করিয়া মানব সুলভ বিপরীত বুদ্ধি বলে শ্রীভগবানের শাস্ত্রে কথিত অবতার গণের অযথা নিন্দা করিয়া থাকে ও লোকচক্ষে তাঁহাদিগকে হীন করিবার প্রয়াস পায়। এরূপ চেষ্টা কলি কালের উপযুক্তই বটে।

—শ্রীভগবান বলিয়াছেন :—

"ধর্ম্মং বক্ষ্যস্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম।"

নিবেদক—শ্রীমতীতোষ কুমার সেন।

পুস্তক পরিচয়।—

বেদসার; শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী প্রণীত। কলিকাতা ১৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট আর্য্য সমাজ মন্দিরে প্রাপ্তব্য; মূল্য এক টাকা দুই আনা।

পদার্থ ও বঙ্গানুবাদ সমন্বিত বেদমন্ত্রের একখানি নাতিদীর্ঘ সঙ্কলন-গ্রন্থ। আর্য্যসমাজের ভাবে লিখিত বলিয়া পৌরাণিক বা তান্ত্রিক মতের সমর্থন নাই—আচার্য্য দয়ানন্দ সরস্বতী কৃত বেদভাষ্যের অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ের উপযোগী করিয়া বেদব্যাখ্যা অবশ্যই হইতে পারে; এ যুগে তাহার আবশ্যকতা আছে। তথাপি বঙ্গদেশে মূল বৈদিক সাহিত্যের যেরূপ অপ্রচলন, তাহাতে এরূপ সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী ও বেদের পরিচয় দানে সক্ষম ক্ষুদ্র একখানি গ্রন্থের আবশ্যকতা আছে। গ্রন্থকার বহুদিন বেদালোচনায় নিযুক্ত আছেন, তাহার ফলে যে এরূপ একখানি পুস্তক প্রণয়নে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালী মাত্রের ধন্যবাদার্হ। পুস্তকে ভাষা, বিষয়-বিন্যাস ও প্রকরণ-বিভাগ আদি সুন্দর হইয়াছে। এ পুস্তকের বহুল চার বাঞ্ছনীয়।

প্রতিবাদ পত্রখানি 'প্রবাসী''তে প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু তদুত্তরে সম্পাদক যাহা জানাইয়াছিলেন তাহা এই—"আপনি অনুগ্রহ করিয়া যে লেখাটি পাঠাইয়াছিলেন তাহা প্রবাসীতে প্রকাশ করিতে পারা গেল না বলিয়া আমরা দুঃখের সহিত ফেরত পাঠাইতেছি। লেখাটি প্রবাসীতে পাঠাইয়া আপনি আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহের পরিচয় দিয়াছেন সেজন্য আমরা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।"

———

মাস-পঞ্জি—ফাল্গুন, ১৩৪০

উত্তর বিহারে ভূমিকম্পের স্পন্দন অল্পবিস্তর অনেক স্থানে এখনও মধ্যে মধ্যে হইতেছে—বঙ্গীয় সরকারের বিশ্বস্ত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা স্তর প্রভাসচন্দ্র মিত্র হঠাৎ কলিকাতা নিজ বাসগৃহে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন—(৯-২-৪); ডাক ও টেলিগ্রাম বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল স্যর তমাস রাইনও ঐ ভাবে নব দীল্লিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন (১২-৩-৩৪)

বঙ্গীয় ব্যবস্থা সভাতে 'টেররিষ্ট বিল' নামে আর এক দফা সন্ত্রাস-নিবারণী আইন পাশ হইল (১০-২৩৪)—বিহারের ভূমিকম্প-পীড়িত লোকদিগের সাহায্য বিধান জন্য স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট "বিহার ও উড়িষ্যার দৈব বিপদ ঋণ দান ব্যবস্থা।" বলিয়া একটী নূতন আইন পাশ করিয়াছে—ভারতীয় রাষ্ট্রসভায় ভারতীয় দিগকে উচ্চ রাজ কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া দেশ সেবায় ভারতীয় প্রকৃতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিস্তৃত আলোচনা হইল (১০-২-৩৪); বঙ্গীয় ব্যবস্থা সভার "বেঙ্গল ষ্টেট্ এইড্ টু ইনডাষ্ট্রি এক্ট" নামক আইন বলে কারবারী লোকেরা যাহাতে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত টাকার ব্যাঙ্ক-সাহুকারী পাইতে পারে তাহার বিধান হইল (৬-২-৩৪)। এসেম্ব্লী সভার (১৭-২-৩৪) রেলওয়ে খরচের বরাদ্দে দেখা যায় আগামী বর্ষে ভারতীয় রেল সমূহের ৭॥ কোটি টাকার ঘাটতি পড়িবে; রাষ্টসভা বা কৌন্সীল অব ষ্টেট্ "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল" পাশ করিয়া দিল (১৬-২-৩৪) ভারত গভর্ণমেণ্টের নৌবিভাগকে 'রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি' পদবীতে উন্নীত করা যায় কিনা, এ বিষয়ে আলোচনা হইতেছে—মিলের তৈরী খদ্দরকে খাদি বলিয়া বিক্রয় করার প্রতিকূলে এক নূতন আইন পাশ হইল।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু পুনঃ গ্রেপ্তার (১২-৩-৩৪) হইয়া দুই বৎসর কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইলেন (১৬-৩-৩৪)। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ্জ হত্যার আসামীদের তিনজনের প্রাণদণ্ড ও ৫ জন জীবন নির্ব্বাসন 'পাইল'।

দক্ষিণ ভারত ত্রিচিনাপল্লীতে একব্যক্তি বেকার সমস্যায় সপরিবারের কাভেরী গর্ভে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—

স্যর সেকেন্দর হায়েদ খাঁ ছুটি প্রাপ্ত গভর্ণর হারবার্ট ইমার সনের স্থানে চারি মাসের জন্য পঞ্জাবের গভর্ণর হইবেন; বোম্বাইর পোষ্টমাষ্টার জেনরের তমাস রাইনের স্থানে ডিরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন।

রপ্তানী স্বর্ণের উপর একটী কর ধার্য্য করিবার জন্য এসেম্বলী সভাতে পুনঃ প্রস্তাব উঠিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবার ২৩॥ হাজার ছাত্র ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা দিতেছে—এত সংখ্যা ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই; ইহার মধ্যে এক হাজারের অধিক ছাত্রী।

ইংলণ্ড হইতে আগত ক্রিকেট খেলোয়ারেরা মাদ্রাজে ভারতীয় ক্রীড়াশীলদিগকে বিষম রূপে হারাইয়া দিয়াছে।

মহাত্মাগান্ধী দক্ষিণদেশ হরিজন ভ্রমণে এখনও নিযুক্ত; স্থানে স্থানে লোকের বিরুদ্ধাচরণ দেখা যায়, ত্রিচিনাপল্লীতে তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বলিয়া লোক বলে যে "তোমাকে আর সর্ব্ব সময়ে লোকদিগকে প্রতারিত করিতে দেওয়া যাইতে পারেনা।" আগামী ১১ই মার্চ্চের পর মহাত্মা হরিজন আন্দোলন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখিয়া বিহারে ভূকম্প পীড়িত লোকদিগের সেবাতে নিযুক্ত হইবেন বলিয়া প্রকাশ। বড়লাট লর্ড ওয়েলিংডন বিহার ভূকম্প বিধ্বস্ত স্থান সমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন (৭-৩-৩-৩৪),

বৈদেশিক

বিলাতে বেকারের সংখ্যা ২৩৪৯০০০ তে উঠিয়াছে, ১৬৪০০০ বৃদ্ধি দেখা যায়। গত দুই বৎসরের প্রত্যেক সনে এখানে ৬৫০০ লোক রাস্তার চলিতে গিয়া দুর্ঘটনাতে মরিয়াছে, আর ১৭৭০০০ লোক জখম

হইয়াছে। ল্যাঙ্কায়ারের বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যত ভাবিয়া ব্রিটনবাসী বা চিন্তিত হইয়াছে। অত্রত্য রেলপথ ও বিমান পথের যুক্ত সমন্বয়ে যাতায়াত বিষয়ে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা

জ্যারমান নবরাষ্ট্রে লুথারের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিধি অবসান হইতে যাইতেছে—বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্মিলিত যুক্ত রাষ্ট্র সভা বা রিস্‌রাট কমিটিও উঠিয়া গেল। ফরাসী ও জ্যারম্যানে অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ সমস্যা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে—ফরাসীর উক্তি নাজী গভর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত রূপেই সামরিক আকার ধারণ করিতেছে, জ্যারম্যানী তাহা স্বীকার করিতেছে না, বলে ফ্রান্সের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি স্পৃহা প্রবল। জ্যারম্যান বিচারাদালতে এক রায়ে সম্প্রতি প্রকাশ যে কোনও ইহুদীর সহিত জ্যারম্যানের বিবাহ বিধি সঙ্গত বা স্বাভাবিক নহে,—উহা যে কেবল অবাঞ্ছনীয় তাহা নহে, আর্য্য শোণিত ধারার পক্ষে ক্ষতিকর, এজন্য ঐ রূপ বিবাহ উচ্ছেদযোগ্য। নাজি রাষ্ট্রে আর্থিক ও শিল্পের অবস্থা উন্নতি লাভ করিয়াছে বলিয়া ইহাদের দাবী।

ফরাসীতে সমাজতান্ত্রিক দিগের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা দিয়াছে ; ফরাসী গভর্ণমেণ্ট দেশ রক্ষায় বিশেষ মনোযোগী,—বেলজিয়াম সীমান্ত ভূমির সংরক্ষণ, নূতন বিমান পোত নির্ম্মাণ ও সামরিক জাহাজ নির্ম্মাণ নূতন বাজটে বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে।

অষ্ট্রিয়াতে সাম্রাজ্যতন্ত্রীদের নূতন বিদ্রোহ উপস্থিত ; রাষ্ট্রনায়ক ডাঃ ডলফাস অতি সতর্কতার সহিত তাহা নিবারণে রত আছেন। জারম্যান নাজীদের বিতাড়ন নিমিত্ত ডাঃ ডলফাসের চেষ্টা সর্ব্বজনবিদিত। সমাজতান্ত্রিক ও নাজী এই উভয় দলকে উচ্ছেদ করিয়া ইনি অষ্ট্রিয়াকে ইটালীর ফ্যাসিষ্ট আদর্শে উন্নীত করিতে চাহেন। এ বিষয়ে ইতালীর সঙ্গে ব্রিটিশ ও ফরাসী শক্তির সহায়তা পাইবেন বলিয়া মনে হয়। সমাজতান্ত্রিক নেতা হের ওয়ালিসকে সামরিক বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। বেলজিয়ামের বৃদ্ধ রাজা এলবার্ট পর্ব্বত পর্য্যটনে হঠাৎ পড়িয়া মরিয়া গিয়াছেন (১৭-২-৩৪) ইনিই বিগত মহাসমরে জ্যারম্যানীর প্রধান ও প্রথম প্রতিরোধকারী বীর।

ইতালীতে সিগনোর মুসলিনীর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র নির্ম্মূল হয় নাই ; লণ্ডন ও পারিসে ইহাদের ক্রিয়া চলিতেছে বলিয়া কয়েকজন খ্যাতনামা লোক ধরা পড়িয়াছে

স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা শোচনীয়। রাষ্ট্রতন্ত্রের বিঘাতী দলের লোকেরা এখন দুই ভাগে বিভক্ত —একদল প্রজাতন্ত্রের পক্ষপাতী ; অন্যপক্ষ বর্ত্তমান ইতালী ও জ্যারম্যানীর ভাবে ব্যক্তিগত শক্তিমত্তার সমর্থনে জাতীয় শক্তি নূতন করিয়া গড়িতে চাহে।

আমারিকার যুক্তরাষ্ট্র রাজ্যের বেকার ও দৈন্যগ্রস্ত লোকদিগকে ৪৫ কোটি টাকার বস্ত্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট বেকারী লোকদিগকে পুনঃ কার্য্যে নিয়োগ করা যায় কিনা এজন্য সকলের নিকট অনুরোধ করিতেছেন, কারখানার কার্য্যের শ্রমসময় কমাইয়া অধিক শ্রমিক নিযুক্ত করিলে তাহা হইতে পারে বলিয়া এক পন্থাও তিনি দেখাইয়াছেন। পনর বৎসর পূর্ব্বে যে সুরাপান নিরোধকারী (**Volstead Act**) আমেরিকা বিধিবদ্ধ করিয়াছিল তাহা এবার উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইল, বলে ঐ জন্য অনেক টাকার রাজস্ব ও অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে, আর বেয়াইনী মদের বহুল চলন হইয়াছে।

উত্তর চীনের জাপানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নবরাষ্ট্র মাঞ্চুকুর প্রধান শাসক পু-ই কে মাঞ্চুকুর প্রথম সম্রাট বলিয়া অভিষেক করা হইল (১-৩-৩৪) ইনিই পূর্ব্বে দুইবার চীনের সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

পঞ্চম বর্ষ] চৈত্র—১৩৪০ [৬ষ্ঠ সংখ্যা

সাধনার পথে

শিক্ষাই সাধনার প্রধান সাধন এজন্য তাহার আদর্শকে জাতীয় সাধনার প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা যায়। লোকের উন্নতি বা জাতীয় প্রকর্ষের বীজ সংস্কাররূপে তাহার অদৃষ্টের ভূমিতে নিহিত থাকে বটে—আর্য্য ভারতের দৃষ্টিতে উহা কর্ম্মফল বা লোকের পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সৎ বা অসৎ কর্ম্মের পরিণাম; আধুনিক পাশ্চাত্য মতে লোকে উহা পূর্ব্ব পুরুষদিগের শোণিতসূত্রে অথবা জড় জগতের পদার্থ বিশেষের সমবায় বা যোগাযোগে অথবা স্নায়বিক সম্বন্ধে জন্মের সহিত পায়। যে প্রকারেই হ'ক, কতকগুলি সংঘটনীয় ও সম্ভাব্য মৌলিক অবস্থা সকল জীবনেরই প্রারম্ভে বিদ্যমান থাকে; তাহারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া সাধনা বা 'কালচারে'র বুনিয়াদ গড়ে। সভ্যতার বিবিধ প্রকারভেদ—সাহিত্য, কলা, বিদ্যা, ধন, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন তাহা হইতে সমুদ্ভূত হয়। শিক্ষাই সেই সম্ভাব্যের বীজভূমি হইতে সাধনার সুগঠিত বৃক্ষের উৎপাদন করে, আর সেই শিক্ষার তারতম্য অনুসারেই মানবজীবনের আকাঙ্খনীয় যাবতীয় বস্তুর লাভ হইয়া থাকে।

আদর্শবাদ—শিক্ষা ও সাধনায়

এইরূপে শিক্ষাই সাধনাপথের প্রধান সম্বল। আর এজন্য চাই তার এক উচ্চ আদর্শ বা পথ-প্রদর্শক। শিক্ষায় এই আদর্শের স্থান অতি মহান্ ও গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শ ব্যতীত কেবল কোনও শিক্ষা-ব্যবস্থা অন্ধের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে, আবার কোনও প্রকার ব্যবস্থার বাস্তব সত্তার অভাবে কেবল আদর্শ লইয়া শিক্ষা পঙ্গুর ন্যায় অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে। উচ্চ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বা আদর্শ চরিত্রের পুরুষ বা উচ্চ কোনও নীতি এই আদর্শের স্থান অধিকার করিতে পারে। সৎসঙ্গ বা উপযুক্ত গুরুর সংস্রবে আসিয়া লোকে সহজেই এই আদর্শের সন্ধান পায়, আর দেশ বা স্বজাতি প্রেমিক রাষ্ট্রপরিচালক বা সমাজ নেতারা বিশেষ বিশেষ নীতি অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান সময়ে

বিভিন্ন দেশে যে বিভিন্ন প্রকারে শিক্ষানীতির প্রবর্ত্তন করিতেছেন, তাহা বাস্তবিক তাহাদের মধ্যে ঐ আদর্শেরই কার্য্য করিয়া থাকে। এই আদর্শ-চালিত শিক্ষানীতিই জাতির প্রধান সংরক্ষক ও ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা। যে লোকের জাতীয় শক্তি যত অধিক সবল তাহার শিক্ষানীতিও তত সুদৃঢ়। তবুও বলিতে হইবে, শিক্ষা যখন রাষ্ট্রনীতির অন্তর্ভুক্ত থাকে, তখন উহার স্বকীয় নীতিকে তাহার কাছে খর্ব্ব হইয়া থাকিতেই হয়—উহা তাহার নিজ মহত্ত্ব ও পবিত্রতা সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারে না। এজন্য শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা চরিত্রের আদর্শকে নীতিগত জাতীয় আদর্শ হইতে উচ্চতর স্থান দিতেই হয়। আজ জগতের সর্ব্বত্র রাষ্ট্রশক্তি ও রাষ্ট্রনীতি প্রবল। রাষ্ট্রের সংহত শক্তির দ্বারাই জাতিগত শক্তির পরিমাপ হয়, এজন্য ব্যক্তিগত চরিত্রমাহাত্ম্যে লাঘব ঘটিয়াছে। যাহারা শক্তিমান—বিদ্যাবুদ্ধিতে অপরের গুরু, শিক্ষক বা পথ প্রদর্শক হওয়ার উপযুক্ত, তাহারাও রাষ্ট্রের যোয়ালীতে আপন স্কন্ধ জুড়িয়া দিয়া রাষ্ট্রনীতির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণের সহায়ক হইতেছেন। স্বাতন্ত্র্যই চরিত্র-বলের প্রধান সহায়, এজন্য এইরূপ ব্যবস্থাতে অতি বড় মনস্বী ও বিদ্বানদিগেরও চরিত্রহীনতা আইসে, এজন্যও অদ্যকার বিদ্বদ্‌সমাজে চরিত্রবানের সংখ্যা এত অল্প। কিন্তু এই চরিত্রই শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মহৎ চরিত্র চুম্বকশলাকার শলাকান্তরকে উন্নীত করিবার ন্যায় অতি সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে অপর লোকের চরিত্র গঠন ও সুশিক্ষার সংযোজনা করে।

ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে আবহমানকাল ধরিয়া এই চরিত্রের আদর্শ সম্পূজিত ও অনুসৃত হইয়া আসিতেছিল। প্রাচীন (স্বাধীন) ভারতে গুরুকুল প্রথায় সদ্‌ গুরুর সঙ্গে বাস করিয়া শিক্ষা লাভ করিবার কথা ছাড়িয়া দিলেও, মধ্যযুগের মুসলমান বিজেতা দিগের শাসন সময়েও গ্রামে গ্রামে টোল ও পাঠশালা ও তাহার অধিষ্ঠাতা রূপে গ্রামের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত দিগের বিদ্যমানতা সে আদর্শের সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিল। ফলে তখন ইহাদের উচ্চ চরিত্রের আদর্শে কেবল মাত্র ছাত্রগণই যে সুশিক্ষা লাভ করিত এমন নহে, গ্রামবাসী জন মাত্রই তাহাদের প্রদত্ত সুশিক্ষা ও তাঁহাদের উচ্চ আদর্শের সচ্চরিত্রের পরম কল্যাণদায়ী সুফল সম্পূর্ণ লাভ করিত। সমাজের সুনীতি ও সুরুচি তাহাদের প্রভাবেই অব্যাহত থাকিত।

অদ্যকার প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে সে আদর্শ সম্পূর্ণই চলিয়া গিয়াছে, পক্ষান্তরে যে নীতির আদর্শে এক্ষণে শিক্ষা প্রণালী পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহাও অপর দেশের ন্যায় জাতির কল্যাণকর স্বকীয় কোনও নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। দেশের সেই শিক্ষাপ্রণালীকে উন্মূলিত করিয়া যে শিক্ষার প্রচলন এ দেশে এখন হইয়াছে, তাহা যে অতি অকিঞ্চিৎকর—সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধির সাধনমাত্র—তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। ইহাতে চরিত্রগত শিক্ষাদর্শ বিলুপ্ত হইয়াছে, জাতীয় শক্তির সম্বর্দ্ধক অন্য কোনও মহৎ উদ্দেশ্য কিছু সাধিত হয় নাই। প্রতিকার কল্পে স্থানে স্থানে জাতীয় শিক্ষা প্রচলনের ক্ষীণ চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু ইহারাও কোনও উচ্চ নীতির আদর্শে পরিচালিত হইতে পারে নাই বলিয়াই, এযাবত তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে দেশের শাসন-চক্রে আজ নূতন পরিবর্ত্তন হইতে যাইতেছে—রাষ্ট্র সংস্কারের নামে অনেক কিছু বিষয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিবে! প্রকৃত ভাবে চলিলে—জাতির প্রকৃত অভাব ও দেশ-প্রকৃতির অবস্থা বুঝিয়া, জাতীয় শক্তিবর্দ্ধক কোনও উচ্চ নীতি শিক্ষাক্ষেত্রে এখন প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। যদিও ব্যক্তিগত চরিত্রের আদর্শে যে সুশিক্ষা হওয়া স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়, তাহা এক্ষেত্রে হইয়া উঠিবে সে আশা

করা যায় না, তবুও অপরাপর শক্তিশালী দেশের ন্যায় রাষ্ট্র বা জাতির প্রকৃত কল্যাণের পক্ষে কোনও শিক্ষানীতি এক্ষণে অনুসৃত হইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও পক্ষপাতমূলক পার্থক্য প্রভৃতি এমন কতকগুলি অনর্থ আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে, যাহা—অন্য ক্ষেত্রে যাহাই হউক্—শিক্ষার ক্ষেত্রে সাংঘাতিক। শিক্ষার মৌলিক কোনও উচ্চ আদর্শ ইহার মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। কাজেই রাষ্ট্র সংস্কারে শিক্ষার প্রকৃত সংশোধন সুদূরপরাহত—যে ব্যক্তিগত আদর্শ শিক্ষার ভূমিতে সর্ব্বদাই আদরণীয় ও ফলপ্রদ, অদ্যকার এই নানা গোলযোগের মধ্যে সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠিতহইতে পারে কি না, তাহা একবার সকলেরই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

কংগ্রেস প্রসঙ্গে।—

কংগ্রেস যে এদেশের সর্ব্বপ্রধান জাতীয় রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্বশ্রেণীর লোকের স্বার্থ ও স্বত্ব সংরক্ষণ করিতে ও এক অবনত জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও মুক্তির কামনার একনিষ্ঠা একমাত্র কংগ্রেসেরই আছে। সমগ্র জাতি সমবেত ভাবে একমাত্র কংগ্রেসের পতাকাতলেই দণ্ডায়মান হইতে পারে। আরও অনেক প্রতিষ্ঠান বা সভা সমিতি আজ দেশে আছে, কিন্তু তাহারা কোনও না কোনও সম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ স্বার্থে স্বার্থবান। যে সকল মহানুভব ব্যক্তি এযাবৎ কংগ্রেসের সেবাতে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছেন, এক সার্ব্বজনীন কল্যাণের নীতিই তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল। কার্য্যপদ্ধতিও তাহাদের অনুকূল ছিল। এজন্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বা সামাজিক প্রশ্ন কংগ্রেসের কার্য্য তালিকাতে স্থান পাইতে পারে নাই—কংগ্রেস আপন পথে ধীরে ধীরে শক্তিসংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমানে তার এই অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। একদিকে গণমতের প্রাধান্য স্বীকার ও গণ-স্বার্থের সংরক্ষণ এবং অপরদিকে স্বাদেশিকতার প্রসার সাধন—এই দুইদিকে যে জাতীয়তার ভাবধারা কংগ্রেসের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, বিদেশীয় শাসন কর্ত্তৃপক্ষকেও তাহা গ্রাহ্য করিয়া চলিতে হইয়াছিল। এই যে কংগ্রেস তাহার প্রভাব দেশমধ্যে প্রসারিত করিয়া জাতীয় শক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতেছিল, তাহার মূলে নিহিত ছিল স্বদেশ প্রেমের উচ্চ নীতি—কোনও ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রাধান্যই তাহার পরিচালক ছিল না। উচ্চ চরিত্র, বিদ্যাবুদ্ধি ও ধনসম্পদের বল লইয়া অনেকেই কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহারা ব্যক্তিগত প্রাধান্যকে নীতির অনুবর্ত্তী করিয়া বা নিজের ব্যক্তিত্বকে নীতির বশবর্ত্তী করিয়া চলিতেন। তা বলিয়া নীতির পরিবর্ত্তন বা কংগ্রেস নেতৃদলের মধ্যে মতভেদ বা বিবাদ হইত না এমন নহে—নরম ও গরম দলের শ্রেণীবিভাগ এবং বিধিবিহিত ও চরম নীতির ভেদাভেদ ঐ সময়েই হয়। মেটা-ওয়াচাও সুরেন্দ্রনাথ-ভূপেন্দ্রনাথ এবং বালগঙ্গাধর-লজপত-বিপিনচন্দ্র পালের কংগ্রেস নীতির পার্থক্যই ভারতীয় জাতীয়তার নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিল। তাহার মুখেই মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও প্রভাব লইয়াই তিনি রাষ্ট্রের পরিচালনাতে ব্রতী হন। এই ব্যক্তি-মাহাত্ম্য 'মহাত্মা' নামে দেশের আবালবৃদ্ধের উপরে কার্য্য করিতে থাকে। ইহাতে আবেগ ও ভাবপ্রবনতার দিক দিয়া অসাধারণ কার্য্য হইল—সমগ্র দেশমধ্যে এক অসাধারণ গণজাগরণের উদ্দীপনা উঠিল। জন-জাগ্রতি বলিয়া রাষ্ট্রনীতিকেরা উল্লাসে তাহা বরণ করিয়া লইল,—জাতীয়তায় ভারতবাসীর এক অপূর্ব্ব

সম্পদ লাভ হইল বলিয়া সমগ্র ভারত মহাত্মা গান্ধীকে এই প্রথম ভারতের একচ্ছত্র নায়ক বলিয়া সম্পূজিত করিতে লাগিল। ভাব ও আবেগের খেলা ইহাতে যতখানি হইতে লাগিল, নীতির দৃঢ় বল তাহাতে তত নিবদ্ধ ছিলনা। তাহার উপরে মহাত্মা কেবলমাত্র তাহার নিজ ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মতবাদের স্তরে একটীর পর আর একটী কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন—দেশবাসী অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াও তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিল। ইহার উপরে আবার তিনি রাষ্ট্রনীতিতে ধর্ম্ম ও সমাজ সমস্যার সংযোজনা করিয়া বিষয়টী আরও জটিল করিয়া তুলিলেন। প্রথমতঃ হিন্দুমুসলমানের মিলন লক্ষ্যে তিনি ভারতের জাতীয় সমস্যার উপরেই খিলাপত আন্দোলনকে উত্তোলিত করিয়া মুসলমানের প্রীতি আকর্ষণ করিতে গিয়াছিলেন। ফল তাহাতে বিপরীত ফলিল—মুসলমান কংগ্রেস-পূজিত ভারতীয় জাতীয়তার আদর্শকে ভুলিয়া, তাহার উপরে খিলাপতের পতাকাতলে নিজ মুসলিম সার্ব্বজনীনতার ভাবে উল্লসিত হইল। অচিরে খিলাপতের নিজ অধিষ্ঠান তাহার নিজ ভূমে ও আপন জনগণ কর্ত্তৃক উন্মূলিত হইলেও, ভারতীয় মুসলমান সে আদর্শে আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের যে পরিকল্পনা করিয়া বসিয়াছিল তাহাকেই ভারতে বদ্ধমূল করিবার প্রয়াসে ভারতীয় জাতীয়তার মহামিলন ভূমে নূতন বিচ্ছেদের সৃজন করিল। বিভিন্ন নামের ও বিভিন্ন দলের মুসলমান সভা সমিতি গঠিত হইতে লাগিল; মহাত্মার অতি প্রিয় ও অনুরক্ত মুসলমান নেতারাও অচিরে তাহার বিরোধ করিতে বসিল। অপর দিকে প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থার নূতন সংস্কার প্রবর্ত্তন হইতে এই সাম্প্রদায়িক বিরোধকেই প্রধান করিয়া মুসলমানেরা নানা সুবিধা ও সুযোগ পাইবে মনে করিয়া এই বিরোধকে বাড়াইয়াই চলিয়াছে। ক্রমবর্দ্ধমান এই সাম্প্রদায়িক বিবাদকে ভাবী শাসন ব্যবস্থাতে সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগী কায়েম করিয়া কংগ্রেসের চিরপোষিত ভারতীয় জাতীয়তায় স্থায়ী বিচ্ছেদ আনয়ন করা হইল। ফলে আজ কংগ্রেস ভূমে হিন্দু মুসলমানের পুনর্মিলন সুদূরপরাহত হইয়াছে। পক্ষান্তরে মুসলমান মনে করে ও কেহ কেহ প্রকাশ্যে বলেন—"কংগ্রেস এখন হিন্দু সভায় নামান্তর মাত্র, হিন্দু-সভা আর কংগ্রেসে এখন আর তফাৎ কিছু নাই।' আবার এই হিন্দু সমাজের মধ্যেই গান্ধী প্ররোচিত কংগ্রেসের কর্ম্ম পদ্ধতিতে বিষম বিবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ভেদরাহিত্য ও হিন্দুদের মন্দিরে সকলের প্রবেশাধিকার এবং হিন্দু বিবাহে বয়স সীমা নির্দ্ধারণ প্রভৃতি চরম সংস্কার বিষয়ে রাজবিধানের সমর্থন করিতে গিয়া মহাত্মা একদিকে যেমন আপন কর্ম্মনীতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, তেমনই তাহার ও তাহার দলভুক্ত কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের বিরুদ্ধে সনাতনপন্থী হিন্দুদিগকে বিপক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন। এইরূপে মূল হিন্দু সমাজের মধ্যেই বিভিন্ন প্রকারের ভেদ, বিরোধ ও অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে।

কোনও স্থির নীতিতে পরিচালিত না হওয়াতে কংগ্রেসের কর্ম্ম-পদ্ধতিতে অসংযম সহজেই স্থান পাইল; তাহার উপর যখন অত্যল্প সময় মধ্যে স্বরাজ, স্বাধীনতা, অসহযোগ প্রভৃতি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বিহীন প্রাণ মাতান নাম সকল লোকচক্ষে ধৃত হইল, তখন সে অসংযমের ঔদ্ধত্য ও ব্যাভিচার সহজেই আসিয়া পৌছিল—রাষ্ট্রশক্তি বিরোধ করিতে গিয়া অসংখ্য লোক দলে দলে কারাদণ্ড আদি অশেষ নিগ্রহ ভোগ করিতে লাগিল; একশ্রেণীর লোক চরম পথে চলিয়া লোক হিংসায় দেশ মধ্যে এক সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়া বসিল, তৎফলে দেশ মধ্যে যে সকল চরম রাজ বিধানেরও প্রবর্ত্তন হইয়াছে,

তাহাও কম সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে নাই। অদ্যকার এই উন্নতিশীল মানবতার যুগে উহা রাজা প্রজা সকলের পক্ষেই কলঙ্কর কথা। রাজবিধান তবুও পরিবর্তনশীল—রাজনীতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় বিরোধ ও অসঙ্গতির সমাপন হইতে পারে; কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি মূলতঃ সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; রাষ্ট্রের উচ্ছৃঙ্খলতা আজ সেই ধর্ম্ম ও সমাজকে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে; রাজশাসনের প্রবল শক্তির ন্যায় ইহাকে দমন করিবার কোনও সামর্থ্য চাক্ষুষ সমাজ ও ধর্ম্মে দেখা যাইতেছে না; কিন্তু ইহার পরিণাম জাতির উপরেই অতি সাংঘাতিক হইতে যাইতেছে। বর্ত্তমান সামাজিক বিরোধ ও বিচ্ছেদ তাহারই পরিচয় দিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসের শক্তি কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন—কোনও স্থির নীতির বল ইহার নাই; যাহা কিছু মহাত্মার নামেই এখনও চলে। সম্প্রতি তিনি কংগ্রেস কার্য্যপদ্ধতিতে আবার এক পরিবর্ত্তন করিতে বসিয়াছেন। আইন অমান্য করণ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করিয়াছেন এবং কৌন্সিল ইত্যাদিতে কংগ্রেসকর্ম্মী দিগের পুনঃ প্রবেশ বা স্বরাজ্য দলের গঠনেও অনুমোদন করিয়াছেন। আইন অমান্য প্রত্যাহার ভিন্ন এখন আর গত্যন্তর নাই। স্বরাজ্যদলকে শক্তিশালী করিয়া জাতীয়তার এবং কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করাও এখন কঠিন হইবে—তাহা করিতে গেলে তেমন শক্তিসম্পন্ন দল-নায়কের প্রয়োজন। সে জন্য স্বর্গীয় মতিলাল নেহেরু বা চিত্তরঞ্জন দাসের ন্যায় লোক ইহাদের মধ্যে এখন দুর্লভ। মহাত্মা নিজে সে নায়কত্ব করিতে পারেন কিনা তাহাও সন্দেহ।

ব্রতাচারী।—

বাঙ্গলার উদ্বেলিত যুব-মনকে সংযত করিয়া প্রকৃত কার্য্যোপযোগী করিবার জন্য স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রেরই চেষ্টা থাকা আবশ্যক—বাঙ্গলার উপর আপদ্‌পাত অনেক; অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক, শিক্ষা প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়েই বাঙ্গলার নানা সঙ্কট উপস্থিত; অথচ বাঙ্গলার আদর্শবাদ ও ভাবপ্রবনতা প্রসিদ্ধ। এজন্য সংঘর্ষের যাতনাও তার অধিক। এ অবস্থায় কোনও প্রতিকারের দিকে লোকের মতি যাওয়া স্বাভাবিক। রাজপুরুষদিগের মধ্যেও এদিক দৃষ্টি পড়িয়াছে দেখিয়া ইহার গুরুত্ব আরও অধিক উপলব্ধি হইতেছে—মিঃ গুরুসদয় দত্ত একজন উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী। তিনি সম্প্রতি 'ব্রতাচারী' নামে বঙ্গদেশে একটী যুব আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি 'নারী মঙ্গল সমিতি' স্থাপন করিয়া বঙ্গীয় রমণীকুলের মঙ্গল সাধনে তৎপর হইয়াছেন, এক্ষণে বঙ্গীয় যুবকগণের কল্যাণ সাধন ও সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কল্যাণ বিধানে ব্রতী হইয়াছেন। অল্পদিন হইল ফরিদপুর সহরে তাহার ভ্রমণ উপলক্ষে এক ব্রতাচারী সঙ্গম হইয়াছিল; তাহাতে স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইংরেজ কর্ম্মচারী যে অভিভাষণ করিয়াছিলেন, তাহাতে উহার উদ্দেশ্য ও উদ্যোক্তাগণের মনোভাব অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছিল—বলেন, "আমরা সকলেই একটী আদর্শের অনুভাবনা করি যাহাতে বাঙ্গালী শারীরিক শক্তি, চরিত্র ও সংযম লইয়া দেশের কল্যাণে ব্রতী হইয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারে। ব্রতাচারী আন্দোলন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হইতে পারে।" আবার "ব্রতাচারী বাস্তবিক পক্ষে একটী জাতীয় আন্দোলন; জাতীয় সাধনা (culture)র ভিত্তিতে উহা প্রতিষ্ঠিত, উহা হইতে ইহা প্রেরণা লাভ করিয়াছে। তবে ইহা এরূপ সঙ্কীর্ণ নহে যে অপর জাতির সাধনাতে কোনও মঙ্গলই দেখিতে পায় না, বরং অপরের সাধনাতে যাহা কিছু ভাল তৎ

সমুদয়ই ইহা আয়ত্ত করিয়া লইতে চায়......" "ঐরূপে ইহারা এমন একটী জীবনের ব্রত লাভ করিবে যাহাতে তাহাদের নাগরিক জীবনের এক উচ্চ আদর্শ লাভ হইবে"—ইত্যাদি কথাতেই আন্দোলনের উদ্দেশ্যে কতকটা বুঝিতে পারা গেল। এদেশের জাতীয় সাধনার মর্ম্মকথা কি একালে তাহা বুঝিয়া উঠা বড়ই কঠিন; প্রচলিত শিক্ষা, দীক্ষা, জীবনযাত্রা সমুদয়ই তাহারা পরিপন্থী, নাগরিক জীবন—citizenship, অপর সাধনার শ্রেষ্ঠ বিষয়—"all that is best in the culture of other peoples" ইত্যাদি অনেক কথা অদ্যকার জাতীয় সাধনায় প্রধান আদর্শ বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। নাগরিক ধর্ম্ম অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম্ম, যাহারা উৎপত্তি ও উৎকর্ষ লোকের নিজ প্রকৃতির মধ্যেই নিবদ্ধ, এবং অপরের শ্রেষ্ঠ সাধনা অপেক্ষাও যাহা উৎকৃষ্ট তাহা আপন স্বধর্ম্ম,—এইরূপ অনেক মহান্ ভাব আজ বুঝিয়া উঠাই দুঃসাধ্য।

নারীর অধিকার।—

নারীর অধিকার বলিয়া আজ যে প্রশ্ন যে ভাবে এদেশে উঠিয়াছে তাহা ভারতের নিজস্ব বিষয় নহে—উহা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য সমাজের সহিত সংমিশ্রণ ও অদ্যকার এদেশের উপরে পাশ্চাত্যের প্রভাববিস্তারের অন্যতম ফল। তদুপরি বর্ত্তমানে লোকের অতিমাত্র রাজনৈতিক মনোবৃত্তি যাহাতে লোকে মনে করে যে রাজনৈতিক অধিকার লাভই মনুষ্যজীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য—ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি আর সমুদয় তাহার কাছে নগণ্য, তাহাতে বিশেষ করিয়া ইহারা বুঝিতেছে যে এদেশের প্রচলিত রীতি নীতি সমুদয়ই সেই রাজনৈতিক অধিকার লাভের প্রতিকূল; বর্ত্তমান এই দেশের এই যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দৈন্য তাহার জন্য ঐ সকল দেশপ্রচলিত রীতি নীতি গুলিই দায়ী; তাহা উঠাইয়া দিতে পারিলেই এই অবনতির অবসান ঘটিবে—স্বাধীনতা লাভের পথ মুক্ত হইবে, বর্ত্তমানে সময়ের প্রধান কাম্য ও আবশ্যক বিষয় যে দেশের রাজনৈতিক মুক্তি তাহা অর্জ্জিত হইবে। এই ভাবে স্ত্রী-স্বাধীনতাকে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সহায়ক বলিয়াই অনেকে বরণ করিয়া লইতে চাহেন। কিন্তু দেশ আজ এতই উদ্বেলিত যে প্রকৃত স্বাধীনতা এই ভাবে আসিবে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর কাহারও নাই। যতদূর দেখা যায়, তাহাতে ঐ স্বাধীনতা কেবল কথার কথায় রহিয়া যাইতেছে, এবং ঐ কথার দাসত্ব ব্যতীত আপাততঃ আর কিছু লাভ হইতেছে না; পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষের অবাধ মিলন আদি ব্যাপারে মানব মনের এমন কতকগুলি ভাববিকৃতি আইসে যাহাতে প্রকৃত অনেক বিষয় হইতে মানুষকে সরিয়া আসিতে হয়—স্বাধীনতা লাভের বা অন্য কোনও মহৎ বিষয় অর্জ্জনে মানুষের যে স্থিরমতি বা কর্ম্ম পদ্ধতির আবশ্যকতা, বর্ত্তমান নানা ভাব-বিহ্বলতার মধ্যে তাহাতে যে নানা প্রকার অবহেলা হইতেছে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সমুদয় বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা ধরা পড়ে। স্বাধীনতা বলিতে এক্ষণে ব্যভিচার বা সংযমের অভাব মাত্র বোধ হইয়া থাকে—ব্যবহার ও চরিত্রগত কোনও দায়িত্ব তাহাতে আসিতে চায় না। 'কো-এডুকেশন' বা বালকবালিকা ও যুবকযুবতীর একত্র ক্লাশে বসিয়া শিক্ষা লাভ করা চাই। ইহাতে জ্ঞানার্জ্জনের কথা তুচ্ছ; কারণ যে শিক্ষা লাভের জন্য বালিকা বা যুবতীদিগকে পুরুষ সঙ্গে পাঠান হইতেছে, সে শিক্ষা যে পুরুষ দিগের জন্যই দোষাবহ ও প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের পরিপন্থী তাহা এক্ষণে সকলেই স্বীকার করিতেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্ত্রীদিগের পুরুষের সঙ্গে একত্র পাঠ করিবার

অধিকার লাভই বড় কথা; ইহার ফলাফল গৌণ। রাজনৈতিক অধিকার লাভ, ব্যবস্থা-সভায় ভোটাধিকার বা উচ্চপদবী লাভ স্ত্রী স্বাধীনতার আর একটী অকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়। এক্ষেত্রেও রাজনীতি ক্ষেত্রের অধিকার লাভই বড় কথা, রাজনীতি যাহার সাধন—গৃহ ধর্ম্মের শান্তি ও শৃঙ্খলা, স্ত্রীর যাহাতে স্বভাবসিদ্ধ চির অধিকার—তাহা অবহেলিত হইতেছে। এইরূপে অধিকার লাভের বিপরীত ফল সমাজে ইতি মধ্যেই দেখা দিয়াছে; পাশ্চাত্য সমাজ ইহার বিষে জর্জ্জরিত, কিন্তু আমরা এখন পরকীয় ভাবে এতই আত্মভোলা যে তাহা দেখিয়াও সাবধান হইবার আবশ্যকতা বোধ করি না। নারীর অধিকার ভারতে খুবই আছে, তাহা নারীর মর্য্যাদা ও স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতায়—জগত ও সংসারেরে স্থিতি ও সৃষ্টিতে তাঁহার একছত্র দায়িত্ব ও অধিকারে।

হিমালয় শিখরাভিযান।—

হিমালয়ের নাঙ্গা পর্ব্বত পার হইতে এক জার্ম্মান অভিযান ভারতে আসিয়াছে, পূর্ব্বে একবার এই অভিযান নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। এইবার সেই যাত্রার অভিজ্ঞতা লইয়া আবার নূতন আয়োজনে এই অভিযান হইবে। কাশ্মীর পথে এই যাত্রা হইতেছে। গতবৎসর নেপালের পথে গৌরীশঙ্কর অভিযান হইয়াছিল; তাহাও নিষ্ফল হইয়া আসিয়াছে। গৌরীশঙ্কর অভিযান দ্বারা বিধর্ম্মী লোকদের পদস্পর্শে হিমালয়ের পবিত্রতা নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ভূতপূর্ব দালাই লামা তাঁহার মৃত্যুর অব্যহিত পূর্ব্বে এক দুঃখ জানাইয়া গিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে ঐরূপ না হয় সেরূপ আকাঙ্খা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। হিমালয় দেবভূমি—ঋষি ও মহাত্মাদিগের সূক্ষ্ম দেহ তথায় বিচরণ করে, এ বিশ্বাস এদেশের অধ্যাত্মতত্ত্বে বিশ্বাসবান ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। হিমালয় তপস্যা ও নীরব সাধনার স্থান! ভারতের লক্ষ লক্ষ তপস্বী ও সাধু পুরুষ তথায় কালযাপন করিয়াছেন, এবং আজও করেন। আধুনিক কালের উন্নত লোকদিগের চরিত্রগত দম্ভ বা জাতীয় স্পর্দ্ধার পদভরে হিমালয়ের বায়ুমণ্ডল ব্যাহত হওয়া অসম্ভব নহে। বিগত অভিযানের পর উত্তর বিহার ও নেপাল রাজ্যের বিষম ভূমিকম্প ব্যাপার, তাহাতে নেপালরাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। নেপালরাজ গৌরীশঙ্করের ভূস্বামী। বিগত বর্ষের ইউরোপীয় অভিযানকে গৌরীশঙ্কর উত্তরণে অনুমতি দান করাতেই নেপালের উপর এই দৈব আক্রোশ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। আবার আর একটী কথা ইহার মধ্যে উঠিয়াছে যে গৌরীশঙ্কর এই ভূকম্পন ফলে আপন উচ্চতা আরও এক হাজার ফুট বাড়াইয়া লইয়াছে। একথা সত্য কিনা ভূতত্ত্ববেত্তাগণ ও গভর্ণমেণ্টের সার্ভে বিভাগের ব্যক্তিরা খোজ করিয়া দেখিতে পারেন। ভূপৃষ্ঠের উন্নয়ন বা অবনয়ন ভূতাত্ত্বিকগণের নিকট অসম্ভব বা অস্বাভাবিক বিষয় নহে। পর্ব্বত-গাত্র ও পর্ব্বতশিখরদেশের বর্দ্ধনশীলতা বিষয়ে অনেক বৈজ্ঞানিকও অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন—সমুদয় হিমালয় প্রদেশই ভূপৃষ্ঠগঠনপ্রণালীর একটী পরিণত ফল। হিমালয়ের উন্নয়নের ন্যায় ভূপৃষ্ঠের আরও অনেক স্থলেব অনেকানেক বিপুল পরিবর্ত্তন অসীম কালপ্রবাহের বিভিন্ন যুগে হইয়া গিয়াছে। এই হিমালয়ের গঠনকালে ভূপৃষ্ঠের যে ভীষণ যাতনা ও ভূকম্পনাদি বিষম বিতাড়ন হইয়াছিল তাহা সম্ভবপর ও অনুভবযোগ্য। যদি গৌরীশঙ্করের আরও উন্নয়ন হইয়া থাকে, তবে তৎসঙ্গে এরূপ ভূমিকম্পের সমুদ্ভব হওয়া অতি সাধারণ বিষয়। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় বিজ্ঞানের প্রধান কার্য্য। গৌরীশঙ্করের উন্নয়ন প্রকৃত ঘটনা কিনা তাহা বৈজ্ঞানিকের পর্য্যবেক্ষণসাপেক্ষ।

পর্ব্বতশিখরের উন্নতিপ্রাপ্তি ভূমিকম্পের ন্যায় রহস্যপূর্ণ বা অজ্ঞাতকারণ নৈসর্গিক ব্যাপারেরও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে, সুতরাং উহা বৈজ্ঞানিকের গ্রহণযোগ্য। কিন্তু পর্ব্বতের উন্নয়নের মধ্যে বিজাতীয় ও বিধর্ম্মীদিগের পদস্পর্শ ভয়ের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহা নির্ণয় করা আধুনিক বিজ্ঞানের অসাধ্য। আর যাহা অসাধ্য তাহাই উহার অগ্রাহ্য !

বৈজ্ঞানিকের বিদ্বেষ।—

এই বৎসর বড়দিনের ছুটিতে বোম্বাই সহরে নিখিল ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের এক অধিবেশন হয়—আজ কয়েক বৎসর যাবত ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৈজ্ঞানিকগণ এই ভাবে বৎসরে একবার সম্মিলিত হইতেছেন। ইতিপূর্ব্বে রাজনৈতিকসভা কংগ্রেস বিশেষ আড়ম্বরের সহিত এক এক স্থানে বসিত বলিয়া অন্যান্য কংগ্রেস বা বাৎসরিক সম্মিলনীগুলি তত খ্যাতি লাভ বা লোকচক্ষে বিখ্যাত হইতে পারিত না। এই দুই বৎসর সেই কংগ্রেস মৃতপ্রায়; উহার অভাবে অন্য যেখানে যে কংগ্রেস বসে তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক খ্যাতি পায়। সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক কংগ্রেসে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যাদি মাত্র আলোচিত হয়, ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপকগণ তাহাতে যোগদান করিয়া থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্র ভিন্নও অন্যত্র বৈজ্ঞানিক থাকিতে পারে, ভারতের কোনও স্থানে একালে তেমন আবহাওয়া বহে না। এবারের বৈজ্ঞানিক সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন একজন বাঙ্গালী অধ্যাপক, ডাঃ মেঘনাথ সাহা। তাঁহার বিশেষ চেষ্টাতে এবারের সভায় ইউরোপীয় উন্নত দেশসমূহের অনুকরণে ভারতে একটী স্থায়ী বিজ্ঞানশিক্ষালয় বা একাডেমী স্থাপনের প্রস্তাব হয় এবং কলিকাতাতেই উহার স্থান নির্দ্ধারণ হওয়া প্রায় স্থিরীকৃত হয়। ইহার পরে সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের বৈজ্ঞানিকসভার এক অধিবেশন হইয়াছে, তাহাতে সভাপতি হইয়াছিলেন কলিকাতাতেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ মান্দ্রাজী বৈজ্ঞানিক স্যর সি, ভি, রমণ। এই সভাতে তিনি বিজ্ঞানে কংগ্রেসের পূর্ব্ব প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন যে "কলিকাতার একটী ক্ষুদ্র দল অতি অন্যায় ব্যস্ততায় সহিত এই একাডেমী স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে" ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক বায়ুমণ্ডলে এরূপ বিরোধ ও বিদ্বেষ অতীব পরিতাপের বিষয়। ইহা বর্ত্তমান সর্ব্বপ্রকারে দূষিত দেশের সাধারণ বায়ুমণ্ডলেরই অন্যতম কুফল। ইহার সঙ্গে বর্ত্তমান সময় বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা দেশের প্রতি বাহিরের অন্য প্রদেশের লোকদিগের বিদ্বেষ মূলক মনোবৃত্তিরও এক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলন।—

কলিকাতাতে বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ ও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা ব্যবসায়ী দিগের এবার একটী যুক্ত সম্মিলন হইল। পরিণাম তাহার নানা প্রকারেই শিক্ষপ্রদ হইয়াছে। এই (পাশ্চাত্যের প্রভাব যুক্ত) যুগে বাঙ্গলার প্রতিভা নানা দিকেই বিকশিত হইয়াছে, এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে অত্যধিক প্রসার লাভ করিয়া অত্যল্প সময়ের মধ্যেই যেন তাহা বিলীন হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে—অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়টা সেইরূপ একটী বিষম সঙ্কটের সময়। প্রতিভা নিষ্প্রভ, নিজ শক্তিতে সমুদয় জাতির উপর একথা সর্ব্বজন মান্য প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়া সকলকে পরিচালনা করিাত পারে এমন শক্তি কাহারও নাই, অথচ অতীত গৌরবে সকলেই আত্মপ্রতিষ্ঠায় অতিমাত্র ব্যস্ত ও নিজেকে পরম প্রতিভাবান মনে করেন। পরিণাম পরস্পর বিরোধ, সাধারণ বস্তুকে অতি

মূল্যবান বলিয়া মনে করা। ধর্ম্ম ও নীতির অবজ্ঞা এবং নানা ব্যভিচারের প্রশ্রয় লাভ ইহাতে অতি সহজেই হইয়া আসিতেছে।

আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ও প্রসার লাভ একালে বাঙ্গলার এক প্রধান কীর্ত্তি। ধরিতে গেলে উহা মধ্য যুগে (মুসলমান রাজত্বকালে) বাঙ্গলার আর এক নিভৃত সাধনার পরিণত ফল। তখন একদিকে যেমন সংস্কৃত ভাষা ও ন্যায় দর্শনাদিবিজ্ঞানের চর্চ্চা বাঙ্গলার পল্লীতে পর্য্যন্ত হইত, বৈষ্ণব ধর্ম্মের অপূর্ব্ব রস ও তান্ত্রিকের প্রখর জ্যোতি বাঙ্গালাতে প্রকাশ পাইয়াছিল, তেমনই গ্রামে গ্রামে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণ বিরাজ করিতেন। ইহাদের শেষ প্রতিনিধি গঙ্গাপ্রসাদ, দ্বারিকানাথ প্রভৃতি কবিরাজগণ কলিকাতার নব সৃষ্ট বাজারে আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়া এযুগের আয়ুর্ব্বেদের জন্য এক অসাধারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যে সাধনা ও চরিত্রবল পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদের পরাতত্ত্বের সন্ধান আনয়ন করিয়া দিত, অদ্যকার এই বিলাসবহুল ভোগ-বাসনার দিনে তাহা একান্তই দুর্লভ হইয়াছে। তাহার উপরে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মোহে লোক আজ অতিমাত্র অভিভূত। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা লোকের নিকট অনাদৃত। স্বয়ং আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীকেও ইহাতে আত্মপ্রত্যয় হারাইয়া পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হইয়া পরানুকরণে চলিতে হইয়াছে। নাড়ীবিজ্ঞান ও অস্ত্রবিজ্ঞানাদি এখন তিরোহিত প্রায়; তার স্থানে তাপমান, ছায়াচিত্রাদি যন্ত্রের বাহ্যিক প্রয়োগ স্থান লাভ করিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদের প্রসার ও প্রতিপত্তি বিস্তারের নিমিত্তই আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনের আয়োজন হয়, কিন্তু যাহাদিগকে লইয়া মিলনের প্রচেষ্টা হয় তাহাদের বিরোধ ও অনৈক্য দৃঢ় বদ্ধমূল একমাত্র কলিকাতা নগরীতে—একটীর স্থানে চারিটি আয়ুর্ব্বেদ 'কলেজ' বিদ্যমান। অন্যত্র ত কথাই নাই। ইহার অন্তরালে যে বিবিধ প্রকারের অনৈক্য দেখা যায় তাহা একালের প্রসূত সুলভ ফল। যে দুই একজন আয়ুর্ব্বেদের অন্তর্শক্তিতে বিশ্বাসী কবিরাজ এখনও বিদ্যমান, তাহাদের সহিত প্রায় কাহারও মিলন হয় না। অনেকেই পাশ্চাত্য ভেষজ ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালীর অনুবর্ত্তন করেন ও আয়ুর্ব্বেদে তাহার প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন। তাহার উপরে বর্ত্তমান কালের রাজনৈতিক প্রভাব অনেকের উপরেই আসিয়া পড়িয়াছে—যাহাতে স্বল্প মাত্র স্বার্থের অনুরোধে লোকে পরম কল্যাণকর বিষয়সমূহের বলিপ্রদান করিতেও কুণ্ঠিত নহে—আয়ুর্ব্বেদকে সরকারী 'ফেকালটি' পরীক্ষার শ্রেণীভুক্ত করা, কবিরাজদিগের ডাক্তারের ন্যায় সার্টিফিটাদি প্রদানের ক্ষমতা লাভ প্রভৃতি অতি প্রলোভনের বিষয় সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহাতে বাস্তবিক ফল কি হইবে, তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। মোটের উপর আয়ুর্ব্বেদকে আধুনিকতার প্রভাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে কি করিতে হইবে, তাহাই বিবেচ্য। বিষয়টী কত গুরুতর আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনের উপস্থিত শোচনীয় পরিণাম হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে। যে কারণে সম্মিলন ভাঙ্গিয়া গেল তাহার মধ্যে এই দুই প্রকারের মনোবৃত্তির খেলাই প্রধান।

পরীক্ষার্থীর প্রসার লাভ।—

এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষারই পরীক্ষার্থীসংখ্যা বাড়িয়াছে—ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী প্রায় সাড়ে তেইশ হাজার, ইণ্টার সাইন্স ও আর্ট প্রায় সোয়া আট হাজার, বি-এ বি-এসসি প্রায় চারি হাজার—মোট পঁয়ত্রিশ হাজারেরও অধিক ছাত্র পরীক্ষা দিতে

যাইতেছে। তার উপরে কন্যা শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা বৎসর বৎসর অত্যধিক বাড়িতেছে—এবার ম্যাট্রিকে এক হাজার, ইণ্টারে পাঁচ শত ও বি-এ, বি এস্ সিতে দুই শত ছাত্রী পরীক্ষার্থিনী। এত ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার জন্য এযাবত কাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে উপস্থিত হয় নাই। দেশের স্বাভাবিক অবস্থাতে বাঙ্গলার ন্যায় এইরূপ একটী জনবহুল প্রদেশের পক্ষে এই ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী নয়। দেশের অধিকাংশ লোকই এখনও নিরক্ষর; ইহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন হইলে, পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়িবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই।

সমস্যা শিক্ষার দিক দিয়া নহে—শিক্ষার যাহা পরিপোষক এবং শিক্ষার যাহা লক্ষ্য সেই অর্থের দৃষ্টিতেই এই সংখ্যা বৃদ্ধির বিচার করিতে হইবে। যত ছাত্র ছাত্রী এখন স্কুল কলেজে পড়িতেছে, তাহাদের অধিকাংশের এই শিক্ষার ব্যয় বাহুল্য কি ভাবে চলে, তাহা একটু খোজ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—অবশ্যই কলিকাতার মত বৃহৎ সহরে অনেক ধনাঢ্য লোকের ছেলে মেয়ে স্কুল কলেজে পড়ে; মফঃস্বলের বহু অবস্থাপন্ন লোকের পুত্রকন্যা সহরের স্কুল কলেজ ও বোর্ডিংএতে থাকিয়া বহু অর্থ ব্যয় করে; ছোট সহরের চাকুরীজিবী বা উকীল ডাক্তারদিগের ছেলেমেয়েরাও বিনা ক্লেশে স্কুল কলেজের বেতন দিয়া পড়ে। কিন্তু এদেশের অধিকাংশ লোকই ধনহীন, দরিদ্র; তাহাদের তুলনাতে ধনীর সংখ্যা অতি নগণ্য। ইহাদের দৈনন্দিন সংসারযাত্রা যে ভাবে নির্ব্বাহ হয়, তাহার উপরে একালের মাথা প্রতি ধার্য্য স্কুলের বেতন, পুস্তকমূল্য ও পরীক্ষার ফী প্রভৃতি শিক্ষার্থীর উপরে নানা প্রকার কর দিতে অধিকাংশ লোকই নিতান্ত অক্ষম। তবুও ভবিষ্যৎ আশায় বুক বাধিয়া এই সকল শিক্ষার্থিদিগের পিতা মাতা ক্ষমতার অতিরিক্ত গুরু ব্যয় ভার বহন করিতেছে—বর্ত্তমান দেশের এই অর্থ-কৃচ্ছ্রতার দিনে যে প্রচলিত বিদ্যালয় গুলিতে এবং পরীক্ষা মন্দিরে ছাত্র সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাকে শিক্ষার প্রসার বলিয়া উল্লাস করিবার হেতু কিছু নাই, বিস্ময়ের কারণ অবশ্যই আছে। দেশের দুর্দ্দশা না হইলে ছাত্র সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইত। সর্ব্বোপরি এই সকল পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ দশা কি হইবে তাহা বিশেষ রূপেই ভাবিবার বিষয়। যে সকল ছাত্র ছাত্রী এখন পরীক্ষার পাশ করিয়া বাহির হইতেছে তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিলেই উহা যে ক্রমে আরও অধিক শোচনীয় হইবে, তাহা ধরিয়া লওয়া যায়। বর্ত্তমান শিক্ষার ব্যবস্থাতে এমন কোনও বিধান নাই, যাহাতে শিক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই দুরবস্থার অপনোদন হইতে পারে। প্রতিকার রূপে উচ্চশিক্ষার প্রসার হ্রাস ও স্কুল কলেজের সংখ্যা হ্রাস করা প্রভৃতি কথা মধ্যে মাধ্যে শুনা যাইতেছে। কিন্তু শিক্ষার প্রসার হ্রাস করাই বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না—উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে লোকের কর্ম্মক্ষমতা ও স্বাধীন জীবিকার প্রসার বৃদ্ধি পায়, তাহাই দেখা আবশ্যক।

মেয়র নির্ব্বাচন।—

কলিকাতা করপরেসনের প্রধান নায়ক 'মেয়র' নামে অভিহিত হন। বৎসরে একবার তাহার নির্ব্বাচন হয়। বিলাতী নামে উহার নামকরণ। কিন্তু সম্পূর্ণ বিলাতের ভাবে উহার নির্ব্বাচন হয় একথা বলা যায় না—কারণ বিলাত ও ভারত এক নহে—বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে ভারতের সমুদয় বিষয়ে বিষম অপচার প্রবেশ করিয়াছে এবং এদেশীয় প্রকৃতিতে যে যে স্থলে বিলাতী ভাব প্রবেশ করিয়াছে, সেই ক্ষেত্রেই এই অপচার অত্যধিক। মেয়রের পদবীটিতে

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাগরিকেরই অধিকার। এইজন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনপূজিত নগরবাসীকেই ঐ পদে অভিষিক্ত করা আবশ্যক। কার্য্যকুশলতা এই পদের ততদূর আবশ্যক গুণ নহে—লোক চক্ষে সম্মান ও শ্রদ্ধা যতদূর। এজন্য চাই অসাধারণ চরিত্রবল, জ্ঞান ও সামাজিক আঢ্যতা যাহার বলে বেতনভুক্ কর্ম্মচারীগণের কর্ম্মকুশলতা সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিবে। কেবল নাগরিক ব্যাপারে নহে—শিক্ষা, বিচার ও শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিভাগও এইরূপ নায়কতায় পরিচালিত হইতে তাহার প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষা পায়। প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ জাতিদিগের মধ্যে এই নিয়ম বিদ্যমান ছিল—ভারতের ঋষি ও গ্রীকদিকের জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাহার নিদর্শন তাহারা নিঃস্বার্থ রাষ্ট্রপরিচালক ছিলেন। আধুনিক জগতের ধনাঢ্যতা সেই জ্ঞান ও চরিত্র-মাহাত্ম্যকে বিলুপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। একদিকে লোকের ভোগ-বহুল জীবন-প্রণালী, এবং তাহার নির্ব্বাহ নিমিত্ত অর্থ বাহুল্যের আবশ্যকতা, আর একদিকে রাষ্ট্রের বিবিধ ক্ষেত্রে উচ্চ বেতন ভোগী কর্ম্মচারী নিয়োগ এবং অর্থের পরিমাপে পদমর্য্যাদার পরিমাপাদির সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ লোকের স্বার্থজনিত বিরোধ ইত্যাদি সকল প্রকার অনর্থই আজ সর্ব্বত্র বিরাজমান। ব্যবস্থাপক সভা, নাগরিক সভা প্রভৃতি সর্ব্বস্থানে এই পক্ষাপক্ষ ও দলাদলি চলিতেছে, দলের স্বার্থ রক্ষা করিতে গিয়া কার্য্যের সাধারণ নীতিতে ব্যাঘাত পড়ে। ভারতের নব নিয়োজিত বিধান গুলিতে এই সকল মহাপাপ অতি বিকট আকার ধারণ করিয়াছে—কারণ অন্যত্র যাহা প্রকৃত এখানে তাহা বিকৃত। ভারতের প্রকৃতির যাহা অনুযায়ী, ভারতের অন্তরাত্মার যাহা আকাঙ্খা, আধুনিক শিক্ষা, দীক্ষা জীবনযাত্রা, রাষ্ট্র ও সমাজের এই সকল বিধান তাহার বিপরীত।

কলিকাতা করপরেশনের মেয়র নির্ব্বাচনে এই করপরেশনের মধ্যে বিরোধের খেলাই চলিয়া আসিতেছে, এবং নূতন বিরোধের সৃষ্টি হইতেছে। এক দলের নির্ব্বাচন অপর দলে নাকচ করিবার জন্য প্রথম হইতেই লাগিয়াছেন; তাহারা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিকারী হইয়াছেন। এবং সম্ভবতঃ সরকার এই পক্ষাপক্ষের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন। ফল যাহা হইবে তাহাতে বিরোধ ও বিবাদ বাড়িয়াই চলিবে। কালধর্ম্ম রক্ষা পাইবে। মেয়রের পদটী এমন, যাহা সর্ব্ববাদী সম্মত হওয়া উচিত; এবং তাহা না হইলে কেহ যদি ঐ পদ গ্রহণ না করেন, তবেই উহার মর্য্যাদা রক্ষা পায়।

আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ।—

আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর সাহচর্য্য ও ঐক্য স্থাপন করা যায় কিনা এ চেষ্টা কতক কাল ধরিয়া হইতেছে। একালের জড় বিজ্ঞানের ফলে বিভিন্ন দেশে যাতায়াতের সুবিধা সুযোগ হওয়াতে এবং রাষ্ট্র ও অর্থনীতির বশে বাণিজ্যাদি প্রসারের হেতুতে যে ঐ ঐক্য ও মিলন অনেকটা সম্ভবপর হইয়াছে একথা অস্বীকার করার যো নাই। তথাপি এই রাষ্ট্র ও অর্থনীতির বিকৃত ফলে ও তাহার প্রতিক্রিয়া রূপেই এক্ষণে ঐরূপ মিলনসঙ্ঘ আরও আবশ্যক বলিয়া অনুভূত হইয়াছে। প্রথমতঃ আন্তর্জাতিক ধর্ম্মসভা, দর্শনসভা প্রভৃতি বিবিধ জাতির কয়েকটী সম্মিলন-আমেরিকার ও ইউরোপের বর্দ্ধিষ্ণু কয়েকটা স্থানে হয়। ঐগুলি মানবজাতির বিদ্বৎ সভা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। আজিও পণ্ডিত দার্শনিক বা চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই বিষয়ে অধিক ভাবিয়া থাকেন। তৎপর বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের পর রাষ্ট্রজগতের দুর্গতি দেখিয়া এক আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসভা বা জাতিসঙ্ঘ স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু

তাহার নিষ্ফলতা দেখিয়া ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে প্রকৃত বিশ্ব মানব মিলন ক্ষীণ রাষ্ট্রিক নীতির দৃষ্টিতে হইতে পারে না—উহা কোনও উচ্চতর সাধনার নীতিসাপেক্ষ। যে সকল আন্তর্জাতিক সম্মিলন গুলি ধর্ম্ম, বিজ্ঞান বা দর্শন লইয়া—ইতিপূর্ব্বে হইয়া আসিতেছিল তাহারই প্রসার সাধন করিয়া যদি কোনও উচ্চতর মানব সাধনার (culture এর) ভিত্তিতে জাতিসঙ্ঘ সংস্থাপিত হইত, তবে তাহাতে প্রকৃত কাজ হইতে পারিত। দুঃখের বিষয় এরূপ সাধনার বীজ বর্ত্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতিতে নিহিত নাই, আর বর্ত্তমান সময়ের উন্নতিশীল জাতিসমূহ এই সকলের সমৃদ্ধিতেই উন্নত—ইহাদের প্রভাব ছাড়িয়া সাধনার অন্য কোনও অন্তর্দৃষ্টি গ্রহণ করিতে কেহ প্রস্তুত নহে। প্রকৃত ধর্ম্মের বা সত্যের নীতিতেই মানব মিলন সম্ভবপর; অন্যথা বিবাদ ও বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। জগতেও সে বিবাদ ও বিরোধের খেলা চিরকাল চলিয়াছে, এখনও চলিতেছে ও চলিবে। আজ লোকের জাতীয় কর্ম্ম ধারা ও জীবন প্রণালীর মধ্যে সেই অনৈক্যের ভাব এতই প্রবল যে কোন্ জাতির, কোন স্থানে, মানব সভ্যতার কোন্ স্তরে সেই মিলনবীজ বিদ্যমান তাহা খুঁজিয়া বাহির করাই কঠিন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূভাগের খণ্ড দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে উহা এখন এসিয়া খণ্ডের বিভিন্ন জাতির মধ্যে খুজিয়া পাওয়া যত সহজ, ইউরোপ বা পাশ্চাত্যভূমে তেমন নহে—ইউরোপে প্রাচীন গ্রীকের যে উচ্চ কৃষ্টি-নীতি মানবসভ্যতার এক উচ্চস্তর নির্দ্দেশ করে, তাহাকে উৎপাটিত করিয়াই তথায় খৃষ্টের ধর্ম্মনীতি স্থানলাভ করিয়াছিল, তাহাকে আবার অপসারিত করিয়া বর্ত্তমান ইউরোপের অর্থ, রাষ্ট্র ও সমাজনীতি প্রতিষ্ঠিত—পরিণাম তার বর্ত্তমান ইউরোপের মহা কুরুক্ষেত্র—চতুঃ শত বর্ষ ব্যাপী জাতিতে জাতিতে মহা সমর। প্রকৃত ঐক্য ও মিলনের মূল মন্ত্র এখনও এসিয়াটিক সাধনার করকবলস্থ—ইসলামের দীক্ষা, খৃষ্টানের বিশ্বাস, বৌদ্ধের অহিংসা ধর্ম্ম, জরথ্রুস্ত্রের পাপভয়, চীনের নীতিশিক্ষা, উপনিষদের অমোঘ বাণী, পুরাণ ও তন্ত্রের ব্যবহারিক ধর্ম্ম—এ সমুদয়ই সেই মৌলিক মন্ত্র হইতে নিঃসৃত—ভারতের বেদ তাহার আধার। সর্ব্বভূতের সমত্ব ও ঐক্য যাহার প্রধান শিক্ষা। আজ জগতে বাস্তবিক কোনও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে প্রতীচির সেই অধ্যাত্ম সাধনার ও পাশ্চাত্যের এই জড়বাদী সভ্যতার বিরোধ। এশিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে এখনও সেই সাধনার সন্ধান লওয়া যায়, যদিও বর্ত্তমান পাশ্চাত্যের প্রভাব তাহাতে প্রচণ্ড আঘাত দিয়া আসিতেছে। এই অধ্যাত্ম সাধনাকে পুন উদ্‌যাপিত করিয়া তুলিতে পারিলেই জগতের ঐক্য সম্ভবপর হইবে, এবং তাহা হইলে আজ যে বিজ্ঞানের বলে আন্তর্জাতিক সম্মেলন পৃথিবীতে সম্ভবপর হইয়াছে তাহাও সার্থক হইল বলিয়া মনে করিতে হইবে। এজন্য সর্ব্বপ্রথমে এসিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে একটী সাধনাগত (culture) সঙ্ঘ বা সম্মিলন করা আবশ্যক। এজন্য অতি সামান্য চেষ্টা মধ্যে মধ্যে হইয়াছে। প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ যখন পাশ্চাত্য ভূমিতে ভারতের বাণী শুনাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া আসেন, তখন জাপানী মনীষি ওকাকুরা ভারতে এইরূপ এক উদ্দেশ্য লইয়া আসেন—তৎপর স্বামী রামতীর্থের জাপান গমন কতকটা ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিল। কতক দিন হইল আর একজন জাপানী পণ্ডিত য়্যামাকামী সোগেন ও তাহার ধর্ম্মগুরু টোকিও বৌদ্ধমন্দিরের প্রধান অধ্যক্ষ এইখান হইতে ঐরূপ একটী বিবৃত পরিকল্পনা লইয়া যান—যাহাতে জাপানের পৃষ্ঠপোষকতায় একটী এসিয়াটিক সাধনার স্থায়ী কেন্দ্র কোথাও স্থাপিত হইতে পারে। সম্প্রতি জাপানে এসিয়ার যুবকবৃন্দের একটী আন্তর্জাতিক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে বলিয়া একখানি আমেরিকান পত্রিকাতে প্রকাশ। এই আন্দোলন বিশুদ্ধভাবে চলে ইহা বাঞ্ছনীয়।

———

ধর্ম্ম-রহস্য।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘটক

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।"

মানবজগৎ চিরকালই এত উচ্ছৃঙ্খল কেন,—এ প্রশ্নের উত্তরে নানা মুনির নানা মত; —কেহ বলবেন,—মানব-জগৎ সুখের জন্য উচ্ছৃঙ্খল, কেহ বলবেন-দুঃখের জন্য, কাহারও মতে ভোগের জন্য, কাহারও মতে তৃষ্ণার জন্য, কেহ বলবেন—অর্থের জন্য, কেহ বলবেন—স্বার্থের জন্য, কেহ বলবেন—কামনা চরিতার্থ করিবার জন্য, কাহারও মতে বৈষম্যের জন্য, কাহারও মতে অসহনীয় বৈষম্যের সাম্য বিধান জন্য,—এবং প্রকারে যিনি যাহাই বলুন না কেন, কোন উত্তরই আমাদের মতে সমীচীন বোধ হয় না। কেন না. মানবজগৎ সুখের জন্য উচ্ছৃঙ্খল হইলে সংসারে দুঃখের নিরাস হইত, দুঃখের জন্য হইলে সুখোৎপত্তি হইত, ভোগের জন্য হইলে তৃপ্তি আসিত, তৃষ্ণার জন্য উচ্ছৃঙ্খল হইলে নিবৃত্তির সূচনা হইত, অর্থের জন্য হইলে অনর্থ ঘুচিয়া যাইত, স্বার্থের জন্য হইলে সংসারের দ্বেষ. হিংসা, অসূয়াদি তিরোহিত হইত, কামনার চরিতার্থতার জন্য উচ্ছৃঙ্খল হইলে মানব জগতে ভগবন্মুখপঙ্কজবিনিঃসৃত মধুরাক্ষরা গীতার প্রয়োজন হইত না, বৈষম্যের জন্য হইলে সাম্যবাদের অমিয় প্রবাহে সংসার প্লাবিত হইত, সাম্যের জন্য হইলে মর্ত্ত্যলোক অমর্ত্ত্য-ভবনে পরিণত হইত। তাই. বলা হইয়াছে, মানব-জগৎ চিরকালই এত উচ্ছৃঙ্খল কেন?—ইহা কি প্রকৃতিরই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম না, উহার অপর কোনও নিগূঢ় কারণ আছে, তাহার সদুত্তর কোথায়?

মানববেতর সাধারণ জীবগণ মানুষের মত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আহার, বিহার, নিদ্রা, ভয়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদির বশীভূত হইলেও, উহারা উচ্ছৃঙ্খল নহে। "উচ্ছৃঙ্খল" শব্দের প্রকৃত অর্থ--জীবনের কোনও বিষয়ে শৃঙ্খলা বা ব্যবস্থা (নিয়ম) নাই যাহার, (উৎ—উৎক্রান্ত শৃঙ্খলা যার) ইত্যর্থে অব্যবস্থ—অস্থির—অশান্ত। শত—সহস্র—লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে ইতর জীব-জগৎ, যে শাশ্বত নিয়মের অধীন হইয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিল, আজিও তাহার কণা মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তবে যে সমস্ত জীবগণ অপরিহার্য্য প্রাক্তন বশে দুর্ব্বার মানব সমাজের সংস্রবে আসিয়া কালক্রমে বশ্যতার মোহমদে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে, (১) অমোঘ সংসর্গ দোষে তাহাদের মধ্যে জাতীয় নিয়মের কতক কতক ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ উহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। যে সমস্ত জীবজন্তুগণ. কোনক্রমেও মানুষের বশ্যতা স্বীকার করে নাই, স্বভাবে বিচরণ করিয়া আসিয়াছে, (২) তাহাদের নিয়ম পূর্ব্বেও যেমন ছিল আজিও ঠিক তেমনই আছে। কিন্তু মানুষের মত নিয়মভ্রান্ত জীব সংসারে আর দ্বিতীয় আছে কিনা জানি না। কেহ কেহ এতাদৃশ নিয়মবদ্ধতার উচ্ছেদনকেই মানব সমাজের

---

(১) গো, অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, মেষ, ছাগ, কুক্কুর, মহিষ, ইত্যাদি।

(২) সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্পাদি।

উন্নতির কারণ নির্দ্দেশ করেন ; পরন্তু জাতীয় নিয়ম উচ্ছিন্ন হইলে জাত্যন্তর পরিণামের আর বাকি রহিল কি, আমরা বুঝিতে পারি না। ফলতঃ জাতীয়তার ভিত্তি স্থির রাখিয়া বিশেষ বুদ্ধিপূর্ব্বক জাতীয় নিয়মের সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন ("উচ্ছেদন" নয়) ঘটন হইলে জাত্যুন্নতি সম্ভবপর, নিয়মের উচ্ছেদনকে আমরা ব্যভিচারের অঙ্গীভূত মনে করি, ব্যভিচারী মানবসমাজের স্থায়িত্ব কোথায় ?

মানুষের ন্যায় মানবেতর জীবগণের উচ্ছৃঙ্খল না হওয়ার বিশেষ কারণ এই,—প্রকৃতির করুণায় উহাদের চিত্তবৃত্তিগুলি প্রায়শই সীমাবদ্ধ, যে বৃত্তির স্ফুরণে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায়, উহাদের সেই দুর্নিবার কামবৃত্তি নিয়মিত ; সময় ধর্ম্মে ক্রোধের আবির্ভূতি আছে, স্থায়িত্ব নাই, লোভ আছে, মত্ততা নাই, মোহ আছে, অজ্ঞতা নাই, প্রায়শই আহারে লিপ্সা আছে, অল্পেই তৃপ্তি, যখন তখন নিদ্রার আবেশ আছে, আচ্ছন্নতা নাই, ক্ষুধা অনিবার্য্য হইলেও আতুরতা নাই, স্নেহ মায়া মমতাদি জীবোচিত বৃত্তি সমস্তই আছে, কিন্তু কিছুতেই উহারা মানুষের ন্যায় আকৃষ্ট নহে। একমাত্র আহার সংগ্রহই উহাদের জীবগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য, মাতৃ ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়া একটুকু দৃঢ় হইতে পারিলেই উহারা আত্মনির্ভর হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার পথে অগ্রসর হয়, তদ্বিষয়ে কেহ অনুমাত্রও অপরের মুখাপেক্ষী নহে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী আহার জুটাইতে পারিলেই কৃতকৃত্য হইল,—উহাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল, আর চাই কি ? যাহার জীবনের উদ্দেশ্য বা পথ স্থির আছে, তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা কোথা হইতে আসিবে ?

সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতের সময় হইতেই আলোচ্য উচ্ছৃঙ্খলতার স্ফূর্ত্তি, দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকের আশু মুগ্ধ উপদেশ হইতে উহার পুষ্টি,—ক্ষণিকবাদ নীতির মোহিনী শক্তি হইতে উন্নতি,—কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে উহার সাময়িক নিবৃত্তি। অতঃপর বিখ্যাত রাজপুতজাতির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উহার পুনরাবৃত্তি, মহাপ্রভাব প্রতাপসিংহের পতনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি। কুরুক্ষেত্রের ভগবদনুষ্ঠিত সুমহান্ যুদ্ধ যজ্ঞ, বিষ্ণ্বতার ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রকল্পিত সুগভীর জ্ঞানযজ্ঞ, শৈবাবতার মহাপ্রাণ শঙ্করানুষ্ঠিত মহান্ সন্ন্যাসযজ্ঞ এবং প্রেমাবতার চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সুমধুর বৈরাগ্য যজ্ঞেও যাহার পূর্ণাহুতি অবশিষ্ট রহিয়াছে, জানিনা ভগবানের চরমাবতার—কল্কিদেবের অনুষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ করবাল যজ্ঞে তাহার উপসংহার হইবে কি না ? ইদানীং নায়কহীনতায় ঐ উচ্ছৃঙ্খলতা পরাকাষ্ঠা পাইয়াছে ; পরিণাম ভগবান্ জানেন।

প্রাগুক্ত উচ্ছৃঙ্খলতার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মভাবে ভীত হইয়া যেন ভগবান্ ধর্ম্মদেব একদা বকরূপ ধারণ পূর্ব্বক তৃষ্ণাপীড়িত ধর্ম্মাশ্রয় যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে উপনীত হইয়া কৌশলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কঃ পন্থা ?—" "কথায়িত্বা জলং পিব।" একে পিপাসায় আকুল, তাহাতে অকস্মাৎ একটা ক্ষুদ্র বকের মুখ হইতে তাদৃশ গূঢ় তত্ত্বাংশ বা প্রশ্নের কথা বহির্গত হওয়ায় কুশাগ্র বুদ্ধি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যেন একটুক সন্দিগ্ধ হইয়া ধীরতার সহিত উত্তর করিলেন,—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনি র্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥"

যেমন প্রশ্ন তেমন উত্তর! বক প্রশ্নের সদুত্তরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রকারান্তরে কেবল তাৎকালিক উচ্ছৃঙ্খলতারই চূড়ান্ত বর্ণনা দিয়াছেন,—মত বৈষম্যে সনাতন বেদ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, স্মৃতি অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের নিয়মাচার পদ্ধতির তদবস্থা। এমন মুনি নাই যাঁহার মতের সহিত অপরের মতের কোনরূপ সামঞ্জস্য আছে, সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব গুহায় (নিবিড় অন্ধকারে) নিহিত; ধর্ম্মের স্বরূপ না জানিয়া তাঁহার তত্ত্ব অবধারণ করে কার সাধ্য? অতএব সাধু সজ্জনের গতির দিক লক্ষ্য রাখিয়া পথ নির্ণয়করিতে লইবে অর্থাৎ সাধু সজ্জন যে পথে পরিচালিত হন, মানুষের পক্ষে তাহাই প্রকৃত পন্থা; তদ্ভিন্ন পথ নির্ণয়ের আর কোন উপায় নাই।"

বর্ত্তমান সময়ের পাঁচহাজার বৎসরের পূর্ব্বে সত্যবাদী মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের মুখে মানব জগতের যাদৃক্ উচ্ছৃঙ্খলতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের ইদানীন্তন দশা কি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যার যার অন্তরাত্মাই তাহার চূড়ান্ত সাক্ষী। এতাদৃশ শোচনীয় মূলকারণই মানব জীবনের উদ্দেশ্য-ভ্রষ্টতা—পথ-ভ্রান্তি। সংসারে পথহারা হইয়া স্থির থাকিতে পারে কে? জন্মধারণমাত্রই পার্থিব আপাতমধুর বিষয় রসে প্লুত হইয়া মানুষ আপনার গন্তব্য পথ হারাইয়া বসে, কেমন করিয়া স্থির থাকিবে? দুর্গম কান্তারে পথভ্রান্ত হইলে পথিক যেরূপ দুরাবস্থা প্রাপ্ত ও সঙ্কটাপন্ন হয়, আমরা পথবিপাক বশতঃ ইদানীং তাদৃশ বা ততোহধিক দুর্গতও বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি! উপায় কি?

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সময় "মহাজন" চিনিবার অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় ছিল বলিয়াই পথজিজ্ঞাসু বারিচরকে সহজেই তিনি পথের রহস্য বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন—"মহাজনো যেন গত স পন্থা।" সুতরাংমহাজনের অনুসরণ করিতে পারিলেই তৎকালে পথের ভ্রান্তি ঘুচিয়া গিয়াছে। ইদানীং 'মহাজন" শব্দের প্রচলিত অর্থ—"বেবসাই" গদিয়ান অথবা সুদখোর ধনী! "সাধু" শব্দের অর্থ—মালা-তিলকাদি-চিত্র-বিচিত্র-লম্বোদর পণ্য-জীব! "সন্ন্যাসীর" অর্থ—রুদ্রাক্ষ-ভস্ম-জটা বল্কল কম্বল চর্ম্মাম্বর কমণ্ডলু মণ্ডিত ধূমপানাসক্ত—আরক্তনেত্র উগ্রমূর্ত্তি ভিক্ষাজীব! "বৈরাগী" শব্দের অর্থ—নামাবলী ভেক তিলকাদি সজ্জিত রূপান্তর গৃহী, অবজ্ঞেয় ভিক্ষুক! সুতরাং এদিনে ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের উল্লিখিত সদর্থ প্রশ্নোত্তরের মর্ম্ম সহজে বোধগম্য হওয়ার নয়; বর্ত্তমান পদার্থ বা তামসিক বিজ্ঞানালোকের অপার গর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ বকের প্রশ্নোত্তর হয়ত দ্বাদশবর্ষীয় অজাত শ্মশ্রু বালকের তর্ক-সিদ্ধান্তেই নিতান্ত অসার "ফাকি" বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে অনেক সময়ের আবশ্যক হয় না!! দিনের গতিক এই! মহাজন চেনা দুষ্কর! উপায় কি? জীবনে এমন সম্বল পাইয়া আসি নাই যে, মহাজন ভাগ্যে মিলাইবে! কাহার পথের অনুসরণ করিব? কে পথ দেখাইবে? 'কঃ পন্থ'"?

আজন্ম জীবনের পথহারা হইয়াই মানব জগৎ অনাদি—অনন্তকাল যাবৎ উচ্ছৃঙ্খল। জন্মধারণ করিয়া যাঁহারা ভ্রমেও পা ভ্রান্ত হ'ন নাই, তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল মানব সমাজের ভয়ে প্রকাশ্যে পদে পদে "জড় ভরত" বলিয়া সংসার হইতে আপনার ভাবে আপনি সরিয়া গিয়াছেন! যাঁহারা পথাবলম্বী হইয়াও, উচ্ছৃঙ্খল সমাজের দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহারা মানব জগতের পথ-প্রদর্শন জন্য প্রাণান্ত যত্নে রাশি রাশি অভ্রান্ত অনুশাসন রাখিয়া গিয়াছেন; বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ও দর্শনাদি বিশ্বগ্রন্থ তাঁহারাই উজ্জ্বল নিদর্শন। ইদানীং অখণ্ড প্রভাব প্রতিভাশালী পাশ্চাত্যবাসীর যত্নে নব্যভারতে—কেবল ভারতে কেন?—সমগ্র পৃথিবী

ভরিয়া বেদাদি শাস্ত্র চর্চ্চার ত্রুটি নাই, নানা শাস্ত্রীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মণ্ডলীর আবির্ভাবে নবমাধুর্য্যে অভূতপূর্ব্ব অঙ্গরাগ সম্পন্ন হইয়া ভারতভূমি অধুনা মনোহর শারদীয় গগনের অনুকরণ করিতেছে! জাতীয় বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি এবং বিজাতীয় বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি মহামহাগ্রন্থনিচয়ের সংস্কার ও মুদ্রণ বাহুল্যে, অধ্যয়ন অধ্যাপনা আলোচনা গবেষণা অনুশাসন অনুষ্ঠানও বাক্‌পটুতার কলকোলাহলে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইতেছে, মানুষ, ইচ্ছামাত্র কামচর সদৃশ, জলে—স্থলে—গহন-কান্তারে—নিভৃত শৈল-কুহরে—সুদূর গগনে সুখ বিহার করিয়া দুঃসাধ্য দিদৃক্ষা বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিতেছে, মানুষ, ইচ্ছামাত্র চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়াদি বিবিধ উপাদেয় ভোগ্য সামগ্রীর আকণ্ঠ ভজনায় মানবরসনা অশেষ প্রকারে চরিতার্থ হইতেছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মহিমায়, বিষয় জগতের যে দিক্ দৃষ্টিপাত করা যায়, তদ্দণ্ডে তন্মুহূর্ত্তেই যেন সেই দিক হইতে রাশি রাশি কাম্যবস্তু, মনপূত কামরূপ ধারণপূর্ব্বক সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া মানবীয় গগণ ভেদী ভোগ-বিলাস তৃষ্ণার জ্বলন্ত পাবকে অভিলষিত আহুতি প্রদান করিতেছে! কিন্তু এত জানিয়া—এত শুনিয়া এত দেখিয়া—এত করিয়া—এত খাইয়া—লইয়া—পরিয়াও উচ্ছৃঙ্খলতারই কণামাত্র প্রশমিত হইল কি?—কিছুতেই হওয়ার নয়, পথভ্রান্তের শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই বিপথের (বিলাসের) অনুকূল, শত ভোগ, শত বিলাস, শত সুখ-সেবা—কিছুতেই ঈদৃশ উন্মার্গাবস্থিত নিদারুণ চিত্তবৃত্তির (উচ্ছৃঙ্খলতার) নিবৃত্তি হইতে পারে না।—"হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।" "কঃ পন্থা?"

উল্লিখিত পথ-প্রসঙ্গে পথাবলম্বী আর্য্য মনস্বীগণ নানাশাস্ত্রে নানাভাবে যে সমস্ত সদর্থ কথার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন, অনন্তকাল যাবৎ বিপথে পাদচারণার অপরিহার্য্য ব্যসন বশতঃ আমাদের ভ্রান্ত বুদ্ধি দ্বারা তাহার প্রকৃত অর্থ বোধগম্য করা একান্তই অসম্ভাবিত হইয়া পড়িয়াছে। রাশি রাশি শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক,—পুঞ্জীকৃত বৃত্তি টীকা ভাষ্য বার্ত্তিককারিকায় আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া, জনসমাজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ, "মহামহোপাধ্যায়" পদবীমণ্ডিত, অতিবড় প্রবীণ পণ্ডিত হইলেও, কি হইবে? তিনিও পথভ্রষ্ট; শাস্ত্রের সারার্থ তাহা হইতে বহু দূরে অবস্থান করে; তদর্থে নিরক্ষর মূর্খ তদপেক্ষা মূলতঃ অধিকতর অপরাধী নহে। পথভ্রান্তের পথ চেনা সহজ সাধনার কর্ম্ম নয়; পথের ভুল না হয়, এইজন্য মহামনস্বী ঋষিগণ, আজন্ম অরণ্যে বসতি করিয়াছেন। অদ্য সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ গত হইল, মায়া মোহাচ্ছন্ন সংসারাশ্রম পরিহার পূর্ব্বক বনাশ্রয় করিয়া জ্ঞানধন বুদ্ধদেব পথভ্রষ্ট জীবগণকে পথের মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য অশেষ যত্ন করিয়া গিয়াছেন; মানুষ তাহার কিছুই বুঝিল না! কেবল বুদ্ধ ধর্ম্মের কথঞ্চিৎ স্মৃতি রক্ষার জন্য টিয়া পাখীর কৃষ্ণকথার মত, সাধারণে মুখে মুখে সুমহান্ সাম্যবাদের বুলী ধরিল—"অহিংসা পরমধর্ম্ম," আর শাস্ত্রার্থ বোধের জন্য অসাধারণ পণ্ডিতমণ্ডলী ধরিলেন—ভাষ্য টীকা টিপ্পনি (১) এবং সমন্বয়দর্শী নব্যশিক্ষাভিমানী প্রতিভার অবতার বাবু মহোদয়েরা সময়-ধর্ম্মে উদ্বেলিত হইয়া, স্কুলের বালক বৃন্দকে ব্যবহারে শিখাইলেন—"রাখীবন্ধন" "অরন্ধন", অধিকন্তু বঙ্গাক্ষরে অতি সরল সূত্র রচনা করিয়া বিশেষ শিক্ষা দিলেন—'ভাই ভাই

(১) ভগবান্ বুদ্ধদেবের অন্তর্দ্ধানের ৫০০ শত বৎসর পর হইতে বর্ত্তমান সময়ের ২০০ শত বর্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে আমরা নানা শাস্ত্রীয় বিশেষতঃ ব্যাকরণ শাস্ত্রের নানাবিধ টীকাটিপ্পনি বৃত্তিভাষ্য বার্ত্তিক কারিকাদির যুগ বলিয়া অনুমান করি।

ঠাঁই ঠাঁই! (১) এদিকে শাস্ত্রাভিমানী বাক্‌পটু বুধমণ্ডলী রাশি রাশি শাস্ত্রীয় বাণী কণ্ঠস্থ করিয়া যেখানে সেখানে ধর্ম্মের রহস্য ব্যাখ্যাচ্ছলে শ্রোতৃবর্গকে "বাগ্বৈখরী শব্দঝরী"—কথার ছটায়, (২) বহু বহু প্রমাণ, প্রয়োগ প্রদর্শনপূর্ব্বক মুগ্ধ করিতে লাগিলেন—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা ॥"—ইত্যাকার ভূরি ভূরি প্রমাণ হইল, প্রয়োগ হইল, বক্তৃতার আসরে করতালীও যথেষ্ট পড়িল, শ্রোতৃবর্গ ধর্ম্মের রহস্যও খুবই বুঝিলেন; কিন্তু পথের হইল কি? "অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা।" শাস্ত্রের সারার্থ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করা নিষ্ফল;—

"শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।
অতঃ প্রযত্নাজ্ জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞাত্তত্ত্বমাত্মনঃ ॥" (৩)

মহানুভাব যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর-বাক্যের মর্ম্মার্থে অভিনিবেশপূর্ব্বক নিতান্ত ব্যাপর হইয়া যেন উত্তর গীতার প্রজ্ঞাশীল কবি সাধারণের অপেক্ষাকৃত সহজ বোধের জন্য প্রকারান্তরে উহারই স্পষ্টার্থ বিবৃতি করিয়া গিয়াছেন—

অনন্তশাস্ত্রং বহুবেদিতব্যম্
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যম্
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্ ॥—

"শাস্ত্র অনন্ত, সুতরাং জানিবার বিষয়ও অনন্ত; মানুষের আয়ুষ্কাল অত্যল্প, তাহাতে বিঘ্নেরও অভাব নাই; অতএব হংস যেমন জল-মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে অসার জলীয়াংশ বর্জ্জনপূর্ব্বক সারবান্ ক্ষীরভাগ গ্রহণ করে, (৪) তদ্রূপ নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থনপূর্ব্বক তাহার বহুলাংশ (বাহুল্য অর্থাৎ অসারভাগ) পরিত্যাগ করিয়া, সারভাগ গ্রহণ করাই মানুষের পক্ষে প্রকৃত শ্রেয়ঃ পন্থা।"—এস্থলে কথা হইতেছে,—শাস্ত্রের আবার "অসারাংশ" কি? যাহা সারবান্, তাহাই শাস্ত্র, —মানব-জগতের নিত্য উপাস্য বস্তু, তাহাতে আবার অসারতা কোথা হইতে আসিবে? কাল ধর্ম্মে সম্প্রদায় বিশেষের স্বমত-পোষক যুক্তি-তর্কে উদ্ধৃত কবিতাটিও নিতান্ত অসার প্রতিপন্ন হইতে পারে, তাহাতে সত্যের গৌরব নষ্ট হইতে পারে না। আমরা আজন্ম মিথ্যাবাদী,—আমাদের কথা-যুক্তি-

(১) বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বের সূত্র ছিল—"ভাই ভাই এক ঠাঁই।" ব্যবচ্ছেদের পরবর্ত্তী সূত্র—ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই।"

(২) বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্র ব্যাখ্যা ন কৌশলম্। বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন চ মুক্তয়ে ॥"
পণ্ডিতগণের শাব্দিক নির্ঝরস্বরূপ কণ্ঠভেদী বাকচাতুর্য্যময় পাণ্ডিত্য দ্বারা শুধু শাস্ত্র ব্যাখ্যার নৈপুণ্যই বিশেষরূপ প্রকটিত হইয়া থাকে; তদ্দ্বারা ভুক্তির প্রশ্রয় ভিন্ন মুক্তির কারণ কিছু মাত্রই সাধিত হয়না।

(৩) শব্দ জাল, ভীতিবিস্ময়স্তিমিত মহারণ্য স্বরূপ; উহাতে প্রবেশ করিলে পদে পদে চিত্তের ভ্রমণ বৃত্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অতএব সংসারে মুক্তিকামী ব্যক্তিগণের যত্ন সহকারে তত্ত্ববিৎ সন্নিধানে একমাত্র আত্ম তত্ত্বই জ্ঞাতব্য।

(৪) হংস জল মিশ্র দুগ্ধের জলীয়াংশ ত্যাগ করিয়া শুধু দুগ্ধই গ্রহণ করে কিনা আমরা জানি না, কবির কথা উপেক্ষা করিতে পারিনা। যাহার ইচ্ছা হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখুন।

তর্ক—সমস্তই মিথ্যার পোষক ; সুতরাং তদ্দ্বারা কোনও বিষয়ের কোনরূপ সত্য-নির্দ্ধারণ হইতে পারে না। পরন্তু শাস্ত্র-বাক্য দ্বারাই শাস্ত্রের অসারতা প্রতিপাদিত হইয়াছে ; যথা,—

"মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জবদয়া তোষসত্যং পীযূষবদ্ভজ॥"—

মহর্ষি অষ্টাবক্র বলিতেছেন,—"বৎস, যদি মুক্তি (১) অভিলাষ কর, তবে বিষবৎ বিষয়-বাহুল্য পরিত্যাগ করিয়া, পীযূষের ন্যায় ক্ষমা, দয়া, সরলতা, সন্তোষ ও সত্য ভজনা কর।"—এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে,—বিষয়-জগতের যত কিছু সম্পদ, সমস্তই অসার, কেবল ক্ষমা, দয়া, সরলতা, সন্তোষ ও সত্যই সারভূত পদার্থ ; সুতরাং অনন্ত বেদাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, অশেষ আচার-নিষ্ঠ ও শম দমাদি কঠোর সাধন-সম্পন্ন হওয়ার জন্য জন্ম-জন্মান্তর-ব্যাপী কঠোর ক্লেশ না করিয়া, মানুষকে কেবল ক্ষমা, দয়া, সরলতা, সন্তোষ ও সত্যের অনুসরণ করিতে পারিলেই, সমস্ত অসারতা (বিষয়-বাহুল্য) পরিত্যাগপূর্ব্বক 'যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যম্"—এই সদর্থ বাক্যের সার্থকতা রক্ষিত হইল। কথাগুলি আরও পরিস্ফুটরূপে আলোচিত হইতেছে ;—

জগতে প্রত্যেক বিষয়ের,—প্রত্যেক শাস্ত্রের—প্রত্যেক সূত্রের—প্রত্যেক বাক্যের—প্রতি কথারই এক একটা সারার্থ আছে ; বৈষয়িক সারার্থগুলির প্রতি একে একে প্রণিধান কর,—হিন্দু গৃহস্থের "দুর্গোৎসব" একটি বৃহদ্ বিষয় ; শাস্ত্রানুশীলন-মতে উহা ত্রিবিধ,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিকভাব শ্রেষ্ঠ, রাজসিক ভাব মধ্যম, তামসিক অধম। পশু বলি প্রভৃতি বাহ্যাড়ম্বরে "তামসিক" উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে ; এতাদৃশ উৎসব কেবল চিত্তের সহজ তামসী (নিকৃষ্ট) বৃত্তি চরিতার্থ হয়, দৈহিক চক্ষু, কর্ণ রসনাদি ইন্দ্রিয় সুখের সঙ্গেই উহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তামসিক ভাবের কণামাত্রও সাধকের চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে না। উহা সরিৎ-স্রোতে তৃণরাশিবৎ হৃদয়-মর্ম্মের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়। ফল,—মন্দের ভাল অর্থাৎ কিছুই না করা অপেক্ষা এই শ্রেণীর সাধারণ আমোদ-আহ্লাদও গৃহস্থের কর্ত্তব্য, কালে ইহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর উপাসনায় চিত্ত প্রণোদিত হইতে পারে।—

"রাজসিক" উৎসবে পশু বলির ব্যবস্থা নাই ; কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তার চিত্তচাঞ্চল্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। উহাতে মাকে কি ভাবে কত প্রকারে স্নান করাইলে'—সাজাইলে,—পুজোপহার দিলে,—কত প্রকারে পূজার মুদ্রাসনাদি প্রণালী প্রদর্শন করিলে,—কি ভাবে কত প্রকারে স্তবস্তুতি ও প্রার্থনা মন্ত্রাদি পাঠ করিলে,—কিভাবে আরতি ও পূজোচিত অঙ্গরাগাদি (২) সম্পাদন করিলে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে, তদ্বিষয়ে সাধকের চিত্ত অস্থিরতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। ফল,—অপেক্ষাকৃত ভাল, মায়ের প্রসন্নতার জন্য উপাসকের এতাদৃশ চিত্তচাঞ্চল্য, স্থৈর্য্যেরই পূর্ব্ব লক্ষণ।

(১) "মুক্তি র্হিত্বা ন্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" সংসারে সর্ব্বপ্রকারের আত্মনির্ভর হওয়ার নাম মুক্তি; যোগশাস্ত্রে ইহার অপরাভিধান "স্বরূপাবস্থান"—"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।"

(২) সম্প্রদায়িক উপাসনার জ্ঞাপক চিহ্নাদি অর্থাৎ তসরের ধুতী, নামাবলী, রুদ্রাক্ষ, ভস্ম, বিলেপন, সিন্দুর, পুণ্ড্র, মালা, তিলক গোপীচন্দন ইত্যাদি।

"সাত্ত্বিক" উৎসব—নীরব,—নিষ্পন্দ—নিশ্চল—"নিবাতনিষ্কম্পইব প্রদীপঃ" উহাতে বহিরাড়ম্বরের অণুমাত্র বিকাশ নাই, মায়ের প্রসন্নতার জন্য চিত্তের কণা মাত্র চাঞ্চল্য (রাজসিকতার আকর্ষণ) নাই, তদর্থে "বৃহন্নন্দীকেশ্বরপুরাণ পদ্ধতি" অনাদৃত, বিবিধ-রচনাবিন্যস্ত উপচারাদি উপেক্ষিত, উহাতে দর্শন স্পর্শন, শ্রবণ ও প্রসাদোপকল্পিত রসনাদি ব্যাপারের কিছুই নাই। সাধক নিভৃত নির্জ্জনে একাকী ধ্যান-মগ্ন, শুদ্ধ চিত্তের একাগ্রতার সঙ্গেই সাত্ত্বিক-উৎসবের ঘনিষ্ট সম্পর্ক; সুতরাং চিত্তের তদ্‌গতভাব মূলক ঐকান্তিক লঘুত্ব বশতঃ আত্মার উর্দ্ধগতিই সাত্ত্বিক উৎসবের মুখ্যার্থ।—

তামসিক উৎসবে তমোধর্ম্মে জীবাত্মা ক্রমশঃ ভারাক্রান্ত হইয়া, যেভাবে সেভাবে পার্থিব দেহে অধিষ্ঠান করে; রাজসিক ক্রিয়ার ফলে ক্বচিৎ পার্থিব পুণ্য শরীরে কদাচিৎ অপার্থিব দিব্য দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া, জীবাত্মার রজোধর্ম্ম (১) পর্য্যবসিত হয়। সাত্ত্বিক ক্রিয়ার ফলে, জীবাত্মা, দেবযান পথে (২) সূর্য্যালোকে প্রবেশ করে; মর্ত্ত্যলোকে তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় না।

উল্লিখিত ত্রিবিধ সাধনার উপরেও উপাসনার অ র একটি উচ্চগ্রাম আছে,—'আত্ম ভজন' বা 'আত্মোৎসব', (৩) ইহাতে চিত্তের তন্ময়তা আপনার (আত্মার) বিশ্বব্যাপী মহাভাবে (৪) পর্য্যবসিত হইয়া উপাসনার (কর্ম্মের) উপসংহার সমাহিত অর্থাৎ জীবাত্মার নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়। ফলিতার্থ,—দুর্গোৎসবের তামসিক অপেক্ষা রাজসিক ভাব শ্রেষ্ঠ, রাজসিক হইতে সাত্ত্বিক ভাব শ্রেষ্ঠতর, সাত্ত্বিকভাব অপেক্ষা আত্মভজন শ্রেষ্ঠতম। অতএব দুর্গোৎসবাদি বৃহৎ মুদ্রে—যাবদীয় পূজোপাসনারই 'সারাথ'—একমাত্র 'আত্ম ভজন;—"যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যম্।"

ধর্ম্মজীবনে ভারতের বৈশিষ্ট্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ

ধর্ম্ম-জীবনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-সমাজ দুই বিভিন্ন পথের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে—"আমাদের জীবন অন্তর্মুখী, ইউরোপের জীবন বহির্মুখী। অন্তর্জগৎ আমাদের জীবনের সর্ব্বস্ব, স্থূলজগৎ (ইহাতে ভোগ, বিলাস, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিই সখাসর্ব্বস্ব) ইউরোপের ইহকাল ও পরকাল।

---

(১) রজোধর্ম্ম—রাগ স্বভাব, সংসার-বাসনার প্রধান বৃত্তি।

(২) জীবাত্মার ইহলোক হইতে প্রস্থানের দুইটি পথ,—"দেবযান" ও "পিতৃযান" দেবযান সূর্য্যলোকের, পিতৃযান চন্দ্রলোকের (যমরাজের) নির্দ্দিষ্ট প্রশস্ত পন্থা,—এক আলোকময়, অপর অন্ধকারাচ্ছন্ন। দেবযান—জন্ম মরণনাদি দুঃখ নাশের এবং পিতৃযান—পুনর্জ্জন্মাদি দুঃখ-ভোগের কারণ।

(৩) দেহাত্মবাদিগণ, নিজের দেহপিণ্ড-ভজনকেই "আত্মভজন" বলে; কিন্তু আলোচ্য আত্ম-ভজনার অর্থ রক্ত-মাংসাদি স্ফীত পিণ্ডদেহের ভজনা নয়, আত্মভজনার মূল মন্ত্র—"চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং।"

(৪) মহাভাব—"সোঽহং।"

আমরা ভাবকে আশ্রয় করি, ইউরোপ কর্ম্মকে আশ্রয় করে।* (ভাবই প্রধান, কর্ম্ম তাহার তুলনায় ক্ষুদ্র" ('ধর্ম্ম ও জাতীয়তা'—অরবিন্দ)।

বলিতে কি, ইউরোপে ভোগেরই প্রায় পূর্ণ রাজত্ব—ইহকালের সুখভোগই তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ; ধর্ম্ম গৌণ বস্তু। কিন্তু ভারত ইহার বিপরীত পথ অনুসরণ করিয়া চলে। আমাদের দেশে ধর্ম্মই প্রধান—আধ্যাত্মিকতাই আমাদের জীবনাদর্শ। ভারত ত্যাগের দেশ—ভোগের দেশ নহে। যিনি ত্যাগী, ভারতবাসী তাঁহাকেই পূজা করে—শ্রদ্ধা করেন দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সর্ব্বস্ব ত্যাগী বলিয়াই রাজপুত্র সিদ্ধার্থ 'বুদ্ধদেব' (বর্ণাশ্রমধর্ম্মী হিন্দু তাঁহাকে ১০ অবতারের অন্যতম অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন)। তিনি ধর্ম্মের জন্য রাজ্য-সুখকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছজ্ঞান করিয়াছিলেন (পূর্ব্বেই তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।) আর সেই ত্যাগধর্ম্মের মাহাত্ম্যেই গৃহ-ত্যাগীনদীয়ার 'গৌরাচাঁদ' আজ দেবতার আসনে আসীন। আর সেই ত্যাগেরই মহিমায় চিত্তরঞ্জন আজ 'দেশবন্ধু'। (মহাত্মাজীর কথাও তাহাই) এরূপেই যে ভারতের ললনাগণের সতী-মহীমা জগতে অপূর্ব্ব—যে ভারতসতীগণের বিশ্ব-বন্দিত গৌরব আজও জগতে দেদীপ্যমান, আমাদের সেই সতীগণও ভোগকে ত্যাগের পদানত করিতে শিখিয়াছেন—অন্যজাতির মধ্যে যাহা দুর্ল্লভ।

তাই বলি, ভারতের বিশেষত্বই হইল ত্যাগ;—ত্যাগই ধর্ম্ম—ত্যাগই পরমার্থ—ত্যাগেই মোক্ষ —ত্যাগেই প্রকৃতসুখ-শান্তি—ত্যাগেই বিমলানন্দ। ভোগে সুখ নাই—শান্তি নাই—আনন্দ নাই। ভোগে কামনার তৃপ্তি না হইয়া বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় কামনার আগুণ দ্বিগুণ জলিয়া উঠে। তাই আমাদের ভগবতী শ্রুতি উপদেশ দিয়াছেনঃ—"ত্যাগেনৈকে নামৃতত্বমানশুঃ।"

সেই জন্যই আমাদের মহিমাময় পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের সাধনা-লব্ধ সিদ্ধান্তের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন,—"এই ত্যাগ, সত্য, দয়া ভক্তি, প্রেম প্রভৃতিই জগতে জয়ী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।" প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ ধরিয়া ভারতীয় সাধনা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল বলিয়াই জগতে ইহার গতি অনন্যসাধারণ। বস্তুতঃ এদেশের লোকের মনে ধর্ম্মবুদ্ধি এরূপ দৃঢ় হইয়া আছে যে, তাহারা ধর্ম্মের জন্য সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে, অন্য কিছুর জন্য তাহা পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত দিকে দিকে দেদীপ্যমান।*

---

* কর্ম্ম ত সকলেই করে; প্রভেদ কিন্তু সেই ভাব সাধনে। প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভারত কর্ম্ম করিলেও নিষ্কাম ভাবেই (নিষ্কাম-ধর্ম্মই এদেশের সাধনা।) করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে বটে; কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে কেহই আত্মাকে জড়িত করেন নাই। ইহার ভাব গভীর অর্থবোধক বলিয়া সহজে আমরা বুঝি না। কিন্তু কোন কর্ম্মবীরের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া ফলাফল দেখিলে, ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ বাবু বলিয়াছেন, যদি কেহ বৃহৎ কর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করিতে চান, তবে তিনি যেন ফলাফলনিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য্য থাকে, তাহা হইলেই বিশ্বাস নয়নে দেখিতে পাইবেন, বারংবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই সে-ই একদিন বিজয়ী।" কর্ম্ম জীবনের প্রতি এরূপ গভীর শ্রদ্ধার ভাব যে আধ্যাত্মিকতা প্রসূত তাহা বলাই বাহুল্য॥" (প্রবাসী)

* এখানে সামান্য একটী কথা উল্লেখ করিব। সম্প্রতি জনৈক মহিলা দশহরার দিন গঙ্গাঘাটে 'বসুমতী'-সম্পাদক মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন,—"বাবা ? দশহরার জন্য আমি পয়সা দুইটী অতিকষ্টে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলাম (অথচ এই মহিলাটীই পয়সার অভাবে মাঝে মাঝে উপবাসী থাকিতেন)।

"জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্ম—আর্য্য-শিক্ষার মূল; উদারতা, প্রেম, সাম্য, মৈত্রী, করুণা দয়া, দাক্ষিণ্য, অহিংসা, সত্য, শক্তি, সাহস প্রভৃতি আর্য্য-চরিত্রের লক্ষণ। মানব জাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে উন্নত-উদার-চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ দেওয়া, দুর্ব্বলকে রক্ষা করা এবং প্রবল অত্যাচারীকে শাসন করা, আর্য্যজাতির জীবনের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাহার ধর্ম্মের চরিতার্থতা।" (ধর্ম্ম ও জাতীয়তা,)।

আমরা এখন সেই মহান্ আদর্শ-চ্যুত হইয়া পাশ্চাত্য-শিক্ষার পরোক্ষ প্রভাবে ভ্রান্তিসঙ্কুল তামসিক মোহে পড়িয়া [বিলাসের নব নব উপকরণ ও অন্ধ অনুকরণের স্পৃহা আমাদের দেহ ও মনকে অধীনতার নাগপাশে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।]—অন্ধ অনুকরণ ও বিলাসের পঙ্কিল প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া ইচ্ছাকৃত অভাবের আগুনে পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিতেছি। ইহার বিষময় ফলে আমাদের সমাজ বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য হারাইয়া বসে। সেইজন্য বিদেশের আমদানী নকল আচারাদি ক্রমশঃ আমাদের সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাহাতে আমাদের নিজস্ব ও জাতীয়ত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছি। এমনই আমাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা !

কথায় কথায় আমরা মূল বিষয় হইতে একটু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কথা হইতেছিল, 'ধর্ম্ম-জীবনে ভারতের বৈশিষ্ট্য।' পূর্ব্বোল্লিখিত প্রেম, সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি গুণের আদর—যাহা আর্য্য-চরিত্রের লক্ষণ, তাহা একমাত্র ভারতেরই নিজস্ব। গুণী ব্যক্তি যে বর্ণেরই হউক না কেন, হিন্দু তাঁহাকে পূজা করেন—ভক্তি করেন। বলা বাহুল্য যে উহা গুণের পূজারই রূপান্তর মাত্র। এই গুণের পূজা ভারতের ধর্ম্ম-জীবনে আর এক বিশেষত্ব।

এক্ষণে আমাদের ধর্ম্মের আর একটী বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। প্রথমতঃ আমাদের ধর্ম্ম 'সনাতন' ধর্ম্ম। 'সনাতন' শব্দের অর্থ—নিত্য, অজর ও অমর। যাহা নিত্য তাহাই সত্য। ইহা কোন গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে—থাকেও না—[ভগবান্ শ্রীশ্রী-রামকৃষ্ণদেব বলিতেন—"সকল ধর্ম্মই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।" তাই সেই নরদেব সকল ধর্ম্মকেই অতীব প্রীতির চক্ষে দেখিতেছেন এবং সেই ভাবে তাঁহার-ধর্ম্মজীবনও কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:—"প্রথমে নিজের ধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে, পরে সকল ধর্ম্মকেই আপনার বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত হওয়া যায়।"]

এইজন্য 'সনাতন' ধর্ম্মকে আমাদের শাস্ত্রে 'সাধারণ ধর্ম্ম' ও বলা হইয়াছে। যাহা সকলের পক্ষেই অনুষ্ঠেয়, তাহাই 'সাধারণ ধর্ম্ম।' মহাভারতে ইহাকে আবার 'বিশ্বধর্ম্ম'ও বলা হইয়াছে। এই সনাতন বা বিশ্বধর্ম্মের মধ্যে অনেক "গৌণধর্ম্ম" আছে। যথা—ব্যক্তিগতধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, যুগধর্ম্ম ইত্যাদি। সনাতন ধর্ম্মের যথার্থ পালনের জন্য এই সকল ধর্ম্মের আচরণ সর্ব্বদা রক্ষণীয়—কখনই উপেক্ষণীয় ও বর্জ্জনীয় নহে। কেননা, তাহাতে সনাতন ধর্ম্ম বিকশিত ও অনুষ্ঠিত

আজ আমি গরীব কাঙ্গালকে দিয়া যে তৃপ্তি পাইলাম, তাহা না করিলে, আমি কখনই শান্তি পাইতাম না। আমার কষ্ট আছে বলিয়া কি আমি পরকালের কাজ করিব না?" এরূপ কথা শুধু ভারতেরই নিজস্ব। এই পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যে আর সেরূপ নাই। কিন্তু নূতন শিক্ষার প্রভাবে এরূপ মনোভাব এখন তিরোহিত হইয়া যাইতেছে।

হইয়া থাকে। "মহান্ ধর্ম্মের সঙ্গে ক্ষুদ্র ধর্ম্ম মিলাইয়া ও সংশোধন করিয়া অনুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর। ব্যক্তিগত ধর্ম্ম জাতিধর্ম্মের অঙ্গাশ্রিত করিয়া আচরণ না করিলে, জাতি ভাঙ্গিয়া যায়। আগে জাতিকে রক্ষা করিয়া তবেই আধ্যাত্মিক, নৈতিক উন্নতি নিরাপদ করা যায়।"—(অরবিন্দ, ধর্ম্ম ও জাতীয়তা)

দ্বিতীয়তঃ—পৃথিবীতে যত রকম ধর্ম্ম আছে, সকল ধর্ম্মই হয়ত ঋষি-কর্ত্তৃক, আর না হয়, কোন-না-কোন অবতার দ্বারাই প্রচলিত হইয়াছে। ঋষিগণকর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্ম, একমাত্র ভারতবর্ষ ভিন্ন জগতের আর কোথাও নাই! সকল প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে একমাত্র হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত আর সকল ধর্ম্মই অবতার-কর্ত্তৃক প্রচলিত ও প্রচারিত হইয়াছে। যেমন বুদ্ধদেব হইতে 'বৌদ্ধধর্ম্ম' নানক হইতে 'শিখধর্ম্ম' মোহাম্মদ হইতে 'মুসলমানধর্ম্ম' যীশু হইতে 'খৃষ্টধর্ম্ম' প্রভৃতি। কিন্তু আমাদের হিন্দুধর্ম্ম কোনও অবতার বিশেষ বা কোনও ঋষি-বিশেষ দ্বারা স্থাপিত হয় নাই—নানা-মুনির নানামত—সেই পরস্পর বিরোধী মতের সমন্বয়েই হিন্দুধর্ম্ম বিদ্যমান। সকল ধর্ম্ম হইতে এখানেই আমাদের পার্থক্য এবং মৌলিকত্ব।

এই ধর্ম্মের মৌলিকত্বের ও বিশেষত্বের স্থূল ও গূঢ় কারণ এইরূপ :—ইহাতে সকল রকম পথ, সর্ব্বপ্রকার উপায়, সকল প্রকার সাধনা ও শৃঙ্খলা স্থান লাভ করিয়াছে। আর আমাদের ধর্ম্ম বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত [আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থে ধর্ম্মবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, শিল্পবিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই আছে। এইজন্য এই ধর্ম্ম যুক্তিযুক্ত। তদ্ভিন্ন ইহাতে অধিকারী ভেদ মানে। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের জন্য বিভিন্ন প্রকার বিধি-ব্যবস্থা থাকায় তদ্দ্বারা পরধর্ম্মে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা হয় না। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব ("আমাদের ধর্ম্ম অতি বিশাল ও নানা শাখা-প্রশাখা শোভিত।" তাহার মূল গভীরতম জ্ঞানে আরূঢ়) এবং এইখানেই তাহার মৌলিকত্ব। এই কারণেই শিকাগো সহরে স্বামী বিবেকানন্দের মুখ-নিঃসৃত ধর্ম্ম-বাণী, ধন-গর্ব্বিত প্রতীচ্য জাতির হৃদয়-রাজ্য জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। উক্ত সভায় তিনি পাশ্চাত্য দেশবাসিগণের সমক্ষে ভারতীয় ধর্ম্ম-জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের মোহিনী শক্তিতে তখন অনেকে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ,—মানুষের প্রকৃতি ও রুচি বিভিন্ন। সেই প্রকৃতি, রুচি ও অধিকার ভেদেই মানুষ নিজ নিজ অধিকার ঠিক করিয়া লয়। তাহার ফলেই আমাদের মধ্যে নানা মত ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে (হিন্দুর শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি) অর্থাৎ হিন্দুধর্ম্মে অধিকারী ভেদ মানে বলিয়াই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমরা ভেদজ্ঞানপূর্ণ বলিয়াই ধর্ম্ম ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়। হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা যাহা ;—নিজেকে নিজেকে জানা বা অনুভব করা [আমাদের প্রাচীন ভারতের উপদেশ ছিল—'আত্মানং বিদ্ধি অর্থাৎ আপনাকে জান। নিজেকে না জানিলে, মহাসত্যকে (মহাসত্য স্বরূপ ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের হৃদয়-গুহায় পরমাত্মরূপে অবস্থান করিতেছেন। তিনি সকলের প্রাণের প্রাণ) উপলব্ধি করিতে হয়, [আত্মজ্ঞান লাভের দ্বারাই তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। অন্তরাত্মা যখন পবিত্র হইয়া উঠে তখনই মানুষ নিজের মধ্যে ভগবানের স্বরূপ বুঝিতে পারে।)], তাহার অভাবেই এরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু সাধু মহাজন ব্যক্তিগণ ভেদজ্ঞান শূন্য বলিয়াই তাঁহাদের মনে ঐ ভাব

আসে না। "যত মত তত পথ"—এই অমৃত বাণীটী স্মরণ রাখিলে, সব গোল মিটিয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত কাটাকাটি মারামারি, আত্মহত্যা, নরহত্যা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই এই ধর্ম্মের নামে। অথচ আর্য্যজাতির সকল কর্ম্মই ধর্ম্মভাবপ্রসূত।

সে যাহা হউক, যখনই জাতির ভিতর যথার্থ ধর্ম্মভাব জাগিবে, তখনই প্রত্যেক মানুষ আপনাদিগকে জানিতে বা বুঝিতে পারিবে। এবং সেইসঙ্গে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের প্রতি কি কর্ত্তব্য, তাহাও বুঝিতে বা জানিতে পারিবে। এই জানা বা বুঝাই ছিল—আমাদের সনাতন ধর্ম্মের চিরন্তন আদর্শ এবং পূর্ব্বকালে এরূপ মনে করাই ছিল—আমাদের ধর্ম্মের কাজ। ভারত এই ধর্ম্মের দ্বারাই অনাদিকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। এখনও ধর্ম্ম ম্রিয়মাণ দশায় উপনীত হইয়াও ভারতকে বাঁচাইয়া রাখিতেছেন। যেদিন ধর্ম্মদেব অন্তর্হিত হইবেন, সেইদিন ভারত শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হবে। সত্যই ধর্ম্মদেবের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য এবং জাতির পতনের সঙ্গে সঙ্গে দেশও ধ্বংসের পথে যাত্রা করিয়া ক্রমে তাহার অবস্থা যে শ্মশানবৎ প্রতীয়মান হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

তাই প্রথমেই একবার বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্মরক্ষায় সমাজরক্ষা, সমাজরক্ষায় ভারতের রক্ষা। যাহাতে তাহা রক্ষা পায়, তজ্জন্য সুমহান্ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ও অনুশীলনে জাতি কি বিশেষ ভাবে যত্নবান্ হইতে হইবে। মানুস যাহাকে ধরিয়া সত্যের দিকে অমৃতের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সেই মহান্ ধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ ও সংরক্ষণে এবং স্বধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলাই অবশ্য কর্ত্তব্য।* কেননা একমাত্র ধর্ম্মই জীবনের সার বস্তু। এবং "যেখানে ধর্ম্ম সেখানে সিংহের ন্যায় তর্জ্জন-গর্জ্জন। সেখানে মানুষকে কোন ভয় করি না; কখন কোন মানুষের খাতির রাখি না।" (ভক্ত কেশব সেনের উক্তি)। বলা বাহুল্য যে, আত্মার বলে বলীয়ান্ না হইলে এরূপ কথা বলিবার সাহসও আসে না। আত্মবলে বলী হইলে তবে বুঝা যাইবে যে, ধর্ম্মরাজ্যে ঢুকিবার অধিকার জন্মিয়াছে। পুরাকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ভারতের এই বৈশিষ্ট্যটুকু চিরউজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে ও থাকিবে।

তবে বর্ত্তমান কুশিক্ষার প্রভাবে আমাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস শিথিল প্রায় হইয়াছে। ফলে, ভারতবাসীর মন আজ কোন দিক্ দিয়াই আর সান্ত্বনা পাইতেছে না। ইহা বিদেশীয় ভাবের ও শিক্ষার ফল বৈ আর কিছুই নহে। তাহাতে মনের এত অবনতি হইয়াছে যে, পরের সমস্তই রমণীয় দেখে,—আর নিজেদের সমস্তই কুৎসিৎ দেখে! ইহা অপেক্ষা জাতির পতন * আর কি হইতে পারে?

---

* বাপ পিতামহের ধর্ম্মই 'স্বধর্ম্ম'। তাঁহারা যে পথ ধরিয়া চলিয়াছেন, আমার পক্ষে তাহাই 'স্বধর্ম্ম।' এই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগের পরিণাম ফল—সমাজের বর্ত্তমান অধঃপতন।

কবীরের দোঁহা

অনুভব জ্ঞান।

আতম অনুভব জ্ঞান কী, জো কোই পূছে বাত।
সো পুংগা গুড় খাই কৈ, কহৈ কৌন মুখ স্বাদ ॥১॥

আত্ম-অনুভবের কথা শুধায় যদি কোন জন।
বোবার যে গুড় খাবার কথা, কোন মুখে হয় বরণন ॥ ১ ॥

জ্যোঁগুংগে কে সৈন কো, গুংগা হী পহিচান।
ত্যোঁ জ্ঞানীকে সুকথ কো, জ্ঞানী হোয় সো জান ॥২॥

বোবা যেমন বোবার কথা, সবই বুঝে ইসারায়।
তেমনি জ্ঞানীর আনন্দ যা', জ্ঞানী হ'লে বুঝে তায় ॥ ২ ॥

নরনারী কো স্বাদ কো, খসী নহীঁ পহিচান।
ততজ্ঞানী সুকখ কো, অজ্ঞানী নহিঁ জান ॥৩॥

জায়া পতির সুখস্বাদ যা', নপুংসক কি বুঝবে তায়।
তত্ত্বজ্ঞানীর কি সুখ প্রাণে, অজ্ঞানীরা খোঁজ না পায় ॥ ৩ ॥

আতম অনুভব জব ভয়ো, তব নহিঁ হর্ষ বিষাদ।
চিত্ত দীপ সম হৈব রহ্যো, তজি করি বাদ বিবাদ ॥২॥

আত্ম-অনুভব যবে হ'য়, হর্ষ বিষাদ তখন গত।
চিত্ত থাকে দীপের সমান, বাদ বিবাদ সব অপগত ॥ ৪ ॥

কাগদ লিখৈ সো কাগদী, কী ব্যোহারী জীব।
আতম দৃষ্টি কঁহা লিখৈ, জিত দেখৈ তিত পীব ॥৫॥

কাগজ লেখে কাগজী যে, আদান প্রদান জীবের শুধু।
আত্ম-দর্শী লিখক কোথা, যে দিকে চায় সেথা ধুধু ॥ ৫ ॥

লিখা লিখী কী নহীঁ, দেখা দেখি কী বাত।
দুনহা দুলহিন মিলি গয়ে, ফী কী পরী বরাত ॥৬॥

লেখালিখির নয়ক' মোটে, দেখার এসব আপন চোখে।
প্রিয়া পাওয়ার পরে বিয়ে, ক'রতে যাওয়া লাগে ফিকে ॥ ৬ ॥

ভরোহোয় সো রীতঈ, রীতো হোয় ডরায়।
রীতো ভরো ন পাইয়ে, অনুভব মোঈ কহায় ॥৭॥

পূর্ণ যাহা শূন্য হয়', শূন্য পুনঃ পূর্ণ হয়।
পূর্ণতা কি অপূর্ণতা, নাই যায় তায় অনুভব কয় ॥ ৭ ॥

—শিবপ্রসাদ

অমৃত বচন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ সেন বি-ই.

মনুষ্য সত্তার তিন প্রধান বিভাগ—

মনুষ্যের শরীর এবং মানসিক ক্রিয়া পরীক্ষা করিলে জানা যায় যে এই মনুষ্যের সত্তার তিনটি প্রধান ভাগ আছে :—

(১) স্থূল দেহ এবং ইন্দ্রিয়। ইহা কঠিন, দ্রব, বায়বীয়, আগ্নেয় এবং আকাশিক দ্রব্যে গঠিত এবং তাহাদের সহিত জড় শক্তিও মিলিত আছে। চৈতন্য শক্তি ভিন্ন ভিন্ন পর্দ্দার ভিতর দিয়া গমন করিলে এই সকল জড়শক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

(২) অন্তঃকরণ সংযুক্ত মন ; ইহার চারিটি অঙ্গ আছে যথা :—

(ক) সংকল্প বিকল্পাত্মক মন।

(খ) চিত্ত—যাহার ধারার দ্বারা মন বাহ্য বস্তুর প্রতি প্রেরিত ও তাহার সহিত সংলগ্ন হয়।

(গ) বুদ্ধি—যাহা দ্বারা সকল বিষয় বুঝা যায়। ইহা নিশ্চয়াত্মিকা। চৈতন্য ধারা একাগ্র হইলে এই জ্যোতি (বুদ্ধি) প্রকাশিত হয়।

(ঘ) অহংকার—যাহা আপনার জ্ঞানকে অপর হইতে পৃথক অর্থাৎ অহম্ ও ইদম্ এই উভয়ের ভেদ জন্মায়।

(৩) আত্মা অথবা চৈতন্যশক্তি, ইহা উল্লিখিত দুই অঙ্গকে অর্থাৎ দেহ ও মনকে সজীব রাখে ; ইহার সাহায্য ব্যতীত সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে।

মনুষ্য দেহে ছয় চক্র :—

পূর্ব্ব প্রকরণে আমরা মনুষ্য শরীরে তিনটি প্রধান বিভাগ উল্লেখ করিয়াছি ; তাহাকে microcosm এর (ব্যষ্টির) মুখ্য তিন ভাগ বলিতে পারা যায়। তদ্ব্যতীত প্রথম বিভাগের অর্থাৎ এই স্থূল শরীরের ছয়টি উপবিভাগ বা ছয়টি চক্র আছে, যথা :—

(১) মূলাধার—ইহা পায়ু দেশে স্থিত ; ইহার কার্য্য মলমূত্র বহিষ্কার করা।

(২) স্বাধিষ্ঠান—ইহা উপস্থ দেশে স্থিত। ইহার প্রধান ক্রিয়া সন্তানোৎপাদন করা অর্থাৎ সেই বীজোৎপাদন করা যাহা ক্রমশঃ জীব শরীরে পরিণত হয়।

(৩) মণিপুর—ইহা নাভিদেশেস্থিত ; ইহার দ্বারা পরিপাক ক্রিয়া হইয়া থাকে এবং ইহা স্থূলদেহের পোষণ করিয়া থাকে।

(৪) অনাহত চক্র—ইহা হৃদয় দেশে স্থিত ; (বুকের কড়া যেখানে সেই স্থানে) ইহা দ্বারা সমস্ত শরীরের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। এই চক্র হইতে রাগ দ্বেষ সংকল্প বিকল্প সুখ এবং দুঃখাদি উদয় হইয়া থাকে। এ প্রকার ঘটনা দেখা গিয়াছে যে হৃৎপিণ্ড ও নাড়ী (pulse) ক্রিয়া বন্ধ হইলেও এই যন্ত্রের ক্রিয়া অক্ষুন্ন থাকে। সুখ ও দুঃখের অনুভব এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইলেও সমভাবে বিদ্যমান থাকে দেখা গিয়াছে। এই

চক্রে আঘাত লাগিলে ইহার ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং তখন সমস্ত শরীরের পতন হয় ও অন্তঃকরণের ক্রিয়া স্থগিত হয়।

(৫) বিশুদ্ধচক্র—ইহা কণ্ঠ দেশে স্থিত; ইহা দ্বারা সূক্ষ্ম নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া হইয়া থাকে।

(৬) আজ্ঞাচক্র—ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থিত নাসিকার মূল স্থান হইতে প্রায় এক ইঞ্চি ভিতরের দিকে অবস্থিত আছে। ইহা আত্মার বৈঠক স্থান ((Seat of the Spirit)-এই ছয় চক্র বস্তুতঃ সুষুম্না নাড়ীতে স্থিত। চারিটি নিম্ন চক্রের ক্রিয়া মনুষ্য শরীরে অল্পাধিক প্রকাশিত আছে; কিন্তু উচ্চতর দুইটি চক্রের ক্রিয়া যোগ সাধনা করিলে প্রকাশিত হয়। এই যোগ সাধন প্রণালী পরে নির্দেশ করা যাইবে। মৃত্যুর পূর্ব্বে ও পরে এবং আসন্নকালে আত্মার যে সকল অন্তর্মুখী অবস্থা হইয়া থাকে তাহা আমাদের থাকে, তাহা যোগক্রিয়া দ্বারা সম্পূর্ণ সজ্ঞান অবস্থাতেই ক্রমশঃ সম্পাদিত হয় এবং এরূপ সাধনায় যে সকল অনুভূতি হইয়া থাকে তাহা আমাদের উল্লিখিত বাক্যের যথার্থতা সমর্থন করিয়া থাকে। অতঃপর যদি কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালী উদ্ভাবিত হয়, যদ্দারা মুমূর্ষু ব্যক্তির দেহের সজীব ও নির্জীব অংশের প্রভেদ পরীক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাদ্বরা আমাদের উল্লিখিত বাক্যের যথার্থতা আরও উত্তমরূপে সমর্থিত হইবে এবং বিজ্ঞানের দিক হইতে তাহা অধিকতর সন্তোষজনক হইবে।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ধারা :—

স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয় ও ষড়চক্রের যত ক্রিয়া আছে তাহা দুই প্রধান ধারা দ্বারা সম্পাদিত হয়।

(১) অন্তরমুখী ধারা, ইহা বাহ্যবস্তুর ছায়া বা জ্ঞান অন্তরায় পৌঁছায় এবং শরীরের পালন ও পোষণের জন্য জীবনী শক্তি প্রদান করে। ইহা আত্মার ধারা, অন্তরমুখী ও আকর্ষক; ইহা দুই ভাগে প্রকাশিত হয় যথা :—

(ক) জ্ঞানাত্মক বা বোধনাত্মক ভাবে এবং

(খ) রচনাত্মক ভাবে যাহাতে শরীরের রচনা ও পোষণ হয়।

প্রথমটি মানসিক ক্রিয়াশালী জীবের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়; এই সকল মানসিক ক্রিয়া স্নায়ু ও সূক্ষ্মতর নাড়ী দ্বারা সম্পাদিত হয়। ইহা চৈতন্য শক্তির উচ্চতর রূপ। রচনা অধ্যায়ে আমরা ইহার বিষয় বিশেষ রূপে বলিব। দ্বিতীয় ধারাটি যদিচ নিম্নাঙ্গের, তথাপি রচনার ক্রিয়ায় ইহা অত্যন্ত আবশ্যক। তৃতীয় অধ্যায়ে এই উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ বিশেষ রূপে বিচার করা যাইবে। জীব জন্তুর রচনাত্মক অঙ্গ বোধনাত্মক অঙ্গের উপর নির্ভর করে। বোধনাত্মক অঙ্গ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইতে বিলুপ্ত হইলে রচনাত্মক অঙ্গের লোপ হয় ও স্থূল শরীর বিনষ্ট হইয়া যায়।

(২) দ্বিতীয় বহির্মুখী ধারা।—ইহা প্রতিক্রিয়ার ধারাও বহির্মুখী; ইহা হইতেই ইচ্ছা ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া মল মূত্র ত্যাগের ক্রিয়া এবং সংগার ক্রিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা মনুষ্য শরীরে বাহ্য ও আন্তরিক সকল বন্দোবস্ত করিয়া থাকে এবং মন হইতেই এই ধারা উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদে ইচ্ছা শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শক্তি প্রধানত পরিপোষণ ক্রিয়াতেই লক্ষিত হইয়া থাকে। শেষ দুইটি ক্রিয়া অর্থাৎ আপান ও সংগার ক্রিয়া জীব জন্তুতে যেরূপ আছে উদ্ভিদেও প্রায় সেইরূপ, বরং প্রবলতর রূপে আছে। উদ্ভিদে অনাহত চক্র অথবা অন্তঃকরণ কার্য্যকারী নহে কিন্তু গুপ্তাবস্থায় বা প্রচ্ছন্নাবস্থায় থাকে; মানসিক ক্রিয়া সম্বন্ধে আজ্ঞাচক্র ও উদ্ভিদে সেইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। চৈতন্যশক্তির রচনাত্মক অঙ্গের ন্যায় মন বা বহির্মুখী ধারার ক্রিয়া চৈতন্য শক্তির উপরে নির্ভর করে, কারণ চৈতন্য শক্তি অপসারিত হইলে বহির্মুখী ধারা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় হয়।

উপরে আমরা যাহা বলিলাম তাহা হইতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে মন এবং চৈতন্য ধারা পরস্পর সহায় হইয়া এই স্থূল শরীর এবং ষড়চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং চিতিশক্তিই মনের ভিতর দিয়া সকল প্রকারে জড়শক্তি ও জীবনীশক্তি এবং মানসিক শক্তি প্রদান করিতেছে।

সমাগতা

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অনেক ঘোরাঘুরির পর তিনমাস আগে যে দিন কিশন রাম হরদয়ালের বিদেশী মাল আমদানীর আফিসে সমার একটি কুড়িটাকা মাহিনার চাকুরী জুটিয়াছিল সেদিন সমা একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিয়াছিল,—'এই সূক্ষ্ম সূত্রেই হয়তো আমি আমার সৌভাগ্যকে টানিয়া পা'ড়ে তুলিতে পারিব।' কিন্তু আজ হটাৎ সে সেপথে একটি প্রকাণ্ড বাধা দেখিতে পাইল।

কারবারের মালিকের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র নরসিংরামজী যেমন সুশ্রী তেমনি মধুর স্বভাব। ঐটিই এখন সমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিরুদ্ধে প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়াছে—নরসিংরাম নয়, তাহার ঐ দেবতুল্য গঠন, ঐ অমৃতময় বাক্য এবং মধুর ব্যবহার! ঐ নরসিংরামকে সমা কর্ম্মের আরম্ভ হইতেই দেখিতেছিল, কিন্তু তাহাতে যে অতগুলি সব বর্ত্তমান আছে সেকথা, মাত্র কয়দিন পূর্ব্বে সে জানিতে পারিয়াছে। আর এই আবিষ্কারটা যে তা'র অজ্ঞাতসারে তা'র সম্মুখে কারাগারের একটা দ্বার কিম্বা রসাতলের একটা ফটক খুলিয়া ধরিয়াছে, সে কথা সমার বিবেক আজ তাহাকে তাহার বাসায় একান্তে পাইয়া বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে এবং তাহাকে শপথ করাইয়া লইয়াছে যে, হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইলেও সে এচাকুরী ছাড়িয়া দিবেই!

সমা কিশনরাম হরদয়ালের চাকুরী ছাড়িলেও আগ্রা ছাড়িল না; কিন্তু পূর্ব্বেই দেশের অজ্ঞাত পরিচয় কোথা এক ভদ্রলোকের নিকট অগ্রিম মাহিয়ানা পাইয়া তাঁহার কন্যার গৃহ শিক্ষকতায় নিযুক্ত হইয়া তৃতীয় দিবস রাত্রি দশটার সময় যখন সে ছিন্নভিন্ন পরিচ্ছদে, উন্মুক্ত, আলুথালু কবরী বন্ধনে, শত নখর চিহ্নিত ও ঘর্ম্মাক্ত দেহে, অশ্রুসিক্ত চক্ষে, হাঁফাইতে হাঁফাইতে বাড়ী ফি'রল, সেদিন সে স্ত্রীজাতীর আত্মরক্ষায় অক্ষম দেহনির্ম্মিতাকে এবং স্বদেশবাসীর জাতীয় চরিত্রহীনতাকে এক সহস্র অভিসম্পাত করি:ত করিতে জন্মের মত আগ্রা ত্যাগের সঙ্কল্প করিল।

কিন্তু আগ্রা ত্যাগ করিলে কি হইবে? আগ্রার স্মৃতিচিহ্ন সে আপন দেহের মধ্যেই বহিয়া লইয়া গেল,—তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহার দেহের মধ্যে যে অন্য একটি মনুষ্যদেহের অঙ্কুর নিহিত হইয়াছে তাহা সে অল্পদিনেই বুঝিতে পারিল। ভাবিল,—সৃষ্টির আগাগোড়াটাই একদেশদর্শিতা—পক্ষপাতিত্ব!—মেঘ ফাঁকে থাকিয়া পৃথিবীকে বৃষ্টিতে ডুবাইয়া দিবে কিন্তু পৃথিবী জোর করিয়া একটি ফোঁটা জলও মেঘের কাছে কাড়িয়া লইবার শক্তি রাখেনা! এ যে দেখি গৃহপালিত পশ্বাদি যেমন মানুষের সম্পূর্ণ অধীন অথচ মানুষের উপর পারস্পরিক সমশক্তিহীন, স্ত্রী পুরুষের মধ্যেও ঠিক সেই ভাব,—ধিক্ ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাকে?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আগ্রা হইতে সমা লক্ষ্ণৌ আসিল। আগ্রায় অনেক ক্ষেত্রেই সে আপনাকে খ্রীষ্টান্ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহা মিথ্যা। এবার সে আপনার দেহটিকে ঐনষ্ট চরিত্র ভারতীয় জাতীর সীমা এলাকার বাহিরে ধরিবার সঙ্কল্প করিয়াই সে লক্ষ্ণৌ আসিয়াছিল। এবং তাহার সৌভাগ্য বশতঃ এখানে একটি বাঙ্গালী পাদ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া পড়িলে সমা মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব

না করিয়া, একদিন একটি গির্জ্জায় গিয়া ব্যাপ্‌টাইজ্‌ড্‌ হইয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তাহার খৃষ্টান নাম হইল,—মিস্‌ মাগারেটা সমাগতা।

লক্ষ্ণৌএ আসিয়া খৃষ্টান হইবার ফলে সমার একটি কামও জুটিয়া গেল,—সে স্থানীয় মিশনারী গার্ল স্কুলের একটি এডিসন্যাল শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইল; মাহিনা মাসে পঁচিশ টাকা।

এই স্থানে একটি দলে মিশিতে পাইয়া এবং কতকটা আন্তরিক সহানুভূতিরও সন্ধান পাইয়া, বিশেষতঃ, উদরান্নেরও একটা সংস্থান হওয়ায়, সমা মনে করিল যেন, তার ঘাড়ে বাতাস পাইল। এভাব কিন্তু তাহার বেশীদিন রহিলনা। যখন শনৈঃ শনৈঃ আগ্রার সেই নরপশুর কৃত আঘাতের ফল সমার দেহে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করিতেছিল তখন, সমাও ক্রমশঃ গভীর দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মাণা হইতেছিল।

সমার কয়েকটি স্ত্রীবন্ধু জুটিয়াছিল। একজনের নাম মিস্‌ মেরী সরলতা। তিনিও বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। সমা তাঁহাকে সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিল। তিন তাঁহার স্বজাতীয়ার উপর সমার বর্ণিত পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—'হায়, হায়, ভগ্নী! কেন আপনি আগেই ব্যাপ্‌টাইজ্‌ড্‌ হন নাই? তাহা হইলে ঐ কুক্কুরগুলা আপনার ত্রিসীমানা মাড়াইতেও সাহস করিত না; করিলেও শাস্তি পাইতে বাকী থাকিত না। দুঃখের বিষয় যে আপনি প্রতি সংবাদ পত্রেই দৈনিক দুই চারিটি ঐরূপ কুক্কুরোচিত অত্যাচারের সংবাদ জানিয়াও আপনাকে সাবধানে রাখিতে পারেন নাই! শেষ সিদ্ধান্ত হইল,—সমা ব্যাপ্‌টাইজ্‌ড্‌ না হইয়াও মিথ্যা করিয়া আপনাকে খৃষ্টান্‌ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, সেই গুরুতর মিথ্যা কথন অপরাধে ভগবান ক্রুদ্ধ হইয়াই ঐ সয়তানকে প্ররোচিত করিয়া তাহার নিজকৃত অপরাধের শাস্তি দেওয়াইয়াছেন,—সে শাস্তি ঈশ্বরের বিচার ফল বলিয়া মাথা পাতিয়া লওয়াই কর্ত্তব্য। না লইলে উপায়ই বা কি? অন্য কোন উপায় যদিই বা ছিল, সে তাহাদের কল্পনাতেও আসিলনা,—ভগবানের রাজ্যে কোন পাপই অদণ্ডিত থাকে না!

কিন্তু তথাপি, উভয় বন্ধুতে আশু সঙ্কট মুক্তির যে উপায় অবধারণ করিল তাহাও নিতান্ত নির্দ্দোষ এবং নিষ্কলুষ নয়। কিন্তু তদ্ভিন্ন এসঙ্কট মুক্তির উপায় ছিলনা। নিতান্ত উপায়ান্তর অভাবেই সমাকে সম্মত হইতে হইল যে, সে বিবাহই করিবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাল্যকাল—পঠদ্দশা হইতে সমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, কেবল এই দেশের হিন্দুদেরই মানুষে মানুষে জাতিভেদ—বামুন, কায়েত, হাড়ি, বাগ্দী, কুলু, মালী ধোপা! বাকী এই সসাগরা দুনিয়ার বুকে অন্ততঃ সমধর্ম্মী সবাই এক—সেখ, সৈয়দ, জোলা, মাল, কসাই—এক সানকীর কুটুম্ব! ব্যাপ্‌টাইজ্‌ড্‌ হওয়ার পর ক্রমশঃ সমার সে ধারণা চূর্ণ হইয়া গেল। দেখিল হিঁন্দুর যে ফাট্‌গুলা উপরিভাগ পর্য্যন্ত হাঁ করিয়া আছে, তা'র চেয়ে বড় বড় ফাঁক কাগজ কলম বোল্‌চালের কাঁথা ঢাকা রহিয়াছে। পিতা পুত্রের মধ্যেও হয়তো একটি নালার ব্যবধান—অন্য কথা কি? সমা আশ্চর্য্য হইল যে, হিঁন্দুর ঐ দৃশ্যমান ফাটগুলার দিকে চাহিয়া চাহাইয়া, দেখিয়া, দেখাইয়া দুঃখে দরদে যাঁহাদের শয্যা-কণ্টকী ধরিয়াছে তাঁহারা এই মুষ্টিমেয় নেটিব্‌ খৃষ্টান্‌ ক'টাকে সুধা ধবলিত আলিঙ্গনে প্যারাডাইসের চিলা কোটায় তুলিয়া লইলেন না কেন? জীবান্তে একঘরে, পাশাপাশি খাড়া হইয়া একমালি পিতা—ঈশ্বরের সহিত আলাপন্‌ চুলায় যাউক, মরণের পর মাটির নীচে ও কাছাকাছি থাকিবার হুকুম নাই! সেকালে কে এক রাজনন্দিনী রাধা না কি নন্দ গোয়ালার ছেলেকে নাসাকুঞ্চন সহকারে বলিয়াছিলেন,—'আমার সোনার বরণ কালো যে হবে! কৈ, তর্ক সিদ্ধান্তের ঝিলে রামাবাগ্দীর লাশ চাপিলে, সিদ্ধান্তের প্রেতাত্মা উঠিয়া খোনা কেথায়—ভোঁ ভোঁ কৃষ্ণকায়! অঁস্পৃশ্য স্তে দূরী ভ বঁ! এমনটা বলার কথা সমা তো কখনো শুনেনাই—বর্ণ আতঙ্কে! খাতমুখে উপস্থিত ধাবমান অশ্বের ন্যায় সমার আশাতুরঙ্গ ব্যাহতগতি হইল।

বেকারের প্রতিকার—প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ

শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ বসু, বি এস, সি (লণ্ডন)

পাশ্চাত্য দেশে সাধারণতঃ মজুর শ্রেণীর লোকেরাই বেকার সমস্যায় কষ্টভোগী হয়; কারখানার মজুরীর উপরেই উহাদের জীবিকা সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহা না মিলিলেই সর্ব্বনাশ। ভারতের অবস্থা অন্যরূপ; এখানে মজুর শ্রেণীর লোকদের স্ব স্ব বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে; কারখানার মজুরীর উপর তাহাদের অল্পলোকেরই জীবিকা নির্ভর করে। এখানে মধ্যবিত্ত লোকেরাই প্রধানতঃ বেকার-সমস্যায় ভোগে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে মাত্র এই সমস্যার উদ্রেক হইয়াছে, এক্ষণে উহা এক গুরুতর চিন্তার বিষয়। আমাদের বেশ মনে হয় এক সময় এ সমস্যা মোটেই এদেশে ছিল না! পাশ্চাত্যের ভাবে প্রভাবিত হওয়াই এই সঙ্কটের প্রধান কারণ। দেখা যায় যে বাঙ্গলা দেশই এই ভাবে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক প্রভাবিত, এজন্য বাঙ্গলায় এই ভাব অতি গুরুতর। মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, কচ্ছি প্রভৃতি ভিন্ন প্রদেশীয় যে সকল লোকেরা পাশ্চাত্যের প্রভাবে কম পড়িয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে এই প্রশ্ন অত্যন্ত কম। এই প্রকার ঘটনা হইতেই বাস্তবিক এই বেকার সমস্যার মৌলিক কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়—উহা হইতেছে আমাদের জীবন সাধনায় পাশ্চাত্যের বশ্যতা। উহা রাষ্ট্রিক অধীনতা অপেক্ষাও অনেক অধিক সাংঘাতিক ও ক্ষতিজনক হইয়াছে। ভারতের উপর দিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে নানা প্রকারের রাজনৈতিক বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে; তাহা সত্ত্বেও বর্ত্তমানে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথমভাগ পর্য্যন্ত ভারত তাহার স্বকীয় সাধনগত স্বরাজ অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল। তখন ইংরেজ লেখক স্যর তমাস-মন রো বলিয়া গিয়াছেন—"যদি উত্তম কৃষি ব্যবস্থা, অতুলনীয় কারুশিল্প, লোকের সুখ সুবিধার উপযোগী সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যজাত প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা, লিখন পঠন হিসাবসংরক্ষণ আদি শিক্ষার নিমিত্ত প্রতি গ্রামে শিক্ষালয় স্থাপন, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অতিথি-সৎকার ব্যবস্থা, পরস্পরের মধ্যে বদান্যতা এবং সর্ব্বোপরি স্ত্রীজাতির প্রতি এমন ব্যবহার যাহাতে সকলে বিশ্বস্ততা, সম্মান ও অন্তরের কোমল ভাবসমূহ পরিপোষণ করিবার সম্পূর্ণ অবসর লাভ করিতে পারাই সভ্যজগতের লক্ষণ হয়, তবে হিন্দুরা কোন ইউরোপীয় জাতি হইতে কোনও প্রকারে হীন নহে; বরং আজ যদি সভ্যতার পণ্য লইয়া ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসা চলে, তবে আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ইংলণ্ড তাহার রপ্তানি মাল অপেক্ষা আমদানীর সামগ্রী লইয়া অধিকতর লাভবান হইবে।"

আমাদের দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভদ্রলোকেরা'ই এক্ষণে বেকার সমস্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পীড়িত। তাহাদের যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল ভোগ করিতে হইতেছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা পাশ্চাত্য ভাবে প্রভাবিত হইয়া সংবাদপত্র আফিসে ও বক্তৃতামঞ্চে, গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া, দেশের নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছেন, তাহারাত কখনও নিজেদের এই দুরবস্থার কথা ভাবেন নাই বা বলেন নাই—তাহারাত কেবল সার্ব্বজনীন জনশিক্ষার প্রচার ও তথাকথিত লাঞ্ছিত বা অস্পৃশ্যদিগের উত্তোলন বিষয়েই শতমুখে দাবী দাওয়া করিয়া আসিতেছেন। এই

তথাকথিত শিক্ষা প্রচারের ফলে, এদেশের কৃষিজীবি ও বণিকবৃত্তি লোকদিগের মধ্যে যাহারা অকিঞ্চিত্তর উন্নতি করিতে সক্ষম ও সঙ্গতিসম্পন্ন, তাহারা নিজ নিজ ব্যবসায় ছাড়িয়া স্কুল কলেজে ঢুকিয়া চাকুরীর ক্ষেত্রে ভিড় বাড়াইয়া বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে, আর নিজ পিতৃ-পিতামহ কুলের চিরাগত কর্ম্মদক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া কৃষি ও বাণিজ্যে ততোধিক ক্ষতি সাধন করিয়াছে—স্ব স্ব বৃত্তিতে রত থাকিলে অন্ততঃ তাহাদের নিজ নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের কোন চিন্তা থাকিত না ; পক্ষান্তরে আজ ইহাদের সকলের এক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার দ্বারা ভদ্রাভদ্র সকলের এমন হীন অবস্থা হইয়াছে যে তাহাতে সাধারণ মজুরদিগের অবস্থাও ভাল বলিতে হয়। এই প্রকারে দেখা যায় যে এই কালের এই উন্নয়ন আন্দোলনের (uplift movement) অর্থনৈতিক ফল যেমন শোচনীয়, ব্যবহারিক পরিণতি তেমনই ভয়াবহ। ইহারই প্রচারণা ফলে মানবধর্ম্মের একটী অতি উচ্চ গুণ যে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব বা বদান্যতা, তাহাতে অনেক হানি পৌছিয়াছে। আমাদের রাষ্ট্রনেতারা ও সরকারপক্ষ ইহার দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই এক্ষণে সরকারী চাকুরীতে দেশের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর এক বিকট সাম্প্রদায়িক ভেদ ও বিরোধের সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছেন। হায়! আজ এদেশের সামাজিক বায়ুমণ্ডল কি ঘোর বিদ্বেষ ও ঘৃণার তিক্তরসে পূর্ণ হইয়াছে ! সমুদয় ভারত ব্যাপিয়া জাতিতে জাতিতে ঘোর বিরোধ উপস্থিত ! নিম্ন শ্রেণী উচ্চ শ্রেণীর বিরুদ্ধে, অস্পৃশ্যরা উচ্চ হিন্দুর বিপক্ষে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে।

আরও অনেক প্রকারে অধুনাকার এই নব্য তান্ত্রিক ভারতবাসীদিগের অতিমাত্র পাশ্চাত্যাভিমুখী মনোবৃত্তিতে আমাদের অর্থনৈতিক দশার বিপরীত ফল দর্শাইতেছে এবং তাহাতে বেকারের সমস্যা আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্ধভাবে আজ ইহারা পাশ্চাত্যের আর একটী মতবাদের অনুবর্ত্তন করিতেছে যে—ক্রমেই অভাব এবং আরও অধিক অভাব সৃষ্টি করিয়া যাও। তাহাতে জীবনের আদর্শ উন্নীত হয়। তাহাতেও লোকে আজ নানা বাহুল্য ব্যয়ের প্রশ্রয় দিতেছে, অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য ব্যবহার করে, এবং নিজেকে মূর্খের মত, আড়ম্বর শীল বলিয়া বৃথা গর্ব্ব করে। তাহাতেই এদেশের লোকের যৎসামান্য আয় এক্ষণে শূন্যের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ; কিন্তু তার বিনিময়ে সুযোগ সুবিধা কিছু হইয়াছে এমন বলা যায় না। অধিকন্তু ইহার দ্বারা লোকের জীবন সংগ্রাম আরও কঠিন হওয়াতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রসার সাধন হইয়াছে.—যে বিরোধ জাতিতে জাতিতে বা বিবিধ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুন্নতের উন্নয়ন করিতে যাইয়া দেশের তথাকথিত নেতারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা এই অর্থনৈতিক বাজারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা আরও শতধা বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ইহার উপরে আবার, পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালীর জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া নব্য ভারত তাহার নিজ চিরাগত গ্রাম্য স্বরাষ্ট্র বিধি বা স্বাধীন লোকতান্ত্রিকতার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। সেই প্রাচীন বিধি আর্থিক দৃষ্টিতে লোকের মহান্ কল্যাণকর ছিল ; আজ পাশ্চাত্যের অনুকরণে উহার সংগঠন করিতে গিয়া একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও প্রাদেশিকতার ভেদ বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর্থিক দৃষ্টিতেও উহা সম্পূর্ণ ধ্বংসকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। শাসন ব্যবস্থাতে আজ বহু প্রদেশ ও তৎসঙ্গে অসংখ্য গভর্ণরের পদবী সৃষ্ট হইয়াছে ; তাহাদের সাজ সজ্জা ও অনেক ব্যয়সঙ্কুল কৌন্সিল ব্যবস্থা, অসংখ্য শাসন বিভাগ, তাহাতে বহু ব্যয়সাধ্যকারী উচ্চপদস্থ

কর্ম্মচারী—ইত্যাদিতে শাসনসংস্কার শিখরদেশ অতিমাত্র ব্যয়ভারগ্রস্থ। প্রজাবর্গের আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে ইহাদের এরূপ ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারে। অপর কারণগুলির সঙ্গে ইহাও বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের এক কারণ। (ক্রমশঃ)

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম

এ দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণের অনেকের ধারণা ও বিশ্বাস যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আধুনিক বিজ্ঞান-মত-সম্মত নহে। আধুনিক বিজ্ঞান বলিতেছে যে এই ধরণীপৃষ্ঠে মানুষ তির্য্যক প্রাণী হইতে ক্রম বিকাশের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আবির্ভূত হইয়াছে। সুতরাং সমগ্র মানবজাতি যখন একই ক্রমবিকাশের নিয়মের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে, তখন মানুষের মধ্যে দুর্ল্লঙ্ঘ্য শ্রেণী-বিভাগ থাকা উচিত নহে। বরং গুণগত শ্রেণী বিভাগ মানা যাইতে পারে কিন্তু বংশগত শ্রেণী-বিভাগ বা জাতিবিভাগ অযৌক্তিক—যদিও অপর উদারতর সম্প্রদায় শ্রেণী বিভাগ লইয়া মাথা ঘামাইতেই চাহেন না। কারণ তাহাদের মতে সকল মানুষই তুল্যমূল্য।

শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন বিজ্ঞানকে যাহারা অভ্রান্ত বলিয়া মানিতে চাহেন, তাঁহারা তো দেখিতে পাইতেছেন, যে সত্য আজ বিজ্ঞান সুসিদ্ধান্ত বলিয়া মানিতেছে, সেই সত্য দুই দিন পরে অপসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। এই জন্য মিষ্টার জিরাল্ড গোল্ড বলিয়াছেন— 'Science is the continuous discovery of its own mistakes' অর্থাৎ আপনার ভুল ক্রমাগত আবিষ্কারের নামই বিজ্ঞান। আর ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদও তো যে সর্ব্ববাদিসম্মত নহে তাহা এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডাক্তার জেম্‌স্ অর্ মহোদয়ের মন্তব্য হইতেই বেশ বুঝা যায়। তিনি বলিয়াছেন,—'The greatest scientists and theologians of Europe are now pronouncing Darwinism to be absolutely dead'—অর্থাৎ যুরোপের বড় বড় বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মবৃত্তগণের মতে ডারউইনের মত সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুতরাং বিজ্ঞানের মত যদি পরিবর্ত্তনশীল হয় এবং ডার উইনের মত যদি সর্ব্ববাদিসম্মত না হয়, তবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর অযথা দোষারোপ করা অন্যায় নহে কি? বিশেষজ্ঞ যখন প্রমাণিত হইতেছে* সকল মানুষই এক বংশগত জীব নহে এবং প্রত্যেক জাতীয় জীবনই স্বতন্ত্র ভাবে ধরণীবক্ষে আবির্ভূত হইয়াছে, আর যখন উদ্ভিদ জগতেও দেখা যায় একজাতীয় আমের বীজ হইতে অন্য জাতীয় উৎপাদন করা যায় না এবং মিশ্র কলমের বীজ হইতে আর গাছ জন্মে না, জীব জগতেও যখন গাধা ও

---

* Dr. James Bill, Professor of Lonbon University College says :—'Every thing declares the species to have their origin in a distinct creation, not in a gradual variation from some original type.'

[illegible] অশ্বতরের বংশ থাকে না, সিংহ [illegible] ও [illegible] ব্যাঘ্রের মিলনে কচিৎ সন্তান উৎপাদন হইলেও সেই সন্তানের আর বংশ থাকে না। তখন বংশগত বা কৌলিক জাতিবিভাগ অপসিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে কেন ? আর যখন দেখা যায় মানুষের প্রভেদ দেশের দিক দিয়া ততটা নহে, যতটা হয় মানসিকশক্তি বিকাশের দিক্ দিয়াই ঘটে। গুণসংক্রমণের নিয়মানুসারে তাহাদের সেই কৌলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়। এই জন্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় বংশের দোষগুণ পর পর পুরুষে সংক্রমিত হইয়া থাকে। সুতরাং মনে হয় কৌলিক গুণ সুপ্ত থাকিলেও একেবারে লুপ্ত হয় না। এই সকল ভাবিয়া দেখিলে, সহজেই মনে হয় জাতি-স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য রহিয়াছে। এই বিষয়টী বর্ণাশ্রম মতে বর্ণভেদগত বৈশিষ্ট্যের লোপ-সমর্থনকারিগণের বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে স্বপক্ষ ও বিরুদ্ধ পক্ষ—সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে কালের বহুধ্বংসিনী শক্তিকে উপহাস করিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম দীর্ঘকাল জীবিত রহিয়াছে। ভিতর ও বাহির হইতে ইহার উপর যে কত আক্রমণ চলিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তবুও যে আছে, ইহা বাঁচিয়াছে, তাহার কারণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে এমন একটি জীবনীশক্তি আছে যাহা অন্য কোন ধর্ম্মবিশ্বাসে লক্ষিত হয় না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে বহুপুরুষ ধরিয়া কৌলিক সাধনাজনিত গুণের বংশ পরাম্পরায় সংক্রমণ শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সম্বন্ধে এক্ষণে য়ুরোপ সংক্রমণশক্তিতে অবিশ্বাসী বলিয়া মনে হয় না।

বর্ণাশ্রমে অর্থনীতির উৎকটতা নাই—যাহার ফলে একদল মুষ্টিমেয় হয় ধনকুবের আর অবশিষ্ট লোকেরা হয় শ্রমিক। বর্ণাশ্রমবিধানে উৎকট ও জটিল আর্থিক সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য হয়। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনয়নের মূলে প্রয়োজন মনুষ্যচরিত্রও জীবনব্যাপার হইতে পশুভাবের উন্মূলন। পশুভাব বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়াই অর্থনীতিক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে। বর্ণাশ্রম শিক্ষা দেয়—জীবন ভোগের জন্য নহে ত্যাগের সহিত ভোগের জন্য—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধঃ কস্যচিদ্ ধনম্'। একা খাইতে নাই, একা পরিতে নাই, কোনও আনন্দ বা সুখ একা পাইতে নাই, বিত্ত একেকের জন্য নহে—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমগ্র জগতের তৃপ্তির জন্য। এক কথায় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় মানুষ পশু নহে—দেবতা। আবার শুধু দেবতা নহে ব্রহ্মদেবতা।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধান পশুপ্রবৃত্তিকে দমনে রাখে,—অধিক খাইবার, অধিক পরিবার আকাঙ্খাকে লোপ করিয়া দেয়। কাজেই বর্ণাশ্রমে জীবন জয়ী হইবার জন্য দ্বন্দ্ব থাকে না। এই সংগ্রামহীনতার জন্যই জীবন সুস্থ ও স্বস্থ ভাবে বাঁচিবার অবকাশ বা সুযোগ পায়।

বর্ণাশ্রমে কর্ম্ম ও বৃত্তিভেদেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। সকলের এক কাজ নহে, এক বৃত্তি নহে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বৃত্তিকেই অবলম্বন করিবেন, তিনি অন্য কোন বৃত্তিতে প্রলুব্ধ হইবেন না। আবার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র ব্রাহ্মণের আভিজাত্যে বিজিগীষু হইয়া ব্রাহ্মণ বৃত্তি গ্রহণ করিবেন না। ইহাতে হয় একটা সাম্যের সৃষ্টি, ও তৎসঙ্গে দেখা দেয় অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সাচ্ছলতা। অন্যদিকে বৃত্তি কুলানুগত হওয়ার দরুণ প্রত্যেকেরই মধ্যে জন্মে একটা কর্ম্মকুশলতা—যাহার জন্য মসলিনের ন্যায় সূক্ষ্মবস্ত্রেরও আবির্ভাব সম্ভবপর হয়। (ক্রমশঃ)

—————

স্বামী রামতীর্থের জীবনী ও বাণী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ জি

লাহোরে অধ্যাপনা সময়ে তিনি তাহার ঘড়ির সহিত খেলা করিতেন। যে কেহ সময় জানিতে চাহিলে তিনি বলিতেন—বন্ধু, সবে একটা বাজিয়াছে। বিভিন্ন সময়ে একই উত্তর পাইয়া ছাত্রেরা অনুসন্ধান করিতেন কিরূপে উহা সম্ভব। তিনি বলিতেন ভাই, আমার ঘড়িতে সব সময় একটা বাজিয়া আছে। কাল মাত্র এক। তিনি পূর্ব্বাশ্রমে কি সন্ন্যাস জীবনে কখন 'আমি' শব্দ ব্যবহার করিতেন না (১)—বলিতেন 'রাম বল্‌ছে, রাম শুন্‌ছে' ইত্যাদি। ঈশ্বরার্থে রাম শব্দ প্রয়োগ করিতেন। এবং পত্র লিখিবার সময় বা বক্তৃতার সময় তিনি শ্রোতৃবর্গকে উপস্থিত নর-নারীরূপে—হে আমার আনন্দময় আত্মা, বা হে চিরসুখী রাম বলিয়া সম্বোধন করিতেন। দেনভারে বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন—প্রত্যেক দিনই নিউইয়ারস্ ডে, প্রত্যেক রাত্রিই এক্‌সমাস নাইট্। নিজেকে রাম বাদশা বলিয়া আনন্দমূর্ত্তি বালকের ন্যায় বিশ্বাস করিতেন। পোর্ট সৈয়দে তিনি লর্ড কার্জ্জনের সহিত এক জাহাজে চরিত অস্বীকার করেন। এক জাহাজে দুইজন রাজা যাইতে পারে না বলিয়া তিনি অন্য জাহাজে উঠেন।

জাহাজে আমেরিকান্‌গণ তাহাকে আমেরিকাবাসী ও জাপানীরা জাপানবাসী মনে করিত। ভারতাভিমুখে আসার সময় তিনি মিশরের কোন মস্‌জিদে পার্শিভাষায় এক বক্তৃতা দিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। ওস্তাদের হাতে বেহেলার কম্পমান তারের মত তাহার শরীরের প্রত্যেক কণা সদা আনন্দ-হাসিতে নৃত্য করিত। লাহোরের তীব্র গ্রীষ্মকালে যখন তিনি ফুট-পাথের উপর দিয়া চলিতেন—লোকে তাহার পাদ স্পর্শ করিয়া দেখিত উহা বরফের মত ঠাণ্ডা (২)। কারণ জানিতে চাহিলে বলিতেন যে,—'আমি ত গরম লাহোরের পথে চলিতেছি না—আমি যেখানেই চলি ভগবতী গঙ্গার শীতল তরঙ্গ আমার পদ ধৌত করিয়া দেয়। তুমি কি দেখ না ব্রহ্মময়ী গঙ্গা সর্ব্বত্র বহিতেছে?' আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রামতীর্থ দার্জ্জিলিং পাহারে কিছুকাল

১। মিশন কলেজে ও ওরিণ্টাল কলেজে তাহার ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্রকে তিনি সম্বোধন করিতেন—'হে প্রিয়তম কৃষ্ণ, তুমি সব আমি তোমাকে কি শিখাইব?" কোন ছাত্র অজ্ঞতা নিবেদন করিলে বলিতেন—"হে প্রেমাস্পদ কৃষ্ণ, তুমি নিশ্চয়ই সব জান।" উহাতে অদ্ভুত ফল ফলিত। অজ্ঞ ছাত্র ও সাহসভরে বোর্ডের নিকট জটিল প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিত। মিশন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাক্তার ইউইং সাহেবকে বলিতেন—"সাহেব, তুমি যিশুকে পূজা কর, তুমি তাহার আঁখি দুইটী দেখিয়াছ কি? না নিশ্চয়ই দেখ নাই, এই দেখ, ঈশ্বর তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান।" এইরূপে তিনি ঈশ্বরোন্মাদ হইয়াছিলেন।

২। উপাধ্যায় ব্রহ্ম বান্ধব যখন ইংলণ্ডে যান তখন তাহার সঙ্গে একটী লোটা মাত্র সম্বল ছিল। জনৈক মাড়োয়ারী এই চক্‌চকে লোটার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় তিনি তাহাকে উহা সানন্দে প্রদান করিয়া নিঃসম্বল যাত্রা করেন। কথিত আছে যে, তিনি লণ্ডনের টেম্‌স্ নদীর বরফের মত ঠাণ্ডা জলে প্রত্যহ স্নান করিতেন ও বিলাসভূমি লণ্ডনে ও কঠোর সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতেন।

বাস করেন। পরে মথুরায় পুষ্করে ও শেষে হরিদ্বারে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। একদিন খরস্রোতা গঙ্গাতে স্নান করিতে যাইলে তার পা পিছলে যায় ও তিনি ভাবের ঘোরে থাকিতেন বলিয়া আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হন ও গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। জীবনের শেষের দিকে হাসি ও আনন্দ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল ও তিনি যেন বিষণ্ণভাবাপন্ন হইয়াছিলেন।

মথুরায় যখন পুরাণসিংহ তাঁহার সহিত দেখা করেন তিনি বলেন—দেখ একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা লাভ হইবে। পুরাণসিংহ শুনিয়া চমকিত হইলেন; কারণ জাপানে তাহার নিকট তিনি ধর্ম্মের কথা ব্যতীত কখনও দেশের কথা বলেন নাই। তিনি ভাবিলেন নানা স্বাধীন দেশ ভ্রমন করিয়া হয়ত স্বামিজীর মত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। পরক্ষণে ২টী ভদ্রলোক তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া আসিলেন; অভিবাদনান্তর তাহারা উপবিষ্ট হইলে প্রতিনমস্কার করিয়া রামতীর্থ হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তোমরা রামের খোঁজ নিতে আসিয়াছ—রাম তাহার হৃদয় তোমাদের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দিতেছে,—তাঁহাকেই অন্বেষণ কর—জগৎ তোমাদের পদানত হইবে।" তাহাতে ভদ্রলোক ২টী অতিশয় লজ্জিত হইয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন—"স্বামীজি আমাদের ক্ষমা করুন আমরা পাপী, আমরা আপনার ভালবাসায় পরাজিত, কি করিব পেটের দায়ে আমরা এই সব করি।" তাহারা গভর্ণমেণ্টের সি, আই, ডি, ছিল।

আজমীরে পুষ্কর হ্রদের উপর তিনি কিষণগড় ষ্টেটের বাটীতে থাকিতেন। তখন একবারে নিঃসম্বল থাকিতেন, সঙ্গে একটী ফাঁপা বাঁশের খণ্ড ছিল ও তাহার ভিতর কাগজ, পেনসিল রাখিতেন। বন্ধুদের উহা দেখাইয়া বলিতেন—এ বাঁশখানি রামের যাদু—এদিয়ে স্নানকালে রাম হ্রদের কুম্ভীর তাড়ায়—আর এটী রামের পোর্টম্যাণ্টো এর ভিতর রামের সমস্ত সম্পত্তি থাকে। নিঃসম্বল কৌপীনবস্ত্র সাধু সত্যই রাজা, একমাত্র সেই চিরসুখী। শীত কি গ্রীষ্ম অধিকাংশ সময়েই তিনি ছাদের উপর থাকিতেন, বলিতেন রাম গৃহ পছন্দ করে না, সেগুলি যেন গোরস্থান মনে হয়।

ভারতের তীর্থস্থান সমূহের মধ্যে একমাত্র পুষ্করে ব্রহ্মার মন্দির আছে। এখানে ব্রহ্মা ব্রহ্মযজ্ঞ করিয়াছিলেন। তিনি পুরাণসিংহ প্রভৃতি বন্ধু-ভক্তদের পবিত্র যজ্ঞভূমি দেখাইতে নিয়া যান ও যজ্ঞের উপাখ্যান বিবৃত করেন। প্রবাদ ছিল যে, যজ্ঞে পূর্ণত সিদ্ধি হইলে শঙ্খ-ধ্বনি হইবে। দেবতা ও মানুষ সকলে যজ্ঞ করিতেছেন—কিন্তু কিছুতে আর শঙ্খধ্বনি হয় না। এদিকে একটী নিম্ন জাতীয় ঘেসেড়ার হৃদয়ে প্রকৃত ব্রহ্মযজ্ঞ চলিতেছিল। সে ঈশ্বর চিন্তায় এত অভিভূত হইয়াছিল যে ঘাস কাটিতে কাটিতে নিজের আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিলেন; কিন্তু মানুষের রক্ত-সদৃশ লালরক্ত না বহির্গত হইয়া ঘাসের রঙহীন রস বাহির হইল। এই আঘাত পাইয়া সে দিব্যোন্মত্ততায় নৃত্য করিতে লাগিল ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়, বৃক্ষলতাও নাচিতে লাগিল। তখন যজ্ঞ-কর্ত্তা আসিয়া করজোড়ে তাহাকে যজ্ঞের নিকট লইয়া গেলেন ও তাহাতে শঙ্খধ্বনি হইল। স্বামী রামতীর্থ বলিলেন ইহাই প্রকৃত বেদান্ত।

স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় তিনি তাঁহার পত্রাবলীর ভিতর দিয়া আত্ম প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার বহু বক্তৃতা অতি সারগর্ভ, বাগ্মীতাপূর্ণ উন্মাদকর। বৈজনাথ রায়ের Hinduism : Ancient and Modern নামক পুস্তকের একটা অতি সুন্দর উপক্রমণিকা তিনি লিখিয়া দিয়াছেন। ভারতে আসিয়া তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা, উপদেশ, নানা সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখাতে

নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি ওমার খায়েম্, হাফিজ প্রভৃতি পারস্য কবিদের সহিত অধিকতর পরিচিত ছিলেন ও ওয়াল্ট্, হেইট্ম্যান, কোলিরজ, শেলি, জর্জ্জ রাসেল, কাণ্ট প্রভৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

হৃষিকেশের কিছু উপরে বদরী নারায়ণের পথে গঙ্গাতীরে বিয়াস আশ্রমে তিনি কিছু কাল ছিলেন। তখন লম্বা দাঁড়ি রেখেছিলেন ও আগত দর্শনার্থিদের বলিতেন—দেখ, আমার কেমন ব্যাসদেবের মত দাড়ি হইয়াছে। এলাহাবাদ ও কাশীধামে বেদান্তের বক্তৃতা দিবার সময় পণ্ডিতেরা তাঁহাকে চ্যালেঞ্জ করেন যে, তিনি সংস্কৃত না জানিয়া, বেদান্তের মূল গ্রন্থ না পড়িয়া কিরূপে বেদান্ত বিষয়ে বলিতে পারেন। ইহাতে তিনি মর্ম্মাহত হন; কারণ তিনি যেন সংস্কৃতানভিজ্ঞ ছিলেন। তখন হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার সেই আনন্দ হাসি হ্রাস হইয়া বিষণ্ণচিত্ত হইয়া পড়িলেন।

তখন তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ, বেদ, বেদান্ত পড়িতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। তিনি বৈদিক মন্ত্রের প্রকৃতার্থ নির্দ্দেশ করিবার জন্য গভীর চিন্তা করিতেন ও মগ্ন-চিন্তায় তন্ময় থাকিতেন। তিনি বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য্যকে বেদের প্রকৃত অর্থজ্ঞ বলিতেন ও বেদের অন্যান্য অর্থ মানিতেন না। একদিন তিনি স্নানান্তে গঙ্গাতীরে প্রস্তর খণ্ডের উপর উপবিষ্ট, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। তিনি অনুভব করিলেন তিনি যেন জগজ্জননী, দেবতা প্রভৃতি যেন তাঁহার সন্তান, তাঁহার শিরার ভিতর দিয়া যেন ঐশী কামকলা প্রবাহিত হইতেছে—সমস্ত প্রকৃতি যেন প্রেমবিলিপ্ত। তাঁহার হৃদয়ে এই বাণী উত্থিত হইল—দেবগণ তোমরা এস, আমি তোমাদের জন্মদান করি। এই ভাব অপসৃত হইলে তিনি বেদপাঠের নিমিত্ত যেই পাতা খুলিলেন, দেখিলেন —দেবীসূক্ত প্রভৃতি এই ভাবের মন্ত্ররাশি। তিনি বলিতেন, ধ্যান করিয়া বেদার্থ অবগত হওয়া উচিত।

বেশুনে অবস্থান কালে পাহাড়ীরা তাঁহাকে ফল দুধ দিত। তাহারা বলিত—ইনি আমাদের দেবতা ইনি মানুষ নন্। তাহারা স্বামিজীর থাকিবার জন্য একটী কুঠিয়া তৈরী করে দিয়াছিল। তাঁহার এইরূপ মানসিক পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—জগৎ আমার ফল দেখিতে চায় ফলের পশ্চাতে যে কি সাধনা ও অধ্যবসায় আছে—তপস্যা, কেঠোরতা আছে তাহা দেখিতে চায় না। গৌড়পাদ ও গোবিন্দাচার্য্যের নীরবতা পশ্চাতে ছিল বলিয়া শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধি এত জলন্ত হইয়াছে। এই সময় তিনি পদ্মাসনে দিনের পর দিন বসিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিতেন, শরীর বা শীতগ্রীষ্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন না। তিনি বলিতেন—কে বলে জগৎ আছে। জগৎ ছিল না, থাক্‌বেনা—এবং নেইও! শেষে গেরুয়ায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। তিনি বলিতেন এদেশে গেরুয়া স্বাধীনতার চিহ্ন নয়, গোলামেরাও আজকাল গেরুয়া পরিতেছে। বশিষ্ঠাশ্রমে নামিয়া তিনি গেরুয়া ত্যাগ করেন, ও ধূসর রঙের পট্ট, কাল পাগ্‌ড়ী, পাজামা ও কুর্ত্তা ও ইমাম্ পরিতেন। লোকদের বলিতেন দেখ, রামকে কেমন মৌলবী দেখাইতেছে। তখন তিনি হাততালি দিয়া গান গাইতেন এবং বৈষ্ণবদের মত নাচিতেন ও আর পড়াশুনা করিতে পারিতেন না। যিনি চিরপ্রফুল্ল ও হাস্যময় থাকিতেন, তিনি নীরব হইলেন ও মৌন থাকিতেন। শিষ্য স্বামী নারায়ণের সহিত মাঝে কথা কাটাকাটি হওয়াতে তিনি তাহাকে পৃথক থাকিতে আদেশ করিলেন। এই বিষাদ ক্রমে খুব বাড়িতে লাগিল ও শেষে দেওয়ালীর দিন গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এমারসন্ যেমন বলেন, প্রকৃত শক্তিশালী মহাপুরুষদের একটী চিন্তা বেশী প্রবল। একটা চিন্তা স্রোতের ভিতর দিয়া তাহাদের সমস্ত শক্তি প্রবাহিত হয়। স্বামী রামতীর্থের সমস্ত বক্তৃতা, প্রবন্ধ ও চিঠির মধ্যে একটী চিন্তাই প্রবল ছিল—তাহা এই বেদান্তের অদ্বৈতভাব। যাহা কিছু বলিতেন, লিখিতেন বা করিতেন ঐ একচিন্তাই কেন্দ্রস্থ ছিল। জনৈক শিষ্যা সূর্য্যানন্দ (মিসেস্ ওয়েলম্যান্) কে তিনি কলিকাতার কালীঘাটের কালীও পত্রিকার সম্পাদকের সহিত দেখা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমেরিকার দেনভার, চিকাগো, মিনিয়া পলিশ সহরে তিনি কয়েকটী বেদান্ত সোসাইটী স্থাপন করিয়াছিলেন ও বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে গরীব হিন্দু ছেলেদের জন্য স্কলারশিপ, যোগার করিয়াছিলেন। তিনি বহু সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন কিন্তু কোন আশ্রম বা মিশন স্থাপন করেন নাই। তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ও কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার শিষ্যদের কেহ কেহ আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন।

গুরু নানক বলিতেন—সিমিরিন (ব্রহ্ম ধ্যান) ই জীবন। তদনুযায়ী স্বামী রামতীর্থ বলিতেন —ওঁ জপ ও সর্ব্বদা অদ্বৈতানুভূতির চেষ্টা ও আনন্দে অবস্থানেই প্রকৃতই জীবন; দেহজ্ঞান দূর হইলেই ঈশ্বর জ্ঞান উদিত হয়। দেহই আমাদের জগতের সহিত আবদ্ধ রাখিয়াছে। বর্ত্তমান পঞ্জাবের স্রষ্টা গুরু গোবিন্দ সিংহ বলিতেন—প্রেমই জীবন; অন্য কিছুই নহে। স্বামিজী তেমনি প্রেমের দ্বারা সকলের সহিত ঐক্যানুভব করিতে বলিতেন ও নিজে অভ্যাস করিতেন।

তিনি একটি সুন্দর গল্প বলিতেন।—এক ফকিরের একখানি কম্বল ছিল, সেটী এক চোর চুরি করিয়া লয়। থানায় গিয়া ফকির তাহার অপহৃত দ্রব্যাদির একটী দীর্ঘ তালিকা দেন। তিনি বলিলেন, আমার লেপ, গদি, ছাতা, পাজামা কোট প্রভৃতি সবই অপহৃত। চোর ইহা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া আসিয়া কম্বলটী পুলিশের সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া বলে, একটা ছেড়া কম্বলের জন্য সাধু জগতের সব কিছু মিথ্যা বলিয়াছে। ফকির কম্বলটী পাইয়া চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় পুলিশ তাহাকে মিথ্যা বলার জন্য ভৎসনা করে; তখন ফকির বলিল আমি সত্যই বলিয়াছি, এক কম্বলই আমার নিকট লেপ, বালিশ, ছাতা প্রভৃতির মত ছিল—এতগুলি কাজে ব্যবহার করিতাম। স্বামী রামতীর্থ বলিতেন—এইরূপ সাধুর নিকট ঈশ্বরই সব।

তিনি একজন প্রেমিক সাধক ছিলেন ও ফার্সি এবং উর্দ্দু গজল গাহিতে ভালবাসিতেন। 'যার জন্য দশদিক আমি ঘুরে বেড়াই তিনি আমার চোখের মধ্যেই আছেন'—এই গজলটী গাইতেন, এটী উপনিষদের মধ্যেও আছে। তিনি পৃথিবীর সর্ব্ব দেশের সাধু, কবি ও ভক্তদের বাণী পাঠ করিতেন। বিশেষতঃ বুল্লাসাহ, শামস্ তাব্রেজ, মৌলানা জলালউদ্দিন রুমী, ইমারসন্, থোরো, গেটে, হেগেল, স্পিনোজা, কান্ট্, ডারউইন, হেকেল প্রভৃতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। যে সকল সংবাক্যগুলি অতিশয় ভালবাসিতেন ও সর্ব্বদা বলিতেন বা লিখিতেন তাহার কিছু নিম্নে দেওয়া হইল:—

"হে প্রেমিক যার জন্য তুমি বন জঙ্গলে ঘুরিয়া মর, সে তোমার অন্তরে।—শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া বুকে হাত দিয়া কাঁদে জানে না যে সেই আমি—প্রভু তুমি প্রেমিকারূপে, ফুল, ও মৌমাছিরূপে আছ।—এ্যাণ্টনি প্রেমে সুখ খুজিয়াছিল, ব্রুটাস্ যশে, সিজার রাজত্বে, কিন্তু প্রথম নৈরাশ্য, দ্বিতীয় নিন্দা ও তৃতীয় ব্যক্তি অকৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, কিন্তু সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।—তাহারা

লৈলাকে বধ করিল কিন্তু রক্তপাত হইল তাহার প্রেমিকের, এমনি করিয়াই প্রেমে তাহাতে তদাকার কারিত হইতে হয়—জলবিন্দু রোদন করিয়া বলিল, আমরা সমুদ্র হইতে পৃথক—কিন্তু সমুদ্র হাসিয়া উত্তর দিলেন আমরা সবই জল—মলয় আসিয়া কুসুমে আঘাত করিল—কিন্তু ইহাতে মলয়ের চোখে জল আসিল—যিনি এই নশ্বর জীবন ত্যাগ করিবেন তিনি অমরত্ব লাভ করিবেন ও যিনি উহা ত্যাগ করিবেন না তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী—আমি চিকিৎসকের নিকট গিয়া আমার অসুখ জানাইলাম, তিনি বলিলেন তোমার মুখ বন্ধ করিয়া তোমার প্রেমাস্পদের নাম কর ইহাই ঔষধ, নিজেকে আহার কর, ইহাই পথ্য ও ইহ-পরকালের আশা ত্যাগই তোমার নিবৃত্তি, ইহা ভবরোগের চিকিৎসা—বাসনা ত্যাগই ত্যাগ, আসক্তি ত্যাগই পবিত্রতা—হিন্দুদের বেদ-বেদান্ত দর্শন সমস্তই এই এক ওঁকারের ব্যাখ্যা মাত্র।—যখনই অহং নাশ হয় তখন দৈবানুপ্রেরণা অবতরণ করে—প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ, উহা কামশূন্য হইলেই দৈবানুভূতিতে পরিণত হয়—জ্ঞানীর নিকট সমস্ত জগৎ অতিসুন্দর, ত্যজ্য, গ্রাহ্য কিছু নাই—চির-শান্তি অন্বেষণই সর্ব্বধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, কেবলমাত্র স্থানকালপাত্রানুযায়ী পথ বিভিন্ন— বাসনা দ্বারাই অখণ্ড আত্মা খণ্ডিত হয়, জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমাদের পূর্ণ হইতে হইবে—মহাপুরুষদের শক্তি ও বাণী তাহার শিষ্যদের নিকট অতি অল্পই থাকে আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি সেই সমস্ত ধারণ করে ও প্রাণীর নিকট প্রদান করে—মৃত্যু প্রশ্ন করে না তোমার কি আছে কিন্তু তুমি কি হইয়াছ—জীবনের প্রশ্নও তাই—সর্ব্বদাই সর্ব্বাবস্থায় আনন্দ ও শান্তি ও প্রেমে পূর্ণ থাকাই সমস্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য॥"—ইত্যাদি।

পুনার ভি, জি, যোশী প্রভৃতির অনুরোধে তিনি আমেরিকায় ভারতবাসীদের জন্য কাজ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতে আসিয়াও শেষদিন পর্য্যন্ত সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে তিনি বহু প্রবন্ধ লেখা ও বক্তৃতা দিয়াছেন। কোনপ্রকার বিদ্রোহ প্রভৃতি দ্বারা তিনি ভারত স্বাধীন করিতে আদেশ দেন নাই—কেবল আত্মানুভূতি-বেদান্ত দ্বারাই ভারত জাগ্রত হইবে বলিতেন।

তিনি বলিতেন ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য বহু বহু প্রেমে আত্মপ্রসার—যে ভালবাসার পরিবার-বর্গের সহিত আত্মানুভূতি হয়—তাহা স্বদেশে বিস্তার করিলে দেশপ্রেম ও তাহার প্রসার করিলে সমস্ত জগৎ ছরাইয়া পড়িবে। বেদান্ত ব্যতীত দেশপ্রেম বা বিশ্বপ্রেম হয় না অর্থাৎ দেশাত্ম বুদ্ধি ও বিশ্বাত্মবুদ্ধিই পর্য্যায়ক্রমে দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম। তিনি বলিতেন—"সমস্ত ভারতভূমি আমার শরীর, কুমারিকা আমার পদদ্বয়, হিমালয় আমার শির, গঙ্গা, সিন্দু ও ব্রহ্মপুত্র আমার জটা, বিন্ধ্য কটিদেশ, করোমণ্ডল ও মালাবার পর্ব্বতশ্রেণী আমার বাহুদ্বয়, যখন আমি চলি তখন আমি অনুভব করি যেন ভারত চল্‌ছে, যখন কথা বল্‌ছি তখন ভারত কথা বল্‌ছে, যখন নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলি তখন যেন ভারত নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেল্‌ছে, আমি ভারত, আমি বিশ্ব, আমি শঙ্কর, আমি শিব, আমি বুদ্ধ, আমি যিশু, আমি মহম্মদ। শৈব যেন শিব, বৈষ্ণব বিষ্ণু, বৌদ্ধ বুদ্ধ, খ্রীষ্টান খৃষ্ট, মুসলমান মহম্মদকে ইষ্টজ্ঞানে পূজা করে, আমিও তেমনি ভারত মাতাকে পূজা করি—শৈবরূপে, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ খ্রীষ্টানরূপে, মুসলমানরূপে; কারণ ভারতমাতা আমার ইষ্টদেব, আমার শালগ্রাম, আমার কালী। দেশপ্রেম যেন ঈশ্বর প্রেমে পরিণত হয় তেমনি ঈশ্বরবুদ্ধি ব্যতীত দেশপ্রেম হয় না। প্রত্যেক ভারতবাসীকে ভারতমাতা রূপে আমাদের সেবা করিতে ও ভালবাসিতে হইবে। প্রত্যেক

ধর্ম্ম ভারতের কোন অংশকে অর্থাৎ কোন নদী, কোন বৃক্ষ বা পশু বা কোন সহরকে পবিত্রতীর্থ মনে করি—কিন্তু আমি সমগ্র ভারতকে পূতভীর্থভূমি মনে করি ও সকলের করা উচিত। কোন জাপানী যুবক সৈন্যদলে যদি বৃদ্ধ মাতার সেবার ব্যপদেশে যোগদিতে না চায়, তবে তাহার মাতা আত্মহত্যা করে আমাদেরও তেমনি সমস্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া দেশসেবায় জীবন নিয়োগ করিতে হইবে)।

আমেরিকায় তিনি বিবাহিত জীবনের খুব প্রশংসা করিতেন, কিন্তু ভারতে আসিয়া আবার কৌমার্য্য ব্রতের খুব প্রশংসা করিতেন। তিনি দেশের সমস্যাকে পূর্ণভাবে সমাধান না করিয়া খণ্ড খণ্ড রূপে সে সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "মানুষ ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা অনুভব করিতে পারিবে না, যদি সে তাহার সমগ্রজাতির সহিত নিজের ঐক্য অনুভব করিতে না পারে।—যজ্ঞে বৃথা ঘি না ঢালিয়া অনশনক্লিষ্ট দরিদ্র ভারতবাসীদের তাহা দাও—ভাবী তরুণ সমাজ সংস্কারক, তুমি জাতির প্রাচীন মহিমা ও প্রথার কথনও নিন্দা করিও না,তাহাতে জাতির শক্তি হ্রাস হয়—যখন সমস্ত জাতির সহিত ঐক্য অনুভব করিবে তখন তুমি দেশের কল্যাণকর যা কিছু চিন্তা করিবে দেশে তাহাই প্রতিফলিত হইবে—আদেশ বা বাধ্যতা নয়, প্রেম ও সেবা উন্নতির প্রধান ক্ষেত্র—ক্ষুদ্রদৃষ্টি সম্পন্ন বড়লোক দ্বারা জাতি বড় হয় না—উচ্চ দৃষ্টিবান্ জনসাধারণ দ্বারাই জাতি বড় হয়—শির তোমার যত উচ্চে হউক পাদযুগল যেন মাটিতে সকলের সঙ্গে থাকে—তবেই দেশ-সেবা সম্ভব—ইউরোপ আমেরিকা ঈশার ব্যক্তিত্বে বড় হয় নাই, অজ্ঞাতসারে বেদান্তকে কর্ম্মজীবনে পরিণত করিয়াছে; কর্ম্মজীবনে বেদান্তের অভাব ভারতের অবনতির প্রধান কারণ—সমালোচনা নয়, সহানুভূতিই সেবার প্রথম সোপান—যাদের পতিত তোমরা বলছ যথার্থতঃ তাহারা উন্নত হইতে পারে নাই এই মাত্র আর কিছু নহে—সত্য-জ্ঞানই শক্তি ও বিনয়ের উৎস, দেহ-জ্ঞান (তা ব্রাহ্মণ-শরীর-জ্ঞান বা সন্ন্যাসী-শরীর-জ্ঞান হউক) তোমাকে চর্ম্মকার করিয়া ফেলে—জড়বাদ মূলক সভ্যতার প্রধান দোষ এই যে, উহা নারীজাতিকে যথার্থ শ্রদ্ধা ও সম্মান না দিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের জিনিষপত্রের মত অধিকারে আনে—ইত্যাদি।

দার্জ্জিলিং পাহাড়ে যখন তিনি বাস করিতেন তখন একদিন তিনি গভীর সমাধি মগ্ন হন। উত্থান কালে মনে সংকল্প উঠিল—"ভারত স্বাধীন হউক।" "রাম সহস্র সহস্র লোকের ভিতর দিয়া কাজ করিয়া দেশ স্বাধীন করিবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু ভারতে ও বিদেশে এক সর্ব্বোচ্চ আদর্শ চিরকুমার সন্ন্যাস বা ত্যাগমাত্রই প্রচার করিয়াছেন। সংসার ও সন্ন্যাসের সহিত, ত্যাগ ও ভোগের সহিত আপোশ করেন নাই। Spiriutal regeneration বা আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে অন্য সমস্ত সমস্যার সমাধান আপনা হইতেই হইবে বলিতেন। তাঁহার মত কেহই জাতীয় জীবন এমন অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিতে পারেন নাই। একমাত্র তাঁহারই ভারতেতিহাসের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের এক অখণ্ড জ্ঞান ছিল। তাহার পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক অন্য সকলে তাঁহারই অপভ্রংশানুকরণ করিয়াছেন। রামতীর্থের Practical বেদান্ত বিবেকানন্দের বেদান্ত এক নহে। সি, এফ, এণ্ড্রুজ বলেন—রামতীর্থের বক্তৃতাবলী ও কবিতাবলীতে বেশী ভাবযুক্তময় কবীত্বে পরিপূর্ণ। এককথায় স্বামী রামতীর্থের বাণী স্বামী বিবেকানন্দের বাণী জনপ্রিয় সংস্করণ মনে হয়।

স্বামী রামতীর্থ একজন ভাবুক কবি ছিলেন। তিনি ওয়াল্ট্ হুইটম্যানের ছন্দে উর্দ্দু ও ইংরাজিতে অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটী ইংরাজি কবিতা আমেরিকায় গীত হইয়াছিল। লাহোরে একবার কলিকব্যথায় খুব কষ্ট পাইতেছিলেন, তখন পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ উর্দ্দু কবি একবাল তাঁহাকে দেখিতে যান। এত অসুখ সত্ত্বেও সর্ব্বদা হাসিতে ছিলেন—যেন কোন কষ্ট হইতেছে না; বন্ধু একবালকে বলিলেন দেখ রামের একটা শরীর ভুগিলে কি হইবে কোটী শরীরে সে সুস্থ আছে—অসুখ শরীরে আনন্দ মনের। মৃত্যুর পূর্ব্বে মাসাধিক তিনি হরিদ্বারে খুব কষ্ট পাইয়াছিলেন, তখন বিমাতা, স্ত্রী ও পুত্র তাঁহাকে দেখিতে আসেন। তাহার কিছু পরে তাঁহার শরীর ত্যাগ হয়। হরি ওম তৎসৎ।

নারী-স্বাতন্ত্র্য

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যতীর্থ

স্বাতন্ত্র্যের কথা উঠিলেই আমরা প্রধানতঃ মনে করি আর্থিক স্বাতন্ত্র্য। আত্মার ও মনের স্বাতন্ত্র্যকে কার্য্যকর করিয়া তুলিতে হইলেও লাভ করিতে হইবে শরীর যাত্রা নির্ব্বাহের ও প্রাণ ধারণের স্বাধীনতা। তাই জনৈক স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী বলিয়াছিলেন—'How can be couarageous when you have not a penny and are incabable of earning one?'—অর্থাৎ হাতে যখন একটা পয়সা নাই, তখন জোর আসিবে কোথা হইতে? সুতরাং আর্থিক দুর্গতির পরিবর্ত্তন না হইলে স্বাতন্ত্র্য বিষয়ক সমস্যার সমাধান দুরূহ। য়ুরোপে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 'Married woman's proparty Act' পাশ হওয়ার পর হইতে ইংলণ্ডে নারীদিগের সামাজিক জীবনে নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

কিন্তু ভারতে নারীজাতির অবস্থা অন্যরূপ, যদিও বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য অনুকরণে স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন চলিয়াছে। আমাদের দেশে পুরুষের কর্ত্তব্য নারীর পোষণ, আর নারীর কর্ত্তব্য পুরুষের সেবা। তাই আর্থিক ব্যাপারে ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণ এমন ভাবে আটঘাট বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহাতে এই ভাবটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে—'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি'। কিন্তু অর্থব্যাপারে নারীর যে একেবারেই স্বাতন্ত্র্য নাই তাহাও নহে। কাত্যায়ন স্ত্রীধন সম্বন্ধে এই নিয়মটী করিয়াছেন,

প্রাপ্তং শিল্পেন যদ্বিত্তং প্রীত্যাচৈব যদন্যতঃ।
ভর্ত্তুঃ সাম্যং ভবেত্তত্র শেষন্তু স্ত্রীধনং স্মৃতম্॥

অর্থাৎ স্ত্রী চেষ্টা করিয়া নিজে যাহা উপায় করুক, অথবা অপরে তাহাকে যাহা দান করুক, সে সমস্তে স্বামীরও অধিকার আছে, তবে স্ত্রীর নিজস্ব ধন বলিতে যদি কিছু বুঝায়, তবে তাহা হইতেছে ঐ শেষোক্ত দানের ধন।

আমাদের দেশের অর্থার্জ্জন বিষয়ে নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের কতকটা স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে, কিন্তু ভদ্র ও শিক্ষিত ঘরের মেয়েদের তাহা নাই। যদি নিম্নশ্রেণীর মেয়েরা অর্থোপার্জ্জনে কতকটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াও মাতৃত্ব বজায় রাখিতে পারে তবে ভদ্র ও শিক্ষিত ঘরের মেয়েরা তাহা পারিবে না কেন? মেয়েরাতো মাতৃত্বের ভার জীবনের সর্ব্বক্ষণেই বহন করে না—তাহাদের অবসরও তো যথেষ্ট রহিয়াছে। তাহারা বসিয়া বসিয়া গালগল্প করিয়া শুইয়া গড়াইয়া বাজে কাজে সময় না কাটাইয়া সেই অবসর সময়ের সদ্‌ব্যবহার করে না কেন?

'কেন'র উত্তর বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রাচীনা ও নবীনা নামক প্রবন্ধে দিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রধান কারণ আলস্য। আলস্য বশতই আজকাল নারীদিগের শরীর বলশূন্য ও রোগের আকর হইয়াছে এবং তজ্জন্যই সংসার বিশৃঙ্খলাযুক্ত এবং অশান্তিময় হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গৃহিণী যদি শয্যাশায়ী থাকে তবে অর্থের ধ্বংস হয়, শিশুদিগের অযত্ন হয়। কিন্তু আলস্যের মূল কারণ হইতেছে বিলাসপ্রিয়তা। প্রাচীনাগণ নিতান্ত ধনী না হইলে জল তুলিতেন, বাসন মাজিতেন, উঠান ঝাঁট দিতেন, ঘরে লেপ দিতেন, রন্ধন করিতেন, প্রয়োজন মত ঢেঁকশালেও যাইতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে মেয়েরা অন্ততঃ সহরের মেয়েরা শ্রমসাধ্য কার্য্য করে না। অধিকাংশ সময়ই তাহারা শয্যায় গড়াইয়া বেশের পারিপাট্য করিয়া, নভেল পড়িয়া, গান গাহিয়া, সখের কাজ ও সন্তান প্রসব করিয়াই অতিবাহিত করে। এতে দাড়ায় অনর্থক অর্থব্যয়, পাচক ও দাসদাসীর উপর কার্য্যভার অর্পণের ফলে দ্রব্যসামগ্রীর অপব্যবহার, ভাল রন্ধনের অভাবে তৃপ্তিকর খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা, অতিথি অভ্যাগতের যথাযোগ্য সম্মানের হ্রাস, পরিবারের মধ্যে মনোমালিন্য এবং গৃহে অশান্তি। মোটের উপর সংসার হয় কণ্টকময়। সুতরাং রোগের মূল দূর করিতে না পারিলে কেবল মাত্র ঔষধ লেপনে ফল হইবে কেন? যদি মেয়েরা আলস্য বশত নড়িয়া বসিতেই নারাজ বা অক্ষম হয়, তবে তাহাদিগের অর্থোপার্জ্জন হইবে কি প্রকারে? অতএব নারী-স্বাতন্ত্র্যের যাহারা পক্ষপাতী তাহাদের এই দিক দিয়াও ভাবিয়া দেখা উচিত। আলস্য ও বিলাসিতা আমাদের মজ্জাগত ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়াই আমরা সর্ব্বব্যাপারে কোণাঠাশা হইয়া দাঁড়াইয়াছি।

পুরুষের কথা ছাড়িয়া দিলেও ধর্ম্মবিষয়েও মেয়েদের স্বেচ্ছাচারিতা পরিলক্ষিত হইতেছে। পাতিব্রত্য যতটা প্রাচীনাগণের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ ছিল, এখন যেন তাহার ততটা দৃঢ়তা নব্য নারীদিগের মধ্যে নাই। পূর্ব্বে যাহা কিছু করা হইত তাহা অনেকটা ধর্ম্মের ভয়ে করা হইত; কিন্তু এক্ষণে যাহা কিছু করা হয়, তাহা লোকনিন্দার ভয়ে। বর্ত্তমানে দানধ্যানে, পরিচর্য্যা, অতিথি সৎকার প্রভৃতি কার্য্যে ধর্ম্মভাবের অভাব হেতু সজীবতার ভাব পরিলক্ষিত হয় না। তাহার কারণ ধর্ম্মের বন্ধন যত দৃঢ় লোক নিন্দার ভয় তত দৃঢ় হয় না। এই ধর্ম্মভাব শৈথিল্যের মূলে রহিয়াছে আধুনিক অসম্পূর্ণ শিক্ষা। এই শিক্ষার ফলে তাহাদের বিশ্বাস জন্মিতেছে তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্মের শাসন অমূলক। সুতরাং অসম্পূর্ণ শিক্ষা, তৎফলে তাহাদের ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাসের শিথিলতা এবং তন্নিবন্ধন বিলাসিতা, আলস্য প্রভৃতি দুর্নীতি হেতু শারীরিক ব্যাধিসমূহ সমাজকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছে বলিয়াই বর্ত্তমানে অর্থের অভাব অনুভূতি সত্ত্বেও অর্থোপার্জ্জনে নারীজাতি আগ্রহশীলা নহে বরং ব্যয়বাহুল্যে তৎপর। নচেৎ চেষ্টা থাকিলে গৃহস্থধর্ম্মোচিত কার্য্য

করিয়াও ব্যয় সঙ্কোচ পূর্ব্বক বা অবসর ক্রমে গৃহশিল্পের সাহায্যে নারীগণ সংসারের অর্থাভাব কতকটা দূর করিতে পারে কিন্তু সেই দিকে তাহাদের আগ্রহ কোথায়? সুতরাং আজকার আর্থিক ব্যাপারে নারীজাতির বিমুখতা শাস্ত্র বা ধর্ম্মের বাধার জন্য নহে,—ইহার মূলে রহিয়াছে বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষা-ভোগবিলাস ও আলস্য পরতন্ত্রতা।

এতৎসম্পর্কে ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে নারীজাতির প্রকৃত উন্নতি কেবলমাত্র আর্থিক স্বাতন্ত্র্যাপেক্ষী নহে; কারণ পহাড়ী অঞ্চলে ও ব্রহ্মদেশে নারীদিগের অর্থার্জ্জনে যথেষ্ট অধিকার থাকিলেও, তথাকার সমাজ খুব সমৃদ্ধ বা উন্নত নহে। সুতরাং আসল কথা হইতেছে মনের মুক্তি, অন্তরাত্মার উদ্বোধন ও তদনুযায়ী শিক্ষাদীক্ষা। এই প্রকারে যখন অন্তরাত্মা জ্ঞানশক্তিতে জাগিয়া উঠিবে, তখনই নারীজাতি নিজেকে স্বকীয় রূপকে চিনিতে ও জানিতে পারিবে এবং তখনই তাহারা প্রকৃত স্বাধীনতা সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হইবে।

প্রতীচ্য ভূখণ্ডে তথাকথিত স্ত্রীস্বাধীনতার ফল যে কিরূপে বিষময় হইয়া পড়িয়াছে তাহা ভারতের ভাবিবার বিষয়। তৎসম্বন্ধে বহুবার আলোচিত হইয়াছে। নারীজাতির এবম্বিধ স্বাতন্ত্র্য প্রিয়তার ফলে বিবাহবিচ্ছেদ নিত্যকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং তৎসঙ্গে বালক বালিকাদিগের অসহায়তা ও লোকের সাংসারিক এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি এতই বাড়িয়া চলিয়াছে যে, মনে হয় ভবিষ্যতে মানুষের অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কাও অমূলক নহে। কয়েকমাস পূর্ব্বে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ভগ্নী মিসেস্ করনিল রুজভেল্ট্ নর্থ আমেরিকান রিভিউ পত্রে লিখিয়াছিলেন —"মোটর, টেলিফোন, এরোপ্লেনের প্রাচুর্য্যে মানসিক উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য, অর্থের অতিরিক্ত গোলামী এবং পুরুষনারীর স্বাতন্ত্র্য-চর্চ্চা—এই কয়টিই বর্ত্তমানে পারিবারিক অশান্তির মুখ্য হেতু। এই উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের ফলে মানুষ খেয়ালের জীব হইয়া উঠিতেছে—চিন্তাকরার পাট উঠিয়া যাইতেছে। গৃহের কথা মনে থাকেনা—তাতো সুখ—গৃহের উপর মায়া ঘুচিতেছে, গৃহের প্রয়োজনীয়তাও কমিতেছে। তার উপর যদি কাহারও প্রচুর অর্থ থাকে তো অপরের কাছে মাথা নত করিবার প্রয়োজনও ঘুচিয়া যায়। যে ক্ষেত্রে পয়সা প্রচুর, পুরুষ ও নারী পরস্পরের বিভিন্ন সামাজিক আহ্বানের সমাদরে মত্ত, সেখানে কাঁহারও প্রতি কাহারও দায়িত্ব থাকে না, সহযোগিতার প্রয়োজন বিলুপ্ত হয়—নিজেদের খেয়াল তৃপ্তি লইয়াই তারা উদ্‌ভ্রান্ত থাকে। এই মনোভাব হইতে যে স্বাতন্ত্র্যের উৎপত্তি, তাহা প্রকাশ করিয়া ধরিতে চায়। স্বার্থপরতায় যদি বাধা লাগে তবে তাহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠে, মায়ামমতার কথা মনে থাকেনা—স্বার্থরক্ষা ও স্বার্থসিদ্ধির বাসনা প্রবল হয়। তখন স্ত্রীবলে—আমার প্রতিভা—সে প্রতিভা কেন গৃহকর্ম্মে চাপাদিয়া রাখিব। আত্মপ্রকাশের এই ঝোক গৃহসুখ, গৃহধর্ম্মপালনের সম্পূর্ণ বিরোধী।"

এতৎপ্রসঙ্গে মিসেস্ রবিন্‌সনের মতটিও উদ্ধৃত করিলাম। তিনি বলেন—একমালী কারবারে অংশীদার বা পার্টনারদের (partners) যেমন পরস্পরে পরস্পরকে মানিয়া চলিতে হয় —খেয়াল বা স্বেচ্ছাচারে কারবার পরিচালিত হয়না,—স্বামী স্ত্রীর partner ship বা অংশীদারত্ব ব্যাপারেও সেই নিয়ম। দুইজনে একযোগে পরামর্শ করিয়া কাজকর্ম্মে সংসার-কারবারটিকে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত করিবে,—ইহাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ এই সহযোগিতার উপর দুইজনের সুখশান্তি নির্ভর করিতেছে। পরস্পরের দোষত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখিয়া মানিয়া

লওয়াতেই partnership বজায় থাকে—নচেৎ তার ধ্বংস অনিবার্য্য। যে বৃত্তি এই সহযোগিতাকে পোষণ করে তাহারই নাম প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা এবং ভালবাসিবার এই বৃত্তির নামই প্রতিভা। খেয়াল তৃপ্তি বা লঘু আনন্দকে জীবনের উদ্দেশ্য করিলে পরিণামে ক্ষোভ ও অনুতাপ সার হয়। সুতরাং স্বামীস্ত্রীর মধ্যে পরস্পরে পরস্পরকে সহিয়া চলিবে,—স্বাতন্ত্র্য বা স্বেচ্ছাচারকে শিরোধার্য্য করিবে না।"

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট্ রুজভেল্ট্ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন—"আমার বয়স তখন দশবৎসর, রুগ্ন ছেলে, বিছানায় শুইয়া বইএর পাতার ছবি দেখিতেছিলাম। পাশে বসিয়া মা ছবি বুঝাইয়া দিতেছিলেন,—বড় ভাল লাগিতেছিল। ঘুম না হওয়ায় মা আমার মুখে মুখ দিয়া সান্ত্বনা দিতেছিলেন। বাবা ও মা দুইজনেই আমাকে লইয়া ব্যস্ত,—কত গল্প বলিতেছিলেন। + + + সে গল্প,—সেই মাবাপের স্নেহ! সেই স্নেহই আমার সকল কষ্ট দূর করিয়া আসিয়াছে। যদি এমন না হইত! যদি রুগ্ন আমায় বিছানায় ফেলিয়া দুই তিনটা নার্শ লাগাইয়া দিয়া মা বাবা বাহিরে যাইতেন—পার্টিতে, থিয়েটারে, সান্ধ্য ভোজ বা রাজনৈতিক 'আলোচনা' সমিতিতে। ভাবিতে গা শিহরিয়া উঠে,—তাহা হইলে আর কি হইত জানি না,—তবে রুজভেল্ট মানুষ হইবার কোন আশা রাখিতেন না।"

ভারতের ঋষিগণ এবংবিধ স্বাতন্ত্র্যের কুফল বুঝিতে পারিয়াই স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিলেও স্বাতন্ত্র্য দেননাই। পুরুষের স্বাধীনতা বাহিরেরদিকে, মেয়েদের স্বাধীনতা অন্তঃপুরে। অথচ পরস্পরে সংসারের কাজে পরস্পরকে সাহায্য করে, আয়ব্যয়ের তালিকা নির্দ্ধারণ করে এবং এই প্রকারে সহযোগিতার ভাবে উভয়ের চিত্ত অভ্যস্ত হয়। সুতরাং পরস্পর পরস্পকে সহিয়া চলিবার দরুণ স্বাতন্ত্র্যের স্থান পুরুষ ও নারীর মধ্যে হইতে পারে না। আবার পুরুষ ও নারীর স্থান ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে থাকাতে তাহাদের স্বাধীনতায়ও বাধা জন্মিতে পারে না। শাস্ত্রকারগণ পুরুষ ও নারীকে এইজন্য সংযত হইয়া চলিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া দিয়াছেন—পুরুষকে জানিবে আগুণ আর নারীকে জানিবে ঘি—দুইটিকে কদাপি অবাধে একত্র হইতে দিবে না। দুইটির অবাধ মেলামিশার ফলে পাশ্চাত্য দেশসমূহে ব্যভিচারের মাত্রা যে কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন। এইজন্যই শাস্ত্রপ্রণেতৃগণ পুরুষ ও নারীকে অবাধ মিলনে প্রশ্রয় দিতে চাহেন নাই। পুরুষের কাজ লোকসমক্ষে নারীর কাজ গোপনে—নীরবে, পুরুষ দিবে কর্ম্ম, নারী দিবে ভালবাসা, পুরুষ যুদ্ধ বিগ্রহ করিবে, নারী সান্ত্বনা বারি লইয়া ফিরিবে। কঠোর বৃত্তি পুরুষত্ব যাহাতে প্রয়োজন, তাহা পুরুষের ধর্ম্ম; কোমলতা, কমনীয়তা নারীর ভূষণ। পুরুষের মস্তিষ্ক, পুরুষের বাহু জীবনের একদিক, আর শরীর হৃদয়, নারীর কোমলহস্ত জীবনের আর একদিক্। পুরুষের বল ও শক্তি এক ধরণের, নারীর শক্তি ও বল আর এক ধরণের। পুরুষের হইতেছে আক্রমণ করিবার বল, আর নারীর হইতেছে সহ্য করিবার ক্ষমতা। পুরুষের শক্তিতে ডাকহাঁক, বাহিরের চটক থাকিতে পারে—মেয়েদের মধ্যে ভরিয়া আছে নীরব সামর্থ্য, অকাতর শ্রম ও অটুট অধ্যবসায়, শালীনতা এবং শোভনতা। প্রত্যেকের স্থান ও কার্য্য পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিদ্বেষ ও রেষারেষির ভাব হইতে পারে না। এই রেষারেষি ও বিদ্বেষের ফলে ও নারীত্বের প্রসারের ফলে পাশ্চাত্য রমণীগণ যতই কর্ম্মস্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছে, তাহাদের মাতৃত্ব ততই

ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। ফলে নারীজাতির উপর ঘোর নির্য্যাতনই বাড়িতেছে এবং তাহার ফলে জীবনে তাহারা শান্তি পাইতেছে না,—পুরুষদিগকেও শান্তি দানে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে। কাজেই পুরুষ ও নারী—উভয়েরই জীবন মরুময় হইয়া উঠিতেছে।

আর্থিক স্বাতন্ত্র্যই যদি কাম্য হয়, অর্থই যদি জীবনের একমাত্র উপভোগ্য হয়, তবে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, সমাজে সমাজে স্বামীস্ত্রীতে পিতাপুত্রে বিরোধ উপস্থিত হইবেই। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে সমাজ গঠন করিয়া যাঁহারা আমাদের দেশের উন্নতির আশা করিতেছেন, তাঁহারা আমাদের দেশের তিলপ্রমাণ দোষকে তাল প্রমাণ দেখাইবার পূর্ব্বে যেন পাশ্চাত্য সমাজের পর্ব্বতাকার দৃষ্টি-অবরোধকারী দোষগুলি দেখিবার প্রয়াস পান।

ভ্রান্তি বিনোদন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাজবৈদ্য—শ্রীযুক্ত শক্তিচরণ রায় বিশারদ

২৫। **শাস্ত্র বিশ্বাসযোগ্য, বিজ্ঞান বা বিচার নহে।** ১। বিশ্বাস যে কিরূপ ভ্রান্ত তাহা পুর্ব্বেই দেখান হইয়াছে (পঃ৯ দেখ)। বিজ্ঞান শুধু ভুল নহে। উহা ভুল না হইয়া ঠিক হইবারই উপায় নাই। শাস্ত্রে বলে—লক্ষণ হইতে মান ও মান হইতে মেয় সিদ্ধি হয়। (১) অর্থাৎ কোন জিনিষ প্রমাণ করিতে হইলে যে সব জিনিষ হইতে তাহা প্রমাণ করা যাইবে প্রথমেই সেই জিনিষগুলির নিশ্চয় করিতে হইবে। তাহার পর সেই জিনিষগুলি হইতে প্রমাণের সাহায্যে যে জিনিষের প্রমাণ চাই তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। যেমন পরার্থ কি ইহা না বলিয়াই পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন বিজ্ঞান আরম্ভ হইয়াছে। ইহাকেই বলে লক্ষণাভাব দোষ কাযেই রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা ভুল হইতেই হইবে। সেইরূপ গণিতেও লক্ষণাভাব দোষ সর্ব্বত্রই দেখা যায়। কাজেই গণিতও ভুল। লক্ষণাভাব দোষ হইলেই প্রমাণ ভুল হইতেই হইবে। পদার্থ কি তাহার ঠিক নাই পদার্থের বিদ্যা কেমন করিয়া হয়? মানুষ কি তাহার ঠিক নাই, সকল মানুষ মরে কিনা কেমন করিয়া বিচার হইতে পারে? ইত্যাদি। বিজ্ঞানেরই যখন এই দশা তখন সামান্য বিচারের কথা বলিবারই প্রয়োজন নাই।

২। শাস্ত্র যাহা লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছেন বিজ্ঞান তাহা প্রথমে হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছে। বহুকাল পরে আবার সেই কথাই সত্য বলিয়া বিজ্ঞানকে মানিতে হইয়াছে। কথায়

(১) মানাধীনা মেয়সিদ্ধিশ্চ লক্ষণাৎ।

[মান—প্রমাণ। মেয়—যাহা প্রমাণ করিতে হইবে। লক্ষণ—Definition—যাহা দ্বারা জিনিষটী ঠিক চেনা যায়, অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় হয়। Nothing can be proved if the proof is not based on definition]

বলে নির্ব্বোধের নাই প্রমাদের ভয় (১)। কাযেই সত্যকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার জন্ত অন্ধ বিজ্ঞানকে আর ভাবিতে হয় না। কিন্তু সত্য বড়ই ছ্যাঁচড়া কাহারও খাতির রাখে না। অন্ধ বিজ্ঞানের সাধের নিশার স্বপন ভাঙ্গিতে সত্যের একটুও কষ্ট হয় না।

৩। যাহা বরাবর হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে তাহা এত কাল পরে মানিতে বেহায়া বিজ্ঞানের এতটুকু লজ্জা নাই। যদি বল ভুল স্বীকার করায় দোষ কি? বিজ্ঞান ত ভুল স্বীকার করে না। যাহা বরাবর হাসিয়া উড়াইয়াছে তাহাই আবার পরে অম্লান বদনে বলে। ঘাড় হেঁটও নাই, ভুল স্বীকার করাও নাই। যেন দুইটাই সত্য।

৪। যে যে বিষয়ে শাস্ত্রের কথাই বিজ্ঞানকে শেষে মানিতে হইয়াছে তাহা নানা স্থানে বলা হইয়াছে। সুবিধার জন্ত এখানে একত্র করিয়া দেওয়া গেল।

১। মায়া বিপরীত ও বিপরীত হইতেই জগৎ সৃষ্ট ২। বিশ্বাস ভিন্ন জ্ঞান হয় না। ৩। ভগবানের কৃপা ভিন্ন জ্ঞান হয় না। সকলেই স্বীকার করেন বিজ্ঞানের সকল বড় বড় আবিষ্কারই অবিচারিত (by intuition) অর্থাৎ আপনা হইতেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বিচার করিয়া বাহির করা হয় নাই। ৪। মনুষ্য কোন জিনিষই ঠিক জানিতে পারে না ৫। বুদ্ধি ভ্রান্ত ও সন্দেহ থাকিয়াই যায় (পঃ ২২।২)

৬। সূক্ষ্মই আসল, স্থূল বা প্রত্যক্ষ তাহার কাছে কিছুই নহে। (পঃ দেখ) ৭। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নিত্য ও অনিত্য (পঃ ১৬।৩—৫ দেখ) ৯। দেশ কাল এবং অবস্থার উপর বস্তুর গুণ নির্ভর করে। ১০। পদার্থ দেখিতে ভিন্ন প্রকৃতই এক। ১১। বীজাণু উদ্ভিদ্। কাযেই মানুষ পশু পক্ষী কীট ও জড় বস্তু সবই এক (পঃ ২১'৮) ১২। গঙ্গার জল পবিত্র ১৩। পৃথিবীর আয়ু লক্ষ কোটি বৎসর ১৪। তেজ হইতে জগৎ সৃষ্ট। ১৫। মন হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। প্রায় সকল বৈজ্ঞানিকগণই এই কথা মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন (ক) ১৬। পুষ্পক রথ। ১৭। জটায়ু রাবণের রথ ভাঙ্গা। ১৮। উদর রোগে লবণ ১৯। ক্রমোন্নতি (Evolution) থাকিলেই ক্রমাবনতি থাকিবেই। অহল্যা পাষাণী। মণিগ্রীব ও নলকুবর যমলার্জ্জুন ইত্যাদি।

৫। অতএব দেখা যাইতেছে সকল গূঢ় বিষয়ে শাস্ত্রের কথাই ঠিক কাযেই বিজ্ঞান ও বিচার অপেক্ষা শাস্ত্র যে লক্ষ গুণ বিশ্বাসযোগ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানেরই যখন এই দশা তখন অন্ত মনুষ্যের কথা ত উঠিতেই পারে না। কাযেই মনুষ্য বুদ্ধিতে শাস্ত্রের উপর টেক্কা মারিতে যাওয়ার ন্যায় বাঁদরামি আর কিছুই নাই।

৬। বিজ্ঞান শত সহস্র চেষ্টাতেও যে শাস্ত্রের নাগাল আজও পায় নাই, যে শাস্ত্রের বিরুদ্ধে বাঁদরামি করিয়া বিজ্ঞানকে পদে পদে ঘাড় হেঁট করিতে হইয়াছে। সেই অপরূপ সত্যকে গেঁজেলী বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টাকে গেঁজেলি বুদ্ধির গেঁজেলি ধোঁয়া ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। গেঁজেলি বুদ্ধিতে যাহার নাগাল পাওয়া যায় না তাহাই গেঁজেলি বলিয়া ঠিক করাই গেঁজেলি বুদ্ধির চরম পরিচয়। কথায় বলে কত হাতী গেল রসাতল মশা বলে কত জল। যেখানে

---

(১) কুতোহবোধস্য প্রমাদভীতিঃ।

(ক) Jean's Mysterious Universe (p141)

বিজ্ঞানই থই পায়না সেখানে সামান্য বুদ্ধিতে টেক্কা মারিতে যাওয়া গেঁজেলি ধৃষ্টতার চূড়ান্ত। শাস্ত্র বুঝিতে গেলে একটী বিশেষ জ্ঞানের দরকার যাহা প্রায় কোন মানুষেরই হয় না। রিসেও [Richet] এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। প্লাঙ্ককে মানিতে হইয়াছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান দ্বারা সত্য বুঝা যায় না। বিশ্বাস চাই।

৭। যাহারা অলীক হিন্দু অর্থাৎ যে হতভাগ্যেরা ভাগ্যক্রমে হিন্দুকুলে জন্মলাভ করিয়াও হিন্দু হইবার ভাগ্য লাভ করে নাই তাহারা নিজের দুষ্প্রবৃত্তি পোষণ করিবার জন্য শাস্ত্রের ছল ধরিতে ব্যস্ত। কেন না শাস্ত্র দোষযুক্ত দেখাইতে পারিলেই শাস্ত্রের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায়! এই অলীক হিন্দুরা শাস্ত্রের ছল ধরিবার জন্য কতই না এলোপাথাড়ি প্রশ্ন করে। কিন্তু অন্য কোনও বিষয়ে তাহারা একটীও প্রশ্ন করে না। গণিত শাস্ত্রে কতই ভুল আছে। গণিতের ভুল বিষয়ে প্রশ্ন করা দূরে থাকুক অলীক হিন্দু সে কথা কাণে যাইবামাত্র কাণে আঙ্গুল দিয়া সে কথায় শিহরিয়া উঠে।

২৬। শাস্ত্র মানায় অশেষ লাভ—[১] অহঙ্কার হইতেই মনুষ্যের সংসারবন্ধন। মুক্তি মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব অহঙ্কার ত্যাগই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, কাযেই ক্ষতি করিয়াও অহঙ্কার ত্যাগকরা যারপর নাই ভাল ও লাভ করিয়াও অহঙ্কার রাখা যারপর নাই মন্দ।

২। অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া বিশ্বাস করিলে যে কি মহালাভ হয় তাহা মেছুনির কথায় স্পষ্ট বুঝা যায়। এক জুয়াচোর ব্রাহ্মণ তাহাকে ঠকাইয়া চিরকাল ভাল ভাল মাছ খাবার জন্য তাহাকে বলে "মেছুনি তুই মন্ত্র লইবি?" মেছুনি বলে "আমি ছোট জাত আমায় আর কে মন্ত্র দিবে?" ব্রাহ্মণ বলে 'আমি দিব" ও জুয়াচুরি করিয়া বলে "আয় ছাগলি পাতা খা" এই মন্ত্র জপ করিবি। অল্প দিনেই মেছুনি এই জুয়াচুরি মন্ত্রেই সিদ্ধিলাভ করিল। ঠাকুর ছাগলী হইয়া পাতা খাইতে আরম্ভ করিলেন। বহুদিন পরে ব্রাহ্মণ মনে মনে করিল—মেছুনি বরাবরই উহার শ্রেষ্ঠ মাছটী তাহাকে দিয়া যায়, এখনও সে তাহার জুয়াচুরি ধরিতে পারিল না কেন? তাহার পর যখন সে নিজে দেখিল ঠাকুর সত্য সত্যই ছাগলী হইয়া পাতা খাইতেছেন সে তখন মেছুনীর পায়ে পড়িয়া আপন বদমায়েসি স্বীকার করিল ও শেষে নিজেও তরিয়া গেল। অহঙ্কার ছাড়িলে নিজেত তরিতেই পারে আর অন্যকেও তরাইতে পারে।

৩। লাভ করিয়া অহঙ্কার ছাড়া যায় না, অহঙ্কার ছাড়িয়া লাভ করা যায়। অর্থাৎ অহঙ্কার ছাড়িবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে তবেই ভাল হইতে পারে নতুবা নহে। অতএব শাস্ত্র ভুল হইলেও হিন্দুদের উহা অবিচারে মানা উচিত। তাহা হইলে অহঙ্কার ছাড়া এই মহালাভ হইল। বিচারের দ্বারা শাস্ত্রের ভুল ধরিলেও অহঙ্কার বৃদ্ধির ফলে সর্ব্বনাশই হইবে।

৪। মনে কর জুতা পায় দিয়া খাইলে কোন দোষ নাই শাস্ত্রে কিন্তু উহাকে অনাচার বলেন। মনে কর ইহা শাস্ত্রেরই দোষ। এখন লাভ লোকসান দেখা যাউক্। শাস্ত্র মানিলে লাভ—অহঙ্কারত্যাগ, শাস্ত্রমানা ও মুক্তির পথে অগ্রসর।

৫। অতএব অন্যায় করিয়া শাস্ত্র মানিলেও মহালাভ ঠিক করিয়া শাস্ত্র না মানিলেও মহাক্ষতি। কাযেই শাস্ত্রের উপর টেক্কা মারিতে যাওয়া কোন মতেই উচিত নহে। নিজের বুদ্ধিতে জিত হওয়া অপেক্ষা পরের বুদ্ধিতে হারাও ভাল। জ্ঞান লাভের এই একমাত্র উপায়।

দশাবতার চরিত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতিঃশাস্ত্রী

শ্রীরামচন্দ্র চরিত বৃত্তান্ত

বালি ও সুগ্রীব।—এই ভ্রাতৃদ্বয়ের পিতার নাম ঋক্ষরাজ (বরাহরূপী সপ্তর্ষি) (উত্তরকাণ্ড ৪২ অ, ।) বালির অন্যতম নাম ইন্দ্রসুত। মহেন্দ্রসন্নিভ বালির উৎপত্তি দেবেন্দ্র হইতে। এই দেবেন্দ্রই সোমধারাস্থিত বা সুমেরুবাসীর বেদে উক্ত পবমান সোম। ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলের বহু সূক্তে এই পবমান সম্বন্ধে বহু ঋক্ রচিত হইয়াছে। সেই সকল ঋক্ হইতে পরম ব্যোম সম্বন্ধীয় অনেক নাভসতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

বল, বলয়, বলি, বালি এই সমস্ত শব্দই বলধাতু হইতে উৎপন্ন। বলধাতুর অর্থ প্রাণ-দান ও বধ। বলীমুখ অর্থে বানর। বায়ুই প্রাণশক্তি। বায়ু প্রথমে সাত ভাগে পশ্চাৎ উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত। বায়ু হইতে বা বায়ুর দ্বারা অগ্নির উৎপত্তি। বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন প্রকারের অগ্নি আকাশে বিদ্যমান। দিতির গর্ভস্থ বালক বায়ুকে ইন্দ্র যে সাত ভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন সেই সপ্তভাগে বিভক্ত পুত্রের নাম যথা—১ম ব্রহ্মলোক, ২য় ইন্দ্রলোক, ৩য় দিব্য বায়ুলোক নামে বিখ্যাত। এই লোকত্রয় পরম ব্যোমে। ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য পরম ধামে বিদ্যমান। অবশিষ্ট পুত্র চারিটি ভূরাদিলোক চতুষ্টয়ে ইন্দ্রের সহচর রূপে সঞ্চরণ করিয়া থাকে। (আদি ৪৬ সং)

সংবিদাগ্নি—পরমাত্মার ইচ্ছা পবন দ্বারা মহাকাশরূপ মহার্ণব আলোড়িত হইয়া বহু অণ্ড বিশিষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে অন্তকটাহ বা লোকালোক পর্ব্বত সর্ব্বশেষে অবস্থিত। ইহাই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমা বলিয়া কথিত। এই চক্রবাড়েলর কেন্দ্রে ধ্রুব অবস্থিত। সূর্য্যকেন্দ্রী চক্রবাল রাশিচক্র।

পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বলয়াকারে যে চক্রবাল (Horizon) অবস্থিত তাহা পার্থিব চক্রবাল। ইহাই গ্রীবাস্বরূপ এবং ইহার দৃশ্য অতীব মনোহর, এই জন্য ইহা সুগ্রীব। মহেন্দ্রসন্নিভ বালি অর্থাৎ রাশিচক্র রূপ সুদর্শনচক্র সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ বা অগ্রজাত। শ্রীরামচন্দ্ররূপ সূর্য্যের সিংহাসনাধি-রোহণের পূর্ব্বে সুদর্শনচক্ররূপ বালির সুন্দর জ্যোতিঃ ছিল। বামনাবতারে দেবেন্দ্রকে ত্রৈলোক্যাধি পত্য প্রদত্ত হইলে, মহেন্দ্রসন্নিভ এই বালির উৎপত্তি হইয়াছিল। পরে মার্ত্তণ্ডের প্রভুত্ব ও রাজত্ব-কালে তাঁহার প্রখরতেজে রাশিচক্ররূপ সুদর্শন চক্র (বালি) অদৃশ্য হইয়া যায়। তাহাই রূপকে বালিবধ নামে উপাখ্যাত। মৎসপুরাণ হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। যথা—

ততোঽম্বরাচ্চিন্তিতমাত্রমাগতং, মহাপ্রভং চক্রমমিত্র নাশনম্।
বিভাবসোস্তুল্যামকুণ্ঠমণ্ডলং, সুদর্শনং ভীমমসহ্যবিক্রমম্॥
তদাগতংজ্বলিত হুতাশনপ্রভং, ভয়ঙ্করং করিকরবাহুরচ্যুতঃ।
মহাপ্রভং দনুকুল দৈত্যদারনং, তপোজ্জ্বলজ্জ্বলন সমানবিগ্রহম্॥

মঃপুঃ ২৫১তঃ।

অতএব জানাগেল যে তারাগণসমণ্ডিত রাশিচক্রই হইতেছেন, "বালি"। এবং যে পার্থিব চক্রবালে সূর্য্যের উদয়াস্ত সংঘটিত হয়, তাহাই হইতেছে সুগ্রীব। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ৯মসর্গে বালি ও সুগ্রীবের মায়াবী দৈত্যসহ যুদ্ধবৃত্তান্তে ইহার আভাস পাওয়া যায়। বালি মায়াবী দৈত্যের অন্ধকারে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া বিলে প্রবেশ করিলে সুগ্রীব সংবৎসর বিল দ্বারে অবস্থিত ছিল। পৃথিবীর রাশিচক্র ভ্রমণ করিতে এক বৎসর লাগে। ইত্যাদি জ্যোতিষিক ব্যাপার উপাখ্যানে রূপকে বর্ণিত।

বালিবধ ও তারাহরণ।—"রামশরাঘাতে (সূর্য্যরশ্মিতে) ব্যথিত বানররাজ মহাত্মা বালি **সূর্য্যসদৃশ** রামচন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে মৌন অবলম্বন করিলেন।" অদর্শনকেও শাস্ত্রে বধ বা নিধন বলা হয়।

তারা রাশিচক্রে নিবদ্ধ হেতু বালির পত্নীরূপে কল্পিত। তারা রাত্রিকালে দৃষ্ট হয় কিন্তু রাশিচক্রস্থ রাশি দৃষ্ট বা বোধগম্য হয় না। ইহা হইতেই তারাহরণ উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে।

সুগ্রীব ও রামচন্দ্রের সখ্যতা স্থাপন।—ভ্রাতৃদ্বয় বালি ও সুগ্রীব মধ্যে বৈরতা ছিল। বালি সুগ্রীবের ভার্য্যা তারাকে হরণ করিয়া তাহাকে বিতাড়িত করেন। সুগ্রীব বালি ভয়ে সদাই ভীত। বানরগণের সেবনীয় মতঙ্গ মুনির (মতঙ্গ শব্দের অন্যতম অর্থ মেঘ ও হস্তী) শাপে বালির দুষ্প্রবেশ্য যে পুণ্য আশ্রমে বানরগণ সর্ব্বদাই বাস করিয়া থাকে (ক্ষিতিজরেখা হইতে রাশিচক্র পর্য্যন্ত স্থান মধ্যে) তথায় অত্যুত্তম আয়ুধধারী রামলক্ষণ ভ্রাতৃদ্বয়কে দর্শন করিয়া বানররাজ সুগ্রীব অত্যন্ত ভীত হইয়া এবং ভ্রাতৃদ্বয়কে বালির প্রেরিত ছদ্মবেশী চর মনে করিয়া তথা হইতে অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিলেন। সেই সময় ধর্ম্মাত্মা সুগ্রীব উদ্বিগ্ন চিত্তে সমস্ত সচীব ও বানরগণ সহ মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন যে নিশ্চয় চীরবসন পরিধারী এই ব্যক্তিদ্বয় ছদ্মবেশে এখানে থাকিয়া বিচরণ করিতেছে। অনন্তর সুগ্রীবের সহচরগণ সেঃ গিরিতট হইতে অন্য পর্ব্বত শিখরে গমন করিল। প্রধান প্রধান বানরগণ যুথপতিকে বেষ্টন করিয়া রহিল। অনন্তর বাক্যবিশারদ হনুমান ভয়সন্ত্রস্ত সুগ্রীবকে কহিতে লাগিলেন—"সকল ভয় পরিত্যাগ করুন, এখানে বালিভয়ের কোন আশঙ্কা নাই। হে বানর শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব! আপনি যাহার ভয়ে ভীত হইয়াছেন, সেই সুদর্শন ক্রূর প্রকৃতি বালিকে এখানে দেখিতে পাইতেছি না। অনন্তর পরামর্শ দ্বারা ঠিক করিয়া হনুমান ভিক্ষুবেশে রাম লক্ষণের নিকট গমনে সমস্ত অবগত হইলেন। পরস্পর যথাযোগ্য আলাপ পরিচয় ও সম্ভাষণাদি দ্বারা তৃপ্ত হইয়া পরে হনুমান স্বীয় রূপ ধারণ করিলেন এবং রাম লক্ষণকে পৃষ্ঠে করিয়া সুগ্রীব সমীপে আনয়ন করিলেন। **মন্তব্য :**—সূর্য্যও চন্দ্রের ক্ষিতিজ রেখায় উপস্থিত হওয়াই সুগ্রীব সমীপে আকাশ মার্গ হইতে আনয়ন। সূর্য্য ক্ষিতিজ রেখায় গমনের বিষয় স্থির ভাবে চিন্তা করিলে বিষয়টি সহজে উপলব্ধি হইবে।

তৎকালে রাম স্বীয় পত্নী সীতাশোকে কাতর এবং সুগ্রীবও স্বীয় পত্নী তারাশোকে কাতর। উভয়ের অবস্থা সমান হইলে সহজেই বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়া থাকে। হনুমান সুগ্রীব সম্মুখে রাম লক্ষণের সমস্ত পরিচয় দান করিয়া উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য করিয়া দিলেন। তদনন্তর অরিন্দম হনুমান (অন্তরিক্ষাগ্নি) কাষ্ঠদ্বয় আনয়ন ও ঘর্ষণ পূর্ব্বক অগ্নির উৎপাদন ও অর্চ্চনান্তে তাঁহাদের মধ্যে সখ্যতা স্থাপিত করিলেন। তৎপরে রাম ও সুগ্রীব উভয়ে প্রীত হইয়া অগ্নি

(পার্থিবাগ্নি বা পৃথিবী) প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর সখ্যতা স্থাপন করিলেন। তদনন্তর "কামচারী ও কামগামী বানর সুগ্রীব" ও দাশরথি রাম উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। **মন্তব্য :**—এই সময় হইতে যথা নিয়মে সূর্য্যের উদয়াস্ত হইতে লাগিল। পৃথিবীতে সুচারুরূপে কার্য্য হইতে লাগিল। সূর্য্যদেব গগনের যে স্থানেই থাকুন, পৃথিবীর নিম্নেই হউক আর উর্দ্ধেই হউক, কখনই ক্ষিতিজ রেখার দৃষ্টির বহির্ভূত হন না।

তদনন্তর হৃষ্ট সুগ্রীব বলিলেন, আপনি আমার প্রিয় বয়স্য (সমান বয়স্ক) আমাদের সুখ ও দুঃখ সমান হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি, উভয়ের মধ্যে বহু প্রেমালাপ হইল। (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ২।৩।৪ সর্গ।)

চক্রবালকে (Horizon) সুগ্রীব নাম করণের কারণ।— গৃ ধাতু হইতে গ্রীবা শব্দ। গৃ ধাতুর অর্থ গিলন বা গিলে ফেলা। চক্রবালে সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকার অদৃশ্য হয়; তাহাই কবির কবিত্বপূর্ণ রূপক ভাষায় বর্ণিত। যেন চক্রবাল অন্ধকারকে গিলিয়া ফেলে। এবং বাস্তবিক চক্রবালের দৃশ্য অতীব মনোহর হেতু সুগ্রীব নাম। বেদে এ সম্বন্ধে বহু মন্ত্র রচিত হইয়াছে।

সূর্য্যরূপ রামচন্দ্রের সহিত সুগ্রীব রূপ বানরের সখ্যতা আছে। চক্রবালের সৃষ্টি ব্যাপারে শক্তি ও কর্ত্তৃত্ব আছে। মানবের জন্ম সময়ে ধরণীর যে অংশ, ভাগ বা স্থান পূর্ব্ব চক্রবাল সংলগ্ন হয়, সেই লগ্নানুসারে মানবের জীবনের শুভাশুভ ফল এবং আয়ু নির্ণয়। লগ্ন, চন্দ্র, সূর্য্য ও মধ্য গগন বা দশম স্থান এই চারিটি সৃষ্টি ব্যাপারে অতি আবশ্যকীয় বস্তু। আমরা পাঠকবর্গকে হনুমানের (অন্তরিক্ষাগ্নির) রাম লক্ষণকে (সূর্য্য ও চন্দ্রকে) পৃষ্ঠে লইয়া সুগ্রীব (চক্রবাল) সন্নিধানে লইয়া যাওয়ার ব্যাপারটি চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। তদ্দ্বারা বিষয়টির আভ্যন্তরিক গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে।

রাম সহ যুদ্ধে বালির পতন।—আদি ত্রেতাযুগে এই সৌরজগৎ সম্পূর্ণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সূর্য্যমণ্ডল ও গ্রহগণ যথাযথভাবে নির্ম্মিত হইয়া স্ব স্ব কক্ষায় ভ্রমণ ও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। তখন পূর্ব্বসৃষ্ট রাশিচক্রের দীপ্তির বিলোপ হইয়াছিল। এই ব্যাপারই রামায়ণে রাম সহ যুদ্ধে বালির পতন নামক উপাখ্যানে পর্য্যবসিত। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ১৭ সর্গে বর্ণিত—"তদনন্তর রণশূর বালি রাম কর্ত্তৃক শরদ্বারা আহত হইয়া নিকৃত্তিত পাদপের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। (প্রখর সূর্য্য রশ্মিতে রাশিচক্র অদৃশ্য হইল)। সমুজ্জ্বল কাঞ্চনভূষণশালী (তারাগণ সমন্বিত) বালি ভূতলে নিপতিত (অদৃশ্য) হইলে তদীয় রাজ্য ভূমি প্রণষ্টচন্দ্র আকাশের ন্যায় শোভাবিহীন হইল। নিপাতিত হইলেও সেই মহাত্মার লক্ষ্মী, তেজ ও পরাক্রমের কিছুই ব্যতিক্রম হইল না। (যেমন মেঘে সূর্য্যকে আবরণ করিলে সূর্য্যের কোনরূপ ক্ষতি হয় না) ইন্দ্রদত্ত অত্যুত্তম রত্নভূষিতা কাঞ্চনমালা সেই বানরের প্রাণ, তেজ ও দেহলক্ষ্মী ধারণ করিয়া রহিল। বানররাজ সেই মালা দ্বারা সন্ধ্যাকালীন জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বালি পতিত হইলেও লক্ষ্মী যেন মালা, দেহ মর্ম্মঘাতী শর, এই তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, যে সকল নক্ষত্রপুঞ্জদ্বারা রাশিচক্র সংঘটিত সে সমস্তই বর্ত্তমান রহিল, কেবল মাত্র দ্বাদশ রাশির পৃথক বিভাগ অদৃশ্য হইল।

বালিপুত্র অঙ্গদকে সুগ্রীব হস্তে সমর্পণ ও অঙ্গদ পরিচয়।

মৃত্যুকালে বালি স্বীয় প্রিয়পুত্র অঙ্গদকে সুগ্রীবহস্তে সমর্পণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অঙ্গদ প্রকৃত কিরূপ বস্তু বা ব্যক্তি তাহা জানা আবশ্যক। শব্দের মূলান্বেষণ করিলেই কবির সমস্ত আভ্যন্তরিক উপাখ্যান রহস্য অবগত হওয়া যাইবে। অঙ্গ+দে ধাতু হইতে অঙ্গদ শব্দ সিদ্ধ। দে ধাতুর অর্থ পালন ও রক্ষণ। এবং অনগ ধাতুর অর্থ গতি, চিহ্নকরণ ও অঙ্কপাত।

যাহারা গৃধ্নু তাহারাই গৃধ্র সদৃশ। গৃধ্রপদবাচ্য কে? তাহা ঋক্, সাম ও যজুর্বেদে আছে। "শ্যেনো গৃধ্রানাং পদবীঃ।" ৯৪৪ সাম উঃ মাঃ। গৃধ্র ব্যক্তিদিগের পদবী শ্যেন। বাজপক্ষীর নাম শ্যেন। আবার অনেক ঋঙ্মন্ত্রে চন্দ্র ও সূর্য্যকেও শ্যেন আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। গত্যর্থক শ্যৈ ধাতু হইতে শ্যেন শব্দের উদ্ভব। পশুর শ্বেত বা শ্বেতপীতবর্ণ শ্যেন শব্দের অন্যতম অর্থ।

এস্থলে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কবি গৃধ্র শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা কবি স্বয়ং গৃধ্রের মুখ দিয়া ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন।

গৃধ্র সম্মুখীন্ রাম গৃধ্রকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গৃধ্র মধুর ও প্রিয়বাক্যে কহিলেন, "হে রাঘব। আমাকে তোমার পিতার বয়স্য (Contemporary) বলিয়া জানিও।" "বয়স্য" শব্দের অর্থ সমান বয়স্ক ও স্নিগ্ধ। ইহা হইতে কি পাওয়া যাইতে পারে? রামের পিতা দশরথ—চন্দ্র বা মন।

নিম্নোক্ত বিবরণ হইতে বিজ্ঞ পাঠক রাম ও জটায়ুর সম্বন্ধটা বিচার করিয়া দেখিবেন। পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—হে রাঘব! পূর্ব্বকালে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, কর্দ্দম (পৃথ্বি ও জল পরমাণুর আর্দ্রীভাব বা সূক্ষ্ম সংঘাত) তাঁহাদের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ। কারণ ইহার সংহতি ব্যতিরেকে কোন রূপ বা অবয়ব গঠিত হইতে পারে না। তাহার পর বিবৃত (বৈকারিক সৃষ্টি), শেষ (বায়ু) সংশ্রয়, বীর্য্যবান বহু পুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান, অরিষ্টনেমি ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হন। **মহাতেজা কশ্যপ** তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। (মরীচি বা রশ্মি হইতে কশ্যপের অর্থাৎ সুমেরুতে কশ্যপনামা নক্ষত্রের উদ্ভব। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কর্দ্দমাদি সকলেই অতি সূক্ষ্ম পরমাণুরূপী, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কারণ পরমাণু হইতেই এই জগতের সৃষ্টি। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে এই পরমাণু তত্ত্ব নিহিত।

হে রাম! কশ্যপ ষষ্ঠি দক্ষকন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা এই ৮জনের পাণিগ্রহণ করিয়া তাহাদের বলিলেন, "তোমরা আমার সদৃশ ত্রৈলোক্য-পালক পুত্র সকল প্রসব করিবে।" সুতরাং কশ্যপপত্নীরা যে পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন তাঁহারা নক্ষত্র ও গ্রহরূপী। সকলেই বহু পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দনু অশ্বগ্রীব নামে এক পুত্র প্রসব করেন। দনু শব্দ জন ধাতু হইতে উদ্ভুত। যাহা হইতে এই সৌরজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই দনু। অশ্বগ্রীব অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বা এই সৌর জগতের গ্রীবাস্বরূপ। নক্ষত্রমণ্ডলকে বা রাশিচক্রকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত। বিজ্ঞ পুরাণপাঠক তাহা অনুভব করিতে পারেন। এবং কশ্যপপত্নী মনু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি প্রকার মানুষ প্রসব করেন। **মন্তব্য।**—মনস্ এই ক্লীবলিঙ্গ শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ অর্থাৎ অধ্যাত্ম ব্যাপার যাহা দেহের অভ্যন্তরে সম্পাদিত হয় (Mental affairs) মনঃ বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারি অভ্যন্তরিক তত্ত্ব। কশ্যপ হইতেছেন

প্রাণ বা তৈজস শক্তি (Positive force) এবং দনু হইতেছেন আনবিক দ্রব্য শক্তি (material & negative force) এবং মনু হইতেছেন (মতি খ্যাতি) (mental negative force) মনু শব্দ পুংস্ত্রী উভয় লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাকরণের পাণ্ডিত্যে সরল সুখলভ্য ব্রহ্মতত্ত্ব জটিলতর হইয়া পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে। বাদবিশম্বাদের হেতু হইয়াছে, বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া ব্রহ্মবিৎ মহাপুরুষগণ বলিয়া থাকেন সনৎ, সনৎকুমার, সনন্দ ও সনাতন যেমন ব্রহ্মার চারি পুত্র, সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মাতা মনুর গর্ভে এবং কশ্যপের ঔরসে চারি পুত্র জন্মে। এই চারি পুত্র হইতেছেন মহর্লোক (ব্রাহ্মণ) স্বর্লোক (ক্ষত্রিয়) ভুবর্লোক (বৈশ্য) এবং ভূর্লোক (শূদ্র)।

তাম্রা—পঞ্চকন্যা প্রসব করেন। (অহল্যাদি প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চকন্যা)। কিন্তু রামায়ণে উক্ত পঞ্চকন্যার নাম পৃথক যথা—ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী, শুকী। নামগুলি বিশ্লেষণে সব গোলযোগ মিটিয়া যায়, শাস্ত্রব্যাখ্যান কৌশল বাহির হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে শুকী নতাকে প্রসব করেন। নতার কন্যা বিনতা (বি+নতা)। বিনতার (কশ্যপদ্বারা) পুত্র (১) অরুণ (২) গরুড়। গৃধ্র বলিতেছেন—আমি অরুণের ঔরসে জন্মিয়াছি (সুতরাং কশ্যপের পৌত্র)।

(ক্রমশঃ)

জনক সভায় যাজ্ঞবল্ক্য

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

বিদেহাধিপতি জনক সভা আহ্বান করেছেন। রাজসভা, সুতরাং রাজার ভাণ্ডারের মণি মুক্তা আর মূল্যবান আস্তরণে সভাকে সুশোভিতা করা হ'য়েছে। দ্বারদেশে সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত প্রতিহারী দণ্ডায়মান। সিংহাসনে স্বয়ং বিদেহরাজ জনক সমাসীন। জনকের আশ্রিত বেদজ্ঞ ঋত্বিক অশ্বলও সেই সভায় উপস্থিত আছেন; আর সেই সভা অলঙ্কৃত ক'রে উপবিষ্ট আছেন কুরুপাঞ্চাল দেশীয় বেদবিদ, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ। এই সভা কেন আহূত হয়েছে ? সমাজের দরিদ্র প্রজাদিগের উপর পুনরায় রাজকর বসাইবার জন্যই কি এই সভার আয়োজন কিম্বা সর্ব্বসাধারণকে রাজার আদেশ শ্রবণ করাইবার জন্যই এই সভার উদ্যোগ ? কে জানে কি জন্য এই সভা আহ্বান করা হয়েছে। সেকালে রাজা ত ইচ্ছামত রাজকর নির্দ্ধারিত করতে পারতেন না। রাজার সব কার্য্যইত শাস্ত্রনিয়ন্ত্রিত ছিল। প্রজাশোষণই যদি জনকের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে সেই সভার একধারে সবল, সুস্থকায়, সবৎসা সহস্র দুগ্ধবতী গাভীই বা সজ্জিত করিয়া রাখিবেন কেন? শুধু তাই নয়, সেই এক সহস্র গাভীর শৃঙ্গগুলিও সুবর্ণমণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। এ ত সভা নয়, এ যে বিদেহরাজের বহুদক্ষিণ যজ্ঞ। এই বহুদক্ষিণ যজ্ঞে সশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যও উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু সকলেই নীরবে সমাসীন। কি উদ্দেশ্যে যে কুরুপাঞ্চাল দেশীয় বড় বড় বিদ্বান, পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করা হয়েছে তাহা কেহই জানেন না। সমগ্র বিদেহরাজ্যের অধিপতির

আবার কিসের অভাব ? যাঁর হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, ভাঁড়ার রত্নপূর্ণ, পুরী অগণিত সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত; ঐশ্বর্য্য অতুলনীয়; এ হেন সম্রাটের আবার অভাব কি ? কিন্তু সেকাল ত আর একালের মত ছিলনা। তখন কি রাজা, কি প্রজা কেহই ভোগকে পরম পুরুষার্থ ব'লে মনে করতেন না। ধনরত্নই বল, আর দাসদাসী পুত্র মিত্র সৈন্যসামন্তই বল, কোনটাই মানুষের হৃদয়ের সবটা অধিকার করতে পারত না। সসাগরা পৃথিবীর রাজা হয়েও মানুষ ব'লত "ততঃ কিম্ ?" রাজা জনকেরও হয়েছিল তাই। সেই জন্য তিনি সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করে বললেন "আপনারা সকলেই আমার পূজনীয়, আপনারা সকলেই বেদবিদ্; কিন্তু আপনাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ, তিনি আমার প্রদত্ত সুবর্ণ শৃঙ্গবিশিষ্ট এই সহস্র গাভী স্বগৃহে লইয়া যান"। জনকের কথায় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহই গাভীগুলি নিয়ে যেতে অগ্রসর হলেন না। সভা নীরব। ব্রাহ্মণ দিগকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে তেজস্বী যাজ্ঞবল্ক্য দাঁড়িয়ে উঠলেন, আর তাঁর শিষ্যের দিকে চেয়ে বললেন "ওহে সামশ্রব, যাও ঐ হাজার গাভী নিয়ে আশ্রমে চলে যাও"। শিষ্য ও গুরুর পরম ভক্ত কিনা, তাই আর কাল বিলম্ব না করে গাভীগুলি খুলে নিয়ে আশ্রমের দিকে হাঁকিয়ে চললেন। তখন হ'ল ব্রাহ্মণদের হুস্। সভাস্থ ব্রাহ্মণদের হ'ল তখন ঈর্ষা, তাঁরা একেবারে 'রা' 'রা' করে, তাল ঠুকে যাজ্ঞবল্ক্যকে ঘিরে দাঁড়ালেন আর প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুললেন। জনকের আশ্রিত হোতা অশ্বল রেগে যাজ্ঞবল্ক্যকে বলে উঠলেন "বড় যে গাভীগুলি নিয়ে যাওয়া হল, তুমি কি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, আমরা কি আর বেদ পড়িনি, না বেদ জানিনা, একমাত্র তুমিই কি বেদবিদ্ ব্রহ্মিষ্ঠ পুরুষ হয়ে বসেচ নাকি" ? যাজ্ঞবল্ক্য তখন একটু ঈষৎ হেসে অশ্বলকে বললেন "ব্রহ্মিষ্ঠ পুরুষকে আমরা নমস্কার করি। আমি ব্রাহ্মণ, কিন্তু ব্রাহ্মণের ঘরের মূর্খত নই। গাভীগুলির যে আমার দরকার"। এই কথা শুনে অশ্বল ত রেগে আগুন তিনি বললেন "ওসব বাজে কথা এখন রেখে দাও তুমি যে আমাদের চাইতে বড় তা আগে প্রমাণ কর। আমার প্রশ্নের জবাব দাও"। তখন যাজ্ঞবাল্ক্য ও অশ্বলের মধ্যে বাক্ যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। অশ্বল প্রশ্ন করেন আর যাজ্ঞবল্ক্য দেন তার উত্তর। অশ্বল বললেন "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি কেমন ব্রহ্মেষ্ঠি পুরুষ তা একবার দেখি, আচ্ছা বল দেখি, এই যা কিছু দেখচি, যাকিছু অনুভব কচ্চি সব জগৎটাই মৃত্যু দ্বারা ব্যাপ্ত, মৃত্যুর বশে; এমন জিনিষ জন্মেনা, যা না মরে; তা বল দেখি ওহে বিদ্বান ব্রহ্মেষ্ঠি পুরুষ, বলি বল দেখি এমন কোন উপায়, এমন কোন সাধন আছে কি যাদ্বারা যজমান মৃত্যুর এই কবল থেকে মুক্ত হ'তে পারে" ? অশ্বলের এই কথা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন "শোনো অশ্বল, শোনো, মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি হ'বার উপায় আছে। সে উপায়টী হ'চ্চে হোতা ঋত্বিক, অগ্নি, বাক্। যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনে অশ্বল ত হেসে খুন। বল্লেন যেন 'পণ্ডিত, এহ বাহ্য আগে কহ আর,' অমন ধারা তিন চারটে শব্দ উচ্চারণ করলে হবে না. সভাস্থ সকলকে বুঝিয়ে বল। যাজ্ঞবল্ক্য আবার বলতে আরম্ভ করলেন—তিনি বল্লেন আমি আগে যা বলেছি তাই ঠিক, পৃথিবীতে যে সব জিনিষ আমরা দেখতে পাই, সেগুলি হ'চ্চে ভৌতিক। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটী ভূত অল্প, বেশী এক সঙ্গে মিশে পৃথিবীর যত কিছু পদার্থ তৈয়েরী করেছে। সেইজন্য পৃথিবীস্থ সব বস্তুকেই ভৌতিক পদার্থ বলে। আর আকাশে, অন্তরীক্ষে, যে সব বস্তু দেখা যায় বা অনুভব করা যায় যেমন সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি, সেগুলি হ'চ্চে দৈব, 'দৈব' কথাটা

দিব্ ধাতু থেকে হয়েছে, দিব্ ধাতুর মানে প্রকাশ, দীপ্তি পাওয়া। সেই জন্য উজ্জ্বল চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিকে দৈবিক বস্তু বলে। আর আমাদের এই যে শরীর, অঙ্গ, মন, বাক্ প্রভৃতি ইহারা আমাদের নিজ, এইজন্য ইহাদিগকে আত্মিক বলে। আর 'অধি' এই কথার মানে হ'চ্ছে সম্বন্ধীয়। যার সম্বন্ধে বলতে হ'বে সেই কথাটীর পূর্ব্বে 'অধি' এই পদটী দিতে হয় যেমন আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক। আধিভৌতিক মানে পৃথিবীস্থ বস্তু বিষয়ক, আধিদৈবিক মানে আকাশ বা অন্তরীক্ষস্থ পদার্থ সম্বন্ধীয়, আর আধ্যাত্মিক মানে হ'চ্ছে শরীর মন প্রাণ সম্বন্ধীয়। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক এই তিনের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অন্তরীক্ষে যাহা অধিদৈব অগ্নি শরীরে তাহা আধ্যাত্মিক বাক্। অন্তরীক্ষে যাহা অধিদৈব সূর্য্য শরীরে তাহা আধ্যাত্মিক চক্ষু, অন্তরীক্ষে যাহা অধিদৈব বায়ু শরীরে তাহা আধ্যাত্মিক প্রাণ, অন্তরীক্ষে যাহা অধিদৈব চন্দ্র শরীরে তাহা আধ্যাত্মিক মন। অশ্বল, এই যে কাঠে কাঠে ঘ'সে সমিধ্ অর্থাৎ শুকনো পলাশকাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে, ঘি ঢেলে যজ্ঞ করা হয়, সে যজ্ঞের মানে হ'চ্ছে আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক আর আধিদৈবিক এই তিনের মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, যে একটা সাধারণ তন্ত্রী আছে, সেই সম্বন্ধটাকে হৃদয়ে অনুভব করা, সেই সাধারণ তন্ত্রীতে একটা ঝঙ্কার তুলে দেওয়া। যজ্ঞের সময় যজমানের দরকার হয় একটা বেদি আর সেই বেদিতে প্রজ্বলিত অগ্নি, আর দরকার হয় হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা এবং ব্রহ্মার। কোন্ মন্ত্রে কোন্ দৈবী শক্তিকে আহ্বান করে শরীরে সেই দৈবীশক্তিকে ফুটিয়ে তুলতে হ'বে হোতা সেই মন্ত্র ঠিক করে দেন, আর অধ্বর্য্যু সেই মন্ত্র পাঠ করে দেন আহুতি, এবং উদ্গাতা যিনি তিনি উচ্চৈঃস্বরে সেই মন্ত্র গান করতে থাকেন, আর যজ্ঞ যাতে সুসম্পন্ন হয়, যজ্ঞের কোন অঙ্গহানি না হয় সে বিষয়ে মন রাখেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মাই হলেন যজ্ঞের রক্ষক।

এই জগতে যতকিছু পদার্থ আছে সবই নশ্বর, সবই অনিত্য, সকলই মরণশীল। সমস্ত জগৎ মৃত্যু দ্বারা ব্যাপ্ত; সবই মৃত্যুর বশে! যে উপায়ে মৃত্যুর বশ থেকে, মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হওয়া যায়, সেই উপায়টী, সেই সাধনটী হ'চ্ছে যজ্ঞ এবং যজ্ঞের হোতা অগ্নি এবং বাক্। যজমানের, সাধকের সম্মুখস্থিত বেদিতে প্রজ্বলিত অগ্নি, আধিভৌতিক অগ্নি, এই অগ্নি হচ্ছেন সাধকের দ্রব্যময় যজ্ঞের হোতা। সাধক যা কিছু আধিভৌতিক দ্রব্য নিজের ইষ্টের নিকট নিবেদন করেন এবং ইষ্টের নিকট হইতে প্রার্থনা করেন, এই অগ্নি সাধক বা যজমান প্রদত্ত সেই সেই দ্রব্য সাধকের ইষ্টদেবতার নিকট নিয়ে যান এবং ইষ্টদেবতার নিকট থেকে সাধকের অভীষ্ট ফল সাধককে প্রদান করেন। ছন্দে গীতমন্ত্র সাধকের অন্তঃশরীরে আধ্যাত্মিক অগ্নির উদ্বোধন করে। অন্তঃ শরীরে এই আধ্যাত্মিক অগ্নি একবার প্রজ্বলিত হ'লে আর নির্ব্বাপিত হয় না। এই অগ্নি শরীরের নিম্নদেশ থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে মস্তকের উপরিভাগ ভেদ ক'রে বহু উর্দ্ধে অন্তরীক্ষে উত্থিত হয়। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, অধঃ ঊর্দ্ধ সবদিক এক অপূর্ব্ব জ্যোতিতে পূর্ণ হ'য়ে যায়, যজমানের শরীরের জ্ঞান তখন থাকে না। যজমান তখন নিজেকে সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় রূপে দর্শন করেন। যজমানের এই আধ্যাত্মিক অগ্নি যজমানের অন্তঃযজ্ঞের সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। যজমানের শরীর, মন, প্রাণ সবকে পবিত্র ক'রে যজমানের সুপ্ত দৈবী শক্তিগুলিকে উদ্বোধিত করেন। যে মন্ত্রের দ্বারা অন্তঃশরীরে এই জ্যোতির্ম্ময় অগ্নির উন্মেষ হয়, সেই মন্ত্রকে বলে দৈবী বাক্। অগ্নিই তখন এই দৈবী বাক্‌রূপে প্রকা-

শিত হন এবং সাধকের অজ্ঞান, দেহাভিমান দূর ক'রে সাধককে অমরত্ব প্রদান করেন। তাই তোমাকে বলেছি, অশ্বল, যে মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হবার উপায় হ'চ্ছে অগ্নি এবং বাক্। এই অগ্নিই হচ্চেন পুরোহিত ঋত্বিক ; অগ্নিই হ'চ্চেন দৈবীশক্তি উদ্বোধনকারী হোতা ; আর দৈবী বাক্ হ'চ্চে অগ্নিরই অন্যতম রূপ।

অশ্বল কিন্তু নাছোড় বান্দা। তিনি আবার জোর গলায় বলে উঠলেন "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য! বলি আর একটা প্রশ্নের উত্তর দাও দিকি, যা কিছু এই জগৎ ব'লে আমরা জানচি, সবই দিন আর রাত্রির দ্বারা ব্যাপ্ত, দিন আর রাত্রির দ্বারা আক্রান্ত, জগতে এমন কোন বস্তু নেই যা দিন আর রাতের বশে না আছে। আচ্ছা, এখন বল দেখি যাজ্ঞবল্ক্য, এমন কোন উপায়, এমন কোন সাধন আছে কি যে উপায় দ্বারা—যে সাধনের বলে যজমান বা সাধক এই অহোরাত্রের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারে—এই দিন রাত্রের কবল থেকে মুক্ত হতে পারে।"

অশ্বলের কথায় যাজ্ঞবল্ক্য একটু হেসে বললেন, 'অশ্বল, তোমাকে ত পূর্ব্বেই মৃত্যুর কবল থেকে যে উপায়ে মুক্ত হওয়া যায় তা বলেছি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে যজ্ঞই হচ্চে একমাত্র উপায় একমাত্র সাধন যা যজমানকে মুক্তি দিতে সমর্থ। মানুষের ভেতর সুপ্ত রয়েছে এমন একটা শক্তি যে শক্তিকে যদি একবার জাগান যায়, তাহলে সেই জাগ্রত শক্তিই তাকে ক্রমে ক্রমে দেবত্বে উন্নীত করে এবং মৃত্যুর কবল থেকে—অহোরাত্ররূপী কালের হাত হ'তে মুক্ত ক'রে অমরত্ব প্রদান করে। এই শক্তিই হ'চ্চে অগ্নি। যজ্ঞের দ্বারাই এই অগ্নিকে জাগ্রত করা হয়। দীক্ষণীয় ইষ্টিতে, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে যজমানের অন্তঃশরীরে এই অগ্নিকে জাগ্রত করা হয়। তুমি ত জান অশ্বল দীক্ষণীয় ইষ্টিতে যখন বলা হয়—

> অগ্নি মু'খং প্রথমো দেবতানাং সংগতানামুত্তমো বিষ্ণুরাসীৎ।
> যজমানায় পরিগৃহ্য দেবান্ দীক্ষয়েদং হবিরাগচ্ছতং নঃ ॥
> অগ্নিশ্চ বিষ্ণোতপ উত্তমং মহোদীক্ষা পালায় বনতং শক্র।
> বিশ্বৈ র্দেবৈর্যজ্ঞি য়ৈঃ সংবিদানৌ দীক্ষামস্মৈ যজমানায় ধত্তম্ ॥
>
> (আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র ৪।২।১)

দৈবীশক্তির বিকাশের প্রথম উপায় হ'চ্চে অন্তঃশরীরে এই অগ্নির উদ্বোধন। মূলাধার থেকে মস্তক ভেদ ক'রে এই অগ্নি উত্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই আকাশবৎ একটা ব্যাপ্তি অনুভূত হয়। তারপর দিব্য জ্যোতিতে সেই অন্তঃআকাশপূর্ণ হ'য়ে যায়, তারপর উদিত হন সূর্য্য। এই সূর্য্য প্রথমে রশ্মিযুক্ত, তারপর রশ্মিবিহীন। এই সূর্য্যের বিস্তৃত গোলক তিনবর্ণে রঞ্জিত দৃষ্ট হয়, প্রথমে রক্তবর্ণ, তারপর শ্বেতবর্ণ, তারপর কৃষ্ণবর্ণ। এই সূর্য্যকে অন্তঃচক্ষু দিয়ে দেখা যায়। এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের উদয়ে অন্তর্জগৎ উদ্ভাসিত হয়, আর সেই সূর্য্যের তিনবর্ণ থেকে থর থর ক'রে আনন্দধারা প্রবাহিত হতে থাকে। কি দিবস কি রাত্রি, সব সময়েই যজমান বা সাধক এই অন্তঃসূর্য্য দর্শন করেন—তাঁর নিকট তখন দিন রাত ব'লে সময়ের বিভাগ থাকে না। তিনি পলকবিহীন স্থিরনেত্রে সূর্য্য হইতে ক্ষরিত জ্ঞান, আনন্দ, শক্তি অনুভব করেন, আর অনুভব করেন নিজের জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বব্যাপী রূপ। এই অন্তঃ সূর্য্যই হয় তখন তাঁর চক্ষু। তাই বলি তার অন্তঃচক্ষুই তখন অধ্বর্য্যুর কাজ করে, পূর্ব্বেই তোমাকে বলেছি অধ্বর্য্যুর কাজ হ'চ্চে অনুচ্চস্বরে আহুতি

দেওয়া। এখন যজমান সর্ব্বব্যাপী দিব্য জ্যোতিতে করেন আত্মনিবেদন, নিজের সবটা আহুতি দেন এই জ্যোতির্ম্ময় সত্তায়। তাই বলছি, অশ্বল, অহোরাত্ররূপী কালের কবল হ'তে মুক্ত হবার উপায় হ'চ্চে যজমানের অধ্বর্য্যুরূপ এই আধ্যাত্মিক চক্ষু এবং অধিদৈব সূর্য্য। অন্তঃচক্ষুরূপে যজমানে যাহা আধ্যাত্মিক, অন্তঃসূর্য্যরূপে তাহাই আধিদৈবিক। দর্শ আর পূর্ণমাস যাগের কথা তোমাকে আর বলতে হবে না, অশ্বল। প্রতি অমাবস্যায় ও পূর্ণিমাতে ত এই যাগ তুমি করে থাক। আমাদের বহিঃ চক্ষু মুদ্রিত করে অন্তঃচক্ষু দ্বারা এই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী সত্তার অনুভবই দর্শ যাগ, আর চোখ চেয়ে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদায় সেই সত্তার অনুভূতিই পূর্ণমাস ইষ্টি। এই দর্শ ও পূর্ণমাস যাগ যাঁর সুসম্পন্ন হ'য়েছে, যাঁর অন্তঃশরীরে দিব্য চক্ষু ও জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য অভিব্যক্ত হয়েছে সেই যজমানই মুক্ত হয়েছেন অহোরাত্ররূপী কালের কবল থেকে।

অশ্বল কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তাঁর প্রাণে বড়ই আঘাত লেগেছে। হাজার, হাজারটা দুগ্ধবতী গাভী, তাতে আবার তাদের সোনা দিয়ে মোড়ানো শিং। এই গাভীগুলি কিনা অশ্বলের চোখের সামনে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর শিষ্যকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর আশ্রমে। জনক রাজার সভাপতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অশ্বলের প্রাণে তা সইবে কেন?

তিনি আবার চক্ষুঃরক্তবর্ণ ক'রে যাজ্ঞবল্ক্যের দিকে তাকিয়ে বললেন "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, ভারী যে ব্রহ্মিষ্ঠ বলে বড়াই করচ, বল দেখি আর একটা প্রশ্নের উত্তর। এই সমস্ত জগৎ পূর্ব্বপক্ষ ও অপরপক্ষ দ্বারা ব্যাপ্ত, শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ দ্বারা কবলিত; এখন বল দেখি যজমান কোন্ উপায়ে কোন সাধন বলে এই শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের হাত হ'তে মুক্ত হ'তে পারে?

যাজ্ঞবল্ক্যও দমিবার লোক নন। তিনি তিন চারটী ছোট্ট কথায় অশ্বলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বল্লেন 'ওহে অশ্বল, শোন শোন এই শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের কবল হ'তে মুক্তির উপায় হ'চ্চে উদ্গাতা, ঋত্বিক, বায়ু আর প্রাণ।' অন্তরীক্ষে যাহা অধিদৈব বায়ু যজমানে তাহা আধ্যাত্মিক প্রাণ। রজোগুণবহুলা শক্তিই প্রাণ। এই প্রাণকে ইষ্টদেবতাভিমুখী করা চায়। সাধনের দ্বারা, মন্ত্রদ্বারা, যজ্ঞদ্বারা এই প্রাণ সংযত হ'লে, স্থির হ'লে, যজমানের অন্তঃ আকাশে অভিব্যক্ত হন সোম, দিব্যজ্যোতির্ম্ময়রূপে যজমানের হৃদয়কে আহ্লাদিত, আনন্দিত করেন চন্দ্র। এই আনন্দ পার্থিব অপর সব আনন্দ হ'তে নিবিড়তর গভীরতর কিন্তু চন্দ্রের যেমন হ্রাস বৃদ্ধি আছে, এই আনন্দের সেইরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হয়। ইহা প্রথমে স্থায়ি হ'তে চায় না। প্রায়ণীয় ইষ্টি, জ্যোতিষ্টোম পশুযাগ ও সোম যাগ ক'রে এই আনন্দকে স্থায়ি করতে হয়, যজমানের সাধনের অবস্থায় নিমীলিত চক্ষু হইয়া ইষ্টের ধ্যান যেমন দর্শ বা অমাবস্যায় এবং উন্মীলিত চক্ষু হইয়া সর্ব্বত্র ইষ্ট দর্শন যেরূপ পূর্ণমাস যাগ সেইরূপ স্থির অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে আনন্দের অনুভূতিই হ'চ্চে প্রতিপৎ প্রভৃতি অপরাপর তিথিগুলি। অন্তঃশরীরে অগ্নি উদ্বোধিত, সূর্য্য অভিব্যক্ত, প্রাণ সংযত হ'লে পবিত্র হৃদয়ে সোমরূপী আনন্দের বিকাশ হয়।"

অশ্বল পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, বল দেখি যাজ্ঞবল্ক্য, এই যে আকাশ যাকে নিরালম্বের মত দেখা যাচ্চে; যজমান কোন্ উপায় দ্বারা আকাশেরও সেই অবিজ্ঞাত আশ্রয়টী জেনে স্বর্গ বা শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করতে পারে?" এই প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন "অশ্বল এই শ্রেষ্ঠ সুখ বা স্বর্গলাভের উপায় আছে। সেই উপায় হ'চ্চে ঋত্বিক, ব্রহ্মা আর মনোরূপী চন্দ্র। প্রাণ সংযত

হলে মন সংযত হয়, মনের স্পন্দনই প্রাণ। পবিত্র, সংহত মনই ব্রহ্মা, মনই চন্দ্র। অধি দৈবত রূপে যাহা চন্দ্র, আধ্যাত্মিকরূপে যজমানের অন্তঃশরীরে তাহাই মন। সূর্য্যমণ্ডলের পর চন্দ্রমণ্ডল। সাধকের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হ'লে অন্তঃ আকাশে সাধক অগ্নি, সূর্য্য চন্দ্র, স্পষ্টই দর্শন করেন। অগ্নিরই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ হ'চ্চে সূর্য্য, চন্দ্র, প্রাণ। মন যখন পবিত্র হয়, পশুভাব যখন সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় তখন সাধকের চিত্তাকাশ কোটি সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় দিব্য আলোকে এবং কোটি চন্দ্রের শীতল কিরণের ন্যায় দিব্য শুভ্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। তখন সাধকের না থাকে প্রাণের কার্য্য, না থাকে মনের কামনা, সাধক তখন আত্মরতি, আত্মক্রীড় হইয়া স্বর্গ বা শ্রেষ্ঠ আনন্দ অনুভব করেন। অনন্তর তাঁর দিব্য বিভূতি রূপ ঐশ্বর্য্য, মহিমা, সম্পদ লাভ হয় এবং তিনি তখন স্বমহিমায় বিরাজ করেন।"

অশ্বলের গায়ের জ্বালা, তবুও যায় না, তিনি আবার প্রশ্ন করলেন "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, বল দেখি আজ এই যজ্ঞে হোতা কতগুলি এবং কোন্ কোন্ ঋক মন্ত্রদ্বারা কার্য্য করবেন? অধ্বর্য্যুই বা কতগুলি এবং কোন্ কোন্ আহুতি দ্বারা হোম করবেন। ব্রহ্মাই বা কোন্ দেবতার দ্বারা আজ এই যজ্ঞ রক্ষা করছেন এবং উদ্গাতাই বা কতগুলি এবং কোন্ কোন্ ঋক্ দ্বারা আজ এই যজ্ঞে স্তব করবেন?"

অশ্বলের প্রশ্নের পর প্রশ্নেও যাজ্ঞবল্ক্য, স্থির, অবিচলিত। তিনি অশ্বলকে বললেন "অশ্বল, তোমার এ প্রশ্নগুলির উত্তর পূর্ব্বেই দেওয়া হয়েছে, তবুও আর একবার বলি, শোন, যজ্ঞের প্রারম্ভে ঠিক করা হয় যজ্ঞের উদ্দেশ্য, কোন্ দেবতা যজ্ঞের লক্ষ্য, কোন্ দৈবী শক্তিকে উদ্বোধিত করতে হবে। উদ্দেশ্য ঠিক হ'লে, যিনি হোতা তিনি ঠিক করে দেন মন্ত্র; প্রতি যজ্ঞেই তিন প্রকার মন্ত্রের দরকার হয়, এই তিন জাতীয় মন্ত্র হ'চ্চে পুরোহনুবাক্যা, যাজ্যা ও শস্যা। যজ্ঞের প্রারম্ভের পূর্ব্বে যে সকল ঋক হোতা পাঠ করেন সেগুলি পুরোহনুবাক্যা, যজ্ঞের যে মন্ত্রগুলি দ্বারা অধ্বর্য্যু আহুতি দেন সেগুলি যাজ্যা, আর যে সব মন্ত্র উচ্চারণ করে উদ্গাতা দেবতার উদ্দেশ্যে স্তব স্তুতি করেন সেগুলি হ'ল শস্যা। তুমি ত জান অশ্বল, যে আহুতি মানে আবাহন, যে মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞের ইষ্টদেবতাকে আহ্বান করা যায় সেই মন্ত্রকে পুরোহনুবাক্যা বা অনুবাক্যা বলে। 'অনু' পশ্চাৎ, আর বাক্ হ'ল মন্ত্র, যে মন্ত্র উচ্চারণ করার পশ্চাৎ সেই মন্ত্রের দেবতা আগমন করেন প্রত্যক্ষ হন সেই মন্ত্রকে অনুবাক্যা বা পুরোহনুবাক্যা বলে। যে ঋত্বিক বা পুরোহিত দেবতাকে যজ্ঞে আহ্বান করেন তিনিই হোতা। হোতা আবার যখন যাজ্যা মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন অধ্বর্য্যু অগ্নিতে দেন আহুতি। যাজ্যা হ'ল সেই মন্ত্র যে মন্ত্র দ্বারা ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দেওয়া হয়, যজন বা আত্মনিবেদন করা হয়। তারপর যে মন্ত্র দ্বারা ইষ্ট দেবতার স্তুতি করতে হবে, প্রশংসা করতে হবে সেই শস্যা মন্ত্র হোতা উচ্চারণ করেন, আর উদ্গাতা উচ্চৈঃস্বরে সেই মন্ত্র গান করতে থাকেন। পুরোহনুবাক্যা, যাজ্যা ও শস্যা এই তিনটী ঋকের বা মন্ত্রের দ্বারা হোতা যজ্ঞকর্ম্ম সম্পাদন করেন। এই তিনটী ঋক মন্ত্র আবার আধ্যাত্মিক রূপে প্রাণ, অপান ও ব্যান বায়ুরূপে অভিব্যক্ত। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণ সংযত হ'লে, অন্তঃশরীরে অগ্নি জাগ্রত হয়, এবং সেই অগ্নি ক্রমে ক্রমে অপর দৈবী শক্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলে। প্রাণ সংযত হ'লে প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হলে প্রাণময় জগতের উপর আধিপত্য করা যায়। এবং ইষ্টের নিকট আত্ম নিবেদন রূপ যাজ্যা এবং ইষ্টের গুণকীর্ত্তন রূপ শস্যা মন্ত্র খুব ভালরূপে সম্পন্ন হ'লে

যজমান অনির্ব্বচনীয় সুখলাভে সমর্থ হয়, এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষ তিন লোকেই সে জয়ী হয়। সাধকের জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তি বাড়ে, কিন্তু এসব ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হ'তে নেই। সাধক ভূঃ ভুবঃ স্ব স্বর্গ, মর্ত্ত্য, অন্তরীক্ষ এই তিনলোকে যত কিছু ভোগ্য বস্তু আছে সমস্তই ইষ্ট দেবতাকে নিবেদন করে এবং মনকে সংযত করে, সুসমাহিত হয়ে সন্ন্যাসরূপ যজ্ঞ দ্বারা অমৃতত্ব লাভ ক'রে কৃতকৃতার্থ হয়। এখন বুঝলে অশ্বল, যজ্ঞ দ্বারা কেমন ক'রে কালরূপী মৃত্যুর কবল থেকে মুক্ত হয়ে সাধক সোমরসরূপ অমৃতত্ব লাভ করতে পারে। প্রথমে দীক্ষা থেকে অর্থাৎ দীক্ষণীয় ইষ্টি থেকে আর সোমযাগ পর্য্যন্ত এই যে যজ্ঞ কর্ম্ম ইহা সাধকের দিব্য জন্মলাভ হ'তে অমৃতত্ব রূপ স্ব স্বরূপের অনুভূতির একটা ইতিহাস।" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে অশ্বল চুপ করে গেলেন। অশ্বল চুপ ক'রলে হবে কি, তাতেই কি যাজ্ঞবল্ক্যের রক্ষে আছে, অশ্বলকে চুপ করতে দেখে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন জরৎ কারুবংশীয় আর্ত্তভাগ নামক ঋত্বিক।

আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী এম্, এ. এল্ এম্ এস্।

পৌষ্কলাবততন্ত্র।—মহর্ষি পুষ্কলাবত প্রণীত শল্যশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। এই গ্রন্থও এখন পাওয়া যায় না। ভানুমতী টীকায় চক্রপাণি ইহার পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"পুষ্কলাবতেঽপি উক্তং—আহারস্য যৎ পরং ধাম, তৎ অগ্নিনা রঞ্জিতং রক্তং প্রতিপদ্যতে তৎ সৌম্যাগ্নেয়ত্বাৎ উষ্ণদ্রব্যৈশ্চাভিবর্দ্ধতে ইতি" (সু: সূ: ১৪অঃ ব্যাখ্যাবসরে)

বৈতরণতন্ত্র।—মহর্ষি বৈতরণ প্রণীত গ্রন্থ। ইহাও শল্য শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। প্রাচীন টীকার বহুস্থলে বৈতরণতন্ত্রের পাঠের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু মূল গ্রন্থ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

সুশ্রুত সংহিতার অশ্মরী রোগের টীকায় উল্লনাচার্য্য বৈতরণ তন্ত্রের পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন দেখাযায়। তিনি বলেন,—"তথাচ বৈতরণঃ —

ভগস্যাধঃ স্ত্রিয়া বস্তিরূর্দ্ধং গর্ভাশয়াস্থিতা
গর্ভাশয়শ্চ বস্তিশ্চ মহাস্রোতঃ সমাশ্রিতৌ।
বস্তিভাগং সমুন্নম্য চাবনম্যাশ্মরীং বুধঃ।
স্ফিগগ্রে বেধনং তাসাং হিতমন্যত্র দোষকৃৎ" ইত্যাদি

চক্রপাণিও সুশ্রুতের টীকায় বৈতরণ তন্ত্রের পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

"সর্ব্বশস্তং শিবং প্রাপ্য প্রলেপস্তু নিবর্ত্তয়েৎ।" (সুঃ সূঃ ১৮অঃ)

এতদ্ভিন্ন ব্রণ বন্ধনাদির বিশেষ লক্ষণ সকল এবং বিশেষ বিশেষ শাস্ত্র চিকিৎসা সকল যাহাদের সুশ্রুতের মধ্যে উল্লেখ নাই, সেসকলও বৈতরণতন্ত্র হইতে টীকাকারগণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে দেখাযায়। এই সকলের দ্বারা অনুমান করা যায় যে, বৈতরণতন্ত্র সুশ্রুত সংহিতা হইতেও বৃহত্তর গ্রন্থ ছিল।

ভোজতন্ত্র বা ভোজসংহিতা।—শল্যতন্ত্র বিষয়ক অতিবৃহৎ গ্রন্থ। মহর্ষি

ভোজ সুশ্রুতের সতীর্থ ছিলেন-ইহা উল্লনের টীকা পাঠে জানা যায়। ধারা অর্থাৎ বর্ত্তমান আরা প্রদেশের একজন প্রাচীন অধীশ্বর ছিলেন, তিনিও ভোজরাজ নামে পরিচিত ছিলেন। রাজমার্ত্তণ্ড প্রভৃতি আরও কএকটি বৈদ্যক গ্রন্থ আছে, সে সকলেরও রচয়িতা ভোজরাজ। ভোজতন্ত্র বা ভোজ সংহিতার যিনি রচয়িতা তিনি অতি প্রাচীন এবং রাজমার্ত্তণ্ড প্রভৃতির রচয়িতা পরবর্ত্তী কালের লোক বলিয়া অনুমান করা যায়। ভোজসংহিতার রচয়িতাকে কোথাও কোথাও বৃদ্ধ ভোজ নামে অভিহিত করা হইয়াছে দেখা যায়। যে সকল প্রাচীন টীকাকার ছিলেন, তাঁহারা ভোজ সংহিতার বহু বহু পাঠ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা উক্ত গ্রন্থের প্রামাণ্য অবগত হওয়া যায়। টীকাকারগণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠসমূহ হইতে কয়েকটী মাত্র পাঠ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে, ইহা দ্বারা গ্রন্থের কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। মূলগ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না। উল্লনাচার্য্য কর্ত্তৃক উদ্ধৃত ভোজসংহিতার পাঠ যথা—

"শস্ত্রং ব্রীহিমুখং কার্য্যমঙ্গুলা ন যড়ায়তম্।
দ্ব্যাঙ্গুলং তস্য বৃত্তং স্যাৎ তৎফলং চতুরঙ্গুলম্॥"

(সুঃ সূঃ ৮অঃ)

পুনশ্চ—"হস্তপাদাঙ্গুলিতলে কূর্চ্চেষু মনিবন্ধয়োঃ।
বাহু জঙ্ঘাদ্বয়ে চাপি জানীয়ান্নলকানিচ॥"

(সু গঃ ৫অঃ)

চক্রদত্ত ও সুশ্রুত সংহিতার শস্ত্রবচনীয় অধ্যায়ের ব্যাখ্যাবসরে একাধিক ভোজকৃত লক্ষণ সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন, যে সকল সুশ্রুত সংহিতার সূত্র স্থানের অষ্টম অধ্যায়ের টীকা পাঠে জানা যায়। এখানে দুই একটী ভোজকৃত পাঠ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা—

সুশ্রুতের সূত্রস্থানের একাদশ অধ্যায়ের টীকায় চক্রদত্ত—

"সংব্যূহিমস্তথা প্রাক্যো দ্বিবিধঃ ক্ষার ইষ্যতে।
পাক্যস্ত সপ্রতীবাপ স্তীক্ষ্ণোহন্যস্ত ভবেৎ পুনঃ॥"

(সুঃ চঃ টীঃ ১১ অঃ)

পুনশ্চ— "রোহিতা মূর্দ্ধগাঃ কৃষ্ণাঃ কর্ণপালিশ্রিতাঃ সিরাঃ। ইত্যাদি

(সুঃ সূ ১১অঃ চঃ টীঃ)

অন্যত্র— "ব্রণোদরাস্থাপন পীড়িতানাং
প্রমেহিনাং ছর্দ্দ্যতিসারিনাঞ্চ।
দ্রবংন দদ্যাদথবাপি কোষ্ণং
স্বল্পং হিতং ভেষজসংস্কৃতঞ্চ॥

(সুঃ সূঃ ১৯অঃ চঃ টীঃ)

।.দৃঢ়রক্ষিত ও মাধব নিদানের টীকায় বহুস্থলে ভোজকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

যথা (১) "ভৌপাদৌতু ইয়ং বিস্রংসীতি নাম্না পঠ্যতে" ইতি

(২) তথাচ ভোজঃ—"কাসো জরোরক্তপিত্তং ত্রিরূপং রাজযক্ষ্মাণি।"

(৩) যদাহ ভোজঃ—"স্তব্ধাদিদৃষ্টির্ভবতি গুরোচ্ছ্বাসস্তথৈবচ।
দর্শনাদস্হজস্তজ্জাদ্ গন্ধাচ্চৈব প্রমহ্যতি ॥"

(মূর্চ্ছাধিকারে)

মাধব নিদানের অন্যতম টীকাকার শ্রীকণ্ঠ দত্তও বহুস্থলে ভোজের পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন দেখা যায়। যথা,—

তথাচ ভোজঃ "যদারক্তঞ্চ পিত্তঞ্চ বাতেনানু গতং ত্বচি।
অগ্নিদগ্ধনিভান স্ফোটান্ কুরুতঃ সর্ব্বদেহগান্।
সজ্বরান্ সপরীদাহান্ বিদ্যাৎ বিস্ফোটকাংশ্চতান্ ॥"

(বিস্ফোটকাধিকারে)

(১) ভোজেঽপ্যুক্তং যথা,—

"পিত্তেন জাতো বদনে বিকারঃ।
পার্শ্বে বিশেষাৎ সতু যেন শেতে ॥
স্নায়ুপ্রতানপ্রভবো বিশেষাৎ।
দাহ প্রাপাক্য প্রচুরো বিদারী ॥

(মুখরোগাধিকারে)

করবীর্য্যতন্ত্রম্।—মহর্ষি করবীর্য্য প্রণীত শল্যতন্ত্র মূলক গ্রন্থ। ইহাও বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না।

মহর্ষি করবীর্য্য ধন্বন্তরির অন্যতম শিষ্য ও সুশ্রুতের সহাধ্যায়ী। প্রাচীন টীকাবগণের সময়ে করবীর, তন্ত্র বিলুপ্ত হয় নাই। যেহেতু প্রাচীন টীকার মধ্যে উক্ত তন্ত্রের পাঠ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, দেখা যায়। কিন্তু উহা অতি অল্প। আমরা করবীর তন্ত্রের একটী পাঠ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। যথা,—

"উক্তং হি করবীরাচার্য্যৈ,—

'চন্দ্র কৈঃ শিখিগিচ্ছাভৈর্নীলপীতাদিরাজিভিঃ।
আবৃতং বেশবার্য্যম্ব, মজ্জক্ষীরোপমং ত্যজেৎ ॥"

(নিদান অতিসারাধিকার)

গোপুর রক্ষিত তন্ত্রম্।—ধন্বন্তরির যে সকল শিষ্য ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গোপুর রক্ষিত ও একজন শিষ্য ছিলেন। উক্ত গ্রন্থ তাঁহারই রচিত বলিয়া খ্যাতি আছে। দুঃখের বিষয় গোপুর রক্ষিত তন্ত্র পাওয়া যায় না এবং উক্ত তন্ত্রের কোন পাঠও টীকাকার গণের টীকার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন,—গোপুর ও রক্ষিত দুইজন ব্যক্তি এবং তাঁহাদের রচিত দুইখানি গ্রন্থ ছিল।

প্রশ্নোত্তরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রঃ।—ব্রহ্ম কি ?

উঃ।—ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত এজন্য তাহা প্রকাশ করা যায়না। ঠারে ঠোরে ঈঙ্গিত করা যায়। বাক্যমন মায়িক বা বৈকারিক। যখনই বাক্য বলা যায় তখন সে অবিদ্যার বশে। সুধীগণ ব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দ লক্ষণ বলিয়াছেন। ইহা স্বরূপ লক্ষণ। আবার জগতের সৃষ্টিস্থিতি লয় যাঁহা হইতে, যাঁহা কর্ত্তৃক ও যাঁহাতে হয় তিনিই ব্রহ্ম। এইটী ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। যাহা আমি, যাহা দেহী যাহা আত্মা তাহাই ব্রহ্ম। ঋষি বিমদকে তং শিষ্য বলিলেন—হে গুরুদেব, আমাকে ব্রহ্ম কি বলুন। তখন ঋষি চুপ করিলেন। শিষ্য কিছুকাল গেলে পুনরায় বলিলেন—ব্রহ্ম কি বলুন। ঋষির ইন্দ্রিয় ব্যাপার রুদ্ধ হইয়া গেল। এই অবস্থায় কিয়ৎ সময় অতিবাহিত হইলে শিষ্য তারস্বরে পুনরপি বলিলেন—ব্রহ্ম কি বলুন? তখন ঋষি নেত্রোন্মিলন করিয়া বলিলেন, ব্রহ্মই বলিয়াছি। শিষ্য আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—সে কেমন? ঋষি বলিলেন ইন্দ্রিয়বৃত্তি রুদ্ধ করিয়া উপরত চিত্তে অবস্থান করিলে স্বয়ংপ্রভ ব্রহ্ম প্রকাশমান হন। তাই চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া তোমাকে প্রকৃত পথ দেখাইতেছিলাম। ব্রহ্ম বাক্য দ্বারা বুঝান যায় না। এ বিষয়ে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উক্তি এই যে—ব্রহ্ম এঁটো হন না অর্থাৎ মুখে উচ্চারিত শব্দ রাশি দ্বারা তাঁকে বুঝান যায় না। কঠ শ্রুতি বলেন "নহ্যকৃত কৃতেন" —নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে কর্ম্ম দ্বারা পাওয়া যায় না। ঈশোপনিষদ বলিয়াছেন—আনজদেকং মনসোজবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবনপূর্ব্বমর্ষৎ।" অর্থাৎ নিশ্চল এক মন ও ইন্দ্রিয়গণের গতির বাহিরে ব্রহ্ম অবস্থিত। মন বা ইন্দ্রিয় দ্রুতগতি দ্বারাও তাঁকে প্রাপ্ত হন না। কেন উপনিষদ্ বলেন, "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্‌গচ্ছতি ন মনো নবিদ্মন বিজানীম যথৈব অনুশিষ্যাৎ "অর্থাৎ তথায় (ব্রহ্মে) চক্ষু পৌছায় না, বাক যায় না, মন যায় না, বুদ্ধি যায় না অথবা তাহা শিষ্যকে কেমনে অনুশাসন করে তাহাও বলা যায় না। বৃংহ ধাতু হইতে ব্রহ্মশব্দ নিষ্পন্ন হয়। যাহা বৃহৎ সর্ব্বত্রই তুলনায় বৃহৎ তাহাই ব্রহ্ম। তাঁহা অপেক্ষা বৃহদ্ অন্য কিছু নাই। যেমন দ্বিতীয়ার চন্দ্র লোকে একবার দেখাইতে না পারিয়া কোন বৃক্ষশাখা প্রতি লক্ষ্য করিতে বলে। সেই শাখার দিকের আকাশে দৃষ্টি প্রসারিত করিলে আপনি চন্দ্র প্রকাশ হন তদ্রূপ শাখাচন্দ্রন্যায়ে ব্রহ্ম উপদেশ করা হয়। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক তাই ডিম্বের খোসাবৎ ব্যাপক নহেন। দুগ্ধের প্রতি অণুতে অণুতে যেমন মাখম তেমনি ব্যাপক। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ক্ষীরে সর্পিরিবাহিতম্।" শ্রুতি বলেন—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখং।

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

অর্থ—সর্ব্বত্র তাঁহার হাত পা, সর্ব্বত্র তাঁহার মুখ কর্ণ, তিনি সর্ব্ব জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন।

গীতায়—"অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্ত মিব চ স্থিতম্।

ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥

অর্থ—তিনি সর্ব্বভূতে অবিভক্ত এক অখণ্ড স্বরূপই আছেন কিন্তু বিভক্ত মত বোধ হয়; তিনি ভূতের পালন বিনাশ ও জন্মের কারণ।

ব্রহ্ম এই শব্দটী সর্ব্বব্যাপী এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ব্যতীত শব্দব্রহ্ম বেদ ও কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ অর্থেও প্রয়োগ হয়। ব্রহ্মের স্বরূপ দুই ভাবে চিন্তন করা হয় এক 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', অর্থাৎ যা কিছু সবই ব্রহ্ম। এই ভাবটী গীতায় নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্ ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥

অর্থ—ব্রহ্মই ঘৃত, আহুতি প্রদানের দর্ব্বী বা শ্রুক। ব্রহ্মই ঘৃত, ব্রহ্মই অগ্নি, আহুতি যে দেয় সেও ব্রহ্ম তদ্দ্বারা ব্রহ্মেই গমন করিবে, যাঁর ব্রহ্মেই কর্ম্ম এইরূপ বুদ্ধি তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন এবং সবই ব্রহ্মে পূর্ণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নাই। এই ভাবটী প্রসিদ্ধ যজুর্ব্বেদীয় শান্তিবাক্যে প্রকাশিত—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণ মুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যতে॥

অর্থ—যাহাই ইন্দ্রিয়াদির অগোচর সেই শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহাও তাঁহাদ্বারা পূর্ণ যাহা ইন্দ্রিয়াদির গোচর এই শব্দদ্বারা প্রকাশিত হয় তাহাও তদ্দ্বারা পূর্ণ। অর্থাৎ এই দৃশ্য প্রপঞ্চাত্মক বিশ্ব জগৎ ও তৎব্যতিরিক্ত যাহা সবই তাঁহা দ্বারা পূর্ণ। এই পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপে মায়া উপাধিবশে পূর্ণশক্তি সবিত কার্য্যব্রহ্ম উদ্ভাসিত হন এবং কার্য্যব্রহ্মে৷ পূর্ণত্ব গৃহীত হইলে এক পূর্ণ ব্রহ্মই অবশেষ থাকেন। অর্থাৎ কার্য্যব্রহ্মে পূর্ণ শক্তিমত্তাদি মায়িক উপাধিমাত্র; তাহা অন্তর্হিত হইলে ঘটনাশে ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীনবৎ কার্য্যব্রহ্মের পূর্ণত্ব পূর্ণেই লয় হয়।

অপর যেভাবে ব্রহ্ম চিন্তন হয় তাহা "নেতি নেতি" বিচারে—ইহা ব্রহ্ম নহেন উহা ব্রহ্ম নহেন তাহা ব্রহ্ম নহেন এইরূপে মায়িক জাগতিক সব পদার্থ ত্যাগ করিতে করিতে সর্ব্ব নিষ্কল ব্রহ্ম পরিশেষে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই শ্রুতিতে নিষেধাত্মক বাক্য দ্বারা তাঁহার প্রকাশ করিয়াছেন তৎযথা বৃহদারণ্যকের তৃতীয় অধ্যায়ে—

"স হোবাচ তদ্বৈতদক্ষরং গার্গি ব্রহ্মণা অভিবদন্ত্য স্থূল মনণ্ব হ্রস্ব
মদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরস-
মগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কম প্রাণমমুখমমাত্র
মনন্তর বাহ্যং নতদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন।"

অর্থ—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে গার্গি! ব্রহ্মবিদগণ উক্ত আকাশের আধারকেই অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি স্থূল নহেন অণুও নহেন হ্রস্বও নহেন, দীর্ঘও নহেন। তাঁহাতে লোহিত বা স্নেহ নাই। তিনি ছায়া ও অন্ধকার বিমুক্ত, তাঁহাকে বায়ু বা আকাশ বলা যায় না তিনি অসঙ্গ অরস অগন্ধ অচক্ষু অশ্রোত্র, অবাক্ অমন অতেজস্ক অপ্রাণ অমুখ, মাত্রা বা পরিমাণশূন্য অনন্তর বা ছিদ্র রহিত। অবাহ্য অর্থাৎ বহির্ভাগ শূন্য, তিনি কিছু ভক্ষণ করেন না, তাঁহাকেও কেহ ভক্ষণ করে না।

মাণ্ডূক্য উপনিষদে—অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং।

অর্থ—অদৃষ্ট অব্যবহার্য্য (বিষয়েরই ব্যবহার হয়) অগ্রাহ্য (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে) অলক্ষণ (লক্ষণ হীন অর্থাৎ বর্ণনীয় নহে) অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য (অনির্দেশনীয়) কেবলমাত্র আত্মা সর্ব্ব অবস্থায় আছেন এইরূপ প্রত্যয়গম্য যাঁহার জ্ঞানে দৃশ্যপ্রপঞ্চ উপশান্ত হয়। শান্ত শিব (মঙ্গলময়) অদ্বৈত।

ঈশ উপনিষদে সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

অর্থ—তিনি সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ময় অশরীরি শিরা ও ব্রণরহিত শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ॥

স্বামী মহাদেবানন্দ।

(ক্রমশঃ)

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপনির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ প্রণালী যাহা ভারতের সাধনার এক বিশেষ লক্ষ্য—সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচন সাপেক্ষ।

শিবতত্ত্ব—বৈদিক কি না ?

আজকাল প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রচেষ্টায় মিশর, বেবিলন ও গ্রীসাদি প্রাচীন সভ্যতা বিস্তারকারী জাতিগণের আবাসভূমে শিবলিঙ্গ পাওয়া যাইতেছে। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে উহা ঐসকল জাতির লিঙ্গোপসনার পরিচায়ক। ভারতীয় আর্য্য সভ্যতাই যে ঐসকল প্রাচীন সভ্যতার মূল ইহাও স্বীকৃত হইতেছে। তত্রাচ লিঙ্গ উপাসনা অনার্য্যাগত বলিয়া উক্ত হয়। শিব অনার্য্য দেবতা। আর্য্যগণ অনার্য্য মদ্র, দ্রাবিড়াদি দেশবাসীগণকে স্ববশে আনয়ন করিবার জন্য যুদ্ধাদি উপায়ে অপারগ হওতঃ ধর্ম্মের পথে দেবতার একত্বাদির মধ্য দিয়া উহাদের বশতাপন্ন করেন। এইরূপে মহাদেব আর্য্যগণের উপাস্য হইয়াছেন। আর্য্যগণ এবম্প্রকার সামঞ্জস্যর বিধানদ্বারা দ্রাবিড়গণকে বশতাপন্ন করিয়াছেন, ইহা কেবল অনুমান মাত্র। বর্তমানে সিন্ধুদেশে করের নিকটে মহেঞ্জদারো নামক স্থানে খনন দ্বারা যে সব অতি প্রাচীন সামগ্রী প্রাপ্তি ঘটিয়াছে তাহাতেও শিব লিঙ্গোপাসনা প্রচলিত থাকার পরিচয় দেয়। এক্ষণে ঐ স্থানও অনার্য্য সেবিত বলিয়া অনুমান করা হইতেছে এবং অস্মদ্দেশের বহু শিক্ষিত বিশারদগণ তৎ সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধাদিও লিখিতেছেন। তাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার উপর নির্ভর করতঃ শিব, মহাদেব, ঈশান বা তল্লিঙ্গ ও যোনিচিহ্ন শক্তিপূজা অনার্য্য হইতে আগত এমন ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাক্‌ডোনাও বলিয়াছেন শিব, মহাদেব, ঈশান শব্দ ঋগ্বেদ বা যজুর্ব্বেদীয় রুদ্রাধ্যায়ে নাই। পণ্ডিত কেইথ তাহার সমর্থন করতঃ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভূমিকায়, যে সব গ্রন্থে ঐসকল নাম নাই তাহা প্রাচীন ও যাহাতে আছে তাহা অর্ব্বাচীন এইরূপ সাব্যস্ত করিয়াছেন। ঋগ্বেদে "শিশ্নদেবগণ" সম্বন্ধে নিন্দা

সূচক বাক্য দেখা যায়। যাস্ক ও সায়নাদি ঐ শব্দার্থ লিঙ্গপরায়ণ ব্যক্তি সমূহ বাচক করিয়াছেন। পাশ্চাত্যগণ স্বকপোলকল্পিতার্থ করতঃ উহা লিঙ্গদেবতার উপাসনাকারী করিয়া বসিয়াছেন।

লিঙ্গ উপাসকের লিঙ্গদেব একটী মাত্র দেবতা। তাহার বহুত্ব সম্ভবে না; শিশ্ন দেবগণ অর্থ শিশ্নদেবের উপাসকগণ করা অসঙ্গতার্থ গ্রহণ হয়। অপর যুক্তি অদূরদর্শিতার ফল স্বরূপ। ঋগ্বেদের ১০।৯২।৯ ইত্যাদি মন্ত্রে শিব, ২।১।৬ ইত্যাদি মন্ত্রে মহাদেব ও ২।৩৩।৯ ইত্যাদি মন্ত্রে ঈশান শব্দ দৃষ্ট হয়। যজুর্ব্বেদের ৩য় অধ্যায়ের ১৫.৬১।৬৩ ইত্যাদি মন্ত্রে শিব ও ১৫।৩৫ মন্ত্রে ঈশান শব্দ দৃষ্ট হয়। উহা মরুৎগণের পিতা রুদ্রদেবতার প্রতিশব্দ বটে।

গীতাতেও দেখিতে পাই সৃষ্টি সম্বন্ধে আছে যে—

"যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবর জঙ্গমং।
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥" ১৩অ।২৬
"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।" ৯অ।১০
"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।" ৯অ।৮
"মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।" ১৪অ।৩
"তাসাং ব্রহ্মমহদ্ যোনিমহং বীজপ্রদঃ পিতা।" ১৪অ।৪

১২৯ সূক্তের ৩।৪।৫ মন্ত্রে পাওয়া যায় "তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসাস্তন্মহিমা জায়াতৈকং" "সতোবন্ধুমসতি" ও 'স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ।" লিঙ্গের চারিদিকের বেষ্টন সতের বন্ধন চিহ্ন বা সর্প বেষ্টনী অথবা গৌরীপট্ট বা গৌরবর্ণ চাকচিক্যময় বাহ্যাবরণ যাহা লিঙ্গাত্মক পুরুষকে আবরণ করিতেছে। Wilson সাহেব ইহার অনুবাদ করিয়াছেন "Selfsupporting Principle beneath and the energy aloft." ইহাকেই লক্ষ্য করতঃ মহর্ষি দধিচী ঈশা উপনিষদে "হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্য পিহিতং মুখং তত্বং পূষন্ অপাবৃণু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।" "পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মি সমূহ তেজো যত্তেরূপং কল্যাণতমং তাত্তপশ্যামি" ইত্যাদি বলিয়াছেন। সাধারণ লোক বন্ধন চিহ্নকে যোনি চিহ্ন বলিয়া উহা গ্রহণ করিতেছে। কোন শ্রুতিতে "উমা সহায়ং" বাক্য আছে। উমা বা ব্রহ্মবিদ্যা সহায়ে যাহাকে জানা যায়। "সহস্বসাম্বিকয়া" অর্থ সহজসিদ্ধ অম্বিকা সহ। এই সকলেই প্রকৃতি পুরুষ সন্নিহিতে ক্রিয়াক্ষম হইয়া সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ করেন ইহাই প্রকাশ মাত্র করে। পুরাণের শিব সংহারকর্ত্তা সেই শিবলিঙ্গে সৃষ্টি দর্শনই লিঙ্গ অর্থ লিঙ্গ গতো ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় "অলিঙ্গ ব্যাপ্য এবচ" যখন ক্রিয়াশীল হন তখনই লিঙ্গ সগুণ বা প্রকৃতি সহ যুক্ত হন। অলিঙ্গের লিঙ্গ "খং ব্রহ্ম" বাক্যে শ্রুতি কহিয়াছেন। ঐ বাক্য অনুলক্ষ্য করতঃ পুরাণে লিঙ্গ লক্ষণ এইরূপ পাওয়া যায়। "আকাশং লিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্য পীঠিকা আলয় সর্ব্বদেবানাং লায়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে॥ সংক্ষেপে এই শিবতত্ত্ব যে বৈদিক তাহা বর্ণিত হইল।

মাসপঞ্জি—চৈত্র, ১৩৪০

উত্তর বিহারে ভূকম্পন এখনও মধ্যে মধ্যে অনুভূত হয়—ব্যারিষ্টার কে, এন, চৌধুরী বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ শিকারী, গুড ফ্রাইডের ছুটিতে মধ্য প্রদেশের এক জঙ্গলে শিকারযাত্রা করেন, এবং এক ব্যাঘ্রশিকারে শিকার কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন—স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৪ সালের ঠাকুর ল লেকচার দিবেন—স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্রের স্থানে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ বঙ্গীয় রাজপরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতে সেদিন এক প্রস্তাব হয় যে হাইকোর্টের কোনও বিচারপতিকে অবসরান্তে গভর্ণমেণ্টের উচ্চকার্য্যে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা উচ্চাদালতের মহান্ কর্ত্তব্যের পক্ষে ব্যাঘাতক—মহাত্মা গান্ধী উত্তর বিহার শারণ অঞ্চলে ভ্রমণ করিতেছেন, তথায় তাহার পক্ষে ও বিপক্ষে উভয়তঃ জন আন্দোলন দেখা যায়—রেওয়া রাজ্যের দরবার হাই স্কুলের হেড মাষ্টার ছাত্রাবাস পর্য্যবেক্ষণ কালে গুলির আঘাতে আহত হন—নেপাল রাজ দরবারে কয়েকজন উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষ অবৈধ জন্ম হেতুতে রাজপাট হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন—কলিকাতার কয়েকজন পাশ্চাত্য চিকিৎসা জীবি খ্যাতনামা ব্রাহ্মণপণ্ডিতকুমার পাকুর রাজ পপিবারের এক কুমারের চিকিৎসার ব্যাপারে হত্যা চক্রান্তে অপরাধী বলিয়া অভিযুক্ত—জারম্যান নাজিদলের প্রধান কয়েকজন নায়কের হত্যা চেষ্টা হয়—বোম্বাই হাকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর এফ, বিউমণ্ট কলিকাতায় ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন—কলিকাতা করপোরেসনে এবার মি, এ, কে, ফজলুল হক মেয়র ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইলেন—স্যর সি, সি, ঘোষ অসুস্থতাহেতু কার্য্য পরিত্যাগ করায় ভারত গভর্ণমেণ্টের আইনসদস্য শ্রীযুক্ত শাহা ... মিত্র ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্য মাতৃভাষায় পা... ...তীয় প্রস্তাবে প্রায় এক বৎসর পরে সরকার পক্ষ অনুমোদন জ্ঞাপন করিয়াছেন; এতদুদ্দেশ্যে সরকারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রতিনিধি দিগকে লইয়া একটী আলোচনা সভা হইবে তাহাতে প্রস্তাবের বিশেষ বিশেষ বিষয় স্থিরীকৃত করিবেন—

ইলোরের মুসলমানগণ হিন্দু পক্ষ আম্মাবারুর সময়ে এবার মহরম উৎসব হইবে বলিয়া, কোনও সংঘর্ষের আশঙ্কাতে মহরম উৎসব স্থগিত রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতে গভর্ণমেণ্টের শিক্ষায় অর্থ মঞ্জুরী প্রশ্নের আলোচনায় মুসলমানগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও অধিক সংখ্যা প্রতিনিধির দাবী করে; তৎপ্রসঙ্গে মন্ত্রী নাজিমুদ্দিন বলেন শিক্ষা বিষয়ে এ প্রদেশে এমন পরিবর্ত্তন হইতে যাইতেছে যে এ সকল প্রশ্ন এখন পৃথক্‌ভাবে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন—কয়লার মূল্য বৃদ্ধি কল্পে এক প্রস্তাব ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হইয়াছে—ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের সংরক্ষণ কল্পে এক আইনের পাণ্ডুলিপি এক সিলেক্ট কমিটির বিবেচনার জন্য গেল—বরদা রাজ্যের দুস্থ কৃষকদিগকে এবার দশ লক্ষাধিক টাকার রাজকর দান হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে—বিহার ভূকম্প পীড়িত স্থান সমূহে কয়লার সরবরাহের সুবিধার জন্য সরকার চেষ্টা করিতেছেন—কলিকাতাতে মেনিন জাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব—মান্দ্রাজ প্রান্তের এসেম্বী সভ্য সি এম্

রঙ্গ আয়ারের প্রস্তাবিত মন্দির প্রবেশ আইনের পাণ্ডুলিপি শীঘ্রই সভাতে আলোচিত হইবে, কাণপুরের অস্পৃশ্য জাতির এক জনসভা এই আইনের প্রতিবাদ করিয়াছে, কয়েকজন বিশিষ্ট সাধু এজন্য অনশন গ্রহণ করিয়াছেন—

ভারত গভর্ণমেণ্ট নবগর, আলোয়ার ও ভাওয়ালপুর রাজ্যকে অনেক টাকা ঋণ দান করিয়াছেন, সরকার পক্ষের উক্তি এসমুদয় টাকা শোধ পাওয়ার সকল সম্ভাবনাই আছে। বেরার প্রদেশে হায়দরাবাদ নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য নিজামের আবেদন উপস্থিত; রাষ্ট্র-সংস্কারে নিজামরাজ্য ফেডারেশন ব্যবস্থার কি স্থান অধিকার করেন তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধিত।—দীল্লিতে কংগ্রেস নেতাদিগের সভাতে কংগ্রেস দল স্বরাজ্যপার্টি পুনঃ উজ্জীবিত করিয়া রাষ্ট্র সভাতে প্রবেশ করিবে বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ইহার সমর্থন করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স আন্দোলন ও তুলিয়া লইতেছেন।

ইংলণ্ডে বস্ত্র বাণিজ্যের দুরবস্থার ল্যাঙ্কেশায়ারে আরও হাহাকার উঠিয়া রুশ সভিয়েট সহ ইংলণ্ডের বাণিজ্য যুক্তির মস্কোতে সভিয়েট রাজ সরকার প্রেরিত হইয়াছে—জাপানের প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ড বাসী দিন দিন অধিক আতঙ্কে অভিভূত হইতেছে—অচিরে ইংলণ্ডে একটা সর্ব্ব দেশীয় অর্থ-যাত্রা সম্মেলন বসিবার সম্ভবনা—জ্যারম্যান নাজি গভর্ণমেণ্ট চারি বৎসরের মেয়াদে নূতন কার্য্যক্রম আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে তিনের এক অংশ বেকার চলিয়া গিয়াছে—রুশ সভিয়েট জাতিসঙ্ঘে যোগদান করিবার সম্ভাবনা আমেরিকার ফিলিপাইন দ্বীপ স্বাধীনতার শেষ নির্দ্ধারণ সিনেট সভার সমক্ষে উপস্থিত—আইরিশ সিনেট সভাকে তুলিয়া দিবার জন্য রাষ্ট্রনেতা ডি, ভেলেরা একটী নুতন আইন করিতে চাহেন—ইতালীতে নূতন রাষ্ট্র নির্ব্বাচনে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তি বা সিগ্‌নোর মুসোলিনীর ক্ষমতা বলবত্তর।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

পঞ্চম বর্ষ] বৈশাখ—১৩৪১ [৭ম সংখ্যা

সাধনার পথে

বর্ত্তমান জগতের লোক নূতন লইয়া অতি মাত্র ব্যস্ত—পুরাতনকে গ্রাহ্য করিতে চাহে না: বর্ত্তমান যে রূপ লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত তাহাতেই সে অভিনিবিষ্ট ও মুগ্ধ; ভবিষ্যৎকেও বড় আসন দিতে চাহে না; যদি বা দেয় তবে তাহা বর্ত্তমানেরই এই মোহের আবেশে—বর্ত্তমানকেই সে ভবিষ্যতে বড় করিয়া দেখে। ভবিষ্যতের যে নিজ মূর্ত্তি আছে, যাহা বর্ত্তমানের ধ্বংসেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহা সে গ্রাহ্য করিতে চায় না।

নূতন ও পুরাতন —বর্ষ গণনায়

অতীতের দশা বর্ত্তমানের হাতে আরও শোচনীয়—অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে আজ আর কাহারও আগ্রহ বা অবসর নাই—অতীত মৃত; তাহার দেহ শব, উহাকে বিস্মৃতিতে বিসর্জ্জন দেওয়াই সঙ্গত। অতীতের ভাবনা করিতে নাই, বিশেষ যাহাদের অতীত উজ্জ্বল—বর্ত্তমান মলিন, তাহাদের। যাহাদের অতীতে কিছুই নাই, বর্ত্তমানই সমুদয়, তাহারাত অতীতের অস্তিত্বই মানিবে না; যদি বা মানে তবে তাহা নগণ্য ও জঘন্য—বর্ব্বরোচিত হেয়। অতীতের যাহারা স্রষ্টা, মানবের গুরু, ধর্ম্ম ও নীতির মন্ত্রদাতা—তাহারাও এই অসভ্য বর্ব্বরের পর্য্যায়ে পরিগণিত।

এইরূপ ধারণার পশ্চাতে রহিয়াছে আধুনিক বিজ্ঞানের একটী বিকট সংস্কার—ক্রমবিকাশ বাদ। এই যে জগত তাহা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াই এই বর্ত্তমান অবস্থাতে আসিয়াছে—জড়, চেতন, ন্যায় ও বিচার বুদ্ধি এ সমুদয়ই ক্রমোন্নতির ফল। সুতরাং বর্ত্তমান সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতির পরাকাষ্ঠায়। এ বর্ত্তমানকে লইয়া আর অতীত বা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা চলে না—চারিদিকেই উল্লাস, উন্নতির প্রবাহ—জড় বিজ্ঞানের বিজয় ডঙ্কা, ভোগ ও লালসার অমিত ভাণ্ডার, সাহিত্য ও

কলার অপূর্ব্ব বিলাস। এ প্রবাহে পড়িয়া আত্মহারার স্বাধীন স্পৃহা আর কোন দিকেই বাধা মানে না। উন্নতির মদিরা আজ জগতকে ভাসাইয়া চলিয়াছে !

কিন্তু ইহার মধ্যেও দিনের পর দিন যায়, দিবার পর রাত্রি আইসে, বৎসরের পর বৎসর কাটে ; বার মাস ছয় ঋতু দিবা রাত্রি—এ সমুদয়ই কালচক্রের আবর্ত্তন নির্দ্দেশ করে। এ গতি এক ভাবে, সমানরূপে, একটানা উন্নতির দিকে চলে না। উত্থান পতন, উন্নয়ন অবতরণ, বিকাশ ও লয় এই গতির ক্রম নির্দ্দেশ করিতেছে। এই যে বর্ত্তমান তাহা বর্ত্তমান মনুষ্যের অবস্থা বা মনোবৃত্তির কেবল কোন সরল সহজ স্বাভাবিক ক্রম বিকাশের পরিণতি মাত্র নয় ; উহাতে অবনতি ও পতনের কারণ-চিহ্নও বহুল বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার অনেক অধঃপাতন বা নিম্নগমনের হাত এড়াইয়াই এই উন্নতির পদবীতে উঠিতে হইয়াছে। এই উন্নতি ও অবনতির সমষ্টি দৃষ্টিতে বর্ত্তমানের গুণাগুণ বিচার করিতে হইবে—কালের গতি বা যুগের প্রকৃতি বুঝিতে হইবে।

বৎসরের পর বৎসর আসিয়া সর্ব্বোপরি এই কালের গতিই নির্দ্দেশ করিয়া যায় মাত্র। নববর্ষের জয় গান আজ সকলেই করিতেছে। বর্ত্তমানের মদিরায় আজ সকলেই বিভোর। কিন্তু নব বর্ষের এই শুভাগমন কালনেমির কোন্ দিগের গতি নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহার বিচার কেবল বর্ত্তমানের দৃষ্টিতে করিলে চলিবে না, অতীত ও ভবিষ্যতের সমষ্টি বিচার তাহার সহিত যোগ করিতে হইবে। শিক্ষা ও সমাজ নীতিতে, রাষ্ট্র ও জীবন যাত্রার দৈনন্দিন ব্যাপারে আমরা এক্ষণে বৎসরের পর বৎসর কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইতেছি, বাস্তবের চিত্রে তাহা দেখিয়া লওয়া আর কঠিন বিষয় নহে। তাহার যথার্থ দৃষ্টি মিলিলেই ভবিষ্যতেও সুপথ মিলিবে। ভবিষ্যতের পক্ষে বর্ত্তমান উত্তেজনা দান করিতে পারে বটে, কিন্তু অনুপ্রেরণা লইতে হয় অতীতের হাতে, বিশেষতঃ ঐতিহ্যের লীলা ক্ষেত্র এই ভারত-ভূমিতে॥

বাঙ্গলার নূতন বৎসর।—

বাঙ্গলার বর্ষগণনায় আবার এক নূতন বৎসর আসিল। নব বর্ষের যে মর্য্যাদা দেওয়া উচিত একালে এদেশের লোকে তাহা দেয় না, তাহা একাধিক বার বলিয়াছি ; আজ আবার বলিব। যে বিজাতীয় প্রভাব দেশের আপন বলিয়া যাহা কিছু তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া লোকের মনোবৃত্তি ও কর্ম্মপ্রবৃত্তিতে বিষম বিকার আনয়ন করিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গলার নববর্ষ তাহার আপন মাহাত্ম্যের উপযুক্ত সম্মান লাভ করিতে পারিতেছে না—সঙ্গে সঙ্গে জাতির যাহা কিছু মহান্ ও শ্লাঘার বিষয় তাহার সমস্তই অবজ্ঞাত ও নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে। পরিণাম তাহার সেইরূপই শোচনীয়, সকল দিকে দেখা যাইতেছে—বৎসরের পর বৎসর যতই চলিয়া যাইতেছে, জাতীয় সঙ্কট ততই গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে—নব বর্ষের আগমনে আর কেহ শুভ ও কল্যাণের কামনা করিয়া উহার সম্বর্দ্ধনা করিতে পারে না ; আর সেই কামনার অন্তরালে যে উৎসাহ ও সজীবতা জাগ্রত ছিল তাহাও আর ভাবী বর্ষফল গণনায় মঙ্গলের চিত্র দেখাইতে পারে না। তাহার পরিবর্ত্তে নির্য্যাতনের আতঙ্ক, বিরোধের বিভীষিকা, দৈন্য ও অনশনের যাতনা, রোগ শোক মহামারী নব বর্ষের ফলাফল গণনায় দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। এ দুর্দ্দশার প্রতিকার করিতে হইলে, আজ সকলে দেশপ্রকৃতি ও লোকপ্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করিয়া পরকীয় মোহে ও বিজাতীয় ভাবে জাতীয় জীবনে যে বিভ্রাট ঘটাইয়াছে, তাহার দিকেই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টিপাত করিতে

হইবে। বাঙ্গালার "নব বর্ষে"কে বাঙ্গালী যে ভাবে দেখে, তাহাতে সে দিন দিন কতদূর আত্মবিস্মৃত ও আত্মমর্য্যাদা হীন হইয়া গিয়াছে, তাহার পর্য্যাপ্ত পরিচয় ঘটে।

বর্ষগণনায় বাঙ্গালার নিজ বর্ষকাল বঙ্গাব্দদ্বারা নির্দ্দেশিত হয়। ভারতে প্রচলিত অন্যান্য অব্দের সহিত ইহার সামঞ্জস্য বা মিল আছে; তাহার মধ্যে ইহার বৈশিষ্ট্যও আছে। কোনও আকস্মিক ঘটনা মাত্র হইতে ইহার উদ্ভব হয় নাই—মহাবিষুব সংক্রমণে প্রকৃতির যে বিশ্বব্যাপী পরিবর্ত্তন ঘটে, ভূলোক ও দ্যুলোকে যে অবস্থান্তর আইসে, ঋতুর নব বিকাশে পৃথ্বীতলে ভূমি জল ও বায়ুমণ্ডলের অবস্থার যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই এই নব বর্ষের পরিকল্পনা হয়। বাঙ্গালার ভৌগোলিক অবস্থিতিতেএই কালগণনার আর বিশেষ মাহাত্ম্য আছে—বসন্তের পূর্ণতার মুখে দারুণ গ্রীষ্মের সূচনা হইল, কাল-বৈশাখীর ভীষণ প্রভঞ্জন ও করাল মেঘাড়ম্বর হইতে নব বর্ষের বর্ষ ধারার সূত্রপাত হইয়াছে, গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ উল্লঙ্ঘন করিয়াই দিগ্‌দিগন্ত হইতে মলয়বাতাস শরীর মন শীতল করিয়া চলে—এরূপ অবস্থায় নববর্ষের আগমন কেবল প্রাকৃতিক জগতের কোনও অবস্থান্তরের সহিত কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সম্পর্কিত নহে, মানব জীবনের নানাবিধ ভয় ভ্রান্তি দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে নূতন সুখ শান্তি আশা উৎসাহ ও নবীন কর্ম্ম প্রেরণাও এই নব বর্ষ আনয়ন করে। বিগতের বজ্র কঠিন নিগড় ছেদন করিয়া, গ্রীষ্মের দুঃসহ উত্তাপ সহ্য করিয়া কালান্তক যমরূপী কালবৈশাখীর ভীষণ বাত্যাবিভীষিকা ভেদ করিয়া বাঙ্গলার নববৈশাখী আবার ফুটিয়া উঠিবে, ভারতের অন্তরাত্মা—বাঙ্গলার প্রতিভা—বৎসরের পর বৎসর সেই প্রতীক্ষাই করিয়া থাকে।

ঐতিহ্যের পৃষ্ঠে বঙ্গীয় শতাব্দীর আর এক বিশেষত্ব আছে—কোন অবস্থায় কাহার দ্বারা এই বঙ্গাব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা লইয়া ঐতিহাসিকদিগের মতবিরোধ সৃষ্টি করে; এবং অনেকে ইহাকে অনির্ণেয় বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু যে সময়পরিমাণ ইহাদ্বারা নির্দ্দেশিত হয়, তাহাতে ঐতিহাসিক বাঙ্গলার কাল-পরিধিরও একটা সীমা পাওয়া যায়। তের চৌদ্দ শত বৎসরের পূর্ব্বেকার বাংলার ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। ঐ সময়ে সমগ্র ভারতের ইতিহাসেও এক যুগপরিবর্ত্তন ঘটে—উত্তর ভারতে মগধ ও মালবের পরাক্রান্ত বিক্রম-সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছে; বাহির হইতে আগত হুনদিগকে বিতাড়িত করিয়া থানেশ্বরে বর্দ্ধন-বংশ পুনঃ নূতন সাম্রাজ্যে বিস্তার প্রয়াস পাইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণে চালুক্য বংশ মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহাতে বাধা দান করে এবং বাঙ্গলার রাষ্ট্রিক জীবনের সূচনা হয়—বাঙ্গালী রাজা শশাঙ্ক তখন বঙ্গদেশ হইতে থানেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়া সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তে আপন আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সময়-স্থিতি ও কীর্ত্তি-গৌরব লক্ষ্যে রাজা শশাঙ্ককেই বঙ্গীয় শতাব্দীর প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। তদবধি শূর, পাল ও সেন বংশীয় হিন্দু রাজা ও বঙ্গীয় মুসলমান নৃপতিদিগের গৌরবকাহিনীও এই বঙ্গীয় অব্দেই গ্রথিত হইয়া আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই কালের মধ্যে ধর্ম্ম, সমাজ সহিত্য প্রভৃতিতে বাঙ্গলা এক নূতন রূপে প্রসারলাভ করিয়া ভারতীয় সাধনার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। তাহাতে বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য এই নূতন অব্দগণনার অনুরূপেই রক্ষা পাইয়াছে। নব বর্ষ দিনে বাঙ্গালী ইহার অনুধাবণায় আপন ইতিহাসেরও গুরুত্ব বুঝিয়া জাতীয়তার নূতন প্রেরণা লাভ করিতে পারে।

পরলোকে প্রমথনাথ বসু।—

রাঁচি-প্রবাসী প্রবীণ কর্ম্মী ও চিন্তাশীল লেখক প্রমথ নাথ বসু মহাশয় এই মাসে পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স প্রায় আশি বৎসর হইয়াছিল; কিন্তু এযাবৎ কাল তাঁহার কর্ম্মপ্রবণতা ও চিন্তাশীলতা নবীনের মতই ছিল। তাহার বিদ্যানুরাগ ও লেখনীপ্রভাব চিরদিন অব্যাহত ছিল; নানাদিকে বহু গ্রন্থ ও পুস্তিকা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন; সাময়িক সংবাদ পত্রে জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যে চিন্তা ধারার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা একান্ত দুর্লভ। ভারতের সাধনার বিগত সংখ্যাতেও তাঁহার এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, আরও প্রকাশিত হইবার জন্য রহিয়াছে।

স্বর্গীয় প্রমথ নাথ বসু সর্ব্বসাধারণে পি. এন. বসু নামে পরিচিত ছিলেন। দেশের অগ্রশীল সমাজে তাহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। অদ্যকার পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাব তিনি বিশেষ রূপেই বোধ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে এদেশবাসীর পক্ষে প্রতিষ্ঠা ও পদবী লাভ যে বিলাতে গমন ও বিলাতি শিক্ষা লাভ এবং তদনন্তর সরকারী চাকুরীর উচ্চ পদবী লাভ—এ সমুদয়ই তাঁহার ঘটিয়াছিল। তৎফলে এদেশে যে একটা অর্দ্ধ বিলাতি বাঙ্গালী সমাজ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই তিনি নানা প্রকারে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। তরুণ বয়সে তিনি ইংলণ্ড গমন করিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এস-সি পরীক্ষা পাশ, ভূতত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থান পর্য্যবেক্ষণ ও নানা গবেষণার কার্য্যে অচিরে তিনি যশস্বী হন। কথিত আছে যে তাঁহারই গবেষণা ফলে আজ বিহার প্রদেশের যেই স্থানে ধনকুবের টাটার বিরাট লোহার কারখানা চলিতেছে, সেইখানের খনি সকল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কার্য্যসূত্রে তিনি দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক উচ্চভাবাপন্ন লোকের সহিত পরিচিত ছিলেন, ব্যক্তিগত সম্পর্কে অনেক উচ্চপদস্থ লোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল—তিনি স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জামাতা; আর বর্ত্তমান সুপ্রসিদ্ধ আইন ব্যবসায়ী ও রাজসরকারের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ সচিব শ্রীযুক্ত বি-এল মিত্র মহাশয় তাঁহার জামাতা।

কিন্তু বসু মহাশয়ের হৃদয়ের আন্তরিক সম্বন্ধ ছিল দেশের প্রকৃত সত্তার সহিত এবং তাহার প্রাণের টান ছিল দেশবাসীর বাস্তবিক কল্যাণের দিকে। নিজের জীবনে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বর্ত্তমান বিজাতীয় প্রভাব ও বৈদেশিক ভাবের বিষময় ফল প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াই তিনি স্বদেশের সমাজ ও ভারতীয় জীবনের গুণরাশির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কার্য্যে তিনি যে অসাধারণ ধীশক্তি, ও স্থির চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার আর তুলনা নাই বলিলেও চলে—তাঁহার রচিত পুস্তক সমূহে ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক, সকল দিক দিয়াই তিনি মানব সভ্যতার বিবিধ দিগ্‌দর্শন ও তৎসহ ভারতীয় সভ্যতা ও সাধনার উচ্চ প্রকর্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত; পাশ্চাত্য মনীষার দীক্ষায় (মিল, স্পেনসার প্রভৃতির) দীক্ষিত—তিনি কখনও হিন্দুশাস্ত্র পড়েন নাই, হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত মহান নীতির সহিত তাহার সাক্ষাত পরিচয় ঘটিয়াছিল, এরূপ সম্ভবপর নয়; তথাপি তিনি পাশ্চাত্য সমাজ ও আধুনিক বিজ্ঞানের দোষসমূহ যে ভাবে দেখিয়াছেন, এবং ভারতীয় সমাজ ও ভারতীয় সভ্যতার প্রশংসার পরোক্ষে ভারতীয় ধর্ম্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা

দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা তাহার এক অসাধারণ সত্যনিষ্ঠতারই পরিচয় দেয়। দুঃখের বিষয় আজ কাল জগতে সত্যের সমাদর নাই-এজন্য বসু মহাশয়ের রচিত অমূল্য পুস্তকগুলি বড় কেহ যত্ন করিয়া পড়ে না। আজ মিথ্যার রটনায় সকলে মত্ত, ক্ষণিক আমোদ লাভের নিমিত্ত লোকে লালায়িত, বিজ্ঞান তাহার সেবায় নিয়োজিত, কলা নামীয় অলীক কথার সাজে সাহিত্য সত্য-বিচ্যুত। বসু মহাশয়ের গ্রন্থাবলী ইহারই কার্য্যকরী প্রতিবাদ। সত্যনিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইলে এ সকল বহি লোকে আদর করিয়া পড়িবে, অথবা উহা পড়িলেও সত্যনিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে পারে। সময়ান্তরে এ সকল পুস্তকের বিস্তারিত আলোচনার আকাঙ্ক্ষা রহিল। আজ বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে যে শোকার্ত্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছি, তাহারই মাত্র কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতেছি। দেশের যেই কয়েকজন চিন্তাশীল ও মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ভারতের সাধনাকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সর্ব্বদা ইহার কল্যাণ কামনা করেন, দূর প্রবাসের এই প্রবীণ লোকটী তাহাদের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন। দেশের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা ও নানা প্রকার গুরুতর সমস্যার মধ্যে ভারতীয় সাধনার অন্তর্নিহিত সত্যের উপলব্ধি করিয়া এবং তাহাকে জাগাইয়া তুলিয়া তাহারই বলে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক সুগঠিত করিয়া তুলিতে পারিলেই এ জাতির রক্ষা ও কল্যাণ হইবে, আর জগতের কল্যাণও ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত—ভারতের সাধনার এই মৌলিক লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই আজ পাঁচ বৎসর হইল বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"ভারতের সাধনা পত্রিকাতে দেশের বিশেষ উপকার হইবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।"

দেশের বর্ত্তমান এই অবস্থাও রাষ্ট্রিক আন্দোলনের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া বসু মহাশয় মনে করিয়াছিলেন, এক্ষণে সমগ্র ভারতব্যাপী একটি আন্দোলন ভারতীয় সাধনার মৌলিক দৃষ্টিতে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তই হওয়া উচিত। এতদুদ্দেশ্যে তিনি বিগত ১৩৩৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন, —"আমি দেখছি যে ভারতীয় সাধনা মূলক শিক্ষা প্রচার সমিতি হইতেই আমার প্রস্তাবিত সমিতির কার্য্য হইতে পারে"। পরেই আবার লিখিলেন, "আপনারা যে মহৎ কার্য্য হস্তে লইয়াছেন তাহাতে আমি যোগদান দিয়া ধন্য হইব"।...ইত্যাদি। ভারতের সাধনা পত্রিকাকে তিনি আন্তরিক ভাল বাসিতেন এবং ইহার উদ্দেশ্য পূর্ণ সমর্থন করিতেন। বসুমহাশয়ের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল উপরি উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ভারতীয় সাধনামূলক শিক্ষাপরিষদের আরও বিস্তৃততর সংগঠন হয়। এবং তাহাতে বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যোগ দান করেন। এই জন্য তিনি তিনবার কলিকাতাতে আসিয়া পরিষদের অধিবেশনে যোগ দান করেন এবং শেষ দিন পর্য্যন্ত ইহার বিস্তারার্থে ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ তাহারই আগ্রহবশে শিক্ষাপরিষদে ভারতীয় সাধনামূলক সাধারণ সংসদ বা Indian culture Association এর প্রসারসাধন করা হয়। জাতীয় শিক্ষার প্রতিও বসু মহাশয়ের অসাধারণ অনুরাগ ছিল; বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় হইতেই তিনি উহার সহিত ঘনিষ্টভাবে যোগ দান করিয়াছিলেন; কয়েক বৎসর তিনি উহার রেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জাতীয় সাধনার মৌলিক নীতিকে কর্ম্মসূত্র বলিয়া গ্রহণ করাতে উপস্থিত পরিষদে তিনি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন এবং ইহার উপরে এত বিশ্বাস রাখিয়া ইহার এই প্রসার সাধনে এই আগ্রহ দেখাইয়া গিয়াছেন। সংসদের পূর্ণাঙ্গ গঠন প্রণালী ও ইহা কর্ম্মের সূচনা দেখিয়া যাইবার জন্য

তাঁহার অত্যধিক আকাঙ্খা ছিল। অতিশয় পরিতাপের বিষয় তিনি তাহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রচলিত প্রণালীর সভা সমিতির উপরে ব্যক্তিগত ভাবে আমরা বড় আস্থা স্থাপন করি না। যে আন্তরিকতা লইয়া বসু মহাশয় সুদীর্ঘ কাল এই দিকে চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিষ্ফল যাইবে না—ইহাই বিশ্বাস করি।

সভ্যতার মাপকাঠি—

মাত্র ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন কয়েক খানি আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ জাপানের দ্বার দেশে গিয়া উপস্থিত হয় এবং উহাকে জগতের বাণিজ্যক্ষেত্রে উদ্‌ঘাটিত করিবার জন্য দাবী করে, তখন জাপানকে অজ্ঞাত ও অসভ্য লোকের দেশ বলিয়াই গণ্য হইত। তাহার পরেও বাঙ্গালী কবির কাছে সে 'অসভ্য জাপান,' এই অবজ্ঞায় টিটকারী পাইয়াছে। আজ জাপান উন্নতির শিখরে; পৃথিবীর সকল জাতির ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। বীরত্বে, পণ্যে ও ঐশ্বর্য্যে তাহার সমকক্ষ কেহ আছে কি না, ইহা একটি জিজ্ঞাসার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে জাপানকে আজ সভ্যতার উচ্চস্তরে স্থান দিতেও আর কেহ কুণ্ঠিত হইবে না। আধুনিক জগত যে মাপে সভ্যতার ওজন করে বর্ত্তমান জাপান তাহার সেই পশ্চিমের পথপ্রদর্শকদিগের নিকট তাহা উত্তমরূপেই শিখিয়া লইয়াছে। পাশ্চাত্যের কর্ম্মনীতি ব্যবহারিক উপযোগিতা; ইহার উপরে আর কোনও নীতিসূত্র—মানবীয় বা ঐশ্বরীয় ধর্ম্ম—morals বা religion আছে তাহা সে কর্ম্ম ক্ষেত্রে মানে না। ফলে সমাজে সভ্যতার নামে একটা স্বার্থবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে মাত্র—অর্থশাস্ত্র আজ ইহাদের বেদ কোরাণ ও বাইবেল, স্বার্থসিদ্ধি তার মন্ত্র ও শিক্ষার ফল। ফলে এক প্রকার হীন বৈশ্যবৃত্তি আজ জগতে প্রধান্য লাভ করিয়া বসিয়াছে, ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ্য ভাবও তাহার দ্বারা ক্রীত বিক্রীত হইতেছে; কেবল মাত্র শূদ্রত্বের কাছে উহাকে মধ্যে মধ্যে নত হইতে হয় মাত্র। এই ভাব লইয়াই পশ্চাত্য জগত আজ নিজেদের সভ্যতার উচ্চ স্তরে উন্নত বলিয়া মনে করে এবং আপন আদর্শে অপরকে উন্নত বা সভ্য করিয়া লইতে চাহে। এমন একদিন ছিল যখন প্রত্যেক জাতি অপর দেশ বা জাতির লোককে অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিত। এই ভাবেই ভারতীয় আর্য্যেরা আপন জাতি ও গণ্ডীর বাহিরের লোকদিগকে অনার্য্য বা দাস বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে, আদি খৃষ্টানরা প্রাচীন সুসভ্য গ্রীকদিগকেও 'হিদেন' বলিয়া গালি দিয়াছে, মুসলমান হিন্দুকে কাফের বলিয়া বিদ্বেষ করিয়াছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য লোকের নিকট এইরূপেই পূর্ব্ব কালের সমুদয় লোক অনুন্নত ও অসভ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রাচীনেরা যেমন ভূগোলকে অগ্রাহ করিয়া চলিত আধুনিক অর্ব্বাচীনেরা তেমনই ইতিহাসের অবমানন। করে। সভ্যতার তুলনাত্মক বিচার কেবল সমসাময়িক জাতির মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া থাকা উচিত নহে, প্রাচীন ও আধুনিক মানবের সভ্যতারও সম্যকরূপ তুলনা হওয়া আবশ্যক। ইহাদের বিভিন্ন কালের কর্ম্মনীতির মৌলিক সূত্র কি কি, তাহার নির্দ্ধারণে উহা সহজেই হইতে পারে। প্রাচীন সভ্যতার প্রকৃতি আধুনিক সভ্যতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট, তাহা ঐ নীতিসূত্রের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হইতেই নির্ণীত হইতে পারে। যে জাপানের উন্নতিরেখার প্রান্তবিন্দুদ্বয় একজনের জীবনস্মৃতির মধ্যে নিবদ্ধ রাখা যায়, তাহাদেরই একজন ইউরোপীয় সমাজে গিয়া বলিয়া আসিয়াছেন যে—"আমরা দুই হাজার বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর অপর সকল জাতির শান্তিতে ব্যাঘাত করি নাই, পক্ষান্তরে আমাদের অপার্থিব ভাবসম্পদ ও কলাকৌশল এবং আমাদের হস্তশিল্পের কারুকার্য্যের দ্বারা আমরা লোকের নিকট অপরিচিত ছিলাম না,

তবুও তখন আমরা "অসভ্য" আখ্যায় অবজ্ঞাত হইতাম। আজ যখন অপর জাতির সহিত যুদ্ধ করিয়াছি, হাজার হাজার শত্রুর প্রাণ বিনাশ করিয়াছি, তখন আর তোমরা আমাদিগকে সভ্য জাতি বলিয়া মানিয়া লইতে দ্বিধা বোধ কর না।"

ন্যায়ে উন্নতি—

সমাজের দুর্নীতি নিবারণের নিমিত্তই আইনের সৃষ্টি। আইনের বন্ধন খুব শক্ত হওয়াই উচিত। কারণ মানবসমাজে দুর্নীতির অবকাশ বিস্তর। যে সমাজে দুর্নীতির দমনস্পৃহা যত প্রবল, সে সমাজে আইনের কঠোরতা তত অধিক। প্রাচীন সমাজের আইনের এত বহুলতা ছিল না, কিন্তু তাহা কঠিন ছিল, তাহাতে সমাজে দুর্নীতির প্রশ্রয় পাইত না। চীনদেশে প্রাচীন রীতিনীতি এখনও অনেকটা বিদ্যমান। সম্প্রতি তথাকার কোন একজন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ অন্যায়রূপ উৎপীড়ন ও লোকের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করে। প্রাদেশিক গভর্ণর তৎক্ষণাৎ বিচারার্থ তাহাকে ডাকিয়া পাঠান; অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট যত টাকা উৎকোচ লইয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ টাকা তাহার জরিমানা হইল। কিন্তু ইহাতেও তাহার নিষ্কৃতি হইল না—ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য হইতে তাহাকে দিনমজুরের কার্য্য করিবার আদেশ হইল—নগরের রাস্তানির্ম্মাণে যেখানে বহু কুলী মাথায় ঝুড়ি করিয়া মাটি বহিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে লোকে দেখিল একজনের পৃষ্ঠে লেখা আছে, "আমি তুং আউ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্"। আজকালকার সভ্য জগতের চক্ষে ইহা বর্ব্বরোচিত প্রাচীন বিধান বলিয়া মনে হইবে। এদেশের মধ্যযুগের কাজির বিচারের নাম করিয়া অনেকে তামাসা উপভোগ করেন। কিন্তু তাহাতে ন্যায় ও বিচারের যে উদ্দেশ্য তাহা এখনকার অপেক্ষা অধিক সিদ্ধ হইত কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। অতঃপর চীনের উক্ত প্রদেশে উৎকোচের নাম পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা সন্দেহ, অথবা উৎকোচ গ্রহণ তথায় এতই বিরল ও ন্যায়ানুভূতির বিরুদ্ধ যে ঐরূপ কঠোর দণ্ডের বিধান করিতে হইয়াছে। আজকাল এদেশে উৎকোচ গ্রহণ বা উৎকোচ দান, যে কোনও প্রকারেই হউক, কার্য্যক্ষেত্রের পদে পদে দৈনন্দিন ব্যাপার, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আইনের শিথিলতা ও তৎসঙ্গে লোকের ন্যায়ানুভূতির হ্রাস ঘটাতেই এইরূপ হইয়াছে। সভ্যতার স্তরে উঠিয়া বাস্তবিক আমরা উন্নত কি অবনত তাহা আদালত ও বিচারাদালতের অবস্থা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।

গভর্ণরের হত্যাচেষ্টা—

দার্জ্জিলিংএর শৈলশিখরে বাঙ্গলার লাট স্যর জন এণ্ডারসনের প্রাণনাশের চেষ্টায় বাঙ্গলার একশ্রেণীর যুবকের মনে কিরূপ গুরুতর ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার আর একটী বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেল; চিত্তের কতখানি বিকৃতি ঘটিলে, মনের কিরূপ শিক্ষা ও ভাবনায়, জীবনে কতখানি বিতৃষ্ণা জন্মিলে, দেশের কিরূপ অবস্থায় যুবকেরা এইরূপ দুঃসাহসিক ও আত্মবিধ্বংসী নৃশংস ব্যাপারে লিপ্ত হইতে পারে তাহাই ভাবিবার বিষয়। এরূপ একটা স্থায়ী অবস্থা যে দেশের ঘটিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ করা যায় না। দেশের শাসনশক্তি ইহার উচ্ছেদ সাধনে ক্রমে ক্রমে অনেক উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন, জাতির প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেই ইহার বিরোধী, আমরা ধর্ম্ম ও জাতীয় সাধনার নামেই ইহার প্রতিবাদ করিয়া থাকি। প্রতিকারের অনেক চেষ্টাই হইয়াছে ও

হইতেছে, রাষ্ট্রের অর্থ ও মনীষাবল প্রধানতঃ এইজন্য নিয়োজিত। এদেশের লোকও স্বভাবতঃ শান্তি চায়, রাজভক্তি লোকের প্রকৃতিগত—বিশেষতঃ দেশের যাহারা ধন বিদ্যা ও পদবীতে উন্নত ও শক্তিমান তাহারা সকলেই রাজসরকারের অনুগত; অধিকাংশের সম্পদ সরকারী সংশ্রব হইতে উদ্ভূত। যে বিকৃত জাতীয়তা রাজশক্তির বিরুদ্ধে একজনকে অপরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ করে তাহা এদেশে বিরল; পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত ঈর্ষা, ধন ও পদমর্য্যাদার পার্থক্যবোধ ও সাম্প্রদায়িক বিবাদ পদে পদে এদেশে পরিলক্ষিত হইতেছে। এইরূপ অবস্থাতে এইরূপ বিকৃত ভাবের উদ্ভব যেরূপ অস্বাভাবিক, তাহা কোনও অস্বাভাবিক অবস্থা হইতেই মাত্র আসিতে পারে। এই অস্বাভাবিক ব্যাপারের রহস্যভেদ করা দুষ্কর। দেখা গিয়াছে যে অতিমাত্র শিক্ষিত, বিনয়গুণসম্পন্ন ও রাজভক্ত পিতামাতার সন্তান এই দুষ্কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে; আর সরকার বহু চেষ্টা করিয়াও এ যাবত ইহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারেন নাই।

এই যে অপচার আজ দেশের মধ্যে ঘৃণা ভীতি ও অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, সাধারণতঃ ইহার দুই প্রকারের কারণ উল্লেখ শুনা যায়। অনেকে বলিবে সাক্ষাতে হউক বা পরোক্ষে হউক এদেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক জাতীয় আন্দোলনের ফলেই ইহার সৃষ্ট হইয়াছে—কংগ্রেস যে জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাই এক্ষণে বিপ্লব বা সন্ত্রাসে আসিয়া পরিণত হইয়াছে; স্থুল দৃষ্টিতে অনেকের ইহা মনে হইতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসের মূল নীতি যে এরূপ কার্য্যপ্রণালীর বিরোধী এবং কংগ্রেসের স্থিতি যে দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিরই অনুকূল, তাহা প্রকৃত রাজনীতির চক্ষে ধরিয়া লওয়া কঠিন বিষয় নয়। কংগ্রেসের স্থিতিকাল ও কর্ম্মনীতি এবং বর্ত্তমান উহার পরিচালনা, পরিণাম ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, এরূপ মতবাদ পোষণ করা যাইতে পারে না। আর এক পক্ষ বলেন—দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সহিত ইহার এমন সম্বন্ধ নাই। যেমন অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত আছে। বাঙ্গলার শিক্ষিত যুবকরা জীবিকা বা কোনও উপায় পাইতেছে না; বেকারের চরম দুর্দ্দশায় পড়িয়া ইহারা জীবনে হতাশ হইয়া এরূপ আত্মহননে প্রবৃত্ত হইতেছে, রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খা এই ক্ষেত্রে গৌণ, অর্থনৈতিক ঈর্ষা ও বিজাতীয়ের প্রতি বিদ্বেষ কতকটা এই হতাশ জীবনের ক্রূর প্রবৃত্তিতে উত্তেজনা দিতেছে মাত্র। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি ও স্বয়ং রাজ প্রতিনিধি এই কথা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও ইহা যথার্থ বলিয়া মনে হয় না—বেকার সমস্যা আজ এদেশে নূতন নহে। যাহারা নীরবে অর্থ-ক্লেশ ভোগ করে, তাহাদিগের সংখ্যাই এদেশে অধিক, তাহাদের মনে এরূপ দুষ্ক্রিয়ার ভাবনা স্থান পায় না উহারা "দৃষ্টের দোহাই দিয়াই নিরস্ত থাকে। আবার অনেক অবস্থাপন্ন লোকের পুত্রই এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে। বাঙ্গালীর বেকারী যুবক উদ্বন্ধনে জীবন দিয়াছে, অবস্থার পীড়নে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে, রেল পথে মাথা রাখিয়া দেহ ত্যাগ করিয়া অবস্থার পীড়ন হইতে রক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু যাহারা বিপ্লব ও সংগ্রাম সৃষ্টি করিয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তাহাদের আর্থিক বা মানসিক অবস্থা এরূপ নহে।

যে বিকৃত অবস্থা বাঙ্গালী জীবনে এই বিভ্রাট আনয়ন করিয়াছে, তাহা কেবল রাজনীতি বা অর্থনীতির চিন্তার বিষয় নহে—অদ্যকার জগতের সাধারণ সমাজ নীতিই উহার জন্য দায়ী। আর তাহার নিয়ন্ত্রণসূত্র হইয়াছে আজিকার এই পাশ্চাত্যের হাতে গঠিত লোকের শিক্ষা ও জীবনাদর্শ। স্বাধীন চিন্তায় প্রসার সাধন এবং ধর্ম্ম ও নীতিকে বিসর্জ্জন দিয়াই আধুনিক—পাশ্চাত্য

সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বিজ্ঞান ও যুক্তি বাদের (rationalism) নামে আজ অনেক কুসংস্কার মানব মনে স্থান পাইয়াছে—পর-মত-সহন, নিজ জ্ঞান ও ভোগের গণ্ডী ছাড়িয়া অন্য কোনও বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার কেহ করিতে চাহে না। সমাজ রক্ষার যে প্রধান গুণ (cardinal virtue) পূর্ব্বে মানব জীবনে বদ্ধমূল ছিল—দয়া, দান, ঐক্য, শ্রদ্ধা ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি তাহা এখন লোকচরিত্র হইতে বিলুপ্তপ্রায়; সমাজ এখন সমুদয় বন্ধন কাটাইয়া মুক্ত হইতে চাহে; পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী—ইহাদের স্বাভাবিক পারিবারিক বন্ধন পর্য্যন্ত আর টিকিতেছে না। সাহিত্যে এক নব ভাববিলাসের বন্যা নীতি ও শীলতাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে—যুবক-যুবতীর অবাধ মিলনে নানা প্রকার ব্যভিচার এই মুক্ত স্বাধীনতার নামেই চলিতেছে; ইহার উপর আবেগপূর্ণ নভেল ও গল্পের বাহুল্য, গ্রামোফনের উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা ও সিনেমার দুর্দ্দর্ষ ও দুঃসাহসিকার নানা প্রকার চলচ্চিত্র অত্যকার এই কৃত্রিম জীবনের কৃত্রিমতা বাড়াইয়াই চলিয়াছে। ইহাদের প্রভাবে পড়িয়া জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই কেহ মনের গতি সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখিতে পারিতেছে না—বাঙ্গলার যুবকদিগের ভাবপ্রবণ প্রাণে এই প্রভাব অধিক প্রবল হইয়া আরও অধিকতর বিকৃতির সৃষ্টি করিয়াছে। আজ যে মতিভ্রংশতা রাজনৈতিক অপরাধে ধরা পড়িতেছে, রাষ্ট্র, সমাজ ও পারিবারিক ব্যাপারেও সর্ব্বত্র তাহাই বিবিধ প্রকারে বিদ্যমান। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে যে বিষময় প্রভাবে ইহার উদ্ভব তাহারই উচ্ছেদ সাধন করিতে হয়।

মেয়রগিরির লড়াই।—

কলিকাতা করপরেশনের মেয়র পদবী লইয়া সত্য সত্যই একটি জঘন্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে একটি মহাকাব্য বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন—বীররস, শান্তরস, করুণরস, হাস্যরস প্রভৃতি সমুদয় রসেরই নাকি সমাবেশ ইহাতে আছে। যাহারা ইহাতে এরূপ রসসঞ্চার দেখিয়াছেন, তাহারা নিজেরাও ঐরূপ কোনও রস-চক্রে বিচরণ করেন। কিন্তু যাহারা ইহার পারস্পর্য্য ও আন্তরিক অবস্থা অবগত আছেন, তাহারা ইহাকে একটা খণ্ড যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন। তবে যুদ্ধ বলিতে যে মনুষ্যোচিত মহিম ভাব তাহাতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে তাহার কিছুই নাই—যে শক্তি ও দায়িত্বের ক্রিয়া তাহাতে থাকে, তাহা এখানে বর্জ্জিত। মানুষের উপযুক্ত বিবাদ বিসম্বাদ আছে, যুদ্ধ ও বিতর্ক হয়; কিন্তু তাহাতে থাকে মানবধর্ম্মের কোনও নীতির পরিচালনা। আর মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে যে বিবাদ ও মারামারি বা কামড়াকামড়ি হয়, তাহাতে কেবল স্বার্থ বা রিপুর প্রেরণা মাত্র থাকে। মানুষ যখন নীতিকে ছাড়িয়া আপন ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রেরণায় পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করে, তখন সে এই সকল ইতর প্রাণীরই সামিল হয়। বাঙ্গালার আধুনিক কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের বিবাদ কংগ্রেস যখন উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার উচ্চ শিখরে সমারূঢ় তখন যেরূপ পরিলক্ষিত হইয়াছিল, আজ তাহার চরম অবনতির অবস্থাতেও তাহাই আছে। তাহারই একটা ক্ষীণ ও হীন তরঙ্গ কলিকাতা করপরেশনের মেয়র নির্ব্বাচন ব্যাপারে দেখা গিয়াছে। লাহোর কংগ্রেসে যখন দেশ বিদেশের নেতা ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ভারতের স্বাধীনতা প্রশ্ন লইয়া ব্যস্ত, তখন বাঙ্গালী নেতাদিগের বিবাদ মীমাংসা করিতে গিয়া তাহাব বহু সময় নষ্ট ও বৃথা শ্রম ক্ষয় হইয়াছিল। শুনা যায়, সেই সময় লাহোরের কোন কোন স্থানীয় সংবাদ পত্র বাঙ্গালার ত্রই দলনায়কদিগকে ইতর জন্তুর চিত্রে চিত্রিত করিয়া অপর দেশীয় নেতৃগণের হস্তে বেত্রাঘাতে তাহার

মীমাংসার প্রতিকৃতি দেখাইয়াছিল। তাহাতেও সেই বিবাদের শান্তি হয় নাই; পরেও কংগ্রেস আর একবার এই বিবাদ মিটাইবার জন্য একজন বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ আনীকে প্রেরণ করেন। তিনিও বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া যান। তারপর কংগ্রেস নিজেই রাজকোপে পড়িয়া হতজীবন হইয়াছে, বাঙ্গালার বিবাদকর্ত্তা নেতৃদ্বয়ের একজন মৃত ও অপর জন দেশান্তরিত হইয়াছেন—কিন্তু কংগ্রেসের প্রেতাত্মা কলিকাতা করপরেশনকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গালীর সেই বিবাদের প্রশ্রয় দিতে ছাড়িল না। কেবল কংগ্রেসের মৌলিক বিবাদই যে এই বিরোধের কারণ তাহা নহে—তাহাতে হয়ত কর্ম্মনীতি বা লক্ষ্যের ভেদ কিছু ছিল। বর্ত্তমান বিরোধে সেই নীতি কংগ্রেসের সহিতই বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ খুজিলে তাহার স্থান এই পতনের অনুপাতেই হীনতর প্রবৃত্তির খেলা মাত্র দেখা যাইবে—ব্যক্তিগত ঈর্ষা, আপন প্রতিষ্ঠার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্রতা, সাম্প্রদায়িক ভেদবাদ, গণতন্ত্রের নামে দলপ্রাধান্য স্থাপন ও তদনুসঙ্গিক ব্যভিচার প্রভৃতি একালের সমুদয় পাপই এই পতিত ও দুর্ব্বল জাতির উপরে অতি হীন রূপে আসিয়া চাপিয়া বসিয়াছে। প্রতিকূল শক্তিমানের নীতিকৌশল তাহাতে সহজেই সুযোগ ও অবসর পাইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় দেশ ও লোকহিতৈষণার নামেই আজ চতুর্দ্দিকে এই ব্যাপার চলিতেছে। করপরেশনের এই ব্যাপার যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, যে ভূতের নৃত্য চলিতেছে, তাহার জন্য দায়ী কে? তবে তাহার উত্তরে বলিতে হইবে যে এ দায়িত্ব কংগ্রেসেরই—কংগ্রেস যেদিন আপন মৌলিক নীতি ছাড়িয়া করপরেশনের ভিতরে স্বরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, সেদিনেই ইহার বীজপতন হয়। এইনীতিভ্রংশতা বর্ত্তমানে কংগ্রেসের পদে পদে দেখা গিয়াছে। ইহা একটা রাষ্ট্রিক নাস্তিকতা—অদ্যকার প্রচলিত সাধারণ নাস্তিকতারই এক বিশেষ প্রকারভেদ—পরিণাম ইহার ব্যভিচার ও আত্মধ্বংস।

ক্ষতপূরণ।—

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঘোর অন্ধকার দেখিয়াই আজ সকলে বলিতেছেন—গ্রাম সংগঠন ও পল্লীশিল্পের উৎকর্ষ সাধন কর, তবেই রক্ষা। কবি আপন ভাবের ঝোঁকে দুই একটা কল্পনা-গীতিতে গ্রাম ও পল্লী জীবনের গুণ গাহিয়া গিয়াছেন, বেকারের যাতনা ও রাজস্বহানির আশঙ্কায় সরকার-পক্ষ এক্ষণে পল্লীসম্পদবর্দ্ধনে মনোনিবেশ করিয়া একটা নূতন দপ্তর খুলিয়াছেন, কংগ্রেস তার জাতীয়তার গর্ব্ব লইয়াই, আর সমুদয়দিগের কর্মপরায়ণতা হারাইয়া, গ্রামসংগঠনে মনোযোগী হইবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এ সমুদয়ও কবির কল্পনার ন্যায় ভাবে মাত্র না থাকিয়া কার্য্যে পরিণত হইবে কি না, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। ঠেকিয়া যে শিক্ষা হয়, তাহা সেই ঠেকা উদ্ধারের কার্য্যে মাত্র নিয়োজিত হইতে পারে অন্য কোনও বিষয়ের প্রতিকার তাহা দ্বারা হয় না। পল্লী সংগঠন দেশের বেকারসমস্যা বা অর্থ-সঙ্কট অপেক্ষা আরও গুরুতর বিষয় এবং উহা সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের। বেকার-সমস্যা ঘুচিতে পারে,—তাহা প্রভুদিগের চাকুরীর দানে; বেকারীরা তাহাই মাত্র চাহে। কিন্তু ইহাতে গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না; বরং গ্রাম তাহাতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। এদেশে বেকার বলিয়া কোনও বিষয় ছিল না, যে পর্য্যন্ত এই নৌকরসাহী চাকুরিয়া-তন্ত্রের সৃষ্টিতে চাকুরীজীবির সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহাতেই গ্রামের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। এই বেকারী ও চাকুরীয়াদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা সকলেই গ্রামে থাকিতেন; এবং নিজ নিজ বৃত্তিতে একনিষ্ঠ থাকিয়া দেশের যাবতীয় শিল্পের উন্নতি বিধান করিতেন। গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি, লোকের মধ্যে পরস্পর ঐক্য ও সদ্ভাব, পরোপকার

প্রভৃতি অসাধারণ ভাবে সামাজিক সুখ ও শান্তি বিধান হইত। অদ্যকার নাগরিক জীবন তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে, বর্ত্তমান শিক্ষা দ্বারা সেই বৃত্তিচ্যুতি ঘটিয়াছে, চাকুরীর জীবন লোককে অকর্ম্মণ্য ও আরাম-প্রিয় করিয়াছে এবং এক প্রকার জঘন্য দাস মনোবৃত্তির প্রশ্রয় দান করিয়াছে, আইন আদালতের ব্যবস্থায় গ্রাম মামলা বা বিরোধের স্থায়ী আবাস ও লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, ইহার উপরে একদিকে বিজাতীয় আদর্শের ভোগবিলাস ও বেশ-ভূষা অপর দিকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদেশীয় পণ্যের আমদানী এবং তৎসঙ্গে দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদ সাধন, লোককে যেমন অর্থ ও সঙ্গতি বিহীন করিয়া তুলিয়াছে, তেমনই অমিতব্যয়ী ও বিলাস পরায়ণ করিয়া সকল দিকেই সর্ব্বনাশ ও বর্ত্তমান এই দুরবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। বেকারের সমাধান, দেশের আর্থিক উন্নতি বা লোকের "ক্রয়-শক্তি বৃদ্ধি" করিতে হইলে,—এই যে নিদারুণ ক্ষতি দেশের হইয়াছে, তাহার পূরণ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাহার মূল কারণ গুলির প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শিক্ষাসমস্যায়।—

এদেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বিষয়ে অনেক সময় অনেক কথা হইয়াছে ও হইতেছে। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির দোষ অনেকেই অনুভব করিয়া থাকেন। এ যাবত ইহার সংস্কার বা সংশোধন কল্পে বিবিধ চেষ্টাও হইয়াছে। রাজসরকার এখন দেশের শিক্ষাকে আপন হস্তগত করিয়া অন্যান্য শাসন বিভাগের ন্যায় ইহার পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাহারাও ইহার দোষ বুঝিয়া সময় সময় শিক্ষা কমিশনাদি বসাইয়াছেন; জাতীয় ভাবে প্রণোদিত হইয়া দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—বিভিন্ন প্রদেশে গুরুকুল, বিদ্যাশ্রম, ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, জাতীয় বিদ্যাপীঠাদিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্বয়ং স্কুলের শিক্ষক ও কলেজের অধ্যাপকগণ নিজে নিজে সভা সমিতি ইত্যাদি গঠন করিয়া শিক্ষা কার্য্য ও নিজেদের অবস্থা সমবেত ভাবে পর্য্যালোচনা করেন; রাষ্ট্রক্ষেত্রে আন্দোলনকারী নেতার মধ্যে মধ্যে শিক্ষাতে আপন আন্দোলনের বিষয়ীভূত করিয়া, বিশেষতঃ ছাত্র সমাজের সহযোগ পাইবার জন্য, দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু কোনও দিগেই এ যাবত কোনও রূপ সুফল ফলিতেছে না। সম্প্রতি দেশের আর্থিক দুর্গতিতে এবং শিক্ষিত যুবকদিগের বৃত্তিশূন্যতার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে আর এক গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এ শিক্ষাতে মনুষ্যত্ব অর্জন হয় না, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভ কিছু নাই—এইরূপ অভিযোগই পূর্ব্বে ছিল; বর্ত্তমানে শিক্ষালাভ করিয়াও উদরান্নের সংস্থান হয় না এই আপত্তিই প্রধান হইয়াছে। এরূপ অবস্থাতে শিক্ষার দিকে লোকের মতি আর থাকিবে না, বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়াদি এরূপভাবে চলিবে না,—এই প্রকার আশঙ্কাও না হইয়াছে এরূপ নয়। কিরূপ ভাবে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করিলে এ সমুদয় দুরবস্থা নিরাকরণ হইতে পারে তাহাই প্রশ্ন হইয়াছে। এ পত্রিকার আরম্ভকাল হইতে শিক্ষা বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছে; এবং শিক্ষাকে জাতীয় সাধনার ভিত্তিতে ও লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই শিক্ষার মর্য্যাদা রক্ষা ও দেশের কল্যাণ হইতে পারে, এই মতের প্রতিপাদন এখানে করা হইয়া থাকে। সম্প্রতি কলিকাতার একটী শিক্ষক-সম্মিলনে এই মতের কতকটী সমর্থন দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি—বলিতেছেন, "শিক্ষা প্রণালী কেবল ধর্ম্মবিবর্জ্জিত নহে, ইহা আমাদের জাতির রুচি ও আদর্শের বিরোধী এবং জীবনের বাস্তবতা হইতে বিচ্ছিন্ন।" জাতীয় সাধনা-মূলক শিক্ষা বলিতে আমরা

প্রধানতঃ দেশের প্রকৃতি, জাতির সাধনা (culture) এবং লোকের অভাব বা প্রয়োজন প্রতি লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপদ্ধতিই বুঝি। এজন্য শিক্ষাকে সর্ব্বপ্রকারে প্রকৃত শিক্ষানুরাগী নিরপেক্ষ লোকের হাতে ন্যস্ত করা উচিত। সরকারী দপ্তরের অন্তর্গত করাতে শিক্ষাতে অনেক অপচার আনয়ন করা হইয়াছে। প্রকৃত শিক্ষা কেবল স্বাধীন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেই সম্ভবপর। যে ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন (local self government) শাসন কর্তৃপক্ষ হইতে স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে শিক্ষাকে আরও স্বাধীন করা সঙ্গত ও সম্ভবপর। রাজ সরকার নিজ শিক্ষা বিভাগ রাখিতে পারেন; কিন্তু সাধারণ বিধানের অন্তর্গত রাখিয়া, বিভিন্ন লোক ও প্রতিষ্ঠানকে তাহাদের নিজ আদর্শে বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালন করিবার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া উচিত। উন্নতিশীল দেশ মাত্রেই এই ব্যবস্থা আছে। এদেশেও রাজসরকার তাহার সমর্থন না করেন এমন নয়। পাঞ্জাব আর্য্য সমাজের গুরুকুল স্বাধীন ভাবেই চলিয়া আসিতেছে, হরিদ্বারে সনাতন পন্থী দিগের ঋষিকুলও ঐ ভাবে পরিচালিত, কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলিগড়ে মুসলেম ইউনিভার্সিটী অনেকটা স্বাধীন, বিভিন্ন প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও অনেকটা স্বাধীন পরিচালন ক্ষমতা দিয়াছেন। তথাপি এ স্বাধীনতা পর্য্যাপ্ত নহে। প্রত্যেক প্রদেশেই স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা পর্য্যন্ত শিক্ষার নানা দিক লক্ষ্যে হইতে পারে ও তাহার আবশ্যকতা আছে।

কিন্তু এবিষয়েও আর দুইটী অতি গুরুতর অন্তরায় আছে—প্রধান বাধা এই যে, দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আবহাওয়া সর্ব্বত্র বহিতেছে; একপ্রকার বৈপ্লবিক দুরাচার স্থানে স্থানে এদেশের ছাত্র সমাজের সুনামকে কলঙ্কিত করিয়াছে; এজন্য সমুদয় শিক্ষালয়ের উপর এখন শাসন কর্তৃপক্ষের তীব্র নজর রহিয়াছে। কেবল বাঙ্গলাতে নহে, অন্য প্রদেশের অবস্থাও এক্ষণে ঐরূপ—সেজন্য লাহোরে সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশের এক ছাত্র সভাতে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন যে—'বর্ত্তমান শিক্ষা আমাদের অর্থনৈতীক দুর্দ্দশার সহচরী রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রকৃত জ্ঞান নির্দ্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের দ্বারা অর্জ্জিত হয় না। বিদ্যালয় গুলি এখন কারাগার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ তাহার প্রহরী হইয়া কাজ করিতেছেন। এরূপ অবস্থাতে যাহারা শিক্ষালয় হইতে বিদ্যা লাভ করিয়া বাহির হয়, তাহাদের অবস্থা কি হইতে পারে?'

শিক্ষা-স্বাতন্ত্র্যে দ্বিতীয় প্রধান বাধা – লোকের স্বাধীন কর্ম্ম প্রবৃত্তির তিরোধান। রাজ-সরকারের উপর নির্ভর করিয়া করিয়া এদেশের লোক এক্ষণে স্বাধীনভাবে নিজ কর্ম্ম করিবার সংস্কার ও ক্ষমতা উভয়ই হারাইয়াছে! উন্নত রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষণ এই যে, প্রজারা স্বাধীন ভাবে সমুদয় কার্য্য করিয়া যাইবেন—আপন আপন শাসন ও বিচার কার্য্য পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ করিবেন, শিক্ষার কার্য্য অধ্যাপকেরা, ধনবৃদ্ধি বণিক সম্প্রদায়, এবং জনহিতকর যাবতীয় কার্য্য সেবাব্রত পরায়ণ লোকেরা করিয়া যাইবেন। রাজা প্রধানতঃ দেশরক্ষা কার্য্যে নিয়োজিত থাকিবেন। ভারতের প্রাচীন বর্ণ-ব্যবস্থা ইহারই সমর্থন করিত। মধ্যযুগে, ইংরেজশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত, সেই ভাবই অল্পাধিকরূপে এদেশে বিদ্যমান ছিল—এ দেশের গ্রাম্য পঞ্চায়ত ও গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ও টোল থাকা ইহার পরিচয় দিয়া থাকে। বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থাতে দেশের সমুদয় কর্ম্ম-ক্ষমতাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রাজশক্তি গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে একদিকে যেমন প্রজাপক্ষ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, রাজসরকারকেও নানা প্রকারে গুরুকার্য্যে ভারাক্রান্ত ও অর্থব্যয়ের জন্য বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। নূতন শাসন সংস্কারে এ সমুদয় গুরুতর বিষয়—অন্ততঃ শিক্ষা ব্যাপারে—বিবেচিত হওয়া আবশ্যক।

আর্য্যমনোবিজ্ঞান

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ শরণদেব

পাশ্চাত্য দেশবাসী শরীরবিজ্ঞানবিৎ অধুনাতন পণ্ডিতেরা বলেন জড় জগতের সহিত কারবার করিতে গিয়া আমরা পদে পদে প্রতিঘাতের ভাব বা প্রতিঘাত হইতে বেদনা অনুভব করি। এই বেদনা নিতান্তই সত্য প্রত্যক্ষ অনুভূতি বিশেষ। ইহা আর অস্বীকার করিলে চলিবে না। এই বেদনানুভূতি বাহ্য জগৎ হইতেই আসে এইরূপ আমরা মনে করি। অতএব শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ জানিবার জন্য শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু রসনা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের যেরূপ প্রয়োজনীয়তা আছে তদ্রূপ বেদনানুভূতির জন্যও একটী ষষ্ঠ বহিরিন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তা আছে। পাঁচটী বহিরেন্দ্রিয়ে আর কুলায় না। আরো একটী ষষ্ঠ বহিরিন্দ্রিয় খুঁজিতে হয়। আলোক কণিকাগুলি চক্ষুর জালিময় পর্দ্দায় পতিত হইয়া উহারা চক্ষু ইন্দ্রিয়ে স্ব প্রতিবিম্বিত পদার্থের একটী প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে। আর আলোক কণিকাগুলির ধাক্কায় উত্তেজিত হইয়া দর্শনের সংবিৎ স্নায়ু যেই সেই প্রতিবিম্বটী মনের (মস্তিষ্কের) নিকটে উপস্থিত করে, অমনি আমাদের চাক্ষুষ অনুভূতি জন্মিয়া থাকে। এই চাক্ষুষ অনুভূতির সাধনভূত দর্শন শক্তি (দর্শন স্নায়ু) দেহের প্রতিনিয়ত স্থান বিশেষে আবদ্ধ থাকে। চক্ষুর তেজোময় গোলক যন্ত্রে আমাদের দর্শন শক্তি বাঁধা থাকে। অন্যান্য বহিরিন্দ্রিয়েরও প্রতিনিয়ত স্থান বিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত বেদনানুভূতির সাধনভূত শক্তি বিশেষ বা ইন্দ্রিয়টা কিন্তু দেহের কোনও নির্দ্দিষ্ট অংশ বিশেষে আবদ্ধ থাকে না। হস্ত পদাদি দৈহিক অংশ সমূহেই উক্ত বেদনা অনুভূত হইতে পারে। শরীরের যেখানে পেশী সঞ্চালক স্নায়ু ও সংবিৎ স্নায়ুর পরস্পর সংঘর্ষ থাকে, সেই খানেই এই বেদনার অনুভূতি হইতে পারে।

ইহা শরীরের কোনও নির্দ্দিষ্ট অংশ বিশেষে আবদ্ধ থাকে না। দেহের মাংস পেশীর ভিতরে কতকগুলি সূক্ষ্ম বিশেষ স্নায়ু আছে। মাংস পেশী সংশ্লিষ্ট সেই স্নায়ু যন্ত্রগুলির সহিত বেদনানুভূতির বিশিষ্ট সম্পর্ক আছে। বেদনাবাহী ওই স্নায়ুগুলি বেদনা বিষয়টা মনের নিকটে উপস্থিত করে। তাহার ফলে আমরা বহির্জগতের সহিত কারবার করিতে গিয়া পদে পদে প্রতিঘাতের ভাব বেদনা অনুভব করি। অতএব শরীরের মাংসপেশী সম্পৃক্ত কতকগুলি বিশেষ সংবিৎ স্নায়ু যন্ত্রগুলিকেও বেদনানুভূতির সাধনভূত ষষ্ঠ বহিরিন্দ্রিয় বলিতে হয়। খাঁটি যাহা স্পর্শেন্দ্রিয় তাহা হয়ত শৈত্য ও তাপানুভূতির পরিচায়ক। উহা কখনও বেদনাগ্রাহী ইন্দ্রিয় হইতে পারে না।

উল্লিখিত ষষ্ঠ বহিরিন্দ্রিয়ের প্রতিবাদ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র শরীর ব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয়ের যে পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া শৈত্য ও তাপের সম্বন্ধ ঘটিয়া থাকে, আমরা যেরূপ তৎপরিমিত ত্বগিন্দ্রিয়েই শৈত্য অথবা তাপ অনুভব করিতে পারি, এইরূপ যে সকল স্নায়ু অনুভূতির উদ্রেক করে, মাংস পেশী সম্পৃক্ত সে পরিমিত সেই (অনুভূতির উদ্রেককারক) স্নায়ু প্রান্তে অতিরিক্ত

উত্তেজনা হয়। তৎপরিমিত স্নায়ুপ্রান্তেই কেবল মাত্র ওই বেদনা অনুভূত হয়। স্পর্শানুভূতির সহিত বেদনানুভূতির বিষয় পরিমিত বা পরিচ্ছিন্ন স্থান ব্যাপিয়া উৎপত্তির সাদৃশ্য দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের বেদনানুভূতি ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন না হইলে উহা ত্বগিন্দ্রিয়ের সমান ধর্ম্ম (বিষয় দ্বারা পরিচ্ছিন্ন স্থান মাত্র ব্যাপিয়া বিষয়ানুভূতি উৎপত্তির সাদৃশ্য) দ্বারা সংক্রান্ত হইতে পারে না। বেদনানুভূতি ও স্পর্শানুভূতির উৎপত্তির নিয়ম প্রণালীটা ঠিক একরূপ বলিয়া মনে হয়, বেদনানুভূতি ও স্পর্শানুভূতির যাহা সাধনভূত ইন্দ্রিয় বিশেষ তাহাও শরীরব্যাপী ও এক। শরীর ব্যাপী এক ত্বগিন্দ্রিয় ছাড়া বেদনানুভূতির জন্য ষষ্ঠ বহিরিন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তা নাই। বেদনার অনুভূতি শরীরের সর্ব্বত্র অনুভূত হয় বলিয়া তাহার যাহা সাধনভূত তাহাও নিশ্চয় শরীর ব্যাপী ও এক, তাহা ত্বগিন্দ্রিয়। ত্বগিন্দ্রিয় ছাড়া বেদনানুভূতির জন্য পৃথক কোনও বহিরিন্দ্রিয় নাই।

শরীর-বিজ্ঞানবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতি ছাড়া শরীরের মধ্যে অন্য আরো একটী নূতন ইন্দ্রিয়ের নূতন অনুভূতি আছে, বঙ্গ ভাষায় তাহাকে পেশনানুভূতি আখ্যায় উল্লেখ করিতে পারা যায়। মাংসপেশীর এই অনুভূতি হইতেই বস্তুর গুরুত্ব বা ওজন জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ক্রমাগত ব্যবহার দ্বারা ওজন জ্ঞানটি এরূপ খাঁটী হয় যে, দোকানদার সকল হাতে লইয়াই বস্তুর পরিমাণটা দুই সের কি দশ সের তাহা বলিয়া দিতে পারে। সমস্ত দেহ অথবা দেহের কোন অবয়ব বিশেষ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে মাংসপেশীর ভিতরে যে বাধার ভাব সমুদিত হয়, তাহাকে মাংস পেশীর অনুভূতি বা পেশানানুভূতি বলে। গুরু বস্তু বহন করিবার সময়ে ভার বাহীকে দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, সে তাহার শরীরের কোনও নির্দ্দিষ্ট অংশ বিশেষে গুরুভার বোধ করিতেছে। বস্তুগত্যা সে কিন্তু শরীরের কোনও প্রতিনিয়ত নির্দ্দিষ্ট স্থান বিশেষে "শরীরের এই অংশ বিশেষেই গুরুত্বে জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, অন্য অংশ বিশেষে জন্মে না" এইরূপে ভার বোধ করিতেছে না। আর তাহা দেখাইতেও পারিবে না। ভারবাহীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার শরীরে চক্ষুর মত কোন একটী প্রতিনিয়ত অংশ বিশেষে গুরুত্ব অনুভূতির খবর দিতে পারে না।

ভগবান কণাদ মুনি তাঁহার রচিত বৈশেষিক দর্শনে প্রত্যক্ষের কারণ নির্দ্দেশ প্রকরণে গুরুত্বের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে কোনও কথার স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেন নাই। তজ্জন্য বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্যকার প্রশান্ত দেব বলেন, বস্তুর গুরুত্ব জ্ঞানটা—অতীন্দ্রিয়-গুরুত্বটা ইন্দ্রিয়ানুভূতির গ্রহণযোগ্য বিষয় নহে। পরোক্ষ প্রমাণ অনুমান দ্বারা বস্তুর গুরুত্বের অনুমান করিতে হয়। তথাপি বৈশেষিক দর্শনের টীকাকার বল্লভাচার্য্য বস্তুর গুরুত্ব পরিমাণটা স্পর্শেন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য বিষয় স্বরূপে অঙ্গীকার করিয়া গুরুত্ব জ্ঞানটা স্পার্শন জ্ঞান (স্পর্শেন্দ্রিয় জাত প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিশেষ) বলিয়াছেন। বিবেচনা করা যাউক যাহা শৈত্য ও তাপের জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে, তাহা হয়ত খাঁটী স্পর্শেন্দ্রিয় হইতে পারে এবং যে সকল স্নায়ুযন্ত্রে বস্তুর শৈত্য ও তাপানুভূতি জন্মাইয়া থাকে, স্পর্শেন্দ্রিয়ের সেই সকল স্নায়ুযন্ত্রে বাহ্য বস্তুর প্রতিঘাত বা প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ বশতঃ গুরুত্ব বোধ জন্মিয়া থাকে। অতএব, বস্তুর প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ লইয়া গুরুত্ব বোধ জন্মিয়া থাকে বলিয়া গুরুত্বের অনুভূতিটা আমরা সক্রিয় স্পর্শানুভূতির গণ্ডির ভিতরে আনিয়া ফেলিতে পারি। আর স্পর্শেন্দ্রিয় বস্তুর গুণ মাত্রের (শৈত্য ও তাপের) সম্বন্ধ লইয়া যে সকল স্নায়ুর সাহায্যে শৈত্য ও

তাপ অনুভূতি জন্মাইয়া থাকে, ওই শৈত্য ও তাপানুভূতিটা নিষ্ক্রিয় স্পর্শানুভূতি বলিলে বল্লভাচার্য্যের উক্ত মতটাও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। আর উক্ত বেদনানুভূতিও বস্তুর প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধ লইয়া জন্মিয়া থাকে বলিয়া উহাও সক্রিয় স্পর্শানুভূতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া ব্যবহার করিতে পারা যায়।

কেহ কেহ বলেন, তুলাদণ্ডের নমন উন্নমন দর্শনে বস্তুর ওজনটা অনুমিত হয়। বস্তুর ওজন বা গুরুত্বের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। কারণ যে সকল সামান্য ও বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম থাকিলেই নীলাদি রূপের প্রত্যক্ষ হয়, গুরুত্বে তাহা নাই।

মন্তব্যঃ—১। স্পর্শেন্দ্রিয়ের যে সকল স্নায়ু অনুভূতির উদ্রেক করে, সেই সকল স্নায়ুযন্ত্রে গুরু বস্তুর চাপ প্রযুক্ত হইলে অর্থাৎ কোনও একটা বস্তু ত্বকের সংস্পর্শে আসিয়াছে এই প্রকারের বোধ হইলে, বস্তুর চাপানুভূতির তারতম্য অনুসারে বস্তুর গুরুত্বটা অনুমিত হয়—গুরুত্বের সহিত চাপানুভূতির যে হেতু কার্য্য কারণ সম্বন্ধটা আছে। বস্তুর গুরুত্ব না থাকিলে তাহার প্রতিঘাতজনিত উত্তেজনার ফলে বস্তুর চাপও অনুভূত হইতে পারে না। চাপকার্য্য দেখিয়া তাহার কারণভূত গুরুত্বটা অনুমান দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। কার্য্য দেখিয়া কারণটা অনুমান দ্বারা বুঝিতে হয়।—নদীতে স্রোতের বৃদ্ধি কার্য্যটা পূর্ব্বের তুলনায় বেশী হইতে দেখিলে ইতঃপূর্ব্বে আরো অধিকতর বৃষ্টি হইয়াছে নতুবা স্রোত কখনও বৃদ্ধি পাইতে পারে না, এই বৃদ্ধি কার্য্য দেখিয়া অধিকতর বৃষ্টির কারণ ভাব অনুমানের দৃষ্টান্ত। বস্তুর গুরুত্বটা বহিরিন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয় নহে। গুরুত্বের প্রত্যক্ষ করা যায় না। সুতরাং গুরুত্ব অনুভূতির জন্য ষষ্ঠ-সংখ্যক বহিরিন্দ্রিয়ের স্বতন্ত্র প্রয়োজনীয়তাও থাকিতে পারে না। ইতঃপূর্ব্বে বহিরিন্দ্রিয়ের যে পাঁচটী সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তদতিরিক্ত বহিরিন্দ্রিয়ের ষষ্ঠ অথবা সপ্তমাদি সংখ্যা বিশেষ নাই।

২। একেন্দ্রিয়বাদের আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া ভগবান গৌতম মুনি বলেন আমাদের শরীরের উপরিতন প্রদেশসমূহে আপাদমস্তক ব্যাপিয়া ত্বক্ (আবরণ) রহিয়াছে, উহার দ্বারা শরীরব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয় আবৃত থাকে। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হস্তপদাদি অবয়বগুলি ভিন্ন হইলেও শরীরের সমূহ অবয়বব্যাপী ত্বগিন্দ্রিয় বস্তুটা এক বা অবিশেষ। হস্ত পদাদি অবয়ব বিশেষ বিশেষ ত্বগিন্দ্রিয়ের অঙ্গীকার করা হয় না। হস্তাবয়বে যে ত্বক্ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, পদাদি সমূহেও সেই একই ত্বক্ রহিয়াছে। শরীরের তাবৎ অবয়বেই স্পর্শের উপলব্ধিটা সমান বা এক জাতীয় হয় বলিয়া শরীরের সমগ্র অবয়বব্যাপী স্পর্শগ্রাহক ইন্দ্রিয়টীও অনেক নহে—এক। শরীর-ব্যাপী ত্বক্ শারীরিক অবয়বসমূহে এক জাতীয় প্রয়োজনের (উপলব্ধির) সাধক বলিয়া উহাও এক—অনেক নহে। দেখ, আমাদের দুইটী চক্ষুই এক জাতীয় প্রয়োজনের (রূপাদি জ্ঞানের) সাধক বলিয়া চক্ষু ইন্দ্রিয়ের বাম ও দক্ষিণ এই দুইটী অংশ দ্বারা আর উহার ভিন্নভাব কল্পনা করা প্রয়োজন-হীন বৃথা গৌরব ছাড়া কিছুই নহে। প্রয়োজনের তারতম্য থাকিলে এক জাতীয় বস্তুর ভিতরেও বিশেষ ভাব কল্পনা করা অন্যায্য হইতে পারে না। শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু রসনা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকের দুই দুইটী করিয়া অবয়ব বিশেষ আছে। ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যেকেই স্বীয় অংশদ্বয় দ্বারা এক জাতীয় প্রয়োজনের (জ্ঞানের) সাধন করে। সেইজন্য দুই দুইটী অংশ বিশেষে ইন্দ্রিয়গণের আর পার্থক্য করিয়া বিভাগ করা হয় না। আমাদের চক্ষু ইন্দ্রিয় বা দর্শন শক্তিটা এক হইলেও

উহা বাম ও দক্ষিণ অংশদ্বয়ে যেন বিভক্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা আমাদের শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু রসনা ও ঘ্রাণ ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের যন্ত্রগুলি দুই দুইটী অংশে বিভক্ত করিয়া যেন আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, চক্ষু ইন্দ্রিয়টী এক হইলেও উহা যেমন দুইটী অংশে বিভক্ত বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ এই বহির্জগৎও স্বরূপতঃ এক হইলেও ইহার মধ্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া যে দ্বৈত ভাবের প্রতীতি তাহা প্রতীতি মাত্র। বস্তুগত্যা বহির্জগতের দ্বৈত প্রতীতির মৌলিকতা নাই। ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর তারতম্য ও প্রয়োজন সাধনের তারতম্যে দ্বৈতভাব বর্হির্জগতে অনুভূত হয়। বিচার বুদ্ধির দ্বারা বিভাগ পুরঃসর জগতের স্বরূপ বুঝিতে না পারিলেই ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বহির্জগৎ আপাততঃ বহুরূপে প্রতীয়মান হয়। বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা বর্হির্জগতের দ্বৈতভাবটী যে মিথ্যা (মরীচিকাস্থ জলের মত প্রতীতি মাত্র) ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্তই যেন জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির দুই দুইটী অংশবিশেষ রচনা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। বর্হির্জগৎ স্বরূপতঃ এক বা বহুই হউক তাহা লইয়া বর্ত্তমান প্রকরণের কলেবর বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, চক্ষুর বাম ও দক্ষিণ এই দুইটী অংশবিশেষ এক জাতীয় প্রয়োজনের সাধক। তজ্জন্য উহার যেমন দেখিতে দুইটী হইলেও স্বরূপতঃ এক। আমাদের শরীরব্যাপী ত্বক্‌ও সেইরূপ শারীরিক অবয়বসমূহে একজাতীয় প্রয়োজনের সাধক সুতরাং শরীরব্যাপীয়া অবস্থিত ত্বগিন্দ্রিয়ও এক। একই ত্বক্ আমাদের হস্তপদাদি অবয়ব সমূহেই পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। একই ত্বক্ আমাদের শ্রোত্র চক্ষু রসনা ও ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বা আশ্রয় গুলি ব্যাপীয়া অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, যাহার দ্বারা শ্রোত্র আদি বহিরিন্দ্রিয়গণের প্রদেশ বা আশ্রয় সমূহ পরিব্যাপ্ত থাকায় শব্দাদি বহির্বিষয় রাশি গ্রহণ করিতে পারা যায় এবং যাহার দ্বারা শ্রোত্র আদি ইন্দ্রিয়গণের প্রদেশসমূহ পরিব্যাপ্ত না থাকিলে শ্রোত্র আদি বহিরিন্দ্রিয়ের প্রদেশ বিশেষে শব্দাদি গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং সমগ্র ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশব্যাপী সেই এক ত্বক্ বস্তুই রূপ রস গন্ধাদি বিষয় জ্ঞানের সাধনভূত ইন্দ্রিয় বিশেষ। মনে কর যাহা না থাকিলে যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, যাহা থাকিলেই সেই কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহা সেই কার্য্যেরই সাধনভূত বস্তু বিশেষ। ইহা একটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। এই নিয়ম প্রণালীর অনুপাতে বুঝিতে হইবে যে, এক ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের প্রদেশসমূহ পরিব্যাপ্ত থাকিলেই অথবা ত্বগিন্দ্রিয় থাকিলেই যখন রূপাদি জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, তখন এক ত্বগিন্দ্রিয়ই আমাদের রূপ রস গন্ধাদি বহির্বিষয় জ্ঞানের সাধনভূত এক বা অদ্বিতীয় ইন্দ্রিয় বিশেষ। বহিরিন্দ্রিয় বলিতে এক ত্বক্ ছাড়া নানা ইন্দ্রিয়ের অঙ্গীকার করা বৃথা গৌরব ছাড়া কিছুই নহে।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের সিদ্ধান্তবাদী বলেন, দেখ যে ত্বকের দ্বারা স্পর্শ উপলব্ধি করিতেছ তোমার উল্লিখিত মতানুসারে সেই ত্বক্ দ্বারাই রূপাদি বিষয়েরও উপলব্ধি হইয়া থাকে। ইহা অঙ্গীকার করিতেই হইবে, কারণ তোমার মতে স্পর্শ গ্রাহী ত্বক্ ইন্দ্রিয় ছাড়া রূপাদি বিষয়গ্রাহী অন্যান্য বহিরিন্দ্রিয়ের অস্তিত্বটা অঙ্গীকৃত হয় না। আর সেই ত্বক্ যখন শরীরের সমগ্র ইন্দ্রিয়প্রদেশে এক—নানা নহে, তখন ত্বক থাকিলেইত রূপাদি জ্ঞান হওয়াও সম্ভবে। আর তাহা হইলে অন্ধাদির যখন ত্বক্ আছে, তখন তাহাদেরও আর রূপাদি জ্ঞান হওয়া অসম্ভব নহে—সম্ভবে। কিন্তু অন্ধাদি লোকের রূপাদি জ্ঞান হওয়া যখন সম্ভবে না, সুতরাং ইহা বুঝিতে হইবে যে স্পর্শ

জ্ঞানের মত রূপাদির জ্ঞানগুলিও বহির্ব্বিষয়েরই জ্ঞানবিশেষ হইতে পারে। এক ত্বক্ কখনও স্পর্শ ছাড়া রূপাদি বিষয় জ্ঞানের সাধন হইতে পারে না।

বহিরিন্দ্রিয়ের নানাত্ববাদীর উক্ত প্রকারে প্রদর্শিত আপত্তির পরিহার করিবার জন্য একেন্দ্রিয়ের অস্তিত্বে পক্ষপাতী প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, আমাদের শরীরব্যাপী ত্বক্ এক হইলেও ত্বকের কোন অংশবিশেষ চক্ষুপ্রদেশে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া ধূমস্পর্শ অনুভব করিতে পারে শ্রোত্র ও হস্তাদি অন্যান্য অবয়বসমূহে ত্বকের যে অংশবিশেষ রহিয়াছে, তাহার ধূমস্পর্শ অনুভব করিতে পারে না। ত্বকের চক্ষুপ্রদেশে পরিব্যাপ্ত কোন অংশবিশেষ রূপ অনুভব করিতে পারে। ওই অংশবিশেষ বিকৃত হইলে আর রূপাদি জ্ঞান হওয়া সম্ভবে না। বধিরাদি সম্বন্ধেও উক্ত নিয়ম প্রণালীর অনুসরণ করিয়া একেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ববাদ রক্ষা করিতে পারা যায়। আর তাহা হইলে অন্ধাদিরও রূপাদি জ্ঞান হইয়া যাউক এইরূপ আপত্তিটা আর খাটিল না।

একেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ববাদের রক্ষাকল্পে উপর্য্যুক্ত বাক্যভঙ্গী দেখিয়া বহিরিন্দ্রিয়ের নানাত্ব-বাদী বলেন, যেরূপ যুক্তিপ্রণালী অনুসারে একেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ববাদী বহিরিন্দ্রিয়ের নানাত্ববাদী উক্ত আপত্তির পরিহার করিতে গিয়া বহিরিন্দ্রিয়ের একত্বটা বা বহিরিন্দ্রিয়ের সংখ্যা বিশেষ এক ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার (একেন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠালিপ্সু প্রতিবাদীর) প্রতিজ্ঞাহানি দোষ আসিয়া পড়েঃ—মনে কর ইতঃপূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে যে, চক্ষু আদির নানা প্রদেশবিশেষে যে ত্বক্ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা নানা নহে—এক। একই ত্বক্ রূপাদি তাবৎ বহির্ব্বিষয়ের জ্ঞান সাধন ইন্দ্রিয়বিশেষ। এক্ষণে সেই ত্বকেরই আবার চক্ষু আদি প্রদেশবিশেষ নানারকমের নানা অবয়ব অঙ্গীকার করিয়া সেই নানা অবয়বগুলি আবার নানা বিষয়ের নানাবিধ জ্ঞানের সাধনযন্ত্ররূপেও অঙ্গীকার করা হইয়াছে। আর তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে, শরীরের নানা প্রদেশবিশেষে নানা অবয়ব বিশেষরূপ রস গন্ধাদি নানা বিষয়ের জ্ঞানসাধক। শরীরের সমগ্র অবয়ব ব্যাপিয়া ত্বক্ নির্ব্বিশেষে এক ত্বক্ রূপাদি গ্রাহক নহে। সুতরাং রূপাদি বিষয়গ্রাহী ইন্দ্রিয়টাই এক—শরীরের সমগ্র প্রদেশ বিশেষে এক জাতীয় এক জাতীয় প্রয়োজনের সাধক হইতে পারিল না। অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, রূপাদি বিষয়গ্রাহক যন্ত্রগুলি নানা বা অনেক—এক নহে বিভিন্ন। সুতরাং ত্বক্ নির্ব্বিশেষে এক ত্বক আর রূপাদি জ্ঞানের সাধন হইতে পারিল না। আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংখ্যা বিশেষ এক এরূপ প্রতিজ্ঞাটীও আর রহিল না। সেই জন্য বহিরিন্দ্রিয়ের সংখ্যাবিশেষ এক ইহা অঙ্গীকার না করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের (জ্ঞানোৎপত্তির) সাধনভূত ভিন্ন ভিন্ন নানা ইন্দ্রিয়ের অঙ্গীকার করাই যুক্তিসিদ্ধ। যদি বল একেন্দ্রিয়ের অঙ্গীকার করায় লাঘব আছে। পাঁচ রকমের পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের অভ্যুদ্‌গমে গৌরব মানিয়া লইতে হয়। দেশবিশেষে বিশেষ বিশেষ আকাশের অঙ্গীকার না করায় যেরূপ লাঘব আছে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অঙ্গীকার না করিয়া একেন্দ্রিয়ের অঙ্গীকারে লাঘব আছে। গুরুভার জগতে কেহই বহন করিতে চায় না। এইরূপ আশঙ্কার পরিহার করিবার জন্য বলিতে পারা যায় যে, দেশবিশেষে আকাশ বস্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের সাধক নহে। সকল দেশের সকল আকাশেই সমান বা একজাতীয় একরূপ প্রয়োজন সাধিত হয়। সুতরাং বিশেষ প্রয়োজন না পাওয়ায় এক আকাশের মধ্যে আর তারতম্যের কল্পনা করা ঠিক নহে।

ত্বকের চক্ষু আদি প্রদেশবিশেষে কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অংশবিশেষ ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের সাধন করে। তজ্জন্য ত্বকের পরস্পর বিভিন্ন বিজাতীয় পাঁচটা অংশ বিশেষ স্বীকার করায় গৌরব থাকিলেও তাহা বহন করিতে পারা যায়। আর বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে তাদৃশ গৌরবের অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়াই বরং একই বস্তুর মধ্যে অত্যন্ত ভিন্ন ভাবও কল্পনা করিয়া তাহা হইতে পৃথক রূপে তাহার নানাভাবও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়। প্রয়োজন বিশেষে একই মৃত্তিকার ঘট ও মঠাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাব রাশি মানিয়া লইয়া ব্যবহার করিতে হয়। আর তাহা হইলে ইহাও সিদ্ধ হইতে পারে যে, এক ত্বকই কেবল মাত্র বহিরিন্দ্রিয় ইহা না মানিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়েরই ব্যাবহারিক অস্তিত্বটা পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

আরো দেখ, যাহার দ্বারা চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়প্রদেশ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিয়াই রূপ রস গন্ধাদি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই ত্বকই কেবল মাত্র রূপাদি বিষয় সকলের জ্ঞান সাধন ইন্দ্রিয় বিশেষ। ইহা কখনও যুক্তিসহ বাক্য হইতে পারে না। দেখ পৃথিবী আদি পঞ্চভূত দ্বারাও চক্ষু আদির আশ্রয় ভূত প্রদেশসকল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। নতুবা চক্ষু আদি প্রদেশদ্বারা রূপাদির গ্রহণকার্য্য হওয়া সম্ভবে না। তাহার ফলে রূপাদি বিষয়ের জ্ঞানোৎপত্তিরও আর সম্ভাবনার আশা থাকিতে পারে না। সুতরাং পৃথিবী আদি পঞ্চভূত ও রূপাদি বিষয়জ্ঞানের সাধনভূত ইন্দ্রিয় হইতে পারে। অতএব শরীরের সমগ্র অবয়ব ব্যাপিয়া এক জাতীয় প্রয়োজনের সাধক এক ত্বক্ ইন্দ্রিয়ের (জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের) প্রদেশসমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিয়াই যে উহা সমগ্র বহির্ব্বিষয় জ্ঞানের সাধনভূত ইন্দ্রিয়বিশেষ এরূপ বলিতে যাওয়া সম্ভবে না। নতুবা পৃথিবী আদি পঞ্চভূতও উক্ত নিয়ম অনুসারে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে পারে।

অপিচ আমাদের শরীরের সমগ্র অবয়ব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান ত্বক্ নির্ব্বিশেষে একই ত্বক্ যদি রূপ রস গন্ধাদি জ্ঞানের সাধনযন্ত্র হয়, তাহা হইলে শরীরব্যাপী এক ত্বকের সহিত মনের সম্বন্ধ মাত্রে একই সময়ে বৃহৎ ত্বগিন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট রূপ রস গন্ধাদি বিষয়েরও এককালীন জ্ঞানের (বহু জ্ঞানের) প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধটাই যেহেতু সেই ইন্দ্রিয়ের অধিকার ভুক্ত বিষয় জ্ঞানের সাহায্যকারী কারণ বিশেষ। আমরা কিন্তু একই সময়ে একটী বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া ততোধিক বিষয়ের বুদ্ধিগুলি অনুভব করিতে পারি না। কারণ একই সময়ে নানা বিষয়ের নানা বা অনেক বহু জ্ঞান বা বুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহার সবিশেষ কারণ দেখ।

একেন্দ্রিয়ের অঙ্গীকারে একই সময়ে বহু বিষয়ের বহু জ্ঞানের উৎপত্তির অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। অর্থাৎ প্রসঙ্গাতিক্রম দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার পরিহার করিবার জন্য বলিতে হয় যে, আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের সংখ্যা বিশেষ নানা (পাঁচ) এক নহে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি-প্রণালী অনুসারে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে পাঁচটী সংখ্যা বিশেষ নির্ণীত হইয়াছে তাহা হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংখ্যা কখনও ন্যূন হইতে পারে না। আর তাহা হইলে ফলতঃ ইহা স্থির হইল যে, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংখ্যা বিশেষ পাঁচ, তদতিরিক্ত বা ন্যূনও নহে। এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পাঞ্চভৌতিক ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব ও শব্দাদি পাঁচ রকমের বিশেষ জ্ঞানরূপ ক্রিয়া দেখিয়াও বুঝিতে হয় যে, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংখ্যাবিশেষ পাঁচ। (ক্রমশঃ)

গীতার শিক্ষা ও দীক্ষা

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু, গীতারত্ন

এই নশ্বর মনুষ্য জীবন কয় দিনের জন্যই বা, পশ্চাতে ও সন্মুখে মহাকাল—অনন্ত সময়। আমাদের অতীত অজ্ঞাত, ভবিষ্যতও অজ্ঞাত, নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী এই বর্ত্তমান, যাহার জন্য আমরা ধর্ম্মকে পদে পদে উপেক্ষা করিয়া চলি।

মানুষ জানে কেবল নিজকে, তাহাও সম্পূর্ণরূপে নহে, কিন্তু যেটুকু জানে শুধু নিজেকেই জানে। এই আত্মজ্ঞানই মানুষের মূলধন। নিজেকে ভাল করিয়া জানিলে, বিশ্বকে জানা যায়। যে শক্তি বা বিদ্যাবলে আমরা নিজেদের জানিতে পারি, তাহা সর্ব্বভূতস্থ মহামায়ার বুদ্ধিরূপী বিকাশ।

এই মহাশক্তি তিন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত—ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া। আমাদের ভিতরেও সেই মহাশক্তির ত্রিধা বিকাশ রহিয়াছে, বিশ্বের সর্ব্বত্রও সেই মহাশক্তির খেলা। এই তিন শক্তির নিয়ামক তিনজন পুরুষ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। কিন্তু মূলে তিনই এক—তিনে এক, একে তিন।

ধর্ম্ম মানুষের গড়া নয়—ইহা মানুষের মুক্তির জন্য শ্রীভগবানের দান। অন্ধজড় শক্তির মিলনে এই বিশ্বের সৃষ্টি হয় নাই, স্বতঃসিদ্ধি জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই ইহার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। এই পরমেশ্বরই গুরুরূপে মানুষের আত্মার অন্তর্য্যামী। তিনি নিজ গুণে দয়া করিয়া 'আত্মভাবস্থ' হইয়া অন্তরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়া আমাদের অজ্ঞানজ তমঃ দূরীভূত করিতেছেন,—ইহাই তাঁহার স্বরূপের করুণা বা মাধুর্য্যের লীলা।

ভগবানের প্রেরণায় মানুষ সর্ব্বদাই ভগবানের আনন্দ স্বরূপকে চায়। কিন্তু আনন্দকে পাইতে হইলে মানুষকে অনেক শিক্ষা করিতে হয়। সেই শিক্ষা শুধু কেতাবী শিক্ষা হইলেই চলিবে না, যদ্দ্বারা বর্ত্তমান Universityকে ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু তদ্দ্বারা ভগবানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তাহার জন্য চাই ব্রহ্মচর্য্য, গুরুর নিকট শিক্ষা ও দীক্ষা, শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি, মনুষ্যত্বের বিকাশ, চরিত্র গঠন ও সর্ব্বভূতের কল্যাণকামনা, শরীর মন ও বুদ্ধি সবল ও সুস্থ না হইলে, আমরা মহতের ধারণা করিতে পারি না।

গীতার কেন্দ্রভূত সার শিক্ষা হইতেছে—'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ'—তুমি বুদ্ধির শরণাগত হও।

গায়ত্রী মন্ত্রেও এই বুদ্ধির প্রবর্ত্তক-রূপে পরমেশ্বরের ধারণা ও ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং গীতা ও গায়ত্রীর শিক্ষায় কোন প্রভেদ নাই। এই বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলন বর্ত্তমান যুগে একান্ত প্রয়োজন। গীতা শিক্ষা দিতেছেন যাহাতে অমি সকাম উপাসনা ও স্বধর্ম্ম পালনের ভিতর দিয়া নিষ্কামী হইয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারি।

প্রথমে নিজেকে অভীষ্ট দেবতার পূজার যোগ্য করিয়া লইবার জন্য অঙ্গন্যাস ও করন্যাস প্রয়োজন যদ্দ্বারা দেহস্থ তাড়িতময় পদার্থ, গীতা পাঠকালে যে যে স্থানে থাকা কর্ত্তব্য, সেই সেই স্থানে প্রেরণ করা হয়। ন্যাসাদির দ্বারা দেহ স্থির হয়।

গীতাপাঠ মানে জ্ঞানযজ্ঞ করা। তপস্যা বা যোগে বসিবার পূর্ব্বে নিজের দেহ ও মন শুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। শুধু গীতা পাঠ করিলেই হইল না, গীতার ধ্যান বিশেষ ভাবে প্রয়োজন, যাহা গীতাজ্ঞান ধারণ করিবার শক্তি দান করে।

পাঠারম্ভে সেই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বিশালবুদ্ধি ব্যাসদেবকে নমস্কার করিবে, যিনি জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য গীতা পাঠ করিবে, অন্য কোন রূপ কামনা করিবে না।

গীতোক্ত মন্ত্র সকল বিধিপূর্ব্বক পাঠ করিয়া বাসুদেবকে প্রসন্ন করিলে, তিনি নিজে মানবের সকল অভাব পূরণ করেন।

গীতার মন্ত্রশক্তি অলৌকিক, তাহার ফলও অসাধারণ। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, গীতার মন্ত্র শক্তির ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাবেন।

মঙ্গলাচরণ, অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতির লক্ষ্য—আত্মোদ্বোধনা—অর্থাৎ আমাতে জ্ঞানের সঞ্চার হউক, আমার জ্ঞানের পথে বাধা দূর হউক, আমি যেন অবাধে শ্রীভগবানের উপদেশ বুঝিতে পারি ও সেই মত কার্য্য করিতে পারি এবং ভগবদুদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতে পারি।

একটি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিক ভাবে চিন্তা ও ধ্যান করার নামই যোগ। কিন্তু চিন্তনীয় বিষয়ের সদসৎ ভাবের প্রতি দৃষ্টিরাখা বিলক্ষণ প্রয়োজন। অতএব সর্ব্বাবস্থায় যদি সেই সর্ব্বশান্তিপ্রদ পরম পুরুষ শ্রীভগবানের চিন্তার অভ্যাস ও ধ্যান সময় থাকিতে করা যায়, তাহা হইলে অপূর্ব্ব যোগেরই অভ্যাস হয়।

সেই পরম পুরুষই সকলের শাসনকর্ত্তা, পথপ্রদর্শক এবং উপদেষ্টা গুরু। তিনি কবি অর্থাৎ ক্রান্তদর্শী সর্ব্বজ্ঞ এবং পুরাণ অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ পুরুষ এবং তিনি মলিন মন বুদ্ধির অগোচর। তিনি "অনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্"—তিনি সূক্ষ্মতম, আবার বৃহত্তম এবং এই সূক্ষ্মরূপে সর্ব্বজীবে প্রবিষ্ট। তিনিই প্রাণীদিগের কর্ম্মফল দাতা।

গীতার ন্যায় এমন কঠিন অথচ সরল ও মাধুর্য্য পূর্ণ গ্রন্থ এবং এমন দুর্ব্বোধ্য অথচ সুবোধ্য গ্রন্থ জগতে আর নাই।

গীতার অনেক স্থলে পরস্পর বিরোধী ভাব ও আপাত অসংলগ্ন কথা দেখিতে পাওয়া যায়, সহজে উহার সামঞ্জস্য ও সঙ্গত অর্থবোধ হয় না। কিন্তু তত্ত্বদর্শী গুরু বা উপদেষ্টার বাক্য শ্রদ্ধা করিয়া শুনিলে, গীতার পরম জ্ঞানলাভ হয় এবং তখন সকল অসামঞ্জস্য ভাবের সমাধান হইয়া যায়।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ"। গীতা—৪।৪০

"অশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। গীতা—৪।৪১

অর্থাৎ যে শ্রদ্ধাবান নহে যাহার সংশয় দূর হয় নাই, তাহার জ্ঞান লাভ হয়না এবং সে বিনষ্ট হয় এবং যিনি ভগবদ্‌বাক্যে প্রকৃত শ্রদ্ধাবান্, তাঁহার নিকট গীতার প্রকৃত অর্থ, শ্রীভগবান গুরুরূপে আবির্ভূত হইয়া প্রকাশ করেন, যদ্বারা গীতার জ্ঞান বিজ্ঞানে পরিণত হয় অর্থাৎ এই জ্ঞান অপরোক্ষ হয়।

গীতার প্রত্যেক বাণীটি সিদ্ধ বাণী। গীতার একটি মাত্র উপদেশ নিজ জীবনে ফুটিয়ে তুলতে পারলে, জীবন সার্থক হয়ে যায়। আমাদের অধিকার কেবল কর্ম্ম করা। আমরা বিপদে পড়ি

অনধিকার চর্চ্চা কর্‌তে গিয়ে, তাহাতেই যত অশান্তি আসে—অর্থাৎ ফল কামনা কর্‌তে গিয়ে যত বিপদ আসে। এই অনধিকার চর্চ্চার ফলে, কর্ম্ম হানি হয় অনেক বেশী। গীতার আদর্শ ও উপদেশের তাৎপর্য্য হল—মানুষকে নিষ্কাম কর্ম্মের ভিতর দিয়ে পূর্ণত্বে উপনীত করা।

যত দিন বেঁচে থাকতে হবে, কাজ করে যেতে হবে, কিন্তু এমন ভাবে কাজ করতে হবে, যেন তা বন্ধনের কারণ না হয়। সেই জন্য চাই যোগরহস্যের আবিষ্কার, যা সমস্ত জগতের সঙ্গে আমাদের বিরোধ ও অসামঞ্জস্য মিটিয়ে দেয়। ইহা শুধু কর্ম্ম করার কৌশল—"যোগ কর্ম্মসু কৌশলম্"। মনের কাজই বিরোধ সৃষ্টি করা, ভেদ সূচনা করা। সেই জন্য শ্রীভগবান গীতাতে মনকে আত্মসংস্থ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আমরা এই উত্তম রহস্য হৃদয়ঙ্গম করি না বলিয়া, আমাদেষ সংস্কারের দাসত্ব করিতে হয়।

গীতা বলিয়াছেন "সত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্" (১৪।১৭)। জ্ঞান উৎপন্ন হয় সত্ব হতে। তিনিই জ্ঞানী যাঁর চিত্তে সত্বগুণ ছাড়া অন্য কোন গুণের প্রভাব নাই। জ্ঞানের উৎস সত্বগুণ। শ্রীভগবান গীতাতে বল্‌ছেন—ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় (১২।৮)—আমাতেই মন দাও—আমার দিকে বুদ্ধি প্রবেশ করাও।

চিত্তকে সমস্ত কামনা থেকে সংযত করে, কেবল শরীর দ্বারা কর্ম্ম করে যাবে, তাহলে আর পাপ স্পর্শ করতে পারবে না।

কাজ করবে দেহের দ্বারা, কিন্তু সমস্ত মনটা থাকবে তাঁতে। যাঁর কর্ম্ম কচ্চি, প্রাণের একান্ত টান থাকবে তাঁর দিকে।

শ্রীভগবানের কথা মত যাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের সম্মুখেই স্বয়ং শ্রীভগবান নিজে আসিয়া জ্ঞানের দীপ জ্বালিয়া দেন যাহাতে তাঁহারা সত্যের পথকে সুস্পষ্ট দেখিতে পান। জীবনের সাধনা কেবল অহংনাশের সাধনা। শ্রীভগবান নিজে আসিয়া সাধনার ভার না লইলে, জীবের সাধনা করা অসম্ভব। তাই চাই আত্মসমর্পণ—তোমার সব তাঁকে দাও। আত্মসমর্পণে জীব কেবল দ্রষ্টার আসন অধিকার করে মাত্র—সে দেখে যে সাধনা করেন স্বয়ং শ্রীভগবান। গীতার চরম শ্লোকের তাৎপর্য্য ইহাই। ভগবানের উপর সকল ভার দিলে, জীবের সাধনার ভারও পড়ে গিয়া তাঁহারই উপর। তখন শ্রীভগবানকেই জীবের জন্য সব করিতে হয়। ইহাই গীতার সুস্পষ্ট মর্ম্মবাণী। সাধক তখন নিজ আধারে শ্রীভগবানের লীলা মাহাত্ম্য দেখিয়া আশ্চর্য্য মুগ্ধ হইয়া যায়।

শ্রীভগবান যখন সাধকের হৃদয়ে জাগ্রত হন, তখন জীবের আর কিছুই করিতে হয় না, করার প্রয়োজনও হয় না।

আত্মসমর্পণে জীবাত্মার ধ্বংশ হয় না। ধ্বংশ হয় কেবলমাত্র অহঙ্কারের—জীব তখন পরা-প্রকৃতির কৃপায় দ্রষ্টার আসন অধিকার করিয়া বসেন।

জীব করে মাত্র অহঙ্কারের সাধনা এবং এই জন্য পায় না প্রাণে শান্তি, কিন্তু যদি সৌভাগ্য ক্রমে আত্মসমর্পণের সঙ্কেত খুজিয়া পায়, তাহা হইলেই সার্থকতায় তাহার জীবন ভরে যায়।

সাধনা করা জীবের সাধ্য নয়, যাঁহার সাধনা তিনি যখন সাধিয়া চলেন, জীব তখনই সিদ্ধি-লাভে ধন্য হন। জীবের ইহাতে কোন কৃতিত্ব নাই, সব কাজ সাধিয়া চলেন অন্তর্য্যামী ভগবান্।

কি করিয়া কাহাকে দিয়া শ্রীভগবান কি করান, ইহা সশ্রদ্ধ সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া চলাই জীবের সাধনা। সাধনার আরম্ভ হইতে সিদ্ধি পর্য্যন্ত সব সাধনাই শ্রীভগবান সাধিয়া করেন। ইহাই আধ্যাত্মিক জগতের গুহ্য রহস্য, যাহা গীতা প্রকাশ করিয়াছেন। চাই খাঁটি আত্মসমর্পণ, এবং তখনই "যোগক্ষেম" তিনি নিজই বহন করেন।

সাধনার ভার যখন ভগবান গ্রহণ করেন, তখনই আসে সিদ্ধি।

অহঙ্কার ও অভিমান থাকিতে, ভগবান ভার গ্রহণ করেন না। নিজের চেষ্টা যেখানে প্রবল, ভগবৎ কৃপা সেখানে অতীব ক্ষীণ।

অভিমানে কাজ পণ্ড হয়। নিরভিমানী কর্ম্মীর ভিতর ভগবৎ প্রেরণা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠে। কর্ম্ম করেন তাঁহারা অন্তর্য্যামীর নির্দ্দেশমত, সেইজন্য সকল রহস্যের নিগূঢ় তাৎপর্য্য তাঁহাদের হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে।

সাধনার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। তিনি নিজমুখে বলিয়াছেন—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সর্ব্বধর্ম্ম ছাড়িয়া দাও, একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।

এই "মাং" কে? সকলে বলেন যে, এই 'মাং' ই শ্রীভগবান্, যিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। সেই 'মাং' কে বাহিরে খুঁজিলে পাওয়া যায় না, তাঁহাকে খুঁজিতে হয় নিজ হৃদয়ের মাঝে।

গুরু সকলের হৃদয়স্থিত এই 'মাং' কে জীবন্ত ও জাগ্রত করিয়া শিষ্যের সম্মুখে ধরেন। ইহাই গুরুর গুরুত্ব। তিনি শিষ্যকে বলেন—"হে প্রিয়তম আমি ভগবান্‌কে আমার হৃদয়ের মাঝে পাইয়াছি—বড় সাধ হয় যে তোমাকে আমার বুকের মাঝে পুরে তাঁকে দেখাই।"

এমনি করিয়া যিনি শিষ্যকে ডাকিয়া বলিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে চিত্তসন্তাপহারী সদ্‌গুরু, আর সেই ডাকে যিনি সাড়া দেন ও জাগ্রত হন—তিনিই শিষ্য। এই গুরু শিষ্য সম্বন্ধ অতি মধুর বাৎসল্যপূর্ণ ও সং এবং ইহাদের উভয়ের প্রীতিতে ভগবান প্রকাশ হন। গুরুর সিদ্ধিতে এবং শিষ্যের সাধনায়, তিনি জীবন্ত হইয়া প্রকট হন। ইহাই শিব শক্তি বা ভক্ত ও ভগবানের মিলন।

ইহাই প্রকৃত দীক্ষা, যাহা তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী গুরু শিষ্যকে প্রসন্ন হইয়া দান করেন।

কবীরের দোঁহা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সতর্কীকরণ। (চিতাবণী)

কবীর গর্ব্ব ন কীজিয়ে কাল গহে কর কেশ।
ন জানোঁ কিত মারি হৈ, ক্যা ঘর ক্যা পরদেশ ॥১॥

গর্ব্ব কবীর ক'রোনাক', কাল ধরেছে মুঠোয় কেশ।
জানি নাক' মারবে কোথা, কি স্বদেশ বা কি বিদেশ ॥১॥

আজ কাল্‌হ কে বীচ মেঁ, জঙ্গল হৈবেগা বাস।
উপর উপর হর ফিরৈ, ঢোর চরৈংগে ঘাস ॥২॥

আজ আর কালের মাঝখানেতে, হ'তে পারে বনেতে বাস।
মাড়িয়ে যাবে উপর দিয়ে' জানোয়ারে খাবে ঘাস ॥২॥

হাড় জরৈ জ্যোঁ লাকড়ী, কেস জরৈ জোঁ ঘাস।
সব জগজরতা দেখি করি, ভয়ে কবীর উদাস ॥৩॥

হাড় পোড়ে ঠিক কাঠের সমান, চুল পোড়ে ঠিক ঘাসের মত।
পুড়তে দেখে চরাচরে, কবীর হ'ল সম্মোহিত ॥৩॥

ঝুঠে সুখ কো সুখ কহেঁ, মানত হৈ মন মোদ।
জগত চবেনা কাল কা, কুছু মুখ মেঁ কুছ গোদ ॥৪॥

মিথ্যা সুখে বলে এ সুখ, তাতেই থাকে মনের সুখে।
জগৎ কালের মুড়কীমুড়ী, কতক কোলে কতক মুখে ॥৪॥

কুসল কুসলহী পুছতে, জগমেঁ রহা ন কোয়।
জরা মুঈ ন ভয় মুআ, কুসল কহাঁ সে হোয় ॥৫॥

সবাই শুধায় প্রশ্ন কুশল, চিরদিন কেউ রয় না ভবে।
ঘোচেনি 'ক' জরা কি ভয়, কোথা হ'তে কুশল হ'বে ॥৫॥

পাণী কেরা বুদবুদা, অস মানুষ কী জাতি।
দেখতহী ছিপি জায়গী, জ্যোঁ তরা পরভাতি ॥৬॥

জলবিম্বের রকম যেমন, মানুষের জাত তেমনি ধারা।
চোখের উপর মিলিয়ে যাবে, প্রভাত কালে যেমন তারা ॥৬॥

নিধড়ক বৈঠা নাম বিনু চেতি ন করৈ পুকার।
যহ তন জল কা বুদবুদা, বিনসত নহীঁবার ॥৭॥

নাম ভুলেছে নাই তাহে ডর, ডাকে না হুঁস ক'রে চিতে।
জলবিম্বের সমান দেহ, সয়না দেরী বিনাশ পেতে ॥৭॥

রাত গবাঈ সোয় করি, দিবস গবায়ো খায়।
হীরা জনম অমোল থা, কৌড়ীবদলে যায় ॥৮॥

নিদ্রাবশে রাত কাটালে, খেয়ে দিনটা ক'রছ ক্ষয়।
ছিল জন্ম অমূল্যধন, ক'রছ কড়ির বিনিময় ॥৮॥

কৈ খানা, কৈ সোবনা, ঔরন কোঈ চিত।
সতগুরু শব্দ বিসারিয়া আদি অংত কা মীত ॥৯॥

এক খাওয়া আর শোওয়া ছাড়া, মনেতে আর কিছুই নেই।
ভুলেছ সৎগুরু শব্‌দ, চিরদিনের বন্ধু যেই ॥৯॥　　　　—শিবপ্রসাদ।

অমৃতবচন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেন বি-ই

ব্রহ্মাণ্ডী মনের (Universal Mind) দেশ এবং তাহার ছয়টি উপবিভাগ।

মনের রাগ দ্বেষ ভাব ও সংস্কার প্রভৃতি বাহ্য শরীরে ও আকৃতিতে কিরূপ ভাবে প্রকাশিত হয়, তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি। মনে কর এক ব্যক্তি অত্যন্ত কোপন স্বভাব, বা সামান্য কারণেই সময় ও অসময়ে, নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠে, এই ক্রোধাবস্থায় তাহার মুখের মাংস পেশীগুলি নিয়তই একরূপ ভাবে বিকৃত হওয়ায় চিরদিনের জন্য তাহার চেহারায় সেই ভাব অঙ্কিত হইয়া যায় এবং তাহার মুখাকৃতি এত দূর বিকৃত হয় যে, তাহার সন্তান সন্ততিরও চেহারা সেই রূপ হইয়া থাকে। এই সত্য সূত্রাকারে পরিণত হইলে বলা যায় যে, মনের যে ভাব প্রবল থাকে, তাহা স্থুল শরীরে প্রতিফলিত হয় এবং সন্তান সন্ততিতেও সংক্রামিত হইয়া থাকে। ক্ষণস্থায়ী পিণ্ডদেশের ব্যক্তিগত মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী অবস্থার এই প্রভাব যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহা বুঝিতে হইবে যে বিশ্বজগতের রচনার ও ব্রহ্মাণ্ডী মন ও আত্মার ক্ষেত্রেও এই প্রভাব সত্য হইবে। যে প্রণালীতে আমরা বিচার করিয়াছি তাহা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, মনুষ্য দেহের ষট্‌চক্রের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডেও ষট্‌চক্র আছে এবং পিণ্ডদেশের মনের সহিত আত্মার যে রূপ সম্বন্ধ ব্রহ্মাণ্ডে ও ব্রহ্মাণ্ডী মনের সহিত আত্মার সেরূপ সম্বন্ধ আছে। এই পিণ্ডদেশের বহির্ভূত এক বিশাল ব্রহ্মাণ্ড আছে। তাহাতে ষটচক্র আছে বলিয়াই তাহা হইতে উৎপন্ন পিণ্ডদেশেও ষটচক্র দেখিতে পাই। পারিভাষিক শব্দ পিণ্ডদেশের অতীত এই বিশাল দেশকে ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া থাকে। সন্তানের আকৃতি দেখিয়া যেরূপ পিতার আকৃতি নির্ণয় করা যায় তেমনি পিণ্ডদেশের ষটচক্র দেখিয়া ব্রহ্মাণ্ডেও যে ষটচক্র আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ব্রহ্মাণ্ড শব্দের অর্থ ব্রহ্মের (ব্রহ্মাণ্ডী মনের) অণ্ডাকৃতি দেশ। পরব্রহ্ম পদও এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত। পরব্রহ্মপদ বাদ দিলে ব্রহ্মাণ্ডের ছয় ভাগ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে এবং পিণ্ডদেশের ছয় চক্রের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের ছয় ভাগের সামঞ্জস্য হয় না। পিণ্ডদেশের ছয় চক্র ব্রহ্মাণ্ডের ছয় চক্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।

অষ্টাদশ প্রকরণে আমরা বলিয়াছি যে আজ্ঞাচক্রে আত্মা অবস্থিত এবং পঞ্চম ও চতুর্থ চক্র অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও অনাহত চক্র সূক্ষ্ম প্রাণ ও মনের স্থান। এই সকল চক্রের স্নায়ু কেন্দ্র সমূহ স্থুল জড় পদার্থ নির্ম্মিত, কিন্তু তাহাদের সম্পর্কীয় শক্তির কেন্দ্রসমূহ সূক্ষ্ম, তাহা স্থুল জড় পদার্থ নির্ম্মিত নহে। ব্যক্তিগত এই সকল কেন্দ্রের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের তদনুরূপ শক্তির কেন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ ও সম্পর্ক আছে। ইহা দ্রষ্টব্য যে মনুষ্য শরীরের ভিন্ন ভিন্ন চক্রে এই মনের ভিতর দিয়াই জীবন শক্তি অর্পিত হইয়া থাকে। অনাহত চক্র সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইলে স্থুল শরীর বিনষ্ট হয়। আত্মা মনের

সহিত মিলিত হইয়াই ষটচক্রের কার্য্য করিয়া থাকে। পিণ্ডদেশে এই কথা যেরূপ সত্য ব্রহ্মাণ্ডেও তদ্রূপ সত্য, সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে ব্রহ্মাণ্ডেও এক মহৎ চিতিশক্তির (চৈতন্য শক্তির) কেন্দ্র আছে। উহা ব্রহ্মাণ্ডের মনের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করে। বৈদিক ধর্ম্মে অথবা বেদান্ত দর্শনে ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে ইঙ্গিত মাত্র আছে কিন্তু সেই পরম পদের বিশেষ কোন বর্ণনা নাই। বেদে ইহা "নেতি" "নেতি" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আত্মা হইতে মনের যেরূপ প্রভেদ আছে পরব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মারও সেইরূপ প্রভেদ আছে।

আত্মা যেরূপ মনের সহিত মিলিত, পরব্রহ্মও সেইরূপ ব্রহ্মের সহিত মিলিত। একবার বলা হইয়াছে যে পরব্রহ্ম ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন, ইহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে পুনরায় তাহারা কিরূপে মিলিত হইতে পারে? ইহার সামঞ্জস্য দুই মাপ ও তিন মাপের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। তিন মাপের অর্থাৎ volume এর বা cube এর দুই মাপের যেমন area বা square এর সহিত মিলনও আছে অথচ প্রভেদও আছে, এই দুই মাপ ও তিন মাপের মিলন স্থলেই এই সম্বন্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল এই সম্বন্ধ দ্বারাই উচ্চ মাপের কোন উপলব্ধি হইতে পারে না। এক বিন্দু point টানিলে (trace করিলে) একটি রেখা হয়। সেই রেখাটিকে অন্য মাপে টানিলে (trace করিলে) একটি area বা বর্গক্ষেত্র হয়। সেই area কে তৃতীয় মাপে পুনরায় টানিলে একটি volume বা ঘন ক্ষেত্র হইয়া থাকে। মনুষ্যের এই তিন মাপের বহির্ভূত অর্থাৎ চতুর্থ মাপের কোন জ্ঞান নাই; কেননা এক বিন্দু হইতে পরস্পর সমকোণে (at right angle) তিনটির অধিক রেখা আমরা টানিতে পারি না। এই area যখনই তৃতীয় মাপ টানা হয় তখনই volume হইতে থাকে; সুতরাং এই area তিন মাপ ও দুই মাপের মিলন স্থল। কিন্তু কেবল area দ্বারা volume এর কোন উপলব্ধি হইতে পারে না। সেইরূপ কেবল তিন মাপের দ্বারা চতুর্থ বা উচ্চতর মাপের কোনরূপ জ্ঞান হয় না।

সেই কারণেই আমাদের এই তিন মাপের জগতে, যখন উচ্চতর মাপ হইতে অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম মাপ হইতে যদি কোন ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, তখন তাহা দ্বারা আমাদের এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে যে—উচ্চতর মাপ আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহার কোন জ্ঞানই বস্তুতঃ আমাদের কিছুই হয় না বা তাহার বিচারও আমরা করিতে পারি না। বৈদিক ধর্ম্মে পরব্রহ্ম পদের কেবল ইঙ্গিত মাত্র আছে অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য বা ভাব নয়নগোচর বা উপলব্ধি হয়, তিনি তাহা নন, "নেতি" "নেতি" এই মাত্রই বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্বরূপের প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে কিছুমাত্র উক্তি নাই। বৈদিক ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ শিক্ষায়, আমরা যতদূর জানিতে পারি, তাহাতে বুঝা যায় যে ব্রহ্মাণ্ডী মনের দেশ পর্য্যন্তই বৈদিক ঋষিদের গতি ছিল; তাহার পরে তাঁহাদের কোনরূপ জ্ঞান ছিল না। তৃতীয় অধ্যায়ে এই পরব্রহ্ম পদের বিষয় আমরা বিশেষরূপে বর্ণনা করিব। এখানে আমরা পরব্রহ্মের উল্লেখ এই কারণে করিয়াছি যে সাধারণতঃ 'ব্রহ্মাণ্ড' এই কথাটি বলিলে বেদ বা বেদান্ত মতে যাহা বুঝা যায়, সন্তমতে তাহা বুঝা যায় না। আমরা 'ব্রহ্মাণ্ড' বলিলে এই বুঝি যে পরব্রহ্মপদও উহার অন্তর্ভূত। বৈদিক "ব্রহ্মাণ্ড" শব্দ দ্বারা ইহা বুঝা যায় না। কবীর সাহেব জগজীবন সাহেব এবং অন্যান্য সন্তের মতে ব্রহ্মাণ্ডের তিনটি উচ্চতর ধাম এই:—সুন্ন (পরমাত্মার স্থান) ত্রিকুটী (মেরু, সুমেরু ও কৈলাশ এই তিনের স্থান) এবং সহস্র দল কমল। সুন্নের

(চৈতন্য স্থানের) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—'অক্ষর (অবিনাশী) এখানে তিনি ব্রহ্মাণ্ডী মন অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত। পারিভাষিক শব্দে এই ব্রহ্মাণ্ডীমনকে অথবা ব্রহ্মকে পুরুষ কহে।

এই পুরুষ বা ব্রহ্ম অক্ষর হইতে চৈতন্য শক্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতির উপর কার্য্য করেন এবং তাহাতেই এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। রচনাধ্যায়ে এই সকল ধ্যানের এবং তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ক্রিয়ার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে অন্য দুইটি ধ্যানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম মাত্র উল্লেখ করিব এবং তাঁহাদের সহিত এই পিণ্ডদেশের যে যে চক্রের যোজনা আছে তাহাও বলিব। ত্রিকুটীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম ব্রহ্ম এবং সহস্র দল কমলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম নিরঞ্জন। এই প্রকারে জানা যায় যে ব্রহ্মের তিনটি রূপ আছে (১) অব্যাকৃত (অপ্রকাশিত) (২) হিরণ্যগর্ভ (সুবর্ণগর্ভ প্রকাশিত উৎপত্তি স্থান) (৩) বিরাট (প্রকাশিত বস্তু সমষ্টি)। আমাদের মনোময় অহং ভাবের অর্থাৎ জীবের এই প্রকার তিন রূপ আছে। উগ ব্রহ্মাণ্ডী তিন রূপের সঙ্গে মিলে। এই অহংএর তিন অবস্থা (three states of consciousness) এই :—

(১) সুষুপ্তি (২) স্বপ্ন (৩) জাগ্রত।

যে হেতু সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের (এই অহংভাবের রূপ সাধারণতঃ প্রকাশিত হয় না সেই জন্য আমাদের কথা প্রমাণ করিতে আমরা ট্রান্স (trance) মূলক অসাধারণ ভাবের উল্লেখ করিয়াছি। ট্রান্সের অবস্থায় অহংভাবের (জীব চৈতন্যের) প্রকাশ হয় এবং ইহা সুষুপ্ত অবস্থা হইতে উচ্চতর। জীবের এই তিন চৈতন্য অবস্থার নাম এই :—(১) প্রাজ্ঞ (কারণ রূপ সুষুপ্ত চৈতন্য অর্থাৎ সুষুপ্তাবস্থার নিহিত চৈতন্য (২) তৈজস (স্বপ্নাবস্থার সূক্ষ্মরূপ চৈতন্য) (৩) বিশ্ব (ইহা জাগ্রতাবস্থার স্থূলরূপ চৈতন্য)। মনুষ্যের সুরত অর্থাৎ আত্মা এবং তাহার কেন্দ্র এই তিন রূপ হইতে ভিন্ন, কিন্তু আত্মাই এই তিন রূপকে জীবনীশক্তি দান করিয়া থাকে। মনুষ্য শরীরে তিনটি উচ্চতর চক্রের (অর্থাৎ—আজ্ঞা, বিশুদ্ধ এবং অনাহত চক্রের) সহিত এই তিন রূপের সম্বন্ধ আছে। ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতর তিন ধাম এবং ব্রহ্মের তিন রূপের সহিত ব্যক্তিগত উচ্চতর তিন চক্রের এবং তিন রূপের যোজনা আছে।

ব্রহ্মাণ্ডের তিনটি নিম্নতর চক্র, সংহার, সৃষ্টি এবং পালন শক্তির কেন্দ্র। সংহার শক্তি ত্যক্ত অনাবশ্যক দ্রব্যকে দূর করে, হিন্দু শাস্ত্রে ইহাকেই 'শিব' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্মাই সৃষ্টিকর্ত্তা ; ইহার, প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্মিলন করিয়া পরে উৎপাদন করিবার শক্তি আছে। এবং বিষ্ণুই পালন কর্ত্তা ; ইনি অপর দুই দেবতাকে চৈতন্য ও জড়শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং তাহাদের ক্রিয়ার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন। এই তিন শক্তির প্রতিবিম্ব, চেতন ও অচেতন এতদুভয় পদার্থেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অচেতন বস্তুতে যে সংহতি শক্তি (cohesion) আছে; তাহাই তাহাদের বিবিধ রূপ রক্ষা করিয়া থাকে এবং তাহাই তাহাদের অস্তিত্বের পোষণকারিণী শক্তি। বর্ত্তমান গঠনের বিনাশ যাহা প্রতিনিয়তই হইতেছে, তাহা সংহার শক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে এবং আয়নের ধারা (ionic flow) যাহা পরমাণু ও অণু (molecules) সকলকে পুনর্গঠিত করে তাহা সৃষ্টি শক্তিরই কার্য্য।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেবের প্রতিবিম্ব জড় পদার্থে আছে। উদ্ভিদে এবং প্রাণী জগতে তাঁহাদের প্রতিবিম্ব আরও বিশেষরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। অচেতন

পদার্থে ব্রহ্মাণ্ডের উচ্চতর তিন রূপের কোন চিহ্ন দেখা যায় না; কারণ যে চিতি শক্তি দ্বারা মানসিক ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহা এই সকল পদার্থে অন্তর্নিহিত হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে এবং উচ্চতর রূপ সমূহই চিতি শক্তির মানসিক অবস্থার অঙ্গ। চেতন জীব মূলাধার, সাধিষ্ঠান ও মণিপুর এই শক্তিত্রয়ের কেন্দ্র স্থল। উদ্ভিদে এই তিন শক্তি (১) পত্রপুষ্প ও বল্কল পরিহারকারিণী শক্তি (২) বীজোৎপাদিকা শক্তি এবং (৩) পোষণ কারিণী শক্তিরূপে অল্প পরিমান প্রকাশিত হইয়া থাকে। উপরে আমরা যাহা বর্ণনা করিলাম তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের ছয় চক্রের সহিত পিণ্ডদেশের ছয় চক্রের যে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে আমরা নির্ম্মল চৈতন্য দেশের স্থান কোথায় তাহা অনুসন্ধান করিব।

নির্ম্মল চৈতন্য দেশ।

আমরা দেখিয়াছি যে মানুষের মন আত্মার অধীন, কার্য্য করিবার সময় মন আত্মা হইতেই প্রয়োজনীয় শক্তি ও বুদ্ধি বা জ্ঞান গ্রহণ করিয়া থাকে এবং এই মন আত্মার সহিত সম্মিলিত। এই কথা ব্রহ্মাণ্ডী মনের দেশ সম্বন্ধেও খাটে। উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মনের ও আত্মার আন্তরিক সম্বন্ধ বিষয়ে যদিও অনেক তত্ত্ব প্রকাশ করে তথাপি নির্ম্মল চৈতন্য ধাম যে কোথায় আছে তাহা নির্ণয় করিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে। সেই জন্য অন্য দিক হইতে আমরা এ বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

আমরা ত্রয়োদশ প্রকারণে দেখাইয়াছি যে, আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম কোষ হইতে মুক্ত হইলে, ইহার কার্য্যকারিণী শক্তি আরও বর্দ্ধিত হয় এবং ইহার নূতন নূতন শক্তি জাগিয়া উঠে। নবম প্রকরণে আমরা ইহাও দেখাইয়াছি যে এই মন একটি যন্ত্রমাত্র; ইহার সাহায্যে আত্মা বিবিধ মানসিক ক্রিয়া করিয়া থাকে এবং যখন চৈতন্যের ধারা গুপ্ত হয় তখন মন নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। সুতরাং এতদ্দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে এই স্থূল শরীরের ন্যায় এই মন ও আত্মার কার্য্য করিবার একটি কোষ বা পর্দ্দা মাত্র। এক্ষণে ইহা বেশ বলা যাইতে পারে যে স্থূল শরীর ত্যাগ করিলে আত্মার যেরূপ ক্ষমতা বার্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ মনোময় কোষও ত্যাগ করিলে তাহার শক্তি আরও বর্দ্ধিত হইবে এবং নির্ম্মল চৈতন্যের ক্রিয়াশক্তি (মানসিক ক্রিয়াশক্তি যাহার ছায়ামাত্র) স্পষ্ট প্রকাশিত হইবে এবং মানসিক শক্তি অপেক্ষা উহা প্রভূত বলশালী রূপে প্রকাশিত হইবে। এবং যে সচ্চিদানন্দভাব আত্মার নিজ গুণ তাহা তখন স্পষ্টরূপে জাগরিত হইবে এবং দুঃখের লেশ মাত্রও থাকিবে না। এই সিদ্ধান্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি প্রয়োগ করিলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব ব্রহ্মাণ্ডী মনও লয় হইলে, এবং সুরতের ভাণ্ডার হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, সেই নির্ম্মল চৈতন্য দেশ প্রকাশিত হইবে এবং এতদ্বারা আমাদের গন্তব্য স্থান যে কোথায় তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইব। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই তথ্য আবিষ্কার করা তত সহজ নহে; যে হেতু উল্লিখিত সিদ্ধান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি না যে কি কারণেই বা ব্রহ্মের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং কেনই বা তাহা সুরতের ভাণ্ডারের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং কি জন্যই বা তাঁহাকে সেই ভাণ্ডার হইতে বিচ্ছিন্ন করা উচিত। রচনা অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশদরূপে বর্ণনা করা যাইবে। এস্থলে আমাদের সংক্ষেপে ইহা বলাই যথেষ্ট যে নির্ম্মল চৈতন্য দেশের এই ছয় ভাগ থাকার জন্যই ব্রহ্মাণ্ডের উপর নির্ম্মল চৈতন্য শক্তিসংজ্ঞাতে ইহাতেও ছয়ভাগ সৃষ্ট হইয়াছে।

মানবদেহ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরস্পর সংযোগ

মনুষ্য শরীরে এরূপ রন্ধ্র বা ছিদ্র আছে যাহার ভিতর দিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সহিত সংযোগ হইয়া থাকে। এই সংযোগের প্রধান সহায় চৈতন্যধারা। কারণ চৈতন্যধারা ঐ ছিদ্রের সহিত ওতপ্রোত ভাবে মিলিত আছে। এই সংযোগ ও তাহার অনুভূতি যে প্রকারে হইয়া থাকে তাহা নিম্নে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় আমরা প্রথমে বিচার করিব। এই স্থূল শরীরের যে উপাদান চর্ম্ম, অস্থি, মাংস, মজ্জা নাড়ী, স্নায়ু প্রভৃতি সমস্তই ত্বগিন্দ্রিয়ের যন্ত্র। যখন এই ত্বগিন্দ্রিয় কোনরূপে উত্তেজিত হয়, তখন স্পর্শের অনুভূতি হইয়া থাকে; ইহা সুখকর বা দুঃখকর হইতে পারে। এই স্পর্শেন্দ্রিয়ের উপর কোন ক্রিয়া হইলে তাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ধারা, যাহা ছিদ্রের ভিতর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে, মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। যদি এই ছিদ্রসমূহ বন্ধ করা যায় অথবা ঐ ধারাকে অপসারিত করা যায়, তাহা হইলে স্পর্শের অনুভূতি মোটেই হয় না। এইরূপ ব্যাপার অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধেও সত্য। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের একটি বিশেষ যন্ত্র আছে এবং তাহার ভিতরে সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ানুরূপ মসলা বা উপাদান আছে। এই মসলার সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ধারা সংযুক্ত আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চক্ষু ইন্দ্রিয়কে লওয়া যাউক:—চক্ষুর স্নায়ুর (optic nerves) ভিতর জ্যোতি আছে; ইহাই দর্শনেন্দ্রিয়ের বিশেষ উপাদান ও ইহার দ্বারাই বাহ্য জ্যোতি ভিতরের জ্যোতির সহিত মিলিত হইয়া থাকে। কিরূপে বাহ্য জ্যোতি দর্শনেন্দ্রিয়ের ভিতর গিয়া দর্শন ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহা আরও বিশদভাবে আলোচনা করা যাউক:—অক্ষি গোলাকার (crystalline lens) ভিতর দিয়া জ্যোতি যাইলে চক্ষুর পর্দ্দার (retina) উপর বাহ্য বস্তুর একটি ছবি পড়ে, তদনন্তর চক্ষুর স্নায়ুর (optic nerves) এবং তৎসংসৃষ্ট জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ধারার সাহায্যে সেই ছবি বস্তু আকারে অনুভূত হইয়া থাকে। এই অপটিক নাড়ী প্রস্ফুরণশীল, এবং ইহাতে জ্যোতি আছে; স্নায়ুর এই অন্ত নিহিত জ্যোতির দ্বারাই বাহ্য জ্যোতির সহিত মিলন হইয়া থাকে; তাহার পর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ধারা অনুভূতি কার্য্য সম্পাদিত করে।

দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ে আমরা যাহা বলিলাম তাহা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়েও (যথা সম্ভব পরিবর্ত্তন সহ) খাটে। (তৃতীয় অধ্যায়ে ইহা বিশেষ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে) সুতরাং এই নিয়ম দেখা যাইতেছে যে ব্যষ্টিতে সমষ্টির অনুভূতি হইতে হইলে অর্থাৎ মনুষ্য শরীরে বিশ্বজগতের কোন অনুভূতি হইতে হইলে, চৈতন্য ধারা ব্যষ্টির উপযুক্ত ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়া তাহার উপযুক্ত মসলার সহিত যখন মিলিত হয়, তখনই বিশ্বের অনুভূতি এই শরীরে হইয়া থাকে। উল্লিখিত নিয়মানুসারে এ জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধামের সহিত মনুষ্য শরীরের ভিন্ন ভিন্ন চক্রের বা স্নায়ু কেন্দ্রের সংযোগ হইয়া থাকে। এরূপ সংযোগ স্থাপন করিতে হইলে বিশেষ সাধনার আবশ্যক। এই সাধনার বলেই অন্তর্নিহিত চক্র (যাহা সাধারণতঃ সুপ্ত অবস্থায় থাকে) জাগরিত হইতে পারে এবং জাগরিত হইলে পর এই সংযোগ স্থাপিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বনিম্নস্থ চক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সংহারকারী শিবের পুত্র গণেশ। মনুষ্য শরীরে মূলাধার এই চক্রের অনুযায়ী চক্র; যদি মূলাধার চক্রকে জাগরিত করা যায় তাহা হইলে গণেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এবং মূলাধার চক্র জাগরিত করিলে গণেশের এবং তাঁহার স্থানের সহিত মিলন হইবে এবং সাধকের শরীরে গণেশের শক্তি কিয়ৎপরিমাণ সঞ্চারিত হইবে। এইরূপ মনুষ্য শরীরের অবশিষ্ট পঞ্চ চক্র ব্রহ্মাণ্ডের

পঞ্চ চক্রের সহিত মিলিত হইতে পারে। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি সমন্বিত যে জগত আমরা সম্মুখে দেখিতেছি তাহা ছয় ভাগে বিভক্ত। মনুষ্য শরীরে যেরূপ ছয়টি চক্র আছে তাহার সহিত এই ছয় ভাগের সংযোগ রহিয়াছে। এই পরিদৃশ্যমান জগতের বাহিরে ব্রহ্মাণ্ডী মনের ধাম আছে। তাহা স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বা কোন দূরবীক্ষণাদি যন্ত্র দ্বারা অনুভূত হয় না। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মাণ্ড ও নিখিল চৈতন্য দেশের বিশেষ বর্ণনা আছে। এক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড ও নিখিল চৈতন্য দেশের সহিত কিরূপে সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব তাহাই ব্যক্ত করিব।

সমাগতা

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন ২৪ বৎসরের যুবক রবার্ট আড্রিয়ান্ শ্বেত দ্বীপের তুষারময় পল্লীবাস ভবন পশ্চাতে ফেলিয়া শ্বেত রজত খণ্ড সংগ্রহ মানসে এই সূর্য্যি মামার দেশে আসিয়াছিলেন, তখন এক ঐ রজত খণ্ড ব্যতীত এদেশে আর কুত্রাপি রূপ খুঁজিয়া পান নাই। তাই, এক বৃহৎ কয়লা কুঠির ম্যানেজারীর সূত্র ধরিয়া প্রতিমাসে যখন তিনি বহু সংখ্যক রজত খণ্ড চর্ম্ম থালিয়ায় পূরিয়া বাক্স বন্দী করিতে করিতে আপন মনে শিস্ দিতেন, তৎকালে ঐ রূপের সন্ধানে মনটিকে একবার সুদূর শ্বেতদ্বীপের পল্লীতে পল্লীতে একপাক ঘুরাইয়া আনিতেন।

কিন্তু মামার বাড়ীর আদরে—কড়া রৌদ্র তেজে, যখন বরফে জমা গাঢ় রক্ত পাৎলা হইয়া গেল, তখন মিঃ আড্রিয়ান্ হটাৎ কলম্বসের মত আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন যে, মালকাটা মজুর শ্যাম বাউরীর ষোড়শী কন্যা রমণীর চক্ষুদুটিতে একটু সৌন্দর্য্য লুকাইয়া আছে,—কণ্ঠস্বরটিও মধুর! তারপর সার আইজাকের মত ইহাদের মধ্যে একটু 'মাধ্যাকর্ষণও অনুভব করিয়া ফেলিলেন।

যেই চিন্তা, সেই কায! অল্পদিনেই—সূর্য্যি মামার কোত্রা পলিশ গেল না বটে,—অল্পদিনেই রমণী কয়লার গুঁড়া ধুইয়া মুছিয়া, সাবানে, এসেন্সে, পাউডারে রমণীয় শ্রী ধারণ করিল।

তারপর, পুরা বিশবৎসর পরে, যখন মিষ্টার আড্রিয়ান তীক্ষ্ণধার ডাইভোর্স আইনের একটি চোটে রমণীর সম্বন্ধ সূত্রটি সাফ্ দ্বিখণ্ডিত করিয়া, রোরুদ্যমানা রমণীর হস্তে ষোড়শ বৎসর বয়স্ক পুত্র জেম্‌স্ আড্রিয়ান্‌কে এবং সামান্য কয়েক শত টাকা দিয়া, আপন তল্পী তল্পা বাঁধিয়া মুক্ত পিঞ্জর শুকের মত পশ্চিম মুখে উধাও হইয়াছিলেন, তখন ধূল্যবলুণ্ঠিতা রমণীর অশ্রুপ্লাবন মুহূর্ত্ত মাত্র তাঁর গতিরোধে সক্ষম হয় নাই। সে আজ ১৬ বৎসরের কথা হইল।

রমণী এখনো বাঁচিয়া আছে। দুই তিনটি ধাড়ি শূকর এবং কয়েকটি মুরগী মাত্র তার সম্পদ—তার জীবিকা অর্জ্জনের উপায়। সে মানভূম জেলার কোন পল্লীতে বাস করে।

জেম্‌স্ এড্রিয়ানের বয়স এক্ষণ ৩২ বৎসর। সে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর অধীনে ড্রাইভারের কাষ করিয়া মাসে ১৫০৲ টাকা মাহিনা পায়। জেম্‌স্ মধ্যে মধ্যে তাহার গর্ভধারিণীকে

দশ পাঁচ টাকা সাহায্যও না করে তা'নয় এবং রমণীও মধ্যে মধ্যে আসিয়া ছেলেকে দেখিয়া যায়।

জেম্‌স্ শত হো'ক্, সাদা চামড়ার মানুষ হইয়া সেই নিছক আব্‌লুশ্ বর্ণা মা'টির এতটা জুলুম কেন বরদাস্ত করিত, সে কথার উত্তর অতি সোজা,— রমণী তা'র শিশু সন্তানটিকে ধাত্রী দ্বারা মানুষ করাইয়া লয় নাই, প্রসবের পর হইতে নিজ হস্তেই লালন পালন করিয়া বড় করিয়াছিল। বলিয়াছি, 'ইনি আমার গর্ভধারিণী, শাস্ত্র মতে ইনি আমার পূজ্যা এবং প্রতিপালনীয়া' এই বিচার করিয়া কার্য্য করা এবং শৈশবাবধি অর্জ্জিত সংস্কার উদ্ভূত ভাবের তাড়নায় কার্য্য করা, এদুই এ বিস্তর অন্তর! শৈশব-সংস্কারের গুরু চাপে কৃষ্ণবর্ণা মাতাটির অস্তিত্ব অপলাপ করিবার শক্তি জেম্‌সের ছিল না। কিন্তু তথাপি সে মাতার বড় সাহায্যও করিয়া উঠিতে পারিত না, তাহার কারণ তাহার অশিক্ষা-জনিত অমিতাচার। তাহার মাহিনা ১৫০৲ টাকা হইলেও কোন কোন মাসে তাহার কেল্‌নারের বিল্ একশতেরও অধিক হইয়া যাইত। অপিচ জেম্‌সের একটি কন্যাও নাকি কোন্ অনাথ আশ্রমে ছিল, তাহার জন্যও প্রতিমাসে কিছু কিছু দিতে হইত; কাযেই, ঐ ১৫০৲ টাকাতেও তার কুলাইত না।

জেম্‌সের এতাবৎ বিবাহ হয় নাই। এ-ই-যাঃ; এইবার একটা মস্ত গোলে পড়িয়া-গেলাম! আলোক প্রাপ্ত অভিজ্ঞ পাঠকের জন্য আমার উদ্বেগ নাই। যিনি মন্দিরের চৌকাঠে পা দিয়াছেন, তিনি জানেন, না জানেনতো উঁকি মারিলেই দেখিবেন,—কালি ঘাটের কালী—দেড়হাত জিব্! কিন্তু আমার মস্তকের এই যে, জেম্‌সের বিবাহই হয় নাই অথচ তাহার কন্যা ছিল বলিয়াছি, এ দুরন্ত হিঁয়ালী আমি আমার এতদ্দেশীয় পাঠক যিনি অদ্যাপি অন্ধকার মাতৃ গর্ভবৎ পল্লী বাসেই আছেন তাঁহাকে বুঝাইব কি করিয়া!

বাজারে অনেক দ্রব্যই পরীক্ষা করিয়া কিনিবার সুযোগ ঘটে না। সে সকলের পরীক্ষার সময় আসে ব্যবহার কালে; কিন্তু আমওয়ালীর বাজারে সে নিয়ম নয়, সামনে খাড়া হইলেই এক চাকা পাওয়া যায়। চাখিয়া পরখ করিয়াই আম কিনিবার রীতি। কাযেই আম বাজারে কেহ কেহ এমন ভুয়া (bogus) খরিদ্দার যায় যে চাখিয়াই দিন চালাইয়া লয়, সওদা করে না। তবে, দৈবাৎ 'ঝুড়ি শকড়ি' হইয়া গেলে একটু ফের ঘটিয়া যায় বটে, তখন হয় ঝুড়ি সমেত কিনিতে হয়, নয় কিছু মূল্য দিতে হয়, তবে সেটা বড় সাধারণ নয়।

জেম্‌স্ গোষ্ঠীর বৈবাহিক বাজার, ঐ আম বাজারের মত,—'চাখ, খাও, পোষায় লও, না পোষায়, হাত ঝেড়ে, মুখ মুছে বাড়ী চলে যাও!

আমাদের জেম্‌স্‌ও ঐরূপ একজন ভুয়া গ্রাহক। একবার নাকি দৈবাৎ 'ঝুড়ি শকড়ি' করিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু তথাপি ঝুড়ি কিনে নাই, তাই মাসে কিছু কিছু জরিমানা লাগিত। ঐ কন্যাটি বুঝি—'child during parents' engagement'

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

জেম্‌সের সহিত সমাগতার পরিচয় হইয়াছিল। ক্রমশঃ সে পরিচয় ঘনীভূত হইলে সমা এক সুট পোষাক আর একজোড়া লেডিশু (স্ত্রীপাদুকা) জেম্‌সের নিকট উপহার স্বরূপ পাইল। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমাকে সেগুলি লইতে হইল কিন্তু সে সকল সমা ব্যবহার করিল না।

মিস্ সরলতা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সমা বলিল,—'দেখুন ভগ্নি! এগুলি আমাকে যেন কয়েদীর পোষাক বলে বোধ হচ্ছে!' হাসিয়া সরলতা বলিলেন,—'কি বলেন আপনি, ভগ্নি, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য জাতির জাতীয় পোষাককে আপনি কয়েদীর সাজ বল্লেন!' সমা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবেই বলিল,—'ইংরাজ সভ্য জাতি হউন, কিন্তু তাঁহাদের পুরুষ জাতিও যে পৃথিবীর পুরুষ সাধারণের মত সমান অসমদর্শী আর সমান বিচার প্রবৃত্তিহীন একথা আমার স্পষ্টই বল্‌তে ইচ্ছা হয়!' আশ্চর্য্য ভাবে সরলতা বলিলেন,—'একথা আপনি কেন বলচেন ভগ্নি? সমাগতা বলিল,—'দেখুন, ভারতবাসী বর্ব্বর জাতি, তারা স্বার্থপরতায় অন্ধ হ'য়ে বিধি নিগৃহীতা স্ত্রীজাতির ঘন জঙ্ঘা, নিবিড় নিতম্ব, গুরু বক্ষঃ, দীর্ঘ কেশের উপর নিষ্কদ্ধ শাড়ী আর পায়ে রূপার বেড়ী দিয়ে আত্ম রক্ষা চুলোয় যাক্, পালাবার পথ পর্য্যন্ত রোধ কর্ত্তে পারে, কিন্তু সেই শাড়ী মলের চেয়ে, বিচার ক'রে বলুন তো ভগ্নি, এই বিরাট গাউন (ঘাগরা তখন হাঁটুর উপর উঠে নাই) আর বিচিত্র মূর্ত্তি লেডিশু পলাবার পক্ষে দূরে যাক্, দ্রুত যাবার পক্ষেও কি বেশী বাধাজনক নয়? তাঁরা ইচ্ছে কল্লেই তো স্ত্রীজাতিরও শর্টবুট ব্যবস্থা কর্ত্তে পারেন। দেখুন, মূর্খের ত্রুটী ক্ষমা করা যায় কিন্তু শিক্ষিতের ত্রুটী ক্ষমা করা যায় না! শুধু তাই নয়, এগুলি যেন আমাকে চিরদিনের জন্য একটা জেলখানায় বদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে কড়ি বেড়ী নিয়ে জেল ওয়ার্ডারের মত আমার সম্মুখে হাজির হ'য়েছে!"

হাসিয়া মিস্ সরলতা বলিলেন,—'আপনি ক্রিটিসিজ্‌মের ছাঁকনায় সূক্ষ্ম বের করে জিনিসটার রংবদলে দিচ্চেন ভগ্নি, কিন্তু মোটামুটি ভেবে দেখুন, এদেশের স্বামীরা তাঁদের স্ত্রীদিগে পর্দ্দার জেলে ভ'রে চাকরাণীর মত খাটিয়ে নেন; এমন কি, স্বামী বাইরে গেলে তাঁর খাবার আগ্‌লে হাঁ ক'রে তীর্থের কাকের মত অনাহারে বসে থাক্‌তে হয়, অবিশ্যি সত্য বল্‌তে গেলে, আমার দেশীয় খৃষ্টান, ভগ্নীরাও এ দোষটা একেবারে ছাড়তে পারেন নাই, সেটা তাঁদের নিজের ত্রুটী, কিন্তু ইউরোপীয় কিম্বা এংগ্লোইণ্ডিয়ান সমাজে ঐ রকম নাই; বিশেষতঃ স্বাধীন মেলা মেশা, স্বাধীন বিচরণ স্বাধীন চিন্তা যে অবাধ সেটা স্বীকার কর্ত্তেই হয়।

সমা অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল,—'সেই ধারণাই ছিল ভগ্নি; পৃথিবীর আকার সম্বন্ধীয় ধারণার মত, এখন সে ধারণা ভেঙ্গে চূরে গোল্লে দাঁড়িয়েছে,—একটা মস্ত গোল! এদেশী,—ছেড়ে দেন এদেশী, বাঙ্গালীর কথাই বলি,—'বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের পর্দ্দা' ব'লে কথাটা অত সাধারণ করে বল্লে ঠিক বলা হ'লো না; বাঙ্গালীর কতকশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগে তাঁদের জীবনের কতকটা অংশ—আমি পাড়াগাঁয়ের কথা বল্‌তে চাই—কতকটা অংশ কতকটা ঢাকা ঢুকির ভিতর থাকতে হয়; আমার এখন বোধ হয় সেটা খুবই সঙ্গত ব্যবস্থা, বলিয়া সমা একটু অন্যমনস্কা হইল।

সরলতা বলিলেন,—'আপনার কি কোন রকম অনুতাপ এসেচে ভগ্নি?' সমা বলিল,—না, অনুতাপ নয়, অনুতাপের কায আমি কিছু করি নি! আমি আমার জাতির অবিমিশ্র (unqualified) স্বাধীনতারই পক্ষপাতী, তথাপি স্বাধীন বিচরণের ছাড় দিয়ে, তা'রই বনিয়াদে ডাইভোর্স আইনের গঠন আর সমর্থনের সুযোগটাকে আমি আদৌ স্বাধীনতা বলে গণতে পারি না ভগ্নী!' বলিয়া সমা অল্পক্ষণ চিন্তিত ভাবে থাকিয়া বলিয়া উঠিল,—'সকল দেশেরই পুরুষ জাতি সাধারণ যে স্ত্রীজাতি সাধারণ চেয়ে অন্ততঃ দৈহিক বলে বড়, একথা তো আপনি স্বীকার করেন?' সরলতা বলিলেন,—'নিশ্চয় স্বীকার করি,—ছিল, আছে এবং চিরকালই থাকিবে এও স্বীকার

করি! সমা,—'আপনি কি বল্‌তে পারেন ভগ্নি,—ইউরোপের শক্তিশালী পুরুষ জাতি আপনাদের অধিকার—দুর্ব্বলের উপর সবলের যে স্বাভাবিক অধিকার—সে অধিকার খর্ব্ব ক'রে দুর্ব্বল স্ত্রী জাতির অধিকার বাড়িয়ে দিলেন কেন?—দয়া ক'রে?' সরলতা,—মনুষ্যত্বের খাতিরে—বিচার বুদ্ধির বশে কি হ'তে পারে না? সমা মৃদু হাসিয়া বলিল,—'দেখুন, বিচার বুদ্ধির খাতিরে আপনার স্বার্থ খাটো করে পরের স্বার্থ বাড়িয়ে দেয় এমন লোক পৃথিবীতে অতি বিরল, গোটা একটা জাতি তো দূরের কথা! মাফ্ করবেন্ ভগ্নি, এই আমার ধারণা যেখানে আপনার হিস্যা কেটে পরকে দেওয়ার কথা উঠে, সেখানে ছোট বড়কে দিয়েছে দেখ্‌লে মনেই হয় যে, ভয়ে দিয়েছে; না দিলে বড় যে কোনো সময়ে জোর ক'রে নিতে পা'র্‌তো; আর, বড় ছোটকে দিয়েচে দেখ্‌লেই মনে হয় দয়া ক'রে দিয়েচে, অথবা নিজের সুখ সুবিধার অনুকূল ভেবেই দিয়েচে, যখন মন যাবে তখনি হাত মুচ্‌ড়ে কেড়ে নেবে; ওটা যদি সত্যিই কিছু হয়, ওটা দেওয়া নয় ভগ্নি, ওটা মস্তবড় একটা হোক্স্ (hoax) নিজের কায হাঁসিল কর্ত্তে মিছে প্রলোভন (allurement) তা'না হ'লে, মদ বিক্রির মুনফার পিছনে পাচ আইনেব বিধানের মত ডাইভোর্স আইন কেন? যে মন মাত্রা ঠিক রেখে পা বাড়াতে পারে সে শুঁড়ির দরজাদিকে তাকাবার প্রয়োজন দেখ না। তাই মনে হয়, স্বাধীনতা, অধিকার, সুখ, এসব বুঝি মনের খেয়ালেরই formation (গঠন)!'

বলিয়া সমা একটু গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিতেছিল; সরলতা বলিলেন,—আপনার কথাটা নেহাৎ ছুড়ে ফেলা যায় না, মুখে যাই বলা হোক দুর্ব্বল স্ত্রী সকল অবস্থাতেই সবল পুরুষের অধীন! তা' হ'লে—সরলতার কথা সমাপ্তির পূর্ব্বেই সমাগতা মৃদু হাসিয়া বলিল,—'আমি বিয়ে ক'র্‌বো না ভগ্নি!' সরলতা, —'তা-ই বল্‌চি,—তা' হলে জেম্‌স্‌কে কি বলা হবে?' সমা,—'জেম্‌স্ আড্রিয়ান্ কি তারিখ ঠিক ক'রে কিছু বলেচেন?' সরলতা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—'দেশীয় খৃষ্টান মতে হ'লে তৎপর কায সেরে নেওয়া যেতে পার্‌তো, কিন্তু এংগ্লো ইণ্ডিয়ানদেরও যে ইউরোপীয়ানদের নিয়মে বিবাহ ভগ্নি! পরস্পব পরস্পর'ক বিশেষ ভাবে পরীক্ষা না করে তো ইউরোপীয় বিবাহ হয় না,—এটা কি আপ্‌নি এতদিন জান্‌তেন না?' সমা বলিল, —আগে বেশ জানতাম না, এখন জান্‌চি,—বিবা'হ হবার আগেই বর কনের স্বামীত্বে অধিষ্ঠিত হ'য়ে সকল রকম স্বত্ব পরিচালন করে, চাই কি, দুই একটি তৃতীয় ব্যক্তি আবির্ভাবের পরও মত প্রকাশ ক'রে ফেল্‌বেন, —বিবাহ হবে না, নাহয় তো বিবাহের দিন কতক পরে সামান্য কারণেই ঐ আষ্টে পৃষ্ঠে পরখকরা বাঁধনটা কাট্‌বার জন্য ডাইভোর্সের মামলা সুরু করে মান সম্ভ্রম মাঠময় করে দেবেন,—নারীমর্য্যাদার মুখের উপর এমন জুতার বাড়ি তো সহজ বুদ্ধিতে কল্পনাই করা যায় না!' বলিতে বলিতে উত্তেজনায় সমার চক্ষু দুটি জ্বলিয়া উঠিল, সমা দৃঢ় স্বরে বলিল,—তাঁকে বলে দেবেন ভগ্নি,—'আমি বিবাহ করবো না!' সরলতা সমার দেহের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—'তা হ'লে কি উপায় হবে? চাকুরি টা ও তো—সরলতার কথা শেষ না হইতেই সমা অধিকতর দৃঢ়স্বরে বলিলঃ—'যা' হয় হবে, আমি বিয়ে কর্‌বই না?'

নবম পরিচ্ছেদ।

একদিন প্রাতঃকালে লক্ষ্ণৌএর হাসপাতালের ফিমেল ওয়ার্ডে রোগীর খাটিয়ায় শুইয়া সমা চক্ষু মেলিয়া আশ্চর্য্য হইল এবং ধীরে ধীরে চক্ষু দুটি পুনরায় মুদিয়া ফেলিল।

চপলতাপ্রণোদিত হইয়া, কৌতুকবশতঃ সমা জেম্‌সের দেওয়া সেই লেডিশুটি পরিয়া চলিতে গিয়া ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া গিয়াছিল। সে সময় সমা সে পতনটা হাসিয়া সারিয়া লইয়াছিল এবং জুতা জোড়াটিকে তৎক্ষণাৎ জানালার ফাঁক দিয়া নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়াছিল; কিন্তু কয়দিন পরে এই পতনের পরিণাম বড়ই ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইল।

সমার উদরমধ্যে ভ্রূণ ছিল। পতনের ফলে আহত হওয়ায় সে ভ্রূণ গর্ভেই নষ্ট হইলে, সমার দেহে সেই মৃত ভ্রূণের বিষ সঞ্চারিত হইল। প্রবল জ্বরে সমার সংজ্ঞা লোপ হইল। সমার বন্ধুবর্গ তত্রত্য লেডি ডাক্তারকে আনাইলেন। লেডি ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং অত্যন্ত আগ্রহে তাহাকে তাঁহার সর্ব্বসাময়িক তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে রাখিবার জন্য লইয়া যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সমার বন্ধুবর্গ প্রথমতঃ তাহাতে একটু আপত্তি জানাইলেন, বলিলেন—দেখুন, হঠাৎ হাসপাতাল দেওয়াটা বড়ই অভদ্রের ব্যবহার হয়, আমাদের বোধ হয় কর্ত্তব্যের ত্রুটীর জন্য অধর্ম্মও হয়! লেডি ডাক্তার বলিলেন,—'অন্য ক্ষেত্র হ'লে তাই হ'তে পারতো ভগ্নি, এক্ষেত্র স্বতন্ত্র—রোগিণী আমার অত্যন্তই চেনা; আমার ছেলেবেলার 'স্কুলমেট্‌'! সমার বন্ধুগণ আহ্লাদিতা হইলেন।

হাসপাতালে আনীত হইয়া সমা লেডি ডাক্তারের যত্নে, বহু কষ্টে আরোগ্য লাভ করিল। সমাকে বাঁচাইতে তাহার ক্ষতযুক্ত গর্ভাশয়টি (overy) কাটিয়া বাহির করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সমা তৎকালে অজ্ঞান থাকায় সেকথা কিছুমাত্র জানিতে পারে নাই। অস্ত্রোপচারের পর সবেমাত্র আজ সমা প্রথম চক্ষুরুন্মীলন করিলে, সম্মুখে একখানি অত্যন্ত পরিচিত অথচ বিস্মৃত পরিচয় মুখ দেখিয়া সে আপন মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত স্মৃতির আলেখ্যটি একবার তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানেচ্ছায় চক্ষু মুদিল।

সমা চক্ষু মুদিলে, সম্মুখভাগে উপবিষ্টা লেডি ডাক্তার ডাকিলেন,—'সমারাণি!' কণ্ঠস্বর-ঝঙ্কার কর্ণপটহে দীর্ঘকাল স্থায়ী, স্বর পরিচিত; কিন্তু কবে কোথায় সে স্বর কর্ণাশ্রিত হইয়াছে তাহা সমা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না এবং পুনরায় চক্ষুরুন্মীলিত করিয়াও সম্মুখোপবিষ্টাকে চিনিয়া উঠিতে পারিল না। কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—'আপনি কে?' লেডি ডাক্তার বলিলেন,—'আমি কুসুম!'

সমা কম্পিত ক্ষীণ একটি হস্ত উর্দ্ধে তুলিল, কুসুম মস্তক অবনত করিয়া সমার কম্পিত হস্ত স্কন্ধে লইয়া সমার মুখচুম্বন করিলেন। অন্য কেহ ছিল না, কেবল দুই দুইটী আনন্দাশ্রুবিন্দু এই প্রিয়সম্মিলন দেখিতে ছুটিয়া আসিল।

সমা কি বলিতে চেষ্টা করিতেছিল, কুসুমকুমারী তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন,—'চুপ্‌ কর, এখন কিছুনা। জগদীশ্বর মুখতুলে চেয়েচেন,—তোমায় আমি বাঁচাতে পেরেচি! এই একটা ঘটনাই আমার শিক্ষা আর এই বৃত্তিটাকে সার্থক করে দিয়েছে সমা!' স্বর,—ভাবাবরুদ্ধ—গদ্‌গদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

কুসুম কুমারী এক দেশীয় খৃষ্টানের কন্যা। সমার পিতার বাসাবাড়ীর সন্নিকটেই কুসুমের পিতার বাসা ছিল। কুসুম সমার সহিত একই স্কুলে পড়িত। দুই এক শ্রেণী উপরে পড়িত।

বয়সেও সে সমা অপেক্ষা দুই চারি বৎসরের বড় ছিল। অনেক দিনই তাহাদের পরস্পরের ছাড়াছাড়ি, কিন্তু বাল্যের প্রীতি গভীর প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় স্থায়ী স্মৃতিগুঞ্জকরী।

কুসুমের দেহ-সৌন্দর্য্য উল্লেখ যোগ্য না হইলেও তাহার হৃদয় কামিনী-কমনীয়তামণ্ডিত থাকায় তাহার মানসিক এই স্থায়ী সৌন্দর্য্য অস্থায়ী দেহসৌন্দর্য্যকে আলোচনার সীমা বহির্ভূত করিয়া দিয়াছিল। কয়েক মাসে সমা আরোগ্য হইল। কুসুম তাহাকে ছাড়িল না; কয়েক মাস সমা বাল্যসখীর কাছেই রহিল। কুসুমের গৃহপালিত মেষশাবকের মত শান্ত, শিষ্ট, ভদ্র একটি স্বামী ছিলেন এবং তিনটি সন্তান ছিল, জ্যেষ্ঠাটি কন্যা, বয়স নয় বৎসরের অধিক হইবে না এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটি পাঁচ বৎসরের মাত্র।

কুসুম কুমারী যোজন বিস্তৃতা পদ্মানদীর ভীষণ তরঙ্গ ভঙ্গ ভেদ করিয়া অপর পাড় হইতে এই নিরীহ স্বামীটিকে আহরণ করিয়াছিল। স্বামীটির নাম কুসুম ধরিত না, মিঃ সমদ্দার বলিয়াই ডাকিত; আমাদেরও তদতিরিক্ত কিছু জানিবার উপায় নাই। তাঁহার বিদ্যাসাধ্য বিশেষ কিছু থাকার কথা প্রচার ছিল না; সে তথ্য অনুসন্ধানের কোন উপলক্ষও উপস্থিত হয় নাই; তবে তাঁর বর্ণপরিচয় ছিল না, এমনটা নয়। কুসুমকুমারীকে কার্য্যব্যপদেশে সর্ব্বদাই বাহিরে থাকিতে হইত কাযেই, স্বামী মহাশয়কে সন্তান পালন, রন্ধনাদি হইতে তাবৎ গৃহকার্য্য এবং গৃহিণীপনা করিতে হইত।

স্বামীটি সর্ব্বদা সহাস্যবদন এবং গৃহকর্ম্মে অক্লান্ত। একদিন মিঃ সমদ্দার গৃহপরিষ্কার করিয়া পত্নীর জুতা বুরুশ করিতেছিলেন; সমার জুতা জোড়াটিও সেই স্থানেই ছিল; পত্নীর জুতা সারিয়া সমার জুতায় হাত দিতেই, সমা দৌড়িয়া গিয়া;—'ওয়েল্, ওয়েল্, মিষ্টার সমদ্দার! করেন কি?' বলিয়া সমদ্দারের হাতটি চাপিয়া ধরিল। মিঃ সমদ্দার তাঁহার অসমব্যবস্থিত দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া, অতি সরল এবং নিঃসঙ্কোচ হাসিতে সমাকে নিবারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'আরে ইয়াকি কঅন্? আপ্নে জানেন্ না অ; লেডি র আপ্নে জান্তা নেহি ইয়া দ্যাকসেন্ লেডি ততোডা ঈ না! মৈলা টৈলা কিসু দ্যাখ্তে মাননা খা। মধ্যে মধ্যে আমারেও দম্কাই দ্যান্, কন্, তুমি অন্দ অইস অ?'

সমা আলিপুরের মেয়ে,—হাসি আসিল বটে, কিন্তু হাসিল না, ভাবিল। ভাবিল,—'নহিলে কি চলে না? নিশ্চয়ই কি চাই,—ইলেক্ট্রিকের পজেটিভ্, নিগেটিভ্, ষ্টীম্‌এঞ্জিনের ব্যাক ওয়ার্ড্ ফর্‌ওয়ার্ড ফটোগ্রাফের শেড্ লইট? একটি ঘোড়া ও একটি কোচম্যান? নহিলে অচল হয়? নিশ্চয় হয়!

একস্থানের উপর দুই পাত্র থাকিতে গেলে বুঝি একটি আধার অন্যটি আধেয় নহিলে থাকাটা বোধ হয় অসম্ভবই হয়! দূর হউক! কিন্তু বড়ই উল্টা লাগিতেছে,—কে জানে, কেন?

———

দেবভাষা পরিষদ

দেবভাষা সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত করা যাহার প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য সেই দেবভাষা পরিষদের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আশা করি পাঠকগণের নিকট অপ্রীতিকর হইবে না। গত ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৫ শে ডিসেম্বর গোরক্ষপুরের অন্তর্গত ভাট্‌নী গ্রামে কয়েকজন নীরব কর্ম্মী কবিরাজ শ্রীযুক্ত পশুপতি মিশ্রের সভাপতিত্বে একটী সাধারণ সভায় সম্মিলিত হইয়া এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখককে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া একটী অস্থায়ী কার্য্যকারিণী সমিতি নিযুক্ত করেন। যতদূর মনে আছে, এই সভায় সভাপতি ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিলেন :—১। ব্রহ্মচারী সত্যব্রত ২। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহাদেব শর্ম্মা ৩। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকিশোর পাণ্ডে ৪। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র নাথ সরকার ৫। শ্রীযুক্ত দেবতা মনি ত্রিবেদী ৬। প্রবন্ধ লেখক।

পরিষদ স্থাপনের উদ্দেশ্য সভাতে নিম্নোক্ত প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

১। ভারতের সর্ব্বত্র দেবভাষা সংস্কৃতকে লোকপ্রিয় করা।

২। প্রত্যেক হিন্দু যাহাতে তাহার ধর্ম্মশাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞানার্জ্জনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য প্রত্যেক ভারতবাসী বিশেষতঃ প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য সংবাদপত্র ও বক্তৃতামঞ্চের সাহায্যে প্রবল প্রচার কার্য্য পরিচালন করা।

৩। অনন্ত ঐশ্বর্য্যের আকর সংস্কৃতভাষায় যাহা কিছু মূল্যবান বস্তু আছে, সে সমুদয় সংগ্রহ ও রক্ষা করিবার জন্য গবেষণা কার্য্য পরিচালনা করা।

৪। ভারতের প্রাচীন সাধনালব্ধ সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত করা, এবং বিশুদ্ধ ধার্ম্মিক ভিত্তির উপর ভারতকে পুনর্গঠিত করা।

৫। ছাত্রগণকে সংস্কৃত শিক্ষায় উৎসাহিত করা, এবং দরিদ্র ছাত্রগণকে তাহাদের অধ্যয়নের জন্য যথোপযুক্ত সাহায্য দান করা।

৬। পরিষদের উদ্দেশ্য পূর্ত্তির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা বা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা।

এই সভা হইবার কিছুদিন পরে এই সকল কর্ম্মী একটী বিশেষ সভায় সম্মিলিত হইয়া স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতি গঠন করেন, এবং লক্ষ্ণৌ নিবাসী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদত্ত শাস্ত্রী মহোদয়কে সভাপতি, ঠাকুর শ্রীযুক্ত গোরক্ষপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চতুর্ব্বেদী ও পণ্ডিত পশুপতি মিশ্রকে সহকারী সভাপতি, প্রবন্ধ লেখককে সম্পাদক এবং ব্রহ্মচারী সত্যব্রতকে সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত করেন। এই সময়ে দেশে অসহযোগ আন্দোলনের প্রাবল্য হেতু পরিষদের কর্ম্মীগণকে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অগ্রসর হইতে হয়। পরিষদের কোন নিজস্ব গৃহ ছিল না, অর্থবলও ছিল না; লোকের মনে অস্বাভাবিক ভীতিবশতঃ সভাধিবেশনের জন্য স্থান পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত না; সুতরাং প্রায় বৃক্ষতলেই সভাধিবেশন করিতে হইত। এইরূপে কঠোর সংগ্রাম করিতে করিতে পরিষদ ক্রমশঃ সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়, এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ভাট্‌নী গ্রামেই আশাতীত সমারোহের সহিত ইহার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হয়। স্থানীয় কবিরাজ শ্রীযুক্ত

পশুপতি মিশ্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েন, এবং লক্ষ্ণৌ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামদত্ত শাস্ত্রী মহোদয় আসিয়া সভাপতির কর্ত্তব্য সম্পন্ন করেন। সভায় একটী মাত্র প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল; উহার মর্ম্ম এই ছিল যে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা হিন্দুমাত্রেরই জন্ম বাধ্যতা মূলক হওয়া উচিত। পরিষদ এ বৎসর একটি সর্ব্বভারতীয় সংস্কৃত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করেন, এবং পুণা ও শোলাপুর প্রভৃতি স্থানের কতিপয় যোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কার প্রদান করেন।

পর বৎসর পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন সারণ জিলার শিবান শহরে সুসম্পন্ন হয়। পাটনা কলেজের প্রথিতনামা সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামাবতার শর্ম্মা এই অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অনিবার্য্য কারণে তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় উকাল শ্রীযুক্ত মহাদেব শরণ পাণ্ডে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌর সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ও নেতা, গীতার অন্যতম টীকাকার, শ্রীযুক্ত আর, এস্, নারায়ণ স্বামী এবং কাশীর শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেকে এই সভায় সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচারের জন্ম আবেদন জানাইয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই অধিবেশনে কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। যাহাহউক পর বৎসর অর্থাৎ ১৯২৫ সালের ১লা ও ২রা ফেব্রুয়ারী এই শিবানেই পরিষদের তৃতীয় অধিবেশন শ্রীযুক্ত আর, এস্, নারায়ণ স্বামীর সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হয়। বঙ্গদেশ হইতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গিরিজাকান্ত গোস্বামী কাব্য সাংখ্য স্মৃতিতীর্থ, কাশীধাম হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিদ্যানন্দ শাস্ত্রী, গোরক্ষপুর হইতে পরমহংস বাবা রাঘবদাস এবং পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবকুমার শাস্ত্রী, বালিয়া হইতে ব্রহ্মচারী প্রমোদানন্দ, এবং হাথুয়া হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ কমল সেনগুপ্ত প্রভৃতি প্রতিনিধি রূপে যোগদান করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত দিনেশচন্দ্র। এই বৎসরের অধিবেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, এবং অনেকগুলি সুচিন্তিত মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল; নিম্নে ইহাদের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১। এই পরিষদের অভিমত এই যে অধ্যাত্মশক্তি ব্যতীত কোন মনুষ্যই জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে না, এবং সেরূপ জয়লাভ করিতে হইলে নিজ নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি অটল বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। আর আমাদের সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ বলিয়া এই ভাষার যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করা হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। পরিষদ তজ্জন্য প্রত্যেক হিন্দুকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে, ভারতের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার প্রচলনের জন্ম তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করুন।

২। এই পরিষদের দৃঢ় অভিমত এই যে হিন্দু জাতির কল্যাণ ও মুক্তির জন্ম দেশের প্রত্যেক স্থানে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত।

৩। সংস্কৃত ভাষার উন্নতি ও প্রসারসাধন রূপ যে মহান্ কার্য্যভার পরিষদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের সহায়তা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইতে পারে না; তজ্জন্য পরিষদ সংস্কৃত প্রেমীকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে তিনি এই মহান কার্য্যে যথাশক্তি সাহায্য করুন, এবং স্বয়ং ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হউন্।

৪। এই পরিষদ হিন্দু মহাসভা এবং অন্যান্য সামাজিক ও ধার্ম্মিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা সংস্কৃতবিদ্যার উন্নতি ও প্রসারের ভার আপনারা গ্রহণ করুন।

৫। এই পরিষদ সাধু, মহাত্মা এবং পণ্ডিতগণকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা দেশের সর্ব্বত্র সংস্কৃতবিদ্যা প্রচারের নেতৃত্বভার গ্রহণ করুন্।

৬। এই পরিষদ বিহার-উৎকল প্রদেশ বিশেষতঃ সারণ জেলায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি চরম অবহেলা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন, এবং বিহার ও উৎকল সরকার এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা নূতন সংস্কৃত পাঠশালার স্থাপন ও পুরাতন পাঠশালাগুলির উন্নতি বিধানের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করুন।

(৬খ) এই পরিষদ সমবায় সমিতিসমূহকেও এই অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা সংস্কৃত পাঠশালার প্রতিষ্ঠা ও সাহায্য দান কার্য্যে বিশেষ প্রযত্ন করুন।

এই অধিবেশনে পর বৎসরের জন্য যে কার্য্যকারিণী সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

সভাপতি :—বিহারের সুপ্রসিদ্ধ নেতা শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর প্রসাদ।

সহ-সভাপতি :—পরমহংস বাবা রাঘবদাস। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশকমল সেনগুপ্ত।

সম্পাদক :—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার।

সহযোগী সম্পাদক :—ব্রহ্মচারী সত্যব্রত। শ্রীযুক্ত মুনীশ্বর সিংহ।

সহকারী সম্পাদক :—শ্রীযুক্ত রামলগ্ন পাণ্ডে। শ্রীযুক্ত কামতা প্রসাদ।

কোষাধ্যক্ষ :—শ্রীযুক্ত রামেশ্বর প্রসাদ আগরওয়ালা।

এই কার্য্যকারিণী সমিতি তাহার ক্ষুদ্র সামর্থ্য সত্বেও অনেক প্রচার কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্ব ভারতীয় সংস্কৃত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করিয়া উপযুক্ত রচয়িতাগণকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল ছাপরা সহরে পরিষদের চতুর্থ অধিবেশন বিশেষ ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ শাস্ত্রী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং মহামান্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয় সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নারায়ণ স্বামী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত গোস্বামী কাব্য সাংখ্য স্মৃতিতীর্থ, কাশীর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপাল শাস্ত্রী বেদান্তকেশরী, পাটনার শ্রীযুক্ত জগৎ নারায়ণ লাল, প্রয়াগের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত মালব্য; শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর প্রসাদ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র প্রসাদ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন প্রথমে সংস্কৃত ও পরে হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বলেন, প্রত্যেক হিন্দু সন্তানই যাহাতে সংস্কৃতে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেন এজন্য তাহার পিতামাতার সর্ব্বোতোভাবে চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই সম্মিলনে অনেকগুলি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছিল; দুর্ভাগ্যক্রমে কার্য্য বিবরণ সম্বলিত কাগজ পত্রগুলি হারাইয়া যাওয়ায় তাহার যথাযথ বিবরণ সংগৃহীত হইবার উপায় নাই। তবে যতদূর মনে হয়, হিন্দুমাত্রেরই জন্য সংস্কৃতের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল; এবং অন্য একটী প্রস্তাবে সরকারকে তাঁহাদের বার্ষিক বজেটে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য যথেষ্ট অর্থের বরাদ্দ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। এই শেষোক্ত প্রস্তাবটী হিন্দু মহাসভার শ্রীযুক্ত জগৎ নারায়ণ লাল খুব সম্ভবতঃ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

ইহার পর দুই বৎসর কাল পরিষদের পূর্ণাধিবেশন হওয়া সম্ভবপর হয় নাই ; তবে কার্য্য-কারিণী সমিতি ইংরেজী ও হিন্দী পুস্তিকাদির প্রচারের দ্বারা নিজেদের কর্ত্তব্য অনেকটা পালন করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ২৫ অক্টোবর গোরক্ষপুরের দুধাই নামক স্থানে স্বামী জগদানন্দের সভাপতিত্বে পরিষদের পঞ্চম অধিবেশন সম্পন্ন হয়। এই সম্মিলনে পরিষদের লক্ষ্য বা মূলমন্ত্রের প্রথমটীর পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নিম্নোক্ত প্রকার স্থিরীকৃত হয়।

"দেবভাষা সংস্কৃত যাহাতে ভারতের রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হইতে পারে তজ্জন্য দেশের সর্ব্বত্র ইহাকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলা।"

এবার পরিষদের কার্য্যকারিণী সমিতি নূতন ভাবে গঠিত হয়, এবং যুক্ত প্রদেশের প্রসিদ্ধ কর্ম্মী পরমহংস বাবা রাঘবদাস ইহার সভাপতি নিযুক্ত হন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ দুধাই গ্রামেই ষষ্ঠ অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত বাসুদেবনারায়ণ সিংহ, এবং সম্মিলনের সভাপতি পরমহংস বাবা রাঘবদাস। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে কাশীর স্বামী পূর্ণানন্দ ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপাল শাস্ত্রী বেদান্তকেশরী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামলগ্ন পাণ্ডে সাহিত্যাচার্য্য, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কপিলদেব কাব্যতীর্থ এবং ব্রহ্মচারী সত্যব্রত ছিলেন। সভায় কয়েকটী মহত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়; উহাদের মধ্যে প্রধানটীর মর্ম্ম নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

"যখন ভারতের গৌরব জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ভারত জগতের গুরুপদে সমাসীন হইয়াছিল, তখন উহার রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃতই ছিল। আর বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া দর্শন বা পুরাণ, তন্ত্র, জ্যোতিষ, সংহিতা, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি ভারতের যাহা কিছু গৌরবের, সে সমস্তই এই সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ হওয়ায় দেবভাষা পরিষদ প্রত্যেক হিন্দুকে সনির্ব্বন্ধ এই অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা নিজেদের সন্তানগণকে সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত শিক্ষা দিয়া তৎপর যেন আবশ্যক হইলে অন্য ভাষা শিক্ষা দেন।

পরমহংস বাবা রাঘবদাস এই প্রস্তাব রচনায় মুখ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৫ই ও ৬ই মার্চ্চ গোরক্ষপুরেরই অন্তর্গত বদরওয়ার গ্রামে পরিষদের সপ্তমাধিবেশন সম্পন্ন হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন সর্দ্দার শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ সিংহ, এবং সম্মিলনের সভাপতি হইয়াছিলেন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত গোস্বামী কাব্য সাংখ্য স্মৃতিতীর্থ। সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করণ বিষয়ক প্রধান প্রস্তাবটী শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ দ্বিবেদী সাহিত্যাচার্য্য, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামলগ্ন পাণ্ডে সাহিত্যাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির সমর্থনে সর্ব্ব সম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়। এই সম্মিলনে পর বৎসরের জন্য যে কার্য্যকারিণী সমিতি নিযুক্ত হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত আর, এস, নারায়ণ স্বামী সভাপতি, এবং কল্যাণসম্পাদক শ্রীযুক্ত হনুমান প্রসাদ পোদ্দার, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোপাল শাস্ত্রী বেদান্তকেশরী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গিরিজা কান্ত গোস্বামী কাব্য সাংখ্য স্মৃতিতীর্থ সহকারী সভাপতি নিযুক্ত হন। গৃহীত প্রস্তাবগুলির মর্ম্ম আমরা নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

১। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই সংস্কৃত ভাষা যেরূপ স্বল্পাধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অন্য কোন ভাষাই সেরূপ হয় না। আর এই ভাষাতেই আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানময় গ্রন্থরাজি

সন্নিবিষ্ট বলিয়া, এবং এই ভাষা দ্বারাই সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য স্থাপন সম্ভব বলিয়া, ভারতবর্ষের প্রাণভূত এই সংস্কৃত ভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।

২। এই পরিষদ প্রত্যেক ভারতবাসী বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীগণকে বিশেষভাবে এই অনুরোধ করিতেছেন যে তাঁহারা স্ব স্ব পুত্র কন্যাগণকে মাতৃভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা দেন, এবং তাহার পর প্রয়োজন হইলে তাহাদের অন্যভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করুন।

৩। এই পরিষদ কলিকাতা প্রভৃতি কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার্থীদের জন্য সংস্কৃত ভাষার অধ্যয়ন ইচ্ছানুকূল করিয়াছেন, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

৪। এই পরিষদ সরকারের নিকট এই সুদৃঢ় অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহার ভারতীয় সভ্যতার প্রাণভূত সংস্কৃত ভাষার অধিকতর অনুশীলনের জন্য সংস্কৃত বিদ্যালয়গুলিকে অধিকতর এবং উপযুক্ত সাহায্য দানের ব্যবস্থা করুন।

৫। এই পরিষদ দেশের দুর্দ্দশাগ্রস্ত সংস্কৃত বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধনের জন্য যথাশক্তি সাহায্য দানের আবশ্যকতার প্রতি সমগ্র সহৃদয় দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন।

ইহার পর বর্ত্তমান বর্ষের ১৮ই ও ১৯ শে মার্চ্চ গোরক্ষপুরের অন্তর্গত পেড্রনা সহরে পরিষদের অষ্টম অধিবেশন সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন পেড্রনা রাজ শ্রীযুক্ত ব্রজ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর, এবং সম্মিলনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর আচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দশঙ্কর বাপু ভাই ধ্রুব। উপস্থিত সভ্যগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত নারায়ণ স্বামী, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হারাণ চন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত স্বামী পূর্ণানন্দ এবং ব্রহ্মচারী শ্রীধর ব্যাকরণবেদান্ততীর্থ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যক্ষ ধ্রুব তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণে অন্যান্য বহু বিষয়ের সঙ্গে পাণিনিসূত্র বার্ত্তিক ভাষ্য হইতে প্রচুর অকাট্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ইহা সপ্রমাণ করেন যে পূর্ব্বকালে সংস্কৃত ভাষাই ভারতবর্ষের ব্যবহারিক ভাষা ছিল; অধুনা প্রাকৃত ভাষাকে যে সংস্কৃতের জননী বলা হইয়া থাকে, তাহা আদৌ সত্য নহে।

এই অধিবেশনে ছয়টীই দীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, স্থানাভাবে কেবল উহার প্রধান ও প্রথমটীর মর্ম্ম আমরা নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

পণ্ডিতবর শ্রীহারাণ চন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয় প্রস্তাব করেন, "পরিষদের সপ্তম অধিবেশনে গৃহীত সংস্কৃতকে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা করণ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবটী এই পরিষদ সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতেছেন"। শ্রীযুক্ত নারায়ণ স্বামী ইহার অনুমোদন এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার সমর্থন করিলে প্রস্তাবটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সমর্থকগণের নাম;—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কপিল দেব কাব্যতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামলগ্ন পাণ্ডে সাহিত্যাচার্য্য, ব্রহ্মচারী সত্যব্রত, ব্রহ্মচারী শ্রীধর ব্যাকরণ বেদান্ততীর্থ, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নারায়ণ দত্ত পাণ্ডেয় শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রভূষণ শাস্ত্রী।

এবারকার এই অধিবেশনে যেরূপ উৎসাহ উদ্যম পরিলক্ষিত হইয়াছিল, পরিষদের ইতিহাসে সেরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই। ইহাতে আগামী বৎসরের জন্য যে কার্য্যকারিণী

সমিতি গঠিত হইয়াছে, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র শাস্ত্রী তাহার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রবন্ধ লেখকের স্কন্ধে পরিষদের প্রতিষ্ঠার দিনে প্রধান সম্পাদকের যে গুরুভার অর্পিত হইয়াছিল আজ পর্য্যন্ত তিনি সেই ভার বহনের দায় হইতে অব্যাহতি পান নাই। যখনই তিনি হতাশ হইয়া এই ভার ত্যাগ করিতে চাহিয়াছেন, ব্রহ্মচারী সত্যব্রত তখনই তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার মনে আশার সঞ্চার করিয়াছেন। যাহা হউক, দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিবার সঙ্কল্প হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে লইয়া যাঁহারা এই পরিষদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা অন্ধকারে আশার আলো দেখিতে পাইয়াছেন, ইহা খুবই আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। পাঠকগণ শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে মহীশূরের দেওয়ান মির্জ্জ মহম্মদ ইস্মাইলও সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করিবার পক্ষপাতী। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ভারতের সাধনার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত এম, এ এবং হিন্দু-মহাসভার সভাপতি বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ স্বনামধন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত মুঞ্জের সহিত এ বিষয়ে প্রবন্ধ লেখকের আলোচনা হইয়াছিল। উভয়েই দেবভাষা পরিষদের উদ্দেশ্যের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন তাঁহারা ঐ উদ্দেশ্যের সহিত সম্পূর্ণ ভাবেই একমত।

বিশেষতঃ ভারতের সাধনা সম্পাদক দত্তমহাশয় আরও বলিয়াছিলেন যে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা দেবভাষা নামক একখানি সংস্কৃত পত্রিকা প্রচারের চেষ্টাও করিতেছেন। যাহা হউক বর্ত্তমানের এই দুর্দ্দিনে যখন সংস্কৃত ভাষাকে নানা স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিবারই চেষ্টা হইতেছে, যখন বাংলার নব্য সাহিত্যিকগণ বাংলাভাষা হইতে সংস্কৃতের সংশ্রব সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া আর্টের নামে প্রতীচির অন্ধ অনুকরণে উহাতে কেবল লালসার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতেছেন, এবং নারী প্রেমকেই একমাত্র প্রেম আখ্যা দিয়া তাহারই বিশ্লেষণে অপার অনন্দ উপভোগ করিতেছেন, যখন অনন্ত ঐশ্বর্য্যের আকর দেবভাষার চর্চ্চার স্থানে সমাজের সর্ব্বস্তরে পূর্ব্বোক্ত গরল-ময় তরল সাহিত্য উহার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতেছে, তখন দেবভাষা পরিষদের এই আশাতীত সাফল্য যে সত্যই অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, আশাকরি কেহই তাহা অস্বীকার করিবেন না।

দেবভাষা পরিষদের উদ্দেশ্যের সহিত সহমত ব্যক্তিগণ ভারতের সাধনা সম্পাদক সহ পত্রব্যবহারাদি করিতে পারেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার।

—

দশাবতার চরিত

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ জ্যোতিঃশাস্ত্রী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বালির মৃত্যু হইল অর্থাৎ প্রখর সূর্য্য কিরণে রাশিচক্র অদৃশ্য হইয়া গেল। অঙ্গ অর্থে অবয়ব, শরীর। দ্বাদশ রাশিবিশিষ্ট চিহ্নীকৃত বালির শরীর পালনার্থ, তাহার অঙ্গদনামা পুত্রকে সুগ্রীব হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। সুগ্রীব ও বালিমধ্যে শত্রুতা থাকিলেও অন্ত বা মৃত্যুকালে সে জ্ঞাতি বিরোধ প্রায় থাকে না। এই জন্য স্বীয় ভ্রাতৃহস্তে প্রিয় সন্তানকে সমর্পণ করিলেন।

মন্তব্য।—ইহার আভ্যন্তরিক তাৎপর্য্য হইতেছে,—যে বলয়াকারে বেষ্টিত সুদূর গগনের রাশিচক্রের সমস্ত কার্য্য (গণনাদি) সুগ্রীব (পার্থিব চক্রবালের) দ্বারা সম্পন্ন হইবার সুবন্দোবস্ত হইল।

দ্বাদশ রাশি বিশিষ্ট রাশিচক্রই কাল পুরুষের অঙ্গ। সুতরাং বালিই জ্যোতিষ শাস্ত্রে কাল পুরুষ নামে খ্যাত। রাশিচক্রের প্রথম ভাগ মেষরাশি কাল পুরুষের মস্তক, দ্বিতীয় বৃষরাশি কাল-পুরুষের কণ্ঠ মুখাদি ইত্যাদি ভাবে অঙ্গ বিন্যস্ত, এবং মীন দ্বাদশ রাশি কাল পুরুষের পদদ্বয়। জ্যোতিঃ শাস্ত্রের সমস্ত গণনা এই রাশিচক্রের বিভাগ দ্বারাই সম্পন্ন হয়। কোন ব্যক্তির জন্মকালে উদয়াচলে (চক্রবালে বা সুগ্রীবে) যে রাশি সংলগ্ন হয়, সেই রাশিই সেই ব্যক্তির লগ্ন হয় এবং সেই রাশিতে তাহার মস্তক এবং তাহা হইতে নিম্নাভিমুখে দ্বিতীয়া রাশিতে কণ্ঠাদি ইত্যাদি প্রকারে মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গই উক্ত রাশিচক্রের দ্বারা স্থিরীকৃত এবং তাহাদের শুভাশুভ ফল নির্ণীত হয়। বাল্মীকি একজন সুদক্ষ জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ ছিলেন, তৎসঙ্গে একজন মহা দার্শনিক সুকবিও ছিলেন। সেই হেতু অতি কঠোর নিরস জ্যোতিষ শাস্ত্রকে প্রাঞ্জল কবিত্বপূর্ণ ভাষায় গাথিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

বালিরাজ্য কিষ্কিন্ধ্যার অবস্থিতি স্থান ও বিবরণঃ—আমরা পূর্ব্ব হইতেই আলোচ্যমান শব্দের মূলাকর্ষণ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়া আসিতেছি। এস্থলেও অগ্রে সেই পন্থা অবলম্বন করা উচিত। 'কিস্কিন্ধ্যা শব্দের আভিধানিক অর্থ পর্ব্বতবিশেষ'। অভিধানে কোন শব্দের অর্থের অন্তে বিশেষ শব্দ সংযোজিত থাকিলে, সেই শব্দের কোন গূঢ় অর্থ আছে জানিতে হইবে। অর্থাৎ সাধারণতঃ যে অর্থ সেই শব্দ দ্যোতনা করে তাহা নহে। যথা মুনি বিশেষ, ঋষিবিশেষ, নদীবিশেষ ইত্যাদি। এস্থলেও কিস্কিন্ধ্যাকে পর্ব্বত বিশেষ বলাতে সাধারণ পর্ব্বত হইতে কোন বিশেষত্ব পূর্ণ পর্ব্বত বুঝিতে হইবে। বেদ পুরাণাদি গ্রন্থে গ্রহ নক্ষত্রাদিকে পর্ব্বতাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। যে দেশে বা স্থানে কিস্কিন্ধ্যা পর্ব্বত বিদ্যমান সেই দেশের নাম কিস্কিন্ধ্যা। কিস্কিন্ধ্যা বানররাজ বালিরাজ্য। বানরগণের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। কিস্কিন্ধ্যা শব্দ বিশ্লেষণে উক্ত শব্দগত রহস্য প্রকটিত হইবে। ব্যাকরণ শাস্ত্র এই শব্দের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দিবে। কিস্কিন্ধ্যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—কিস্কি+ইন্ধ ধাতু অধিকরণ

বাচ্যে অল্ স্ত্রী আপ্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। (কিপি শব্দের অর্থ বানর। শব্দার্থক কু ধাতু হইতে কিথি শব্দ সমুদ্ভূত।) ইন্ধ ধাতুর অর্থ দীপ্তি। ইহা দ্বারা কিষ্কিন্ধ্যা শব্দের অর্থ হইল; যে দেশে বজ্রপাত, বিদ্যুৎ, উল্কাদি দীপ্তি বিদ্যমান এবং যে স্থানে মেঘ গর্জ্জন হইয়া থাকে ও দীপ্তিবিশিষ্ট বানরগণ বাস করেন, তাহাই কিষ্কিন্ধ্যা নামক বানররাজ বালির রাজ্য। অনন্ত অসীম নভোমণ্ডলের রাশিচক্র প্রতি লক্ষ্য করিয়া কবিবর কিষ্কিন্ধ্যা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। উত্তর কাণ্ডের ৪২ অধ্যায়ের বর্ণনা হইতেও ইহার আভাষ পাওয়া যায়। "বিশ্বকর্ম্মা আমার আদেশে এই দিব্য সুন্দর কিষ্কিন্ধ্যা নির্ম্মাণ করিয়াছেন" ইত্যাদি। দিব্য অর্থে দিব্‌লোকে অবস্থিত; অর্থাৎ ইহা পার্থিব নহে।

সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেক। বালির পতনান্তে সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব হইল। (কিঃ কাঃ ২৬ সর্গে) অনন্তর তরুণ সূর্য্য সদৃশ আননবিশিষ্ট কাঞ্চন শৈল তুল্য (মধ্যাহ্নকালে মার্ত্তণ্ডের মধ্যে বা মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট, অগ্নিরও প্রথম জিহ্বা বা মুখ কৃষ্ণবর্ণ এবং ভৌম জৈব হনুমানের মুখ কৃষ্ণবর্ণ; তজ্জন্য এইরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত) পবনপুত্র হনুমান কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন—হে কাকুৎস্থ আপনার প্রসাদে সুগ্রীব পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ইনি বিধিপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আপনাকে রত্নমালাদির দ্বারা বিশেষরূপে পূজা করিবেন। আপনি এই রম্য গিরি গুহাতে (উদয়াচলে) প্রবেশ করিয়া স্বামী সম্বন্ধে বন্ধন করিয়া এই বানরগণকে হর্ষযুক্ত করুন।" রাম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বানরগণ সুগ্রীবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। তদনন্তর রাম সুগ্রীবকে বলিলেন—"তুমি আচারজ্ঞ এই বলবিক্রমশালী অঙ্গদকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত কর।" (সুগ্রীব অর্থাৎ পার্থিব চক্রবাল এবং অঙ্গদ অর্থাৎ দ্বাদশরাশি সমন্বিত রাশিচক্র দ্বারা সৌরজগৎরূপ রাজ্যের কার্য্যাবলী সুচারুরূপে চলিতে লাগিল।) যথানিয়মে সমস্ত অভিসেকাদির কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। গয়, গবাক্ষ, গবয় গন্ধমাদন, মৈন্দ, দ্বিবি, হনুমান, জাম্বুবান ইহারা বিমল সুগন্ধি সলিল দ্বারা বসুগণ যেমন বাসবকে (অর্থাৎ তারকগণ যেমন ধ্রুবকে) সেইরূপ সুগ্রীবকে অভিষিক্ত করিলেন। রামাদেশে সুগ্রীব অঙ্গদকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক যথা নিয়মে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কপি সেনাপতি বীর্য্যবান সুগ্রীব ভার্য্যা উমাকে প্রাপ্ত হইয়া সুররাজের ন্য বানররাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। (তারাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন।)

সুগ্রীব ভার্য্যা উমার পরিচয়। উমার পরিচয় উমারি নিকট হইতে গ্রহ করিতে হইবে। নতুবা এ উমার পরিচয় অন্যত্র পাওয়া কঠিন। উ+মা=উমা। অত ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে ডু প্রত্যয় করিয়া উ শব্দ সিদ্ধ। অত ধাতুর অর্থ সতত গতি। উ অর্থে শিব ও ব্রহ্মা ব্রহ্মের দুইটি ভাব প্রথম স্থির বা গতিহীন ভাব, দ্বিতীয় গতিশীলভাব। উ ধাতুর অর্থ শব্দ সৃষ্টির প্রারম্ভে শব্দ হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে গতির (Vibration) আরম্ভ হয়। মা ধাতুর অর্থ পরিমা সেই গতির পরিমাপক যিনি, তিনিই উমা। মা শব্দের অর্থ কান্তি, পরিমাণ, জ্ঞান, মাতা ও লক্ষ্মী উদয়াচলের মনোহর কান্তিই উমা। উষার মনোহারিণী, সৌন্দর্য্যশালিনী মূর্ত্তি বিষয়ক বহু বে মন্ত্র রচিত হইয়াছে। যথা কুৎস ঋষি বলিতেছেন—

> সূর্য্যো দেবী মুষসং রোচমানাং মর্য্যো ন যোষা মভ্যেতি পশ্চাৎ।
> যাত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রং॥ ১।১১৫।২॥

এই মন্ত্র হইতে বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে কামমোহিত শিবের তৎপ্রতি ধাবমান উপাখ্যান রচিত।

এই উদয়াচল হইতেই কালের পরিমাণ করা হয়। ফলিত ও গণিত জ্যোতিষশাস্ত্রে ইহা এক অবশ্যকীয় বস্তু। জীবজগৎ উৎপত্তির একটি প্রকৃষ্ট স্থান। উমা অর্থে প্রকৃষ্ট জ্ঞানও বুঝায়। যে সর্ব্বার্থসাধিকা জ্ঞানশক্তি সহায়ে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এই উমাই পরমেশ্বর মঙ্গলময় শিবের স্বরূপ। যথা

উমা সহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং
প্রশান্তং ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্ত সাক্ষিং
তমসঃ পরস্তাৎ॥ কৈবল্যোপনিষৎ।

সুগ্রীবের অভিষেককারী পূর্ব্বোক্ত গয়-গবাক্ষ-গবয় গন্ধমাদনাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়; শ্রীরামচন্দ্রের বানরবাহিনীর অন্যান্য প্রধান সুপ্রতিষ্ঠ বানরগণের প্রকৃত পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিব। এক বায়ু যেরূপ প্রথমে সপ্ত পরে উনপঞ্চাশ ভাগে বিভক্ত এবং রসাত্মক দিব্য মন্দাকিনীর বারিই যেরূপ বহুবিধ রসে পরিণত, তদ্রূপ এক দিব্য সোমাগ্নিও বিবিধ ভাগে বিভক্ত হইয়া জগতের বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত। প্রথমে অগ্নি দিবলোকে উৎপন্ন, তাহার বৈদিক প্রমাণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। তৎপরে সেই অগ্নি তিনভাগে বিভক্ত। অগ্নি সম্বন্ধে কুৎস ঋষি বলিতেছেন—

ত্রীণি জানা পরিভূষং তস্য সমুদ্রে একং দিব্যেকমপ্সু।
পূর্ব্বামনুপ্রদিশং পার্থিবানামৃতুন্ প্রশাসদ্বিদধাবনুষ্ঠু॥

সেই অগ্নিই তিনটি জন্মস্থান অলঙ্কৃত করেন; সমুদ্রে (আকাশসমুদ্রে) এক দিবে বা স্বর্গে এক এবং জলে এক। তিনি সূর্য্যরূপে ঋতুগণকে বিভাগ করিয়া পৃথিবীর প্রাণী সকলের হিতার্থে পূর্ব্বপ্রদেশ যথাক্রমে সম্পন্ন করিয়াছেন। সূর্য্যের গতিদ্বারা পূর্ব্বাদি দিক ও বসন্তাদি ঋতু নির্ণয় হয়।

শ্রীরামচন্দ্রচরিত

বানর সেনানায়কগণের পরিচয়।

সেনানায়ক গয়। 'গয় শব্দ গমধাতু হইতে সিদ্ধ। জীবে প্রাণরূপে যে অগ্নি গমনাগমন করে তাহাই 'গয়'। "গয়া এব গায়াঃ, গয়স্বার্থে অন্, গায়ান = প্রাণান। এই প্রাণকে ত্রাণ করে বলিয়া গায়ত্রী সংজ্ঞা হইয়াছে। এই প্রাণের উৎপত্তিস্থান পূর্ব্ব ক্ষিতিজপ্রদেশ। সিদ্ধার্থদেব কঠোর তপস্যা দ্বারা যেস্থানে প্রাণকে ত্রাণ করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তিপদ পাইয়াছিলেন সেই স্থানের নাম হইয়াছে গয়া। পূর্ব্বে অর্থাৎ বুদ্ধদেবের তপস্যাকালে সেই স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। তিনি ঘোর তপস্যা দ্বারা সিদ্ধ হইয়া নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হন। বৌদ্ধধর্ম্মাবসান হইতে সেই স্থানে মৃত পিতৃপুরুষের মুক্তির আশায় তদুদ্দেশ্যে পিণ্ড প্রদান হয়।

দেহমধ্যে প্রাণ যেরূপ সমস্ত দেহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সেইরূপ গয় শ্রীরামচন্দ্রের বানরবাহিনী চালক ও রক্ষক।

গবাক্ষ। গো+অক্ষ। এস্থলে গো অর্থে পৃথিবী-চন্দ্র-সূর্য্য। অক্ষ অর্থে রথ বা

রথের অবয়ব। যে রশ্মি পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য্যাদির চতুর্দ্দিকে রথের অবয়ব নির্ম্মাণ করে তাহাই গবাক্ষ নামধেয় বানরসেনা।

গবয়। বাড়বাগ্নি ও বিদ্যুতাগ্নি। গু ধাতু হইতে উৎপন্ন। গু ধাতুর অর্থ ধ্বনি। যে অগ্নির দ্বারা মেঘের ধ্বনি হইয়া বারিবর্ষণ হয় এবং গো+যা ধাতু হইতেও ইহার উৎপত্তি হয়। গোরিব অয়ো গমনং যস্য। যে সূর্য্যকিরণ সমুদ্রাদির জলাকর্ষণ করে। গো অর্থে জল ধরিলে বাড়বাগ্নিকে লক্ষ্য করা হয়।

গন্ধমাদন। পৃথিবীর একটি নাম গন্ধবতি। যাহা গন্ধে আমোদিত করে তাহাই গন্ধমাদন। অধ্যাত্মরূপে পার্থিব অগ্নিই জীবের নাশাপুটে ঘ্রাণশক্তিরূপে বিদ্যমান। ক্ষিতিজরেখাই পৃথিবীর নাসিকারূপে কল্পিত। (বড়বারূপিণী সংজ্ঞার—ভূরগ্নির ও শাতনিত সূর্য্যের নাসিকাস্পর্শে সন্তান জন্মে) "গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।" গীতা ১৫অঃ ১৩। অতএব ভূরগ্নিই গন্ধমাদন নামক উক্ত বাহিণীর অন্যতম সেনানায়ক।

মৈন্দ। (মা+ইন্দ)। মা অর্থে লক্ষ্মী ও কান্তি এবং ইন্দ অর্থে পরমৈশ্বর্য্য। যে অগ্নি এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ সমরক্ষেত্রটিকে নানা ভাবে সুশোভিত ও ঐশ্বর্য্যান্বিত করেন, তিনিই মৈন্দ।

দ্বিবি (দ্বিবিদ)। (দু+ইবি) দু ধাতুর অর্থ গতি ও অনুতাপ। ইন্ব ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি ও প্রীতি। চন্দ্র নক্ষত্রাদিতে যে অগ্নি বিদ্যমান তাহাই দ্বিবি নামক বানর সেনানায়কের অন্যতম। চন্দ্ররশ্মির হ্রাস বৃদ্ধি হেতু প্রীতি ও অনুতাপ জন্মে।

সুষেণ। (সু+সেনা, ষেপি)। সি ধাতুর অর্থ বন্ধন। যে অগ্নি জগতের পরমাণুবৃন্দকে বন্ধনপূর্ব্বক সৃষ্টিকরণোপযোগী করে তাহাই সুষেণাখ্যা প্রাপ্ত।

নলের স্বরূপ নির্ণয়। রামায়ণোক্ত নলের জন্ম বিশ্বকর্ম্মা হইতে। এই উক্তি হইতে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় হইল না। কারণ বিশ্বকর্ম্মা হইতে অনেকের জন্ম। দীপ্তি ও বধার্থক নল ধাতু হইতে নল শব্দ উদ্ভূত। মেঘাচ্ছন্নাকাশে নীল নভোমণ্ডলে নীরদগাত্রে যখন ক্ষণিকের জন্য সৌদামিনী বিকশিত হয়, তখন কেহ বলেন চিকুর হানছে কেহ বলে "নল" দিচ্ছে। সেই বিদ্যুৎরূপী নলই রামায়ণ মহাকাব্যের জনৈক নায়ক। বাষ্পাকারে সমুদ্র, নদী ও নদাদি হইতে যে জলরাশি শোষিত হইয়া মেঘাকারে পরিণত হয় তাহার মধ্যে অনেক দূষিত পরমাণু থাকে ; সেই দূষিত পরমাণু সকলকে বিদ্যুতাগ্নি দ্বারা বিনষ্ট করিয়া জীবগণের কল্যাণার্থে ধারাকারে সেই বৃষ্টি পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরিত হয়। সুতরাং দীপ্তিশীল নলের এই দূষিত পদার্থরূপ রাক্ষস বধ করিবার ক্ষমতা আছে। যখন নভোমণ্ডলে নবীন নীলবর্ণ নীরদগাত্রে নলের বিকাশ হয়, তখন মনোহর কাঞ্চনবর্ণ চিত্রসদৃশ বিস্ময়জনক চিত্র নয়নগোচর হয়। এই নলই অন্তরিক্ষাগ্নি হইতে সমুদ্ভূত হয়। অন্তরিক্ষাগ্নির নামান্তর বৈশ্বানর অগ্নি। বৈশ্বানর অগ্নি সম্বন্ধে ভরদ্বাজাদি বহু ঋষি সূক্ত প্রণয়ন করিয়াছেন। এই বৈশ্বানর অগ্নির প্রথম উদ্ভব দিব্‌লোকে।

অঙ্গিরাগোত্রীয় অহমীয় ঋষি বলিতেছেন—

পবমানো অজীজনদ্দিবশ্চিত্রং ন তন্যতুম্।
জ্যোতির্বৈশ্বানরং বৃহৎ ॥ ৯৬১।১৬খ সামবেদ পবমান পর্ব্ব ৪৮৪ সাম।

এই মন্ত্রে পবমান সোমকে বৈশ্বানর অগ্নির জনক বলা হইয়াছে।

অন্বয়ঃ। পবমানঃ (পবমান সোম) তন্তুং ন (গতিশীল রজ্জুর ন্যায় বা বজ্রের ন্যায়) দিবঃ চিত্রং বৃহৎ বৈশ্বানর জ্যোতিঃ (আকাশের চিত্র সদৃশ বৃহৎ শ্বেতদ্যুতি বৈশ্বানরকে) অজিজনৎ (উৎপন্ন করিয়াছেন)।

পবমান শব্দের প্রকৃত অর্থ হইতেছে—যিনি সতত পবিত্র—করেন বা করিতেছেন তিনি পবমান।

নীলের স্বরূপ বর্ণন—রামায়ণোক্তি অনুসারে হুতাশন [১] হইতে শ্রীমান অগ্নি তুল্য তেজস্বী নীলের উদ্ভব। নীলধাতুর অর্থ নীলবর্ণ। নীলেরই নামান্তর কৃষ্ণবর্ণ। কিছু প্রার্থক্য থাকিলেও প্রায় এক অর্থে ব্যবহার হয়। [মৎস্য চরিতে ভরদ্বাজের উক্তি—৬।৯।১ ঋ দ্রষ্টব্য) প্রথম অগ্নির স্তর কৃষ্ণবর্ণ হেতু নাম কালী। যেখানে প্রজ্বলিত অগ্নি সেইখানে তাহার প্রথম স্তর কৃষ্ণবর্ণ ঃ মধ্যাহ্নে সূর্য্যের জ্যোতিঃ মধ্যে প্রথম স্তরে কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয় এই হেতু পাবক স্বরূপ রামের সখা নীল। [কিন্তু নীলবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ রাবণ (শনি) রামের শত্রু !!!] কারণ শনির মধ্যে পৃথ্বিতত্ত্বের ভাগ অধিক।

এই হুতাশনই বেদ বেদান্তানুসারে জগতের কারণ স্বরূপ অগ্নি; যাঁহা হইতে জগতের সমস্ত পদার্থ উদ্ভূত হয় এবং যাঁহাতে সমস্ত লয় প্রাপ্ত হয়। ঐ অন্ধকারই এই জগতের সর্ব্ব পদার্থের আবাস স্থল বা ভাণ্ডার গৃহ। সমস্ত রত্নের আধার স্বরূপ অগ্নিও ঐ অন্ধকার মধ্যে অবস্থিত করেন ঐ আঁধার মণিই মহাভারতাদি পুরাণে দুর্ব্বাসা মুনি নামে খ্যাত এবং বেদ "তমসি তাস্থবাংস" আখ্যায় আখ্যাত। ঐ অগ্নিই অকার স্বরূপে প্রথমে আবির্ভূত। অন্ধকারের পশ্চাতে অগ্নি এবং পরেও অগ্নি। অগ্নি ভিন্ন জগতে লীলা করিবার শক্তি আর কাহারও নাই। প্রকৃতি স্বরূপ, ব্যঞ্জনবর্ণ "ক" যে মত স্বরের আশ্রয় ভিন্ন কোন বাক্য করিতে বা ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম, সেইরূপ অগ্নির সাহায্য ব্যতিরেকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অচল। ক স্বয়ং অনুচ্চার্য্য। অক্ পশ্চাতে স্বর 'অ' সংযোগে অক্ হয় এবং পরে ক + অ = ক হয়। উভয়বিধ ভাবে স্বর সংযোগে ব্যঞ্জনবর্ণ বা প্রকৃতির কার্য্যক্ষম হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বরূপ (তাঁহারই মহিমা প্রকাশ এবং ইচ্ছা সম্পাদন করেন। জীবদেহে প্রাণ যেরূপ জীবদেহকে সঞ্চালিত করে।

ঋষভ। গত্যর্থক ঋষ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। যে অগ্নি পদার্থনিচয়ের গতি প্রদান করে। তাহাই ঋষভাখ্য বানরযূথপতি।

চন্দন। চন্দ ধাতুর অর্থ দীপ্তি ও আহ্লাদ। যে অগ্নি জীবের হ্লাদন শক্তির অধিপতি। তাহাই চন্দনাখ্য বানরসেনাপতি।

এই প্রকার ব্রহ্মাণ্ডে এক পরমাত্মারূপ অগ্নিই নানা ভাবে নানা রূপে লীলা ও ক্রীড়া করিতেছেন। তাহাই কবিবর নানা কৌশলজাল বিস্তারপূর্ব্বক বৈদুষ্যপূর্ণ ভাষায় নানা উপাখ্যানে ও অলঙ্কারে ভূষিত করতঃ রচনা করিয়াছেন। যাহা বেদে সূত্রাকারে গ্রথিত তাহাই রামায়ণাদি পুরাণে বাক্পটুতা সহকারে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত।

অথর্ব্ববেদের অগ্নিবিষয়ক মন্ত্র—

অগ্নির্ভূম্যামোষধীষ্বগ্নিমাপো বিভ্রত্যগ্নিরশ্মসু।
অগ্নিরন্তঃপুরুষেষু গোষ্বশ্বেষ্বগ্নয়ঃ।

অগ্নিদ্দিব আতপত্যগ্নের্দ্দেবস্যোর্ব্বান্তবিক্ষম্।
অগ্নিং মর্ত্তাস ইন্ধতে হব্যবাহং ঘৃতপ্রিয়ম্॥ ১২শ কাঃ ১।১৯

ঋগ্বেদে ও সামবেদে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া অগ্নিদেবের প্রার্থনা করিতেছেন। সামবেদ উত্তর আর্চিক ১২৪২ সামে এইরূপ গীত হইয়াছে। ঋষি উষণা অগ্নিদেবের প্রার্থনা করিতেছেন।

শ্রেষ্ঠং যো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্।
অগ্নে। রথং ন বেদ্যম্॥ ৮।৮৪।১ ঋ।

এই মন্ত্রে "রথং ন বেদ্যং" বাক্যের দ্বারা নভোমণ্ডলের যাবতীয় অগ্নির স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন।

এক অগ্নিদেবই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থে ও প্রোতভাবে বিদ্যমান থাকিয়া যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। তিনিই প্রকৃতিরূপে সমস্ত কার্য্য করিতেছেন এবং পুরুষরূপে নিশ্চল স্থির ভাবে দ্রষ্টা স্বরূপ বিদ্যমান যে মহাপুরুষ সাধনাবলে এই সৃষ্টিরহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তিনিও মুক্তপুরুষ হইয়া দ্রষ্টাসহ সাযুজ্যতা লাভ করেন।

বিভিন্ন প্রকারের অগ্নিরূপ বানর বাহিনী মধ্যে যেরূপ আকার শক্তি ও কার্য্য অনুসারে বিভিন্ন নাম, পদ ও ছোট বড়, শত্রু মিত্র ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে, জীবজগতেও সর্ব্বভূতস্থ এক পারমার্থিক পরমাত্মারূপ অগ্নির ও ছোট বড় শত্রুমিত্রাদি ভেদ বিদ্যমান। ইহাই প্রপঞ্চ জগতের বৈশিষ্ট্য, ইহাই অদিতিরূপ প্রকৃতির লীলা। অদিতি হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন অর্থাৎ তিনি জগৎ প্রসবিনী এবং তিনিই জগৎ ভক্ষণকারিণী। প্রকৃতির এই রহস্য যিনি বুঝিতে পারেন, তিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া পরমাত্মাতে মিলিতে পারেন।

মহাভারত মতে রাক্ষস, বানর কিন্নর ও যক্ষগণ ধীমান পুলস্ত্যের পুত্র। মহাভারত আদি পর্ব্ব ৬৬ অধ্যায়। রামায়ণ ও অন্যান্য পুরাণসহ ইহার ঐক্যতা নাই।

মন্তব্য। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদি গ্রন্থ মধ্যে অনেক সত্যতত্ত্ব ও বিজ্ঞানতত্ত্ব থাকিলেও অত্যন্ত জটিল ও উপন্যাসাকারে লিখিত হেতু প্রকৃত সত্যতত্ত্ব জানিবার অনেক অন্তরায় বিদ্যমান এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির পন্থাসকলও কণ্টকীকৃত হইয়া রহিয়াছে। তাহার কারণ গ্রন্থের লক্ষ্য কাব্য ও উপাখ্যান প্রতিও যাহা অনেকের আজীব্যরূপে পরিণত। একথা স্বয়ং বেদব্যাসই বলিয়াছেন।

রাবণ বৈমাত্রেয় কুবেরের স্বরূপ নির্ণয়। কুবেরই পূর্ব্বে লঙ্কার অধিপতি ছিলেন, কিন্তু রাবণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়েন। কুবেরের স্বরূপ অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্যক বিধায়, আমরা সংক্ষেপে কুবেরের কাহিনী পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিতেছি। এই কুবেরের নাম হইতে অনেক পৌরাণিক গূঢ়তত্ত্ব বহিষ্কৃত হইবে। যেরূপ অঙ্গের দ্বারা অঙ্গীর আধারের দ্বারা আধেয়ের পরিচয় প্রাপ্তব্য তদ্রূপ নাম ও নিধি দ্বারা কুবেরের পরিচয় জ্ঞাতব্য।

নিধিপতি, নিধীশ, বসু, যক্ষপতি ইত্যাদি কুবেরের নাম। নিধি কাহাকে বলে, তাহা না জানিতে পারিলে নিধিপতিকে প্রকৃতরূপে জানা অসম্ভব। নিধি শব্দের আভিধানিক অর্থ অব্যাভা-

বর্ক ধন। স্বাভাবিক ধন দৃষ্ট পদার্থ ; অস্বাভাবিক ধন অদৃষ্ট অব্যক্ত পদার্থ। ইহা হইতেই কুবেরের কতকটা আভাষ পাওয়া যায়।

কুবেরের নববিধ নিধি। (মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্চ্চ বা চর্চ্চাকে বাদ দিয়া অষ্টানাধির বিষয় উক্ত।)

মহা পদ্মশ্চ পদ্মশ্চ শঙ্খমকবকচ্ছপৌ।
মুকুন্দ কুন্দনীলাশ্চ চর্চ্চাশ্চ নিধয়ো নব॥ অঃ চি ১

এই নামগুলির দ্বারা প্রকৃত পদার্থের বিষয় জানা যায় না বা তাহাদের অনুভূতি হয় না। সুতরাং নিধিকে না জানিলে নিধিপতিকেই বা কি করিয়া জানা যাইবে। সুতরাং আমরা অগ্রে নিধি * গুলির বিষয় জানিতে চেষ্টা করিব।

উক্ত নয় প্রকার দ্রব্যের দুইটি ভাব। অপ্রকাশ ভাব ও প্রকাশভাব।

১। **মহাপদ্ম** -বিশ্বপদ্ম বা অন্তকটাহ অর্থাৎ দিকৃতত্ত্ব। (Infinite sky or space.) যাহার মধ্যে বহু সৌরজগৎ বিদ্যমান।

২। **পদ্ম**—শব্দের দ্বাবা বিষ্ণুব নাভিকমলোৎপন্ন এই সৌবজগৎকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই পদ্ম হইতে ব্রহ্মাব উদ্ভব হেতু তাঁহাব পদ্মযোনি আখ্যা। গত্যর্থক পদ ধাতু হইতে পদ্ম শব্দ উৎপন্ন ; পদ ধাতুর অন্যতম অর্থ স্থৈর্য। ইহা দ্বাবা আকাশতত্ত্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

৩। **শঙ্খ**—শব্দেব দ্বাবা ধ্বনি বা শব্দতত্ত্বকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শঙ্খধ্বনি মাঙ্গল্য-সূচক। এই ধ্বনিই জগতের উৎপত্তিব কাবণ। শঙ্খ শব্দ শমধাতু হইতে উৎপন্ন, শম ধাতুব অর্থ উপতাপ ও আলোচন অর্থাৎ নিবৃত্তি ও উৎপত্তি। আকাশ, শব্দেব আধাব, বায়ু তাহার উত্তেজক বা প্রকাশক।

৪। **মকর**—'ম' শব্দেব অর্থ কাল, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মক ত্রিশক্তি। ম—কর—মকর। করশব্দের অত্র প্রযুজ্য অর্থ কিরণ, জ্যোতিঃ অর্থাৎ জ্যোতিঃ রূপ হস্ত। কৃ ধাতু হইতে কর শব্দ সিদ্ধ। কৃ ধাতুর অর্থ বিক্ষেপ, বিজ্ঞান ও হিংসা। বিক্ষেপ অর্থে ক্ষেপণ প্রসারণ ও সঞ্চালন। বিজ্ঞান শব্দের দ্বাবা তত্ত্বজ্ঞান বিদ্যা, শিল্পাদি জ্ঞান এবং নানাবিধ বিশেষ সূচিত হয়। হিংসা শব্দ হননেচ্ছা, বধ ও অধোগতি অর্থ দ্যোতনা করে। মকব শব্দ দ্বারা এই সমস্ত অর্থই অভিদ্যোতিত হয়। ইহা ব্রহ্মেব সৃষ্টিকারিনী সাধনশক্তি। একার্ণবরূপী মহাসমুদ্রে ইহা নিহিত ছিল।

মকবশব্দের আভিধানিক অর্থ মৎস্যবিশেষ অর্থাৎ মৎস্যাবতারেব অমুনক্ষত্রমণ্ডল বিশিষ্ট মৎস্যাকার ছায়াপথ, কামধ্বজ, রাশিচক্রের মকরনামা দশম রাশি এবং নিধিবিশেষ। বৌদ্ধ অর্হৎগণের অর্থাৎ যোগ্য ব্যক্তিগণেব ধ্বজাবিশেষের নাম মকব। গীতায় শ্রীভগবান বলিতেছেন—

ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী। ১০।৩১

মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকরনামা মৎস্যাবতার এবং স্রোতস্বিনী নদীগণেব মধ্যে আমি জাহ্নবী (জহ্নু

* ১ মহাপদ্ম, ২ পদ্ম, ৩ শঙ্খ, ৪ মকর, ৫ কচ্ছপ, ৬ মকুন্দ, ৭ কুন্দ, ৮ নীল এবং ৯ চর্চ্চসইএ নববিধ বস্তু মহানিধি নামে খ্যাত। নিধি শব্দের অর্থ আধার ও সমুদ্র ইহা দ্বারা প্রকৃত পদার্থ কি তাহা বোধগম্য হইল না। আমরা বৈশেষিক দর্শন মতে নববিধ দ্রব্যকে ইহার অবরোধক মনে মনে করি। কিন্তু প্রমাণ সাপেক্ষ হেতু প্রমাণের দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

বা অগ্নিতনয়া) সন্ধ্যাকিরী নামা স্বর্গঙ্গা। মকর রাশি, রাশিচক্রের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। দক্ষিণ দিক্‌কে অগস্তিপূতা দিক্‌ বলে। মকররাশির অধিপতি শনি বাষস হেতু ইহা সাম্যদিক্‌ নামেও অভিহিত। মকরনামক নিধিকে কাল বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইল।

৫। কূর্ম্মাবতারে ইহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। কূর্ম্মরূপী কশ্যপই এবং পৃথ্বিই কচ্ছপ বা কুবেরের নিধিবিশেষ।

৬। **মুকুন্দ**—মুকুন্দ শব্দের দুইটী অর্থ। এক নিধিবিশেষ, দ্বিতীয় বিষ্ণু। ইহা হইতে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না। ধাত্বর্থ দ্বারা প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি হইবে। মুকুম্‌+দা ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে স্ত প্রত্যয়ে সিদ্ধ। মুচ্‌ ধাতু হইতে মুকুম। মুকু শব্দের অর্থ মুক্তি। দা ধাতুর অর্থ দান। যিনি মুক্তিদাতা অর্থাৎ বিষ্ণু। মুকুন্দ শব্দের অর্থ আত্মা।

৭। **কুন্দ**—কুন্দ শব্দের অর্থ (১) নিধি বিশেষ, (২) ভ্রমিযন্ত্র [সপ্তর্ষি], (৩) কুঁদযন্ত্র, ইহা হইতেই কুঁদুরি শব্দের উদ্ভব। (কু+দো ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে ড প্রত্যয়ে সিদ্ধ। দো ধাতুর অর্থ ছেদন। বিমানস্থ ভ্রমিযন্ত্রকেই ইহার দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। ক+উন্দ ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে অন্। উন্দ ধাতুর অর্থ ছেদন ও আর্দ্রীকরণ বা আর্দ্রীভাব। সপ্তর্ষিরূপ ভ্রমিযন্ত্র পৃথিবীকে জল হইতে উত্তোলন বা উদ্ধার করিয়াছেন। জলতত্ত্ব ও পৃথ্বিতত্ত্বকে পৃথক করা হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে আপ্‌ বলিলে পৃথিবীকেও বুঝায়। এই দুই তত্ত্ব পরস্পর স্বাভাবিক মিত্র। সৃষ্ট্যর্থে ইহাকে পৃথক্‌ করা হইয়াছে। সপ্তর্ষির ঘূর্ণনে আকাশসমুদ্রের উদ্ভব হইয়াছে। আপ্‌ তত্ত্ব।

৮। **নীল**—নীলাকাশ। ঐ নীলাকাশই নীলগিরি, অভিধানে পর্ব্বতবিশেষ নামে খ্যাত। উহাই রামায়ণে নীল নামক বানরবিশেষ। উহাই জ্যোতির আকর এবং কুবেরের নিধি বিশেষ। অগ্নিতত্ত্ব। বেদে উক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ জ্যোতির অতি সূক্ষ্ম পরমাণুরূপে অন্যান্য সৃষ্টির বৈশ্বানর অগ্নির উদ্ভব হইয়া জগৎ উদ্ভাষিত হইয়াছে।

৯। **চর্চ্চস্‌**—অধ্যয়ন ও অনুশীলনাত্মক চর্চ্চ ধাতু হইতে উপন্ন। ব্রহ্মার যে সৃষ্ট্যর্থে তপস্যারূপ অনুশীলন ও অধ্যবসায় তাহাই চর্চ্চস নামক কুবের নিধি। মনঃ বাআহান্‌। মহত্তত্ত্ব।

এই নয়টি কুবেরের মহা নিধি নামে খ্যাত। এই নিধি নিচয়ের দ্বারাই নিধিপতির এক প্রকার পরিচয় পাওয়া গেল। আরও কিছু বিশেষ করিয়া পরিচয় জ্ঞাত হইবার চেষ্টা করা যাউক। কুবেরের আরও অনেক নাম আছে, যথা—ধনপতি, ধনেশ, ধনেশ্বর ও ধনদ ইত্যাদি। এই শব্দ গুলি ধনধাতু হইতে উৎপন্ন ; ধনধাতুর অর্থ শব্দ ও সমৃদ্ধি।

শব্দই সমস্ত সমৃদ্ধির এবং জগৎ উৎপত্তির মূলকারণ। এই "শব্দই" আদি স্বর এবং প্রণবধ্বনি 'প্রণব" যে মহবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি। প্রণব হতে সর্ব্ববেদ জগৎ উৎপত্তি॥ তথাচ—

অনাদ্রি নিধনং ব্রহ্মশব্দ তত্ত্ব মনাময়ম্‌।
বিবর্ত্ততে অর্থ ভাবেন প্রক্রিয়া জগতে যতঃ॥ জৈমিনী॥

কুবেরের পুরী।—কুবেরের পুরী দ্বারাও কুবেরের স্বরূপ নির্ণয় সহজে হইবে। কুবেরের পুরীর নাম—অলকাপুরী, বস্বৌক সারা (সমস্ত বসু বা ধনের ওকস বা আশ্রয় স্থান যত্র অলক অর্থে কুন্তল। কুন্তলের ন্যায় গোলাকার পুরী লোকালোক গিরিকে উদ্দেশ্য করিয়া উক্ত

হইয়াছে। ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর নামও বস্বোকসারা এবং দশরথ রাজার রাজ্য অযোধ্যাও বস্বোক সারা নামে কথিত হয়। কুবের ও ইন্দ্র মধ্যে কি পার্থক্য আছে?

ইন্দ্রের বাগানের নাম নন্দন কানন, আর কুবেরের বাগানের নাম চৈত্ররথ। ছায়াপথই চৈত্ররথ এবং নক্ষত্র পুঞ্জ দ্বারা সংগঠিত বিশ্বচক্র বা রাশিচক্রই নন্দন কানন।

মহাভারতে মৎস্যাবতার লিখিত বসু নামক রাজার উপাখ্যানে বসুরাজার অন্যতম এক নাম উপরিচর রাজা। তিনি সকলের উপরে বিচরণ করেন বলিয়া উক্ত অভিধা প্রদত্ত হইয়াছে। ছায়াপথ বা সোমধারাই সকলের উপরে ইহার অধিপতিই উপরিচর রাজা।

যক্ষ শব্দের অর্থ কুবের; কুবেরকেই যক্ষরাজ ও যক্ষাধিপ বলা হয়। যক্ষ ধাতুর অর্থে পূজা; তিনিই পূজা ও পূজনীয়গণের শ্রেষ্ঠ। 'বিত্তেশ যক্ষরক্ষসাম্।" গীতা ১০।২৩ "যক্ষঃ পুণ্য জনো রাজাগুহ্যকো বটবাস্যাপি।" অঃ চি॥ অত্র বটবাসী অর্থে যিনি ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টনকারী অক্ষয় বটবৃক্ষে বাস করেন। কুবেরের আর একটি নাম দ্রুম অর্থে কল্পদ্রুম। আবার দ্রুম অর্থে পারিজাত বৃক্ষ। দ্রু ধাতুর অর্থ গতি ও দ্রবীভাব কুবের রূপ 'কল্পদ্রুমের নির্য্যাস হইতেই এই জগদুৎপন্ন। এই কুবের রূপ কল্পবৃক্ষ দ্রবীভূত হইয়া দ্রোণ কলসাখ্য জলাশয় বিশেষ বা আকাশ সমুদ্র উৎপন্ন। দ্রোণ শব্দের অন্যতম অর্থ দণ্ড কাক বা যোগ বাশিষ্টের ভূষণ্ড কাক। যে কাকের উদরে ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান। ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দিকে যে কৃষ্ণবর্ণ নীলাকাশ এবং তন্মধ্যস্থ সুখ দুঃখ পূর্ণ জগৎ তাহাই ভূষণ্ড কাক।

"ভূষণ্ড নামের বুৎপত্তিগত অর্থ—ভূ শব্দের অর্থ উৎপত্তি এবং ষণ্ড শব্দের অন্যতম অর্থ বৃক্ষ। সন ধাতু হইতে ষণ্ড শব্দের উদ্ভব সন ধাতুর সোপাদেশ হয়। সনধাতুর অর্থ সেবা দান ও জ্ঞান। যে অক্ষয় অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষ হইতে বিবিধ দ্রব্য ও গুণান্বিত সুখ দুঃখ পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন সেই কৃষ্ণ বর্ণাপরা প্রকৃতিই ভূষণ্ড কাকাখ্যায় আখ্যায়িত। এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডকে অশ্বত্থ, বটা-পারিজাতাদি নানা বৃক্ষ বলিয়া বেদপুরাণাদি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে।

নীলাকাশরূপ যমুনাতীরস্থ ক্ষেত্রে শিখিচর্ষণরূপ অগ্নিদেব যজ্ঞ করিয়া সেই ক্ষেত্র কর্ষনান্তে বীজ বপন করেন। তাহাতে বিবিধ তরুউৎপন্ন হইয়া পরম রমণীয় এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়।

জনক সভায় যাজ্ঞবল্ক্য

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

আর্ত্তভাগ যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ পুরুষ বলে অভিমান ক'রচ, আচ্ছা বল দেখি গ্রহ এবং অতিগ্রহ কতগুলি এবং কি কি?

যাজ্ঞবল্ক্য, আর্ত্তভাগের প্রশ্ন শুনে বলে উঠলেন—আর্ত্তভাগ, গ্রহ ত তুমি দেখেছ। সোম-যাগত তুমি বহুবার করেছ। সোমযজ্ঞে, সোমরস পরিপূর্ণ কলসীর মুখে যে একখানা মাটীর ছোট সরা থাকে, মাটীর সেই ছোট পাত্রটীকেই বলে গ্রহ। এখন বেশ করে বুঝে দেখ, আর্ত্তভাগ, এই গ্রহ বা মাটীর পাত্রটি ঢেকে রাখে সোমরসকে। গ্রহধাতু মানে গ্রহণ করা বা আক্রমণ

করা, তা অবশ্যই তুমি জান। আমি পূর্ব্বেই অশ্বলের প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় বলেছি যে যজ্ঞ যেরূপ দ্রব্যময় সেইরূপ ইহা জ্ঞানময়। একই জিনিষ বাহিরে বিষয়রূপে অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ রূপে এবং অন্তরে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই সব জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপে, অভিব্যক্ত। একই জিনিষ, বাক ও নামরূপে, হস্ত ও কর্ম্ম রূপে মন ও কামরূপে ফুটে পড়েছে। গ্রহ যেমন কলসীর মধ্যের সোমরসকে ঢেকে রাখে, মাটির ঐ ছোট গ্রহটি যেমন মাটীর বড় কলসীর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, সেইরূপ আমাদের দশ ইন্দ্রিয় আর মন এবং ঐ ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয়গুলি আবৃত করে রেখেছে আমাদের অমৃত আনন্দ স্বরূপকে। আর ইন্দ্রিয় ও মন আক্রান্ত হয়েছে তাহাদের বাহিরের বিষয় দ্বারা। গ্রহগুলির মধ্যে আটটি প্রধান এবং অতিগ্রহের মধ্যেও আটটিই প্রধান। সেইজন্য তোমাকে বলচি, আর্ত্তভাগ, যে গ্রহও আটটি এবং অতিগ্রহও আটটি। এবং সেই গ্রহগুলি হ'চ্চে—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, প্রাণ (ঘ্রানেন্দ্রিয়), বাক্ হস্ত এবং মন। আর অতিগ্রহ হ'চ্চে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, নাম, ক্রিয়া এবং কাম। একবার বেশ করে বুঝে দেখ আর্ত্তভাগ, আমরা কি প্রকারে এই গ্রহ ও অতিগ্রহের বন্ধনে বদ্ধ হ'য়ে পড়েছি। অতিগ্রহ এসে আক্রমণ করচে গ্রহকে, বিষয় এসে টেনে নিয়ে যাচ্চে ইন্দ্রিয়কে বাইরে, এই আক্রমণের ফলে গ্রহ স্পন্দিত হ'চ্চে, আর তার সেই স্পন্দন নিয়ে যাচ্চে মনের কাছে, আর মন সেই স্পন্দনে স্পন্দিত হয়ে নিজেতে তুলচে শত শত স্পন্দন, শত শত কামনা, শত শত বৃত্তি। আর আমরা স্বরূপ ভুলে, নিজের আনন্দ স্বরূপ, রসস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে, এই শত শত বৃত্তির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলচি এবং বৃত্তিস্বারূপ্য লাভ ক'রে, কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, জন্মমৃত্যুরূপ সংসারজালে এই গ্রহ অতিগ্রহের বন্ধনে বদ্ধ হ'য়ে পড়চি। একবার ভেবে দেখ আর্ত্তভাগ, আমরা যাকে পিতা মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভাইবন্ধু, আত্মীয় স্বজন, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্, জড়, উদ্ভিদ্, প্রাণী, মনুষ্য দেবতা ব'লচি এবং যাকে সত্য ব'লে ভাবচি সেগুলি স্বরূপতঃ কি? সেগুলি কি আমাদের ইন্দ্রিয়গণের, এই গ্রহগণের, বিষয়ের সহিত, অতিগ্রহের সহিত সম্বন্ধ হেতু, মনে যে সব স্পন্দন উঠছে, সেগুলি কি মনঃকল্পিত স্পন্দনময়ী, বৃত্তিময়ী মূর্ত্তি নয়। মন, ইন্দ্রিয়ের এই স্পন্দনগুলিকে একটা রূপ, একটা নাম দিচ্চে আর সেই নামরূপকেই সত্য ব'লে মনে ক'রে গ্রহ ও অতিগ্রহের বন্ধনে বদ্ধ হ'চ্চে। মনঃকল্পিত নামরূপাত্মক বাহিরের এবং ভিতরের জগৎ, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে সত্যকে, রসরূপ, আনন্দরূপ অমৃতকে আবৃত করে রেখেছে। এই শত শত জ্যোতিস্ক দ্বারা উদ্ভাসিত নামরূপময় জগৎ একখানা সোনার ঢাকনীর মত সত্যের দ্বার আবৃত করে রেখেছে। এই গ্রহ এবং অতিগ্রহের তত্ত্ব অবগত হ'লে, ইহাদের মিথ্যাত্ব হৃদয়ঙ্গম হ'লে, সোমরসরূপ অমৃত লাভ করা যায়।

আর্ত্তভাগের প্রথম চেষ্টা বিফল হ'লেও, তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করবার জন্য আর একবার চেষ্টা ক'রতে উদ্যত হ'লেন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে আবার প্রশ্ন ক'রলেন "আচ্ছা, বল দেখি যাজ্ঞবল্ক্য, এই জগতে যা কিছু আছে সবই ত এই গ্রহাতিগ্রহরূপী মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত, এখন, এই মৃত্যুরও মৃত্যু আছে কি না? সে দেবতা কে, যাঁর অন্ন হ'চ্চে মৃত্যু, যিনি মৃত্যুকেও ভক্ষণ করেন, সেই মৃত্যুঞ্জয় দেবতাটী যে কে তাই তুমি আমাকে বল।"

যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবিদ্। তাঁর পক্ষে আর্ত্তভাগের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন নয়। তিনি

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন "দেখ, আর্ত্তভাগ, এই জগতে অগ্নি সব বস্তুকে দগ্ধ ক'রে ফেলে, সেই জন্য ইহার নাম সর্ব্বভুক্। এই সর্ব্বভুক্ অগ্নিকেও আবার ভক্ষণ করে জল। সেইরূপ এই সর্ব্বগ্রাসী গ্রহ অতিগ্রহ রূপ মৃত্যুরও মৃত্যু আছে। সেই মৃত্যু হ'চ্চে স্বরূপ জ্ঞান। এই মিথ্যা অবিদ্যা, অজ্ঞানরূপ গ্রহ অতিগ্রহ সেখানে অস্তমিত।

দেখ, আর্ত্তভাগ, এই গ্রহাতিগ্রহই হ'চ্চে মানুষের প্রকৃত বন্ধন। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ এসে ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারে আঘাত দিয়ে উঠাচ্চে কম্পন। আর সেই কম্পন চিত্তে তুলচে অসংখ্য বৃত্তি, অগণিত তরঙ্গ; এবং মন সেই কম্পনগুলিকে নামরূপ দিয়ে গ'ড়ে তুলচে শত শত মনোময়ী মূর্ত্তি, আর ঐ মনোময়ী মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হয়ে কামনার পিছু পিছু ছুটে চলেচে সব মানুষ। এখন বুঝতে পাচ্চ, আর্ত্তভাগ, কেমন ক'রে এই গ্রহ অতিগ্রহ ভিতরে অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়রূপে ঢেকে রেখেছে আমাদের রসরূপ আনন্দ স্বরূপকে এবং বাহিরে বিষয়রূপে আবৃত করে রেখেছে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ—অমৃত, আনন্দ। এখন এই আবরণকে, এই অমৃত আনন্দস্বরূপকে ঢেকে রেখেছে যে পাত্র, গ্রহরূপী যে ঢাকনিটী, সেই পাত্রটীকে অপসারিত করতে হ'বে, এই ঢাকনীকে উন্মুক্ত করতে হ'বে। নামরূপ পরিত্যাগ ক'রে সেই পরাৎপর দিব্য পুরুষের জ্ঞান লাভ করতে হবে, তবেই এই গ্রহাতিগ্রহরূপ মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত হ'তে পারবে। আর সেই জ্ঞানই মৃত্যুরূপ গ্রহাতিগ্রহের মৃত্যু স্বরূপ।

আর্ত্তভাগ পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, আচ্ছা, বল দেখি, এই যে গ্রহ এবং অতিগ্রহরূপ সংসার বন্ধন বিমুক্ত পুরুষ যখন মরে, তখন তার প্রাণ সমূহ উর্দ্ধগামী হয় কি না। আর কেহ বা সেই মৃতব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে ন ?

যাজ্ঞবল্ক্য বেদজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী এবং আত্মবিদ্। তিনি আর্ত্তভাগের প্রশ্ন শুনে একটু হেসে ব'ললেন "আর্ত্তভাগ, বল দেখি, যখন আমরা অস্পষ্ট আলোকে একগাছা দড়িকে সাপ বলে মনে করি, কিন্তু যখন স্পষ্ট আলোকে সেই দড়িকে দড়ি বলে বুঝতে পারি, তখন আমাদের কল্পিত সেই সাপ কোথায় যায়? সেই সাপ নিশ্চয়ই দড়িতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ মুক্তপুরুষের অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ উর্দ্ধগামী হয় না, তাহার লিঙ্গশরীর জন্ম মৃত্যু স্বর্গ নরক, ভোগ করে না। তাহার স্থূল দেহ বায়ুপূর্ণ হইয়া পড়িয়া থাকে। আর লিঙ্গ ও কারণ শরীরও সেই সেই শরীরাবচ্ছিন্ন চিদাভাস আত্মাতেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যা অজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হওয়ায় সেই পুরুষ, আর পুনরায় জন্ম মৃত্যু, গ্রহ অতিগ্রহের বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। তখন তার অবশিষ্ট থাকে শুধু নাম। এই নাম সেই পুরুষকে ত্যাগ করে না। নাম অনন্ত, বিশ্বদেবাও অনন্ত। সেই মুক্ত পুরুষ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই মহাবাক্যের লক্ষ্য সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম হইয়া যান।

আর্ত্তভাগ পুনরায় যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন "আচ্ছা, যাজ্ঞবল্ক্য, এই প্রশ্নের উত্তরটা একবার দাও দেখি। পুরুষ যে গ্রহ অতিগ্রহরূপ সংসার বন্ধনে বদ্ধ হয়, সেই বন্ধনের কারণটা কি একবার বুঝিয়ে বল দেখি। যখন পুরুষ মরে, তখন তাহার বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু সূর্য্যে, মন চন্দ্রে, শ্রবণেন্দ্রিয় দিক্‌সমূহে, শরীর পৃথিবীতে, হৃদাকাশ মহাকাশে, লোমসমূহ তৃণলতা প্রভৃতিতে, কেশরাশি বনস্পতিতে, রক্ত এবং শুক্র জলে বিলীন হয়, এইরূপে মৃত্যুসময়ে পুরুষের ইন্দ্রিয়গণ যখন স্ব স্ব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তখন পুরুষ থাকে

কোথায়? আর কেইবা পুনরায় সেই পুরুষকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করায়?" আর্ত্তভাগের প্রশ্ন শুনে যাজ্ঞবল্ক্য তাড়াতাড়ি গিয়ে আর্ত্তভাগের হাতখানি ধ'রে বললেন 'বন্ধু, তুমি যা প্রশ্ন করলে, দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা, নহি সুবিজ্ঞেয় রণুরেষ ধর্ম্মঃ।" দেবগণও এবিষয়ে পূর্ব্বে সন্দেহ করেছিলেন। তাঁহারাও এ তত্ত্ব নিঃসন্দেহরূপে জানতে পারেন নি। এ তত্ত্বটী বড়ই সূক্ষ্ম, বড়ই দুর্বিজ্ঞেয়। তাই বলি বন্ধু এ প্রশ্নের উত্তর যদি তুমি জানতে চাও, তাহলে এস, আমরা একটু নির্জ্জনে গিয়ে এবিষয়ের আলোচনা করি। এই কথা ব'লে যাজ্ঞবল্ক্য আর্ত্তভাগের হাত ধরে সভার বাহিরে গেলেন। তাঁরা বহুক্ষণ আলোচনার পর পুনরায় সভায় প্রবেশ করিলেন। আর্ত্তভাগ দেখিলেন বড়ই বেগতিক, যাজ্ঞবল্ক্যকে কিছুতেই পরাজিত করতে পারা গেল না, তাই তিনি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে নিজের আসনে বসে পড়লেন, যাজ্ঞবল্ক্যকে আর প্রশ্ন করলেন না। যাজ্ঞবল্ক্য এবং আর্ত্তভাগ যে বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন সে বিষয়টী হ'চ্চে কর্ম্ম। কারণ কর্ম্মই মানুষকে সংসার বন্ধনে বদ্ধ করে। একটা কথা আছে মৃতমনুধাবতি ধর্ম্মাধর্ম্মম্'। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য মৃতব্যক্তির অনুসরণ করে। আমাদের প্রত্যেক কাজ, হৃদয়ের প্রত্যেক ভাব, মনের প্রত্যেক চিন্তাটী প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের চিত্তে একটা ছাপ দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সেই ছাপ, সেই কর্ম্মসংস্কার, সেই বাসনাগুলি আমাদের জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনের কারণ। তাই যাজ্ঞবল্ক্য এবং আর্ত্তভাগ নির্জ্জনে ব'সে কর্ম্মেরই প্রশংসা করেছিলেন।

তন্ত্রের দেশ ও কাল

আমাদের দেশে এখন যে সময় আসিয়াছে; তাহাতে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যে কি? সে বিষয়ে বড় কেহ দৃষ্টি দেন না। সকলেরই এই ভাবনা যে, গ্রন্থ কোন সময়ে হইয়াছিল? কোথায় বা হইয়াছিল এবং ইহার রচয়িতাই বা কে? এই সকল কথা লইয়া এতই ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের কিছুই আলোচনা করেন না। এই জন্য গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধে কোন শিক্ষাই হয় না।

অনেকের ধারণা এই যে, তন্ত্র গ্রন্থ বা মন্ত্র শাস্ত্র একমাত্র বঙ্গদেশেই জন্মলাভ করে এবং তাহাও খৃষ্টীয় ১০ম বা একাদশ শতাব্দীতে। যাঁহারা এই সম্প্রদায়ভুক্ত, তাঁহারা আরও বলেন যে, তান্ত্রিক যুগ পৌরাণিক যুগের পরবর্ত্তী। কিন্তু এই তিনটীর মধ্যে একটীও স্বীকার করা যায় না। কাশ্মীর দেশে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচার বিশেষরূপ আছে এবং কাশ্মীরসম্প্রদায় বলিয়া একটী সম্প্রদায়ই আছে। সম্প্রদায়ক্রমে ভারত তিনভাগে বিভক্ত, যথা—গৌড়, কেরল ও কাশ্মীর। এই তিনটী সম্প্রদায় দেশক্রমে বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন আর একটি সম্প্রদায় আছে। তাহার নাম বিলাস। এই সম্প্রদায় সমস্ত ভারতব্যাপী—কোন দেশগত নহে। এই চারি সম্প্রদায়ের বিশেষ বিবরণ এস্থলে দেওয়া যায় না। তবে যাঁহার বিশেষ অনুসন্ধিৎসা আছে, তিনি "ষট্‌শাম্ভবরহস্য" দেখিলে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

আবার কোন কোন তন্ত্রে দেশভেদ অনুসারে তিনটী ক্রান্তাভেদের উল্লেখ দেখা যায়। এই তিন ক্রান্তার নাম বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা। বিন্ধ্যপর্ব্বতকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্বদিকে যাবতীয় দেশ—যাভা, বলিদ্বীপ, আর বোধ হয়, কাম্বোদিয়াও এই বিষ্ণুক্রান্তার অন্তর্গত। কাম্বোদিয়াতে দেবদেবীর মন্দির আছে এবং এখনও সেখানে পূজা হইয়া থাকে। বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর দিক হইতে আরম্ভ করিয়া মহাচীন পর্য্যন্ত যাবতীয় দেশ রথক্রান্তার অন্তর্গত এবং ঐ পর্ব্বতের পশ্চিম ভাগে মহাসাগর পর্য্যন্ত যাবতীয় দেশ অশ্বক্রান্তার অন্তর্ভুক্ত। এই মহাসাগর অর্থে কোন সাগর বুঝায়, উহা বিবেচনার স্থল। যে দেশ এক্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্গত রোডেসিয়া নামে অভিহিত হইয়াছে; যেখানে স্বর্ণ নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। আর মিশর দেশেও যে দেবীপূজা হইত এবং শিবপূজাও হইত, তাহারও প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। এখানে এসম্বন্ধে অধিক আলোচনার অবসর নহে। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রে ও মহাসিদ্ধসার তন্ত্রে এ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যায় এবং উক্ত তন্ত্রে ইহাও উল্লেখ আছে যে প্রত্যেক ক্রান্তায় ৬৪ সংখ্যক তন্ত্র প্রচলিত। এই তন্ত্রগুলির নামও উল্লিখিত আছে।

দাক্ষিণাত্যে শৈবাগম প্রচলিত। শ্রীবিদ্যা উপাসকেরও অভাব নাই। মহারাষ্ট্র দেশেও সেইরূপ। গুজরাত অঞ্চলে বৈষ্ণবতন্ত্রের প্রভাব বেশী হইলেও শাক্তের অভাব নাই। পুণ্যধাম ৺কাশীতে পঞ্চোপাসকের সকলকেই পাওয়া যায়, সুতরাং তন্ত্র শাস্ত্র যে কেবল বঙ্গদেশেই প্রচলিত, এইরূপ উক্তি ভিত্তিহীন।

যাঁহারা বলেন—খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে এই শাস্ত্রের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে—যদি তাহাই হইবে, তবে খৃষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে লক্ষ্মণাচার্য্য যে "শারদাতিলক" রচনা করিয়াছিলেন, উহা সমগ্র সৎসম্প্রদায়ভুক্ত তন্ত্রের সারসংগ্রহ স্বরূপ। সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী রাঘবভট্টের মতে লক্ষ্মণাচার্য্য তৎকালীন সাধারণ শ্রেণীর লোককে সকল তন্ত্রের শিক্ষা ও ভাব সরল ভাষায় বুঝাইবার অভিপ্রায়ে এই তন্ত্রখানি রচনা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণাচার্য্যের পূর্ব্বে ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য যে প্রপঞ্চসার নামে একখানি তন্ত্র শাস্ত্র সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা সাধারণের পক্ষে দুরূহ হইলেও সাধকের পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। তাহার পর "ললিতবিস্তর" নামে বৌদ্ধদের যে গ্রন্থ আছে, উহাতে তন্ত্রের সময় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করা যায়। "ললিত বিস্তর" বৌদ্ধদিগের অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রায়ই বৌদ্ধগ্রন্থ আলোচনায় ব্যস্ত। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তাঁহারা নিজেদের শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধেও বিশেষ আলোচনা করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, আমরা পৌত্তলিক এবং বৌদ্ধগণ আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত। সে যাহাই হউক, ললিত বিস্তরে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধদেব কাত্যায়নী, রুদ্র প্রভৃতি দেবতার পূজা সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যদি তাহা হয়, তবে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও তন্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতির প্রচলন ছিল এবং তন্ত্রশাস্ত্রেরও অস্তিত্ব ছিল, স্বীকার করিতে হইবে।

যাঁহারা বলেন—পৌরাণিক যুগের পর তান্ত্রিক যুগ। তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাস্য এই যে,—যদি তাহাই হয়, তবে পুরাণে শ্রৌত এবং তান্ত্রিক দীক্ষা ও পূজার উল্লেখ থাকে কিরূপে? উহা যে কেবল একটী পুরাণে আছে, তাহা নহে, সকল পুরাণেই ইহার উল্লেখ দেখা যায়। শৈব নীলকণ্ঠ,

সায়ণ মাধব প্রভৃতির নাম সকলেরই জানা আছে। ইঁহারা যে পুরাণের টীকা রচনা করিয়াছেন। তাহাতে তন্ত্রগ্রন্থ হইতে অনেক প্রমাণ উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়াছেন। আরও দেখা যায় যে, হৃল্লেখা মন্ত্র, যাহা সাধারণতঃ তন্ত্রের নিজস্ব বলিয়া সকলে মনে করেন। উহা ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। যদি তাহা হয়, তবে তন্ত্রের উৎপত্তি কবে হইল, এ সমস্যার ভঞ্জন কে করিবেন? এমন পুরাণ নাই, যাহাতে মন্ত্রের উল্লেখ নাই। যাহাকে তন্ত্র বলা যায়, উহাই ত মন্ত্রশাস্ত্র। তাহা হইলে এই বুঝিতে হইবে, যখন মন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে, মন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তিও সেই সঙ্গে সঙ্গেই হইয়াছে।

হারিত সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—"শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকাতি চ।" মেদিনীকোষও এই কথার সমর্থন করিয়াছেন।

সুতরাং তন্ত্রের সময় নির্দ্দেশ করার চেষ্টা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের সমস্ত শাস্ত্র আয়ত্ত না করিয়া একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে বাতুলতার কার্য্য হইবে। আমাদের এখন পল্লব গ্রাহিতার যে প্রকোপ হইয়াছে, সেই পল্লব গ্রাহিতাকে মূলধন করিয়া যাহারা একাজে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাঁহারা বিদ্বৎসমাজে যে নিন্দনীয় হইবেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই সকল মতের পোষকতা করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশের অনেকের বিশ্বাস যে, ম্যাক্সমুলার সাহেব নিরপেক্ষভাবে আমাদের শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। কিন্তু তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল—খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সাহায্য করা। একথা তিনি তাঁহার গ্রন্থে স্পষ্টই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সাহায্যকল্পেই বেদের প্রচার আবশ্যক। একথা তিনি একাধিক বার বলিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ জ্ঞান, তাহা "টেইন্" সাহেব নামে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ফরাসী গ্রন্থকার বিশদরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমরা এখনও মনে করি যে, ম্যাক্সমূলার সাহেব আমাদের মঙ্গলের জন্য, আমাদের ধর্ম্মের সত্য প্রকাশের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এরূপ ভ্রম ধারণা সকল যখন দূর হইবে, তখনই প্রকৃতপক্ষে দেশের কল্যাণ বুঝিতে হইবে।

বাঙ্গলা ভাষায় এঞ্জিনিয়ারিং-য়ের প্রতিশব্দ রচনা।

শ্রীযুক্ত শিব প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, এম-ই, ই,

কলিকাতার Association of Enginees-য়ের নাম দেশীয় এঞ্জিনিয়ারদিগের অবিদিত ত নয়-ই; এমন কি যাঁহারা এঞ্জিনিয়ার নন এমন লোকের মধ্যেও অনেকে জানেন। বড়ই আনন্দের বিষয় যে, সেই এ্যাসোসিয়েশন্ অফ্ এঞ্জিনিয়ারস্ তড়িৎ শিল্প ও তাহার আনুসঙ্গিক বৈজ্ঞানিক শব্দ সকলের বাঙ্গালা পরিভাষা রচনা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রশংসার্হ উদ্যমের ফলের এক স্তবক, তাঁহারা তাঁহাদের সমিতির মুখপত্রের (The journal of the

Association of Engineers) বর্ত্তমান বর্ষের জুন সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন, ও তাহাতে তাঁহাদের দেশবাসী সাধারণকে উহার সমালোচনা করিবার জন্য সাদরে আহ্বানও করিয়াছেন। এঞ্জিনিয়ারগণের সমিতি হইতে এঞ্জিনিয়ারিং শব্দের পরিভাষা রচনার এই প্রচেষ্টা যে সঙ্গতই হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য, কেন না, বিশেষজ্ঞ হিসাবে বঙ্গদেশে একমাত্র তাঁহারাই এমন বিষয়ের পরিভাষা রচনা করিবার যোগ্যতা ও অধিকার রাখেন। আর এ প্রচেষ্টা অতি সময়োচিতও হইয়াছে। কারণ বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রদান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া এখন গৃহীত হইয়াছে; তাই ইহার দ্বারা মাতৃভাষায় এঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধীয় উচ্চশিক্ষা প্রদানের যথেষ্ট সহায়তা হইবে। আশাকরি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এই সমিতিকে এ সাধু প্রচেষ্টায় যথাসম্ভব সহায়তা করিবেন।

পরিভাষার মুখবন্ধের মধ্যে একথা উক্ত হইয়াছে যে, গঠনমূলক সমালোচনাই যেন সাধারণে করেন, একথাটি ভাল হয় নাই, "ওটি চলিবেনা" কেবল মাত্র এরূপ কথা বলিয়াই যেন তাঁহারা ক্ষান্ত না হন। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। বিষয়টি শিল্পবিদ্যা (engineering) সংক্রান্ত পরিভাষা রচনা;—সুতরাং ইহার সমালোচনা করিতে হইলে তদুপযুক্ত বিশেষজ্ঞের জ্ঞানের আবশ্যক করে। কিন্তু তেমন জ্ঞান সকলের যে নাই তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণের নিকট হইতে বিশেষ কিছুর প্রত্যাশা কত দূর করা যাইতে পারে, তাহা বিবেচ্য। সে হিসাবে আমরাও যে কি করিয়া উঠিতে পারিব বলিতে পারি না। তবে এবিষয়ে চিন্তার ফলে যে কথাগুলি মনে উঠিয়াছে, নীচে তাহারই আভাষ দিতেছি সাধারণে বিচার করিয়া দেখিবেন। কথাগুলি এই :—

প্রথম কথা,—

প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক শব্দেরই পারিভাষিক প্রতিশব্দ দেওয়া যাইবে কি ?—না, বহুল ব্যবহারের ফলে যে সকল ইংরাজী শব্দ কথিত ভাষার মধ্যে ইতিমধ্যেই আপনার স্থান অর্জ্জন করিয়া লইয়াছে, সে সকলকে যথাযথ রাখিতে দেওয়া যাইতে পারে? আমাদের মনে হয় এই সমস্যার মীমাংসা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক। এখানে যে মতবিরোধ হইবার একান্ত সম্ভাবনা, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। অনেকেই হয়ত প্রত্যেক শব্দেরই প্রতিশব্দ দিতে চাহিবেন; তাঁহারা বলিবেন, ইহাতেই ভাষা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। একথা কতকটা ঠিক! কিন্তু এবিষয়ে অন্যপক্ষের উক্তিও নিতান্ত যুক্তিহীন নহে। ইঁহাদের মতে প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রতিশব্দ রচনা করিবার চেষ্টা,—আর ভাষাকে সমৃদ্ধ করিতে গিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহাকে ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলা, একই কথা। ইঁহারা বলিবেন, কেবল মাত্র শব্দ-সংখ্যার বহুলতাতেই কোন ভাষার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পায় না। সে সকল শব্দ বড় একটা ব্যবহারে আসিবার সম্ভাবনা নাই তেমন শব্দ ভাষার অভিধানে থাকা আর না থাকা একই কথা। যে সকল প্রতিশব্দ রচিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে বহু শব্দ কার্য্যক্ষেত্রে কখনও ব্যবহৃত হইবে কি? ইঁহাদের উক্তিও যে যুক্তিযুক্ত, তাহা বিবেচক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এই কথাটি আমাদিগকে বিশেষ করিয়া ভাবিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা,—

পারিভাষিক শব্দগুলি সাধুভাষা-সঙ্গত হইবে,—না চলিত ভাষা-সঙ্গত হইবে? বাঙ্গালায় লিখিত ও কথিত ভাষার মধ্যে প্রভেদ বিস্তর; তাই সাধুভাষায় রচিত পারিভাষিক শব্দগুলি কথিত ভাষার পক্ষে যেমন অশোভন হইবে, শব্দগুলি কথিত ভাষার উপযোগী করিয়া রচনা করিলে লিখিত ভাষার পক্ষে তেমনি অব্যবহার্য্য হইবে। যদি একথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তবে প্রত্যেক শব্দেরই একাধিক প্রতিশব্দ দেওয়া অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু তাহাতে ভবিষ্যৎ ইঞ্জিনিয়ারকে একটির স্থানে তিন করিয়া শব্দ আয়ত্তে রাখিতে হইবে।—এখন কোন্ প্রথা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়?

তৃতীয় কথা—

আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, units and measures ঘটিত শব্দগুলি যথাযথই থাকিবে; কেন না তাহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পাউণ্ড, টন, ভোল্ট,—এসকলের ত প্রতিশব্দ হইতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞানে যে সকল সাঙ্কেতিক অক্ষরের নিয়ত ব্যবহার হয়, (যেমন অক্সিজেন—"O", কার্ব্বন—"C" কারেণ্ট—"I", টাইম—"T", ইত্যাদি,) সে সকল **সঙ্কেতিক অক্ষরেরও কি বাঙ্গালা অক্ষর সৃষ্টিকরা হইবে?** এই বিষয়টি অতি গুরু; কেননা ইহারই উপর নিম্নোক্ত বিষয়টি নির্ভর করিতেছে।

চতুর্থ কথা—

Formula গুলি কিভাবে লেখা হইবে?

কথাটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক।

ইংরাজীতে Kinetic energyর formula— $\frac{mv^2}{2}$

ইহাকে আমরা কেমন করিয়া লিখিব?

$\frac{mv^2}{2}$, না— $\frac{\text{মভ}^2}{২}$, না— $\frac{mv^2}{2}$, না— $\frac{\text{মভ}^3}{২}$?

আর একটা উদাহরণ লওয়া যাউক।

মনে করুন, $\frac{E \times 10^8}{4 T N}$,— একটা formula.

ইহাকে কিরূপে লিখিব?— $\frac{\text{ই} \times ১০^৮}{৪ \text{ট} \times \text{ন}}$ না— $\frac{E \times ১০^৮}{৪ T N}$?

সেইরূপ —E.I. cos 30° কে E.I. কস ৩০° লিখিব?—না ই-×আই×কস৩০° লিখিব? না—E.I. কস ৩০° লিখিব? না E.I. কো-জ্যা ৩০° লিখিব?—ইত্যাদি।

পঞ্চম কথা—

পরিভাষার শব্দগুলি কোন ব্যাকরণসঙ্গত হইবে কি না এবং রচনার একটা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে কি না!

সর্ব্বশেষে মনে রাখিতে হইবে, পরিভাষা প্রণয়নের ফলে আমরা যেন বৈজ্ঞানিক জগৎ হইতে বিচ্যুত-সম্বন্ধ হইয়া না পড়ি। এই আলোচনায় বর্ত্তমানে আমরা নিজেদের অভিমত প্রদান করিতে বিরত থাকিলাম। এসম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট আলোচনা হয়, ইহাই উদ্দেশ্য। পরে আমরা আমাদের মতামত পত্রস্থ করিব।

———

প্রশ্নোত্তরী

প্রঃ।—নেতি নেতি বিচারটা কিরূপ?

উঃ।—যেমন এক গৃহস্থের বাটীতে নূতন জামাই এসেছে। বাহিরে জামাই ও বহু লোক বসিয়া আছে। দোতালার ঘরে জানালায় কন্যার সমবয়স্কারা কন্যাসহ সমবেত হইয়াছে। তাহারা ইতিপূর্ব্বে জামাতাকে দেখে নাই তাই জামাই কোন্‌টী জানার জন্য কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ঐটী কি জামাই? মেয়ে বলিল—না। তবে কি ঐটী? মেয়ে বলিল—না। তবে কি ঐটী? মেয়ে বলিল—না। এইরূপে এ না, ও না, সে না করিতে করিতে যখন শেষে জামাইর দিকে আঙ্গুলি দিয়া বলিল ঐটী জামাই? তখন কন্যা হাসিল। সমবয়স্কারা জানিল ঐ জামাই। তারাও হাসিল ও আনন্দে মাতিল।

এইরূপেই ন ইতি ন ইতি করিয়া অবশেষে ব্রহ্মনিরূপণ হয় ও আনন্দও হয়।

অথবা যেমন এক লম্বা হল ধরে বহু তক্তপোষে বহু ব্যক্তি শয়ান আছে। ঘরটী আঁধার। ঐ সকলের মধ্যে এক ছিন্নবাহু ব্যক্তিও ছিলেন। ঐ ছিন্ন বাহু ব্যক্তিকে প্রয়োজন বলিয়া একজন লোক আসিল; সে একটী লণ্ঠন নিয়া নিঃশব্দে প্রত্যেক তক্তপোষে শায়িত ব্যক্তিকে দেখিতে লাগিল ও এ নয়, এ নয়, এ নয় বলিয়া অগ্রসর হইতে হইতে যখন ক্রমে সেই ছিন্নহস্ত ব্যক্তিকে দেখিল—সে আর অগ্রসর হয় না। তার কার্য্য শেষ হইয়াছে তার অন্বেষিতব্য মিলিয়াছে। ব্রহ্ম বা আত্মাও এইরূপে নিরূপিত হয়। তাহাকেই নেতি নেতি বিচারে অগ্রসর হওয়া বলে।

প্রঃ।—নেতি নেতি বিচারে ব্রহ্মান্বেষণ কিরূপ হয়?

উঃ।—এই নেতি নেতি বিচারে ব্রহ্ম বা আত্মান্বেষণ করিতে গিয়া বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত এই—

১। কোন মতাবলম্বী "আত্মাবৈ পুত্র নামাসি" এই শ্রুতি মূলে পুত্রকেই আত্মা বলেন। তাঁদের যুক্তি এক দীপ হইতে যেমন অপর দীপ উৎপন্ন হয় তেমনি পুত্র পিতৃ দেহোৎপন্ন বীর্য্যজাত। পুত্রের ধন বিদ্যা যশে পিতার মুখোজ্জ্বল হয়। পিতার ধর্ম্ম কর্ম্মাদি পুত্র প্রবাহরূপে নির্ব্বাহ করিয়া একতা সম্পাদন করে। পুত্রকৃত শ্রাদ্ধদানাদি জন্য পিতার স্বর্গাদি লোক লাভ হয়। অতএব পুত্রই আত্মা। পিতার চেহারা রূপ গুণ ব্যামোহাদি পর্য্যন্ত পুত্রে অর্শে। কাজেই পুত্র আত্মা।

২। অপর পক্ষ বলেন ইহা সত্য হইতে পারে না। পিতার ভোগ পুত্র পায় না পুত্রের ভোগ পিতা পায় না। গরীবের ছেলে ধনী ও ধনীর ছেলে গরীব হয়, মূর্খের পুত্র বিদ্বান হয় ও বিদ্বানের পুত্র মূর্খ হয়। পুত্রের দেহ অসুস্থ হইলে পিতার দেহ অসুস্থ হয় না, পিতার দেহ বিকৃত হইলে পুত্রের দেহ সেই সময়ে বিকৃত হয় না। এক আত্মা হইলে পিতার মৃত্যুতে পুত্রেরও মৃত্যু হওয়া উচিৎ। পিতার আহার্য্য গ্রহণে পুত্রের তৃপ্তি হওয়া উচিৎ; কই, তাহাত হয়না। অতএব পুত্র আত্মা নহে। বিশেষ জীবাত্মা "আমি সংজ্ঞক যাহা" যাহা "আমার" শব্দে বিশেষিত, তাহা "আমি" নহে। যেমন আমার গৃহ আমার বস্ত্র আমার অঙ্গুরীয় "আমি" হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ "আমার পিতা" "আমার পুত্র" সকলেই অনুরূপ বলিয়া থাকে। এজন্যও আমার পুত্র আমি হইতে ভিন্ন। ঘট দ্রষ্টা

ঘট হইতে ভিন্ন ; পিতা পুত্রের দ্রষ্টা, পুত্র হইতে ভিন্ন। দুর্ভিক্ষাদি কালে পিতা পুত্র বিক্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করে রাত্রিকালে শয়ন গৃহে অগ্নি লাগিলে প্রাণ রক্ষার্থ পিতা পুত্রকে ত্যাগ করিয়া বাহিরে চলিয়া যায়। প্রতিকুল হইলে পুত্র পিতাকে বা পিতা পুত্রকে বধ করে। শ্রুতিতে যে পুত্রকে আত্মা বলা হইয়াছে উহা মুখ্যার্থে নহে, গৌণ অর্থবাদ মাত্র। অন্ন ধনাদির ন্যায় পুত্রও প্রীতিপ্রদ ও বার্দ্ধক্যে অবলম্বন ; তাই ঐ বাক্যদ্বারা পুত্রস্তুতি করা হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ পুত্র আত্মা নহে। এই দেহই আত্মা। আমি গৌর, আমি কৃশ, আমি খাইতেছি আমি বলিতেছি—এই সকল কথা এই দেহকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হয়। আমি বাচক আত্মা পুরুষ এই দেহই অন্নরসময়। অন্ন পচিত হইয়া বীর্য্যাকারে পরিণত হয় তাহা অন্নাদি বিকারে বর্দ্ধিত হইয়া দেহে পরিণত হয়। শ্রুতিতেও পাওয়া যায় "এষ পুরুষোঽন্নরসময়" ইতি অর্থাৎ এই পুরুষ অন্নরসপুষ্ট। অতএব দেহই আত্মা। ইহা চার্ব্বাক্ বা লোকায়ত মতবাদ। (ক্রমশঃ)

স্বামী মহাদেবানন্দ জি।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা যত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপনির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রণালী -যাহা ভারতের সাধনা'র এক বিশেষ লক্ষ্য—সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচনা-সাপেক্ষ।]

পাঞ্চরাত্র মত ও শঙ্করাচার্য্য—খণ্ডন মণ্ডনের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর

[শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্য্যের সময় সংক্রান্ত]

ভারতের সাধনার গত পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় আচার্য্য নিম্বার্কের সময় সংক্রান্ত খণ্ডন মণ্ডনের প্রতিবাদের যে প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহার প্রত্যুত্তরে এই কথা গুলি বলিতে চাই :—

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়কে আমি যথার্থ পণ্ডিত বলিয়াই মনে করি এবং পণ্ডিত বলিয়াই তিনি সকলের কাছে পরিচিত কাজেই আমি স্থানে স্থানে তাঁহাকে "পণ্ডিত প্রবর" বলিয়াছি ; তাহা তিনি কেন উপহাস বলিয়া মনে করিলেন তাহা জানি না ; ইহা আমার দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে। আমি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়কে কোন স্থানে "অপ্রকৃতিস্থ" বলি নাই। আমি লিখিয়া ছিলাম :—'যদি 'আধুনিক' সিদ্ধ মহাত্মা দিগের দেবদর্শন মিথ্যা বলিয়া রাজেন্দ্র বাবুর মত হয় তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে অন্ততঃ বহু শত বর্ষ হইতে প্রচলিত সিদ্ধ এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের—যাহাতে বহু সিদ্ধ পুরুষ পর পর হইয়া গিয়াছেন—তাহার প্রবর্ত্তক আচার্য্যকে, কেবল মাত্র রাজেন্দ্র বাবুর অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা কখনই প্রকৃতিস্থ লোকের পক্ষে সম্ভব

হইবে না। ইহার উপর ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন যে "এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ইহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক কথা। যে যাহা বলে না, তাহাকে সে তাহা বলিয়াছে বলিলে সত্য উদ্ঘাটনের কি সহায়তা হইতে পারে? শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবুর নিকট এরূপ কথা আমরা আশা করি না।" তাহার পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছেন যে "প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য, আমি দোষারোপ করিলাম কোথায়? সিদ্ধ মহাত্মার দর্শন বলিলে কি দোষারোপ করা হয়? তাহাকে কি মিথ্যা দর্শন বলা হয়?" ইত্যাদি। আমি তাঁহার মূল উক্তির (অর্থাৎ "অতএব এই নারদ দর্শন, আজ কালও সিদ্ধ মহাত্মারা যে রূপ দেবতাদি দর্শন করিয়া থাকেন তদ্রূপই"।) আশয় ঠিক ধরিতে পারি নাই বলিয়াই সব রক আশয় কল্পনা করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ তিনি মনে করিয়াছেন যে আমি তাঁহাকে "অপ্রকৃতিস্থ" বলিয়াছি।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় নিম্বার্ক ভাষ্যের যে ব্যাসানুসারিতা নাই তাহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে তাঁহার প্রতিপাদ্য ছিল যে আচার্য্য শঙ্কর ব্যতীত অন্য কোনও আচার্য্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্যাসদেব বা তাঁহার উপদেষ্টা গুরু স্থানীয় কোন ঋষির দ্বারা উপদিষ্ট হন নাই, কাজেই একমাত্র শঙ্কর ভাষ্যেরই ব্যাসানুসারিতা আছে, অপর ভাষ্যের নহে। এই প্রসঙ্গেই তিনি আধুনিক সিদ্ধ মহাত্মার দেবদর্শনের কথা তুলিয়াছেন। কাজেই আমাদের মনে হইয়াছিল তাঁহার উক্ত উক্তির আশয় যে ভগবান নিম্বার্কাচার্য্যের নারদ দর্শন বা নারদ উপদেশ মিথ্যা। আমার প্রতিবাদের প্রতিবাদে যখন তিনি স্বীকার করিতেছেন যে নিম্বার্কাচার্য্যের নারদ দর্শন সত্য তখন তাঁহার সহিত আমাদের কোন মতবিবাদ নাই। আমরা মনে করি ব্রহ্মার মানস পুত্র দেবর্ষি নারদ যেমন ত্রেতায় বাল্মীকিকে রামায়ণ উপদেশ দিয়াছেন এবং দ্বাপরে ও কলির প্রারম্ভে মরধামে অবতীর্ণ হইয়া ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, আজও তেমনি ভক্তবাঞ্ছা পূরণের জন্য ভক্তকে দেখা দিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ দিতে পারেন। এই নারদ দর্শনের সহিত কালের কোন সম্বন্ধ নাই। জন্মেজয়ের সময় জন্ম গ্রহণ করিলেও যেমত নারদ দর্শনের সম্ভাবনা থাকে আজ জন্ম গ্রহণ করিলেও তেমনি নারদ দর্শনের সম্ভাবনা থাকে। জন্মেজয়ের সময়ও আর নারদের জন্ম সময় নয়। নিম্বার্ক ভগবানের নারদ দর্শন সত্য হইলে নারদ ভগবান তাঁহার গুরু হইবার পক্ষে কোন অন্তরায় দেখা যায় না। যখন তিনি আপনাকে নারদের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেন এবং তৎসম্বন্ধে যখন তাঁহার সমসাময়িক কেহ আপত্তি করেন নাই তখন সেটা সত্য বলিয়াই ধরিয়া লওয়া উচিত। ভগবান নিম্বার্ক যে নারদ-শিষ্য ইহা শাস্ত্র সঙ্গত এবং তাহা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয়ের উদ্ধৃত পৌরাণিক শ্লোক হইতেই প্রমাণ হয়। আর এই প্রসঙ্গে ইহা মনে করিতে হইবে যে আচার্য্য নিম্বার্ক, যে সময়েই তাঁহার অভ্যুদয় হউক, তিনি ত একসময়ে ছিলেন এবং তাঁহার ভাষ্যও একসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন ত কোন সম্প্রদায়ই তাঁহার নারদ শিষ্যত্ব অস্বীকার করেন নাই। ভারতের এক সম্প্রদায় যখন অপর সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডনে এতই ব্যস্ত তখন এটা যদি মিথ্যাই হইত তাহা হইলে এই উক্তির মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিয়া তাঁহার সম্প্রদায়কে কেন ছোট করিয়া দেন নাই তাহা বুঝা যায় না। সুতরাং ভগবান সনৎকুমারের উপদিষ্ট ভগবান নিম্বার্কাচার্য্যের ব্যাসানুসারিতা আছে ইহাই বলিতে হ? এবং ভগবান সনৎকুমারের মত ও ব্যাসের মত যে ভিন্ন [illegible] তাহা রাজেন্দ্র বাবুও স্বীকার

করেন। আমাদের মনে হয় কোন ভাষ্যের ব্যাসানুসারিতা আছে কিনা তাহার একমাত্র প্রমাণ উপনিষদ ও গীতা প্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্রের সম্বন্ধ। উপনিষদ বাক্যের সহজ ও সরল অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক যে ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় তাহাই বেদান্তের প্রতিপাদ্য। কিম্বদন্তির উপর নির্ভর করিয়া ব্যাসানুসারিতা বিচার করিতে হইলে সে বিচার কোন দিনই শেষ হইবে না। সকল সম্প্রদায়ের কিম্বদন্তি আছে এবং পিছনে শাস্ত্র প্রমাণ আছে। যাহাই হউক আমার গতবারকার উক্তির জন্য যদি রাজেন্দ্র বাবু কোন ব্যথা পাইয়া থাকেন, তাহা অপনোদনের জন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

রাজেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রতিবাদে নিম্বার্কাচার্য্যের কোন কাল নির্দ্দেশ করেন নাই। কখন তিনি বলিয়াছেন যে তিনি শ্রীরামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বে, আবার কখন প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে তিনি শ্রীমধ্বাচার্য্যের পরে। শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্যের যে তিনি পরে তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি ভারতের সাধনার ১৮৬ পৃষ্ঠায় পদ্ম পুরাণ হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ঐ শ্লোকগুলি যে ক্রম নির্দ্দেশক নহে তাহা ভবিষ্য পুরাণোক্ত শ্লোক হইতে জানা যায়:—

বিষ্ণুস্বামী প্রথমতো নিম্বাদিত্যো দ্বিতীয়কঃ
মধ্ব্যাচার্য্য স্তৃতীয়স্তু তুর্য্যো রামানুজ স্মৃতঃ।

এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তাঁহার সম্পাদিত বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসে লিখিয়াছেন "এস্থলে দেখিতে পাই নিম্বাদিত্য বিষ্ণু স্বামীর পরবর্ত্তী এবং মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। মধ্বাচার্য্যের স্থিতি কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ; সুতরাং নিম্বার্কাচার্য্যের স্থিতি কাল একাদশ শতাব্দী গ্রহণ করা সুসঙ্গত।······রামানুজাচার্য্য দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন নিম্বাদিত্য তৎপূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং তাঁহার স্থিতি কাল ১১ শ শতাব্দী গ্রহণ করা সমীচীন।"

তাঁহার দ্বিতীয় কথা যে শ্রীমদ্ মধ্বাচার্য্য তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ২১টী ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য বা বৃত্তি দেখিয়াছিলেন ইহা তাঁহার জীবন চরিতে দেখা যায়। অথচ রামানুজ ভাষ্য বা বেদার্থসার সংগ্রহে যে সব প্রাচীন আচার্য্যের ভাষ্যাদির নাম আছে, তাহাদের সকলের নাম তিনি করিতেছেন না। ইহাতে মনে হয়—তাঁহার সময় বহু প্রাচীন ভাষ্য লুপ্ত হইয়াছিল বা তিনি তাহার সন্ধান পান নাই। পক্ষান্তরে আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের সময়ের মধ্যে যে সব নূতন ভাষ্যাদি হইয়াছে, তাহাদের অনেকের নাম আছে। এ স্থলে কি শঙ্করাচার্য্য, কি রামানুজাচার্য্য, কি মধ্বাচার্য্য কেহই নিম্বার্ক-ভাষ্যের নাম করিতেছেন না। অথচ নিম্বার্ক ভাষ্যটী রামানুজ বা মাধ্বভাষ্যের ন্যায় অদ্বৈত বিরোধী বৈষ্ণব মতের ভাষ্য। এই জন্য অনেকে অনুমান করেন নিম্বার্ক ভাষ্য মাধ্বভাষ্যেরও পরবর্ত্তী। রাজেন্দ্র বাবুর এই উক্তি হইতে জানা যায় যে রামানুজাচার্য্য যে সকল ভাষ্য দেখিয়াছিলেন তাহার কতক গুলি মধ্বাচার্য্য দেখিতে পান নাই। অথচ দুই আচার্য্যের সময়ের ব্যবধান ২০০ শত বা ২৫০ শত বৎসর। রাজেন্দ্র বাবু রামানুজাচার্য্যের জন্মকাল ৯৪০ শকাব্দ বলিয়া মনে করেন; উহা খৃষ্টাব্দে পরিণত করিলে ৯৪০+৭৮=১০১৮ খৃষ্টাব্দ হয়। ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয় যে পূর্ব্বকালে সকল আচার্য্যের ভাষ্যের কথা সকল আচার্য্য অবগত থাকিতেন না। এবং অবগত থাকাও সম্ভব ছিল না। আচার্য্য শঙ্কর বা রামানুজ যাঁহাদের প্রচারের ভাবটা খুব বেশী ছিল তাঁহাদের ভাষ্যের কথাই সকলে অবগত ছিলেন। সুতরাং নিম্বার্কভাষ্যের কথা মধ্বাচার্য্যের ভাষ্যে উল্লেখ না থাকায়

তিনি যে তাঁহার পরে তাহা প্রমাণিত হয় না। পরন্তু হেমাদ্রি উদ্ধৃত ভবিষ্য পুরাণের নিম্নের শ্লোকের দ্বারা ইহা নিশ্চিত রূপে প্রমাণ হয় যে তিনি হেমাদ্রির পূর্ব্বে ছিলেন। শ্লোকটী এই :—

"উদয়ব্যাপিনীগ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপধান।
নিম্বার্কো ভগবানেষাং বাঞ্ছিতার্থ ফলপ্রদঃ॥

হেমাদ্রির অভ্যুদয় কাল ত্রয়োদশ শতাব্দী। সুতরাং নিম্বার্কাচার্য্যের অভ্যুদয় কাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে ঐ শ্লোক ভবিষ্য পুরাণে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে ভবিষ্য পুরাণে উক্ত শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইবার সম্ভাবনা অল্প। যাহাই হউক নিম্বার্কাচার্য্য যে হেমাদ্রির পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। দুই জন নিম্বার্কাচার্য্যের কল্পনা বিচার-সহ নহে। কারণ ব্রত উপবাসের তিথি নিরূপণ আজও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে উক্ত মতানুসারে হইয়া থাকে। এবং সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক অপর নিম্বার্কের কথা কেহ অবগত নহেন। রাজেন্দ্র বাবু হেমাদ্রি গ্রন্থে উক্ত শ্লোক কেন পাইলেন না তাহা আমরা বুঝিলাম না। তিনি যে দিন অনুমতি করিবেন আমরা এসিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিত হেমাদ্রি গ্রন্থে উক্ত শ্লোক তাঁহাকে দেখাইয়া দিয়া আসিব। কাজেই তিনি যে মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্বে তাহা নিশ্চিত। শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজচার্য্যের পর যে সকল নূতন ভাষ্য হইয়াছে তাহার অনেকের নাম মধ্বাচার্য্য করায় এবং নিম্বার্ক ভাষ্যের নাম না করায় ইহাই মনে হয় নিম্বার্ক ভাষ্যের কাল আচার্য্য শঙ্করের কালেরও পূর্ব্বে।

রাজেন্দ্র বাবু বেদান্ত সূত্রের ২।২।১১ সূত্রের নিম্বার্ক ভাষ্য ও রামানুজ ভাষ্য হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে উভয় ভাষ্যের মধ্যে ঐক্য আছে। কাজেই নিম্বার্ক রামানুজের পরবর্ত্তী। কিন্তু ঐ যুক্তির দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইতে পারে যে রামানুজাচার্য্য নিম্বার্কাচার্য্যের পরবর্ত্তী। রাজেন্দ্র বাবু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে নিম্বার্ক ভাষ্য "সংযত, সংক্রান্ত ও সারগর্ভ, রামানুচার্য্যের ভাষ্য সেরূপ নহে।" অর্থাৎ নিম্বার্ক ভাষ্য বৃত্তিগুণসম্পন্ন এবং রামানুজভাষ্য ভাষ্য-গুণসম্পন্ন। আমরা জানি যে আগে সূত্র, তৎপরে বৃত্তি এবং তাহার পর ভাষ্য। এই যুক্তি দ্বারা আচার্য্য রামানুজের কাল আচার্য্য নিম্বার্কের পরেই হয়।

আমরা আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধে আচার্য্য নিম্বার্কের কাল নির্দ্দেশ করি নাই। কারণ ইতিহাস-সম্মত তাঁহার কাল নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। তবে যে সকল সামান্য প্রমাণ আমরা পাইয়াছি তাহাতে আমাদের মনে হয় তিনি বসুবন্ধুর পরে এবং কুমারিলের পূর্ব্বে। বেদান্ত দর্শনের ইতিহাসের ৩৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে "ধ্রুবক্ষেত্রে যে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গদি আছে, তাহার মোহান্ত আপনাকে নিম্বার্ক বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। নিম্বার্কের নিয়মানন্দ নাম দেখিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া বোধ হয়। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মতে নিম্বার্কের অবস্থিতি কাল পঞ্চম শতাব্দী। ধ্রুব ক্ষেত্রের গদি অন্ততঃ ১৫০০ বৎসর কালের অধিক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এইরূপ তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন। বাস্তবিক এই নির্দ্দেশ অসঙ্গত। ৺অক্ষয় বাবু ইহা অত্যুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবশ্যই নিম্বার্কাচার্য্যের কাল নির্ণয় নিতান্ত দুরূহ। কেন যে অত্যুক্তি তাহা স্বামীজী বলেন নাই। উক্ত উক্তির সত্যাসত্য নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। যদি নিম্বার্ক ভাষ্যে এমন কোন কথা থাকে যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি কুমারিল বা শঙ্করের পরে

তাহা হইলে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের উক্ত দাবী অগ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য। নচেৎ অন্য উপায় না থাকায় উক্ত দাবী গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য। রাজেন্দ্র বাবু দেবাচার্য্যের যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই কাল সত্য বলিয়া ধরিলে রাজেন্দ্র বাবুর গণনা অনুসারে নিম্বার্কাচার্য্যের কাল ৮০৩ খৃষ্টাব্দ হয়। এবং "টাট্টি" নামক স্থানে যে গুরুপরম্পরা রক্ষিত আছে তাহা যথার্থ ধরিলে তাঁহার অভ্যুদয় কাল ২২১ খৃষ্টাব্দ হয়। অবশ্য কোনটার দ্বারাই নিশ্চিত রূপে স্থির হয় না যে কোন সময়ে তাঁহার অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাঁহার সময় নির্ণয়ের একমাত্র উপাদান তাঁহার রচিত ভাষ্য। আমাদের বিশ্বাস নিম্বার্ক ভাষ্য ও শঙ্কর ভাষ্যের আলোচনার দ্বারা নিম্বার্কাচার্য্যের সময় নির্ণয় করা যাইতে পারে। রাজেন্দ্র বাবু ১।১।৪ সূত্রের নিম্বার্ক ভাষ্য হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন : "এই বাক্যদ্বয় দেখিলে মনে হয়, গৌরপদ, কুমারিল, ভর্তৃহরি,মণ্ডন মিশ্র ও শঙ্করাচার্য্যের সময়, পূর্ব্ব মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনের মধ্যে যখন ঘোর মল্লযুদ্ধ চলিতেছে ইহা তখনকার কথা। যেহেতু শঙ্কর, বাৎস্যায়ন, ব্যাস, পাতঞ্জলি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষ্যে এভাবের কথা নাই। এতদ্ভিন্ন 'বালভাষিতম্' পদটী এস্থলে এতদর্থে একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। আর 'উপনিষদ' পদটী একদেশী বেদান্তী ভর্তৃহরি এবং গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়ে একটু বিশেষভাবে এই কথায় প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা অভিজ্ঞগণ অবগত আছেন। এইজন্য মনে হয় নিম্বার্ক ভাষ্য ইহাদের পরবর্ত্তী। অবশ্য এতদ্দ্বারা নিশ্চয়তা সহকারে ইহা বলা যায় না বটে, কিন্তু ইহাতে যে একটা সম্ভাবনা সূচিত করে, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন।" আমরাও স্বীকার করি যে এই বাক্যটী যখন লেখা হয় তখন পূর্ব্ব মীমাংসক ও বেদান্তীদের ভিতর ঘোর মল্লযুদ্ধ চলিতেছে। সেই যুদ্ধ শেষ হইয়াছিল আচার্য্য শঙ্করের সময়। কুমারিল তখন প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—মণ্ডন মিশ্র সুরেশ্বরাচার্য্য নাম গ্রহণ পূর্ব্বক আচার্য্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রভাকর পরাজিত। কিন্তু নিম্বার্কভাষ্যে যখন উক্ত উক্তির সন্নিবেশিত হয় তখন পূর্ব্ব মীমাংসকেরা পরাজিত হন নাই, "বালভাষিতম" পদটী ইহাই সূচিত করে। রাজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে "ঔপনিষাদানাং সিদ্ধান্ত" এই কথাটী লক্ষ্য করবার বিষয়। নিম্বার্ক ভাষ্যে আছে—"তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বাচিন্ত্যশক্তি বিশ্ব জন্মাদি হেতু বৈদেকগম্যঃ সর্ব্ব ভিন্নাভিন্নো ভগবান্ বাসুদেবো বিশ্বাত্মৈব জিজ্ঞাসা বিষয় স্তত্রৈব সর্ব্বং শাস্ত্রং সমন্বেতা ত্যৌপনিষাদানাং সিদ্ধান্তঃ।" নিম্বার্ক ভাষ্য রচনার সময় উত্তর মীমাংসক দিগের নাম ছিল 'ঔপনিষদঃ"। তখন তাঁহারা অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত হন নাই। তাঁহাদের মধ্যে সিদ্ধান্তের কিছু কিছু ভিন্নতা থাকিলেও উপনিষদ যে বেদের সার অংশ তাহা উপদেশ দিতেন। এই বাক্যদ্বারাও প্রমাণ হয় আচার্য্য নিম্বার্ক আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্বে। কত পূর্ব্বে—তাহা বলা কঠিন। সেইজন্য আমরা তাঁহার কাল নির্ণয় করি যে—তিনি বসুবন্ধুর পরে এবং আচার্য্য শঙ্করের পূর্ব্বে।

আচার্য্য শঙ্করের পরে তাহারঅভ্যুদয় হইলে তিনি শঙ্কর মত খণ্ডনের অন্ততঃ চেষ্টা করিতেন প্রথম শঙ্কর মত খণ্ডনের প্রচেষ্টা দেখা যায় নিম্বার্কাচার্য্যের বার পুরুষ অধস্তন দেবাচার্য্যে। যদি কেহ মনে করেন যে শঙ্কর মত খণ্ডন করিতে পারা যায় না বলিয়া তিনি খণ্ডনের প্রয়াস করেন নাই, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ "পরপক্ষ গিরিবজ্র" গ্রন্থ পাঠ করিতে বলি। তত্ত্বমুক্তাবলীতে শ্রীমন্মধ্যাচার্য্য মায়াবাদের এক শত দোষ দেখাইয়াছেন কিন্তু "পরপক্ষগিরিবজ্রে,

মায়াবাদের তিন শতেরও অধিক দোষ দেখান আছে। শ্রীনিবাসাচার্য্যের ভাষ্যেও শঙ্কর মত খণ্ডন দেখা যায় না। সুতরাং ইহা দ্বারাও প্রমাণ হয় যে শুধু নিম্বার্কাচার্য্য নহে শ্রীনিবাসাচার্য্যও শঙ্করের পূর্ব্বে। দেবাচার্য্যের ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য ও শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য ব্যতীত অন্য আচার্য্যের নাম না থাকায় তাঁহারা যে সমসাময়িক এই যুক্তির সারবত্তাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। নিম্বার্ক ভাষ্যে যে সকল বচন উদ্ধৃত আছে তাহার অধিকাংশই দ্বাদশ উপনিষদ হইতে। স্মৃতি বলিতে তিনি বুঝিতেন গীতা, বিষ্ণুপুরাণ, মনুস্মৃতি ও মহাভারত। তাঁহার ভাষ্যে অন্য পুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত দেখা যায় না। বৌদ্ধ, জৈন, পাশুপত প্রভৃতি যে সকল মতবাদ তিনি খণ্ডন করিয়াছেন তাহাও প্রাচীন। তাঁহার ভাষ্য বৃত্তির গুণ সম্পন্ন। শঙ্কর ভাষ্যে নিম্বার্কাচার্য্যের নাম না থাকিলেও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ খণ্ডিত আছে। নাম করিয়া মতবাদ খণ্ডনের প্রথা দেখা যায় না। এই সমস্ত আলোচনা করিলে নিম্বার্ক ভাষ্য যে শঙ্কর ভাষ্যের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল ইহাই মনে হয়। উভয় ভাষ্যের তুলনা মূলক আলোচনা করিলে অনেক সত্য বাহির হইতে পারে। কিন্তু ইহা তাহার স্থান নয়।

শ্রীনৃসিংহ দাস বসু।

মাসপঞ্জি—বৈশাখ, ১৩৪১

কলিকাতা করপরেসনের মেয়র ও ডিপুটি মেয়রের নির্ব্বাচন লইয়া দল বিরোধ উপস্থিত, ইহারা সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করিতেছেন—কংগ্রেস পুনঃ স্বরাজ্যদল গঠন করিয়া ব্যবস্থা সভা সমূহে প্রবেশে সঙ্কল্প করিতেছে, এজন্য রাঁচিতে সর্ব্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এক বৈঠক হইবার কথা ছিল, শুনা যায় তাহা না হইয়া বাছা বাছা কংগ্রেস নেতাগণকে লইয়া মহাত্মা গান্ধী এক কনফারেন্স করিবেন; ভারতীয় ব্যবস্থা সভার এ বিষয়ের আলোচনায় গৃহ সচিব স্যর হেরী হেগ প্রকাশ করিয়াছেন যে কংগ্রেস তার কার্য্যপদ্ধতি বদলাইলে মূল কংগ্রেস বা তাহার কার্য্যকরী সমিতির বৈঠকে সরকারের আপত্তি হইবে না এবং সম্ভবতঃ সরকারও কংগ্রেস সম্বন্ধে তাহার কর্ম্ম-প্রণালী বদলাইবেন ও কংগ্রেস পক্ষের বন্দীদের মুক্তি দিবেন—প্রস্তাবিত মন্দির প্রবেশ আইন লইয়া নানা স্থানে তীব্র প্রতিবাদ সভা হইতেছে,—ভারতীয় ব্যবস্থা সভাতে ভারতীয় সামন্ত রাজ্যরক্ষা বয়নশিল্প রক্ষা বিষয়ে দুইটী আইন পাশ হইল, উক্ত সভার বর্ত্তমান বৈঠকের সমাপ্তি হইল, আর ইহার আয়ুষ্কাল আগামী জুলাই মাসে সিমলা বৈঠকের সহিত শেষ হইবে—জাপ-ভারত বাণিজ্য-চুক্তি উভয় দেশীয় প্রতিনিধিগণ স্বাক্ষর করিলেন (নব দীল্লি ৬-১-৪১), অতঃপর ইহা লণ্ডনে প্রেরিত হইবে, এবং ব্রিটিশ রাজ পক্ষ ও জাপ দূতের সাক্ষর পাইবে—নূতন চুক্তি অনুসারে ভারতে জাপানী বস্ত্র আমদানী নিয়ন্ত্রণ জন্য ভারত সরকার বিজ্ঞপ্তি করিয়াছেন—বোম্বাইর ব্যবস্থা-সভাতে মিঃ এম, সি, রাজার প্রস্তাবিত অস্পৃশ্যতা উচ্ছেদ আইন সম্বন্ধে গভর্ণর হিন্দু জনসাধারণের মতামত চাহিয়াছিল—বোম্বাই ও দীল্লিতে কাপড়ের কলের মজুরেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে—ভারতীয় কয়লার ব্যবসায়ীদিগের কয়লার উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ জন্য ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত

প্রস্তাব সরকার কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইল—ভারতীয় পাট কল সমিতি পাটের উন্নতি ও বাজার বৃদ্ধির নিমিত্ত ক্রিয়াত্মক চেষ্টা করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিতেছে ; বিদেশে দালাল নিয়োগ এবং রিসার্চ্চ দ্বারা পাটের উন্নতি বিধান ইত্যাদি ইহাদের লক্ষ্য, খরচের জন্য কলের প্রতি লুমের উপর চারি টাকা শুল্ক স্থাপনের কথা—বিদেশীয় কার্পাস সূত্র ও কার্পাস বস্ত্রের আমদানী হ্রাস পাইতেছে বলিয়া প্রকাশ—গ্রামের আর্থিক উন্নতি ও চাষার ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি কল্পে একটী গঠনাত্মক পরিকল্পনা ভারত সরকারের ধারণায় রহিয়াছে, বাঙ্গলার শিক্ষিত যুবক দিগকে চাষের কার্য্যে লাগাইবার ক্ষীণ চেষ্টা চলিতেছে ; ইংলণ্ডস্থিত ভারতীয় গ্রামোন্নতি সমিতি বেতার বার্ত্তার প্রসারের দ্বারা ভারতীয় প্রজার উন্নতির আশা করেন। মাড়োয়ারী সভার সভাপতি বলেন সিনেমার দ্বারা ভারত বাসীর নৈতিক শক্তির মূলোৎপাটন হইতেছে—ভারতের সাধনার অকৃত্রিম বন্ধু প্রবীণ দেশভক্ত রাঁচি প্রবাসী প্রমথ নাথ বসু মহাশয় পরলোক গমন করিলেন, লব্ধপ্রতিষ্ঠ মান্দ্রাজী স্যর শঙ্কর নেয়ারের মৃত্যু ঘটিল, প্রসিদ্ধ আইন গ্রন্থ প্রণেতা স্যর দীনশা মোল্লার মৃত্যু হইল—দার্জ্জিলিংএ লেবঙ দৌড় উপস্থিতি কালে বাঙ্গলার গভর্ণর স্যরজন এণ্ডারসনের প্রাণহানির এক দুঃসাহসিক চেষ্টা হইয়াছিল, দুইটী বাঙ্গালি যুবক এই অপরাধে ধৃত—সীলেটে ভীষণ ঝড় হইয়াছে—গোরক্ষপুরে কতক স্থানে চন্দন বৃষ্টি পড়িয়াছে।

বৈদেশিক

ইংলণ্ডে জাপানী শিল্পের প্রতিযোগিতায় ডাণ্ডীর শিল্পকেন্দ্র সন্ত্রস্ত, তত্রত্য বাণিজ্য সভার সভাপতি মিঃ আলেকজেণ্ডার পেন্স বলেন, ছলে বলে কৌশলে যেরূপেই হউক ইহার প্রতিরোধ করিতে হইবে—জ্যারম্যান গভর্ণমেণ্ট নূতন বজেটে অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধির বরাদ্দ করিয়াছে দেখিয়া ইউরোপীয় শক্তি পুঞ্জের গাত্রদাহ উপস্থিত, কৈফিয়েতে উহারা বলিতেছে যে ভার্সিলিসের সন্ধিতে জারম্যান বজেট সম্বন্ধে কোনও কথা নাই ; অর্দ্ধবর্ষ কালে জারম্যান বেকার সংখ্যা অর্দ্ধেকে পরিণত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ ; বিদেশীয় ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে জারম্যানের উক্তি এই যে ঐ টাকার সুদ এত বেশী যে শোধ দেওয়া দুঃসাধ্য ; বাণিজ্যে তাহার এই নীতি যে, যে দেশে তার পণ্য রপ্তানি করিতে পারিব সেই দেশ হইতেই মাত্র সে রপ্তানি লইবে ; এখানে আর একদল কমিউনিষ্ট প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল, হার হিটলারের জন্মদিনে (২০-৪-৩৪) মহা সমারোহে উৎসব হইল—রুশ বিপ্লববাদী নির্ব্বাসিত ট্রট্স্কি ফ্রান্সে আসিয়াছে বলিয়া উত্তেজনা চলিতেছে ; জারম্যান বাজেটে সামরিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনায় ফরাসীই অতিমাত্র বিক্ষুব্ধ—অর্থসঙ্কট এড়াইবার জন্য ইতালী সকল দিকেই ব্যয়-সঙ্কোচ করিতেছে, সিনিয়র মুসেলিনী তাঁহার আপন খরচে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সঙ্কোচ আনিয়াছেন ; ইতালীর উড্ডয়নবীর রেণেডো দোনেডি ১৪৫০৭ মিটর উপরে উঠিয়া এ যাবত কালের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূর উর্দ্ধগামী ফরাসী লেময়নকে (১৩৬১ মিটর) হারাইয়াছেন—অষ্ট্রীয়া রাজ্য প্রকৃত পক্ষে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত হইল (১-৫-৩৪)—স্পেনের রাষ্ট্র-বিপ্লব এখনও চলিতেছে—রুশ সভিয়েট্কে ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সঙ্ঘ রাষ্ট্র সম্মান দান করিয়াছে ; জাতিসঙ্ঘও উহাকে স্বীকার করিয়া লইবে, এরূপ সম্ভাবনা—রুমানিয়ায় রাজা ফেরলকে হত্যার চেষ্টা হইল—আমেরিকার রুজভেল্ট-বিরোধী দলের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি—কানাডা জাতিসঙ্ঘ হইতে বিচ্যুত হইতে চেষ্টা করিতেছে।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

পঞ্চম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ—১৩৪১ [৮ম সংখ্যা

সাধনার পথে

কালের প্রভাব প্রবল, কাল দুরতিক্রম্য। কালের বশে জগত চলিতেছে। উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি, উৎপত্তি-স্থিতি-ধ্বংস—এ সমুদয়ই কাল করিতেছে। কাল কিন্তু নিজে নিরপেক্ষ নহে।

কালের প্রভাব ও সাধনার বল

কালের গতি দুইটি সীমা-নির্দ্ধারক বস্তু চাহে—কালের মাপ হয় ঘটনা পরম্পরায় সমষ্টিতে; আবার কালের ক্রিয়া চলে দেশ বা ক্ষেত্র এবং পাত্র বা ব্যক্তি ও বস্তুর আশ্রয়ে দেশ-কালপাত্র ভেদে সমুদয় ঘটনা ঘটে, চলিত কথায় এ তত্ত্ব নিহিত আছে। ইহার মধ্যে দেশ ও পাত্র উভয়ই সীমিত—অনন্ত বিশ্বের ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ। অসীম বিশ্বের সমুদয় শক্তিকেন্দ্র কালরূপে আসিয়া ইহাদের উপরে আরোপিত হয়; তাহাতেই মহাশক্তির খেলা চলে—অনন্ত ঘটনাস্রোত প্রবাহিত রয়। এই কালের বশে এই যে পরিবর্ত্তন যাবতীয় বিষয় বা বস্তুতে ঘটে, তাহা কিন্তু লইয়া যায় তাহাকে এক ধ্বংসের পথে। এজন্য কালের নামান্তর ধ্বংস বা বিনাশ। জগতের যাবতীয় বস্তু এক বিশাল ধ্বংসের পথের যাত্রী, কালের করাল কবলে স্থিত। এই ধ্বংসের পথেও কিন্তু প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ভাব বা অবস্থায় উপভোগ আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তুর প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে এই উপভোগের তারতম্য দেখা যায়। জড় বস্তুর পরিবর্ত্তনে তাহার নিজ অনুভূতিতে সুখ বা দুঃখ তেমন কিছু দেয় না, উহা তাহার স্বভাব; স্বভাবের অতিরিক্ত তাহার আর বিশেষ কোনও অনুভূতি নাই। চেতনের সুখ দুঃখ অনুভূতি আছে; কিন্তু তাহা সকলের মধ্যে তত তীব্র নয় যে পরিবর্ত্তনকে ধ্বংস বলিয়া শিহরিয়া উঠিবে; পরিণাম চিন্তনে ভীতি-বিহ্বলতাও তাহার আইসে না; কিন্তু যে বিচারশীল সে নিজ পরিবর্ত্তনের পরিণাম বোধে ভীত ও শঙ্কিত হয়; অথবা বিভিন্ন সময় চেতনা ও চিত্তের বিবিধ অবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের অনুভূতি বোধ করে। কাল এই অনুভূতিরও নিয়ন্তা। একই মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপে আপন মনের ভাব পোষণ

করে ও বিভিন্নরূপে কার্য্য করে। একই জাতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্নরূপ কার্য্যতৎপরতা দেখায়; তাহাতে তাহার উন্নতি অবনতি উত্থান-পতন নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কালের বশে এ সমুদয় হয়। কাল দুর্দ্দমনীয়। জগতের সকল পদার্থ ও বিষয়ই কালের কবলে পড়িয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু কালের উপরেও এক বস্তু আছে—তাহা সত্য বা ধর্ম্ম। সেই সত্যের সংস্পর্শে যে জীবন যাপন করিতে পারে, সত্য যাহার অধিগত হইয়াছে এবং সত্যকে যে ব্যবহারে আনিয়া কর্ম্মগতি সেই সত্যের নির্দ্দেশে পরিচালনা করিতে পারে, সেই কালের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে,—কর্ম্ম-পরম্পরায় ধ্বংসের মুখে জগতের যে প্রগতি চলিয়াছে, তাহা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সত্য যাহা তাহাই এক মাত্র প্রকৃত এবং এই ধ্বংসের ধারা হইতে বিমুক্ত। সৃষ্টি ও কর্ম্মপ্রবাহ লইয়া যে কাল-পরিক্রমণ তাহা উহার উৎপথগমন। কালের প্রকোপ বা ধ্বংস হইতে রক্ষার নিমিত্ত সত্যই একমাত্র শরণ্য ও আশ্রয়। সত্যকে যে ধরিয়া চলিয়াছে, তাহার মৃত্যু নাই—

মানবের প্রকৃত সাধনা এই সত্যকে অবলম্বন করিয়া। সত্যের সন্ধানে চলিয়া, সত্যকে উপলব্ধি করিয়া ব্যক্তিগত বা জাতিগত জীবনে যে প্রকর্ষ লাভ করা যায়, তাহাই বাস্তবিক সাধনা বা 'কালচার'। মানব-ইতিহাসে এই সাধনা বিরল। যে জাতি উহা লাভ করিতে পারিয়াছে, সে অমরত্ব লাভ করিয়াছে, যে তাহা অল্প পরিমাণেও করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইতিহাসে তাহার স্থিতি ও প্রভাব অল্লাধিক পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতের সাধনা এই দৃষ্টিতেই ইতিহাসের অতুলনীয় সম্পদ; এমন স্থিতি ও মাহাত্ম্য মানবীয় সাধনার আর কোনও স্থানে দৃষ্ট হয় না। সত্যকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম্ম তাহাই উহার সম্বল—কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়াই উহা বিদ্যমান রহিয়াছে। কালবশে আজ যে ধ্বংসোন্মুখীন উন্নয়ন চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতেছে, ভারতের অন্তরাত্মা তাহাতে অভিভূত নহে। কালকে অতিক্রম করিয়া সে আত্মপ্রতিষ্ঠ রহিয়াছে ও রহিবে।

ব্যাধি ও প্রতিকার।—

যে ধর্ম্মগ্লানি এক্ষণে উগ্র মূর্ত্তিতে এদেশে দেখা দিয়াছে, তাহার পরিণাম ভাবিয়া অনেকেই উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। কুশিক্ষায় ধর্ম্মহানি ঘটাইয়াছে। প্রধানতঃ দুই কারণে এই কুশিক্ষার প্রসার হইয়া আসিতেছে—প্রথমতঃ অন্যকার বিজাতীয় আদর্শে পরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষা; অপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা আধুনিক সভ্যতার প্রভাব। ধর্ম্মগ্লানিতে সমাজ বিধ্বস্ত হইয়াছে।—আর সমাজ বন্ধন শিথীল হওয়ায় একদিকে লোকচরিত্রে যেমন নানা ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছে তেমনই অর্থজনিত অসমতা ও লোকের বৃত্তিহীনতার সৃজন করিয়া দারুণ অর্থ-সঙ্কটের উদ্রেক করিয়াছে। যে ঐক্য ও পরার্থপরতা সামাজিক ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া সমাজে প্রতিপালিত হইত—ধর্ম্মের অঙ্গীয় বলিয়া যে সমুদয় সামাজিক ক্রিয়াকলাপ নানা জনহিতকর কার্য্যরূপে সমাজে অহরহ অনুষ্ঠিত হইত, তাহা এক্ষণে বিলুপ্তপ্রায়। একদিকে বিলাস ও ব্যভিচারের প্রসার অন্যদিকে দারিদ্র্যের প্রকোপ অচিরে মানবসভ্যতার বিনাশ সাধন করিবে, ইহাই আশঙ্কার বিষয় হইয়াছে।

ভারতে এরূপ আশঙ্কার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। ভারতীয় সভ্যতার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য এবং উহার অতুলনীয় গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য্য, ভারতকে যে শ্রেষ্ঠ আসন জগতের মানব সমাজে দিয়াছে, তাহাই আজ বিপদসঙ্কুল—সঙ্কট চতুর্দ্দিকে ও সকল জাতির মধ্যেই কোনও না কোনও রূপে ঘনাইয়া

আসিতেছে। কিন্তু হিন্দু জাতির ভবিষ্যত যেমন ঘন কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন এমন আর কাহারও নহে। অন্য জাতির উন্নতি বা অবনতির মানদণ্ড তার নিজ জাতীয় আদর্শ বা ঐতিহ্যের বিবরণে গ্রথিত নাই। আশঙ্কা এই যে, কেবল হিন্দু জাতিরই একটী স্থায়ী সত্তা ইতিহাসে আছে—ভারতীয় সাধনার সনাতন ভিত্তি এই জাতিকে তার এই বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। আজ কিন্তু মনে হইতেছে, এই প্রাচীন জাতি কি তাহার যুগযুগান্তরের সেই সাধনা ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য লইয়া সত্য সত্যই মরিতে বসিয়াছে?—আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া এই প্রশ্নই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বিজাতীয় শিক্ষা ও দীক্ষায় আমরা এমনই অভিভূত, বিরোধীর সংঘর্ষে আমরা এতই কাতর হইয়াছি যে ইহা হইতে উদ্ধারের কোনও উপায় আছে, তাহা বড় কেহ ধরিয়া উঠিতে পারি না। দশা এমনই আত্ম-বিস্মৃত ও আত্ম-মূঢ়ের।

বাস্তবিক কিন্তু এইরূপ গুরুতর সময়েই আত্মস্থ হইতে হয়। জাতির সাধনা দৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিকারের উপায় দেখিতে হয়, জাতীয় প্রকৃত শক্তি-উৎসের রুদ্ধ দ্বারগুলি উন্মোচিত করিয়া কার্য্য-তৎপর হইতে হয়। চতুর্দ্দিকে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু সে জাগরণের গতি কোন্ দিকে তাহাই ভাল করিয়া দেখিয়া লইতে হইবে। স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া চলিলে চলিবেনা—ধীর ও বীর ভাবে কর্ত্তব্যপথ নির্দ্ধারণ করিয়া চলিতে হইবে।

এক প্রকার ক্ষীণ জাগরণের লক্ষণ আজ স্থানে স্থানে যথার্থ দিকের লক্ষ্যেই দেখা যাইতেছে। উহা একালের এই বিজাতীয় শিক্ষা ও বিজাতীয় ভাবের প্রভাবকে উত্তরণ করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইতে চাহে,—অদ্যকার এই পরাক্রমিক, পরপদভারে অবনত, পরানুকরণে প্রমত্ত উদ্ভ্রান্ত জাতির নানা উল্লাস ও আন্দোলন এবং বিলাস ও ব্যসনে আত্ম-বিধ্বংসীর ক্ষণিক বিকার-ব্যঞ্জনা মাত্র দেখিয়া ব্যথিত হয়, আর জাতির যে শক্তিউৎসের গতি রোধ হওয়াতে তাহার মধ্যে নানা পঙ্কিল আবর্জ্জনা ও বিষ-পোকার অনিষ্টপাত ঘটিয়াছে এবং অপর দিকে উহার উচ্ছেদ-সাধনের নিমিত্তই আবার যে সকল শক্তিপুঞ্জ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে তাহাতেও নূতন নূতন আশঙ্কা, উদ্বেগ এবং সন্ত্রাসের যাতনা বোধ করে। দেখা যাইতেছে আজ কয়েক বৎসর মাত্র হইল, বিজ্ঞানের কুসংস্কার সমূহ ধরা পড়িতেছে, অকালপূজিত অর্থনীতির দারুণ তাপে সমাজ বিদগ্ধ হইতে বসিয়াছে, দেশে দেশে গণতন্ত্রের নামে স্বেচ্ছাচারের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, শিক্ষা দুর্নীতিকে বরণ করিয়া লইতেছে, চরিত্র আপন মর্য্যাদার বিনিময়ে ব্যভিচারকে আদর করিয়া লইতেছে, সমাজস্থিতির মূলাধার নারী তার প্রকৃতিতে বিরক্ত ও সতীত্বে বিরূপ, পুরুষ শৌর্য্য হারাইয়া কূটনীতির বশীভূত – আধুনিকতার এই নানা মহাপাপে আজ কাল কাহারও কাহারও নজর পড়িয়াছে। ভারতের সাধনায় যাঁহারা আস্থাবান—ভারতের অন্তরাত্মার সহিত যাঁহাদিগের কিঞ্চিত পরিচয়ও আছে এইরূপ অবস্থার বিপর্য্যয়ে তাঁহাদিগেরই আশা ও আনন্দের হেতু আছে; মনে হয় একদিন এই আত্মবিধ্বংসী বিকৃত অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, মিথ্যা ব্যভিচারের হাত হইতে উদ্ধার হইয়া, মানুষ আবার সত্য ও নীতির পথে চলিতে থাকিবে, ভারতের সাধনা যাহার অবলম্বনে মাত্র পরিচালিত হইয়াছে। এজন্য ভারতকেই সর্ব্বাগ্রে সাবহিত হইয়া চলিতে হইবে; এই জন্ম ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে এক মাত্র ভারতই সম্যক প্রকারে এই দুরন্ত ব্যাধির প্রকৃতি নির্ণয় করিতে সক্ষম; ইহার প্রতিকারের উপায়ও তাহারই হাতে। এ ক্ষেত্রে আবার কোন প্রকার ভ্রম বা প্রমাদে প্রতারিত না হইতে হয়, তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে, যে পাশ্চাত্যের প্রভাবে আজ এদেশের লোকেরা, বিশেষতঃ তরুণ সম্প্রদায় বিপথগামী হইতেছে, সেখানের অনেক মনীষীই এক্ষণ ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার প্রশংসাবাদ করিতেছেন—ইহারা প্রধানতঃ স্যরজন উড্রফ (Is India Civilised ?) কর্ণেল বার্ড উড (Swa) প্রভৃতি লেখকগণের নাম করিয়া থাকেন। বলিবেন, ইহারা যখন ভারতীয় সাধনা ও সভ্যতার উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তখন এক দিন আসিবে, যখন তথাকার জনসাধারণের অনেকেই উহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবে, আর তখন এতদ্দেশীয় পশ্চিমের মুখাপেক্ষী লোকদিগের বর্ত্তমান এই বিসদৃশ মনোবৃত্তির নিমিত্ত চিন্তার কোনও হেতু থাকিবে না। কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতে এরূপ অবস্থা কখনও আসিবে কিনা, বলিতে পারা যায় না; যে দুই এক জন মনীষী ভারতীয় সাধনার প্রশংসাবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের প্রভাব তদ্দেশীয় সমাজে তত বিস্তার লাভ করে নাই, যতটা তাহাদের খ্যাতি এই দেশে প্রচারিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতবাসীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়া, ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতবাসীকে লোক চক্ষে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা একালে নানা প্রকারে ও নানা উদ্দেশ্যে চলিয়া আসিয়াছে; মিস্ মেয়োর প্রণীত ভারতগ্লানিকর পুস্তক মাদার ইণ্ডিয়া' ইহার সাক্ষ্য বহন করে। আবার পাশ্চাত্যের বিদ্বৎসমাজ কতক বৎসর পূর্ব্বে ও ভারতীয় সাহিত্য দর্শন প্রভৃতিকে যে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিত, তাহা আর বিদ্যমান নাই। কালধর্ম্মে আজ পরমতসহনশীলতা যেমন লোক চরিত্রে বিলুপ্ত হইয়াছে, অপরের শ্রেষ্ঠতা স্বীকারও তেমনই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

আবার কেহ বলিবেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা—যাহা ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী—তাহা তার আত্মকৃত ব্যাধিতেই মরণ পথে চলিয়াছে, উহার ধ্বংস সাধন অচিরে হইবে। সুতরাং পরিপন্থী ও প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতার নিপাতে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতা রক্ষা পাইবে। এইরূপ হেতুবাদ এক প্রকার হীন আশাবাদিতার লক্ষণ প্রকাশ করে মাত্র; কারণ পাশ্চাত্য সমাজও সভ্যতার বিলোপ সাধন হইলেও তার পদানুবর্ত্তী আধুনিক ভারতীয় সভ্যতারও বিলোপ সাধন হইবে; আর সেই ধ্বংসের চিহ্ন ভারতীয় সমাজের নানা দিকেই দেখা দিয়াছে। কেবল ইহাই নহে, অনেক বিষয়ে দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য তাহার ভুল ও ক্রটী বুঝিয়া যে সংশোধন করিয়া চলিতেছে, ভারতবাসীরা তাহাই বিনা বিচারে অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। সুতরাং পাশ্চাত্য সমাজ রক্ষা পাইলেও ভারতীয় সমাজ ধ্বংসমুখে চলিয়া যাইতে পারে।

ভারত তাহার মোহান্ধকার হইতে নিজের সাধনাবলেই উদ্ধার লাভ করিতে পারে; প্রকৃত জাগরণ যদি তাহার কোনও দিকে কোনও প্রকারে হইয়া থাকে, তবে তাহা তাহার নিজ সাধনাবলেই হইয়াছে। ভারত যুগে যুগে এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ও প্রতিকুল অবস্থার হাত হইতে আপন সাধন বলেই আত্মরক্ষা করিয়াছে। অপরের পরাভবে বা অবনতিতে বা অপরকে বিনষ্ট করিয়া সে কখনও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহে নাই! মানবীয়তার যে উচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্য ভারতের সাধনার মূল মন্ত্র রূপে অনুপ্রেরণা দান করিয়াছে, তাহাতে সকল লোকেই উদ্বোধিত হইয়া পরম কল্যাণের অধিকারী হউক, ইহাই ভারতের অভিপ্রায় ও আকাঙ্খা।

অতএব ভারতের নিজ চরিত্রে আজ যে সকল পাপসংস্পর্শ ঘটিয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক। একদিকে পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত, বিজাতীয় ভাবে

বিভ্রান্ত তরুণ ও তথাকথিত জাতীয়তার উন্মাদনায় অগ্রগামী লোকদিগের প্রকৃত তত্ত্বের দৃষ্টিতে ভ্রম-নিরসন ও প্রকৃত জাতীয়তার দৃষ্টিতে আপন জীবনে সুস্থভাব ও সবলতা আনয়ন করিয়া প্রকৃত সুখের সন্ধান দান এবং অপর দিকে জাগতিক অবস্থায় অনভিজ্ঞ, নিজ নিজ ক্ষুদ্রতার গণ্ডীতে আবদ্ধ, স্বার্থান্ধতা এবং তন্নিমিত্ত ভয় ও হীনতার ভাবে বিজড়িত ধর্ম্মব্যবসায়ী ও সমাজ-নেতৃগণের কালের প্রয়োজনানুযায়ী আত্মদৃষ্টিতে জাগরিত হইয়া নব কর্ম্ম-প্রেরণায় নূতন উৎসাহ আপনাদিগকে নিয়োজিত করা।—এই দুই দিকের লক্ষ্যে জাতি আজ এক মহান্ আত্ম-সংস্কার চাহিতেছে।

দেবভাষা ও রাষ্ট্রভাষা।—

ভারতের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে, তাহার মীমাংসা এখনও হয় নাই। রাজভাষা বলিয়া ইংরাজী এখন চলিতেছে; কিন্তু তাহা রাষ্ট্রভাষা নহে; কারণ ভারতের অগণিত নরনারীর নিকট উহা বিজাতীয় এবং ইহাতে তাহারা অনভিজ্ঞ ও চিরকাল অনভিজ্ঞ থাকিবে। হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য একটা চেষ্টা জাতীয়তাবাদিগণ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু হিন্দীর অন্তর্শক্তি এত ক্ষীণ যে তাহা কোনও মর্য্যাদা-সম্পন্ন ভাষা ও সাহিত্যের পদবীতে উঠিতে পারিবে কিনা তাহা সন্দেহ—হিন্দী ভাষার স্থিতি-স্থাপকতা কিছু নাই। বাঙ্গলা, মারহাট্টি, গুজরাটি প্রভৃতি ভাষা সাহিত্যে উন্নত বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু সমগ্র ভারতের লোকে কোনও একটী প্রাদেশিক ভাষাকে আপন করিয়া লইবে সে আশা সুদূরপরাহত। দক্ষিণ ভারতের তামিল, তেলেগু প্রভৃতি কোনও দ্রাবিড়ী ভাষার সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষার দাবী করিবার অধিকার আরও কম।

বাস্তবিক ভারতবর্ষের ন্যায় মহাদেশ কল্প দেশ—যেখানে বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা, আচার, রীতি নীতি পৃথক, সেখানে প্রত্যেক প্রদেশের লোক আপন আপন ভাষাতে তাহাদের কথাবার্তা ও কাজকারবার চালাইতে পারে; আর সমগ্র ভারতের জন্য, যে ভাষায় বিভিন্ন প্রদেশের, সকল লোক না হইলেও, শিক্ষিত ও উন্নত লোকেরা অন্যান্য প্রদেশের সহিত শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞানচর্চ্চা, রাজ্য-রক্ষা ও রাষ্ট্রের পরিচালনা ইত্যাদি কার্য্য যুক্তভাবে করিতে পারে, সেই ভাষাই এদেশের রাষ্ট্রভাষা হইবার যোগ্য। ইংরেজী ভাষা এক্ষণে কেবল মাত্র সমগ্র ভারতের শাসন কার্য্যের উপযোগী হইতেছে মাত্র—পরন্তু শিক্ষা, ধর্ম্ম ও সভ্যতার বিস্তার ও সংরক্ষণ পক্ষে উহা ভারতের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল বা উন্নতির পরিপন্থীই হইতেছে।

সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে ঐরূপ একটী ভাষার প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; ফরাসী ভাষা অল্পাধিক পরিমাণে সমগ্র ইউরোপের রাষ্ট্রভাষার কার্য্য করিয়া থাকে। এক সময়ে ল্যাটিন ভাষা ইউরোপের অনেক দেশে প্রচলিত হইয়াছিল; ফরাসীতে ল্যাটিনের উপাদান অনেক আছে, অধিকন্তু গল, ফ্রাঙ্ক, টিউটন প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালের লোকদিগের ভাষার সন্নিবেশ ইহাতে হইয়াছে; এই ভাষার সমৃদ্ধি লইয়া ফরাসী জাতিই পরবর্ত্তী কালে সভ্যতায় ইউরোপবাসীর অগ্রণী হইয়া চলিয়াছে বলিয়া আধুনিক কালে ফরাসী ভাষা ইউরোপীয় শিক্ষিত জনমণ্ডলীর আদর্শ হইয়াছে এবং সমগ্র ইউরোপে উহার আদর ও প্রচলন আছে। এই অবস্থা হইতেই কোনও দেশের বিভিন্ন জাতির সমবেত রাষ্ট্র ভাষার কথা উঠিলে

তাহাকে উহার "লিঙ্গোয়া ফ্রাঙ্কা" বলা হয়। ভারতের রাষ্ট্র ভাষা বা "লিঙ্গোয়া ফ্রাঙ্কা" কি হইবে, এই প্রশ্নই এই খানে উঠে।

সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেবভাষা সংস্কৃতেরই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার পূর্ণ অধিকার। কোনও লোকেই তাহার নিজ নিজ প্রাদেশিক মাতৃ ভাষা ছাড়িতে পারিবে না; সাধারণ কাজকারবার, এমন কি রাজকীয় ব্যাপার তাহাতে চলিবে—সমগ্র ভারতের যাহারা নেতা বা রাজ কার্য্য পরিচালক হইবেন, তাহারাও তৎ তৎ প্রদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া, তথাকার জনসাধারণের সহিত মিশিয়া তাহাদের সেবাতৎপর হইবার জন্য যোগ্যতা অর্জ্জন করিবেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত তাহাদিগের যদি এমন কোনও ভাষা অর্জ্জন করিতে হয়, যাহাতে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যিক ভাব সম্পদে উন্নত হইয়া সমগ্র দেশ ও জাতির উন্নতি করিতে পারে, তবে তাহা যে সংস্কৃত এবিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সংস্কৃতের সম্মান জগৎজোড়া; ভারতের অন্য কোনও প্রাদেশিক ভাষাতে তাহা নাই; জগতের অপর কোনও ভাষারও তাহা নাই। আর ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলি সমুদয়ই এই মূল সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত অথবা ইহার দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। এখনও আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমে, সর্ব্বত্র যদি কোনও এক ভাষার চর্চ্চা থাকিয়া থাকে, যাহা দ্বারা সর্ব্বত্র কোনও লোক আপন মনোভাব ব্যক্ত করিয়া আসিতে পারেন, তবে তাহা সংস্কৃত। ভারতের গৌরবময় দিনে যখন হিন্দুর আপন রাষ্ট্র ছিল, তাহার জ্ঞান ও যশঃ সৌরভ জগতের চারিদিকে প্রসারিত হইয়াছিল; তখন সংস্কৃতই ভারতের রাষ্ট্র ভাষা ছিল—সংস্কৃত দ্বারাই ভারতীয় রাষ্ট্র বা ভারতবর্ষ সংহত ও সম্বদ্ধ রহিয়াছিল। পরে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের আগমনে সে ঐক্য ও সম্বদ্ধতা ছিন্ন হইল, তখনই সংস্কৃতকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রাদেশিক ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশে প্রদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধ আরম্ভ হইল; পরিণাম তার ভারতের এই ভীষণ অধঃপতন। আজ যখন ভারতকে পুনঃ সম্মিলিত ও সম্বদ্ধ করিবার কথা উঠিয়াছে, তখন এই রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাতে যেন পুনঃ সেই পুরাতন ভুলেরই অনুবর্ত্তন করা না হয়। অন্য প্রাদেশিক ভাষাকে অগ্রাহ্য করিয়া কোনও একটীকে প্রাধান্য দান করিলে, যে প্রাদেশিক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। বাস্তবিক ঐরূপ করা অস্বাভাবিক এবং অসম্ভবও বটে। এমন একটী ভাষাই সমগ্র দেশের বলিয়া গৃহীত হইতে পারে—যাহার ভাব ও আন্তর্শক্তি সমগ্র দেশের লোকের চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে - দেশের প্রকৃতি, জল বায়ু ও লোকের মানসিক সংস্কার ও বংশপরম্পরা যাহার সহিত সম্পর্কিত রহিয়াছে। ভারতের পক্ষে এরূপ ভাষা সংস্কৃত ভিন্ন আর কোনওটীই নহে।

রাষ্ট্র বিপ্লবের সাংঘাতিক প্রভাব, ধর্ম্ম-বিপ্লবের ন্যায়ই বহুকাল ধরিয়া সংস্কৃত ভাষার উপরে পড়িয়াছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে যেমন প্রাদেশিক ভাষার প্রসার সাধন ঘটিয়াছিল, সেইরূপই পরে প্রথমতঃ মুসলমান শাসনের প্রভাবে পারসীক ভাষা এবং তৎপর ইংরেজ শাসনে ইংরেজী ভাষা সংস্কৃতের প্রভাব খর্ব্ব করিয়াছে। এবং ইহাতে বর্ত্তমান সময় ভারতের ধর্ম্ম, সাধনা ও সভ্যতার উপরে যে বিপদপাত ঘটিয়াছে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক। দেশের লোকে আত্মসংবিদ্ হারাইয়াছে—যে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চ্চা ভাষার প্রধান সংরক্ষক ও সাহিত্যের পরিপোষক তাহাই আজ বিপথগামী করিয়াছে—পরকীয় ভাব ও ভাষাতে লোককে আত্ম-ভোলা করিয়া দিয়াছে।

সংস্কৃতকে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা করিবার কথা দূরে থাকুক বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ তালিকা হইতে পর্য্যন্ত সংস্কৃতকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য অদ্যকার এই শিক্ষিত জনমণ্ডলীর আগ্রহ। একমাত্র ভরসা—সত্যের ব্যতিক্রম জগতে সময় সময় ঘটিয়া থাকিলেও সত্য কখনও বিলুপ্ত হয় নাই—সেই সত্যের লক্ষ্য ভারতীয় সাধনা চলিয়াছে, সত্যের সাক্ষাত সম্প্রকাশে তাহার এই ভাষারও সৃষ্টি—এই জন্য উহা দেবভাষা আখ্যায় আখ্যায়িত। সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি ও প্রসারের মধ্যে সত্যেরই অভিব্যক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রহিয়াছে। এজন্য ইহারও বিনাশ হইবে না। বিভিন্ন যুগের বিরোধী শক্তিকে অতিক্রম করিয়া আজও যে উহা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতেই ইহার প্রমাণ মিলে। আজ নানা দিকে যে বিভ্রাট ও গোলযোগ এক ধ্বংসলীলার সূচনা করিতেছে, তাহা হইতে রক্ষার নিমিত্তই সেই সত্য দৃষ্টির আবশ্যক। ভারতের সাধনায় তাহা সংরক্ষিত রহিয়াছে। আজ যে ক্ষীণ জাগরণের চিহ্ন দেখা দিয়াছে, তাহাতে এই সত্যের সাধনায়, সংস্কৃত ভাষার সেবাতে, ভারতবাসী আত্মরক্ষার এক উপায় দেখিতে পারেন।

প্রয়োজন ও উপায়।—

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না; কিন্তু কিরূপ শিক্ষা হইবে, ইহাই প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের বর্ত্তমান প্রচলিত শিক্ষা পুরুষদিগের পক্ষেই উপযোগী হইতেছে না; তাহাতে স্ত্রীদিগকেও সেই শিক্ষার চক্রে ফেলিয়া শিক্ষিতা করিয়া বাহির করিলে তাহার পরিণাম যে আরও শোচনীয় হইবে তাহা এই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা দিয়াছে। শিক্ষিতা বা এই তথাকথিত স্কুল কলেজে পড়ুয়া মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না ইহা একটী সাধারণ অভিযোগ। ইহার উপরে এই শিক্ষার গুণে লোকের গৃহধর্ম্ম ও পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে; আবার এই শিক্ষিত সমাজে নানা দুর্নীতির প্রসার সহজেই হইয়া উঠিতেছে, ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা শিক্ষার কার্য্য পরিচালনা করেন ও শিক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহারাও ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের কার্য্য অতি কঠিন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া দুঃখ করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের উপায়ান্তর নাই—নূতন পন্থা উদ্ভাবনার শক্তি নাই, অন্যায় ও অনিষ্টকর জানিয়াও তাহার অনুবর্ত্তন করিতে হয়—এমনই দুরবস্থা! এ পদ্ধতিতে কতকগুলি পদবী আছে, জীবিকার ব্যবস্থা আছে; উপায়ান্তর অভাবে তাহা লইয়াই থাকিতে হয়। আর যাহারা সর্ব্বপ্রকার হিতাহিত বিবেচনা হারাইয়া বসিয়াছেন, তাহারা এই পদ্ধতিরই প্রশংসাবাদে উন্মত্ত হইয়া ইহার সমর্থন করিয়া চলিয়াছেন। শিক্ষা লোক-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের উপায়, সাধনার প্রধান অঙ্গ। এই জন্য তিনটী বিষয়ের আবশ্যক—বীজ স্বরূপ জাতীয় সংস্কার, উত্তম ব্যবস্থা এবং মহান্ আদর্শ। অদ্যকার এই শিক্ষাতে ইহার কোন্‌টির কত খানি অভাব বা প্রয়োগ হইতেছে, তাহা সহজেই ধরা যায়।

ভূদেব-স্মৃতি।—

এইবার এই মাসের ১০ই তারিখে ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি সভা তাঁহার চুঁচুঁড়াস্থিত বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় বিগত ১৮৯৪ খৃঃঅব্দের ১৪ই মে। আজ চল্লিশ বৎসর পরে এই এই স্মৃতি সভার প্রথম অনুষ্ঠানে বর্ত্তমান সময়ে লোক-মতির এক বিশেষ পরিচয় ঘটে। ভূদেব যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যে সকল বিজাতীয়

ভাবসংঘর্ষের মধ্যে আপন শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজ পারিবারিক, সামাজিক ও কর্ম্মজীবনের মহান্ আদর্শ আপন ব্যবহারে ও লেখনী দ্বারা উচ্চ সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া, বাঙ্গালী জাতির নিকট রাখিয়া গিয়াছেন, আজ ততোধিক এক সঙ্কটের সময়—যখন কেবল বিজাতীয় শিক্ষা ও বিজাতীয় আদর্শের প্রথম সংঘর্ষ মাত্র নহে, পরন্তু উহাদ্বারা অভিভূত ভারতীয় মনীষা ও ভারতীয় সমাজ সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া মহোল্লাসে মরণের পথে চলিয়াছে। এক্ষণে ভূদেবকে নূতন করিয়া চিনিয়া ভূদেবের কথা নূতন করিয়া শুনিবার সময় আসিয়াছে সত্য। এজন্য যাঁহারা এই স্মৃতি-সভার উদ্যোক্তা তাঁহারা দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।

শুনিতে পাই সভাতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরই সমাগম হইয়াছিল—অতি বড় সংস্কারকামী ও গোঁড়া সনাতনী উভয় দলের লোকের বক্তৃতাদি হইয়াছে। সকলেই বর্ত্তমান সমাজের অবস্থাতে ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ভূদেবের জীবন ও তাঁহাদ্বারা প্রচারিত সামাজিক আদর্শে ইহার প্রতিকার সন্ধানে ঔৎসুক্য দেখাইয়াছেন। এই ঔৎসুক্য আন্তরিক হইলে ভূদেবের প্রচারিত সামাজিক ও পারিবারিক জীবনাদর্শের প্রতি লোকের আরও অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ইহারও সন্ধান করিতে হইবে, আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যে সুমহান্ তত্ত্ব ও উচ্চ আদর্শের প্রচার ইহারা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্ত্বেও আজ সমাজের এই দুর্গতি এবং বিপন্ন অবস্থা আসিল কেমন করিয়া? লোকমত-নিয়ন্ত্রণের অপর কোনও উপায় ছিল বা আছে কিনা?

জাপ-প্রতাপ।—

জাপানীদিগের কার্য্যকারিতা দেখিয়া আজ এই কথাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ইহারা প্রতীচ্য জগতে শ্রেষ্ঠ শক্তির স্থান অধিকার করিয়া আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চাহে। কালের প্রভাব ইহাদিগের অনুকূল, তদনুযায়ী জাতির প্রকৃতি নূতন তেজ ও উৎসাহ লইয়া আপন অভ্যুদয়ে মনোনিবেশ করিয়াছে। 'জয় কালে ক্ষয় নাই, মরণ কালে ঔষধ নাই'—ইহারা এই কথার প্রতিপাদন করিতে যাইতেছে—বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন জাতি ইহার প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছে। আজ বোধ হয় জগতের সকল জাতিই জাপানকে ভীতির চক্ষে দেখে। জাপান যে আর সকল জাতি-শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া চলিতেছে, তাহা তাহার বিগত কয়েক বর্ষের কার্য্য ক্রম দ্বারা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ বিগত চীন সমরের পর জগতের নব-শক্তির স্বাক্ষরিত সন্ধি-সর্ত্তকে অগ্রাহ্য করিয়া সে মাঞ্চুরিয়ার উপরে অভিযান চালনা করে। ইহাতে অপরাপর শক্তি-নিচয়ের বাধা কিছু মানে নাই। তারপরে আন্তর্জাতিক শক্তি নিচয়ের সাধারণ নিরাপদ-ক্ষেত্র সাংহাই সহর হইতেই যখন সে চীনের উপরে অভিযান চালাইয়াছিল, তখনও জগতের অপরাপর-শক্তি নিচয়কে উপেক্ষা করা হয়। সর্ব্বশেষে কেবল পূর্ব্বতন নব-শক্তির সন্ধিবন্ধনকে ছিন্ন করা নহে, জগতের সমুদয় জাতির সঙ্ঘ দ্বারা নিয়োজিত কমিশনের ধার্য্য সমুদয় বিষয়কে অগ্রাহ্য করিয়া প্রকাশ্য ভাবে লীগকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া আসিল। চীনের উপরে চড়াও করিয়া, কার্য্যতঃ তাহার উপরে প্রাধান্য বিস্তার করিয়া, প্রতীচির প্রভুরূপে সে যেন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে চাহে। এক সময়ে আমেরিকার গৃহীত 'মনরো' নীতি এক্ষণে জাপান অবলম্বন করিতেছে। ইতিহাসজ্ঞগণ অবগত আছেন, জাপানের এই অভ্যুত্থানের বীজমন্ত্রও সে আমেরিকা হইতেই পাইয়াছিল।

গীতাতত্ত্ব

শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদার

(গোরক্ষপুর)

গীতা যে একখানি সম্পূর্ণ মোক্ষগ্রন্থ তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সংসারসমুদ্রে নিমজ্জমান আর্ত্ত নরনারীর উদ্ধারের ইহাই একমাত্র তরণী, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই তরণীর কর্ণধার। জীব মায়াজালে বদ্ধ হইয়া বিবিধ বাসনার আবর্ত্তে পতিত হয় এবং এইরূপে দেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া জীবনমৃত্যুর কুক্ষিগত হইয়া পড়ে। যেমন হরিণের নাভিতে কস্তুরী উৎপন্ন হইলে সে উহার সুগন্ধে মোহিত হইয়া উহা পাইবার জন্য চারিদিকে পাগলের মত ছুটিয়া বেড়ায়—অজ্ঞানতাবশতঃ বুঝিতে পারে না যে ঐ কস্তুরী তাহার নিজেরই শরীরে বর্ত্তমান; তেমনি অজ্ঞানান্ধ মানবও মোহবশে এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না যে সে নিজেই আত্মারাম; অনন্ত আনন্দের প্রস্রবণ তাহার নিজের মধ্যেই বিদ্যমান; সে স্বয়ং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। সেই জন্য মানবও সুখশান্তির অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করে। কিন্তু একথা ধ্রুব সত্য যে এই জগতে দুঃখহীন সুখ পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। সুখের সঙ্গে দুঃখ, শান্তির সঙ্গে অশান্তি লাগিয়াই আছে। এই দ্বন্দ্বই প্রকৃতির বৈচিত্র্য। অজ্ঞানান্ধ মানব সুখের জন্য যতই চারিদিকে ছুটাছুটী করে, ততই তাহাকে দুঃখভোগই করিতে হয়। এইরূপে সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে আহত হইয়া যখন মানুষ সম্মুখে আর পথ দেখিতে পায় না, তখনই পরম দয়াল ভগবান কৃপা পরবশ হইয়া তাহার পথ প্রদর্শনের জন্য তাহার নিকট সদ্‌গুরু পাঠাইয়া থাকেন। তখন সদ্‌গুরুর উপদেশে সেই মানবের অজ্ঞানাবরণ অপসারিত হইয়া জ্ঞানালোকে তাহার চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

এই জগতে মনুষ্যগণের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে; কেহ বিচারপ্রবণ, কেহ ভাবপ্রবণ, আবার কেহ বা কর্ম্মপ্রবণ। এই জন্য এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর অনুসৃত পথও বিভিন্ন প্রকারের। সদ্‌গুরু শিষ্যের প্রকৃতি বুঝিয়াই তাহাকে জ্ঞান, ভক্তি বা কর্ম্মযোগের পন্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যিনি যথার্থ তত্ত্বদর্শী, তিনিই সদ্‌গুরু। এই সদ্‌গুরু আবার দুই প্রকারের হইয়া থাকেন। প্রথম সাধারণ সিদ্ধপুরুষ এবং দ্বিতীয় অবতারপুরুষ। সাধারণ সিদ্ধ গুরু নিজের চরিত্রের পবিত্রতা, ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা, ধৈর্য্য, ক্ষমা ইত্যাদি সদ্‌গুণের দ্বারা শিষ্যকে আকৃষ্ট করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে গন্তব্য পথে অগ্রসর করিয়া দেন। কিন্তু অবতারপুরুষ নিজের অমানুষিক শক্তিপ্রভাবে শীঘ্রই মানুষের প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক শক্তি উদ্বোধিত করিয়া তুলেন। শুধু ইহাই নহে, তাঁহাদের বাণীতে এমন শক্তি নিহিত থাকে, যাহা অনন্তকাল পর্য্যন্ত ভ্রান্ত মানুষকে পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। অবশ্য অবতারপুরুষ ও শিষ্যের অধিকারানুযায়ী উপদেশ দিয়া তাহার জীবন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পরিপূর্ণ এবং আনন্দময় করিয়া তুলেন। এইরূপ অবতারপুরুষ অসংখ্যই হইয়া থাকেন। কিন্তু গীতাবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মত মহাপুরুষ যে অদ্বিতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং গীতার বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে সেই গীতাবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে জানিতে চেষ্টা

করা একান্ত আবশ্যক। গীতাগ্রন্থ বুঝিতে হইলে সেই জগদ্গুরুর মহান্ চরিত্র হইতে সাহায্য লইতেই হইবে।

সর্ব্বপ্রথমেই দেখিতে হইবে কিরূপ অবস্থায় গীতার মহাবাণী প্রচারিত হইয়াছিল। রাজ্যভ্রষ্ট, হৃতসর্ব্বস্ব, প্রপীড়িত, মহাবীর, মহাকর্ম্মী অর্জ্জুন শত্রুতা সাধনের জন্য কুরুক্ষেত্রের বিশাল রণাঙ্গনে দাঁড়াইয়া তাঁহার সারথী শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্॥

তখন পর্য্যন্ত অর্জ্জুন নিজের বাহুবলের উপর এতটা আস্থাবান্ যে তিনি বাণ প্রহারে উদ্যত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় কহিলেন,—

'কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণ সমুদ্যমে।

অর্থাৎ এই সকল শূরবীরদের মধ্যে আমি কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিব; অর্থাৎ কোন্ কোন্ বীর আমার সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত? কিন্তু অতঃপর যখন উভয় সেনার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বীরবর পার্থ দেখিলেন যে উভয়পক্ষে তাঁহার জ্ঞাতি ও আত্মীয় কুটুম্বগণই যুদ্ধার্থ সমবেত হইয়াছেন, তখন তিনি ভগ্নোৎসাহ হইয়া গেলেন। তাঁহার স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, হাত কাঁপিতে লাগিল, গাণ্ডীব হাত হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন,—"এই সকল স্বজনবর্গকে হত্যা করিয়া মহাপাপের ভাগী আমি হইতে চাহি না। তাহার পরিবর্ত্তে বরং আমি বনগমন করিব। ইঁহাদিগকে হত্যা করা অপেক্ষা ভিক্ষান্ন ভোজন করাও অনেকাংশে শ্রেয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্ব যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

অর্জ্জুনের অন্তরাত্মা এই উপদেশ স্বীকার করিতে চাহিল না। তাঁহার মনে বহু প্রকারের যুক্তিতর্ক উদয় হইতে লাগিল। কিন্তু যখন কোন যুক্তিই তাঁহার মনঃপূত হইল না, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইয়া বলিলেন,—

কার্পণ্য দোষোপ হতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ় চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয় স্যানিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধিমাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

অর্থাৎ গুরু এবং স্বজনবধের চিন্তায় আমার চিত্ত একান্ত দৌর্ব্বল্য প্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার এক্ষণ কর্ত্তব্য কি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। আমি আপনার শিষ্য এবং শরণাগত, আমাকে যোগ্য শিক্ষা দিন।" এইরূপে অর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন, তখন সেই বন্ধুবৎসল পরম দয়াল মহাপুরুষ অর্জ্জুনকে যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদান করিলেন! বাস্তবিক পক্ষে এই উপদেশ কেবলমাত্র অর্জ্জুনের জন্যই প্রদত্ত হয় নাই, সংসারযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত প্রত্যেক মানবের পক্ষেই ইহা নিত্য শ্রেষ্ঠ মহৌষধ; অর্জ্জুন কেবল উপলক্ষ মাত্র। সংসারে অর্জ্জুনের মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের কখনও অভাব হয় নাই—হইবেও না। সুতরাং এই গীতামৃত সংসার-বিষদগ্ধ প্রত্যেক মানবের শরীরে নবজীবনের সঞ্চার করিবে। এই মানবধর্ম্ম—এই বিশ্বধর্ম্মরূপ অমৃতের সন্ধান

প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাতৃভূমি এই ভারতবর্ষ জগতের চক্ষের সম্মুখে যে মহা কল্যাণের পথ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন একদিন জগদ্বাসী সকলে সেই পথে অগ্রসর হইতে হইতে ভারতের জয়কীর্ত্তনে ধরাতল মুখরিত করিবে, তাহা আমরা অনায়াসে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি।

গীতার সর্ব্বপ্রধান উপদেশ অনাসক্তিযোগ। সর্ব্বদা কর্ত্তব্যকর্ম্মে রত থাকিয়াও মানুষের পক্ষে ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইহাই সেই অনাসক্তি যোগের মূল কথা।

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সংগোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥

অর্থাৎ কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলের কখনও আশা করিও না। ফলের জন্য কর্ম্ম করিও না, পরন্তু কর্ম্মত্যাগে কখনও তোমার প্রবৃত্তি না হয়। ইহার ভাবার্থ এই যে আসক্তিই বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। ফলাসক্তি রহিত হইয়া কর্ম্ম করিলে বন্ধনভয় থাকে না। কর্ম্ম করিতেই হইবে কেন না তদ্ব্যতীত চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে না এবং চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞানলাভ বা মুক্তি হওয়া অসম্ভব।

শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবনই এই আনাসক্তির একটী মূর্ত্ত্য বিগ্রহ—তাঁহার কর্ম্মময় মহাজীবনে কখনও তিনি কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন নাই। ব্রজবাসীগণের উপর শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসার সীমা ছিল না। তিনি উত্তম রূপেই জানিতেন যে তাঁহার অভাবে মাতা যশোদা, পিতা নন্দ, গোপবালক গোপরমণী এমন কি ব্রজের পশু, পক্ষী, বৃক্ষ লতাদিও কিরূপ কঠিন আঘাত পাইবেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যখন কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিল, তিনি ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া মথুরায় যাইতে কাল বিলম্ব করিলেন না। যাত্রাকালে ব্রজের গোপাঙ্গনারা পুনঃ পুনঃ আছাড় খাইয়াও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু অনাসক্তির মূর্ত্ত্য বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না তারপর মথুরায় কংস বধের পর তাঁহার সমগ্র সাম্রাজ্য শ্রীকৃষ্ণের করতলগত হইলেও তদ্দ্বারা তিনি বিন্দুমাত্র আসক্ত হইলেন না। উগ্রসেনকে সেই বিজিত রাজ্য প্রদান করিয়া তিনি নবীন কর্ম্মক্ষেত্র দ্বারকায় চলিয়া গেলেন।

তার পর ভারত যুদ্ধ ও তৎপরবর্ত্তী ঘটনা সমূহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ একাধারে সুনিপুণ যোদ্ধা, চতুর রাজনীতিজ্ঞ, অদ্বিতীয় বাগ্মী, বিনয় ও নম্রতার প্রতিমূর্ত্তি, প্রজাবৎসল রাজা, স্নেহময় পিতা ও ভ্রাতা, প্রেমময় পতি ও সখা, এবং করুণাময় আচার্য্য। ভারত যুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ না করিলেও সমস্ত ব্যাপার তাঁহারই অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালিত হইয়াছে। তারপর যুদ্ধান্তে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে যুধিষ্ঠির যখন আত্মীয়বিয়োগশোকে একান্ত মুহ্যমান হইয়া বনগমন করিতে চাহিলেন, তখন পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণই অপূর্ব্ব বুদ্ধিবলে তাঁহাকে রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত করিলেন। তার পর তাঁহার যদুবংশীয় জ্ঞাতিগণ যখন দুর্নিয়ার পাপপরায়ণ হইয়া উঠিলেন, তখন উহা তাহাদের ধ্বংসের কারণ জানিয়াও তিনি নিশ্চেষ্ট ও নির্ব্বিকার রহিলেন এবং পরিশেষে ধীর ও প্রশান্তভাবে পুত্রপৌত্রাদি সমগ্র স্বজনবর্গকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিলেন এবং স্বয়ংও অতি বিচিত্রভাবে জীবনলীলা সংবরণ করিলেন। এই অপূর্ব্ব চরিত্রের দ্বারা তিনি আজ জগতের এমন এক আদর্শ মহাপুরুষ রূপে প্রতিভাত হইতেছেন, যাহার তুলনা কবি কল্পনাও সহজে খুঁজিয়া পায় না। এই মহান চরিত্র অনাসক্তির এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

যতই আমরা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বিশ্লেষণ করি, ততই আমরা তাঁহার অপূর্ব্ব জীবন দেখিয়া

মুগ্ধ ও বিস্মিত হই। তাঁহার চরিত্রে জগদ্‌গুরুর লক্ষণ পূর্ণ এবং স্পষ্টভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়। বৃন্দাবন ত্যাগের পর শিষ্য উদ্ধবকে তিনি জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। উদ্ধবের মনে জ্ঞানের অভিমান হওয়ায় তিনি বৃন্দাবনের ভক্তিপথাবলম্বীগণকে বিশেষতঃ ব্রজগোপীগণকে বেশ একটু ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার এই ভ্রম দূর করিবার জন্য তাঁহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে গিয়া উদ্ধব দেখিলেন, বৃন্দাবনের পশু পক্ষী এবং বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শোক-সাগরে মগ্ন হইয়াছে। ইহা দেখিয়া উদ্ধবের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। ব্রজবাসীদের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধার ভাব তিরোহিত হইল। জ্ঞানী, গুণগ্রাহী এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য উদ্ধব চীৎকার করিয়া বলিলেন, আমি এই ব্রজললনাদের চরণসেবাকারী লতাগুল্ম হইতে পারিলেও আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিব।

আসামহো ! চরণ রেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্
যা দুস্ত্যজং স্বজন মার্য্যপথং চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দ পদবী শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥

ইহাতেই উদ্ধবের আধ্যাত্মিক জীবন পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়া গেল।

প্রিয় সখা, ভক্ত এবং শিষ্য অর্জ্জুনকে তিনি কি শিক্ষা দিয়াছিলেন? গীতার আরম্ভেই তিনি তাঁহাকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। নানা প্রকারের যুক্তি দেখাইয়া তিনি অর্জ্জুনের মনে আত্মার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া দিলেন, কেননা আত্মাকে চিনিতে না পারিলে মানুষ জড়বাদী, নাস্তিক এবং সন্দেহাকুল হইয়া থাকে। সংসারতাপতপ্ত, হৃতসর্ব্বস্ব, দুঃখদৈন্যপ্রপীড়িত মানবের দুঃখ মোচন কল্পে তিনি বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—

নৈনং ছিন্দতি শাস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

অর্থাৎ শস্ত্র ইহাকে (আত্মাকে) কাটিতে পাবে না, অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, জল বিগলিত করিতে পারে না এবং বায়ু শুষ্ক করিতে পারে না। এই মহাবাণী জগতে অপূর্ব্ব নহে কি?—

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অধিকারী ভেদে দুই প্রকারের বিভিন্ন পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে শুদ্ধ সত্ত্ব হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; যাঁহাদের চিত্ত পারমার্থিক সত্য লাভের জন্যই সতত ব্যগ্র; ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ সুখলিপ্সা যাঁহাদের চিত্তের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; কাম সংকল্প যাঁহাদের চিত্ত কলুষিত করিতে পারে না, সেই সকল পুরুষ সিংহের জন্য নিবৃত্তিমার্গ বা সাংখ্যযোগ; আর যাঁহারা বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াও তত্ত্ব জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাঁহাদের জন্য প্রবৃত্তিমার্গ বা যোগ পথের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্জ্জুন রাজসিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া সাংখ্য যোগের অধিকারী ছিলেন না। তাই তিনি তাঁহার জন্য কর্ম্ম-যোগের বিধানই করিয়াছেন। বস্তুতঃ ফলাসক্তিবিহীন কর্ম্ম কখনই বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। তাই জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ফলাকাঙ্খা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবারই উপদেশ দিলেন। কর্ম্মত্যাগ করিতে বলিলেন। ইহাই গীতোক্ত ধর্ম্মের বিশেষত্ব। মানুষ কর্ম্মত্যাগ

করিয়া ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারে না। এই কর্ম্ম সকাম হইলেই বন্ধনের কারণ হয়, এবং নিষ্কাম হইলে উহাকে অবলম্বন করিয়াই সামান্য মানব ও মুক্তি পথে অগ্রসর হইতে পারে।

গীতোক্ত ধর্ম্মের আর একটী বিশেষত্ব এই যে ইহা সর্ব্ব ধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব মহাসমন্বয়। এই ধর্ম্ম কেবল পরমত সহিষ্ণুতারই চূড়ান্ত উদাহরণ নহে, সমস্ত ধর্ম্মকে ইহা সত্য বলিয়াও ঘোষণা করিয়াছে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

অর্থাৎ "যে আমাকে যে ভাবে সেবা করে আমি তাহাকে সেই ভাবেই কৃপা করি অর্থাৎ ফলদান করি। মানুষ সর্ব্বদা আমার নিকট পৌছিবার পথেই চলিতেছে" এত বড় মহাবাণী জগতে আর কখনও উচ্চারিত হইয়াছে কিনা জানি না। আজিও জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি ধর্ম্মের নামে অহরহঃ পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার অভিনয় করিতেছে। এই মোহান্ধ মানবের দল যে এই ভাবে কত শত নির্দ্দোষ নরনারীর পবিত্র শোনিতে ধরিত্রীর বক্ষ কলুসিত করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই ধর্ম্মান্ধ মানবগণ যদি জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণপ্রচারিত মহা ধর্ম্মের অনুসরণ করে তবে এই অশান্তি-দগ্ধ জগতে যে নিমিষের মধ্যে মহাশান্তি স্থাপিত হইবে তাহাতে লেশ মাত্রও সন্দেহ নাই। এই ধর্ম্ম আমাদিগকে দুর্ব্বল বা কাপুরুষ হইতে কখনই শিক্ষা দেয় না; পক্ষান্তরে ইহা অভ্যুদয়; এবং নিশ্রেয়স অর্থাৎ পারলৌকিক উন্নতি এবং আত্মার মোক্ষ এই উভয় বিষয়েই যথার্থ শিক্ষা দিয়া থাকে। গীতা ভাষ্যের ভূমিকার আরম্ভেই ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—'ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহার রক্ষার জন্য মরিচি আদি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিলেন এবং বেদোক্ত প্রবৃত্তিলক্ষণা-ক্রান্ত ধর্ম্মে তাঁহাদের প্রবৃত্তি দিলেন। তৎপরে তিনি সনক সনন্দনাদিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বৈরাগ্য লক্ষণযুক্ত নিবৃত্তি ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। বৈদিক ধর্ম্মের দুইটী বিভাগ আছে—প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ। গীতার মহাবাণী আমাদিগকে তেজবীর্য্য প্রভৃতির উপর নির্ভর করিতেই শিক্ষা দেয়, এবং আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস হারাইয়া দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতার বশবর্ত্তী হওয়াকে ঘোর নিন্দনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করে। "সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তি মরণাদতিরিচ্যতে।" এই শিক্ষা ভুলিয়াই আজি আমরা দুর্দ্দশার অতল গহ্বরে নিপতিত হইয়াছি। যদি আমরা আবার পূর্ব্ব গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতে শক্তিশালী জাতিরূপে টিকিয়া থাকিতে চাহি, তবে গীতোক্ত মহাধর্ম্মেরই আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে। যাঁহার পাঞ্চজন্য নিনাদে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ক্লীবতাগ্রস্ত অর্জ্জুনের হৃদয়েও মহাবীর্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই পুরুষসিংহ জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মানুশীলনে যে আজিকার মোহাচ্ছন্ন ভারত সুপ্তোত্থিত ও সংঘবদ্ধ হইয়া আবার নিজের বিজয় কেতন উড্ডীন করতঃ বিশ্বের জয়মাল্য লাভ করিতে সক্ষম হইবে তাহাতে সংশয়ের লেশমাত্র অবকাশ নাই।

শিব ও সর্গ

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি

"স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ" (ঋ, ১০।১২৯।৫) স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদরহিত স্বস্ব রূপে স্থিত; পুরুষ ইন্দ্রিয়াতীত। অদৃশ্যাবস্থায় অধঃস্থিত এবং ত্রিগুণা প্রকৃতি উপরে ভাসমানা প্রতীয়মানা হয়েন। "The self-snpprting Principle beneath and the Euergy aloft." (Wilson)।

এই প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্বটী সূক্ষ্মত্বাং দুর্বিজ্ঞেয়; তাই সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা" করতঃ তন্ত্রোক্ত কালী তারাদির পদতলে শিব স্থাপিত। সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতা প্রকৃতি উপরে আর যাহা মূলতত্ত্ব তাহা দৃশ্যপটের নিম্নে অন্তরালে স্থিত। অথবা ভাষান্তরে গৌরী পট্টাবৃত বা অহি পরিবেষ্টিত বন্ধন চিহ্নিত শিবলিঙ্গাদির অবতারণা মনীষিগণ করিয়াছেন। শিব ও ব্রহ্ম একার্থবাচী। তদযথা—"প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবং অদ্বৈতং (মাণ্ডুক্যশ্রুতি)। যখন জগৎ প্রপঞ্চ উপশমপ্রাপ্ত বা বিলীন্ হইয়াছে, তখনই শান্তরসে রসিত, অখণ্ডৈক রস, দ্বৈতহীন, মঙ্গলপ্রদ, আনন্দ স্বরূপ শিবতত্ত্বের বিকাশ। অন্যত্র 'যদাতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি র্ন সন্নচাসৎ শিব এব কেবলঃ" (শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি), অর্থাৎ যখন অতমঃ (তমঃ নাই) দিন রাত্রি নাই, অর্থাৎ কালাবচ্ছিন্নত্বের অভাব, সৎ (মূর্ত্ত), অসৎ (অমূর্ত্ত) কিছু নাই, তখন কেবল যিনি থাকেন তিনিই শিবতত্ত্ব। অথবা "একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ।" অর্থ—যখন 'রু' বা জ্ঞানস্বরূপের বিকাশে মায়িক সব কিছু দ্রাবিত বা লয়প্রাপ্ত তখনই দ্বিতীয় রহিত শিবতত্ত্ব। উপরি উক্ত মন্ত্রাদি দ্বারা বেদ শিবতত্ত্বই যে ব্রহ্মতত্ত্ব তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। ইহাতে শিবতত্ত্ব প্রলয়ের পর যে অবস্থা তাহারই দ্যোতক, এবং সৃষ্টি বন্ধনের হেতু অর্থাৎ দুঃখের নিলয়।

ঋগ্বেদের ১০।১২৯।৪ মন্ত্রে ("কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ। সতোবন্ধুরসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা") সৃষ্টিই যে বন্ধনের হেতু তাহা সুস্পষ্ট। যখন বহু হইবার কামনা জাগিল, সূক্ষ্ম বুদ্ধিতত্ত্বাদি মানস সর্গ হইল, তখনই অসতের দ্বারা সতের বন্ধন ঘটিল। ইহা মনীষা সম্পন্ন ত্রিকালদর্শীগণ হৃদয়ে বিচার দ্বারা জানিয়াছেন। সুতরাং তাহা কখনই শ্রেয়ঃ হইতে পারে না। কিন্তু সাধারণে নিরস্ত সর্ব্ব উপাধি শিবতত্ত্বের—প্রধ্বংসের—অর্থাৎ মুক্তির শ্রেয়তা ধারণা করিতে পারে না। পরন্তু তাদের নিকট প্রকৃতির বিকার যে সৃষ্টি তাহাই প্রিয়তর বা প্রেয়। তাই তাহারা প্রকৃতির শাসনে পুং স্ত্রী সংযোগে উৎপত্তি দৃষ্টে সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত অনুত্তম অব্যয় যে শিবতত্ত্ব তাহাতে প্রকৃতি উপাধিক মলিন জীবতত্ত্বের নিদর্শন স্বরূপ যোনিযুক্ত যে লিঙ্গ তাহাই শিবতত্ত্বরূপে "জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ" বাক্যে প্রেয় ও শ্রেয় জ্ঞানে জীবনব্যাপারে পরিণত করিয়া লইয়াছে। শিবলিঙ্গ ব্রহ্মের প্রতীক বা চিহ্ন। তাহা "আকাশং লিঙ্গমিত্যাহু পৃথিবী তস্য পীঠিকা, আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়নাল্লিঙ্গমুচ্যতে" বাক্যে সুস্পষ্ট। আকাশ হইতে ব্যাপক ও সূক্ষ্মতরকে কোন্ মতে আকাশবৎ বলা যায়। শ্রুতিকে

বিরাট বৈশ্বানর মূর্ত্তি ভূ র্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকব্যাপী। স্বঃ বা দ্যৌঃ তাঁর মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু, নৈশ আকাশব্যাপী ছায়াপথ তার জটা, অন্তরীক্ষ তার বপু বা মধ্য অঙ্গ ও তৎস্থিত মেঘ বিদ্যুতাদি রূপী অহি বা সর্প তার অঙ্গের ভূষণ ভূলোক তার পাদস্থানীয়, তদ্গাত্র সর্ব্বদেবগণের আলয়স্বরূপ, অর্থাৎ, ইন্দ্রলোক, বায়ুলোক, বরুণলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি সর্ব্বলোক তার দেহেই স্থিত। এই সব প্রপঞ্চালয়ে যিনি থাকেন তারই লিঙ্গ অর্চ্চিত হয়। শিব, ঈশান, মহাদেব শব্দ ঋক সাম যজুতে দৃষ্ট হইলেও পাশ্চাত্যগণ তাহা বেদে নাই কল্পনায় শিবার্চ্চন অর্ব্বাচীন এবং ইহা অনার্য্যগত ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। এতদ্দেশে তদ্দিগের কৃতদাসগণ এই মিথ্যা উক্তি গলাধঃকরণ ও উদ্গীরণ করিয়া থাকেন।

তন্ত্রোক্ত ছিন্নমস্তাদির রূপকল্পনাও ব্রহ্মোপাসনার সহায়ক জন্য বর্ত্তমান কালে বেদের পঠন পাঠন অভাবে তন্ত্রশাস্ত্রের আদর হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত ছিন্নমস্তায়, কমলকুসুম উপরি শয়ান যুবক যুবতীর সম্পরিষিক্ত অবস্থাঙ্কিত আসন উপরি দেবী দণ্ডায়মানা। স্বীয় অহঙ্কাররূপ মস্তক একহস্ত-স্থিত জ্ঞানাসিতে ছেদন করতঃ অপর হস্তে তাহা ধারণ করিয়া আছেন। জাগতিক সুখের চরম এহেন কুসুমশয্যাশায়িত যে সম্পরিষিক্ত অবস্থা তাহাকে পদদলিত করতঃ যে সাধক কাঁচা অহ-ঙ্কারের মুণ্ডপাত করেন নির্ম্মম নিরহঙ্কার হয়েন, তিনিই স্বহৃদিস্থিত সর্ব্বরসাধার শান্তির উৎসোত্থিত মধুপানে সমর্থ হয়েন। এই 'রসো বৈ সঃ' যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহার স্ফুরণই মধুপান। এই মধুধারা পানে ছিন্নমস্তার ন্যায় সাধক আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হইয়া স্বারাজ্য লাভ করেন। 'দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেত', ছিন্নমস্তার উপাসক ছিন্নমস্তাই হয়েন। ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি। তাই ব্রহ্মবিদ্যা ঋগ্বেদে মধুবিদ্যা বলিয়া গণ্য। যে মধুবিদ্যা অশ্বশির মুখে মহর্ষি দধীচি অশ্বিনীযুগলকে উপদেশ করিলে ইন্দ্র দধীচির ঐ শির ছিন্ন করার উক্তি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১২ সূক্তে বিবৃত আছে। এবং 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' কহিতে গিয়া গীতার "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" বাক্যের ন্যায় "মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধুনক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধুদ্যৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।" এই সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্র ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ৯০ সূক্তে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে প্রাপ্ত খণ্ডশঃ শাকল শাখীয় ঋগ্বেদে মধুবিদ্যা সুপরিস্ফুট না থাকিলেও শতপথ ব্রাহ্মণে মহর্ষি দধীচিদৃষ্ট মধুবিদ্যা বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। বৃহদারণ্যক উক্ত ব্রাহ্মণাংশ বটে। তাহার ২য় অধ্যায়ে ৪র্থ ব্রাহ্মণে এই মধুবিদ্যা উক্ত আছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের শেষাংশে যে "ঈশা" উপনিষৎ তাহাও এই দধীচিদৃষ্ট মধুবিদ্যার সারাংশ লইয়া রচিত। এই মধুতত্ত্ব বা শিবতত্ত্বই জগন্নাথপুরীতে প্রকারান্তরে চিত্রিত আছে।

বেদান্তে ব্রহ্মই জগৎকারণ। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী, (তৈঃ ব্রহ্মানন্দবল্লী) 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্ব্রহ্মেতি। (তৈঃ ভৃগুবল্লী)। বেদান্তদর্শনেও "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র দ্বারা তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্মই জগৎ কারণ। স্বরূপ লক্ষণে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছেন। সাংখ্যের সৎপ্রকৃতি জগৎ কারণ কথাটী এতদ্দ্বারা নিরাকৃত। সৃষ্টি কেমনে হয় এতৎ সম্বন্ধে বহু মতবাদ পরিদৃষ্ট হয়। কেহ

বলেন রজ্জু সর্পবৎ ব্রহ্মে জগৎ ভ্রান্তিমাত্র। কেহ বলেন জীব জগৎ ব্রহ্মের অংশ হইলেও বরাবর পৃথক্ থাকে। কেহ বলেন কুলালবৎ সৃষ্টিরচনা। অর্থাৎ কুমার যেমন মৃত্তিকাদি উপাদান বাহির হইতে সংগ্রহ করতঃ দণ্ডচক্রাদির সাহায্যে ঘটাদি নির্ম্মাণ করে, তদ্বৎ নিত্য পরমাণু হইতে ঈশ্বর জগৎ রচনা করেন। কেহ বলেন তা নয়, মাকড়সা যেমন নিজের ভিতর হইতে রস নির্গত করিয়া সূত্র সৃজনে জাল তৈয়ার করিয়া তাহাতে বাস করে, তদ্বৎ তিনি নিজদেহ হইতেই উপাদান দিয়া জগৎ রচনা করেন ,কেহ বলেন বিস্ফুলিঙ্গবৎ তাঁহা হইতে জগৎ বহিরাগত। কেহ বলেন প্রকৃতিতে তিনি গর্ভাধান করেন, 'প্রকৃতিঃ সূয়তে স চরাকরম্'। কেহ বলেন, তৎসান্নিধ্যে স্বতন্ত্রা প্রকৃতি জগৎ রচয়িত্রী। ঋগ্বেদে মায়ার আবরণে আবৃত ব্রহ্ম জগৎ স্রষ্টা তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, উহারই প্রতীক জগন্নাথে পরিস্ফুট হয়।

শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ব্রহ্মই শুভ্র বর্ণ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিত 'বর' বা বলরাম। রময়তি, আনন্দয়তি ইতি রামঃ। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আরাম বা আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। সুভদ্রা বা মায়া উপহিত হওতঃ দৃষ্টিসৃষ্টি-কারী তটস্থ লক্ষণে কার্য্যব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা জগন্নাথরূপে বিরাজিত। অর্থাৎ গৌরীপট্টরূপ মায়ার আবরণে আবৃত হওতঃ পূর্ণশক্তি ঈশ্বররূপে বিনির্গত হইয়া মায়ার বিক্ষেপ শক্তিযোগে বিচিত্র জগৎ রচনা করেন।

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরোরূপং ঈয়তে," "রূপং, রূপং প্রতিরূপোবভূব"। (ঋ ৬।৪৭) ঈশ্বরের এই মায়িক পূর্ণত্বকে আদায় বা গ্রহণ করিলে অর্থাৎ মায়ামেঘ অপসারিত করিলে, শুদ্ধ বুদ্ধ পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। ইহাই ঈশোপনিষদে "হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং" বাক্যে প্রকাশিত। ইহাই ঋগ্বেদে 'তমসা গূঢ়মগ্রে প্রকেতং,' 'তুচ্ছেনাভ্যপিহিতং যদাসীৎ' এবং 'সতো বন্ধুরসতি' ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহাই 'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়, পূর্ণমেবাবশিষ্যতে' মন্ত্রে প্রকাশিত।

যদি কেহ জগন্নাথকে দর্শন করিতে চান তবে তাঁহাকে জাগতিক চরম সুখ যে পুংস্ত্রী সংসর্গাদি তাহা বাহিরে ত্যাগ করিয়াই লাভ করিতে হইবে। তাই জগন্নাথের মন্দিরের বাহিরে ঐ যৌন সম্বন্ধের চিত্র অঙ্কিত আছে। জাগতিক ভোগসুখ বাহিরে ত্যাগ করতঃ স্বীয় হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করিলে "অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষান্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ সেই বামনরূপী পুরুষের সন্দর্শন মিলে। ইহাই রথযাত্রারও বিষয়। "রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" কথাটী কঠউপনিষদের "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে" মন্ত্রের ব্যঞ্জক। হস্তাধিষ্ঠিত ইন্দ্র, পাদাধিষ্ঠিত বিষ্ণু, চক্ষুস্থ সূর্য্য, বাক্‌স্থ অগ্নি, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত দেবগণ শরীররূপ রথস্থ সেই বামনের উপাসনা করেন। "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি, শরীরং রথমেবতু। বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেবচ॥ ইন্দ্রিয়ানি হয়ানাহু র্বিষয়াং স্তেষু গোচরাণ্, আত্মেন্দ্রিয় মনযুক্তং ভোক্তেত্যা-হুর্মণীষিণঃ"। কঠ, তৃ বল্লী ৩।৪ দেহরূপরথে দেহীরূপ রথীর দর্শনই প্রকৃত রথযাত্রা—দারুময়রথে দারুময় বিগ্রহদর্শন মধু অভাবে গুড়বৎ মাত্র॥

দশাবতার চরিত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতিঃশাস্ত্রী

শ্রীরামচন্দ্র চরিত বৃত্তান্ত

শুনঃশেফ ঋষি বলিতেছেন—

স বাজং বিশ্বচর্ষণি রর্ষদ্ভিরস্ত তরুতা।
বিপ্রেভিরস্ত সনিতা। ১।২৭।৯ অ

অনুবাদ। সেই প্রসিদ্ধ বিশ্বকর্ষণকারী অগ্নিদেব অশ্বের (অর্থাৎ জগৎ বিস্তৃতিরূপ অশ্বের) দ্বারা তরুসমূহে পরিণত হউন এবং গ্রহ নক্ষত্ররূপ বিপ্র বা মেধাবী ব্যক্তির দ্বারা ফলদাতা হউন। **দ্রোণ কাক** ভূষণ্ডেরই নামান্তর। এই শব্দের ও শব্দগত রহস্য জানিলে প্রকৃত তত্ত্ব বোধগম্য হইবে। দ্রোণি শব্দের অর্থ পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান। অর্থাৎ উর্দ্ধে ও অধোদেশে যে কৃষ্ণবর্ণ লোকালোকে পর্ব্বত বিদ্যমান তন্মধ্যস্থ এই দৃশ্যমান জগতই দ্রোণি শব্দের অববোধক। আবার দ্রোণি শব্দের ব্যবহারিক অর্থ জলের গামলা জল সেচণী ও ডিঙ্গি। একই শব্দ স্থান বিশেষে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হয়; তাহার মর্ম্মাবগত না হইলেই আলোচ্য বিষয়টির উপলব্ধি না হইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। আলোচ্য বিষয়টি বুঝিবার জন্য, হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এইরূপ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল।

বসু শব্দের অন্যতম অর্থ কুবের। সমস্ত সোমধারা কুবেরের রাজধানী ছিল। পরে রাবণ (যম বাশসি) দক্ষিণ দিক্ কাড়িয়া লইলে কুবের উত্তর দিকের অধিপতি হন। এই জন্য কুবের উত্তর দিকের এবং যম (শণি) দক্ষিণদিকের অধিপতি।

(মন্দাকিনী) গঙ্গা হইতে উৎপন্ন অষ্ট বসু। ১। ভব (জল) ধর (পর্ব্বত, কূর্ম্মরাজ ধারণ কর্ত্তা) ২। ধ্রুব; ৩। সোম; ৪। বিষ্ণু; ৫। অনল; ৬। অনিল; প্রভূষ (অলংকৃত করণ, নক্ষত্র চক্ররাত্রি) প্রত্যূষ (প্রভাত) ৮। প্রভব (উৎপত্তি স্থান বা আকাশ, প্রভাব (শব্দ বা ধ্বনি) এই অষ্টগণ দেবতা সুরগঙ্গা মন্দাকিনী হইতে উদ্ভূত।

কুবেরের নাম ও পদ ইন্দ্রাপেক্ষা হীন হইবার কারণ। বায়ু পুরাণে তাহা স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে। ইলবিলার গর্ভে পুলস্ত্য। ঋষির বিশ্রবা নামে এক পৌলস্ত কুল-বর্দ্ধন পুত্র জন্মিয়াছিল। এস্থলে কুবের জননীরও কিছু পরিচয় জানিতে পারিলে ভাল হয়। ইল ধাতুর অর্থ শয়ন, গতি ও ক্ষেপণ। এবং বিল ধাতুর অর্থ সংবরণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে ঘোর নিবিড় অন্ধকার মধ্যে জ্ঞানবিশিষ্ট সৃষ্টিকারিণী গতি শক্তি নিহিত ছিল, তাহাই ইলবিলা আখ্যা প্রাপ্ত। বিশ্রবার চারি পত্নী—১মা দেবাচার্য্য বৃহস্পতির কীর্ত্তিমতী কন্যা দেববর্ণিণী; ২য়া মাল্যবান কন্যা পুষ্পোৎকটা; ৩য়া রাকী ৪র্থ মালবীর কন্যা বৈকসী। দেববর্ণিণীর গর্ভে দিব্য **আর্য্যোবিধিবেদজ্ঞ** জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈশ্রবণ (কুবের) জন্ম গ্রহণ করেন। বৈশ্রবণ রূপে রাক্ষসের মত এবং বিক্রমে অসুরের

মত ছিলেন। ইঁহার পিতা ইঁহার কুবের নাম রক্ষা করেন। কু অর্থে কুৎসা বা কুৎসিৎ এবং বের শব্দের অর্থ শরীর। কুশরীরত্ব হেতু কুবের নামে প্রসিদ্ধ। (অন্ধকার মধ্যে যে অগ্নি বা জ্যোতিঃ তাহাই কুবের)। কুবের ঋদ্ধির গর্ভে নলকুবেরকে (বিদ্যুৎকে) উৎপন্ন করেন।

কুবেরের ক্রীড়াস্থান কৈলাস পর্ব্বত। পর্ব্বত শব্দদ্বারা আমরা সাধারণতঃ যে অর্থ বুঝিয়া থাকি, তদ্ভিন্ন ইহার একটি গূঢ় অর্থ আছে, যাহা জানিলে কৈলাস পর্ব্বতের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইবে। ঐ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দ্বারা অন্য এক বিস্তৃত মহান্ ভাব মনোমধ্যে জাগে। পর্ব্বন্ শব্দ হইতেই পর্ব্বত শব্দের উদ্ভব। পর্ব্বন্+ত=পর্ব্বত। পর্ব্বন্ শব্দ পৃ ধাতু হইতে উৎপন্ন। পৃ পালন পুরণয়োঃ। পৃ ধাতুর অর্থ পালন ও পূরণ। যাহা পালন ও অভাবাদি পুরণ করে তাহাই পর্ব্ব বা পাব। পর্ব্বন শব্দের অর্থ গ্রন্থি, সন্ধি ইত্যাদি। দুইটি বস্তুর সন্ধি স্থল; এইরূপ অর্থে পর্ব্বত শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইহার আভিধানিক অর্থ গিরি, পাহাড় দেবর্ষিবিশেষ ও মৎস্যবিশেষ (মৎস্যাবতার) ইহা দ্বারাও বিষয়টি পরিস্ফুট হইল না। আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন প্রকার পর্ব্বত শব্দের ব্যবহার শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। পর্ব্বত সাধারণতঃ দুই প্রকার ভৌম পর্ব্বত ও ব্যোম পর্ব্বত। কোন দুই স্থানের গ্রন্থি পর্ব্বত নামে অভিহিত হয়। আমরা আকাশের চতুর্দ্দিকে যে নীলবর্ণ (নীলাকাশ) দেখিতে পাই তাহারই নাম লোকালোক পর্ব্বত। এইরূপ আকাশে অসংখ্য পর্ব্বত বিদ্যমান। ঐ নীলাকাশেই পুরাণের ব্যোম নীলগিরি। পার্থিব নীলগিরি ও আছে। এইরূপ বহু দ্রব্যের এক শেট পৃথিবীতে আর এক শেট নভোমণ্ডল পৌরাণিক বর্ণনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেঘসকলও পর্ব্বতাখ্যায় আখ্যায়িত। সুমেরুর চতুপার্শ্বে বহু পর্ব্বত বিদ্যমান। এসকল পর্ব্বত সৌরজগৎকে ও তদন্তর্গত গ্রহনক্ষত্রাদিকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত।

সুমেরুর দক্ষিণপার্শ্বে যে সকল পর্ব্বত আছে তাহাদের অন্যতম কৈলাস দক্ষিণস্থ পর্ব্বত সকলের মধ্যে ত্রিকূট, শ্বেতোদর বসুধার, রত্নবান্ একশৃঙ্গ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিমবান্ প্রভৃতি বহু পর্ব্বত বিদ্যমান। এই পর্ব্বতসকল সুমেরুর বা উত্তরধ্রুবের দক্ষিণস্থ গ্রহনক্ষত্র ভিন্ন অন্য কিছু নহে। হিমালয় হইতে পৃথিবীর উত্তর মেরু প্রদেশের মধ্যে ঐরূপ আখ্যা বিশিষ্ট পর্ব্বত আছে। হিমবান্ পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে কুবেরাচল কৈলাস অবস্থিত। নিধিপতি অলকাধিপ যক্ষরাজ কুবের, রাক্ষস ও বহু অপ্সরাগণের (তারকাগণের) সহিত সতত আমোদপ্রমোদে রত থাকিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। কৈলাস পর্ব্বতের পাদদেশে মন্দোদক নামে একটি সরোবর আছে, তাহার জল দধির ন্যায়। সেই সরোবর হইতে শুভপ্রদা আকাশগঙ্গা মন্দাকিনী প্রবাহিতা। অতএব দেখা যাইতেছে যে মন্দাকিনী বা সোমধারার উপরে মন্দোদক সরোবর, তাহার উপরে কৈলাস পর্ব্বত। সেই কুবেরাচল কৈলাস পর্ব্বত মানবের চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য। যোগ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—ষটচক্রের ঊর্দ্ধদেশে কৈলাস। কৈলাসেশ্বর সংজ্ঞ সদাশিব তথায় জ্যোতিঃ রূপে বিদ্যমান। ঐ স্বচ্ছসলিলা মন্দাকিনীর তীরে চন্দনবনসমন্বিত একটি সুগন্ধ পর্ব্বত ধ্রুবমণ্ডল কশ্যপালয় বিদ্যমান। ঐ পর্ব্বতটি সমস্ত ধাতুতে পরিপূর্ণ এবং না বর্ণযুক্ত নানারত্নপরিপূর্ণহেতু উহা চন্দ্রপ্রভা নামে অভিহিত হয়। তাহার সন্নিকটে আর একটি স্বচ্ছ সলিল সরোবর বিদ্যমান। তাহা হইতে আচ্ছাদানাম্না নদী প্রবাহিতা। (সপ্তর্ষি মণ্ডল অচ্ছ=ভল্লুক) তাহারই তীরে সুবিখ্যাত কুবেরের মহৎ চৈত্র রথবন

(চিত্রা নক্ষত্র সমন্বিত রাশিচক্র) ইহাই কুবেরের বিলাসোদ্যান। এখানে যক্ষসেনাপতি মনিভদ্র সৈন্যাদিসহ এবং কুবেরানুচর গুহকগণ সহ বাস করেন। এই স্থান দিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্দাকিনী প্রবাহিতা। কৈলাস শব্দের ধাতুগত অর্থ ক্রীড়া ভবন বা ক্রীড়াস্থান কিল+আস এবং ক+লস ধাতু হইতে উৎপন্ন। লস ধাতুর অর্থ ক্রীড়া। ক অর্থে ব্রহ্মা, আত্মা, জল। ব্রহ্মারই নামান্তর কুবের ও শিব ইত্যাদি অবস্থা, ক্রিয়া ও গুণানুসারে কবিগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

সপ্তকুল পর্ব্বতের অন্যতম পারিপাত্রই কুবেরের কৈলাস পর্ব্বত। সপ্তকুল পর্ব্বত এই ব্রহ্মাণ্ডের সংহতিস্বরূপ জীবদেহে সপ্তধাতুর ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া বিদ্যমান এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পোষণকারী। সপ্তকুল পর্ব্বত। যথা—

"মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিবান্ ঋক্ষবানপি।
বিন্ধ্যশ্চ পারিপাত্রসহ ইত্যেতাকুল পর্ব্বতাঃ॥

রামায়ণের বর্ণনার সহিত এই কুল পর্ব্বতের বিশেষ সংস্রব থাকায় অত্র তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক বোধে তাহা বিবৃত হইল, কুল শব্দের মূলগত অর্থ না জানিলে কুলপর্ব্বত জিনিষটা কি তাহা উপলব্ধি হইবে না। কুলধাতু হইতে কুল শব্দ উৎপন্ন। কুলধাতুর অর্থ সংযত বা সংঘাত এবং বন্ধুতা বা বন্ধনভাব। কুল শব্দের অর্থ সমূহ, দেহ, গেহ, দেশ, ইত্যাদি। পরমাণুরূপ মহাভূতগণের সমষ্টিতে দেহ এবং গেহ সংগঠিত হয় বলিয়া গেহেরও দেহের নাম কুল। যেমন মানব দেহরূপ গেহে জীবাত্মা বাস করেন সেইরূপ গ্রহনক্ষত্ররূপ গেহে দেবতাগণ বাস করেন। এইজন্য গ্রহনক্ষত্রগণকে দেবগৃহ বলা হয় যেরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ মানবদেহে সপ্ততত্ত্ব দ্বারা ধৃত হয় বলিয়া কুল বলা হয়; সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ বিরাট দেহকেও কুল বলা হয়; কারণ উক্ত সপ্তপর্ব্বতই সপ্ততত্ত্বের আকর স্বরূপ হইয়া এই দৃশ্যমান চরাচর ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট দেহকে সংহতি দ্বারা যথাযথ ভাবে ধারণ করিয়া বিদ্যমান। এই হেতু ঐ সপ্তপর্ব্বত কুল পর্ব্বত আখ্যায় আখ্যায়িত।

নভোমণ্ডলে সপ্তপর্ব্বতের অবস্থান। ১। মহেন্দ্রপর্ব্বত আদি পর্ব্বত মহামেরু বা সুমেরু গিরিতে। ২। মলয় (চন্দনাচল) সুমেরুর দক্ষিণে (ধারণার্থক মলা ধাতু হইতে মলয়। ইহা ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া বিদ্যমান) কুমেরু গিরি। ইহা কৈলাস পর্ব্বতের অন্তর্গত। ৩। সহ্য পর্ব্বত—সূর্য্যলোক (সহধাতু) অর্থ সহন ও শক্তি, অতএব শক্তির উৎপত্তি স্থান)। ৪। শুক্তিবান্ চন্দ্রলোক (শুক্তি সপ্তে কপাম খণ্ড। ৫। ঋক্ষবান সপ্তর্ষিমণ্ডল। ৬। বিন্ধ্য ব্রহ্মার মানসাচল (বি+ধৈ ধাতু হইতে বিন্ধ্য শব্দ সিদ্ধ ধৈ ধাতুর অর্থ চিন্তা। বি+ধৈ ধাতুর অর্থ—বিশেষ রূপ চিন্তা বা ধ্যান বা তপস্যা। ইহাই তপোলোক। এই স্থানে ব্রহ্মা সৃষ্ট্যর্থে তপস্যা করেন। পারিপাত্র (পারিপাত্র ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টনী ছায়াপথরূপী পর্ব্বত (সন্ধি স্থল) তন্মধ্যে আকাশ সমুদ্রে। (বারিন—বারি+ই=সমুদ্র দোহন পাত্র। ছায়াপথ হইতে সমস্ত ধাত্বাদি সৃষ্টির উপাদানস্বরূপ পদার্থ আকাশ সমুদ্ররূপে দোহনপাত্রে রক্ষিত হয়। ইহাই সপ্ত কুলপর্ব্বতের মধ্যে বৃহত্তম। শিবেরও আবাসস্থান কৈলাস পর্ব্বত। শিব শ্বেতবর্ণ এবং কুবের কৃষ্ণবর্ণ। উভয়ে একস্থানে, এক গৃহে পাশাপাশি দুইটি প্রকোষ্ঠে বাস করেন। সুতরাং ইহাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব থাকাই সম্ভব। আমাদের মনে হয় ভবস্যাজের "অহঙ্ক কৃষ্ণ মহরর্জুনঞ্চ" ৬।১১।১ ঋ এই বেদশাস্ত্রই কুবেরের ও শিবের উপাখ্যানের মূল।

কালনেমী (মি)। আভিধানিক অর্থ রাক্ষসবিশেষ ও দৈত্যবিশেষ। রাবণের সহিত ইহার সম্বন্ধ আছে। মহিলা মহলে ও সাধারণ জনগণমধ্যে কথিত হয়—"রাবণের কালনেমী মামা। প্রাসণার্থক নী ধাতু হইতে নেম শব্দের উদ্ভব। নেম অর্থে কাল অবধি ও গর্ত্ত, নেমী অর্থে চক্রের পান্তু ও তীর্থস্থান। দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড চক্রের কৃষ্ণবর্ণ পান্তুভাগই কালনেমি বা কালচক্র। The fine blue colour of the firmament or the blue vault above and around the earth—নানা পুরাণে ইহাই দৈত্য নামে খ্যাত। হরিবংশে ৪৮ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণহস্তে ইহার নিধন বর্ণিত। In plain speaking the blue vault is the boundary walls of this visible world,

শ্রীরামচন্দ্র চরিত।

চতুর্ব্বিধ রাম বা চারিজন রাম। প্রাচীন গ্রন্থে চারিজন রামের নাম অবগত হওয়া যায়। নিম্নে সমাহারে চারিজন রামের বিষয় প্রকাশিত হইল।১। প্রথম বা আদি রাম হইতেছেন মনোবাণীর অতীত সমস্ত তত্ত্বের অতীত পরম পুরুষ। পরমাত্মাই আদি রাম শব্দের অববোধক এবং তিনিই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। তিনিই পরম ব্রহ্ম। কেহ তাঁহাকে কৃষ্ণ, কেহ গোবিন্দ, কেহ মহান্ ইত্যাদি বহু নাম প্রদান করিয়া উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন।

মুক্তিকোপনিষদে সেই বাগাতীত স্বয়ং রামই হনুমানকে যোগশিক্ষা দিবার সময় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন—

এই যে রাম ইনিই পূর্ণ পরব্রহ্ম। ইঁহার উপসনাদ্বারা নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হয়। ইহা বহুজন্মের সাধনা সাপেক্ষ।

> অশব্দমস্পর্শসরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবর্চ্চযৎ।
> অনাথ গোত্রং মমরূপমীদৃশং ভজস্ব নিত্যং পবনাত্মজার্ত্তিহম্॥
> দৃশিস্বরূপং গগসোপমং পর সকৃৎ বিভাতং ত্বজমেকমক্ষরম্।
> অলোকং সর্ব্বগতং যদ্বয়ং তদেব চাহং সকলং বিমুক্তং॥
> দৃশিস্তু শুদ্ধোঽহসবিক্রিয়াত্ম কো ন মেঽস্তি কশ্চিৎ বিষয়ঃ স্বভাবতঃ।
> পুরস্তির সেচার্দ্ধমধশ্চ সর্ব্বতঃ সুপূর্ণ ভুমাহমিতিহ ভাবয়॥
> অজোঽমরশ্চৈব তথাজরোঽহ মতঃ স্বয়ং প্রভঃ সর্ব্বগতোঽহমব্যয়ঃ।
> ন মে কারণং কার্য্যমতীত্য নির্ম্মলঃ সদৈব তৃপ্তোঽহমিতীব ভাবয়॥

মুক্তিকোপনিষৎ। ১০—১৩।

অনুবাদ। হে পবনকুমার! তুমি আমার নিম্নোক্ত প্রকার রূপ নিত্য ভজন করিবে। আমার রূপ কি প্রকার তাহা বলিতেছি শুন। আমার রূপ শব্দবাচ্য নহে; ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব যোগ্য নহে; কোনরূপাকারে আকারিত নহে; সর্ব্বতোভাবে ব্যয় রহিত; রসনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, নাম গোত্র বিহীন. এই প্রকার আমার স্বরূপ চিন্তায় সর্ব্বদুঃখের অবসান হয়। আমার এই অচিন্ত্যরূপ, সর্ব্বদ্রষ্টা রূপে বিদ্যমান, নভোবৎ সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বোৎকৃষ্ট একবার মাত্র দীপ্তিমান হইয়া চির দীপ্তান্বিত, জন্মমৃত্যু রহিত এবং অক্ষয়; নির্লিপ্ত, সর্ব্বব্যাপী, অদ্বয়

সর্ব্ববিষয়ে বিমুক্ত স্বভাব, আমি দ্রষ্টাস্বরূপ, শুদ্ধ, বিকাররহিত, আমার নিজের স্বাভাবিক কোন বিষয় নাই   আমি অগ্র পশ্চাৎ উর্দ্ধ ও অধঃ সর্ব্বত্রই পরিপূর্ণ; আমি সম্পূর্ণ ভূমা অর্থাৎ সর্ব্ব বস্তুতে আমি পরিব্যাপ্ত এই প্রকার আমাকে ভাবনা কর। আমি জন্মমৃত্যু ও জরা রহিত; আমি অমৃত স্বরূপ আমি স্বয়ং জ্যোতিঃবিশিষ্ট সর্ব্বগত ও অব্যয় আমার কারণও নাই কার্য্যও নাই অর্থাৎ সর্ব্ব কার্য্যের অতীত এবং অতি নির্ম্মল; আমি সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত; এই প্রকারে ভাবনা কর, এই ভাবে ভাবনা করিয়া সদ্ভাবাপন্ন হও। তদ্বারা অন্তে বিদেহ বা চিরনির্ব্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।

২। আদি রামের বা ব্রহ্মের মানসপুত্রস্বরূপ নক্ষত্রাদিরূপে প্রকাশভাবই দ্বিতীয় রাম। ইহার মধ্যেও বিভিন্ন স্তর আছে। যথা পরশুরাম, শ্রীরাম ও বলরাম।

মুক্তিকোপনিষদের পূর্ব্বোক্ত যোগসাধনার উপদেশ উচ্চশ্রেণীর কঠোর যোগিগণের জন্য। উক্ত উপদেশের শেষভাগে আর দুইটি শ্লোকের দ্বারা দ্বিতীয় শ্রেণী সাধকের জন্য আধিদৈবিক ভাবে লিখিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা বিষ্ণুস্বরূপ রামের রূপ দর্শনযোগ্য। অর্থাৎ সাকার ভাব ও স্বগুণভাব। সেই শ্লোক দুইটি বুদ্ধচরিতে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

অথর্ব্ববেদীয় **শ্রীরামোপনিষদদুক্ত রামও** কতক পরিমাণে এই ভাবের। তাহাতে উক্ত হইয়াছে—'রামাঙ্গ প্রণবঃ কথিতঃ।" প্রণবই রামের অঙ্গস্বরূপ। এই শ্রীরাম উপনিষদের বক্তা হনুমান এবং শ্রোতা ও প্রশ্নকর্ত্তা শনকাদি ঋষিগণ। এই উপনিষদে রামের স্বরূপ নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

রাম এব পরং ব্রহ্ম রামএব পরংতপঃ।
রাম এব পরং তত্ত্বং শ্রীরামোব্রহ্ম তারকম্ ॥৫।

পূর্ণাঙ্গঃ রাম সম্বন্ধে যোগীন্দ্রগণের প্রশ্নের উত্তরে হনুমান বলিতেছেন—

বিঘ্নং বাণীং দুর্গাং ক্ষেত্রপালং সূর্য্যং চন্দ্রং নারায়ণং নারসিংহং বাসুদেবং বরাহং অস্ত্রাংশ্চ কাং শ্চিৎ সর্ব্বান্ শ্রীসীতাং লক্ষণং হনুমন্তং শত্রুঘ্নং বিভীষণং সুগ্রীবং অঙ্গদং জাম্বুবন্তং ভরতং এতান্ রামস্যাঙ্গান্ জানীয়াৎ"। রাম নামের মহিমা—

"রাকাবোচ্চারণাদেব বহির্গচ্ছন্তি পাতকাঃ।
পুনঃপ্রবেশ শঙ্কায়াং মকরস্তং কপাটিবৎ ॥ বশিষ্ঠ
অপিচ। রাশব্দো বিশ্ববচনো মশ্চাপীশ্বরঃ বাচয়ঃ।
বিশ্বানামীশ্বরো যোহি তেন রাম প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
পরিপূর্ণতমো রামো ব্রহ্মশাপাৎ স বিস্মৃতঃ।
ব্রঃ বৈঃ পুঃ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড।

প্রণবরূপ শব্দের যিনি ঈশ্বর তিনিই রাম। মায়াবশে জীবরূপী রাম তাহা বিস্মৃত।

এই সকল উক্তি ও বর্ণনা কেবল মানবরূপী রামের জন্য নহে। এই উপনিষদানুসারে প্রণব মন্ত্রের (ওঁ) ও রাম মন্ত্রের ফল সমান। এই প্রকারে অনাম গোত্র পরমাত্মার বহু নাম কল্পনা করিয়া এক ঘোর গোলযোগের সৃষ্টি করা হইয়াছে। সাধনার পথ নিবিড় কণ্টকাবৃত অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ৪৪ সর্গে সনৎকুমার দশাননকে রামের অবতারত্ব বর্ণনা কালে রামের অধ্যাত্ম ও অধিদৈব ব্যাপারের উল্লেখ আছে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত "রাম গীতায়" রাম বক্তা ও লক্ষণ প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতা। এই গীতোক্ত রাম সত্ত্বাদিগুণত্রয় রহিত এবং মায়াতীত। সুতরাং ইহাও অধ্যাত্ম রাম।

যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠ ঋষি বক্তা ও দশরথ পুত্র রাম শ্রোতা ও প্রশ্নকর্ত্তা। একস্থানে বশিষ্ঠ ঋষি রামকে উপদেশ দিতেছেন—"সমুদ্ধর মনোরাম মাতঙ্গমিব কর্দ্দমাৎ।"
এইরূপ উপদেশ সংসারী গৃহী মানবের প্রতিই প্রযুজ্য হইতে পারে। কারণ আদি পূর্ণব্রহ্মাণ্ড রামের কেহ গুরু বা উপদেষ্টা হইতে পারেন না।

পুরা কল্পের রামায়ণ কাহিনী। পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডের ৭১ অধ্যায়ে ইহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত। তাহার বর্ণনা সম্পূর্ণ পৃথক ভাবের। তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে দশরথের প্রথম পুত্র ভল্লুককর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে। তৎপরে যজ্ঞ করিয়া চারি পত্নীগর্ভে চারি পুত্র লাভ হয় তাহাতে সুরূপা হইতে ভরত এবং সুবেশা হইতে শত্রুঘ্ন। ইত্যাদি অনেক বিষয়ের পার্থক্য দেখা যায়। স্থূল কথা ইহা পরশুরামকে বা অন্য নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়াই উপাখ্যান রচিত বলিয়াই মনে হয়।

রাম রাজত্ব। কোন দেশের রাজা সদাশয় প্রজাপালক ও প্রজাবৎসল হইলে লোকে বলিয়া থাকে "আমরা রাম রাজত্বে বাস করিতেছি"। রামসহ উপমাবিশিষ্ট এই প্রবচনটি বহুকাল হইতে সর্ব্বশ্রেণীর জনগণের মধ্যে প্রচলিত। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ৫১ সর্গে রাম ও ভরতের কথোপকথন, কথক গণের কথকথায় সর্ব্বসাধারণে ঐ প্রবচনটি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইহার গূঢ় মর্ম্ম হইতেছে, পুরাকালে সূর্য্য চন্দ্রাদি, গ্রহ উপগ্রহ সমন্বিত এই সৌরজগৎ সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্বে পৃথিবীতে নানা উপদ্রবাদি হইত; কিন্তু সূর্য্য রূপী রামের আবির্ভাব ও রাজত্ব কালে সে সকল দূরীভূত হইয়া পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত ও যথাযথ ভাবে সৃষ্টি প্রবাহচালিত সমস্ত বিঘ্ন দূরীভূত হইয়াছিল। ভরতের উক্তি মধ্যে তাহাই নিহিত এবং অন্যান্য পুরাণের উপাখ্যান হইতেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়। রামায়ণের মধ্যেও শেষভাগে পরবর্ত্তী কালে অনেক কৃত্রিম অপর লেখকের লিখিত উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট বলিয়া সুধিগণ স্থির করিয়াছেন। ত্রেতাযুগ ঋগ্বেদের যুগ। তৎকালে যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে সকল শ্রেণীর লোককেই যজ্ঞার্থে যজ্ঞে যোগদান জন্য আহ্বান করা হইত। এরূপ মন্ত্র ঋগ্বেদে দেখা যায়। ঋগ্বেদের সময়ে কলিযুগের মত শ্রাদ্ধ প্রথা ছিল না, মৃতসংকারও বিভিন্ন প্রকার ছিল। শিবমন্দিরও তৎকালে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সমস্তই পরবর্ত্তী কালের ব্যাপার।

যুদ্ধার্থে লঙ্কা গমন জন্য সেতু নির্ম্মাণ।—এই সেতু কিরূপ মহাকবি কালিদাস নিম্নোক্ত শ্লোকে তাহা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। পুষ্পকরথারোহণে সীতা উদ্ধারান্তে রাম অযোধ্যা প্রত্যাগমন কালে সীতাকে সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপার বর্ণনা করিতেছেন।

বৈদেহি! পশ্যামলয়াৎ বিভক্তং মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিস্কৃত চারুতারম্॥ রঘুবংশ ১৩শ সর্গ।

প্রকৃত এই ছায়াপথই লঙ্কাদ্বীপে (দক্ষিণ বা পরধ্রুবে) যাইবার সেতু। শরৎকালের রজনীতে ইহার দৃশ্য অতি সুস্পষ্ট ও অতি মনোহর। পরম ব্যোমস্থ এই ছায়াপথ সহ পার্থিব সেতু উপমিত। এই ছায়াপথরূপ সেতু উত্তীর্ণ হইয়া বানরবাহিনী লঙ্কাদ্বীপ আক্রমণ করেন। (অগ্নি প্রথমে দিব্‌ লোকে উৎপন্ন হইয়া পরে ভূর্ল্লোকে (কুমেরুতে) ব্যাপ্ত হয়, ইহাই বেদের উক্তি।

শ্রীরামচন্দ্রের পুষ্পকরথ।—এই রথ পূর্ব্বে কুবেরের ছিল। লঙ্কা জয় ও রাবণবধান্তে কুবের ইহা রামচন্দ্রকে প্রদান করেন। উত্তর কাণ্ডে ৫১ সর্গে ও অন্যান্য পুরাণে ইহার বিবরণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত। ইহা সূর্য্যরথ নামে প্রথিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রারম্ভ হইতেই ইন্দ্রাদি দেবতার রথ বিষয়ক বহু মন্ত্র রচিত হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ গীতায় "সৃষ্টিতত্ত্ব" শীর্ষক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। এই পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া রামের অযোধ্যায় প্রত্যাগমনবিষয়ক বৈহায়সতত্ত্বপূর্ণ সুললিত মনোমুগ্ধকর গাথা লঙ্কাকাণ্ডের ১২৫ সর্গে ও রঘুবংশের ১৩ সর্গে লিপিবদ্ধ। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের উপাখ্যানের মূল ভিত্তি বেদমন্ত্র। বেদমন্ত্রের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম হইলেই সহজে বুঝা যায়।

শ্রীরামসুহৃৎ জটায়ুর স্বরূপ নিরূপণ।—সসীতা রামলক্ষণ অগস্ত্যের সহিত দর্শন ও কথোপকথনান্তে তাঁহার উপদেশানুসারে গোদাবরী সমীপস্থ পঞ্চবটীতে বাসার্থ গমন কালে পথিমধ্যে এক ভয়ানক পরাক্রমশালী গৃধ্রের নিকটবর্ত্তী হইলেন। গোদাবরী নদীই বা কোথায় এবং পঞ্চবটী বা কোথায় তাহা জানা আবশ্যক। পঞ্চবটী দণ্ডকারণ্যের মধ্যে একটী বন। দণ্ডকারণ্যের বিবরণ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। পঞ্চবটী কিরূপ? তাহারও কিছু বিবরণ জানা আবশ্যক। পঞ্চবটী শব্দের দ্বারা সাধারণত আমরা বুঝিয়া থাকি যে, যেখানে ৫টি বটগাছ থাকে তাহাই পঞ্চবটী। আবার সাধু সন্ন্যাসীরা তপস্যার জন্য অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, অশোক ও আমলকি এই পঞ্চ বৃক্ষের দ্বারা বা পঞ্চবৃক্ষ রোপণে যে গোলাকার স্থান প্রস্তুত করা হয় তাহাকে পঞ্চবটী বলে। রামসীতা ও লক্ষ্মণের যে পঞ্চবটীতে বাসের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা এই পৃথিবীস্থ পঞ্চবটী নহে। বটধাতুর অর্থ কথন বা শব্দ, চেষ্টা, বিভাগ ও বেষ্টন। কুজাদি পঞ্চ তারা গ্রহবেষ্টিত সৌর জগৎই সূর্য্য চন্দ্ররূপী রাম লক্ষ্মণের প্রবাসবাটী পঞ্চবটী। গোদাবরীর স্থান নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। কারণ গোদাবরী সমীপেই উক্ত পঞ্চবটী বিদ্যমান। গোদাবরীর অন্যতম নাম গৌতমী, অর্থাৎ গৌতম ঋষির পত্নী অহল্যা (আকাশস্থ অহল্যা)। এক্ষণে গৌতম ঋষির পরিচয় পাইলেই গৌতমীকে স্পষ্টভাবে জানা যাইবে। গৌতম হইতে গৌতম এবং গত্যর্থসূচক গম্‌ ধাতু হইতে গো শব্দ। যাঁহা হইতে গতির উদ্ভব হইয়া জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে তিনিই গৌতম অর্থাৎ ব্রহ্ম। তাঁহা হইতে উদ্ভূত সোমরাজা বা বরুণ (বেদের পবমান সোম), ইনিই গৌতমপত্নী গৌতমী বা সোমধারা। যাঁহারা জগতে গো (জল, কিরণ) দান করেন তাঁহাদের মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই হেতু ইনি গোদাবরী আখ্যা প্রাপ্ত। এই সোমধারা হইতেই বিশুদ্ধ পরিশ্রুত বারি ত্রিপথদ্বারা সমস্ত বিশ্ব পরিপ্লাবিত হয়। এই গোদাবরী নদী সমীপেই পঞ্চতারা গ্রহসহ মণ্ডলাকারে ভচক্রসমন্বিত পঞ্চবটী বিদ্যমান।

সীতাসহ রাম লক্ষ্মণ পঞ্চবটী গমন কালে যে ভয়ানক বিক্রমশালী গৃধ্রের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন সে গৃধ্রটি কিরূপ? গৃধ্রশব্দের সাধারণ অর্থ শকুনি পক্ষী। গৃধ ধাতুর অর্থ লিপ্সা, লাভেচ্ছা বা আকাঙ্খা। গৃধ্র (শকুনি) আকাশের অতি উচ্চ স্থানে উড়িয়া বেড়ায় এবং আহারের জন্য নিম্নদিকে অতি তীব্র দৃষ্টি থাকে। এইরূপ গুণবিশিষ্ট কোন বৈমানিক দেবশক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই অত্র গৃধ্র শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

যাহারা গৃধ্নু তাহারাই গৃধ্রসদৃশ। গৃধ্রপদবাচ্য কে? তাহা ঋক্‌, সাম ও যজুর্ব্বেদে আছে। "শ্যেনো গৃধ্রানাং পদবীঃ।" ৯৪৪ সাম উঃ আঃ। গৃধ্র ব্যক্তিদিগের পদবী শ্যেন। বাজ পক্ষীর

নাম শ্যেন। আবার অনেক ঋগ্মন্ত্রে চন্দ্র ও সূর্য্যকেও শ্যেন আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। গত্যর্থক শ্যে ধাতু হইতে শ্যেন শব্দের উদ্ভব। পাণ্ডুর (শ্বেত বা শ্বেত পীত) বর্ণ শ্যেন শব্দের অন্যতম অর্থ।

এস্থলে কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কবি গৃধ্র শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা কবি স্বয়ং গৃধ্রের মুখ দিয়া ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন।

গৃধ্রসম্মুখীন রাম গৃধ্রকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গৃধ্র মধুর ও প্রিয় বাক্যে কহিলেন, "হে রাঘব! আমাকে তোমার পিতার বয়স্য (Contemporary) বলিয়া জানিও।" 'বয়স্য' শব্দের অর্থ সমান বয়স্ক ও স্নিগ্ধ। ইহা হইতে কি পাওয়া যাইতে পারে? রামের পিতা দশরথ—(চন্দ্র বা মন)।

নিম্নোক্ত বিবরণ হইতে বিজ্ঞ পাঠক রাম ও জটায়ুর সম্বন্ধটা বিচার করিয়া দেখিবেন।

পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"হে রাঘব! পূর্ব্বকালে যাঁহারা প্রজাপতি হইয়াছিলেন, কর্দ্দম (পৃথ্বি ও জল পরমাণুর আর্দ্রীভাব বা সূক্ষ্ম সংঘাত) তাঁহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ (কারণ ইহার সংহতি ব্যতিরেকে কোন রূপ বা অবয়ব গঠিত হইতে পারে না)। তার পর বিকৃত (বৈকারিক সৃষ্টি) শেষ (বায়ু) সংশ্রয়, বীর্য্যবান্ বহু পুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, অঙ্গিরা, প্রচেতা, পুলহ, দক্ষ, বিবস্বান, অরিষ্টনেমি ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হন। মহাতেজা কশ্যপ তাঁহাদের সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। (মরীচি বা রশ্মি হইতে কশ্যপের অর্থাৎ সুমেরুতে কশ্যপনামা নক্ষত্রের উদ্ভব। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কর্দ্দমাদি সকলেই অতি সূক্ষ্ম পরমাণুরূপী, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কারণ পরমাণু হইতেই এই জগতের সৃষ্টি। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে এই পরমাণুতত্ত্ব নিহিত।

হে রাম! কশ্যপ ঋষি দক্ষকন্যার মধ্যে অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা এই ৮ জনের পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাদের বলিয়াছিলেন—"তোমরা আমার সদৃশ ত্রৈলোক্যপালক পুত্র সকল প্রসব করিবে। সুতরাং কশ্যপপত্নীরা যে পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন তাঁহারা নক্ষত্র ও গ্রহরূপী। সকলেই বহু পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দনু অশ্বগ্রীব নামে এক পুত্র প্রসব করেন। দনু শব্দ জনধাতু হইতে উদ্ভূত। যাহা হইতে এই সৌর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে তাহাই দনু। অশ্বগ্রীব অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বা এই সৌর জগতের গ্রীবাস্বরূপ। নক্ষত্র-মণ্ডলকে বা রাশিচক্রকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত। বিষ্ণুপুরাণ পাঠক তাহা অনুভব করিতে পারেন এবং কশ্যপপত্নী মনু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি প্রকার মানুষ প্রসব করেন।

মন্তব্য।—মনস এই ক্লীবলিঙ্গ শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ অর্থাৎ অধ্যাত্ম ব্যাপার যাহা দেহের অভ্যন্তরে সম্পাদিত হয় (Mental affairs) মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারি অভ্যন্তরিক তত্ত্ব।

কশ্যপ হইতেছেন প্রাণ বা তৈজস শক্তি (Positive force) এবং দনু হইতেছেন আনবিক দ্রব্যশক্তি (Material negative force) এবং মনু হইতেছেন (মতি খ্যাতি) (mental negative force) মনু শব্দ পুং স্ত্রী উভয় লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। ব্যাকরণের পাণ্ডিত্যে সরল সুখলভ্য ব্রহ্মতত্ত্ব জটিলতর হইয়া পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছে, বাদবিসম্বাদের হেতু হইয়াছে, বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া ব্রহ্মবিৎ মহাপুরুষগণ বলিয়া থাকেন। সনৎ, সনৎকুমার, সনন্দ ও সনাতন যেমন ব্রহ্মার চারি পুত্র, সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মাতা মনুর গর্ভে এবং

কশ্যপের ঔরসে চারি পুত্র জন্মে। এই চারি পুত্র হইতেছেন মহর্ল্লোক (ব্রাহ্মণ) স্বর্ল্লোক (ক্ষত্রিয়) ভুবর্ল্লোক (বৈশ্য) এবং ভূর্ল্লোক (শূদ্র)। তাম্রা—পঞ্চ কন্যা প্রসব করেন। (অহল্যাদি প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যা)। কিন্তু রামায়ণে উক্ত পঞ্চ কন্যার নাম পৃথক্ যথা—ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী। নামগুলি বিশ্লেষণে সব গোলযোগ মিটিয়া যায়; শাস্ত্রব্যাখ্যান কৌশল বাহির হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে শুকী নতাকে প্রসব করেন। নতার কন্যা বিনতা (বি+নতা)। বিনতার (কশ্যপ দ্বারা) পুত্র (১) অরুণ (২) গরুড়।

(গৃধ্র) বলিতেছেন—আমি অরুণের ঔরসে জন্মিয়াছি, (সুতরাং কশ্যপের পৌত্র)।

সমাজ

শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

(৩)

* ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিদের প্রবর্ত্তিত নীতি সর্ব্বজীবের কল্যাণকর প্রাকৃতিক নিয়মের উপরই প্রতিষ্ঠিত, ইহা হৃদয়ঙ্গম করতঃ তাঁহাদের যাবদীয় বিধিব্যবস্থা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সর্ব্ববর্ণের লোকেরা ভগবৎবিধানের মতন অকুণ্ঠিতচিত্তে পালন করিতেন বলিয়া বিরাট হিন্দুসমাজ যুগযুগান্ত ধরিয়া সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় অটল অচলভাবে দাঁড়াইয়া আছে। আমি রজঃ ও তমোমোহে আচ্ছন্ন, আমার জ্ঞান সঙ্কীর্ণ, সম্মুখে যাহা দেখি তাহার বাহিরের ব্যাপার বুঝিবার শক্তি আমার নাই; তাই আজ ভীষণ শীত পড়িতেছে দেখিয়া আমি বিধাতাকে অভিশাপ দিতেও কুণ্ঠিত নহি, চাই জ্যৈষ্ঠের তীব্র রৌদ্রতাপ। আবার জ্যৈষ্ঠের নির্ব্বাত নিষ্কম্প ভীষণ জ্বালামালায় যখন প্রাণ ছটফট করে তখন সুশীতল বাতাস আর আষাঢ়ের প্রবল বারিধারার জন্য ব্যাকুল হই। এইরূপে মানুষ রজঃ ও তমোগুণের তাড়নায় প্রকৃতির নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বৈরাচারী হইতে চায়। প্রাণবন্ত সমাজের নেতৃগণ কখনো তেমন স্বৈরাচারের প্রশ্রয় দেন না। ত্রেতাযুগে শূদ্রক স্বীয় বর্ণধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করতঃ ব্রাহ্মণোচিত তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে হত্যা করিয়া সকলকে স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে চলিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। দ্বাপরে অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করতঃ ব্রাহ্মণের বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। যুগে যুগে যত সমাজবিভ্রাট ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে তাহার কার্য্যকারণ সমস্ত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় রজঃ ও তমঃপ্রধান ব্যক্তিদের শক্তিমত্ততা ও অকাল বৈরাগ্যই তাহাদের মূল। যাহারা আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই করিতে পারে না,

* বিগত ফাল্গুন সংখ্যায় এই প্রবন্ধের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কয়েকটি স্থলে লিপিকর ও মুদ্রাকরের ত্রুটিতে ভ্রমপ্রমাদ ঘটায় তাহা সংশোধনপূর্ব্বক এস্থলে পুনরুদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। লেখক।

তাহারা সমগ্র মানবজাতির উদ্ধারের জন্য সমাজসংস্কার করিতে ব্যগ্র হয়। ইহা হইতে বাতুলতা আর কি হইতে পারে?

মহর্ষিদের শাস্ত্র অভ্রান্ত ভগবদ্বাণী বলিয়া পূর্ব্বে রাজা প্রজা সকলেই অবনতমস্তকে মান্য করিলেও এখন করিব কেন? তাঁহারা যেমন জ্ঞানচর্চ্চা করিতেন, এখনও ত অনেকে তেমন করেন, বরং বেশী করেন বলিয়াই ত মনে হয়। কারণ, তখন ঋষিরা গুরুর কাছে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিতেন মাত্র, ইদানীং বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কত বিরাট গ্রন্থ পাঠ করেন, কত নূতন নূতন তত্ত্ব অবগত হন; সুতরাং পুরাকালের ঋষিদের পুরাতন বিধিব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া নব যুগের বিদ্বান্ লোকদের নব নব শাস্ত্র গ্রহণ করিব না কেন? ইঁহাদের মহর্ষি আখ্যা দিয়া তেমন ভাবে পূজা করিব না কেন?—ইত্যাদি প্রশ্ন আজকাল পাঠশালার বালকের মুখেও শুনা যায়। এই সমস্ত প্রশ্ন মীমাংসার পূর্ব্বে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দেখা আবশ্যক মহর্ষিত্ব বা বিশুদ্ধ জ্ঞানোপলব্ধির স্তর কিরূপে আয়ত্ত করা যায়। বহু গ্রন্থ বা শাস্ত্রাধ্যয়নদ্বারা তাহা হয় না। বেশভূষার পরিবর্ত্তন বা দু'চার দিন ফলমূল ও কলাকচু সিদ্ধ খাওয়াতেও হয় না। সাধনাবলে দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি এবং অহং জ্ঞানের স্তর পর্য্যন্ত অতিক্রম করতঃ ভগবানের পরাপ্রকৃতিতে লীন হইলেই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করা যায়—

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি। গীতা

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুশ্রুতেন,

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্।—উপনিষদ্

সৃষ্টিক্রম দুই স্তরে বিভক্ত দেখা যায় (১) আধ্যাত্মিক, (২) আধিভৌতিক। কথাটা একটু বিশদ করিয়া বলা আবশ্যক। বিশুদ্ধ সত্ত্বের স্তরে অবস্থিত পরমাত্মা বা পরমশিব, অশব্দ, অচঞ্চল, নির্ব্বিষয়, নাম ও রূপহীন। এই অসীম শান্ত অবস্থার মধ্যে রজোগুণের স্পর্শে বিন্দু বা ঘনীভূত শক্তির সৃষ্টি, তাহা হইতে শক্তিতরঙ্গের উদ্ভব,—ইহাই বিশ্বসৃষ্টির মূল। এই শক্তি পরমশিব হইতে স্বতন্ত্র নহেন, পরমশিবই শক্তিরূপে প্রসারিত। 'একোঽহম্ বহুস্যাম্'—পরমশিবের এই ইচ্ছা বা কাম প্রথম যে বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য উপস্থিত করিল তাহারই ফল সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি আধ্যাত্মিক সাধকেরা ক্রমে প্রণব, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও প্রকৃতির স্তর উপলব্ধি করিতে থাকেন; এই দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ভৌতিক ব্যাপারের সহিত তাঁহাদের সংশ্রব হ্রাস হইয়া যায়। এতৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এই প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম।

আধ্যাত্মিক সাধনার গতি ঊর্দ্ধগামিনী, ভৌতিক সাধনার গতি নিম্নগা। প্রথমোক্ত সাধনার ক্রমোন্নতিতে মানব ভৌতিক ব্যাপারের ভ্রমপ্রমাদ উপলব্ধি করিতে থাকেন। সেদিকেও যতক্ষণ বুদ্ধির স্তর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিজিত না হয় ততক্ষণ বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ হয় না। আত্মসাধনায় যাঁহারা যত অগ্রসর হইতে থাকেন ততই তাঁহাদের এক একটা ভৌতিকবন্ধন কাটিয়া যায়। ভৌতিক সাধনায় সিদ্ধ ব্যক্তিরা ক্রমে বহুবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। যেমন, কেহ চাকরী বা ওকালতি ব্যবসায়ে অর্থসঞ্চয় করিতে পারিলে মহাজনী, ব্যাঙ্কিং, জমিদারী, কলকারখানা ইত্যাদি আরম্ভ করেন, প্রচুর অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসব্যসন ও প্রতিবেশীর উপর প্রাধান্য স্থাপনের লোভে অস্থির হইয়া উঠেন। কেহ দেশোদ্ধার বা সমাজ-সংস্কারের কার্য্য আরম্ভ করেন, যতই তাঁহার স্তাবকের দল পুষ্ট হইতে থাকে এবং বিপক্ষ হইতে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় ততই তিনি স্বপক্ষকে সন্তুষ্ট ও বিপক্ষকে

নিরস্ত করতঃ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানা কৌশল আবিষ্কারে প্রমত্ত হন। পার্থক্য লোহার শিকল, আর সোণার শিকল। সেই অবস্থায় বহু শাস্ত্রালোচনাই করুন, আর দেশ বিদেশের রাশি রাশি গ্রন্থই পাঠ করুন, বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ অসম্ভব। তাই এখনও কোনও কোন সাধক মহাপুরুষের সন্ধান পাইলে ভৌতিক সাধনায় বিশেষ কৃতী লোকেরাও নিজেদের সমস্ত জ্ঞান গরিমা ভুলিয়া উঁহারই চরণতলে আশ্রয় লইয়া থাকেন।

আধ্যাত্মিক সাধনাবলে যাঁহারা মানবতার সর্ব্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করিতেন তাঁহাদের মন আত্মপর ভাবাভাবের দ্বন্দ্বমোহে মথিত হইত না। স্বার্থবুদ্ধি লইয়া কাহাকেও নিম্নে চাপিয়া রাখা, বা কাহাকেও উচ্চে তুলিয়া ধরার জন্য তাঁহারা সমাজ ও রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য করিতেন না। যাহার যেমন শক্তি ও সংস্কার তাহাকে তদনুসারে আত্মোন্নতি সাধনের পথে অগ্রসর করাই তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিত। পরন্তু একের কার্য্যক্রম যেন অন্যের স্বার্থবিরোধী বা পীড়াদায়ক না হয় তাহাই দেখিতেন। এই জন্যই আধিভৌতিক বিষয়ে অতি সুনিপুণ ব্যক্তিরাও তাঁহাদের উপদেশানুসারে নিজেদের কার্য্যক্রম নির্দ্ধারণ করা একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করিতেন।

তাঁহারা স্বয়ং কি ভাবে চলিতেন? রাজা, ধনী বা অন্য কোনরূপ বিষয়বৈভবশালী কাহারো কাছে তাঁহাদের কোনরূপ কাম্য থাকিত না। অন্নবস্ত্র বা গৃহের জন্য তাঁহারা পরের দ্বারস্থ হইতেন না। অস্বামিক বনের ফলমূলে জীবনধারণ, বৃক্ষবল্কলে দেহরক্ষা ও তরুতলে শয়ন করিয়া তাঁহারা জীবন কাটাইতেন। সুতরাং তাঁহাদের আচরণে অন্যের ঈর্ষাদ্বেষ করিবার মতন কিছুই পাওয়া যাইত না। 'তাঁহাদের শাস্ত্র মানিব কেন?'—বলিয়া সন্দেহ বা অশ্রদ্ধার ভাব তদানীন্তন গৃহস্থাশ্রমী বহুগুণসম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ লোকদের মনেও স্থান পাইত না। তাঁহারা ছিলেন ত্যাগ ও সংযমের আদর্শ; রাজা প্রজা সকলেই তাঁহাদের সেই আদর্শ অনুসরণ করিতেন। ত্যাগ করিব না কিছুই, অন্যের সর্ব্বস্ব ছলে বলে কৌশলে অপহরণ করিব, সংযমের সম্পর্ক রাখিব না, কেবলই ভোগের গণ্ডী বাড়াইব, অতৃপ্ত লালসার তাড়নায় আরো চাই, আরো চাই করিয়া ঘুরিব তিনি কেন শক্তিশালী হইয়াছেন, কেন উচ্চস্তরে আছেন, তাঁহাকে দুর্ব্বল করিয়া নিম্নস্তরে নামাইয়া দিতে হইবে, ইত্যাদিরূপ কলুষিত ভাব তখন ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কাহারো অন্তরে প্রবেশ করিত না।

ব্রাহ্মণের অনধিগম্য কিছুই ছিল না। পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চূড়া হইতে নিম্নদিকে অবতরণ যেমন অনায়াসসাধ্য, তেমনই বিজ্ঞানচর্চ্চা, সংহারাস্ত্র আবিষ্কার, সংগ্রামদ্বারা লোকসংহার, কূটনীতিমূলক ব্যবসাবাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় সংঘর্ষের দ্বারা পরের সর্ব্বস্ব অপহরণ, পরের উচ্ছেদসাধন ইত্যাদি সবই করিতে পারিতেন। তাঁহারা সেদিকে যান নাই। সাধনাবলে একদিকে চরম মুক্তি বা ভগবৎ সাযুজ্য লাভ অন্যদিকে সমগ্র জীবসমাজকে বিশুদ্ধভাবে অগ্রসর করাই ছিল তাঁহাদের ব্রত। তাঁহাদের সাধনার দুইটি ধারা লক্ষ্য করা যায়:—একটি নিজেদের উন্নয়ন, অন্যটি নিম্নস্তরে যাহারা আছে তাহাদিগের উন্নতির বিশুদ্ধ পন্থা প্রদর্শন। তাঁহাদের সাধনার প্রভাবে সর্প ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ হিংস্র জন্তুরাও অহিংসার পরাকাষ্ঠা দেখাইত।

ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেই বুঝিলেন ব্রাহ্মণসাধনা সকল স্তরের লোকের পক্ষে সম্ভব নহে, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব হইলেও সমাজস্থিতি রক্ষার অনুকূল নহে, পরমাত্মার স্বরূপ উপলব্ধি বা বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভও সহজসাধ্য নহে, জন্মজন্মান্তরের বহু সুকৃতিসাপেক্ষ। অতএব ঋষি প্রদর্শিত

বিশুদ্ধ পথে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে সাধনা করিয়া অগ্রসর হওয়াই সকলের কর্ত্তব্য। তাঁহাদেরও সাধনার লক্ষ্য হইল ত্যাগ ও সংযম, পরস্বাপহরণের পরিবর্ত্তে পরকে সাহায্যদান, পরোপকার এবং সর্ব্বজীবে দয়া প্রদর্শন। এই লক্ষ্য হইতেই তাঁহারা ব্রাহ্মণরক্ষাকেই সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য মনে করিতেন। কারণ, ব্রাহ্মণ যে শক্তিবলে তাঁহাদের, তথা সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ করিতেন তাহা তাঁহাদের বাহুবল বা অর্থবলের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। পক্ষান্তরে দেহধারণার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকিলে অধ্যাত্মসাধনায় সুসিদ্ধ হওয়াও ব্রাহ্মণের পক্ষে অসম্ভব হইত। তারপর ক্ষাত্র শক্তির, অর্থশক্তির ও শ্রমশক্তির সাধনা। ক্ষত্রিয়কে বিপন্ন হইতে দেখিলে বৈশ্য, শূদ্র ও ব্রাহ্মণ নিজের সমস্ত শক্তির দ্বারা তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। তেমনই বৈশ্যকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র ও শূদ্রকে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সমবেত শক্তির দ্বারা রক্ষা করিতেন! এই ভাবে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে লক্ষ লক্ষ বৎসর, আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের গণনানুসারেও অন্ততঃ পনর হাজার বৎসর, হিন্দুসমাজ সুখে শান্তিতে চলিয়া আসিয়াছে।

সেই মহোচ্চ সমাজের আজ কি দুর্গতি! কি ভীষণ প্রলয়ের স্রোতে তাহার সর্ব্বস্ব ভাসিয়া যাইতেছে!! ইহার সর্ব্বনাশ দেখিয়াও কি আপনার প্রাণ কাঁদে না? ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার কোন চেষ্টা করিবেন না? উত্তর পাই—সত্যযুগ আর ফিরিয়া আসিবে না, সুতরাং পুরাতন ভাব ও কার্য্যপ্রণালী লইয়া বসিয়া থাকিলেও চলিবে না। তখন ভারতবর্ষের সহিত পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সম্পর্ক ছিল না; ভারতের শক্তিশালী লোকেরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেন। এইক্ষণ নদী পর্ব্বত সাগর মরুভূমি কিছুই আর এদেশকে অন্য দেশ হইতে পৃথক্ রাখিতে সমর্থ নহে, বিজ্ঞান সমস্ত দূরত্ব ও দুর্ল্লঙ্ঘনীয়ত্ব ঘুচাইয়া ফেলিতেছে। পৃথিবীর সকল স্থানের লোকেরা তাহাদের নানা রূপ বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানবিজ্ঞান কলকৌশল লইয়া আসিতেছে, তাহাদের সহিত সংঘর্ষে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আমাদেরও প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহাই ত চাই। কিন্তু কি উপায়ে? তাহার নামে কেবল পরানুকরণ ও আত্মবিসর্জ্জনই ত চলিতেছে; আত্মরক্ষা বা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা যে কয়জন করেন তাহার সন্ধান ত পাই না। নিজকে যাহারা হারাইয়া ফেলে, আপনার দেশ জাতি ধর্ম্ম আচার প্রথা যাহারা ত্যাগ করে তাহাদের কি পরের সহিত সংঘর্ষে বাঁচিবার শক্তি থাকে?

তাঁহারা আরো বলেন,—'জন্মগত পার্থক্য, উচ্চ নীচ শ্রেণীভেদ, তদনুযায়ী বিভিন্ন সাধন-প্রণালী ও আচারপ্রথা রক্ষা আর চলিবে না। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের এক সময়ে প্রয়োজন থাকিলেও এইক্ষণ আর নাই। কারণ, এখন বর্ণভেদে কর্ম্মভেদ নাই, ধর্ম্মভেদও নাই। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ত এখন মূর্ত্তিমান ব্যভিচার, সুতরাং ব্রাহ্মণরক্ষাও সমাজের কর্ত্তব্য নহে।'—সত্য বটে ভোগমোহের প্রলোভনে অল্পদিনমধ্যে অন্যান্য বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণসন্তানও স্বধর্ম্ম সদাচার ও কৌলিক প্রথা বর্জ্জনপূর্ব্বক অর্থাহরণের জন্য দাসত্বের গভীর কূপে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এই পথেই কি হিন্দুর শ্রেয়ঃ লাভ হইবে? ভোগমোহের এই পরিণাম কত দিনের? অত্যন্ত পতন—এক শত, বড় জোর দেড় শত বৎসরের। সম্মুখের দেড়শত বৎসর এই সমস্যার সমাধান কি ভাবে করিবে, ব্রাহ্মণাদি সকলেই অর্থের মোহে বিভ্রান্ত হইয়া ধ্বংসের মুখে সর্ব্বতোভাবে আত্মাহুতি দিবেন, না আপনাকে ও আত্মধর্ম্মকে রক্ষার জন্য স্ব স্ব আশ্রমে ফিরিতে আরম্ভ করিবেন,—কে বলিবেন? বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আশ্রয়ে বিরাট হিন্দুসমাজ বহু সহস্র বৎসর (আধুনিক গণনানুসারেও অন্ততঃ ১৫

হাজার বৎসর) শান্তিসুখে কাটাইয়া আসিতেছিল,—ইহা যেমন সত্য, স্ব স্ব বর্ণধর্মত্যাগের ফলে অল্পদিন মধ্যে তাহার যে অশেষ দুর্গতি—বিধাতার দণ্ড—উপস্থিত হইয়াছে তাহাও সত্য। অতএব কোন্ পথ বাঞ্ছনীয়?

বেশী দিনের কথা নহে, ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণকে অন্নবস্ত্র সংগ্রহের ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্ত রাখা একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করিতেন। তখনও হিন্দুমাত্রেই সংসারযাত্রার প্রত্যেক কার্য্যকে পবিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়াই জানিতেন। তাঁহারা বুঝিতেন কোন ধর্ম্ম কর্ম্ম বিশুদ্ধ ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণব্যতীত হওয়ার উপায় নাই এবং ঐরূপ ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিলে ভগবানই তাহা পাইয়া থাকেন। ভগবানকে অন্নাদি দানের প্রয়োজন কি? তিনি পাইবেন কিরূপে? শ্রীভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন :—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ।

দেবতাদিগের কৃপাতেই মানবেরা অভীষ্ট অর্থাদি লাভ করে। সেই প্রাপ্ত অর্থ আবার ভগবানের উদ্দেশ্যে দান করিবে। তেমন ভাবে যথোচিত অর্থের সদ্ব্যবহার না করিয়া যে সমস্ত অর্থ নিজের বিলাসব্যসনে ব্যয় করে সে চোর। দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ—এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের দ্বারা দেবতারা তৃপ্তিলাভ করেন। ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ঋত্বিক্, এজন্য সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই পরিতোষসাধন হিন্দুরা কর্ত্তব্য মনে করেন। যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকর্ম্মবিহীন তাহাকে অন্নদান আর অন্য জীবকে অন্নদান একই কথা। সদ্‌ব্রাহ্মণের সেবা ও যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে ভগবান তৃপ্ত হন, ইহার সত্যতা তখনও হিন্দুরা প্রাণের সহিত অনুভব করিতেন। এজন্য দেহরক্ষার প্রয়োজনাতিরিক্ত যাহা কিছু সমস্তই ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। তাঁহাদের ঐরূপ দানের দ্বারা শুধু ব্রাহ্মণদের ভরণপোষণ চলিত এমন নহে, দেশের দরিদ্র জনসাধারণও নানারূপে উপকৃত হইত। পাঠক, ভাবিয়া দেখুন, এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কমিউনিজম্ বা সোসিয়ালিজম্ কি পৃথিবীর অন্যত্র কেহ কল্পনাও করিয়াছেন? অন্নবস্ত্রের চিন্তা করিতে হইত না বলিয়া পল্লীতে পল্লীতে সাধনারত বহু ব্রাহ্মণ বিরাজ করিতেন। তখনও এই চট্টগ্রামে শতাধিক উপাধিধারী ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, চাকরী বা পরের অনুসর্পণা তাঁহারা করিতেন না। প্রত্যেক পণ্ডিত বহু ছাত্রকে স্বগৃহে অন্নদান করিতেন। প্রতিবেশীরাও শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণছাত্রকে অন্নদান করিতে পারিলে ধন্য হইতেন। সংসারধর্ম্মে নিপুণ লোকেরা দেশ দেশান্তরে গিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন, তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিত প্রচুর অর্থসংগ্রহ করতঃ নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা ভদ্রাসনকে গৌরবান্বিত করা। তখনও চট্টগ্রামের একটি কি দুইটি পাশ্চাত্য মোহাচ্ছন্ন লোক ব্যতীত অপর কেহই স্বীয় পল্লীভবন ত্যাগ করিয়া বিদেশে সপরিবারে বাস করিতেন না। দুইটি মাত্র চট্টগ্রামবাসী হিন্দু তখন সপরিবারে চট্টগ্রাম সহরে বাস করিতেন। গৃহলক্ষ্মীকে গৃহ ছাড়াইয়া অন্যত্র লইয়া যাওয়া তখনও গৃহীরা পাপ মনে করিতেন। স্ব স্ব পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণপণ্ডিত, পুরোহিত, ধনী জমিদার ও সুচিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখিলেই সকলে গৌরব বোধ করিতেন।

তখন দেখিতাম, যাঁহারা মাসে ২০।২৫৲ টাকা উপার্জ্জন করিতেন তাঁহারা নিজের জন্য সর্ব্বসাকুল্যে মাসে ৩।৪৲ টাকার বেশী ব্যয় করিতেন না। অবশিষ্ট সমস্ত টাকা বাড়ী লইয়া গিয়া স্বীয় পরিবারসংরক্ষণ, শ্রাদ্ধপার্ব্বণ নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেন। গুরুপুরোহিতের সেবা, আত্মীয়কুটুম্বদের নিমন্ত্রণও বাদ যাইত না। যাঁহারা উচ্চ রাজপদলাভে, ব্যবসাবাণিজ্যে বা ওকালতিতে দু'শ, পাঁচশ বা ততোধিক টাকা উপার্জ্জন করিতেন তাঁহাদেরও নিজের ব্যয় প্রায় ঐরূপই দেখিতাম, পার্থক্য ছিল বহুল পরিমাণে অতিথি অভ্যাগতের সেবায়, দানধর্ম্মে, দীঘিপুকুর খালনালা খনন, রাস্তাঘাটনির্ম্মাণ ইত্যাদি জনহিতকর কার্য্যে। তাঁহারাই হইতেন দেশবাসীর অবলম্বন। আনন্দে উৎসবে, সম্পদে বিপদে সকলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাদের সর্ব্বতোভাবে আপন করিয়া রাখিতেন। তাঁহাদের গৃহ সাধুসন্ন্যাসী ব্রাহ্মণপণ্ডিতের পূজাপাঠ স্তোত্রভজনাদিতে নিত্য মুখরিত থাকিত, তাহাতে সমস্ত পল্লীবাসী কত শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতেন। দেশবাসী সকলে তাঁহাদেরে লইয়া গৌরব করিত, তাঁহাদের ভরসায় তাহাদের বুকভরা সাহস থাকিত, চোর ডাকাত ও গুণ্ডাদমনে বা অনুরূপ বিক্রমপ্রদর্শনে অণুমাত্র ভীত ও সঙ্কুচিত হইত না। এইরূপ উৎসাহী বিক্রমশীল প্রতিবেশী সাধারণের বলে তাঁহারাও নিজকে বলীয়ান ও নিরাপদ মনে করিতেন। পল্লীসমাজ পূর্ব্বে তেমন সুসংগঠিত ছিল বলিয়াই পর্তুগীজ বা মগদস্যুদের উৎপাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত।

তখন ৩।৪৲ টাকায় এক এক জনের কিরূপে মাস চলিত তাহা হয়ত এখন অনেকে ধারণাই করিতে পারিবেন না। ৪৲ টাকার মধ্যে প্রত্যহ ৵৹ আধ সের দুধ এবং জলযোগের জন্য ছোলা গুড় বা মুড়িমুড়কির ব্যবস্থাও হইত। চাকর পাচকের প্রয়োজন তাঁহাদের হইত না। দু'পরে অফিসে বসিয়া চা রুটি বিস্কুট বা সন্দেশ রসগোল্লায় উদরপূর্ত্তি করিতেন না বলিয়া সারাদিন খাটিয়াও এলাইয়া পড়িতেন না। অজীর্ণ বা বহুমূত্ররোগেও কেহ অকালমৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেন না। তখন সারা চট্টগ্রাম সহরে ভিন্ন জেলার একটা লোক আসিয়া ময়রার দোকান খুলিয়াছিল, চা-বিস্কুটের একটা দোকানও ছিল না। তখন কোন ব্রাহ্মণ বাজারের মিঠাই স্পর্শও করিতেন না। উপনীত কোন ব্রাহ্মণসন্তানকে তখন সন্ধ্যাহ্নিকবর্জ্জিত দেখি নাই, দীক্ষিত ব্রাহ্মণেরা সকলেই পূজা করিতেন। দীক্ষিত বৈদ্য কায়স্থও অনেকেই পূজা করিতেন।

আজ কি দেখিতেছি? যিনি যত বেশী অর্থোপার্জ্জন করেন তিনিই তত দূরদূরান্তর নগরে গিয়া বাস করিতেছেন। গুরুপুরোহিতের ত কথাই নাই, জ্ঞাতিকুটুম্বদেরও কাহারো কোন সম্পর্ক রাখেন না। তাঁহাদের অনুকরণে যে ১০।১৫৲ টাকার পেয়াদার কাজ করে সেও সস্ত্রীক নগরের বিলাসব্যসনে ঝাঁপ দেয়। তারপর কে কোথায় উড়িয়া যায় তাহার সংবাদও কেহ পায় না। তখন যে মুহুরি মাসিক ২৫।৩০৲ টাকা উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি সংগ্রহ, পুত্রদের উচ্চ শিক্ষা, কন্যার বিবাহ, দোল দুর্গোৎসব, পিতামাতার শ্মশানে মন্দির ও শিবস্থাপন, যাগযজ্ঞ ইত্যাদি করিয়া এবং সর্ব্বদা গ্রামবাসীর সম্পদে বিপদে সহায় হইয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন আজ তাঁহারই সন্তানেরা মাসে ২৫০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিলেও গ্রামের সমাজের বা আত্মীয়পরিজনের কোন সম্পর্ক রাখেন না। দু'এক জন নহে, মাসিক একশত হইতে দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করেন এইরূপ ৪০ জন লোক আমাদের এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইতে দূর দূরান্তরে আছেন।

এই ৪০ জন যদি ৪০টি বিশিষ্ট পরিবার স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিতেন, তাঁহাদের পিতৃপিতামহের পদানুসরণ করিয়া চলিতেন; তবে এই ক্ষুদ্র পল্লীসমাজ কত গৌরবান্বিত হইত, কত শক্তিশালী হইত !

এক গ্রামের নহে, প্রত্যেক গ্রামের প্রায় সমস্ত উপার্জ্জনক্ষম লোক ঐরূপে স্বীয় সমাজ ও গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহার হাতে কিছু বেশী টাকা সংগৃহীত হয় তিনিই কলিকাতায় বা অন্যত্র গিয়া বাড়ী করেন, পুত্রকে বিলাত পাঠান। একটি ভদ্র লোক সরকারী উচ্চপদ হইতে পেন্সন লওয়ার পর কলিকাতায় গিয়া ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে বাড়ী করিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার কি পৈত্রিক ভিটাবাটি নাই ?

উত্তর—প্রকাণ্ড বাড়ী, পুকুর বাগান সবই আছে। কিন্তু গুণ্ডাদের উৎপাতে এখন ছেলে মেয়ে নিয়ে দেশে থাকা দায়, বিশেষতঃ ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিতে হবে।

প্রশ্ন—আপনার শিক্ষা কিরূপে হয়েছিল ? আপনার কয়টি ছেলেইত উচ্চশিক্ষা পেয়েছে, এতদিন আপনার বা তাদের জন্য কলিকাতায় একটা বাড়ী করার প্রয়োজন ত হয় নাই ?

এইরূপে যেসমস্ত হিন্দু বিদ্যাবুদ্ধি ও অর্থবলে শ্রেষ্ঠ হন তাঁহারা সকলেই যখন স্বীয় গ্রাম ও সমাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, নিজের সমস্ত অর্থ বিদেশে ঢালিয়া দিতেছেন, তখন হিন্দুসমাজ ধ্বংস হইবে না, কোন্ সমাজ হইবে ? নগরের সুরম্য সৌধে বৈদ্যুতিক পাখা ও আলোর তলে বসিয়া আদম সুমারি হইতে জনসংখ্যাহ্রাসের তালিকা তুলিয়া যাঁহারা 'হিন্দু মরিতেছে'—'হিন্দু ডুবিল'—ইত্যাদি বিলাপে দেশহিতৈষণা প্রকট করেন তাঁহারা কি কখনও এই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন ? সমাজের শক্তিশালী লোকদের এই বহির্মুখী গতিই যে হিন্দুসমাজ ধ্বংসের মূল তাহা কি তাঁহারা কখনো চিন্তা করেন ?

আমাদের এক বন্ধুর সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক পুত্রের অত্যাগী জর হয়। এক ডাক্তার তাহাকে ফিনাসিটিন খাওয়াইলেন। ফলে ৩ ঘণ্টার মধ্যে উহার জর ও প্রাণ উভয়ই বাহির হইয়া গেল। তেমনই সমাজের প্রকৃত রোগ ও ঔষধ নির্ণয়ে অসমর্থ তথাকথিত সমাজসংস্কারকেরা যুবতীবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলন, অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন, সকলকে সাম্য ও স্বাধীনতা দান ইত্যাদির আন্দোলন তুলিয়া হিন্দুসমাজের মৃত্যু আসন্ন করিয়াছেন। হিন্দুপল্লী আজ শক্তিহীন নিরুপায় লোকের আবাসে পরিণত ; তদুপরি একদিকে অন্নাভাব ও রোগযন্ত্রণায়, অন্যদিকে গুণ্ডাদের অত্যাচার, ধর্ম্মাচারবিহীন যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচারে একেবারে চরম দশায় উপস্থিত। এইরূপ ঘোর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়ও হিন্দুপল্লীতে প্রবেশ করিলে দেখা যায় এখনও ব্রাহ্মণ বৈশ্য কায়স্থ শূদ্রের গৃহে স্বধর্ম্ম ও পবিত্রতা রক্ষার চেষ্টা চলিতেছে, এখনও তাঁহারা নানা অভাব দুঃখের ভিতর দিয়া বংশের পূতধারা রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। এখনও তাঁহারা বর্ণভেদে ধর্ম্মাচারভেদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং তদনুসারে চলেন।

বর্ণ ও স্তরভেদ সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই আছে। ভারতবর্ষে ভেদ নির্ণয় হয় আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির দ্বারা, অন্যান্য দেশে হয় বাহিক্ বেশভূষা দেখিয়া। জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত না হইলে অর্থবল মানব প্রকৃতিকে উন্নত করিবার পরিবর্ত্তে অবনতই করে। এজন্য ভারতবর্ষ মহর্ষিদের উপদেশানুসারে চলাই একান্ত প্রয়োজন বোধ করিতেন। অর্থবানের স্থান ছিল তৃতী

স্তরে। ইউরোপেও প্রাচীনকালে সেই নীতি অনুসরণের চেষ্টা হইয়াছিল। মনীষী সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন—'Until either philosophers become kings or kings become philosphers states will never succeed in remedying their shortcomings" হয় দার্শনিকেরা রাজার আসনে বসিবেন, অথবা রাজাকে দার্শনিক হইতে হইবে; যে পর্য্যন্ত তেমন ব্যবস্থা না হইবে সেই পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের দোষত্রুটি দূর হইবে না। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় তাঁহারা ভারতের অনুসরণের চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ভারতের আদর্শ ত্যাগ ও সংযমের মূর্ত্তি ব্রাহ্মণ সেখানে সম্ভব হন নাই, হইয়াছিলেন ভোগমোহাচ্ছন্ন পোপ। ফলে অর্থশক্তির প্রভুত্বই বাড়িয়া চলিল। সুতরাং বিপ্লব অনিবার্য্য হইল। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া কেবল বিপ্লবই চলিতেছে। কিন্তু আবার পরিবর্ত্তনের বাতাসও বহিতেছে। অর্থশক্তিকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য ইউরোপের সর্ব্বত্র বিগত দুই শতাব্দী ধরিয়া চেষ্টা চলিতেছে। সোসিয়ালিজম্, কমিউনিজম্, প্রভৃতি বিভিন্ন নামে তাহা প্রকটিত হইতেছে। হিট্‌লার প্রমুখ জার্ম্মেণির বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ যে ভাবে সমাজ সংস্কার আরম্ভ করিয়াছেন তাহার পরিণাম ক্রমে ভারতের প্রাচীন নীতি গ্রহণেই পর্য্যবসিত হইবে বলিয়া মনে হয়। তথাকার প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত কাউণ্ট কাইজারলিং লিখিয়াছেন,—"Those who belong to different castes are undoubtedly beings of different kind, and it would seem of infrnite importance with whom one eats, and careless behaviour can result in infection just as dangerous as contact with the becilli of typhoid. And this is true quite literally in fact in a higher degree. Our souls are peculiarly open to infection, every influence penetrates into them and disturb the original condition." বিভিন্ন বর্ণের লোক যে বিভিন্ন প্রকৃতির তাহা নিঃসন্দেহ। তাহাদের কাহার সহিত মেলামেশা ও আহার করা যাইতে পারে তাহা বিচার করা একান্ত প্রয়োজন। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এতদ্বিষয়ে সামান্য অসাবধানতার ফল সন্নিপাত রোগের বীজাণুর মতন সাংঘাতিক সংক্রামক হইয়া থাকে। মনুষ্যের অন্তর সহজেই অন্যের ভাবে আক্রান্ত হয়, তেমন বাহ্যিক প্রত্যেক প্রভাব অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার স্বীয় মৌলিক অবস্থাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে।

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন পাশ্চাত্য প্রভাবের সংক্রামকতা সন্নিপাত ব্যাধির বীজাণু হইতেও ভীষণতর সাংঘাতিকভাবে অর্থশালী ভারতীয়দের আত্মাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, এবং তাহারই ফলে ভারতের বর্ণাশ্রম সমাজ ধ্বংসোন্মুখ। পাশ্চাত্যের অনেক হলাহল এদেশে আসিয়াছে, সম্প্রতি সাম্য ও স্বাধীনতার লীলাই প্রধান। পাশ্চাত্যের সোসিয়েলিষ্ট কমিউনিষ্ট প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকেরা মানবমাত্রকেই সমান ও স্বাধীন করার যে কল্পনা লইয়া ছুটিয়াছেন তাহা তাঁহাদের দেশেই এখন যাবৎ সফল হয় নাই; সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ যে তদ্দ্বারা হইবে কেহই নিশ্চিতরূপে তাহা বলিতে পারেন না। না হওয়ার আশঙ্কাই অধিক। কারণ বিশ্বের সৃষ্টি প্রণালীই তাহা সমর্থন করে না। ভিন্নভেদ লইয়াই সৃষ্টি। তদনুসারে এক এক প্রকারের শক্তি এক এক স্তরে সমধিক প্রকাশ পায়। সকল শক্তির গতি এক মুখী হয় না। স্ব স্ব শক্তি অনুসারে আত্মোন্নতির চেষ্টা সকলেই করিবে। এই চেষ্টা ও উদ্যমের পক্ষে বিভিন্ন স্তরের

শক্তিমানেরা যেন ঠোকাঠোকি করিয়া না মরে তেমন ব্যবস্থা করাই সমাজনেতৃগণের কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সাম্য ও স্বাধীনতাবাদীদের লক্ষ্য হইতেছে সকলকে এক ক্ষেত্রে সংগ্রাম করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া, তারপর সকলে কাটাকাটি করিয়া মরুক, বা যে যেরূপে পারে অন্যকে গ্রাস করুক।

ভারতবর্ষ কোন কালে এই দুর্নীতির প্রশ্রয় দেন নাই। বিরাট পুরুষ বুদ্ধদেব ধর্ম্মের ভিতর দিয়া সকলকে সমান ও উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাও সফল হয় নাই। সম্প্রতি এদেশের সকলকে সমান করার ব্যাপারটা কেবল মাত্র স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ও খাদ্যাখাদ্যের বিচার রাহিত্য এবং নিম্ন শ্রেণীকে বাহ্যিক সাজপোষাক দিয়া উচ্চ শ্রেণীর সহিত মিলাইবার কল্পনা লইয়াই চলিতেছে। ইহার মূল ভোগবুদ্ধি। ভোগের প্রলোভনে সকলকে সমান করা কি সম্ভব হইবে?

(ক্রমশঃ)

কবীরের দোঁহা

সতর্কীকরণ। (চিতাবনী)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যহি ঔসর চেত্যো নহীঁ, পসুজ্যোঁ পালী দেঁহ।
সত্ত নাম জান্যো নহী, অংত পড়ৈ মুখ খেহ ॥১০॥

এ সুযোগে হুস হ'লনা, পশুর দেহ বই'ছে সুখে।
সত্য নামকি জান্‌লে নাক, অন্তিমে ছাই পড়বে মুখে ॥১০॥

লুটি সকৈ তো লুটিলে, সত্তনাম ভংডার।
কাল কংঠতেঁ পকরিহৈ, রোকৈ দসৌ দুয়ার ॥১১॥

লুট্‌তে পার নাও লুটে নাও, সত্যনামের খাজনা খানা।
কাল ধ'রেছে গলাটিপে, আগলে সকল আনাগোনা ॥১১॥

আগে দিন পাছে গয়ে, গুরু সে কিয়া ন হেত।
অব পছতবা ক্যা করৈ, চিড়িয়াঁ চুগ গই খেত ॥১২॥

ভবিষ্যৎ সব অতীত হ'ল গুরুকে কই চিন্‌লেনা ত'।
অনুতাপে কি ফল এখন, শস্য পর-হস্তগত ॥১২॥

আজ কহৈ মৈঁ কাল ভজুংগা, কাল কহৈ ফির কাল্হ।
আজ কাল্হ কে করতহী, ঔসর জাসী চাল ॥১৩॥

আজ বলে কাল ক'রবো পূজা, কাল সে বলে আবার কাল।
আজকাল এই ক'রে ক'রে, যাচ্ছ শুধু ব'লে কাল ॥১৩॥

কালহ্ করৈ সো আজ করু, সবহি সাজ তেরে সাথ।
কালহ্ কালহ্ তূ ক্যা করৈ, কাল্‌হ কাল কে হাথ ॥১৪॥

আজ কর কাল ক'রবে যদি, সব উপাদান তোমার আছে।
কাল কাল কি ক'রছ তুমি, কাল থাকে সব কালের কাছে ॥১৪॥

কাল্‌হ করৈ সো আজকর, আজ করৈ সো অবব।
পলমেঁ পরলৈ হোয়গী বহুরি করৈগা কবব ॥১৫॥

আজ কর কাল ক'রবে যদি, আজ কর ত কর এবে।
পলের ভিতর প্রয়ল হ'বে, আবার সুযোগ পাবে কবে ॥১৫॥

পাচ পলককী সুধি নহীঁ, করৈ কাল্‌হ কে সাজ।
কাল অচানক মারসী, জ্যোঁ তীতর কো বাজ ॥১৬॥

সিকি পলের নেইক খবর, মুখে আনে কালের কথা।
হঠাৎ এসে মারবে কালে, তিতিরে বাজ মারে মথা ॥১৬॥

পাচ পলক তো দূরহৈ, মো পৈ কহ্‌রো না যায়।
না জানূঁ ক্যা হোয়গা, পাচ বিপল কে মায়ঁ ॥১৭॥

সিকি পলত দূর অতিশয়, তার কথা না মুখে সাজে।
জানি না কি হয়ে যাবে, সিকি বিপল সময় মাঝে ॥১৭॥

কবীর নৈবিতি আপনী দিন দস লেহু বজায়।
য়হ পুর পট্টন, য়হ গলী, বহুরী ন দেয়ৌ আয় ॥১৮॥

কবীর নহবৎ আপনার বাজিয়ে নাও দিন দশের তরে।
এ সহর এ রাস্তা গলি, পাবে না ফের দেখ্‌তে পরে ॥১৮॥

জিনকে নৌবতি বাজতী, মংগল বাঁধতে বার ॥
একৈ সতগুরু নাম চিন্‌, গয়ে জনম সব হার ॥১৯॥

বাজত নবৎ যাহার কারণ ফুলের তোরণ ঘুষত জয়।
এক সৎগুরু নামের বিনে, জীবনটা তার অপচয় ॥১৯॥

—শিবপ্রসাদ।

— —

সমাগতা

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কুসুমকুমারীর তিনটি সন্তান খুব ঘন ঘনই হইয়াছিল, কিন্তু পাঁচ বৎসর আর কিছুই হয় নাই, এই কথাপ্রসঙ্গে সমা জানিতে পারিল যে, এই দীর্ঘ বিরামটি স্বভাবের অনুগ্রহের দান নয়, কৃত্রিম উপায়ে, জোর করিয়া স্বভাবের এই যে আদবীর ক্রম রোধ করা হইয়াছে,—অস্ত্রোপচারে তাহার গর্ভাশয়টি উদর হইতে উচ্ছিন্ন করিয়া সন্তানজন্মিবার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ করা গিয়াছে। কুসুম কুমারী বলিল—'ফলন্ত মেয়ের সাধারণতঃ দশ পনেরোটা ছেলে হয়, সব ক'টা টেকে না, কিন্তু হওয়ার অসুবিধেগুলো সবই তো ভোগ কত্তে হয়? তা', যদি ২৫, ৩০ বৎসরের মধ্যে দশ পনেরোটা ছেলে পেটে ধর্‌তে হয় তা'হলে, বাইরের কোন নিয়ম বাঁধা (Systematic) কায কর্‌বার সময় জীবনেই পাওয়া যায় না, তাই পেটের দায়ে অপারেশনটা খুব ডেঞ্জারাস্ হলেও কত্তে হয়েছে ভগ্নি!'

সমা সাশ্চর্য্য মনোযোগে কুসুমের কথাগুলি শুনিয়া বলিয়া উঠিল—'বল কি? দেহের একটা যন্ত্র কেটে বের করে দিলেও মানুষ বেঁচে থাকে, দেহের ক্ষতি হয় না, তা' এই নূতন শুনলুম ভাই!' কুসুম ঈষৎ হাসিয়া বলিল—ওটা নিজের দেহরক্ষার কোন সাহায্যই করে না তো? ওটা যে কেন আছে তা' কি বোঝো না? পুরুষের তো নাই, তবে কেটে ফেল্‌লে মেয়ে মানুষের দেহের ক্ষতি হবে কেন? তবে অপারেশনটা খুবই কঠিন!' সমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—'তা' হো'ক্ কঠিন, ঐ ছার যন্ত্রটা গোটা মানুষটাকেই একটা যন্ত্র ক'রে তুলেচে। কিন্তু ছি, ছি ভগ্নি। কি ভুলই তুমি করেছ! এই যদি তুমি জান্‌তে তা' হ'লে, আমার অপারেশনের সময় সেই ওভারিটা কেটে ফেলে দেবার জন্যে ডাক্তার সাহেবকে অনুরোধ করা তোমার খুবই উচিৎ ছিল। তা' হ'লে বোধ হয় আমাকে ডবল বাঁচানো হ'তো কুসুম! যা' হোক্, আমি আবার তোমাকে কষ্ট দিতে চাই!'

সমার কথা শুনিতে শুনিতে কুসুমকুমারী টিপি টিপি হাসিতেছিল। সমা তার জীবন-প্রবাহ-গতি কোন্ দিকে ফিরাইতে চায় কুসুম তাহা জানিত না। গর্ভাশয়টি উৎপাটিত করিয়া ফেলা হইয়াছে, এই সংবাদটা সমার অপ্রীতিকর হইতে পারে এই ধারণায় কুসুমকুমারী সমাকে সে সংবাদটা দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, তাই এত দিন সমা সে কথা জানিতে পারে নাই। সমার মনোভাব বুঝিয়া কুসুম বলিল—'তোমাকে ডবল বাঁচানোই হো'ক্, আর ট্রিবল মেরে ফেলাই হো'ক্, তোমার প্রাণটা রাখ্‌বার জন্যে সেটা বের ক'রে ফেলা গেছে ভগ্নি, তা' না হ'লে তোমাকে বোধ হয় বাঁচান যেত না, তবে, পাছে কথাটা শুন্‌লে তোমার মনে কষ্ট হয় ব'লে সে কথাটা তোমায় বল্‌তে একটু ইতস্ততঃ কর্‌ছিলাম!"

'ইতস্ততঃ কর্‌ছিলে—এই শুভ সংবাদটা দিতে?' বলিয়া বিজয়দৃপ্ত মুখে উত্তেজনার আতিশয্যে সমা উঠিয়া দাঁড়াইল, যেন, কোনো বীর যোদ্ধা সেইমাত্র সম্মুখযুদ্ধে তাহার শত্রুকে

পরাজিত করিয়া দাঁড়াইল ; সমার চক্ষুদুটি সেই জয়গৌরবই প্রকাশ করিতেছিল। সমার এই বিজয় ঘোষণা ভগবানের বিরুদ্ধে, কি পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে সে কথা সমাই জানে !

সেই সময় মিঃ সমঝদার একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র টেবিলের উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া চলিয়া গেলেন। সমা সেটি খুলিয়া পড়িতে পড়িতে বিজ্ঞাপনের খণ্ডে একস্থানে পেন্সিল চিহ্নিত করিয়া কুসুমের হাতে দিল। কুসুম সেটি পড়িল :—

Wanted a Bengalee actress having a little Knowledge in English and accomplished in singing and dancing, on a salary of Rs 50/-a month with prospects.

Candidates are required to appear personally before and to apply to the Manger Novarangini Theatre.

49, Ulluk bazar street, Calcutta.

বিজ্ঞাপন পড়িয়া কুসুম বলিল,—'তুমি কি কাজটা ধরতে চাও ?'

সমা বলিল,—'দোষ কি ?' কুসুম,—'বড্ডো ব্যাড্ কম্প্যানি কিন্তু !'

সমা বলিল—'দেশের এজুকেটেড্ ফিমেল জেন্‌ট্রি যে ওদিকে নজর দেন নাই, তাই অমন একটা ইম্পর্টেন্ট ডিপার্টমেণ্ট্ বেশ্যারা অকুপাই করে আছে। যা' হো'ক্ সে রকম বেশী দিন আর থাকবে না আশা করা যায় !'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সমাগতার ইতিবৃত্তের যাহা বলা হইয়াছে, বিশেষতঃ যাহা ইতঃপশ্চাৎ বলা হইবে তাহা আজি হইতে বিশ বৎসর পূর্ব্বে বলিলে, সেটি আরব্য উপন্যাসের অনুকরণ বলিয়াই বিবেচিত হইত। এই কয় বৎসরেই এই দেশটা অগ্রসর হইয়াছে—অনেক দূর। তাই আজ যিনি দেশের স্থূল খবরগুলাও রাখেন, তাঁর কাছেও আমার এ গল্পটা মিরাক্‌ল্ (অলৌকিক) বলিয়া প্রতীত হইবে না, ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ; এবং সেই দৃঢ় বিশ্বাসবশেই যখন সমাগতা বাল্য সখী কুসুমের নিকট বিদায় লইয়া কোঁচা দোলাইয়া কাছা আঁটিয়া, কোটের উপর গলায় চাদর ঝুলাইয়া লম্বা চুল ছাঁটিয়া, খাটো চুলে টেরী কাটিয়া পুরুষের বেমালুম্ ছদ্মবেশে একটি কোরিয়া ব্যাগ হাতে লইয়া ৮ নং ডাউন ট্রেণের ইণ্টার ক্লাসে গিয়া উঠিল, তখন তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পাঠককে তাহার পশ্চাদানুসরণে প্রবৃত্তি দিতে আমি সাহসী হইলাম।

কথিত ট্রেণটি ডাক গাড়ী। ... ... একটি ক্যারেজের ... ... আধখানি ডাকের কামরা এবং অপর আধখানি ইণ্টার ক্লাস। সমা সেই ইণ্টার ক্লাস কামরাটিতেই উঠিয়া পড়িল। যাহারা অদৃষ্টবাদী তাঁহারা বলিবেন—অদৃষ্ট তাহাকে সেই ঘরে টানিয়া তুলিল ; আমরা বলিব—সমা ইচ্ছা করিয়াই সেই কাম্‌রাটিতে উঠিল কারণ, সেটিতে আরোহীসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। সমা কাম্‌রাটির এক প্রান্তে যাইয়া আপনার একটু স্থান করিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। যথা সময়ে গাড়ী ছাড়িল। গতির মুখে ক্রমশঃ বেগ সংগ্রহ করিয়া ডাকগাড়ী আপন আভিজাত্য গৌরবে ছোটলোক ইষ্টিশানগুলির আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া, বড়গুলির সহিত অল্পক্ষণ মাত্র আলাপন করিয়া,

ক্বচিৎ কোথাও একটু জলযোগ, কোথাও একটু টিফিন খাইয়া, বীরদম্ভে মেদিনী কম্পিত করিয়া, গর্জ্জনে আকাশ শব্দিত করিয়া চলিল। সমা তাহার ভিতর বুকের মধ্যে যুদ্ধনিরত আশার উন্মাদনা এবং হতাশার অবসাদ বহিয়া, বহিয়া ক্লান্তি এবং অস্থিরতাবশতঃ উঠিয়া, বসিয়া, শুইয়া, জাগিয়া, ঘুমাইয়া যাইতে লাগিল।

গাড়ি বন্দরে পৌঁছিলে অন্য সমস্ত আরোহী সমার কাম্‌রা হইতে নামিয়া যাওয়ায় গাড়িটি নির্জ্জন হইল। সমা আপনার অধিকৃত বেঞ্চখানি ছাড়িয়া তদুপরিস্থ একটি বার্থের উপর উঠিয়া সটান লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। তখন একটি ছোক্‌রা আসিয়া সেই কাম্‌রার জানালা দিয়া উঁকি মারিল। সমা তাহা দেখিতে পাইল না। সমার অধিকৃত বার্থ হইতে সে জানালা দেখা যায় না। রাত্রি তখন দশটা।

সিটী বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িবার মুখেই সেই উঁকিওয়ালা ছোক্‌রা সমার কাম্‌রায় প্রবেশ করিল। সমা তাহা বুঝিতে পারিল না—সে তখন গাড়ি চলনের ধীর 'ঝং—ঝং' তালে তালে নাতি উচ্চ কণ্ঠে একটি গান আরম্ভ করিয়াছিল। অনেকে, যাহারা গান করিতে জানে না—লোকের সাম্‌নে গাহিতে লজ্জা করে, অথচ গান গাহিবার মনে মনে ইচ্ছাটুকুও আছে, রেলগাড়িতে উঠিলেই তাহাদের গলা সুর্ সুর্ করে এবং গাড়ি ছাড়িয়া দিলে তার শব্দ যেমন উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে, এ গায়কের স্বরও তত উচ্চে উচ্চে উঠিতে থাকে এবং পরবর্ত্তী ষ্টেসনে গাড়ি থামিবার সময়েও তেমনি ক্রমশঃ ক্রমশঃ কমিয়া কমিয়া থামিয়া যায়। সমার গান সে প্রকারের নয়, প্রকৃতই সে গান কতকটা শিখিয়াছিল, গলাও তার ভাল ছিল।

গুণ্ গুণ্ করিয়া আরম্ভ করিয়া সঙ্গীতের ভাবাবেগবশে যখন সমার ললিতকোমল কণ্ঠ একটু উচ্চে উঠিল, তখন সেটি যুবকের শ্রুতিগোচর হইতেই যুবক হটাৎ যেন চমকাইয়া উঠিয়া তড়িৎচঞ্চল দৃষ্টিতে গীতকারীর প্রতি চাহিল; একবার উর্দ্ধ দন্তে নিম্ন অধরোষ্ঠ দংশন করিল এবং দেহের ভিতরে হাত দিয়া কি একটি পরীক্ষা করিল, তৎপরে হাতের রিষ্টওয়াচ আলোকের দিকে ফিরাইয়া দেখিল; দেখিয়া, স্থির ভাবে বসিয়া সেই শিক্ষিতকণ্ঠের ললিত স্বরানুক্রমসহ গানটি আগাগোড়া স্তব্ধ হইয়া শুনিল। তাহা এই;—

'ক্ষণে উদ্ভুত জল বুদ্বুদ মত
বৃথা কি এদেহ—ফাঁকা কি প্রাণ?—
ক্ষণিক আকাশে বিজলী রেখাটি, ক্ষণিক—বাতাসে বাঁশীর তান্?
আলেয়ার আলো—বাতাসে বেড়ায়!
স্রোতের কুটাটি—স্রোতে ভেসে যায়!
সাঁঝের সেফালি প্রভাতে ঝরে সে—বৃথায় সুষমা বৃথাই ঘ্রাণ?
ক্ষণিক—আকাশে বিজলী রেখাটি, ক্ষণিক—বাতাসে বাঁশীর তান?
ছাড় এ ভাবনা! কেন এ চেতনা,
দীর্ঘ জীবন বিধির দান?
কেন এ দেহ পাষাণ গঠন?
কেন সচেতন হৃদয় খান?

নহেক আকাশে বিজলী রেখা সে নহেক বাতাসে বাঁশীর তান!
নহেক স্বপন মানব জীবন
তুলিতে রতন এ দুরাভিমান।
সাগর সেঁচিয়া, জলধি মথিয়া,
সুমেরু উপাড়ি টানিয়া আন—
কোন্ দুখ তায় ভেঙ্গে যদি যায়
মাণিক লভিতে দেহ কি প্রাণ—
জীবন নহেকো বিজলী আকাশে, নহেকো বাতাসে বাঁশীর গান!'

(আলেয়া—একতালা)

গান থামিতেই আগন্তুক ব্যক্তি একটি পেন্সিল লইয়া সমার বার্থের কিনারায় মৃদু আঘাত করিয়া সমার মনযোগ আকর্ষণ করিল। সমা পশ্চাৎদিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল। আঘাতের মৃদু শব্দে সে চমকাইয়া উঠিয়া বসিয়া পড়িল এবং মুখ ফিরাইয়া দেখিল,—কে একজন তাহাকে হস্তের দ্বারা তাহার নিকট যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। আহ্বানকারী ভদ্র বাঙ্গালীর পরিচ্ছদধারী, সুন্দরদর্শন, বয়সে বালক না হইলেও যুবক বলা চলে না—কৈশোর যৌবনের মধ্যপথবর্ত্তী বয়ঃক্রম অষ্টাদশ অতিক্রম করিয়া থাকিলেও, মুখে যৌবরোমচিহ্ন মাত্র নাই। সমার ছদ্মবেশে তাহাকে ঐ আহ্বানকারী বালকের প্রায় সমবয়স্ক বোধ হইলেও সমা তদপেক্ষা তিন চারি বৎসরের অধিক বয়স্কা কাযেই, স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই আহ্বানকারী বালকের সমীপবর্ত্তী হইতে তাহার বিন্দুমাত্র শঙ্কা বা সঙ্কোচবোধ হইল না; বরং কতকটা উৎফুল্লভাবেই তৎসঙ্কেতানুবর্ত্তিনী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। ছোক্‌রা সমার একটি হাত ধরিয়া নিজের নিকটে একটি বেঞ্চের উপর তাহাকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'কি তোমার নাম ভাই?' সমা বলিল,—'বিনোদ বিহারী রায়।' ছোক্‌রা;—'কোথাকার টিকিট তোমার? দেখি!' তারপর?

সমা মনে করিল, 'রেলের চেকার টেকার হইবে, বলিল,—'লাক্ষ্ণৌ টু হাওড়া; বলিয়া পকেট হইতে টিকিটটি বাহির করিয়া ছোকরার হাতে দিল। ছোক্‌রার মুখটি মুহূর্ত্তের জন্য একটু চিন্তাযুক্ত বোধ হইল; সে তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—'আমি চেকার টেকার নই, কেবল ফেয়ারটা দেখলুম্—কত। তুমি কি লাখ্‌নৌএ থাক?' সমা মনে মনে একটু অপ্রস্তুত হইল; ভাবিল,—'টিকিট দেখিতে চাহায় সে প্রকৃতই ছোক্‌রাকে চেকার মনে করিয়াছিল, তাহার ভাব ভঙ্গী ছোকরার চক্ষে তাহার মনের চিন্তাটি ধরাইয়া দিয়াছে। ছোকড়ার বুদ্ধির সম্বন্ধে একটু অনুকূল ভাব উঠিলেও এইবার মনে মনে একটু সাবধান হইয়া ছোকরার বুদ্ধির প্রশ্নের উত্তরে, আপনার নামের মত একটি আগুন্ত মিথ্যা গল্প বলিল। বলিল,—'না ভাই আমি লাখ্‌নাউএ থাকি না, আমার এক খুড়া লাক্ষ্ণৌতে থাকেন,—একটা বড় ফার্ম্মের ফরেন্ করেস্পণ্ডিং ক্লার্ক; আমি ক্যালকাটা থেকে তাঁকে দেখ্‌তে মাসখানেক হলো লাখ্‌নাউ গিয়েছিলাম, এখন বাড়ি ফিরে যাচ্চি। তোমার ঘর কোথা ভাই,—আমাদের দেশে বোধ হয়?'

ছোক্‌রা—'কোথায় তোমার দেশ?' সমা—'চব্বিশ পরগণা।'

ছোক্‌রা—'নিকটেই বটে। আমার বাড়ী,—কোন্নগর!'

সমা—'তোমার নাম কি ভাই?' ছোক্‌রা—'হরিধন দত্ত।'

সমা—'তুমি কোথা হ'তে ম্যাট্রিক্ দিয়েছিলে?

হরি—'কিসে বুঝলে যে আমি ম্যাট্রিক পাস করেচি?'

সমা—'মুখ দেখে—সত্যি নয় কি?'

ছোকড়া একটু হাসিয়া বলিল,—'লাষ্ট্ ইয়ারে আমি রিপণ কলেজ থেকে আই, এস্, সি পাস্ করে বেরিয়েচি, এখনো থার্ড ইয়ারে এড্‌মিশেন নিই নাই,—আর নিয়েই কি বা হবে—এই তো দেশের অবস্থা!'

সমা—'কিসের অবস্থা? চাক্‌রী বাক্‌রীর? লেখাপড়ার এইম্ (aim) কি খালি চাক্‌রী? একটা মিন্‌স্ খুজে বের কর না?

হরি—কি রকম মিন্‌স্?'

সমা—'এই, নূতন কিছু একটা। আমি দুবচ্ছর আগে স্কটিশ্ চার্চ্চ থেকে ম্যাট্রিক্ পাস্ করে আর কন্টিনিউ করি নাই, একটা কোন স্পেকুলেশেনের (speculation এর) চেষ্টায় আছি।'

হরি—'কি রকম speculation?

সমা—'যেমনই জুটে যায় তেমনি?'

হরি—'স্পেকুলেশেনে সময় সময় লাইফ রিস্ক্ কত্তে হয়, তা জান তো?'

সমা—'খুব জানি,' —'কোন্ দুখ তায়, ভেঙ্গে যদি যায় মানিক লভিতে দেহ কি প্রাণ?

হরি—'ভাল কথা, তোমার ভাই, গলাটাও বেশ, গানটাও বেশ,—ওটার অথারও তা' হলে তুমিই মনে হয়!'

সমা বলিল,—'হ্যাঁ, আমিই অথার (author) বটি!'

হরি—'তা' হলে তুমিও এক জন (Extremist Speculator) একষ্ট্রিমিষ্ট স্পেকুলেটার?

সমা—'আমি তা'ই বটি কিন্তু—তুমিও' বল্লে, আর কে?'

হরিধন বলিল,—আচ্ছা তা' হলে আমি তোমাকে একটা স্পেকুলেটিভ্ পার্টির কাছে introduce ইনট্রোডিউস্ করে দিতে পারি, সে পার্টিও আমাদেরই দেশের।'

সমা—'সেটা কিসের স্পেকুলেশেন্—কোল ফিল্ড বোধহয়?'

ছোকরা আশ্চর্য্য ভাবে বলিল,—'কোল্ ফিল্ড্? সেটা আরও মস্ত বড় আইডিয়া! সে স্কীম্ তুমি শর্ট্ করে মাথায় নিতে পারবেই না বোধ হয়?'

সমাও আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—'বল কি? স্কীম্‌টা কি শুনি?'

হরিধন কহিল,—'আশ্চর্য্য অরিজিনেটারের মাথা কিন্তু! কলম্বসের পর এপর্য্যন্ত আর কারো মাথায় একথাটা ঢোকে নাই যে, স্কুল লাইব্রেরীর গ্লোব্‌টা এখনো একটা কম্‌প্লীট্ জিনিস নয়, ওটাতে এখন যতটা নীল দেখায়, বাস্তব পৃথিবীতে অতটা জল নয়, ঐ জলের মাঝে মাঝে আরও অনেক স্থল আজানা হয়ে পড়ে রয়েচে; সেই আন্‌নোন্ রিজন্‌স্ ডেস্কভার করবার জন্যেই এই প্রচেষ্টা। আর, সেগুলো পৃথিবীর কোন্ খানে—কোন্ ল্যাটিচিউড্ লঙ্গিচিউডের মাঝখানে

আছে, তাও অঙ্ক ক'ষে বের করা হয়েচে'—বাধা দিয়া সমা বলিল, 'বল কি ভাই, বড়ই আশ্চর্য্যতো—একথা তো কল্পনাও কত্তে পারি না যে. এ হ'তে পারে!

হরি—'তাইতো বল্লুম, একি তোমার আমার মাথা হে! এম্. এ, ফাষ্ট্ক্লাস্ ফাষ্ট—সায়েন্স, ফিলজফি, হীষ্ট্রী জিওগ্রাফি আর ম্যাথ্মেটিক্স্! কি করে জিনিসটা ধরা পড়লো শোন,—তোমার তাক্ লেগে যাবে!—চাঁদের নিজের কোন লাইট্ নাই, যেটা আমরা চাঁদের কাছে পাই সেটা রিফ্লেক্সন্ জানতো? চাঁদেও পৃথিবীর মত জল, মাটি এই সব আছে জলটারই রিফ্লেক্শন্ আমরা পাই, মাটীটাই কালো ঠেকে। ঠিক তেমনি ভাবে, যেমন ভাবে চাঁদের চেহারাটা পৃথিবীর অনেক কিছুতে, বিশেষতঃ জলে ছোট্ট হয়ে রিফ্লেক্টেড্ হয়, সান্ লাইটের জোরে এই পৃথিবীটাও ঐ সান্লাইটের বলে চাঁদের পিঠে হাজির হয়। আমরা পৃথিবীর উপর ব'সে পৃথিবীটার সবটা দেখ্তে পাই না, কিন্তু এর সমস্ত ঠিক্ ঠাক্ চেহারাটা ছোট্ট হ'য়ে চাঁদের অনেক কিছুর উপর প'ড়ে যায়। সেটাতো আমরা সাদা চোখে দেখ্তে পাই ই না—অর্ডিনারী টেলিস্কোপেও না কিন্তু আমাদের লীডার—এই স্কীমের অরিজিনেটার যিনি, তিনি জার্ম্মানী থেকে মেটিরিয়েল্স্ আমদানী ক'রে এম্নি একটা টেলিস্কোপ ক'রেচেন যে, তাই দিয়ে চাঁদের উপর পৃথিবীর চেহারাটা স্পষ্ট দেখা যায়।'

কথাটা আমাদের যতটাই আষাঢ়ে ঠেকুক্, সমা সেটা এতটা পরিতৃপ্তির সহিত হৃদ্গত করিল যে, সে সম্বন্ধে জেরা করিবার কোনো প্রশ্ন খুঁজিয়া পাইল না। সে বলিল,—'আমাদের লিডার বল্লে? তা'হলে তুমিও একজন মেম্বার বল? হরিঃ—'হাঁ, শুধু আমি? মেয়েতে পুরুষে তিনশ' হয়েচে, এখনো রোজ রোজ বাড়্তেই চলেচে!' সমার মুখমণ্ডল সহসা অধিকতর উৎফুল্লোজ্জ্বল হইল; বলিল,—'ফিমেল্ মেম্বারও আছেন? কতজন? হরিঃ—'তা' আমি ঠিক বল্তে পারিনা, বেশী নয়, দশ বিশ জন হবেন,—এদেশে এজুকেটেড্ ফিমেল্ ইয়ুথের সংখ্যা তো কম? অন্য দেশ হ'লে বোধ হয় আধা আধি হয়ে যেতো!

সমা একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—'হা স্কীম্ খুবই উচু বটে, কিন্তু প্রাক্‌টিকেবল্ হবে কি?

হরিঃ—'কেন হবে না? সর্ব্বরকম সাজ সরঞ্জাম, হালহাতিয়া মায় পাচশ লোকের এক বৎসরের খাদ্য সামেৎ যখন সর্ব্বরকমে মজবুৎ প্রকাণ্ড একখানি জাহাজ পাচশটি ফায়ার ব্রাণ্ড ইয়ুথ্ বুকে নিয়ে বিউগুল্ বাজিয়ে, পাতকা উড়িয়ে মহা সমুদ্রের জল কেটে দৌড়ুবে তখন দেখ্লে বুঝবে যে, ইম্প্রাক্‌টিকেবল্ কথাটা ডিক্শেনারী থেকে তুলে দেওয়াই উচিৎ!' একটি যৌবন স্বপ্ন সুলভ উন্মাদনা রসে সমার স্বপ্ন উর্ব্বর হৃদয় আপ্লুত হইল। সে চর্ম্ম চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বক্তার মুখের উপর চেতনাহীন দৃষ্টি স্থাপন করিয়া তাহার কথাগুলি শুনিতেছিল এবং তৎকালে মনশ্চক্ষে দেখিতে ছিল,—বিরাট অর্ণবযানের সাগরজলোদ্ভেদ এবং পতাকার উৎপত্তি, আর কর্ণে বাজিতে ছিল—বিউগুলের ভ্যাঁ পোঁ, তাই, হরিধনের কলিকায় গুলির ছিটার 'পটাং' শব্দটা কর্ণে প্রবেশই করিল না এবং সেই হেতু আলিবাবার দৌলতের পাহাড়টির নামটি ভুগোলের কোন পাতায় আছে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উত্থাপন করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; কেবল শুধাইল,—এস্কীম্ প্রাক্‌টিকেবল্ কত্তে, অনেক টাকার দরকার, না? কিন্তু সে টাকা,—তোমাদের লীডার বুঝি খুব বড় লোক?

হরি—'বড় লোক' ? না,—টাকাওয়ালা লোক নন ; আরে, বড় লোক ? তাঁরাতো গম ক্ষেতের শিয়াল কাঁটা ! লীডারকে আমি অবিশ্যি কখনো দেখি নাই—তবে টাকাটা মেম্বার দিকেই সংগ্রহ কর্ত্তে হবে !'

সমা—'কি করে ? চাঁদা দিয়ে ?'

হরি—'দেখ বিনোদ. আর বেশী কিছু,—আমাদের অরগ্যানিজশন ক্রীড্ এসব কিছু শোনবার পূর্ব্বে তোমাকে শপথ নিয়ে আমাদের দলের একজন মেম্বার হ'তে হবে, নচেৎ আর কিছু শুন্‌তে পাবে না !'

সমা—'আচ্ছা. আমি মেম্বার হ'তে-রাজী আছি, কি শপথ কত্তে হবে বল ?

হরি—'ব'ল্‌চি কিন্তু শপথ নেবার পূর্ব্বে তিনবার মনে মনে ভেবে ঠিক করে নাও যে তুমি আমাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য যে কোন সময়ে দলের ডিক্টেটারের ডিক্টেশন মত জীবন উৎসর্গ পর্য্যন্ত করতে পারবে কিনা। যদি পারবে বলে বোধ কর, তা'হলে শপথ নাও, নচেৎ নিও না—বিপদ হবে !'

ক্ষণেক মনে মনে চিন্তা করিয়া সমা বলিল,—'পারবো, খুব পারবো, দাও —কি ক'রে শপথ নিতে হবে বল !' বলিয়া দক্ষিণ হস্তটি হরিধনের সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সমার কৌতূহলী দৃষ্টিকে বিস্ময়বিস্ফারিত করিয়া দিয়া হরিধন জামার ভিতর হইতে একটি টোটাভরা ছয় নলা রিভলভার বাহির করিয়া সমার সম্মুখে ধরিল। সমা সহসা ভীতি সঙ্কুচিত মুখে সম্প্রসারিত হস্ত পশ্চাদপসারিত করিল। হরিধন ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—'ভয় নাই, হাত দাও স্পর্শ কর,—এই আমাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ! একে ছুঁয়ে শপথ কর.—আমি 'আরব্ধ কার্য্যে আপনাকে উৎসর্গ করিলাম !' সমা রিভলভার স্পর্শ করিয়া শপথ করিল। হরিধন রিভলভারটি পূর্ব্ব স্থানে লুক্কায়িত করিয়া এবং হাতের ঘড়িটি একবার দেখিয়া লইয়া ব্যস্ত ভাবে বলিল,—শোন ! ক'টা কথা তাড়াতাড়ি ব'লে দিই, কায আরম্ভ করতে হবে, আর বেশী দেরী নাই. একটা বেজে গেল, আর কুড়ি মিনিট্ মাত্র বিলম্ব আছে ! আমাদের স্কীম্ সাক্‌সেস্‌ফুল কত্তে যে টাকা দরকার, সে অনেক টাকা. সে টাকা আমাদের নাই ; পরের কাছ থেকে নিতে হবে, কিন্তু চাইলে কেউ দেয়না—'ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ ! তাই আমরা যার টাকা আছে তার কাছে জোর ক'রে নিই। আজ এখনি—কুড়ি মিনিট পরেই এই গাড়ির পাশের কামরার ডাক্ লুট্ করবো। এই আমাদের আজকার প্লেন্। তুমি আজ আমাদের দলভুক্ত না হ'লে, আমার কাযে বাধা দিলেই আমার হাতে তোমার মরণ হতো,—তোমার সুন্দর মুখ তোমাকে তিল মাত্র সাহায্য কত্তে পারতো না। যাক্. এই আমাদের ক্রীড্। আমাদের অরগ্যানিজেশন শোনো,—আমার নাম হরিধন দত্ত নয়,—আর কোন দিন ঐ নামে নিজের পরিচয় দিয়েছি বলেও মনে হয়না। আমাদের সকলেরই নাম অপ্রকাশ, এক একটা সাঙ্কেতিক নম্বরের দ্বারা আমরা পরস্পরের কাছে পরিচিত। আমাদের অরগ্যানাইজার কে আমরা চিনি না, নামও জানি না ; হয়তো কোথাও দেখেও থাক্‌তে পারি কিন্তু সে হয়তো ভিন্ন পরিচয়ে আমাদের দলে যে ৩০০ তিনশ

মেম্বার আছে, সেটাও শোনা কথা ; আমাদের দল খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করা প্রত্যেক দলে পনেরোজন মাত্র আছে, তা'রাই এক সঙ্গে থাকে আর এক সঙ্গে কায করে, কাযেই পরস্পরের নাম না জান্‌লেও পরস্পর পরস্পরকে চেনে। আমাদিগে খবর দেবার একজন মাত্র লোককে চিনি,—সে সংবাদদাতা ; আমরা সব খপর তারই কাছে পাই,—এই কাযে বোধ হয় আরও লোক আছে, আমরা একজনকেই পাই, তার আর কিছু কায নাই, খালি সংবাদ বয়। যাক্, আর সময় নাই। আমাদের ২০ দল ভর্ত্তি হয়ে গেছে, তুমি যে দলে ভর্ত্তি হলে সে দলের নম্বর ২১ আর আমার দলের নম্বর ১৫। তোমার সঙ্গে আমার সর্ব্বদাই দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নাই, আর সেরূপ নিয়মও নয়। তুমি তবে প্রিপারেশন্ শেষ হয়ে গেলে, ভয়েজের দিনে সব একত্র হওয়া যাবে। হাঁ আর এক কথা, আমাদের দলের সাঙ্কেতিক নাম জাহাজ কিম্বা সিপ্ আর সাঙ্কেতিক চিহ্নও একটি জাহাজের ছবি।' এই বলিয়া পকেট হইতে একটি কার্ড বাহির করিয়া তাহার উপর পেন্সিল দিয়া কি লিখিয়া ও সেটি সমার হাতে দিয়া তাহাকে জানালার কাছে লইয়া গিয়া বাহিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল :—'একটা আলো দেখচ গা ?' সমা বলিল,—'হাঁ দেখচি।' ছোকরার নাম হরিধন নহে জানিলাম, প্রকৃত নাম পাইবারও উপায় দেখিনা কাযেই এখনো তাহাকে হরিধন বলা ব্যতীত উপায় নাই। হরিধন বলিল,—কি রংএর আলো !' সমা বলিল—'বেগুণে।' হরিধন বলিল,—'হাঁ ঠিক্, ঐ আলোর উপর লক্ষ্য রেখে দাঁড়াও—টিকিট খানা বাগিয়ে পকেটে নাও, আমি ততক্ষণ পোষাক পাল্‌টেনি !'

মুহূর্ত্তমধ্যে হরিধন আপন উপরের কোট্ এবং পরিহিত বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া শ্মশ্রু গুম্ফে এবং আগাগোড়া কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে আপনাকে একটি নূতন মানুষ করিয়া ফেলিল এবং সমার পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। সমা মুখ ফিরাইয়া সঙ্গীর অপরূপ ছদ্মবেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য এবং অধিকতর মুগ্ধ হইল। হরিধন সমার হস্তে আপন কাপড় এবং কোটটি দিয়া বলিল,—'তোমার কোটের উপর কোটটা প'রে নাও আর কাপড় খানা তোমার ছোট হাত ব্যাগটায় রাখ !' সমা তদ্রূপ করিল। দূরের বেগুণে রংএর আলো তখন আরও নিকটে আসিয়াছে। হরিধন সমাকে আবার আলোকটি দেখাইয়া বলিল,—'দেখ, আলো খুব কাছে, আমাদের ছাড়াছাড়ির সময় এসে প'ড়েছে ; কথা ক'টা মন দিয়ে শোনো, আমি এখনি এই ডেঞ্জার সিগন্যালটা টানবো, গাড়িটা দাঁড়াবামাত্রেই এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে, পেছু দিকে না চেয়ে, আমি কি কর্‌চি, কোথায় যাচ্চি সে সব কিছু মাত্র লক্ষ্য না করে, তুমি যতটা জোরে পার ঐ আলো লক্ষ্য ক'রে যাবে, সেখানে তিন খানা মোটর দাঁড়িয়ে আছে দেখ্‌বে, সেই মোটরে যে সোফার আছে তাকে ঐ কার্ডখানা দেখাবে, তার পর সে যা' বলে কর্‌বে !' একটা কঠিন কার্য্যকাল আসন্ন বোধে উভয়ের হৃদ্‌যন্ত্রই ঘন স্পন্দিত হইতেছিল,—হরিধনের স্বর কম্পিত হইতেছিল এবং সমা আপন হৃদয়ের স্পন্দন ধ্বনি কর্ণে অনুভব করিতেছিল। সেই আসন্নসঙ্কট মুহূর্ত্তে হরিধন বলিল,—'এস, আমাদের প্রথা মত বিদায়ের কোলাকুলি করি—কিজানি হয়তো এই দেখা শেষ দেখাও হ'তে পারে !' বলিতে বলিতে সমাকে চিন্তা করিবার কিম্বা কোন শব্দ উচ্চারণ করিবার সাবকাশ না দিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছায় বাহুবদ্ধ করিয়াই ছাড়িয়া দিয়া, দুই হাত পশ্চাতে হাটিয়া এক মুহূর্ত্তমাত্র সমার বিহ্বলতা চঞ্চল মুখের পানে চাহিল এবং পর মুহূর্ত্তে

শব্দ মাত্র উচ্চারণ না করিয়া হস্ত সঙ্কেতে সমাকে পালাইবার ইঙ্গিৎ করিয়া দৌড়িয়া গিয়া ডেঞ্জার সিগন্যাল্ টানিয়া দিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কি হইল? একথা বলা বড়ই কঠিন কায! জগতে অসম্ভব কিছুই নয়,—ভালর দিকেই কি, আর মন্দের দিকেই কি! আজ যাহা অসম্ভব ঠেকিতেছে, কা'ল তাহা সম্ভব আর অসম্ভবের মাঝে দাঁড়ি টানিয়া,—এই পর্য্যন্ত সম্ভব, আর এই পর্য্যন্ত অসম্ভব ইহা দেখাইয়া দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত বোধ হইতেছে। আমরা সাধারণ-গোলা, গৃহস্থ মানুষ, বিদ্যাসাধ্যও নাই, আত্মসংযম, চিত্তশুদ্ধিরও কোনো খবর রাখিনা। ইলেক্ট্রিকের পজেটিভ্ নিগেটিভ্ সংস্পর্শে অগ্ন্যুৎপাৎ হয় দেখিয়াছি; মহাযোগী সত্যানন্দের হাতে গড়া প্রিয় শিষ্য ভবানন্দের দুর্গতির কথাও শুনিয়াছি; কর্দ্দমময়, পিচ্ছিল যৌবনপথ অনেক দিন হইল পার হইয়াছি, লাফালাফি করিতে কিম্বা অসাবধানতায় দুই একটি আছাড়ও না খাইয়াছি এমন নয়, কর্দ্দমচিহ্ন এখনো আঁটিয়া ধরিয়া আছে। এইতো অভিজ্ঞতার হেতুসূত্র (source)! তবে, একটা (direction) আমি দিতে পারি,—এ তথ্যের মীমাংসা করিতে—'পাঠক কিম্বা পাঠিকা, সম্পূর্ণ আত্মস্থ হইয়া আপন আপন বুকে হাত দিয়া, চক্ষু মুদিয়া,—যুবক হইলে দেখুন,—এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁর কি হয়, আর অযুবক হইলে দেখুন,—তাঁহার কি হইতে পারিত!—সেই রাত্রিকালে, সেই নির্জ্জন কক্ষে সেই সমপন্থী, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল যুবক যুবতীর আলিঙ্গন—দেখিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া আমাকে দায় হইতে মুক্তি দেন!

সিগন্যাল্ টানিতে হরিধনের হাত কাঁপিল। একাযে সে আজ নূতন ব্রতী নয়, আর কোনো দিন কাঁপে নাই, আজ কাঁপিল; তবে সে খুব অল্প! দেহের গ্রন্থীগুলি যেন একটু শিথিল বোধ হইল; সে মাত্র ক্ষণেকের অনুভূতি।

সিগন্যাল টানিয়া গাড়ি থামিবার পূর্ব্বেই হরিধন কাম্‌রা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গাড়ীর পা'দানের উপরে উপরে মেল্ ভানের পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দলস্থ আর আর যাহারা যেখানে যে কাজে ব্রতী ছিল তাহারাও নিয়ম মত সে কাজ করিয়া চলিতেছিল কাহারো প্রতি কাহারো লক্ষ্য নাই। হরিধন বাহির হইতেই সমা মুহূর্ত্তেক স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইল। এই দেখাই হয়তো শেষ দেখা! বড়ই নিদারুণ কথা! আজিকার মত এ কায না করিলেই হইত! ভাবিতে ভাবিতে সমা অন্য মনস্ক ভাবে হরিধনের নির্দ্দেশ মত আলোক লক্ষ্য করিয়া ঘনস্পন্দিত বক্ষে, কম্পিত পদে গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িল, কিন্তু গাড়ীর বেগ তৎকালে যথেষ্ট মন্দীভূত হইলেও এককালে থামিয়া যায় নাই; সমা সেই গতিশীল গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িবার ফলে কিছু দূর ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়া গেল। তাহার মস্তকে আঘাত লাগায় সে অচেতন হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটি গর্ত্তে গিয়া পড়িল। অন্য কেহই বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিল না, কিন্তু এই ব্যাপার, দুরূহ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেও, হরিধনের লক্ষ্যচ্যুত হইল না। এবং তাহার পরিণামও ভীষণ হইল।

মুহূর্ত্তমধ্যে বৈদ্যুতিক তার ছিন্ন হওয়ার ফলে সমস্ত ট্রেণটা অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। সেই নিবিড় অন্ধকারে চিৎকার, আর্ত্তনাদ এবং রিভল্‌ভারের দুম্ দাম্, ফট্ ফাট্ শব্দের মধ্যে মেল্‌ব্যাগ

অপহৃত হইল। দস্যুদল বিজয়োল্লাসে দ্রুত অন্তর্হিত হইল। কিয়দ্দূর গিয়া হরিধন দল ছাড়িয়া পশ্চাতে ফিরিল। দৌড়িয়া প্রত্যাগত হইয়া সমা যেখানে পড়িয়াছিল সেখানে গেল। সে স্থান লুণ্ঠিত ট্রেন যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সে স্থান হইতে অধিক দূরে নয়। সমা তখন চেতনা পাইয়াছিল কিন্তু পলায়নের শক্তি পায় নাই,—আঘাত সাংঘাতিক না হইলেও কঠিন। হরিধন যাইতে সমা তাহাকে চিনিতে পারিল না, আক্রমণকারী বোধে চিৎকার করিয়া উঠিল। দস্যু দলের নিয়মানুসারে তৎক্ষণাৎ তাহাকে রিভল্‌ভারের গুলিতে খুন করা হরিধনের কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু হরিধন সে কর্ত্তব্য পালন করিল না; তৎফলে সমার চিৎকার দ্বারা আকৃষ্ট রেলগাড়ির লোক জন আসিয়া তাহাদের উভয়কেই ধরিয়া ফেলিল। মুহূর্ত্তেই হরিধনের হস্তস্থিত রিভলভারের গুলি তাহার কণ্ঠদেশ হইতে মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া সশব্দে চলিয়া গেল; হরিধনের প্রাণহীন দেহ ধৃতকারীর বাহুচ্যুত হইয়া ধরাশায়ী হইল এবং সমা ঘটনাস্থলে ধৃত দস্যুর দশা প্রাপ্ত হইল।

যথাকালে উপযুক্ত বিচারালয়ে সমার বিচার হইয়া গেল। কেহ তাহার পক্ষ সমর্থন করিল না। লুণ্ঠনের কালে কেহ তাহাকে কিছু করিতে দেখে নাই। সে ঘটনায় কাহারো প্রাণ হানিও হয় নাই, কিন্তু সমা তাহার ছদ্মবেশ এবং তাহার দেহে থাকা হরিধনের কোটের পকেটে রক্ষিত অব্যবহৃত রিভলভারের টোটার অবস্থানের কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারে নাই তজ্জন্য সেও দস্যুদলভুক্ত একজন অবধারিত হওয়ায় তাহার পাঁচ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হইয়া গেল। আমরাও দীর্ঘ দিনের জন্য তাহার পশ্চাদনুসরণের অবসর পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সমা দিন কতক জেল খাটুক, আমরা ততক্ষণ কলিকাতা দেখিয়া আসি!

দিগদর্শন

বেদান্তে ভেদান্ত

একদিকে প্রবৃত্তির উদ্দাম গতি অপরদিকে সামাজিক বাধা এই উভয়ের মধ্যে আপোষ করিতে গিয়া মানুষ তার স্বকর্ম্মের স্বপক্ষে যুক্তি অনুসন্ধান করে; এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি বা সংস্কারের অনুকূল যুক্তিকে উপাদেয় ও প্রতিকূল যুক্তিকে হেয় জ্ঞান করিয়া থাকে। যুক্তির দৃঢ়তা অপেক্ষা প্রয়োজন সিদ্ধির অনুকূলতাই হয় স্বপক্ষ সমর্থনের প্রধান অবলম্বন। সংযম ও চিত্তশুদ্ধি দ্বারা নিবৃত্তিমুখী না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের পার্থক্যবোধ সুপরিস্ফুট না হওয়ায় ভোগমুখী প্রবৃত্তির প্রবল প্রতাপ থেকে মানুষ নিষ্কৃতি পায় না। কিভাবে কখন কোন দিক্ দিয়া প্রবৃত্তি তার স্বীয় স্বার্থ সাধন করিয়া লয়, তাহা বুঝিয়া ওঠা বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও কষ্টকর হইয়া থাকে। অনেক সময় উদার ধর্ম্মমতের মুখোস পরিয়া সে তার অভীষ্ট সিদ্ধি করে ইহাও দেখা যায়। যাহা হউক শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ অবলম্বনে প্রবৃত্তিকে দমন করিতে না চাহিলেও কেহ নিজেকে প্রবৃত্তির দাস ভাবিতে বা সমাজে তাহা প্রকাশ হইতে দিতে চায় না। নিজের নির্দ্দোষিতার

সাফাইরূপে যে সকল অনুকূল যুক্তি খুজিয়া বাহির করে তাহার বেশীর ভাগই বিচারসহ হয় না। তথাপি যদি কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উক্তি বা কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণের একাংশ স্বকার্য্যের সমর্থকরূপে পায় তাহা হইলে আনন্দের সীমা থাকে না নির্ভয়ে ইচ্ছানুরূপ বিচরণের উৎসাহ ও শক্তিবৃদ্ধি হয়। ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়—একজন স্বৈরিণীকে প্রতিবেশিনীগণ নিন্দা করিলে সে অদ্বৈতমতের দোহাই দিয়া উত্তর দিয়াছিল যে, পতিতে ও উপপতিতে যখন একই ব্রহ্ম বিরাজিত, তখন উভয়ের মধ্যে ভেদ জ্ঞান করা নিতান্তই মূর্খতার কার্য্য। মুখবন্ধে এতগুলি কথা বলিয়া এইরূপ দৃষ্টান্ত দিবার উদ্দেশ্য এই যে, বর্ত্তমান যুগে অনধিকারীর মধ্যে অদ্বৈতবাদরূপ চরম আদর্শের বহুল প্রচারের ফলে সকলেই মৌখিক বৈদান্তিক হইয়া উঠায় সমাজের চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে ও তাহা সমর্থনে ঐ জাতীয় যুক্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছে। প্রবৃত্তিমূলক আহারবিহারের সংযম ও শুচিতার অনুকূল যুক্তি অপেক্ষা প্রতিকূল যুক্তিগুলিই সাধারণের নিকট ভোগবাদের অনুকূল বিধায় অধিকতর সমাদর পাইতেছে : এই সকল কারণেই বোধ হয় প্রাচীন যুগে অধিকারিবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কোন উচ্চাঙ্গের সত্য কেবল শুনিয়া রাখিলেই সাধনা ব্যতিরেকে মানুষ তদনুকূল আচরণের প্রকৃত অধিকারী হয় না। যাহার সাধন সামর্থ্য নাই তাহার দ্বারা কেবল বিচার বুদ্ধির সাহায্যে সত্য গৃহীত হইলে নানা বিকৃত মতের সৃষ্টি হইয়া সত্যের অপব্যবহার ঘটে। এই জন্য কোন উচ্চতত্ত্ব বা বিদ্যাদান করিবার পূর্ব্বে গ্রহীতার যোগ্যতা বিচার করা প্রাচীন রীতি ছিল। বেদান্তসারের প্রথমেই কাহারা বেদান্তের অধিকারী বা যোগ্য পাত্র তাহা নির্ণীত হইয়াছে। বেদান্তের দোহাই দিয়া ভেদ-অস্ত করা যত সহজ বেদান্তের প্রকৃত অধিকারী হওয়া কিন্তু তত সহজ নহে। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বা একং সদ্বিপ্রা বহুধা ভবন্তি প্রভৃতি দুই চারিটী বড় বড় কথা মুখস্থ করিয়া স্বেচ্ছাচারের স্বপক্ষে উপরোক্ত স্বৈরিণীর মত বিচারসহ ভিত্তিহীন যুক্তি দেখান যাইতে পারে কিন্তু তাহার দ্বারা প্রকৃত কল্যাণ বা পরমার্থ সাধন হয় না। সাধনার দ্বারা যখন জীবের সৎভাব চিৎভাব ও আনন্দভাব সম্পূর্ণ সুব্যক্ত হয় তখনই "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি অভেদ প্রতিপাদক শ্রুতি দ্বারা অভেদের উপলব্ধি হয়। জীবের সংসারিত্ব থাকে না, কার্য্যাকার্য্য ভেদাভেদ চলিয়া যায়—জীব শিবে পরিণত হয়। তাহার পূর্ব্বে অসংখ্য কামনা বাসনা সংসারের দাস সুখ দুঃখ চঞ্চল দুর্ব্বল অজ্ঞ সাধারণ জীবের পক্ষে অদ্বৈতবাদের দোহাই দিয়া প্রবৃত্তির প্রয়োজন সিদ্ধি করিতে যাওয়া ভাবের ঘরে চুরি ভিন্ন কিছু নয়।

সর্ব্বজীবে একই ব্রহ্মচৈতন্য বিদ্যমান, কারণতত্ত্বে সকলেই এক সৎপদার্থ হইতে উদ্ভূত একথা যেমন পারমার্থিক সত্য, তেমনি আবার স্থূল জগতে রূপে গুণে ভাবে ভাষায় আকৃতি প্রকৃতিতে প্রত্যেকেই বিভিন্ন ; কেহই কাহারো সমান নহে একথাও ব্যবহারিক সত্য ; ব্যবহারিক জগতকে ছাড়াইয়া উঠিতে না পারিলে একথা উপেক্ষা করা চলে না।

অসংখ্য ভেদোপাধি বিশিষ্ট বৈচিত্র্যময় ব্যবহারিক জগতে নানা রুচি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট মানবের মধ্যে—সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধির অজুহাতে বেদান্তানুমোদিত অদ্বৈতবাদ সহসা সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। ভেদজ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় থাকিতে সকলে সমান এই কথা অগ্নিকে জল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টার মতই মিথ্যা। অগ্নি ও জল মূলতঃ এক বস্তু হইতে উৎপন্ন হইলেও অগ্নির দ্বারা জলের কাজ বা জলের দ্বারা অগ্নির কাজ সম্ভব নয়। জাতীয় লক্ষ্যের প্রতি আস্থাহীন সদাচার-

বিমুখ ব্যক্তিগণের পক্ষে যথেচ্ছাচারের অনুকূল যুক্তিরূপেই অদ্বৈতবাদ গৃহীত হইতে দেখা যায়। বেদান্ত যে রীতিতে ভেদ অস্ত করিতে ইচ্ছুক তাহাই যদি সংস্কারকামীদের কাম্য হইত কোন সনাতনপন্থীরই তাহাতে আপত্তির কারণ ঘটিত না। মানুষকে উচ্চস্তরে উঠাইবার শাস্ত্রসম্মত কোন প্রয়াস নাই, আছে কেবল ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল করিবার বিরাট অভিযান। উচ্চে উঠিলেই নিম্নস্থ সকলকে সমান দেখা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে নতুবা কৃত্রিম উপায়ে প্রয়োজনের চাপে আংশিক সমান করিতে যাওয়া ভারতীয় রীতি নহে। যদি ভারতে ভারতীয় ভাবে সমানাধিকারবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তবে সনাতন পদ্ধতি ছাড়িয়া নহে, ধরিয়াই সাধনার পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া উপরে উঠিতে হইবে। ধার্ম্মিকের পক্ষেই সমব্যবহারী না হইলেও সমদর্শী হওয়া সম্ভব। ঈর্ষা ঘৃণা অহমিকা দাম্ভিকতা প্রভৃতি দোষ গুণ প্রকৃত ধার্ম্মিকের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। বহু নবীন-পন্থীকে খাদ্যাখাদ্যবিচারে উদার কিন্তু স্বার্থের সামান্য আঘাতে রুদ্রমূর্ত্তি ধরিতে দেখা যায়। চায়ের দোকানে বসিয়া হরিজনদের উচ্ছিষ্ট পেয়ালায় চা পান করিতে আপত্তি নাই। কারণ, আমার মধ্যে যে ভগবান তাহাদের মধ্যেও তাহাই এইরূপ অদ্বৈতবাদের সাফাই অনেকে দিয়া থাকেন। কিন্তু সেই হরিজনকে দিয়া নিজের পাইখানা পরিষ্কার করাইতে কয়জন সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন। একদিন কাজ বন্ধ করিলে ধমক দিয়া—সামান্য বেতন কাটিতেও ঐ সকল উদারপন্থীগণের ক্রুটি হয় না। আসল কথা, যদি হরিজনের সহিত নিজেকে সমান এই বোধ জন্মিত তাহা হইলে আমি যে কাজে ঘৃণা বোধ করি অপরকে দিয়া সেই কাজ করাইতে পারিতাম না।

চা পানের সময় অত বিচার করিতে যাইলে অসুবিধা ঘটিত। চা পানে বাধা জন্মিত বলিয়াই উদারতার মূর্ত্তিতে প্রবৃত্তি নিজের কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইয়াছে মাত্র—সাধনার চরমাবস্থার উপযোগী অদ্বৈতবাদ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারের দ্বারা প্রচলিত সনাতন ধর্ম্মবিশ্বাস নষ্ট করতঃ বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া হিন্দুদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট অবলম্বনশূন্য মেরুদণ্ডবিহীন করিবার যে প্রয়াস চলিতেছে কোন ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্যক্তি তাহাকে সমর্থন করিতে পারেন না।

যদি বেদান্তের একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে তবে তাহা খাঁটী দেশীয় ভাবে ধার্ম্মিক নীতিতে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে পরমার্থবাদের ভিত্তিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়—নতুবা বর্ত্তমানের আন্দোলন সাধারণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ ও উদাসীন করিয়া তুলিতেছে। অতএব সংস্কারকামী বন্ধুদিগকে এই অমূল্য ভগবদুপদেশটী স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি,—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদ জ্ঞানীনাং কর্ম্মসঙ্গিনাং"

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

নারীত্ব ও কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমানের দুইটি প্রধান কর্ত্তব্যের সম্বন্ধেই আমার যা বক্তব্য তাহা বলিতেছি। সতীত্ব ও মাতৃত্ব। এর চেয়ে বড় কর্ত্তব্য যে জগতে আর কি আছে, আমি জানি না। একজন বিখ্যাত দেশনায়ক আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "যে সব মেয়েরা আমাদের মধ্যে আসিতেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমরা কি ভাবে চলিব বলুন দেখি?" আমি তাঁকে উত্তর দিই—"ছেলে যেমন মার সঙ্গে চলে, সেই ভাবে। তাঁদের ডেকে বলুন, 'মা! যখন অসুর-শক্তি সুরশক্তিকে পরাভব করেছিল,

তখন তাদের দুর্গতি নাশ করিতে দুর্গারূপে এসেছিলে, আজও তেমনি করে তোমাদের মহাশক্তির সমাবেশ করে সন্তানদের মধ্যে এসে দাঁড়াও।' কার সাধ্য আছে কোন কথা বলিবার ?"

মা যদি সতী, সত্যনিষ্ঠা, উন্নতচরিত্রশালিনী হন সন্তান পালনকেই (লালন নয় !) তাঁর প্রধান ধর্ম্ম মনে করিয়া সেই ভাবেই আশৈশব তাকে সৎ শিক্ষা দেন, সংসার হইতে কত না পাপ তাপ দূরীভূত হইয়া যায়।

এ দেশের শাস্ত্রে এবং লোকাচারে নারীর বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চ্চার বাধা ছিল না, তাহা অনেকেই জানেন। ঠিক ইংরাজী যুগের পূর্ব্বে এবং পরের যে যুগ, সে যুগটি এ দেশের কতকটা অন্ধকার যুগ। তা ভিন্ন কোন কোন অশিক্ষিত পরিবারের মধ্যে হয়ত অনেক রকম কুসংস্কার থাকিতে পারে, প্রধানতঃ হিন্দুর মেয়েরা (উচ্চ শ্রেণীরই অবশ্য) কোন যুগেই আকাট মূর্খ ছিলেন না, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। নাম করিতে হ'লে বাছা বাছা নামগুলই লোকে সকল বিভাগেরই নমুনা-স্বরূপ দিয়া থাকে, এক ধরণের অনেকগুলি নাম সংগ্রহ করা কেহই আবশ্যক বোধ করে না। ইহাতে দেখা যায়, অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সকল বিভাগেই হিন্দু নারীর শক্তি সামর্থ্যের ও সৎশিক্ষার কোন অভাব ঘটে নাই। যাহাতে জ্ঞান বুদ্ধি প্রসারিত, কর্ত্তব্যবোধ পরিমার্জ্জিত, দূরদর্শন ও নীতি চরিত্র গঠিত, ত্যাগ সংযম চারিত্রিক দৃঢ়তা বর্দ্ধিত হয়, এ শিক্ষার তাঁদের কোন দিনই অভাব ছিল না। শিল্প, সাহিত্য, আতিথেয়তা বা সামাজিকতা যে কিছু শিক্ষার অঙ্গ বা শিক্ষা-সাধনার অবশ্যম্ভাবী ফল, সকলই প্রচুরতররূপে তাঁদের ভিতর বর্ত্তমান ছিল।

এ দেশের মেয়েরা সকল যুগেই এমন কি ঘোরতর বিপ্লবময় জাতীয় দুর্দ্দিনে কুল-গৌরব ও আত্মসম্মান রক্ষাপূর্ব্বক রাজ্যশাসন, জমিদারী পরিচালনা, বড় বড় যৌথ পরিবারের কর্ত্তৃত্ব—কোন কিছুতেই পশ্চাৎপদ হন নাই। অহল্যাবাঈ ঝান্সির রাণী খুব বেশী দিনের নন, অর্দ্ধ-বঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর দূরপ্রসারী ও সূক্ষ্মদৃষ্টি যে অনেকানেক কূট রাজনীতিবেত্তার অপেক্ষাও অনেক বেশী ছিল, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাস যাঁরাই জানেন, তাঁদেরই অজানিত নয়। বর্ত্তমানের এই যুগটিকেই যদি অন্ধ তামস যুগ বলা যায়, খুব বেশী অত্যুক্তি করা হয় না। মনের মধ্যে আমাদের বড় বড় আদর্শ খাড়া হইয়া উঠিতেছে বটে, কিন্তু আসলে আমরা নীচের দিকেই নামিতে চলিয়াছি। ভারতের শিক্ষা-সাধনা নিবৃত্তিমূলক নয়, আমরা তার সেই মর্ম্মকথা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি বলিয়াই যত কিছু অনর্থ ডাকিয়া আনিতেছি। যাত্রাগান এবং কথকতার দ্বারায় সার্ব্বজনীন লোকশিক্ষা শুধুই প্রাথমিক অক্ষর-পরিচয়ই নহে, নীতিধর্ম্ম পুরাণাদির প্রচারে এ দেশের অতি নিম্নস্তরের মধ্যেও যেমন উচ্চাঙ্গের নীতিশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এমন আর কোথাও হয় নাই। পল্লীজীবনের সঙ্গে সঙ্গে সে সমুদয়ই আজ ইন্দ্রজালবৎ অদৃশ্য হইয়া তার স্থানে পড়িয়া আছে, সমাজ বন্ধনের বাহিরে, সহরে ঠাসাঠাসির মধ্যে দায়িত্বহীন শিক্ষা-সম্পদশূন্য অসার জীবনযাত্রা।

আপনাদের আবার সেই ভারতীয় সাধনার পথে মুখ ফিরাইতে হইবে। ছেলেমেয়েদের প্রতি কর্ত্তব্য ত করিবেনই প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েদেরও যাহাতে ঐভাবে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা হয়, তার উপরেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আপনাদের সমিতিতে এবং এইরূপ বহুতর নারী সমিতি সংগঠিত করিয়া সম্মিলিতভাবে এই সকল অবশ্যকরণীয় বিষয়ে আলোচনা এবং ইহার জন্য মধ্যে মধ্যে সুচিন্তিত প্রবন্ধপাঠক অত্যাবশ্যক। ছেলেমেয়ে দুইজনকেই সমান শিক্ষাদান করিতে যেন দ্বিধা

করিবেন না। অবশ্য শিক্ষার বিষয় বিভিন্ন থাকুক, কিন্তু মেয়েদেরও যে কতকগুলি প্রধান প্রধান বিষয়ে ছেলেদের সঙ্গে সমান অধিকার আছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। বিদ্যাশিক্ষায় প্রাচীন ভারতের নারীদের ত উচ্চাধিকার ছিলই, মনু বলিয়াছেন, 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।' উচ্চাঙ্গের জ্ঞানসমাবেশে যে এই সেদিন পর্য্যন্ত বঙ্গনারীদের অধিকার নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না, তাহার প্রমাণ জন্য মিলাইয়া দেখুন দেখি, আপনার শৈশবে দৃষ্টা বা যৌবনে পরিচিতা, অথবা আজিও বর্ত্তমানা পিতামহীর সহিত আপনার পৌত্রীটিকে। দু চারিটি সেমিজ পেটিকোট ব্লাউস ও জুতা মোজা পরিয়া এক তাড়া বই খাতার বোঝা বহিয়া সে কি তাঁর চেয়ে উন্নতহৃদয়মন, উদার চিত্তবৃত্তিশালিনী ও ত্যাগপূত চরিত্রসম্পন্না হইতে পারিয়াছে? স্কুলের শিক্ষা ছেলেমেয়েকে দিতে হইবে, দিন; কিন্তু আসল শিক্ষাই গৃহশিক্ষা। গৃহশিক্ষার প্রধান শিক্ষক ছেলে-মেয়েদের মা, মা নিজে শিখিয়া তাদের মানুষ হইতে শেখান। তাদের শেখান স্বদেশকে ভালবাসতে, স্বধর্ম্মকে শ্বাসবায়ুর মতই গ্রহণ করিতে, স্বজাতিকে দেহের শোণিতবিন্দুর মতই প্রিয় ভাবিতে। তাদের শেখান, ত্যাগের ধর্ম্ম, সংযমের ধর্ম্মই বীরের ধর্ম্ম মহতের ধর্ম্ম, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

পরোপকার।

পরোপকার ব্রত বড়ই কঠোর ব্রত পরের মন্দ করা যেমন সহজ, পরের ভাল করা তেমনি শক্ত। ভাবিয়া দেখুন, আপন আপন সময় ও সামর্থ্যের অধিকাংশই,—প্রায় সমুদয়ই স্বার্থের সেবাতে ব্যয়িত হইয়া যায় কি না? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরোপকারের ভাণ করিয়া প্রকৃত পক্ষে আত্ম-পরিতোষের কাজ করি কি না? নিষ্কাম ধর্ম্মের সাধনা কয়জন করিতে পারে, কয়জনইবা করিয়া থাকে?

পরহিতোদ্দিষ্ট কার্য্যে আরও এক বিঘ্ন আছে—উপকার ভ্রমে অপকার হইবার সম্ভাবনা। আমার ভাল হইবে ভাবিয়া আমার জন্য আমি যত কাজ করি, সব গুলিতে পরিণামে আমার ভাল হয় না, অনেক গুলিতে আমার ক্ষতি হয়। কিন্তু এমন স্থলে আপাত প্রীতি বা সাক্ষাৎ পরিতোষ জন্য এমন একটী সান্ত্বনা পাওয়া যায় এবং তাহা দেখাইয়া মনকে প্রবোধ দিয়া অদৃষ্ট পূর্ব্ব বা অতর্কিত পরিণাম ক্ষতি জন্য যে জ্বালা উপস্থিত হয়, তাহার কতক উপসম করা যায়। পরের বেলা কিন্তু এ সান্ত্বনার, এ প্রবোধের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং এমন সব স্থলে উদ্দেশ্য সাধু বলিয়া নিষ্কৃতি হইতে পারে না: অবশ্যই প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়। তবেই দেখুন নিষ্কাম পরোপকারের ইচ্ছা হইলেও কত সাবধান হইয়া চলা আবশ্যক। তাহার উপর পরোপকারে কত বিদ্যা, কত দূরদৃষ্টি, কত, সামর্থ্য, কত আয়োজনের দরকার। তাই বলিতেছি, পরোপকার বড়ই কঠিন ব্যাপার। স্পর্দ্ধা করা সহজ, আস্ফালন করা সহজ, বুজরুগী দেখান সহজ, কিন্তু সেত পরোপকার করা নয়, সে যে ভাঁড়ামি মাত্র।

৺ইন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ

(৩)

(স্বামী বিশুদ্ধানন্দ)

অশ্বল ও আর্ত্তভাগ যখন কিছুতেই যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত ক'রতে পা'রলেন না, তখন হাস্যমুখে উঠে দাঁড়ালেন লহ্যের পুত্র ভুজ্যু লাহ্যায়নি। তিনি জোর গলায় যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন ক'রে বলে উঠলেন "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, এবার তোমার শক্তির পরীক্ষা হবে। এবার তোমাকে এমন একটি প্রশ্ন ক'রব, যার উত্তরে তুমি আমাদিগকে যা তা ব'লে ভুল বুঝিয়ে দিতে পারবে না। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা একজন দিব্যপুরুষের নিকট হ'তে শুনেছি। তাঁর জ্ঞান অলৌকিক, তিনি একজন দিব্যশক্তিসম্পন্ন পুরুষ। এবার তুমি নিশ্চয়ই পরাজিত হবে—যাজ্ঞবল্ক্য, এবার তুমি নিশ্চয়ই পরাজিত হবে। এইবার আমার প্রশ্ন শোনো, যাজ্ঞবল্ক্য, প্রশ্নটী শুনে তার যথার্থ উত্তর দাও। আমি এবং আমার কয়েকজন সহাধ্যায়ী একবার শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য মদ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে কপিবংশীয় পতঞ্চল নামক কোন গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হয়েছিলাম। উপস্থিত হ'য়ে দেখি কি পতঞ্চলের এক মেয়েকে উপদেবতায় পেয়েছে। তখন আমরা গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক আবিষ্টা সেই মেয়েকে ঘিরে বসে গন্ধর্ব্বকে প্রশ্ন করেছিলাম "তুমি কে হে বাপু, এই মেয়েটির স্কন্ধে ভর করেছ?" গন্ধর্ব্ব আমাদের প্রশ্ন শুনে গুরুগম্ভীর স্বরে ব'লে উঠল "আমি সুধন্বা, অঙ্গিরা বংশে আমার জন্ম।" তখন আমরা এই ব্রহ্মাণ্ডের যে শেষ কোথায় হ'য়েছে সেইটে জা'নবার জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম "আচ্ছা, ভাই গন্ধর্ব্ব! বল দেখি পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিল, পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিল?" এখন সেই একই প্রশ্ন তোমায় আমি জিজ্ঞাসা করচি, যাজ্ঞবল্ক্য, বল দেখি সেই পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিল?"

ভুজ্যুর এই প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্যের ওষ্ঠপ্রান্তে বিদ্যুতের ন্যায় একটু হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি সহজ গলায় ভুজ্যুকে সম্বোধন ক'রে ব'ললেন "ভুজ্যু, সেই গন্ধর্ব্ব তোমাদিগকে যা বলেছিলেন তা সবই আমি জা'নতে পেরেছি। তিনি যা বলেছিলেন তা শোনো। সেই গন্ধর্ব্ব তোমাদিগকে বলেছিলেন "যাঁরা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণ যেখানে যান, এই পারিক্ষিতগণও সেইখানেই গমন করেন।" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে ভুজ্যু ত অবাক্। কিন্তু ভুজ্যু সহজে পরাজয় স্বীকার ক'রতে চাইলেন না। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করে ব'লে উঠলেন "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, ওরকম উত্তর সবাই দিতে পারে, তোমার ওটা কি প্রশ্নের উত্তর হয়েছে? একজন যদি আর একজনকে জিজ্ঞাসা করে 'ওহে, রাম কোথায় ছিলেন বল দেখি?' আর অপর ব্যক্তি যদি উত্তরে বলে "শ্যাম যেখানে ছিলেন, রামও সেইখানেই ছিলেন।" তাহলে কি সেটা উত্তর হয় নাকি? তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, পারিক্ষিতগণ কোথায় ছিলেন, আর তুমি তার উত্তরে বললে অশ্বমেধযজ্ঞকারিগণ যেখানে ছিলেন, পারিক্ষিতগণও সেইখানেই ছিলেন। এটা কি আবার একটা উত্তর! ওরকম ফাঁকী রেখে দাও। এখন বল অশ্বমেধযাজীগণ কোথায় যান।"

ভুজ্যুর প্রশ্নের উত্তরে বিশুদ্ধচিত্ত বিমুক্তপাশ যাজ্ঞবল্ক্য ব'লতে লাগলেন, "ভুজ্যু, সমুদয় পুণ্যকর্ম্ম হ'তে শ্রেষ্ঠ হ'চ্চে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ'। সুতরাং অশ্বমেধযাজিগণ সকলের চেয়ে উৎকৃষ্টতম লোকে গমন করেন। সেখান হইতে তাঁহাদের আর অধোগতি হয় না। তাঁহারা ক্রমে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। সূর্য্যকিরণ দ্বারা উদ্ভাসিত এই যে আমাদের সৌর জগৎ, ইহার বত্রিশগুণ পরিমিত স্থান হ'চ্চে এই লোক এবং তাহার দ্বিগুণপরিমিত পৃথিবী এই লোককে পরিবেষ্টন করিয়া আছে, আবার সেই পৃথিবীর দ্বিগুণ পরিমাণ সমুদ্র সেই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এই পর্য্যন্ত বিরাট সৃষ্টি, স্থূল জগৎ। ইহার পর যাহা তাহা সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়। অশ্বমেধ-যজ্ঞকারিগণ পুণ্যের উৎকর্ষতা হেতু স্থূল জগৎ অতিক্রম করেন এবং সেই লোকে নিজ নিজ ইপ্সিত স্থান প্রাপ্ত হন। যে পথ দিয়া তাঁহারা গমন করেন সেই পথটী মক্ষিকার পাখার ন্যায় কিম্বা ক্ষুরের ধারের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম। পারিক্ষিতগণ সেই সূক্ষ্ম আকাশপথ দিয়া অশ্বমেধযাজিগণের নিকট উপস্থিত হন, ইন্দ্র তখন পক্ষিরূপ ধারণ ক'রে তাঁহাদিগকে সূক্ষ্ম বায়ুর হস্তে সমর্পণ করেন। সূক্ষ্ম বায়ু তখন তাঁহাদিগকে নিজের শরীরে স্থাপনপূর্ব্বক পারিক্ষিতগণকে সেই স্থানে নিয়ে যান যেখানে অশ্বমেধ-যাজিগণ গমন করেছেন। শোনো, ভুজ্যু, এই জগতে, যত কিছু ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে অধ্যাত্ম, অধিদৈব এবং অধিভূত বস্তু আছে, তাহা বায়ুই। ব্যষ্টি ও সমষ্টিভাবে যিনি এই বায়ুতত্ত্ব অবগত হ'তে পারেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হ'তে সমর্থ হন।

"আমি পূর্ব্বেই বলেছি, ভুজ্যু, যে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক জগৎ এক উপাদানে গঠিত; এক সূত্রে গাঁথা। যে সব রাজারা সুলক্ষণ অশ্বকে উৎসর্গপূর্ব্বক অগ্নিসম্মুখে বলি প্রদান করেন, তাঁহারা আধিভৌতিক অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞই হ'চ্চে সর্ব্বকর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেক যজ্ঞেরই আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক দিক আছে। শুধু আধিভৌতিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রলে, যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকে, যজ্ঞের অঙ্গহানি হয়। সেই জন্য আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ভাব নিয়ে যজ্ঞ ক'রতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বই হ'চ্চে প্রধান অঙ্গ। আর এই যজ্ঞের দেবতা হ'চ্চেন প্রজাপতি। অধিদৈবত অশ্বমেধ যজ্ঞে সমস্ত স্থূল জগতটাকেই অশ্বরূপে কল্পনা ক'রতে হবে। এই অধিদৈব অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বের মস্তক হ'চ্চে উষা; চক্ষু সূর্য্য; বায়ু প্রাণ; বৈশ্বানর অগ্নিই হ'চ্চে এই অশ্বের বিবৃত মুখ; সংবৎসরই অশ্বের দেহ; দ্যুলোক হ'চ্চে অশ্বের পৃষ্ঠদেশ; অন্তরীক্ষ উদর; পৃথিবীই হ'চ্চে অশ্বের চরণসমূহ রাখিবার স্থান; দিকসমূহ অশ্বের পার্শ্বদ্বয়; অবান্তর দিকসকল অশ্বের পার্শ্বাস্থিসমূহ; গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত এই ছয় ঋতু হ'চ্চে অশ্বের অবয়বসমূহ; মাস ও অর্দ্ধমাস হ'চ্চে অশ্বের অবয়বসমূহের সন্ধি; দিবা ও রাত্রি হ'চ্চে অশ্বের চরণ; নক্ষত্রমণ্ডল হ'চ্চে অশ্বের অস্থিসমূহ; আর ঐ যে গগন-স্থিত মেঘমালা, উহাই হইতেছে অশ্বের মাংস; বালুকারাশিই হ'চ্চে অশ্বের উদরমধ্যস্থিত অর্দ্ধজীর্ণ ভুক্তান্ন; নদীসমূহই অশ্বের নাড়ী, আর পর্ব্বতমালা হ'চ্চে অশ্বের যকৃৎ ও প্লীহা; তৃণ ও বৃক্ষরাজিই অশ্বের লোমসমূহ; অশ্বের সম্মুখভাগ হ'চ্চে উদীয়মান সূর্য্য, আর অস্তগামী সূর্য্যই অশ্বের পশ্চাদ্-ভাগ; বিদ্যুৎ হ'চ্চে অশ্বের হাইতোলা; অশ্বের শরীরকম্পনই গর্জ্জন; মেঘ হইতে বারিবর্ষণই অশ্বের মূত্রত্যাগ এবং মেঘগর্জ্জনই হ'চ্চে অশ্বের বাক্। আধিভৌতিক অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বের সম্মুখে যেমন একটি সুবর্ণময় পাত্র এবং পশ্চাদ্ভাগে একটী রৌপ্যময় পাত্র স্থাপিত হয়, সেইরূপ অধিদৈব

যজ্ঞীয় অশ্বের সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগস্থিত পাত্র দুইটী হ'চ্চে সূর্য্য ও চন্দ্র। এই পাত্রদ্বয়রূপী সূর্য্য ও চন্দ্রের উৎপত্তিস্থান হ'চ্চে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র। এই যে অশ্ব, ইহা হয়রূপে দেবগণকে, বাজীরূপে গন্ধর্ব্বদিগকে, অর্ব্বারূপে অসুরদিগকে এবং অশ্ব হইয়া মনুষ্যগণকে বহন করিয়াছিলেন। সমুদ্রই হ'চ্চে অশ্বের উৎপত্তি ও আশ্রয়স্থান। সমস্ত জগৎটাকেই অশ্বরূপে কল্পনা ক'রতে হবে। তারপর, ভুজ্যু, এই অশ্বকে ক'রতে হবে উৎসর্গ। ত্রিলোকে যা কিছু ভোগ্যবস্তু আছে সবই বলি দিতে হবে ভগবানের চরণে। শরীর, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, সবটাই নিবেদন করতে হবে পরমেশ্বরকে। এই জগৎরূপ অশ্বের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে, লক্ষ্য রা'খতে হ'বে, এই জগৎরূপ অশ্বের উৎপত্তি ও আশ্রয়স্থান ঐ সমুদ্র বা পরমাত্মার দিকে। এই হ'চ্চে অধিদৈব অশ্বমেধ যজ্ঞ। তুমিত জান, ভুজ্যু, বেদে ঋষিগণ অগ্নিকে অশ্ব, হয়, বাজী ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। অশ্‌ ধাতু থেকে 'অশ্ব' পদটী নিষ্পন্ন হ'য়েছে, অশ্‌ ধাতুর অর্থ এখানে ব্যাপ্তি। অগ্নি সর্ব্বব্যাপী তাই অগ্নিকে অশ্ব বলা হয়। হি ধাতু থেকে হয়েছে 'হয়'। 'হি' ধাতুর মানে গতি, বিলক্ষণ গতিবিশিষ্ট বলিয়াই অগ্নিকে 'হয়' বলা হয়। 'বাজী' এই কথাটীও দ্রুতগমন ও বলের দ্যোতক, অগ্নি দ্রুতগামী ও শক্তিমান্ বলিয়া অগ্নিকে বাজী নামে অভিহিত করা হয়। সামবেদের সেই মন্ত্রটি তোমার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে ভুজ্যু, যেখানে ঋষি বলচেন —

"অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং বন্দধ্যা অগ্নিং নমোভিঃ সম্রাজন্তমধ্বরাণাং।"

আরও তোমাকে বলি ভুজ্যু, সেই ঋকটি স্মরণ করতে, যাতে ঋষি বলচেন—

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥"

একই অগ্নিকে ঋষিরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, যম, মাতরিশ্বা (বায়ু) এবং সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পক্ষিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অগ্নিকে গন্ধর্ব্ব নামেও অভিহিত করা হয়েছে। আমাদের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের রসরূপে (অঙ্গানাং রসঃ) অর্থাৎ অঙ্গিরস নামে, ঋষি ও হোতা নামেও অগ্নিকে অভিহিত করা হয়েছে। বৈদিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ অগ্নিকে যে সব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন সেগুলি কেবল আধিভৌতিক অগ্নিতে প্রযোজ্য হ'তে পারে না। দেখ ভুজ্যু, তুমি বেদজ্ঞ; তুমিও একথা স্বীকার করবে। তুমিও জান যে বেদে যে সমুদয় মন্ত্র আছে সেগুলির মধ্যে অগ্নি ও ইন্দ্র মন্ত্রগুলিই প্রধান। অগ্নি, জীবের শুভ ইচ্ছাশক্তি। যে শক্তি জীবকে ভগবন্মুখী করে। এই শক্তি, এই অগ্নি প্রতি জীবেই সুপ্ত রয়েছে। এই শক্তিকে, এই অগ্নিকে জাগাতে হবে, প্রজ্বলিত ক'রতে হবে, এই শক্তিকে জাগান বড় সহজ নয়। কিন্তু এই অগ্নিকে এই সুপ্ত শক্তিকে একবার জাগাতে পা'রলে, ইহা আর নির্ব্বাপিত হয় না, সেই জন্য এই অগ্নিকে মধুচ্ছন্দা 'অস্বপ্ন', 'অস্তন্দ্র' বলেছেন। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, ভুজ্যু, যে দীক্ষণীয় ইষ্টি দ্বারা যজমানের অন্তঃশরীরে এই অগ্নিকে প্রজ্বলিত করা হয়, এক জায়গায় জড় করা অতি দীর্ঘ শৃঙ্খলকে যদি টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে সেই শৃঙ্খল যেমন ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হ'তে থাকে, সেইরূপ এই সুপ্ত, কুণ্ডলীকৃত অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে যজমানের অন্তর বাহির সুবর্ণজ্যোতিতে উজ্জ্বলীকৃত করে। এই অগ্নি যজমানের মস্তক ভেদ ক'রে শৃঙ্খলাকারে অন্তরীক্ষে উত্থিত হয় এবং তাহার অধঃ ঊর্দ্ধ সর্ব্বদিকে প্রসারিত হ'য়ে

যজমানের অন্তর বাহির দিব্যজ্যোতিতে পূর্ণ করে। এই অগ্নি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হ'য়ে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হয়, সেই জন্য এই অগ্নিকে ব্রহ্ম বলে। তখন যজমানের দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। যজমান তখন এই অগ্নিতে হোম করেন, আত্মনিবেদন করেন। এই অগ্নিরই আর এক উজ্জ্বল দিব্যমূর্ত্তির নাম ইন্দ্র। এই দিব্য জ্যোতি ঊর্দ্ধ হইতে আসিয়া যজমানের দেহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহার সমস্ত দুরিতরাশি দূর করে, সমস্ত বৃত্রাণি, যজমানের স্বরূপের আবরণরূপ যত কিছু অজ্ঞান সব অপসারিত করে। সেই জন্য এই দিব্যজ্যোতিকে, অগ্নির অন্যতম রূপ এই ইন্দ্রকে বৃত্রঘ্ন বলে। এই অগ্নিতে, এই দিব্য জ্যোতিতে যখন যজমানের ঠিক ঠিক আত্মনিবেদন হয়, যখন ত্রিজগতের সমস্ত ভোগ্য বস্তু হুত হয়, পরিত্যক্ত হয়, তখনই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। যতক্ষণ জ্যোতিঃ ততক্ষণ দর্শন। অগ্নি, ইন্দ্র, পূষা, বৃহস্পতি অগ্নিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এই রূপসকল এই দিব্য জ্যোতিসমূহ যজমান দিব্যদৃষ্টির দ্বারা স্পষ্টই দেখিতে পান। কিন্তু যখন অগ্নি, ইন্দ্র, পূষা, বরুণ, বৃহস্পতিরূপ দিব্য জ্যোতিসমূহ যজমানের দেহ, মন, প্রাণ, তার স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ সমুদয় শরীরই সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করে, তখন অগ্নির আর এক রূপের বিকাশ হয়, এই রূপ সূক্ষ্ম, অদৃশ্য। অগ্নির এই রূপকে প্রাণ, বায়ু, মাতরিশ্বা বা হিরণ্যগর্ভ বলে। পূর্ব্বেই তোমায় বলেছি, ভুজ্যু, যে ঋষিগণ অগ্নিকে সুপর্ণ নামে অভিহিত করেছেন, অগ্নি সুপর্ণরূপে পারিক্ষিতগণকে সূক্ষ্ম বায়ু বা হিরণ্যগর্ভ অবস্থায় পৌঁছে দেন। যজমান, রূপের রাজ্য ছেড়ে অরূপের রাজ্যে প্রবেশ করেন। তার পর অগ্নির এই মাতরিশ্বারূপ সূক্ষ্ম বিকাশের সহিত যজমান একীভূত হ'য়ে যান এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে এই হিরণ্যগর্ভ অবস্থা অনুভব ক'রতে ক'রতে সেই পদ লাভ করেন যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারিগণ লাভ করেছেন। এখন তোমায় বলি, ভুজ্যু, যে পতঞ্চলের কন্যাকে যে উপদেবতায় পেয়েছিলেন, তিনি পতঞ্চলের আরাধ্যদেবতা অগ্নিই। সেই উপদেবতা তোমাদিগকে বলেছিলেন যে তিনি অঙ্গিরাবংশ হইতে জাত। অগ্নিকে ঋষিগণ অঙ্গানাং রসঃ বা অঙ্গিরস নামে অভিহিত করেছেন। সেই গন্ধর্ব্ব অগ্নির সূক্ষ্মতম রূপ বায়ু বা মাতরিশ্বা, বা হিরণ্যগর্ভ, বা ব্রহ্মারই প্রশংসা করেছিলেন। এই হিরণ্যগর্ভেরই বিকাশ হ'চ্চে এই ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ। যিনি এই তত্ত্ব অবগত হ'তে পারেন, ভুজ্যু, তিনি মৃত্যু জয়পূর্ব্বক ক্রমমুক্তি দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন। কিন্তু একটা কথা তোমায় বলে রাখি ভুজ্যু যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মের ফল ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত। কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তনু ভাগবতী হয়, জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ বাড়ে, ক্রম মুক্তি লাভ হয়; কিন্তু সদ্য মোক্ষ হয় না। মোক্ষই সকলের স্বরূপ, ইহা লভ্য জিনিষ নয়, ইহা প্রাপ্ত বস্তু নয়। যত কিছু কর্ম্ম আছে তা হয় উৎপাদ্য, কিংবা সংস্কার্য্য, কিংবা বিকার্য্য কিংবা আপ্য। মোক্ষ ইহার কোনটাই নয়।

যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শ্রবণে ভুজ্যু একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

ভুজ্যু নীরব হইলেন বটে, কিন্তু তাতেই কি যাজ্ঞবল্ক্যের রেহাই আছে। ভুজ্যুকে নীরব দেখিয়া হাসিতে হাসিতে উঠে দাঁড়ালেন চক্র নামক ঋষির পুত্র চাক্রায়ণ উষস্ত। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, গরুগুলি ত নিয়ে গেলে, এখন আমার প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি। বেশ স্পষ্ট ভাষায়, কোন ছল চাতুরী না ক'রে, আমায় বল যিনি সাক্ষাৎ

অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বভূতের আত্মা, সেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ আত্মার স্বরূপ কি। শিঙে ধ'রে লোকে যেমন গরুকে দেখায় সেইরূপ "এই সেই আত্মা" এই রকম করে আমার নিকট এই আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।"

উষস্তের এই প্রশ্নবাণে যাজ্ঞবল্ক্য গম্ভীর ভাবে বলিলেন "উষস্ত, তোমার এই আত্মাই সর্ব্বভূতের অভ্যন্তরস্থ সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম।" উষস্ত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কে সেই আত্মা তার স্বরূপ কি?" যাজ্ঞবল্ক্য উষস্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শোনো উষস্ত, যিনি প্রাণের দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসাদি কার্য্য করেন, তিনিই তোমার এই সর্ব্বান্তর আত্মা; যিনি অপান বায়ুর সাহায্যে অপানের কার্য্য, ব্যান বায়ুর দ্বারা ব্যানের কার্য্য, উদান বায়ুর সাহায্যে উদানের কার্য্য করেন, তিনিই এই সর্ব্বান্তর আত্মা।" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনিয়া উষস্ত একেবারে হেসে আকুল। উষস্ত কিছুক্ষণ বেশ ক'রে একবার হেসে নিয়ে তারপর যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন ক'রে ব'ললেন "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি নিতান্ত বালক, যদি কেউ ব'লে "তোমাকে গরু দেখাব, তোমাকে ঘোড়া দেখাব; তারপর যদি সেই ব্যক্তি বলে "যা চলে বেড়ায়, তা গরু, আর যা দৌড়ে যায়, তা অশ্ব।" সেই ব্যক্তির এইরূপ উক্তি যেমন মূর্খতার পরিচায়ক, তুমিও সেইরূপ আমার প্রশ্নের উত্তর অতি মূর্খের ন্যায় দিয়েছ। আমার প্রশ্ন ছিল যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম যিনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা তিনি কে তাঁর স্বরূপ কি। তার উত্তরে তুমি ব'ললে যিনি প্রাণ, অপান, ব্যান ও উদান বায়ুর সাহায্যে তাদের স্ব স্ব কার্য্য ক'রছেন তিনিই এই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, তিনিই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম। আমি তোমাকে ব'ললুম এই আত্মাকে প্রত্যক্ষ করাতে ইহাকে আমাদের সকলের চোখের সামনে ধরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে যে "এই হ'চ্চে সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, এই সেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম; তুমি তার কিছু না ক'রে, শুধু সেই আত্মার দু একটী কার্য্যের কথা ব'ললে'। গরুগুলি নিয়ে যাবার লোভে যে সব ছল চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেছ, সেই সব ছল চাতুরী ছেড়ে দিয়ে এখন স্পষ্ট সাদা কথায় আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

উষস্তের প্রশ্ন শ্রবণে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "শোনো, উষস্ত, আমি পূর্ব্বে যা তোমাকে বলেছি, এখনও ঠিক্ তাই তোমাকে বল্‌ছি, তুমি যে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, সর্ব্বান্তর আত্মার স্বরূপ জানতে চেয়েচ, সেই সর্ব্বান্তর আত্মা হ'চ্চেন তিনি যিনি প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান বায়ুর সাহায্যে তাদের স্ব স্ব কার্য্য ক'রচেন।" "শুনুন, ব্রাহ্মণগণ, শুনুন মহারাজ, এই দাম্ভিক ব্রহ্মনিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরটা একবার শুনুন।" সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী এবং মহারাজ জনককে সম্বোধন ক'রে উষস্ত বার বার এই কথা বল'তে লাগলেন। তারপর যাজ্ঞবল্ক্যের দিকে ফিরে জোর গলায় ব'লে উঠলেন "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, তোমার ওসব ধাপ্পাবাজী রাখ, এখন স্পষ্ট করে, আঙুল দিয়ে আমায় প্রত্যক্ষ করিয়ে দাও—এই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, এই সর্ব্বান্তর আত্মাকে।" উষস্তের অসদ্ব্যবহারে, যাজ্ঞবল্ক্য স্থির অবিচলিত। তাঁহার সেই ধীর গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখলে বোধ হয় যেন তিনি মান অপমানের অতীত, নিন্দাস্তুতির বাইরে। যাজ্ঞবল্ক্য পুনরায় মধুর বচনে উষস্তকে সম্বোধন ক'রে ব'লতে লাগলেন "শোনো উষস্ত, এই সর্ব্বান্তর আত্মা, এই অপরোক্ষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে তোমাকে যা বলেছি, তার চেয়ে আর বেশী কিছু এর সম্বন্ধে বলা যায় না। তাই তোমাকে বলি উষস্ত, 'ন দৃষ্টেঃ দ্রষ্টারং পশ্যেঃ, ন শ্রুতেঃ শ্রোতারং শৃণুয়াঃ, ন মতেঃ মন্তারং

মন্বীথাঃ, ন বিজ্ঞাতেঃ বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ।' দৃষ্টির দ্রষ্টাকে দর্শন করিবে না, জ্ঞানের জ্ঞাতাকে জানিবে না। এই সর্ব্বান্তর আত্মাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখান যায় না। দেখ উষস্ত, আঙ্গুল দিয়ে প্রত্যক্ষ করিয়ে দেখান যায় সেই বস্তুকে, যে বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে থাকে। আমাদের ইন্দ্রিয় আর সেই বস্তুর মধ্যে ব্যবধান থাকা চায়; কিন্তু যে বস্তু সর্ব্বান্তর, প্রতি অণু পরমাণুর মধ্যে অনুস্যুত, যা সব বস্তুর অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান, এমন কোন দেশ নাই, যেখানে এ না আছে, এমন কোন কাল নেই, যেখানে এর ভান না হয়, এই যে জগৎ, এই জগৎটাও যাতে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে, সেই অখণ্ডৈকরস নিরবয়ব, নিরন্তর আত্মাকে কেমন করে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে, তোমার চোখের সাম্‌নে ধ'রবো উষস্ত। তোমার এবং ঐ যে গরুটী চ'রচে এই দুয়ের মধ্যে আশা করি ব্যবধান আছে, তাই তুমি ঐ গরুটীকে প্রত্যক্ষ করচ। কিন্তু আত্মা, যখন সর্ব্বান্তর তখন কেমন ক'রে তাকে তুমি প্রত্যক্ষ ক'রবে? ঘট, পট, গরু, ইত্যাদির মত এই সর্ব্বান্তর আত্মাকে ইন্দ্রিয়ের সাম্‌নে রেখে প্রত্যক্ষ করা যায় না ত উষস্ত, এ যে অসম্ভব, আত্মার স্বভাবই যে এইরূপ।। "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য"। আরও দেখ উষস্ত আত্মা সৎস্বরূপ, প্রকাশস্বরূপ। এই প্রকাশস্বরূপ আত্মার প্রকাশেই বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, দেহ, সমস্ত জগতটাই প্রকাশিত। এমন কি আছে যা এই সর্ব্বপ্রকাশককে প্রকাশিত ক'রতে পারে? যে দ্রষ্টা তাকে আবার কে দেখবে? যে শ্রোতা সে কেমন করে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হ'বে? সে কি প্রকারে মননের বিষয় হ'বে? যে বিজ্ঞাত সেই বা কেমন ক'রে আবার জ্ঞেয় হ'বে? আমাদের যত কিছু খণ্ড জ্ঞান সবই দেশে এবং কালে হয়; কিন্তু যিনি দেশ কালকেও প্রকাশ ক'রচেন, তাঁকে কোন্ ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রকাশ ক'রতে পারা যায়? আর এই যে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর জ্ঞান হ'চ্চে, সে জ্ঞান হচ্চে বৃত্তিজ্ঞান, সেটা অন্তঃকরণের পরিণাম বিশেষ। এই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, এই সর্ব্বান্তর আত্মা বিশুদ্ধচিত্তে স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। মলিন দর্পণ থেকে মলিনতা যতই যেতে থাকে মুখবিম্বও যেমন ততই উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হয়, সেইরূপ চিত্ত যতই, শান্ত, সমাহিত হ'তে থাকে ততই নিত্য প্রকাশ স্বরূপ সর্ব্বান্তর আত্মার বিকাশ হ'তে থাকে। এ আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, উষস্ত, এ আত্মাকে দেখান মানে এ আত্মার অনুভূতি, আপনাতে আপনি প্রকাশ। ইনিই তোমার জিজ্ঞাসিত সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, ইনিই নিত্য কূটস্থ। ইহা ব্যতীত আর যা কিছু, সবই নশ্বর, সবই ধ্বংসশীল।" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শ্রবণে চক্রমুনির পুত্র উষস্ত চাক্রায়ণ ম্লানমুখে নিজের আসনে নীরবে উপবেশন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

— —

নারী—পাশ্চাত্যে ও ভারতে

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)

আমরা যে পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধি দেখিয়া তাহাদিগের অনুকরণ প্রয়াসী হইয়াছি, সেখানে আমাদিগের দেশের মত লোকদিগের প্রকৃতিগত, ভাষাগত, আচার-ব্যবহারগত, সভ্যতার স্তরগত এত অধিক বৈষম্য না থাকা সত্ত্বেও সাম্যবাদ ও অবাধ-প্রতিযোগিতা থাকার ফলে ধনীরাই সকলে ধনোপায়ের প্রধান উপায়—ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি—উত্তরোত্তর অধিকভাবে গ্রাস করিয়াছে ও করিতেছে—ধনীরাই দেশের সকল ধন আত্মসাৎ করিয়াছে—সেখানকার সুখ সমৃদ্ধি কেবল ধনীদিগের—তাহারাই প্রকৃতপক্ষে (প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য) সমাজের ও রাজনীতির নিয়ন্তা। এইরূপ ধনীরা সকল ধনোপায়ের উপায়গুলি গ্রাস করায় সমাজে অধিকাংশ লোকই তাহাদিগের আজ্ঞাধীন বেতনভোগী দাস হইতে বাধ্য হইয়াছে এবং যখন এইরূপ দাসত্বও জোটে না, তখন তাহাদিগের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না।

যাহাদিগের বুদ্ধি ও কর্ম্মক্ষমতা ধনীদিগের ধনোপায়ের সুবিধা করিয়া দেয়, তাহারা অধিক হারে বেতন পায়, কখনও তাহাদিগের অংশীদারও হয়—তাহাদিগের তজ্জন্য কতক পরিমাণে অর্থ-স্বচ্ছলতাও থাকে—তাহারাই সচরাচর মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা সুবিধামত ধনীদিগের দাসত্ব না পাওয়ায় বা দাসত্ব করিতে অস্বীকার করায় তাহারা ধনীদিগের অগাধ ধনের কিয়দংশ ছলে, বলে বা কৌশলে আদায় করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হয়। এই শ্রেণীর অধিকাংশকে অর্থ-স্বচ্ছল ব্যক্তিদিগের অহমিকার ও ভোগবাসনার ইন্ধন যোগাইতে হয়—তাহাদিগের চিত্তবিনোদনে নিযুক্ত থাকিতে হয়। কেহ বা নাটক, উপন্যাস, গল্প লিখেন—কেহ বা ছবি আঁকেন, কেহ বা স্থপতির কার্য্য করেন—কেহ নাচ-গানের নূতন নূতন ভঙ্গী দেখান—কেহ বা ধনীদিগের আমোদ ও উত্তেজনাপ্রদ খেলায় পারদর্শিতা দেখান—কেহ বা নূতন নূতন উপায়ে ধনীদিগের ধনবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন—কেহ বা তৎব্যপদেশে তাঁহাদিগের অর্থ দোহন করেন। কেহ বা জালজুয়াচুরী, ডাকাতী করেন, কেহ বা ধনীদিগের কেলেঙ্কারী প্রকাশ করিয়া দিবার ভয় দেখাইয়া তাঁহাদিগের অর্থ দোহন করেন। ধনীরা বিষয়ভোগসুখপ্রবণ হয়, সুতরাং কলাবিদ্যাও একালে অর্থস্বচ্ছল লোকদিগের কেবল ইন্দ্রিয়সুখ দিবার জন্য নিয়োজিত হইতেছে, তাহার মহৎ উদ্দেশ্য art for art's sakeএর নামে অশ্লীলতাপূর্ণ হইয়াছে—কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক হইতেছে। সেই জন্য এই উন্নত যুগের কলাবিদ্যা পুরাকালের কলাবিদ্যা অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতিতে ধনীদিগের ধনোপার্জ্জনের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছে—বিজ্ঞানই বড় বড় কল-কারখানা সৃষ্টি করিয়া দেশের শিল্প এবং কৃষি-কার্য্যও ধনীদিগের কবলে আনিয়া সাধারণ লোকদিগকে তাঁহাদিগের দাসত্বে নীত করিয়াছে। অধিক লোক হত্যাকারী, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া অপর দেশ জয় করা। বিজিত দেশ হইতে প্রভূত ধনাগমের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। সুতরাং পদার্থ-বিজ্ঞানের মান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পদার্থ বিজ্ঞানবিদ্‌রাই পণ্ডিত বলিয়া

গণ্য। পদার্থবিদ্যা বহুধা বিভিন্ন—এক একটি পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্র অতিশয় সঙ্কীর্ণ—অথচ তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করিতে জীবনব্যাপী অধ্যবসায় আবশ্যক—তাহাতে প্রখর বুদ্ধির বিশেষ কোন আবশ্যক নাই। যাহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি ও সময় কোন একটি পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নিয়োজিত, তাহারা সচরাচর সমগ্র দৃষ্টি (Comprehensive view) সম্পন্ন হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ভিন্ন অন্য কিছু তাঁহারা সচরাচর বোঝেন না।

মানুষের জীবনের সুখ, দুঃখ, স্বচ্ছন্দতা, শান্তি, সন্তোষ মনের অবস্থার উপরই—ত্যাগধর্ম্মী ভালবাসা পাওয়া ও ভালবাসিতে পাওয়ার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে (ভোগমূলক ভালবাসা গাঢ় ও একনিষ্ঠ হইলে, প্রকৃতির রসায়নাগারে ত্যাগধর্ম্মী শ্রেষ্ঠ ভালবাসায় পরিণত হয়) এবং মনের অবস্থা শরীরের স্বাস্থ্য বিশেষতঃ স্নায়ুর ও রসগ্রন্থিদিগের (glands) স্বাভাবিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হওয়ার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে—বিষয় ভোগ—বাহুল্যের উপর নির্ভর করে না তাহা একালের ধনী সমাজ-নিয়ন্তারা সম্যক উপলব্ধি করেন না—সচরাচর আমরাও করি না এবং করি না বলিয়াই আমরা ঐ ভোগ বাহুল্যের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত। বিষয়-ভোগে যদি সুখদায়িত্ব থাকিত, সকলেরই একই প্রকার বিষয় ভোগে একই প্রকার সুখ বোধ হইত। একই লোকের বিভিন্ন মানসিক অবস্থায় এক সময়ে যাহা প্রীতিপ্রদ, অন্য সময়ে তাহা প্রীতিপ্রদ থাকে না—কষ্টপ্রদও হয়। অনেক ক্রোরপতিও প্রতি বৎসর আত্মঘাতী হয়। প্রায় সকল জগৎপূজ্য লোকই—বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি বিষয়ভোগকে তুচ্ছ করেন। তাঁহারা অন্য প্রকার—বিষয়ভোগে নিরপেক্ষ—সুখের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়াই বিষয়ভোগবাসনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। পরার্থপরতার সুখ বিষয়ভোগ নিরপেক্ষ সুখ। যাহার বিষয়ভোগ-নিরপেক্ষ সুখবোধ জাগ্রত হইয়াছে, সেই কেবল জীবনে স্থায়ী সুখস্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে পারে সেই প্রকৃত স্ব-অধীন, সেই প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পায়। সেই সুখ ত্যাগমূলক—বিষয়ভোগের সুখ তাহার বিরুদ্ধধর্ম্মী ক্ষণস্থায়ী মাত্র; সেই জন্য যে বিষয়ভোগের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হই—অল্পদিন পরে হয় ত তাহা পরিত্যক্ত হয়। বিষয়ভোগে আবার সচরাচর ভোগতৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়।

সকলেই ভোগের প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া অবিরাম ঘুরিতেছে—কাহারও জীবনে শান্তি, সন্তোষ, তৃপ্তি নাই। এই ভোগেচ্ছা-পূরণের চেষ্টায় যত যুদ্ধ, মারামারি, কাটাকাটি, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত হয়। বাসনার অন্ত নাই—বাসনা পূরণের ক্ষমতা সকলেরই সীমাবদ্ধ, সুতরাং ভোগে যে কেহ প্রকৃত সুখী হইতে পারে না তাহা দেখি না। ভোগবাসনার নিবৃত্তি হইলেই প্রকৃত সুখের সন্ধান পাওয়া যায়—নিজেরাও সুখী হন—অপরকেও সুখী করিতে পারেন। সুখের জন্য, দুঃখনিবৃত্তির জন্য সকলেই লালায়িত—তাহাই দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের প্রাধান্যের দিনে ভোগলোলুপ ধনপ্রভাবগ্রস্ত পাশ্চাত্য সমাজে দর্শন শাস্ত্রের মান্য নাই—তাহা কথার কচকচি মাত্র বলিয়া গণ্য। সুতরাং যেরূপ শিক্ষায়, যে নিয়মানুবর্ত্তিতায় লোক প্রকৃত সুখী হইতে পারে, স্ব-অধীন হইতে পারে, একালের পাশ্চাত্য সমাজে কাহারও সে দিগে দৃষ্টি নাই বলিলেই হয়—সুতরাং প্রকৃত স্বাধীনতা, প্রকৃত সুখ-শান্তি কাহারও নাই।

ভোগেই সুখ ধরিয়া লওয়া হইতেছে বলিয়াই নারীদিগের অর্থকর কর্ম্ম করিতে পাওয়া তাহাদিগের স্বত্ববৃদ্ধি বলা হইতেছে।

মাধ্বমতে বেদের স্থান

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

বৈদিক দর্শন বা আস্তিক দর্শন বলিতে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনকে প্রধানতঃ বুঝায়। বস্তুতঃ এতদ্ভিন্ন আরও কয়েকটী মতবাদ আস্তিক দর্শন নামে পরিচিত আছে, ইহাদের কতক পরিচয় মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ নামক গ্রন্থে আছে।

এই আস্তিক দর্শন গুলি, সকলেই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে। বেদ মানিলেই আস্তিক হয়, আর বেদ না মানিলেই নাস্তিক হয়। ঈশ্বর স্বীকারের সঙ্গে আস্তিকতা ও নাস্তিকতার কোন সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বর অস্বীকারে নাস্তিক হয়—ইহা অনেকটা পাশ্চাত্য দেশের ভাব, ইহা ঠিক্ এদেশের কথা নহে।

কিন্তু এই আস্তিক দর্শনগুলিতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইলেও এই স্বীকারের বিশেষত্ব আছে। একমাত্র পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তদর্শন ভিন্ন সকল দর্শনেই স্বীকার করা হয় যে, বেদ ভিন্নও অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা কর্ম্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি অবগত হওয়া যায়। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য অনুমানাদি প্রমাণেরই ন্যায়। অর্থাৎ অন্য দর্শনের মতে বেদ যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা, তাহা হইলে সে কথায় বেদের প্রমাণ থাকিবে না। অপর প্রমাণের অবিরুদ্ধই বেদের প্রামাণ্য। কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসাও বেদান্তদর্শনের মতে বেদের প্রামাণ্য সকল প্রমাণের প্রামাণ্যের উপরে। তাহাতে বেদ যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরুদ্ধেও কোন কথা বলে তাহা হইলেও বেদ সেই অংশেও প্রমাণ, বেদের কথাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যক্ষাদি অপর কোন প্রমাণই বেদের প্রামাণ্য হ্রাস করিতে পারে না। ইহাই পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্ত-দর্শনের মত।

কিন্তু বেদান্তের এই যে মত, ইহা কেবল বেদান্তের অদ্বৈতমতেই বলা হয়। বেদান্তের যে দ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি ব্যাখ্যা আছে, সে সকল মতে বেদের প্রামাণ্য ওরূপ নহে। সে সকল মতে বেদ কোন অংশে অন্য প্রমাণের বিরোধী হইলে সেই অংশে অপ্রমাণই হইবে। অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য অপর প্রমাণের প্রামাণ্যেরই অনুরূপ বা সমান বলবিশিষ্ট। অদ্বৈত বেদান্তমতে বেদ সকল প্রমাণশিরোমণি, কিন্তু অন্য বেদান্তমতে বেদ অন্যপ্রমাণসমকক্ষ বা সহযোগী মাত্র। সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় ও বৈশেষিকের মতে বেদ অন্যপ্রমাণের মত একটী প্রমাণ মাত্র, ইহার বিশেষ কোন প্রাধান্য নাই; সুতরাং এই সকল মতে বেদের ব্যাখ্যা অন্যপ্রমাণের অবিরোধেই করিতে হইবে। এইজন্য অদ্বৈতবেদান্ত ভিন্ন দ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত মত গুলির মধ্যে কোনটীকে ন্যায়মতানুগামী কোনটীকে বা সাংখ্যমতানুগামী বলিয়া বিবেচনা করা হয়। যেমন বেদান্তের মাধ্বমতটীকে ন্যায়মতপ্রধান বলা হয়; রামানুজমতটীকে সাংখ্যমত-প্রধান বলা হয়, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য বেদান্তের যত গুলি ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বহুলপ্রচারিত অদ্বৈতব্যাখ্যা ভিন্ন ইহাদেরই প্রাধান্য অধিক। অদ্বৈতমতে বেদান্তদর্শনের উপর ভাষ্যটীকাদি প্রভৃতি যত গ্রন্থ আছে, তাহার তুলনায় অন্যমতের ভাষ্যটীকাদি গ্রন্থ প্রায় দশভাগের এক

ভাগ হইলেও মাধ্ব ও রামানুজমতেরই ভাষ্যাদি গ্রন্থ অধিক। অনেকেই জানেন আজ কাল বেদান্তের উপর যত বিভিন্ন মতের ভাষ্যাদি মুদ্রিত আছে, তাহা দশ বারো খানির অধিক নহে, বোধ হয়, যথা—

১। শাঙ্কর ভাষ্য ৬। মাধ্ব ভাষ্য
২। ভাস্কর ভাষ্য ৭। বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্য
৩। রামানুজ ভাষ্য ৮। বল্লভ ভাষ্য
৪। শ্রীকণ্ঠ ভাষ্য ৯। গোবিন্দ ভাষ্য (বা বলদেব ভাষ্য)
৫। নিম্বার্ক ভাষ্য ১০। বীরশৈব (নীলকণ্ঠ ভাষ্য)
১১। বৈখানখ ভাষ্য (তেলিগু অক্ষরে)
১২। শ্রীকরভাষ্য (বীরশৈব মতে)

ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচার শাঙ্করভাষ্যের, তৎপরে রামানুজভাষ্যের, তৎপরে মাধ্বভাষ্যের, তৎপরে নিম্বার্কভাষ্যের দেখাযায়। প্রাচীনতায়ও ইহাদের ক্রম অনুরূপ। মুদ্রাযন্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তনের সময় একমাত্র শাঙ্করভাষ্যের প্রচার হয়, আজ কিন্তু ক্রমে অপর ভাষ্যগুলিরও প্রচার হইতেছে। এসময় ইহাদের পরিচয় পাওয়া সুধীমাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। আজ আমরা বঙ্গভাষায় শাঙ্করভাষ্য ভিন্ন রামানুজ, মাধ্ব নিম্বার্ক ও বলদেব ভাষ্য পাইতেছি। সুতরাং ইহাদের মতবাদেরও পরিচয় কিছু পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে, মাধ্বমত সম্বন্ধে আমরা খুব অল্পই জানি। ইহাদের বৈশিষ্ট্যও যথেষ্ট আছে। এই জন্য এই প্রবন্ধে মাধ্বমতে বেদসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে। মাধ্বমতের দার্শনিক গ্রন্থগুলি সমালোচনা করিয়া মাধ্বসম্প্রদায়ের একজন মহামান্য প্রধান আচার্য্য তাম্রপর্ণি আনন্দতীর্থ, সৎতত্ত্বরত্নমালা নামে যে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহাই অবলম্বন করিলাম। কারণ, মাধ্বসম্প্রদায়মধ্যেই বলা হয়—এই গ্রন্থ খানি মাধ্বমতসিদ্ধান্তসারজাতীয় গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

সৎতত্ত্বরত্নমালা গ্রন্থখানি আলোচনা করিয়া দেখা গেল—মাধ্বমতে অনেক বিশেষত্ব আছে, অনেক নূতন কল্পনাও আছে। বেদান্তসিদ্ধান্তানুরাগী জ্ঞানী বা ভক্তমাত্রেরই সেগুলি জানা আবশ্যক মনে হয়। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের অধিকাংশ বৈষ্ণব যে মতটি মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের মত বলিয়া বিবেচনা করেন, সেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, অনেকেরই মতে, এই মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যকার বলদেব বিদ্যাভূষণপ্রমুখ পণ্ডিতগণ, মধ্বাচার্য্য হইতে অধস্তন মাধ্বমতের আচার্য্যগণের মধ্যে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকেও স্থান দিয়াছেন। এই কারণে অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য চৈতন্যদেবের মতটীকে মাধ্বমতের শাখাবিশেষ বলিয়া জ্ঞান করেন। অতএব মাধ্বমতের পরিচয় এ ক্ষেত্রে যতই লাভ হয়, ততই সুবিধা বলিয়া বিবেচিত হইবে সন্দেহ নাই।

মাধ্বমতে যে সব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাহা বহু। আমরা এ প্রবন্ধে মাধ্বমতে বেদসম্বন্ধে যেরূপ ধারণা পোষণ করা হয়, তাহাই আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

মাধ্বমতে বলা হয় বেদ পঞ্চ প্রকার, যথা,—

১। মূলবেদ, ৪। শাখাবেদ
২। উপবেদ ৫। উপশাখাবেদ
৩। অবান্তরবেদ

যে সময় বেদের ঋক্ যজুঃ ইত্যাদি নাম ছিল না, সে সময় পাঞ্চরাত্রের সহিত সমস্ত বেদ একীভূত ছিল। অবশ্য হইা সত্যযুগেই ছিল। ইহারই নাম মূলবেদ। এ বিষয়ে উক্ত গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই,—

পাঞ্চরাত্রং ঋগাদ্যাশ্চ সর্ব্বমেকং পুরাঽভবৎ।
মূলবেদ ইতি হ্যাখ্যা কালে কৃতযুগে তদা॥
নৈব ঋক্সামাদি নামানি তদা বেদস্য চাঽভবন্॥

(মাধ্ব আথর্ব্বণ ভাষ্য ৪ পৃঃ)

কিন্তু পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র বিষ্ণুই রচনা করিয়াছেন—মহাভারতাদিতে ইহাই প্রসিদ্ধ।

পাঞ্চরাত্রস্য বেত্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্।

(মঃ ভাঃ শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম ৩৪৯।৬৮)

অলাভে বেদমন্ত্রাণাং পাঞ্চরাত্রোদিতে ন হি।
আচারেণ প্রবর্ত্তন্তে তে মাং প্রাপ্স্যন্তি মানবাঃ॥ (বরাহ ৬৬। ১১)

পাঞ্চরাত্রং ভাগবতং তন্ত্রং বৈখানসাভিধম্।
বেদভ্রষ্টান্ সমুদ্দিশ্য কমলাপতিরুক্তবান্॥

(যতীন্দ্রমতদীপিকাধৃতপুরাণবচন)

উক্ত প্রকার অপর বহু বচন হইতে জানা যায়—পাঞ্চরাত্র অপৌরুষেয় নহে। নীলকণ্ঠ মহাভারতের টীকায় পাঞ্চরাত্র সম্বন্ধে উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"তেন পাঞ্চরাত্রস্য পুম্প্রণীতত্বং বেদবিরুদ্ধত্বং চ সূচিতম্"।

(মঃ ভাঃ বঙ্গবাসী সংস্করণ ১৮২৭ পৃঃ)

বেদ কিন্তু অপৌরুষেয় নিত্য শব্দরাশি। পাঞ্চরাত্র বেদবৎ নিত্য শব্দরাশি বলিয়া বিবেচিত হয় না। অতএব মাধ্বমতে ইহা একটী নূতন কথা বলা যাইতে পারে।

তাহার পর মাধ্বমতে বলা হয়—উক্ত একই বেদ ত্রেতাযুগে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। এজন্য সৎতত্ত্বরত্নমালা বলিতেছেন—

"একো বেদঃ কৃতে হ্যাসীৎ ত্রেতায়াং স ত্রিধাঽভবৎ"

কিন্তু একথাটীও নূতন কথা। কারণ, দ্বাপরযুগেই বেদ বিভাগ হইয়াছিল, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা। যথা—

দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপী মহামুনিঃ।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে জগতো হিতম্॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৩। ৩। ৫)

তাহার পর সৎতত্ত্বরত্নমালা গ্রন্থে আছে—ত্রেতাযুগে ত্রিধাকৃত বেদ দ্বাপরযুগে গৌতম—শাপাদি দ্বারা উৎসন্ন হইয়াছিল, যথা—

"স এব দ্বাপরে গৌতমশাপাদিনা উৎসন্নশ্চ" (৫পৃঃ)

কিন্তু এই কথাটীর আকর কি, তাহা কথিত হয় নাই। যাহাহউক এই উৎসন্ন বেদকে ভগবান্ বাদরায়ণ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের মন্ত্রের একদেশ গ্রহণ করিয়া ঋকৃমন্ত্র রচনা বা সংকলন করিয়া ছিলেন, ইত্যাদি, যথা—

"একৈকস্মাদ্ ঋগাদেঃ একৈকং ঋগাদিকম্ একদেশেন
উদ্ধৃত্য ঋগাদিচতুর্ব্বেদান্ অকরোৎ" (ঐ)

এতদ্দ্বারা জানা যায়—বর্ত্তমান ঋগ্বেদখানি বেদব্যাসের রচনা বা সংকলন। অর্থাৎ প্রাচীন ঋগ্বেদের কিয়দংশ মাত্র। এস্থলে "উদ্ধৃত্য" ও "অকরোৎ' এই শব্দদ্বয় হইতে মনে হইতে পারে—বর্ত্তমান ঋগ্বেদমধ্যে বেদব্যাসের নিজবাক্যও থাকিতে পারে। কারণ উদ্ধার করিতে গেলে নিজের কথা কিছু না কিছু প্রবেশ করিয়াই থাকে। আর এক্ষেত্রে তাহা হয় নাই—এইরূপই যদি কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র ঋগ্বেদ খানি না থাকায়, উহার প্রামাণ্য থাকিতে পারেনা। যাহারা একদেশে বিকৃত হয়, তাহার সমগ্রও বিকৃত বলিয়া গণ্য করা যায়। যেমন অঙ্গুলি নষ্ট হইলে হস্ত নষ্টও বলা যায়। এতদ্ব্যতীত বেদ সম্বন্ধে একদেশবিকারে সমগ্রের যে প্রামাণ্যহানি হয়, তাহাতে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। কারণ, কোন্ বিষয়ের কোন্ অংশ নষ্ট বা পরিত্যক্ত হইয়াছে—জানিতে পারা যায় না বলিয়া সেই অংশের সহিত অবশিষ্ট অংশ মিলিত করিয়া সমগ্রের তাৎপর্য্যবোধে বাধা ঘটে, সুতরাং ভ্রম অনিবার্য্য হয়। আর যদি ব্যাসের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে অভ্রান্ত বলিয়া বুঝিতে হয় তাহা হইলে, তাহা পৌরুষেয় শাস্ত্রই হইয়া গেল। অতএব মাধ্বমতে বর্ত্তমান ঋগ্বেদের আর বেদত্ব থাকিতে পারে না, অর্থাৎ নিত্যত্ব অপৌরুষেয়ত্ব ও অভ্রান্তত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং বর্ত্তমান বেদমূলক যত ঋষিপ্রণীত ও আচার্য্যপ্রণীত গ্রন্থাদি সকলই অপ্রমাণ হইয়া গেল। জানিনা, এই জন্যই কি, ইহারা বেদার্থ বুঝিবার জন্য পুরাণাদি শাস্ত্রের শরণ গ্রহণ করিতে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন?

কিন্তু তত্ত্বপ্রদীপ প্রভৃতি গ্রন্থে আছে, তাঁহারাই বলিয়াছেন—ব্যাসদেব ঋগ্বেদকে ২৪টী শাখায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্তরূপে উদ্ধার করিয়া সংকলন করিয়াছিলেন—এরূপ বলা হয় নাই। অতএব মাধ্বমতের মধ্যেই এইরূপ মতভেদ বর্ত্তমান দেখা গেল।

কিন্তু ঋগ্বেদ ২১টী শাখায় বিভক্ত—ইহাই মহাভারত বা বিষ্ণু পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও আছে—

"একবিংশতি শাখং ব্যহ্বৃচ্যাম্"

চরণব্যূহগ্রন্থেও ২১টী শাখারই কথা আছে। সুতরাং এ দিকেও মধ্বাচার্য্যমতে কিছু নূতন কথা পাওয়া গেল।

তাহার পর "সৎতত্ত্বরত্নমালা" গ্রন্থে আছে,—

ঋচঃ স ঋচ উদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ প্রভুঃ।
যজূংষি নিগদাচ্চৈব.........ইত্যাদি।

অর্থাৎ ঋগ্বেদ হইতে ঋক্ সকল উদ্ধৃত করিয়া প্রভু ব্যাসদেব ঋগ্বেদ করিয়াছেন, তদ্রূপ "নিগদ" হইতে যজুঃ সকল উদ্ধৃত করিয়া যজুর্ব্বেদ করিয়াছেন, ইত্যাদি।

বস্তুতঃ এস্থলেও একটী নূতন কথা পাওয়া গেল। কারণ, নিগদটী যজুর্ব্বেদেরই অন্তর্গত অর্থাৎ উহা যজুঃই, অন্য নহে। এই বিচারটী মীমাংসাদর্শনের ২ অধ্যায় ১ পাদ ১৩ অধিকরণে মীমাংসিত হইয়াছে। যে যজুঃমন্ত্র উচ্চৈস্বরে পাঠ করা যায়, তাহাকে নিগদ বলা হয়। যজুঃমন্ত্র মৃদুস্বরে পাঠ করিতে হয়। অতএব নিগদ হইতে যজুর্ব্বেদ উদ্ধৃত হইয়াছে—এই কথাটী মীমাংসা-দর্শনবিরুদ্ধ কথা, সুতরাং ইহাও একটী নূতন কথা।

তৎপরে বলা হইয়াছে, আথর্ব্বণ বেদটী নিগদের অন্তর্ভুক্ত যথা—

"আথর্ব্বণবেদস্য নিগদান্তর্ভাবেন উক্তিঃ" [৫পৃষ্ঠা]

কিন্তু আথর্ব্বণ বেদ যে পৃথক্—ইহাই প্রসিদ্ধ। সুতরাং ইহাও একটী নূতন কথা।

ইহার পর বলা হইয়াছে—ঋগ্‌বেদের ২৪টী ভাগ ব্যাসদেবকৃত এবং অবান্তরভেদ ঋষিগণ করিয়াছেন। যথা—

"চতুর্ব্বিংশত্যাদিভেদেন ভগবদ্‌বিভক্তশাখাসু
অবান্তরশাখাভেদশ্চ ঋষিভিঃ প্রণীতঃ"। [৫ পৃঃ]

বস্তুতঃ ইহাও নূতন কথা। ঋষিগণ বেদবিভাগ করিয়াছেন—ইহা ত শুনা যায় না। তবে যাজ্ঞবল্ক্য সূর্য্যের নিকট শুক্লযজুর্ব্বেদ লাভ করিয়াছিলেন—ইহাই একমাত্র শুনা যায়। কিন্তু এতদ্বারা ঋষিগণ বেদবিভাগকর্ত্তা, তাহা বুঝা যায়। তবে যদি অবান্তরবেদ বলিতে আর কোন গ্রন্থ বুঝায়, যাহা আজকাল বেদ বলিয়া পরিচিত নহে, তাহা হইলে তাহা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু সে অবান্তর বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে কি না তাহা ভাবিবার বিষয়।

যাহাহউক মাধ্বমতে যে পাঁচপ্রকার বেদের কথা বলা হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ—

১। মূল বেদ—পাঞ্চরাত্রের সহিত অবিভক্ত বেদ।
২। উপবেদ—ত্রেতাযুগে ত্রিধা বিভক্ত ঋগাদি বেদ।
৩। অবান্তরবেদ—দ্বাপরে ব্যাসকর্তৃক বিভক্ত ঋগাদিবেদ।
৪। শাখাবেদ—২৪ শাখায় বিভক্ত বেদ।
৫। অবান্তর শাখাবেদ—ঋষিগণদ্বারা পুনঃ পুনঃ বিভক্ত বেদ।
বা উপশাখাবেদ

ইহা হইতে বুঝা যায় পাঞ্চরাত্র ব্যতীত সম্পূর্ণ মূলবেদই চারিভাগে বিভক্ত—ইহা মাধ্বগণের সম্মত নহে। মাধ্বমতে চতুর্ব্বেদ অতিরিক্ত মূলবেদ আরও আছে—স্বীকার করা হয়। আর এই জন্যই বোধ হয়, তাঁহারা স্বাভিমত কথা প্রমাণ করিবার জন্য মূলবেদ নামে প্রমাণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। যেমন—

"চতুর্দ্দশবিদ্যাস্থানানি বেদিতব্যানি" ইতি মূলশ্রুতিঃ"

এই বলিয়া তাঁহারা মূল বেদকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু এই মূলশ্রুতি বা মূলবেদ অন্যত্র প্রসিদ্ধ নাই। ইহা মাধ্বসম্প্রদায়েই প্রসিদ্ধ।

অতঃপর ছান্দোগ্য শ্রুতি সম্পর্কে তাঁহারা মূলবেদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—

"বাকোবাক্যং মূলবেদঃ"

ইহার অভিপ্রায় এই যে, ঋগ্‌বেদাদি বেদচতুষ্টয় ব্যতিরিক্ত অবিভক্ত মূলবেদ পৃথক্‌ আছে, আর তাহাই "বাকোবাক্য" নামে অভিহিত। অধিক কি মাধ্বসম্প্রদায়ে স্বীকার করা হয় যে উপলব্ধ বেদচতুষ্টয় মূলবেদের অন্তর্গতও নহে। এই উপলব্ধ চারিবেদভিন্ন অবশিষ্ট অনুপলব্ধ যে বেদ, তাহাই মূল বেদ, আর তাহাই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বাকোবাক্য নামে অভিহিত হইয়াছে; অতএব কথাগুলি খুবই নূতন বলিতে হয়।

যাহাহউক বর্ত্তমান বেদ যদি মূল বেদ না হয়, তাহা হইলে এই বেদের উপর প্রামাণ্য বুদ্ধি যে কিরূপে হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। আর যদি আসল বেদ না থাকিল, তাহা হইলে আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম, তত্ত্ব জ্ঞান, আত্মজ্ঞান—সকলেরই মূল প্রমাণ আর আমরা পাই না বলিতে হইবে। সুতরাং এসম্বন্ধে সংশয় ও ভ্রম নিবারণ করিবার উপায়ও আর নাই—বলিতে হইবে। অলৌকিকতত্ত্বে বেদই প্রমাণ, আর সেই প্রমাণ আর আমাদের নাই। যাহা কিছু বেদ বলিয়া পাওয়া যাইতেছে, তাহা মূলবেদের বিকার মাত্র। অতএব তাহাতে প্রামাণ্যবুদ্ধি কখনই জন্মিতে পারে না। এরূপ হইলে আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মের কিরূপ অবস্থা স্বীকার করা হইল, তাহা সুধীগণের বিবেচনীয়। এককথায় মাধ্বসম্প্রদায় আমাদিগকে শিখাইলেন—যে "তোমাদের আসল অপৌরুষেয় বেদ আর নাই।" যাহা বিধর্ম্মিগণ বহুকৌশলে আমাদিগকে শিখাইতেছেন এবং শিখাইতে চাহেন, তাহা মাধ্বসম্প্রদায় আমাদের সমাজের গুরুর আসনে বসিয়া শিখাইয়া দিলেন। জানিনা—ভাল করিলেন, কি মন্দ করিলেন?

তবে এস্থলে একটা কথা আমাদের স্মরণ করা উচিত। কথাটা এই যে, মাধ্বসম্প্রদায় বিশ্বাস করেন যে, মধ্বাচার্য্য, বদরিকাশ্রমে অতি দুর্গম্য অথবা অপর মনুষ্যের অগম্য ব্যাসাশ্রমে একাকী দুইবার গিয়াছিলেন এবং সেখানে ব্যাসদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্রহ্মসূত্রের অর্থাদি অবগত হইয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ইত্যাদি। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি এই মূলবেদ কেন আনিলেন না, তাহা বুঝা যায় না। অবশ্য ব্যাসদেব চারিযুগ অমর, ইহা পুরাণাদিপ্রসিদ্ধ কথা। হিন্দু ইহা অবিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু যে মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের অর্থ ব্যাসের নিকট অবগত হইয়া প্রচার করিলেন, তিনি কি সেই ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য মূলবেদ উদ্ধার করিয়া আনিলেন না? ইহা যেন অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার, অধিক কি মনে হয়—অস্বাভাবিক ব্যাপার। আজ আমরা যদি কেহ ব্যাসের দর্শন পাই, তাহা হইলে বেদের উদ্ধার ত সর্ব্বাগ্রেই করিতে চাহিব। ব্যাসের বাক্য ও বেদের বাক্য তুলনা করিলে বেদবাক্যেরই প্রামাণ্য অধিক—ইহাই ত হিন্দুর বিশ্বাস। মহাভারতে দেখিতে পাই, ব্যাস তাহার নিজ আশ্রমটী বেদধ্বনিতে সর্ব্বদা মুখরিত করিয়া রাখিয়াছেন! অতএব ব্যাসের নিকট হইতে বেদের উদ্ধার অসম্ভব হইতে পারে না। তবে যদি বলা যায়—ব্যাসও মূলবেদ জানিতেন না, তাহা পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং মূল বেদের উদ্ধারের সম্ভাবনা কোথায়? তাহা হইলেও বিষম কথা হয়। ব্যাস নারায়ণের অবতার সর্ব্বজ্ঞ, তিনিও মূলবেদ পান নাই—ইহা কি কোন হিন্দু বিশ্বাস করিবেন? অতএব এই বিষয়টী সুধীগণেরই ভাবিবার বিষয়।

তাহার পর বেদের যদি এইরূপই অবস্থা হয়, তাহা হইলে জৈমিনি শবর প্রভাকর কুমারিল শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ, যাঁহারা মধ্বাচার্য্যের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের

কৃপায় আমরা বেদের মুখ দর্শন করিতেছি, তাঁহারা এ বিষয় কোন কথা বলিতেন না! বস্তুতঃ, মধ্বাচার্য্যের বেদসম্বন্ধে যেরূপ ধারণা প্রচার হইতেছে, তাহাতে ত মনে হয় না যে, উক্ত আচার্য্যগণও এরূপ কথা অবগত ছিলেন। অতএব মাধ্বমত হইতে বেদ সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা পাওয়া যায়, অনেক ভাবিবার বিষয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্বজ্ঞগণের অনেক আবিষ্করণীয় বিষয় যে মাধ্বমত ইঙ্গিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবশ্য আমাদের এইরূপ চিন্তার মূল এস্থলে পূর্ব্বোক্ত "সংতত্ত্বরত্নমালা" গ্রন্থখানি। মাধ্বসম্প্রদায়ে ইহা অতি প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয় বলিয়া ইহাকেই এজন্য আমরা অবলম্বন করিলাম। বর্ত্তমানে আচার্য্য সত্যধ্যানমূর্ত্তি প্রভৃতি মাধ্বমতের মোহন্তগণ শঙ্করাচার্য্যের মতবাদকে অবৈদিক প্রমাণ করিবার জন্য ৺কাশীধামে বিচার সভা অহ্বান করিয়াছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহারা এরূপ কার্য্য করিয়াই থাকেন, অতএব এসময় তাঁহাদের মতটীও সাধারণের জানা কর্ত্তব্য। আজ যাঁহারা বেদান্তী বলিয়া নানা মতবাদ প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা কেহই শাঙ্কর বেদান্তভাষ্যাদি অপেক্ষা কোন প্রাচীন বেদান্তব্যাখ্যা দেখেন নাই বলিয়াই বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্য বেদান্তপ্রচার না করিলে এই সব পরবর্ত্তী বেদান্তিগণ বেদান্তের মুখ দর্শন করিতে পাইতেন কি না খুবই সন্দেহের বিষয়। অতএব ইঁহারা সকলেই শাঙ্করমতের অবৈদিকত্ব প্রমাণে বদ্ধপরিকর। সুতরাং এসময়ে সত্যনির্ণয়ের জন্য যতই সত্যের আবিষ্কার হয় ততই মঙ্গল। মাধ্বমতে অন্য যে সব বিশেষত্ব আছে, তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বারান্তরে যে সকল বিষয় কিছু কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মাসপঞ্জি—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

বড়লাট লর্ড ওয়েলিংডন সস্ত্রীক বায়ুপথে স্বদেশ যাত্রা করিতেছেন, তাহার অনুপস্থিতিকালে মাদ্রাজ-লাট স্যার জর্জ্জ ষ্টেনলী গভর্ণর জেনারেলের কার্য্য করিবেন। মহাত্মা গান্ধী উৎকল ভ্রমণ করিতেছেন, তত্রত্য ডিঃ বোর্ড ও মিউনিসিপালিটী সমূহ তাহার কোনও সম্বর্দ্ধনা করিতেছে না—লর্ড আর্কস্কিন মান্দ্রাজের গভর্ণর নিযুক্ত হইলেন—কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ স্যর বি-বি-ঘোষের মৃত্যু হইল। এক দল ভারতীয় ফুট বলখেলোয়ার দক্ষিণ আফ্রিকাতে খেলা করিতে গেল; খেলাতে ইহারা দক্ষতা দেখাইতেছে; তবে শুনা যায় কোনও শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে খেলা ইহাদের হইতেছে না। টিটাগড়ে অবনত (depressed) শ্রেণীর লোকদিগের এক সভাতে এই মন্তব্য পাশ করা হইয়াছে যে তাহাদিগকে কেহ 'হরিজন' নামে অভিহিত না করে; আর ইহারা মন্দির প্রবেশ

ইত্যাদি আন্দোলনের সঙ্গে সংস্রব রাখিতে চাহে না—কলিকাতা অকটারলুনী কীর্ত্তি স্তম্ভের নীচে শ্রমিক সম্প্রদায়ের এক বিরাট সভা হইল, তাহাতে কংগ্রেস ও গান্ধীকে ধনিক সমাজের প্রতীক বলিয়া নিন্দাবাদ করা হয়—অর্থ সঙ্কটের প্রতিকার কল্পে জন্মনিরোধ আজকাল একশ্রেণী লোকের মস্তিষ্ক অবরোধ করিয়াছে, কলিকাতা রোটারী ক্লাবে সেদিন এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হইল। —কোচিন রাজসরকার অবনতদিগের উন্নতিকল্পে এক বর্ষে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। দার্জ্জিলিংএ সন্ত্রাস নিবারণ জন্য কড়া নিয়ম জারি হইয়াছে—ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও তাহাদের মন্ত্রীদিগের এক সভা বোম্বাইতে হইয়া গেল. বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থাতে ইহাদের কর্ত্তব্যদৃষ্টি আকর্ষণ ইহার উদ্দেশ্য—প্রচারণা (Propaganda) দ্বারা এদেশে সন্ত্রাস নিরসন সাধনে গভর্ণমেণ্ট বিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন —ভারত গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের উপরে বে আইনী বলিয়া যে সকল কঠোর নিয়ম জারি করিয়াছিলেন, তাহা তুলিয়া লওয়া হইল—সীমান্তে দুর্দ্দান্ত দলভুক্ত লোকেরা একজন ইংরেজ সামরিক কর্ম্মচারীর প্রাণ সংহার করিয়াছে -প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহ ক্রমে নিজ এলাকার অধীন কংগ্রেস কমিটিগুলিকে নির্ম্মুক্ত করিতেছে—বঙ্গীয় গভর্ণর কয়েক মাসের জন্য স্বদেশযাত্রা করিবেন, তৎস্থলে মিঃ উড্‌হেড কার্য্য করিবেন। আফগান রাজ্য সহ বাণিজ্য ব্যবস্থার নূতন আয়োজনে ভারতসরকারের প্রেরিত প্রতিনিধিরা কাবুল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন—ভারতে গমের চাষ লইয়া সরকারী সমিতি অকালে স্থগিত হইয়াছে—ভারতে রবারের ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ জন্য নূতন রাজকীয় ব্যবস্থা হইল—রেলওয়ে বিভাগের আয় সর্ব্বত্র কিঞ্চিৎ বাড়িতেছে—বেলুচিস্থান হইতে ভারতে রৌপ্যের আমদানী বন্ধ হইল, ইহাতে পারস্যের ক্ষতি—কৃষির দুরবস্থা দেখিয়া পাঞ্জাব রাজসরকার কতিপয় জেলার রাজস্ব মাপের ব্যবস্থা করিলেন—বঙ্গীয় শাসনবিভাগ গ্রামসংগঠন কার্য্যে কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে যাইতেছে। উত্তর বিহারে এখনও মধ্যে মধ্যে ভূকম্পন হয়—দেশের সর্ব্বত্র এবার গ্রীষ্মের উত্তাপ অত্যধিক—স্থানে স্থানে বিলম্বে আগত কালবৈশাখীর ঝড় প্রবল—কাশ্মীর রাজ্যে যমুনার উপরে একটী পুল পড়িয়া বহু লোকের প্রাণ হানি ও অর্থ নষ্ট হইয়াছে। শ্যামনগরে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা হইয়াছে—কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র নিযুক্তি ব্যাপার লইয়া কেলেঙ্কারী চলিতেছে; গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব নির্ব্বাসন নাকচ করিয়াছেন। নূতন নির্ব্বাচন লইয়া আর একটী সভা পণ্ড হইল।

বৈদেশিক

ব্রিটিশ রাজনৈতিক মহলে 'হোয়াইট্ পেপার' সমর্থন শুনা যাইতেছে, ভারত এখন নির্ব্বাক্। আমেরিকার ইংলণ্ডের সমরঋণ পরিশোধ জন্য কড়া তাগিদ চলিতেছে—ইউরোপীয় রাজনীতি জটিলতর, ইটালীতে নূতন ফেসিলিষ্ট দলের উদ্ভব, জারমেনী রাজনৈতিক দলাদলি প্রবল, ফ্রাঙ্কো-জারম্যান সম্বন্ধ তীব্রতর—সভিয়েট রুশ জাতিসঙ্ঘে যোগদান করিবার সম্ভাবনা—. রুশে চার চাষ বৃদ্ধি হইয়াছে. সুবর্ণ সঞ্চয়ও অধিকতর -তুর্কে বিদেশীয় লোকের গমনাগমন রাজ-বিধানে নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে—জাপবীর এড্‌মিরেল টোগোর মৃত্যু হইয়াছে—রাষ্ট্রিক মণ্ডলে দল গঠন প্রণালীর উচ্ছেদ সাধন করিতে জাপানে প্রচেষ্টা দেখা যায়।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

পঞ্চম বর্ষ]　　　　　আষাঢ়—১৩৪১　　　　　[৯ম সংখ্যা

সাধনার পথে

অদ্যকার জগতে মানবসমাজে যে সকল ভাব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে বিভিন্ন দেশের সংযোগ এবং বিভিন্ন লোকের মধ্যে ঐক্য ও মিলনের কথা বিশেষ করিয়া শুনা যায়; সর্ব্ব মানবে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, মহামানবের সৃষ্টি সাধন, বিশ্বপ্রেমের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক উচ্চতর বিষয় বর্ত্তমান সভ্যতার অবদান, এই সকল উচ্চ কথা অনেকেই কহিতেছেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞান জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে যান বাহনাদির উন্নতি ও প্রসার সাধন করিয়া বিভিন্ন দেশের লোকের মিলনের অনেক সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিয়াছে। শিক্ষা ও পুস্তক প্রচার দ্বারা পরস্পরের মনোভাবের বিনিময় অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক হইয়া আসিতেছে; সংবাদ পত্রের প্রচলন ও মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার সাধন দ্বারা একদেশের বার্ত্তা অপর দেশে অহরহ প্রচারিত হইতেছে। এই সকল বাহিরের আয়োজন ও জাগতিক অবস্থা দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন ভূ-মণ্ডল সত্য সত্যই বুঝি মহামানবের মিলন ভূমিতে পরিণত হইতে যাইতেছে। কবি ইহার পরিকল্পনা বহুদিন করিয়া রাখিয়াছেন, দার্শনিক ইহার উচ্চ ভাবে সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আধুনিক ভাবুক তাহার সম্ভাবনায় উল্লসিত।

মিলন ভূমি
—সাধনার ক্ষেত্র

মানবের মিলন কল্পনা ও তাহার চেষ্টা জগতে আজ নূতন বিষয় নহে। এ বিষয়ে মানুষের একটা স্বভাব-সিদ্ধ কর্ম্মপ্রেরণাও আছে। প্রীতি ও মৈত্রী মানবের সাধারণ ধর্ম্ম, সহযোগ ও সহ-বাস তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়া মানব সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু মৈত্রী যেমন মানব চিত্তের স্বাভাবিক গুণ, বৈরও তেমন মনুষ্য চরিত্রের সাধারণ লক্ষণ। এজন্য স্বভাবের ক্রোড়ে লালিত মানবশিশু মিলনের পুণ্যক্ষেত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

তথাপি মিলনের খণ্ড কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে—মানব ইতিহাসের প্রতি যুগে, বিভিন্ন লোকের দ্বারা, বিভিন্ন প্রকারে। জগতে যে যখন যাহা কিছু মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহা কোনও না কোনও প্রকারে এই মিলনের লক্ষ্যে পরিচালিত হইয়াছে। সকল মনীষী ও মহাপুরুষেরা এক মিলনযজ্ঞের হোতার কার্য্য বিভিন্ন প্রকারে করিয়া গিয়াছেন। কবি ও বিজেতা উভয়েই মিলন-কার্য্যের সহায়ক। জ্ঞানবীর ঋষি ও নীতিবিদেরা জগতের রহস্যভেদ ও বিবিধ তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন করিয়া, তাহাতে বহুজনের চিত্ত আকর্ষণ করতঃ জগতে সুধীজন সমাজের সৃষ্টি করিয়াছেন, কর্ম্মবীর বিজেতারা আপন শূরত্বের বলে দেশ হইতে দেশান্তরে বিজয় বাহিনী পরিচালিত করিয়া বিবিধ জাতি ও বিভিন্ন দেশের লোককে আপন শাসন পতাকার তলে একত্রিত করিয়াছেন। এইরূপ বীরপুরুষদিগের দ্বারা নব নব রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও নূতন নূতন জাতি গঠিত হইয়াছে। সর্ব্বোপরি করুণা-কাতর ও মানব-প্রীতিতে অধীর ধর্ম্মপ্রচারক ও ধর্ম্ম-সংস্থাপয়িতারা নিজ নিজ ধর্ম্মে অসংখ্য লোককে দীক্ষিত করিয়া অতি বৃহদায়তনের ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের কাহারও মধ্যেই স্থির মিলনের সম্ভাবনা কিছু হয় নাই। বরং ঐক্য ও মিলনের নামে সকল ক্ষেত্রেই পরিণামে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে—জ্ঞানরাজ্যে বিবিধ মতবাদ, বিজেতাদিগের দ্বারা লোকের উৎপীড়ন ও উচ্ছেদ-সাধন এবং ধর্ম্মের নামে রক্তপাত—ইতিহাসের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে লিখিত আছে।

প্রকৃত মিলন কেবল সত্যের ভূমিতেই সংঘটিত হইতে পারে। সত্য হইতে বিচ্যুত হইয়াই সংসারে বিরোধের উদ্ভব হইয়াছে, আবার সত্যে প্রত্যাবর্ত্তনে মাত্র সেই মিলন সম্ভবপর হইবে। সত্যের অনুবর্ত্তন, সত্যের উপলব্ধি, এবং সত্যের ব্যবহার দ্বারা জীবনের যে উৎকর্ষ লাভ তাহাই মানবের সাধনা বা 'কালচার'—এই সাধনাই মানবের মিলনভূমি। স্পর্শমণির প্রভাবের ন্যায় এই মানবসাধনা লোক হইতে লোকান্তরে ব্যাপৃত হয়। মানব ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতে এইরূপ এক সাধনার ব্যাপ্তি (fusion of culture) জগতে চলিয়া আসিয়াছে। আজ সত্য হইতে অধিকতর বিচ্যুত বলিয়া মানুষ উহার সন্ধান বা স্বাদ তেমন লাভ করিতে পারিতেছে না; ফলে অনৈক্যের বিষময় ফল তাহারা দিন দিন অধিকতর ভোগ করিতেছে। ভারতীয় সাধনা যুগ যুগান্তর ধরিয়া এই সত্যকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে; এজন্য উহার মধ্যে যে ঐক্য ও মিলনের বীজ নিহিত আছে, এমন আর কোথাও নাই; ইহার সম্প্রসারণ ও সংস্পর্শ লাভে মানবের যে ঐক্য ও মিলন এবং সমাজশৃঙ্খলার সম্ভাবনা রহিয়াছে, এমন আর কোথাও নহে!

বর্ণাশ্রম ও সেবাধর্ম্ম।—

লোক-সেবা ও সমাজ-সেবার কথা আজ সর্ব্বত্র শুনা যায়। নব ভারতে দেশ-সেবার স্পৃহা অত্যন্ত জাগ্রত; দেশ-সেবা জাতিগঠনের প্রধান উপাদান; এজন্য উহার গৌণ মর্ম্ম অসাধারণ; আজ যে সকল লোক জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তির পরিচালনা করিতেছে, তাহারা সকলেই দেশসেবা ব্রতে দীক্ষিত। সেবা মাত্রেরই একটী অধিকার ও স্থান নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। নতুবা সেবার কার্য্য উত্তমরূপে চলিতে পারে না। ভারতীয় বর্ণাশ্রম এই অধিকার ও স্থাননির্দ্দেশের অতি উত্তম ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থাতে সকলেই সেবক। প্রত্যেকেরই শক্তি ও অধিকার ইহাদ্বারা ব্যবস্থিত। প্রত্যেক লোক আপন আপন অবস্থাতে থাকিয়া, নিজ নিজ শক্তি অনুসারে সমাজ বা রাষ্ট্র সেবাতে

নিযুক্ত থাকিবে—এই ভাবে ভারতের ব্রাহ্মণ সেবক, ক্ষত্রিয় সেবক, বৈশ্য সেবক ও শূদ্র সেবক। সকলেরই সেবার লক্ষ্য এক, ফল বা পরিণামও এক—সমাজ ধর্ম্মের সম্যক প্রতিপালন এবং তন্নিমিত্ত সকলের তুল্য ভাবেই মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স লাভ। পরবর্ত্তী কালে ইহাতে ইতরবিশেষের ধারণা আসিয়াছে, তারতম্যের সৃষ্টি হইয়াছে, উচ্চ নীচ ভেদ জন্মিয়াছে; শক্তির অপচয় হইয়াছে; তাহাতে মৌলিক উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতেছে না। বিভিন্ন বর্ণের সেবাকার্য্য তুল্যরূপে সমাদৃত নহে; ফলও উহার ফলিতেছে না। বর্ত্তমান সময়ে কেবলমাত্র বৈশ্য ও শূদ্রের কার্য্যপ্রাধান্য প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়। তাহাতেই জগতের যাবতীয় দুর্দ্দশার সৃষ্টি। এক্ষণে ব্রাহ্মণের সেবা অগ্রাহ্য, ক্ষত্রিয়ের সেবা সেবার ভাব হইতে বিচ্যুত। ব্রাহ্মণ থাকিয়াও নাই, ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রশক্তির অপব্যবহার জগতের সর্ব্বত্র চলিতেছে। এই দুই শক্তি স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই প্রধানতঃ সমাজশৃঙ্খলা বজায় থাকে। নতুবা সেবাধর্ম্মও অপূর্ণ রয়। ভারতই এই সকল শক্তির মাহাত্ম্য ও সেবার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিল। ভারতে এক্ষণে এই দুই শক্তির পুনঃ জাগরণের আবশ্যকতা আছে। ব্রাহ্মণের অভাবে জগত অব্যবস্থিত, ক্ষাত্রশক্তির অভাবে ভারত অবনত। প্রকৃত সেবাধর্ম্ম উহাদের পুনরুত্থান চাহে।

কংগ্রেস—বর্ত্তমান ও অতীত।—

সমগ্র ভারতের লোককে একই আদর্শে একত্র সম্বদ্ধ করিয়া এক জাতীয় শক্তির প্রতিষ্ঠা করাই ছিল কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য। যত দিন কংগ্রেস নীতিকে প্রধান করিয়া চলিয়াছিল, উদ্দেশ্যকে মনে দৃঢ় বদ্ধ রাখিয়াছিল, ততদিন এই জাতীয় শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছিল। কিন্তু যখন নীতির স্থানে ব্যক্তি এবং উদ্দেশ্যের স্থানে উপায় কংগ্রেসের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়া বসিল, তখন হইতেই কংগ্রেসের জাতীয় শক্তির লাঘব ও নানা দলের বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে। দেশের শক্তিমান পুরুষগণই প্রথমাবধি কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে মতবিরোধও ছিল—কিন্তু ইহাদের কেহই আপন প্রাধান্য স্থাপন করিয়া কংগ্রেস নীতিকে পদদলিত করিতে চাহেন নাই। নরম ও চরম দলের ভেদ তখনই ঘটিয়াছিল; কিন্তু তাহার মধ্যেই 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত সর্ব্বজনমান্য বলিয়া পরিগৃহীত হয়। তখন প্রত্যেকেই নিজ নীতিকে সম্মান করিয়া চলিত, অনেক সময় একপক্ষ অপর পক্ষের নীতিরও মর্য্যাদা দিত। দেশের লোকে উভয় দলকেই প্রীতির চক্ষে দেখিত—কোনও ব্যক্তি-প্রাধান্যের জন্য নহে, নীতির গুণাগুণ বিচারে। পরিশেষে যখন এক দলের নীতি দেশের চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল তখন অপর দল কংগ্রেসের কর্ম্মক্ষেত্র ছাড়িয়া আপনিই অপসৃত হইয়াছিল। তারপর ব্যক্তিবিশেষকে প্রধান করিয়া নীতির অবজ্ঞা কংগ্রেস দিন দিনই অধিকতররূপে করিয়া আসিতেছে। নীতি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলে বুদ্ধিভ্রংশতা সহজেই আসিয়া পড়ে; তাহাতে আবার অহংভাব বা ব্যক্তি-প্রাধান্য প্রবল হইলে মতিচ্ছন্নতাও ঘটে। বর্ত্তমান এই গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেস একে একে অনেক কর্ম্মপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিল; কিন্তু কোনওটিই কার্য্যকারী হইল না। দেশের প্রকৃতি ও লোকচরিত্রের অনভিজ্ঞতা দেশনায়কের পক্ষে কত দূর অমার্জ্জনীয় অপরাধ তাহাই দিন দিন প্রতিপন্ন হইয়া আসিয়াছে। অসহযোগ, অহিংস প্রতিরোধ—প্রভৃতি কর্ম্মপন্থাগুলি দেশের প্রকৃতি ও লোকচরিত্রের অজ্ঞতার চূড়ান্ত নিদর্শন। পরিণাম ইহার তদনুরূপই ঘটিয়াছে। কতকগুলি

বিপরীত ফলের দ্বারা মূল কার্য্যের গুণ বিচার করা যায়—হিন্দু মুসলমানের ঐক্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া একালের কংগ্রেস-নেতা উহাকে কংগ্রেসের প্রধান কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে খিলাপতের ন্যায় অবাস্তর ও পররাষ্ট্রবিষয়ক ব্যাপার ভারতের নিজ নানা জটিল প্রশ্নের সহিত জুড়িয়া দেওয়ায় একদিকে যেমন জাতির স্থির লক্ষ্যে ব্যাঘাত ঘটিল, কর্ত্তব্যের গুরুত্ববোধ এককেন্দ্রিত্ব হারাইয়া তেমনই শিথিল হইয়া পড়িল। ফল তাহার এই ঘটিল যে মুসলমানকে ঐক্যের দিকে টানিবার জন্য এই প্রযত্নের দ্বারা তাহারা ঐ আদর্শ ছাড়িয়া যত দূর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, তেমন আর কোনও কালেও ছিল না। রাজনৈতিক গুপ্ত কারণে এইরূপ অবস্থার অনেকটা সহায়তা করিয়াছে বটে, কিন্তু যাহারা ঐরূপ গুপ্ত বিষয়ের সন্ধান পায় না তাহাদের রাজনীতি লইয়া খেলিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

কতকগুলি চমকপ্রদ কথা ও ব্যাপারের দ্বারা লোকের মন অভিভূত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করা একালের কর্ম্মনীতির প্রধান অঙ্গ। বর্ত্তমান কংগ্রেসের একছত্র পরিচালক মহাত্মা গান্ধী এই নীতি যেরূপ ভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, এমন খুব কম লোকেই করিতে পারে। বাস্তবিক এইরূপ সব কার্য্য দ্বারাই তিনি 'মহাত্মা' নামও অর্জ্জন করিয়াছেন—চরকার ডাক ও উহা দ্বারা মুহূর্ত্ত মধ্যে স্বরাজ হাতে পাওয়া, অনশন, লবণদুর্গআক্রমণ প্রভৃতি অনেক বিষয়েই মানুষকে অবাক্ করিয়াছে, অথবা দলে দলে অসাড়ে তাহার পথে ধাবিত করিয়া লইয়াছে। অসহযোগ ও আইন অমান্যকরণ গৃহীত হইল; দেশের উপর দিয়া দুঃখের প্লাবন—যাতনার অগ্নি-বাত্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল, কিন্তু উহার চূড়ান্ত পরীক্ষার অবসর কেহ পাইল না—সময়ে অসময়ে গৃহীত নীতি সকল প্রত্যাহার করিতে লাগিলেন। এইরূপ এক নীতি পরিহার করিয়া কংগ্রেস এক গর্ব্বস্ফীতির গরিমা বোধ করিয়াছিল শাসনকর্ত্তৃপক্ষের সহিত সমকক্ষতার অনুমানে—দীল্লিতে গান্ধী-আরউইন বৈঠক বসিল, সন্ধি চুক্তি প্রভৃতি উচ্চ নামে উহা কথিত হইতে লাগিল; কিন্তু সে উন্নয়ন কংগ্রেস ও কংগ্রেসনেতার পক্ষে কি শোচনীয় অধঃপতনের সোপান হইল, কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অবস্থা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দীল্লির সংলাপের পরেই কংগ্রেসপক্ষের গোলটেবিলে যোগদান, সেখানে দেশীয় ও বিদেশীয়দের হাতে মহাত্মার লাঞ্ছনা প্রভৃতি কংগ্রেসের পরবর্ত্তী দূরদৃষ্টেরই সূচনা করিয়াছিল। ঐক্যই কংগ্রেসের মূল মন্ত্র; ঐক্যেই তার সমুদয় আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। মহাত্মা তাহার নিজ হাতে ভাঙ্গা ঐক্যের জোড়া দিতে গিয়া গোলটেবিলে সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থমনোরথ ও লাঞ্ছিত হইয়া আসিলেন। পক্ষান্তরে শাসন কর্ত্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িক মীমাংসার বিচারে কেবল হিন্দু ও মুসলমানের নহে, হিন্দুর উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর ভিতরেও অনৈক্যের বীজ বদ্ধমূল করিয়া দিলেন। অতঃপর কংগ্রেসের আর কোনও কাজই রহিল না। আপন কোট বজায় রাখিবার জন্য অগত্যা কংগ্রেসকে পুনঃ আইন অমান্যের ভয় দেখাইতে হইল—কিন্তু সরকার এবার আর তাঁহাকে সে অবসর দান করিলেন না। অচিরে কংগ্রেসের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকারিতা স্থগিত হইল, দলে দলে কংগ্রেসকর্ম্মী অবরুদ্ধ হইল। কংগ্রেস রাজনৈতিক দৃষ্টিতে মৃত পদার্থে পরিণত হইল।

অদ্যকার কংগ্রেসের আর একটী কর্ম্ম—লোকের মতি গতি বুঝিয়া, আধুনিকতার বাতাসে পাল তুলিয়া চলা—মহাত্মা এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত। মেয়েপ্রগতি, অনাচার, অস্পৃশ্যতার প্রচলন—এসমুদয় যাহা এদেশের ধর্ম্ম ও লোকব্যবহারের বিরুদ্ধ বিষয়, এ সময়ের পাশ্চাত্য শিক্ষা

ও পাশ্চাত্যের সংশ্রবে চলিয়া আসিতেছে, মহাত্মা তাহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ ও দলপুষ্টির সুযোগ পাইয়াছেন। কংগ্রেসের মস্তকে যখন বজ্রপাত উপস্থিত এবং সমুদয় ভারতবাসীর মিলন-যজ্ঞের সমুদয় আশা ভঙ্গ হইয়াছে, তখনই তিনি হিন্দু সমাজের মধ্যে ঐক্যের নামে অনৈক্য সৃষ্টির আর এক পথ ধরিলেন – যে রাষ্ট্রবৈঠকে তাহার কোনও কথারই মূল্য রহিল না, অসহযোগের প্রণেতা, তাহার মীমাংসার প্রতিকার পাইবার জন্য হিন্দু-সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সমর ঘোষণা করিয়াছেন—অসবর্ণ বিবাহ, মন্দিরে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের নির্বিচার প্রবেশাধিকার, মৃত্যুপণে অনশনের ভয় দেখাইয়া হিন্দু নেতাদিগকে এক নূতন সাম্প্রদায়িক মীমাংসাতে সম্মতি দানে বাধ্য করা—ইত্যাদি কারণে হিন্দুসমাজে যে অনৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান কংগ্রেস-নীতির ফলবৈপরীত্যের আর এক নিদর্শন।

কংগ্রেস এক্ষণে আর এক কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই করাড়ে রাজনিগ্রহ হইতেও মুক্তি পাইতেছে—ব্যবস্থাপরিষদে প্রবেশ লাভ ও তাহাতে একটী পক্ষ মাত্রে পরিণত হওয়াই এক্ষণে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হইয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও উহার প্রধান রতকৃত্যতা—অনৈক্য সৃষ্টির হাত হইতে সে রক্ষা পাইতে পারে নাই—কংগ্রেস-পার্লিয়াম্যান্টারী-বোর্ড বা ব্যবস্থা-সভাসমূহে প্রবেশার্থীদিগের এক নূতন কংগ্রেসী দল গঠিত হইয়াছে ; তাহাতে যে প্রণালীতে কংগ্রেস দল চলিবেন, তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ভাবী শাসন-সংস্কারে সরকারী ব্যবস্থাতে গৃহীত সাম্প্রদায়িক মীমাংসার স্থায়ী অনৈক্যকে কংগ্রেস দল মান্য করিয়া লইবেন বলিয়া, ইহাদের নিজেদের দলেই এক্ষণে বিষম দলাদলি উপস্থিত। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও মিঃ এনীর ন্যায় প্রতিপত্তিসম্পন্ন সভ্যগণও ইতিমধ্যে দুই তিনবার বোর্ডের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে তাহা পুনঃ গ্রহণ করিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, পণ্ডিতজী ইহার ভিতরেই একটী নূতন দল গঠন করিয়া ব্যবস্থাপরিষদে দণ্ডায়মান হইবেন। কংগ্রেসের বর্ত্তমান শবদেহের নূতন ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা হইতেছে !

সহ-শিক্ষা।—

সহ-শিক্ষা নামে বালক-বালিকা বা যুবক-যুবতীতে একত্র এক স্কুল বা কলেজে পড়িবার রীতি প্রায় দেশ মধ্যে প্রচলিত হইতে চলিল। দুই এক বৎসর পূর্ব্বে যে সকল কলেজ-কর্ত্তপক্ষ ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহারাও এবৎসর শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষার্থিনীদের পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলেজের দৃষ্টান্তে অনেক স্কুলও ছাত্রের সঙ্গে ছাত্রী ভর্ত্তি করিয়া লইয়াছে। যে সকল শিক্ষা-কর্ত্তপক্ষ ইতিপূর্ব্বে এই সহ-শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, তাহাদের মনোভাবের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এমন মনে করিবার কিছু হেতু নাই ; আর যে সকল পিতা বা অভিভাবক মেয়েদের এই শিক্ষা পদ্ধতিতে পাঠাইতেছেন, তাহারাও ইহার পক্ষপাতী নন। একান্ত নিরুপায় হইয়াই ইহারা এইরূপ কায করেন। বিবাহের দায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যও নাকি কেহ কেহ কন্যাকে এইরূপ বিদ্যালয়ে পাঠান—সময়মত বিবাহ প্রায় আজ কাল হইয়া উঠে না ; কাজেই পিতা কন্যাকে স্কুল কলেজে পাঠাইয়া ঐ অখ্যাতি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাহেন ; লেখা পড়া শিখাইয়া মেয়েকে বিবাহ না দিয়া রাখিবে, ইহাও কাহারও কাহারও মনের ভাব, এরূপ শুনা গিয়াছে ; এই সমুদয়ই নিরুপায়ের গতি। শিক্ষার জন্যই বর্ত্তমান শিক্ষায় কন্যাকে পাঠায়, এরূপ লোক

খুবই কম, কারণ বর্ত্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে কাহারও কোনও উচ্চ ধারণা নাই—যে ক্ষেত্রে বালক বা পুরুষ দিগেরই সুশিক্ষা কিছু হইতেছে না, সেই ক্ষেত্রে মেয়েদের শিক্ষা কি হইবে? বিদ্যালয়ের অবস্থাও এই ক্ষেত্রে কম নিরুপায়ের কথা নহে—মেয়েদের সুশিক্ষা হওয়া উচিত, এবং সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক; ছেলে ও মেয়ের একপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না, সম্পূর্ণ পৃথক্ বন্দোবস্তে বিস্তারিত ভাবে সমগ্র দেশেই মেয়েদের সুশিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া কর্ত্তব্য—প্রচলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বা বিদ্যালয় সমূহ ইহা জানে ও বুঝে। কিন্তু এরূপ কোনও সুব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই। অর্থাভাব, স্থানাভাব ও লোকাভাব। কি বিষম দৈন্যের মধ্যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির কার্য্য চলিতেছে! শিক্ষার ব্যবস্থাতে ক্রুটী থাকিয়া গেলে পুরুষের পক্ষে যত ক্ষতিকর হয়, স্ত্রীর পক্ষে তাহা অপেক্ষাও অধিক অনিষ্ট হইবে, ইহা বুঝিয়া উঠা কঠিন নহে। বর্ত্তমান ধরণের স্ত্রীশিক্ষা ও সহশিক্ষা বেশী দিন এদেশে প্রচলিত হয় নাই, কিন্তু ইতিমধ্যেই উহার কুফলের পূতিগন্ধে বায়ুমণ্ডল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষিতা রমণীর দুঃশীল ব্যবহার এবং তদপেক্ষাও গুরুতর দুর্নীতির বিবরণ দিন দিন বহু প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। একটী বিশিষ্ট কলেজের ছাত্রী-নিবাসে অনুসন্ধানে ইহার যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহার ফলে উহার কর্ত্তৃপক্ষ তাহা তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা পুরুষ-বিদ্যালয়ে না করিয়া অন্যত্র একটী পৃথক বাড়ীতে করিতেছেন। এ শিক্ষার সমুদয় ক্রুটীগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কর্ত্তৃপক্ষ ইহার সমূল উৎপাটনেই মনোযোগী হইবেন।

সনাতনী ও সংস্কারক।—

বর্ত্তমান অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন-আন্দোলনে সনাতন ও সংস্কার কামী লোকদিগের মধ্যে পার্থক্য বিশদরূপে দেখা গিয়াছে। ধর্ম্ম ও নীতির পক্ষে ইহা এক শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। সনাতনী দল আত্মপক্ষ সমর্থন কি তাহা জানিত না; নিজ শক্তি বা বলপরীক্ষার অবসরও তাহাদিগের বহুদিন ঘটে নাই; আত্মপ্রত্যয় হারাইয়া এক তমোমগ্ন জড়তার মধ্যে উহারা বহুদিন নিমগ্ন ছিল; সংস্কারকদিগের অভিযান আজ অনেক দূর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে—হিন্দুবিবাহবিচ্ছেদ ও হিন্দু দেবমন্দিরে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের সমভাবে প্রবেশাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে আইন করিবার জন্য তাহাদিগের ব্যগ্রতা, ব্যবস্থাপরিষদে ইহাদিগের বিধিবদ্ধ চেষ্টা, এবং বিশেষতঃ মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ দেশনায়কের অধীনতায় এইসকল বিষয়ে সমগ্র দেশময় আন্দোলন উপস্থিত করায়, রক্ষণশীল সনাতনী সম্প্রদায়ের মধ্যে এক নূতন চেতনার উন্মেষ ও উহার প্রতিক্রিয়ায় এক নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। সনাতনীরা দল বাঁধিয়া সভাসমিতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আন্দোলন মুখে সত্যাগ্রহ করে, এবং আইন সভায় যাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে স্বপক্ষসমর্থন ও বিরোধী দলের ধর্ম্মবিরোধী কার্য্যের প্রতিবাদ করিবে, এই জন্য সমবেত চেষ্টা চলিতেছে। পক্ষান্তরে সংস্কারকদল এক্ষণে আপন আপন গণ্ডী ও আদর্শ ছাড়িয়া অন্যান্য দলের সহিত মিলিয়া রাষ্ট্র ক্ষেত্রে ক্ষমতা অর্জ্জনের নিমিত্তই ব্যস্ত। পূর্ব্বে ধর্ম্ম বা স্বাধীন চিন্তার কোনও মৌলিক নীতি দ্বারা মাত্র প্রণোদিত হইয়া সংস্কারকের কার্য্য চলিত—ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য্য সমাজ প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্প্রদায় এবং মদ্যনিবারিণী, সুনীতিসঞ্চারিণী প্রভৃতি সভা নিজ নিজ বিষয়ে মাত্র আপনাদিগের সমুদয় চেষ্টা নিবদ্ধ রাখিত। এক্ষণে রাষ্ট্রসংস্কার এবং তাহা দ্বারা আপন আপন দল বা সম্প্রদায়ের নিমিত্ত কিছু স্বার্থসিদ্ধি মাত্র সকলের

উদ্দেশ্য হইয়াছে— উপস্থিত শাসনসংস্কারের নামে কর্তৃপক্ষ যে বিষময় বিরোধের ফলটী এদেশবাসীর হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, ইহা তাহারই অন্যতম পরিণাম। রাষ্ট্রপক্ষে জাতীয়তার প্রতীক কংগ্রেস আপন লক্ষ্যে হতপ্রযত্ন হইয়া এক্ষণে এই সকল সংস্কারবাদিদিগের সহিত এক যোগে অধিকাংশ বিষয়ে সংস্কার কার্য্যেই আপনাদিগকে নিয়োজিত করিয়াছে।

এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রীয় বায়ুমণ্ডল, রাষ্ট্রিক আদর্শ এবং নব-প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্র-সংস্কার দেশের লোকের মন এমনই আলোড়িত করিয়া দিয়াছে যে, সকলেই নিজ নিজ ধর্ম্ম ও সাধনার প্রাণবস্তুকে ছাড়িয়া রাজনৈতিক আলেয়ার পেছনে ছুটিয়াছে; এবং তাহারই দ্বন্দ্বের মায়াভূমিতে দাঁড়াইয়া পরস্পর বিরোধ মাত্র করিতেছে। আজ সনাতনী সনাতনের রক্ষার জন্য যে পথ ধরিয়া চলিতে চাহে, তদপেক্ষা সহস্রগুণে তাহা রক্ষা পাইবে যদি নিজ শিক্ষা দীক্ষা ও জীবন যাত্রায় সে প্রকৃত সনাতনের পথে চলে। আজ সে পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া কে কতদূরে সরিয়া পড়িয়াছেন, তাহা প্রত্যেকে একবার আপনার দিকে দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারেন। সনাতনের স্বরাষ্ট্র তাহার নিজ ধর্ম্মে; অতি দুর্দ্দিনেও সে তাহা রক্ষা করিয়াছিল; অদ্যকার তাহার নানা প্রকারের বিজাতীয় মোহই তাহাকে তাহা হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে। আত্মরক্ষার নিমিত্ত তাহার এই নব প্রচেষ্টাতেও সেই মোহেরই খেলা অনেক খানি আছে। প্রাণের দায়ে তাহাকে এ পথে অনেকটা চলিতে হইয়াছে, ইহাও ঠিক; কিন্তু আত্মদৃষ্টি হারাইয়া এই চক্রে পড়িলে তাহার সমূলে বিনাশের আশঙ্কা আছে। সংস্কারকেরা নিজ নিজ পথ ছাড়িয়া অন্য পন্থা গ্রহণের দ্বারা তাহাদের মূল আদর্শ ও কর্ম্মনীতির অসারতার পরিচয়ই আরও দিতেছেন। আর কংগ্রেস যে আজ লক্ষ ভ্রষ্ট ও অবান্তর বিষয়ে লিপ্ত, তাহার দুর্ব্বলতাই সেই সাক্ষ্য বহন করিয়া চলিয়াছে।

হীন হত্যা।—

অজ্ঞাতে রাজকীয় বা উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিয়া খ্যাতি বা অখ্যাতি অর্জ্জন করা, অথবা কোন হীন স্বার্থসিদ্ধি সম্পাদন একালের একটা দুর্লক্ষণ। হিংসা জাগতিক নিয়মের বহির্ভূত নহে—অন্যায় এবং পাপও তাহাই; অন্যায়ের প্রতিকার কল্পে, পাপের বিনাশের জন্যই হিংসার প্রয়োজন আছে। কিন্তু এই হিংসার তারতম্য আছে। হিংসার মধ্যেও ধর্ম্মাধর্ম্ম আছে— জগতের প্রত্যেক বিষয়েই তাহা। সম্মুখ ক্ষেত্রে সমকক্ষদিগের মধ্যে যে হিংসা তাহাই ধর্ম্ম ও ন্যায় মূলক। দুর্ব্বল ও সহায়হীনকে হিংসা করিতে নাই—এজন্য ভ্রূণহত্যা মহাপাপ; আত্মহত্যা ততোধিক; দুর্ব্বল শত্রুকে বিনাশ করিতে নাই, পরাজিত করিয়া আশ্রয় দান অথবা মিত্র করিয়া পালন করিতে হয়। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের এ সকল সাধারণ কথা—জনসাধারণেরও ধারণায় আবদ্ধ। গুপ্ত-হত্যাও এই কারণেই মহাপাপ; উহা হীনতা ও কাপুরুষতা ব্যঞ্জক। ভারতীয় ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল এবং উহার নিন্দা সর্ব্বত্র। অদ্যকার জগতের এই সকল হীন হত্যা বর্ত্তমান সভ্যতারই পরিমাপক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আত্মহত্যা অহরহ ঘটে—নরনারী সম্বন্ধের ব্যতিক্রম, আর্থিক ক্লেশ, সংসারসংগ্রামে প্রতিযোগিতা, ঈর্ষা, হতমান, আত্মগ্লানি ইত্যাদি অসংখ্য লোককে নিত্য আত্মহত্যায় লিপ্ত করিতেছে। ভ্রূণহত্যা এক্ষণে লোকের দৈনন্দিন ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে—একদিকে সংযম ও সুনীতির অভাব, অপর দিকে ব্যভিচার ও দুর্নীতির প্রসার; সমাজ অতিষ্ঠ; লোকে নিজ—পাপের নহে—পাপের পরিণাম ভয়ে আতঙ্কিত; অর্থনীতি ও নিজ

ভোগবিলাসের গণনায় বুদ্ধিমত্তা দর্শাইয়াই জনতাহ্রাসের নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে—নীতি ও শাস্ত্র বিধানের স্থান ইহাতে নাই—আছে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আর এক আসুরিক উপযোগ—নানা ঔষধ ও যন্ত্রের আবিষ্কার—যাহাতে সন্তানজননিরোধ করা যায়—সভ্য জগতের বায়ুমণ্ডল আজ ইহাদের বিজ্ঞাপনে মুখরিত ও কলুষিত। বিজ্ঞব্যক্তিরা ইহার প্রশংসা বাদে নিরত। অগণিত ভাবী মানবের অঙ্কুর বিনাশ হইতেছে! এই মহাপাপ আজ আর এক আকারে দেখা দিয়াছে, তাহাতেই ইহা লোকের দৃষ্টি অধিক আকর্ষণ করিতেছে। রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি আজ আর সকল নীতিকে অপসৃত করিয়া মানব মনে প্রাধান্য লাভ করিয়া বসিয়াছে—মানব প্রকৃতির অনেক মহনীয় বিষয় ইহাদের নিকট পরাভূত। গুপ্তহত্যায় মহাপাপ আজ প্রায় সমুদয় রাষ্ট্রে দেখা যায়। উচ্চপদস্থ ব্যক্তি বা দেশবিখ্যাত জননায়কগণের উপরেই প্রায়শঃ এই পাপক্রিয়া চলে। প্রতিকারের নিমিত্ত নানা ব্যবস্থা হয়; প্রতিশোধেরও নানা উপায় অবলম্বিত হয়। ইউরোপের রাষ্ট্র মণ্ডলে ঐরূপ গুপ্ত হত্যা চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে—এইরূপ একটী ঘটনার নিমিত্তই প্রচণ্ড ইউরোপীয় মহাসমর সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ভারতীয় লোকের মনোবৃত্তি আজ কতক কাল ধরিয়া বর্ত্তমানের এই অতিমাত্র রাষ্ট্রিক প্রভাবে প্রভাবিত। শোচনীয় বিষয় এই যে, বর্ত্তমানের এই সকল প্রভাব পাশ্চাত্যের দেশ ও জাতিসমূহের মধ্যে যেমন সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে ক্রিয়া করিতে পারে, ভারতে তেমন পারে না। ভারতের উহা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; আর ভারত এক্ষণে পতিত ও অবনত বলিয়া, উহার স্বাভাবিক ক্রিয়ার গতিরোধহেতু, সকল কাজেই বিকৃতি আইসে। এই বিকৃত জটিল অবস্থার মধ্যে ভারতবাসী পাশ্চাত্যের ভালমন্দ কিছুই আত্মস্থ করিয়া লইতে পারিতেছে না—বিকারের দুরবস্থা ভোগ করে মাত্র। শিক্ষা, সংস্কার, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আদর্শ—সমুদয় বিষয়েই ভারতবাসীর এ শোচনীয় অবস্থা। হিংসার হীন পাপটি কি ভাবে এদেশ বাসীর মধ্যে আসিয়া অধিকার করিয়া বসিতেছে, তাহা বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক ব্যাপারে একশ্রেণীর যুবকদিগের মধ্যে যে হীন ও কাপুরুষতাময় পূর্ণ হিংসার ভাব দেখা দিয়াছে তাহা হইতে স্পষ্ট লক্ষিত হয়। বাঙ্গলার সন্ত্রাস-বাদ ইহাদের সৃষ্ট বিষয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে যে সকল হীন হত্যা ইহাদিগের দ্বারা সঙ্ঘটিত হইল, এবং তজ্জন্য যে অর্থব্যয়, লোকের লাঞ্ছনা ও প্রচণ্ড নীতি সকল প্রচলন করিতে হইয়াছে, তাহা দেশবাসীর পক্ষে যেমন দুবিসহ, ইহাদিগের মনোবিকৃতিরও তেমনই পরিচালক। দমন নীতির ফলে এ পাপ দেশ হইতে বিদূরিত হইল এই ভাব যখন অনেকে পোষণ করিতেছিলেন, তখনই দার্জ্জিলিং শৈল-শিখরে লেবঙ্ খেলার মাঠে স্বয়ং গভর্ণরের জীবন-নাশের চেষ্টাতে এক নূতন চমক প্রদান করিয়াছে—রাষ্ট্রশক্তি এ সকল পাপ বিদূরিত করিবার চেষ্টাতে অবশ্যই কুণ্ঠিত হইবে না। কিন্তু নীতি যেখানে লাঞ্ছিত, সে স্থলে ইহার উচ্ছেদ সাধন সহজ বিষয় নহে।

মহাত্মার প্রাণনাশ-চেষ্টা—

এই মাসের ১০ই তারিখে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার হরিজন পরিভ্রমণ সফর ক্রমে পুনা সহরে গমন কালে তত্রত্য মিউনিসিপালিটি তাহাকে এক মানপত্র দানের আয়োজন করেন। সভা বসিবার প্রাক্কালে একখানি মোটর গাড়ীতে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। তৎক্ষণাৎ দেশ মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রাণ হানির জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী উক্ত মটর গাড়ীতে ছিলেন

না। তথাপি মহাত্মা যখন উক্ত সভার প্রধান ব্যক্তি, এবং অদ্যকার দেশনায়কগণের প্রধান ও উপস্থিত আন্দোলনের নেতা, তখন তাঁহার উপরে এই হিংসা—বর্ত্তমান কালের লোকের বিকৃত মনোভাবের পক্ষে অসম্ভব কিছু নহে। কিন্তু এইরূপ মনোবিকৃতি যে অধিকাংশ রাজনৈতিক—সামাজিক বা ধর্ম্মনৈতিক নহে, তাহা ঠিক। তবুও এক শ্রেণীর একদেশদর্শী সাংবাদিক এইরূপ প্রচার করিতেছেন যে "এই কার্য্য হরিজন আন্দোলন দমনপ্রয়াসী সনাতনীদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন।" আরও বলে, "ধর্ম্মের গোঁড়ামীর জন্য এই ভারতবর্ষের বুকে যত অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে এগুলি তাহাদেরই পর্য্যায়ভুক্ত। গোড়া মুসলমান ও সনাতনী হিন্দু উভয়ের মনোবৃত্তিতে একই বস্তু কাজ করিতেছে—তাহা স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা।" ইত্যাদি।

মহাত্মার প্রাণ নাশের চেষ্টা লইয়া সংবাদ পত্রের অনেক প্রচার কার্য্য চলিয়াছে। প্রোক্ত ঘটনার পরেই কামসেট ষ্টেশনের নিকট মহাত্মা যে ট্রেনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তাহাকে লাইনচ্যুত করিয়া মহাত্মার প্রাণহানির চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়াও প্রকাশ পায়; আধুনিক সাংবাদিক মনোবৃত্তিতে এই সকল ঘটনার রটনা খুব হয়। দেওঘরে মহাত্মার উপর লাঠি প্রহার হয়, এবং তাহাও মহাত্মার প্রাণহানির তৃতীয় চেষ্টা বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু মহাত্মা নিজেই সে লাঠির চার্জ্জ মিথ্যা কথা বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপ অলীক প্রচার দ্বারা সাংবাদিকের ভাবদৈন্য ও সঙ্গতির অভাব মাত্র প্রকাশ পায়। দেওঘরের কথা মহাত্মা নিজে অস্বীকার করিয়াছেন, রেল ট্রেণের বিপদের কথাও অতিরঞ্জিত—রেল কর্ত্তৃপক্ষ নিজেই সেই রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন, গান্ধী যাত্রার সহিত তাহার কোনও সম্পর্ক নাই। পুনার ঘটনা অনিশ্চিত, মহাত্মা সেই গাড়ীতেই ছিলেন না। ঘটনা ঠিক হইলেও সনাতনী দলের কেহ উহা করিয়াছে, তাহা বলা চলে না—সনাতনী দল অপেক্ষা শ্রমিক সমাজতন্ত্রী ও আধুনিক যুবসম্প্রদায়ের এক বিভাগ গান্ধীবিদ্বেষ অনেক বেশী দেখাইয়া থাকে। আর ইহাদের মনোভাব যেমন রাষ্ট্রিক বিষে বিদগ্ধ সনাতনীদিগের তেমন হইতেই পারে না। এরূপ হত্যা চেষ্টা বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক মনোবৃত্তির পরিণতি, প্রোক্ত সাংবাদিকের অসংগত উক্তি যেমন উহারই অন্যপ্রকারের অভিব্যক্তি।

পুরাতন স্মৃতি।—

চল্লিশ বৎসর পর ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্মৃতিবার্ষিকী সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে; আর সাতাইশ বর্ষ পরে হিতবাদীর পত্রিকার সম্পাদক ৺কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ মহাশয়ের স্মৃতি সভার অধিবেশন হইল। আজকাল স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান বহুতর হয়। কাহারও কাহারও জীবদ্দশায়ই "সম্বর্দ্ধনা" "জয়ন্তী" প্রভৃতি নামে বার্ষিক উৎসব হইয়া আসিতেছে। এই অবস্থাতে ভূদেব বাবু ও কাব্যবিশারদকে স্মৃতিপথে আনয়ন করা কেবলমাত্র সাময়িক উত্তেজনার ফল, একথা বলা চলে না; পরন্তু এ সকল আবেগ ও আড়ম্বর ভেদ করিয়া দেশের অন্তরাত্মা যে সত্যের সন্ধান চাহে—প্রকৃত গুণের সম্মান করিয়া কৃতার্থ হইতে চায়, এই সুদীর্ঘ কালের পরে ইঁহাদের স্মৃতিবাসরে তাহারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। চরিত্রের যাহা মহৎ—প্রকৃতিতে যাহা সৎ তাহা কালের কালিমা ভেদ করিয়াই আপন জ্যোতিঃ বিকীরণ করে। ভূদেব একালে আর্য্যসাধনার প্রতীক ছিলেন; উহা অবিনশ্বর; ভূদেবের স্মৃতিও তাহাই; কাজেই এই সুদীর্ঘকাল পরেও তাহা দেশবাসীর হৃদয়

অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কাব্যবিশারদের স্মৃতি-বার্ষিকীর নায়কত্ব করিবার জন্ম সুদূর দিনাজপুরবাসী ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আহ্বান করা হইয়াছিল; এ সভার এ আর এক বিশেষত্ব। ইহাতে প্রধানতঃ এই প্রতিপন্ন হয় যে কেবলমাত্র এত কাল পরে নহে, এত দূরের পর্য্যন্ত বঙ্গবাসী সুধীজনগণ কাব্যবিশারদকে এখনও ভুলিতে পারে নাই—কলিকাতার বর্ত্তমান অবস্থাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ন্যায় কোনও ব্যক্তিকে এইরূপ সভাপতিত্বের জন্ম পাওয়াও দুষ্কর। বঙ্গীয় সাংবাদিক মহলে কাব্য বিশারদ যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন—এই রাজনৈতিক যুগে বাঙ্গলা ভাষাকে রাজনৈতিক আকার দান তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি—অনেক রাজনৈতিক শব্দের বাঙ্গলা পরিভাষা তাঁহার রচনা। ইহা ছাড়া ব্যঙ্গকবিতা, চিন্তার গাম্ভীর্য্য ও ভাষার চারুবিন্যাসে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অদ্যকার বাঙ্গলা সাংবাদিকের ভাষায় ও ভাবে ঐরূপ কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পরলোকে শ্যামাদাস।—

প্রবীণ কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি আর ইহ সংসারে নাই! সত্তর বৎসর বয়সে ১৮ই আষাঢ় রাত্রিতে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এই কালে তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত এবং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক ভারতে আর কেহ আছেন কিনা সন্দেহ। সর্ব্বোপরি আয়ুর্ব্বেদকে তিনি যেই দৃষ্টিতে দেখিতেন, তাহা আজ কাল আরও দুর্লভ। পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিয়া বিশুদ্ধ মন লইয়া বিশুদ্ধ ভাবে আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চা বা ভারতীয় কোনও শাস্ত্রের চর্চ্চা করা অতিশয় কঠিন বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাচস্পতি মহাশয় তাহা করিয়াছিলেন, এবং তাহা করিয়া খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও অর্থলাভ হইতেও বঞ্চিত হন নাই। আশা করি তাঁহার এই দৃষ্টান্ত অদ্যকার অনেক উন্নতিশীল আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার্থীকে পাশ্চাত্যের মোহভ্রান্ত পথ হইতে রক্ষা করিবে। বহু জনহিতকর কার্য্য এবং ভারতের সাধনার অনুকূল ভাব ও প্রতিষ্ঠানের সহিত কবিরাজ মহাশয় সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা ও জনপ্রিয়তা অসাধারণ ছিল। বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত তিনি বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ নামক জাতীয় আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয় এখনও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আশা করি এ বিদ্যাপীঠের কার্য্যভার যাহাদের উপরে অর্পিত হইল তাহারা কবিরাজ মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি বলিয়া ইহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবেন।

স্বামী লালনাথ।—

স্বামী লালনাথের নাম আজ ভারতের সর্ব্বত্র পরিজ্ঞাত। মহাত্মা গান্ধীর সাহচর্য্য করিতে গিয়া মিত্রভাবে অনেক অজ্ঞাত লোক—স্ত্রী এবং পুরুষ—খ্যাতি লাভ করিয়া লোক চক্ষে বড় হইয়াছেন এবং দেশ মধ্যে তাহাদিগের প্রতিষ্ঠা প্রচারিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে গুণী জ্ঞানী অবস্থা বা পদবীতে বড় এবং বয়সে প্রবীণ ছিলেন; নিজ নিজ গুণেই ইঁহারা খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা পাইবার যোগ্য; গান্ধীআন্দোলন ইহাদের একটা কর্ম্মক্ষেত্র ও সুযোগ দান করিয়াছে মাত্র। কিন্তু স্বামী লালনাথ এরূপ কিছুই নহেন। ইনি একজন নবীন সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে যুবদলভুক্ত। ইহাদের নিজ সম্প্রদায়ে প্রভাব ও প্রতিপত্তি কম। কিন্তু রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যাপারে যেমন এক্ষণে সর্ব্বত্র যুবজাগরণ দেখা দিয়াছে, সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে সেইরূপ

যুবশক্তির বিকাশ সর্ব্বদাই আছে। এই যুবকেরাই ব্রহ্মচারীরূপে সাধু বা সন্ন্যাসীদিগের আখড়া আশ্রমাদি পরিচালনার যাবতীয় কার্য্য সমাধা করে। কুম্ভমেলার সময়ে সন্ন্যাসী জীবনের নানা দিক দেখিবার যে সুযোগ ঘটে, নবীন সন্ন্যাসীদিগের যুবোচিত উল্লাস তাহার অন্যতম। প্রবীণ সাধু ও পরমহংসেরা যখন আপন আপন মণ্ডলে ধীর ও স্থির ভাবে আসন করিয়া উপদেশাদি করেন, তখন এই যুব সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন স্থানে নানা ভাবে কুস্তী, ডন, কসরতাদি করিয়া থাকে। আর স্নানযাত্রার সময়ে ইহাদের যে উল্লাস তাহা জগতের কোনও যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে হইতে পারে না। এই যাত্রাকে ইহাদের কাছে কোনও যুদ্ধযাত্রা বা সামরিক অভিযান বলিয়া ধরা যাইতে পারে—অনেক বারে এমন হইয়াছে যে বিভিন্ন দলের সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে স্নান লইয়া বিষম মারামারি হইয়াছে, বহু সন্ন্যাসী তাহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই সকল সংগ্রামে ইহারা প্রকৃত ফৌজের কাজ করিয়াছে, এবং এখনও সেইরূপ করিতে পারে বলিয়া প্রস্তুত থাকে। সরকার বাহাদুরের ব্যবস্থাতে এক্ষণে ঐরূপ কোন গোলযোগ হয় না বলিলেও চলে। তথাপি সরকার ইহাদের ভয়ে ভয়ে চলেন।

লালনাথ এইরূপ কোনও সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় হইতে খ্যাতিলাভ করিয়া উঠেন নাই—তাহার খ্যাতি অদ্যকার জগতে প্রধান খ্যাতনামা পুরুষ মহাত্মা গান্ধীর বিরোধে। মহাত্মার সমুদয় আন্দোলন এক্ষণে হরিজন বা অস্পৃশ্যদিগের উন্নয়নে পর্য্যবসিত। এজন্য তিনি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন। মহাত্মার পক্ষে যুব আন্দোলনকারীর অভাব নাই। যুবদল দলে দলে শোভা যাত্রা করে, সত্যাগ্রহ করে, এবং প্রয়োজন হইলে অহিংসা ত্যাগ করিয়া হিংসার ভাবও দেখায়। স্বামী লালনাথ এরূপ একটী বিরুদ্ধ যুবমণ্ডলীর নেতা হইয়া প্রতিক্রিয়ারূপে মহাত্মার সফরে বাধা দান বা মহাত্মার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বেড়াইতেছেন। উত্তর ভারতে প্রায় সর্ব্বত্র যেখানে যেখানে মহাত্মা আপন কার্য্যাবলিকানুসারে যাইতেছেন, সেখানেই স্বামী লালনাথ তাঁহার দলের লোক এবং স্থানীয় যুবমণ্ডলী হইতে দল গড়িয়া মহাত্মার কার্য্য ও চলাচলাদিতে বাধা দান করিয়া থাকে। এ বিষয় স্বামী লালনাথ সনাতন ধর্ম্মের পক্ষপাতী—অস্পৃশ্য উদ্ধার ও সর্ব্ব-সাধারণের হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ লাভ লইয়া, মহাত্মার সহিত তাঁহার বিবাদ। কাশী, পুরী, কানপুর, দেওঘর, আজমীর প্রভৃতি স্থানে যখনই মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত হইয়াছেন, স্বামী লালনাথ ও তাঁহার দলের লোক তখন কৃষ্ণপতাকা লইয়া বিরুদ্ধ আন্দোলন করিয়াছেন। একদিকে কংগ্রেস ও হরিজন দল ও অন্যদিকে লালনাথ ও তাঁহার দলভুক্ত হিন্দু যুবদের সঙ্গে সংঘর্ষও উপস্থিত হইয়াছে। দেওঘর, কাশী ও আজমীরে এই সংঘর্ষ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছিল। দেওঘরে মহাত্মার উপরেও লাঠির আঘাত হইয়াছিল বলিয়া সংবাদ রটে, কিন্তু মহাত্মা নিজেই তাহা অস্বীকার করেন। আজমীর মহাত্মা গান্ধীর সম্মুখেই লালনাথজী গুরুতর রূপে আহত হন ও তাহার মস্তক হইতে রক্ত নিঃসৃত হয়, মহাত্মা এইজন্য পুনঃ সাতদিনের অনশনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আধুনিক আন্দোলনকারী সমাজহিতৈষিদিগের কার্য্যে কিরূপ বিপরীত ফল ফলিতেছে, এ তার আর এক দৃষ্টান্ত।

পাশ্চাত্যের পরিস্থিতি।—

জার্ম্ম্যানিতে নাজিদলের অভ্যুত্থান পাশ্চাত্যে এক নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সূচনা

করিয়াছে। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের পর ভার্সিলীসের সন্ধিপত্র দ্বারা জারম্যান জাতি যে হতমানের মর্ম্মবেদনা বোধ করিয়া আসিতেছে, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্যই জারম্যানির জাতীয় চেতনা নাজি নামে প্রকাশ পাইয়াছে এবং হার হিটলারের ন্যায় কঠোরমনা নায়ককে কর্ণধার করিয়া উহা এই নূতন জাতীয় অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। জারম্যানী সর্ব্বোপরি পাশ্চাত্য সমাজে সামরিক সমকক্ষতা (সামরিক দ্বন্দ্বই পাশ্চাত্যের প্রধান সামাজিক সম্বন্ধ !) চাহে। প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীর ইহা সহ্য হইবার নহে। ফলে ইউরোপে পুনঃ শীঘ্র এক সমর বাধিবে অনেকেই এই আশঙ্কা করিতেছে। যুদ্ধ করে এই আকাঙ্ক্ষা হয়ত অনেকেরই নাই, শক্তির অভাবের ভয় অনেকে করে। কিন্তু গত্যন্তর নাই—মুসোলিনীর ন্যায় রাষ্ট্র-নীতিজ্ঞের এইরূপ মনোভাব। আর প্রত্যেকেরই ভিতরে ভিতরে সমরায়োজন যে যথাসাধ্য চলিতেছে, তাহাও ঠিক। প্রতি রাষ্ট্রই নিজ নিজ শক্তি সঞ্চয়ে ব্যস্ত। ইহার মধ্যেই নাজি জারম্যানিতে অন্তর্বিপ্লবের এক বিষম তরঙ্গ উঠিয়াছে। ভূতপূর্ব্ব চেনসেলার জেনারেল ভন সীচারকে সস্ত্রীক গুলি করিয়া মারা হইয়াছে, দুই শত নাজির আপন লোক, ষ্টর্ম্ম ট্রপ-নেতা ধৃত, ইহাদেরও প্রাণবধের কথা। দশ জন দলনায়ক সরাসরি সামরিক বিচারে অর্দ্ধঘণ্টা সময় মধ্যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, প্রধান সেনাপতি আরনষ্ট রো-য়েন কার্য্য হইতে বহিস্কৃত ও কারাবদ্ধ হইয়াছেন; স্বয়ং ভন পেপেনও সন্দেহে ধৃত হইয়াছিলেন, এক্ষণে মুক্ত হইয়া হিটলারের অধীনে ভাইসচেনসেলারের কার্য্য করিতেছেন—ভূতপূর্ব্ব কাইজারের পুত্রগণকে সন্দেহের চক্ষে দেখা হইতেছে এইরূপ ভাবে হিটলার কেন হঠাৎ তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু ও সহকর্ম্মীদিগের উপরে নিরূপ হইয়া এরূপ কঠোর নীতি অবলম্বন করিলেন তাহা অনেকেরই বিস্ময়ের কারণ হইয়াছে। অবশ্যই কোনও অন্তর্বিপ্লবের সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছিল। জারম্যান রাষ্ট্র হিটলারের নেতৃত্বে যে স্বেচ্ছাচারের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই—ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে যে ঘোর সন্ত্রাসের উদ্রেক হইয়াছিল অদ্যকার জারম্যানী তাহারই পুনঃ অভিনয় করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় ফরাসী বিপ্লবের সময় ইউরোপীয় রাষ্ট্রমণ্ডলে যে চঞ্চলতা দেখা দিয়াছিল, আজ জারম্যানীর এই নৃশংস ব্যাপারে তাহার লেশ মাত্র দেখা যাইতেছে না—অদ্যকার ইউরোপ অবশ্যই সভ্যতার ক্রমবিকাশে ফরাসীবিপ্লবের ইউরোপ হইতে অনেকখানি অগ্রগামী হইয়া আসিয়াছে—ন্যায়ান্যায় বিচারশূন্যতা ও পাপ ও উৎপীড়নে সহনশীলতাই কি এই সভ্যতার লক্ষণ ?

সমর-দেবতা—

ইউরোপের রাষ্ট্রমণ্ডলে সময় সময় এক এক জন সমরদেবতার আবির্ভাব হয়, আলেকজেণ্ডার হইতে শেষ কাইজার পর্য্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস এই সমরদেবতাদিগেরই কীর্ত্তিকাহিনীতে পরিপূর্ণ। ভবিষ্যতে কে আর একজন সমরদেবতার আবির্ভাব হইবে তাহা লইয়া কল্পনা জল্পনা চলিতে পারে—উপস্থিত মুসোলিনী ও হিটলারের প্রতিই লোকের নজর পড়িবার কথা। সেদিন মুসোলিনী বলিয়াছেন—"শান্তি কি সমর ইহাই প্রশ্ন—চিরন্তন শান্তিতে আমার বিশ্বাস নাই। অধিকন্তু আমি মনে করি শান্তিতে মানব প্রকৃতির অবনতি ঘটে, মহান ভাব সকল বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা কেবল শোণিতলালসা ও শোণিতপাতেই উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে।" হায়! মানবধর্ম্মের কি অপকৃষ্ট মহিমাই পাশ্চাত্য সভ্যতায় স্থান পাইয়াছে। মানবতা ও বর্ব্বরতায় যে পার্থক্য নাই, এই মহান সত্যই ইহারা প্রতিপন্ন করিয়া যাইবে। এজন্য দ্বিতীয় আর একটা মহাসমরের আবশ্যকতা আছে বটে।

মুসোলিনী কিন্তু ইহাকে ভাবে মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন, এবং কার্য্যতঃ এখনও আর কিছু কালের জন্য শান্তি চাহেন। হিটলার এ বিষয়ে মুসোলিনীকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন—নিজ দেশ ও আপন জনের মধ্যেই রক্তবন্যা ছুটাইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণবীজ রক্তপিপাসায় সিদ্ধিলাভ করিয়া লইতেছেন।

যোগলাভের পথ—জ্ঞানপথ ও যোগপথ।

স্বামী জ্ঞানানন্দ

পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলা হইয়াছে, আনন্দ-স্বরূপ আত্মার প্রকাশদ্বারা নিত্য পরম সুখ লাভ করার জন্যই যোগের (চিত্তবৃত্তিরোধ বা চিত্তনাশের) প্রয়োজন। এখন দেখা যাউক চিত্তনাশ কিরূপে সাধন করিতে হয়। পূর্ব্বেই শাস্ত্র বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে "দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগোজ্ঞানং মুনীশ্বর" (চিত্তনাশের দুইটী ক্রম আছে, যোগ আর জ্ঞান)।

নির্ব্বিকার পরম চিৎস্বরূপ (পরমাত্মা)ই, স্বেচ্ছায় নিজ মায়াতে অধিষ্ঠিত হইয়া সবিকার জীব-চিৎ (জীবাত্মা) রূপে প্রকাশিত হন। 'চিৎ'এর (আত্মার) এই সবিকার জীবভাবই চিত্তত্ব বা চিত্তবৃত্তি। ইহাই আত্মার বন্ধনের কারণ। এই চিত্তত্বের নিরোধ (বা চিত্তনাশ) হইলেই নির্ব্বিকার আত্মা স্ব-রূপে বিরাজ করেন; ইহাই মোক্ষ। যোগশিখা উপনিষদে আছে, মহেশ্বর ব্রহ্মাকে বলিতেছেন; মোক্ষলাভ করিতে হইলে যোগ আর জ্ঞান উভয়ই চাই; কেবল একটী দ্বারা তাহা হইবে না।—

> "জ্ঞানং কেচিদ্ বদন্ত্যত্র কেবলং তন্নসিদ্ধয়ে।
> যোগহীনং কথং জ্ঞানং মোক্ষদো ভবতীহ ভো॥
> যোগঽপি জ্ঞানহীনস্তু ন ক্ষমো মোক্ষ কর্ম্মণি।
> তস্মাজ্ জ্ঞানং চ যোগঞ্চ মুমুক্ষু র্দৃঢ়ম্ অভ্যসেৎ॥"*

অর্থ।—কেহ কেহ জ্ঞানকেই মোক্ষের কারণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু শুধু জ্ঞান মোক্ষদানে সমর্থ নহে। এই মর্ত্ত্যলোকে [সকলেই স্থুলদেহধারী, সুতরাং দেহের জড়ত্ব ও ব্যাধিক্লেশাদি দোষে আবদ্ধ; যোগভিন্ন এই সব শারীর বন্ধন হইতে মুক্তির অন্য উপায় নাই, অতএব] যোগ-বিহীন জ্ঞান কিরূপে মোক্ষদান করিবে? [আবার বিচার-বিবেক সাহায্যে আত্মজ্ঞানের অনুশীলন ব্যতীত স্ব-রূপোপলব্ধি অসম্ভব বলিয়া পূর্ণ মোক্ষলাভ হইতে পারে না, এই হেতুতে] জ্ঞানবিহীন যোগও মোক্ষসাধনে সমর্থ নহে। অতএব মোক্ষাভিলাষী সাধক জ্ঞান ও যোগ উভয়ই দৃঢ়ভাবে অভ্যাস করিবেন।

এখানে দেখা গেল যে, নিঃশ্রেয়স লাভ করিবার দুইটী উপায়—যোগ আর জ্ঞান। এই দুইটী আবার পরস্পর সাপেক্ষ—একটীকে ছাড়িয়া অপরটীর মুক্তি দিবার ক্ষমতা নাই। তবে, যাঁহার মন সেই নিত্যানন্দধাম লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে তিনি, যে পন্থাই অবলম্বন করুন না কেন, বাঞ্ছিত ফল লাভ করিবেনই; কারণ ফলদাতা যিনি তিনি যে বাঞ্ছা কল্পতরু। তিনি ত অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বসাক্ষী, মনের ভিতর বসিয়া মন দেখেন; তিনি যে 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন,' তোমার অকপট ভাব জন্মিলেই তাহা তাঁহার গ্রাহ্য হইবে। এমন কি, তুমি যদি প্রমাদবশতঃ ভ্রান্ত পথেও চল, তিনি তোমার অকপট ভাব দেখিয়া, তোমার যে পথে চলা আবশ্যক সেই পথেই পরিচালিত করিবেন,—আবশ্যক হইলে তোমার গতির মুখও ফিরাইয়া দিবেন; কেবল চাই তোমার অকপট বাঞ্ছা—খাটি ব্যাকুলতা। তাঁহাকেই একান্তভাবে আশ্রয় করিলে আর ভয় কি? তাঁহারই ত অভয়বাণী—

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মাম্ একং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥"
[শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা]।

অর্থ।—সকল ধর্ম্ম (ঐহিক ও পারত্রিক বা মর্ত্ত্য ও স্বর্গীয় ভোগসাধন বিবিধ কাম্য ধর্ম্ম) পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও। [তাহা হইলে আমিই তোমাকে [ভ্রমপ্রমাদাদি-জনিত] সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।

তবে আর ভয় কি ? ভগবানের প্রতি অকপটে এইরূপ নির্ভরতা স্থাপন করিতে পারিলে কোন চিন্তা নহে, ইহা অপেক্ষা বড় ধর্ম্মও নাই। তুমি যদি অকপট মুমুক্ষু হও, তবে যোগপন্থা অবলম্বন করিলে সেই যোগাভ্যাসই কালে তোমাকে জ্ঞানবিচারে প্রবর্ত্তিত করিবে, আর জ্ঞানপন্থা-নুসরণ করিলে তাহাই কালে তোমাকে যোগসাধনে প্রবর্ত্তিত করিবে।

এখন দেখা যা'ক এই পন্থা দুইটার অর্থ কি ? ইহাদের মধ্যে প্রভেদই বা কি ? মুক্তিকোপনিষদে আছে—

"চিত্তং সংজায়তে জন্ম-জরা-মরণ-কারণম্।
বাসনাবশতঃ প্রাণস্পন্দ স্তেন চ বাসনা।
ক্রিয়তে চিত্তবৃক্ষস্য তেন বীজাঙ্কুরক্রমঃ ॥"

অর্থ।—চিত্তই [জীবের] জন্ম, জরা ও মৃত্যুরূপ দুঃখের কারণ হয়। [প্রাক্তন] বাসনাবশতঃ প্রাণশক্তি চঞ্চল হইয়া উঠে এবং তাহাতেই আবার [নূতন নূতন] বাসনার উদয় হইয়া থাকে। এইরূপে, বাসনা ও প্রাণস্পন্দন এই দুইটী চিত্তরূপ বৃক্ষের বীজও অঙ্কুরবৎ হইয়া থাকে (যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর হয় এবং অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ ও ফলোৎপত্তিপূর্ব্বক আবার নূতন নূতন বীজের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ প্রাক্তন বাসনারূপ বীজ হইতে প্রাণসম্পন্দরূপ অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক চিত্তরূপ বৃক্ষ ও তাহার বৃত্তিরূপ শাখাপ্রশাখা ফুলফলের উৎপত্তি পূর্ব্বক আবার নূতন বাসনাবীজের উদ্ভব হইয়া থাকে)।

যেমন বীজ বিনষ্ট হইলে অঙ্কুরোদ্গম অসম্ভব হয় এবং অঙ্কুরের অভাব হইলে বৃক্ষ ও নূতন বীজের উৎপত্তি অসম্ভব হয়, সেইরূপ বাসনার বিনাশে প্রাণচাঞ্চল্যের উৎপত্তি অসম্ভব এবং প্রাণচাঞ্চল্যের অভাবে নূতন বাসনার উৎপত্তি অসম্ভব হয়; সুতরাং উহাদের একটীর বিনাশেই উভয়ের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। মুক্তিকোপনিষদে উপরি উক্ত শ্লোকের পরেই আছে—

"দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য প্রাণস্পন্দন বাসনে ॥"
একস্মিংশ্চ তয়োঃক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নশ্যতঃ ॥"

অর্থ।—চিত্তবৃক্ষের দুইটী বীজ— প্রাণস্পন্দন ও বাসনা (প্রাণস্পন্দন ও বাসনা এই দুইটাই বিবিধ বৃত্ত্যাত্মক চিত্তের উৎপত্তিকারণ) এতদুভয়ের একটীর ক্ষয় হইলেই সত্বর উভয়েই বিনষ্ট হয়।

যোগকুণ্ডলী উপনিষদে আছে—

"হেতুর্দ্বয়ংহি চিত্তস্য বাসনা চ সমীরণম্।
তয়োর্বিনষ্ট একস্মিংস্তদ্দ্বাবপি বিনশ্যতঃ ॥"

অর্থ।—চিত্তের দুইটী হেতু আছে, বাসনা ও সমীরণ (প্রাণবায়ু—চঞ্চল প্রাণপ্রবাহ) এতদুভয় মধ্যে একটী বিনষ্ট হইলেই, দুইটীরই বিনাশ হয়।

এই সকল শাস্ত্রবচনে দেখা যায় যে, বাসনা ও প্রাণপ্রবাহ এই দুইটীর একটীকে রোধ করিতে পারিলেই উভয়ের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আর কারণের বিনাশে কার্য্যের নাশ অপরিহার্য্য, সুতরাং উহাদের একটীকে নাশ করিতে পারিলেই চিত্তের নাশ নিশ্চিত। অতএব বাসনানাশের চেষ্টা আর প্রাণপ্রবাহরোধের চেষ্টা এই দুইটিই চিত্তনাশের উপায় বা পথ। সাধকের পক্ষে তাঁহার প্রত্যক্ষানুভূতিই এতদ্বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই পথদ্বয়ের মধ্যে, সাধনারম্ভে কেহ বা একতরটী, কেহ বা অন্যতরটী অবলম্বন করেন। প্রাণজয় (বা প্রাণপ্রবাহরোধ) দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন বশীভূত হইয়া থাকে, আর জ্ঞানবিচারদ্বারা নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক লাভপূর্ব্বক অনিত্য বিষয়বাসনার ক্ষয়-সাধনের চেষ্টা করা হয়। এই দুইটী পথের মধ্যে **প্রাণপ্রবাহরোধের পথকেই যোগপথ** বলা হয়। অন্যপন্থাবলম্বিগণ অগ্রে প্রাণবায়ুরোধের চেষ্টা না করিয়া, কেবল জ্ঞান-বিচারদ্বারা বিষয়বাসনা ক্ষয়ের চেষ্টা করেন। চিত্তনাশের উদ্দেশ্যে এই **বাসনাক্ষয়ের পথকেই জ্ঞানপথ** বলা যায়।

সেই বাঞ্ছিতকে পাইতে হইলে চিত্তনাশই প্রয়োজনীয়। এই চিত্তনাশের জন্যই কেহ বা জ্ঞানপন্থা, কেহ বা যোগপন্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু এতদুভয়ের সহযোগ না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্তনাশ অসম্ভব, আর চিত্তনাশ না হইলেও মোক্ষলাভ সুদূরপরাহত হয়। তাই—

"যোগেন রহিতং জ্ঞানং ন মোক্ষায় ভবেদ্ বিধে।
"জ্ঞানেনৈব বিনা যোগো ন সিধ্যতি কদাচন ॥"
[যোগশিখোপনিষৎ]।

অর্থ।—[শিব ব্রহ্মাকে বলিতেছেন]—হে বিধে! যোগরহিত জ্ঞান মোক্ষদানে সমর্থ নহে, আবার জ্ঞান ব্যতীত যোগ [সাধন করিলেও তাহা] কখনও সিদ্ধ হয় না।

তবে এই পথদ্বয়ের মধ্যে উভয়ই যুগপৎ অনুসরণীয় নহে; উহারা বস্তুতঃ কিন্তু পরস্পর স্বতন্ত্র দুইটী পথই নহে, একই পথের পূর্ব্বাপর ক্রমানুযায়ী অংশ মাত্র। পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে—"**দ্বৌক্রমৌ** চিত্তনাশস্য **যোগোজ্ঞানং** মুনীশ্বর।" এখন এই পূর্ব্বাপর ক্রমের বিচার করা যা'ক।

সাধনপথে যাঁহারা চলেন তাঁহারা দেখিতে পান যে, সুদীর্ঘকাল জ্ঞানবিচার দ্বারা তত্ত্বলব্ধ তত্ত্বসমূহ অনুশীলন বা অভ্যাস করিতে থাকিলেও, দেহ-প্রাণ-মন অবশীভূত থাকায়, বাসনারাশির ক্ষয়সাধনের চেষ্টা সুদূরপরাহত হইয়া থাকে, বরং অনেক সময়ে বিপরীত ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে—জ্ঞানবিচারদ্বারা নিজের কোন সংস্কারের অশুভতা স্থির করিয়া তদ্বিরুদ্ধ সংস্কার উৎপাদনের চেষ্টা করিলে (উহাকে দমন করিব, উহাকে দমন করিব, এইরূপ পুনঃ পুনঃ ভাবনাদ্বারা ঐ অশুভ সংস্কারটী নাশ করিতে চেষ্টা করিলে) সেই অশুভ সংস্কার ও তজ্জনিত বাসনাটীই আরও প্রবল হইয়া উঠে; কারণ "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে, সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ" [গীতা]—বিষয়সমূহের চিন্তা করিতে করিতেই তৎপ্রতি আসক্তি জন্মে (অর্থাৎ সেই চিন্তায় লাগিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়) এবং সেই আসক্তি হইতেই কাম (সেই বিষয় ভোগের বাসনা) জন্মে।

সংস্কারসমূহ বিষয়সম্বন্ধী, সুতরাং কোন সংস্কারের সপক্ষে কি বিপক্ষে ভাবনা করিতে গেলেই তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ের ভাবনা করিতে হয়। তাহাতে যে ভোগবাসনা প্রবল হইয়া উঠে তাহাকে সফলতা দান করিবার জন্য তখন প্রাণও চঞ্চল হইয়া উঠে। কিন্তু জ্ঞানপন্থী প্রাণস্রোতকে ধরিবার কৌশল না পাওয়ায় তখন আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। যাঁহারা কেবল বিচার ও তদনুযায়ী অভ্যাস দ্বারা কাম ক্রোধ-লোভাদি দমন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই এ বিষয়ে ভুক্তভোগী ও অভিজ্ঞ। শত্রুনিপাত করিতে হইলে শত্রুর সমীপবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করা আবশ্যক বটে, কিন্তু শত্রু যদি তোমার অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ ও প্রবলতর অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন হয়, তবে যত অধিক বার তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে ততই ক্রমে তোমার অধিকতর বলক্ষয় হইতে থাকিবে এবং পরিশেষে তোমারই বিনাশ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিবে। তবে শ্রীরামচন্দ্রের মত অনুসন্ধান পূর্ব্বক শত্রুর মৃত্যুবাণটী হস্তগত করিতে পারিলে আর ভয় নাই। প্রাণই এই চিত্ত-রাবণের মৃত্যু-বাণ। হে জয়াভিলাষি! এই মৃত্যুবাণটী হস্তগত কর, রাবণ বধে আর বিলম্ব হইবে না। এই চিত্তাসুরও বাস্তবিক দশানন—দর্শনস্পৃহা, শ্রবণস্পৃহা, কর্ম্মস্পৃহা, গমনস্পৃহা প্রভৃতি দশেন্দ্রিয়জাত দশটী ভোগস্পৃহাই উহার দশটী মুখ। তুমি একটী একটী করিয়া উহার মুণ্ডপাত করিতে চাহিয়াছিলে, পারিলে না। পারিবে কেন? উহার প্রতি যে ব্রহ্মার বর (বিধাতার বিধান) আছে, উহার মৃত্যুবাণ হস্তগত করিতে না পারিলে কেহ উহাকে বধ করিতে পারিবে না। তাই বলি, সেই মৃত্যুবাণটী হস্তগত করিতে চেষ্টা কর; তাহাই **যোগপথ।** অগ্রে যোগাভ্যাসদ্বারা প্রাণকে আয়ত্ত করিয়া লইতে না পারিলে, শুধু জ্ঞান বিচার দ্বারা চিত্তনাশ করা অসম্ভব হয়।

যোগপথের অগ্রগণ্যতা।

উপরে জ্ঞানপথ ও যোগপথের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া, এখন তদুভয় মধ্যে কোন্‌টী অগ্রগণ্য তাহার বিচার করা যাইতেছে। যদিও জ্ঞান ও যোগ উভয়ের পরস্পর সাপেক্ষতা আছে, তথাপি পথ হিসাবে যোগপথকেই অগ্রগণ্য বলা যায়। যোগশিখোপনিষদেই আছে—

"জন্মান্তরৈশ্চ বহুভি র্যোগো জ্ঞানেন লভ্যতে।
জ্ঞানন্তু জন্মনৈকেন যোগাদ্ এব প্রজায়তে॥
তস্মাদ্ যোগাৎ পরতরো নাস্তি মার্গস্তু মোক্ষদঃ॥"

অর্থ—[যোগ ছাড়িয়া কেবল] জ্ঞানপন্থানুসরণ করিলে বহু জন্মান্তর পরে যোগপথ লাভ হইবে, কিন্তু [অগ্রে] যোগপথ অবলম্বন করিলে তাহা হইতে এক জন্মেই জ্ঞানপথ লাভ হইবে [এতদুভয় মিলিত হইয়া সাধককে মোক্ষাভিমুখে অগ্রসর করিবে], অতএব যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মোক্ষদায়ক পথ আর নাই।

যোগকুণ্ডল্যুপনিষৎ বলিয়াছেন—

"তয়োরাদৌ সমীরস্য জয়ং কুর্য্যান্নরঃ সদা।"

অর্থ—[বাসনা ও প্রাণবায়ু] এতদুভয় মধ্যে অগ্রে প্রাণবায়ুকে জয় করিবে। অগ্রে প্রাণজয়ের সাধনাই চিত্তবৃত্তিনিরোধের নিশ্চিত পথ। যোগশিখোপনিষৎ বলিতেছেন—

"চিত্তং প্রাণেন সম্বদ্ধং সর্ব্বজীবেষু সংস্থিতম্।
রজ্জ্বা যদ্বৎ সুসংবদ্ধঃ পক্ষী তদ্ব ইদং মনঃ।

তস্মাৎ তস্য জয়োপায়ঃ প্রাণ এব হি নান্যথা ॥”

অর্থ—সকল জীবের ভিতরে চিত্ত প্রাণদ্বারা সংবদ্ধ আছে। পক্ষী যেমন রজ্জুদ্বারা সুসংবদ্ধ থাকে, এই মনও সেইরূপ প্রাণদ্বারা সুসংবদ্ধ আছে। নানাবিধ জ্ঞানবিচার দ্বারাও এই মনকে বাধ্য করা যায় না। অতএব [রজ্জু ধরিয়া আকর্ষণ করিলেই যেমন রজ্জুবদ্ধ পক্ষীকে হস্তগত করা যায়, সেইরূপ] প্রাণ জয় করাই মনকে আয়ত্ত করার একমাত্র উপায়, ইহাতে দ্বিধা নাই।

রোগ, শোক, উৎসব, আমোদপ্রমোদ হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি নানাবিধ আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ ও সুখ জীবের দেহ ও মনকে সর্ব্বদা ব্যথিত ও মথিত ও উত্তেজিত করিয়া থাকে। এগুলি সাধনপথের বিষম বিঘ্ন। এই সকল বিঘ্ন নিরাকৃত করিতে হইলে শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ মানাপমানাদি দ্বন্দ্বে সহিষ্ণু হইতে হইবে, যেন এগুলিতে উদ্বেগ বা চিত্তচাঞ্চল্য জন্মাইতে না পারে। কিন্তু যোগ ভিন্ন কেবল জ্ঞানদ্বারা এই দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা লাভ করা অসম্ভব। যোগশিখোপনিষদে দেখ,—

“জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তোঽপি ধর্ম্মজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিনা দেহেঽপি যোগেন ন মোক্ষং লভতে বিধে ॥
অপক্কাঃ পরিপক্কাশ্চ দেহিনো দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
অপক্কা যোগহীনাস্তু পক্কা যোগেন দেহিনঃ ॥
সর্ব্বো যোগাগ্নিনা দেহো হ্যজড়ঃ শোকবর্জ্জিতঃ।
জড়স্তু পার্থিবো জ্ঞেয়ো হ্যপক্কো দুঃখদো ভবেৎ ॥
ধ্যানস্থোঽসৌ তথাপ্যেবম্ ইন্দ্রিয়ৈর্বিবশো ভবেৎ।
তানি গাঢ়ং নিয়ম্যাপি তথাপ্যন্যৈঃ প্রবাধ্যতে ॥
শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদ্যৈ র্ব্যাধিভি র্মানসৈস্তথা।
অন্যৈর্নানাবিধৈ র্জীবৈঃ শস্ত্রাগ্নি-জলমারুতৈঃ ॥
শরীরং পীড্যতে তৈস্তৈ শ্চিত্তং সংক্ষুভ্যতে ততঃ।
তথা প্রাণবিপত্তৌ তু ক্ষোভম্ আয়াতি মারুতঃ।
ততো দুঃখশতৈ ব্যাপ্তং চিত্তং ক্ষুব্ধং ভবেন্নৃণাম্ ॥”

অর্থ।—জ্ঞানবিচারনিষ্ঠ ব্যক্তি, সংসারবিরক্ত এবং ধর্ম্মজ্ঞ হইলেও, [বলপূর্ব্বক বাহ্যতঃ] ইন্দ্রিয়জয়ী হইলেও, এই [জড়াত্মক] দেহে সম্বন্ধ থাকায়] যোগ ভিন্ন মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। দুই প্রকার দেহাধিকারী আছে—কাচা আর পাকা ; যোগহীন হইলেই সে কাচা দেহাধিকারী, আর যোগদ্বারাই পাকা দেহী হয়। [এই শরীর-মনোরূপী স্থূল-সূক্ষ্ম] সর্ব্বদেহ যোগাগ্নি দ্বারা পক্ক হইয়াই জড়তা ও শোকাদি দোষ রহিত হয় ; আর পার্থিব (ক্ষিত্যংশপ্রধান -

* বিজিতেন্দ্রিয়ঃ—ইন্দ্রিয়দমনকারী (দমঃসম্পন্নঃ ন তু শমঃসম্পন্নঃ—শমরহিত-দমঃসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ)—বিচারপূর্ব্বক ঐন্দ্রিয় সুখের অসারতা ও অনিষ্টকারিতা দর্শনে বলপূর্ব্বক বাহেন্দ্রিয় সমূহের দমনকারী। জড়ঃ—জাড্যদোষযুক্তঃ (আলস্য-নিরুদ্যম-রোগসঙ্কুলঃ)। গাঢ়ং—গাঢ়রূপেন, বলপ্রয়োগেন। প্রাণবিপত্তৌ—প্রাণবিপত্তিহেতোঃ—দেহমধ্যে প্রাণের বিপত্তি অর্থাৎ স্বাভাবিক গতির ব্যতিক্রম উপস্থিত হওয়ায়।

মলাদিবহুল) জাড্যদোষযুক্ত, [সুতরাং] অপক্ক দেহই দুঃখপ্রদ বলিয়া জানিবে। সে (অপক্কদেহী) ধ্যানস্থ হইলেও ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বশীকৃত হইয়া থাকে (ইন্দ্রিয়ের ভোগানুকূল বিষয়সমূহ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেই তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও বাসনাসক্ত হইয়া থাকে)। যদি [জ্ঞান দ্বারা] ইন্দ্রিয় সমূহকে বলপ্রয়োগপূর্ব্বক নিয়মিত করিয়াও রাখা যায়, তথাপি সে অন্যান্য উৎপাত দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়—শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বসমূহ, [সর্পমশকপিপীলিকাদি] প্রাণিবর্গ, অস্ত্রাঘাত, অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি [-জনিত উপদ্রব] এবং এইরূপ অন্যান্য নানাবিধ উৎপাত দ্বারা তাহার শরীর পীড়াপ্রাপ্ত, সুতরাং মনও সংক্ষুভিত হয়। এইরূপে দেহমধ্যে প্রাণের স্বাভাবিক গতির ব্যতিক্রম হওয়ায় প্রাণবায়ু চঞ্চল হয়, তাহাতে চিত্তও শত শত দুঃখরাশি দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া উঠে।

যোগ ভিন্ন কেবল জ্ঞানচর্চ্চাদ্বারা এই দশাই হয়। অস্থিমজ্জাবসারক্তাদিঘটিত এই যে সাঙ্গোপাঙ্গ শরীর, ইহাই জীবের স্থূল দেহ; আর ইন্দ্রিয় ও প্রাণবৃত্তি এবং অন্তঃকরণ সমূহদ্বারা সূক্ষ্মদেহ গঠিত। এতদ্ব্যতীত অজ্ঞানোপাদনগঠিত কারণ দেহ আছে। এই ত্রিবিধ দেহ আছে বলিয়াই জীবকে দেহী (অর্থাৎ দেহাধিকারী) বলা হয়। যোগদ্বারা এই ত্রিবিধ দেহই বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয়। যোগপন্থীর ভিতরে যে অন্তর্মুখীন প্রাণক্রিয়ার আরম্ভ হয়, তাহাই এই দেহমনরূপী স্থূলসূক্ষ্ম শরীরের মলসমূহকে ক্রমে ক্রমে বহিস্কৃত করিয়া তাহার শরীরশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি জন্মায়। যোগদ্বারা ক্রমে ক্রমে যোগিদেহের পার্থিব অংশ হ্রাস পাইতে ও তৈজসাদি অংশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং ক্রমে সত্বশুদ্ধি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপে পার্থিব জড়ত্বাদি দোষ হইতে মুক্ত হওয়ায় তৈজস অণিমাদি শক্তি সাধকের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া থাকে, এবং তমোগুণ হ্রাস ও সত্বগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁহার ইচ্ছা বা সংকল্পশক্তিও ক্রমে অবাধ হইয়া উঠে, আর তাঁহার দেহ জাড্যরহিত ও চিত্ত শোক-মোহাদিবর্জ্জিত হয়। এই অবস্থা সাধনগম্য। সৌভাগ্যবশতঃ সদ্গুরু লাভ হইলে ও তদীয় উপদেশ অনুসারে সাধন করিতে থাকিলে, ক্রমে সাধকের এই অবস্থা আসিয়া থাকে; সাধারণ (সাধনভজনরহিত) মানবের পক্ষে ইহা অসম্ভব। সদ্গুরুর আশ্রয় লইয়া তাঁহার উপদেশ অনুসারে সাধনভজন করিতে থাক, এসকলই স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে থাকিবে।

জ্ঞান বা আত্মানাত্মবিচারকে পরিপক্ক করিবার জন্য যে সাধন বা ক্রিয়া অবলম্বন করা যায় তাহাই যোগপথ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে প্রথমে 'সাংখ্যবুদ্ধি' (আত্মানাত্ম-বিচারবুদ্ধি—theory or philosophy of Atma and Anatma) কহিয়া, পরে ঐ বুদ্ধিকে কার্য্যতঃ অভ্যাস করিবার সাধনরূপ 'যোগবুদ্ধি' (art or practice of bringing the theory into effect) কহিতে আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন।

"এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।

বুদ্ধ্যাযুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥"

অর্থ।—হে পার্থ! এই তোমাকে সাংখ্যবিষয়ে (আত্মানাত্মতত্ত্ব বিষয়ে) বুদ্ধি বলা হইল, এখন যোগবিষয়ে (সাধন বিষয়ে) বুদ্ধি কহিতেছি, শ্রবণ কর; এই (যোগ-) বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে তুমি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।

এই 'যোগবুদ্ধি'ই প্রাণচাঞ্চল্য রোধ করবার (চঞ্চল প্রাণকে শান্ত করার) পথ। আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে অগ্রে এই পথেই চলিতে হইবে—এইটীই অগ্রগণ্য পথ।

পরবর্ত্তী প্রবন্ধে ইহা বিশদরূপে দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

মেঘদূত—পরা-বিরহ-গীতি।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ

আষাঢ়ের প্রথম দিবস। মেঘ-মেদুর অম্বরে নব মেঘের কলাপলীলা দেখিয়া বিরহী-জনচিত্ত উথলিয়া উঠে। তাই কি প্রথম আষাঢ়েই মেঘদূত রচনার পরিকল্পনা? কবে কোন্ দিন উজ্জয়িনীর কোন্ পর্ণ কুটীরের প্রাঙ্গনদেশে বসিয়া মহাকবি কালিদাস "কশ্চিৎ কান্তাবিরহ-গুরুণা" বলিয়া মন্দাক্রান্তা ছন্দে তাঁহার অমর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, আমরা আজও তাহা ভুলিতে পারি নাই। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে মেঘাক্লিষ্ট নভোমণ্ডল দেখিলে সেই মহাকবির সুরে আমাদেরও হৃদয়তন্ত্রী প্রতিরণিত হইয়া উঠে, কেন?

মেঘদূত বিরহের গান। বিশ্ব-মানবের অন্তঃকরণে যে শাশ্বত বিরহের তন্ত্রী অহরহঃ বাজিতেছে, তাহারই অনুকূল ভাবোদ্দীপক বলিয়া কি মেঘদূতকাব্য আমাদের ভাল লাগে, না, ইহার শব্দঝঙ্কার, উপমা, অনুপ্রাস, মন্দাক্রান্তা-ছন্দের ছন্দলীলা—ইহাই আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া প্রাণকে মাতাইয়া তোলে? কে জানে মেঘদূত কেন এমন সুধাস্রাবী? কে জানে, আষাঢ়ের প্রথম দিন আসিলে মেঘাড়ম্বরের ডমরু ধ্বনির সহিত আমাদেরও প্রাণ দুরু দুরু গুড়ু গুড়ু করিয়া উঠে কেন?

বিরহী কিন্তু কে? কান্তা-বিরহ কাহার ঘটিয়াছে? রামগিরি আশ্রমে নির্ব্বাসিত যক্ষের, না ভারতবর্ষের এই পুণ্যভূমিতে অবস্থিত আমাদের? বিরহ হয় ত যক্ষেরও হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের মত এমন গুরু-বিরহ বোধ হয় কাহারো হয় নাই, হইতে পারে না।

আমাদের বিরহ কি? কান্তাবিচ্ছেদে আমরা প্রপীড়িত নহি। ইহা মিথুন-রাগের বিরহবিলন, সুখদুঃখের বিদ্যুৎ-বিলসন নহে। এ বিরহ বিরাট, বিপুল। এ বিরহ বৃহৎ। আমার মনে হয় যে ভূমার অভাব-জনিত এই বিরহ-দুঃখ।

মহাকবি কালিদাস কল্পনার কল্প-লোক সৃষ্টি করিয়া মেঘদূতের মত অনুপম রস-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বিরহী যক্ষকে কাঁদাইয়াছেন। উত্তর-মেঘ ও পূর্ব্ব-মেঘের মুখে বার্ত্তা বহন করাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের ত কিছুই কল্পনা ব'লে মনে হয় না; সবই সত্য, প্রকট সত্য, এই ভাব লইয়া মেঘদূত পাঠ করিলে মেঘদূত বেদান্তে পরিণত হয়। এই সকল জাগ্রৎ সত্য আজ আমাদের কাছে কল্পনার অপেক্ষাও অলীক। আজ ভারতের কঙ্কাল আছে, দেহ নাই; স্মৃতি-মাত্র আছে, সে ধৃতি ও মনীষা নাই। প্রাণমাত্র নাই, আছে কেবল প্রাণের অস্ফুট বিঘোষণা।

কেহ কেহ যক্ষকে শ্রীরামচন্দ্র কল্পনা করেন এবং উত্তর-মেঘ ও পূর্ব্ব-মেঘকে হনুমান্ কল্পনা করিয়া থাকেন। রামচন্দ্রের বিরহ ও হনুমানের দৌত্য অনেকটা যক্ষের বিরহ ও উত্তর-মেঘের এবং পূর্ব্ব-মেঘের দৌত্যের মত হইলেও পার্থিব। আমার মনে হয়, মহাকবির মহতী কল্পনা-সম্ভূত এই বিরহ বেদান্তের বিরহ, আর উত্তরমেঘ ও পূর্ব্বমেঘের দৌত্য উত্তর-মীমাংসা ও পূর্ব্ব-মীমাংসার দৌত্য।

অপরা বিরহ।

কালিদাস ও মেঘদূত বলিলে যে বৃহৎ ভারতবর্ষের ধ্যান-মূর্ত্তি চিত্তযবনিকায় উদ্ভাসিত হইয়া

উঠে, তাহাতে দেখিতে পাই আসমুদ্রক্ষিতীশ মহারাজ বিক্রমাদিত্য রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট। আর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নব-রত্ন—কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবি, বররুচি, বরাহমিহির প্রভৃতি দিক্‌পাল জ্যোতির্ব্বিদ্, ঘটকর্পূর, ক্ষপণক, অমরসিংহ প্রভৃতি মহা মনীষী ও যমদমী ধন্বন্তরি, বসিয়া আছেন।

আজ তাহা কল্পনা! আজ তাহা ইতিহাসের ইতিবৃত্ত! কিন্তু এক দিন গিয়াছে, রেবার তটোপান্তে আসীন পণ্ডিতমণ্ডলী কত কাব্য, কত জ্যোতিষশাস্ত্র, কত দর্শন-শাস্ত্র আলোচনা করিতেন, দিঙ্‌নাগাচার্য্য কাব্যকল্পনার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করিতেন। বণিক্-রাজ বসুভূতি, বিশ্বসেন ঐশ্বর্য্যের আলিম্পন আঁকিতেন। কত কবি কত ভাষায় স্রগ্ধরা মালিনী উপেন্দ্রবজ্রা ইত্যাদি ছন্দে কত যৌবনগীতি গাহিতেন। মর্ত্ত্যে যেন একটী স্বর্গের আবির্ভাব। ভারতবর্ষ বিক্রম ও বৈভবে আদিত্য এবং সুখ ও সৌভাগ্যে আদিত্য ছিল।

সেই দিন আমাদের গিয়াছে! শুধু গিয়াছে নহে, স্মৃতির যবনিকা হইতে তাহার শেষ পদাঙ্ক পর্য্যন্ত মুছিয়া যাইতেছে! কালিদাসের স্থলে আসিয়াছে হুইট্‌ম্যান্, ভবভূতির পুরোভাগে বসিয়াছে মেটর্‌লিঙ্ক, দিঙ্‌নাগাচার্য্য এখন শ্বেতদ্বীপের বার্ণার্ড্ শ। স্রগ্ধিণী, মালিনী, মন্দাক্রান্তা এখন মন্দীভূতঝঙ্কারে বিলীয়মান। উত্তর-মেঘ ও পূর্ব্ব-মেঘ মহান্ পুষ্করমেঘ সমুদ্ভূত অভিজাত পাত্র, তাহারও প্রয়োজনীয়তার অসদ্ভাব। দৌত্যই যদি পাঠাইতে হয়, তবে টাগোর্ আর চাটার।

কিসের জন্য দূত? কাহার উদ্দেশে দূত? বিরহের আর অবকাশ নাই যে! এখন মিলনের নাম সফরী-লীলা। উহা ক্ষণিক উপভোগ। উহা গত রজনীর বিশুষ্ক পুষ্প-মালিকা। প্রভাতের আবির্ভাবে পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা। নিশীথের সুখস্বপ্নের অবসানে উষার জাগরণ ক্ষণে যে বিদায়ের বাঁশী বাজিয়া উঠে, তাহাতে বিরহের অবকাশ নাই। আর মেঘদূত-রচনা হইবে না। আর কালিদাসকে পাইয়াও বর্ত্তমান যুগ ধন্য হইবে না। আষাঢ়ের মেঘে বজ্র খেলিয়া যাইবে। কোথায় কালিদাস? কোথায়ই বা মেঘদূত? বিরহী যক্ষের বেদনা, তাহার অন্তরের বেদনার নিগূঢ়তা, বারিশূন্য মেঘের মত, অনন্ত শূন্যে এখন হাহাকার করিয়া বেড়াইবে। ইহা অধম যুগ; যে অধমতার কথা কালিদাস তাঁহার যক্ষমুখে এইরূপে গাইয়াছেন:—"যাঞ্চা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা"। এ যুগে প্রণয় নাই, তাই প্রণয়ের অভাব-জনিত বিরহও নাই। ইহা অশুচি কাম-লীলার যুগ। একটা অধম মনোবৃত্তি এ যুগের সর্ব্বস্ব মহান্‌কে গ্রাস করিয়া মানব অন্তঃকরণের সুমহান্‌বৃত্তি ও প্রবৃত্তিকে পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিতেছে। এ যুগে মানব মানবীর জন্য, মানবী মানবের জন্য আদৌ আকুলিত নহে। বর্ত্তমানে শরীর বুভুক্ষার তাণ্ডব-লীলা।

সে কথা যাউক্। আমরা বিরহী। আমাদের বিরহ-বেদনা আষাঢ়ের ধারা-সম্পাতের মত অবিশ্রান্ত। এ বিরহের অবসান আর হইবে কি না কে জানে? কে আমাদের অন্তরের বেদনা বহিয়া লইয়া সেই সর্ব্বসন্তাপহারীর শ্রীচরণে পৌঁছাইয়া দিবে? বিক্রমাদিত্য নাই, তাঁহার নবরত্ন সভাও নাই, আর তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মহাকবি কালিদাসও নাই। আমাদের এই মহান্ বিরহ আষাঢ়ের ধারা-বর্ষণের সহিত অবিরল ক্রন্দনেই বোধ হয় নিঃশেষিত হইবে।

ঈশ্বরকৃপা হি কেবলম্।

অমৃত বচন

অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি, ই, ইঞ্জিনিয়রিং কলেজ, দয়ালবাগ

(২৩) মস্তিষ্ক ও তাহার ক্রিয়া

মনুষ্য শরীরে মস্তিষ্কই সর্ব্বাপেক্ষা অসাধারণ যন্ত্র। ইহার বিবিধ অংশে যে কি কি ক্রিয়া হয় তাহা আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। অবশ্য এরূপ কোন কোন অংশ জানা গিয়াছে ও অঙ্কিত হইয়াছে যাহা দেহের নিম্নাঙ্গ সকল চালিত করিয়া থাকে। পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন যে মস্তিষ্কের এক অংশ বাক্য বা শব্দ উচ্চারণ করিবার কেন্দ্রস্থল (Brochu's Centre of Speech) অন্য এক অংশ মনুষ্যের গমনাগমন নিয়মিত করে ইত্যাদি ইত্যাদি; কিন্তু মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিষয়ে আমাদের যে জ্ঞান আছে তাহা অতি সামান্য; এই অত্যাশ্চার্য্য যন্ত্রের নিয়মিত ক্রিয়ার তুলনায় সেই অল্প পরিমিত জ্ঞান অতি তুচ্ছ বলিতে হইবে। আমাদের বাক্য সমর্থনের জন্য একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—মনে কর কোন ব্যক্তি ট্রান্সভাবাপন্ন হইয়াছে, অথবা ক্লোরোফর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান হইয়াছে। সে অবস্থায় মস্তিষ্কের ভিতর যে ধূসর ও শুক্লবর্ণ পদার্থ (grey and white matter) আছে এবং যাহা হইতে শরীরের অন্যান্য নিম্নতর স্নায়ুকেন্দ্রসমূহ (অর্থাৎ ছয় চক্র) উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা স্থূল শরীরের ন্যায় শিথিল ও নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। ট্রান্স অবস্থায় মনুষ্যের বিবেচনা শক্তি বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং ক্লোরোফর্ম দ্বারা অভিভূতাবস্থায়ও মনুষ্য সমভাবে জীবিত থাকে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে জীবাত্মার স্থান মস্তিষ্কের কোন উপদানে নাই এবং ইহার কেন্দ্র মস্তিষ্কের স্থূল পদার্থের অতীত কোন ঘাটে (plane এ) আছে। এই দৃষ্টান্ত হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ঘাট (plane)ও মস্তিষ্কের পদার্থে নাই, তাহা অন্য কোন ঘাটে (planeএ) আছে। নিম্নশ্রেণীর জীব জন্তুতে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়া মনুষ্যাপেক্ষা অনেক কম এবং কোন কোন জীবে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাদের শারীরিক ক্রিয়া মস্তিষ্কের উপর মোটেই নির্ভর করে না অর্থাৎ মস্তিষ্কের অধীন নহে। আমরা যদি আরও নিম্নতর শ্রেণীর জীব লক্ষ্য করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে তাহাদের ভিতর মস্তিষ্কের কোন চিহ্নও নাই, অথচ শরীরপোষণাদি জীবনের ক্রিয়া সমূহ সম্পাদিত হইতেছে। উদ্ভিদ-জগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্নায়ু এবং চক্রাদি কিছুই নাই, তথাপি ইহার পোষণ ও বর্দ্ধন যথা নিয়মে হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে স্নায়ুমণ্ডল ও তাহাদের কেন্দ্রসমূহ (অর্থাৎ চক্রসমূহ) এবং মস্তিষ্ক (যাহাকে স্নায়ুমণ্ডলের শক্তির ভাণ্ডার বলা যায়) এই তিনটির এই শরীরের পালন ও পোষণক্রিয়া ব্যতীত আরও বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্রিয়া আছে। এই প্রয়োজনীয় ক্রিয়া বলায় চৈতন্য ক্রিয়া বুঝিতে হইবে। এই ক্রিয়া প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত:—

(১) অনুভূতি ও (২) ইচ্ছা।

অনুভূতি ও ইচ্ছার ক্ষমতা সততই যে মস্তিষ্ক বা স্নায়ুর উপর নির্ভর করে তাহা নহে। প্রেত বা স্থূল দেহহীন জীবের দ্বারায় এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হয় (১০ম প্রকরণ দ্রষ্টব্য)

তাহারা স্নায়ুমণ্ডল ও মস্তিষ্ক ব্যতীত অনুভব ও ইচ্ছা করিয়া থাকে। ট্র্যান্স অবস্থায় মনুষ্যের শরীরের স্নায়ুসমূহের এবং মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তথাপি দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে জাগ্রতাবস্থাপেক্ষাও এ অবস্থায় মনুষ্যের মানসিক শক্তি বিশেষরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহা আমরা উপরে যাহা বলিয়াছি তাহাই সমর্থন করে। এই সকল অসাধারণ ক্ষমতা দ্বারা ইহাই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে মনুষ্য শরীরে অনেক অন্তর্নিহিত শক্তি আছে যাহা সাধনা দ্বারা জাগরিত হইতে পারে। এই সকল অন্তর্নিহিত শক্তি উপদেবতা এবং উচ্চতর দেবতার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মনোগত ভাব জানা এবং অগম্য স্থান হইতে প্রার্থিত বস্তু আনয়ন করার ক্ষমতার বিষয় অনেকেই জানেন; ইহাতে আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা যে যথার্থ তাহা আরও প্রমাণিত হইতেছে। এই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে মানুষের মানসিক নিয়মিত ক্রিয়ার দৌড় আমরা যত অল্প মনে করি তত অল্প নহে পরন্তু তাহা বহুদূরব্যাপী এবং গভীর। এই সকল দৃষ্টান্ত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে বা মানব দেহের (microcosm বা ব্যষ্টির) রহস্য জানিবার পক্ষে কিরূপ সাহায্য করে তাহা আমরা সম্প্রতি বর্ণনা করিব।

মনুষ্য শরীর ও স্নায়ু সমূহের ক্রিয়াশক্তি এই তিন ভাগে বিভক্ত:—

(১) জীবনদায়িনী শক্তি (২) জীবন রক্ষা কারিণী শক্তি (৩) প্রতিস্পন্দন বা প্রতিক্রিয়া করিবার শক্তি। এই বিভাগে মনুষ্য জীবনে সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কথা নিহিত আছে। এই সকল ক্রিয়ার যে ঘাট (plane) আছে তাহার অভ্যন্তরে মনুষ্যের স্নায়ুমণ্ডল-স্থিত নিতান্ত সূক্ষ্ম ঘাট বিদ্যমান আছে। মস্তিষ্ক ও ষটচক্রের এবং প্রত্যেক চক্রের অন্তরতম অংশের সহিত বিশ্বের (macrocosmএর) তদনুরূপ সূক্ষ্ম ঘাটের সংযোগ আছে। যখন এই বিশ্বের সূক্ষ্ম ঘাট সমূহের উপর মনুষ্যদেহের চক্রের ভিতর দিয়া কার্য্য হয় তখনই বিশ্বের (macrocosm) ও পিণ্ডের (microcosm) চক্রের পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং তথাকার অর্থাৎ বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার শক্তি মনুষ্য দেহে সঞ্চারিত হয়। এই মস্তিষ্কের (যাহা হইতে সমুদয় নিম্নতর স্নায়ুকেন্দ্র উৎপন্ন হইয়াছে) সূক্ষ্ম ঘাট সমূহ দৃশ্যমান জগতের অন্তর্গত নহে, পরন্তু ব্রহ্মাণ্ডে এবং নির্ম্মল চৈতন্য দেশে অবস্থিত। মস্তিষ্কে এই সকল চক্রের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ জাগরিত করিলে, ব্রহ্ম এবং পরম পুরুষের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা যাইতে পারে। এই জন্য মনুষ্য শরীরে মস্তিষ্কের এত মহিমা।

এই সকল সূক্ষ্ম এবং উচ্চঘাট মস্তিষ্কের কোন স্থানে সংযুক্ত আছে তাহা এখন আমরা বর্ণনা করিব।

(২৪) মস্তিষ্ক এবং তাহার দ্বার সমূহ

মনুষ্যের মস্তিষ্কের মধ্যবর্ত্তী যে ফাট আছে তাহাতে বারটি ছিদ্র বা দ্বার আছে, তন্মধ্যে ছয়টি দ্বারের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের ছয় চক্রের সম্বন্ধ আছে এবং অবশিষ্ট ছয়টি দ্বারের সহিত নির্ম্মল চৈতন্য দেশের ছয় ধামের সম্বন্ধ আছে। ব্রহ্মাণ্ডের সহিত যে দ্বারগুলির সম্বন্ধ আছে সে গুলির ধূসর বর্ণের (grey matter) বস্তুতে অবস্থিত এবং নির্ম্মল চৈতন্য দেশের সহিত যে গুলির সম্বন্ধ আছে সে গুলি শ্বেত (white matter) বস্তুতে অবস্থিত। মস্তিষ্কের এই ধূসর বা শ্বেত বস্তুর কোনও মহিমা নাই পরন্তু তন্মধ্যস্থিত অন্তরতম চক্র যদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ও নির্ম্মল চৈতন্যদেশের সহিত

সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহারই মহিমা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং আমরা যে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহাতে এইগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিম্নলিখিত স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের বক্তব্য বিষয় স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে। একটি অন্ধকার ঘরের প্রাচীরে একটি ছিদ্র আছে, তাহার ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি ঘরের ভিতর আসিতেছে। প্রাচীর যে উপাদানে নির্ম্মিত ঐ ছিদ্র সে উপাদানে নির্ম্মিত নহে কিন্তু উহা সেই প্রাচীরে আছে মাত্র। এই গৃহস্থের কোন ব্যক্তি যদি ঐ কিরণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হন তাহা হইলে তাঁহাকে ঐ ছিদ্রের কাছে যাইতে হইবে। এবং তিনি যদি এতদূর সূক্ষ্ম হইতে পারেন যে সেই রশ্মি অবলম্বনে বাহিরে যাইতে পারেন তাহা হইলেও তাঁহাকে সেই ছিদ্রের কাছে উপস্থিত হইতে হইবে। এইরূপে যদি কেহ ব্রহ্মাণ্ড ও নির্ম্মল চৈতন্য দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে মস্তিষ্কের অন্তর্নিহিত যে সকল গুপ্তদ্বার আছে তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে।

উপরে আমরা যাহা বর্ণনা করিলাম তাহা অনেকটা আপ্তবচনের প্রমাণ স্বরূপ বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু সাধক সাধনা দ্বারা সেই সকল চক্র জাগরিত করিলে স্বয়ংই সমস্ত ব্যাপার দেখিতে পাইবেন।

(২৫) সাধনার দ্বারা জীবনী শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে

এই কথা বলা আবশ্যক যে সাধনা দ্বারা নির্ম্মল চৈতন্য দেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে তদ্দ্বারা জীবনীশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং সাধকের অন্তরে নির্ম্মল চৈতন্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। তাঁহার স্থূল দেহ এই চৈতন্যের বর্দ্ধনে উপকৃত হন এবং যখন তিনি অভ্যাসের সময় ট্রান্স বা সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হন তখন সেই চৈতন্যের আভাসই মনুষ্য শরীরের ক্রিয়া সম্পাদনে যথেষ্ট। আমরা যাহা বলিতেছি তাহা সূর্য্যের আভাস ও জ্যোতির দৃষ্টান্তে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে পারে। কোন স্থানে যদি সূর্য্যের কিরণ না আসে কিন্তু তাহার আভাস বা প্রতিবিম্বিত জ্যোতি থাকে তাহা হইলে সেই স্থান উজ্জ্বলরূপ প্রকাশিত হয়, এমন কি মনুষ্যসৃষ্ট অনেক দীপদ্বারাও আমরা সেই স্থান সেইরূপ আলোকিত করিতে পারি না। সেইরূপ অভ্যাসীর সুরতের আভাস, সাধারণ মনুষ্যের সুরতের দ্বার অপেক্ষা অধিকতর বলবান ও চৈতন্য শক্তিসম্পন্ন, যদ্দ্বারা সাধক তাঁহার অন্তরে এবং বাহিরে যাহা ঘটিয়া থাকে তৎ সমস্তই জানিতে পারেন। এমন কি মৃত্যুর সময়ও তাঁহার এই চৈতন্য শক্তি অক্ষুন্ন থাকে। মৃত্যুর সময় ও তাহার পরে সাধকের স্থূল দেহের সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ থাকে যেরূপ ভূত বা প্রেতের কোন অবশিষ্ট শরীরের সহিত থাকে।

কবীরের দোঁহা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পাঁচো নৌবতি বাজতী, হোত ছতীসো রাগ ।
সো মংদির খালী পড়া, বৈঠন লাগে কাগ ॥ ২০ ॥

পাঁচটী নবৎ বাজত যাতে, ছত্রিশ রাগ ধরত তান ।
শূন্য পড়ে সে দেউল আজ, কাকের তথা অধিষ্ঠান ॥ ২০ ॥

ঢোল দমামা গড়গড়ী, সহনাঈ অরু ভেরি ।
অবসর চলে বজাইকে, হৈ কোই লাবৈ ফেরি ॥ ২১ ॥

ঢোল দামামা নাগরা সানাই, ভেরী তুরী আদি ক'রে ।
বাজিয়ে সুযোগ যাচ্ছে চ'লে কেউ থাক'ত ফেরাও তারে ॥ ২১ ॥

এক দিন ঐসা হোয়গা, সব সে পড়ৈ বিছোহ ।
রাজা রাণা ছত্রপতি, ক্যোঁ নহিঁ সাবধ হোহি ॥ ২২ ॥

একদিন হবে এমনতর সকলেরে ছাড়তে হবে ।
রাজা রাণা ছত্রপতি, হুঁস কর না কেন তবে ॥ ২২ ॥

উজড় খেড়ে ঠীকরী, গড়ি গড়ি গয়ে কুম্হার ।
রাবণ সরীখা চলি গয়া, লংকা কা সরদার ॥ ২৩ ॥

গ্রাম সমভূম খোলাম টিপি, গড়ত যে ভাঁড় কুমোর গেছে ।
রাবণ হেন লঙ্কাপতি, সেও ত এখন চ'লে গেছে ॥ ২৩ ॥

ঊচা মহল চুনাবতে, করতে হোড়ম হোড় ।
সুবরন কালী ঢলাবতে, গয়ে পলক মেঁ ছোড় ॥ ২৪ ॥

উঁচু মহল তুলত' যারা, কতই বাজি নেছে জীতে ।
সোণার কলি টু লয়ে দিত, চ'লে গেছে এক পলেতে ॥ ২৪ ॥

কহা চুনাবৈ মেড়িয়াঁ, লম্বা ভীতি উসারি ।
ঘর তো সাঢ়েতীন হথ, ঘনা তো পৌনে চার ॥ ২৫ ॥

লম্বা ভিতের দালান দিয়ে কি ইমারৎ ফাঁদবে আর ।
ঘরত মোটে সাড়ে তিন হাত, বড় জোর নয় পৌণে চার ॥ ২৫ ॥

পাঁচতত্ত্ব কা পূতলা, মানুষ ধরিয়া নাম ।
দিনা চার কে কারণে, ফিরি ফিরি রোকৈ ঠাম ॥ ২৬ ॥

পাঁচ তত্বের ক্রীড়ার পুতুল, ধ'রেছে সে মানুষ নাম ।
মাত্র দুচার দিনের তরে, জোড়া করে বাসস্থান ॥ ২৬ ॥

কবীর গর্ব ন কীজিয়ে, দেঁহী দেখি সুরংগ ।
বিছুরে পৈ মেলা নহাঁ, জ্যোঁ কেচুলী ভুজংগ ॥ ২৭ ॥

কবীর গর্ব্ব ক'রো না'ক, দেখে মানব মানস-হারা ।
গেলে কায়া পায় না আবার, সাপের যেমন খোলস ছাড়া ॥ ২৭ ॥

শিবপ্রসাদ ।

যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ

(৪)

(স্বামী বিশুদ্ধানন্দ)

উষস্ত নীরব হ'লে হবে কি? কুরুপাঞ্চাল দেশের সব বড় বড় বিদ্বান্ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ জনক রাজার সেই সভায় নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছেন। তাঁরা কি সহজে পরাজয় স্বীকার করতে চান? স্বর্ণমণ্ডিত-শৃঙ্গ সহস্র গাভীর লোভ ব্রাহ্মণেরা ত্যাগ ক'রলেও ক'রতে পারেন, কিন্তু যশ? পাণ্ডিত্যাভিমান্? লোকৈষণা? এসব ত্যাগ করা একটু কঠিন। আর জনক রাজাই বা ছাড়বেন কেন? তাঁর মন এখন ছুটেছে সত্যের সন্ধানে—বেদপ্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞানের দিকে। বেদের লক্ষ্য কি, মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি এবং কি প্রকারেই বা সেই লক্ষ্যে পৌছান যায়, এই সব বিষয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মীমাংসিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাজা জনক কিছুতেই সভা ভঙ্গ ক'রবেন না। বর্ত্তমান রাজাদের মত ত আর তখনকার রাজারা ছিলেন না, এবং তখনকার সভ্যতাও কিছু বর্ত্তমান সভ্যতার মত ছিল না। তখনকার সমাজ, তখনকার রাষ্ট্র এবং সেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি যে রাজা সেই রাজারও উদ্দেশ্য ছিল আত্মজ্ঞান। তখনকার সভ্যতার মাপকাটী ছিল **জ্ঞান**, আর এখনকার সভ্যতার মাপকাটী হ'চ্চে **অর্থ, টাকা**। তখনকার সভ্যতা মানুষকে ভোগের ভিতর দিয়া পৌছে দিত ত্যাগে, আর এখনকার সভ্যতা মানুষকে নিয়ে যাচ্চে একটা ভোগ থেকে আর একটা ভোগে। বাসনার একটা আবর্ত্ত থেকে আর একটা আবর্ত্তে মানুষকে চুবিয়ে, চুবিয়ে নিয়ে গিয়ে তার হৃদয়ে জাগিয়ে দিচ্চে শুধু ভোগের তীব্র লালসা আর অতৃপ্ত হৃদয়ের করুণ আর্ত্তনাদ ও অশান্তি। তখনকার সমাজে কি একেবারেই অশান্তি ছিল না? আর তখন কি সকলেই ত্যাগী পুরুষ হ'য়ে জটাবল্কল ধারণ ক'রে গৌরীশৃঙ্গে গিয়ে দেবদারুতলায় চোখ বুজে ব'সে থাকত? তা থাকত না। এক একটা সময়ে, এক একটা ভাবের প্রাধান্য থাকে। তখন ছিল আত্মজ্ঞানের প্রাধান্য। ক্ষাত্র-শক্তি, বৈশ্যশক্তি, শূদ্রশক্তি তখন নিয়ন্ত্রিত হ'ত পরার্থপর ত্যাগী আত্মজ্ঞানী পুরুষ দ্বারা। রাজা জনক, তাই, জানতে চেয়েচেন তাঁর সময়ে শ্রেষ্ঠ আত্মজ্ঞানী পুরুষকে এবং সেই জন্য কুরুপাঞ্চাল দেশের সব বিদ্বান্, বেদজ্ঞ জ্ঞানীপুরুষগণকে ডেকে এক সভা করেছেন। উদ্দেশ্য সেই সভায় কে যে শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ, জ্ঞানী তাই স্থির হ'বে এবং তাহলে তিনি সেই আত্মজ্ঞ, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের নিকট আত্মজ্ঞানসম্বন্ধে উপদেশ লাভ ক'রতে পারেন। যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট হ'তে তিনি আত্মজ্ঞান লাভ ক'রতে ইচ্ছুক, তাঁর জন্য তিনি দক্ষিণারও ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজার দক্ষিণা, সে খুব বড় রকমেরই ছিল। সবৎসা সহস্র গাভী, আবার সেই গাভীগুলির শিং সোনা দিয়ে মোড়া। কিন্তু যখন রাজা জনক, সেই সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে সম্বোধন করে, ব'ললেন "আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, তিনি ঐ সহস্র গাভী গ্রহণ করুন", তখন সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে নীরব দেখে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর শিষ্যকে সেই গাভীগুলিকে নিয়ে তাঁর বাটীতে যেতে আদেশ দিলেন। এই আদেশ দিয়েই যাজ্ঞবল্ক্য প'ড়লেন মুস্কিলে। বোলতার চাকে ঘা দিলে, বোল্‌তারা যেমন সেই

আঘাতকারীকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করে, সেইরূপ সেই সভার ব্রাহ্মণগণ চারিদিক থেকে রা, রা ক'রে যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করে অতিষ্ঠ করে তু'লতে লাগলেন। প্রথমে এলেন রাজা জনকের সভাপণ্ডিত অশ্বল, তারপর আর্ত্তভাগ, আর্ত্তভাগের পর ভুজ্যু, ভুজ্যুর পর উষস্ত। যাজ্ঞবল্ক্য একে, একে, সকলকেই পরাজিত ক'রে ভা'বলেন আর বুঝি কেউ তাঁর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হবেন না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য ভাবলে হ'বে কি; তিনি যে বোলতার চাকে ঘা দিয়েছেন। উষস্তকে ম্লানমুখ আসনে ব'সতে দেখে, হাস্যমুখে, গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কুশীতকের পুত্র কহোল। যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন করে কহোল, ব'লতে লাগলেন "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য তুমি উষস্তকে ত যা, তা, ক'রে বুঝিয়ে দিলে, কিন্তু মনে রেখ, কুরুপাঞ্চাল দেশের এই সব ব্রাহ্মণগণ এখনও জীবিত আছেন। আর এই কহোল এখনও মরে নি। উষস্ত তোমাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন আমিও তোমাকে সেই প্রশ্নই ক'রচি, আমিও বলচি, যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যা সকলের অভ্যন্তরস্থ আত্মা, সেই আত্মতত্ত্ব আমার নিকট ব্যাখ্যা কর"।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "কহোল উষস্তের প্রশ্নের উত্তরে এই আত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা ত আমি করেছি। আমার কথায় তুমি তখন মন দাওনি। তোমার মন বোধ হয় তখন সহস্র গাভীতে পূর্ণ ছিল। যাহোক, উষস্তকেও আমি যা বলেছি তোমাকেও সেই কথা বলচি, এবার মনোযোগ দিয়ে শোন। তুমি যে আত্মা সম্বন্ধে জানতে চাচ্চ, সেই সর্ব্বান্তর আত্মা, সেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, তোমারই এই আত্মা।"

যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে কহোল হো, হো করে হেসে ব'লে উঠলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, আমাকে কি তুমি উষস্ত পেয়েছ? আমার আত্মা কেমন করে সকলের অভ্যন্তরস্থ হবে, আর কেমন করেই বা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ হবে। সেই কথাটা এই সভার সামনে বিশদ করে বল, ওরূপ হেঁয়ালিতে উত্তর দিও না যাজ্ঞবল্ক্য, সব সময় এটা বেশ ক'রে মনে রাখবে যে তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশী হেঁয়ালী জানি।" কহোলের কথায় যাজ্ঞবল্ক্য একটু হেসে ব'ললেন, "কোহল, আমার কথায় ত বিন্দুমাত্র হেঁয়ালী নেই। তোমার আত্মাই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, তোমার আত্মাই সর্ব্বান্তর। দেখ কহোল, তুমি যে এই হাত নাড়'চ, কথা বলচ, গমনাগমন ক'রচ এই যে সব কাজ হ'চ্চে, এ কি তোমার এই স্থূল দেহটা ক'রচে? স্থূল দেহটাই যদি কাজ ক'রত, তাহলে মরা মানুষের দেহও গমনাগমন, আদান প্রদান ক'রতে পা'রত। মৃতদেহও কথা বলতে পার'ত, কিন্তু তা ত হয় না, কহোল। তুমি তাহলে দেখতে পাচ্চ, যে এমন একটা কিছু আছে, যেটা এই স্থূল দেহকে চালাচ্চে। হাতকে, পাকে, বাক্‌কে, পায়ু ও উপস্থকে, তাদের নিজের নিজের কাজে নিযুক্ত করচে। আরও দেখ কহোল, আমরা সকলেই প্রতিদিন তিনটে অবস্থা অনুভব করে থাকি। এই তিনটে অবস্থা হ'চ্চে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। যখন আমরা জেগে থাকি, আমাদের এই জাগ্রৎ অবস্থায়, আমরা, শব্দ শুনি, কত বস্তু স্পর্শ করি, কত রূপ দেখি, কত রস, কত ভাল ভাল জিনিষ আস্বাদন করি, কত জিনিষের গন্ধ পাই। আমরা যা দিয়ে শব্দ শুনি, তা দিয়ে স্পর্শ করি না, যা দিয়ে স্পর্শ করি, তা দিয়ে রূপ দেখি না, আবার এমনি মজা, যা দিয়ে দেখি, তা দিয়ে আস্বাদ করি না, এবং যা দিয়ে আস্বাদ করি, তা দিয়ে আঘ্রাণ করি না। আমরা যেগুলি দিয়ে এই শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ অনুভব করি, সে গুলির নাম ইন্দ্রিয়, শব্দ, স্পর্শ,

রূপ, রস, গন্ধ যেমন পাঁচটা বিষয়, সেই রকম এই পাঁচটা বিষয় ভোগ করার জন্য আবার পাঁচটা ইন্দ্রিয় আছে—শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়। এই পাঁচটা হ'চ্চে জ্ঞানেন্দ্রিয়; আর পূর্ব্বেই তোমাকে বলেছি যে আমরা যে গুলির দ্বারা গমনাগমন করি, আদান প্রদান করি, কথা বলি, জনন ও বিসর্জ্জন করি সে গুলি হ'চ্চে কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই কর্ম্মেন্দ্রিয়ও পাঁচটী—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। আর আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে যে প্রাণ ক্রিয়া ক'রচে, সেই প্রাণেরও পাঁচ রূপ।—প্রাণ, অপান সমান, ব্যান ও উদান। এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ ছাড়া আরও একটা জিনিষ আছে, সেটা হ'চ্চে অন্তঃকরণ। এই যে অন্তঃকরণ ইনিও আবার চার রূপ ধরেছেন—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার। এখন, এই পাঁচটা কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ আর মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই উনিশটে দরজা দিয়ে আমরা বাইরের ও ভিতরের সব বিষয় ভোগ করচি, বাইরের ও ভিতরের বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করচি।

এই বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহঙ্কার; এই যে ইন্দ্রিয়গণ, এই প্রাণসমূহ, এই যে শরীর এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গন্ধ এই যে ভোগ্য বস্তু সকল, এরা নিজেরা স্বাধীনভাবে, স্বতন্ত্র হ'য়ে কোন কিছু ক'রতে পারে না; এদের নিজেদের প্রকাশ নেই, এরা স্বপ্রকাশ নয়। এমন একটা জিনিষ নিশ্চয়ই আছে যে জিনিষটা বুদ্ধিকে, মনকে প্রাণকে, বাক্‌কে, সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়, সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়কে স্ব স্ব বিষয়ে পরিচালিত করচে। শুধু যে পরিচালিত করচে তা নয়, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ সব দেহগুলিকেই সে প্রকাশ করচে। জাগ্রতের পর স্বপ্ন, স্বপ্নের পর সুষুপ্তি, সুষুপ্তির পর আবার জাগ্রৎ; এইরূপে অবস্থার পর অবস্থা আসচে, যাচ্চে; কিন্তু এই যে প্রকাশশীল জিনিষটী, এ ঠিক সমান ভাবে রয়ে যাচ্চে। এই প্রকাশ স্বরূপ, এই চিৎ স্বরূপ জিনিষটী, এই সৎস্বরূপ বস্তুটীর কখনও ব্যভিচার হ'চ্চে না। এই সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ জিনিষটী জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিকে প্রকাশ করচে। স্বপ্নের অবস্থায়, জাগ্রৎ অবস্থার পদার্থ নেই, সুষুপ্তিতে স্বপ্নও নেই জাগ্রতও নেই কিন্তু এই নিত্য সৎস্বরূপ প্রকাশস্বরূপ বস্তুটী সমানভাবে বিদ্যমান আছে। আবার দেখ, কহোল, সমাধিতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি কিছুই নেই, সেখানে প্রপঞ্চ শান্ত। না আছে প্রমাতা, না আছে, প্রমেয়, না আছে প্রমাণ। এই যে নিত্য চৈতন্যস্বরূপ সতত প্রকাশশীল বস্তুটা, এই নির্ব্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্যই অস্মৎ প্রত্যয়ের (আমি এই জ্ঞানের) লক্ষ্য আত্মা। এই আত্মা অখণ্ড, একরস, সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। জিনিষটে অখণ্ড, একরস, সৎ, চিৎ আনন্দস্বরূপ, সে কখন বহু হ'তে পারে না, বহু মানেই পরিচ্ছিন্ন, বহু মানেই খণ্ড, ভেদবিশিষ্ট। এই যে অখণ্ড একরস চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ইহা সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত, সেই জন্যই ইহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না। এই কাপড়খানাকে আমি দেখচি, ইহা আমার ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়েছে, কিন্তু এই কাপড়কে এবং আমার অন্তঃকরণের সমুদয় বৃত্তিগুলিকে প্রকাশ করচে যে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা তাকে কেমন ক'রে ইন্দ্রিয়ের বিষয় করবে। যে ইন্দ্রিয়কে প্রকাশ করচে তাকে আবার কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশ করবে। আত্মা এবং আত্মানুভূতির মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। সেই জন্য আত্মা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ। এই আত্মাই সর্ব্বপ্রকাশক ব'লে সর্ব্বান্তর।

নারী—পাশ্চাত্যে ও ভারতে

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র (এটর্ণী)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

ধনীরাই সকল শিল্প গ্রাস করিয়াছেন; সুতরাং লোকরা ভোগপ্রবণ হইলে তাঁহাদেরই লাভ হয়। ধনীরা নিজেরা ভোগপ্রবণ, সুতরাং ধনীপ্রভাবগ্রস্ত পাশ্চাত্য সমাজে ভোগাসক্তি কমাইবার প্রয়োজনীয়তা কেহ দেখে না—বরং তাহাদিগের দেখিয়া ভোগাসক্তি সকলেরই বাড়িয়াছে। তাহার উপর ধনীরা সকল ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি অধিকভাবে গ্রাস করায় অনেকের গ্রাসাচ্ছাদন জোটাই ভার হইয়াছে—জুটিলেও তাহা পরেও জুটিবে, এ ভরসা না থাকায় অনেকে সৈনিক ও নাবিকের কার্য্য করিতে বাধ্য হওয়ায়, অনেকেই বহুকাল বিবাহ করিতে পারে না—অনেকে চিরকালই বিবাহ করিতে পারে না। অনেক পুরুষ যদি বিবাহ না করে, অনেক নারীও বহুকাল বা চিরকাল বিবাহিত হইতে পারে না; সুতরাং তাহাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে বাধ্য হইতে হয়। পূর্ব্বে যখন অবিবাহিত নারীর সংখ্যা অল্প ছিল, তখন তাহারা তাহাদিগের উপযোগী কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম—যথা ঝি ও দাই ইত্যাদি—করিয়া তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। কিন্তু উপরি উক্ত নানা কারণে যখন বহুকাল অবিবাহিত নারীর সংখ্যা উত্তরোত্তর অধিকভাবে বাড়িতে লাগিল, অপেক্ষাকৃত অর্থ-স্বচ্ছল অবস্থায় যাহারা প্রতিপালিত হইয়াছে, সেরূপ নারীদিগেরও এখন উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যায় অর্থোপার্জ্জন করিবারও আবশ্যক হইল, সময় কাটাইবার জন্যও নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইবারও আবশ্যক হইল—সুতরাং তাহারা সকল অর্থকর ও রাজনৈতিক কার্য্য করিবার দাবী করিতে বাধ্য হইলেন ও তদুপযোগী হইবার শিক্ষার প্রার্থী হইলেন।

ধনীরা দেখিল যে, নারীরাও সকল অর্থকর কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদিগের বিশেষ সুবিধা হয়। ধনীরা ধনোপায়ের প্রধান উপায়গুলি—ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি পূর্ব্ব হইতে গ্রাস করিয়া বসিয়া থাকায়, যাহাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, তাহাদিগের অধিকাংশকেই ধনীদিগেরই দাসত্ব করিতে হয়, অথবা তাহাদিগের মনস্তুষ্টিসাধন বা চিত্তবিনোদনেই নিযুক্ত থাকিতে হয়। নারীরাও দাসত্বপ্রার্থী হইলে—দাসীত্বপ্রার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে Law of Demand and supplyএর জন্য সকল দাসেরই পারিশ্রমিকের হার কমিয়া যায়, তাহাতে তাহাদিগেরই লাভ—নারীরাও চিত্তবিনোদন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাহাদিগের তাহাতেও নানা কারণে সুবিধা—এক ত ঐরূপ লোকসংখ্যাবৃদ্ধিতে পারিশ্রমিকের হার কমিয়া যায়—তাহার উপর তাহারা নূতন ধরণেও চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইতে পারে। আবার কি দাসত্বে নিযুক্ত, কি চিত্তবিনোদনকার্য্যে নিযুক্ত নারীদিগের চরিত্রহীনতা অনেক স্থলে অর্থোপার্জ্জনের বিশেষ সহায়ক হয়—সুতরাং ঐরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত নারীদিগের সে লোভ জয় করা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। তাহাতেও ভোগলোলুপ ধনীদিগেরই বিশেষ সুবিধা হয়। সুতরাং ধনী সমাজনিয়ন্তারা

নারীদিগের সকল কর্ম্ম করিবার সমান অধিকার দাবীর বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন ; এবং এরূপ কর্ম্ম করিতে পাওয়া নারীস্বত্বের প্রসার বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন—সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, পূর্ব্বকালে পুরুষরা নারীদিগকে অর্থকর কর্ম্ম করিতে দিত না ; সেই জন্য নারীরা পুরুষদিগের দাসী হইতে বাধ্য হইয়াছিল—উহা তাহাদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার। ঐ 'প্রগতি'-শীল কালের নারীভক্ত পরম কারুণিক সমাজনিয়ন্তারা (অর্থাৎ ধনী প্রভুরা) নারীদিগের দুঃখে বিগলিতচক্ষু হইয়া পুরাকালের মনুষ্যসমাজ মাত্রেরই নারীদিগের প্রতি এই ভীষণ অত্যাচার প্রতীকারে বদ্ধপরিকর হইলেন—পুরুষ ও নারী সমান · তাহারা কোন বিষয়েই হীন নয়—তাহাদিগের পুরুষদিগের সহিত সকল কর্ম্ম করিবার সমান অধিকার থাকা বিধেয়—এইরূপ সাম্য থাকাই সভ্যতা-বিকাশের মাপকাঠি বলিয়া প্রচারিত হইল—সকলেই একালের দয়াময় সমাজ নিয়ন্তাদিগকে ধন্য ধন্য করিল—তাহাদিগের স্তুতিবাদকারী সংবাদপত্রাদি সেই সাম্যবাদের জয়ডঙ্কা বাজাইতে লাগিলেন।

ধনীদিগের দাসরা (শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিক প্রভৃতি) কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিলে তাঁহাদিগের বিশেষ সুবিধা (উহাদিগের সুবিধা হয় না বলিতেছি না) হয় বলিয়াই প্রধানতঃ সকলকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, নারীরাও সেইরূপ শিক্ষা পাইতেছেন। সকলেরই অহমিকা আছে—এই সাম্যবাদ সকলেরই সেই অহমিকার প্রীতিদায়ক, সুতরাং এই সাম্যবাদ প্রচারে 'শিক্ষিতা' নারীরা সকলেই প্রীত হইলেন—বিশেষতঃ যাঁহাদিগকে পেটের দায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, নানারূপ অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম হওয়াতে তাঁহারা বিশেষ প্রীত হইলেন,—'শিক্ষিতা' নারীরা এই পুরুষ ও নারীতে সাম্যপ্রকাশে এইরূপ সকল কর্ম্ম পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় করিতে পাওয়া তাঁহাদিগের স্বত্বাধিকার-বৃদ্ধি বলিয়া বুঝিলেন। সাম্যবাদ-প্রচলনে লিখিতে পড়িতে জানিলেই সকলেই নিজেকে পণ্ডিত মনে করেন -সকল বিষয়ে তাহাদিগের প্রত্যেকের যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং তাহার ফলে সকলেই কি সমাজগঠন, কি সামাজিক প্রথা, কি সামাজিক নিয়মাদি, কি ধর্ম্মবিশ্বাস, কি পূজা-পদ্ধতি, কি পরকালতত্ত্ব সকল বিষয়েরই মতবাদ—প্রত্যেকের যুক্তির দরবারে পরীক্ষা দিয়া পাশ করিতে হয় এবং এই সকল সাম্যবাদ-স্ফীতমস্তিষ্ক অগাধ পণ্ডিতাদগের কাছে পরীক্ষায় পুরাকালের সকল সমাজনিয়ন্তা মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কন্‌ফিউশিয়স, মোজেশ, মহম্মদ—ফেল হইয়া গিয়াছেন—তাঁহারা সকলেই নারীদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচারী তাঁহাদিগের কাছে সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছেন। কি বৈদিক ঋষিরা, কি বুদ্ধ, কি চৈতন্য প্রভৃতি সকলেই ভ্রান্ত বা জুয়াচোর মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইয়াছেন। এখন জনাধিক্যের মতবাদই মান্য ; সুতরাং এই সকল নব্যতন্ত্রী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে পুরুষ ও নারীর সাম্য 'প্রগতির' মাপকাঠী হইয়াছে এবং ঐ সাম্যবাদের জয়ধ্বনিতে তাহার প্রতিবাদের ক্ষীণধ্বনি চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

অল্প লোকই দেখিল যে, এই সাম্যবাদ ও অবাধ প্রতিযোগিতা প্রচলনের ফলে ধনীরা সকল ধনোপায়ের প্রধান উপায়গুলি—ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি উত্তরোত্তর অধিকভাবে গ্রাস করিতে পারিয়াছেন ও তজ্জন্যই উত্তরোত্তর অধিকাংশ লোকদিগকে তাঁহাদিগের আজ্ঞাধীন দাস হইতে বাধ্য করিয়াছেন—অধিকাংশ লোকদিগকে সৈনিক, নাবিক এবং খনির ও বৃহৎ বৃহৎ

কলকারখানার শ্রমিক জীবনের অশেষ দুঃখ ও কষ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন ও সে অবস্থায় বিবাহ করা দুঃসাধ্য বলিয়াই অনেকে বিবাহ করিতে না পাওয়ায় অনেক নারী ও পুরুষ দিগের সহিত বি সম প্রতিযোগিতায় (কেন "বি-সম" তাহা পরে আলোচিত হইবে) অর্থোপার্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেছেন—অধিকাংশ পুরুষ ও নারী জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু—ভালবাসা হইতে বহুকাল বা চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইতেছেন—ভালবাসা উপভোগের প্রকৃষ্ট সময়—যৌবন বৃথায় কাটাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং তাঁহারাই নিজেদের সান্নিপাতিক ভোগতৃষা মিটাইবার জন্য স্বদেশের গৌরববৃদ্ধি বা মঙ্গলের ব্যপদেশে পরদেশ জয় করিতে উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক পুরুষদিগকে নিযুক্ত করিতেছেন—ও তজ্জন্য অপর দেশবাসীরাও কেহ বা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য, কেহ বা পরদেশ জয়গৌরবে অগ্রণী হইবার জন্য, সকল সমর্থ পুরুষকে সৈনিক জীবনের পুরাকালের ক্রীতদাসদিগের অপেক্ষাও ভীষণ কষ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছেন—কোটি কোটি লোকদিগকে রণস্থলের বধ্যভূমিতে নীত করিতেছেন, বিজিত দেশবাসীদিগের ধন দোহন করিয়া—তাহাদিগের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট করিয়া তাহাদিগের জীবন ভীষণ কষ্টকর করিয়াছেন—যাঁহারা এইরূপ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত লোকের জীবন ভীষণ কষ্টকর ও অশান্তিগ্রস্ত করিয়াছেন, সেই পরম কারুণিক একালের পাশ্চাত্যের ধনী সমাজনিয়ন্তা প্রভুরা এখন নারীদিগকে সেই সাম্যবাদের জালে আবদ্ধ করিয়া তাহাদিগের অশেষ সুখদায়ী দাসীগিরি করিবার জন্য সাদর সম্ভাষণ করিতেছেন এবং বলিতেছেন—"এস তোমরা দলে দলে—আমাদিগের সকল প্রকার দাসীগিরির অশেষ সুখভোগ কর—তোমরা এতকাল স্বামী অপত্যদিগের জন্য 'বিনা বেতনে' খাটিয়া মরিতে—আমরা তোমাদিগকে 'বেতন' দিব—তাহাতে তোমরা ইচ্ছামত খাও, পর, থিয়েটারে যাও, চলচ্চিত্র দেখ—নাচো, গাও—নানাপ্রকার আমোদ উপভোগ কর, জীবন সার্থক কর—আর স্বামীর বা পিতামাতার কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে না—যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবে। পূর্ব্বে তোমরা একটিমাত্র পুরুষ উপভোগ করিতে পারিতে—কি ভয়ানক অত্যাচার—এখন তোমাদিগের মনোমত যত ইচ্ছা পুরুষ উপভোগ কর—কামই জীবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ—ইচ্ছা করিলে তাহাতেও যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে—কুসংস্কারাপন্ন পিতা-মাতারও তাহাতে কোন কথা বলিবার অধিকার স্বীকার করিও না—একালের সমাজনিয়ন্তারা পিতামাতার অপেক্ষা শুভানুধ্যায়ী জানিও। তোমরা লেখাপড়া শিখিয়াছ, বড় হইয়াছ, পিতা-মাতারও তোমাদিগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই (সে অধিকার কেবল ধনী প্রভুদিগের আছে)। বুড়ুরা যে বলে, এরূপ কাম উপভোগ করিতে গেলে—তোমাদিগেরই গর্ভ হয়, পুরুষদিগের ত হয় না—তাহার জন্য ভীত হইও না—প্রকৃতির এই পক্ষপাতিত্বেরও প্রতীকার আমরা করিয়া রাখিয়াছি। বৈজ্ঞানিক ডাক্তারদিগকে নিযুক্ত করিয়া গর্ভনিরোধ প্রথা আবিষ্কার করিয়া রাখিয়াছি। যদি অপত্য না চাও, অপত্য হইলে তোমাদিগের বড় কষ্ট হয়, সে কষ্ট দেখিয়া আমরা প্রাণে বড় ব্যথা পাই, গর্ভনিরোধ প্রথা অবলম্বন কর, যদিও তাহা সত্ত্বেও কখন কখন গর্ভ হইয়া পড়ে, তাহার জন্য চিন্তিত হইবার আর আবশ্যক নাই। আমরা ডাক্তারদিগের সাহায্যে গর্ভপাত করাইবারও ব্যবস্থা করিয়াছি। আর গর্ভপাত করাইতে বিশেষ কষ্ট হয় না—গর্ভপাত করিবার অবাধ অধিকারও প্রায় সকল পাশ্চাত্য সমাজে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে স্বীকৃত হইয়াছে।

দেখ, পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া ভীষণ শত্রুকে বধ করিলে সকল সমাজ তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দণ্ড দেয়—লোক-বধ করিবার অধিকার কেবল রাজাদিগেরই আছে—তাহাও নামমাত্র। সেই কেবল রাজভোগ্য অধিকার—তোমার গর্ভস্থ সন্তানকে পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া হত্যা করিবার অধিকারও আমরা তোমাদিগকে দিতেছি। আমরা তোমাদিগের কত শুভানুধ্যায়ী, ঐরূপ হত্যা করিতে অধিকার দেওয়াই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমেরিকায় দেখ, প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ—ইংলণ্ড জার্ম্মাণীতে ৬ লক্ষ নারীরা বিনা দণ্ডে গর্ভপাত করাইতেছে; সুতরাং তোমাদিগের এই শুভানুধ্যায়ীদিগের উপদেশ শুন। যদিও এখনও গর্ভপাত করাইতে কিছু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তোমরা যখন পুরুষদিগের সহিত স্বাধীনতা-সমরে অগ্রসর হইয়াছ, সমকক্ষতার দাবী করিতেছ, এই সকল সামান্য কষ্ট তুচ্ছ করাই উচিত। আমাদিগের লক্ষ লক্ষ পুরুষ দাসরা দেখ কেমন অকাতরে প্রাণ দিয়া চক্ষু-কর্ণ-হস্ত-পদাদি হীন হইয়া গৌরবান্বিত হইতেছে। তোমরা গর্ভপাতের সামান্য কষ্ট স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইলে, এই স্বাধীনতা-সমরে ত জয়ী হইতে পারিবে না। বৃদ্ধরা যে বলে, যত দিন যৌবন থাকে, শরীর সবল থাকে, এরূপ জীবন অনেকের বেশ কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু যৌবন কাটিয়া গেলে, শরীর অসুস্থ হইলে—বিশেষতঃ বৃদ্ধবয়সে সকলেরই জীবন ভীষণ কষ্টকর হয়—কেহ তাঁহাদিগের নিকটেও আসে না—নির্জ্জন কারাবাস তুল্য হয়—সে কালের স্বাধীন নারীর জীবনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু সেকেলে বুড়োদিগের কথায় কর্ণপাত করা যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা দেখ লোলচর্ম্মা প্রাচীনাদিগকে কেমন নবীনা সাজাইতেছি। সকলেই যাহাতে চিরযৌবন উপভোগ করিতে পারে তাহারও শীঘ্রই বন্দোবস্ত হইবে জানিও। মৃত্যুকেই পৃথিবী হইতে নির্ব্বাসিত করিব—বৈজ্ঞানিকেরা কি না করিতে পারেন? আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তায় বর্ত্তমানের সুখ ও আমোদ পরিত্যাগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। তোমরা যে কোন কালে বৃদ্ধা হইবে, কে বলিল? সকলেই অজর অমর হইয়া প্রাচীন কালের কল্পিত স্বর্গ-সুখভোগ করিবে, এখন যে কাহারও জীবনে শান্তি সুখ নাই, নিত্য নূতন ব্যাধি হইতেছে, সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তাহাই নিশাবসানে সুখসূর্য্য উদয়ের সূচনা করিতেছে, স্থির জানিও।”

এইরূপে ভোগবাসনা পূরণের লোভে অনেক শিক্ষিতা পাশ্চাত্য নারী উৎসাহিত হইয়া—আরও বহু অধিক পাশ্চাত্য নারী পাশ্চাত্য সমাজগঠনদোষে তাঁহারা যে দুর্দ্দশায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, তাহা হইতে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় দেখিতে না পাওয়ায়, মন্ত্রের সাধন কি শরীরপতন—এই প্রতিজ্ঞায় এই স্বাধীনতা সমরে, এই পুরুষদিগের সহিত সমকক্ষতার দাবী সাব্যস্ত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন এবং অনেকটা সাফল্য লাভও করিয়াছেন। স্বামী অপত্যের বিনা বেতনে দাসীগিরি করার পরিবর্ত্তে পুরুষদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় ধনী প্রভুদিগের প্রায় সকল রকম গোলামীগিরি করিবার স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছেন—কেবল এখনও সৈনিক ও নাবিক জীবনের অশেষ সুখ অর্জ্জন করিতে পারেন নাই—এবং নারীর নারীত্ব যে মাতৃত্বে তাহা বর্জ্জন করিয়া নারীসত্ব বৃদ্ধি করিতেছেন—এবং ধনী প্রভুদিগের গোলামীগিরির কাড়াকাড়িতে জীব জগতে অদৃষ্ট, ইতিহাসে অশ্রুত, পুরুষ ও স্ত্রীজাতির ভিতর বিদ্বেষভাব পুষ্ট হইয়াছে—এই সমকক্ষতা দাবীতেও ভোগলোলুপতার বৃদ্ধিতে উত্তরোত্তর গৃহে অশান্তি বৃদ্ধি

হইতেছে—উ রোত্তর অধিক গৃহ ভগ্ন হইতেছে—পিতামাতার ও অপত্যের প্রীতি সম্বন্ধ ক্ষীণ হইতেছে--উত্তরোত্তর অধিক লোক নিত্য নূতন হোটেলে খাইতেছেন—নিত্য নূতন ক্ষণস্থায়ী ভালবাসা উপভোগ করিতেছেন--ও অপত্যেরা নিত্য নূতন পিতা বা মাতার ভালবাসা যত্ন পাওয়ার সৌভাগ্য উপভোগ করিতেছে—এবং অসুস্থ অবস্থায় ও বৃদ্ধবয়সে ভাড়াটিয়া সেবা-যত্ন পাইয়া বা অবৈতনিক সেবা-সদনের সেবা শুশ্রূষা পাইয়া বা বেকার আশ্রমের আদর-যত্ন পাইয়া এই প্রগতিশীলতার অশেষ আনন্দ উপভোগ করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন, আর সকলেই প্রগতির 'জয়' 'জয়' গাইতেছেন।

আমাদিগের দেশের শিক্ষিতা নব্যতন্ত্রী নারীরাও এখন পাশ্চাত্যের নারীদিগের সকল প্রকার গোলামীগিরি অধিকারপ্রাপ্তির অশেষ সুখ দেখিয়া সেই অধিকারপ্রাপ্তির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। হিন্দুদিগের পুরাতন চিন্তার ধারা ও সমাজগঠন ভাঙিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। অদ্বৈত উপলব্ধিতে বিকৃতমস্তিষ্ক যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরা এমন নারীনিগ্রহী সমাজগঠন করিয়াছিলেন যে, যত দিন সে সমাজগঠন প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল, তত দিন কোন হিন্দু নারীকে (অতিশয় দীন দরিদ্র বিগতযৌবনা স্বল্পসংখ্যক নারী ভিন্ন) পরের বেতনভোগী দাসীগিরি করিতে হয় নাই। এমন কি দীর্ঘ দশ শতাব্দীর মুসলমান রাজত্বকালেও বহুকালব্যাপী অরাজকতার কালেও, বিজেতা মুসলমানদিগের দাসীগিরি করিবার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, একটি নারীকেও সেই দাসীগিরির স্বাধীনতা সুখ, স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিতে দেয় নাই। এমন চিন্তার ধারা প্রবর্তিত করিয়া নারীদিগের ভিতর এমন ক্রীতদাসের মনোভাব আনয়ন করিয়াছিলেন যে, তাহারা স্বামী, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয়কুটুম্বদিগের গৃহে বিনা বেতনে—পেটভাতায় মাত্র থাকিত, তাহাদিগকে সেবা যত্ন করিয়া সুখী হইত—(আবার পুরুষরাও এমন মূর্খ অর্থশাস্ত্রজ্ঞানহীন ছিল যে, সেই অর্থোপার্জ্জনে অনিচ্ছুক ও অকুশল নারীরা যখন তাহাদিগের আশ্রয় চাহিত, ঐ সকল বিকৃতমস্তিষ্ক ঋষিদিগের কথায় নিজেরা শাকান্ন মাত্র খাইয়াও তাহাদিগকে খাইতে পরিতে দিত। এই সকল দরিদ্র নারীদিগকে মাসী, পিসী, দিদি বলিতেও লজ্জা বোধ করিত না। তাহারা বয়োজ্যেষ্ঠা হইলে তাহাদিগের স্ত্রীকেও অনেক সময়ে উহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে হইত) তথাপি বিজেতাদিগের বেতনভোগী দাসীগিরি করিবার স্বাধীনতা ও সুখস্বচ্ছন্দতা অর্জ্জন করিত না—করিবার প্রবৃত্তিও হয় নাই। কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা! কি ভয়ানক নারীদিগের প্রতি অত্যাচার! কি দাস্যমনোভাব প্রচলন! এত অত্যাচার, এরূপ দাস্যমনোভাব প্রচলন আমাদিগের স্বাধীনতার প্রয়াসী, নারীস্বত্বপ্রসারকামী, পাশ্চাত্য শিক্ষায় উন্মীলিতচক্ষু নব্যতন্ত্রী আর কত কাল সহ্য করিতে পারেন? শিক্ষিত পুরুষরা অধিকাংশই বিজেতাদিগের গোলামীগিরি করিতে পাওয়ায় (উকীলরাও গোলামীগিরিই করেন। তাঁহারাও আদালতের কর্মচারীর ভিতরই গণ্য কেবল সেকালে রাজারাজড়াদিগের ভাঁড়ের (Court jester) মত কখনও কখনও দুচার কথা মোলায়েম ভাবে শুনাইয়া দিবার অধিকার আছে) জীবন ধন্য হইল বোধ করেন—ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি তাঁহারা করিতে পারেন না—করিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষার অবমাননা করিতেও অনেকে অনিচ্ছুক। তাহা অশিক্ষিত ও পরদেশবাসীদিগের হস্তে তুলিয়া দিয়াছেন; সেই গোলামীগিরির সুখে তাঁহাদিগের দেহ জর্জ্জরিত। সেই জন্য শিক্ষিত

নব্যতন্ত্রী অনেকেই বোধ হয় মনে করেন যে, আমাদিগের নারীরা—যাহারা দেশের প্রায় অর্দ্ধেকাংশ, তাহারা যদি বিজেতাদিগের সেই অশেষ সুখদায়ী বেতনভোগী দাসীগিরির স্বাধীনতা, সুখ ও স্বচ্ছন্দতা অর্জ্জন করিতে না পায় (বিজেতারাই অধিক বেতন দানে সমর্থ- দেশের লোকের শতকরা এ‌কটিরও মাসিক ১০০ টাকার অধিক আয় নাই ; সুতরাং শিক্ষিতা নারীদিগের অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হইলে বিজেতাদিগের বেতনভোগী গোলামীগিরি পাইবার চেষ্টাই করিতে হইবে) দেশের স্বাধীনতাই খর্ব্ব হইয়া যায়—নারীদিগের জীবনই ব্যর্থ হইয়া যায়—নির্ব্বোধ প্রাচীনপন্থীরা নারীদিগের প্রতি অত্যাচারে অভ্যস্ত বলিয়া তাহা বুঝিতেও পারে না। সুতরাং এক দল শিক্ষিত নব্যতন্ত্রীরা দেশের সকল পুরাতন চিন্তাধারা, সামাজিক নিয়মাবলী, সমাজগঠন ভাঙ্গিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। হিন্দুর দীর্ঘ জাতীয় জীবনের সকল সাধনা (culture), সকল অভিজ্ঞতা সমুদ্রের অতল জলে নিক্ষেপ না করিলে দেশের ও নারীদিগের কোন মঙ্গল হইতে পারে না—হিন্দুর সকল বৈশিষ্ট্য লোপ না করিলে হিন্দুর কোন উন্নতি হইতে পারে না, স্থির করিয়াছেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের, আদমসুমারি (Census Report) হইতে প্রকাশ যে, সমগ্র ভারতবর্ষের শতকরা ৭২, ৭৩টি, বাঙ্গালার শতকরা ৭৬ বা ৭৭টি লোক কৃষির উপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষের ১১টি বাঙ্গালার ৮টি মাত্র—শিল্পের (industry) উপর, ভারতবর্ষের ও বাঙ্গালার ৬টি মাত্র (বাঙ্গালায় তাহাও অধিকাংশ বিদেশীর হস্তে)—বাণিজ্যের উপর—২ বা ২৷৷০টি মাত্র profession (উকীল ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি)এর উপর, রাজসরকারের চাকরীর উপর ১'৫ মাত্র (তাহার ভিতর সৈন্য পুলিসও আছে) লোক নির্ভর করে—বাকী বেকার ভিক্ষুক ইত্যাদি। সুতরাং শিক্ষিতা নারীরা—যাহারা পুরুষদিগেরই মত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাদিগকে অর্থোপার্জ্জন করিতে হইলে তাহারা কি উপায়ে তাহা করিতে পারে, তাহা কেহ দেখিতেছেন না। ঐরূপ শিক্ষিত পুরুষরা ত বি, এ, বি, এস্, সি ; এম, এ ; এম, এস্ সি ; এম, বি ; বি, ই ; বি, এল পাশ করিয়া ফ্যা ফ্যা করিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই পাশ করা তরুণীর সংখ্যা-বৃদ্ধিতে, নারীবিদ্যালয়ের ছাত্রীর সংখ্যা-বৃদ্ধিতে উৎফুল্ল—দেশের উন্নতি দ্রুতগতিতে হইতেছে ধরিয়া লয়েন। কিন্তু ঐরূপ শিক্ষায় যে তাঁহারা কায়শ্রমবিমুখ হন, তাঁহাদিগের ভোগবাসনা বৃদ্ধি হয়, তাহা নিশ্চিত। বিশ ত্রিশ টাকা মাহিয়ানার কেরাণীরা পর্য্যন্ত এক ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইলে ট্রামে চড়েন। বিখ্যাত পণ্ডিত ৺শ্যামাচরণ সরকার প্রত্যহ বারাসত হইতে হাঁটিয়া আসিয়া কলিকাতায় সামান্য বেতনে চাকরী করিতেন শুনিয়াছি। দেশব্যাপী হাহাকারের দিনে সবাক চলচ্চিত্রের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়িতেছে। সেখানকার ও ফুটবলাদি ম্যাচখেলার টিকিট কিনিতে কাঙ্গালীবিদায়ের সসম্ভ্রম ব্যবহারও অনেকে উপভোগ করেন। ক্রমাগতই এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বস্ত্র ব্যবহার চা, পাণ ব্যবহার মিষ্টান্নের দোকান ক্রমাগতই বাড়িতেছে—সকল স্কুলকলেজেই নাটক অভিনয় হইতেছে—শিক্ষিত তরুণরা নৃত্যগীতবাদ্যকুশল তরুণী বিবাহ করিতে চাহিতেছেন—গৃহে গৃহে গানবাজনা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। (পিতা-মাতার সেই ব্যয় জোগাইতে প্রাণান্ত হইতেছে।) এ সকলই ভোগবাসনা বৃদ্ধি প্রমাণ করিতেছে।

তরুণীরাও ঐরূপে শিক্ষিতা হওয়াতে তাহারাও ঐরূপ কায়শ্রমবিমুখ হইতেছে, ভগ্নস্বাস্থ্য

হইতেছে—তাহাদিগেরও ভোগবাসনা বৃদ্ধি হইতেছে। ঐরূপ শিক্ষাপ্রাপ্তিতে পুরুষরা ইংরাজী ভাবগ্রস্ত হইয়াছে—তাহাদিগের অনুকরণে সাধ্যাতিরিক্ত বিলাসপ্রবণ হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন আমরা ইংরাজদিগের প্রিয়পাত্র ছিলাম—ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহাদিগের অধীনে চাকরী করিতে পাওয়ায়—জমীর আয় ও দামবৃদ্ধিতে একরূপ চলিয়া যাইত। এখন সর্ব্বত্র চাকরী পাওয়া দুর্ঘট হইয়াছে। এই ভোগবাসনাবৃদ্ধিতে আমরা যৌথ-পরিবারপ্রথা ভাঙ্গিয়াছি। সাধ্যাতিরিক্ত ভোগপ্রবণ হওয়ায় ও যৌথ-পরিবার প্রথার সাহায্য পাওয়ার আশা না থাকায় শিক্ষিত তরুণরা বিবাহ করিতে চাহিতেছেন না। সুতরাং বিবাহের বয়স ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে—২০, ২৫, ৩০ বৎসরের কুমারীসংখ্যাও বাড়িতেছে এবং তাহারাও যে শিক্ষায় পুরুষরা ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প ও কৃষিকর্ম্ম করিতে অপারগ হইয়াছে, কেবল চাকরী করিবার উপযোগিতা অর্জ্জন করিয়াছে, তরুণীরাও সেই শিক্ষা পাইতেছেন—তাঁহাদিগেরও তজ্জন্য ভোগবাসনা বৃদ্ধি হইতেছে। শিক্ষিত তরুণদিগের পক্ষের—যাহারা পূর্ব্বকালের বিনা বেতনের দাসী স্ত্রীও প্রতিপালন করিতে অক্ষম - ঐরূপ শিক্ষিতা ও শিক্ষাপ্রাপ্তিতে উদ্দীপিত ভোগবাসনা ও বিকশিত ব্যক্তিত্ব (developed individuality) স্ত্রী প্রতিপালন করা, হাজার দশ হাজারের ভিতর একটিরও সম্ভব নয়—তাহা কেহ দেখিতেছেন না। সুতরাং অধিকাংশকে বহুকাল (বিশেষতঃ যাহারা রূপহীনা) চিরকালই অবিবাহিতা থাকিতে হইবে—কেরাণীগিরি ও শিক্ষয়িত্রীপদের উমেদারী করিয়া বেড়াইতে হইবে ও বিফল হইতে হইবে—অথবা জীবনের শূন্য হৃদয়ের দুঃখভোগ করিতে হইবে—এখনই তাহাই হইতেছে এবং পিতার মৃত্যুর পর তাহাদিগের দুর্দ্দশা কি ভীষণ হইবে ও হইতেছে, তাহাও কেহ দেখিতেছেন না। সুতরাং ঐ সকল নারীকে বিজেতাদিগেরও যে অল্পসংখ্যক অর্থস্বচ্ছল লোক আছে, তাহাদিগের গোলামীগিরি বা চিত্তবিনোদনকারী কার্য্যে কাড়াকাড়িতে নিক্ষিপ্ত হইবে—ঐরূপ কর্ম্মপ্রার্থী সংখ্যাবৃদ্ধিতে তাহার পারিশ্রমিকও অতি অল্প হইবে, হয় ত বা দুই চারি শত, না হয় সহস্র নারী মাসিক ২০, ৩০, ৪০ টাকার বেতনের গোলামী করিবার অশেষ সুখ বোধ করিবে। ধনী স্বাধীন পাশ্চাত্যে এইরূপ স্ত্রীলোকদিগের সকল কর্ম্ম করিবার অধিকারপ্রাপ্তিতে স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতির ভিতর জীবজগতে অদৃষ্ট, ইতিহাসে অশ্রুত বিদ্বেষ ও বিরোধভাব সৃষ্টি হইয়াছে। Ellen Key প্রমুখ স্ত্রী-স্বাধীনতার নেতারা দেখিতেছেন যে, যদি নারীদিগের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক না করা হয়, তাহা হইলে এ বিদ্বেষভাব বাড়িবে—নারীরাও মাতৃত্বের কার্য্যে অনুপযোগী হইবে। এখানেও তাহাই হইতেছে, প্রত্যেক রাস্তায় গর্ভনিরোধকারী ঔষধ ও দ্রব্যাদি বিক্রয় হইতেছে, সর্ব্বত্রই তাহার বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে।

এই সকল নারী বিজেতা ও অর্থস্বচ্ছল ব্যক্তিদিগের গোলামীগিরির কাড়াকাড়িতে নিক্ষিপ্ত হইয়া, ঐরূপ কাড়াকাড়ির জন্য হিন্দু মুসলমানদিগের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীদিগের ভিতর যেরূপ সদ্ভাব ও সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি হইয়া দেশের রাজনৈতিক একতা ও শান্তি বদ্ধমূল হইতেছে—নারীদিগকেও ঐরূপ গোলামীগিরি করিবার স্বাধীনতা দানে—পুরুষ ও নারীর ভিতর সাম্যবাদ স্বীকারে, পারিবারিক জীবনে ও তদপেক্ষা অধিক ভাবে শান্তি ও সুখ বৃদ্ধি করিয়া সকলেরই জীবন আনন্দময় করিবে—দেশের স্বাধীনতা ও য়ুরোপীয় জাতিদিগের সহিত সমকক্ষতা করতলগত হইবে ।।

নব্যতন্ত্রী শিক্ষিতসম্প্রদায় পুরুষ ও নারীর সাম্য-স্বীকারে নারীদিগকে বিজেতাদিগের গোলামীগিরি করিবার স্বাধীনতা দান—দেশের যেরূপ স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিতেছেন, দেশের অশিক্ষিত সিপাহীদিগের দ্বারা অর্জ্জিত সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল কার্য্যে যে স্বাধীনতা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে স্বীকৃত হইয়াছিল, সর্দ্দা-আইন ও মন্দিরে প্রবেশাধিকার বিলের দ্বারা সেই ক্ষমতা বিজেতাদিগের হস্তে তুলিয়া দিয়াও সেইরূপ স্বাধীনতা বৃদ্ধি করিতেছেন। ক্রিকেট, টেনিস, ফুটবল, হকিতে—নাচ গানে পারদর্শিতা দেখাইয়া তাঁহারা যে স্বাধীনতালাভের উপযোগী হইয়াছেন, তাহা প্রমাণ করিতেছেন তদ্দ্বারা দেশব্যাপী হাহাকার নিবারিত হইবে বোধ হয় বুঝিয়াছেন সেই জন্য সেইরূপ খেলার কৃতিত্বের গুণগান পাইয়া অল্প বয়স্ক বালকবালিকাদিগকে সেইরূপ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে প্রোৎসাহিত করিতেছেন ও তাহারাও তজ্জন্য উহাই তাহাদিগের জীবনের লক্ষ্য স্থির করিতেছে।

স্বাধীন ধনী পাশ্চাত্য দেশেই পুরুষ নারীর সাম্যবাদ—সকল কর্ম্ম করিবার সমান অধিকার দেওয়া যে, নারীদিগকে ধনী প্রভুদিগের গোলামীগিরির জালে আবদ্ধ করিবার ফন্দীমাত্র, তাহাতে ধনীদিগেরই কেবল সুবিধা বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে, নারীদিগের দুর্গতি বৃদ্ধ হইতেছে, তাহা এখন তাঁহারাও বুঝিতেছেন। সম্প্রতি চিন্তাশীল লেখক Wyndham Lewis তাঁহার লিখিত Doom of Youth নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠকদিগের অবগতির জন্য তুলিয়া দিলাম। * "নারীদিগের সকল কর্ম্মে সমান অধিকার এই মতবাদের দ্বারা দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। প্রথম,—পুরুষদিগের পারিশ্রমিকের হার কমান দ্বিতীয়,—এত কাল অসংখ্য নারীরা যাহারা শ্রমিক সংখ্যাভুক্ত হয় নাই, তাহাদিগকে অল্প বেতনের শ্রমিক সংখ্যাভুক্ত করা ... ... নারীপ্রগতি –(নারীদিগের সকল কর্ম্মে সমান অধিকার দাবী) চেষ্টা করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে ... ... একালের ধনপ্রভাবগ্রস্ততার গতি যদি না রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে দুই শ্রেণীতে মনুষ্যসমাজ বিভক্ত হইবে—(১) অল্পসংখ্যক উচ্চশ্রেণী, (২) শ্রমিক। পৃথিবীতে ভবিষ্যতে উচ্চশ্রেণী দীর্ঘজীবী হইবে এবং শ্রমিকরা ১০ বৎসরকাল (মাত্র) অধিক পরিশ্রম করিয়া কুকুরের ন্যায় জীবন যাপন করিবে—ভারতের কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদিগের জীবন সেইরূপ হইয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতে পাশ্চাত্যেও তাহাই হইবে।"

এই পরাধীন, লুপ্তশিল্প, পরহস্তগতবাণিজ্য দেশের লোকের গড়পড়তা আয় মাসিক ৪,

* 'Feminism served the double purpose of cheapening the labour of man and of tapping an enormous uptil-then unused labour-market the feminist movement was artificially created for this purpose * * * * the tendency of modern capitalism if unchecked will be to produce a world in which men are divid d into two classes—(1) the very small superclass (2) labour. In the world of future, the superclass will be long lined and the labour will have about 10 years of active working lif—'the life of a dog'—these conditions are approximated in Industrial India today and they will be in store for the west."

৫, ৬ টাকা মাত্র—শতকরা একটি লোকেরও মাসিক ১০০ টাকা আয় নাই। সংসারের কুটিলতায় স্বার্থপরতায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, বহু ভারত ঋষিদিগের বহু তপস্যার ফল, ত্যাগের জীবন্তমূর্ত্তি ভারত অবলাদিগকে আমরা কতটুকু ভোগসুখ দিতে পারি, আর কয়জনকে বা তাহা দিতে পারি যাহার লোভে আমরা তাহাদিগকে পুরুষদিগের সহিতে বি-সম প্রতিযোগিতায় অর্থোপার্জ্জনের কাড়াকাড়িতে—যাহা কেবল গোলামীগিরি পাইবার কাড়াকাড়ি মাত্র—নিক্ষিপ্ত করিতে চাহিতেছি, তাহা একবার সকলে স্থিরচিত্তে ভাবিবেন কি? তাঁহাদিগের ত্যাগশীলতার ভালবাসার অফুরন্ত উৎস এই পরাধীন গরীব দেশে কি দীন দরিদ্র, কি পাপীতাপী, কি অন্য সকলের জীবন মরুভূমিতে মরুদ্যান (oasis) সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের অশেষ তাপক্লিষ্ট হৃদয় সরস ও শান্তিযুক্ত রাখে—তাঁহারা গৃহে গৃহে লক্ষ্মীরূপে বিরাজিত বলিয়া জীবন এত উপভোগ্য থাকে যে 'happy as a poor Indian village' পাশ্চাত্যের প্রবাদের ভিতর গণ্য হইয়াছে। মাতৃত্বই নারীত্ব বলিয়া নারীদিগের জীবনের প্রধান সুখই মাতৃত্বের ত্যাগধর্ম্মী ভালবাসা—ভোগমূলক নহে। সেই ত্যাগধর্ম্মী ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইলে তাহারা কোন কালেই কোন অবস্থায়ই সুখী হইতে পারে না—কাহাকেও স্থায়ী সুখী করিতেও পারে না, সেই গোড়ার কথা আমরা ভুলিতেছি। আমরা সাম্যবাদ-মদিরামত্ত হইয়া অবলাদিগের ঘাড়ে গোলামীগিরির জোয়াল তুলিয়া দিয়া তাহাদিগের মঙ্গল করিতেছি,—না, পাশ্চাত্যের প্রগতি-পিশাচীর কাছে বলি দিতে লইয়া যাইতেছি? আমরা পাশ্চাত্যের অনুকরণে উন্নতি-প্রচেষ্টায় ঈশপের গল্পের লোভী কুকুরের মত কেবল 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্ট' হইতেছি মাত্র।

দশাবতার চরিত

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় জ্যোতিঃশাস্ত্রী

শ্রীরাম চরিত

(শ্রীরামের শূদ্রতপস্বী বধরূপ কলঙ্কস্খালন)

রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ৮৬ হইতে ৮৯ সর্গে এক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারের অকাল মৃত্যুর ও শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক শম্বুক নামা শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদনরূপ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। যে সময় রামচন্দ্র বনবাস হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক অযোধ্যায় রাজা হইয়াছিলেন ইহা সেই সময়ের উপাখ্যান। যদি রামচন্দ্রকে মানবরূপধারী রাজা বলিয়া ধরা যায় এবং তিনি ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং ত্রেতাযুগের রাজা ছিলেন, তাহা হইলে এই শূদ্র তপস্বীর উপাখ্যানের মূল অলীক হইয়া পড়ে। ত্রেতাযুগই ঋকবেদের যুগ, তৎকালে এই ভারতেও জাতিবৈষম্যের সৃষ্টি হয় নাই। এই জন্য উক্ত উপাখ্যান বহু পরবর্ত্তীকালের বলিয়া মনীষিগণ স্থির করিয়াছেন। ঐ উপা-

খ্যানের গল্পাংশ ত্যাগ করিলে উহার মধ্যে যোগ ও জ্যোতিষ তত্ত্ব গূঢ় ও প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত দেখা যায়। সেই যোগ ও জ্যোতিষ তত্ত্ব নিষ্কাষণ করিবার জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা। সংক্ষিপ্ত উপাখ্যান না লিখিলে আলোচনার সুবিধা হইবে না এই জন্য উপাখ্যানটি নিম্নে সংক্ষেপে প্রকটিত হইল।

শূদ্রতপস্বী বধোপাখ্যান।—কোন ব্রাহ্মণের **চতুর্দ্দশ বর্ষীয়** পুত্রের অকাল মৃত্যু হেতু তিনি শোক বিহ্বল হইয়া মৃতপুত্র সহ রামসমীপে আগমন পূর্ব্বক নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং রামের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। যথা "রামের কোনও মহৎ দুষ্কৃতি আছে, সন্দেহ নাই; সেই জন্য তদীয় অধিকারে বালকগণের অকালমৃত্যু সংঘটিত হইতেছে। অন্যের অধিকারে বালকগণের এরূপ মৃত্যুভয় নাই।

মন্তব্য। এসকল পুত্রশোককাতর ব্যক্তির অলীক প্রলাপ বাক্য মাত্র। তৎকালের ব্রাহ্মণ হইয়াও সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় এরূপ শোকবিহ্বল কেন? ত্রেতাযুগে অন্যান্য রাজার শাসনকালে অনেক অকালমৃত্যুর বিষয় ঋগ্বেদে আছে। পুনশ্চ হতপুত্র ব্রাহ্মণ বলিতেছেন—"হে রাজন্! মৃত বালকের জীবন দান কর। নতুবা পত্নীর সহিত এই রাজদ্বারেই প্রাণ ত্যাগ করিব।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

মন্তব্য। ধ্রুবের অন্যতম নাম শিশু, কুমার, বালক, শিশুমার এবং ব্রহ্মলোকস্থ হেতু ব্রাহ্মণ কুমার। সুমেরুই ব্রাহ্মণ এবং সপ্তর্ষি চক্র ব্রাহ্মণী।

রাম ঐ ব্রাহ্মণের দুঃখশোকসমন্বিত ক্রন্দন শ্রবণে বশিষ্ঠ, ভ্রাতৃগণ ও পুরবাসীগণকে আহ্বান করতঃ তাহার বিচার ও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন অর্থাৎ এই মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিতে বলিলেন। শূদ্রাণিগর্ভজাত ঋষিপ্রবর নারদ মৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে বলিলেন। ঋষি বলিতেছেন—

"রাজন্! পূর্ব্বে সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই তপোনুষ্ঠান করিতেন, তৎকালে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য কোন জাতিই তপস্বী ছিলেন না। এইরূপে ব্রাহ্মণ বর্ণ প্রধান, তপঃ প্রদীপে অবিদ্যাবিরহিত সেই সত্যযুগে সকলেই মরণরহিত ও ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন।

মন্তব্য। সত্যযুগে সৃষ্টির আদিগত ব্রহ্মার মরিচ্যাদি মানস পুত্রগণই ব্রাহ্মণ নামে বিদিত এবং মরণরহিত ত্রিকালজ্ঞ; এখনও তাঁহারা বিদ্যমান রহিয়াছেন। সুধীগণ তাহা চর্ম্ম-চক্ষেই দেখিতে পান। সত্যযুগে উক্ত ব্রাহ্মণেরাই তপোনুষ্ঠান করিতেন। কেন? ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রবাহ চালাইবার জন্য। তৎকালে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ জন্মে নাই সুতরাং অন্য কোন জাতিও ছিল না। জন ধাতু হইতে জাতি শব্দ—জন্ম হইলেই জাতি হয়। তখন অন্য কিছু জন্মে নাই।

"তপশ্চৈবস্তাং কর্ম চান্তর্মহত্যর্ণবে।" —অথর্ব্ববেদ ১১।১০।২

সত্ত্বগুণেই জগতের প্রকাশ। আপস্বরূপ সত্ত্বগুণই শ্বেত বর্ণ। শ্বেতবর্ণ সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ বর্ণ। কারণ শ্বেত বর্ণেই সমস্ত প্রতিভাত হয়। শ্বেতবর্ণ জল ব্রাহ্মণ এবং শ্বেতবর্ণ জ্যোতিও ব্রাহ্মণ। অনন্তর ঋষি বলিতেছেন—সত্যযুগাবসানে মানবগণের ব্রাহ্মণত্ব-বুদ্ধি (তরলত্ব ও দ্রবত্ব) শিথিল হইলে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় আবির্ভূত হইল। ত্রেতাযুগে (সূর্য্যাদিগ্রহরূপী) ক্ষত্রিয়গণ আবির্ভূত হইলেন। এই ত্রেতাযুগে পূর্ব্বে সঞ্চিত তপোবলসম্বলিত ক্ষত্রিয়গণ জন্মিলেন। ইঁহারাই

ব্রহ্মের অনুলোমগতি।) সত্যযুগে ক্ষত্রিয়াপেক্ষা ব্রাহ্মণেরা প্রধান। (ক্ষেত্ররূপ অগ্নির তেজ তখন প্রবল না হওয়ায়) কারণ জলের আধিক্যতা হেতু (আধিক্যে নব্যবাদসা ভবন্তি।) ত্রেতা-যুগে উভয় বর্ণই সমবীর্য্যবান্ হয়েন (?) ইত্যাদি প্রকারে সৃষ্টির উপাদানভূত দ্রব্যানুসারে পার্থিব মানবগণ মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বহু বিষয়ের অবতারণা হইয়াছে। তাৎ-কালিক সমাজের ও দেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া যেরূপ শিক্ষার আবশ্যক তাহাই উপন্যাসা-কারে বা উপাখ্যানাকারে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু জগতের কোন বস্তুই একভাবে চিরকাল যায় না ও যাইতে পারে না। পরাশরসংহিতার প্রথমেই আবশ্যক মত ইহার পরিবর্ত্তনের আদেশ আছে। এস্থলে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। বন মধ্যে সীতার অনুসন্ধান কালে কবন্ধ নামক রাক্ষস বধ করিলে সে স্বর্গে গমন সময়ে রামকে তাপসী শবরীর নিকট যাইতে বলিল। তপ-শ্চারিণী শবরী রামচন্দ্রকে পাইয়া যথা বিধানে তাঁহার অর্চ্চনা করিল। ইত্যাদি। রামচন্দ্র সে সময় কেন তপশ্চারিণী, ব্যাধিনীকে বধ বা তাহার শিরচ্ছেদন করিলেন না? সম্ভবত রাম নিজ ইচ্ছায় কিছুই করিতেন না। তখন ব্যাধিনীকে বধ করিতে পরামর্শ দিবার কেহ ছিল না বলিয়া।

নারদাদি ঋষিগণ ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র সমীপে অকালমৃত্যুর কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া চারিযুগের বর্ণাশ্রম বিষয়ক ব্যাপার নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিলেন—দ্বাপরযুগেও শূদ্রের তপস্যা করা পরম অধর্ম্ম। ত্রেতাযুগের কথা আর কি বলিব?" কিন্তু রাজন্! কোনও শূদ্র দুর্বুদ্ধি বশতঃ এই ত্রেতাযুগে তোমার অধিকার মধ্যে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে; সেই জন্যই এই বালকের মৃত্যু হইয়াছে। এই বলিয়া তপস্যা দমনাদি রাজনীতিশিক্ষাপ্রদ বিষয় সকল বলিলেন। তদ্দমনের দ্বারা বালকের জীবন লাভ হইবে।

দেবর্ষি নারদের অসম্পূর্ণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রামচন্দ্র পরমপ্রীত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "সৌম্য! তুমি দ্বিজ শ্রেষ্ঠকে আশ্বাসিত কর এবং বালকের মত শরীর তৈলদ্রোণীতে স্থাপন করাও। বিবিধ সুগন্ধি তৈল দ্বারা উহার মৃত দেহ রক্ষা করিবে। যেন কোন মতে নষ্ট না হয়।" ইত্যাদি।

লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ দিয়া রাম মনে মনে বিমানকে স্মরণ করিলে পুষ্পক রথ তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিল—"এই আপনার রথ উপস্থিত হইয়াছে।"

মন্তব্য—ত্রেতাযুগে এমন বাক্‌শক্তি বিশিষ্ট জীবন্ত রথ ছিল নাকি? তদনন্তর রাম ভরত ও লক্ষ্মণকে নগর রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, প্রদীপ্ত শরাসন, তূণীর ও খড়গ ধারণ পূর্ব্বক বিমানে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ সেই শূদ্র তপস্বীর অন্বেষণার্থে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে **দক্ষিণদিকে** গমন করতঃ বহু অন্বেষণের পর **শৈবল পর্ব্বতের** পার্শ্বদেশস্থ এক সরোবর তীরে **ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে** লম্বমান এক কঠোর তপস্যায় রত তপস্বীকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎ সমীপবর্ত্তী হইয়া কথোপকথনের দ্বারা জানিলেন যে, সে তপস্বী শূদ্রজাতি। তপস্বী শূদ্রজাতি শুনিয়াই দয়াদ্রচেতা রাম কোষ হইতে রুচিরকান্তি শরাসন বহিষ্কৃত করিয়া তাপসের মস্তক ছেদন করিলেন। সেই শূদ্র নিহত হইলে ইন্দ্র ও অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ

সাধুবাদ করিয়া ভূয়োভূয়ঃ রামচন্দ্রের প্রশংসা করতঃ রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবগণ অতীব প্রীত হইয়া সত্য পরাক্রম রামচন্দ্রকে কহিলেন, "হে মহামতে! তুমি সুরকার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়াছ এক্ষণে অভিলাষিত বর প্রার্থনা কর। তৎকৃত বিনাশনিবন্ধন এই শূদ্র স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ হইল। (অতএব শূদ্রের তপস্যা করিতে ভীত হইবার আবশ্যক নাই। তপস্যায় প্রাণ গেলে স্বর্গ হয়। রাম ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দশ বর্ষীয় মৃত পুত্রের পুনর্জ্জীবন বর প্রার্থনা করিলে সেই বর প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই বালক (বা শিশু) পুনর্জ্জীবিত হইল।

মন্তব্য। দেবর্ষি নারদ রামকে না জানিয়া শুনিয়া যোগবলে অকাল মৃত্যুর কারণ যে শূদ্রের তপস্যা, তহা তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিলেন, কিন্তু কোথায় কোনস্থানে সে তপস্বী কি ভাবে তপস্যা করিতেছে যদি রামকে বলিয়া দিতেন, তাহা হইলে রামকে সমস্ত ভূমণ্ডল খোঁজাখুঁজী করিয়া বেড়াইতে হইত না। রামের কপালে কষ্ট ছিল নারদ কি করিবেন!

রামেরও কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার রাজোচিত বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একজন বড় রাজা হইয়া তাঁহার বিশ্বাসী উপযুক্ত কর্ম্মচারী বা সৈন্য সামন্ত পাঠাইয়া অন্বেষণ পূর্ব্বক শূদ্রতপস্বীকে ধরিয়া আনাইয়া যথারীতি বিচার পূর্ব্বক দণ্ডবিধান না করিয়া স্বয়ং তাহার অন্বেষণে বাহির হইলেন কেন? এবং একেবারে এরূপ শিরশ্ছেদরূপ দণ্ড (Capital punishment) বা কেন দিলেন?

তৎকালের দেবতারাও এই রাজার মত বুদ্ধিমান ছিলেন। রাম রাজার এই কার্য্য দেখিয়া সাধুবাদ ও পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং বরও দিয়াছিলেন!

ধন্য সে কালের রাজা ও দেবতা! এই বীরশ্রেষ্ঠ রাজারামচন্দ্রই সীতার জন্য ক্রন্দন করিয়া অশ্রুধারায় ধরণী প্লাবিত করিয়াছিলেন।

যে দেশের জনগণ এই ঔপন্যাসিক বর্ণনায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মনোমধ্যে কুসংস্কার পোষণ করে, সে দেশের অধোগতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

বিজ্ঞ রামায়ণ পাঠকগণ জানেন এবং জানিতে পারেন যে রামায়ণের পূর্ব্ব ও উত্তর কাণ্ড সকল এক জনের ও এক সময়ের লেখা নহে।

বৌদ্ধযুগের বিষয় ও ব্যাপার ইহাতে সন্নিবিষ্ট থাকায় বৌদ্ধ যুগাবসান কালে লিখিত বলিয়া অনেকে স্থির করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

———

মাসপঞ্জি—আষাঢ়, ১৩৪১

কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থানের কংগ্রেস দলের উপর সরকারী কঠোরতার প্রত্যাহার হইতেছে। কংগ্রেস-কার্য্যকরী সমিতি নূতন কংগ্রেস কর্ম্ম পদ্ধতির এক খসড়া পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, ব্যবস্থা পরিষদাদিতে প্রবেশ কল্পে একটা কংগ্রেস পার্লেমেণ্টারী বোর্ড গঠিত হইবে, সভ্যগণকে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে অঙ্গীকার পত্রে সাক্ষর করিতে হইবে, কংগ্রেস পার্লেমেণ্টারী দল মোটামোটি হোয়াইট পেপার-সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবেন না, তবে সাম্প্রদায়িক মীমাংসাতে হস্তক্ষেপ করিবে না ইহাই কংগ্রেসের গান্ধী নীতি, পণ্ডিত মালব্য প্রভৃতি কতিপয় প্রতিষ্ঠাবান সভ্য ইহাতে আপত্তি করিতেছেন—কলিকাতা করপরেশন অনেক কেলেঙ্কারীর পর গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশে চীফ এক্সিকিউটিভ্ অফিসার কর্ত্তৃক আহূত এক সভাতে নলীন রঞ্জন সরকারকে মেয়র ও মিঃ বি,এল, রায় চৌধুরীকে ডেপুটী মেয়র নিযুক্ত করিয়াছেন—মহাত্মা গান্ধী বোম্বাই নাগরিক সভাতে অভিনন্দন লইতে যাইবার পথে তাহার গাড়ীতে কে বোমা নিক্ষেপ করে; কোনও ক্ষতি হয় নাই, রেলপথে তাঁহার রেল বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টাও নাকি এক স্থানে হইয়াছে—প্রায় সকল স্থানেই এক্ষণে ভ্রমণকালে গান্ধী বিরোধী শোভাযাত্রা ইত্যাদি হয়, স্বামী লালনাথ নামক একজন যুবক সন্ন্যাসী ইহার পরিচালক—প্রায় সর্ব্বত্র প্রচুর বর্ষা বারিসম্পাত হইতেছে, চেরাপুঞ্জিতে একদিন ৩৬ ইঞ্চি জল হয়—বিহার আসাম ও পাঞ্জাব প্রদেশে বন্যা-পীড়া উপস্থিত—দেরাদূনে ভারতীয় পাব্লিক স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আরও অগ্রসর—'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক' কার্য্য ১৯৩৫ সালের এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা—রাস্তার নির্ম্মাণ ও সংস্কার কল্পে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট পাঁচবৎসর মেয়াদী একটা পরিকল্পনা করিয়াছেন, ইহাতে ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় ও ২০০ মাইলের অধিক পথ প্রস্তুত হইবে—কলিকাতা হইতে দার্জ্জিলিং ও ঢাকাতে টেলিফোনে বার্ত্তা-ব্যবহারের ব্যবস্থার প্রস্তাব চলিতেছে—পুরী ও শিলংএ মহারুদ্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান হইল—বঙ্গের প্রধান আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক বিবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় সত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন।

বৈদেশিক

সুয়েজ কেনেল কোম্পানীর লভ্যাংশ রূপে ব্রিটেন এবার ২৩১২০০০ লক্ষ পাউণ্ড প্রাপ্ত হইল—ব্রিটিশ রাজসরকার বায়ুপথে দেশরক্ষার সমধিক আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছে—গত জুন মাসে ব্রিটিশ বেকারীর সংখ্যা ২০৯২৫০৬—জার্ম্যানিতে হঠাৎ অন্তর্বিপ্লব প্রজ্বলিত, ভূতপূর্ব্ব চেন্সেলার ভন সীচার সস্ত্রীক গুলিদ্বারা নিহত, কহষ্টর্ম্ম ট্রুপ নেতা ধৃত ও নিহত, অনেকগুলি হিটলারের অনুগত প্রধান কর্ম্মী সামরিক বিচারে প্রাণদণ্ডিত, নির্ম্মম ভাবে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান ও হত্যা চলিতেছে—ইতালীতে হিট্লার-মুসোলিনী সংলাপ হইয়া গিয়াছে, অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখিতে ইহাদের সম্মতি, ইউরোপীয় রাজনৈতিক গগন মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া ইহাদের প্রতীতি—পোলিস মন্ত্রী ম, ব্রনিলাম পীরেকি গুপ্তভাবে হত—অষ্ট্রিয়ান মন্ত্রী ডাঃ ডলফাস মুসোলিনী সহ সাক্ষাৎ করিবেন—জাপ রাষ্ট্রমণ্ডলে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইল, ইহারা অধিকতর জাতীয়ভাবে প্রণোদিত—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ঋণ বৃদ্ধি, রাষ্ট্রের শিল্পোন্নতির জন্য রাজসরকার ঋণ ব্যবস্থা করিতেছে—জাপান সঙ্কল্প করিতেছে যে কাহারও প্রতীক্ষা না রাখিয়া সে নূতন নৌবহরের সম্প্রসারণ করিবে।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

পঞ্চম বর্ষ] শ্রাবণ—১৩৪১ [১০ম সংখ্যা

সাধনার পথে

আধুনিকতার আবেশ।—

আধুনিকতা বলিয়া যে বিকট বিষয় এক্ষণে জগৎ গ্রাস করিতে বসিয়াছে, তাহাকে আর কালের ক্রমগতিতে জগতের অবস্থার একটা স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন বা বর্ত্তমানের স্বভাবজ পরিণতি বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। প্রত্যেক যুগের, প্রতি বর্ষের এবং প্রতি মুহূর্ত্তের একটা নূতনত্ব আছে; তাহা ঐ ঐ সময়ের লক্ষণ, তৎতৎ যুগের ধর্ম্ম এবং কালোপযোগী ফল—অতীতের সহিত তাহার ক্রমানুগতিক সম্বন্ধ আছে; বর্ত্তমানের মুহূর্ত্তগুলি সেখানে অতীতকে মুছিয়া আইসে নাই—অনেক স্থলে অতীতের সহিত ইহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান। কিন্তু আজ আধুনিকতা বলিয়া কালের যে অভিযান উপস্থিত, তাহা অতীতের সমুদয় কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া, প্রকৃতির ক্রমানুগতি ভুলিয়া, কালের অজ্ঞাত প্রদেশে প্রগতি নামের ধ্বজা তুলিতে যাইতেছে। কালের স্বভাবজ লক্ষণ ভুলিবার ভয়েই আজ নবীন, সবুজ, তরুণ, New age, modernism ইত্যাদি নূতন নূতন নামে ইহার সম্বর্দ্ধনা হইতেছে।

সকল দেশে ও সর্ব্ব কালে বর্ত্তমান এই নূতন বেশ পরিয়াই আইসে। নূতন তার নবীন ভাবের গর্ব্বে বিভোর; আপনাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে এ অবসর তার নাই। তবুও সময়ের একটী আভিজাত্য আছে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে স্থির ফল প্রসব করে। সে আভিজাত্য তাহার নিজ পরম্পরা এবং দেশের ও জাতির সংস্কার বা সাধনা। এই আভিজাত্যের বলেই কালের মহিমা, নতুবা উহা ধ্বংসপথের সহায় মাত্র। যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির উত্থান পতন ঘটিয়াছে; ইহাদের মধ্যে যাহারা কালের এই আভিজাত্য লইয়া চলিয়াছে—নিজ সংস্কার ও

সাধনাতে স্থিরতর থাকিতে পারিয়াছে, তাহারাই কালের সর্ব্বধ্বংসী কবল হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইয়াছে। আগত কাল কেবল বর্ত্তমানের রূপে—কেবল আধুনিকতার ক্ষুদ্র আবরণে তাহাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না, ভূত ও ভবিষ্যতের যুক্ত-বন্ধনে তাহাকে স্থিরতর করিয়াই রাখিয়াছে।

আধুনিকতার যে রূপ লইয়া বর্ত্তমান আজ উপস্থিত, তাহাতে রহিয়াছে সর্ব্বপ্রকার সংস্কার ও সাধনাবর্জ্জিত—ভাবপরম্পরা হইতে মুক্ত-কতিপয় জাতির সদ্য প্রতিষ্ঠিত অভ্যুত্থান। ইহাদের অভ্যুত্থান যেমন চমকপ্রদ অধঃপতনও তেমন সত্বর সংসাধিত হইয়া আসিতেছে। ইহারা কেবল অজ্ঞতার আচ্ছন্ন থাকিয়া, আপন শিক্ষা সমাজ ও স্বাতন্ত্র্যের সুস্থ ও সবল ভিত্তিভূমির উচ্ছেদ সাধন করিয়া, নবীনের নামে বিহ্বল হইয়া মরণের পথে চলিবেই।

এজন্য ইহা সত্যের সংশ্রব ছাড়িয়া মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়াছে—ছলনা, চাতুরী প্রভৃতি মিথ্যার অনুচরবর্গ আধুনিকের কর্ম্মক্ষেত্রে সকল অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সত্য ও জ্ঞান হইতে সরিয়া পড়িয়াই আধুনিকতা মায়াবী জগত মোহিত করিয়া লইয়াছে। মানুষকে মোহিত করিবার প্রধান অস্ত্র নারী; কাজেই নারীসঙ্গের ন্যায় উপাদেয় বস্তু আধুনিকের আর কিছু নাই আর নারীপ্রগতি সকল প্রগতির অগ্রগামী হইয়া চলিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার বিলাস ব্যসন ও ব্যভিচার ইহার সহচররূপে চলিতেছে। আধুনিকের নিকট ধর্ম্ম উপহাসের সামগ্রী, নীতি স্বার্থসাধনের উপায় মাত্র, প্রবীণের অভিজ্ঞতা অতীতের পঁচা মাল—সৎসাহিত্য ভীতির বস্তু—দুর্নীতি কলা বলিয়া আদৃত। ইহারা যদি ধ্বংসপথের সাথী না হয় তবে আর কি? আজ ইহার সর্ব্বথা বিরোধ ও পরিবর্জ্জনই একমাত্র রক্ষার উপায়।

পক্ষাপক্ষ।—

রক্ষণশীলতা ও উদারনীতি এই দুই পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চিরকাল মানবসমাজে চলিয়াছে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রতন্ত্রে ইহার প্রয়োগ ও প্রভাব দেখিয়া কতক দিন হইতে এদেশবাসীরা রাষ্ট্রিক ভাবেই ইহার মর্ম্ম ধরিয়া লইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক কিন্তু কেবল রাষ্ট্রে নহে, জাগতিক প্রত্যেক বিষয়ে উহার বিদ্যমানতা। ভারতে কিন্তু এই বিরোধ বহু পূর্ব্বেই মানিয়া চলিয়াছে। কেবল মাত্র পূর্ব্বে উহা যেরূপ স্বাভাবিক ও সমাজের কল্যাণকর ভাবে পরিচালিত হইত, এক্ষণে কৃত্রিম বিজাতীয়তা ও বৈদেশিক প্রভাবে, তাহা বিকৃত ও নানা অনিষ্টের হেতু হইয়াছে মাত্র। বিরোধেরও বিধি আছে। স্থিতি ও পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ঐক্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা পাইতে পারে। প্রকৃতির নিয়মে তাহা পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া মানুষ যেখানে উহার ব্যতিক্রম করিতে গিয়াছে, সেখানেই এই নিয়মের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। মানুষকে এই বিপথে চালাইবার প্রধান যন্ত্র তাহার অহঙ্কার—অহঙ্কার প্রকৃতিতে বিকৃতি ঘটাইবার মৌলিক সাধন; সৃষ্টি ইহার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে, বিনাশও ইহার বশে হয়। সুসভ্য মানব সমাজে উহা প্রথমে স্বাধীন চিন্তা আখ্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, পরে উহা ব্যভিচারে পরিণত হইয়া সমাজকে ধ্বংসের মুখে পরিচালিত করিতেছে। আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে অবস্থা তাহাতে এই রক্ষণশীল ও উদার নৈতিকের সম্বন্ধে চরম ব্যতিক্রম ঘটিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থ—এই সকল ক্ষেত্রেই এই অবস্থা। রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রিক ভাব আজ সকলের মধ্যে প্রবল, এজন্য রাষ্ট্রক্ষেত্রেই এই বিরোধ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। স্থিতি বা রক্ষণশীলতার ঘোর অবমাননা

চলিতেছে—যে দুই চারিটী রাজ্যে রক্ষণশীলতার দিকে প্রযত্ন দেখা যায়—ইংলণ্ড, জাপান, ইটালী প্রভৃতি, যেখানেই তাহা এখনও কতক পরিমাণে অনুসৃত হয়, সেখানেও কিন্তু উহা কোনও মৌলিক সত্যনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে, নিজ নিজ স্বার্থের জন্য মাত্র তাহা অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালী জাগতিক নীতির একটী মৌলিক তত্ত্বের সন্ধান দেয়; বিভিন্ন সমাজের মানব যাহা স্মরণাতীত কাল ধরিয়া মান্য করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমান এই স্বাধীন চিন্তা বা স্বেচ্ছাচারের যুগে প্রায় সর্ব্বত্র উহার উচ্ছেদ সাধন ঘটিয়াছে। ফলে বিপ্লবের পর বিপ্লব সর্ব্বত্র চলিয়াছে; হত্যা ও উৎপীড়ন নূতন নূতন আকারে প্রকাশ পাইতেছে; ঔদ্ধত্য ও স্বেচ্ছাচারিতার হাতে রাষ্ট্র সমর্পিত। কেবল মাত্র ব্যবহারিক উপযোগিতার দৃষ্টিতে প্রতিপালিত হইলেও ব্রিটিশ রাষ্ট্রতন্ত্র রাজমুকুটের সম্মান রক্ষা করিতেছে, এবং তাহাতেই উহা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। জাপ-রাষ্ট্রে রাজপদের সম্মান আরও অধিক; কারণ প্রতীচ্যের সংস্কার ও সমাজ নীতির মৌলিক ভিত্তিতে উহা প্রতিষ্ঠিত। জাপানের জাতীয় প্রকৃতিতে উহা ধর্ম্ম। এজন্য জাপানের রাষ্ট্রশক্তি আজ স্বভাব-সবল ও দৃঢ়সম্বদ্ধ; দেশভক্তি ও রাষ্ট্রশক্তি উহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবল। আধুনিক বিজ্ঞান বল সে সমুদয়ই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে, স্বাধীন চিন্তাও তাহার আছে, কিন্তু উহাকে সে আত্মঘাতী অস্ত্রোপচারে পরিণত করে নাই—নিজ জাতীয় ধর্ম্মের (সিন্তো) সহায়করূপ আত্মসিদ্ধির সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। জানিনা একালের প্রভাব জাপানকেও তাহার এই স্বস্থ ও সুস্থ অবস্থা হইতে বিচলিত করিয়া ফেলিবে কি না। স্বাধীন চিন্তার লীলাভূমি ইউরোপের মধ্যে একালে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণীল জাতিগুলিই উহার কুফল অধিকতর ভুগিতেছে; জ্ঞানবিজ্ঞান ও উদ্ভাবনা শক্তির অগ্রত ফরাসী এক বিষম বিপ্লবের উগ্রফল বহন করিয়া চলিয়াছে, ধর্ম্ম ও চিন্তাধারায় নানা ঘাতে প্রতিঘাতের ক্ষেত্র জারম্যানী এক্ষণে রাষ্ট্রিক ক্রান্তির চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত। যে সত্য ও ধর্ম্মে জগৎ প্রতিষ্ঠিত, তাহার দৃষ্টি হারাইয়া মানুষ আপন সাময়িক সুবিধা ও ক্ষীণ জ্ঞানদৃষ্টির বশে যে পরিবর্ত্তনের অনুসরণ করিতেছে, তাহা কেবল রাষ্ট্রে নহে, সমাজ ও আর্থিক জীবন যাত্রা প্রণালীতে ততোধিক অনর্থের সৃজন করিতেছে। আজ জগতের সর্ব্বত্র তাহা অতি পরিপক্ক ভাবে দেখা দিয়াছে। ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, জীবনযাত্রা, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি সর্ব্বাগ্রে ঐ ধর্ম্ম নীতিকে প্রধান করিয়া পরিচালিত হইয়াছিল, মানুষের স্বেচ্ছাচার তাহাতে আপন প্রভাব বিস্তারের অবসর বড় পায় নাই; এজন্য ভারতে নানা যুগ পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ভারতীয় সাধনার মৌলিক স্থিতির উচ্ছেদ সাধন কখনও হয় নাই। বিপ্লব ভারতের উপর দিয়া খুবই গিয়াছে, এবং আজিও যাইতেছে—এমন দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু ইহার মধ্যে কেবল সে আপন সাধনাগত অন্তর্নিহিত মূল নীতির বলেই স্থিতি ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রাখিয়া, সকল প্রকার বিরোধী শক্তির প্রভাবকে ব্যাহত করিয়া, বিবিধ সংস্কারে আত্মশুদ্ধি সাধন করিয়া আপন সাধনার পথে চলিয়াছে। আজ জগতের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে, বিজাতীয় ভাবপ্রবাহ, বৈদেশিক অধিকারে পড়িয়া, উহার আর এক কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অদ্যকার এই পক্ষাপক্ষের দ্বন্দ্বে তাহাকে আপন স্থান বাছিয়া লইতে হইবে।

দেশীয় লোকের উচ্চ পদবী লাভ।—

নূতন শাসনসংস্কারে 'ইণ্ডিয়ানাইজেসন' বা দেশীয় লোককে রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্তকরণ,

বিশেষতঃ যে সকল উচ্চ পদে এযাবত কাল দেশীয় লোকেরা নিযুক্ত হইতে পারিত না, তাহাতে তাহাদের প্রবেশাধিকার দানের ব্যবস্থা আছে। উক্ত সংস্কারের জন্মদাতা মিঃ মণ্টেগু শ্রীযুত এস্ পি সিংহকে লর্ড পদবীতে উন্নীত করিয়া তাঁহাকে এদেশের একটী প্রাদেশিক গভর্ণরের স্থায়ী পদ দিয়া, তার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, লর্ড সিংহের ভাগ্যে ঐ পদবী ভোগ অধিক দিন ঘটে নাই। তৎপর কয়েকটি প্রদেশে দেশীয় ভাগ্যবান লোকেরা অস্থায়ী ভাবে গভর্ণরের কার্য্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। বঙ্গদেশে এই মাসে কয়েকটী উচ্চ পদবী লাভ বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে—জনপ্রিয় বিচারপতি শ্রীযুত মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় মাত্র দেড় মাসের জন্য অস্থায়ী ভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কার্য্য করিবেন। ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েক জন বাঙ্গালী অস্থায়ী ভাবেই এই পদ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন—যাহারা জাষ্টিস্ মন্মথনাথের মনীষাবল, মহাপ্রাণতা ও সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলকর কার্য্যে তাহার চিত্তনিয়োগ দেখিয়া বাস্তবিকই বিমোহিত, তাহারা তাঁহার এরূপ অস্থায়ী উন্নতিতে তত আনন্দ লাভ করিবেন না—রাজবিধানে এরূপ ব্যক্তির ঐ পদে স্থায়ী নিয়োগে কোনও বাধা আছে কিনা, জানি না; থাকিলে নূতন সংস্কারে ইহার প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক। মিঃ এ. কে. চন্দ শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর বা প্রধান পরিচালক পদ পাইয়াছেন—দেশীয় লোকের পক্ষে এই পদ প্রাপ্তি এই প্রথম, নবনিযুক্ত দেশীয় শিক্ষা-মন্ত্রীর এই নিয়োগে কৃতকৃত্যতা আছে বলিয়া বোধ হয়। দেশীয় লোকের পদবী বৃদ্ধি একালে হইতেছে ও হইবে; কিন্তু ইহাতে এই দেশীয় লোকেরা দেশীয় প্রকৃতির সম্মান কত দূর রাখিয়া চলিতে পারিবেন তাহাই ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। পারিলে, তাহাতে যে ফল হইবে সহস্র উচ্চপদ দ্বারা তাহা হয় না। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় একসময়ে কার্য্যতঃ এদেশের শিক্ষানিয়ন্ত্রণে নিযুক্ত ছিলেন—বিহার প্রদেশে হিন্দীভাষার প্রচলন এবং এদেশের বঙ্গবিদ্যালয়গুলির উন্নতি প্রভৃতি বহু কার্য্যে বহু দিন যাবৎ তাহার প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে রহিয়া গিয়াছে। ভূদেব নিজে দেশীয় প্রকৃতির প্রতীক ও জাতীয় সাধনায় সিদ্ধপুরুষ ছিলেন—তখন কিন্তু 'ইণ্ডিয়ানাইজেসন' ছিল না; তিনি নিজে ছিলেন খাঁটি স্বদেশী ও পরবর্ত্তী স্বাদেশিকতার জন্মদাতা। শ্রীমান্ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চেনসেলার পদে নিযুক্ত হইয়া পিতার উপযুক্ত পুত্রের দাবী বহাল করিয়াছেন—এত অল্প বয়সে (মাত্র ৩৪ বর্ষ) এই পদের দায়িত্ব ইতিপূর্ব্বে আর কেহ গ্রহণ করে নাই। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে তাহার দক্ষতাও অভিজ্ঞতা ইতিপূর্ব্বে অনেক প্রবীণেরও অনুসরণের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু কেবল কার্য্যপরিচালনা অদ্যকার উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের এক মাত্র বিষয় নহে। শিক্ষায় যে সকল দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার প্রতিকারই শিক্ষাপরিচালনার কর্ত্তাদের সর্ব্বাগ্রে দেখা আবশ্যক। আবার শিক্ষাক্ষেত্রের বাহিরেও এক্ষণে অনেক জঞ্জাল সঞ্চার ও সমস্যার উদ্রেক হইয়াছে, একমাত্র সুশিক্ষার গুণে তাহারও দূরীকরণ ও সমাধান হইতে পারে। অদ্যকার লোকচরিত্রের যাহা কিছু দুর্ব্বল ও কলঙ্কময়, তাহা এই শিক্ষা হইতে উদ্ভূত; দেশের লোকের নানাবিধ অভাব ও ক্লেশ, শিক্ষাভাব ও বেকার সমস্যা—এসমুদয়েরও দায়িত্ব শিক্ষাবিভাগেরই; সমাজে আজ যে বাসন ও বিলাসের নিত্য লীলা চলিতেছে তাহাও: শিক্ষা হইতে নিঃসৃত। শিক্ষার দায়িত্ব ও কর্ত্তৃত্ব যাহার উপরে অর্পিত হয়, প্রকৃত কর্ত্তব্যের দায়িত্ব তাঁহার তদপেক্ষা অনেক অধিক।

নবীন ও প্রবীণ।

[শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা]

নবীন যাহাকে প্রগতি মনে করিয়া উল্লসিত প্রবীণ তাহাকেই অধোগতি ভাবিয়া শঙ্কিত। এই পরস্পর বিরোধী উভয়বিধ মনোভাবকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল যুক্তি বা মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে সাধারণভাবে তাহার অধিকাংশগুলি বিশ্লেষণ করতঃ দেখান যাইতে পারে যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘর্ষই এই ভাববিপর্য্যয়ের কারণ; সেজন্য প্রতীচ্য সভ্যতার পক্ষপাতী নবীনগণ অধিকাংশ প্রাচীন প্রথাকেই কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। এবং প্রাচ্য সভ্যতার পক্ষপাতী প্রবীণগণও নবীনের অধিকাংশ কার্য্যকলাপকেই উচ্ছৃঙ্খলতাময় ভাবিয়া থাকেন। একটা সংস্কারের মোহ উভয়েরই বিচার বুদ্ধিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে ও সত্য নির্ণয়ে বাধা জন্মাইতেছে। যেরূপ সংস্কারমুক্ত অহমিকাবর্জ্জিত পক্ষপাতশূন্য উদার মন থাকিলে মানুষ পরস্পরের বক্তব্য শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্য সহকারে শুনিয়া একটা আপোষ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে সেরূপ সত্যানুসন্ধিৎসা কাহারও মধ্যে তেমন দেখা যাইতেছে না। বুদ্ধির চারিপাশে অহমিকার প্রাচীর তুলিয়া সত্যের প্রবেশপথ রুদ্ধকরতঃ স্বমত সমর্থনের প্রচেষ্টাই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নিজের জয় পরাজয়কে উপেক্ষা করতঃ এক মাত্র সত্যের জন্যই বিচারের প্রয়োজন। নতুবা খলের যেমন ছলের অভাব হয় না তেমনি মানুষের স্বকর্ম্মের স্বপক্ষে যুক্তির অভাব কোন দিন ঘটে না। কিন্তু কাহার কোন যুক্তি অধিকতর বিচারসহ বা দৃঢ়। কাহার মধ্যে কতখানি সত্য আছে কোন সভ্যতায় জগতে শান্তি আসিতে পারে—ইত্যাদি বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার খুব সহজসাধ্য নহে। সুতরাং আমরা সকল দিক বিচার না করিয়াই একটা সুবিধানুরূপ মতবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ি ও পরে স্বকার্য্য সমর্থনের জন্য বিচারের নামে বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হই। বিরোধ ও সংশয় তাহাতে বৃদ্ধি পায় ভিন্ন হ্রাসের দিকে যায় না। নবীন ও প্রবীণে যে বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহার পশ্চাতে খানিকটা বুঝিবার ত্রুটি আছে আবার রুচিভেদও আছে। কেহ মনে করেন দেশ উন্নতির পথে চলিয়াছে কেহ বলেন অধঃপাতে যাইতেছে। ইহার কোনটী সত্য ইহার সূক্ষ্ম হিসাব এখনও হয় নাই। কোন কোন বিষয়ে উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও কোন কোন দিকে অবনতির চিহ্নও দেখা দিয়াছে। এখন এই উন্নতির দিকটা প্রবল হইয়া অবনতিকে চাপা দিবে অথবা অবনতির উগ্রমূর্ত্তি উন্নতিকে গ্রাস করিবে, তাহা স্থির করা খুবই কষ্টসাধ্য। এই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।' সুতরাং আমাদের পক্ষে সবজান্তা হইয়া স্বমতকে প্রাধান্য দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। অনেক সময় দেখা যায় ভ্রান্তজীব যাহাকে উন্নতি মনে করিয়া আনন্দে আত্মহারা হয় তাহাই হয়তো পরিণামে মারাত্মক দুঃখের কারণ হইয়া উঠে, আবার যাহাকে অবনতি মনে করিয়া শিহরিয়া উঠে তাহাই পরে উন্নতির সোপান হইয়া দাঁড়ায়। সংস্কারকামী ও রক্ষণশীল উভয়কেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষদর্শনের মধ্যেও মানুষের যখন ভুল হয় তখন ভবিষ্যতের অনুমানকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি করিয়া? সুতরাং স্বমত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা না করিয়া যাহা সত্য, যাহা কল্যাণকর, যাহা এদেশের উপযোগী, যাহা

পরমার্থসাধনের সহায় তাহাকেই উভয় মতবাদের মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তর্কের জন্য তর্ক করিলে তাহার শেষ নাই, মীমাংসা নাই। হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায় যখন ঋষিবাক্যে বিরোধ ঘটে তখন তাহার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বা একবাক্যতা করিবার বিধান আছে। উভয় বাক্যের মধ্য হইতে অপ্রধান অংশ ত্যাগ করিয়া প্রধান প্রধান বিষয়ে মিল রাখা হয়। অথবা অপ্রামাণ্য বচনকে ত্যাগ করিয়া প্রামাণ্য বচনকে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু নবীন ও প্রবীণের মধ্যে যে বিরোধ তার মীমাংসার জন্য সেরূপ কোন চেষ্টা এখনও হয় নাই। বিচারের পদ্ধতি অনুসারে একটা কিছু ভিত্তি করিয়া সত্য মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য দেশের কল্যাণকামী নবীন ও প্রবীণ সকলের সত্যাগ্রহীরূপে সচেষ্ট হওয়া উচিত। নতুবা প্রত্যেকের নিজ নিজ রুচি ও সুবিধা মত একটা মতবাদ সৃষ্টি করিয়া তদনুসারে সংস্কার করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। শাসন অগ্রাহ্য করা, যাহা কিছু আছে তাহার ধ্বংস করা বা নূতন কিছু হইতে না দেওয়াই কাহারও কাম্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। সহস্র চেষ্টা করিয়াও অনেক সময় মানুষের বুঝিবার ত্রুটি ঘটে কিন্তু আমরা অধিকাংশ স্থলে বুঝিবার বিশেষ চেষ্টা না করিয়াই ঠিক বুঝিয়াছি ভাবিয়া অগ্রসর হই। অনেক তরুণকে দৃষ্টিক্ষীণতা বশতঃ চশমা চোখে দিয়া ঐশ্বর্য্য (অর্থাৎ বিলাসিতার উপাদান) বাড়িল—উন্নতি হইল ভাবিয়া আনন্দিত হইতে দেখা যায়। বিচার করিলে বেশ বুঝা যায় ঐ তরুণের একটা ঐশ্বর্য্য বাড়িল একথা যেমন সত্য আবার উন্নতি হইল একথাও তেমনি মিথ্যা। এইরূপ বহু ব্যাপার আছে যাহা বাহ্যতঃ উন্নতি বলিয়া মনে হইলেও কার্য্যতঃ উন্নতি নহে। এ সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে স্বমতকে প্রাধান্য দিয়া বিরুদ্ধবাদীর কথা অগ্রাহ্য করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। সাহিত্য কলা ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ যেমন নবীনগণকে উল্লসিত এবং উৎসাহিত করিয়াছে সেইরূপ সর্ব্বত্র ঐহিকতা উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভোগবাদের প্রাবল্য প্রবীণগণকে ব্যথিত ও শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। উভয়পক্ষেরই উল্লাস বা আশঙ্কার কারণ আছে। যাহাতে পরস্পরকে বুঝিবার ভুল না হয় তাহার জন্য উভয়পক্ষেরই যুক্তিগুলি যথা সম্ভব নিরপেক্ষভাবে দেখান আবশ্যক। যেখানে পরস্পর পরস্পরকে বুঝিবার ভুলে বিরোধ ঘটে সেখানে সেখানে ধৈর্য্য ও শ্রদ্ধা সহকারে উভয়ের বক্তব্য শুনিলে সত্য নির্ণয়ের সাহায্য হয়, মতভেদ অনেকটা কমিয়া যায়। আর যেখানে রুচিভেদ মতভেদের কারণ হয়ে বিরোধের সৃষ্টি করে সেখানেও পরস্পরের প্রতি শত্রুতাবোধ হ্রাস পায়। অতএব এইবার সংস্কার্য্য বিষয়গুলির মধ্য হইতে এক একটীকে লইয়া পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা যাউক।

স্ত্রীস্বাধীনতা নবীনগণের সংস্কার্য্য বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম। তাঁহারা বলেন পুরুষের ন্যায় মেয়েদেরও সর্ব্বত্র সমান অধিকার ও স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। পুরুষের পক্ষপাতিত্বদোষে সমাজ শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ পরাধীন ও পঙ্গু হইয়া থাকায় জাতীয়জীবনের সম্যক্ বিকাশ ও পুষ্টিলাভ হইতেছে না। নর ও নারী উভয়েই মানুষ, উভয়কেই মনুষ্যোচিত সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা সমান অংশে দান করিতে হইবে। নতুবা মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল প্রকার সুযোগ পুরুষ একা লাভ করিবে আর নারী তাহাদের সেবাদাসীরূপে ভোগের পণ্যরূপে পরমুখাপেক্ষিণী হইয়া লাঞ্ছিত জীবন যাপন করিবে। এই অবিচার ও অত্যাচার মূলক প্রথাকে নবীনগণ কিছুতেই সহ্য করিবে না। পাশ্চাত্যদেশের ন্যায় এদেশের নারীদেরও স্বাধীনতা চাই, সমান মর্য্যাদা চাই, সমান অধিকার চাই, ইত্যাদি।

প্রবীণগণ বলেন—স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই স্বাধীনতা শব্দের অর্থ কি? তাহা ভালরূপে অবগত হওয়া প্রয়োজন। স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলন বা যথেচ্ছ-চারিতা স্বাধীনতা নয়। স্ব এবং অধীনতা এই দুইটী শব্দের সংযোগে নিষ্পন্ন স্বাধীনতা বলিতে আমরা স্ব এর অধীনতা বুঝিয়া থাকি। স্ব-শব্দে যদি শুদ্ধ আত্মা হয় তাহা হইলে একমাত্র আত্মার অধীন বলিতে মুক্ত পুরুষকে বুঝায় সুতরাং আমাদের মত বদ্ধ জীবের পক্ষে স্ব শব্দে স্বজন বা স্বধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। নতুবা স্ব এর অর্থ স্বীয় ইচ্ছা ধরিলে স্বাধীন বলিতে স্বেচ্ছাচারীকে বুঝায় কিন্তু কোন সভ্য মানুষই স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেয় না। কোন না কোন সমাজসম্প্রদায় নীতি ধর্ম্ম বা স্বজনের অধীন হইয়া চলিতে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলেই বাধ্য। কোন দিক দিয়া কাহারো অধীন নয় একথা কেহই বলিতে পারেন না। যে শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নারী জাতিকে বিশেষ করিয়া পরাধীন বলা হয়, তাহার অর্থ বাল্যে পিতা যৌবনে ভর্ত্তা ও বার্দ্ধক্যে পুত্র ভরণ পোষণাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। অর্থাৎ পিতা পুত্র ও পতির অধীনে থাকিয়া জীবন ধারণ করিবেন। "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" নারীর স্বতন্ত্রভাবে থাকা উচিত নহে। সাধারণতঃ এই একটী মাত্র বচনের দোহাই দিয়া স্ত্রী জাতিকে পরাধীন বলা হয়। মাতা পিতা পতি পুত্রাদি স্বজন গণের অধীনতা কি সত্যই পরাধীনতা? পুরুষের সহিত নারীর সমানাধিকারবাদটুকু বাদ দিলে গৃহে থাকিয়া স্বধর্ম্ম পালনকে পরাধীনতা বলা চলে না। গৃহের অগণ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে নারীজীবনের পূর্ণতা লাভ হইতে পারে একথা পাশ্চাত্য দেশীয় চিন্তানায়কগণও আজকাল বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নর ও নারী উভয়ে মনুষ্যত্বের দিক দিয়া এক হইলেও কর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ত্তব্যতা এক নহে। সংসারের বাহিক কর্ত্তব্য পুরুষের উপর ও আভ্যন্তরীণ কর্ত্তব্য নারীজাতির উপর সম্পূর্ণ ন্যস্ত থাকিলে পারিবারিক জীবন যেরূপ অধিকতর শান্তি শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠবের সহিত রক্ষিত হইতে পারে উভয়ের তুল্য কর্ত্তব্য বা তুল্যাধিকার স্থলে তাহা হয় না। সন্তানপালনের কর্ত্তব্য জননীর উপর ন্যস্ত রাখা যদি যুক্তিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কেহই জননীকে কেরাণী দোকানদার বা চাষীরূপে দেখিতে চাহিবেন না। আকৃতির কমনীয়তা ও প্রকৃতির মাধুর্য্য নারী জাতীকে বাহিরের কোলাহল হইতে দূরে রাখিবারই অনুকুল। বাহিরের কতকগুলি ব্যাপারে যুবতী স্ত্রীলোকের একাকী যথেচ্ছ বিচরণের যেমন বাধা আছে, সাংসারিক বহু ব্যাপারে তেমনি পুরুষের হস্তক্ষেপ চলে না। বহু স্ত্রী সানন্দে স্বামী পুত্রের সেবা করেন আবার বহুপুরুষ স্বেচ্ছায় স্ত্রী বা জননীর হস্ত-পুত্তলিকার ন্যায় পরিচালিত হইয়া থাকেন। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও আছে কিন্তু তাহা অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রী বা পুরুষের শিক্ষার অভাবে ঘটিতে দেখা যায়। জাতিভেদের দ্বারা কর্ম্ম বিভাগকে যেমন অনেকে প্রতিযোগিতাবিহীন সুব্যবস্থা বলিয়া মনে করেন, স্ত্রী পুরুষের পৃথক্‌ভাবে কর্ত্তব্যের সীমা নির্দ্দেশ থাকাটাও তেমনি বাঞ্ছনীয় সুব্যবস্থা। ইহার ফলে এদেশে নর নারীর মধ্যে প্রতি-যোগীতার বিষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। কর্ত্তব্যপালন যাদের ধর্ম্ম অধিকার আদায়ের হিসাবে তাহাদের লক্ষ্য থাকে না। সেই জন্যই এতদিন কোন নারী গৃহকর্ম্মকে অধীনতা ভাবিয়া পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চায় নাই। অধিকারবাদ যত প্রবল হইবে হিংসা বিদ্বেষও প্রতি-যোগিতা ততই তীব্র হইয়া দেখা দিবে। অধিকারবাদ ও ভোগবাদের প্রাবল্যই পাশ্চাত্যদেশে অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে। পারিবারিক শান্তি সে দেশে দুর্ল্লভ পদার্থের মধ্যে অন্যতম।

হোটেলিজীবনই অধিকাংশের ভাগ্যে ঘটে। ঐহিক প্রতিপত্তিই যাঁদের একমাত্র লক্ষ্য স্বাধিকার বাদ তাদের জন্যই সৃষ্ট। স্বাধিকারবাদ ভোগবাদ সমাধিকার প্রভৃতি এদেশের জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল নহে। লক্ষ্যের বিভিন্নতায় সামাজিক প্রথারও বিভিন্নতা ঘটে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ এক নহে; ভৌগোলিক সংস্থান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সমস্তই পৃথক্। সুতরাং সকল বিষয়ে পাশ্চাত্যকে আদর্শ করিয়া তাহাদের রুচি দ্বারা বিচার করা চলে না। তাঁহাদের এই স্বল্প দিনের সভ্যতার ভিতর ইহার মধ্যেই ক্ষয়ের লক্ষণ দেখা দিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বুঝিতেছেন। নিজেদের বহুকালব্যাপী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া একটী অর্ব্বাচীন সভ্যতার মোহে আকৃষ্ট হওয়া জাতীয় কল্যাণের পরিপন্থী। জীবনসংগ্রামে কুটিল রাজনীতি ও কঠোর অর্থনীতি ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় নারীদিগকেও প্রবৃত্ত করিতে না চাওয়া কি সত্যই অত্যাচার? আজকালকার চিকিৎসা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে বা মস্তিষ্ক পরিচালনায় মেয়েদের জরায়ুসংক্রান্ত ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে। তাহাতে সন্তান উৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মায়। বাহিরের কঠোরতা মেয়েদের স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। ইত্যাদি কারণে অথবা জাতীর প্রথার অনুরোধে হাটে বাজারে স্ত্রীগণকে পুরুষের ধাক্কা খাইতে না দিলে কি সত্যই পঙ্গু করিয়া রাখা হয়? প্রতিযোগিতা ব্যতিরেকে নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রের সীমা মধ্যে পারদর্শিতা দেখাইতে পারা কি সম্মানের বিষয় নহে? সংসারের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া শ্রীসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করতঃ আদর্শ জননীরূপে সন্তানকে শিক্ষাদীক্ষায় গুণে জ্ঞানে মানুষের মত মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা জগতে কোন কর্ম্ম অপেক্ষা হীন বা কম যোগ্যতার পরিচায়ক একথা কেহই বলিতে পারেন না। মহামতি এণ্ড্রুজ এক সময়ে সংবাদ পত্রে লিখিয়াছিলেন ভারতের ন্যায় মাতৃত্বের গৌরব পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এদেশের বহু সন্তান এখনও জননীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। জননীকে প্রণাম না করিয়া ঘর হইতে বাহির হয় না। মাননীয়া য়্যানি ব্যাসেণ্ট তাঁহার হিন্দু ইজম্ গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে সীতা সাবিত্রী আত্রেয়ী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী উভয়ভারতী দ্রৌপদী প্রভৃতির ন্যায় গৌরবময় ইতিহাস অন্য কোন জাতির নারীর মধ্যে নাই। তথাপি আমরা বিদেশীর প্ররোচনায় বিদেশী ছাঁচে মাতৃজাতিকে রূপান্তরিত করিতে চাই। নারী প্রগতির চরম অবস্থায় হার হিট্লারকে আইন করিয়া বিবাহিত জীবন যাপনের জন্য বাধ্য করিতে হইতেছে। ইহা দেখিয়াও যদি আমরা সমানাধিকার বাদের ধুয়া তুলিয়া স্ত্রী স্বাধীনতার নামে বিদেশীর মন্দ দিকটার অনুকরণ করিতে যাই পরিণামে পরিতাপের সীমা থাকিবে না। সংস্কারকামী নবীনগণ স্ত্রীস্বাধীনতা বলিতে পশ্চিমের অনুকৃতি ভিন্ন জাতীয় আদর্শের অনুকূলভাবে অন্য কিছু চিন্তা করেন কি? অনুকরণ যে সুফল প্রসব করে না তাহা সে দিন সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করিয়াছেন। অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—"প্রাচ্য দেশীয় লোকের পক্ষে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র প্রাচ্য যদি পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করিতে যায় তবে পাশ্চাত্যকে আত্মস্থ করিতে পারিবে না এবং জালিয়াতির ন্যায় অন্যায় করিবে"। কবির মতেও দেখা যাইতেছে উন্নতি ও অনুকরণ এক নহে। জজ ব্যারিষ্টার বা কাউন্সিলের মেম্বর হওয়াই যদি স্বাধীনতার লক্ষণ হয় তাহা হইলে বহু পুরুষ ও সেরূপ স্বাধীনতায় বঞ্চিত। কর্ম্মক্ষেত্রে সমান অধিকারই যদি পরমপুরুষার্থ বা শরীর মনের পুষ্টি

সাধক হয়, তাহা হইলে সেরূপ অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করা নীতিবিরুদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকার অর্জ্জনই এদেশের বড় কথা নয়। স্ব স্ব শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত কর্ত্তব্য পালনই এ দেশের ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত। মানুষে মানুষে শক্তির বৈষম্য যত দিন থাকিবে অধিকারভেদও কোন না কোন আকারে ততদিন চলিবে। এবং ধর্ম্মানুগত্যই এই অধিকারগত বৈষম্যের তীব্রতা হ্রাস করিতে পারে। ধর্ম্মবিশ্বাসকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিলে সত্যিকার ভেদজ্ঞান দূর হয় না, সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি পায় না। সকলে সকলের সমান বা সকলের সমান অধিকার এই কথাটী বেশ প্রীতিপ্রদ চিত্তাকর্ষক হইলেও এই সমতা বোধ জন্মাইতে হইলে বহু সাধনার আবশ্যক। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম ও কর্ত্তব্য বোধ বৃদ্ধি পাইলে প্রভুত্বপ্রিয়তা আপনা হইতে হ্রাস পায়। নিজেকে বড় মনে করিবার অভিমান ধার্ম্মিক ব্যক্তির হৃদয়ে স্থান পায় না। সুতরাং যে পথ অবলম্বন করিলে মানুষের হিংসা বিদ্বেষ দম্ভ দূর হয় সর্ব্বত্র আত্মবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্য চেষ্টা করিলে সমাজ হইতে বহু অত্যাচার অনাচার দূর হইতে পারে। নতুবা অধিকার অর্জ্জনের চেষ্টা দ্বারা সামাজিক কলুষতা নিবারণ করা যায় না, শান্তি আসে না।

কোন নীতি নিয়ম বা প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া চলা পরাধীনতা নয়—উহা স্বীয় কল্যাণের জন্যই প্রয়োজন। পরকীয় ভাবের দ্বারা জাতীয় ভাবধারা যদি বিলুপ্ত হয় তাহাই সত্যিকার পরাধীনতা। এদেশে পর্দ্দাপ্রথা বিদ্যমান থাকায় কিছু কালের জন্য নারীগণ সাধারণ পুরুষের সহিত অবাধ মেমামেশা করিতে পায় না, অন্যদেশে তাহা পায়। উহাকেই যদি নারী জাতির পরাধীনতা বলিতে হয় তাহা হইলে বলিব ঐরূপ পরাধীনতা আমাদের মায়েদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়, উহাতে জাতির অকল্যাণ অপেক্ষা কল্যাণই হয় অধিক। অন্য দেশে সীতা সাবিত্রীর জন্ম হয় না। এ দেশের জননীগণ সন্তান কর্ত্তৃক যেরূপ পূজিত ও সম্মানিত হইয়া থাকেন, কোন দেশে সেরূপ মাতৃভক্তির তুলনা আছে কি? এখানকার নারীগণ স্বামী পুত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান না হইয়া নিঃস্বার্থ সেবা দ্বারা সকলের কল্যান সাধন করিয়া থাকেন। তাহা কি উচ্চাদর্শের লক্ষণ নয়? সংসারে নামতঃ পুরুষের কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও গৃহিণীগণই পশ্চাতে থাকিয়া পুরুষকে পরিচালিত করেন ইহা কে না দেখিতেছে? অতএব হে সংস্কারকামী নবীনপন্থী বন্ধুগণ! তোমরা নিজেদের রীতিনীতি প্রথাকে ভালবাসিবার মত স্বাদেশিকতা শিক্ষা কর। যদি কিছু দোষ ত্রুটি থাকে তাহা জাতীয় আদর্শের অনুকূল ভাবে সংশোধন কর। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসূত বিকৃতরুচি ব্যক্তিবিশেষের অহঙ্কারবিজৃম্ভিত মতবাদকে বলপূর্ব্বক সমাজের উপর চাপাইয়া দিয়া চারিদিকে বিদ্রোহের বীজবপন করিও না। মেয়েদের গৃহছাড়া করিয়া হিন্দুর পবিত্র সংসারকে লক্ষ্মীছাড়া করিও না। দুই চারি জন স্ত্রীলোক উকিল ব্যারিষ্টার কাউন্সিলার না হইলে দেশে কোন ক্ষতি হইবে না। একটী আদর্শ জননী বা আদর্শ গৃহিণী সংসারের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। যাহাতে প্রতি গৃহ আদর্শ জননীর কল্যাণস্পর্শে পবিত্র হইবার সৌভাগ্যলাভ করে তোমাদের উৎসাহ সেই মহনীয় কর্ম্মে ব্যয়িত হউক। বিবিয়ানার বিষ মায়েদের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিও না। হিন্দুর গার্হস্থ্যজীবনে যতটুকু শান্তি এখনও আছে তাহার পশ্চাতে মায়েদের মহত্ত্ব সুপরিস্ফুট। স্ত্রীর সাহায্য ব্যতিরেকে পুরুষ অচল আবার সহযোগিতা ব্যতীত নারী পঙ্গু ইহার জন্য পুরুষ বা স্ত্রী দায়ী নহেন—প্রকৃতির বিধানই দায়ী। পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রী স্বাধীনতা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমাদের জাতীয় আদর্শের নিকটবর্ত্তী

হইবার পক্ষে কোন সুবিধা করিয়া দেয় না। প্রতীচ্যের অনুরূপ ভোগবিলাসে যথেচ্ছচারিণী হইয়া চলিবার আগ্রহ জাগাইয়া দেয় মাত্র। ব্রাহ্ম সমাজই প্রথম স্ত্রীস্বাধীনতা অর্থাৎ মেয়েদের অবাধ মেলা মেশার প্রচলন করেন কিন্তু আজ শত বৎসরের অভিজ্ঞতার পর সেই ব্রাহ্ম সমাজেরই বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যৌবন কালে মেয়েদের অবাধ মেলা মেশার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন। এইভাবে প্রবীনগণ স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহার প্রতিবাদে নবীনগণের যে কিছু বক্তব্য নাই তাহা বলা চলে না। নবীন পক্ষে সাধারণ যুক্তি এই যে পুরুষেরা যদি মেয়েদের অবিশ্বাস করে মেয়েরাই বা পুরুষকে বিশ্বাস করিবে কেন? অনভ্যস্ত চক্ষু নারীগণকে ঘরের বাহিরে দেখিলেই শিহরিয়া উঠে। বাহিরের আলো বাতাসে হৃষ্ট পুষ্ট দেহমন লইয়া স্বেচ্ছায় মেয়েরা পুরুষের সহযোগিতা করিবে। সমান না হইলে মিলন হয় না, যাহা হয় তাহা দাসত্ব। বাধ্যতামূলক সেবা ও সংযমের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাকৃত জ্ঞানমূলক কর্ত্তব্যবোধে যে সেবা ও সংযম আসে তাহাই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং হে রক্ষণশীল প্রবীণগণ! ভয় পাইও না অবিশ্বাস করিও না। মেয়েরা স্বাধীন হইলে দেশ উচ্ছন্ন যাইবে না, অধিকতর সুন্দর ও নিপুণতা সহকারে সমাজের সেবা যত্ন করিতে শিখিবে।

ভয়ের যে কারণ নাই সে কথা প্রবীনগণ স্বীকার বা বিশ্বাস করেন না। বর্ত্তমান স্ত্রী স্বাধীনতার যুগে তরুণতরুণীর সহঅধ্যয়নপ্রথা প্রবর্ত্তনইচ্ছুক নবীনপন্থীগণের প্রতি অভিজ্ঞ অধ্যাপক ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাতে প্রবীণগণের ভয় যে অমূলক নহে তাহাই প্রমাণিত হয়। তিনি বলিয়াছেন যে—"ভারতবর্ষে চরিত্রহীনতাই সর্ব্বাপেক্ষা দূষণীয় এবং পাপ বলিয়া গণ্য হয় কিন্তু ইউরোপে তাহা নহে। সেখানে সতীত্বের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় না। সততা ও সাহসের উপর বেশী নির্ভর করা হয়। যৌনঘটিত ব্যাপারে আমাদের নৈতিক অধঃপতন ঘটিতেছে। অথচ পাশ্চাত্য গুণাবলী গ্রহণ করিতে আমরা সক্ষম নহি। আমি ব্রহ্মচর্য্যে বিশ্বাস করি। আমি তিনবার ইউরোপে গিয়াছি এবং সেখানে যে সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা আমার নৈতিক আদর্শের একান্ত বিরোধী। সহ অধ্যয়ন ও অবাধ মেলামেশা দ্বারা মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হয় না। যৌনসম্পর্কে কৌতুহলও নিবৃত্তি হয় না। ইউরোপে একদল ইহার বিরুদ্ধবাদী আছেন এবং আমিও তাঁহাদের দলে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশেও সহঅধ্যয়নের যে অভিজ্ঞতা আছে তাহাতেও আমার মত পরিবর্ত্তিত হয় নাই।" অধ্যাপক মহাশয়ের অভিজ্ঞতা লব্ধ এই অভিমতকে গোঁড়ামি বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। এই কারণেই রক্ষণশীল প্রবীণগণ স্ত্রীস্বাধীনতার নামে অবাধ মেলামেশার পক্ষপাতী নহেন।

এইভাবে বাদ প্রতিবাদ বহুক্ষণ চলিতে পারে। রুচি যেখানে মতভেদের কারণ যুক্তি সেখানে স্বমতে আনিতে পারে না যদি কোন নিরপেক্ষ বিচারকের নিকট আত্ম সমর্পণ করা না যায়। কাহাকে সুরুচি বা কুরুচি বলে তাহার বিচার জন্য একটা প্রামাণ্য মানদণ্ড থাকা চাই—সেই মানদণ্ড হইতেছে স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্র। রুচি কোন সুপথ দেখাতে পারে না যতদিন না মানুষ সংযম সাধনায় সিদ্ধ হয়। কোন হিন্দুর গৃহস্থ রমণীকে পুরুষের সহিত নৃত্য করিতে দেখিলে কেহ বাহবা দিবেন কেহ বা ধিক্কার শব্দ উচ্চারণ করিবেন। একজন বলিবেন মেয়েদের মধ্য হইতে লজ্জারূপ কুসংস্কার দূর হইয়া নৃত্য কলার উন্নতি হইতেছে। ইহা সুসংবাদ সুখের কথা। আর

একজন বলিবেন ইহা মেয়েদের পবিত্রতাহানিকর ও ধ্বংসের পূর্ব্ব লক্ষণ। এই দুইটী মতই দুই দিক দিয়া সত্য, ভোগবাদ যাহাদের লক্ষ্য নারীনৃত্য তাহাদের পক্ষে সুখের বিষয় নিশ্চয়ই। আবার পরমার্থবাদই যাহাদের কাম্য তাহাদের পক্ষে ঐ নৃত্য যে আদর্শের প্রতিকূল তাহাতে সন্দেহ নাই। লজ্জাশীলতা মেয়েদের একটী প্রধান গুণ ও সৌন্দর্য্য, এই লজ্জার আবরণে অনেক দোষ অনেক সময় প্রকাশিত হইতে পারে না। লজ্জাশীলা রমণীগণের মধ্যে যেমন একটী সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে লজ্জাহীনাদিগের মধ্যে তাহা দেখা যায় না; এই কারণে প্রবীনগণ স্ত্রী স্বাধীনতার নামে লজ্জাহীনতার প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত। আর নবীনগণ মেয়েদের নির্লজ্জতাকেই পছন্দ করেন বেশী। অবশ্য লজ্জাশীলতার নামে দেড় হাত ঘোমটা যেমন অনাবশ্যক আবার স্বাধীনতার নামে লজ্জাকে একেবারে বিসর্জন দেওয়াও সুরুচিসঙ্গত নহে। এমন বহু অনাবশ্যকীয় রীতি সমাজে প্রচলিত আছে যাহার সহিত ধর্ম্মের কোন সম্পর্ক না থাকিলেও অনেকে তাহাকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন এবং তাহার ফলে নারীগণকে বাধ্য হইয়া অনেক বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সেই সকল বিষয়গুলির সংস্কার অবিরোধে হইতে পারে। নবীন ও প্রবীন কাহারও মতে মতভেদ হইবে না, বিলাসিতা শ্রমবিমুখতা লজ্জাহীনতা অনুদারতা ও স্বার্থপরতা প্রভৃতি দোষগুলি যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তদুপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতঃ অধিকতর জ্ঞান সংযম ও চরিত্রগঠনের উপযোগী শিক্ষাও সুযোগ দান পূর্ব্বক আত্মবিকাশের অনুকূল ভাবে মাতৃজাতিকে মহিমামণ্ডিত করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় কোন পক্ষই বাধা দিতে পারেন না। পাশ্চাত্যভাবে স্ত্রীস্বাধীনতার কোন প্রশ্ন না থাকিলেও নারী জাতির যথেষ্ট উন্নতি ও স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে। প্রথমে সংস্কার্য্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে নবীন ও প্রবীণ উভয়ের মত আলোচনা করতঃ শেষে মীমাংসায় উপনীত হইবার পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা দেখা যাইবে। আসল কথা স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে অধিকার আদায়ের প্রশ্ন তত বড় নহে। পারিবারিক জীবনে শান্তিশৃঙ্খলাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যত বড়। গৃহকর্ম্ম সন্তানপালনের ভার চাকরের উপর দিয়া উভয়ে চাকরী করিবে অথবা পুরুষ গৃহে থাকিবে স্ত্রী বাহিরে উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিবে এই সকল বিষয় অপেক্ষা কিসে উভয়ের শারীরিক মানসিক ও আত্মিক উন্নতি বৃদ্ধি পায় সেইদিকে লক্ষ্য দেওয়া দরকার—স্বাধীন দেশের তথাকথিত স্বাধীনা রমণীগণ এদেশের রমণীগণ অপেক্ষা কত হীন অবস্থায় দিন যাপন করিতেছেন তাহার একটী বর্ণনা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারকামীর মুখ দিয়া যাহা বাহির হইয়াছে তাহা এই "যে নারীকে ঘরের রাণী করিয়া রাখা কর্ত্তব্য সেই নারী আজ গলিতে গলিতে ঘুরিয়া ফিরিতেছে অথবা কারখানায় কঠিন পরিশ্রম করিতেছে। এক ইংলণ্ডে শুক্‌না রুটির জন্য ৪০ লক্ষ স্ত্রীলোক কারখানায় বা অমনি আর কোনও স্থলে নোংরা কার্য্য করিয়া কষ্টে কাল কাটাইতেছে ওখানে যে নারীদের অধিকারের জন্য আন্দোলনের দিন আসিতেছে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা তাহার কারণ"।

বিধবা বিবাহ—নবীনগণের একটী সংস্কার্য্য বিষয়। বিধবাগণের বিশেষতঃ বালবিধবাগণের দুঃখে হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেরই প্রাণ কাঁদিয়া থাকে। তন্মধ্যে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ক্রন্দনই কার্য্যকর ভাবে সামাজিকের নিকট প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তিনি শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করতঃ বিধবাগণের পুনর্বিবাহ প্রচলনে সচেষ্ট হইয়া তারানাথ বাচস্পতি প্রভৃতি তাৎকালীক পণ্ডিত প্রধানগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ বিচারে পণ্ডিত-

বর্গের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুকূলে না হওয়ায় বিধবাবিবাহ প্রচলনে বাধা উপস্থিত হয়। তাহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অদম্য উৎসাহে ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন সিদ্ধ হয় এযাবৎ প্রায় ৭৮ বৎসরের উপর এই আন্দোলন চলিতেছে কিন্তু অদ্যাপি ঐ বিধবা বিবাহকে হিন্দুসমাজ আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেন নাই। চিরবৈধব্য পালনকে হিন্দুগণ উচ্চাদর্শ বলিয়া মনে করেন। আত্মসংযম স্বার্থত্যাগ পরার্থপরতা প্রভৃতি গুণে বিধবাগণ অতুলনীয় গৌরবের অধিকারিণী। সংস্কারকামী নবীনগণও তাহা অস্বীকার করেন না কিন্তু চিরবৈধব্য পালনকে প্রথা হিসাবে রাখিতে তাহারা অনিচ্ছুক এই খানেই প্রবীণগণের সহিত নবীনগণের মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। নবীনগণ বলেন চিরবৈধব্য পালন স্বেচ্ছাকৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয় বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নহে। এসম্বন্ধে তাঁহারা প্রধানতঃ চারিটী যুক্তি দেখাইয়া থাকেন, প্রথমতঃ স্ত্রী পুনর্বিবাহ করিতে পারিবে না পুরুষ পারিবে ইহাতে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পক্ষপাতমূলক অধিকারগত বৈষম্য করা হয়। দ্বিতীয়তঃ বৈধব্যযন্ত্রণার প্রতি দৃকপাতহীন নির্দ্দয়তা পুরুষের হৃদয়হীনতার পরিচায়ক হয়। তৃতীয়তঃ ইন্দ্রিয়সংযমের অক্ষমতা প্রযুক্ত অনেক ক্ষেত্রে ব্যভিচার ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি কুফল দেখা দেয়—চতুর্থতঃ প্রায়শঃ বিধবাগণকে অপরের গলগ্রহ হইয়া জীবন ধারণ করিতে হয়। প্রথম আপত্তির উত্তরে প্রবীণগণ বলেন নৈসর্গিক নিয়মানুসারে স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে অধিকার বৈষম্য অনিবার্য্য। দাম্পত্যপ্রেমের পবিত্রতা রক্ষা ও সংযমসাধন যদি উচ্চাদর্শ হয় তাহা হইলে অধিকার বাদের দোহাই দিয়া যেহেতু পুরুষগণ একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন সেই হেতু স্ত্রীকেও পত্যন্তর গ্রহণ করিতে হইবে ইহা অসঙ্গত প্রতিহিংসা। প্রকৃতি কর্ত্তৃকই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীগণের মধ্যে কতকগুলি বিষয় অধিকতর দায়িত্ব ও যোগ্যতা অর্পিত হইয়াছে। বংশধারাকে নির্দ্দোষ ও পবিত্র রাখিতে হইলে নারীগণের পবিত্রতার প্রয়োজন যে বেশী তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। পুরুষকে সাংসারিক ব্যাপারে বাধ্য হইয়া অনেক ক্ষেত্রে কঠোর ও নিষ্ঠুর কর্ম্ম করিতে হওয়ায় স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের হৃদয় স্বভাবতই কঠিন এবং স্ত্রীগণের অন্তঃকরণ পুরুষ অপেক্ষা কোমল স্থিতিশীল ও নিবৃত্তিমার্গমুখী। সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বহুগুণে স্ত্রীগণই স্বাভাবিক রূপে পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সুতরাং যোগ্যতা ও সামাজিক কল্যাণের পক্ষে প্রয়োজন বিবেচনায় স্বার্থত্যাগের নিয়ম পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর বিষয়ে কঠিনতর হওয়া দূষণীয় নহে বরং স্ত্রীজাতির পক্ষে অধিকতর গৌরবের বিষয়। তদ্ভিন্ন পুরুষের সংখ্যাল্পতা প্রযুক্ত বিধবাগণ বিবাহ করিলে অনেক কুমারীর পুরুষ অভাবে বিবাহ হইবে না। অন্য আকারে আর একটী নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইবে। নবীনগণের দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে প্রবীণগণের বক্তব্য এই যে মানুষ কেবল দেহী নহে, মানুষের মন ও আত্মা দেহ অপেক্ষা বড় ও মূল্যবান। দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তি মানুষের কাম্য হইলেও আত্মার উপর দেহের প্রভুত্ব অপেক্ষা দেহের উপর মন ও আত্মার প্রভুত্ব অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

দেহের কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিলে যদি মন ও আত্মার উন্নতি হয় তবে সে দেহকষ্ট কষ্টই নহে। দেহের কষ্ট স্বীকার করিয়া বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তির শাসন এবং ভবিষ্যৎ অধিক সুখের উদ্দেশ্যে বর্ত্তমানের অল্পসুখ-ভোগ সম্বরণই মানব জাতির পশু হইতে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। বিধবাগণ যদি কিঞ্চিৎ দৈহিক কষ্ট স্বীকার করিয়া চিরবৈধব্য পালন দ্বারা সমধিক আত্মোন্নতি ও পরহিত সাধনে সমর্থ হন তবে সেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে বলা কি সত্যই নির্দ্দয়তার লক্ষণ। ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর আত্মার

বিলাসাদি সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন আপাততঃ কঠোর বোধ হইলেও তৎপরিবর্ত্তে সুস্থ সবল শরীর ও তজ্জনিত মানসিক স্ফূর্ত্তি ও সহিষ্ণুতা কি সুখের বিষয় নহে! অবশ্য বিধবা কন্যা বা পুত্রবধূকে তদুপযুক্ত শিক্ষা দানের জন্য পিতামাতা শ্বশুর শাশুড়ীকে আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। ব্রহ্মচর্য্য পালনে দীক্ষিত হইয়া সুস্থ সবল শরীরে বিধবাগণ নানা সৎকর্ম্মে দৃঢ়ব্রত হইতে পারেন। মনকে ভগবদভিমুখী করিবার সুযোগ পাইয়া দুঃখজড়িত তীব্র বৈষয়িক সুখে না হউক প্রশান্ত নির্ম্মল আধ্যাত্মিক সুখে পরহিতে ও ভগবৎসেবায় নিয়োজিত জীবন কাটিয়া যায়। বিধবাগণের সেই পবিত্র দেবীমূর্ত্তি এদেশে কাহার না দৃষ্টিগোচর হয়। বিদেশীগণের মধ্যে নাই বলিয়া পরমার্থবাদের অনুকূল কোন পবিত্র প্রথাকে ভোগবাদের প্রতিকূল বিধায় নিন্দা করা চলে না। তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে প্রবীণগণ বলেন, সংযম শিক্ষার অভাবে দুই এক স্থলে ব্যভিচারাদি কুফল দেখা দেয় বলিয়া যে প্রথা অধিকাংশের নিকট উচ্চাদর্শরূপে গৃহীত তাহার পরিবর্ত্তন সাধন অনুচিত। প্রবৃত্তি মন্দ হইলে সধবাগণের মধ্যেও উক্ত দোষ দেখা দিয়া থাকে। তাহাতে কেবল বৈধব্য প্রথাকেই দায়ী করা যায় না। অধিকাংশ বিধবাই কি পবিত্র জীবন যাপন করেন না? যিনি চির বৈধব্য পালনে অক্ষম তাহার পক্ষে আইন অনুসারে বিবাহ করায় কোন বাধা নাই। অভিভাবকগণ হাবভাব বুঝিয়া মন্দের দিকে যাইবার সম্ভাবনা দেখিলে আইন অনুসারে বিবাহ দিতে পারেন। তাহার জন্য প্রথা পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নাই। চতুর্থ আপত্তির উত্তর এই যে যদি কোন পিতা ভ্রাতা দেবর বা ভাসুর বিধবা কন্যা ভগ্নী বা ভ্রাতৃবধূর প্রতি যথোচিত স্নেহ যত্ন সম্মান শ্রদ্ধা না দেখাইয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিতা নিপীড়িতা করেন, তাহা নিশ্চয়ই ধর্ম্মানুগত নহে। সুতরাং তাহার প্রতিকারকল্পে সংস্কারকামীগণ যদি কোন বৈধ উপায় অবলম্বন করেন তাহাতে প্রবীণগণের আপত্তির কারণ নাই। অতএব দেখা যাইতেছে চির বৈধব্য প্রথাকে গৌরব দান করতঃ বিধবাগণকে বিবাহের জন্য প্ররোচিত না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনে অক্ষমতা প্রযুক্ত যাঁহারা বিবাহেচ্ছু তাঁহাদের বিবাহে কোন অসুবিধা বা বাধা না জন্মায় তাহার ব্যবস্থা যদি সংস্কারকগণ করেন এবং অবস্থাবিপর্য্যয়ে যাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন তাঁহাদিগের জন্য কোন প্রকার বিধবা-বৃত্তি বা গৃহশিল্পাদি শিক্ষা দ্বারা উপার্জ্জনের উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেন তাহাতে প্রবীণগণের সমর্থন ও সহযোগিতা থাকিতে পারে। তদ্ভিন্ন বিধবাগণের ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুকূল শিক্ষা ও ধর্ম্মচর্য্যাদির সুব্যবস্থা থাকা সকলের বাঞ্ছনীয়। দৈহিক কষ্টের প্রতি সহানুভূতিপ্রযুক্ত পুরুষের হৃদয়হীনতা ও পক্ষপাতিত্বের দোষ দেখাইয়া বিধবাগণকে পুনর্বিবাহে প্ররোচিত করা অপেক্ষা বৈধব্যের সুযোগ লইয়া মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অধিকতর আগ্রহ ও প্রযত্ন বৃদ্ধি করিতে পারিলেই বিধবাগণের এবং দেশের কল্যাণ অধিক হইবে।

যাঁহারা চির কৌমার ব্রতের পক্ষপাতী তাঁহারা চির বৈধব্য প্রথার বিরোধী হইতে পারেন কি করিয়া বুঝা কঠিন। ভবিষ্যৎ বা পরলোকে সুখের আশায় অথবা অধিকাংশের সমর্থন ও শ্রদ্ধা পাইলে মানুষ অকাতরে গৌরবের সহিত অনেক কষ্ট সহ্য করিতে পারে। কোন প্রথার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইলেই প্রথা পালনে অধিকতর কষ্ট অনুভব হয়। বৈধব্য প্রথার যত নিন্দা প্রচার হইবে ততই উহা পালনের অক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। ভোগবাদী বহির্মুখী জীবের পক্ষে ভোগের সমর্থক যুক্তি পাইলেই তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়া স্বাভাবিক। সুতরাং জাতীয় প্রথার

বিলোপ সাধনের চেষ্টা অপেক্ষা প্রথাকে নিষ্কলুষ করিবার প্রযত্নই অধিকতর কল্যাণ জনক। প্রবীণগণের এই সকল যুক্তির বিরুদ্ধে নবীনগণের প্রধান আপত্তি এই যে আদর্শবাদ একটা বড় জিনিষ হইলেও তাহা কেবল নারী জাতির পক্ষে প্রযোজ্য পুরুষের জন্য নহে ইহা হইতে পারে না। যাঁহারা উচ্চাদর্শ উচ্চাদর্শ বলিয়া চীৎকার করেন তাঁহাদের মধ্যে কয় জন আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম বা চলিতেছেন। এ যুগে হিন্দুর প্রাচীন আদর্শ অনুযায়ী শাস্ত্রানুগত জীবনযাপন অসম্ভব। যুগধর্ম্ম স্বীকারকরতঃ কালোচিত পরিবর্ত্তন আবশ্যক। সেকাল ক একালে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কেবল বাতুলতা। প্রবীণগণ বলেন যাহা সত্য তাহা সর্ব্বকালে সমান, সত্যের ধ্বংস নাই পরিবর্ত্তন নাই। বর্ত্তমানের অধিকাংশ লোক মিথ্যাশ্রয়ী অল্প বিস্তর মিথ্যার ব্যবহার প্রয়োজন মত প্রায় সকলেই করেন তাহার ফলে এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে যে সত্যকে বিশ্বাস করান খুবই কঠিন ব্যাপার, সত্য বলিলেও লোকে মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ করে। মিথ্যা-দ্বারা আত্মগোপন সহজ হয় অনেক অসুবিধা দূর হয়। বুদ্ধিপূর্ব্বক মিথ্যার প্রয়োগে অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় অনেক কাজ অনায়াসে মিথ্যার দ্বারা হাসিল করা যায়। তাহা বলিয়া সদা সত্য কথা বলিলে এই প্রাচীন নীতি উঠাইয়া দিয়া প্রয়োজন মাফিক যেখানে যে শব্দটী মিথ্যা বলিলে সুবিধা যেখানে সেইরূপ ভাবে মিথ্যার প্রয়োগ করিবার জন্য কেহ শাস্ত্রকে কালোচিত পরিবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন কি? সত্যকে উঠাইয়া দেও একথা না বলিয়া সত্য পালনে যে সকল অসুবিধা কালধর্ম্মে বা আমাদের দোষে দেখা দিয়াছে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করাই সংস্কারকামীগণের অবশ্য করণীয় হওয়া উচিত। একজন আদর্শ রক্ষা করেন না বলিয়া অপরকে আদর্শভঙ্গ করিতে উপদেশ না দিয়া যিনি আদর্শ রক্ষা করিতে পারিতেছেন না তাহাকে উহা রক্ষা করিবার মত মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া দেওয়া ও অন্যান্য বাধা দূর করিয়া দেওয়াই সঙ্গত। যে সকল পুরুষ নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানেন না বা করেন না তাঁহাদের জন্য সামাজিক শাস্তি বিধিবহির্ভূত নহে। সুতরাং বিধবা বিবাহের প্রচলন না করিয়া বিধবাগণ যে সকল অসুবিধা ভোগ করেন তাহার অধিকাংশ অসুবিধা দূর করিবার জন্য আন্দোলন চালান যাইতে পারে যাহাতে বিধবাগণের আদর্শে আমাদের গৃহ মন্দিরে পরিণত হয়। বিধবাবিবাহ লইয়া নবীনপন্থী সংস্কারকামীগণের সহিত প্রবীণপন্থী রক্ষণশীলগণের এইভাবে বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে।

বিবাহবিচ্ছেদ আর একটী সংস্কারের বিষয়ীভূত হইলেও এ সম্বন্ধে জনমত দৃঢ় করিবার মত প্রবল প্রচার কার্য্য পরিচালনা এখনও হয় নাই। সুতরাং নবীন পন্থীগণের মধ্যে কেহ কেহ বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষপাতী হইলেও সকলে নহে। সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত কোন সংস্কার কামী মনীষী হিন্দুসমাজের কল্যাণকল্পে হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদ য়্যাক্ট নামক একটী আইন ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে পাশ করাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান যুক্তি এই যে বিবাহ-সম্বন্ধ আজীবন স্থায়ী রাখা হিন্দুসমাজের একটা কলঙ্ক, কোন সভ্য সমাজে বিবাহ সম্বন্ধকে বাধ্যতামূলক স্থায়ী করা হয় নাই। উহাতে অযোগ্য অত্যাচারী স্বামী বা স্ত্রী লইয়া মনের মিল না থাকিলেও বাধ্য হইয়া অশান্তির সঙ্গে অনেক দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সংসার করিতে হয়; ইহাতে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয় না। অতএব প্রয়োজন মত অসুবিধা বুঝিলে বিবাহবন্ধন ছেদন করিবার অধিকার

স্ত্রী এবং পুরুষের থাকা উচিত। প্রবীণগণ বলেন হিন্দুর বিবাহ অন্যান্য জাতির ন্যায় মিলনের চুক্তিপত্র নহে উহা ধর্ম্মসংস্কার প্রেমের পবিত্রতা রক্ষা ও উৎকর্ষসাধন উহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তাহা ক্ষমা তিতিক্ষা ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা দ্বারা যতটা রক্ষা হয় বা বৃদ্ধি পায় সামান্য কারণে বিরোধকে ঘনীভূত করিয়া বিচ্ছেদ ঘটাইলে তাহা হয় না। সারা জীবনের সঙ্গী বা সঙ্গিনী এই বোধ দৃঢ় থাকিলে সেখানে যতটা বিশ্বাস ও প্রেম কেন্দ্রীভূত হয় সম্পর্কের স্থিরতা না থাকিলে তাহা হইতে পারে না। এই ব্যবস্থার ফলে হিন্দুর পারিবারিক জীবন যতটা শান্তিপূর্ণ এখনও আছে অপরের ততটা নাই। দুই এক স্থলে হয়তো ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতে পারে তাহার জন্য একটী নূতন অনিষ্টকর প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে যাওয়া বাতুলতা। একা আমেরিকায় বৎসরে ৭ লক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদের নালিশ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ; উহাই কি সভ্যতা উন্নতির লক্ষণ? কোন কারণে বিরোধ ঘটিলেও মাতৃ পিতৃ ভ্রাতৃ প্রভৃতি সম্বন্ধ যেমন নষ্ট হইবার নহে পতিপত্নী সম্বন্ধও এদেশে তদ্রূপ। উহা চুক্তি বা চুক্তিভঙ্গ নহে। অনুকরণপ্রিয়তা ও নিজেদের সভ্যতার প্রতি আস্থাহীনতাই এই ভাবে যাহার যাহা খুসী হিন্দুসমাজের উপর কষাঘাত করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিয়াছে। এ সম্বন্ধে স্বীয় সভ্যতায় গৌরবিত হিন্দুপ্রধানগণের সকল কথাই গোড়ামি ও কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। নিজদিগকে অসভ্য ও ছোট ভাবিতে ভাবিতে আমরা এতই অসভ্য ও ছোট হইয়া গিয়াছি যে পশ্চিমের দোষ শুনিলেও গুণ মনে করিয়া নিজেদের মধ্যে চালাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠি। সে কারণে সংস্কারকামীগণকে সতর্ক করিবার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারকামী মহাত্মা গান্ধীর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মহাত্মা লিখিয়াছেন "আমার মত এই যে আমাদের সভ্যতার কাছে পৃথিবীতে আর কোনও সভ্যতাই দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন তাহার কাছাকাছি কিছু করিতে পারে এমন লোক দেখা যায় না। রোম মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে গ্রীস ধ্বংস হইয়াছে, মিশরের আধিপত্য আজ আর নাই, জাপান পাশ্চাত্য দেশের মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। চীনের অবস্থা কিছু বলা যায় না। কিন্তু ভারতবর্ষ আজ পড়িয়া গেলেও শিকড় তাহার মজবুত আছে। যে রোম ও গ্রীস নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহাদের পুঁথির পাঠই ইউরোপীয়েরা পড়িতেছে। উহাদের মত ভুল করিবে না এই অহঙ্কারেই তাহারা আজ মত্ত। এমনি দীন তাহাদের অবস্থা। কিন্তু হিন্দুস্থান অচল আছে ইহাই হিন্দুস্থানের গৌরব। হিন্দুস্থানের উপর এই দোষ দেওয়া হয় যে হিন্দুস্থান এতই অসভ্য এতই অজ্ঞান ও এতই কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে ওখানে কোনও পরিবর্ত্তনই করা যায় না। এই অপরাধ আমাদের ভূষণ, কলঙ্ক নয়। অভিজ্ঞতায় যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে কি করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন করা যায়? অনেক পথপ্রদর্শক আসিতেছে যাইতেছে কিন্তু হিন্দুস্থান অচল আছে ইহাই উহার সৌন্দর্য্য, উহাই উহার আশার আলোক ·········অনেক ইংরাজ লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে উপরের বিচার অনুসারে হিন্দুস্থানের কাহারও নিকট হইতে কিছু শিখিবার নাই একথা একেবারে খাঁটী"। রক্ষণশীল প্রবীণগণ স্বীয়মত সমর্থনকল্পে অধিকাংশ স্থলে ইহার অধিক কিছু বলেন না; যাহা হউক অধিকাংশ নবীনও বিবাহবিচ্ছেদ পছন্দ করেন না সুতরাং এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ

(৫)

(স্বামী বিশুদ্ধানন্দ)

কহোল সহসা যাজ্ঞবল্ক্যকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, থাম, থাম, ঢের হয়েছে, তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার জবাব না দিয়ে বেশ পাশ কাটিয়ে চলেচ দেখছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম সর্ব্বান্তর আত্মা কোন্‌টী? 'আত্মা' বলতে, "অহং অহং" বা "আমি, আমি" এই যে আমাদের অন্তপরজ্ঞান হ'চ্ছে, এই অহং জ্ঞানের 'আমি' এই জ্ঞানের

গোচর যে বস্তুগুলি হ'চ্ছে য-দিগকে আমরা আত্মা' বলচি, সেই আত্মাগুলির মধ্যে কোন্ আত্মাটী সর্ব্বান্তর? দেখ যাজ্ঞবল্ক্য, এখন এই জাগ্রৎ অবস্থায়, আমি ব'লতে এই স্থূল শরীরকেই এই অন্নময় আত্মাকেই ত বুঝিয়া থাকি। শুধু যে এই অন্নময় দেহটাকেই 'আমি' বা 'আত্মা বলচি তা নয়; প্রাণের যে আশা আকাঙ্খা; মনের যে সঙ্কল্প, বিকল্প, বুদ্ধির যে সব জ্ঞান, হৃদয়ের, চিত্তের যে সব সুখ, দুখ, আমোদ, আহ্লাদ—এই সবটাকে নিয়েই ত আমি, আমি অন্নময়, আমি প্রাণময়, আমি মনোময়, আমি বিজ্ঞানময়, আমি আনন্দময়। এই অন্নময় আত্মা, এই প্রাণময় আত্মা, এই মনোময় আত্মা, এই বিজ্ঞানময় আত্মা, এই আনন্দময় আত্মা, এই আত্মাগুলির মধ্যে কোন্ আত্মাটি সর্ব্বান্তর, কোন্ সেই সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম আত্মা, কোন্ আত্মা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম? বল, যাজ্ঞবল্ক্য, এই সভার মাঝে, বিদেহরাজ জনক আর এই ব্রাহ্মণমণ্ডলীর সামনে, বেশ স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বল কোন্ সেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, কোন্ সেই সকলের চেয়ে অন্তরতম আত্মা, যে আত্মাকে জা'নলে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়?"

কহোলের কথায় যাজ্ঞবল্ক্য গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন—"কহোল, আমি পাশ কাটিয়ে ত যাচ্চি না, তুমি যে আত্মাগুলির কথা ব'ললে, এর কোনটাই সর্ব্বান্তর আত্মা নয়, এর কোনটাই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম নয়, তোমাকে ত পূর্ব্বেই বলেছি যে, যে জ্ঞানে অপর বস্তুকৃত কোন ব্যবধান নেই, সেই জ্ঞানই হ'চ্ছে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ। এখন বেশ করে ভেবে দেখ, এই অন্নময় আত্মা, এই প্রাণময় আত্মা, এই মনোময় আত্মা, এই বিজ্ঞানময় আত্মা, এই আনন্দময় আত্মার যে জ্ঞান আমাদের হ'চ্ছে সেই জ্ঞান—সেই অনুভূতিতে অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, আনন্দ, অর্থাৎ আমাদের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণশরীর ব্যবধান রয়েছে: এই শরীর গুলির সঙ্গে মিশে, এক হ'য়ে আমাদের আমি'র বা আত্মার জ্ঞান হ'চ্ছে। আমাদের স্থূল, সূক্ষ্ম কারণশরীরে বর্ত্তমান, আমাদের বুদ্ধি, মন, প্রাণ, শরীরে অবস্থিত সমুদ্রে তরঙ্গমালার ন্যায় সতত বিদ্যমান এই যে অশনা, পিপাসা; এই যে বাসনা, এই যে এষণা, এই ত সংসার। শোন কহোল, তুমি যে সর্ব্বান্তর আত্মা, যে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মের কথা বলেছ সেই আত্মা সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্মবর্জ্জিত। অশনা পিপাসা কোন কাম, কোন বাসনা, কোন এষণাই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। সেই আত্মা নিত্য, অব্যয় নির্ব্বিশেষ প্রকাশ স্বরূপ। সে আত্মা অন্ন, মন, প্রাণ, বুদ্ধি এর কোনটা দ্বারাই বিশিষ্ট হয় না। সে যে সর্ব্বপ্রকাশক। এই স্বপ্রকাশ সংস্বরূপ আত্মা নিত্য, অনন্ত, সত্য। ইনিই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম। এই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য আত্মস্বরূপে স্থিতির জন্য ব্রাহ্মণগণ পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা ত্যাগ করেন। ভোগ্য বিষয় থেকে, কাম্য বিষয় থেকে, বহির্বিষয়ে ধাবমান সংসারে আসক্ত চিত্তকে সংসার থেকে উঠিয়ে নিয়ে অন্তর্মুখী করেন। চিত্তকে আত্মতত্ত্বে নিয়োজিত করেন; প্রাণধারণের জন্য শুধু ভিক্ষাচর্য্যা অবলম্বন করেন। তাঁহাদের মন, তাঁহাদের প্রাণ, তাঁহাদের বুদ্ধি, তাঁহাদের চিত্ত দিন রাত, সব সময়েই পর ব্রহ্মে নিমগ্ন থাকে। সর্ব্ববিধ ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিলে হৃদয় জ্ঞানবলে বলীয়ান্ হয়। জ্ঞানীপুরুষ এইরূপে সর্ব্ববিধ ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান বলে বলীয়ান্ হইয়া অবস্থান করেন, কোন বিষয়াসক্তিই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে না। এইরূপে যখন তিনি আত্মবলে বলবান্ হন, যখন তাহার বুদ্ধি জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, তখন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি অনাত্মবিষয়ক সর্ব্বপ্রকার চিন্তা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার চিত্তে তখন অপরিচ্ছিন্ন তৈল ধারাবৎ আত্মবিষয়ক মননই হইতে থাকে; তারপর আত্মবিষয়ক মনন গভীর হইতে গভীরতর ও নিবিড়তর হইলে তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হন। তখন সেই জ্ঞানী ব্যক্তি আত্মক্রীড়, আত্মরতি হইয়া কৃতার্থ হন। তখন, যে অবস্থায় তিনি থাকুন না কেন, যে প্রকার আচরণই তিনি করুন না কেন তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠার কোন ব্যাঘাত হয় না। এই যে জ্ঞানীপুরুষ, এই যে সর্ব্বপ্রকার এষণারহিত আত্মতৃপ্ত অবস্থা ইহাই মুক্তি, ইহাই মোক্ষ। এই মুক্তাবস্থা ব্যতীত আর যাহা কিছু, সবই অবিদ্যাগ্রস্ত; সবই শোক মোহ জরা মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত। এবার বুঝেছ কহোল।" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শ্রবণে কহোল নিরুত্তর হইয়া স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

ধর্ম্মে পাশ্চাত্য প্রভাব।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

পরাজিত জাতি আত্মরক্ষা করিতে করিতে যখন ধর্ম্ম হারায়, তখন আর তাহার নিজত্ব থাকে না। তখন সে ক্রমশঃ বিজেতার জাতিতে পরিণত হয়। এজন্য প্রথমে যায় তাহার ধনসম্পত্তি, তৎপর যায় তাঁহার জীবিকার্জ্জনপদ্ধতি, তৎপরে যায় তাহার শিক্ষাদীক্ষা; এইরূপে ক্রমশঃ যায় তাহার পোষাকপরিচ্ছেদ, আচারব্যবহার এবং পরিশেষে যায় তাহার ধর্ম্ম। এই প্রকার অবস্থা অল্পবিস্তর ভারতে অনেকবার ঘটিয়াছে; কেবল ধর্ম্মটী যায় নাই বলিয়া আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রায়ই লাভ করিয়াছে। অবশ্য ইহার অনেক সাক্ষ্যই আজও পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ত্তমানের পাশ্চাত্যবিজয় যে কোথায় গিয়া শেষ হইবে, তাহা এখন ভাবিবার বিষয়। এবার ধর্ম্ম লইয়া, কেবল ধর্ম্ম লইয়া কেন, তাহার মূল পর্য্যন্ত ধরিয়া টানাটানি, এবার কি হয়, আজ মহাচিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমানের পাশ্চাত্যবিজয়ে আমাদের উক্ত দশার সকল গুলিই বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীজীবন হইতে সহর জীবন পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে উক্ত সকল দশাই পরিদৃষ্ট হইবে। আমাদের ধনসম্পদ যে গিয়াছে, তাহা আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। আজ আমাদের অনেকেরই সম্পদ কাগজপত্রে পরিণত। রজতকাঞ্চন মণিমাণিক্য আর কাহারও গৃহে নাই। যাহা যাহার আছে তাহাও প্রায় ব্যাংকেই থাকে। এইরূপ আচারব্যবহার পোষাকপরিচ্ছদ, সকলের মধ্যেই বিশেষ পরিবর্ত্তন। অবশিষ্ট যে ধর্ম্মজ্ঞান, তাহাও আজ আর ভারতে লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকিতেছে না। আজ ধর্ম্মজ্ঞানের মূল যে সংস্কৃতবিদ্যা, তাহার জন্যও ইউরোপে যাইতে হইতেছে। সংস্কৃতবিদ্যায় বিলাতি ছাপ থাকিলে, তাহার আজ বিশেষ আদর, তাহার অর্থসমস্যা, অন্নচিন্তা সুমীমাংসিত। অধিক কি, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও, তাহার মূল্য নাই, তাহার যে দারিদ্র্য সেই দারিদ্র্য বর্ত্তমান, কিন্তু তাঁহারাই যদি একবৎসরের জন্য বিলাতে গিয়া একটী বিলাতি ছাপ আনিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার আর ভাবনাচিন্তা নাই, আসিবামাত্রই বৃত্তি। বস্তুতঃ এ প্রলোভন কি সম্বরণ করা যায়? কিন্তু বিলাতে গিয়া সংস্কৃত শিক্ষার প্রবৃত্তিটা যে ভারতমাতার শিরে সবুট পদাঘাত-বিশেষ, তাহা আর বুঝিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত ইঁহাদের নাই। তাই মনে হয়, আজ আমাদের ধর্ম্ম ও তাহার মূল পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি, এবার আমাদের ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বুঝি যায়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার যে কত ঐশ্বর্য্য, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এ জাতীয় পাশ্চাত্য পণ্ডিত আজ আমাদের বহু সংস্কৃতশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায়ই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হন, অথবা অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতবিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা হন। অনেক সময় ইঁহাদিগকে কিছু দিন শিখাইতে পারেন, এখন দেশীয় পণ্ডিতবর্গের উপর ইহারা কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হন। আমাদের বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রসম্বন্ধে ইঁহারা যে মতামত প্রকাশ করেন, ছাত্র মহলে তাহার বিশেষ আদর হয়। ইংরাজী শিক্ষিত সমাজেও এই সকল মতামতের সম্মান অধিক হয়। এই সকল পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনেক

সময় অধীনস্থ পণ্ডিতবর্গের নিকট গোপনে শিক্ষা করেন এবং অপরের নিকট সেই সব পণ্ডিত দিগকে মূর্খ বলিয়া উপেক্ষা উপহাসও করেন। ইঁহারা তাঁহাদের নিজশিক্ষার অনুরূপশিক্ষার জন্য উৎসাহ দেন, তাঁহাদের পথে অপরকে চলিতে উপদেশ প্রদান করেন। নিজে যেমন নিজকুলধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্মের সেবাকে অজ্ঞতার পরিচায়ক বলিয়া বুঝেন, অপরকেও তাহাই বুঝান। বেদশাস্ত্রে অভ্রান্ততা বোধ, পরকালে বিশ্বাস, দেবদ্বিজগুরুভক্তি, পূজাপাঠব্রতনিয়মাদি—সকলের মধ্যে অন্ধ-বিশ্বাসের মাত্রাভেদও ক্রমোন্নতির অনুসন্ধান করেন।

কেবল কি তাহাই, ইহারা যে পাশ্চাত্যভাবাভিমানিনী দেবতার অভীষ্টসিদ্ধির পথে কিরূপে কতদুর সহায়তা করিতেছেন, তাহা বুঝিতেও পারেন না। জীবদেহ খাদ্য গ্রহণ করিয়া সেই খাদ্যকে যেমন স্বদেহে পরিণত করিয়া স্বদেহের পুষ্টিসাধন করে, তদ্রূপ এই বিজেতা পাশ্চাত্য-ভাবটী আজ আমাদের ভারতীয় ভাবকে গ্রাস করিয়া কিরূপে পাশ্চাত্যভাবে পরিণত করিতেছে, এবং পরিশেষে নিজ ভাবেরই পুষ্টিসাধন করিতেছে, তাহা ইহারা বুঝেন না। বিজেতা জাতি, পরাজিত জাতির সমূলধ্বংসসাধনে ইচ্ছা করিলে সেই পরাজিত জাতির মধ্য হইতে কতিপয় ব্যক্তিকে বিশেষভাবে অনুগৃহীত করিয়া স্বমতে আনিয়া বিশেষভাবে শক্তিশালী করিয়া তুলেন, এবং তৎপরে তাহাদের দ্বারাই সেই জাতির শিক্ষাদীক্ষার বিকৃতিসাধন করিয়া নিজ অভীষ্টসাধন করেন; আর তখন সেই পরাজিত জাতি তাহার প্রতিবাদ করিলে সেই বিজেতাজাতি সেই পরাজিত জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন; কখন বা পরাজিত জাতিকে গৃহবিবাদের পথ দেখাইয়া দেন, এবং তাহারা সেই বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে উভয়পক্ষকেই সমর্থন করেন। আর এই নীতির এই মানস পুত্রগণকে ইহা বুঝাইতে গেলেও যখন ইহারা বুঝিতে চাহেন না—তখনই তাঁহারা তাঁহাদের নীতি সফল হইয়াছে মনে করেন। আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞগণ সেই বিজেতা পাশ্চাত্য ভাবের অনুগৃহীত মানসপুত্র। একথা ইঁহাদিগকে বলিলেও ইহাঁরা ইহা ভাবিতেও ইচ্ছা করেন না, বিশ্বাস করিতেও ইচ্ছা করেন না। সুতরাং তাদৃশ নীতির সফলতার আশ্রয় আজ ইঁহারাই।

কারণ, এই জাতীয় ব্যক্তিই আজ সংস্কৃত শিক্ষাকে স্বেচ্ছাধীন বিষয় করিয়াছেন। এই জাতীয় ব্যক্তিই স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে স্বধর্ম্মবিধর্ম্ম সাধারণ ধর্ম্মহীন শিক্ষার পক্ষপাতী। এই জাতীয় ব্যক্তিই পাঠ্যপুস্তক রচনাদ্বারা স্বজাতির আত্মমর্য্যাদার মূল—আমাদের অতীতগৌরব, আমাদের ভবিষ্যদ্ গৌরবভূমি বালকবালিকাদিগের মন হইতে মুছিয়া ফেলিতেছেন। এই জাতীয় ব্যক্তিই আমাদের দেব ঋষি ও তপস্বিগণের এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের গৌরবক্ষুন্নকর গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আমাদের জাতীয় আদর্শশিক্ষার সর্ব্বপ্রধান পুস্তক সেই রামায়ণ মহাভারতের উপর অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া থাকেন। এই জাতীয় ব্যক্তিই ভারতের যাহা কিছু ভাল, সবই বিদেশী আমদানী বলিয়া থাকেন। যে সকল শত্রুমত নিপাত করিয়া আমরা আমাদের অনাদিকালের ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতের বাহবায় উৎসাহিত হইয়া, পাশ্চাত্য অর্থে পরিপুষ্ট হইয়া সেই সকল শত্রুগণের ধর্ম্মমতের ভস্মাবশেষ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ইহারাই আমাদিগকে, সুতরাং নিজদিগকেও, ছিন্নভিন্ন দুর্ব্বল ও চিরতরে পরপদানত রাখিবার ব্যবস্থার সহায়তা করিতেছেন। যে সব আচার্য্য সিদ্ধ মহাত্মগণকে অবলম্বন করিয়া

সম্প্রদায়ভেদে আজও এই জাতি আত্মরক্ষা করিতেছে, স্বাধীনচিন্তার উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া সেই সকল আচার্য্য মহাত্মগণের বিদ্যা বুদ্ধি ও অলৌকিক শক্তিকে ভ্রম প্রমাদ ও বুজ্‌রুগি প্রভৃতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাদের উপর আমাদের শ্রদ্ধাবুদ্ধি বিলুপ্ত করিতেছেন। অদৃষ্টের কি নির্ম্মম পরিহাস! ইঁহারা চাহেন—আবার জাতীয়তা, ইঁহারা চাহেন—আবার স্বাধীনতা। অবশ্য এই সকল পাশ্চাত্য শিক্ষিতের মধ্যে একেবারেই যে ভাল লোক নাই—এরূপ বলা সঙ্গত হইবে না, তবে ইঁহাদের সংখ্যা এতই অল্প যে, "নাই" বলিলে বিশেষ ভ্রম হইবে না।

তাহার পর, শত্রুদলের ধ্বংসসাধন করিতে হইলে যেমন অগ্রে প্রধান শত্রুর নিপাত করাই নীতি, তদ্রূপ আমরা এখনও পর্য্যন্ত আমাদের যে শাস্ত্র ও যে সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, এই সকল পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকেই আমাদের সেই শাস্ত্র ও সেই সম্প্রদায়ের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া তাহার উপর আমাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বিলুপ্ত করিয়া থাকেন। আর এই কার্য্যে যিনি যত কৃতকার্য্য হইতেছেন, তিনি ততই পাশ্চাত্য বাহবা পাইতেছেন, আর সেই বাহবায় উৎসাহিত হইয়া দ্বিগুণ উদ্যমে আক্রমণ আরও তীব্রতর করিয়া তুলিতেছেন। এইরূপে আমাদের শত্রুপক্ষের প্রধান মল্লনিবর্হণনীতির ইঁহারাই প্রধান সহায় হইয়া থাকেন।

আমাদের সেই শাস্ত্র এবং সেই সম্প্রদায় এখন আমাদের বেদশাস্ত্র এবং বেদান্তসম্প্রদায়, বা স্মার্ত্তসম্প্রদায়। এই শ্রেণীর বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তি বহু দিন হইতে এই দুইটী বিষয়ের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া ইহাদের বিষয়ে আজ নব্যশিক্ষার্থীদিগের হৃদয় এমন স্বাধীনচিন্তার স্রোত উৎপাদন করিয়াছেন, যে ইহাদের দ্বারা আমাদের জীবন যে চরিতার্থ হইতে পারে, তাহা তাহাদের লক্ষ্য-বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। ইহা যে সাধনার শাস্ত্র, ইহা যে মোক্ষসাধনসহায় প্রধান সম্প্রদায়, তাহা আর ইঁহারা বিশ্বাস করেন না। ইহারা বেদ ও বেদান্ত পড়েন, পাশ্চাত্য টীকাটিপ্পনীসাহায্যে নিজে নিজে; যথাবিধি বেদপাঠ ইঁহাদের মতে অজ্ঞতা। এই বেদ ও বেদান্ত পড়িবার উদ্দেশ্য—পূর্ব্বকালে দেশের ভূগোল ও ইতিহাসের আবিষ্কার, সমাজের রীতিনীতিনির্ণয়, কখন বা এই বৈদিক জাতির বর্ব্বরতার নিদর্শননির্দ্ধারণ, অথবা বেদের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশনিরূপণ। ইঁহারা বেদান্তের নানা সম্প্রদায়ের মতামত আলোচনা করেন—বেদান্তের প্রধান ও প্রচলিত অদ্বৈতমতের দুর্ব্বলতা বা পরানুকরণতা আবিষ্কারের জন্য। ফলতঃ পাশ্চাত্যভাবাভিমানিনী দেবতার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রধানশত্রুনিপাতের ব্যবস্থা বেশ সফলতার সহিতই অনুষ্ঠিত হইতেছে।

আমাদের অদ্বৈতবেদান্তমতখণ্ডনের জন্য ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৌদ্ধবাদ সমাশ্রয় করেন, কেহ বা প্রেমপ্রধান বিকৃত দ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ অথবা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ অবলম্বন করেন। কারণ, প্রেমপ্রধান বাদের আকর্ষিণী শক্তি খুব বেশী হয়। ইহাতে সুখলালসার চরিতার্থতা যেমনটী হয়, এমনটী আর কোথাও হইতে পারে না। কেহ বা অনন্তক্রমোন্নতিবাদ আশ্রয় করিয়া সেই অদ্বৈতবেদান্তমতের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। কারণ, ইহাতে যতই কুকর্ম্ম করা যাউক না কেন, উন্নতিই হইতে থাকিবে, নরকভয় বা অবনতির কোন সম্ভাবনা নাই। ফলে এই সব আপাতমনোরম শ্রুতিমধুর মতবাদের প্রশংসা ও অদ্বৈতবেদান্তের নিন্দা করিয়া যদি বেদের অপৌরুষেয়তা ও অভ্রান্ততা আমাদিগকে ভুলাইতে পারা যায়, যদি প্রবলপ্রচলিত অদ্বৈতবেদান্ত মতকে ভ্রান্তমত বলিয়া বুঝাইতে পারা যায়, যদি তাহার দ্বারা জীবনের চরিতার্থতা হইতে পারে

না, ইহা বুঝাইতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই পাশ্চাত্যভাবদেবতার প্রধান শত্রুর নিপাত হইল। আর তাহা হইলে পৌরুষেয় শাস্ত্র ও ক্ষুদ্রক্ষুদ্র অপ্রচলিত মতবাদ সকল উন্মূলিত করিতে আর বেগ পাইতে হইবে না। এইরূপে পাশ্চাত্যশিক্ষিত মনীষীবৃন্দ সেই পাশ্চাত্যভাবদেবতার অভিসন্ধিসিদ্ধির প্রধান বাহনস্থানীয় হইয়াছেন। জানিনা—শিক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের ধর্ম্মে এই অতিভীষণ অভূতপূর্ব্ব আক্রমণের ফলে আমাদের ধর্ম্ম আর জীবিত থাকিবে কিনা? এখন বোধ হয়—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

এই ভগবদ্বাক্য অবলম্বন করিয়া, আশায় বুক বাঁধিয়া নিজকে স্বধর্ম্ম পালনে যত্নবান করিয়া রাখা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।

আজকাল বৌদ্ধমত সমাশ্রয় করিয়া যাঁহারা ভারতীয় ধর্ম্মধ্বংসে সহায়স্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বলেন—অদ্বৈতবেদান্তের প্রধান প্রচারক হিন্দুদিগের শঙ্করাচার্য্য। তিনি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হইলেও তাঁহার নিজস্ব কিছুই নাই। তাঁহার যুক্তিবিচারের যে চমৎকারিতা, তাহা বৌদ্ধমতের সম্পত্তি। তিনি বৌদ্ধমতকে বৈদিকমত বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন মাত্র। তিনি বেদান্তপ্রভৃতি শাস্ত্রগুলির ভাষ্য করিয়া বৌদ্ধমতই প্রকটিত করিয়াছেন। বৌদ্ধমত তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। বৌদ্ধমতের প্রাচীন গ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে উভয় সম্প্রদায়ের যুক্তিবিচারের ঐক্য বা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বেদমধ্যে সে সব যুক্তিবিচার নাই। পুরাণ ও মহাভারতাদিতে যে অদ্বয়ব্রহ্মবাদের ও জগন্মিথ্যাত্বের কথা আছে, তাহার নিজস্ব মূল্য কিছুই নাই। কারণ, তাহাতে বৌদ্ধমতের উল্লেখ থাকায় তাহারা যে বৌদ্ধমতাবির্ভাবের পরবর্ত্তী, তাহাতে কোন সন্দেহই হয় না। অতএব কেবল যে শঙ্করাচার্য্যের নিজস্ব কিছুই নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার মতবাদ বৈদিকমতবাদই নহে। এই জন্য বিজ্ঞানভিক্ষু ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পদ্মপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া যে শাঙ্কর বেদান্তকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতবাদ বলেন—তাহা খুবই সঙ্গত, ইত্যাদি।

কিন্তু এই সব সুধীবৃন্দের এইরূপ কথায় আমরা বিস্মিত হই না। কারণ, সূর্য্যের উত্তাপ অপেক্ষা বালুকার উত্তাপ অসহ্যই হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পর আজপর্য্যন্ত প্রায় দেড়হাজার বৎসর অতীত হইতে চলিল, বৌদ্ধগণ এই সময়ের মধ্যে শাঙ্কর মতকে যত আক্রমণ না করুন, বিজ্ঞানভিক্ষু এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কেন তদপেক্ষা অনেক অধিক আক্রমণ করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যশিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞগণ, নিরপেক্ষতার ভান করিয়া, অথবা সত্যানুসন্ধিৎসার ছল করিয়া, কেন এই মতবাদকে অন্যদিক দিয়া নানারূপে আক্রমণ করিয়া সেই সকল প্রাচীন অস্ত্রের পুনঃপ্রযোগে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বিজ্ঞানভিক্ষু ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আক্রমণের উদ্দেশ্য স্বস্বমতে নিষ্ঠাবৃদ্ধি, আর পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণের উদ্দেশ্য—তাঁহাদের প্রেরক দেবতার মনস্তুষ্টি; আর তাহার ফলে ঐশ্বর্য্যের পরিপুষ্টি ও স্বার্থসিদ্ধির পরিপূর্ত্তি। বস্তুতঃ পরাধীন দরিদ্র দেশে এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

আচ্ছা, বৌদ্ধমত শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং বৌদ্ধগ্রন্থে যেরূপ যুক্তিতর্ক দেখা যায়, সেইরূপ যুক্তিতর্ক শাঙ্কর মতে দেখা যায় বলিয়া যদি শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমতেই প্রভাবিত হইয়া থাকেন,

অথবা শঙ্করাচার্য্যের যাহা কিছু ভাল, তাহা যদি বৌদ্ধগণের হয়, তাহাহইলে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী যে বেদ, সেই বেদ দ্বারা কি বুদ্ধদেব প্রভাবিত হয় নাই? অথবা বুদ্ধদেবের যাহা কিছু ভাল তাহা কি বেদের হইতে পারে না? শঙ্করাচার্য্য জন্মিয়াছেন বৈদিক কুলে, লালিতপালিত ও শিক্ষিত হইয়াছেন বৈদিক ধর্ম্মের ক্রোড়ে, সাধন ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বৈদিক গুরুর নিকটে। বুদ্ধদেবও প্রায় তাহাই। প্রভেদ এই মাত্র যে, তিনি বৈদিক গুরুর নিকট হইতে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিয়া গুরুর নিকট হইতে চলিয়া গিয়া নিজে ধ্যানবলে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; অবশ্য এই যে ধ্যান তাহা তিনি বৈদিকগুরুর নিকটই শিখিয়াছিলেন; কারণ, অপর কোন বৌদ্ধ গুরুর শরণগ্রহণের কথা শুনা যায় না। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য হইলেন, প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ, আর বুদ্ধদেব হইলেন অবৈদিক অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ। তিনি বৈদিক কিছুই পাইলেন না। তাঁহার সবই নিজস্ব। শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধকুলে জন্মিয়া বৌদ্ধশিক্ষা পাইয়া পরে বৈদিক হইয়া যদি বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতেন, তবে তাঁহার বৌদ্ধসংস্কারবশতঃ একদিন তাঁহাকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলিতে পারা যাইত। কিন্তু তাহা ত হয় নাই। আর বুদ্ধদেব যদি বৈদিক কুলে জন্মিয়া, বৈদিক শিক্ষা ও সাধনফলে সিদ্ধ হইয়াও বৈদিক মতে অনাস্থ করায় অবৈদিক হন, তবে শঙ্করাচার্য্য বৈদিক কুলে জন্মিয়া বৈদিক শিক্ষা ও সাধনফলে সিদ্ধ হইয়া বৈদিকসম্প্রদায় ত্যাগ না করিয়া বেদ-বিরুদ্ধ বৌদ্ধমত খণ্ডন করায় বৌদ্ধ হন কি করিয়া? বৈদিকসমাজ ও বৌদ্ধসমাজ তৎকালে শত্রুভাবাপন্ন থাকায় পরস্পরের চিন্তায় আদানপ্রদান, শিক্ষার বিনিময় প্রায় অসম্ভবই ছিল। অতএব এস্থলে শঙ্করাচার্য্যকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বলার উদ্দেশ্য—শঙ্করাচার্য্যকে নিন্দা করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহা যে হিন্দুকে তাহাদের আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য সেই পাশ্চাত্য ভাবদেবতার গূঢ় অভিসন্ধির ফল, তাহা বুঝিতে কি আর বিলম্ব হয়?

তাহার পর বেদমধ্যেই পূর্ব্বপক্ষরূপে বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ আছে। পূর্ণমাত্রায় না থাকিলেও বীজাকারে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বেদান্তসারগ্রন্থেও সদানন্দযোগীন্দ্র প্রদর্শন করিয়াছেন। শূন্যকে 'ব্রহ্ম" উপনিষদ্ মধ্যেই বলা হইয়াছে (আমার অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা দ্রষ্টব্য) আচ্ছা, এই বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদপ্রভৃতিকে যদি বৌদ্ধগণ সঙ্গত বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রচার করিয়া থাকেন, আর প্রচার করিতে গেলে, তাহার বিবৃতি ও বিযুক্তিপ্রভৃতি যেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা যদি তাঁহারা করিয়া থাকেন, আর তৎপরে যদি কোন বৈদিকাচার্য্য সম্প্রদায়ক্রমে বেদবিদ্যা লাভ করিয়া বহুপূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান বৈদিক অদ্বয়ব্রহ্মবাদের পুনঃপ্রচারের জন্য বেদ-বিরুদ্ধ ও বেদে পূর্ব্বপক্ষরূপে গৃহীত পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণের প্রপঞ্চিত মতবাদের অনুবাদ করিয়া তাহার খণ্ডন করেন, এবং তজ্জন্য যদি নানারূপ যুক্তিতর্কের উদ্ভাবনা করেন, এবং সেই জাতীয় যুক্তিতর্ক যদি বৌদ্ধগণের বিরোধী মতবাদখণ্ডনের জন্য বৌদ্ধগণের গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি বলিতে হইবে—সেই বৈদিকাচার্য্যের মতবাদ বৌদ্ধদিগের উদ্ভাবিত মতবাদবিশেষ! লৌকিক বিষয়ের আবিষ্কার কি, একই সময়ে পরস্পরনিরপেক্ষ নানা ব্যক্তিকর্ত্তৃক নানাদেশ হইতে সাধিত হয় নাই? বিজ্ঞান জ্যোতিষ প্রভৃতি বহু বিষয়ে এই ব্যাপার ত পাশ্চাত্য দেশই সংঘটিত হইয়াছে। যুক্তিতর্ক ত আর অলৌকিক বিষয় নহে!

বীজ যেরূপ হয় বৃক্ষ সেইরূপ হয়। বেদে পূর্ব্বপক্ষরূপে উক্ত বৌদ্ধমতবাদের বীজ হইতে

বৌদ্ধচিন্তক্ষেত্রে যদি বৌদ্ধমতবাদরূপ মহাবৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তবে বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বেদে, উক্ত অদ্বয়ব্রহ্মবাদের বীজ হইতে বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী অবিচ্ছিন্নসম্প্রদায় বৈদিকগণের হৃদয়ক্ষেত্রে যে অদ্বয়ব্রহ্মবাদরূপ মহামহীরুহের উদ্ভব হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? এইরূপ উদ্ভব হওয়াই ত স্বাভাবিক। মধ্যকালে বৌদ্ধমত প্রবল হইয়াছিল বলিয়া যে, এই অদ্বয়ব্রহ্মবাদে বৌদ্ধমত প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বলিবার ত কোন কারণ দেখা যায় না। এই মতদ্বয় পরস্পরবিরোধী, ইহাদের সমাজও বিভিন্ন। শঙ্করাচার্য্যের সাধকজীবনে কোন বৌদ্ধসম্বন্ধের প্রবাদপর্য্যন্তও নাই। অতএব শঙ্করাচার্য্যপ্রচারিত অদ্বয়ব্রহ্মবাদে বৌদ্ধপ্রতিভার অবদান স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না।

যদি বলা যায় বৌদ্ধদিগের সহিত সংঘর্ষে বৈদিকগণের হৃদয়ে যে অভিনব যুক্তিবিচারের স্ফূর্ত্তি, তাহারাই বৌদ্ধ সম্পদ, তাহারাই বৈদিক হৃদয়ে বৌদ্ধগণের অবদান। বৌদ্ধগণের সহিত সংঘর্ষ না হইলে এই বিচারপারিপাট্য বৈদিকগণের হৃদয়ে বিকশিত হইত না, ইত্যাদি। কি তাহাও বলিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না। যাহার হৃদয়ে যে বিষয়ের স্ফূর্ত্তি হয়, সে বিষয়টী তাহারই সম্পত্তি, অপরের হইতে পারে না। একজন মল্ল যদি প্রতিপক্ষমল্লের প্রতি কোন নূতন অস্ত্র প্রয়োগ করে, আর সেই অস্ত্রপ্রয়োগের প্রতীকারার্থ যদি প্রতিপক্ষমল্লটী কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করে, তবে কি তাহা প্রথম মল্লের অবদান হয় ? গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণগণ যখন বিষাক্ত বাষ্পের ব্যবহার আরম্ভ করিল, তখন বৃটীশ ও ফরাসী নূতন এক মুখাবরণ আবিষ্কার করিল। এই মুখাবরণ আবিষ্কার কি জার্ম্মাণগণের অবাদন ? বৃটীশগণ যখন ট্যাঙ্ক অস্ত্র আবিষ্কার করিল, আর তাহার প্রতিবিধানার্থ যখন জার্ম্মাণগণ ট্যাঙ্কভেদী কামান আবিষ্কার করিল, তখন এই কামানের আবিষ্কার কি বৃটীশের অবদান হইল ? অস্থি ভগ্ন হইয়া জোড়া লাগিলে তাহা অন্যস্থলের তাদৃশ অস্থি অপেক্ষা দৃঢ় হয়, অতএব এই অস্থিদার্ঢ্যতা কি অস্থিভঙ্গকারীর অবদান হইল ? অতএব বৌদ্ধদিগের সহিত সংঘর্ষে বৈদিকগণের হৃদয়ে যে অভিনব যুক্তিবিচারের আবির্ভাব, তাহা বৌদ্ধদিগের দান নহে। তথাপি যদি বলা হয়—জার্ম্মাণের বাষ্প আবিষ্কার বৃটীশের সহিত যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া আবিষ্কার, সুতরাং তাহা বৃটীশ ও ফরাসীর অবদান, এবং বৃটীশের ট্যাঙ্ক আবিষ্কার জার্ম্মাণের সহিত সংঘর্ষের ফল, সুতরাং তাহা জার্ম্মাণের অবদান, তাহা হইলে বৌদ্ধগণের সহিত তৎপূর্ব্ববর্ত্তি বৈদিকগণের সংঘর্ষের ফলে বৌদ্ধগণের যে নূতন যুক্তিতর্কের উদ্ভাবন, তাহাও বৈদিকগণের বৌদ্ধদিগকে অবদান বলিব না কেন ? অতএব এই জাতীয় কল্পনা নিতান্ত নিরর্থক।

যদি বলা যায়—বৈদিকাচার্য্য মীমাংসক কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধগণের নিকট পরাজিত হইয়া বৌদ্ধ হইয়া বৌদ্ধগণের নিকট ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া সেই ন্যায়বিদ্যাবলে বৌদ্ধগণকে পরাজিত করায় বৈদিকগণের যে যুক্তিবিচারে উৎকর্ষ, তাহা বৈদিকগণকে বৌদ্ধগণেরই অবদান হইল। তাহা হইলে বলিব—না, তাহাও বৌদ্ধগণের অবদান নহে। কারণ, গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র বুদ্ধদেব এবং তৎপরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণ কলুষিত করিলে মহর্ষি বাৎস্যায়ন ভাষ্য রচনা করিয়া গৌতমসূত্ররক্ষা করেন। এইরূপ আরও পরে দিঙ্‌নাগাচার্য্য বাৎস্যায়নভাষ্য দূষিত করিলে বার্ত্তিককার উদ্যোতকর সূত্র ও ভাষ্য রক্ষা করেন। পরে বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতি, বার্ত্তিক আক্রমণ করিলে বাচস্পতিমিশ্র এবং তৎপরে উদয়নাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতির আক্রমণ প্রতিহত করিয়া যথাক্রমে বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা

এবং তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি রচনা করেন। গৌতমসূত্রের উপর বুদ্ধদেবের বৃত্তির কথা স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে, মীমাংসক কুমারিল, ধর্ম্মকীর্ত্তির নিকট যে পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা ন্যায়শাস্ত্রীয় বিচারেই পরাজয়। কারণ, তিনি মীমাংসা লইয়াই থাকিতেন, ন্যায়শাস্ত্রে তখনও পরিপক্ব হন নাই। এই জন্য মীমাংসক কুমারিল, বৌদ্ধ হইয়া বৌদ্ধাচার্য্যের নিকট হইতে ন্যায়শাস্ত্র শিখিয়া সেই ধর্ম্মকীর্ত্তিপ্রমুখ বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্মকীর্ত্তি, শুনা যায়, কুমারিলের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং কুমারিলেরই শিষ্য ছিলেন। তিনি বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মপালের নিকট ন্যায়াদি শাস্ত্র গোপনে অধ্যয়ন করিয়া ক্রমে বৌদ্ধ হন, এবং নিজ খুল্লতাত কুমারিলকে পরাজিত করেন, আর ইহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধাচার্য্যের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সেই বৌদ্ধাচার্য্যকে পরাজিত করেন। এসময়ে যে ন্যায়শাস্ত্রের জন্য বৈদিক নৈয়ায়িক ছিলেন না, তাহা নহে, কিন্তু বিচারের পণের অনুরোধে তাঁহাকে বৌদ্ধ হইতে হইয়াছিল, আর সেই জন্য তাহাকে বৌদ্ধের নিকট হইতেই ন্যায়বিদ্যা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আর ইহাতে তাঁহার অন্য প্রকারে লাভও হইয়াছিল। কারণ, তিনি বৌদ্ধগণের কোথায় দুর্ব্বলতা, তাহাও ভালরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন। অতএব কুমারিল বৌদ্ধগণের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া বৌদ্ধগণকে পরাজিত করায়, কুমারিলের প্রতিভা বা বিদ্যা বুদ্ধি যে বৌদ্ধ অবদানে সমৃদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বলিবার কোন আবশ্যকতা নাই। আজকাল বৌদ্ধন্যায় বলিয়া অনেকে চীৎকার করেন, কিন্তু সেই বৌদ্ধন্যায় বৌদ্ধের উদ্ভাবিত নহে, তাহা মহর্ষি গৌতমের। আর বৌদ্ধধর্ম্মের যাঁহারা পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত। তাঁহারাই বৈদিক-শাস্ত্রে পারঙ্গত হইয়া বৌদ্ধশাস্ত্র পুষ্ট করিয়াছিলেন। অতএব বৌদ্ধদিগের যাহা কিছু, সকলি বৈদিক ; বৈদিক বিদ্যাবুদ্ধ বৌদ্ধের নিকট ঋণী নহেন। বৌদ্ধসংঘর্ষে বৈদিকের হৃদয়ে যে নূতন নূতন যুক্তির উদ্ভাবন, তাহা বৈদিকেরই নিজস্ব, তাহা বৌদ্ধের নহে। এস্থলেও কেহ কেহ বলেন, বৈদিক ধর্ম্মের মহামনীষিগণ, বৌদ্ধধর্ম্মে এমন কিছু পাইয়াছিলেন, যে জন্য তাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হন। অতএব বৈদিক ধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা নিশ্চয়ই আছে। এতদুত্তরে আমরা বলিব —ইহা তাহার শ্রেষ্ঠতা নহে। ইহা সেই সকল বৈদিক মনীষীগণের দুর্ব্বলতা, এবং বৌদ্ধমতের আপাতমনোরম সিদ্ধান্তের মোহিনী শক্তি। কাহার কোন্ বিষয়ে দুর্ব্বলতা থাকে বা দুরাগ্রহ থাকে, আর তজ্জন্য সে ব্যক্তি নিজসম্প্রদায় ত্যাগ করে, তাহা আজকালের শাক্তের বৈষ্ণব হওয়া বৈষ্ণবের শাক্ত হওয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ান্তর বা ধর্ম্মান্তর গ্রহণবিষয়ে আলোচনা করিলে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় না। ইহাতে প্রবৃত্তির প্রকারভেদই হেতু হইয়া থাকে।

কুসুমাঞ্জলী দ্বিতীয় স্তবকে মহামতি উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—"ভূয়স্তত্র কর্ম্মলাঘবম্ ইতি অলসাঃ, ইতঃ পতিতানামপি অনুপ্রবেশ ইতি অনন্যগতিকাঃ, ভক্ষ্যাভক্ষ্যনিয়ম ইতি রাগিণঃ, স্বেচ্ছয়া পরিগ্রহ ইতি কুতর্কাভ্যাসিনঃ, পিত্রাদিক্রমাভাবাৎ প্রবৃত্তিরিতি পাষাণ্ডসংসর্গিণঃ, "উভয়োরন্তরং জ্ঞাত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে" ইত্যাদি শ্রবণাৎ অব্যগ্রতাভিমানিনঃ। সপ্তঘটীকাভোজনাদিসিদ্ধেঃ জীবিকা ইতি অযোগ্যাঃ, আদিত্যস্তম্ভনং পাষাণপাটনং শাখাভঙ্গঃ ভূতাবেশঃ প্রতিমাজল্পনং ধাতুবাদঃ ইত্যাদিধন্ধনাৎ কুহকবঞ্চিতাঃ, ততস্তান্ পরিগৃহ্নন্তি ইতি সম্ভাব্যতে।"

অর্থাৎ অলসগণ কর্ম্মের লাঘব দেখিয়া, বৌদ্ধ হয়, হিন্দুসমাজ হইতে পতিতগণ এই সমাজে স্থান লাভ করিতে না পারিয়া অনন্যগতিক হইয়া বৌদ্ধ হয়, পানাহারের নিয়ম নাই বলিয়া লোভিগণ বৌদ্ধ হয়, কুতর্কাভ্যাসিগণ নিজের মনগড়া মত চালান যায় বলিয়া বৌদ্ধ হয়, পাষণ্ড সংসর্গবশতঃ পিতৃপিতামহক্রমে প্রচলিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করায় কতকগুলি লোক বৌদ্ধ হয়, দেহ ও আত্মার ভেদজ্ঞান থাকায় কাহার শুচিতা আবশ্যক—এইরূপ শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ম্মে উদাসীনগণ বৌদ্ধ হয়। জীবিকার্জ্জনে যোগাগণ সপ্তঘটিকার মধ্যে ভোজনাদি লাভ হইবে এই আশায় বৌদ্ধ হয়, আদিত্যস্তম্ভণ, পাষাণবিদারণ, বৃক্ষশাখাভঙ্গ, মনুষ্যশরীরে ভূতাবেশ, প্রতিমাকে কথা বলান তাম্রাদি ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা, ইত্যাদি ধাঁধাতে ভুলিয়া কুহকবঞ্চিতগণ বৌদ্ধ হয়। অতএব তাহারাই বৌদ্ধাদি শাস্ত্রের আদর করিয়া থাকে, এজন্য বৌদ্ধাদিশাস্ত্র মহাজন পরিগ্রহীত নহে।—এই উদয়নাচার্য্য নৈয়ায়িকের আচার্য্য। ইঁহার সমকক্ষ ন্যায়পণ্ডিত ভারতে আর জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ, এবং পরেও জন্মিবেন কি না সংশয়। বৌদ্ধপরাজয়যজ্ঞে ইনিই শেষ আহুতি দেন।

তাহার পর লৌকিক বিষয়ে ইহা অমুকের দান, 'ইহা অমুকের আবিষ্কার' ইত্যাদি নির্ণয়ে কোন বিশেষ ফল নাই। অবস্থাচক্রে মানবের বুদ্ধি বিকশিত হয়। যে জাতি বা যে সম্প্রদায় যেরূপ অবস্থায় পতিত হয়, তাহার বুদ্ধিবিবেচনা তদ্রূপ হয়। যে আজ নীচ, সুযোগ পাইলে সেও একদিন মহান্ হইতে পারে। তর্কবিচারশক্তি, উদ্ভাবনীশক্তি, কল্পনাশক্তি সকলই লৌকিক। চর্চ্চা ও অনুকূল অবস্থা হইলে ইহা সকলেরই সম্ভাবিত হইতে পারে। ইহার শেষও নাই, আদিও নাই। সুতরাং অমুক, অমুকের নিকট ঋণী—এ কথার বিশেষ সার্থকতা নাই। যাহা অলৌকিক বিষয়, তাহাতেই দাতা বা আবিষ্কর্ত্তার বিশেষত্ব। কারণ, তাহা অবস্থাচক্রে সকলের সম্ভাবিত হইতে পারে না। বৌদ্ধদর্শন, অনুভব ও যুক্তির উপর নির্ভর করে। বুদ্ধের সর্ব্বজ্ঞত্বও তাঁহারা অনুভব বা সাধনা ও যুক্তির ফলের মধ্যে গণ্য করেন। তাঁহারা ইহার মধ্যে অলৌকিক অংশ কিছুই মান্য করেন না। অতএব বিচারে কিছুই নির্ণয় হয় না বলিয়া তাঁহারা শূন্যবাদে অবস্থিত হইয়াছেন। যখন কিছুই নির্ণয় হয় না, তখন কিছুই নাই একথা সকলেই বলিতে পারে। এ সিদ্ধান্ত লৌকিক, ইহা কাহারও নিজস্ব হইতে পারে না। তবে যদি এরূপ কেহ বলেন যে, এমন একটী বস্তু আছে, যাহা সকলপ্রকার হইয়াও নিজরূপে নিত্যবিদ্যমান সকল প্রকার অনন্তভাবই তাঁহার ভূষণবিশেষ, তাহা হইলে অলৌকিক কথা কিছু বলা হইল বটে। কিন্তু সে কথা ত বুদ্ধদেব বলেন নাই। সেকথা বেদই বলিয়াছেন। অতএব এই অলৌকিক তত্ত্বের যিনি প্রতিধ্বনি করেন, তিনিও তাঁহার নিজস্ব কিছুই না বলিলেও লোকে উঁহাকে তাহার নিজস্ব বলে। এক্ষেত্রে ঋণী-অঋণী-নির্ণয় কথঞ্চিৎ সার্থক বা আপাতমধুর কথা মাত্র। লৌকিক বিষয় হইতে ইহার মূল্য কিছু আছে। এক্ষেত্রে যদি কেহ বলেন "আমি এই সত্য অনুভব করিয়াছি, এজন্য ইহাই সত্য, তোমরা গ্রহণ কর—" তাহা হইলে তাহার মূল্য বাস্তবিকই কিছু নাই। তাহা যে ভ্রম নহে, তাহার প্রমাণ কি? আর বস্তুতঃ এস্থলে তাহাই ঘটিয়াছে, বৌদ্ধমত ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়া ভারত হইতে বিতাড়িতই হইয়াছে। তবে যিনি বলেন যে, সেই বেদের অলৌকিক তত্ত্বসম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই, আমার নিকট সত্য বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছে, তখন তাঁহার কথা বেদেরই প্রতিধ্বনি বলিয়া গ্রহণযোগ্য এবং তাহার মূল্য আছে—ইহাই সঙ্গত

বলিতে হয়। যদি কেহ বলেন—বেদকে অভ্রান্ত বলিব কেন ? বেদের কথা বলিয়া তাহাকে আমারা মানিব কেন? তাঁহাকে আমার "বেদ মানিব কেন" প্রবন্ধটী পড়িতে বলিব। বস্তুতঃ পাশ্চাত্যশিক্ষিতগণ বলেন,—সকলেই সকল তত্ত্ব আবিষ্কার বা উপলব্ধি করিবার অধিকারী, অধিকারিভেদ আবার কি ? অথচ তাঁহারা যে কেন আবার জাতিবিশেষের ঋণী-অঋণী-তত্ত্ব বিচার করেন, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। এরূপ অবস্থায় যখন আমরা শুনি, হিন্দু-সভ্যতা গ্রীস রোম ইজিপ্ত পারস্ত ও চীন প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়াছে, তখন মনে হয়, পাশ্চাত্য-ভাবাভিমানিনী দেবতার অধিকৃত ভারতরাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার লালসা তাঁহার এতই প্রবল হইয়াছে যে, তাঁহার এই গূঢ় অভিসন্ধিটী আর লুক্কাইত থাকিতেছে না।

বস্তুতঃ বুদ্ধদেব বেদপথে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে অসমর্থ হইলে বৈদিক গুরুত্যাগ করিয়া, অথচ অন্য গুরুর সাহায্য গ্রহণ না করিয়া যখন প্রাণপণ করিয়া বোধিবৃক্ষের তলায় ধ্যান নিমগ্ন হন, আর সেই ধ্যানফলে সিদ্ধিলাভ করেন, এবং তাহার পর তাঁহার উপলব্ধ সত্য যখন তাঁহার নিজের অনুভব বলিয়া প্রচার করিলেন, এবং যে বেদোক্ত ধ্যানে তাঁহার এই সিদ্ধি, সেই বেদকে যখন তিনি অবজ্ঞা করিলেন, তখন তাঁহার বহু শিষ্য হইলেও এবং ক্রমশঃ অর্দ্ধ জগতে তাঁহার মত বিস্তৃত হইলেও যে ভারত ভূমিতে তাঁহার মতবাদের জন্ম, সেই ভারত হইতে তাঁহার মতবাদ বিতাড়িত হইল। আর শঙ্করাচার্য্য যে বেদোক্তমতে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন, এবং সিদ্ধিলাভ করিয়া যখন তাঁহার উপলব্ধ সত্যকে সেই বৈদিক সত্য বলিয়া প্রচার করিলেন, তখন তাঁহার মতটী ভারতে আবার বদ্ধমূল হইয়া গেল। বস্তুতঃ শঙ্করাচার্য্য যদি বুদ্ধদেবের ন্যায় নিজ উপলব্ধ সত্যকে বেদনিরপেক্ষ করিয়া প্রচার করিতেন, তাহাহইলে কোনও বৈদিকধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত না। তাঁহার মতও বৌদ্ধমতের ন্যায় ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইত। বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী বেদের কথাই শিরোধার্য্য করেন, ব্যক্তিবিশেষের কথা তাঁহারা মান্য করেন না। অধিক কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বেদের নিন্দা করিয়া কিছু বলিলে তাহাও অগ্রাহ্য হইত। এজন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের কথা বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বিগণ বেদানুগত করিয়াই গ্রহণ করেন। আর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও তন্ত্রও পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে বেদের দোহাই দিয়াই নিজ কথা বলিয়াছেন। আর এইজন্যই শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যাকালে প্রায়ই নিজেদের মতকে কোন সর্ব্বজ্ঞ বৈদিকঋষিমূলক বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। অতএব শঙ্করাচার্য্যপ্রচারিত অদ্বৈতবেদান্তমতকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমত বলিবার উদ্দেশ্য ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন। বিজ্ঞানভিক্ষু ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের উদ্দেশ্য—স্বস্বমতে শিষ্যবৃন্দের নিষ্ঠাবৃদ্ধি, আর পাশ্চাত্যভাবাভিভূত সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্য—স্বার্থসিদ্ধি !

তাহার পর আবার শুনা যায়—শঙ্করাচার্য্যের বৌদ্ধমতখণ্ডনটী বৌদ্ধমত না জানিয়া খণ্ডন। তিনি বৌদ্ধমত ভালরূপ জানিতেন না। তাঁহার বৌদ্ধমতশিক্ষা স্বদলভুক্ত বৌদ্ধ বিদ্বেষী পণ্ডিতগণের নিকট হইতে। তিনি ভাল ভাল বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে উহা লাভ করেন নাই। কিন্তু যখন তাঁহার যুক্তি অকাট্য বলিয়া বোধ হয়, যখন তাঁহার বিচারনৈপুণ্য নিতান্ত অসাধারণ বলিয়া অনুভূত হয়, অথবা যখন তাঁহার কোন বুদ্ধিমত্তা বা প্রশংসার স্থল উপস্থিত হয়, তখন শুনা যায় যে, উহা তাঁহার নিজের নহে, উহা বৌদ্ধদিগের। তখন তাঁহার বৌদ্ধমতের জ্ঞান আর অল্প

বলা হয় না। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন পণ্ডিতবর্গের মুখে এরূপ অসামঞ্জস্যপূর্ণ বাক্য একটু দীর্ঘকাল আলাপ করিলেই শুনিতে পাওয়া যায়। তখনই মনে হয়, সেই পাশ্চাত্যভাবাভিমানিনী দেবতার নীতি সফলতা লাভ করিয়াছে।

সকলেই জানেন—সকলমতের সঙ্গে সকল মতের কোন-না-কোন অংশে ঐক্য বা সাদৃশ্য থাকেই থাকে। যেখানে অধিক সাদৃশ্য বা ঐক্য থাকে, সেখানে কখন কখন অন্যমতের নামেও সেই মতটী চলিয়া যায়। কিন্তু তাদৃশ অধিক সাদৃশ্য বা ঐক্যসত্ত্বেও যদি একটী মত অপর মতের আমূল খণ্ডন করে, তখন কি অন্যমতের নামে সেই মতটী চলিয়া যাওয়া উচিত? খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের বিদ্যাসাগরী টীকাতে অদ্বৈতবেদান্তমতের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী লঙ্কাবতারসূত্রের যুক্তিবিচারের সাদৃশ্য দেখিয়া পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাঁহারা শঙ্করমতকে বৌদ্ধমত বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিরস্ত করিতেছেন—দেখা যায়। ইহাও আজ হইতে প্রায় ৭।৮ শত বৎসরের পূর্ব্বের কথা। শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিতেও দেখা যায়—কাশ্মীরে বৌদ্ধপণ্ডিতগণ শঙ্করাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"আপনার মতের সহিত শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের প্রভেদ কোথায়?" এবং শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেছেন। অতএব আজ যাঁহারা শঙ্করমতের সহিত লঙ্কাবতার-সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থোক্ত বিষয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া একটা নূতন আবিষ্কার বলিয়া লম্ফঝম্ফ করেন, তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্যম বেশ উপভোগের বিষয়ই হয়, সন্দেহ নাই।

পরিশেষে এই শাঙ্করমতদ্বেষ বা স্বধর্ম্মবিদ্বেষ এই সব পাশ্চাত্যশিক্ষিত সুধীবৃন্দের হৃদয় কিরূপ অধিকার করিয়াছে, তাহার একটী কৌতুকপ্রদ নিদর্শন এই যে, শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ যখন নিজ মতের ব্রহ্মসূত্রভাষ্যাদিতে বৌদ্ধপ্রভৃতি বিরোধী মতের খণ্ডন করিলেন, তখন সেই পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ তৎপূর্ব্ববর্ত্তী শঙ্করাচার্য্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন দেখা যায়; কিন্তু এই সব শিক্ষিত সুধীবৃন্দ বৌদ্ধগণের নিকট শঙ্করাচার্য্যের ঋণ যে ভাবে প্রদর্শন করেন, সে ভাবে শঙ্করাচার্য্যের নিকট পরবর্ত্তী ব্রহ্মসূত্রভাষ্যকারগণের কোনরূপ ঋণ প্রদর্শন করেন না। ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদ্‌সমূহের ভাষ্য শঙ্করাচার্য্য না করিলে, প্রাচীন কোন ভাষ্য অবলম্বন না করিয়া, যে কোন মনীষীই ভাষ্যাদি রচনা করিতে পারিতেন কি না, তাহা ভাবিবারও ইঁহাদের অবকাশ হয় না। কিন্তু যাঁহারা ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ক্রমবিকাশ অনুসন্ধানে তৎপর, তাঁহাদের এই বিষয়টী উল্লেখ করিতে কেন ভ্রম হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যাঁহারা যথাবিধি স্বধর্ম্মপালন করেন, এবং নিজসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ বলিয়া শাঙ্কর সিদ্ধান্তকে আক্রমণ করেন, তাঁহাদের এক্ষেত্রে কোন দোষ হয়—বলা যায় না, কিন্তু যাঁহারা আচারে ও বিচারে ম্লেচ্ছ বা ম্লেচ্ছপ্রায়, তাঁহারা কেন যে বেদ বেদান্তের দোহাই দিয়া শাঙ্করমতখণ্ডনে উৎসাহিত হন, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। তখনই মনে হয়, সেই পাশ্চাত্যভাবাভিমানিনী দেবতার সেই কুটনীতি এস্থলে সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ ইঁহাদের দ্বারা আমাদের ধর্ম্ম যেভাবে আক্রান্ত হইতেছে, তাহাতে অদূরভবিষ্যতে আমাদের ধর্ম্মের অবস্থা যে কিরূপ হইবে, তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয়।

— ——

অভিনন্দন

মান্যবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের
কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদ প্রাপ্তি উপলক্ষে

হে পূজারী, কোন্ অবসরে, তুমি কাহার আসনে,
অভ্যস্ত নৈবেদ্যভার দিকে দিকে সজ্জিত কেমনে
না দেখে' কি পূজায় বসিলে ? কি বলিব স্মৃতিকথা ?
কবে সেই জিত-জেতা নির্ব্বিশেষে পীড়কের ব্যথা
মূর্ত্তিমান দণ্ডসম ধরেছিল ন্যায়ের পতাকা,
বস্ত্রখণ্ডধ্বজোপরি আজও যেন শোভে শশী রাকা—
রেখেছিল দ্বারকার মান স্বজাতির দম্ভ হরে'
লভেছিল ভারতের ভালবাসা পুষ্প সাজি ভরে।
তা'র পর একদিন রিপণের দূরদৃষ্টি বলে
শান্ত দান্ত সৌম্যমূর্ত্তি তেজঃপূর্ণ রমেশের ভালে
হোতার বিজয়টীকা উজলিল সপ্তরশ্মি রেখা,
লিখেছিল বিস্ময়পুলকে নব জাগরণ লেখা,
থরে থরে দেশভরে সাজাইল পূজার সম্ভার,
দেউলের গর্ভগৃহে ন্যায় ও ধর্ম্মের অবতার
আছে, আছে আর্ত্তনিবেদন তরে আশার ঠাকুর,
বেদনা প্রলেপ দিতে, তমোমাঝে নির্ম্মল মুকুর,
দুষ্কৃতের দণ্ড আছে, অধর্ম্মের ভীষণ বিষাণ,
দরিদ্রের বরাভয়, কর্ম্মনিষ্ঠ-বিজয় নিশান !

কিন্তু হায় ! গিয়াছে সেদিন, তা'ও কোন্ লাজে বলি,
সারা বঙ্গ জুড়ে' আজ স্তব্ধবাক্ অশ্রু ছলছলি
অর্থী প্রত্যর্থীর মূক দীর্ঘশ্বাস বিলাপ জানায়—
বিচার-দেবতা কোথা, লুকাইলে কোন্ কিনারায় ?
দিনশেষে বিচারক নথি-পেশ-গণনা-কৌশলী,
দিনশেষে পাপক্ষয় উকীলের অর্থকুতুহলী,
দিনশেষে বন্দীর শৃঙ্খল শুধু বুকে বেজে যায়,
দিনশেষে বাদী প্রতিবাদী ফেরে করে' হায় হায়।
দিনশেষে শূন্যতার শূন্য তারে বাজে ব্যর্থ গান,
দিনশেষে নিরাকার নির্ব্বিকার হাসে ভগবান।
এ নহে সে আশার ও আকাঙ্ক্ষার নিবেদন স্থল,
ব্যথিতের দেবতা প্রতিমা, তাপিতের তৃষ্ণাজল,

এ নহে সে ধৈর্য্যমূর্ত্তি পুতাম্বর পূজারী আসন,
এ নহে সে শুচিশুদ্ধ নৈবেদ্যের সজ্জা-আভরণ,
এ যে হেথা স্বার্থ-সংঘাতের আজ দ্বন্দ্ব-কোলাহল
কে জিনিবে, কাহার নয়নে দিয়ে ধুলি কিম্বা জল ;
বিচার হয়েছে আজ হিসাবীর খতিয়ান কষা,
তৌল মান ন্যায়ের হয়েছে স্বর্ণকার রতি মাষা,
অন্যায় নিষ্কৃতি লভে ঢাক ঢোল যোড়শোপচারে,
আর্ত্তের আশা অনদান অর্থহীন বাক্যের সম্ভারে।
নাহিক দেবতা আজ শূন্য সব মন্দিরের মাঝ —
কি পূজিতে এলে হে পূজারী, কা'রে উদ্বোধিবে আজ ?
তবুও রেখেছি আশা—মানবের শেষের সম্বল—
মোরা যে অমৃতসন্ধানী ; "নাস্তি" "নাস্তি" পাপকোলাহল ।
মিথ্যা কথা দেব নাই, মিথ্যা কথা বৃথাই সাধনা,
মিথ্যা—মিথ্যা, সত্য—সত্য ভারতের শাশ্বত ভাবনা।
বলিতে হইবে আছে, আছে আছে সত্য সত্য-রূপ—
আমার দেবতা আছে আমারই সর্ব্বস্বের রূপ,
আমি আছি, দেব আছে, কর্ম্ম আছে, ন্যায়দণ্ড আছে,
ধর্ম্মী আছে, ধর্ম্ম আছে, উদ্বোধিত সংযমীর কাছে।
তাই কি এসেছ আজ নিশীথের সাধকের বেশে
মরারে বাঁচায়ে দেবে, শক্তিরে জাগাবে দেশে দেশে,
দণ্ডরে ধরিবে তুলিয়া, প্রাণেতে চেতনা জাগায়ে,
ন্যায়ের দুন্দুভি বাজায়ে, বরাভয় দিবে বিলাইয়ে ?
এস শাক্ত ভারদ্বাজ, পিতৃশক্তি করহ স্মরণ,
নমি' শির তুলে লও তপোলব্ধ রক্তের বরণ,
এক হাতে তমো নাশি খড়্গে তব ছুটুক বিজলী,
হস্তান্তরে ভক্তান্তরে আশার হাসিটী উজলি,
জাগাও মায়েরে পুনঃ সন্তানের জুড়াবার কোল,
ন্যায়ের আসনে বসি' রক্ষ রক্ষ ডাকো উতরোল,
শিবেরে যে দলিছে পাষাণী সভ্যতা হউক লজ্জায়
মহাযোগী এই সে ভারতে ঢাকুক তনু ও সজ্জায় ।
অসুরের চাই ভীতি, দুষ্কৃতের চাই বিনাশন—
তমোনাশি' অট্টহাসি অন্ধের চক্ষুরুন্মীলন—
আশ্রিতে চরণচ্ছায়া, সন্তানের নির্ভয় ভাবনা—
সার্থক হউক তব গম্ভীর নিশীথ সাধনা॥

শ্রীনরেন্দ্র নাথ শেঠ।

সমাজ।

শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর চক্রবর্ত্তী

(৩)

পাশ্চাত্য চশ্‌মা লইয়া এদেশের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদের অবস্থা দেখিলে মনে হয় যে ইহাদের ন্যায় দুর্গত মানব এজগতে আর নাই। পাশ্চাত্যজ্ঞানাভিমানীরা বলেন, ইহারা যে দেশের ও যে সমাজের লোক সেই দেশ ও সেই সমাজ এখনও বর্ব্বরতার নিম্নস্তরে রহিয়াছে। ইহারা ভারতের, ইহারা হিন্দু সমাজের ; সুতরাং ভারতের ও হিন্দুসমাজের এই কলঙ্ক অপরিহার্য্য। এইরূপ অভিযোগ কতদূর সঙ্গত একটু নিবিষ্ট চিত্তে তাহার বিচার করা আবশ্যক।

প্রথমতঃ—হিন্দুরা সাম্যবাদী নহেন।

দ্বিতীয়তঃ—তাঁহারা অর্থ ও ভোগবিলাসকে উচ্চস্থান দেন না। পোষাক পরিচ্ছদ ও বাড়ী ঘর সাজসরঞ্জাম উচ্চ মানবত্তার পরিচায়ক নহে। তাঁহাদের মতে সমাজে বিভিন্নধর্ম্মী—উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, বলবান দুর্ব্বল, সকল শ্রেণীর লোক থাকিবেই, এবং যথাস্থানে তাহাদের স্থানও হইবে।

তৃতীয়তঃ—তাঁহারা কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদী। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যে মানুষ সমাজের যে স্তরে জন্মগ্রহণ করে তাহা তাহার জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফল। কিঞ্চিৎ আক্ষরিক জ্ঞান ও সাজ পোষাক কাহারো কর্ম্মফল খণ্ডন করিতে পারে না, প্রকৃত উন্নতিও দিতে পারে না। সুখ দুঃখ ভোগও পূর্ব্বজন্মের এবং ইহজন্মের কর্ম্মফলের উপরই নির্ভর করে। সুতরাং তাহার অন্তর্বৃত্তি ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা যেন বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত হয় তেমন আদর্শই তাহার সম্মুখে রাখা সমাজের কর্ত্তব্য। হিন্দুসমাজ তাহাই করিয়া আসিতেছেন।

প্রাচীন হিন্দু-সমাজে গুরু অধ্যাপক ও পুরোহিতেরাই সম্মানের হিসাবে সর্ব্বোচ্চ আসন পাইতেন। অথচ তাঁহাদের গৃহ ও অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা, পবিত্রতার অংশ বাদ দিলে, অন্য কোন অংশে নিম্নতম শ্রেণীর কাহারো অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল না। শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী-গুরু অধ্যাপকও ডালতরকারীর অভাবে ভাতের সহিত তেঁতুলের কুঁড়ি বা নিমপাতা সিদ্ধ খাইয়া দিনপাত করিতেন, গৃহের অভাবে বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া থাকিতেন। সুতরাং তাঁহাদের সহিত তুলনায় আত্মগ্লানি অনুভব করিতে পারে এখন লোক নিম্নশ্রেণীর কোনস্তরে অল্পদিন পূর্ব্বেও ছিল না। এখনও ভারতের ৭ কোটী লোকের দিনান্তে একবেলা নুনেভাতেও মিলে না ; শুধু নিম্নবর্ণের লোকেরা নহে, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিও সেই একই যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইতেছে। কোটী কোটী লোককে শোষণ করিয়া দু'চার জন বিপুল সম্পদ্ আয়ত্ত করিবে, আর তাহারা যথেচ্ছ অপব্যবহার করিয়া বিলাসব্যসনে প্রমত্ত হইবে, এমন দুর্ব্বুদ্ধি তখন কাহারো মনে স্থান পাইত না। সকলেরই ধ্যান থাকিত স্বজাতীয় ব্যবসায়ের দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা। একের ব্যবসায় অন্যের শোষণের পরিবর্ত্তে সাহায্যই করিত। সংসারযাত্রার কর্ম্ম ছিল,—স্ব স্ব কুলপ্রথানুসারে নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পরিমিত ব্যয়ে দেহরক্ষা

করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তদ্দ্বারা সাধু সন্ন্যাসী গুরু অধ্যাপক পুরোহিত আত্মীয় কুটুম্ব ও দরিদ্র প্রতিবেশীর ভরণপোষণ। হিসাব করিলে দেখা যাইত তখন এক এক জন সমর্থ গৃহীর উপার্জ্জনের ত্রিচতুর্থাংশ ঐভাবে সমাজসেবার জন্যই ব্যয়িত হইত। কেহ নিজের ব্যবসায় হইতে বঞ্চিত হইত না, বরং যে সব নিম্নবর্ণের লোক বর্ত্তমানে উপার্জ্জনের অভাবে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে তখন তাহাদের ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধাই ছিল। কারণ, উচ্চ বর্ণের লোকেরা তাহাদের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। নিম্নবর্ণের মধ্যেও একের ব্যবসায়ে অন্যে লোভ করিত না। এইক্ষণ সাম্য ও স্বাধীনতার ধুয়া ধরিয়া যেখানে লাভের সম্ভাবনা সেই খানেই প্রবল ব্যক্তিরা নিরীহ লোকদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে। ইহাতেই ত উহারা দিন দিন ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। তখন দরিদ্র হইলেও কাহারো ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা ছিল না। সমাজের উচ্চ নীচ সকল স্তরের মধ্যে এমন দয়ামমতা ও প্রেমের বন্ধন ছিল যে একে অন্যের দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেন না। এখনো স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ধনীর কথা কি, নিতান্ত দরিদ্র গৃহীর দ্বারে গিয়াও যদি কেহ বলে,—'আমি অভুক্ত'—তবে তাহাকে এক মুষ্টি না দিয়া সেই গৃহী নিজের মুখে অন্ন তুলিবে না। কৌলিক বৃত্তিতে না কুলাইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্প, দোকানদারী, গানবাদ্য, পরের চাকরী,—যে কোন একটা কিছু অবলম্বনে অন্নসংগ্রহ করিতে নিম্নশ্রেণীর পক্ষে বাধা ছিল না, এখনও নাই। উপার্জ্জনের পরিমাণ বেশী হইলে উচ্চ শ্রেণীর অনুকরণে তাহারা বাড়ী ঘর জমিদারী করিত, পূজাপার্ব্বণ শ্রাদ্ধোৎসব ইত্যাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া স্বজাতির মধ্যে উচ্চ শ্রেণীতে পরিণত হইত। এখনও তেমন উন্নতি নিম্ন শ্রেণীস্থ সকলের মধ্যেই হইতেছে। এইরূপেই তাহাদের মধ্যে অসংখ্য শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের জন্য খৃশ্চান মিশনারীরা, বৃটিশ রাজপুরুষেরা ও তাঁহাদের ভারতীয় মানসপুত্রেরা অল্পদিন মধ্যে হঠাৎ যে বেদনা বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহারা তাহার কণামাত্রও বোধ করে না। 'মিশনারী এণ্ড কো' দেখাইতে চাহেন যে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের অত্যাচারেই ইহাদের এত দুর্গতি। মানবরাজ্যের কোথাও এমন ভীষণ অত্যাচারের তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহাদের যে সমস্ত পল্লীতে এখনও পাশ্চাত্যপ্রভাব প্রবেশ করে নাই তথায় গিয়া দেখুন, ইহারা কি বলে। ঐ সব ছদ্মবেশ, কৃত্রিম হা হতাশ ইহাদের ভিতর নাই; নানা দোষ দুর্ব্বলতার মধ্যেও আছে শান্তিময় ভাব, প্রাণভরা আনন্দ, সরলতা ও দেবভক্তি। অভাব দুঃখ ইহাদের আছে;—কাহার নাই? কর্ম্মফলে ইহাদের বিশ্বাস অগাধ, সহিষ্ণুতার সহিত তাহা সহ্য করে। ইদানীং যাঁহারা উত্তম সংস্কার, উন্নতি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বড়াই করেন তাঁহাদেরই মুখমণ্ডল প্রমাণ করিয়া দেয় যে কত দুঃখের ও দুশ্চিন্তার আগুণে তাঁহাদের অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছে। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে তেমন জ্বালাযন্ত্রণা কোথায়? সারাদিন অন্নসংগ্রহের এত দুঃখধান্দার পরেও সন্ধ্যার সময় তাহারা ভগবানের নামকীর্ত্তন করে, আমোদ উল্লাস করে, রাত্রে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়। নব্য সংস্কারকেরা হয়ত বলিবেন, কুসংস্কারে ডুবিয়া থাকার ফলে ইহদের ভালমন্দ বিচারবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। কোন্‌টি কুসংস্কার, আর কোন্‌টি সুসংস্কার—তাহার চূড়ান্ত বিচার কখনো কি হইয়াছে? কিছুদিন পূর্ব্বেও আমাদের সংযম, উপবাস ও প্রাণায়ামের কত নিন্দা, কত বিদ্রূপ মিশনারী কোম্পানী করিয়া বেড়াইতেন, হিন্দুসমাজের কুসংস্কার প্রমাণের জন্য ঐ সমস্তই ছিল তাঁহাদের প্রধান অস্ত্র। আর আজ ঐ সমস্তের প্রশংসা ধরে না।

নিম্ন বর্ণসমূহের বন্ধু বলিয়া যাঁহারা ঘোষণা করিয়া বেড়ান তাঁহারা যদি এমন কোন আয়োজন করিতেন যাহাতে শক্তিশালী লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোকদের জীবিকা অপহরণ করিতে না পারে, ইহাদের উত্তম আহার্য্য, পোষাক পরিচ্ছদ ও বাড়ীঘর পাইতে পারে তবেই বুঝিতে পারিতাম ইহাদের জন্য সত্যই উঁহাদের প্রাণ কাঁদে, সত্যই ইহাদিগকে উন্নত করিবার জন্য উঁহারা ব্যগ্র। শুধু ইহাদের আনীত জল বা অন্ন উদরসাৎ করিলে, ইহাদের দু'একটি সুন্দর বালককে খান্‌সামা বানাইলে বা দু'একটি সুন্দরী মেয়েকে আয়া বানাইলে ইহাদের যে কোনরূপ উন্নতি হইবে, বা ইহারা উচ্চ শ্রেণীর সমকক্ষ হইয়া যাইবে তাহা ত বুঝি না। নিম্নবর্গের উন্নতির নামে সামান্য কিছু ইংরেজী বিদ্যা শিখাইয়া তাহাদের দু'একটা চাকুরীও দেওয়া হইতেছে বটে। মিশনারী ভ্রাতাদের এই সমস্ত কূটনীতির কেন্দ্র দাঁড়াইয়াছে এই শান্তিপ্রিয় নিরীহ লোকদের মধ্যে তাহাদের চিরকালের আশ্রয় উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি, সমাজবিপ্লব ও আত্মবিচ্ছেদ এবং পাশ্চাত্য বিলাস ব্যসনের অনুকরণে ধ্বংসের পথ পরিষ্কার! ইউরোপের সাম্রাজ্যলোলুপ এক একটা শক্তি যেভাবে আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীদিগকে উচ্ছেদ করিয়াছে, কাহারো হাত পা কাটিয়া, কাহাকেও জীবন্ত পোড়াইয়া যেমন অমানুষিক বর্ব্বরতার পরিচয় দিয়াছে তেমন অত্যাচারের কেহ কি কল্পনাও করিতে পারে? এখনো ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গদের উপনিবেশে এসিয়ার বিশেষতঃ ভারতবর্ষের অধিবাসীরা, শ্বেত পীত শ্যাম যে বর্ণেরই হউক, যেভাবে ব্যবহৃত হইতেছে; স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিবার ও শ্বেতাঙ্গ মহলে বাস করিবার অধিকার পায় না, ধনে মানে বিদ্যায়-বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠতর হইলেও শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে রেল কিম্বা ট্রাম চড়িতে পারে না, 'মিশনারী এণ্ড কোং' ঐ সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন কি? যত দোষ হিন্দুর স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারে!

হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রথার নিন্দা করিতে গিয়া কেহ কেহ বলেন,—'মানুষমাত্রেই এক রকম রক্তমাংস, দেহের গঠনপ্রণালী সকলই এক তাহাদের আবার বর্ণভেদ কি? যদি দেখিতাম ব্রাহ্মণমাত্রেই গৌরবর্ণ, আর শূদ্রমাত্রেই কৃষ্ণবর্ণ, তা'হলেও না হয় বুঝিতাম যে ব্রাহ্মণে ও শূদ্রে বর্ণ-ভেদ আছে। তা' যখন নহে তখন হিন্দুসমাজের বর্ণভেদ ব্রাহ্মণের বুজরুকি বই আর কি?— মনুষ্য রক্তের গুণাগুণ পরীক্ষায় রকেফেলার ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ ডাক্তার কার্ল ল্যাণ্ডষ্টীনার দেখিতে পাইয়াছেন যে মানুষে মানুষে বংশানুক্রমে রক্তে গুণভেদ ঘটে, উপরের চামড়া শাদাই হউক, আর কালই হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। মনুষ্যরক্তের বর্ণভেদ আছে, তাহা ৪ প্রকারের। অস্ত্রাঘাতে বা কোন রোগে দেহ হইতে বহুল পরিমাণে রক্ত নির্গত হইয়া কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার দেহে অন্যের টাট্‌কা রক্ত প্রবেশ করাইয়া তাহাকে রক্ষা করার নূতন চিকিৎসা প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই নূতন চিকিৎসা তত্ত্বের গবেষণাতেই ডাক্তার ল্যাণ্ডষ্টীনারের ঐ আবিষ্কার। চতুর্থ প্রকারের রক্তবিশিষ্ট দেহে প্রথম প্রকারের রক্ত প্রবেশ করাইয়া দিলে অমৃতের ন্যায় ফল হয়, তৃতীয় ও দ্বিতীয় প্রকারের দেহেও ফল ভাল হয়; অর্থাৎ উর্দ্ধ হইতে নিম্নদিকে ফল ক্রমশঃ অধিকতর ভাল হয়। কিন্তু নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে প্রয়োগ করিলে ফল বিপরীত দাঁড়ায়। চতুর্থ শ্রেণীর রক্ত প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশ করিলে ফল বিষময় হয়। রক্তের এই গুণ ভেদ হইতে কে কিরূপ পিতার সন্তান তাহাও নির্দ্ধারণ করা যায়। এই আবিষ্কারের জন্য ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ল্যাণ্ডষ্টীনার ইউরোপের প্রসিদ্ধ নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,

—When the blood liquid of one normal healthy person and the red blood cells of another are put in the same test tube instead of mixing freely the red cells often clump together as if they were glued. When it happens in a man's vein following blood transfusion, death may result......It is on the basis of these properties that blood was divided into different groups.........Every human being belongs to one or the other of the blood groups. To a certain extent blood groups are inherited and this fact is often used to determine paternity. If the blood groups of each parent are known one can state to which groups their child might belong."

হিন্দুর এক একটি প্রথা যতই গুরুত্বপূর্ণ হউক না কেন, যতক্ষণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ তাহা সমর্থন করিবে না, ততক্ষণ আধুনিক শিক্ষিত সমাজে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিবেন। ডাক্তার ল্যাণ্ডষ্টীনারের এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের পর ভারতের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা মহর্ষিগণের বর্ণবিভাগে এবং তদনুসারে বৈবাহিক সম্বন্ধনির্ণয় ও স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের প্রতি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে কি? ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন সন্তান মূর্দ্ধাবষিক্ত কেন ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ হয়, আর শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভজাত সন্তান কেন চণ্ডাল হয়, কেনই বা অসবর্ণ বিবাহে উচ্চ বর্ণের পাতিত্য ঘটে তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে কি?

আহারে বিহারে যেখানে একাকার প্রবলভাবে চলিতেছে সেই একরঙা শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেই রক্তের ঐরূপ বর্ণভেদ ল্যাণ্ডষ্টীনার দেখিতে পাইয়াছেন, আর যে ভারতে বহু যুগান্ত ধরিয়া বর্ণভেদ কর্ম্মভেদ, আহার্য্যভেদ, আচারপদ্ধতি ভেদ ইত্যাদি কড়াক্রান্তির হিসাবে চলিতেছে সেখানে রক্তের বর্ণভেদ ও বংশের ধারায় পার্থক্য যে বিশেষভাবে হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কি আছে?

নিম্নজাতির সহিত সংশ্রবে তাহাদের আধিব্যাধি অনাচার ও চরিত্রদোষ শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে প্রবেশ করিবার বা তাহাদের স্বার্থহানি ঘটিবার আশঙ্কা হইলে ইউরোপীয়েরা কি করিতেন? তাহাদেরে তোপের মুখে উড়াইয়া দিয়া তাঁহদের বাসস্থান নিরাপদ করিতেন না কি? আর ভারতের প্রাচীনযুগে শক্তিশালী হিন্দুরা নিম্নবর্ণের লোকদেরে বহুদোষের আকর জানিয়াও তাহাদের সম্বন্ধে কি করিয়াছিলেন? অস্পৃশ্যতার গণ্ডী আঁকিয়া তাহাদের একটু দূরে বাস করিতে বলিলেন। তাহারা তাহাদের যোগ্যতানুসারে জীবিকানির্ব্বাহের বৃত্তি অবলম্বন করিলে সেই সমস্ত বৃত্তি যেন অন্য কেহ কাড়িয়া লইয়া না যায় তেমন ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহাদের অধিকার অনুসারে ধর্ম্মসাধনার ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন। আর যখনই তাহাদের নিজেদের আচার ব্যবহার সংশোধন করিয়া উন্নত হইয়াছে তখন তাহাদের উচ্চস্তরে স্থানলাভ করিতে কোনরূপ বাধা দেন নাই। যত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুই হউক তাহাদের ধর্ম্মে ও শাস্ত্রে অবিচলিত শ্রদ্ধা রহিয়াছে, তাহাদের সুনিহিত সংস্কার এই যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলেই তাহাদের বর্ত্তমান জন্মলাভ ঘটিয়াছে, অতঃপর উচ্চবংশে জন্ম বা ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য বিশুদ্ধভাবে চেষ্টা করিয়া এই জন্ম সার্থক করিতে হইবে। তদনুসারে তাহারা অগ্রসর হইতেছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহারা যে এত হীন দেখা যাইতেছে তাহার একমাত্র কারণ

অর্থাভাব। নতুবা দয়ামমতায়, পরোপকার সাধুতায় ও সরলতায়, পাপের প্রতি ঘৃণায়, ভগবদ্ভক্তিতে তাহারা অন্যান্য দেশের বহু উন্নত লোক হইতেও শ্রেষ্ঠ। তাহারাও ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুদ্ধাশুদ্ধ হিসাব করিয়া চলিতে জানে; তাহারাও দৃঢ়তার সহিত তাহাদের জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষা করে, বিধর্ম্মী ও বিজাতীয় লোকেরা তাহাদেরও পূজা বা আহার স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা দেখাইতে চাহেন যে ইহারা এদেশের আদিম বর্ব্বর জাতীয় লোক, আর্য্য হিন্দুরা তাহাদের দেশ আক্রমণ ও তাহাদেরে পরাজিত করতঃ পদতলে চাপিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ কাহিনী তাঁহারা তাঁহাদের ভাবানুসারেই প্রচার করেন। এখনও পার্ব্বত্য অঞ্চলে নিতান্ত হীনাবস্থায় বহু লোক বাস করে। আর্য্য হিন্দুদের নিকট পরাজিত হওয়ার কোন চিহ্ন কি তাহাদের মধ্যে পাওয়া যায়? তাহারাও হিন্দু-বংশ-সম্ভূত, কাহারো দ্বারা পরাজিত বা নির্য্যাতিত নহে। তাহারা চিরকালই স্বাধীন ছিল, আজ ইউরোপীয়েরা আসিয়াই তাহাদের গলায় পরাজয়ের শৃঙ্খল পরাইয়াছেন, এবং ক্রমশঃ উহা কঠোরতর করিয়া তুলিতেছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও বলিতে পারি, হিন্দু সমাজের ক্রোড়ে থাকিয়া ইহারা যেরূপ শান্তিসুখে দিন কাটাইয়া আসিতেছে, মনুষ্যত্বের উচ্চ সোপানে আরূঢ় হওয়ার চেষ্টা করিতেছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও তেমনটি দেখাইতে পারিবেন না। তাঁহারা হয়ত বাহিক্ সাজ পোষাক বাড়ীঘর জুড়িগাড়ী মটোর ইত্যাদির বাহার দেখাইবেন। আমরা বলিব, মনুষ্যত্ব শুধু তাহাতে নহে, বরং তদ্দ্বারা মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনাই ঘটিতেছে। তৎসমস্তের সাহায্যেইত যত ব্যভিচার, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, হিংসা নৃশংসতা মানুষকে পশুতে পরিণত করিতেছে।

এদেশের নিম্নবর্ণের লোকেরা উচ্চবর্ণকর্ত্তৃক দলিত নির্য্যাতিত ইত্যাদি কাহিনী কত নূতন নূতন উৎকট ভাব ও বিশেষণ যোজনাপূর্ব্বক কতকগুলি পাশ্চাত্য লোক ও তাহাদের ভারতীয় মানসপুত্রেরা উচ্চ বর্ণ সমূহের বিরুদ্ধে জগময় ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছে। বিদেশীয়দের তেমন করিবার নানা হেতু আছে। তাহাদের চক্ষে আমাদের রীতিনীতি বিসদৃশ, সুতরাং তাহাদের জ্ঞান বিশ্বাস অনুসারে যাহা ভাল তাহা করিবে। কেহ কেহ যে আমাদের সর্ব্বনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে তেমন না করিতেছে তাহাই বা বলি কিরূপে? তাহাদের ঐ সমস্ত কুট কৌশলের ফলে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা উচ্চ শ্রেণীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া যাইতেছে, উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও দলাদলি আরম্ভ হইয়াছে। তাহাদের দুরভিসন্ধি সহজেই বুঝা যায়, আমাদের নিজের ভাই বন্ধুরা কেন তাহাদের সাহায্য করিতেছেন তাহাই যে বুঝি না। আমাদের যাঁহারা বুদ্ধ বা যীশুর পূর্ণাবতার বলিয়া খ্যাতিলাভের জন্য ব্যগ্র, তাঁহাদের জন্য শ্রীভগবানের চরণে কৃপাভিক্ষা ব্যতীত আর কিছু করিবার নাই, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক ও কলঙ্কজনক হইয়াছে দেশের শক্তিশালী যাঁহারা নিজকে নিষ্ঠাবান হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহাদের মোহাচ্ছন্ন অলসতা! তাঁহারাই হিন্দু সমাজের যাবতীয় দুঃখ ও লাঞ্ছনার মূল।

ভারতের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের জন্য ঐ সমস্ত লোকের অন্তর যেন একেবারে গলিয়া যাইতেছে। কেহ ইহাদিগকে দরিদ্রনারায়ণ, কেহ বা হরিজন আখ্যা দিতেছেন। যাহারা উচ্চ শ্রেণীস্থ তাহাদের সঙ্গে হরির বা নারায়ণের যেন কোন সংস্রবই নাই। তেমন পাষণ্ড বলিয়া যাহাদেরে গালি দেন তাহাদেরই সন্তানদিগকে বিগড়াইয়া তাহাদের কাছ হইতে অর্থ আদায়

করিয়া তাঁহারা দরিদ্রনারায়ণ সেবার নামে আশ্রম খোলেন। এই সমস্ত আশ্রমের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা বলেন, আশ্রমের কর্ত্তাদের ভোগবিলাসের জন্য যে সব ব্যবস্থা করা হয়, হতভাগ্য দরিদ্রদের জন্য তাহার দু'আনা পরিমাণও হয় না। সেই সব ব্যাপারের আলোচনা আমাদের লক্ষ্য নহে। কেবল জিজ্ঞাস্য, তাঁহারা কয়টি দরিদ্রের সেবা করেন? এই সমস্ত পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন উৎকট দরিদ্র প্রেমিকেরা নিজেদের দেশে পূর্ব্বে কি ছিল, এখনও কি আছে, তাহা দেখেন না। পাশ্চাত্য দেশে যেমন 'পুয়র হাউস্' আছে, এখানেও তদনুরূপ অনাথাশ্রম খুলিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় এখানেও মিশন খোলা চাই। সেখানে 'মেটার্নিটি হোম' আছে, এখানেও 'মাতৃসদন' চাই। এদেশে ঐ সমস্ত ছিল না,—না থাকা কি এদেশের কলঙ্ক, না থাকাই কলঙ্ক? সে সব দেশে অধিকাংশ দরিদ্রলোকের গৃহ নাই, আত্মীয় স্বজন ভাইবন্ধু বলিয়াও কেহ নাই, গৃহ যাহাদের আছে তাহাদেরও পিতামাতা ভাই ভগ্নীর সহিত সংস্রব থাকে না। আমাদের দেশের দরিদ্রতম লোকও তেমন নিরাশ্রয় বা আত্মীয়স্বজনবিহীন নহে। অবশ্য বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বড় লোকদের কল্যাণে তাঁহাদের পরিত্যক্ত আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা তেমন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের সমগ্র সমাজই এতদিন অনাথাশ্রমের কর্ত্তব্য অকুণ্ঠিতচিত্তে নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। পল্লীগ্রামে এখনো এমন কোন্ দরিদ্র আছে যে রোগের সময় গ্রাম্য কবিরাজের ঔষধ ও প্রতিবেশীর সেবাশুশ্রূষা পায় না? এমন কোন্ দরিদ্র প্রসূতি আছে যে গ্রাম্য ধাত্রীর সাহায্য পায় না? অবশ্য পাশ্চাত্য দেশে অসংখ্য অবিবাহিত রমণী তথাকার মেটার্নিটি বা রেস্থ হোমের সাহায্যে যেমন গোপনে সন্তান প্রসবের সুবিধা পায় এদেশে তেমন পায় না। এইক্ষণ এদেশেও যদি সেইরূপ 'মেটার্নিটি হোম' ইত্যাদি স্থাপনের প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে কি তাহা দেশের কলঙ্ক নহে? তাহাতেই যে এদেশের মাথা হেঁট হইয়া যাইবে।

আমাদের এক বিশিষ্ট আত্মীয় সহরে ওকালতি করেন। একই সময়ে তাঁহার পুত্র কন্যা নাতি নাতিনী ১১ জন শয্যাগত হয়। দুই পুত্র ও এক কন্যার অবস্থা সাংঘাতিক হইয়াছিল। জনৈক উচ্চপদস্থ হাকিম তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে আসিয়া বলিলেন আপনি মিশনে খবর দিন, উঁহাদের সেবা শুশ্রূষার বন্দোবস্ত অতি চমৎকার। উঁহাদেরে অনুরোধ করা হইল। তাঁহারা সকলেই সারাদিন স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, রাত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্য অবসর করিতে পারেন। প্রত্যহ দুইজন আসিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নিঃস্বার্থ সেবাব্রত এবং ঐকান্তিক যত্ন অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদের ঐ বন্ধুর এক বিধবা আত্মীয়া আসিয়া ক্রমাগত ১৫।১৬ দিন যাবৎ দিনরাত্র অবিরাম যেভাবে খাটিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য কোন নার্সিং হোমের বা মিশনের অতি পাকা নার্শেরাও দেখাইতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার যেমন কর্ম্মনিপুণতা, তেমনই সহিষ্ণুতা। তাঁহার স্নানসন্ধ্যা ও দ্বিপ্রহরে ভাতেভাত সিদ্ধ করিয়া খাইতে যে সময়টুকু লাগিত তদ্ব্যতীত অবশিষ্ট সময় তিনি রোগীর পার্শ্বেই কাটাইতেন। এমন বহু মহিলা ও যুবকের কথা আমরা জানি। যাঁহারা গ্রাম ও সমাজের সম্পর্ক রাখেন না, সমাজের ঐ সমস্ত রত্নের খবরও রাখেন না, তাঁহাদের পক্ষে পাশ্চাত্যের যাহা কিছু আমদানী হইতেছে তাহাই সর্ব্বোত্তম মনে হইবে সন্দেহ কি?

ভারতের এই নব্য মানবপ্রেমিকেরা পাশ্চাত্য ফ্যাসনে 'দরিদ্রনারায়ণ' ও 'হরিজনদের'

জন্য যাহা করিতেছেন জগৎময় ঢাকঢোল বাজাইয়া দেখাইতে চাহেন যে এমন অত্যুত্তম দানধর্ম্মের ব্যাপার ভারতে পূর্ব্বে ছিল না। অতীব ক্ষোভের সহিত বলিতেছি, ইঁহারাই ভারতের নামে কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছেন। দেখিতেছি, দরিদ্রের নামে তঁহাদের কে কোথায় একটা নিঃশ্বাস বড় করিয়া ফেলিবেন, তাহার বার্ত্তা দেশদেশান্তরে ঘোষণার আয়োজন আগেই করিয়া রাখেন। দরিদ্রকে অন্নদান করিয়া, অর্থসাহায্য করিয়া তাহার মঙ্গল সাধন করিব এবং তদ্দ্বারা তাহার কৃতজ্ঞতা ও দশজনের প্রশংসা অর্জ্জন করিব, এইভাব হিন্দুর নীতি অনুসারে অত্যন্ত দূষিত। দরিদ্রকে দান করিয়া, নিজের অর্থের সদ্ব্যবহার করিব, নিজের কল্যাণসাধন করিব, ইহাই সাত্ত্বিক হিন্দুর নীতি। এই নীতি অনুসারে এখনও হিন্দুর ঘরে ঘরে নিত্য বিবিধ সদনুষ্ঠান চলিতেছে; হিন্দুর প্রত্যেক পূজাপার্ব্বণের মুখ্য কর্ম্ম দরিদ্রকে দান। সঙ্গতিশালীরা পিতামাতার শ্রাদ্ধে শত শত কাঙ্গালীকে অন্নদান করিয়া থাকেন—তাহাকে কেহ পরোপকারের কার্য্যও বলে না, দরিদ্র-নারায়ণের সেবাও বলে না। উহা শ্রাদ্ধের অঙ্গীয় কর্ম্ম, স্বর্গত আত্মার তৃপ্তির জন্য। অথচ তাহাতেই হইতেছে প্রভূত দরিদ্রসেবা। হিন্দুর এক একটা তীর্থে নিত্য কত সহস্র দরিদ্র পরিপোষিত হইতেছে নব্যতান্ত্রিকেরা তাহার সংবাদ রাখেন কি? যাহারা তেমনভাবে অন্নবস্ত্র ও তৈজসাদি পায় তাহারা দাতার কাছে উপকৃত বা কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ মনে করে না; দাতারা যে তেমন অবসর দেন না, তাঁহারা দান করিতে পারিয়াই নিজকে কৃতার্থ মনে করেন। এই দান ও গ্রহণের সম্বন্ধ যদি অন্যরূপ হয়, অর্থাৎ দাতা যদি মনে করেন, 'পরের সাহায্যার্থ এই দান করিতেছি', আর গ্রহীতারাও মনে করে যে 'তাঁহার দানে আমরা উপকৃত',—তবে দাতার কার্য্য দাঁড়াইবে পরকে বাধ্য করিবার ব্যবসা, আর গ্রহীতাদের হইবে দাসভাবে মজিয়া যাওয়া।

সাহায্য করিয়া একে অন্যকে উন্নত ও বড় করিতে পারে না! পরের সাহায্যে আমি বড় হইতেছি, এই ভাব লইয়া জগতে কেহই বড় হয় নাই। তেমন সাহায্য ভিখারী লোকের আত্মা যে অঙ্কুরেই পঙ্গু হইয়া যায়। আত্মসাধনার দ্বারাই মানুষ বড় হয়, উন্নত হয়;—তেমন সাধনার দৃষ্টান্ত যিনি যত বেশী উজ্জ্বল ভাবে জাতির সম্মুখে ধরেন এবং সেই দিকে জাতিকে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করেন তিনিই জাতির তত বেশী উপকারী। ইহাই হিন্দু-সমাজের আদর্শ। আমাদের ঘোর অধঃপতনের যুগে আসিয়াও পাশ্চাত্য সত্যানুসন্ধিৎসু লোকেরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহার সহিত তুলনা করিয়া তাঁহাদের স্বদেশের অবস্থা সম্বন্ধে বলেন :—

There is actually much more charity among the natives of India than among us. The sense of belonging together is so strong there, the conscience of being unique so little developed that no extraordinary determination is necessary in order to let one's neighbour participate in one's possessions. Apart from catastrophe, real famine—the poor in the East seem to be exposed to the danger of starvation far less then they are with us. Everyone gives as far as he can to the needy, supparts poor relatives, the sick and wanderers; he does so as a matter of course, without making any fuss about it.

কাউন্ট হারম্যান কাইজার্লিং ভারতে আসিয়াছিলেন ২৩ বৎসর পূর্ব্বে। তদানীন্তন ভারতের সামাজিক অবস্থা যাহা দেখিয়াছেন তাহার সম্বন্ধেই এই উক্তি। তিনি দেখিয়াছেন তখনও ভারতীয়দের মধ্যে যৌথ পরিবারে ও সমাজবদ্ধভাবে থাকার প্রবৃত্তি সুদৃঢ় ছিল, তখনও আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকার সঙ্কীর্ণভাব তাহাদের ভিতর প্রবেশ করে নাই, তখনও তাহারা আত্মীয় স্বজনের পরিপালন, দুঃস্থ রুগ্ন ও অতিথির সেবা শুশ্রূষা কর্ত্তব্যবোধেই করিয়া যাইত; ঐ সমস্ত করিতে গিয়া খুব মহৎ কার্য্য করিতেছে বলিয়া তাহারা ঢাক ঢোল বাজাইত না।

কিছুদিন পরে আসিলে বোধ হয় তিনি বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা পোষণ করিবার অবসর আর পাইবেন না।

সমাজ সম্বন্ধে যত বিষয় আলোচনা করিবার আছে তাহার অতি অল্পাংশই উল্লেখ

করিলাম। আমাদের সামাজিক অবস্থা পূর্ব্বে কি ছিল, বর্ত্তমানে কিরূপ গড়াইতেছে তাহার আভাস দেওয়াই এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। হিন্দুসমাজে বহু আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়াছে, সেগুলির আশু দূরীকরণ এবং সমাজের নানা দিকে উন্নতি ও সংস্কার যে একান্ত প্রয়োজন তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কে তাহা করিবেন? মৃত্যুর কবল হইতে সগরবংশধরদের উদ্ধার করিবার জন্য সেই স্বর্গগঙ্গার পূত ধারা মর্ত্তে আনিতে পারেন এমন শক্তিশালী ভগীরথ কোথায়? পুরাকালে মহর্ষিদের উপদেশানুসারে রাজশক্তি সমাজ পরিচালনার সাহায্য করিতেন, বর্ত্তমানে রাজশক্তি আমাদের সমাজরক্ষার কথা ভাবেন না, দেশের যাঁহারা এইক্ষণ প্রধান তাঁহারাও সমাজ সম্বন্ধে শুধু উদাসীন নহেন, বরং সমাজ ধ্বংসের সাহায্যই করেন। সমাজশক্তির মূল্য কি, এতদিন আমাদের সমাজ আমাদের জাতিকে কি ভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহা তাঁহারা ভাবেন না। এই সমস্ত কারণে হিন্দু সমাজে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণ প্রবেশ করিয়াছে, এজন্য হিন্দু আজ মেরুদণ্ড খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে পারে না, তাহার বিপুল বিদ্যাবুদ্ধি ধন সম্পদ্ কর্ম্মশক্তি সমস্তই অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। পথের কুকুর বিড়াল পর্য্যন্ত তাহাকে পদদলিত করিতেছে। বাধা দেওয়ার শক্তি তাহার নাই। পাশ্চাত্যের এক একটা ঢেউ আসে, আর আমরা তাহার সঙ্গে গড়াইয়া যাই, আত্মশক্তিবলে নিজের পথ নিজে গড়িবার চেষ্টা করি না। ঢেউগুলি কোন্‌দিকে যাইবে, কোন্ সুরে গিয়া ঠেকিবে, একবার স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহাও দেখি না। ইংরেজেরা রাজত্ব করিতে আসিয়াছেন; আমাদের জাতিবুদ্ধি নাশ করিয়া তাঁহাদের রাজত্ব চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা আমাদের জন্য ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিলেন; যতই হিন্দু যুবকেরা ইংরেজী শিক্ষার ফলে স্বধর্ম্মে আস্থাহীন হইতে ছিল ততই তাঁহারা আনন্দপ্রকাশ করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়াও কিন্তু আমাদের নব্য নেতৃগণের চৈতন্য হইল না। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে লিখিয়াছেন:—"রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, দিরোজিও প্রভৃতি ইংরেজ মিশনারীর সহিত একত্র হইয়া বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন করেন। ১৮১৭ সনে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৩৫ সনে লর্ড মেকলে ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার প্রসিদ্ধ 'মিনিট' প্রেরণ করেন*। অতঃপর পাশ্চাত্য শিক্ষার নূতন মদিরা হিন্দুত্বের বোতলে প্রবেশ করিয়া মারাত্মক কাণ্ড উপস্থিত করিতে থাকে। তখন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, সেই সময়েই এদেশে ধীশক্তির অরাজকতার যুগ আরম্ভ হয়। তাহার ভীষণ স্রোতে নব্য বাঙ্গালীরা ছিন্ন নঙ্গর তরীর ন্যায় ভাসিয়া যাইতে থাকে। পাশ্চাত্যের যাহা কিছু তৎসমস্তের অর্চ্চনা ও অনুকরণ এবং স্বদেশের যাহা কিছু তৎসমস্তের বর্জ্জন ও নিন্দা, স্বদেশের প্রাচীন শিক্ষা ও সভ্যতা আচার প্রথা ও সংস্কার ইত্যাদির প্রতি ঘৃণা—অতি তীব্রভাবেই আরম্ভ হয়। স্বদেশের ধর্ম্মকে কুসংস্কার বলিয়া ঘোষণা করিতে থাকে। এইরূপে দিক্‌বিদিক্ না দেখিয়া হিন্দুসমাজের ভিত্তি ধ্বংস করিবার সময় তাহার কিছুমাত্রও রক্ষার যে কোন প্রয়োজন আছে এই নব্য কালাপাহাড়ের দল তাহা মনে করিল না। †

---

* ভারতবাসীকে রক্ত ও বর্ণ ব্যতীত অপর সমস্ত বিষয়ে ইংরেজ বানাইয়া ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যেই যে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন একান্ত আবশ্যক তাহাই লর্ড মেকলে ঐ মিনিটে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী রিপোর্টে ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুযুবকদের স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্টতার প্রাবল্য দেখিয়া আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

† Lord Macaulay's famous minute was penned in 1835. There after the new wine of Western learning was poured with disastrous results into the old bottles of Hinduism, it went into the heads of young Bangal. By the middle of the nineteeth century a period of intellectual anarchy had set in, which swept the rising generation before it like a craft which has snapped its moorings. Westernism became the fashion of the day—and Westernism demamded of its votaries that they should cry down the civilisation of their own country. The

মোহাচ্ছন্ন ভারতবাসীর চৈতন্য সম্পাদনের জন্য এইরূপ কত কথা সার জন উড্রফও বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের কাহারো কি সংজ্ঞা হইয়াছে? যে ইংরেজী শিক্ষার ঐরূপ ফল তাহারই বিস্তার জন্য এই বাংলা দেশে দেড় হাজারের অধিক ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নাই কি? বালকদের সর্ব্বনাশের পথ কাটিয়া দিয়া মেয়েদেরও সেইপথে নিক্ষেপ করিবার আয়োজনের ক্রটি হইতেছে?

অতঃপর আসিয়াছে পাশ্চাত্য উপায়ে ভারতকে স্বাধীন করার ঢেউ। আমেরিকা-বাসীরা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করতঃ তাহার প্রবল চেষ্টার দ্বারা তাহাদের রাজ্য স্বাধীন করিয়াছে। ভারতবাসী কতিপয় প্রধান ব্যক্তি সেই আশায় ভারতেও কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু যে সঙ্ঘবদ্ধতার প্রভাবে আমেরিকায় কংগ্রেসের সাধনা সফল হইয়াছে, ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্য প্রণালী সেই সঙ্ঘবদ্ধতার মূলেই ক্রমাগত কুঠারাঘাত করিয়া আসিতেছে। ভারতে কংগ্রেস সৃষ্টির পূর্ব্বে সাধারণ হিতকর ব্যাপারে হিন্দু-মোছলমানে দলাদলি ছিল না, উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের মধ্যে রেষারেষি দেখা যাইত না;—আর আজ? কেহ হয়ত বলিবেন, এই সমস্ত ত আমাদের শত্রুদের চক্রান্তের ফল। আমরা বলিব,—আপনারাই ত ইন্ধন যোগাইতেছেন। উপায় চিন্তার সময় অপায় কোন্ কোন্ পথে আসিতে পারে তাহাও দেখা আবশ্যক। শত্রু আসিয়া আমার ভাইকে আমার বক্ষ হইতে লইয়া গিয়া যেন আমার গলায় ছুরি বসাইবার জন্য তাহাকে প্রস্তুত না করিতে পারে পূর্ব্বেই সেই ব্যবস্থা করা আমার কর্ত্তব্য। মোছলমান ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা ত গিয়াছে, অতঃপর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বৈদ্য কায়স্থ তেলী নাপিত বেনে সাহা যুগী প্রভৃতির মধ্যে কি ভীষণ দলাদলি আরম্ভ হইয়াছে! প্রত্যেক বর্ণের নেতৃগণ স্ববর্ণের জন্য এক একটা ক্ষুদ্র গণ্ডী প্রস্তুত করত ঐ গণ্ডীবদ্ধ সমাজের মঙ্গল কামনায় সমিতি গঠন ও সংবাদ পত্র প্রচার করিতেছেন, তদ্বারা তাঁহাদের স্ববর্গের মঙ্গল অপেক্ষা অন্যান্য বর্ণের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষবর্ষণ করতঃ তাহাদের সহিত পার্থক্য সৃষ্টিই বেশী হয়। তাঁহাদের আচরণে প্রকাশ পায় অন্যেরা যেন তাঁহাদের চক্ষুশূল। সমগ্র হিন্দুসমাজের কল্যাণকর কোন অনুষ্ঠান যদি উচ্চবর্ণের কেহ করেন, অন্যান্য বর্ণের লোকেরা তাহা ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করে। উহার সহিত যোগ দিলে তাহাদের নিজেরই যে পরম মঙ্গল হইবে ইহাও তাহারা চাহে না। যেই সময়ে দেশের মধ্যে এইরূপ ভীষণ মতদ্রোহ চলিতেছে সেই সময়ে মুষ্টিমেয় লোক কংগ্রেস দ্বারা দেশোদ্ধারের যে কল্পনা করেন তাহার মূল্য কি? কংগ্রেসের পদে পদে বিফলতাই তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। কংগ্রেসের নেতৃগণ কল্পনার তুলিতে যথাসম্ভব মনোরম চিত্র আঁকিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে চাহেন; তাঁহারা মুখে বলেন,—সর্ব্বাগ্রে চাই একতা, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক যেন কংগ্রেসকে আপনার মনে করে, তেমন ভাবে তাহার কার্য্যপ্রণালী চালাইতে হইবে; অথচ কার্য্যকালে দেখি বাহিরের কোন লোককে ত তাঁহারা আমলই দেন না, তাঁহাদের ক্ষুদ্র দলের মধ্যেই কত বিরোধ। কংগ্রেসের পতকাধারী সংবাদপত্রগুলি খুলিয়া দেখুন, একদল অন্য দলের বিরুদ্ধে কি ভীষণ হলাহল বর্ষণ করে। তদুপরি অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, জাতিভেদ ত্যাগ, সধবা বিধবা ও যুবতী বিবাহ ইত্যাদির আন্দোলন তুলিয়া হিন্দুসমাজকে কি ভীষণ ভাবে ছিন্নবিছিন্ন করা হইতেছে।

দেবতা বজ্রনির্ঘোষে বলিতেছেন,—'নেদং যদিদমুপাসতে'—'আত্মানং বিদ্ধি।' যতদিন পরের কোটে থাকিবে ততদিন কাটাকাটি করিয়াই মরিবে। পরাঙমুখী গতি ত্যাগ করিয়া আপনার কোটে ফিরিয়া আস, আপনার সমাজ, আপনার গৃহ সুদৃঢ় কর, তবেই দেবতা তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, তোমরা শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইবে।

---

ancient learning was despised, ancient custom and tradition were thrust aside, ancient religion was decried as an outworn superstition. The ancient foundations upon which the complex structure of Hindu society had been built up were undermined, and the new generation of iconoclasts found little enough with which to underpin the edifice which they were so recklessly depriving of its own foundations.'—Lord Ronaldshay

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপনির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ প্রণালী বাহা ভারতের সাধনা'র এক বিশেষ লক্ষ্য—সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচনা-সাপেক্ষ।]

বুদ্ধাবতার ও ব্রাহ্মণাধিক্ষেপ

"ভারতের সাধনা" পত্রিকায় বিগত ফাল্গুন সংখ্যার আলোচনাংশে শ্রীযুত মহীতোষ কুমার সেন মহাশয়ের "অবতার বাদ" বিষয়ে একটি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধটিতে শাস্ত্রের প্রতি লেখক মহাশয়ের শ্রদ্ধার ভাব দেখিয়া প্রীত হইয়াছি; তবে বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া তিনি যেটুকু আলোচনা করিয়াছেন, বিশেষতঃ তৎকালীন ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না।

বুদ্ধাবতারের পূজা সম্বন্ধে তিনি বুদ্ধগয়ার উল্লেখ করিতে পারিতেন। সেই খানে মঠাধিকারী হিন্দু সন্ন্যাসী যথারীতি বুদ্ধদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যখন তাঁহাকে শ্রীমন্নারায়ণের অবতার বলা হইতেছে—তখন তাঁহার পূজা ও বন্দনা থাকিবেই। লেখক মহীতোষ বাবু অবতারের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়া করিয়াছেন, লেখেন নাই। যদি স্বকপোলকল্পিত হয়—তবে বলিব যে তিনি পত্রের অন্যত্র যেরূপ শাস্ত্রভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন—এস্থলে তাহার বিপরীত কথা লিখিয়াছেন। শ্রীজয়দেব দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধস্তুতির সময়ে যাহা বলিয়াছেন, তৎপ্রতি প্রণিধান করিলেও মহীতোষ বাবু বুঝিতে পারিতেন যে জয়দেব বুদ্ধের বেদনিষ্ঠায় ব্যথিত হইয়াছেন—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধে রহহ শ্রুতিজাতম্"

এই অহহ (খেদসূচক পদ) দ্বারাই গোস্বামীর আন্তরিক ব্যথা প্রকটিত হইয়াছে।

সে যাহাহউক, মহীতোষ বাবু লিখিয়াছেন, হিন্দুগণ প্রকৃত ধর্ম্ম ছাড়িয়া কেবল যাগযজ্ঞ ও পশু-বলির পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন, ইত্যাদি। বলি—যজ্ঞে পশুবধ তো বেদের বিধান, সত্য ত্রেতা দ্বাপর সব সময়েই চলিয়া আসিয়াছে—এবং যাগযজ্ঞ কি প্রকৃত ধর্ম্ম নহে? ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "আচার-ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতে লাগিলেন" ইত্যাদি। এই সংবাদ তিনি কোথায় পাইলেন? সাহেবদের পুস্তকে না আধুনিক সংস্কারকদের বক্তৃতায়?

আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ এখন ব্রাহ্মণ নিন্দা বাবুদের একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। সাহেবদের দোষ কি? উহারা তো সমাজে একটা ভেদ-বুদ্ধির সৃষ্টি করিয়া উহাদের আধিপত্য সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিবেই—কিন্তু বিবেকানন্দের ন্যায় ব্যক্তিও যে ব্রাহ্মণ-নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেন, এই দুঃখের কথা কাহাকে বলিব? ব্রাহ্মণের অধঃপাত ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই—নচেৎ ভারতের এই দুরবস্থা হইবে কেন? কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে এই অধঃপাত সার্ব্বজনিক—ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সকলেরই ঘটিয়াছে। তবে, এই অধঃপতন কলিযুগের প্রভাবেই প্রধানতঃ হইয়াছে—ধর্ম্ম এযুগে সঙ্কুচিত হইবেই। পরন্তু একপাদ ধর্ম্ম তো থাকিবে? তাহা রক্ষা করে কে? ধর্ম্মময় মহাত্মদের "মূলং কৃষ্ণো ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ"—অর্থাৎ শ্রীভগবান্, বেদ (এবং বেদানুগতা শাস্ত্রজাত) ও (শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা) ব্রাহ্মণ। এই অধঃপতনের যুগেও ব্রাহ্মণ্যের বিলোপ ঘটে নাই—তাই ধর্ম্মও রহিয়াছে। কিন্তু যে ভাবে ব্রাহ্মণ-নিন্দা ঠাই বেঠাই আরম্ভ হইয়াছে—তাহাতে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল হইতে হয়। ধর্ম্মকে উদ্দীপিত করিতে হইলে ব্রাহ্মণকে জাগাইতে হইবে—নিন্দা দ্বারা নহে, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা-প্রদর্শন দ্বারা।

সে যাহা হউক, এখন বুদ্ধাবতারের প্রয়োজন সম্বন্ধে বলিব। আমার নিজের কথা নহে—শাস্ত্র কি বলিয়াছে। তাহাই নির্দ্দেশ করিব।

বিষ্ণুপুরাণ—তৃতীয় অংশ ১৭শ ও ১৮শ অধ্যায়ে ঐ কাহিনী রহিয়াছে। তবে "বুদ্ধ" নামটি তাহাতে নাই—আছে মায়ামোহ।

যাগযজ্ঞাদির প্রভাবে অসুরেরা ক্ষমতাশালী হইয়া দেবতাদিগকে উৎপীড়িত করিতেছিল—নিরুপায় দেবগণ শ্রীমন্নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন।

"ইত্যুক্তো ভগবাংস্তেভ্যো মায়ামোহং শরীরতঃ।
সমুৎপাদ্য দদৌ বিষ্ণুঃ প্রাহচেদং সুরোত্তমান্॥ ৪১
"মায়া মোহোয়মখিলান্ দৈত্যাংস্তান্ মোহয়িষ্যতি।
ততো বধ্যা ভবিষ্যন্তি বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ॥ ৪২

বিষ্ণুপুঃ ৩য় অংশ ১৭ অধ্যায়।

মায়ামোহ আসিয়া অসুরদিগকে বলিলেন—

"কুরুধ্বং মম বাক্যানি যদি মুক্তিমভীপ্সথ।
অর্হধ্বং ধর্ম্মমেতঞ্চ মুক্তিদ্বারমসংবৃতম্॥ ৫
এবং প্রকারৈ র্বহুভি যুক্তি দর্শন বর্দ্ধিতৈঃ।
মায়ামোহেন দৈত্যাস্তে বেদমার্গাদপাকৃতাঃ॥ ৭
অর্হতেন মহাধর্ম্মং মায়ামোহেন তে যতঃ।
প্রোক্তা স্তমাশ্রিতা ধর্ম্মমার্হতা স্তেন তেঽভবন্॥ ১১

(বিঃ পুঃ ৩য় অংশ ১৮শ অধ্যায়)

পূর্ব্বে বলিয়াছি, 'বুদ্ধ' নাম নাই; কিন্তু দেখা গেল যে মায়ামোহ কর্ত্তৃক প্রচারিত মতাবলম্বীরা 'আর্হত' সংজ্ঞাভাজন হইয়াছিল।

অপিচ, তারপর আছে—

"পুনশ্চ রক্তাম্বরধৃঙ্ মায়ামোহঽজিতেক্ষণঃ।
অন্যানাহাসুরাণ্ গত্বা মৃদ্বল্প মধুরাক্ষরম্॥ ১৪
"স্বর্গার্থং যদি বাঞ্ছা বো নির্ব্বাণার্থ মথাসুরাঃ।
তদলং পশুঘাতাদি দুষ্ট ধর্ম্মৈ র্নিবোধত॥ ১৫
'বিজ্ঞানময় মেবৈতদশেষমবগচ্ছথ।
বুধ্যধ্বং মে বচঃ সম্যগ্ বুধৈরেবমুদীরিতম্॥ ১৬
এবং বুধ্যত বুধ্যধ্বং বুধ্যতৈব মিতীরযন্।
মায়ামোহঃ স দৈতেয়ান্ ধর্ম্মমত্যাজয়ন্নিজম্॥ ১৭

বিঃ পুঃ ৩য় অংশ ১৮ অধ্যায়।

যদিও বিষ্ণুপুরাণে (আর্হত সংজ্ঞার মত) বৌদ্ধ সংজ্ঞার স্পষ্ট উল্লেখ নাই—তথাপি "বুধ্যধ্বং 'ও 'বুধ্যত' বারংবার উচ্চারিত হওয়াতে এই মতাবলম্বীরা 'বৌদ্ধ' সংজ্ঞাভাজন হইয়াছেন, বোধ হয়।

এভাবে অসুরগণ বেদধর্ম্মবহিষ্কৃত হইয়া দেবগণ কর্ত্তৃক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ভয় হয়, আমরাও বেদবিহিত যাগযজ্ঞনিন্দক ব্রাহ্মণবিদ্বেষীদের ঈদৃশ প্রচারের ফলে পথভ্রষ্ট হইয়া বিধ্বস্ত হইয়া যাইতে পারি। তাই বলি, সাধু সাবধান। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই, যে বেদবাহ্য বৌদ্ধদের প্রচার ফলে ভারতের সনাতনী সাধন বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতেছিল—ভাগ্যে শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল—তিনি ঐ জঞ্জাল ঝাঁটাইয়া ভারতবর্ষের বাহিরে সরাইয়া দিয়াছিলেন, তাই ধর্ম্মসাধনার সনাতনপদ্ধতি আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতে পারিয়াছে—এখন আবার সেই বৌদ্ধমতের বিমোহন চিত্র দেখাইয়া কেহ যেন সমাজকে উন্মার্গগামী করাইয়া ধ্বংসের পথে পরিচালিত করিতে না পারে তদর্থে ধার্ম্মিক সমাজহিতৈষীর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইতি—শ্রীবিদ্যাবিনোদস্য কস্যচিৎ।

মাসপঞ্জি—শ্রাবণ, ১৩৪১

বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অস্থায়ী ভাবে কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ্ জষ্টিশ নিযুক্ত হইলেন; স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইলেন; শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত এ, কে, চন্দকে বাঙ্গলার ডিরেক্টার অব পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকসন্ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন—ম্যান দ্বীপের আপীল জজ মিঃ হেরল্ড ডারবী সায়ার কলিকাতা হাইকোর্টের স্থায়ী চীফ্ জষ্টিশের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন—অমৃতসরের কংগ্রেস কমিটিতে দলাদলির প্রভাবে দুঃখিত হইয়া ডাঃ সইফুদ্দীন কিসলু সাত দিনের অনশনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন—মিঃ আর, এন্, চৌলা সমুদয় পৃথিবী প্রদক্ষিণ কল্পে বায়ুযানে করাচী হইতে রওনা হইয়াছেন—উত্তর ভারতে দুইবার ভূকম্পন অনুভূত হইয়াছে—নাঙ্গাপাহাড় আরোহণকারী জার্ম্মান্ দলের লোকদের অনেকেই প্রাণ হারাইয়াছে, যাত্রা এবারও নিষ্ফল হইল—স্যর হেরি হেগের স্থানে স্যর হেন্‌রী ক্রেক্ ভারত সরকারের হোম মেম্বারের পদে নিযুক্ত হইলেন, স্যর হেরি যুক্তপ্রদেশের ভাবী গভর্ণর—শ্রীযুক্ত রূপেন্দ্রকুমার মিত্র, জুনিয়ার গভর্ণমেণ্ট প্লীডার কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন—ভারত সরকারে আদেশে এদেশের সমুদয় 'কমুনিষ্ট' দলগুলি বেয়াইনী বলিয়া ঘোষিত হইল—লব্ধপ্রতিষ্ঠ অর্থশাস্ত্রবিদ্ স্যর কাউজি জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইল—সাম্প্রদায়িক ভাগাভাগী লইয়া কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হইয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও এনি প্রভৃতি কংগ্রেস পার্লিয়ামেণ্টরী বোর্ড হইতে পৃথক এক জাতীয় দল গঠনের মতলব করিতেছেন—কাশীতে সনাতনী দল মহাত্মা গান্ধীর সম্বর্দ্ধনাতে বিশেষ বাধা দান করিতেছে—আগামী ৩১শে ডিসেম্বর বর্ত্তমান এসেম্ব্লী সভার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইবে—বঙ্গলাট স্যর জন এণ্ডারসন চারি মাসের বিদায়ে স্বদেশযাত্রা করিয়াছেন, তৎস্থানে সিনিয়ার মেম্বর শ্রীযুক্ত জন উড্‌হেড্ গভর্ণরের কার্য্য করিবেন—আসাম ও উত্তর বিহারে ভীষণ জলপ্লাবন হইল; বহু গ্রাম জনশূন্য ও লোক গৃহশূন্য হইয়াছে—ভারতীয় রাষ্ট্র-পরিষদের শারদীয় অধিবেশন সীমলা সহরে আরম্ভ হইয়াছে—আসাম-গভর্ণর মাইকেল কেনে ঐ প্রদেশের রাজনৈতিক কারামুক্ত ব্যক্তিদিগের ভরণপোষণের নিমিত্ত ব্যস্ত—পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু দুই দিনের জন্য কারামুক্ত, তাহার পত্নী বিশেষরূপে পীড়িত হওয়ায়—

বৈদেশিক

ভূমিকম্প হইয়া আফ্‌গানিস্থানের একখানি গ্রাম সম্পূর্ণ ভূপ্রোথিত হইয়াছে—লণ্ডনে ইণ্ডো-জাপানী বাণিজ্য সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল—অষ্ট্রীয়াতে নাজিদলের প্রভাব বাড়িতেছে বলিয়া মনে হইতেছে—জারম্যানী হার হিটলারকে অতি-মানবের স্থান দিতে ব্যস্ত; ইতালী নাজি-কার্য্যকারিতার বিরোধী—জন্মহার বৃদ্ধিতে জাপান পরিপুষ্ট—তুর্কী বিদেশীয়ের সমাগম রোধ করিতেছে—ধর্ম্মঘটে আইরিশ ডাবলিন সহরে সমুদয় সংবাদপত্র বন্ধ—জ্যারম্যান রাষ্ট্র নায়ক ভন্ হিণ্ডেন বার্গ ৮৭ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন—আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে ভীষণ তাপ-বাত্যা বহিতেছে, পোল্যাণ্ডে বন্যা উপনীত—চীনের ফুচাও উপকূলে বিদেশীয়ের প্রতি আক্রমণ সম্ভবনায় ব্রিটিশ জাপ ও আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজের সমাগম হইয়াছে—জার্ম্মেণ রাষ্ট্র কর্ম্মী ভন পেপেন অষ্ট্রীয়াতে জারম্যান দূত নিযুক্ত হইয়াছেন—প্রেসিডেণ্ট রুসভেণ্ট রাষ্ট্রের সমুদয় রৌপ্য রাজকোষে জমা করিবার আদেশ দিয়াছেন।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

পঞ্চম বর্ষ] ভাদ্র—১৩৪১ [১১শ সংখ্যা

সাধনার পথে

আস্তিক্য ও দুঃখবাদ

সংসার দুঃখময়—এই মতবাদ যাহারা পোষণ করিয়াছে অথবা জীবন দুঃখময় বলিয়া যাহারা আর্ত্তনাদ করে, তাহাদের প্রকৃতি অনুসন্ধান করিলে এই একটী বিষয় তাহাতে দেখা যায় যে, তাহাদিগের মধ্যে আস্তিক্যের লেশ মাত্র নাই। সংসারে দুঃখ আছে—জরা, মৃত্যু, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য [illegible]কের নিত্য জীবনসহচর, ইহাতে সন্দেহ নাই। মানুষ মরিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; এই যে [illegible] জগৎ [illegible] সমগ্র এবং প্রত্যেক বিষয়টী একদিন বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহার [illegible]রিণাম আছে, লক্ষ্য আছে, উদ্দেশ্য আছে,—ইহা বুঝিলে মৃত্যু তার কঠোরতা হারায়, ধ্বংস নূতন সৃষ্টির সন্ধান দেয়, নিরাশা আশার স্থান অধিকার করে, দুঃখ আনন্দে পরিণত হয়। এই আনন্দ, এই আশা—এই সৃষ্টি ও জীবনের জ্যোতি ও প্রভাব—এই জগতে রহিয়াছে। তাই এই স্থিতি, তাই এই প্রকাশ। এই স্থিতিই যে জগতের ভিত্তি ও সত্তা, ঐ প্রকাশই তাহার গুণ—এ বোধ সংসারকে আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছে; নতুবা সমুদয়ই দুঃখ, সমুদয়ই কদর্য্য। আবার সমগ্র বা বিরাট দুঃখ নাই, সমুদয় দৃষ্ট জগতেও তাই—মোটা মোটি সুখ ও শান্তিতে জগত ভরা। খণ্ড ও সীমিতের মধ্যেই যত ক্লেশ ও অশান্তি। দুঃখ ব্যক্তিগত জীবনে—সীমিত সময় ও খণ্ড দেশ মধ্যে, খুঁজিয়া তাহা বাহির করিতে হয়। এই সমগ্রই প্রকৃত বস্তু, স্থির ধীর ও প্রকৃত অবস্থার নির্দ্দেশক। দুঃখ যত তাহা পরিবর্ত্তনের মধ্যে, অস্থিরও পরিবর্ত্তনের স্বরূপ বিকার মাত্র; উহা প্রকৃতি হইতে—সুস্থতা ও সুখ হইতে—দূরে সরিয়া রয়। যাহা শান্ত- সুখময়—তাহা স্থির।

এই পরিবর্ত্তন ও সীমা, খণ্ডন ও বিকার, মৃত্যু ও ধ্বংসকে অতিক্রম করিয়া যে স্থির দৃষ্টি ও অনুভূতি তাহাই আস্তিক্য। তাহাই সত্যের উপলব্ধি, বিশ্বাস—আস্তিক্য। আস্তিক্য সাধনা-

সাপেক্ষ। সীমা ও খণ্ডের পর পারে সে সাধনার লক্ষ্য—মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যে সাধনার সিদ্ধি। আর্য্য ঋষি তাহার অধিকারী—বেদ তাহার অমূল্য ভাণ্ডার। এজন্য বেদে শ্রদ্ধাই আস্তিক্যের সাধারণ প্রমাণ। আস্তিকে দুঃখ নাই। নাস্তিকেরাই দুঃখবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন—এ কালের সোপেনহোয়ার ও সে কালের গৌতম বুদ্ধ তাহার নিদর্শন। যে আনন্দঘন সচ্চিদানন্দ জগৎস্থিতির মূলাধার—ভারতের সাধনা যাহার অমৃতরসে সঞ্জীবিত, তাহা ইহাদের দৃষ্টির বহির্ভূত।

কংগ্রেস-কথা।—

মৃতকল্প কংগ্রেসকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য কংগ্রেস-ব্যবসায়িগণ নূতন উদ্যমে লাগিয়াছেন—বোম্বাইতে কংগ্রেসের নির্ব্বাপিত দীপশিখাকে পুনঃ উদ্দীপিত করিতে আয়োজন চলিতেছে। অক্টোবর মাসে ইহার এক অধিবেশন হইবে। এ অধিবেশনে কংগ্রেসের প্রতি দেশবাসী লোকের মতি গতি কিরূপ অব্যাহত আছে, তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে। কংগ্রেস আত্মপ্রত্যয় হারাইয়াছে। এজন্য ইহার বিভিন্ন মত ও বিরুদ্ধ দলের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী একথাই আজ বলিতেছেন।কংগ্রেস-স্বরাজ্যদল সর্ব্বপ্রথম কংগ্রেসে গান্ধীনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে; স্বর্গীয় মতিলাল নেহারু ও চিত্তরঞ্জন দাস সেই বিরোধের অগ্রণী ছিলেন। বিহারের রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও গান্ধী-কুটুম্ব (পরে) রাজগোপাল আচারি প্রভৃতি গান্ধী নীতিতে অটল থাকেন। মহাত্মা নিজে এই দলাদলিতে কোনও পক্ষভুক্ত হন নাই,—হইতে পারেন না। অসহযোগ নীতির অবলম্বনকারিদিগকে তিনি যেমন সমর্থন করিয়াছেন, ব্যবস্থাপরিষদে যোগদানকারী স্বরাজ্যদলের কার্য্যপ্রণালীও তিনি সেইরূপই অনুমোদন করিতেন। রাষ্ট্রসংস্কারের প্রশ্নে স্বরাজ্য দলের কার্য্যপ্রণালী প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে—সাইমন কমিশনের পরিকল্পনা ইহার তীব্র সমালোচনার বিষয় হয়; এবং ইহার পরোক্ষ প্ররোচনাতে গোলটেবিলের বৈঠকেরও ব্যবস্থা হয়; আর কংগ্রেসের পক্ষে রাষ্ট্র সংস্কারের এক পরিকল্[illegible] নামে প্রকাশিত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মার স্বকীয় নীতি বশে দে[illegible] সাধারণ্যে [illegible]ওবিডেন্স বা নিরস্ত্র প্রতিরোধ কার্য্যে গ্রহণ করা যায় কিনা, তাহারও অনুসন্ধান হয়; সর্ব্বসা[illegible] পক্ষে তাহা অপ্রযুজ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে ও স্থানবিশেষে তাহার প্রয়োগ করা যায় বলিয়া তখন ধার্য্য হয়, এবং মহাত্মা নিজে প্রচলিত লবণআইন অসঙ্গত বলিয়া তাহা ভঙ্গ করিতে সর্ব্বপ্রথম যাত্রা করেন; তাহার দৃষ্টান্তে আরও বহু স্থানে উহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা চলিতে থাকে। রাজশক্তি ইহাতে বাধা প্রদান করিলেও কংগ্রেসের কার্য্য পদ্ধতির সঙ্গতি স্বীকারে কুণ্ঠিত হন নাই—মহানুভব লর্ড আরউইন মহাত্মাকে নিজ প্রসাদে আহ্বান করিয়া উপস্থিত বিবাদের নিষ্পত্তি করিলেন, এবং কংগ্রেস পক্ষে স্বয়ং মহাত্মা গোলটেবিলে যোগদান করতঃ রাষ্ট্রিক যুক্ত মীমাংসাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন, ইহাই স্থির হইল। ভারতীয় গগনে নূতন সুখতারার উদ্রেক সম্ভাবনীয় হইল—মহাত্মার জীবনব্যাপী সাধনা সার্থক হইতে চলিল বলিয়া অনেকে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে সত্য সত্যই মৈত্রী ও সমতার সূত্রপাত দেখা দিল বলিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচির মনীষা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কেহ বা গান্ধী ও আরউইন্ উভয়কেই মহাত্মা বলিয়া, এই মিলনে, কবি কল্পিত আদর্শ পুরুষের উন্নত আসনে স্থাপন করিল। *

এই সময়ে বিলাতের একদল লোক লর্ড আরউইনকে অতি দুর্ব্বল মেরুদণ্ডবিহীন খর

কিন্তু ইতিমধ্যে কয়েকটী গুরুতর বিষয় এই সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল —(১) রাষ্ট্র সংস্কারে ভারতের দাবী অগ্রাহ্য করিবার জন্য ইংলণ্ডে মিঃ চার্চ্চিহিল প্রমুখ একদল লোক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল; ইহারা ভারতবাসীকে সম্পূর্ণ অধীন প্রজার ন্যায়ই চিরকাল রাখিবার পক্ষপাতী; ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য একান্ত প্রয়াসী। কমিশন ও বৈঠকাদির মীমাংসামূলক কার্য্যপ্রণালী ইহাদের অনভিপ্রেত; গান্ধীআরউইন সংলাপ ইহাদের কাছে একান্ত হীনতা-ব্যঞ্জক। লর্ড আরউইনকে দুর্ব্বল প্রকৃতি বলিয়া ইহারা নিন্দা প্রচারে প্রস্তুত। ইহাদের প্ররোচনা ও রটনার ফলে, ভারতশাসননীতির পরিবর্ত্তন ঘটিল, গান্ধী-আরউইন বাদ নিজ মহিমা হারাইল। গোলটেবিলের শেষ মীমাংসা ব্রিটিশ মন্ত্রী সভার অনুজ্ঞায় মাত্র পর্য্যবসিত হইল এবং ইতঃপর ভারতে যে সকল দমনমূলক শাসননীতি অবলম্বিত হইল তাহা ইহার সহায়ক হইল। (২) সাম্প্রদায়িক পার্থক্য ও শ্রেণীবিশেষের (গণের নহে) সুবিধা দানে ভেদ-সৃষ্টি রাষ্ট্রসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে এক বিষম স্থান লাভ করিয়া বসিয়াছে। এই জন্য কংগ্রেসের মূল নীতি যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে, একতা স্থাপন করা, তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাধা পড়িল। সাম্প্রদায়িক স্বার্থে ও ব্যক্তিগত নেতৃত্ব ও পদবী লাভের আশায় মুসলমানগণ পূর্ব্বেই পৃথক দলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল এবং মহাত্মার একান্ত অনুরক্ত কংগ্রেসপন্থী ব্যক্তিরাও তাহার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এতদতিরিক্ত হিন্দুসমাজের অনুন্নত দিগের মধ্যেও রাষ্ট্রসংস্কারে পৃথক্ আসনের ব্যবস্থা করিয়া কংগ্রেসের অভীপ্সিত একতায় আর এক অপ্রত্যাশিত বাধা পড়িল। গোলটেবিলের শেষ মীমাংসায় মহাত্মা এই দুই সম্প্রদায়ের হাতেই মহা অপ্রতিভ হইয়া আসিলেন।

(৩) যে কারণেই হউক্ বর্ত্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রিক ভাবনায় উদ্বোধিত এক শ্রেণীর যুবক ভারতের সাধনার ধারাকে অগ্রাহ্য করিয়া, গান্ধী নীতিকেও পরিহার করিয়া, অন্য এক বিকৃত পথে চলিয়াছে। ইহারা এক্ষণে সন্ত্রাসবাদী বলিয়া পরিচিত। আ[illegible]িক জগতের রাষ্ট্রিক প্রভাব ইহাদের উপরে আছে—ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় জীবনসমস্যা—[illegible] [illegible]তি ইহার সহায়তা করিতেছে। অপর দিকে সমাজ-সাম্য প্রভৃতি আধু[illegible]ভ্যতার অনেক বিষয় ভারতীয় মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে এবং এক শ্রেণীর লোক ইহার প্রচার ও প্রয়োগে আত্মনিয়োগ করিতেছে। এ সমুদয়ই প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তির প্রতিকূল। অনেক রাষ্ট্র ও সমাজের

কুটার মতন তুচ্ছ—"a man of straw" বলিয়া উড়াইয়া দিতেছিলেন; আর এক দল লোক তাঁহার অশেষ প্রশংসাও করিতে ছিলেন। তাঁহার মহানুভবতার গুণে ভারতকে বিষম গোলযোগের হাত হইতে রক্ষা করা হইল—"His qualities alone have stood between India and chaos. আবার কেহ কেহ কবি কিপ্‌লিংএর বাক্য নির্দ্দেশ করিয়া লর্ড আরউইনকে মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় পাশ্চাত্যের আর একজন মহাত্মা বলিয়া উচ্চ প্রশংসা করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন:—

"Oh East is East, and West is West, and never the two shall meet.
Till Earth and sky meet presently at God's great judgement seat.
But there is neither East nor West, border nor breed nor birth
When two strong men meet face to face though they come from the ends of the earth."

ধ্বংস সাধন ইহারা করিয়াছে ও করিতেছে। শাসন কর্তৃপক্ষ ইহাদের দমন না করিয়া পারেন না। আর এই দমন নীতির প্রসার যে কংগ্রেসের উপরেও পরোক্ষে গিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গোলটেবিল হইতে হতাশ হইয়া আসিয়া মহাত্মা পুনঃ অসহযোগ ও আইন-অমান্যকরণের সঙ্কল্প করিলেন এবং নব-নিযুক্ত বড় লাট লর্ড ওয়েলিংডনের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে উপরি উক্ত কারণে ব্রিটিশ নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন ঘটিয়াছে। আইন অমান্যের লক্ষণ দেখা দিতেই কংগ্রেসের উপর চরমনীতি সকল প্রযুক্ত হইতে লাগিল। প্রায় সকল কংগ্রেস কর্ম্মীই কারারুদ্ধ হইলেন। বহু দিন যাতনা ও ক্ষতি স্বীকারের পর কংগ্রেস আজ তাহার গৃহীত নীতির পরিহার করিয়া পুনঃ মুক্তিলাভ করিয়াছে। কিন্তু উহা তাহার পূর্ব্ব শক্তি লইয়া কার্য্য করিতে পারিবে কিনা, তাহাই সন্দেহ হইতেছে। ইতিমধ্যে আর দুইটী অন্তর্বিবাদে কংগ্রেসের শক্তিক্ষয়ের নূতন কারণ উপস্থিত। প্রথমতঃ মহাত্মা রাষ্ট্রিক ব্যাপারে সমাজ-সংস্কার মিশ্রিত করিয়া, হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি, স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ভেদ ও সর্ব্বসাধারণের দেবমন্দিরপ্রবেশ প্রভৃতি বিষয়ে আধুনিক সংস্কার বাদীদিগের পথানুসরণ করায় প্রকৃত হিন্দুসমাজের বিদ্বেষ ভাজন হইয়াছেন, এজন্য ইহারা রাষ্ট্র ক্ষেত্রেও কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাড়াইয়াছে; আবার মহাত্মা গোলটেবিলের বিরোধ করিয়া আসিলেও গোলটেবিলের সাম্প্রদায়িক মীমাংসাকে উপস্থিত কংগ্রেসনীতিতে মান্য করিয়াই লইতে চাহেন। ইহাতে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের ন্যায় কংগ্রেস পন্থী ব্যক্তিও কংগ্রেস মধ্যে নূতন দল বাঁধিয়া বসিয়াছেন। ব্যাপার দেখিয়া মহাত্মা কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়িবেন একথাও উঠিয়াছে।

পাটের চাষ।—

বাঙ্গলার পাটের মূল্য বৃদ্ধি না হওয়াতে কৃষকের ও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ধনী ও জমিদার দিগের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাঙ্গলার পাটই এক মাত্র অর্থ সমাগমের উপায়। সেই অর্থে সরকারী রাজস্ব চলে, জমিদারের বিপুল বিলাসব্যসন, কলিকাতা বাস ও দেশ দেশান্তরে ভ্রমণাদি চলে এবং একালের জগৎব্যাপী কল কারখানার সৃষ্ট নানাদেশের নানা বিলাস দ্রব্য বাঙ্গলাতে আসিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাজার [illegible] বসিয়াছে, পরদেশ ও পর প্রদেশীয় লোকেরাও বাঙ্গলাতে আসিয়া বাঙ্গলার অন্ন গ্রাস করিতেছে। পাটের মূল্য কমিয়া যাওয়াতে এই সকল দিকেই হাহাকার উপস্থিত। গরীব কৃষককুল অন্নে মরিতেছে, আর ধনের আড়ম্বরে যাহারা জীবন গড়িয়া তুলিয়া ছিল, তাহারা মুস্কিলে পড়িয়াছে। পাট ভিন্ন বাঙ্গলার ধন বৃদ্ধির আর উপায় কিছুই নাই। এক সময় ছিল যখন নিজ হস্তকৃত সূতা ও বস্ত্র ব্যবসায়ে বাঙ্গলা এমনই সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই দেশে আসিয়া বাঙ্গলার সেই শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাইয়াছিল, তাহার পর বস্ত্র ও সূত্রের স্থানে নীলের চাষে, বাঙ্গলার অনেক স্থানে, বাঙ্গলার কৃষক আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পরে পাট সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। বিদেশের চাহিদাই যে কোন দেশের বাণিজ্যের উন্নতির কারণ হয় তাহা বলাই বাহুল্য; বাঙ্গলার এই যে শ্রীবৃদ্ধি তাহার কারণ ছিল বিভিন্ন সময়ে এই সকল দ্রব্যের বাহিরের চাহিদা। একালে পাশ্চাত্য জগতের শিল্প ও কলকারখানার বিপুল উন্নতিতে নানা স্থানে কাপড়ের কল স্থাপন ও প্রস্তুত হওয়াতে বস্ত্রের প্রতিযোগিতাতে বাঙ্গলার বস্ত্র-বাণিজ্য নষ্ট হইয়াছে, রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে নীল প্রস্তুত হওয়াতে বাঙ্গলার নীলের চাষ উঠিয়া

গিয়াছে, এক্ষণে বাঙ্গলার পাটের উপরে নূতন আক্রমণ পড়িয়াছে। নীলের ন্যায় পাটেরও প্রতিযোগী কিছু বহির্দ্দেশের কোথাও দাঁড়াইবে কিনা কে বলিতে পারে?

আত্মরক্ষার নিমিত্তই বাঙ্গলার পাটের উপরে এখন দেশের শাসনকর্ত্তৃপক্ষ ও অর্থনীতিবিদ্‌দিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাহিরের চাহিদা বাড়াইয়া লওয়া ইহাদের শক্তি ও সামর্থ্যের বাহিরে। অথচ পাটের মূল্য বৃদ্ধি করিতে হইবে। যে অল্প মূল্যে পাট এই কয়েক বৎসর বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে পাট উৎপাদনের খরচও পোষায় কি না সন্দেহ। কয়েক বৎসর পরীক্ষা ও অপেক্ষা করিয়া সরকার এক্ষণে এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, পাটের চাষ পরিমাণে কমাইতে হইবে, তাহা হইলেই পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। গত ২।৩ বৎসর সরকার এজন্য পুস্তিকাদি প্রচার দ্বারা চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন। প্রজারা উপায়হীন, গত প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল যে পাটের দর তাহাদের মোহ উদপাদন করিয়া গিয়াছে, তাহার হাত হইতে সহজে ইহারা নিস্কৃতি পাইতে পারিতেছে না। সেজন্য সরকার পক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা করিতে যাইতেছেন যাহাতে কৃষককুলকে বলিয়া কহিয়া, প্ররোচনা ও প্রচার দ্বারা, পাটের চাষ কমাইতে রত করা যায়। এজন্য সরকারী বিশেষ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবেন, ম্যাজিষ্ট্রেট বা কালেক্টারগণ এবং সরকারী অপরাপর বিভাগের কর্ম্মচারিগণ সকলেই মনোযোগী থাকিবেন এবং আগামী বর্ষের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করিবেন বলিয়া বরাদ্দ করিতেছেন।

উপস্থিত ব্যবস্থাতে কৃষকদিগের স্বেচ্ছার উপরেই এই জন্য নির্ভর করা হইবে। কিন্তু বাধ্যতামূলক না করিলে যে ইহাতে কোন ফল হইবে, তাহা সম্ভবপর নহে। তবে স্বেচ্ছার অন্তরালে যদি বাধ্যতার শক্তি থাকে তবে পৃথক কথা। যে অতি মাত্র অল্প টাকাতে ইহারা এই ব্যবস্থাতে সফলতা আনিতে চাহেন তাহাও হইয়া উঠিব কি না সন্দেহ। আবার সরকার এখন মনে করেন শতকরা ১০ পরিমাণ চাষের জমি কমাইতে পারিলেই এখন চলিবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরও অধিক পরিমাণ জমি না কমাইলে আশানুরূপ কোন ফল হইবে কি না, সন্দেহ। আর এক কথা এই যে—এ সমুদয় অবস্থার অন্তরালে আর একটী অবস্থা আছে. তাহা দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ও লোকপ্রকৃতির প্রয়োজনীয়তা। পাটের চাষ কমাইয়া ধান্য ও অপরাপর আবশ্যক শস্যাদির উৎপাদন জন্য দেশের এক শ্রেণীর লোক চিরকালই বলিয়া আসিয়াছেন। ইহাদের দৃষ্টি সেই জাতীয় সাধনার প্রতি—লোকের প্রকৃত প্রয়োজন ও দেশ প্রকৃতির প্রকৃত অবস্থার লক্ষ্যে। আজ তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই এদেশের লোকের যাবতীয় দুরবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। আর সেই দুরবস্থার প্রতিক্রিয়াই এক্ষণে নানাদিকে দেখা দিয়াছে। সেজন্যই এই পাটের চাষ কমাইবার জন্য আজ নূতন রব উঠিয়াছে। পাটের চাষের ন্যায় আধুনিকতার অনেক বিষয়ের চাষই কমাইয়া লওয়া আবশ্যক হইয়াছে।—পাটের বাহুল্যের ন্যায় অন্য ভাব এদেশবাসীর বুদ্ধি ও জীবনপ্রণালীর নানা আবর্জ্জনাময় ক্ষেত্র হইতেও অনেক বিষয় উঠাইয়া দিতে হইবে।

বিজ্ঞানের নব জ্ঞান।—

স্যার জেমস্ জীনস্ বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। এবার ব্রিটিশ বিজ্ঞানোন্নতি সভার নেতৃত্ব করিবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। স্বীয় অভিভাষণে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের ভবিষ্যত নির্ণেয় বিষয় সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। তাহাও

জ্ঞেয় বিষয় কি এক না দুই—মানুষের মন ও বাহিরের জগৎ কি এক বস্তু, না দুইটী বিষয়—দ্বৈতাদ্বৈতের এই দ্বন্দ্ব মীমাংসাই ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানকে করিতে হইবে। স্তর জেমস্ জীনস্ এই সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'নিউ ফিজিক্স' গ্রন্থেও তিনি এই প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়াস পাইয়াছেন। বলেন—

"বাহিরের জগৎ যাহাই হউক্ না কেন, আমরা উহাকে আমাদের মনে মাত্র এক প্রকারে অবধারণ করিতে পারি; মনের ভিতরে যে বস্তু থাকে তাহাকেই মন বুঝিতে পারে; বাহিরের কোনও বস্তুর সহিত তাহার পরিচয় সম্ভবপর নয়। কাজেই কোনও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানা আমাদের সম্ভবপর নয়। ...এজন্য জ্ঞাত বস্তুর প্রকৃতি অবধারণ অপেক্ষা জ্ঞাতা মনের প্রকৃতি নির্ণয় করাই আগে কর্ত্তব্য......মানসিক ভাব ও বহির্জগত বাস্তবিক পক্ষে একই প্রকৃতির। ...বহির্জগতে জড় পদার্থ সমূহ কোথায় আছে তাহা লইয়া নব্য বিজ্ঞানের মাথা ঘামাইয়া কাজ নাই; উহারা আমাদের মনের উপরে যে ধারণা জন্মায়, তাহার প্রকৃতি ও নিয়মাদি নির্ণয় করাই ইহার কর্ত্তব্য। সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর জগতের পরিস্থিতি রচনা করিয়াই ক্ষান্ত, উহাকে সর্ব্বপ্রকার গুণমণ্ডিত করা মনুষ্যের (মনের) কার্য্য।" ... ... ইত্যাদি।

স্তর জেমস আজ বিজ্ঞানের তরফে যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন, দর্শন তাহা অনেক আগেই তুলিয়াছিল। মানুষই যে পদার্থজ্ঞানের পরিমাপক (Homo mensura) তাহা গ্রীক সমাজের অতি সাধারণ দর্শনবিজ্ঞানেই ধরা পড়িয়াছিল। প্রায় সকল যুগের প্রধান প্রধান দার্শনিকগণই বাহ্যিক জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া মনোজগতের প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন; বর্ত্তমান জড়বাদ যুগের প্রবর্ত্তক ইন্দ্রিয়সংবিদ্‌বাদিরাও ইন্দ্রিয়—চৈতন্যের নিকট বাহ্যজগতকে গৌণ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহার পরে জড় বাহ্যজগতের পরীক্ষণমূলক প্রত্যক্ষ জ্ঞানবাদ তর্কশাস্ত্রে প্রাধান্যলাভ করাতে, একদিকে যেমন জড়বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি দার্শনিক বিচারকে অভিভূত করিয়া ফেলিল, তেমনই জড়জগতের প্রাধান্যও বিজ্ঞানসমাজে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। এমন কি মনোবিজ্ঞানকে জড়বিজ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত করিয়া ইহারা বিচারাদি করিতে লাগিল। স্তর জেমস্ পদার্থ বিজ্ঞানের সেই প্রত্যক্ষ বা পরীক্ষণমূলক ভাবে প্রণোদিত হইয়াই মনের প্রকৃতি-পরীক্ষায় অগ্রসর হইয়াছেন। জড় ও চেতনের প্রকৃত সম্বন্ধে যদি তিনি ইহাতে কোনও তত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন, তবে তাহা দর্শন-শাস্ত্র-মন্দিরের প্রথম সোপানে স্থান পাইবে মাত্র এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইহাতে ধন্য হইবে। কিন্তু ইহার প্রকৃত তত্ত্বে উপনীত হইলে যে সাধনার আবশ্যক, বর্ত্তমান বিজ্ঞান জগতে তাহার সম্ভাবনা নাই। প্রকৃত জ্ঞান লাভ পক্ষে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি সহায়ক নহে,—বাধক; মানব মনের অহঙ্কার সেই বাধার প্রতিমূর্ত্তিরূপেই সকলের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। স্তর জেমস্ জীনস তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই, পারিবেন কিনা, তাহা সন্দেহ—তাই তিনি বলিতেছেন—"God makes mathematics and Man makes the rest. We are allies of the same power in making the universe. Instead of being determined we determine." এই অহঙ্কারের বিজৃম্ভণ অজ্ঞানেরই নামান্তর মাত্র। প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইতে হইলে এই অহংভাব হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

প্লাবন-পীড়ন।—

আসাম ও বিহার প্রদেশের জলপ্লাবনে লোকের কষ্টের সীমা নাই। বাঙ্গলায় পদ্মার পারে এবং যুক্ত প্রদেশের গঙ্গার ধারে অনেক স্থানও বন্যাপীড়িত। উড়িষ্যায় মহানদী এবং দক্ষিণে নর্ম্মদার জল বৃদ্ধিতে স্থানীয় বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। জীবন যাত্রার অশেষ ক্লেশ, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক অশান্তি এবং আরও নানাপ্রকার উদ্বেগের সহিতই ভূমিকম্পের দৈব কোপ দেশের উপরে এবার পড়িয়াছিল; তাহার উপরে দেশব্যাপী জলপ্লাবন উপস্থিত লোকের বাসস্থান ও ভবিষ্যৎ অন্ন-সংস্থানে দারুণ আঘাত দিয়াছে। প্লাবন-পীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থে লোকের সাহায্য ভিক্ষা সর্ব্বত্র হইতেছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ, ভূকম্প প্রভৃতির দুর্ঘটনায় অহরহ অর্থ সাহায্য করিয়া লোকে আর কত দান করিতে পারে?

জলপ্লাবন এ দেশে এ কালে প্রতি বৎসরই হইতেছে। প্রকৃতির হাতে লোককে যদি এত শীঘ্র শীঘ্র নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় তবে সেই কার্য্যে সহজেই সন্দেহ আইসে;—দেহে রোগ হইলে স্বাভাবিক অবস্থার কোনও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, ইহাই বুঝিতে হয়। জলপ্লাবনের ইতিবৃত্ত খুঁজিলেও বর্ত্তমান যুগে দেশের স্বাভাবিক ভৌগোলিক অবস্থার কতকগুলি ব্যতিক্রম ধরা পড়ে। প্রথমতঃ রেল পথের উচ্চ বাঁধ এক্ষণে সমুদয় দেশকে জালের মত ছাইয়া ফেলিয়াছে—সহজ জল নিষ্কাষণের তেমন ব্যবস্থা নাই; অনেক স্থানের জলপ্লাবন এইজন্য হইয়া থাকে। আর একটী গুরুতর বিকৃত অবস্থায় সৃষ্টি হইয়াছে, বর্ত্তমান সরকারী সেচন-বিভাগের (irrigation department) কার্য্যদ্বারা—প্রায় বৃহৎ সমুদয় নদীর জলপ্রবাহকেই বেশীর ভাগ সেচন-বিভাগের নালা দ্বারা স্বাভাবিক গতির বিমুখী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ শীতের সময় বা বর্ষা ব্যতীত অন্য ঋতুতে সেচনবিভাগের খালগুলি খোলা থাকে; তাহাতে বৎসরের অধিকাংশ সময়, যখন নদীতে জল সরবরাহ কম হয় তখন, মূল নদীর তলদেশ সমূহ শুষ্ক বা মন্দ-সলিলা থাকে; নদীর খাত তাহাতে বালুতে ভরিয়া যায়। কিন্তু বর্ষার সময় সেচন বিভাগ তাহার খালগুলি বন্ধ করিয়া দেয়; ফলে বর্ষার অতিরিক্ত জল সমুদয়ই সেই অগভীরীকৃত নদীর তলদেশ দিয়া বহিতে থাকে; প্রকৃতির গতিতে যত জল তাহাতে বহিয়া যাইত এখন তাহা পারে না। ফলে নদীর দুকূল বহিয়া জলের প্লাবন বয়। এইরূপ কৃত্রিম ব্যবস্থার কোনও প্রতিকার না হইলে একালের প্লাবনের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করা যাইবে না; আর স্থায়ী কোন ব্যবস্থা না হইলে কেবল লোকের সাময়িক চাঁদা বা সাহায্য দ্বারা ইহার কি প্রতিকার হইবে? কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ কোনও প্রতিকারের আশা করা যায় না—দুর্ভোগ চলিবেই। যেদিন সকল কৃত্রিমতাকে ভাঙ্গিয়া প্রকৃতি আবার আপন রীতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবে, তখনই ইহার প্রতিকার হইবে।

সংস্কারকের গুপ্তনীতি।—

দেওয়ান বাহাদুর হরবিলাস সর্দ্দা ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে একটী আইন উপস্থাপিত করিয়া দেশমধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবিত বিবাহ-সংস্কার আইন তাঁহারই নামে 'সর্দ্দা আইন' নামে গৃহীত হইয়া তাঁহার নামের খ্যাতি বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি দেওয়ানবাহাদুর উপাধিও প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার বিধান অনুসারে ১৪শ বর্ষের ন্যূন কোনও ভারতীয় কন্যার বিবাহ সরকারের শাসনে দণ্ডনীয়। হিন্দুর ধর্ম্ম অনুসারে এ বিধান অ-শাস্ত্রীয়, সুতরাং অতিমাত্র

বে-আইনী। 'ধর্ম্মরাজ্য' নামক পত্রিকাতে প্রকাশ সম্প্রতি উক্ত দেওয়ান বাহাদুর রাজপুতনার কিষণগড় নামক সামন্তরাজ্যে গিয়া, অস্থায়ী ভাবে তত্রত্য অধিবাসী বলিয়া পরিচিত হইয়া, আপন আইনের নির্দ্ধার্য্য বয়সের অল্প বয়স্কা ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ সম্পাদন করাইয়াছেন। এ কার্য্য উক্ত রাজ্যে আইনবিরুদ্ধ নহে, ব্রিটিশ ভারতে দণ্ডনীয়। সংস্কারক সর্দ্দা এই গুপ্তনীতিবলে আপন আইনের দণ্ড হইতে আপনাকে বাঁচাইয়াছেন। আজ দেশমধ্যে নানা দিকে যে সংস্কারের বাত্যা বহিতেছে, এই একটী ঘটনা হইতেই তাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায়!

প্রাদেশিক স্বার্থ বনাম বিদ্বেষ।—

প্রাদেশিকতা বা নিজ নিজ প্রদেশের নামে অপর প্রদেশের প্রতি বিদ্বেষপ্রচার এই কালে এদেশের প্রায় সর্ব্বত্র দেখা দিয়াছে। আধুনিক ভারতীয় পরিস্থিতির ইহা আর একটি বিষময় ফল। বাঙ্গালী জাতিকে এক সময়ে প্রায় ভারতের অন্য প্রদেশের সকলেই ঈর্ষার চক্ষে দেখিত ও বিদ্বেষ করিত—বাঙ্গালীর সরকারী কার্য্যক্ষেত্রে উচ্চ পদবী লাভ ও সাধারণ বুদ্ধিকৌশল এই ঈর্ষার কারণ ছিল। বাঙ্গালী আজ প্রায় সর্ব্বত্র অপদস্থ; পরপ্রদেশে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতা দেখাইবার প্রায় সকল পথই রুদ্ধ; নিজ গৃহে কুশিক্ষা ও অনাচারের প্রবল বন্যায় বাঙ্গালীর জন্মগত নিষ্ঠা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। বাঙ্গলাতে এখন অ-বাঙ্গালীদিগের প্রভাব ব্যবসায়ক্ষেত্রে অত্যধিক বাড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া অনেক বাঙ্গালী এক্ষণে প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান অর্থদৈন্য ও অন্নক্লেশের দিনে বাহিরের লোকদিগকে বাঙ্গলার বুকের উপর বসিয়া ধন ও মানে বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া, সকলেই আতঙ্কিত হইতেছে। স্যর পি, সি রায়ের মত পণ্ডিত এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঠাকুরের মত আভিজাত্য-সম্পন্ন ব্যক্তিও ইহাতে আতঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাদেশিক বিদ্বেষ যে জাতীয়তার পরিপন্থী তাহা ভারতের বর্ত্তমান জাতীয়তার অবস্থা দৃষ্টেই বুঝিতে পারা যায়। বিভিন্ন প্রদেশের লোক অন্যান্য প্রদেশে যাইয়া পরস্পর মেলামেশা ও মনোভাব বিনিময় যত বেশী করিবে, জাতীয়তার ভিত্তি ততই দৃঢ় গঠিত হইয়া উঠিবে। যে প্রদেশে যে লোকের কোনও গুণের বা শক্তির উৎকর্ষ দেখা যাইবে, তাহা অপরের অনুকরণের বিষয়ই হওয়া উচিত, বিদ্বেষের নহে। আর যে প্রদেশে যে জাতির যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার প্রয়োগ ও ব্যবহারের জন্য সমগ্র রাষ্ট্রবিধানের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। আজ বাঙ্গলা যেমন অপর দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইয়াছে, বিদ্যা ও ধীশক্তির প্রয়োগ যে সকল কর্ম্ম বা ব্যবসায়ে আবশ্যক, বাঙ্গালীর জন্য সে সকল ক্ষেত্র অপর প্রদেশে উন্মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য বাঙ্গালার নেতৃবর্গ অবহিত হইয়া আপন প্রদেশের যুবকদিগকে অন্য প্রদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা দেখিতেও পারেন। নিজ প্রদেশেও ব্যবসায়ের নিয়মে যুবকদিগকে উৎসাহিত করিয়া কর্ম্মপ্রবর্ত্তকরণ উচিত। এরূপ অনেক বুদ্ধি ইহারা পরপ্রদেশীয় বা বিদেশীয়দিগের নিকট শিখিয়া লইতে পারে। স্বদেশে যে ইহারা উপযুক্ত গুণপ্রভাবে অপর দেশের প্রবাসীগণ অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা লাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা না করিয়া অপর লোকের বিদ্বেষ প্রচারে ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই।

আর্য্য মনোবিজ্ঞান

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজভূষণ শরণ দেব

পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ রস গন্ধাদি বিষয় জ্ঞানের সাধন বটে ইহা সত্য। কিন্তু বৃক্ষাদি ছেদন করিবার সাধন-ভূত কুঠারাদি যন্ত্রগুলি যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি সেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না। উহারা লৌকিক চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের অযোগ্য অতীন্দ্রিয় বা অপ্রত্যক্ষ বস্তু বিশেষ। নতুবা জ্ঞানিন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সিদ্ধি করিবার জন্য পরোক্ষ প্রমাণ অনুমান প্রমাণের অবতারণা করিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। যাহার ভিতর দিয়া বায়ু প্রভৃতি মূর্ত্তদ্রব্যগুলি যাওয়া আসা করিয়া থাকে সেই আকাশের রূপাদি নাই বলিয়া উহা আমাদের অপ্রত্যক্ষ বস্তু বিশেষ। প্রত্যক্ষীভূত এই স্থূল শরীরের সহিত অপ্রত্যক্ষ আকাশের সংযোগ আছে ইহা সত্য। তথাপি দুইটী হস্তের সংযোগ যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় শরীর ও আকাশের ওই সংযোগ কিন্তু সেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না। কারণ প্রত্যক্ষীভূত বস্তুর সহিত অপ্রত্যক্ষ বস্তুর সংযোগটা সর্ব্বত্র অতীন্দ্রিয়ই হইয়া থাকে; অতএব বুঝিতে হইবে যে, আমাদের শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু রসনা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি বিষয়ের সহিত সংযোগবিশেষ ঘটিয়া থাকে। তথাপি জ্ঞানেন্দ্রিয়চয় অপ্রত্যক্ষ বস্তু বলিয়া প্রত্যক্ষীভূত বাহ্য বস্তুর সহিত উহাদের সংযোগটা আর চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষানুভূতির গোচর হইতে পারে না। কারণ ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষীভূত বস্তুর সহিত অপ্রত্যক্ষ বস্তুর সংযোগটা সর্ব্বত্র অতীন্দ্রিয়ই হইয়া থাকে। আর ওই বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগটা প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া উহার অস্তিত্বটা একেবারে নাই বলিয়া উড়াইয়া দিলেও চলিবে না। প্রত্যক্ষ হইতে অনুমানও একটা অতিরিক্ত প্রমাণ বিশেষ। তাহার দ্বারাও বস্তুর স্বরূপ যথাযথ ভাবে নিরূপিত হইতে পারে। অনুমান প্রমাণটাও বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ আছে বলিয়া বুঝাইয়া দিলে তাহার অস্তিত্বটাও আর নাই বলিতে পারা যায় না। আমরা সচরাচর ইহা দেখিতে পাই যে, সম্মুখে একখানি চিত্র রাখিয়া দিলে আলোক কণিকাগুলি চক্ষুর পর্দ্দায় পতিত হইয়া চক্ষু ইন্দ্রিয়ে আলোকপ্রতিফলিত চিত্রটার একটা প্রতিবিম্ব উৎপন্ন করে। তাহার ফলে আমাদের চিত্র সম্বন্ধীয় চাক্ষুষ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। আর ওই চিত্র খানি যদি পৃষ্ঠ দেশে আনিয়া রাখা হয় তাহা হইলে ওই ছবির রূপ ও আকৃতি আর চাক্ষুষ জ্ঞানের গোচর হইতে পারে না। কারণ ছবিখানি প্রচুর আলোকের মাঝে থাকিলেও পৃষ্ঠ প্রদেশদ্বারা ব্যবহিত বলিয়া উহার রূপাদির সহিত চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সংযোগ নামক সম্বন্ধ বিশেষ ঘটে নাই। যাহা ঘটিলেই চক্ষু আলোকে তরঙ্গে দৃশ্যমান পদার্থের রূপাদি অনুভব করিতে পারে, নতুবা নহে; দৃশ্যের সহিত চক্ষুর সংযোগটাই যেহেতু দৃশ্য বস্তুর জ্ঞানের অসাধারণ সহকারী কারণ বিশেষ। যদি বল, দৃশ্যের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ না ঘটিলেও ওই দৃশ্যের উপরে মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প এবং অনুভবকর্ত্তা জ্ঞাতা আমার অনুভূতি প্রবাহ বহিতে পারে, তাহা হইলে আমরা বলিতে চাই যে, যখন তোমার পৃষ্ঠভাগে একখানি নূতন

চিত্র থাকে তখন তোমার চক্ষু ইন্দ্রিয়ে ওই চিত্র সম্বন্ধীয় রূপাদির সম্বন্ধ না ঘটিলেও উহার উপরে তোমার মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প এবং তদনুসারে জ্ঞাতা তোমার অনুভূতির স্রোতও বহিয়া যাউক? কারণ তোমার মতে বস্তুর রূপাদির সহিত চাক্ষুষ সংযোগ না ঘটিলেও ওই রূপাদি বিষয়ে মনের সঙ্কল্পাদি ও জ্ঞাতা তোমার অনুভূতির স্রোত বহিতে পারে। তাহা (সঙ্কল্পাদির স্রোতটা) কিন্তু বহিতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ বর্ত্তমান সম্বন্ধ না ঘটিলে উহাদের বিষয় রাশির উপরে মনের সঙ্কল্পাদি ও জ্ঞাতার জ্ঞান প্রবাহও বহিতে পারে না। রূপাদি বিষয়ের ভিতর দিয়া মনের ভাল মন্দ নানাবিধ সঙ্কল্পাদি ও জ্ঞাতার জ্ঞানালোকের স্ফূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিতে হয় যে, চক্ষু ইন্দ্রিয়ে বস্তুর রূপাদির সংযোগ নামে প্রসিদ্ধ একটা সম্বন্ধ বিশেষ ঘটিয়া থাকে ও আছে। যাহা ঘটিলেই আমরা চক্ষুদ্বারা রূপাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারি ও যাহা না ঘটিলে রূপাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। উক্ত নিয়ম প্রণালী অনুসারে শব্দাদি বিষয় রাশির সহিত শ্রোত্রাদি অন্যান্য বহিরিন্দ্রিয়েরও যে সংযোগ বিশেষ ঘটিয়া থাকে তাহা স্বয়ং নিরূপণ করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

একটা দৃশ্য বস্তু দূরে থাকিলে তাহার সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ ঘটে না। দৃশ্যটা নিকটে থাকিলেই তাহার সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ বিশেষ ঘটিয়া থাকে। আর চক্ষুও সেই বস্তুটা (নিকটবর্ত্তী বস্তুটা) গ্রহণ করে। দৃশ্যের সহিত চক্ষুর সম্বন্ধ না ঘটিলেও যদি দৃশ্যের চাক্ষুষ জ্ঞান হইতে পারে, তাহা হইলে দুরস্থিত বস্তুরও চাক্ষুষ জ্ঞান হইতে আর বাধা থাকিতে পারে না। আর তাহা হইলে দূরে বস্তুর অগ্রহণ মূলক বা নিমিত্ত দূরত্ব ব্যবহারটাও লুপ্ত হইয়া পড়ে। আর দূরত্বের তুলনায় "এই বস্তুটী আমার নিকটে রহিয়াছে ইহা চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে" এইরূপে বস্তুর গ্রহণ নিমিত্ত নৈকট্য বা সামীপ্য ব্যবহারটাও লোপ হইয়া পড়ে। চক্ষু আদি ইন্দ্রিয়গুলি যদি স্বকীয় বিষয়ের সম্বন্ধ না পাইলেও তাহার (স্ব স্ব বিষয়ের) জ্ঞান জন্মাইতে পারে তাহা হইলে এই বস্তুটী নিকটে আর ওই বস্তুটী দূরে রহিয়াছে এই প্রকারে দূরে বস্তুর অগ্রহণ ও নিকটে বস্তুর গ্রহণ নিমিত্ত দূর ও নিকট ব্যবহার করা যাইত না। এইরূপ দোষ আসিয়া পড়ে। উক্ত দোষ স্খালন করিবার জন্য বলিতে হয় যে, বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ আছে বা ঘটিয়া থাকে। নতুবা উক্ত দোষের পরিহারটাও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে।

পক্ষান্তরে মনে করা যাউক, বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগটা বহির্জগতের রূপ রস গন্ধাদির খবরটা মনের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে, আর মন তাহাদিগকে গ্রহণ করে। বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগের অপেক্ষা না রাখিয়া শুধু মনের দ্বারা বহির্জগতের সংবাদটা জ্ঞাতা আমার অনুভূতির ভিতরে আসিবার গত্যন্তর নাই। যদি বল বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগের অপেক্ষা না রাখিয়াও মন রূপাদি বহির্ব্বিষয় গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে আপত্তি এই যে, অবিকলইন্দ্রিয় লোকের মত বিকলইন্দ্রিয় অন্ধাদিরও নিমীলিত নেত্রের ও রূপাদির চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ হইতে আর বাধা থাকিতে পারে না। আমরা বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ লইয়াই বহির্জগৎ প্রত্যক্ষ করি। নতুবা আমাদের গত্যন্তর নাই। আমাদের মন ইন্দ্রিয় বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ লইয়াই রূপাদি গ্রহণ করে। ইহা নীল ইহা পীত ও কটু তিক্ত অম্ল সুগন্ধ দুর্গন্ধ মধুর বীণা রব উহা শীত ইহা উষ্ণ ইত্যাদি রূপে বহির্জগতের সংবাদটা বহিরিন্দ্রিয়ের সম্পর্কেই মনের নিকটে উপস্থিত হয়। কর্ণপটহে বায়ু তরঙ্গের ধাক্কা বা সম্বন্ধ ও চক্ষুর পর্দ্দায় আলোক কণিকার ধাক্কাটা বিষয় (শব্দ ও রূপ) ও ইন্দ্রিয়ের (শ্রোত্র ও চক্ষুর) মাঝ-

খানে দাঁড়াইয়া যথাক্রমে শ্রোত্র ও চক্ষু ইন্দ্রিয়ে শব্দ ও রূপের সম্বন্ধ আনিয়া যেমন উহাদিগকে শ্রোত্র ও চক্ষুর নিকটে প্রকাশ করে, বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগও তদ্রূপ শ্রোত্র আদি ইন্দ্রিয় ও অতি-রিন্দ্রিয়ের (মনের) মাঝখানে দাঁড়াইয়া জ্ঞাতা আমার অনুভূতির কেন্দ্রে বহির্জাগতিক যাহা কিছু তাহাদের সম্বন্ধ আনিয়া উপস্থিত করে। আর মন ওই শব্দাদি বিষয় রাশি গ্রহণ করে।

উল্লিখিত যুক্তি প্রণালীর ধারা অনুসারে বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগের অস্তিত্বটাই যদি সিদ্ধ হইল, তবে ইহাও একটা অবশ্য স্বীকার্য্য বিষয় রহিয়াছে যে, বিষয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের চিরন্তন নৈসর্গিক প্রণয় বা সম্বন্ধ বিশেষ আছে বলিয়াই বহির্জগতের সহিত আমাদের মনের আদান প্রদান ও পরিচয় ঘটিয়া থাকে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সাহায্যে প্রতীয়মান জগৎ আমাদের মনের পরিচিত (সঙ্কলিত) হইয়া থাকে। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগের অপেক্ষা না রাখিয়া মন স্বভাবতঃ বাহিরে যাইয়া বহির্জগৎটা স্বীয় কল্পনা স্রোতে ভাসাইতে পারে না। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সম্মুখে বর্ত্তমান বিশাল বহির্জগতের সহিত মনের পরিচয় হওয়াটা অসম্ভব অথবা প্রমাণদ্বারা নিরূপন করিবার অযোগ্য তাহা নহে। যদি উহা অসম্ভব ও প্রমাণশূন্য বিষয় হইত তাহা হইলে কি হইত? এই জড় জগৎ কোনও কালে আমাদের অনুভূতির কেন্দ্রে স্থান পাইতে পারিত না।—মনে কর, আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যেন রথ বিশেষ। আর ওই রথের পরিচালক সারথি হইতেছে আমাদের মন! কারণ মন যদি জ্ঞানেন্দ্রিয় রথে আরূঢ় (সংযুক্ত) না হয় তাহা হইলে সারথিবিহীন রথের মত জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ স্বকার্য্য (রূপাদি জ্ঞান) উৎপন্ন করিতে পারে না। মন সংযোগের অপেক্ষা না রাখিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি স্বাধিকারস্থ ও চিরক্ষুণ্ণ বিষয়মার্গে বিচরণ করিতে পারে না। ইহা আমরা প্রত্যক্ষতঃ অনুভব করি যে, সময় বিশেষে (অন্যমনস্ক অবস্থায়) চক্ষু চাহিয়া থাকিলেও চক্ষু সন্নিকৃষ্ট রূপাদির সহিত চক্ষু ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও রূপাদি জ্ঞান হয় না। কারণ বাহা ইন্দ্রিয় বা জ্ঞান সাধন করণ বস্তু তাহা কখনও স্বয়ং স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। অতএব জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি যেমন রূপাদি জ্ঞানের সাধন বা কারণভূত বস্তু বলিয়া মন নামক অন্য একটী পরিচালকের সম্বন্ধ রাখিয়াই স্বকার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হয় নতুবা নহে। এইরূপ মনও অতিরিন্দ্রিয় বিশেষ বস্তু বলিয়া উহাও একজন পরিচালক জ্ঞাতা আত্মার অপেক্ষা না রাখিয়া স্বয়ং স্ব পরিচালিত হইয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে পারে না। দেখ বৃক্ষাদি ছেদনসাধন কুঠারাদি কি? একজন পরিচালকের মুখের দিকে না চাহিয়া স্বয়ং স্বপরিচালিত হইয়া স্বকার্য্য সাধনে সক্ষম হয়? কখনই না। মন বা অন্তঃকরণের ভিতরে অনুভব কর্ত্তা জ্ঞাতা আমার জ্ঞানালোকের সঞ্চার না থাকিলে অন্তঃকরণ পঙ্গু ও অন্ধ প্রায় হইয়া বিষয়ের ভিতরে ভাল মন্দ নীল পীত সুগন্ধ দুর্গন্ধ শীত উষ্ণ প্রভৃতি কোনও প্রকারের সঙ্কল্প, স্মৃতি, বুদ্ধি, আদি কার্য্যগুলি করিতে পারে না।—সুষুপ্তি সময়ে অন্তঃকরণ জ্ঞাতা আমার জ্ঞানালোক হারা হইয়া যায় বলিয়াই উহা (অন্তঃকরণ) ওই সুষুপ্তি সময়ে কিছু মাত্র সঙ্কল্পাদি কার্য্য করিতে পারে না, সুতরাং আমাকে কিছু মাত্র জানাইতেও পারে না। জীবের সুষুপ্তি অবস্থায় অজ্ঞান অন্ধকারের ভিতরে আরো অধিকতর গাঢ় অজ্ঞান অন্ধকার প্রবেশ করিয়া জমিয়া ঘনীভূত হইলে অন্তঃকরণ তাহাতে (সৌষুপ্ত অজ্ঞানে) বিলীন হইয়া লুকাইয়া মিশিয়া যায়। সেই জন্য সুষুপ্তি সময়ে জ্ঞাতার জ্ঞান শক্তি অজ্ঞানে আবৃত থাকে। আর জ্ঞাতার জ্ঞান!

শক্তির স্ফূর্ত্তি স্পষ্ট বিকাশ না থাকায় অন্তঃকরণ সৌষুপ্ত অজ্ঞান তিমিরের গর্ভে থাকিয়া নিষ্ক্রিয় বা পঙ্গু ও অন্ধপ্রায় হইয়া পড়ে। তখন (সুষুপ্তি দশায়) অন্তঃকরণের কোনও প্রকারের আর সাড়া পাওয়া যায় না। হৃদয়ে জ্ঞাতার জ্ঞানরবির কিরণাবলী না পড়িলে হৃদয়কমল কি অজ্ঞানের জড়তার কবল হইতে মুক্ত হইয়া বিকশিত (অনুভূত) হইয়া স্বকার্য্য সাধনে সক্ষম হয় ? কখনই না। নিবিড় অন্ধকারের মাঝে লুক্কায়িত দৃশ্য সমূহ যেরূপ চাক্ষুষ জ্ঞানের অধিকার ভুক্ত হয় না। সৌষুপ্ত গাঢ় অজ্ঞানের আবরণে অন্তঃকরণও তদ্রূপ জ্ঞানালোকের অস্পষ্ট বিকাশবশতঃ জ্ঞানচক্ষু হারাইয়া অন্ধপ্রায় হইয়া নিষ্ক্রিয় (সঙ্কল্পাদি ক্রিয়াশূন্য) হইয়া পড়ে। অন্তঃকরণ নিজের নির্দ্দিষ্ট স্থান বিশেষ (জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহে ও তদাধিকৃত বিষয় সমূহে) বিহার করিয়া বিষয়ের ভিতরে ভাল মন্দাদি তারতম্যে কল্পনাদি কার্য্য করিতে পারে না। এই জন্যও বলিতে হয় যে, জ্ঞাতার জ্ঞানালোক পাইয়াই মন বিষয়ের ভিতর দিয়া ভাল মন্দাদি কল্পনা করিতে ও বুদ্ধি, স্মৃতি প্রভৃতি জ্ঞানগুলি জন্মাইতে পারে। একজন পরিচালক জ্ঞাতার সাহায্যে অর্থাৎ জ্ঞানী লোকের সম্বন্ধ বিশেষ না পাইলে মন ইন্দ্রিয় বা করণবস্তু বলিয়া উহা কখনও স্বয়ং স্বপরিচালিত হইয়া স্বকার্য্য সাধনে সক্ষম হইতে পারে না। স্থূল দেহের প্রতিনিয়ত স্থান ও বাহ্য বিষয় বিশেষে অধিকৃত চক্ষু আদি যন্ত্রগুলি যেরূপ রূপাদি বহির্বিষয়ের জ্ঞান সাধন বস্তু বলিয়া বহিরিন্দ্রিয় আখ্যায় পরিচিত হয় এইরূপ সূক্ষ্ম অন্তর্জগতের বিষয় সুখদুঃখাদি জ্ঞানের অসাধারণ কারণ বা করণ বলিয়া মনও অন্তঃকরণ আখ্যায় অভিহিত হয়। আমাদের মনটা যে ইন্দ্রিয় বা করণ বিশেষ ইহা বিশেষরূপে নিরূপণ করা হইয়াছে। আমাদের মন কুঠারাদির মত করণভূত বস্তু বিশেষ। সেই জন্য তাহাকে আর স্বতন্ত্র জ্ঞাতা বলা যায় না। জ্ঞাতার জ্ঞানশক্তির সম্বন্ধ পাইয়াই জড় অচেতন মনও নিজে প্রকাশিত (জ্ঞাত) হয়। মনের কিন্তু স্বভাবতঃ জ্ঞানালোক নাই। অতএব আমাদের মন পরতন্ত্র পরাধীন—জড়। একজন জ্ঞাতার অধীন। অচেতন রথাদি যেমন একজন চেতন সারথির অপেক্ষা রাখিয়াই নিয়মিত মার্গে গমনাগমন করিতে পারে। মনও এইরূপ জ্ঞান সাধন জ্ঞেয় করণভূত বস্তু বলিয়া একজন চেতন জ্ঞাতা পরিচালকের অধীনেই উহার কার্য্যগুলি সম্পন্ন হয়। নতুবা নহে, মনোরথের পরিচালক যে একজন জ্ঞাতার আবশ্যক হয় তাহা শাস্ত্রে আত্মা নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার অপেক্ষা রাখিয়াই মনের কার্য্যকলাপ নিষ্পন্ন হয়। ওই মনই আত্মার রথ বিশেষ। ওই মনোরথে আরূঢ়—সংযুক্ত হইয়া জ্ঞাতা মানসিক সকল প্রকার প্রবৃত্তিই অনুভব করেন। রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই তিনটা দোষদ্বারা প্রেরিত হইয়া মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয়। তাহার ফলে বাহিরের বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিতে পারা যায়। রূপাদি মৎ বহির্জগৎ জ্ঞাতা আমার অনুভূতির কেন্দ্রে অবস্থিতি লাভ করে। জ্ঞাতা আত্মাও আবার মনের সংসর্গে বাহ্য বস্তুতে আসক্ত অথবা দ্বেষযুক্ত হইয়া যথাক্রমে বস্তুর গ্রহণে ও পরিহারে অনুমতি দিবার জন্য প্রতিমাণে মনের সহিত মিলিয়া থাকেন। সেইজন্য মন ও মনদ্বারা সঙ্কল্পিত সঙ্কল্পাত্মক বিষয়গুলি আমার অনুভূতির আলোকে অপরিচিত থাকিতে পারে না। অর্থাৎ মন যখন আমার সর্ব্বদা পরিচিত জ্ঞানগম্য ও সম্মুখবর্ত্তী সাক্ষাৎ বিষয় বিশেষ। তখন মনের সোপানে আরূঢ় মানসিক সঙ্কল্পাত্মক বিষয়গুলিও জ্ঞাতা আত্মার বা আমার পরিচিত মধ্যে গণ্য হইতে বাধ্য। কারণ মনের পরিচিত বিষয় কখনও জ্ঞাতা আমার জ্ঞানালোকের আড়ালে থাকিতে পারে না।

দেখ চক্ষু দ্বারা কোন অভিনব রূপ আলোচিত হইলেই ওই রূপের উপরে মনের সঙ্কল্প প্রবাহটা ছুটিতে পারে। কিন্তু চক্ষু দ্বারা অনালোচিত হইলে মন ওই অভিনব রূপটী চক্ষু হইতে তুলিয়া লইয়া স্বীয় কল্পনার স্রোতে ভাসাইতে পারে না। চক্ষু আদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনালোচিত বিষয় বিশেষ মনের সঙ্কল্প স্রোতটা যেমন ছুটিতে পারে না, এইরূপ মন বা মানসিক সঙ্কল্পের অগোচর (অসঙ্কল্পিত) বিষয় রাশির উপরে অনুভব কর্ত্তা জ্ঞাতা আত্মার অনুভূতির সম্বন্ধধারাও বহিতে পারে না। অর্থাৎ মনের অপরিচিত বিষয় রাশি আমাদের অনুভূতির উল্লেখ যোগ্য বিষয়রূপে অনুভূত হইতে পারে না। কিন্তু আমরা যখন রূপ দেখিতে পাই। বর্হিজগতের শব্দাদি বুদ্ধিগুলি যখন আমরা স্পষ্টরূপে অনুভব করি, তখন রূপাদি জ্ঞানের গোপন বা অস্বীকার আর আমাদের অভ্যন্তরে স্থান পাইতে পারে না। বর্হিজগৎ তখন আমাদের অনুভূতির বিষয় রূপে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বলিতেই হইবে যে, বর্হিজগৎ আমাদের মনেরও পরিচিত হইতে বাধ্য। নতুবা উহা (বর্হিজগৎ) কোনও কালে আমাদের অনুভূতির কেন্দ্রে স্থান পাইতে পারিত না।

মনের সহিত প্রতীয়মান জগতের পরিচয় বা সম্বন্ধ হয় না বা নাই বলিতে গেলে চলিবে না। শারদীয় পূর্ণিমার চন্দ্র কিরণে আমাদের মনের স্ফূর্ত্তি হয়; বসন্তের মৃদু মন্দ হাওয়াতে মনের আনন্দ অনুভূত হয়; ব্যাঘ্র দেখিলে ভয় হয়; বাহিরের নানা বিধ বস্তু দেখিয়া রাগ দ্বেষ ভয় লজ্জা ঘৃণাদি আভ্যন্তরীণ ভাবগুলি অনুভূত হয়; বাহ্য বস্তু অন্নাদি ভক্ষণ করিলে মন সুস্থতা অনুভব করে ও খাদ্য অনুসারে মনেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। বহির্জগতের ঘাত প্রতিঘাতের তরঙ্গটা মনের উপরে অনবরত বহিতেছে। এইরূপ আমাদের জীবন-কাল ব্যাপিয়া জড় জগতের সহিত দেনা লেনা কারবারটা সর্ব্বদাই চলিতেছে। বহির্জগতের গতিটা জ্ঞানেন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া মনের উপরে আঘাত করিলে মনও আবার আঘাতকারী ওই বস্তুর দিকে (বাহিরের দিকে) একটি তরঙ্গ বা প্রতিঘাতের ভাব দিয়া থাকে। তাহার ফলে জ্ঞাতা আমার অনুভূতিখানি জাগিয়া যখন বিষয়ের আঘাত পায় তখন বুঝিতে হইবে যে বহির্জগতের আঘাত প্রতিঘাতের তরঙ্গটাও মনের উপরে লাগিয়া থাকে। আর বহির্জগতের দিকেও মনের তরঙ্গ ছুটিয়া থাকে। নতুবা বহির্জগৎ কখনও জ্ঞাতার অনুভব শক্তির নিকটে যাইয়া স্বয়ং সম্বন্ধ করিতে পারে না। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ (মন) যখন পরস্পর আহত প্রতিহত হইতেছে, উঠিতে বসিতে নড়িতে চড়িতে মন সর্ব্বদা বাহ্য বস্তু শরীরাদির ভার বোধে বেদনা অনুভব করিতেছে, তখন বহির্জগতের সহিত মনের যে একটা বাঁধাবাঁধি সম্পর্ক বা পরিচয় আছে তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। বহির্জগতের সহিত আমাদের মনের পরিচয় হয় বা পরিচয় হওয়া সম্ভবে ইহা আর অস্বীকার করিলে চলিবে না। (ক্রমশঃ)

———

অমৃত বচন

[দ্বিতীয় অধ্যায়]

[সুরতকে জাগরিত করিবার ও অন্তরে বাড়াইবার সাধন প্রণালী]

শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আধ্যাত্মিক উন্নতি

সমষ্টির (macrocosm) সহিত ব্যষ্টির (microcosm) যে সম্বন্ধ আছে তাহা আমরা প্রথম অধ্যায়ে সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়াছি। এ মনুষ্য দেহে সুরত অর্থাৎ আত্মার স্থান কোথায় এবং যে ধামে গমন করিলে পরম ও অনন্ত আনন্দ প্রাপ্তি হয় সেই ধামই বা কোথায় তাহা আমরা নির্ণয় করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের দেখা কর্ত্তব্য যে কি উপায় ও সাধন দ্বারা সেই ধামে পৌঁছিতে পারি এবং তথায় যাইবার পথে যে সকল লোক ও দেশ আছে, কিরূপে তাহা অতিক্রম করিতে পারি। এই সমস্ত বিষয় আমরা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি :—

এ মনুষ্য শরীরে আত্মার যে সকল অন্তর্নিহিত শক্তি আছে সেগুলিকে জাগরিত করা উক্ত সাধনার প্রথম সোপান। তাহার পর নির্ম্মল চৈতন্য দেশে যাইবার জন্য যে ক্ষমতা আবশ্যক তাহা আত্মা প্রাপ্ত হইবে। যে অবধি আত্মা এ পিণ্ডদেশে আসিয়াছে, সেই অবধি স্থূল প্রকৃতির ও এই জগতের (পিণ্ডের) ছায়া তাহার উপর পড়িয়াছে এবং তাহার প্রতিক্রিয়াও হইয়াছে। এইরূপে ইহা মন ও প্রকৃতির সহিত সংলগ্ন হওয়ার ইহার বহির্মুখী ধারা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত চৈতন্য শক্তি সুপ্ত ভাবেই আছে। বাহিরের সংস্কারে বহির্মুখ শক্তি যেরূপ জাগরিত হইয়াছে, সুরতের বৈঠক স্থানে সেইরূপ অন্তরের সংস্কার অঙ্কিত করিতে পারিলে ইহার অন্তর্নিহিত চৈতন্য শক্তি জাগিয়া উঠিবে এবং তখনই ইহা উচ্চ ধামে যাইবার উপযোগী বেগ ও শক্তি প্রাপ্ত হইবে।

শ্রবণ দর্শন ও বচন মনুষ্য জীবনের আবশ্যকীয় অঙ্গ চিত্ত-বৃত্তি একাগ্র করিবার জন্যও জীবের চৈতন্য শক্তি বা সুরতকে জাগরিত করিয়া উচ্চ ধামে আরূঢ় করিবার জন্য যে সকল সাধন প্রণালী আছে তাহা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমরা অন্য একটী কথা বলিব।

সেই সাধন প্রণালী স্পষ্টরূপে বুঝানই এই কথার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই স্থূল জগতে বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এবং সেই জ্ঞান অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে হইলে, আমাদের চক্ষু, কর্ণ ও বাগেন্দ্রিয়ের ব্যবহার করিতে হয়। সুতরাং এ স্থূল শরীরের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার সংগ্রহার্থে এই তিনটি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করা প্রথমতঃ আবশ্যক। ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে যদি এই তিনটী ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হয় তাহা হইলে মনুষ্যের মানসিক শক্তিসমূহ হয় বিলুপ্ত অথবা অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং জীবনও স্বল্পকাল স্থায়ী হইয়া পড়ে। যেহেতু—

চক্ষু ও কর্ণ দ্বারা যদি কিছু দর্শন ও শ্রবণ না করা যায় তখন কি বিষয়ই বা মন চিন্তা

করিবে এবং যাবৎ মুখ দিয়া কিছু বলা না যায় তাবৎ আমাদের মনাগত ভাব অন্যের কাছে কি রূপেই বা প্রকাশ করিতে পারা যাইবে, এবং আমাদের যাহা আবশ্যক তাহা কিরূপেই বা পূর্ণ হইতে পারে? এরূপে আমাদের মানসিক শক্তিই বা কিরূপে বিদ্যমান থাকিতে পারে এবং আমরা কত দিনই বা জীবন ধারণ করিতে পারি?

উপরে আমরা যাহা বলিলাম তাহা কেবল স্থুল ঘাট অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়ের পক্ষেই বলা হইয়াছে, পরন্তু উহা সূক্ষ্মতর এবং উচ্চতর ঘাটের (plane) ক্রিয়া সম্বন্ধেও সত্য অর্থাৎ উচ্চতর ঘাটের ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় হইলে তথাকার দেহের চৈতন্য শক্তিও নিস্তেজ ও মৃতপ্রায় হয়। কিন্তু স্থুল দেহের পরিপোষণার্থে সেই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের বিশেষ কোন কার্য্য আবশ্যক হয় না। সেজন্য সে সকল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলেও এই স্থুল শরীরের অস্তিত্বের কোন হানি হয় না। সেই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সকল যে নিয়মিত রূপে পরিচালনা না করায় তাহারা এই শরীরে সুপ্তভাবে থাকে এবং যে উদ্দেশ্যে মনুষ্য শরীরে তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা সাধিত হয় না।

এই মতে যে সকল ভক্তি ও সাধন প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা উল্লিখিত তিন প্রকার ক্রিয়ার অনুশীলনার্থ তিন ভাগে বিভক্ত :—

(১) চৈতন্য ধারা দ্বারা চৈতন্য নামের 'সুমরণ' অর্থাৎ জপ

(২) চৈতন্য রূপের ধ্যান বা দর্শন

এবং

(৩) মনোযোগ করিয়া চৈতন্য শব্দের শ্রবণ।

প্রেতগণ যখন এ জগতে আবির্ভূত হয় তখন তাহারা সাধারণতঃ উল্লিখিত তিন প্রকার ক্রিয়া (বচন, দর্শন ও শ্রবণ) করিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে তাহাদের ঐ প্রকারের সূক্ষ্মতর ক্ষমতা আছে। স্থুল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে সকল ঘটনা জানিতে পারা যায় না উক্ত সূক্ষ্ম শক্তির দ্বারা সেই সকল ঘটনাও তাহারা জানিতে পারে। দর্শন শ্রবণ ও বচন যে কেবল স্থুল ঘাটেই দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নহে, উহারা সূক্ষ্ম ঘাটেও বিদ্যমান আছে। এবং সেখানে উহাদের ক্ষমতা আরও অধিক পরিমানে বিস্তৃত। সুতরাং যে সকল সাধন প্রণালী আমরা বর্ণনা করিব তাহা কাল্পনিক নহে। এবং বৈজ্ঞানিক বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে হইলে বৈজ্ঞানিকেরা যেরূপ পরীক্ষা করিয়া থাকেন এই বিষয়েও সেইরূপ পরীক্ষা করা উচিত।

রচনাত্মক শক্তিসমূহ অজানিতরূপে কার্য্য করিয়া থাকে

যে ত্রিবিধ মাপের (three dimensions) বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। অর্থাৎ এই স্থুল জগতে যে তিনমাপ আমরা দেখিতে পাই, সূক্ষ্মতর জগতে এই তিন মাপ ব্যতীত আরও তিন মাপ আছে এবং তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর দেশে এই ছয় মাপ ছাড়া আরও তিন মাপ ক্রমান্বয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপে এই বিশ্ব জগতের স্তরে স্তরে ত্রিবিধ মাপের অনেকগুলি বিভাগ রহিয়াছে কিন্তু সৃষ্টির নিয়ম এই যে যে বিশেষ বিশেষ রচনাত্মক শক্তি ত্রিবিধ মাপের এক বিভাগের উপর কার্য্য করে তাহা অন্য বিভাগের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না। এইরূপ ব্যবস্থা যদি না থাকিত তাহা হইলে সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। এবং তড়িৎশক্তি

কাচাদি পদার্থের ভিতর দিয়া বাধা অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইলে সেই কাচাদির যেরূপ অবস্থা হয় উচ্চ ধাম হইতে নিম্নতর ধামে শক্তি প্রবাহিত হইবার সময় ঠিক সেইরূপ অবস্থাই সংঘটিত হইত অর্থাৎ নিম্নতর দেশ একেবারে ধ্বংশ হইয়া যাইত। তৃতীয় অধ্যায়ে রচনা বিষয় বর্ণনা কালে ত্রিবিধ মাপের প্রত্যেক বিভাগ (each of three dimensions) অন্য বিভাগের সহিত কিরূপ ভাবে সংলগ্ন অথচ পৃথক রহিয়াছে তাহা আমরা দেখাইয়াছি। তবে এস্থানে সেবিষয়ের পুনরুল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে রচনার অনেক মহতী শক্তি আছে যাহা অজানিত ঘাটের ভিতর দিয়া কার্য্য করিতেছে, সেই শক্তিগুলিকে আমাদের কিছুতেই উপেক্ষা করা উচিত নহে।

এই সকল শক্তি যখন তীব্র বেগে প্রবাহিত হয় তখন উচ্চরবে শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে। সাধকের অন্তর্নিহিত শক্তি জাগরিত হইলে, সেই সকল শব্দ বিশেষরূপে অনুভূত হইয়া থাকে।

দুই প্রকার শব্দ আছে। যথা :—

(১) চৈতন্য শব্দ, ইহা অন্তরমুখী ও আকর্ষক

(২) মায়িক ও মানসিক, ইহা বহির্মুখী অর্থাৎ বহির্জগতের দিকে মনকে লইয়া যায়। (পূর্ব্ব এক প্রকরণে দ্রষ্টব্য)

শব্দ স্বীয় উৎপাদিকা শক্তির অনুরূপ

এজগতে যত প্রকার শব্দ আছে তাহাতে স্ব স্ব উৎপাদিকা শক্তির গুণ ও প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে:—

বারুদ বা তদ্রূপ অন্য কোন বিস্ফোরক দ্রব্য প্রজ্জলিত হইলে ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হয়। যখন এই স্ফোটন হয় তখন বহু পরিমানে বায়বীয় পদার্থ (gaseous substance) একই স্থানে উৎপন্ন হয়। তাহার ফলে চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডলে সজোরে আঘাত লাগে। এইরূপ আঘাত লাগায় যে অবস্থা হয় তাহা সেই শব্দেও বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ আঘাতের প্রবলতা ও আকস্মিকতা সেই শব্দে স্পষ্টরূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। অন্যান্য বৈখরী বা উচ্চারিত শব্দও এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্য হৃদয়ে যে ভাব থাকে তৎপ্রকাশক শব্দেও সেই ভাব বিদ্যমান থাকে। হৃদগত ভাব যেরূপ বলবান হয় শব্দেও তাহা স্পষ্ট অনুমিত হইয়া থাকে এবং সেই ভাবের তীব্রতানুসারে শব্দেরও ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। মনুষ্য হৃদয়ে তীব্র ক্রোধ বা প্রেমাদির যখন প্রাবল্য হয় তখন তাহার উচ্চারিত শব্দেও সে ভাব প্রকাশিত হয়।

পশুদিগের অতি নিম্ন ক্রমের চৈতন্য থাকে; তাহারা যে সকল শব্দ করে তদ্দারা তাহাদের স্থুল ভাব (মোটামুটি ভাব) প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ আঘাত লাগিলে তাহারা এক প্রকার কষ্ট সূচক ভাব প্রকাশ করে এবং ক্রোধান্বিত হইলে তাহারা যে আর এক রকম ভাব প্রকাশ করে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু মনুষ্যে যে সকল উন্নত ভাব ও চিন্তা আছে তাহা মনুষ্যের কণ্ঠস্বরে প্রকাশিত হয়। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির বাক্য শুনিলে এ কথার যথার্থতা বুঝিতে পারা যায়। সাধারণ মনুষ্যও যখন ভাবের আবেগে বিহ্বল হয় তখন তাহাদের ভাষাও সেই সকল হৃদগত ভাব প্রকাশ করে। মাতা যখন সস্নেহে নিজ শিশুসন্তানকে আদর করেন, তখন তাঁহার হৃদয়-দ্রবকারী শব্দ সেই ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে। সেইরূপ প্রিয়জনের বিয়োগ জনিত

শোকাতুর করুণ বিলাপ ধ্বনিতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগণের ভৈরব রণনিনাদে তাহাদের হৃদ্গত ভাব স্পষ্টরূপে সূচিত হইয়া থাকে। সামান্য মনুষ্য যদি শব্দদ্বারা এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে পারে তখন সৃষ্টির প্রারম্ভে আদি চৈতন্যশক্তির প্রথম বিকাশ সময়ে চৈতন্যময় কিরূপ শব্দ উত্থিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রভাবও কিরূপ চৈতন্যময় হইয়াছিল তাহা আমরা সামান্য বুদ্ধিতে ধারণাও করিতে পারি না।

চৈতন্য শব্দের গতি সততই অন্তর্মুখী

কোন শক্তির বিকাশ বলিলে আমরা সাধারণতঃ এই বুঝি যে, সেই শক্তি কোন কেন্দ্র (centre) হইতে নির্গত হইয়া বৃত্তাভিমুখে (centre fugal) বহির্মুখী ধারায় প্রবাহিত হয়।

পূর্ব্ব প্রকরণের শেষ ভাগে আমরা যে আদি চৈতন্য শক্তির বিকাশের কথা বলিয়াছি, তাহা সাধারণতঃ লোকে এইরূপ ভাবেই গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু আমরা সেই ভাবে ঐ শব্দ প্রয়োগ করি নাই। সেই আদি চৈতন্য শক্তি প্রথমে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রকটাবস্থায় (latent) ছিল; সৃষ্টির প্রারম্ভে তাহা প্রকটাবস্থায় (kinetic) আসে। কিন্তু চৈতন্য শক্তি অন্তরমুখী ও আকর্ষক; সুতরাং সেই শক্তির বিকাশে যে শব্দ উদ্ভূত হয় তাহাও অন্তরমুখী ও আকর্ষক। এই আদি চৈতন্য শক্তির গুণ ও প্রকৃতির ছাপ সকল প্রকার চৈতন্য শক্তিতে পড়িয়াছে অর্থাৎ যত প্রকার চৈতন্যশক্তি আছে তাহারা সকলেই অন্তরমুখী ও আকর্ষক। যখন সাধক আজ্ঞাচক্র জাগরিত করিয়া অনাহত ধ্বনি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করেন তখন তাঁহার আত্মা এক অন্তরমুখী বলবৎ আকর্ষণ অনুভব করে।

নিয়মিত রূপে সুরত শব্দযোগের অভ্যাস করিলে (সাধনা করিলে) আত্মাও অন্তরমুখী হয় এবং যে উচ্চতর চৈতন্য ঘাট হইতে চৈতন্য শব্দ আসিতে থাকে, সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। এইরূপে সুরত শব্দযোগ বা ভজনের অভ্যাস দ্বারা আত্মা জাগরিত হইয়া থাকে। চৈতন্য শব্দ সমূহ অতিশয় সূক্ষ্ম, সুতরাং যে পর্য্যন্ত আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তি সকল ধ্যান ও সুমিরণ দ্বারা জাগরিত না হয় সে পর্য্যন্ত কেহ চৈতন্য শব্দ প্রকৃতরূপে শুনিতে পায় না। যোগ সাধনায় বিশেষ অগ্রসর হইলে সাধক উচ্চঘাটের শব্দ শুনিতে পান; এই জন্য শব্দ অভ্যাস যোগ সাধনার উচ্চ সোপান। কিন্তু সে জন্য চৈতন্য শব্দ শ্রবণের অভ্যাস (অর্থাৎ যাহাকে পারিভাষিক শব্দে ভজন বলে) দীর্ঘকাল স্থগিত রাখিতে হয় না।

সাধক দেড়মাস বা দুইমাস ধ্যান ও সুমিরণ অভ্যাস করিলে ভজন বা চৈতন্য শব্দ শ্রবণের অভ্যাস আরম্ভ করিতে পারে।

এক্ষণে আমরা ধ্যান ও সুমিরণের বিষয় বলিব।

প্রচলিত সাধারণ রূপের ধ্যানকে প্রকৃতপক্ষে নির্ম্মল চৈতন্যের ধ্যান বলা যায় না

এই সৃষ্টি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত :—(১) চেতন ও (২) অচেতন।

এই জগতে চৈতন্য রূপের সাধ্য মনুষ্যের রূপই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই জন্য কেহ কেহ অনুমান করিতে পারেন যে মনুষ্যের রূপের ধ্যানই সর্ব্বোচ্চ চৈতন্য রূপের ধ্যান কিন্তু প্রকৃত পক্ষে

তাহা নহে। কেবল জাগ্রতাবস্থাতেই মনুষ্যের চৈতন্যের প্রকাশ ও ধীশক্তির কার্য্য হইয়া থাকে। যেহেতু এই অবস্থাতেই মনুষ্য জ্ঞান লাভ করে।

স্বপ্নাবস্থাতে এই জ্ঞানলাভের শক্তি মনের পূর্ব্ব সংস্কারের অধীন হয়। এবং সুষুপ্তি অবস্থায় তাহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই কারণে মনুষ্যরূপের ধ্যানকে নির্ম্মল চৈতন্য রূপের ধ্যান বলা যায় না; বরং ইহা সামান্য বুদ্ধি ও জ্ঞান সংযুক্ত স্থূল রূপেরই ধ্যান বলিতে হইবে। পরম পুরুষকে যদ্যপি আমরা অনন্ত আকাশ রূপ মনে করিয়া ধ্যান করি, তাহাও প্রকৃত চৈতন্য রূপের ধ্যান বলিতে পারি না; কেননা অনন্ত আকাশ রূপের যে ভাবনা তাহা স্থূল রূপের ভাবনা হইতেই উদয় হইয়া থাকে। অতএব এরূপ ধ্যান প্রকৃত নির্ম্মল চৈতন্য রূপের ধ্যান হইতে পারে না।

হৃদ্গত ভাব সমুহ মুখে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে

প্রকৃত চৈতন্যরূপের ধ্যান যে কি তাহা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে দুই একটি অন্য বিষয়ের কথা আমরা বলিব যাহাতে আমরা এ বিষয় সহজভাবে বুঝিতে পারিব। পূর্ব্ব এক প্রকরণে আমরা বলিয়াছি যে হৃদয়ের যত বলবৎ ভাব আছে তাহা মনুষ্যের মুখে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এবং সেই সব ভাব যদি সতত উৎপন্ন হয় তাহা হইলে তাহা মুখে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়া যায় অর্থাৎ চির দিনের জন্য চেহারায় সেই ভাবের ছাপ পড়িয়া যায়। এই বিষয় যে কেবল বলবৎ ভাবের পক্ষে সত্য তাহা নহে বরঞ্চ সামান্য পরিমাণে সকল ভাবের পক্ষেই সত্য। সাধারণতঃ বলবৎ ভাবের পক্ষেই এই প্রতিবিম্ব সমূহ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু বহুদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তিরা মানুষের মুখের চিহ্ন দেখিয়াই তাহার স্বভাব ও হৃদয়নিহিত গুপ্তভাব বুঝিতে পারেন অর্থাৎ চেহারায় যে সকল প্রতিবিম্ব অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহার স্বভাব ও চরিত্র দোষ ও গুণ সকলই বুঝিতে পারেন। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইতেছে। এক্ষণে আমরা ধ্যান ও সুমিরণের বিষয় বলিব।

মুখাকৃতি দেখিলেই মনে তদনুরূপ ভাব জাগরিত হয়

যেমন শব্দদ্বারা প্রকাশিত ভাব অন্যের মনে তদনুরূপ ভাব জাগরিত করে তেমনই মুখাকৃতি বা মুখের ভাব দেখিয়া অন্যের মনেও সেইরূপ ভাব জাগরিত হয়, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহাকে দেখিলেই উৎফুল্ল হয়। ভাঁড়ের চেহারা দেখিলেই মানুষের হাসি পায়; শুধু তাহাই কেন, এই সমস্ত ভাবের বিষয় চিন্তা বা স্মরণ করিলেও মনে সেইরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এক্ষণে যদি চৈতন্য ভাব জাগরিত করিবার জন্য নিয়মিতরূপে চৈতন্যরূপের চিন্তা করা যায় তাহা হইলে সেই চিন্তাকে পারিভাষিক শব্দে চৈতন্য ধ্যান কহে। ইহা বলা বাহুল্য যে, নির্ম্মল চৈতন্যরূপ দর্শন ও চিন্তন ব্যতীত এইরূপ চৈতন্য ধ্যান হইতে পারে না। কিন্তু নির্ম্মল চৈতন্যরূপ কোথায় পাইবে? আমরা এক্ষণে এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। সিদ্ধপুরুষ ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর যোগীদিগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণের বর্ণনা দ্বারা আমরা এই অনুসন্ধান কার্য্যে অনেকটা সাহায্য প্রাপ্ত হইব। তঁহাদের বিষয় এই জন্য আমরা অগ্রে বর্ণনা করিব। (ক্রমশঃ)

কবীরের দোঁহা

কবীর গর্ব ন কীজিয়ে, অস জোবন কী আস।
টেসু ফুলা দিবস দস, খংখর গয়া পলাশ ॥২৮॥

কবীর গর্ব্ব ক'রো নাক', এতটুকু আশ যৌবন পরে।
দিন দশেকের তরে ফুটে পলাশ যেমন শুকিয়ে ঝরে ॥২৮॥

কবীর গর্ব ন কীজিয়ে, উচা দেখি অশ্বাস।
কালহ্ পরোভুইঁ লেটনা, উপর জমণী ঘাস ॥২৯॥

কবীর, গর্ব্ব ক'রো নাক, উঁচু উঁচু বাড়ী দেখে।
কাল্‌কে ভুঁয়ে পড়বে শুয়ে, গজাবে ঘাস উপর থেকে ॥২৯॥

কবীর গর্ব ন কীজিয়ে, চাম লপেটে হাড়।
হয় বর উপর ছত্রতর, তৌভী দেবৈঁ গাড় ॥৩০॥

কবীর, গর্ব্ব করো নাক,' চামড়া ঢাকা হাড়ের পরে।
থাকলেও ছাতা ঘোড়ার উপর, তবুও রে পুত্‌বে তারে ॥৩০॥

পক্কী খেতি দেখি করি, গর্বৈ কহা কিসানু।
অজহুঁ ঝোলা বহুত হৈ, ঘর আবৈ তব জানু ॥৩১॥

ক্ষেতে পাকা ফসল দেখে, কৃষক বসে গর্ব্ব করি।
"আরও অনেক থ'লে হ'বে," ঘরে আসে বুঝতে পারি ॥৩১॥

জেহি ঘর প্রেম ন প্রীতিরস, পুনি রসনা নহিঁ নাম।
তে নর পসু সংসার মেঁ উপজি খেপ বেকাম ॥৩২॥

অন্তরে যার প্রেম প্রীতি নেই, আর নেই নাম রসনায়।
পশু সে নর এ সংসারে, জন্মে বৃথা মরে যায় ॥৩২॥

ঐসা য়হ সংসার হৈ, জৈসা সেমর ফুল।
দিন দস কে জৌহার মেঁ, ঝুঁঠে রংগ ন ভুল ॥ ৩৩ ॥

তুলোর ফুলের রংটী যেমন, তেমনি যেমন এ সংসার।
দিন দশেকের ব্যবহারে' ভুলে, না রং ঝুটো তার ॥৩৩॥

কবীর ধূল সংকেলি কৈ, পুড়ী জো বঁধী য়হ।
দিবস চার কা পেখনা, অংত খেহফী খেহ ॥৩৪॥

কবীর, ধূল জড় ক'রে, হ'লে দেহ পুঁটলী বাঁধা।
দেখার শুধু দু'চার দিনের অন্তিমে সেই ধুলোর গাদা ॥৩৪॥

—শিবপ্রসাদ।

সমাগতা।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা সহরে দুইটা জিনিষ খুব প্রসিদ্ধ,—চিড়িয়াখানা আর যাদুঘর। পাড়াগাঁয়ের লোক কলিকাতায় পা দিয়াই ঐ দুইটিই দেখে—ঐ দুইটি দেখিলেই যেন অতবড় বিরাট সহরটা সবই দেখা হইয়া গেল—এমনি তা'দের বুদ্ধি! কলিকাতা যাইবার কালে আমার হ'পে খুড়াও আমাকে সেই কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। খুড়ার নাম 'হরিপ্রসাদ'; তিনি কোন্ কালে দিন কতক কলিকাতায় থাকার ফলে তাঁহার নামটিও, এইবার 'হ' আর পেসাদের 'পে' যোগ হইয়া—অমনি গুটাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছিল। তিনি বলিয়া ছিলেন,—ঐ দুটি দেখিয়াই চলিয়া আসিও, থাকিও না!' আর হাতে রাখী বন্ধনের মত মন্ত্রপূত করিয়া একটি তাগা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে আমি,—'ইহার প্রয়োজন কি?' জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন,—'মস্ত বড় গাঁ বাবা, সে কল্‌কাতা, ভিড়ে ঢুকে পড়্‌লেই পথ ভুলে যাবে; হয়তো কোনও পালধাড়ীর পেছু পেছু কোন্ বেপাপ্পা গোগালে ঢুকে পড়্‌বে!' আমি বলিয়াছিলাম,—'আমার হাতে রাখী বাঁধ্‌লে কল্‌কাতার পথ সোজা হবার সম্ভাবনা কি?' তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—'বাপুহে, আপনাকে আপনি চিন্‌তে পার্‌লে সোজা পথও চিন্‌তে পারবে; ভিড়ের মাঝে পাছে হারিয়ে যাও তাই রাখী বাঁধলুম্!' আমার খুড়ার বুদ্ধিটাও স্থূল আর, মাথাটাও বেশ ঠিক ছিল না। পাগলের কথা! আমিতো তার এক বর্ণও বুঝি নাই—আপনারা পারিবেন ত দেখুন্?

এহেন কলিকাতা সহরে নটবর ভাদুড়ি মহাশয় হটাৎ কবি হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাব্য হইতেছে রস; ইক্ষুদণ্ডে যেমন রস আছে, মানুষেও তেম্‌নি রস আছে। কাব্যই মানুষের রস, ইহা নাকি অমৃত তুল্য! যথা প্রমাণম্,—'কাব্যামৃতরসাস্বাদ স্বজনৈঃ সহ সঙ্গমঃ!' মানুষের এই কাব্যরস ক্ষীরমোহনের মত সর্বাঙ্গে লাগিয়া থাকে না, ইহাও ইক্ষুদণ্ডের মত পীড়নপেষণে বাহির হয়। কলের পেষণ দণ্ডের কর্ কর্ এর সঙ্গে সঙ্গে ইক্ষুরস যেমন গড়্ গড়্ করিয়া গড়াইয়া পড়ে কালের পেষণ দণ্ডের চাপে মানুষের কাব্যামৃতও তেমনি হড়্ হড়্ করিয়া বাহির হইয়া আইসে—অন্ততঃ নটবরের তাহাই ঘটিয়াছিল। অনেক পীড়ন পেষণের পর নটবরের এই বাক্যামৃত রস বাহির হইয়া পড়িয়াছিল - সেই কথাই বলিব। নটবর বাবু সম্পন্ন লোকের সন্তান। বাপের বেশ দু-পয়সা ছিল। নটবর বাবু ইস্কুল কলেজে দুই একটা কি পাস্ টাস্‌ও করিয়াছিলেন। তাঁহার একটি ভগ্নী ছিলেন, তিনি নাকি লেখা পড়ায় ভাইকেও উঁচাইয়া গিয়াছিলেন। ভগ্নীর একটি স্বামী ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি পত্নীর বেশ পছন্দসই হয়েন নাই। আলোকপ্রাপ্তা ভগ্নী কি আদর্শের পশ্চাতে ধাইতে ছিলেন কিম্বা কি নমুনা তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছিল তাহা তিনিই জানিতেন। যখন সহসা ঐ অপছন্দ স্বামীটির ললাটে কদলীস্পৃষ্ট করিয়া ভগ্নী, গন্ধর্ব্ব বিধানে একটি নূতন স্বামী আহরণ মতে পলায়নপরা হইলেন, তখন ঐ পৈত্রিক অর্থাৎ প্রাজাপত্য স্বামীটি আসিয়া নটবরের নিকটে নাসাক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। এ-ই হইল নটবরের—পেষণ নম্বর এক।

তৎপরে যখন অসূয়াপরবশ, বিচারবুদ্ধিহীন, জুলুমবাজ জাতীয় সমাজ ভগ্নীর অপরাধে ভাইকে কঠিন প্রায়শ্চিত্তের জন্ত চাপিয়া ধরিল, তখন নটবর বলিলেন,—'বাঃ রে বিচার! ঘোল খেলে কেষ্টদাস আর কড়ি দেবে নিধিরাম? আমি প্রায়শ্চিত্ত করিব না!' তখন সমাজকর্ত্তারা বলিলেন,—'বা, হা, বা! বাপের এস্‌সেট্ নেবে আর লায়েবিলিটি নেবে না? এ কোন্ কথা! তোমার বাবাকে বারণ করা গিয়েছিল,—'বাপু, ধেড়ে মেয়েকে বুড়ো বয়সে পর্য্যন্ত বই বগলে করে পথে ছেড়ে দিও না, তখন সে কথায় কান না দেওয়ার এই-ই ফল। তোমার বাপের ক্রুটী, তুমি প্রায়শ্চিত্ত করবে না! আলবাৎ করবে!" নটবর বলিলেন,—"আমি কর্‌বোই না!' কিন্তু গ্রাম শুদ্ধ লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গ্রামে বাস করা হয় না, তিনি কলিকাতায় পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। এই হইল নটবরের—পেষণ নম্বর দুই।

সমাজের উপর চটিয়াই হউক আর খেয়ালের বশেই হউক কিম্বা উপার্জ্জনের উপায় উদ্ভাবনের জন্যই হউক নটবর বাবু বিলাত গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া ভোজ খাইলে নাকি ব্যারিষ্টার হওয়া যায়। সেখানের ভোজ কি প্রকার তা' জানা নাই। ভোজ শুনিলেই আমাদের সেই বাঁশের ঠেকো দেওয়া সামিয়ানা, সেই গোময় লেপিত উঠান, সেই উঠানের পার্শ্বে শুক্‌না মাটীতে কাৎলা মাছের পুচ্ছ তাড়না, আর সেই দুগ্ধ ফেন-শুভ্র মাল্যাকার উপবীত ধারী ঠাকুরের ছাঁক্‌না-তাড়িত ঘৃতসৌগন্ধ—এক্ষণে দুর্গন্ধ—মনে পড়ে। তা' সাহেবদের পিতৃশ্রাদ্ধে কিম্বা মেম ঠাকুরাণীদের সাবিত্রীব্রতে অনেকগুলি ভোজ খাইয়া পিতৃসঞ্চিত বিত্ত অনেকগুলি ডোভারের জলে ডুবাইয়া নটবর বাবু মিঃ এন্ ভাদুড়ী বার-এট-ল হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেশের দুর্বিনীত মক্কেলগুলা তাঁহাকে ভোজ দেওয়া দূরে যাউক, দৈনিক দাল ভাতের উপরও বিশেষ মনোযোগী হইল না। তখন মিঃ ভাদুরীর হইল,—পেষণ নম্বর তিন।

তার পর দিন কতক পরে অসময়ে,—প্রৌঢ় দশায়—যখন অর্দ্ধাঙ্গিনী (বলিব—কি সহযোগিনী বলিব? তা' সহযোগিনীই বেশ!) লোকান্তর গতা হইলেন, তখন মিঃ ভাদুড়ী চতুর্থা পীড়িত হইয়া গড়্ গড়্ শব্দে রস উদ্গীরণ করিলেন।

পত্নীর পরলোক গমনের পর তিনি বাল্মীকির—'মা নিষাদ'র মত লিখিয়া ফেলিলেন,—

'প্রিয়, তুমি যাও নাই মোরে',
　　আছ অন্তরে—ভাঙ্গা ঘরে!
　　স্নিগ্ধ চোকে চেয়ে ধীরে ধীরে!
　　　　আমার দীর্ঘ শ্বাস
　　　　　তোমার বিশ্বাস
　　　　　ডাকিয়া আনিছে—ফিরে, ফিরে, ফিরে!
সখি হে! তুমি যাও নাই মোরে!
　হৃদয়ের অনু, পরমানু
　　সদাই তোমায় আছে ঘিরে
　তাই তারা বিশ্ব ছেড়ে চলে গেছে দূরে—অতি দূরে!
আছ অন্তরে—ভাঙ্গা ঘরে, যাও নাই দূরে—মোরে!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

একটা বৎসরের যেমন অনেক ভাগ, ছয়টা ঋতু—একটা জীবনেরও তেমনি অনেক ভাগ, নয়টা দশা। বৎসরের যেমন বসন্ত ঋতু, মানুষের জীবনেরও তেমনি বসন্ত ঋতু আছে, তাহার নাম পড়্‌তা। দারুণ শীতে শত চেষ্টা কর, চাই কি, রোজ গোড়ায় সাত ঘড়া জল ঢাল, গাছের পাতা তবু ঝরিতেই থাকিবে; কিন্তু তুমি চোখের কোণে চাহ আর না-ই চাহ, দখ্‌নেও বহিবে কলিও মুখ তুলিয়া চাহিবে।

যদিও বছর আখেরীতে—জীবনের প্রায় শেষ ভাগে মিষ্টার ভাদুড়ীর পড়্‌তা পড়িল তথাপি, সেই দক্ষিণা বহিল—'হু হু' অমনি কোকিল কবি ডাকিল,—'কুউহুঃ!' আর বিরহীর দল বলিয়া উঠিল, 'উহু!'—কাব্যের কি ভাব, কি শৈশব সরল ভাষা! যেমন সালানপুরের অমৃতী—দৃশ্যতঃ নীরস, পাকের জড়ান্ বুঝে কার বাপের সাধ্য কিন্তু কামড়াইবার অপেক্ষা—অম্‌নি কষ বেয়ে রস! আর যায় কোথা? একটা পাল ধাড়ী যদি ঝাঁপ দিল তো, গন্ধর্ব্ব সেনের স্বর্গলাভের অভিনয় হইয়া গেল।

গন্ধর্ব্ব সেন একটা ধোপার গাধা। এক ধোপার এক গাধা ছিল, ধোপা তাহার নাম রাখিয়াছিল—গন্ধর্ব্ব সেন। হটাৎ গন্ধর্ব্ব সেন মরিল, ধোপা দুঃখে শিরোমুণ্ডন করিয়া, কায কর্ম্ম ছাড়িয়া কাঁদিতে বসিল। প্রতিবেশী গাধার নামের খবর রাখিত না শুধাইল—'ভাই রজক! কাঁদ কেন? ধোপা কহিল,'—ভাই হে, সংবাদ রাখ না? কা'ল রাত্রে গন্ধর্ব্ব সেনের স্বর্গলাভ হইয়াছে যে!' প্রতিবেশী মনে করিলেন,—গন্ধর্ব্ব সেন বুঝি গান্ধীমহারাজ টহারাজ গোছ দেশের একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিই বা হইবেন; কিন্তু 'তিনি কে?' একথা জিজ্ঞাসা করিলেই আপনার অনভিজ্ঞতা ধরা পড়িবে, এই ভয়ে সে প্রশ্ন না করিয়াই বলিলেন,—'বটে?' বলিয়া নিজেও মস্তক মুণ্ডন করিয়া কাঁদিতে বসিলেন। এই রকমে ক্রমানুসারে দেশের রাজা পর্য্যন্ত যখন ন্যাড়া মাথায় রাজ্ঞীকে সম্ভাষণে গেলেন তখন রাণী প্রশ্ন করিলেন,—'কে তিনি মহাভাগ্য, যাঁহার জন্য দেশের রাজাও মাথা মুড়ান? তখন রাজার চৈতন্য হইল,—'তা' ই তো!' অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল,—সেটা একটা ধোপার গাধা!

সেইরূপ, কবি যেই গাহিলেন,—

'আমার স্নেহের ভেতর দিয়ে
পশেছিলে তুমি মর্ম্মে,
তোমার বর্ণ উঠতো ফুটে আমার প্রত্যেক কর্ম্মে;
চূর্ণ করি গর্ব্ব শিকল খুলিয়া দিয়াছি ধাঁধা,—
ঐ খেলা টি হে তোমার হাতে নিতুই ছিল যে বাঁধা—'

অমনি গন্ধর্ব্ব সেনের পূজারীর দল ফুকারিয়া উঠিল,—কেরামৎ! কেরামৎ! একেই বলে অরিজনালিটি! এই স্নেহের ভিতর সুড়ঙ্গের সন্ধান! এ সেকালে জানা থাক্‌লে, রায়-গুণাকর ভারতচন্দ্রকে দামোদরের ধারে এক পাহাড় মাটি কেটে জড় কর্‌তে হ'তো না, আর ঐ খোলা যে বাঁধা যায় এতথ্য আগে জানা থাকলে, মা যশোদাকেও বৃন্দাবনের তাবৎ দড়ি জড় কর্‌তে

হ'তো না,—বাছার হাতে শুধু খোলা বেঁধে দিলেই হ'তো !' অমনি আকাশ ছাইয়া শব্দ উঠিল,—'ঠিক্ কথা !'

এই গতানুগতিকতা চিরদিন আছে ও থাকিবে। আলগ্ লতার মত শূন্যেই ইহার স্থিতি ও বৃদ্ধি, তথাপি ইহারই প্রসাদে অনেক শুষ্ক তরু অপূর্ব্ব শ্রী ধরে ; কাহারো সৌভাগ্যসৌধ ইহারই উপর গড়িয়া উঠে ; কিন্তু মিষ্টার ভাদুড়ীর তাহা হইল না। বসন্ত কালে প্রাচীন পর্কটীরও যেমন এক কালে সহস্রমুখে পত্রোদ্গম হয়, পড়্‌তা পড়িলে, মিষ্টার ভাদুড়ীর বুদ্ধিও সেইরূপ শতমুখে বিকাশ প্রাপ্ত হইল—বিশেষতঃ তাঁ'র সওদাগরী বুদ্ধি—সওদাগরীতে প্রতিপন্ন হইবার যে বিদ্যা ক'টি যথা—খরিদ্দারের খাঁই বুঝিয়া মাল আমদানী, অজানা বিদেশী মাল দেশে আমদানী এবং দেশের পুরাণোমাল মাজিয়া ঘসিয়া বিদেশে রপ্তানী আর, হাওয়া বুঝিয়া পালের জোরে নৌকা চালন ! ইহাতে ভাদুড়ী সাহেবের বর্ণবিভব ফুটিল বটে কিন্তু ভাগ্যসৌধ গড়িয়া উঠিল না কাযেই, পরিশেষে তাঁহাকে অধমতারণ ইন্‌সল্‌ভেন্সি আদালতের শরণাপন্ন হইতে হইল।

তা', মিষ্টার ভাদুড়ীর মহাভারত কল্প ইতিহাস বর্ণনার স্থানাভাব ; কেবলমাত্র আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অর্থাৎ সমাগতার ইতিবৃত্তের সহিত ইহার যেটুকু সম্বন্ধ তাহাই বলিব।

মিষ্টার ভাদুড়ী স্বজাতি-সমাজে অবজ্ঞাত ও তৎকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইলে কিছুদিন খৃষ্টধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু সু-বর্ণ বিভব মাকালের কালোবীচি গলায় বাধিতেই যিশুর ক্রস্ নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিয়া ও ব্রাহ্মসমাজে নাম লেখাইয়া নবীন উদ্যমে সমাজসংস্কারে অর্থাৎ পৌত্তলিকতা উচ্ছেদ সাধন স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন, জাতিভেদের মূলোচ্ছেদ বিশেষতঃ বিধবাবিবাহের প্রচলন আদি দেশহিতকর কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যায় ব্রাহ্ম্য সমাজে গিয়া চক্ষু মুদিয়া ব্রহ্মানুভূতি সুরু করিয়া দিলেন কিন্তু ব্রহ্মানন্দে ক্ষুন্নিবৃত্তির সম্ভাবনা না দেখিয়া সে সকল ছাড়িয়া ছুড়িয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন ।

সমাগতা বাল্যকালে যে স্কুলে পড়িয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, মিষ্টার ভাদুড়ী আপন খৃষ্টানী আমলে কিছুদিন সেটির অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

চারি বৎসর নয় মাস পরে কারাগারের নিয়মানুসারে পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলে সমাগতা কারামুক্তা হইল। তাহার প্রার্থনানুসারে তাহাকে আলিপুর জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইল। মুক্তির কালে সে আপনার সকল জিনিস পত্র মায় সেই বিজ্ঞাপন সম্বলিত সংবাদপত্রটিও ফেরৎ পাইল।

আলিপুর। এই আলিপুরের পটেই সমার জীবনের সেই অত্যুজ্জ্বল চিত্রাংশটি অঙ্কিত ছিল। সমা সে কথা ভুলে নাই—ভুলিবার নয়? সমা সেই বিজ্ঞাপনে লিখিত ঠিকানাটিতে যাইবার সঙ্কল্পেই যাত্রা করিয়াছিল ; আশা করিতেছিল,—যদি এখনো পদটি খালি থাকে, কিম্বা অন্য কিছু উপায় হয়। সমার পা দুটি কি তাহার যেন কতকটা অনভিমতেই,—'যাইব কি ? কি করিতে যাইব ? যখন আবার একবার এদিকে আসিয়াই পড়িলাম তো শৈশব, বাল্যের সেই মোহময় মধুর স্মৃতিমণ্ডিত আলেখ্যটি একবার দেখিব না ? কি হইবে দেখিয়া ?' ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই তাহাকে তাহার সেই স্কুলবাটীর সম্মুখে লইয়া উপস্থিত করিল। বালিকারা স

স্কুলে আসিতেছে,—একে একে, দুইএ দুইএ, তিন চারিজনে দল বাঁধিয়া ; হাসিতে হাসিতে, খেলিতে খেলিতে, গল্প করিতে করিতে, কেহ পদব্রজে, কেহ বা যান বাহনে চাপিয়া, উৎফুল্ল ভাবে, স্থান এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানকে সাময়িক উৎফুল্ল করিয়া। এমনি করিয়া সমাও একদিন আসিত—এমনি হাসিয়া নাচিয়া, উৎফুল্ল ভাবে চতুর্দ্দিক উৎফুল্ল করিতে করিতে আসিত? সমার সে বাল্য কৈশোরের উৎফুল্লতা তার পিতার চিতায় পুড়িয়া খাক্ হইয়াছিল,—আজ সে অদৃষ্টলাঞ্ছিতা, ভিখারিণী? দুঃখের কালে বিগত সুখের স্মৃতি সুখ দেয়, যে বলে সে ভুল বলে? সেই শত স্মৃতি চিহ্নমণ্ডিত বিদ্যালয়ের প্রতি খণ্ড, প্রতি অংশ, সেই বালিকা, কিশোরী, প্রাপ্ত অর্দ্ধপ্রাপ্ত যৌবনা ছাত্রীদের আনন্দ ঝঙ্কার সমার হৃদয়ে শূলবিদ্ধ করিল,—আনন্দতো হইল না! সমা তৎপর সে স্থান ত্যাগ করিয়া অনেক অনুসন্ধানের পর বিজ্ঞাপনে লিখিত ঠিকানায় হাজির হইয়া দেখিল, সে বাড়ীতে থিয়েটার থাকার কোনো চিহ্ন নাই, তৎপরিপর্ত্তে সম্মুখভাগের প্রকাণ্ড ফটকটির মাথার উপর বৃহদাকার সাইন বোর্ডে বৃহৎ অক্ষরে লেখা আছে, 'অনাথ এবং অবলা আশ্রম।'

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সমা ভাগ্য মানিত না ; মানিলে, সনাতনের সেই ভগ্ন কুটীরকেই সে তাহার ভাগ্যনির্দ্দিষ্ট চিরবাসস্থান বলিয়া বরণ করিয়া লইত। তাহা সে করে নাই। ভাগ্য বা অদৃষ্ট চর্ম্মচক্ষুর বিষয় নয়,—মনশ্চক্ষুরও নয়। ইহার বর্ত্তমানতা উপলব্ধি ভুয়োদর্শনের ফল মাত্র—ফল দেখিয়া হেতু নির্ণয় উপপত্তি (deduction), কিন্তু এই উপপত্তিও অভ্রান্ত—নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বলা যায় না। এই প্রহেলিকা চিরকাল সন্দেহজড়িত, অনিশ্চিত হইয়া আছে এবং থাকিবে। অদৃষ্ট বলিতে অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়ত্বই বুঝায়। যদি শাস্ত্রানুযায়ী—পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলস্বরূপ এই অদৃষ্ট অখণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান জীবনের চেষ্টা অর্থাৎ পুরুষকারের কোনো মূল্যই থাকে না এবং পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল যদি বর্ত্তমান জীবনের সর্ব্বকর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহা হইলে পরম্পরা ক্রমে সর্ব্ব প্রথম জন্মকালে কৃত কর্ম্মই বস্তুতঃ পক্ষে পরবর্ত্তী সকল জীবনেরই নিয়ন্তা হয়। সর্ব্ব প্রথম জন্মের কর্ম্মে জীবের স্বাধীনতা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু পরবর্ত্তী এই ভূরি ভূরি জন্মান্তরের সার্থকতা কিছুই থাকে না, ইত্যাদি। এদিকে যদি পুরুষকার বা চেষ্টার কিছুমাত্র মূল্য থাকা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়ত্ব খর্ব্ব হইয়া যায় এবং ফলে অদৃষ্টেরও কোনো মূল্য থাকে না। কিন্তু যখন সর্ব্ব প্রকারে একরূপ ক্ষেত্রে একই প্রকার চেষ্টার ফল সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন রূপ হইতে দেখা যায় এবং মনুষ্য চেষ্টা পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইতে এবং কখনো বা চেষ্টা এমন কি কল্পনা ব্যতীত ও কল্পনার অতীত পদার্থ পর্য্যন্ত হস্তগত হইতে দেখা যায় তখন পুরুষকারের শক্তিতেও অশ্রদ্ধা আসিয়া যায়। যাউক, কিন্তু অদৃষ্টের যদি থাকাই হয় তো অদৃষ্টের অদৃষ্ট বড়ই মন্দ বলিতে হইবে। কারণ, সাধারণ নিয়মে লোক হিতকারীরই গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে, তা'র অস্তিত্বের অপহ্নব কেহ করে না। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি দুরদৃষ্ট যে, তা'র অদৃষ্টে এই সাধারণ নিয়মটি সম্পূর্ণ বিপরীত—যা'র প্রতি অদৃষ্ট প্রসন্ন সে অদৃষ্টকে গ্রাহ্যই করে না, তা'র অস্তিত্বও স্বীকার করে না ; কিন্তু অদৃষ্ট যাহার উপর বিরূপ, সে ক্রমাগতই অদৃষ্টকে স্মরণ করে এবং তা'র সন্তুষ্টি কামনায় পূজা করে।

সেই নিয়মের বশেই সমা কারাবাসের অবস্থায় প্রথম অদৃষ্টের অস্তিত্ব মানিয়া লইল। এই কারাবাস তো সমার পুরুষকারের ফল নয়? ফল লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মের নামই তো পুরুষকার?

জেলখানা তো কোনোদিনই সমার কাম্য ছিল না? সমা ভা'বল;—একই কর্ম্মবৃক্ষে নানাফল সম্ভাবিত হয় কিন্তু ভিন্ন জনে ভিন্ন ফল পায় কেন? পূর্ব্বাপর সমস্ত ঘটনাই সমা আলোচনা করিয়া দেখিল। দেখিল,—জীবনে তা'র সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে; অপিচ কর্ম্মের পারিশ্রমিক স্বরূপ একান্ত অবাঞ্ছিত ফল সকল, যেন কোন্ অজ্ঞেয় শক্তির দ্বারা, তাহার উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমা অদৃষ্ট মানিল। সমা মানিয়া লইল যে, এই নারী জন্মটা যদি বস্তুতঃই অভিশপ্ত হয় তো ইহাও অদৃষ্টের ফল—অলঙ্ঘ্য! এই প্রথম সমার আত্মাভিমান এবং আত্মস্বাতন্ত্র্য স্পৃহা আহত হইল এবং ক্রমশঃ চূর্ণ হইয়া গেল।

এই হেতুই আজি এই নির্দ্দেশ-পীঠিকা (সাইন্ বোর্ড) পৃষ্ঠে বড় বড় হরফে অবলা শব্দ লিখিত দেখিয়া ও সমা বৈয়াকরণিক কিম্বা অভিধানকারককে রক্ত চক্ষু না দেখাইয়া ঐ শব্দের 'নারী' এই অর্থ বুঝিয়া লইয়াই একটু আশ্বস্তা হইল কারণ, আগত প্রায় রাত্রিতে সে যে আপনার সম্ভ্রম নিরাপদে রাখিতে কোন্ স্থানে মাথা গুঁজিয়া দাঁড়াইবে তাহা সে এখনো স্থির করিতে পারে নাই; সে যে প্রকৃতই অবলা! কিন্তু তথাপি, সহসা বাড়ীটির ভিতর প্রবেশ পক্ষে ইতস্ততঃ করিয়া সমা সেই অবলা আশ্রয়ের ফটকটির পার্শ্বে বারেক দাঁড়াইলে, পথের অপরদিকের একটি বড় বাড়ীর ফটকের শিরোদেশে এবং ফটকের উভয় পার্শ্বসংলগ্ন নাতি উচ্চ প্রাচীর স্তম্ভগুলির মাথায় সজ্জিত মর্ম্মর পুত্তলিগুলির উপর তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; তখন ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্ষোভে, বিরক্তিতে তাহার অন্তঃকরণ তিক্ততায় বিষাইয়া উঠিল। তোরণশিরে মূর্ত্তিটি পুরুষমূর্ত্তি—একটি যোদ্ধবীরের প্রতিকৃতি—দীর্ঘাকার পুরুষ, ঋজু দণ্ডায়মান, উন্নমিত ঋজু গুম্ফদ্বয় শিরস্ত্রাণের ঊর্দ্ধদেশে উড্ডীন বকপক্ষ স্পর্শ করিবার প্রয়াসে ঊর্দ্ধমুখী, বাহুদ্বয় বর্ম্ম চ্ছাদিত, পৃষ্ঠে লম্বিত ঢাল, উন্নত বক্ষে মণিমালা, কটিবন্ধে কোষবদ্ধ অসি, হস্তে দীর্ঘ বর্শা, চক্ষু উদ্দীপ্ত, মুখ গর্ব্বময়। আর প্রাচীর শিরসংলগ্ন গুলি সকলই নারীমূর্ত্তি—উলঙ্গ—সর্ব্বাঙ্গ উন্মুক্ত; স্বামীরও অদ্রষ্টব্য যে নারীঅঙ্গ তাহাও অনাবৃত! কেহ ব্রীড়া সঙ্কুচিতা, কুচভারাবনতা; কেহ উত্তুঙ্গ কুচকুম্ভে অপাঙ্গ বিক্ষেপকারিণী; কেহ পীনোন্নত পয়োধরা, চঞ্চলনেত্রা, নৃত্যরতা; কেহবা আবেশার্দ্ধমুদিতনয়না; এমনি সব রমণীমূর্ত্তি—অধরপ্রান্ত মৃদুহাস্যমণ্ডিত বাসনাবুভুক্ষিত, মুখভাব বিলাসবিহ্বল; দেহভঙ্গিমা কুৎসিৎভাবোদ্দীপক! সমার মন গর্জ্জিয়া উঠিল,—'হায় রে, অকৃতজ্ঞতা! যে একদিন দেহমলের তুল্য দেহমধ্যে আবদ্ধ কৃমির কৃমিত্ব ঘুচাইয়া জীবনপাত করিয়া তাহাতে মনুষ্যত্ব আরোপ করিল, শিয়রে ঐ বীরের টোপর পরাইল, সেই আনুবীক্ষণিক কৃমিকীট আজি মনুষ্যপদবী পাইয়াই সেই মাতৃমূর্ত্তির লজ্জাজনক কুৎসিৎ অপমূর্ত্তি গড়িয়া উন্মুক্ত রাজপথের উপর কুক্কুরবৃত্তির কীর্ত্তিধ্বজার মত বসাইয়া দিল—কৌতুকে? পূজামণ্ডপে, রত্নবেদিকায় বসাইয়া একান্ত নিবিষ্ট ধ্যানে ষোড়শোপচারে পূজা করিল না—সেই জগদ্ধাত্রীর? এই অপজীব—পুরুষ তার মাতৃজাতিকে কি-ই শিক্ষা দিবে? আবেগে অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে সমা একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

কিয়ৎক্ষণে সাহস সঞ্চয় করিয়া সমা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল; দেখিল ফটকের পার্শ্বেই একটি কক্ষ, তাহার প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে এক সাইনবোর্ডে লেখা আছে,—'Manager's

Office" এবং সেই কক্ষের অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষের দ্বারদেশেও ঐরূপ এক কাষ্ঠফলকে লেখা আছে,—'Director's private chamber'.

সমা 'ম্যানেজারের আফিস' চিহ্নিত কক্ষটিতে প্রবেশ করিল। কক্ষটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। সাধারণতঃ আফিসঘরের সাজসরঞ্জাম যে কিছু—টেবিল, চেয়ার, আলমারী, চিঠির ফাইল, ওয়েষ্ট্‌পেপার বাস্কেট্‌ ইত্যাদি সকলই সে ঘরে আছে। একটি বড় ঘড়ি এবং তাহার নীচে সহরের একটি ম্যাপও ঝুলানো আছে। ঘরের মধ্যে বৈদ্যুতিক পাখা চলিতেছে, পাখার নীচে টেবিলের মধ্যভাগে ছাঁটকাট্‌ দুরস্ত একটি সুপরিচ্ছদ ভদ্রলোক একটি চেয়ারে বসিয়া তৎকালে সম্মুখভাগের চেয়ারে উপবিষ্ট দুই ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। তাঁহার বসিবার স্থান এবং ভাব-ভঙ্গীই সমাকে ইঙ্গিৎ করিল যে ইনিই ম্যানেজার বাবু!

ম্যানেজারবাবু বাঙ্গালী, বয়স চল্লিশ পার হইয়া থাকিবে; মালঞ্চের বেড়া ডিঙ্গাইলেও, তরল মধুমল্লী ঘ্রাণ এখনো অবসরক্রমে নাসায় অনুভূত হইতেছে, অস্পষ্ট পাপিয়াঝঙ্কার এখনো অবসরক্রমে কানে বাজিতেছে। সম্মুখের ব্যক্তিদ্বয়ও বাবুলোক—নব্য বাঙ্গালীবাবুবেশী। বয়ঃক্রম একজনের প্রায় ত্রিশ, অন্যের পঁচিশেরও নীচে। সাহেবী ছদ্মবেশ—হ্যাট্‌, কোট্‌, কলার নেকটাইএর ফাঁকে বাঙ্গালীত্ব যেমন উঁকি মারে, ওই বাঙ্গালীবেশী বাবু দুটির টেরি, চস্‌মা, রিষ্টওয়াচের ফাঁকে ফাঁকেও তেমনি ভাবে মাড়োয়ার দেশের পার্ব্বত্য কঠোবতা উঁকি পাড়িতেছিল। গৃহমধ্যস্থ বাবু তিনটির বর্ণনায় কিঞ্চিৎ মসী ব্যয় করিলাম তাহার কারণ, তাহা না হইলে, সমাগতা কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহারা তাঁহাদের আলোচনা বন্ধ করিয়া পরস্পরে যে ভাবে দৃষ্টি বিনিময় করিলেন এবং সমার প্রতি যেভাবে চাহিলেন সে ভাবটি আমি বুঝাইতে পারিতাম না।

কোনো কিছুই সমার দৃষ্টি এড়াইল না, তথাপি সে অবিকৃতমুখে ম্যানেজার বাবুর উদ্দেশে একটি নমস্কার করিয়া কিয়দ্দূরে দাঁড়াইল। ম্যানেজারবাবু—'কি চান?' বলিতেই সমা একটি অচঞ্চল দৃষ্টি তাঁর মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল,—আপনাদের ফটকের উপর সাইন বোর্ডে 'অবলা আশ্রয়' লেখা রয়েচে দেখ্‌লুম—আমার এখানে কোনো আশ্রয় নাই; এই ঠিকানায় নবরঙ্গিনী থিয়েটার ছিল জানতুম্‌, তার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা কর্‌বার্‌ উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এসেছিলুম্‌,—তাঁ'রা কি আর কোথাও উঠে গেছেন?'

ম্যাঃ—'নবরঙ্গিনী এই ফার্ম্মেরই থিয়েটার ছিল, তার ম্যানেজার অন্য এক ভদ্রলোক ছিলেন। সে থিয়েটার প্রায় চার বৎসর হ'লো উঠে গেছে তাই, আমাদের এই অবলা আশ্রয়টি সাবেক বাড়ী থেকে তুলে এখানে আনা গেছে। তা' আপ্‌নি ইচ্ছে কর্‌লে এখানে এড্‌মিশান নিতে পারেন—যান্‌না, পাশের ঘরে ফারমের ম্যানেজিং ডিরেকটর ব'সে আছেন, তার সঙ্গে কথা ক'য়ে ঠিক ক'রে ফেলুন!' এই বলিয়া এক টুকরা কাগজে—'She wants to be admitted' লিখিয়া সমার হাতে দিয়া বলিলেন—'দেনগে, ডিরেকটরের হাতে এই কাগজটা!'

কাগজটুকরা হস্তে সমা বাহির হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষদ্বারে আসিল। দ্বারের কবাট উন্মুক্ত থাকিলেও দুয়ারে একটি সবুজবর্ণ রেশমী পর্দ্দা ঝুলিতেছিল, হটাৎ পর্দ্দা ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে সমা একটু সঙ্কোচবোধ করিতেছিল, তজ্জন্য সে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিবার এবং সুযোগ প্রাপ্তির আশয়ে ক্ষণেক সেই দুয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইল; সেই সময় ম্যানেজার বাবুর কক্ষে যে

কথাবার্ত্তা পুনরারম্ভ হইল তাহা অপেক্ষাকৃত অনুচ্চকণ্ঠে হইলেও স্থানের নৈকট্যনিবন্ধন সমার কর্ণে প্রবেশ করিল। সমা আভাসে বুঝিল—সেই মাড়োয়ারীদ্বয়ের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিতেছেন—'আচ্ছা যাউক; আমারদের কোথা, আপনর কোথা দুইই যাতে দেন্, এক্ হজার লেন, লীয়ে, হামারদের সওদাটা পাক্কা কোরে দেন—আপনার দর্‌সনী টাইসও আল্‌গে লিয়ে লেন!" ম্যানেজার বাবু ঈষৎ হাস্যমিশ্রিতস্বরে বলিলেন—'আরে ছ্যা, ছ্যা কি ব'ল্‌চেন্ বিস্‌রাম বাবু! সেই কোড়া মাল্‌টা হাজার টাকায় কি বেচা যায়? আর জিনিসখানা কি? আপ্‌নারা মাল দেখ্‌বেন না খালি দামই দেখ্‌বেন, তা' হ'লে কি করে চল্‌বে? হাজার টাকায় চান্? বলুন, আজকের আমদানী ঐ লাট্ খাওয়া মালটা দু, চার দিন পরেই দিতে পারি। ওটাও আপ্‌নি দেখলেন তো? খুব বস্তা-পচা বল্‌তে পারেন না—একটু বেমেরামতে বদ রং দেখাচ্চে। ঐই দেখ্‌বেন নগদ দুহাজারে বেচ্‌বো! যাক্, আপনারা পাকা খরিদ্দার যখন জেদই কচ্চেন, তখন না হয় আড়াই হাজারই দেবেন; বাস্, আর কথা কঁবেন না—সব কারবারেই একটা পড়্‌তা আছে তো? আগাগোড়া খতিয়ে দেখুন, বুঝ্‌বেন, ওর কমে দিতে গেলে আমাদের লোকসান প'ড়ে যায়!'

এমন সময় ডিরেকটারের কক্ষ হইতে এক প্রৌঢ়া রমণী পর্দ্দা ঠেলিয়া বাহিরে আসিলেন। রমণী 'ভদ্রমহিলা'বেশিনী, গৌরবর্ণা এবং স্থূলাঙ্গী। চরণের বার্ণিশকরা শ্লীপারটি হইতে নাকের রোল্‌গোল্ডের চস্‌মাটি পর্য্যন্ত পরিপাটী। এই পারিপাট্যকে উপেক্ষা করিয়াও বয়ঃক্রম তাঁহার দেহে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে ছাড়ে নাই। রমণী বাহিরে আসিয়া সমাকে তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—'কি চান?' সমা বাক্যব্যয় না করিয়া হাতের সেই কাগজটি রমণীকে দেখাইতেই তিনি পর্দ্দাটি ঠেলিয়া দিয়া সমাকে ভিতরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং সমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলে পুনরায় পর্দ্দাটি টানিয়া দ্রুতপদে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

দিগদর্শন

জনন-নিয়ন্ত্রণ

(Birth-control)

অধুনা একদল ব্যস্তবাগীশ মানব সমাজের তথাকথিত হিতাকাঙ্ক্ষী লোক সুর তুলিয়াছেন, জগতে যে ভাবে লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে লোকসংখ্যা না কমাইলে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে না। এইজন্য তাহাদের মতে জননিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক বিবেচনায় তাহারা তৎপক্ষে নানাবিধ পুথি-পুস্তক লিখিতেছেন এবং নানারূপ ঔষধ ও প্রক্রিয়ার আবিষ্কার করিতেছেন।

বর্ত্তমান প্রগতির যুগে ভারতবর্ষও যে এবম্বিধ জন্মনিরোধনীতি গ্রহণ করিবে না,—তাহা তো হইতেই পারে না। সকল দিকেই যখন প্রতীচ্য সভ্যতা, শিক্ষা দীক্ষা কৃষ্টি সংস্কৃতির অনুকরণ করা হইতেছে তখন এই দিকেই বা অনুকরণ চেষ্টা হইবে না কেন? তাই প্রকাশ্যভাবে জন্ম-

নিরোধক ঔষধের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে এবং শুনা যাইতেছে এই সকল ঔষধ বহু পরিমাণে তরুণ তরুণীদিগের মধ্যে ব্যবহৃতও হইতেছে।

আর্থিক দুরবস্থার দিনে জন্মশাসন যে প্রয়োজনীয়, ইহা তো সাধারণভাবে বেশ বুঝা যায়। কারণ যখন পতিপত্নীর মোটা ভাত কাপড় সংগ্রহই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিতেছে, তাহার উপর সন্তান জন্মিলে সন্তানের খাদ্যাদি যোগাড় করা বাস্তবিকই ক্লেশদায়ক ব্যাপার। সুতরাং দেখিতে গেলে গৃহস্থ পরিবারে জন্মশাসনের ফলে অনেকটা আরাম উপভোগের সুযোগ হইতে পারে। আবার অন্যদিক দিয়া দেখিতে গেলেও দেখা যায় জন্ম নিয়ন্ত্রণে কৃত্রিম উপায় অবলম্বিত হইলে ইহার সাহায্যে অবৈধ উপায়ে ভোগস্পৃহা নিবৃত্ত করা সহজ সাধ্য হয়, অথচ বাহিরে সে কথা প্রকাশ হইবার আশঙ্কাও খুব কম হয়। সুতরাং জননিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা যে কল্যাণকর তাহা অন্ততঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে মনে করিতেছে।

জন্মশাসনের সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা চলিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনসহরে লর্ড হার্ডারের সভাপতিত্বে এসিয়া মহাদেশের জন্মনিরোধ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সভা বসিয়াছিল। সেই সভায় ডাক্তার ডাইস্‌ডেল্ বলেন—'ভারতবর্ষের শতকরা ৭৫ জন লোকের যখন একবেলার বেশী ভাত জোটে না, তখন ভারতে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়।' তৎপ্রসঙ্গে তিনি যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—'ভারতের বর্ত্তমান অধিবাসীর সংখ্যা ৩৫ কোটি। আর যে ভাবে লোক সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাতে ৫০ বৎসরের মধ্যে ঐ লোকসংখ্যা বাড়িয়া দুই হাজার কোটিতে পরিণত হইবে। তখন ভারতে এত লোকের স্থান ও আহারের সঙ্কুলান হইবে কিরূপে? এইজন্যই ভারতের জননিরোধের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।' প্রতীচ্যবাসীর ভারতের প্রতি এইরূপ বিশ্ব প্রেমিকতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু ভারতে ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মোটামুটি ত্রিশ কোটি লোক ছিল এবং এই ৪০ বৎসরে মোটে পাঁচ কোটি মাত্র লোক বাড়িয়াছে। সুতরাং উক্ত ডাক্তার মহোদয়ের ৫০ বৎসরের ভবিষ্যৎ অনুমান যে কতটা সত্য হইবে তাহা ভারতবাসীর ভাবিবার বিষয়।

যাহাই হউক, এদেশে শিক্ষিতা ভদ্রমহিলারাও প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া জন্মনিরোধের প্রস্তাব ভোটের জোরে পাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রগতিবাদিনী শিক্ষিতা নারীরাও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ভারতের লোকসংখ্যা যে ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ঘরে ঘরে যে ভাবের অন্নাভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে জন্মনিরোধের জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়াও দারিদ্র্যের হাত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করা বিধেয়।

জন্মনিরোধ প্রস্তাবটি প্রকাশ্যভাবে যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া কলিকাতার গত মহিলা সভায় পাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও যথেষ্ট হইয়াছিল। প্রতিবাদিনীদের পক্ষ হইতে কুমারী রাণী ঘোষ বলিয়াছিলেন—"যে বিষয় নিভৃত শয়নকক্ষে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে মীমাংসিত হওয়া বাঞ্ছনীয় প্রকাশ্য সভায় তাহার আলোচনা অশোভন।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"প্রত্যেক নারীরই জীবনের সুখ সুবিধা, কর্ত্তব্য, আরাম ও সন্তোষের উপলব্ধি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র মানদণ্ড আছে। যাহা একের পক্ষে বলকর পথ্য তাহা অপরের পক্ষে বিষবৎ পরিত্যাজ্য; সুতরাং জন্ম-ব্যাপার দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় অসঙ্গত। ইহার ফলে সংখ্যা হিসাবে ভারতবর্ষ দুর্ব্বল

হইয়া পড়িবে। যাহারা জন্মনিরোধের পক্ষপাতিনী তাহারা জনসাধারণকে আত্মসম্মান রক্ষার বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করুন,—জন্মনিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে অর্থনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দিন।" শ্রীমতী ক্ষেমচাঁদ মহোদয়াও প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন "অবশ্য বহু ভগিনী দরিদ্রের দুঃখ দূর করিবার জন্য এই ব্যবস্থার পক্ষপাতিনী। কিন্তু অধিকাংশ ভগিনীই স্বার্থপরতার দিক্ দিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা কাঁদুনে ছেলের আবির্ভাব চাহেন না। তাহাতে তাঁহাদের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে মনে করেন।" লাহোরের কুমারী খাদিজা বেগম ফেরোজুদ্দীন মহোদয়া বলিয়াছিলেন —'যদি ভারতবর্ষে জনসংখ্যার আধিক্য দেখিয়া জন্মনিরোধ ব্যবস্থার জন্য সকলে লালায়িত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ দিবার জন্য সম্মেলন এত ব্যগ্র কেন? নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে জন্মসংখ্যা হ্রাস করাইবার জন্য জন্মনিরোধের ব্যবস্থা না করিয়া যাহাতে তাহাদের নৈতিক জীবনের উন্নতি ঘটে, জীবনযাত্রা প্রণালীর মানদণ্ড পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন। তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিন, সংযম শিক্ষা দিন। উহাই ভারতীয় শিক্ষার মেরুদণ্ড।'

এক্ষণে আধুনিক খৃষ্টান সভ্যতার চূড়ামণি মার্কিণ যুক্তপ্রদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সম্প্রতি গবেষণা ও আলোচনা করিতে যে এক বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতে পক্ষে ও বিপক্ষে বহুলোক উপস্থিত ছিলেন। জননিরোধক আইনের পাণ্ডুলিপিও সিনেট সভায় পেশ হইয়াছে। প্রস্তাবক হইতেছেন ওরিগণষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সেনেটর ওয়ালটার পিয়ার্স—যদিও পিয়ার্স ছয়টি সন্তানের জনক। তিনি বলিয়াছেন—ব্যবসায় বাণিজ্য এখনই লোকের কাজ মিলিতেছে না। যদি জননিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহা হইলে যে লক্ষ লক্ষ শিশুর জন্ম হইবে, তাহারা কাজ পাইবে কোথায়?' অপর পক্ষে ডাক্তার হেন্‌রী ক্রসন বলিয়াছেন যে, "জননিয়ন্ত্রণওয়ালারা প্রচার করিতেছে ডাক্তারেরা সকলেই জননিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী—এ কথা আদৌ সত্য নহে"। পাদরী চার্লস কাওলিন বলিয়াছে—"প্রজননের হাত এড়াইলেই দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দূর হইবে না, হইবে টাকার জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে।" নিউজার্সে ষ্টেটের সেনেটর শ্রীমতী মেরী নর্টন, কাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিক অর্থনীতির অধ্যাপক জনরায়ান, পাদরী উইলিয়ম চেজ ও আর্নেষ্ট ষ্ট্রাস এবং অন্য অনেকে জননিয়ন্ত্রণ আইনের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। হপ্‌কিন্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার হাওয়ার্ড বেলী বলিয়াছেন—"আমার নয়টি সন্তান ও তেরটি পৌত্রপৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী আছে। আমি তাহাদের সকলের জন্মে অত্যন্ত আনন্দিত।"

জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিবাদিনীগণের উদ্ধৃত অংশসমূহ হইতে মনে হয় যে বর্ত্তমানে যাহারা জন্মশাসনের পক্ষপাতী তাঁহারা ব্যভিচার দোষ নিবারণের জন্য ততটা ব্যগ্র নহেন, যতটা ব্যগ্র আত্মসুখ সুবিধার জন্য। বরং মনে হয় জন্মশাসনের মূলে ব্যভিচারের দিকে আগ্রহই যেন প্রবল।

পাশ্চাত্য দেশসমূহের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় কেবল ফরাসীদেশেই লোকসংখ্যা বাড়িতেছে না বরং ক্রমাগত কমিতেছে এবং শুনা যায় ফরাসী দেশেই ব্যভিচারের মাত্রা অত্যন্ত বেশী। সাধারণতঃ ফরাসী দেশের মেয়েরা বিবাহ করিতে চাহে না। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহারা পুরুষের সঙ্গ লাভে অনিচ্ছুক তাহা নহে। সে দেশের মেয়েরা অবাধে পুরুষদের সঙ্গে মিশিয়া অবৈধভাবে গর্ভবতী হইয়া থাকে এবং নানা প্রক্রিয়া অবলম্বনে সেই গর্ভও তাহারা নাশ করিয়া সন্তান পালনের দায়িত্ব হইতে নিজেদের দূরে রাখে। ইহার ফলে অনেক সময়

মেয়েদের মধ্যে নানাবিধ উৎকট ব্যাধির সৃষ্টি হয়, এবং অনেক সময় ডাক্তারগণ কঠিন পীড়া হইতে নারীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ঐ সকল নারীদের জরায়ু কাটিয়া দেয়। ইংলণ্ডের সমাজও যে খুব উন্নত তাহা নহে। ব্রিটিশবালার অবাধ স্বাধীনতা সেই দেশের সমাজে এত কলঙ্ক বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহাতে তথাকার নারীরা চতুরতায়, বিলাসিতায়, ফাজলামিতে, নষ্টামিতে ফরাসী বিলাসিনী হইতে কোন অংশে ন্যূন বলিয়া মনে হয় না। ঐ সকল মেয়েদের স্বাধীনতার ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া ইংলণ্ডের সমাজহিতৈষিগণ আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। মোটের উপর শান্তিময় পারিবারিক জীবনের শান্তিমাধুর্য্য পাশ্চাত্য দেশের অনেকেই ভোগ করিতে পারে না। তথাকার বিবাহ নরনারীর দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ক্ষণিক মিলন মাত্র। যতক্ষণ পরস্পর পরস্পরকে দৈহিক তৃপ্তি দিতে পারে ততক্ষণ উভয়ের মধ্যে মিলন। তারপরই নারীর চক্ষে সুপুরুষ পড়িলে, কিংবা পুরুষের চক্ষে সুনারী পড়িলে, তাহারা অবাধে পরস্পরকে পাইবার জন্য সবই করিতে পারে। মোটের উপর তথাকার সাধারণ নরনারী ক্ষণিক আনন্দের জন্য মিলিত হয় এবং আবার পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন আনন্দের আশায় ছুটাছুটি করে।

ব্যভিচারের সংজ্ঞা যেন পাশ্চাত্য দেশসমূহের নিকট অতি সঙ্কীর্ণ। নরনারীর দৈহিক মিলনকে তাহারা স্বাধীনতা বলে এবং সেই স্বাধীনতা ভোগ করিবার জন্য নরনারী তথায় উন্মাদ হইয়া উঠে। এইরূপ অবাধ মিলনকে তাহারা 'ফ্রীলাভ্' (Free love) নামে চালাইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য দেশের নরনারীর মধ্যে এই যে দৈহিক মিলনের অবাধ আকাঙ্খা,—এই আকাঙ্খার মূলে যদি সন্তান আসিয়া বাধা স্বরূপ দাঁড়ায়, তাহা হইলে নরনারীর অবাধ মিলনে ও ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার পথে সেই সন্তান বিষম বাধা জন্মায়। কাজেই নারী গর্ভধারণের উৎপাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিলে তাহার চিরযৌবন রক্ষার পক্ষে যেমন সুবিধা হয়, অবাধ পুরুষের সহিত মিলনের পথও তেমনি প্রশস্ত হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাশ্চাত্য দেশসমূহে ব্যভিচারী ব্যক্তিগণ তথায় জন্মনিরোধের ধূয়া তুলিয়াছে, এবং তৎফলে অনেক পুস্তক ও ঔষধাদির আবির্ভাব হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দেশের ব্যভিচারের তরঙ্গ আসিয়া ভারতীয় সমাজ-শরীরে আঘাত দিয়াছে। শিক্ষিত ভারতীয় নরনারীগণের চরিত্রের উপর পাশ্চাত্য প্রভাব কলঙ্ক ঢালিয়া দিয়াছে। এক্ষণে ভারতের যুবকযুবতীদিগের মধ্যে পাশ্চাত্য ফ্রীলাভে'র (Free love) ঘূর্ণীবাত্যা প্রবল তরঙ্গের ন্যায় আসিয়া তাহাদিগের হৃদয়কে আলোড়িত করিয়াছে। আর সেই তরঙ্গের প্রভাবে জন্মশাসনের জন্য এদেশেও এক দল নরনারী ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তাহারা ভুলিয়া যাইতেছে সৃষ্টিপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্যই পুরুষ ও নারীর মিলন এবং এই মিলনের নাম বিবাহ। বিবাহ ইহলৌকিক ও পরলৌকিক সম্বন্ধ লইয়া নরনারীকে মিলিত করে। ঐ মিলনের প্রকৃত অর্থ প্রজা-উৎপাদন,—ব্যভিচার নহে, দৈহিক ভোগের জন্য আকাঙ্খা নহে, পরন্তু আত্মার মিলনের অব্যবহিত সুখময় ফলস্বরূপ প্রজা উৎপাদন মাত্র।

আশ্চর্য্যের বিষয় পাশ্চাত্য দেশে বিবাহের উৎসাহের জন্য এখন চেষ্টা চলিতেছে। ইটালীতে মুসোলিনী ও জার্ম্মানীতে হিট্লার যুবকযুবতীদিগকে বিবাহ বিষয়ে উৎসাহিত করিতেছেন।

ফরাসী দেশেও সন্তানের সংখ্যা পাঁচের বেশী হইলে দম্পতীকে ফরাসী রাজ সরকার সন্তান পোষণের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

জন্মনিয়ন্ত্রণ যে একেবারে দোষাবহ তাহাও বলা হইতেছে না। অতীতকালে জনন-নিয়ন্ত্রণের পক্ষে নৈতিক আদর্শই ছিল উৎকৃষ্ট উপায়। সেই উপায়-অবলম্বন দোষাবহ বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এক্ষণে কৃত্রিম উপায়ই হইয়াছে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। কিন্তু কৃত্রিম-উপায়-অবলম্বনে প্রসূতিদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতি তো হইবেই না, অধিকন্তু সন্তান সন্ততিদিগের দেহের গঠন ও স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দ্রুত নৈতিক অবনতি ঘটিতে থাকিবে। মার্কিন ডাক্তার জার্ডিনের জননিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিখ্যাত পুস্তকই এই কথা বলিয়া দিতেছে।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে সময় প্রতীচ্য জাতিরা কৃত্রিম উপায়ে জনন-নিয়ন্ত্রণের জোর নিন্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আমাদের দেশের নব্য শিক্ষিতগণ ঠিক সেই সময়েই কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতেছে। প্রতীচ্যের মনীষগণ অতীতের কঠোর অভিজ্ঞতার ফলে যাহা অনিষ্টকর বলিয়া বুঝিয়াছেন মজ্জাগত ব্যাধির ন্যায় পাশ্চাত্য অনুকরণের মোহে আমরা তাহাকেই পরম-কল্যাণকর বলিয়া মনে করিতেছি। আমাদের দাসমনোবৃত্তির এই শোচনীয় নিশ্চলতা দূর করিয়া সচলতা আনয়ন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। মনে রাখিতে হইবে একটা জাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকলকেই আমাদের পিতৃপিতামহ এবং মাতৃমাতামহীদের মত কতকটা আরাম কতকটা সুখশান্তি উৎসর্গ করিতে হইবে।

ভারতের মাতৃজাতিকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে পুত্রের মঙ্গলকামনায় আত্মবলি দেওয়াই মাতার কর্ত্তব্য এবং তবেই সুপুত্রের মাতা হওয়া যায়। মাতৃত্বের মহিমায় মহিমান্বিত না হইতে পারিলে সুসন্তানের মাতা হওয়া যায় না। দুটা দাপাদাপী ও ফষ্টিনষ্টির দ্বারা সে কার্য্য সাধিত হয় না। একজন সুশিক্ষিতা মহিলা হয়তো সভায় স্বল্পকাল বক্তৃতার জন্য সহজেই ধন্যবাদ বা করতালি পাইতে পারেন কিন্তু একটি বালককে সুসন্তানরূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে বিশ বৎসর ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও আত্মোৎসর্গের দরকার।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে নারীদিগের সতীত্বটা একটা টিটকারী নহে,—ইহা পুরুষদিগের স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটা প্ররোচনাও নহে। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সমাজের একটা নিজস্ব সম্পত্তি আছে। ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি এই সতীত্বের মর্য্যাদা। দেশের যত সৎপুত্র জন্মিয়াছেন সব সতী মাতার গর্ভে। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আমাদের হিন্দুসমাজ যে ঠিক আছে, তাহা এই সতীত্বের সম্মানের জন্য। সতীত্বের গৌরব রক্ষার জন্য রাজপুত রমণীগণ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সতীত্বের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য হিন্দুরমণী অবলীলাক্রমে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং কতকগুলি বিদেশী সাহিত্যের অনুসরণে ও বিদেশী আদর্শের মোহে যাহারা সতীত্বের অমর্য্যাদা করিতেছে তাহারা যে অন্ততঃ হিন্দুসমাজের অনিষ্টকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রশ্নোত্তরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

উঃ।— ব্রহ্মান্বেষণে বিভিন্ন মত :—

৩। অন্য কেহ বলেন উক্ত মত ভ্রমাত্মক। দেহ আত্মা হইতে পারে না, দেহ অচেতন জড়, ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া চেতনবৎ প্রতীয়মান হয় মাত্র। ইহা বাল্যযৌবনাদি সহ বিবিধ পরিণতি প্রাপ্ত হয়, ষড়্‌বিকার যুক্ত। পিতৃবীর্য্য ও মাতৃ শোণিত হইতে উৎপন্ন সংঘাত দ্রব্যসংঘাত সর্ব্বদাই পরার্থ হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা আত্মা হইতে পারে না। আমি বধির, আমি কাণ, আমি মূক এইরূপ অনুভব হয়। উহা ইন্দ্রিয় বিষয়ক। ইন্দ্রিয়গণের দ্বারাই রূপ রস গন্ধাদি বিষয় জ্ঞান হয়। শ্রুতিতেও আছে "প্রাণাঃ এতং প্রজাপতিং এত্য উচুঃ।" অর্থাৎ প্রাণ (ইন্দ্রিয়) সকল এই প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের চেতনত্ব প্রমাণিত হয় অতএব ইন্দ্রিয়গণই আত্মা, দেহ নহে।

৪। অন্য কেহ এই ইন্দ্রিয়াত্ম বাদকে দূষণ করিয়া প্রাণ (পঞ্চপ্রাণ) আত্মা এই মত পোষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে বৃক্ষছেদনে কুঠারের কর্ত্তৃত্ব নাই, উহা অচেতন করণ মাত্র। তদ্বৎ ইন্দ্রিয়গণও করণ মাত্র। কুঠারবৎ প্রাণ শক্তি সমন্বিত হইয়া কার্য্য করে: উহারা অচেতন। লোকে বলে পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি তাহাই এক্ষণ স্পর্শ করিলাম অর্থাৎ পূর্ব্বে যে আমি দেখিয়াছি সেই আমি এখন স্পর্শ করিলাম; তাহাতে যে দেখিয়াছিল সেই স্পর্শ করিতেছে। দর্শন ইন্দ্রিয় ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিয়াছে ও স্পর্শ করিয়াছে মাত্র। চক্ষু স্পর্শের বা কর্ণের কাজ করে না, কর্ণ চক্ষু বা রসনার কাজ করে না, স্পর্শ আঘ্রাণের কাজ করে না। এইরূপ এক ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্য ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নির্ব্বাহ হয় না। যদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্র কর্ত্তা হয় তবে বহু কর্ত্তা স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। দেহ এক কর্ত্তা বহু হইলে কার কথা রাখে। তেঁতুল দৃষ্টে জিহ্বায় জল আসা সাধারণ। অথচ জিহ্বার ও চক্ষুর কর্ত্তৃত্ব স্বতন্ত্র হইলে ঐরূপ ঘটিতে পারে না। ইহাতে এক কর্ত্তা থাকা যুক্তিসিদ্ধ হয়। ইন্দ্রিয়গণের সংঘাতও কর্ত্তা নহে, কারণ সংঘাতে সর্ব্বত্র পরার্থ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ আত্মা নহে। প্রাণেরই ক্ষুধা তৃষ্ণাদির অনুভূতি হয় এবং প্রাণক্রিয়া রুদ্ধ হইলে সকল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই রুদ্ধ হয়। অতএব প্রাণই আত্মা শ্রুতিও বলেন "আত্মা প্রাণময়" ইতি।

৫। অন্য কেহ এই প্রাণাত্মবাদ দূষণ করিয়া মনই আত্মা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ—দেহ প্রাণ কর্ম্মকারের যন্ত্র মাত্র। উহা যেমন বাহির হইতে বায়ু লইয়া তাহার যোগে অগ্নিকে উদ্দিপীত করে তেমনি প্রাণ বাহির হইতে বায়ু গ্রহণ করিয়া ভিতরে নেয় ও ইন্দ্রিয়াদিকে উদ্দিপীত করে ও ভিতরের বায়ু বাহিরে নেয়। উহা জড়। ইহার কোন হিতাহিত জ্ঞান নাই। নিদ্রাকালে যখন অন্য ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বিশ্রাম করে তখনও প্রাণ কাজ করে। ঐ সময় প্রিয়জন বা শত্রু চৌরাদি নিকটে আসিলে এমন কি গাত্রস্পর্শ করিলেও প্রাণ তাহা জানিতে পারে না। প্রাণ ঘড়ী যন্ত্রের ন্যায় অচেতন না হইলে, নিদ্রিত ব্যক্তি অন্য লোক সমাগম জানিতে পারিত। নিদ্রাবস্থায় রোগশোকজনিত তীব্র যন্ত্রণার বিস্মৃতি হয় কেন? প্রাণ কেন ঐ সমুদয়ের প্রকাশক হয় না? অতএব প্রাণ আত্মা নহে। পঞ্চপ্রাণ সমবেত হইয়া কার্য্যকরী হয়; তাহা সংঘাত, কাজেই পরার্থ; অতএব প্রাণ আত্মা হইতে পারে না। অতএব মনই আত্মা। মনই সংজ্ঞার উৎপত্তি করে।

ধর্ম্মে পাশ্চাত্য প্রভাব

[২]

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বনে পাশ্চাত্যশিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞগণ আমাদের ধর্ম্মের মূলে যেরূপ কুঠারাঘাত করিতেছেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, এইবার যে সমস্ত পাশ্চাত্যশিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞগণ বিশ্বপ্রেমের মহিমা ঘোষণা করিয়া দ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ অবলম্বন করিয়া আমাদের ধর্ম্মধ্বংসকারিণী সেই পাশ্চাত্যভাবাভিমানিনী দেবতার বাহনস্বরূপ হইয়া থাকেন, তাঁহাদের বিষয় আলোচ্য। ইঁহারা, দেখা যায়, বেদবেদান্তগীতাপ্রভৃতি শাস্ত্রসাহায্যে তাদৃশ কোন একটী মতবাদ আশ্রয় করিয়া ভারতীয় ধর্ম্মমতের নিতান্ত দুর্ভেদ্য দুর্গ সেই বেদমূলক অদ্বৈতবাদের উপর আক্রমণে অগ্রসর হন। বৌদ্ধমতবাদ, অবৈদিক বলিয়া বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বিগণ যদি অবিচারিত চিত্তে তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করেন, তাই যেন সেই পাশ্চাত্যভাবাভিমানিনী দেবতা এই সব পাশ্চাত্যশিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞগণকে বেদের দোহাই দিয়া, বেদমার্গের ভিতর দিয়া, ভারতীয় ধর্ম্মমতের সেই নিরতিশয় দুর্ভেদ্য দুর্গ ধ্বংস করিতে প্ররোচিত করিয়া থাকেন। এইরূপে সেই পাশ্চাত্যভাবাভিমানিনী দেবতার প্রধানমল্লনিবর্হন-নীতি এক্ষেত্রে বেদমার্গের ভিতর দিয়া বেদমূলক অদ্বৈতবাদের উপর আক্রমণ করিয়া প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল মহাত্মা বেদের অভ্রান্ততা কেহই সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন না, অথচ ইঁহারা বেদবেদান্তের দোহাই দিয়া বেদৈকপ্রমাণবাদী অদ্বৈতবাদীর মতবাদখণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। বেদের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে কেহ বলেন—বেদ সর্ব্বাংশে অভ্রান্ত নহে, কিন্তু কতক অংশে যে ইহাতে ভ্রমপ্রমাদ নাই—ইহা নিশ্চিত। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—সে অংশ কোন্‌টী? তখন তাঁহারা বলেন—যে অংশটী যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় এবং আমাদের অনুভূতির সঙ্গে ঐক্য হয়, সেই অংশে কোন ভ্রমপ্রমাদ নাই—ইহাই বলিতে হইবে। সুতরাং বেদের অভ্রান্ত অংশ নির্দ্দেশ করিবার মানদণ্ড তাঁহাদেরই বুদ্ধি বা বিবেচনা। কেহবা বেদের অভ্রান্ততাই স্বীকার করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেদকে ঋষিপ্রণীতও বলেন। কিন্তু ঋষিপ্রণীত হইলে তাহা যে আর বেদ নহে, তাহা যে স্মৃতি হয়, এবং তাদৃশ বেদ যে পৌরুষেয় হয়, আর পৌরুষেয় হইলে যে, তাহা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত হয় না, অথবা অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বেদেরই অনুবাদমাত্র হয়, বেদের প্রামাণ্যেই যে তাঁহাদের কথার প্রামাণ্য, আর তজ্জন্য বেদনিরপেক্ষ তাঁহার কথার দ্বারা যে বেদার্থ নির্ণেয় নহে, কিন্তু বেদার্থনির্ণয়ের জন্য যে অনাদিসিদ্ধ মীমাংসাসম্মত কৌশল, তদ্দ্বারাই বেদার্থ নির্ণেয়—ততদূর পর্য্যন্ত আর তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন না। কেহ বা ঋষিদিগের সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বীকার করিয়া ঋষিপ্রণীত বেদের অভ্রান্ততা প্রতিষ্ঠাপিত করেন, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞের যে রচনাকার্য্য সম্ভবপর হয় না, যেহেতু যাহাকে রচনা বলা যায়, তাহা রচনার পূর্ব্বে রচনাকর্ত্তার চিত্তে সংস্কাররূপেও বিদ্যমান থাকে না, থাকিলে তাহার কথন পুনরাবৃত্তিবিশেষই হইয়া যায়, আর তজ্জন্য বেদ, সর্ব্বজ্ঞ-ঋষিরচিত নহে—এতদূর পর্য্যন্ত তাঁহারা আর অনুধাবন করিতে পারেন না। আর এইরূপে যাঁহারা বেদের

অভ্রান্ততায়, সুতরাং অপৌরুষেয়তায় ও নিত্যতায় স্বয়ং বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা সেই বেদের দোহাই দিয়া কি করিয়া বেদে অভ্রান্ততাবাদীর মতে দোষারোপ করেন—যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তখন তাঁহারা বলেন,—"আমরা বেদকে অভ্রান্ত না বলিলেও, যাঁহারা অভ্রান্ত বলেন, তাঁহারা যদি বেদার্থনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া, বেদার্থনির্ণয়ের জন্য তাঁহাদেরই কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই ত্রুটী কেন একজন বেদে অবিশ্বাসী ব্যক্তি প্রদর্শন করিতে পারিবে না? পক্ষান্তরে সেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বেদের যে স্বারসিক অর্থ হয়, তাহাই বা কেন তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন না? অহিন্দু কি হিন্দুর আইন অনুসারে হিন্দুর ন্যায়-অন্যায় বিচার করেন না? অতএব বেদ না মানিয়া বেদোক্ত মত অদ্বৈতবাদ নহে, কিন্তু তাহা ভেদাভেদবাদ বা অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলিয়া যদি নির্দ্দেশ করা হয়, তাহাতে দোষ হয় না।

কথাটী আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না, কিন্তু অশুদ্ধচিত্তে বেদার্থ প্রকাশিত হয়—ইহা কখনও কোন নিষ্ঠাবান্ বেদসেবী বিশ্বাস করিবেন না। পদপদার্থ ও অন্বয়বোধবশতঃ বাক্যার্থবোধ হইলেও যে মলিন দর্পণে মুখদর্শনের ন্যায়, তাহা অশুদ্ধচিত্তের সংস্কারকলুষিত হয়, এবং তাহাও "পানাপুকুরে ঢিল ফেলার" ন্যায় যে, অস্পষ্ট ক্ষণিকপ্রকাশ হয়, তাহা স্বীকার করা ভিন্ন গতি নাই। অহিন্দুকর্তৃক হিন্দুর বিচার যদি সর্ব্বত্রই নির্দ্দোষ হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে বহু স্থলে হিন্দু বিচারপতির হস্তে এতাদৃশ বিচারভার দিবার ব্যবস্থা থাকিত না। অবশ্য এ কথায় পাশ্চাত্যরাজত্বে পাশ্চাত্যশিক্ষিত ব্যক্তি অকুণ্ঠিতচিত্তে সম্মতি প্রদান করিবেন না, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহারা যে মনে মনে ইহা বুঝেন না, তাহা নহে। এজন্য ইলবার্ট বিলের কথা স্মরণ করিলে বোধ হয় বুঝিতে আর বড় বিলম্ব হইবে না। অতএব এই সকল পাশ্চাত্য-শিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞগণ সেই পাশ্চাত্যভাবদেবতার বাহনরূপে যখন এতাদৃশ হিন্দু সাজিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন, তখনই তাঁহাদের যুক্তির ভ্রমপ্রদর্শন এবং তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের অসারতাপ্রদর্শন ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকে না। কারণ, হিন্দু নাম শুনিয়া ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রশংসাবাদ শুনিয়া লোকে তাঁহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া বসে। এক্ষেত্রে আত্মরক্ষার ইহাই শেষ উপায়, এবং বর্ত্তমানে এই উপায়টী অবলম্বন করিবার একটী স্থল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমরা এইরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

কিছুদিন হইতে দেখা যাইতেছে—এই শ্রেণীর অনেকেই অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে নানারূপ অসঙ্গত কথাপ্রচারে অধিকতর বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া হিন্দুসমাজে থাকিয়াই বেদ ও বেদান্ত প্রভৃতি অবলম্বনে অদ্বৈতবাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইনি আমাদের মিত্রস্থানীয় হইলেও আমাদের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক জগৎপূজ্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের উপর হেয়বুদ্ধি উৎপাদনের প্রয়াস করায় ইহার কতিপয় কথার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। তবে মিত্রবুদ্ধি থাকায় ইঁহার নামোল্লেখ আর করিলাম না। কিছু দিন পূর্ব্বে ইনি মাধ্বমতের দ্বৈতবাদের উপর অনুরাগপ্রদর্শনসহকারে অদ্বৈত-মতখণ্ডনে প্রবৃত্ত ছিলেন, অদ্বৈতসিদ্ধান্তকে বৌদ্ধসম্পদ বলিয়া ঘোষণা করিতেন, কিন্তু অধিক দিন যাইতে না যাইতে তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদবাদকে অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ নাম করিয়া, শাস্ত্রসাহায্যে তাহার সমর্থন করিয়া, অদ্বৈতমতের নিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে প্রৌঢ়িবাদী

প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমতাবলম্বী বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। অপর একজন ধুরন্ধর ব্যক্তি আবার উপনিষৎ ও তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনাপ্রসঙ্গে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ব্যাকরণজ্ঞানেরও অভাব প্রদর্শন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। অনন্ত-উন্নতিবাদীর দলও এই সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন। এইরূপে ইহাঁদের দলটা বেশ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে। আর অনেকেই যেন ইহাঁদের কথায় বেশ মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন। সদাচারী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ অন্নাভাবে অনেক দিন হইতেই নীরব হইয়াছেন। কোনরূপ আক্রমণের উত্তর দিবারও তাঁহাদের আর প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং ইহাদের প্রভাব এখন উত্তরোত্তর খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। মনে হয় সেই পাশ্চাত্যভাবাভিমানিনী দেবতার সৈন্যসামন্ত এখন যেন দিগ্বিজয় উল্লাসে অধিকতর উল্লসিত। যাহা হউক, ইহাঁদের মধ্যে উক্ত লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তি কোন এক সময়ে যাহা বলিয়াছেন, অদ্য তাহারই উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। কারণ, ইহাঁর বাক্যে শাস্ত্রচর্চ্চার কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। আর তজ্জন্য ইহাঁর আক্রমণটাই উত্তর দিবার যোগ্য বলিয়া মনে হইল। ইনি বলিতেছেন—

"বৈদিক সাহিত্য চারি ভাগে বিভক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ। সংহিতার মধ্যে ঋক্ ও অথর্ব্ব এই দুইটী মৌলিক। যজুঃ (সূক্তাংশ) ও সাম এই দুই বেদ প্রধানতঃ ঋগ্বেদ হইতে সংগৃহীত। এই বেদসাহিত্যের শেষ অংশ উপনিষদ্, সেই জন্য উপনিষদ্‌কে বেদান্ত বলা হয়। ঋগ্বেদের ও অথর্ব্ববেদের জ্ঞানগর্ভ সূক্তগুলির সহিত উপনিষদের তত্ত্ববিদ্যার সাদৃশ্য আছে। এবং অনেক সময় এইরূপই মনে হয় যে, যে প্রেরণায় ঋগ্বেদের জ্ঞানগর্ভ সূক্তগুলি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, সেই প্রেরণাতেই উপনিষদের তত্ত্বালোচনারও উদ্বোধ হইয়াছিল। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে লিখিত আছে—

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্.........
পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।"

অর্থাৎ যাহা কিছু ভূত ও ভবিষ্যৎ সমস্তই পুরুষের আত্মস্বরূপ......তাহার এক অংশ অমৃতলোকে বিরাজ করেন। এই পুরুষ হইতেই সমস্ত জড় ও জীবলোক উৎপন্ন হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের দশম মণ্ডলের সপ্তম সূক্তে ও অষ্টম সূক্তে যে স্কম্ভ ও ব্রহ্মের বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতেও লিখিত আছে, যে স্কম্ভের বিরাট্ দেহের মধ্যেই এই বিশ্বভুবন নিহিত রহিয়াছে, শুধু বিশ্বভুবন নহে, তপঃ শ্রদ্ধা এবং কালও তাঁহারই মধ্যে নিহিত আছে," ইত্যাদি।

এইরূপ উপক্রম করিয়া মধ্যে নানা যুক্তি তর্ক ও শ্রুতি ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারে বলিতেছেন—

"শঙ্করাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার বিজ্ঞানামৃত ভাষ্যে (১।১।৩ সূঃ) বলিয়াছেন—"নেদং ব্যাসদর্শনম্ অপিতু সপ্তমং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধদর্শনমেব।" ইতি।"

অর্থাৎ আরম্ভ হইল বেদ ও বেদান্তদ্বারা ধর্মতত্ত্বস্থাপনে, আর শেষ হইল শাঙ্করমতদূষণে, অর্থাৎ যে মতের উপর ভারতীয় ধর্ম্মমতটী প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহারই নিন্দায়। অন্য কথায় সেই পাশ্চাত্যভাবাভিমানিনী দেবতা যাহা চাহেন তাহারই সহায়তায়। এক্ষেত্রে যদি কেবল নিজমতস্থাপন এবং তজ্জন্যই পরমত খণ্ডন করা হইত, আর প্রাচীন রীতি অনুসারে পরমতের আচার্য্যের প্রতি কটূক্তি কটাক্ষ প্রভৃতি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য কিছুই থাকিত

না। স্বমতস্থাপনে সকলেরই স্বাধীনতা থাকা উচিত। অবশ্য আজকাল পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে পরমত খণ্ডনোপলক্ষে পরমতপ্রবর্ত্তকের নাম করা হয়, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের প্রতি অসম্মানসূচক ভাব প্রকাশিত হয় না। এই আলোচ্য প্রবন্ধে কিন্তু তাহাই করা হইয়াছে। এজন্য কর্ত্তব্যবোধে ইহার উত্তরপ্রদানে প্রবৃত্ত হইলাম। মুখ্য উদ্দেশ্য—প্রতিপক্ষের দুরভিসন্ধি বিপক্ষ বুঝিতে পারিলে যেমন অনেক সময় সেই প্রতিপক্ষ তাহার দুরভিসন্ধিকে কার্য্যে পরিণত করিতে কুণ্ঠিত হয়, এক্ষেত্রে সেই পাশ্চাত্যভাবাভিমানিনী দেবতা যদি আমাদের ধর্ম্মধ্বংস করিবার জন্য তাঁহার সেই দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতা হন, তাহা হইলেই আমাদের শ্রম কতকটা সার্থক হইবে।

(১) যাহা হউক এইবার দেখা যাউক—উদ্ধৃত কথাগুলি কতদূর সঙ্গত। প্রথম—"বৈদিক সাহিত্য চারি ভাগে বিভক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ।" আচ্ছা, এই কথাটী কি করিয়া সঙ্গত হয়? অনেকেই জানেন—ঈশাবাস্যোপনিষৎ এবং শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ সংহিতার অর্থাৎ মন্ত্রভাগের অন্তর্গত। ৪০ অধ্যায়ে যজুর্ব্বেদ সংহিতা সমাপ্ত। তাহার শেষ অধ্যায় ঈশাবাস্যোপনিষৎ। এইরূপ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ শতপথব্রাহ্মণের শেষ অংশ। সুতরাং সংহিতা ও ব্রাহ্মণ হইতে উপনিষদের পৃথক্ গণনা কিরূপে হয়? এইরূপে ব্রাহ্মণ হইতে আরণ্যকের কোন পৃথক্ গণনা সম্ভবপর নহে। জৈমিনি মহর্ষি মন্ত্রভিন্ন বেদভাগকে ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপ কাত্যায়ন ও আপস্তম্ব প্রভৃতি মহর্ষিগণ বেদকে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ —এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাতিরিক্ত বেদভাগ এপর্য্যন্ত কাহারো জানা নাই। সংহিতা বলিয়া বেদের কোন ভাগ নাই। আজকাল কেহ কেহ মন্ত্রভাগকে সংহিতা নামে প্রচার করিতেছেন। কিন্তু সংহিতা পদটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহাদের সেই ভ্রম দূরীভূত হইবে। সংহিতাপাঠ ও পদপাঠ প্রভৃতি বেদের পাঠপ্রকার মাত্র। বিসন্ধি করিয়া পাঠ করিলে তাহাকে সংহিতা পাঠ বলা যায় না। সংহিতা পদের অর্থ পাণিনি ব্যাকরণ প্রভৃতিতে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমরা আধুনিক অর্থে উপরে মন্ত্রকে সংহিতা বলিয়াছি মাত্র। বাস্তবিক সংহিতা নামে বেদ ভাগ নাই।

(২) তাহার পর "সংহিতামধ্যে ঋক্ ও অথর্ব্ব এই দুইটীই মৌলিক"—এই কথাটীই বা বলা যায় কি করিয়া? বেদের মধ্যে মৌলিক ও অমৌলিক বিভাগ করা যায় কিরূপে? মৌলিক বলিলে মূলসংক্রান্ত বুঝায়, সুতরাং মূলভিন্নই বুঝায়। মূল যদি অপৌরুষেয় হয়, তবে মৌলিক সুতরাং পৌরুষেয়ই হইতে বাধ্য। তাহার উপর আবার অমৌলিক বলিলে বেদের বহির্ভূত বস্তুকেই বুঝায়। যদি বলা যায়—ব্যাসদেব বেদের বিভাগাদি করায় মূল ও মৌলিক ভাবের সম্ভাবনা হইয়াছে; কিন্তু তাহাও সঙ্গত নহে। কারণ, বেদের মন্ত্রের ক্রমবিপর্য্যয়াদি কোনরূপ অন্যথা ঘটিলে তাহার আর বেদত্ব থাকে না। আর অমৌলিক বেদের সম্ভাবনাই বা কোথায়? মাধ্বমতে এই জাতীয় কথা আছে, কিন্তু তাহা যে অসঙ্গত, তাহা "মাধ্বমতে বেদের স্থান" নামক প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব বেদের মৌলিক ও অমৌলিক বিভাগ কিরূপে সঙ্গত হয়, তাহা সুধীগণেরই বিচার্য্য বিষয়। তাহার পর ঋক্ ও অথর্ব মৌলিক হয় কিরূপে? ইহারা কি মূল বেদ নহে? অতএব এতাদৃশ কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত এবং ইহা পাশ্চাত্য সমাজেই শোভা পায়।

(৩) "যজুঃ (সূক্তাংশ) ও সাম এই দুই বেদ প্রধানতঃ ঋগ্বেদ হইতেই সংগৃহীত।" এইবার এই কথাটী আলোচ্য। যজুঃ ও সাম ঋগ্বেদ হইতে সংগৃহীত—এরূপ কি করিয়া বলা যায়? ঋক্ ও ঋগ্বেদ অত্যন্ত বিভিন্ন বস্তু। ঋক্ বলিলে কেবল ঋক্‌মন্ত্র বুঝায়। ঋগ্বেদ বলিলে ঋক্‌মন্ত্র হইতে ঋগ্বেদীয় উপনিষৎ পর্য্যন্ত সবই বুঝায়। যজুঃ মন্ত্রের লক্ষণ জৈমিনি মহর্ষি দেখাইয়াছেন। তাহাতে গদ্যরূপ মন্ত্রকেই যজুঃ বলা হইয়াছে। নিরুক্তকার ভগবান্ যাস্কের ব্যাখ্যাত—

ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্করীষু।

ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতি বিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত উ ত্বঃ॥ (ঋক্ সং ৮,২,২৪,৫)

এই ঋক্‌মন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যজুর্ব্বেদ ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী নহে। আরও বুঝা যায় যে, কোনও বেদই কোন বেদের অগ্রে বা পশ্চাতে নহে। সমস্ত বেদই অনাদি ও তুল্যভাবে বিদ্যমান। যজ্ঞ, ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব মন্ত্রের সাহায্যেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কোনও বেদ না থাকিলে যজ্ঞ উৎসন্ন হইয়া যায়। যজ্ঞ নাই, বেদ আছে—এরূপ হয় নাই। অথচ আজকাল বেদচতুষ্টয়ের মধ্যেই পূর্ব্বাপরিভাব নির্ণয়ের চেষ্টা দেখা যায়। ইহাতে হিন্দু সুধীগণ হাস্যই করিবেন। যাহা হউক পদ্যরূপ মন্ত্রকে ঋক্ বলা হইয়াছে। সেই পদ্যরূপ মন্ত্র হইতে গদ্যরূপ মন্ত্র সংগৃহীত হইল কিরূপে? ইহা নিশ্চয়ই কোন বেদসেবী হিন্দু বুঝিতে পারিবেন না। তাহার পর যজুঃমন্ত্রের সূক্তাংশ ও অসূক্তাংশ—এই দুই বিভাগ কোথা হইতে আসিল? সাম মন্ত্র ঋক্‌ই বটে, কিন্তু ঋগ্বেদ হইতে ত সংগৃহীত নহে। সাম মন্ত্রগুলি প্রধানতঃ ঋগ্বেদ হইতে সংগৃহীত বলায় আরও অসঙ্গত কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়—ঋক্‌মন্ত্র হইতে সামমন্ত্র অন্য কিছু হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। প্রগীত ঋক্‌মন্ত্রকেই সাম বলে। আর মহর্ষি জৈমিনিও ইহাই তাঁহার দর্শনে বলিয়াছেন।

(৪) তাহার পর বলা হইয়াছে—"এই বেদসাহিত্যের শেষ অংশ উপনিষদ্, সেই জন্য উপনিষদ্‌কে বেদান্ত বলা হয়।" বস্তুতঃ এ কথাটীও অসঙ্গত। "বৈদিক সাহিত্যকে চারি ভাগে" বিভক্ত করিয়া অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যকে সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদ্ বলিয়া গ্রহণ করিয়া সেই বেদসাহিত্যের শেষ অংশ উপনিষদ্ বলায় উপনিষদের শেষ অংশকেও কি উপনিষদ্ বলা হইল না? আর তাহা হইলে উপনিষদের প্রথম অংশ আর উপনিষদ্ হইল না? কিন্তু একথা বলা বোধ হয় বক্তারও অভীষ্ট নহে। অথচ কথাটা লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়া গেল—ইহাই কি বলিতে হইবে? আচ্ছা, বৈদিক সাহিত্য ও বেদসাহিত্যের মধ্যে কি কিছু ভেদ নাই? বেদসাহিত্য বেদই হয়, কিন্তু বৈদিক সাহিত্য বেদ অবলম্বনে লিখিত—এইরূপই বুঝায়। এজন্য উহা বেদ নহে। উহা ঋষিপ্রণীত হয়, সুতরাং স্মৃতিপদবাচ্যই হয়। সুতরাং বেদসাহিত্য ও বৈদিক সাহিত্যকে অভিন্ন বলাও অসঙ্গত হইয়াছে।

(৫) আবার বলা হইয়াছে—"ঋগ্‌বেদ ও অথর্ব্ববেদের জ্ঞানগর্ভ সূক্তগুলির সহিত উপনিষদের তত্ত্ববিদ্যার সাদৃশ্য আছে"। আচ্ছা, সাদৃশ্য থাকায় ভেদও আছে—ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তবে কি বলিতে হইবে—ঋগ্‌বেদ ও অথর্ব্ববেদের সূক্তমধ্যে যে তত্ত্ববিদ্যা আছে, আর উপনিষদের মধ্যে যে তত্ত্ববিদ্যা আছে, তাহারা বিভিন্ন, তবে তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য মাত্র আছে? কিন্তু "এই বেদসাহিত্যের শেষ অংশকেই কি উপনিষদ্" বলা হয় নাই? তাহা হইলে বেদের প্রথমাংশে

যে তত্ত্ববিদ্যা আছে, তাহা হইতে বেদের শেষ অংশে যে তত্ত্ববিদ্যা আছে, তাহা বস্তুতঃ বিভিন্ন, তবে তাহাদের সাদৃশ্য আছে মাত্র—এরূপ কথা বিলাতিসমাজেই বলা ভাল হিন্দুসমাজে একথা বলিলে বেদজ্ঞহিন্দুগণ তাঁহাকে পাগলই বলিবে। তাহার পর "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাঽমৃতম্'—এ তিনটী যজুঃমন্ত্র। ইহাতে কি তত্ত্ববিদ্যার কথা নাই? ইহারাও কি ঋগ্বেদ হইতে সংগৃহীত? অথবা অথর্ব্ববেদ হইতে সংগৃহীত! অতএব ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদ হইতে যে উপনিষদ্ সংগৃহীত তাহা আর বলা চলে না। এস্থলে "সংগৃহীত" পদটী কি বেদের পৌরুষেয়ত্বের ইঙ্গিত করিতেছে না? বস্তুতঃ যিনি বেদকে অপৌরুষেয় বলেন না, তাঁহাকে যে হিন্দু বলা হয়, তাহা আরোপ মাত্র। পূর্ব্বপুরুষের হিন্দুত্বই তাঁহাতে আরোপ করা হয়। ইহা আজকাল একজন খৃষ্টানকে "মুখোপাধ্যায়" "বন্দ্যোপাধ্যায়" বলারই মত বলিতে হইবে। মনে হয়, সেই পাশ্চাত্যভাবাভিমানিনী দেবতা আজ আমাদের সমাজের অধিকাংশকেই এমনই শিক্ষা দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন যে, ইহা আর অনেকেরই নিকট মর্ম্মপীড়াদায়ক বলিয়া বোধ হয় না, পক্ষান্তরে অনেকেরই নিকট বড়ই বিজ্ঞতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হয়। অবশ্য, "বেদকে অপৌরুষেয় না বলিলে হিন্দু হয় না,"—এ কথায় হয়ত কেহ আপত্তি করিয়া বলিবেন—"কেন? নৈয়ায়িকও ত বেদকে পৌরুষেয়ই বলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি হিন্দু বলা অসঙ্গত? তাহা হইলে বলিব—নৈয়ায়িকের পৌরুষেয়ত্ব আর উক্ত পৌরুষেয়ত্ব একার্থক নহে। ইহা একটু অনুধাবন করিলেই বোধগম্য হইবে। অতএব এ আপত্তিও নিরর্থক।

(৬) তাহার পর ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্……
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"

এই মন্ত্রদ্বয়াংশকে যেন একটী মন্ত্রের ন্যায় উদ্ধার করিয়া তাহার যে অর্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাতে লেখকের কি ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তাহা সুধীগণেরই বিচার্য্য বিষয়। ইহার প্রথমার্দ্ধ পুরুষ সূক্তের ২য় মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধ। ইহার শেষার্দ্ধ উদ্ধৃত করা হয় নাই, ইহার পূর্ণাকার—

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ২

এবং উদ্ধৃত মন্ত্রের শেষার্দ্ধ পুরুষসূক্তের ৩য় মন্ত্রের শেষার্দ্ধ, এই ৩য় মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধ উদ্ধৃত করা হয় নাই। ইহার পূর্ণাকার—

"এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥" ৩

"অর্থাৎ যাহা কিছু ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই পুরুষের আত্মস্বরূপ…তাঁহার এক অংশ অমৃতলোকে বিরাজ করেন"। যদি বেদ অবলম্বন করিয়া কোন মতবাদ স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে ত বেদের অর্থটাও মোটামুটিভাবে বুঝা আবশ্যক। আচ্ছা, এখানে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইহার অর্থ "এক অংশ অমৃতলোকে বিরাজ করেন" ইহা কিরূপে হয়? যেখানে তিন পাদের কথা বলা হইতেছে, সেখানে এক পাদের কথা আসিল কিরূপে? যেখানে তিন পাদকে অমৃত বলা হইল, সেখানে "এক অংশ অমৃতলোকে" থাকে কি করিয়া? "অমৃতলোক"ই বা আসে কোথা

হইতে? ইহার প্রকৃত আক্ষরিক অর্থ—একপাদ এই সকল ভূত, আর তিন পাদ অমৃত, তাহা দিব্-পদবাচ্যে আছে। কিন্তু ইহার অর্থ করা হইল—"তাঁহার এক অংশ অমৃতলোকে বিরাজ করেন।" "অমৃত" শব্দটী পাদের বিশেষণ, তাহা ত "দিব্"পদবাচ্যের বিশেষণ নহে। অথবা কোন "লোক"শব্দ উহ্য করিয়া তাহারও বিশেষণ হইতে পারে না। ইহা কি অসাবধানতা? না অনভিজ্ঞতা? না দুরাগ্রহ? কি বলিতে হইবে?

তাহার পর দেখা যায় বলা হইয়াছে—"যাহা কিছু ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই পুরুষের আত্মস্বরূপ" এরূপ বলিলে বর্ত্তমানটীকে কি বাদ দেওয়া অভিপ্রেত? আচ্ছা, "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" এতদ্দ্বারাই কি বর্ত্তমানকে লক্ষ্য করা হয় নাই? এটী অর্থমধ্যে গৃহীত হয় নাই কেন? আর "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" বলিলে কি "এই সব পুরুষের আত্মস্বরূপ" বুঝায়? ইহাতে ত "এই সবকে" পুরুষই বলা হইল! পুরুষ বলা আর পুরুষের আত্মস্বরূপ বলা কি এক কথা? "আত্মা" শব্দটী ত এই বেদবাক্য মধ্যে নাই। উহা উহার অর্থমধ্যে আসে কি করিয়া? আর "আত্মা" এই শব্দটীর অর্থ দেহও হয় এবং স্বরূপ বা পরমাত্মাও হয়, এখানে কোন্‌টী অভীষ্ট? দেহ হইলে একরূপ ফল, পরমাত্মা হইলে অন্যরূপ ফল, আর পুরুষের আত্মস্বরূপ না বলিয়া "পুরুষই" বলিলে অন্যরূপ ফল হয়। যিনি বেদবাক্য-লইয়া একটা মতবাদ স্থাপন করিবেন, তিনি কি এই সব ভেদ উপেক্ষা করিতে পারেন? অবশ্য "পুরুষের আত্মা" বলিলে "দেহদেহিভাব" একটী পাওয়া যায় বটে, আর এইরূপে একটা ভেদ স্বীকার করিতে পারিলে "অচিন্ত্যভেদাভেদ" বা 'অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত"বাদস্থাপনে বেশ সুবিধা হয় বটে, কিন্তু তাহা অসঙ্গতই হইবে, এবং তাহাতে অদ্বৈতবাদেরও ক্ষতি নাই। অদ্বৈতমতে একথারও সামঞ্জস্য করিবার কৌশল আছে। কিন্তু শ্রুতিবলে কোন মতস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সুবিধা দেখিলে ত চলিতে পারে না। এরূপ করিলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কি বলিবেন?

যদি বলা যায়—এখানে যে "এক অংশ" বলা হইয়াছে, তাহা সংখ্যাকে লক্ষ্য করিয়া নহে, এবং যে "অমৃতলোক" বলা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের অবিকৃত নিত্যভাবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মের এক অংশেই এই অনাদি অনন্ত বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন স্থিত ও বিলীন হইতেছে, আর অপর অংশ নিজ অমৃতস্বরূপে বিরাজ করিতেছে—ইহাই তাৎপর্য্য। তাহা হইলে বলিব—ইহার প্রমাণার্থ যে বেদবাক্য প্রদর্শিত হইল, তাহার "যথাশ্রুত তাৎপর্য্যার্থ,"—তাহা হইলে ওরূপ হয় না বলিয়া, এতাদৃশ মতটী অবৈদিকই হইতেছে। এরূপ অর্থ শাঙ্করমতে করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি ত প্রবন্ধকর্ত্তার মতে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ, আর প্রবন্ধকর্ত্তা বলিয়াছেন যে, তিনি এই সকল বেদবাক্যের অর্থ কোন মতে বা কোন ভাষ্যানুসারে করিতেছেন না। অতএব নিজমতের সিদ্ধির জন্য গোপনে শাঙ্করব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে লোকে কি বলিবে?

যদি বলা যায় অন্য যে সব বেদবাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাদের অর্থের সহিত একতা করিলে ঐরূপ অর্থই লব্ধ হইবে, শাঙ্করব্যাখ্যা গৃহীত হয় নাই। তাহা হইলে বলিব—ইহাও সঙ্গত কথা হয় না। কারণ, এই শ্রুতির আক্ষরিক অর্থ ত অন্যরূপ হইতেছে। যেহেতু ইহার অর্থ—এক অংশে সর্ব্বভূত আর অপর তিন অংশ অমৃত এবং 'দিবে' অর্থাৎ স্বর্গে বা আকাশে অবস্থিত। আক্ষরিক অর্থ লইয়াই ত অপর শ্রুতির সহিত একবাক্যতা করিতে হইবে, আক্ষরিক অর্থকে ত্যাগ করিয়া তাহা করা উচিত নহে।

যদি বলা যায়—একবাক্যতার অনুরোধে যেটুকু ত্যাজ্য, তাহাই ত্যাগ করিয়া ঐরূপ অর্থ লব্ধ হইয়াছে, তাহা হইলে বলিব—আমরা এস্থলে একটুকুও ত্যাগ না করিয়া অপর শ্রুতির সহিত একবাক্যতা করিতে পারি, আর তাহাতে অদ্বৈতবাদেরও কোন হানি হয় না। প্রত্যুত তাহাতে অদ্বৈতবাদ সিদ্ধই হয়। কারণ, আমরা বলিব—ইহা ব্রহ্মের বিরাট্ পুরুষরূপের কথা, আর ইহার এক অংশ এই ভূলোকের যাবৎ বস্তু, আর অবশিষ্ট অংশ এতদপেক্ষা বৃহৎ, তাহা অমৃতপদবাচ্য দেবতাদিও স্বর্গাদি লোকসমুদায়, ইত্যাদি—শাঙ্করব্যাখ্যা না হয়, নাই গ্রহণ করিলাম। যদি কোন প্রাচীন অবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের অর্থ গ্রহণ না করা যায়, যদি স্বাধীনতা গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সকলরূপ ব্যাখ্যাই হইতে পারে, এবং সকলরূপ ব্যাখ্যায় আপত্তিও করা যাইতে পারে। আর এই বিবাদের শেষই হইতে পারে না। এজন্য বেদেও ব্রহ্মার প্রবর্ত্তিত সাম্প্রদায়িক অর্থের গ্রহণই রীতি। আর ইহাই বর্ত্তমানে মীমাংসা ও শাঙ্করসম্প্রদায়ে যতটা প্রামাণিক, এতটা আর অন্য সম্প্রদায়ে নহে। অতএব এই প্রাচীন সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া বেদার্থনিরূপণ সাহসভিন্ন আর কিছুই নহে। সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাগ্রহণ এরূপ স্থলে কেন প্রয়োজন, তাহার প্রতি বহু যুক্তিই আছে, এস্থলে তাহা বাহুল্যভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

তাহার পর বলা হইয়াছে—"যাহা কিছু ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই পুরুষের আত্মস্বরূপ"। আচ্ছা, এই কথাটাই বা কি করিয়া সঙ্গত হয়? যাহা কিছু ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই পুরুষের আত্মা হইলে পুরুষ হইলেন—সেই ভূত ও ভবিষ্যৎ যাবদ্ বস্তুর দেহস্থানীয়, আর সেই পুরুষরূপ দেহের আত্মা হইল—এই বিকারী বা পরিবর্ত্তনশীল জগৎ। আচ্ছা, আত্মা বিকারী বা পরিবর্ত্তনশীল হইলে তাহার দেহ অবিকারী অপরিবর্ত্তনশীল কি করিয়া হয়? যাঁহারা বিশ্বের সহিত ভগবানের দেহদেহিভাব স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা এই "ভূত ভবিষ্যৎ যাহা কিছুকে" পুরুষের দেহই বলিয়াছেন, আত্মা বলেন নাই। এই অভিনব সিদ্ধান্তটী কি পাশ্চাত্য জগৎ হইতে আমদানী করা হইয়াছে? আহা! এরূপ ব্যক্তিও আবার দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করেন! আর ইঁহাদের দার্শনিকতা আবার অপরে শিক্ষা করে! ধন্য কলির মহিমা!

আচ্ছা, এই শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে পাদকে জগৎ বলা হইল, সেই পাদটীকে কি বিকারী বলা হইল না? কিন্তু অন্য শ্রুতিতে যে ব্রহ্মকে "অব্যয়" বলা হইয়াছে, তাহার গতি তাহা হইলে কি হইবে? যদি বলা হয়—"যে ত্রিপাদ" অমৃত, তাহাকেই "অব্যয়" বলা হইয়াছে—বলিব? তাহা হইলে ব্রহ্মকে যে "অখণ্ড" বলা হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার গতি কি হইবে? যাহা অখণ্ড তাহার আবার পাদবিভাগ কিরূপে হইবে? যদি বলা হয়—"পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" এই শ্রুতিবলে, ব্রহ্মের একপাদ বিকারী হইয়াও ব্রহ্মকে 'অব্যয় অখণ্ড" বলিব? তাহা হইলে বলিব—"পুরুষ এব ইদং সর্ব্বং" অর্থাৎ পুরুষই এই সব বলায়, অর্থাৎ "এব" পদদ্বারা সেই অংশকল্পনা নিষিদ্ধই হইতেছে।

যদি বলা হয়—যে শ্রুতিতে "পুরুষ এব" বলা হইয়াছে, সেই শ্রুতিতেই "পাদ" বর্ণনা আছে, অতএব পাদকল্পনা নিষিদ্ধ কেন হইবে? তাহা হইলে বলিব "ইহা ঠিক্ সেই শ্রুতিতে নাই, পরবর্ত্তী শ্রুতিতে আছে। আর "ইদং সর্ব্বম্" বাক্যের "সর্ব্বম্" পদ দ্বারা ' এব" অর্থেরই প্রাধান্য হইতেছে। অর্থাৎ পুরুষ ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহাই দৃঢ়তাসহকারে বলা হইল। অন্য কথায় "এই সব" অর্থাৎ ব্রহ্মের তিন পাদ ও একপাদ সকলই পুরুষই, অন্য কিছুই নহে—ইহাই বলা হইল। এখন "এব" ও

"সর্ব্বম্" পদদ্বারা যে একমাত্র পুরুষভাবটী বুঝাইতেছে, "পাদ" শব্দদ্বারা তাহার অংশকল্পনা করায় তদ্ভিন্ন বস্তুস্বীকার আবশ্যক হয়। কারণ, বিজাতীয় বস্তুভিন্ন অংশকল্পনা সম্ভব হয় না যেমন বৃক্ষের শাখাদির জন্য বৃক্ষের বিজাতীয় আকাশ আবশ্যক; এইরূপে পাদশব্দদ্বারা তাহার বিরুদ্ধভাব বুঝাইলেও তাহা দুর্ব্বলই হইবে। আর দুর্ব্বল হওয়ায় পুরুষভাবটীই পারমার্থিক এবং পাদভাবটী অপারমার্থিক—ইহাই বলিতে হইবে। আর এই অবস্থায় "অখণ্ড" ও "অব্যয়" শ্রুতির অর্থ ইহার সহিত মিলিত করিলে একমাত্র পুরুষই সত্য, আর তাহার পাদকল্পনা মিথ্যা, অর্থাৎ কল্পিতই বলিতে হয়।

তাহার পর, যে শ্রুতি কর্ম্মকাণ্ডে বা উপাসনাকাণ্ডে থাকে, তাহা জ্ঞানকাণ্ডের শ্রুতি অপেক্ষা তত্ত্বনির্ণয়বিষয়ে দুর্ব্বল। তদ্রূপ যে শ্রুতি কর্ম্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—এই তিনটী স্থলেই থাকে, তাহাও কেবল জ্ঞানকাণ্ডের শ্রুতি অপেক্ষা তত্ত্বনির্ণয়বিষয়ে দুর্ব্বল। নচেৎ জ্ঞানকাণ্ডের শ্রুতি নিরবকাশ হইয়া যায়। এস্থলে "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" এই পুরুষসূক্ত শ্রুতিটী তিন কাণ্ডেরই শ্রুতি যদিও হয়, তাহা হইলে তাহা "অখণ্ড অব্যয়" এই জ্ঞানকাণ্ডের শ্রুতি অপেক্ষা দুর্ব্বলই হইবে। কারণ, ইহা জ্ঞানকাণ্ডেরই শ্রুতি। অর্থাৎ "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" এই মিশ্রশ্রুতিটী অমিশ্র "অখণ্ড অব্যয়" শ্রুতির অর্থের অন্যথা করিতে পারিবে না। কিন্তু "অখণ্ড অব্যয়" শ্রুতি অনুসারে "পুরুষ এবেদং" শ্রুতিরই অর্থের অন্যথা করিতে হইবে, অর্থাৎ ইহারই অর্থ সংকোচ করিতে হইবে। আর তাহা হইলে ব্রহ্মের পাদবিভাগকে উপাসনার্থ কল্পিত বলিয়া অর্থাৎ তত্ত্বনির্ণায়ক নহে বলিয়াই অর্থসমন্বয় করিতে হইবে। কর্ম্মকাণ্ডের শ্রুতির উদ্দেশ্য কর্ম্ম, এজন্য তাহা কর্ম্মেরই অঙ্গ, অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মকালে ঐ শ্রুতি পাঠ করিলে সেই যজ্ঞাদি কর্ম্ম সিদ্ধ হয়। তদ্রূপ উপাসনাকাণ্ডের শ্রুতির উদ্দেশ্য উপাসনা অর্থাৎ উপাস্যদেবের মহিমা প্রভৃতি কীর্ত্তনদ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি হয়। তত্ত্বনির্ণয় ইহাদের উদ্দেশ্য নহে। তত্ত্বনির্ণয় কেবল জ্ঞানকাণ্ডের শ্রুতিরই উদ্দেশ্য। এস্থলে "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং" শ্রুতি উপাসনাকাণ্ডের বা কর্ম্মকাণ্ডের শ্রুতি। গীতামধ্যে এই শ্রুতির অর্থ অনুবাদ করিয়া বলা হইয়াছে "একাংশেন স্থিতো জগৎ"। গীতার এই বাক্য যে উপাসনার্থ উক্ত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট। বস্তুতঃ "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" ইহা ব্রহ্মের মহিমাস্বরূপ বিরাট্ রূপের বর্ণনা। ইহা শুদ্ধব্রহ্মের অথবা সর্ব্বকারণকারণের স্বরূপপরিচয়ার্থ উক্ত নহে। আর তাহা ইহার অর্থ হইতেও বুঝায়। কারণ, ইহাতে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রার্থের ন্যায় অর্থাৎ "যাহা হইতে এই সকলের জন্ম স্থিতি লয়" না বলিয়া "ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পুরুষই" এইভাবে পুরুষস্বরূপ বর্ণন করায় পুরুষের মহিমাবর্ণনের প্রতি লক্ষ্যই অধিক ইহাই বুঝাইতেছে। অতএব এই ব্রহ্মের মহিমাবোধক শ্রুতি, কখনই ব্রহ্মের স্বরূপবোধক "অব্যয় অখণ্ড" শ্রুতির বাধক হইতে পারে না। ইহা কর্ম্ম ও উপাসনাকাণ্ডের শ্রুতি আর "অখণ্ড ও অব্যয়" ইহা জ্ঞানকাণ্ডের শ্রুতি।

বস্তুতঃ "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥" এইটী পুরুষসূক্তের দুইটী মন্ত্রের সংমিশ্রণ বা বিকৃতি। এই পুরুষসূক্ত কর্ম্মকাণ্ডের সময় পাঠ করিতে হয়। ইহার প্রয়োগকথা গ্রন্থান্তরেই কথিত হইয়াছে। আর কোনও উপনিষদ্মধ্যে এই বাক্যটী ঠিক্ ঐ ভাবেও নাই। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে (৩।১৫) আছে "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম। উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥" ছান্দোগ্যোপনিষদে (৩।১২।৬)

তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥" মুণ্ডকে (২।১।১০) আছে—"পুরুষ এবেদং বিশ্বম্ কর্ম্মতপোব্রহ্মপরামৃতম্। এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য॥"

এস্থলে দেখা যাইবে, উক্ত পুরুষসূক্তোক্ত "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্। পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যাঽমৃতং দিবি॥" এই ভাবে পুরুষসূক্তে বা কোন উপনিষদ্‌মধ্যে নাই। আর উহার এক এক অংশ উপনিষদ্ মধ্যে থাকিলেও যেস্থলে তাহা আছে সেস্থলে উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু লেখক পুরুষসূক্তের ২য় ও ৩য় মন্ত্রের যথাক্রমে প্রথমার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধ মিলিত করিয়া ইহার আকারগত এমন একটী পরিবর্ত্তন করিলেন, যে সাধারণ পাঠক শুনিবামাত্র ভাবিবেন—এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয়ই প্রদত্ত হইতেছে। আমাদের মিত্রপ্রবরের বুদ্ধিকৌশল বাস্তবিকই প্রশংসার্হ, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ইহা, সহজ ও প্রসিদ্ধ পথ পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং দুরাগ্রহ কলুষিত হইয়াছে। উপনিষদের ভিতর উপাসনা ও জ্ঞান এই দুইটী বিষয় আছে তাহা অভিজ্ঞগণ জানেন। অতএব ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের বাক্যদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয় করা সঙ্গত হয় নাই।

অবশ্য এখানে একটী আপত্তি হইতে পারে, তাহা এই যে, "অখণ্ড" ও "অব্যয়"শব্দ কি কর্ম্ম ও উপাসনাকাণ্ডে কোথাও নাই, যে, উহা নিরবকাশ হইবে বলিয়া উহাকে বলবতী শ্রুতি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে? তাহা হইলে ইহার উত্তর এই যে, "অখণ্ড" ও "অব্যয়" শব্দ কর্ম্ম বা উপাসনা কাণ্ডে থাকিলে উহাকে তখন স্বরূপপর করিয়া বুঝিতে হইবে না। কারণ, জ্ঞানকাণ্ডে উহাকে স্বরূপপর করিয়াই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। যেহেতু জ্ঞানকাণ্ডে অপর বহু নিষেধ পর-শ্রুতিই আছে, তাহাদের সহিত ইহার সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্টই হয়। অতএব এই পুরুষসূক্তদ্বারা অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদস্থাপন সুবিধা নহে।

আর যদি বলা হয়—যুক্তিবলে, এক অংশ বিকারী হইলেও পুরুষের নখ ও কেশের ন্যায় তাহাকে ব্রহ্মেরই অংশ বলিব, তাহা হইলে বলিব—ইহা যুক্তিবলে সিদ্ধই হয় না। কারণ, পুরুষের নখ ও কেশ পুরুষের দেহের অংশ। পুরুষের দেহ ও পুরুষ পৃথক্ বস্তু। দেহের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু পুরুষের পরিবর্ত্তন হয় না। পুরুষ, দেহকে "আমি" বলিয়া ব্যবহার করিলেও সে জানে যে, 'আমি' যথার্থতঃ দেহ নহি, অতএব যুক্তিবলে "অখণ্ড অব্যয়" শ্রুতির সংকোচ সম্ভাবিত নহে। সুতরাং "পুরুষ এবেদং সর্ব্বং" বাক্যের অর্থ—"এই সব পুরুষের আত্মস্বরূপ" অথবা "এই সকলের আত্মস্বরূপ পুরুষ" এরূপ অর্থ করিয়া কোন লাভ নাই।

আর যদি বলা যায়—"পুরুষ এবেদং সর্ব্বং" বাক্যে পুরুষকেই যখন 'এই সব' বলা হইতেছে, তখন 'এই সবকে' কল্পিত বলিব কেন? পুরুষেরই ন্যায় সত্যই বলিব? তাহা হইলে বলিব, তাহা সঙ্গত হইবে না; কারণ, কল্পিত না বলিলে বিকারীই বলিতে হইবে। যদি ব্রহ্ম হইতে জগদুৎপত্তি মানিতে হয়, তবে কল্পিত বা বিকারী বলা ছাড়া আর উপায় নাই। কিন্তু বিকারী বলিলে ব্রহ্মকে অনিত্য সুতরাং মিথ্যা বলিতে হইবে, আর কল্পিত বলিলে সে সব দোষ নাই। অতএব কল্পিতই বলিতে হইবে। যে বস্তু বিকারশীল, তাহার স্বরূপ নির্ণয় হয় না, এজন্যই তাহাকে অনিত্য বা অনির্ব্বচনীয় বলা হয়, আর অনির্ব্বচনীয়কেই মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যার অর্থ বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অসৎ নহে। দৃশ্যমান অসদ্‌বস্তুর নামই মিথ্যা। দৃশ্যমান্ অসদ্‌বস্তু সৎও নহে অসৎও নহে।

যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ

(৬)

(স্বামী বিশুদ্ধানন্দ)

কহোল নীরবে স্বীয় আসনে উপবেশন করিলে, সেই ব্রাহ্মণমণ্ডিত সভা কিয়ৎ ক্ষণের জন্য নীরব হইল। আর কোন ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিতে অগ্রসর হয় না দেখে, বচক্নু ঋষির দুহিতা বাচক্নবী গার্গী নিঃশঙ্কচিত্তে যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখীন হ'লেন। সেকালের মেয়েরা ত আর একালের মেয়েদের মত ছিল না। সেকালের মেয়েরা পর্দ্দানশীন ছিল না; কিন্তু তাই ব'লে তারা চুল কেটে, বুটপরে পুরুষের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে শালীনতা ত্যাগ ক'রত না। পুরুষের বৃত্তি ও তারা সর্ব্বপ্রকারে অপহরণ করবার চেষ্টাও ক'রত না। অনেক মেয়ে বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা হইয়া ঋষিত্বলাভও করেছিলেন। অনেকেই ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস, শিল্প, কলা বিদ্যায় পণ্ডিতা ছিলেন। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরাও শিক্ষা লাভ ক'রতেন। সবই ঠিক, সবই সত্য। কিন্তু তাঁদের সে শিক্ষা তাঁহাদিগকে, বিনয়, সদাচার, হৃদয়ের কোমলতা, সত্যনিষ্ঠা, স্বামী, পিতামাতা, পুত্র পরিবারের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসাই শিক্ষা দিত। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা কি স্ত্রী কি পুরুষ তাহাদের কাহাকেও মনুষ্যত্ব লাভের, আত্মশক্তির পূর্ণ বিকাশের উপযুক্ত অধিকারী করিয়া তুলিতে অসমর্থ। বর্ত্তমান শিক্ষা কি পুরুষ, কি স্ত্রী সকলকেই উচ্ছৃঙ্খল, ভোগবিলাসী করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু, সেই সময়, মুনি ঋষিরা শিক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন। এক অপরা আর এক পরা। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে সব শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সব শিক্ষা অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। কিন্তু তখনও ছেলে মেয়েদিগকে অপরা বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হ'ত। কিন্তু, সে শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হ'ত পরা বিদ্যা দ্বারা, পরা বিদ্যাই ছিল সমাজের লক্ষ্য। এই পরা বিদ্যা হ'চ্চে সেই বিদ্যা, যে বিদ্যা দ্বারা নিজের আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। তাই, সেই সময় বড় বড় ত্যাগী বড় বড় জ্ঞানী স্ত্রী পুরুষ সমাজকে অলঙ্কৃত করেছিলেন। ব্রহ্ম বিদ্যায়ও স্ত্রীলোক অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। তখনকার ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গার্গীর স্থান অতি উচ্চে ছিল। এমন কি জনক রাজার সেই বেদজ্ঞ ব্রহ্মবিদ ব্রাহ্মণ সভাতেও গার্গী নিমন্ত্রিতা হ'য়ে এসেছিলেন। গার্গী সেই সভাতে যে চুপ করে বসে ছিলেন তা নয় প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব যাহাতে নির্নীত হয় সে বিষয়ে তিনি সভাকে যথেষ্ট সাহায্যও করেছিলেন। সেই জন্য, যখন কহোল পরাস্ত হ'য়ে মনের দুঃখে নিজের আসনে বসে পড়লেন, তখন এই মনঃস্বিনী, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী নির্ভয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন "আচ্ছা যাজ্ঞবল্ক্য বল দেখি এই যে স্থূল জগৎ যাহা অন্তরে বাহিরে সর্ব্বতোভাবে অপ্ অর্থাৎ জলরাশি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, যে জলে এই পৃথিবী ওত প্রোত হয়ে রয়েছে। সেই জল আবার কিসে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে?

যাজ্ঞবল্ক্য—হে গার্গি, তুমি যে জলের কথা বলেছ, সেই জল বায়ুতে ওত প্রোত হ'য়ে আছে।

গার্গী—সেই বায়ু আবার কোথায় ওত প্রোত হয়ে আছে?

যাজ্ঞবল্ক্য—বায়ু অন্তরীক্ষ লোকে ওত প্রোত হ'য়ে আছে।

গার্গী—অন্তরীক্ষ লোক আবার কোথায় ওত প্রোত হ'য়ে আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য—অন্তরীক্ষ লোক গন্ধর্ব্বলোকে ওত প্রোত হ'য়ে আছে।

গার্গী—গন্ধর্ব্বলোক কোথায় ওত প্রেত হ'য়ে আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য—আদিত্য লোকে।

গার্গী—আদিত্য লোক কোথায় ওত প্রোত হয়ে আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য—চন্দ্রলোকে।

গার্গী—চন্দ্রলোক কোথায় ওত প্রোত হ'য়ে আছে ?

যাজ্ঞবলল্ক্য—নক্ষত্রলোকে।

গার্গী—নক্ষত্র লোক আবার কেথায় ওত প্রোত হ'য়ে আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য দেব লোকে।

গার্গী—দেব লোক কোথায় ওত প্রোত হ'য়ে আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য—ইন্দ্র লোকে।

গার্গী—ইন্দ্র লোক কোথায় ওত প্রোত হ'য়ে আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য—প্রজাপতি লোকে।

প্রজাপতি লোক আবার কোথায় ওত প্রোত হ'য়ে আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য—ব্রহ্ম লোকে।

গার্গী—ব্রহ্ম লোক কোথায় ওত প্রোত হ'য়ে আছে ?

যাজ্ঞবল্ক্য—গার্গি, অতিপ্রশ্ন কোরো না। যে দেবতার সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করছ, সে দেবতা অনুমানগম্যা নয়। তুমি যদি এইরূপ অনুচিত প্রশ্ন কর, তাহলে তোমার মস্তক খসিয়া পড়িবে। কেন মারা যাবে গার্গি! যদি বেঁচে থাকতে ইচ্ছে কর তাহলে এইরূপ অতিপ্রশ্ন আর কোরোনা।

যাজ্ঞবল্ক্যের চোখ রাঙানীতে গার্গী কিন্তু আদৌ ভয় পেলেন না। যিনি ব্রহ্মবাদিনী সর্ব্বত্রই যাঁর ব্রহ্মদৃষ্টি, জন্ম মৃত্যু যাঁর নিকট অসৎ, মনের স্পন্দন মাত্র, তিনি কি আর মৃত্যুকে ভয় করেন ? তিনি সেই শত শত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যস্থলে নির্ভয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গার্গীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যাজ্ঞবল্ক্য একটু হেসে বল্লেন "গার্গী, তুমি যে দেবতা সম্বন্ধে, যে আত্মা বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছ, সেই আত্মা বা ব্রহ্ম শুধু আগমগম্য, কেবল বেদপ্রতিপাদ্য। বেদ শুধু "এক মেবাদ্বিতীয়ং", "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম", 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', "তৎ ত্বমসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই সব বাক্য দ্বারা সেই বাক্য মনের অগোচর নির্ব্বিশেষ আত্মতত্ত্বকে ঠারেঠোরে জানিয়ে গেছেন। এই আত্ম সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন ক'রতে হয়, তাহলে সেই প্রশ্নের প্রণালী, রীতি অন্য রকম। তুমি শুধু অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে আমাকে প্রশ্ন ক'রচ। কিন্তু, গার্গি, তুমি নিজে ব্রহ্মবাদিনী, তোমার একটা বুঝা উচিত ছিল যে আত্মা অপ্রমেয়। আত্মা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় নন। আর যখন অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে, তখন অনুমানের দ্বারা কেমন ক'রে আত্মতত্ত্ব নির্ণীত হ'তে পারে গার্গি ? আমাদের যত কিছু জ্ঞান হ'চ্ছে সবই বৃত্তিজ্ঞান। ঐ যে সিংহাসনের উপর মহারাজ জনক বসে আছেন, ঐ সিংহাসনের জ্ঞান

প্রত্যক্ষ জ্ঞান। আমাদের চোখে ঐ সিংহাসনের ছবি পড়ছে, আর চিত্ত ঐ সিংহাসনরূপে পরিণত হ'চ্চে। চিত্তের এই যে বিষয়াকারে পরিণাম, এই টেই হ'চ্চে বৃত্তি। আমাদের যত কিছু জ্ঞান, সব এই বৃত্তি বিশিষ্ট হয়ে হ'চ্চে। এই জ্ঞানে অজ্ঞান ব্যবধান রয়েছে। কিন্তু, গার্গি, আত্মা বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ। আত্মজ্ঞানে কোন ব্যবধান নেই। ইহা বৃত্তিবিশিষ্ট নয়। তাই বলচি, গার্গি, যে জিনিষটা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ, যে বস্তুট কোন প্রমাণের বিষয় নয়, সেই জিনিষটাকে তুমি অনুমানের দ্বারা প্রতিপাদিত করতে ইচ্ছে করেছ, সেই জন্য তোমার প্রশ্ন অতি-প্রশ্ন ; ব্রহ্মবিদ্ সমাজে এই অতিপ্রশ্ন কারীর মস্তক খসে পড়ে, তার অপমান হয়। তোমার প্রশ্নের সার মর্ম্ম হ'চ্চে এই যে, প্রত্যেক কার্য্য তার কারণে ওতঃপ্রোত হয়ে আছে ; ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ এই যে পঞ্চভূত ইহারা নিজ নিজ কারণে ওত প্রোত হ'য়ে আছে। ক্ষিতি, জলে ; জল বায়ুতে, বায়ু আকাশে ; এবং এই স্থূল, সূক্ষ্ম পঞ্চভূত নির্ম্মিত, অন্তরীক্ষ লোক, দেব লোক, ইন্দ্র লোক, গন্ধর্ব্ব লোক সবই স্ব স্ব কারণে ওত প্রোত, আবার এই সব ব্রহ্ম লোকে ওত প্রোত আছে। ব্রহ্ম লোক কিসে ওত প্রোত আছে? এ প্রশ্ন তোমার অতি প্রশ্ন, গার্গি। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হ'লে ব'লতে হয় ব্রহ্ম লোক আত্মাতে ওত প্রোত হ'য়ে আছে। কিন্তু এই যে উত্তর এটা অবৈদিক। কারণ শ্রুতি বলেন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নাই। এই ব্রহ্ম অনন্তর, অবাহ্য, নিরবয়ব, পূর্ণ, স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয়, ভেদ রহিত, সুতরাং তাতে ভেদ কেমন করে থাকবে? তাই বলি গার্গি, তুমি এইরূপ অতি প্রশ্ন ক'রে বিদ্বদ্ সমাজে নিন্দনীয় হ'য়ো না। যাজ্ঞবল্ক্যের কথায় গার্গী স্বীয় আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন।

গার্গীকে স্বীয় আসনে উপবেশন ক'রতে দেখে ব্রহ্মবিদ্ উদ্দালক আরুণি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ, মুখ, সমস্ত দেহ দিয়েই ব্রহ্মতেজ ফুটে বেরুচ্চে। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, জ্ঞানের গভীরতায়, বেদে পারদর্শিতায় তিনি সেই সময়কার ঋষি সমাজে অতি উচ্চ স্থানই অধিকার করেছিলেন। এ হেন ব্রহ্মবিদ্ উদ্দালক আরুণি যখন যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখীন হ'লেন, তখন সেই সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগের ম্লানমুখে ঈষৎ হাসির রেখা ফুটে উঠল। উদ্দালক আরুণি কি বলেন তাই শোনার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইলেন। তখনকার ব্রাহ্মণ সভা এখনকার সভার মত ছিল না। সকলেই সভায় গিয়ে এক সঙ্গে গোলমাল করতেন না ; সকলেই এক সঙ্গে নিজের মত প্রকাশ করতে চেষ্টা করতেন না। একজন যখন নিজের মত প্রকাশ করেছেন তখন আর পাঁচজন তাঁকে বাধা দিয়ে স্ব স্ব মত ব্যক্ত ক'রে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি ক'রতেন না। তখন সভাস্থ সকলেরই উদ্দেশ্য ছিল সত্য নির্ণয়, আর এখনকার সভাস্থ লোকদিগের উদ্দেশ্য হ'চ্চে যেন তেন প্রকারেণ নিজ নিজ জেদ বজায়। তাই যখন উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করার জন্য অগ্রসর হলেন তখন সভার সেই শত শত ব্রাহ্মণ নীরবে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলেন।

উদ্দালক আরুণি অগ্রসর হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যাজ্ঞবল্ক্য, আমরা এক সময়, মদ্রদেশে যজ্ঞবিদ্যা অধ্যয়ন করিবার জন্য পতঞ্চলের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলাম। পতঞ্চলের স্ত্রী গন্ধর্ব্বাবিষ্টা ছিলেন। সেই গন্ধর্ব্বকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম "তুমি কে?" এই প্রশ্ন শুনে সেই গন্ধর্ব্ব আমাদিগকে বলেছিলেন "আমি অথর্ব্বনের পুত্র, কবন্ধ"। আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সেই গন্ধর্ব্ব পতঞ্চল এবং সেখানে যে সব অন্যান্য ঋত্বিকগণ ছিলেন তাঁহাদিগকে এক

প্রশ্ন করেছিলেন। সেই প্রশ্নটা এই :—"হে পতঞ্চল, তুমি কি সেই সূত্রকে জান যাহা দ্বারা ইহলোক, পরলোক এবং সমুদয় ভূত গ্রথিত হইয়া আছে?" গন্ধর্ব্বের প্রশ্ন শুনে পতঞ্চল বলেছিলেন, "হে ভগবন্, আমি জানিনা।" তখন সেই গন্ধর্ব্ব পতঞ্চল ও উপস্থিত যাজ্ঞিকদিগকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন "ওহে, তোমরা কি সেই অন্তর্যামীকে জান, যিনি সকলের অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া, ইহলোক, পরলোক এবং ভূত সমুদয়কে নিয়মিত করিতেছেন?" গন্ধর্ব্বের এই প্রশ্নে সকলেই নির্ব্বাক্। তখন পতঞ্চল হাতযোড় ক'রে বললেন "ভগবন্ এই অন্তর্যামী পুরুষ সম্বন্ধে আমি ত কিছুই জানিনা"। তখন সেই গন্ধর্ব্ব তথায় উপস্থিত ঋত্বিকগণ ও পতঞ্চলকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন "শোনো, তোমরা সকলেই শোনো, যে ব্যক্তি এই সূত্র এবং অন্তর্যামীকে জানেন তিনিই ব্রহ্মবিৎ, তিনিই লোকবিৎ, তিনিই দেববিৎ, তিনিই বেদবিৎ, তিনিই ভূতবিৎ, তিনিই আত্মবিৎ, তিনিই সর্ব্ববিৎ।" শোনো যাজ্ঞবল্ক্য, এই সূত্র এবং অন্তর্যামী যে কে তা সেই গন্ধর্ব্ব আমাদিগকে বলেছিলেন। বুঝেছ, যাজ্ঞবল্ক্য, আমি সেই সূত্র ও অন্তর্যামীকে জানি। এখন তোমাকে আমি বলচি তুমি যদি সেই সূত্র ও অন্তর্যামীকে না জেনে ব্রহ্মজ্ঞের প্রাপ্য এই গাভীগুলি নিয়ে যাও, তাহলে তোমায় আমি নিশ্চয় বলে রাখচি যে আমার শাপে তোমার মাথা খ'সে পড়বে।" উদ্দালক আরুণির এই প্রশ্ন শুনে যাজ্ঞবল্ক্য গম্ভীর ভাবে ব'ললেন "উদ্দালক, সেই সূত্র ও অন্তর্যামীর যে তত্ত্ব, গন্ধর্ব্ব তোমাকে বলেছিলেন, আমি সেই সূত্র ও অন্তর্যামীকে বিলক্ষণ জানি।" যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনে আরুণি হো হো ক'রে হেসে, সমবেত ব্রাহ্মণগণ ও মহারাজ জনককে সম্বোধন ক'রে ব'লে উঠলেন "শুনুন মহারাজ, ব্রাহ্মণগণ, আপনারাও শুনুন, এই হাম্‌বড়া যাজ্ঞবল্ক্যের বালকের মত কথা। যাজ্ঞবল্ক্য, শুধু কথায় তুমি আমাকে ভুলাতে পারবে না; শুধু "জানি" ব'ল্লে হবে না। এই সূত্র ও অন্তর্যামী সম্বন্ধে কি জান তা এই সভার সমক্ষে স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে বল"।

আরুণির কথায়, যাজ্ঞবল্ক্য বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হ'য়ে গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন "আরুণি, তোমার অভিশাপে আমি বিন্দুমাত্রও ভীত নহি। আমি আদৌ বালকের ন্যায় কথা বলিনি। সত্যের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, নিষ্ঠা নেই, সেই অসত্যবাদীরাই শাপে ভীত হয়। কিন্তু এটা জেনো উদ্দালক, যে, যাজ্ঞবল্ক্যের মুখ থেকে সত্য ছাড়া কখন মিথ্যা বেরোই নি। এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোনো। গৌতম, যে সূত্রের কথা গন্ধর্ব্ব তোমাকে বলেছিলেন, বায়ুই সেই সূত্র। হে গৌতম, হে উদ্দালক, সেই বায়ুরূপ সূত্র দ্বারা ইহলোক, পরলোক, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় ভূত গ্রথিত রয়েছে। এই জন্যই গৌতম, লোক যখন মরে যায়, তখন সেই মৃত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া লোকে ব'লে থাকে যে, এই মৃত ব্যক্তির হাত, পা, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একেবারে শিথিল হ'য়ে গেছে। কেন ঐ কথা বলে তা জান আরুণি? ঐ কথা বলে কারণ, বায়ুরূপ সূত্র দ্বারাই সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিধৃত হ'য়ে থাকে, আর সেই বায়ু তখন চলে যায়, তাই লোকে ঐ কথা বলে। এই যে বায়ু, ইনিই প্রাণ, ইনিই সূত্রাত্মা, ইনিই হিরণ্যগর্ভ। স্থূল, সূক্ষ্ম সমুদয় জগৎ ঘনীভূত হয়ে, একীভূত হ'য়ে, এই বায়ুতে, এই প্রাণে, এই সূত্রাত্মায়, এই হিরণ্যগর্ভে অবস্থিত। যাকে আমরা জীবন বলি, এই বায়ু, এই প্রাণই সেই জীবনী শক্তি। এই প্রাণই সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে, সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে, তন্মাত্র ও পঞ্চভূতরূপে, দেবতা, তির্য্যক্, নর, পশু, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি, প্রাণিরূপে, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ

প্রভৃতি লোক ও সেই সেই লোকস্থিত অধিবাসীরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে, ফুটে পড়েছে। মণিগণ যেমন এক সূত্রে গ্রথিত থাকে, ফুলগুলি যেমন এক সুতোয় গাঁথা থাকে, সেইরকম স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয় জগৎ এই বায়ুতে, এই প্রাণে বিধৃত রয়েছে। আরও দেখ গৌতম, আমাদের এই শরীরে প্রাণের খেলা। যখন সমুদয় ইন্দ্রিয়গণ মনে একীভূত হয়, মন যখন সুপ্ত, বুদ্ধি যখন চেষ্টাহীন, যখন আমরা কোন কামনা করি না, স্বপ্ন দেখি না, শুধু অঘোরে নিদ্রা যাই, সেই সুষুপ্তি অবস্থায় জাগরিত থাকে একমাত্র এই প্রাণ। এই প্রাণই নিজকে তখন প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ক'রে এই শরীরের ক্রিয়া ঠিক্ ঠিক্ বজায় রাখে। কিন্তু যখন এই প্রাণ নিষ্ক্রিয় হয়, প্রাণ বায়ু যখন আমাদের শরীরকে ত্যাগ করে, তখন আমরা বলি লোকটা মরে গেছে। এর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব শিথিল হ'য়ে গেছে। তাই বলি উদ্দালক, এই প্রাণ, এই বায়ুই সমস্ত জগৎকে বিধৃত করে আছে ব'লে, এই বায়ুই সেই সূত্র যার কথা সেই গন্ধর্ব্ব তোমাদিগকে বলেছিলেন।" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে আরুণি ত একেবারে অবাক্। যাজ্ঞবল্ক্যের উপর তখন তাঁর শ্রদ্ধা হ'ল। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে সম্বোধন ক'রে ব'ললেন "যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি ঠিকই বলেছ, এখন এই সূত্রেরও নিয়ামক, সমুদয় জগতের অন্তর্যামী পুরুষের তত্ত্বটী ভাল করে বুঝিয়ে দাও।"

যাজ্ঞবল্ক্য তখন ব'লতে লা'গলেন "শোনো উদ্দালক আমি বেশ স্পষ্ট করেই তোমাকে সেই অন্তর্যামী পুরুষের কথা বলচি।

"যিনি পৃথিবীতে আছেন, কিন্তু যিনি পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁকে জানে না, পৃথিবীই যাঁর শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার, আমার সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, অমৃত স্বরূপ।

যিনি জলে বিদ্যমান, অথচ যিনি জল নন্, জল যাঁকে জানে না, জল যাঁর শরীর, যিনি জলের অভ্যন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার, আমার, সর্ব্বভূতের আত্মা। তিনি অন্তর্যামী, অমৃত স্বরূপ।

যিনি অগ্নিতে বর্ত্তমান্, কিন্তু অগ্নি হইতে পৃথক, অগ্নি যাঁকে জানে না, অগ্নিই যাঁর শরীর, যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া অগ্নিকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার, আমার, সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যিনি অন্তরীক্ষে অবস্থিত, অথচ যিনি অন্তরীক্ষ নন্, অন্তরীক্ষ যাঁকে জানে না, অন্তরিক্ষই যাঁর শরীর, যিনি অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়া অন্তরীক্ষকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার, আমার, সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যিনি বায়ুতে আছেন, কিন্তু যিনি বায়ু হইতে পৃথক্, বায়ু যাঁকে জানে না, বায়ুই যাঁর শরীর, যিনি বায়ুর অভ্যন্তরে থাকিয়া বায়ুকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আমার, সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যিনি দ্যুলোকে বিদ্যমান্, দ্যুলোক হইতে যিনি পৃথক্, দ্যুলোক যাঁকে জানে না, দ্যুলোকই যাঁর শরীর, যিনি দ্যুলোকের অভ্যন্তরে থাকিয়া দ্যুলোককে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার, আমার, সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত, অবিনাশী।

যিনি আদিত্যে বর্ত্তমান থাকিয়া আদিত্য হইতে পৃথক, আদিত্য যাঁকে জানে না, আদিত্য

যাঁর শরীর, যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার, আমার, সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত।

যিনি দিক্ সমূহে অবস্থান করিয়া দিক্ সমূহ হইতে পৃথক, দিক্ সমূহ যাঁকে জানে না, দিক্ সমূহই যাঁর শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া দিক্ সমূহকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার, আমার এবং সর্ব্বভূতের আত্মা। তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই অমৃত অবিনাশী।

যিনি ঐ চন্দ্র তারকায় অবস্থিত, অথচ চন্দ্রতারকা হইতে ভিন্ন, চন্দ্র তারকা যাঁকে জানে না, চন্দ্র তারকাই যাঁর শরীর, যিনি চন্দ্র তারকার অভ্যন্তরে থাকিয়া চন্দ্রতারকাদিগকে নিয়মিত করেন, তিনিই অন্তর্যামী, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত।

যিনি আকাশে থাকিয়াও আকাশ হইতে পৃথক, আকাশ যাঁহাকে জানে না, আকাশই যাঁহার শরীর, যিনি আকাশের অভ্যন্তরে থাকিয়া আকাশকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার, আমার, সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি আঁধারে বিদ্যমান্ অথচ অন্ধকার হইতে পৃথক, অন্ধকার যাঁকে জানে না, অন্ধকার যাঁর শরীর, যিনি অন্ধকারের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্ধকারকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার, আমার, সর্ব্বভূতের আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি তেজে, আলোকে বর্ত্তমান, কিন্তু তেজ হইতে ভিন্ন, তেজ যাঁকে জানে না, তেজই যাঁর শরীর, যিনি তেজের অভ্যন্তরে বিদ্যমান্ থাকিয়া তেজকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।"

শোনো, উদ্দালক, তোমায় আবার বলি, যিনি জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে; যিনি অগ্নিতে, বায়ুতে, দ্যুলোকে; যিনি আকাশে, আঁধারে, আলোকে; যিনি সমস্ত অধিদৈবত বস্তুতে বিদ্যমান থাকিয়াও সেই সেই বস্তু হইতে ভিন্ন, সেই সেই অধিদৈবত বস্তু যাঁর শরীর এবং যিনি সেই বস্তুগুলির অভ্যন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত, তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার, আমার, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

শোনো, উদ্দালক, যিনি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান, অথচ সর্ব্বভূত হইতে পৃথক, ভূত সমুদয় যাঁকে জানে না, সমস্ত ভূত যাঁর শরীর, যিনি সমুদয় ভূতের অভ্যন্তরে বিদ্যমান থাকিয়া সমস্ত ভূতকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অবিনাশী, তিনিই অন্তর্যামী।

তিনি যে শুধু সমস্ত অধিদৈব এবং সমস্ত অধিভূত পদার্থের অন্তর্যামী, তা নয় উদ্দালক; বেশ মনোযোগ দিয়ে শোনো।

যিনি প্রাণে বিদ্যমান, অথচ প্রাণ হইতে ভিন্ন, প্রাণ যাঁহাকে জানে না, প্রাণই যাঁর শরীর, যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে থাকিয়াও প্রাণকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি বাক্যে বর্ত্তমান, কিন্তু বাক্য হইতে ভিন্ন, বাক্য যাঁকে জানে না, বাক্যই যাঁর শরীর, যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া বাক্যকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি চক্ষুতে আছেন, চক্ষু হইতে যিনি ভিন্ন, চক্ষু যাঁহাকে জানে না, চক্ষু যাহার শরীর যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে থাকিয়া চক্ষুকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অবিনাশী, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি কর্ণে বিদ্যমান, অথচ শ্রবণ হইতে পৃথক, শ্রবণেন্দ্রিয় যাঁকে জানে না, শ্রবণেন্দ্রিয় যাঁর শরীর, যিনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়কে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি মনে বর্ত্তমান, অথচ মন হইতে পৃথক, মন যাঁকে জানে না, মনই যাঁর শরীর, যিনি মনের অভ্যন্তরে থাকিয়া মনকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি ত্বগিন্দ্রিয়ে বিদ্যমান, অথচ ত্বগিন্দ্রিয় হইতে পৃথক, ত্বগিন্দ্রিয় যাঁহাকে জানে না, ত্বগিন্দ্রিয়ই যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া ত্বগিন্দ্রিয়কে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি বুদ্ধিতে বিদ্যমান, অথচ বুদ্ধি হইতে ভিন্ন; বুদ্ধি যাঁহাকে জানে না, বুদ্ধি যাঁহার শরীর ; যিনি বুদ্ধির অভ্যন্তরে থাকিয়া বুদ্ধিকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

যিনি রেতেতে, শুক্রে, প্রজনন শক্তিতে বিদ্যমান থাকিয়াও রেতঃ হইতে ভিন্ন, রেতঃ যাঁহাকে জানে না, রেতঃ যাঁহার শরীর, যিনি রেতঃ শক্তির অভ্যন্তরে থাকিয়া রেতঃকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অমৃত, তিনিই অন্তর্যামী।

কি অধিভূত, কি অধিদৈব, কি অধ্যাত্ম সমুদয় বস্তুতে তিনি বিদ্যমান থাকিয়া আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সকলকেই নিয়মিত করছেন। তাঁর সত্তায়, তাঁর প্রকাশে সমস্ত জগৎ আছে বলে বোধ হয়, সমস্ত জগৎ তাঁরই প্রকাশে প্রকাশিত। এই অন্তর্যামী পুরুষ স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ স্বরূপে তিনি চক্ষুতে সর্ব্বদা বিদ্যমান। ঘট যেমন সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে পারে না, সূর্য্য যেমন ঘটকে প্রকাশ করে, সেইরূপ চক্ষু শ্রোত্র তাঁকে প্রকাশ ক'রতে পারে না ; তিনিই চক্ষু শ্রোত্রকে প্রকাশ করেন, স্বপ্রকাশ রূপে চক্ষু শ্রোত্রে নিত্য বিদ্যমান থাকায় তিনি অদৃষ্ট হইয়াও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়াও শ্রোতা। মন তাঁহাকে জানিতে পারে না, অমত হইয়াও তিনি মন্তা, বাহ্য ঘট পটাদির ন্যায়, এবং সুখ দুঃখাদির ন্যায় তিনি বুদ্ধির বিষয়ীভূত হন না। কিন্তু অবিজ্ঞাত হইয়াও তিনিই বিজ্ঞাতা। এই অন্তর্যামী ব্যতীত অন্য কেহই দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা নাই, এই অন্তর্যামী ব্যতীত আর যা কিছু সমস্তই আর্ত্ত, সমস্তই বিনাশশীল, একমাত্র এই অন্তর্যামীই স্বয়ং প্রকাশ, এই অন্তর্যামীই অমৃত, অবিনাশী, সর্ব্ববিধ সংসার ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত, এক অদ্বিতীয় অখণ্ডৈক রস। এই অন্তর্যামীই তোমার, আমার, আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের আত্মা।”

যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে উদ্দালক আরুণির মুখে আর কথাটী বেরুলো না। তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে নিজের আসনে গিয়ে উপবিষ্ট হইলেন। সভা কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব হইল।

আলোচনা

[পত্রিকার অন্তর্গত বিষয়ে প্রশ্ন, শঙ্কা বা বিচার সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। পুস্তকাদির সমালোচনা ও ভারতীয় সাধনার সম্পর্কিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা সযত্নে করা হয়। ভারতীয় সাধনার স্বরূপনির্ণয় ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ-প্রণালী - যাহা ভারতের সাধনা'র এক বিশেষ লক্ষ্য—সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও আলোচনা-সাপেক্ষ।]

পুস্তকপরিচয়

প্রত্যাখ্যান।—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের "প্রত্যাখ্যান" নামক সামাজিক উপন্যাসখানি পড়িয়া সুখী হইলাম। বর্ত্তমান যুগে পাণ্ডিত্য পূর্ণ তাত্ত্বিক গ্রন্থ অপেক্ষা উপন্যাসের দিকেই তরলমতি যুবক যুবতীর আকর্ষণ অধিক। কারণ উপন্যাসের ঘটনাপরম্পরা এমন ভাবে সজ্জিত করা হয় যে তাহা পড়িতে কোন আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, বরং একটা আনন্দজড়িত ঔৎসুক্য গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত চক্ষুকে টানিয়া লইয়া যায়। রামায়ণ মহাভারত এখন প্রায় অচল, সচল কেবল উপন্যাস, এবং এই ঔপন্যাসিক নায়ক নায়িকার চরিত্র অজ্ঞাতসারে মানুষের চরিত্রকে প্রভাবান্বিত করে। বিশেষতঃ তরুণ মনের উপর উপন্যাসের প্রভাব খুব প্রবল হইয়া থাকে। মানুষের মত ও চরিত্রের উপাদান সেইখান থেকেই বেশী সংগৃহীত হয় যেখানে তার আকর্ষণ অধিক ও যাহা তাহার চক্ষুর সম্মুখে বারবার নানা ভাবে দেখা দেয়। সুতরাং উপন্যাসের কাজ কেবল রসসৃষ্টি, শিক্ষকতা নহে একথা কার্য্যক্ষেত্রে সত্য নহে। 'রামাদিবৎ ভবিতব্যং ন রাবণাদিবৎ' এই ভাবে শিক্ষা দেওয়া সেকালের কবিদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। অবশ্য তাহাতে তাঁহাদের রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটিত না। একালের কবিরা যে কোন উপায়ে রসসৃষ্টিকে প্রাধান্য দিয়াছেন লোকশিক্ষাকে নয়। তাহার কুফল যে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। যাহা হউক, ক্ষেত্রনাথ বাবু উপন্যাস লিখিতে বসিয়া নবীন নীতি ত্যাগ করিয়া সাহস সহকারে প্রাচীন নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। লোকশিক্ষার দিকেই ঝোঁক দিয়াছেন বেশী। তিনি এই উপন্যাস খানিতে তিনটী নারী চরিত্র তিন ভাবে অঙ্কিত করিয়া সাধ্বী রমণীর মহিমাকে উজ্জ্বলতর করিয়াছেন। ইহাতে প্রেমের তরলতা নাই, আছে গম্ভীরতা। কি ভাবে পতিপ্রাণা স্ত্রী নিজের জীবন সাপের মুখে দিয়া স্বামীকে রক্ষা করে, কি ভাবে পরিত্যক্তা স্ত্রী তাহার চরীত্রহীন মদ্যপায়ী স্বামীকে সৎপথে ফিরিয়ে আনে, স্বামীর কল্যাণের জন্য কি ভাবে নারী তিলে তিলে তার জীবন উৎসর্গ করে—তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই বই খানিতে আছে—ইহা পিতা পুত্র মাতা কন্যার পাঠ করা চলে, যাহা একালের অনেক গ্রন্থে চলে না। এই জাতীয় উপন্যাসের বহুল প্রচার কামনা করি। প্রথম দিককার বর্ণনাগুলি আর একটু হ্রস্ব হইলেই ভাল হইত। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সার্থক হউক—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন।

প্রেরিত পত্র

(সম্পাদক সমীপে)

আধুনিকতার বিক্ষেপ—বেদান্তে।—মহাশয়, গত ৬ই জুলাই তারিখের হিতবাদীর বিশেষ অঙ্কে বেদান্ত বিষয়ে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে; তাহা একজন শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ, সুতরাং বিজাতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, খ্যাতনামা ব্যক্তির নামে লিখিত। তাহাতে বেদাদি হইতে বহু মন্ত্র উদ্ধৃত এবং বেদান্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যান করা হইয়াছে। তাহাতে আধুনিক মনোবৃত্তির যে বিক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সুধীজন মাত্রেরই পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। প্রতিষ্ঠিত মতকে খণ্ডন করিয়া নিজ মতে কোনও নূতনত্ব দেখানই আধুনিক "স্কলারসিপে"র মৌলিকতা—বর্ত্তমান কালের ভারতের বিজাতীয়তা-মণ্ডিত পণ্ডিতদিগের মধ্যে এইরূপ মৌলিকতার বাহুল্যই দেখা যায়।

উক্ত প্রবন্ধে "নেদং যদিদমুপাসতে" বাক্য সমুদ্ধৃত করা হইয়াছে অর্থাৎ যাহার উপাসনা হয় তাহা ব্রহ্ম নহে। কারণ ব্রহ্ম বোধ হইলে উপাস্য উপাসকরূপ দ্বৈত ভাব থাকে না, সমুদয় একীভূত হইয়া যায়। আরও সমুদ্ধৃত করিয়াছেন "জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ" তিনি জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ তাঁহার চেয়ে পুরাণ পিতামাতা বা অন্য কেহ ছিল না। তিনি একা যখন ছিলেন তখন জীব জগৎ কোথায় ছিল? এই সহজ সরল কথাটীও কাহারও স্মরণ পথে আসে না; তাহার কারণ গীতায় ১৮।৬৭ শ্লোকে প্রদত্ত আছে—ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি" অর্থ যার তপস্যা নাই, ভক্তি নাই, গুরু শুশ্রূষা নাই, যে দেবতায় অসূয়ার ভাব পোষণ করে তারা গীতাদি শ্রবণে অধিকারী নহে। গীতাতে ভগবান ২।২৯ শ্লোকে আবার বলিয়াছেন "শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ"। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে "তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানু বিন্দন্তি" অর্থ—এই যে ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্ম, তাহা যার ব্রহ্মচর্য্য নাই তার বুদ্ধিতে খেলে না, সে ব্রহ্মবিদ্যার অনধিকারী। 'সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাধিকারিণাং ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনীয়া।' অধিকারী নির্ণয়ে বর্ণাশ্রমাদি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আচারপদ্ধতিঅনুসারে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা স্বারাজ্য লাভ করিতে হয়। তাহা বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের "বিজাতীয় শিক্ষা জনিত" মনোভাব হইতে প্রাপ্য নহে। তাই "স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ। অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।" তাঁদের চিত্তে সর্পের পা দেখার মত কত কিছু প্রতিভাত হয়; আবার "শ্ববৃত্তিঃ খলু দাসবৃত্তিঃ।" একালের এই সকল শ্রেষ্ঠ পদবী লাভেই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকত্ব লাভ হইবে এমন কোনও হেতু নাই। বর্ত্তমান কাল আবার সংখ্যাধিক্যে জয়লাভের দিন। শত কুকুর একদা চীৎকার করিতেছে, একলা হাতীটা কেন পরাস্ত হইবে না? তাই কিশোরীভজা, আউল, বাউল, সাঁই প্রভৃতি মতবাদের মূলাধার গণনে সংখ্যাধিক্যে ডিক্রী লাভের সম্ভাবনা আছে।

প্রবন্ধে ছান্দোগ্যের মন্ত্র বৃহদারণ্যকের ঘাড়ে ঋগ্বেদের মন্ত্র বৃহদারণ্যকের স্কন্ধে চাপান দেখা যায়। সে যাক; লেখক যে সব মতবাদিগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা যতই কিছু লিখিয়া

থাকুন "অদ্বৈত" শব্দটীর হাত হইতে রক্ষা পান নাই। অদ্বৈত অর্থ "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—দ্বিতীয়রহিত, অখণ্ডৈকরস অর্থাৎ স্বগত, স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদরহিত। আর তাঁদের ন 'দ্বৈত'—অদ্বৈত, কোথাও 'বিশিষ্ট' কোথাও 'বিশুদ্ধ' কোথাও 'দ্বৈত', কোথাও 'ভেদ' শব্দ দ্বারা বিশেষিত করিবার চেষ্টা যে ব্যর্থ, তাহা বাক্যার্থ হইতেই সুস্পষ্ট। লেখক "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" বাক্য উদ্ধৃত করতঃ, মায়া মোহার্থ কি অন্য কিছু তাহা বলেন নাই; কেবল উহা দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব অনুমান করা সমীচীন নহে বলিয়াছেন। লেখক ঋষিগণের ন্যায়ই শুদ্ধচিত্ত, সুতরাং তাঁহার অনুমান মিথ্যা হয় কি করিয়া? উক্ত বাক্যটী ঋগ্বেদের ৬।৪৭।১৮ মন্ত্রাংশ। সম্পূর্ণ মন্ত্রটী এই— "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতি চক্ষণায়।

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতাদশ ॥"

অর্থ কঠউপনিষদে "একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি" মন্ত্রেও সুস্পষ্ট। এক কিসে বহু হয়, অর্থাৎ সৃষ্টি হয়, তাহা ভগবান গীতায় ৪।৬ শ্লোকে "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্ম মায়য়া ॥" বলিয়াছেন।

মায়া যে মিথ্যারই নামান্তর তাহা ঋগ্বেদে ১০।১২৯ সূক্ত হইতেই পাওয়া যায়। এই সূক্তে—সৃষ্টিই যে অসৎ বন্ধন স্বরূপ তাহা স্পষ্টীকৃত আছে। তৎ যথা—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো ন ব্যোমো পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরং ॥১॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥২॥
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেহ প্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিন্নাজায়তৈকং ॥৩॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ॥৪॥

এই ঋক্‌সমূহে ঋষি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎও ছিল না, সৎও ছিল না। অর্থাৎ অসৎ, অভাব বা শূন্য ছিল না, অমূর্ত্ত দ্রব্য বা অব্যক্ত ছিল না। ইহাতে অসৎ কারণবাদী বৌদ্ধদিগের মত যে অবৈদিক তাহা সুস্পষ্ট। সৎ বা মূর্ত্ত বস্তু, সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বা ন্যায়দর্শনের পরমাণু প্রভৃতি যাহা সৎ বলিয়া অভিহিত, সেই সমুদয়ও ছিল না। অসৎকারণবাদী ও সৎকার্য্যবাদী উভয়েরই মত অবৈদিক। ছান্দোগ্যে রজঃ বা অন্তরীক্ষে সূর্য্যোৎপত্তিসহ যে জগৎ সৃষ্ট তাহা ছিল না। অথবা রজোগুণবহুল ত্রিগুণাত্মিকা প্রাকৃতিক সৃষ্টি ছিল না। তৈত্তিরীয়ে "তাঁহা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী," এই যে সৃষ্টি তাহাও ছিল না। তার পর বলিয়াছেন কোন স্থানে কোন আবরক ছিল না, অর্থাৎ তলমলিন কটাহাদির কল্পনা ছিল না। বৃহৎ যে ব্রহ্ম তাঁর কোন আবরণ সম্ভবে কি? কোথায় কাহার স্থান ছিল? অর্থাৎ ভূতজাত ছিল না। অথবা সুখদুঃখাত্মক কিছু ছিল না। সর্ব্বব্যাপক সূক্ষ্ম অপ্; যাহা কারণ সলিল, যদাশ্রয়ে তিনি নারায়ণাখ্য, সেই গহন গভীর জলরাশিও ছিল না। সৃষ্টি যে মায়িক, জগৎ যে অসৎ, অনিত্য, মিথ্যা তাহা শ্রুতি ঋগ্বেদের এই

নাসদীয় মন্ত্রে নিঃসন্দেহরূপে প্রদর্শন করিলেন। শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন, 'না ছিল মৃত্যু, মরণশীল, বিনাশশীল এই জগৎ, না ছিল অমর্ত্ত্য দেবগণ; রাত্রি কিম্বা দিন, কিম্বা তাহার নির্দ্দেশক চন্দ্রসূর্য্যাদিও ছিল না।" তবে ছিল কি? কি যে ছিল তাহাও শ্রুতি বলিতেছেন, 'আনীৎ,' প্রাণ বা চিৎ ছিলেন। প্রাণিগণ যেরূপ শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে, এই সৎ স্বরূপ, চিৎ বা প্রকাশস্বরূপ বস্তুটি কি সেইরূপ শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া বিদ্যমান্ ছিলেন? না, সেরূপ ভাবে ছিল না। তখন যে বায়ু ও ছিল না। অথবা বায়ুরূপী সূত্রাত্মা, সূক্ষ্মসৃষ্টিতে অনুপ্রবিষ্টা হিরণ্যগর্ভও ছিল না। সেই সৎ, সেই চিৎ যে নিরাবরণ, সমুদয় ভেদবিবর্জ্জিত। তবে তিনি ছিলেন কি প্রকারে? শ্রুতি বলিয়াছেন। তিনি ছিলেন "স্বধয়া", "স্বেমহিম্নি। স্বগত, সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদবিহীন ভাবে, স্ব স্বরূপে বা স্বপ্রকারে। আপন মহিমায় আপনি বিরাজমান ছিলেন। সেই সর্ব্বত্র একরূপ, অখণ্ডৈকরস, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিরহিত, "অকায়ম্ অব্রণং অস্নাবির, শুদ্ধম্, অপাপবিদ্ধং" "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" সেই সৎই ছিলেন।' তাঁহাকেই গীতায় "ওঁ তৎসৎ" ইতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহা হইতে পৃথক্ কিম্বা তাঁহার বাহিরে বা অভ্যন্তরে অপর কিছুই ছিল না। ঋগ্বেদের ১০।১৭৭ সূক্তে মায়া দেবতা। তথায় জীবাত্মা বা পতঙ্গ মায়ার আক্রমণে নানা যোনি ভ্রমণ কারণ এবং সমুদ্রবৎ জ্যোতির্ম্ময় পরব্রহ্মে গিয়া মুক্ত হন এরূপ বর্ণিত আছে।

ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে মহর্ষি উদ্দালকদৃষ্ট যে মন্ত্র আছে, তাহাতে "সদেব সৌম্য, ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং"। সেই কথাই এই ঋকে বলা হইয়াছে। এখন ঋষি পরবর্ত্তী মন্ত্রদ্বয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন। ঋষি বলিতেছেন অগ্রে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। এই যে দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ ইহা সবই সলিলবৎ একরূপ অব্যক্ত অবস্থায় ছিল। এক, অদ্বিতীয় আভু অর্থাৎ মহতো মহীয়ান্ যে সৎ ব্রহ্ম তাহা তুচ্ছা মায়া দ্বারা যেন আবৃত ছিল। সেই এক, সৎ, চিৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম স্বীয় জ্ঞানময় তপস্যারূপ মহিমা দ্বারা হিরণ্যগর্ভরূপে প্রকটিত হইলেন। মুণ্ডকে "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে…যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" বাক্য হইতেও সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয় থাকা ও পশ্চাৎ অন্নসংযোগে প্রাণ বা হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি পাওয়া যায়। এইরূপে এক, অদ্বিতীয় সৎ, ব্রহ্ম, তুচ্ছা, মিথ্যা মায়া উপাধিবশাৎ সূত্রাত্মারূপ ধারণ করেন। তাঁর যে বহু হইবার সঙ্কল্প কাম' সিসৃক্ষা বা ঈক্ষণ, তৎপর সূক্ষ্ম সৃষ্টি করতঃ অনুপ্রবেশই তাঁহার মনের রেতঃপাত। "তদৈক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয় ইতি 'সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহম্ ইমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি' ইতি (ছান্দোগ্য ৬।৩)। কবিগণ, তত্ত্বদর্শিগণ বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া হৃদয়ে অনুভব করিয়া জানিয়াছেন যে এই কাম, এই সিসৃক্ষা, এই অসৎ সম্ভূত। মিথ্যা তুচ্ছ মায়াই সৎ স্বরূপ সেই চিতের বন্ধু বা বন্ধন।৪ এস্থলে দ্বিতীয় মন্ত্রে একমেবাদ্বিতীয়ং বলিয়া পশ্চাৎ তমঃ বা মায়া যোগে সৃষ্টি বলা হইয়াছে। তাহা ইন্দ্রজালিকের উৎপন্ন দ্রব্যাদিবৎ। এই তমঃ রূপ মায়ার আবরণই ভ্রান্তির কারণ।

শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন—

"তিরশ্চিনো বিততো রশ্মিরেষাম অধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ ॥৫

অধঃ ঊর্দ্ধ সর্ব্বত্র মায়ার রশ্মিজাল বিস্তৃত হইল। যাঁরা রেত ধারণ করেন সেই সকল প্রজাপতিগণ

উৎপন্ন হইল। পঞ্চভূতাত্মক মহিমা উৎপন্ন হইল। স্বধা নিম্নে ও প্রযতি ঊর্দ্ধস্থ হইলেন। (স্বধা শব্দ অন্নও হয়)। তাহাতে প্রকৃতি নিম্নস্তরে ও প্রযতি জীব উচ্চস্তরে স্থান পাইল। যেমন গীতাতে ৭।৪ শ্লোকে পরা জীবকে ও অপরা প্রকৃতিকে বলা হইয়াছে। কেহ কেহ 'স্বধা' পুরুষ ও 'প্রযতি' দ্বারা প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু পাছে সৃষ্টিকে সকলে সত্য বলিয়া মনে করে সেই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন এই যে পরিবর্ত্তনশীলা নানাময়ী প্রকৃতি ইনি উপরে, আর নিত্য অপরিবর্ত্তনশীল অখণ্ডৈকরস যিনি আপন মহিমায় আপনি প্রতিষ্ঠিত, সেই সৎ চিৎ স্বরূপ ব্রহ্ম নীচে, ইন্দ্রিয়াদির অন্তরালে স্থিত ; অর্থাৎ এই অসৎ পতীয়মান মায়া প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান রূপে, এক নিত্য নির্ব্বিশেষ সর্ব্বভেদবিবর্জ্জিত সদ্বস্তু রহিয়াছে।

কিন্তু এই যে প্রতীতির যোগ্য মায়াপ্রপঞ্চ, এই যে পরিবর্ত্তনশীলা সৃষ্টি, ইহার স্বরূপাদি কি ? সে সম্বন্ধেও শ্রুতি বলিতেছেন—

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আযাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্ দেবা অসৎবিসর্জ্জনেনাথ কোবেদ যত আবভূব ॥ ৬
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বান।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বান বেদ ॥ ৭

অর্থঃ (৺রামচন্দ্র দত্তের অনুবাদ) কেই বা প্রকৃত জানে ? কেইবা বর্ণনা করিবে ? কোথা হইতে জন্মিল ? কেই বা এই নানা সৃষ্টি করিল ? দেবগণও ইহা বলিতে পারেন না ; কারণ তাঁহারাও সৃষ্টির পরে উৎপন্ন হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল তাহা কেই বা জানে ?

এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইত হইল, কাহা হইতে হইল, কেউ ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন বা করেন নাই, তাহা এই সৃষ্টির যিনি অধ্যক্ষ পরম ব্যোমে স্থিত, সাক্ষীস্বরূপ, তিনিই জানিতে পারেন অথবা তিনিও না জানিতে পারেন। এই ৬ষ্ঠ ও ৭ম ঋকে মায়া যে কি তার প্রকৃত রহস্য কেইবা জানে বা বর্ণন করিবে অর্থাৎ মায়া অনির্ব্বচনীয়া, তুচ্ছ, তমঃ। ইহা সৎ কি অসৎ, কিম্বা সদাসৎ তাহা নির্ব্বাচন করা যায় না। ইহাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অনির্ব্বচনীয় বাদের মূল সূত্র। ইহাই কেনোপনিষদে "তদ্ বিদিতাদথো অবিদিতাদধি" মন্ত্রে প্রকাশিত। দেবতা ও মনুষ্যাদি সৃষ্ট জীব। সৃষ্টির আরম্ভন তাঁহাদের পূর্ব্বকালীন ঘটনা। কাজেই তাঁহাদের কেহই সৃষ্টির প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা নহেন। সুতরাং অনুমান ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অনুমান প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ বুদ্ধির মাপ কাটী অনুযায়ী করিয়া থাকে, এজন্য মতদ্বৈধ অবশ্যম্ভাবী। অথবা দেবগণ অর্থ দেবাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গণ। তারা প্রকৃতির বিকারে উৎপন্ন। সুতরাং সৃষ্টি তত্ত্ব ইন্দ্রিয়াতীত। সাধারণ প্রমাণ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু বিষয়পর হইয়া থাকে। কোথা হইতে সৃষ্টি হইল অর্থাৎ সৃষ্টির যে মূল কারণ তাহা অপ্রমেয়। ইহাই শুক্ল যজুর্ব্বেদান্তর্গত ঈশোপনিষদে, ঋষি "নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ" মন্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। নাসদীয় সূক্তের ঋষি ও সৃষ্টি প্রকৃতি হইতে বা পুরুষ হইতে, অথবা প্রকৃতি পুরুষ সংযোগে, কিম্বা কুলালবৎ সোপাধিক পুরুষ হইতে, অথবা ঊর্ণনাভবৎ সৃষ্টি হইয়াছে এই প্রশ্ন উত্থাপন করতঃ সপ্তম মন্ত্রে কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন বা করেন নাই বাক্য দ্বারা তাহার সমাধান করিলেন যে সৃষ্টি কেহ করেন নাই, সৃষ্টি মায়িক, ভ্রান্তি মাত্র। "ন নিরোধো ন চোৎপত্তি" কথাটাই খাঁটি সত্য। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন—বলিয়া শ্রুতি বলিলেন যে "ঈক্ষত্র

বিজ্ঞানাতি বিজানন্বৈ তন্ন বিজানাতি, নহি বিজ্ঞাতু র্বিজ্ঞাতে র্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ, ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোহন্যৎ বিভক্তং যৎ বিজানীয়াৎ। (বৃহদারণ্যক ৪র্থ অধ্যায় ৩য় ব্রাহ্মণ) ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, কঠ, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি উপনিষদ্ সমূহে ঋগ্বেদের এই নাসদীয় সূক্তোক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

লেখক ঋগ্বেদ হইতে যে সমুদয় মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন সেগুলি সোপাধিক ব্রহ্ম বিষয়ক। ভগবান শঙ্করাচার্য্যও তাহা অস্বীকার করেন নাই। লেখকের উদ্ধৃত ঋগ্বেদের মন্ত্রেই লেখককে বলি যে তিনি শঙ্করকে বুঝিতে পারেন নি। কারণ, তিনি তাহাদিগের মধ্যেই একজন যাহারা 'নিহারেণ প্রাবৃতাঃ জল্প্যাচ অসুতৃপ উক্থ শাসশ্চরন্তি।'' অজ্ঞানরূপ কুজ্‌ঝটিকাতে আচ্ছন্ন বলিয়া লোকে নানাপ্রকার জল্পনা করে। তাহারা শিশ্নোদরপরায়ণ, শুধু আপন আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্য আহারাদি করিয়া মুখে শুধু লম্বা চওড়া শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক বিচরণ করে।

—স্বামী মহাদেবানন্দ।

মাসপঞ্জি—ভাদ্র, ১৩৪১

হিন্দু দেবমন্দিরে সর্ব্বসাধারণের প্রবেশাধিকার বিষয় যে কানুনের পাণ্ডুলিপি ভারতীয় ব্যবস্থা সভাতে উপস্থাপিত, তাহার প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত সি, এস, রঙ্গ আয়ার তাহা তুলিয়া লইয়াছেন; কংগ্রেস পক্ষ ও সরকার পক্ষের সমর্থন পাইলেন না বলিয়া তিনি বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন—ভারতীয় সৈনিক বিভাগের সংস্কার কল্পে 'ইণ্ডিয়ান আরমী এমেণ্ডমেণ্ট বিল' নামে এক আইনের আলোচনা ব্যবস্থা পরিষদে হইয়া গিয়াছে, স্যর আবদার রহিম ভারতীয় কমিশন প্রাপ্ত সামরিক কর্ম্মচারিদিগকে ব্রিটিশ কমিশনওয়ালা দিগের সহিত সম পদবীতে তুলিতে চাহেন, বিল পাশ হইয়াছে কিন্তু স্যর আবদার রহিমের প্রস্তাব পরিত্যক্ত—রাষ্ট্র পরিষদ ও আরমী ও নেভি দুই বিভাগেরই নূতন নিয়ন্ত্রণ মূলক আইন পাশ করিয়া দিয়াছেন—বড় লাট লর্ড ওয়েলিংডন স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাষ্ট্র ও ব্যবস্থা পরিষদের যুক্ত বৈঠক এক বিবৃতি করিলেন, ভারতীয় রাষ্ট্রিক পরিবেষ্টনীয় সাধারণ দিগদর্শনের সঙ্গে ভাবী রাষ্ট্র সংস্কারে তাঁহার মহতী আশা প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তাঁহার দেশবাসীগণ সাধারণতঃ ভারতের সহিত সহানুভূতিশীল—ব্যবস্থা পরিষদ ভারতীয় লৌহ বিষয়ে এক বিল (ষ্টীল বিল) পাশ করিয়াছেন, ভারতের একমাত্র লৌহ ব্যবসায়ী ও উৎপাদক টাটা কোম্পানীর ইহাতে অনেক সুবিধা হইবে, উক্ত কোম্পানী যাহাতে জাতীয় উদ্দীপনার কার্য্য করেন এ আশা সরকার করিতেছেন—সর্দ্দা-আইন এবং বাঙ্গলার ১৮১৮ সনের ৩ রেগুলেসন উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব রাজ দরবারে উঠিয়াছিল—কংগ্রেস সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও মি, এনি 'কংগ্রেস নেসন্যাল পার্টি' নামে এক নূতন দলের গঠন করিয়াছেন (কলিকাতা ১৯-৮-৩৪)—আগামী অক্টোবর মাসে বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হইবে; সীমান্ত প্রদেশের জননায়ক গান্ধী ভক্ত আবদুল গফর খাঁ কারামুক্ত—পুষার কৃষি পরীক্ষাগার দীল্লির নিকট স্থানান্তরিত হইল—উত্তর বিহারে গঙ্গার দুকূলে ভীষণ বন্যা প্লাবনে

ভীষণ অনিষ্টপাত ঘটিয়াছে—পদ্মার পুল কে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট বিখ্যাত ইন্‌জিনিয়ারগণ লইয়া একটী কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন, বন্যার পরে তাহার কার্য্যফল দেখা যাইবে—কংগ্রেস কার্য্যক্ষেত্র হইতে মহাত্মা গান্ধী অবসর গ্রহণ করিবেন বলিয়া কোন কোন সংবাদ পত্রে প্রকাশ—কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ চারুচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হইল—যুক্ত প্রদেশের এক স্পেশ্যাল ট্রিবুনেলে স্যর তেজ বাহাদুর সপ্রু বিচারক নিযুক্ত হইয়াছেন—বোম্বাই প্রসিদ্ধ স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ বণিক স্যর মনমোহই দাস রামজীর মৃত্যু হইয়াছে, তিনি ভারতীয় ইনসিয়রেন্স কোম্পানী ও বণিক সভার জন্মদাতা ছিলেন; ব্যবস্থা-পরিষদে তাহার প্রতিষ্ঠাও অসাধারণ ছিল।

বৈদেশিক

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যর জেমস্ জীনস্ ব্রিটিশ বিজ্ঞান সভার বক্তৃতাতে পদার্থ বিজ্ঞানের এক নূতন দিগ্ দর্শাইয়াছেন—রাজপুত্র জর্জ্জ গ্রীক রাজকুমারী মেরিয়ার সহিত পরিণয়ে আবদ্ধ হইয়াছেন—ইংলণ্ডে স্বর্ণ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, গ্লাসগো সহরের বেলষ্টেশনেএক ট্রেণ কলিসনে যাত্রী গাড়ীর সংঘর্ষে অনেক জীবন নষ্ট হইয়াছে—জ্যারম্যান নব রাষ্ট্র হার হিটলারকে প্রেসিডেণ্ট ও চেনসেলারের যুক্তপদে অভিষিক্ত করিয়া লইয়াছে; জেনারেল গোয়েরিং জেনারেল ব্লম্বার্গ এবং জেনারেল রোডোফ্ হেস এই তিনজন হার হিটলারের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে জারম্যানীর অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিবেন; শার প্রদেশের প্রশ্নই জারম্যানীর চক্ষে প্রধান, ফরাসী ব্যক্ত করিতেছেন যে শার জারম্যানকে প্রত্যর্পণ করিতে সে অভিলাসী; আগামী ১৯৩৭ সালে প্যারিস সহরে আর একটি বিশ্বপ্রদর্শনীর আয়োজন চলিতেছে—অষ্ট্রিয়াতে নাজি ষড়যন্ত্র হইতেছে বলিয়া অপবাদ; চেনসেলার ডাঃ শুচ্‌নিগ সিগনোর মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন; অষ্ট্রীয় সীমান্ত হইতে যাবতীয় ইটালীয় সৈনিক তুলিয়া আনা হইল—সভিয়েট রুশ জাতি সঙ্ঘে প্রবেশ করিবে বলিয়া আয়োজন অগ্রসর—আমেরিকায় যুক্ত রাষ্ট্রে ভীষণ দাবাগ্নি উপস্থিত; নৌ শক্তি প্রসারণ পক্ষে ইহার চেষ্টা অবিচ্ছিন্ন; বস্ত্রশিল্পে শ্রমিকদিগের ধর্ম্মঘট লইয়া উদ্বেগ বৃদ্ধিই হইতেছে—জাপান পূর্ব্ববর্ত্তী বাণিজ্যিক সন্ধি সর্ত্তে থাকিতে নারাজ; ভূমিকম্পের নিগই প্রদেশের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে; বঙ্গদেশে জাপানীর পরিচালনাতে একটী লৌহ কারখানা প্রতিষ্ঠার কথা—চীন বিদেশীর দিগের নিকট আর রৌপ্য বিক্রয় করিবে না বলিয়া কড়া আইন করিয়াছে।

অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

পঞ্চম বর্ষ] আশ্বিন—১৩৪১ [১২শ সংখ্যা

সাধনার পথে

বর্ষশেষে

'ভারতের সাধনা'র, পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম সমাপ্ত হইল। ভারতীয় জীবনের ও জগজ্জনের এক সঙ্কটকালেই ইহার জন্ম হইয়াছে; ভারতীয় সাধনার ধারা ও মানব ইতিহাসের এক মহা সন্ধি-ক্ষণে ইহার আরম্ভ; পুঞ্জীকৃত নানা সমস্যার মধ্যে ইহার উদ্ভব। সভ্যতার ও উন্নতির নামে মানুষ, দিগ্‌বিদিগ্‌ দৃষ্টি হীন হইয়া ছুটিয়া, নানাবিধ সমস্যার কুজ্‌ঝটিকা-জালের নিকট আসিয়া এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-সমস্যা, সমাজ-সমস্যা, ধন-সমস্যা, জাতি-সমস্যা, রাষ্ট্র-সমস্যা, গণ-সমস্যা, প্রভুত্ব-সমস্যা, দাসত্ব-সমস্যা, সাম্রাজ্য সমস্যা,—এই সমুদয়ই অতি বিকট আকারে নানাদিকে দেখা দিয়াছে। ইহাদের রহস্য ভেদ করিয়া প্রকৃত কোনও সমাধান কোথাও হইতেছে না। চতুর্দ্দিকে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা দেখা দিয়াছে। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র এ সমুদয়ই প্রায় সর্ব্বত্র বিনষ্ট; যেখানে যেখানে বিদ্যমান সেখানেও মহা বিপদ গণনা হইতেছে। বাহ্যিক চাকচিক্য ও চতুরতার উপর কাজ সর্ব্বত্র চলিতেছে—সমুদয়ই অন্তঃসার শূন্য। এমনই বিকৃত অবস্থা জগতের উপস্থিত। ভারত এক্ষণে নির্জ্জীব ও নির্যাতিত। এ সমস্যার সমাধানে তার কোনও অধিকার বা ক্ষমতা আছে বলিয়াই মনে হয় না। এ জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইবার তাহার শক্তি দেখা যায় না। কিন্তু ভারতের সাধনা চিরজীব ও সর্ব্বশক্তিমান। চিরন্তন কাল উহা জগৎ সমস্যার সমাধান করিয়া আসিয়াছে। সত্যের সন্ধানে তার গতি, ভ্রম প্রমাদ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বপ্রকার রহস্যভেদে তাহার বিশেষ অধিকার। ভারতীয় সাধনায় সিদ্ধ, ভারতের সাধনার প্রবর্ত্তক ও পরিচালক তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ সেই পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন ভারতের সাধনার ধারায়। আজ বিজাতীয় প্রভাব তাহাকে এমনই অবরুদ্ধ করিয়া দিয়াছে যে মনে হয়, আমাদের বুঝি আর কোনও উপায়ই নাই। তাই আজ অগণিত জনমণ্ডলী নানা দুর্দ্দশা ও দুঃখ

ভারে অবনত; তাহাদের আর কিছু দেখিবার বা বলিবার শক্তি নাই; কেহ কেহ সেই বিজাতীয়ের মোহে প্রলোভিত হইয়া, বিজাতীয় ভাবের প্রেরণায়, তাহাদেরই মতন উদ্ভ্রান্ত হইয়া ছুটিয়াছে; এবং ফলে তাহাদের অপেক্ষা অধিক গুরুতর সমস্যা সমূহের সম্মুখীন হইতেছে, এবং অসহায় হইয়া কেবল আত্মরক্ষা ও স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া, বাস্তবিক আত্মদ্রোহই করিতেছে। ভারতীয় সাধনার প্রকৃত স্থিতি ও গতির দিকে কাহারও বড় লক্ষ্য নাই। আজ তাহাদেরই পুনঃ দেখিয়া লইতে হইবে; এবং তাহার অনুসরণ করিতে হইবে। সকল সমস্যার সমাধানই ইহার হাতে রহিয়াছে। এ লক্ষ্য ও আদর্শ লইয়াই 'ভারতের সাধনার' প্রবর্ত্তন হইয়াছে। আদর্শ স্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়াছে—লক্ষ্যের সম্যক সম্প্রাপ্তি ঘটিয়াছে, একথা বলা চলে না। এজন্য যে আয়োজন ও উদ্যোগের আবশ্যক তাহাও হয় নাই। কিন্তু কার্য্য কিছু না হইয়াছে একথা বলিতে পারি না। দুই বৎসর পূর্ব্বেও চতুর্দ্দিকে যে নিরাশার অন্ধকার ঘন নিবিষ্ট ছিল, আজ তাহার মধ্যেই আশার ক্ষীণ আলোক দেখা দিয়াছে; ধর্ম্মও সমাজের উপরে লোকের যে আক্রোশ ও প্রতিকূল আচরণ পদে পদে দেখা যাইত, আজ তাহার তীব্রতার হানি দেখা যায়, অন্ধের মতন যে সকল লোক স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের বিরোধ মাত্র করিত, আজ তাহাদের নিজ মনেই সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে। ভারতের সাধনার নাম ও শক্তির কথা প্রায় লোকের মনোবৃত্তি হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল; আজ অনেকের মুখেই ইহাদের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আর বাহিরের যে জগজ্জয়ী শক্তিতে একালে ভারতীয় সাধনার ধারায় সর্ব্বপ্রকার ব্যাঘাত লাগিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই ধ্বংসের ক্রিয়া প্রবল রূপে দেখা যায়। ভারত তাহার আত্মপক্ষ প্রকৃত রূপে সমর্থন করিতে পারিলে, 'ভারতের সাধনা'র লক্ষ্য পরিপূর্ণ হইবেই। তত্ত্বদর্শী ভারতের ঋষিদিগের সন্তানগণের ইহাতে উত্তরাধিকার যেমন সঙ্গত দায়িত্বও তেমন প্রবল।

পূজা—আগমনী, মূর্ত্তি, মিলন।—

বাঙ্গলায় পূজা বলিতে ৺দুর্গা পূজা বুঝায়, আর আগমনীর আহ্বান-সঙ্গীত তার বিশেষ অঙ্গ। দেবীর আহ্বানের শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান ও প্রক্রিয়া আছে; শারদীয়া প্রকৃতির বিভূতি-সম্ভার তাহার উপকরণ। 'নব উদকে' সেই আহ্বান। বাঙ্গালীর অন্তর কিন্তু কেবল এই বাহ্যিক অনুষ্ঠানে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই—তাই সে বক্ষের 'উষ্ণোদক' লইয়া গাহিয়াছে আগমনীর গান। একদিন বাঙ্গলার ঘরে ঘরে আগমনীর করুণ সঙ্গীত শুনা যাইত; আজিও স্থানে স্থানে তাহা শুনা যায়। এমন মধুর, এমন কোমল, এমন স্নেহ-সিক্ত আর কিছুই নাই—জগজ্জননী মহাশক্তির কন্যারূপে আহ্বান—সর্ব্বশক্তিময়ী আপদ উদ্ধারিণী মহিষমর্দ্দিনী রণচণ্ডিকার হিমালয়-দুহিতা রূপে পুত্র কন্যাসহ বৎসরান্তে পিতৃগৃহে আগমন! বাঙ্গলার গৃহে গৃহে—হিমালয়ের গিরিরাজভবনে—উমারূপী কন্যার আহ্বান হয়! যিনি দানবমর্দ্দিনী অসুরকুল নিধনে নিরতা—তিনিই আমার মাতা ও কন্যার স্নেহমাধুর্য্যের আধার। এ রহস্য কেবল মাত্র ভারতীয় সাধকের কাছেই ধরা পড়িয়াছে—বাঙ্গালা তার চূড়ান্ত উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে; সেই উৎকর্ষের পরিণত ফল বাঙ্গলার ৺দুর্গাপূজা ও আগমনীর গান।

বাঙ্গলা তাহার স্বকীয় সাধনার আর এক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে ৺দুর্গাপূজার প্রতিমার পরিকল্পনায়। প্রতিমা কল্পনার বস্তু নহে, সাধকের সাক্ষাৎ অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার ফল।

জগত্তত্ত্বের নিগূঢ় বিষয় সমূহই সাধনার বলে ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞের হৃদয়ে নানা প্রতিমা রূপে প্রতিভাত। উহারা সত্য-মূর্ত্তি ও সত্য-প্রকৃতি। প্রতিমার পরিপূর্ণতাই ইহার প্রমাণ। ভারতীয় দেব দেবীর প্রতিমাকে প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্য বা মিশরীয় মূর্ত্তিরচনার সহিত এক পর্য্যায়ে ফেলিলে চলিবে না —গ্রীক দেবতা ও মানুষ একই ছাঁচে গঠিত, শারীরিক ধর্ম ছাড়া আর কোন গভীর ভাব বা লক্ষণ তাহাতে প্রকটিত হয় নাই; সকল মূর্ত্তি গুলিই প্রায় এক প্রকারের—ব্যাপকতা বা অতি-প্রাকৃত লক্ষণ ইহাদের দ্বারা নির্দ্দেশ হয় না। আবার মিশরীয় মূর্ত্তি গুলিতে যে রুক্ষ ও আরষ্ট ভাব তাহা পিড়ামিডের কবর-স্থানেরই উপযুক্ত। ভারতীয় দেব মূর্ত্তির কোনও অঙ্গই নিরর্থক বা নিষ্প্রয়োজনীয় নয়। ইহাও সত্য দৃষ্টির আর এক লক্ষণ। সাধক, পূজক ও মূর্ত্তি-নির্ম্মতা সকলের সাধনার ফল—সত্য দৃষ্টি। অন্যকার শিল্পী বা কলাবিদেরা এ মৌলিক তত্ত্ব জানে না ও মানে না তাই তাহারা না না অবান্তর, অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের যোজনা করিয়া প্রতিমাকে উদ্দেশ্য ও সাধনার ক্ষেত্রের বাহিরে নিয়া ফেলিতেছে। আজ কাল নানা দিকে গবেষণার কার্য্য হইতেছে; প্রকৃত গবেষণা এই দিকে হওয়া আবশ্যক—বঙ্কিমচন্দ্র এ যুগে প্রতিমার এক রূপ দেখিতে চাহিয়াছিলেন দেখাইয়াও গিয়াছেন। নব্য বঙ্গ তাহা বিলক্ষণ রূপেই অবগত আছে। কিন্তু—তাঁহার "পুরাবৃত্তকার ঢাকী" এখনও সে দিক লক্ষ্য করিয়া "ঢাক ঘাড়ে করিয়া বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটায়" নাই—দেবী মূর্ত্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য কেহ বাহির করিতে ধায় নাই।

বাঙ্গলার দুর্গাপূজা এক মহান্ মিলনোৎসব। যাহারা ৺পূজা মানে না তাহারাও পূজার এই মিলনের প্রসাদ পায়। দেশ দেশান্তর হইতে আত্মীয় ও কুটুম্ব একত্র আসিয়া পূজার বাটীতে মিলিত হয়। যাহার বর্ত্তমান দেশের হাল—হাওয়াতে নিজ বাটীর পূজা বা গৃহগমন ত্যাগ করিয়া বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হন, তাহারাও কোনও না কোনও প্রকারে মিলনের সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। প্রকৃত মিলন আজ বড়ই দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে—সমাজ, ধন ও রাষ্ট্রক্ষেত্রের সর্ব্বত্র বিদ্বেষ ও অনৈক্য দেখা যায়। ধর্ম্মক্ষেত্রে মিলন সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক; কিন্তু ধর্ম্মে এ যাবত লোকের মধ্যে যত অনৈক্য ও বিরোধ ঘটাইয়াছে এমন আর কিছুতেই নহে। ইহাতে মনে হয়, প্রকৃত ধর্ম্মের সন্ধান ইহারা পায় নাই। বাঙ্গলার ৺দুর্গা পূজাতে পরোক্ষভাবেও সর্ব্বজাতির এক মহামিলন সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। এ পূজা বাস্তবিকই সার্ব্বজনীন ইহাকে আর নূতন করিয়া সার্ব্বজনীন আখ্যা দিবার প্রয়োজন নাই। সকল জাতিই আজ ভারতের সমুদয় ক্ষেত্রে—ব্যবসায়, কর্ম্মজীবন বা পূজাবাটী সর্ব্বত্র—দুর্গা পূজার আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। আজ পূজার মিলনকে বাস্তবিক সার্থক করা যায়, যদি সকল লোক ৺পূজার প্রকৃত মর্ম্ম বোধ করিতে আইসে। একদিন ছিল যখন জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলে তাহা করিত—বিধর্ম্মী মুসলমানদিগের শাসন সময়েই বাঙ্গালাতে ৺দুর্গা পূজার প্রসার সাধন হইয়াছে। তখন বাঙ্গালীর মন প্রকৃতিস্থ ছিল, ঘরে ঘরে সাধক মিলিত। ৺পূজার মাহাত্ম্য প্রতিপালিত ও প্রচারিত হইত; তাহাতে বিদেশীয় শাসন কর্ত্তারাও অভিভূত হইয়াছিল। বহুদিন সেই প্রীতি বাঙ্গালার বাটীতে বাটীতে পরিদৃষ্ট হইয়া আসিতেছিল। আজ বিজাতীয় শিক্ষায় দেশবাসীকে অপ্রকৃতিস্থ ও সাধনাভ্রষ্ট করিয়াছে; তাই ৺পূজার অনুষ্ঠানে মাত্র পর্য্যবসিত। সর্ব্বশ্রেণীর লোক বিকট স্বার্থ দৃষ্টিতে উদ্ভ্রান্ত; বিরোধও অনৈক্য সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে—৺পূজার অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্যক্ পরিকীর্ত্তিত হইলে এই অনৈক্যাসুরেরও বিনাশ হইতে পারে। অন্যথা নহে।

মহাত্মা ও কংগ্রেস।—

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় যে মহাত্মা গান্ধী আর কংগ্রেসের সহিত সংশ্রব রাখিবেন না। মহাত্মা তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করেন। তাহার পরেই কংগ্রেসে তাঁহার অভিপ্রায় মত কায হয় নাই বলিয়া তিনি এক বিবৃতি প্রকাশ করেন এবং সর্দ্দার বল্লভ ভাই পেটেলের এক উক্তিতে মহাত্মার কংগ্রেসত্যাগের সঙ্কল্প সত্য বলিয়া আভাস পাওয়া যায়। কংগ্রেস ও দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে মহাত্মার এই অভিপ্রায়ের উপরে কি গুরুত্ব নির্ভর করিতেছে যে দেশশুদ্ধ সকলের—বিশেষ করিয়া দেশীয় সংবাদ পত্রগুলিতে আবার হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। মহাত্মার প্রতি কার্য্যই চমৎকার হইয়াছে, এবং তাহা লইয়া দেশময় হৈ চৈ যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই হৈ চৈ এর তুলনাতে প্রকৃত কার্য্য কত দূর হইয়াছে, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে, ইহাদের কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইতে পারে। কিন্তু এ যুগ এদেশের লোকের পক্ষে কোনও কর্ম্মের যুগ নহে—আপাততঃ চৈতন্যেরও নয়। চেতনা একদিন হইবে, তাহার কিঞ্চিৎ সুচনা পড়িয়াছে; চৈতন্য বদ্ধমূল হইলে পরে কার্য্যের আরম্ভ। দেশ মাতাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মহাত্মার দক্ষতার অনেকে প্রশংসা করেন; উহাই তাঁহার প্রধান কৃত কর্ম। কিন্তু মত্ততাই কি জাতির চরম লক্ষ্য হইবে? এই মত্ততাকে জাগ্রতি বলিয়া কেহ কেহ উল্লাস করিতে পারেন। কিন্তু সে জাগ্রতি হইতে ত কোন স্থির লক্ষ্যের সন্ধান ও তাহা প্রাপ্তির জন্য সম্ভাবনা থাকা আবশ্যক। মহাত্মার পরিচালিত কংগ্রেস হইতে তাহার কি কত দূর হইয়াছে, তাহা বিচার করিবার সময় আসিয়াছে; আসিয়াছে বলিয়াই কংগ্রেস মণ্ডলে নূতন বিরোধ, মহাত্মার সকলের উপরে সন্দেহ, এবং পরিশেষে কংগ্রেস ত্যাগের সঙ্কল্প উপস্থিত! এইবার বোম্বাইর কংগ্রেস অধিবেশনে অনেক বিষয়ই লক্ষ্য করিবার আছে। ভিতরের বিরোধ ও বাহিরের চাপ অতিক্রম করিয়া কংগ্রেস এমন কোনও কর্ম্মনীতি নির্দ্ধারণ করিতে পারিবে কি না, যাহাতে জাতি সত্য সত্যই কোনও কল্যাণকর পথের সন্ধান পায়, অন্ততঃ যাহাতে কোনও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বা আদর্শের প্রেরণায় সত্য সত্যই আশা ও উৎসাহ বোধ করিতে পারে। মহাত্মার আন্দোলনে আবেগ ও উত্তেজনা যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোনও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের সন্ধান কেহ পায় নাই। ব্যক্তিত্বের পূজা অনেকে করিয়াছে, কিন্তু কোনও নীতির অনুসরণ তেমন হয় নাই।

একে একে কংগ্রেসের কয়েকটী কার্য্যপদ্ধতির পরীক্ষা হইয়া গেল—প্রথমতঃ নরম দলের প্রার্থনা বা ভিক্ষার নীতি, দ্বিতীয়তঃ গরম দলের চোখ রাঙ্গানী, পরে গান্ধী-নীতির আবেগ ও উত্তেজনা। ফল লাভ অল্লাধিক সকলের দ্বারাই হইয়াছে। বৃহত্তর কোনও ফল লাভের ভিত্তির উপাদানও ইহাদের হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। এজন্য আরও ব্যাপক কোনও কর্ম্মনীতিরই প্রয়োজন, এবং সেইরূপ দৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বের আবশ্যক। ভারতের সমস্যা কেবল রাজনৈতিক নহে,—রাজ-নৈতিক অপেক্ষাও অধিক গুরুতর বিষয় ভারতের সমাজ ও ধর্ম্ম। অথবা ভারতের সমস্যা এমন একটা বিষয় যাহা রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি—সমুদয়ের সমাহার চায়।

আবার বাহিরেও ভিতরে জগতের অবস্থার আজ বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ ও প্রতিযোগিতা; সকলেই আপন অস্তিত্ব লইয়া ব্যস্ত; শিল্প ও বাণিজ্যের বিকৃত উন্নতিতে জগত পীড়িত, অন্নক্লেশ ও ধনসঙ্কট এই উন্নতির সহযাত্রী রূপে সর্ব্বত্র

বিরাজমান। অপরাপর কোনও জাতীয় অনুষ্ঠান এই ব্যাপক দৃষ্টি ছাড়িয়া দিয়া হইতে পারে না। কংগ্রেসকে ইহাতেও অবহিত হইতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক কোনও ব্যাপক দৃষ্টি লইতে গেলেই জগতের মৌলিক তত্ত্বে গিয়া পড়িতে হয়। ভারত ব্যতীত এ যাবত জাগতিক সমুদয় বিষয়ের সমাধান এই দৃষ্টিতে আর কোন জাতি করে নাই। ভারতের সমুদয় সাধনা (culture) এই সমুদয়ের দৃষ্টি ও তাহার সমাধানে গ্রথিত। জগতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব বা সত্যের উপলব্ধিতে জাগতিক সমুদয় বিষয় নিয়ন্ত্রণ করা এই সাধনার লক্ষ্য। ভারতে সনাতন আশ্রম ও শিক্ষা ব্যবস্থা, বর্ণ ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা—সমুদয়ই ইহার সম্যক উপযোগের ফল। আজ জগতের সর্ব্বত্র যে বিকট সমস্যাসমূহ উপস্থিত, তাহা উহার বিপরীতপথগমনেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ভারতীয় সাধনার দৃষ্টিতে ইহাদেরও সমাধা হইতে পারে। জগদ্বাসীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষিত হওয়া প্রয়োজন। কংগ্রেস আপন কর্ম্মপদ্ধতিতে ভারতের সাধনাকে কর্ম্মনিয়ন্তা বলিয়া গ্রহণ করিলে আপনি যেমন রক্ষা পায়, জগতবাসীর নিকট যেরূপ সম্মানার্হ ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে পারে। ভারতীয় সাধনার ইহাই আদর্শ ও বিধিনির্দ্দিষ্ট নির্দ্ধারণ। ভবিষ্য কংগ্রেস এই জন্য রাষ্ট্রিক স্বরাজ্যের স্থানে ভারতীয় সাধনাগত (cultural) স্বরাজকে আপন আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে পারেন।

কাল-সঙ্কট

মানব সমাজ যে এক্ষণে এক বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছে—একথা আজ সর্ব্ববাদিসম্মত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক হারবার্ট স্পেনসার এক সার গর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া যান; তাহার নাম "বর্ব্বরতায় প্রত্যাবর্ত্তন। স্পেনসার ছিলেন ক্রমবিকাশবাদের একজন শ্রেষ্ঠ উপাসক—বিশ্বের প্রত্যেক বিভাগে তিনি এই বিকাশবাদ প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু এই বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমলয়েরও চিহ্ন জগতে দেখিতে পাইয়াছেন। মানব সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সমর্থন আজ কাল অনেকেই করিয়া থাকেন; কিন্তু এখানে যে ক্রম-লয়েরও লক্ষণ দেখা যায়, তাহাই তিনি এই পুস্তকে দেখাইয়া গিয়াছেন। পুস্তকের নামেই তাহার প্রকাশ। পুস্তকের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—'সকল দিকেই আমরা দেখিতেছি যে, লোকের হাবভাব, মতিগতি, ক্রিয়াকলাপ যাহা আগে শান্তির অনুসরণে চলিত, তাহা এক্ষণে অশান্তি ও সংগ্রামের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইতেছে। সকল দেশে এবং সর্ব্ব প্রকারে, বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া, লোক একটা বর্ব্বরোচিত দুরাকাঙ্খার পোষণ করিয়া চলিতেছে মাত্র, তাহাদিগের মানসিক ভাব ও অন্তরের অবস্থা তদনুরূপ—সকলেই যেন রক্তপিপাসার উৎকর্ষ সাধনে মহা ব্যস্ত। সর্ব্বসাধারণের জীবনব্যাপার ও দৈনন্দিন কার্য্যে এই পরিলক্ষিত হয় যে, সকলেই বুক ফুলাইয়া চলিতে চাহে, আর তাহার প্রতিবাসীদিগের উপরে প্রভুত্ব করিয়া যাওয়া এবং তাহাদিগের বুকের রক্ত শোষণ করিয়া ঐ প্রভুত্ব ফলানই যেন জীবনের উদ্দেশ্য।

ঐ সময়েরই আর একজন ইংরেজ লেখক আলফ্রেড্ রাসেল ওয়ালেস্, লিখিয়া গিয়াছেন—এই শতাব্দীর (ঊনবিংশ) শেষ অর্দ্ধকাল সমুদয় ইউরোপে লোকের মধ্যে নূতন করিয়া একটী বিকট সামরিক স্পৃহা জাগাইয়া দিয়াছে ; সমুদয় মহাদেশটী যেন একটী বিরাট সমরশিবির ; সর্ব্বত্র প্রতিদ্বন্দ্বী সেনার সন্নিবেশ ; এমন আর কখনও দেখা যায় নাই। প্রকৃত সভ্যতা বা ধর্ম্মের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, একি ভীষণ অবস্থা—অদৃষ্টের মহা বিদ্রূপ ! যতগুলি জাতি আজ শক্তির চরম সীমা পর্য্যন্ত অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রতিবেশীর সর্ব্বনাশে আপন প্রভুত্ব গৌরব স্থাপন করিতে অতি মাত্র ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, ইহারা সকলেই কিন্তু খৃষ্ট ধর্ম্মের উপাসক ! পাশ্চাত্ত্যে উন্নতির নামে আজ এই দশা উপস্থিত ! ইহাকে উন্নতি বলিব কি অবনতি বলিব তাহাই প্রশ্ন !

একজন জাপানী রাজনীতি বিদ্ কোনও ইউরোপীয় সমাজে কতক দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—দুই হাজার বৎসর ধরিয়া আমরা পৃথিবীর অপরাপর সমুদয় দেশের সহিত শান্তি রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছি, এবং আমাদের জাতীয় কোমলস্বভাবসুলভ অত্যাশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য ও হস্তনির্ম্মিত দ্রব্যজাতের কারুকার্য্য দ্বারা জগতের নিকট খ্যাতি লাভ করিতে ছিলাম ; কিন্তু তখন বর্ব্বর বলিয়া লোকের কাছে আমরা পরিগণিত হইতাম। কিন্তু যে দিন হইতে আমরা অপর জাতির উপরে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, হাজার হাজার প্রতিপক্ষের প্রাণ নাশ করিতেছি,তখন হইতেই তোমরা আমাদিগকে সভ্যজাতি বলিয়া উচ্চ আসনে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছ !

এই বর্ব্বরতায় প্রত্যাবর্ত্তনের বিরুদ্ধে লোকের প্রতিরোধ চেষ্টা আছে এবং হইবে ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত সে জন্য যত চেষ্টা হইয়াছে, তাহার সমুদয়ই ব্যর্থ হইয়াছে। ইউরোপের হেগ নগরে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ স্থাপন এই উদ্দেশ্যেই হইয়াছিল—এবং তাহাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপক। স্বয়ং রুশের জার তখন প্রস্তাব করেন যে, কোন রাজ্যে সমর বিভাগে যেন নূতনতর আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার আর কেহ না করেন, বন্দুক বা কামানে এ যাবত যে সকল বারুদ বা বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহার করা হইয়া আসিতেছে, তদপেক্ষা অধিক শক্তিশালী বা সাংঘাতিক দ্রব্য কেহ প্রয়োগ না করে। বেলুন বা তজ্জাতীয় বায়ব যান হইতে অলক্ষ্যে উপর হইতে কেহ বোমা বা হাউই নিক্ষেপ না করে, নৌসমরে সাবমেরিন, টরপেডো বা তজ্জাতীয় ধ্বংসকারী যন্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করা হয়, আর তখন যে সকল ধ্বংসকারী অস্ত্র বা বিস্ফোরক অস্ত্রাদি ব্যবহার করা হইত, তাহারও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তখন যদি এই সকল সুযুক্তিপূর্ণ কথায় কেহ কর্ণপাত করিত বা এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ হইত, তবে আজ মানব সমাজে যে দুর্দ্দশার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অনেক অপনোদন হইত। কিন্তু হেগের সেই শান্তিসঙ্ঘ ক্রমে সমরসঙ্ঘে পরিণত হইয়াছে—হেগের সেই সুচিন্তিত প্রস্তাব হইতে বিভিন্ন জাতি সামরিক শক্তির সম্বর্দ্ধনে মাত্র নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ সেই সভা হইতে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষ ভাব মাত্র লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তৎপরে নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য ইহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগিয়া গেল। শীঘ্রই দেখা গেল জাতিতে জাতিতে শত্রুতা বর্দ্ধিত ; প্রত্যেকেই আত্মরক্ষাতে ব্যস্ত—সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ থাকিতে নহে। সকলেই নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্রের বলে বিশ্বাসবান। তখনই জারম্যানিতে বার্ণহার্ডি রব তুলিলেন—"সম্মুখে সমর অপরিহার্য্য। আপোষ মীমাংসা এ বৈরপ্রবৃত্তির হইতে পারে না,

লোকমতে কোন কাজ হইবার নয়, তাহাতে কেহ বাধ্য হইবার নয়—কেবল মাত্র যুদ্ধ দ্বারা কাহাকেও বাধ্য করা যাইতে পারে, যে যুদ্ধ ইহার পরিহার করিতে চাহে।"

হেগের সভার পরিণাম যাহা হইল, মহাসমরের পরবর্ত্তী শান্তি সভা সমূহে তাহাই অভিনীত হইয়াছে; আরও ব্যাপক ভাবে সেই ফল জেনেভার জাতি-সঙ্ঘে দেখা দিয়াছে। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নের সমাধান কিন্তু কিছুই হইল না, হয়ত আরও দূরে গিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। সান্‌ডে একসপ্রেস্ নামক ইংরেজী সংবাদ পত্রের সামরিক সংবাদ দাতা এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন —"পৃথিবীর লোক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করিতে যাইতেছে না। যে মহাযুদ্ধকে মানব সমাজের সর্ব্বশেষ যুদ্ধ বলিয়া মনে করা গিয়াছিল, তাহার বার বৎসর পরে দেখা গেল যে মানব জাতির অস্ত্রবল ও সরঞ্জাম কেবল যে অক্ষুণ্ণ ও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু বিগত ১৯১৩ খৃঃ অব্দ হইতেও উহা অনেক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে—যে সময়কার জগতের সমরবল কিন্তু ষাট্‌বৎসরব্যাপী সামরিক প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলে আসিয়া পরিণত হইয়াছিল। বিগত মহাসমরের পূর্ব্বে পৃথিবীর সামরিক ব্যয় ছিল বৎসরে ৭০০০০০,০০০ পাউণ্ড; আজ তাহার বার বৎসরে ১০০০,০০০,০০০, পাউণ্ড। ১৯১৩ খৃঃ অব্দে পৃথিবীর সামরিক নৌশক্তি ছিল ১৩৩০০০ টনের, আর ১৯২৯তে তাহা হইয়াছিল ২৮৩০০০। রুশিয়াতে ১৯১৯ অব্দেও সৈন্য বল ছিল ১০১০০০, এক্ষণে তাহা ৫৬২০০০তে উন্নতি হইয়াছে; আর তার সামরিক মনোবৃত্তি যে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা তাহার এরোপ্লেন্ ট্যাঙ্ক, আরমার-কার প্রভৃতির বিপুল আয়োজন হইতেই বুঝিতে পারা যায়, যাহাতে তাহার বাৎসরিক সামরিক খরচ তালিকা (১৯২২ ২৩ সালের) ২৪৪০০০, ০০০ হইতে ১৩৭২ ০০০, ০০০ (১৯৩২ অব্দে) মুদ্রাতে উঠিয়াছে। লেবরেটরী ও ফ্যাকটরী গুলিতে ধ্বংস ও মৃত্যুর যে সকল সরঞ্জাম প্রস্তুত করণের ভৌতিক ক্রিয়া চলিতেছে, সর্ব্বত্র তাহা বাড়িয়াই চলিতেছে।

ব্রিটিশ রাষ্ট্রগুরু মিঃ রামসে ম্যাক্‌ডনেল্ড ১৯৩১ সালে এক বক্তৃতাতে প্রকাশ করেন যে, বিগত ১৯১৪ খৃঃ অব্দের মধ্যে আমেরিকা—যুক্তরাষ্ট্রের নৌসমর বিভাগের ব্যয় ৩৬০০০,০০০ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইয়াছে; আর জাপানের বাড়িয়াছে ১১০-০ ০০০ পাউণ্ড। ঐ সময়ের মধ্যে স্থল সৈন্যের ব্যয় বৃদ্ধি করিয়াছে - ফরাসী ২০৮০০০০০ পাউণ্ড, ইটালী ১৫৪০০,০০০ পাউণ্ড, আর আমেরিকা ১৫৬৮০০০০ পাউণ্ড। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র ও ইটালী বিমান শক্তিও প্রচুর বৃদ্ধি করিয়াছে।

পাশ্চাত্য জগতে যখন নব শিল্পযুগের প্রবর্ত্তন হইল, তখন অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, বুঝি কার্পাস-শিল্পের দ্বারাই জগতের মৈত্রী-বন্ধন স্থাপিত হইবে; শান্তির বাহক স্বর্গীয় দূত কাপড়ের বাজারে আসিয়া অবতরণ করিবেন। কিন্তু হায়! (শিল্পোন্নতির ফলে) শান্তির দূতের পরিবর্ত্তে সমর পিশাচ আসিয়া জগতে নৃত্য করিতেছে!

যখন ক্ষিপ্র ক্রিয়াশীল ও বহু দূরগামী আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য দ্রুত ধ্বংসকারী নারকীয় যুদ্ধোপকরণ সমূহ আবিষ্কৃত হইল, তখন অনেকে মনে করিতেছিলেন যে যুদ্ধ করা এখন এমন বিপদসঙ্কুল হইল যে, শক্তি ও সম্পদ্‌শালী কেহ আর যুদ্ধে অগ্রসর হইবে না। কিন্তু পরিণাম তাহার বিপরীত হইয়াছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসের প্রায় কোনও যুগে যুদ্ধ এইরূপ বিস্তার লাভ করে নাই—আর সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোক এমন উৎসাহ সহকারে সমরকার্য্যে যোগদান করে নাই।

বিগত চারি বৎসরব্যাপী বীভৎস ইউরোপীয় সমরের সময় পৃথিবীর লোক যখন এক অভূতপূর্ব্ব ভীষণ রক্তকর্দ্দমে গড়াগড়ি দিতেছিল, তখন সংবাদপত্রে ও বক্তৃতা-মঞ্চ হইতে উচ্চকণ্ঠে রব উঠিয়াছিল যে, ইউরোপ বুঝি পুনর্ব্বার এই বর্ত্তমান সভ্যতার মহাপাপ হইতে মুক্ত হইতে যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃত ফল যাহা হইয়াছে তাহা স্যার ফিলিপ গীব্‌সের কথায় বলিতে হয় যে—মহাসমরে যে সকল লোক লিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা জয়ী হইয়াছিল তাহাদের আশার পরিতৃপ্তি হয় নাই, আর যাহারা পরাজিত হইয়াছে তাহারাও ভগ্নোৎসাহ হয় নাই ; এই যে ভীষণ হত্যা ও দুর্দ্দশার তাণ্ডব নৃত্য হইয়া গেল, তাহাতে ইহাদের কাহারও পক্ষ হইতেই সুদীর্ঘ শান্তির সম্ভাবনা আসে নাই, রাজনৈতিক চক্রান্তে কুটনীতির কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, সভ্য জগত যে ইহাতে কোনও অধিকার, সুখ বা স্বাধীনতা ভোগ করিবে, তাহা নয়।" আবার কেহ বলিয়াছেন—"শক্তি ও সাম্রাজ্যের উপাসক বর্ত্তমান জাতিগুলির পক্ষে কৃত্রিম (খৃষ্ট) ধর্ম্মের ভাণ ত্যাগ করিয়া সয়তানের পূজা করিতে আরম্ভ করা সঙ্গত।" অদৃষ্টচক্রের এক বিষম আবর্ত্তন মুখে এখন আমরা অবস্থিত ; মহাসমরের পাঁচ বৎর পূর্ব্বে ইউরোপের নৈতিক অবস্থা যাহা ছিল এক্ষণে (১৯৩২) তাহা সেইরূপই, এইরূপ চলিলে আর পাঁচ বর্ষ কাল মধ্যে আর একটী ঘোর সমর সংঘটিত হইয়া ইউরোপের শান্তি একবারে নষ্ট হইবে।

আজ কালের কড়ালে পড়িয়া ইউরোপ যে আপনি আতঙ্কিত হইয়াছে ও অপরের আতঙ্ক জন্মাইয়াছে, তাহা কিন্তু তাহার একান্ত কাম্য ও গৌরবের বিষয় যে বিজ্ঞানের উন্নতি, তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতিকে নব্য ইউরোপ জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন বা বিস্তার পরিচর্য্যায় নিয়োগ করে নাই—করিয়াছে অপরিমিত শিল্পোন্নতির সেবায়। তাহা হইতে প্রয়োজনাতীত শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন ও ধনীকের উদ্ভব ; তাহা হইতেই পাশ্চাত্যের এই সামরিক প্রকৃতি ও সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্বস্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে। আজ যে ইউরোপীয় শক্তিনিচয়কে বৃহৎ সৈন্য বাহিনী ও নৌবাহিনী পোষণ করিতে হইতেছে, তাহার কারণ ভিতরে আপন গৃহরক্ষা ও বাহিরে আপনাদের বাণিজ্যগত স্বার্থরক্ষা। এই স্বার্থরক্ষার জন্যই বিগত ইউরোপের মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল, এবং এই স্বার্থের জন্যই ভবিষ্যৎ সমরও হইবে। বহুদিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দেশবাসীগণ বিজ্ঞান বলে শিল্পোন্নতি করিয়া প্রচুর ধনসঞ্চয় করিয়াছিল, সেই ধনে বিপুল সৈন্য বাহিনী পোষণ করিয়া একে অন্যের দ্বারে গিয়া সমর সজ্জা করিতে চাহে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানোন্নতির আর একটী সাংঘাতিক ফল হইয়াছে—লোকের মনে অহঙ্কার বৃদ্ধি। ইহারা বিজ্ঞানের যে যৎসামান্য জ্ঞান লাভ করে, তাহাকেই চরম জ্ঞান মনে করিয়া 'ধরাকে সরা' মনে করিয়া থাকে। ইহাতেই বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতের বিকট নাস্তিকতার প্রসার সাধন হইয়াছে। ইহারই সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকারের শিল্পজাত, নানা বিলাস দ্রব্যের আবিষ্কার, তাহার ভোগে ইন্দ্রিয় সুখ বর্দ্ধন এবং দেহাত্মবোধ ও দেহ-সর্ব্বস্ব জ্ঞান আসিয়াছে। মানুষ ভোগ সুখে এতই মত্ত এবং তাহাতে এমন নীতি-বিগর্হিত কার্য্যে মগ্ন যে, সুনীতি ও ভগবদ্ সত্তার কথা শুনিলেও ইহারা শিহরিয়া উঠে!

শিবশক্তিবাদ

(শ্রীযুক্ত ভীখনলাল আত্রেয় এম্‌, এ ; ডি, লিট্‌)

দর্শনশাস্ত্রের প্রাচীনতম সমস্যা—এই দৃশ্যমান পরিবর্ত্তনশীল নানা রূপ ও নানা গুণযুক্ত জগতের তত্ত্ব অর্থাৎ মূল উপাদান এক অথবা অনেক? প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রে এসম্বন্ধে বহু মতবাদ দেখা যায়। সেই সকল মতবাদ নিম্নলিখিত কয়েকটী মতের অন্তর্গত। যথা—

(১) এই জগতে যত কিছু পদার্থ দেখা যায়, সে সমস্ত পদার্থের মূলতত্ত্ব একটী মাত্র। সেই একটীমাত্র মূলতত্ত্ব কাহার মতে জড়প্রকৃতি এবং কাহার মতে চেতন ব্রহ্ম। যাঁহারা জড়-প্রকৃতিবাদী, তাঁহারা বলেন,—চৈতন্য জড়প্রকৃতিরই অন্যতম রূপ, কার্য্য বা বিবর্ত্ত। ইহারই নাম জড়াদ্বৈতবাদ অর্থাৎ একমাত্র জড়প্রকৃতি ব্যতীত জগতের মূলতত্ত্ব অন্য কিছু নাই। পক্ষান্তরে—

যাঁহারা ব্রহ্মবাদী, তাঁহারা বলেন,—জড়প্রকৃতি চেতন ব্রহ্মেরই একটী রূপ, কার্য্য বা বিবর্ত্ত। ইহারই নাম চেতনাদ্বৈতবাদ অর্থাৎ একমাত্র চেতনব্রহ্ম ব্যতীত জগতের মূলতত্ত্ব অন্য কিছু নাই।

(২) এই জগতে দুই প্রকার পদার্থ দেখা যায়—জড় ও চেতন। এই জড় ও চেতনের কত যে ভেদ আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু সেই অগণিত জড় ও চেতন পদার্থের মূল উপাদান দুইটী মাত্র, একটী অচেতন জড়, অপরটী চেতনপুরুষ বা আত্মা। ইহারই নাম দ্বৈতবাদ।

(৩) তৃতীয় মত—নানাত্ববাদ বা বহুপদার্থবাদ। যাঁহারা বহুপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা বলেন, যদিও জগতের পদার্থসকলকে চেতন ও অচেতন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, কিন্তু চেতনের মধ্যে কত ভেদ। আজ পর্য্যন্ত একই মুখের দুইটা মানুষ দেখা গেল না। অচেতন জড়পদার্থেরও এমনই কত ভেদ। মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর—তাই কত রকম।

(৪) চতুর্থ মত—এসকল হইতে ভিন্ন। ইহারা দ্বৈত, অদ্বৈত ও নানাত্ববাদকে কোন না কোনরূপে সমন্বয়ের মধ্যে ফেলিয়া একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন। এই সমন্বয়বাদিগণ অনেকের মধ্যে এককে এবং একের মধ্যে অনেককে দেখিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ দুইই সমান। সংসারে অনেক পদার্থ আছে, সেই অনেক পদার্থের প্রত্যেক পদার্থই স্ব স্ব বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখিতে সদাই সচেষ্ট। তথাপি সেই সকল স্বাতন্ত্র্যসমন্বিত পদার্থ সকলের পরস্পর সংযোগও ঘটিতে দেখা যায়, সেই সংযোগের যিনি ঘটক—তিনি ঈশ্বর নামে পরিচিত।

এক্ষণে এই সকল মতবাদের মধ্যে কোন মত যুক্তিসঙ্গত, তাহা অতি সংক্ষেপে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথম জড়াদ্বৈতবাদ, কোন প্রকারেই দার্শনিকগণের যুক্তিসিদ্ধান্তের দ্বারা সমর্থন করা যায় না। কেন না, জড় হইতে চেতনের উৎপত্তি বা জড়ের বিকাশ চেতন অথবা জড় উপাদান সমষ্টির পরিণাম চেতন,—ইহা হইতে পারে না। চেতনের সত্তা স্বয়ংসিদ্ধ আর জড়ের সত্তা কোন

না কোন প্রকার জ্ঞানের অধীন। যদি এমন কোন জড়পদার্থ থাকে যাহাকে কেহই জানিতে পারে না বা কোন প্রকার জ্ঞানের বিষয় নহে, তাহা হইলে উহার সত্তা অসত্তারই সমান। যদি বলা যায় যাহার চেতনত্ব সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নাই, তাহাই জড়, তাহা হইলে আমি ব্যতীত সকল চেতন পদার্থ সম্বন্ধেই আমার প্রত্যক্ষ অনুভূতি কিছু নাই অতএব একমাত্র আমিই চেতন, আর সব চেতন হইয়াও অচেতন। ইহা কখন হইতে পারে না। বিজ্ঞান দিনের পর দিন—ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া যাইতেছে যে, জগতে বস্তুতঃ জড় বলিয়া কোন পদার্থই নাই। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রাকৃতিক উপাদান যে পরমাণু, তাহার ভিতরেও কোন অবিজ্ঞেয়স্বরূপা মহতী শক্তি ও চৈতন্য কার্য্য করিতেছে—ইহা প্রতীত হয়।

চৈতন্যাদ্বৈত মধ্যেও কত সন্দিগ্ধ বিচার্য্য বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম যদি এক হয় ও উহার স্বরূপ যদি এক অখণ্ড অদ্বয় হয় এবং সেই অখণ্ড অদ্বয় স্বরূপ যদি শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র হয়, তাহা হইলে সেই অখণ্ড অদ্বয় স্বরূপ কি প্রকারে বহু নাম ও বহু রূপে পরিণত হইতে পারে? শুদ্ধ চৈতন্য হইতে উহার প্রতিযোগী জড়ের উৎপত্তি অথবা শুদ্ধ চৈতন্যের জড়ত্বে পরিণতি কিংবা উহার জড়রূপে প্রতিভাষণ কি করিয়া হইতে পারে? যদি ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে একই হয়, তাহা হইলে উহাতে নানাত্ব ও পরিবর্ত্তনশীলতা প্রভৃতি কখনই হইতে পারে না। যদি বলা যায় যে, নানাত্ব যাহা দেখা যায়, উহার প্রকৃত সত্তা কিছু নাই—দ্রষ্টার ভ্রান্তি মাত্র, যে দেখে তাহার মন ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিই ভ্রান্তিবশতঃ এককে অনেক দেখিয়া থাকে—একথা বলিলে আবার একটা প্রশ্নের অবসর আসে যে, একে যে বহুত্ব প্রতীতি বা ভ্রান্তি, ইহা আসে কোথা হইতে? যদি দ্রষ্টাও এই ভ্রম বা মায়ার কার্য্য হয়, তাহা হইলে এই ভ্রম বা মায়ার উদয় স্বয়ং কি করিয়া হইতে পারে? শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত কোন অসর্ব্বজ্ঞ দ্রষ্টা ও ভ্রমের সত্তা যদি না স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ভ্রম কখন হইতে পারে না। এই সকল সন্দিগ্ধ ও বিচার্য্য বিষয় দেখিয়া চেতনাদ্বৈতবাদও যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয় না। এখন রহিল দ্বৈতবাদ।

দ্বৈতবাদকে স্থূলদৃষ্টি দ্বারা সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু যদি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রণিধান করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দ্বৈতবাদওসমীচীন বলিয়া মানিতে পারা যায় না। জগতে যতকিছু জড়পদার্থ আছে সে সমস্তই গুণময়ী প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত এই কথা দ্বৈতবাদিগণ বলেন। কিন্তু জগতে প্রত্যেক দ্রব্যেরই একটা বিশেষ গুণ দেখা যায়। এজন্য এক দ্রব্যের স্থানে অপর দ্রব্য কার্য্য করিতে পারে না। যদি সব দ্রব্যেরই মূল একমাত্র গুণময়ী প্রকৃতি, ইহা মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই প্রকৃতিতে সকল দ্রব্যেরই একমাত্র সাধারণ গুণই বিদ্যমান, তা ছাড়া অন্য কোন গুণ নাই, ইহা স্বীকার করিতে হয়। জগতের যাবতীয় বস্তুতেই সেই একটী মাত্র প্রকৃতিগত গুণেরই বিকাশ ভিন্ন অন্য কিছু নাই ইহা অসম্ভব। যেমন অদ্বৈতমতে সবই একমাত্র ব্রহ্ম বলায়, ব্রহ্মের জীবভাবে বহুত্ব স্বীকার করা কঠিন হইয়া পড়ে। যদি বলা যায়, অনেক মনুষ্যকে একমাত্র মনুষ্যশব্দদ্বারা বা পশুকে একমাত্র পশুশব্দদ্বারা যেমন অভিহিত করা যায়, বস্তুতঃ পক্ষে মনুষ্যও পশু সকল পরস্পর ভিন্ন, তেমনি প্রতি জীবান্তর্গত ব্রহ্ম একই ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু নহে। কিন্তু ইহা বিচারসহ নহে। যেহেতু প্রতি জীবের সুখ, দুঃখ, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি সবই ভিন্ন। যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, সংসারে দুইটীমাত্র তত্ত্ব ভিন্ন কিছুই নাই, উহাদের মধ্যে একটী চেতন অপরটী অচেতন

জড়পদার্থ; তাহা হইলেও ইহা বুঝিতে পারা যায় না যে, কি করিয়া একমাত্র জড়পদার্থ হইতে এত বিভিন্ন প্রকার জড় পদার্থ এবং একমাত্র চেতন পদার্থ হইতে কি করিয়া এত বিভিন্ন প্রকার চেতনের সৃষ্টি হইতে পারে? তদ্ভিন্ন—জড় ও চেতন সম্পূর্ণ পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, উহারা কি করিয়া একত্র মিলিত হইতে পারে?

জগতের সকল পদার্থই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। জড়ের সহিত চেতনের সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ। শরীর ও আত্মা, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পরস্পর সম্বন্ধ—এই সব কারণে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পরিণামে জড় ও চেতনের মধ্যে কোন বৈষম্যই নাই। সুতরাং জড়চেতনের শেষ পরিণতি এক। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে দ্বৈতবাদ নিরর্থক বলিয়া প্রতীত হয় এবং ব্যক্তিত্ব এবং বিশেষত্ব বিষয়ে প্রণিধান করিলে নানাত্ববাদই সত্য বলিয়া মনে হয় ও সম্বন্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অদ্বৈতবাদই সত্য বলিয়া মনে হয়।

যাঁহারা নানাত্ববাদী, তাঁহারা ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বের দিকেই বিশেষ জোর দিয়া থাকেন। প্রত্যেক বস্তুই বিশিষ্ট এবং প্রত্যেক জীবই ব্যক্তি, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে দর্শনশাস্ত্রের বিচার বা সিদ্ধান্ত এই ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল সামান্য ধর্মযুক্ত সত্তামাত্রের প্রতি জোর দিয়া থাকে এবং সমস্ত বস্তুর সত্তামাত্র প্রকৃতি অথবা ব্রহ্ম বলিয়া বিরত হয় আর বার বার জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয়,—নানাত্ব ও ব্যক্তিত্ব ভ্রমমাত্র, সে বিচার বা সিদ্ধান্ত কখন সর্ব্বমান্য হইতে পারে না। এইরূপ যে দর্শনশাস্ত্র নানা বস্তু ও ব্যক্তির অতিরিক্ত জগতে কোন প্রকার একত্ব স্বীকার করে না, সে দর্শন শাস্ত্রের মত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যদি সমস্ত বস্তু ও জীবের সহিত সম্বন্ধকারক অথচ বস্তু ও জীব হইতে পৃথক কোন এক বিশেষ পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সে ঈশ্বর যে জগতের সমস্ত বস্তু ও জীব হইতে পৃথক এবং ঈশ্বর হইতে বস্তু ও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, ইহা মানিতেই হয় এবং বস্তুর স্বভাবও গুণ ঈশ্বরাধীন নহে, ইহাও মানিতে হয়। সুতরাং নানাত্ববাদে এই জগৎ ঈশ্বরাধীন ইহা প্রতিপন্ন হয় না। ঈশ্বর জীব ও প্রকৃতি এই তিনটীর সম্বন্ধ একই তত্ত্বের অধীন ইহা মানিতে হইলে এমন একটী পরম তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়, যাহাতে উক্ত পদার্থত্রয় একত্র পরস্পর সম্মিলিত ও সম্বদ্ধ থাকে।

নানাত্ব ও একত্ব পরস্পর সাপেক্ষ যেহেতু প্রত্যেক দৃশ্যমান পদার্থ, এক দিক্ দিয়া অর্থাৎ কারণের দিক্ দিয়া দেখিলে এক এবং কার্য্যের দিক দিয়া দেখিলে অনেক। যেমন বৃক্ষ বা শরীর। বৃক্ষ বলিতে সব বৃক্ষই বৃক্ষ কিন্তু বৃক্ষে কত পার্থক্য বিদ্যমান—এইরূপ শরীর। বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব কি প্রকার তাহা জানিতে হইলে,—কার্য্যকারণবাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। নতুবা বিশেষত্বও ব্যক্তিত্ব জ্ঞান বড়ই দুর্জ্ঞেয় হইয়া পড়ে। জগতে এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা কোন বিশেষরূপে চিরকাল থাকিতে পারে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই প্রতীত হয় যে—কোন বস্তুই সর্ব্বক্ষণ এক অবস্থায় থাকে না, প্রতি ক্ষণেই উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্থান পরিবর্ত্তনেও বস্তুর বিশেষত্ব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তাছাড়া, একবস্তু অন্যবস্তুর নিকট থাকিলেও তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তন, কি জড়, কি চেতন সকলেরই হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক ক্ষণ, প্রত্যেক স্থান বা দেশ ও প্রত্যেক পরিস্থিতি দ্রব্যের পরিবর্ত্তনের হেতু। এই সঙ্গে ইহাও দ্রষ্টব্য যে, পদার্থ সকল

পরস্পর পৃথক হইলেও উহাদের মধ্যে একটী একত্ব ব্যাপক সম্বন্ধ আছে। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের শক্তির কেন্দ্র এক ও অণু-পরিমিত এবং প্রত্যেক ব্যক্তির পশ্চাতে সারা জগতের অনন্ত শক্তি অব্যক্ত রূপে বর্ত্তমান ইহাও জানা যায়। সংসারে এমন কোন বস্তু নাই আর এমন কোন ব্যক্তিও নাই যিনি, জগতের যাবতীয় পদার্থকে অনন্ত কালের জন্য এক অবস্থায় ধরিয়া রাখিতে পারেন। বিশেষত্ব ও ব্যক্তিত্ব স্বয়ং পর্য্যাপ্ত বা স্বয়ং সিদ্ধ নহে। গৃহ কক্ষে থাকিয়া জানালা দিয়া জগদ্দর্শনের মত নানাত্ব দর্শন। প্রত্যেক ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব দৃষ্টিতে অণুপরিমিত কিন্তু বিচার দৃষ্টিতে উহা মহান্ হইতে মহান্। একজন বৈজ্ঞানিক ঠিকই বলিয়াছেন যে,—"জগতের এক একটী অণুর পশ্চাতে এতশক্তি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে যে, যাহাদ্বারা কোটিবর্ষ ধরিয়া কোটিকোটি অশ্বের শক্তিসমন্বিত মেসিনকে চালান যাইতে পারে। জগতের প্রত্যেক পদার্থই অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্। যাহা অণু তাহা বহু এবং যাহা মহান্ তাহা এক। এজন্য বলা উচিত যে জগতে নানাত্ব, বস্তু সকলের ভেদদৃষ্টি দ্বারা এবং একত্ব অভেদ দৃষ্টি দ্বারা হইয়া থাকে অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থই এক মহতী শক্তির অন্তর্গত।

এই সকল বিচারের দ্বারা মনে হয়—বিশ্বের নানাত্ব দেশকাল ও পরিস্থিতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং দেশ কাল ও পরিস্থিতি পরিত্যাগ করিযা দেখিলে সবই এক তত্ত্বের অন্তর্গত। যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে এক তিনিই আজ এই বিশ্বে বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। যাহা এক, তাহা সামান্য গুণস্বরূপধারী শুষ্ক সৎপদার্থমাত্র নহে। তিনি সর্ব্বগুণময় ও সর্ব্বশক্তিময়। সেই এক সর্ব্বগুণময় সর্ব্বশক্তিময় পদার্থ নিত্য, সত্য ও অনন্ত। তদ্ভিন্ন যাহা কিছু সবই অনিত্য, অসত্য ও সান্ত।

যিনি এক, যিনি সত্য, যিনি অনন্ত—তিনিই ব্রহ্ম নামে অভিহিত। ব্রহ্মের কোন বিশেষ নামগুণ বলিতে পারা যায় না, কিন্তু উহার লক্ষণ বলিতে পারা যায়। সেই নিত্য, সত্য, অনন্ত - ব্রহ্মনামে অভিহিত পদার্থই জগতের পরম তত্ত্ব,—উহারই নাম শিব এবং সেই শিবের ক্রিয়াশক্তির নাম শক্তি। শিব এক হইয়াও ক্রিয়াশক্তির দ্বারা নানারূপে নিজেকে বিকশিত করিয়া জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। শিব ও শক্তি অভিন্ন পদার্থ, ইহাদের পার্থক্য নাই! যেখানে শিব সেই খানেই শক্তি, যেখানে শক্তি সেই খানেই শিব। এই শিবশক্তিবাদ—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে নিম্ন লিখিত শ্লোক সকলের দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়ন্তে সমস্তা ভূতজাতয়ঃ।
অনারতং প্রতিদিশং দেশে দেশে জলে স্থলে ॥ ১ ॥
ন সম্ভবতি সম্বন্ধো বিষমাণাং নিরন্তরঃ।
ঐক্যং চ বিদ্ধি সম্বন্ধং নাত্যসাবসমানয়োঃ ॥ ২ ॥
সর্ব্বা এতাঃ সমায়ান্তি ব্রহ্মণো ভূতজাতয়ঃ।
কিঞ্চিৎ প্রচলিতাভোগাৎ পয়োরাশেরিবোর্ম্ময়ঃ ॥ ৩ ॥
সত্যং ব্রহ্ম জগচ্চৈকং স্থিতমেকমনেকবৎ।
ব্রহ্ম সর্ব্বং জগদ্বস্তু পিণ্ডমেকমখণ্ডিতম্ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বশক্তিপরং ব্রহ্ম সর্ব্ববস্তুময়ং ততম্।
সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বং সর্ব্বৈঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বগম্ ॥ ৫ ॥

চিন্ময়স্ব পরমাকাশে৷ য এব কথিতোময়া।
পুরুষোঽসৌ শিব ইত্যুক্তো ভবত্যেষ সনাতনঃ॥ ৬॥
অনন্যাং তস্য তাং বিদ্ধি স্পন্দশক্তিং মনোময়ীম্।
স্পন্দশক্তিস্তদিচ্ছেয়ং দৃশ্যাভাসং তনোতি সা॥ ৭॥
তস্মান্ন দ্বৈতমস্তীহ ন চৈক্যং ন চ শূন্যতা।
ন চেতনাচেতনত্বং বৈ মৌনমেব ন তচ্চ বা॥ ৮॥

পূজা ও অর্চ্চনা

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী—কবিভূষণ বেদান্তশাস্ত্রী বি, এ, ভাগবতভূষণ

শরতে আগমনী।—দিগ্‌দিগন্তে শ্যামায়মানা শস্যসম্ভারাকুলা লক্ষ্মীদেবী অঞ্চল দোলাইয়া জানাইয়া দেন—শরতের পরিপূর্ণ শ্রী প্রকৃতির সদ্যঃস্নাত সেই রূপকে অভিবাদন করিতে কমল ফোটে—সে তাহার বীজ কোন্ গভীর পঙ্কের ভিতরে লোকচক্ষুর অন্তরালে অব্যক্ত প্রকৃতির কোন্ বিরল গহ্বরে রাখিয়া কাল জলের সর্ব্ববিধ বেষ্টনীর মধ্যে যেন কারণসলিলের অসংখ্য ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে কোমল শীতল স্নেহরসের প্রতীক,—মৃণালের কোনও সার্থকতা নাই. সে নিজেকে লুকাইয়া ধরিয়া থাকে, ঐ পদ্মপত্র যাহার উপর জীবকণ্ঠিত কারণবিন্দু গড়ায় টলিয়া পড়ে ঢলিয়া পড়ে, সলিলরাশিতে মিশিয়া পড়ে অনাসক্তির প্রতীক, আর ঐ মৃণাল সার্থক হয় শতদলে বিকসিত হইয়া,—অনবদ্য, নির্ম্মম, উষার কোলে পেলব শুভ্রবর্ণ স্নিগ্ধগন্ধ বিকিরণ করিতেই তাহার জন্ম, পবিত্রতার আদর্শ রক্ষা করিতেই তাহার বিকাশ, তদ্দূরে তদন্তিকে সবিতৃ দেবতাকে বরণ করিতেই তাহার একাগ্রতা—মানবের জীবন সাধনার প্রতীক। এই পঙ্কজ-লক্ষণা শরৎ আজ আসিয়াছে।

এই ভূমা সংস্পর্শে পবিত্র হইয়া আজ বাঙ্গালীর জন্ম সার্থক, কর্ম্ম সার্থক, মানবতা সার্থক, আজ বর্ষাবিধৌত প্রকৃতির সহিত বিরাট ভূমাও পবিত্র হইয়া আব্রহ্ম ভুবনালোকের তৃপ্তিসাধনের অধিকারী। এই পঙ্কজলক্ষণা শরতে মানবজীবন আজ শতদলের মত নিবেদিত হইয়া গেল। তাই আজ পবিত্র হৃদয়ে আবাহন করি, এস মহাশক্তি মা! এস দেবীরূপে, মহাশক্তির অত বড় বিরাট রূপ লইয়া সন্তানের ত্রাস সঞ্চার করিও না, এস বরাভয়দাত্রীরূপে, এস দশদিক্ আলো করিয়া, এস পিতৃগৃহে আদরিণী কন্যারূপে। শাস্ত্র বলেন,—দুর্গা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আজ এই শরতে সকল পৃথকবুদ্ধির, দেহাত্মবুদ্ধির, অহমিকাবুদ্ধির, অব্যবসায়ীবুদ্ধির লয় সাধন করিয়া ডাকিতেছি—মা, করুণাময়ী, এস মা, আজ বড়ই কাতর, মা, তোমার বুদ্ধিতে আমাদের জাগাও মা!

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

প্রতিমা।—প্রতিমা, প্রতিকৃতি ও অর্চ্চা—একার্থক শব্দ। ইহাদের অর্থ তুলনা বা উপমা। চিন্ময় ব্রহ্মের ধারণা ও পূজা দেহাত্মমানী মানবের পক্ষে দুঃসাধ্য বলিয়া আর্য্যশাস্ত্রে স্মরণাতীত কাল হইতে আর্য্যাবর্ত্তে প্রতিমাপূজারূপে প্রতীকোপাসনা সুপ্রচলিত। হৃদয়ে সরস ভাব হইলেই প্রকৃত পূজা সম্ভব। কিন্তু হৃদয় ত সকলের পক্ষে সরস হওয়া সম্ভবপর নহে—কারণ সাধারণতঃ উহা সর্ব্বদাই মরুভূমির মত ধূ ধূ করিতেছে—কদাচ কখন মারব অর্থাৎ ওয়েসিসের মত উহাতে সরস ভাব দেখা দেয়। এই জন্য সাধারণতঃ বর্ত্তমান যুগে পূজা পদ্ধতির সৃষ্টি—তাই সকল সম্প্রদায়ে অনুষ্ঠানের বাহুল্য। কিন্তু পূর্ব্বকালে যজ্ঞপ্রধান বৈদিক যুগে যাজ্ঞিক কর্ম্মিগণ অগ্নি আধারে দেব-পূজা, তৎপরে যোগের প্রচলনে যোগিগণ হৃদয়পুণ্ডরীকে এবং পৌরাণিক যুগের উপাসকগণ উক্ত দুইটী প্রতীক ছাড়া প্রতিমাতে ও পরে উক্ত সকল যুগের যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শী সাধক, তাঁহারা অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ফলতঃ সাধনার দ্বারা ভগবৎকৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ হইলে তবে ঈশ্বরের রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কিন্তু সাধকের দিব্যদৃষ্টি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিমাপূজা বা প্রতীকোপাসনা প্রথম সাধকের পক্ষে কেবল প্রয়োজনীয় তাহা নহে, উহা অপরিহার্য্যও জানিতে হইবে। তবে যাহারা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে চীৎকার করেন, তাঁহারা হয় সনাতন পদ্ধতির সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মসাধনের বিরোধী, নয় নববিধানানুযায়ী নূতন কোন অনুষ্ঠানপদ্ধতির পক্ষপাতী। আর এক অবস্থায় পূজানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে চীৎকার দেখা যায়, যখন মানুষ বারংবার পূজা বা অনুষ্ঠান করিয়াও হৃদয়ের সরসভাব জাগাইতে সক্ষম হয় না তখন উহার মূল ভাবটী ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইতে থাকে—কিন্তু যখন সে ব্যক্তি কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ে ভাবোদ্দীপনে কৃতকার্য্য হয়, তখন আবার তাহার সেই হৃদয়গত ভাব আত্মপ্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়। প্রকৃতপক্ষে সেই সর্ব্বভাবাতীত সমাধি অবস্থা লাভ না করিতে পারিলে, সর্ব্বানুষ্ঠানের অতীত হওয়া যাইতে পারে না। তত্ত্বটী পরবর্ত্তী কালের জনৈক বৈষ্ণব সাধক বেশ পরিস্ফুট করিয়াছেন ;—

"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল।
সে দেখিতে পায় যা'র আঁখি নিরমল॥
অন্ধীভূত দৃষ্টি যা'র বিষয়-ধূলিতে।
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥"

এ বিষয় প্রমাণশিরোমণি "যোগবাশিষ্ট রামায়ণের নির্ব্বাণ প্রকরণের পূর্ব্বভাগে অতি স্পষ্ট ভাষায় উপনিবদ্ধ হইয়াছে। ঐ স্থানে মহর্ষি বশিষ্ঠ, প্রশ্নকর্ত্তা ভরদ্বাজ ঋষিকে বুঝাইতেছেন—

"সাকারং ভজ ভাবত্বং যাবৎ সত্ত্বং প্রসীদতে।
নিরাকারে পরে তত্ত্বে ততঃ স্থিতিরকৃত্রিম॥"

"সখে ভরদ্বাজ, সাধনার সাহায্যে যতদিন সত্ত্বশুদ্ধি না হয়, ততদিন সাকার ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রতিমা পূজা বা ভজনা কর, অনন্তর সাকার উপাসনায় সত্ত্বনৈর্ম্মল্য ঘটিলে, তখন তোমার নিরাকার পরতত্ত্বে ঐকান্তিকী স্থিতি হইবে। যেমন তরঙ্গের উপশান্তি না ঘটিলে সলিলের স্বচ্ছতা হয় না এবং সলিল স্বচ্ছ না হইলে যেমন নিস্তরঙ্গ হ্রদের তলস্থিত পদার্থ দেখা যায় না, সেইরূপ সাধনার সাহায্যে চিত্তের রজস্তমো ঘটিত চাঞ্চল্য ও অজ্ঞান অন্ধকার সমূলে উৎখাত না হইলে, উহাতে

পরতত্ত্ব প্রতিভাত হইতে পারেন না। শ্রীমদ ভগবদ্গীতার শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে উপযোগিতা প্রসঙ্গে স্বামিপাদ শ্রীধর বলিয়াছেন,—মন ইন্দ্রিয়পথে সর্ব্বদা বাহ্য বিষয়ের দিকে ছুটিতেছে। উহাকে ঈশ্বরে স্থির ভাবে নিবদ্ধ করিবার জন্যই গীতার দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ জগতের সমস্তই তাঁহার বিভূতি, অর্জ্জুনকে এই মহৎ তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীভগবানের উক্তি যে, এই পূজায় উন্নতি লাভ করিলে তুমি জ্ঞান লাভ করিয়া পরে আমার সেই পরম রূপ উপলব্ধি করিবার পরে মুক্তি লাভ করিবে। ফলতঃ অদ্বৈতবাদের চরম গ্রন্থ বেদান্তদর্শন ও উহার ভাষ্যে প্রতীকোপাসনা প্রস্তাবে প্রতিমাপূজার স্পষ্ট সঙ্কেত দৃষ্টিগোচর হয়। যথা :—"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।" ৩।২।২৪ সূত্রে ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধান, স্তুতি ও প্রণামাদির সময়ে যোগীরা ঈশ্বর দর্শন করেন। এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ বেদে এবং অনুমান স্মৃতিতে প্রমাণ আছে।

একজনের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, সাধনার তারতম্যে অপরের পক্ষে তাহা কৃত্রিম। একজনের ভিতর যে ভাবের বিকাশ হইল, সেই প্রকাশ যদি অপর দশজনে স্বায়ত্ত করিতে যায়, তবে তাহাদের পক্ষে অন্ততঃ প্রথমাবস্থায় উহা যে অল্প বিস্তর কৃত্রিমভাবাপন্ন হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাকেই বলে -"ভাব আরোপ করা"। এই ভাবের আয়ত্তীকরণ আবার দ্বিবিধ উপায়ে সাধিত হইতে পারে—উচ্চ ভাবসম্পন্ন পুরুষের বাহ্য কার্য্যকলাপ আচার ব্যবহারাদির অনুকরণ চেষ্টা, অথবা চিন্তা দ্বারা ভিতরের ভাব ধারণার চেষ্টা। ইহাতে সর্ব্বদাই বিপদাশঙ্কা এই যে, এই জগতে এই মায়ার রাজ্যে—তমোগুণ বা নিশ্চেষ্টতার এতই প্রাবল্য যে, যতই উচ্চভাব হউক না কেন, উহার চিরকালই নিরর্থক বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। উহা নিবারণ করিবার একমাত্র উপায় নিজ ধর্ম্মজীবনকে সতেজ ও সরস রাখিবার অবিরাম চেষ্টা—সর্ব্বক্ষণই মনে রাখিবার চেষ্টা—আমরা জড়যন্ত্র মাত্র নহি—আমরা চিন্তাশীল মানুষ। তাই বলি, শুধু অনুষ্ঠান ত্যাগ করিলেও হয় না, আবার কেবল নিয়মিত ভাবে জড়যন্ত্রের মত অনুষ্ঠান করিয়া গেলেও হয় না—চাই জীবন—চাই ভাব—চাই অমৃত্যু—অহরহঃ কঠোর চেষ্টা।

হিন্দুধর্ম্মে যোগ ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমাপূজার অনুষ্ঠানও সমসূত্রে ব্যবস্থাপিত। মহর্ষি শাণ্ডিল্য বিখ্যাত অদ্বৈতবাদী হইয়াও তাঁহার দর্শনসূত্রে প্রতিমাপূজার পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য স্মৃতিশিরোমণি মনুসংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে ১৩০ সংখ্যক শ্লোকে প্রতিমার ছায়া লঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রতিমার ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা কর্ত্তব্য এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার উপসংহারে যেমন প্রতিমাদিতে বিষ্ণুর উপাসনা হয়, সেইরূপ আদিত্যাদি অগ্নি সলিল প্রভৃতি প্রতীকে উপাসনার বাহ্য অবলম্বনে ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে, এইরূপ স্পষ্ট সমর্থন করিয়াছেন।

হিন্দুর প্রতিমা পূজা যে ব্রহ্মোপাসনার প্রকারভেদমাত্র, উহাতে যে পৌত্তলিকতার গন্ধমাত্র নাই, তাহা সর্ব্ব প্রমাণশিরোমণি ঋগ্বেদের ৬।৬।২২।১০ মন্ত্রেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জগদম্বাকে দেবতারা কাতরে প্রার্থনা করিতেছেন—"হে দেবি, চণ্ডিকে! তুমি আমাদিগকে সুখকর পথ প্রদান কর।" কিন্তু উহা অমূর্ত্ত হইলে তবে বায়ুপুরাণে কেন সর্ব্বজ্ঞতা নিত্যতৃপ্তি, নিত্যজ্ঞান, স্বতন্ত্রতা, অলুপ্তশক্তি, অনন্তশক্তি, পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভৃতি ঈশ্বরের নিত্যগুণ বলা হইয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রে তৈত্তিরীয়ক আরণ্যকের ১০।১।১৫ মন্ত্রে সিদ্ধ গন্ধর্ব্বাদিগণের স্তবে দেখা যায় তাঁহারা জগদম্বাকে প্রণাম করিবার সময়ে বলিতেছেন, -"ভক্তবৃন্দের অভীষ্টদাত্রী সংসারদুঃখহন্ত্রী, সেই বেদাদি প্রসিদ্ধ

অগ্নিবর্ণা, অষ্টভুজাদিযুক্তা, নিজ অঙ্গকান্তি দ্বারা শত্রুদাহকারিণী দেবীকে নমস্কার করি।" সাধক পূজক তাঁহার পূজ্য ইষ্টদেবকে কতকগুলি উত্তম উত্তম আদর্শগুণে গুণবান্ ভাবিয়া পূজার সাহায্যে ঐ দুর্লভ গুণগুলি আত্মপ্রতিষ্ঠ করিয়া দেবতাভাব লাভ বা জীব হইয়া শিবত্ব লাভ করাই পূজার পরম ও চরম লক্ষ্য। বলা বাহুল্য, পূজা অর্চ্চনাদির মূল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। পূজার আধার বা অধিষ্ঠান প্রতিমা। প্রতিমা দেবতার সাদৃশ্য মূলে পরিকল্পিত প্রতীক। কিন্তু পূজা বা উপাসনা শব্দের অন্তরে যদি কোন ভাবময়ী প্রতিমার নিত্যসত্তা না থাকে, উহাতে প্রার্থনাকারী ও শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মন সাময়িক তৃপ্তি লাভ করিলেও ঐ তৃপ্তি অভিনেতা নটের নাটকীয় রাজ্যলাভ জন্য তৃপ্তি সদৃশ অন্তঃসার শূন্য প্রার্থনা উন্মত্ত প্রলাপে পর্য্যবসিত হয়। পাশ্চাত্য কবিগুরু সেক্সপীয়রও কটাক্ষ করিয়াছেন যে "ভাববিরহিত শব্দরাশি কখনও ভগবানের রাজ্যে পৌঁছে না।"—"Words without thoughts never to heavend go." তাই নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দ ঈশ্বরের স্বরূপধ্যান করার একমাত্র পন্থা পুরাণরাজ বিষ্ণুপুরাণের আদেশ—বর্ণাশ্রম ও সদাচার সম্পন্ন পুরুষ মাত্রেই পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিবে। শ্রীভগবানের প্রীতিসাধনের প্রধান উপায় আরাধনা বা পূজা। যথাঃ—

"বর্ণাশ্রমাচাররতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥"

এই পূজা সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর নামক প্রামাণ্য নিবন্ধে দিবারাত্রে অন্ততঃ একবার শ্রীভগবানের অর্চ্চনা না করিলে নরকগমন অনিবার্য্য বলা হইয়াছে। অবশ্য পূজায় অশক্ত এবং অযোগ্য ব্যক্তি-দের সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্র নীরব নহেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান,—"অপরের পূজিত অথবা পূজ্যমান বিগ্রহ শ্রীহরিকে যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে দর্শন করেন এবং শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পূজাদি দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হন, তিনিও ঐ পূজার ফলভাগী হন।" এই হেতু দেবালয়ে বা দেবদেবীর মন্দিরের সমীপবর্ত্তী হিন্দু মাত্রেই প্রণাম করেন।

পূজা।—পূজা শব্দের যৌগিক অর্থ অর্চ্চনা বা আরাধনা। কিন্তু বঙ্গদেশের সহিত দুর্গাপূজার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ, নিবিড় পুরাতন ও পরিচিত যে, পূজা শব্দটি এদেশে দুর্গাপূজা অর্থে রূঢ়ি অর্থাৎ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গলায় মা দুর্গার প্রতিমার রূপ সাঙ্গোপাঙ্গ, অনুচর, বাহন যাহা কিছু সবই যেন ভক্তিসরস সরল বিশ্বাসী, বাঙ্গালী হৃদয়ের ভাবে রঙ্গে রঞ্জিত ও শ্রদ্ধা বিশ্বাসে ভরা। বাঙ্গালী জানে, বুঝে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, অকপটে যথ শক্তি স্নেহময়ী জগদম্বার সেবা করিতে পারিলে বিশ্বজননী সকলের সকল প্রকার দুঃখদৈন্যের অবসান করিবেন। তাই সাধক বাঙ্গালী মহামায়ার মহাপূজার আয়োজন অনুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর।

আমাদিগের বাঙ্গলা দেশে যে পূজাপদ্ধতি প্রচলিত, তাহাতে বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক—তিন ভাবেরই প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটস্থাপনাদির মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ বৈদিক—অন্যান্য স্থলেও নানা বৈদিক মন্ত্র সংগৃহীত হইয়া পদ্ধতির মধ্যে সন্নিবিষ্ট। পূজার প্রণালীটি সম্পূর্ণ তান্ত্রিক - পূজা করিতে বসিলেই কয়েকটি বিশিষ্ট ক্রিয়া করিতে হয়। অদ্বৈতবাদ এই তান্ত্রিক পূজাপ্রণালীর দার্শনিক ভিত্তি। আবাহন করিতে হয় হৃদয় হইতে, বিসর্জ্জনও হৃদয়ে করিতে হয়। প্রথমে মানসপূজা তাহার পর বাহ্যপূজা। ভূতশুদ্ধি নামক ক্রিয়ার মূলতত্ত্বের তাৎপর্য্যই অদ্বৈত ভাবনা

—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব মূলশক্তি শক্তির সহিত নিজ কারণ পরমাত্মায় বিলীন—ইহাই ঐস্থলে মূল ভাবনার কথা। সমুদয় ক্রিয়াগুলির মূল কথা শুদ্ধি। এই শুদ্ধিকে ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—মন্ত্রশুদ্ধি, দেবতাশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি। সমুদয় ক্রিয়াগুলির মূলই ধ্যান বা ভাবনা, ইহা যোগেরই বিভিন্ন অঙ্গ। এই ভাবনার প্রধান সহায়ক মন্ত্র। কিন্তু পূজা পদ্ধতির পৌরাণিক উপাদানটী ভক্তিরসাত্মক। তাই যেরূপ পূজায় মা দুর্গা তুষ্ট হন, সেদিকে আমাদিগকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শাস্ত্রে মায়ের পূজার প্রথম ও প্রধান বিধানে দৃষ্ট হয়,—"যেখানে পূজক তপোযোগযুক্ত, পূজার দ্রব্যগুলি বিত্তশাঠ্যবর্জ্জিত, যথাশক্তি ও যথাশাস্ত্র সংগৃহীত এবং প্রতিমার মূর্ত্তি এমন সুন্দর ও সুগঠিত হয় যে, দৃষ্টিপাত মাত্রেই দর্শকের ষোল আনা মন প্রাণ অজ্ঞাতসারে মায়ের চরণে সমর্পিত হয়, তথায় নিশ্চয়ই মা দুর্গা আবির্ভূতা হইয়া ঐসকল ভক্ত সন্তানের পূজা গ্রহণ করেন।" তাই আমাদের ঋষিপ্রোক্ত আর্য শাস্ত্রে বলে—"বৈধী পূজায় তিনটী ব্যাপারের একান্ত আবশ্যকতা।" যথা :—　　"অর্চ্চকস্য তপোযোগাৎ পূজনস্যাতিশায়নাৎ। (দ্রব্যস্য)

আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি ॥ (হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র)

উদ্ধৃত প্রমাণে বুঝা যায় যে, অর্চ্চক—যিনি পূজা করিবেন—তাঁহাকে তপস্বী হওয়া প্রয়োজন, পূজাকর্ত্তার প্রধান গুণ তপস্যা অর্থাৎ স্বধর্ম্মে অবিচলিত নিষ্ঠা। মহাভারতের উক্তি "তপঃ স্বধর্ম্মবর্ত্তিত্বম্।" যে স্বধর্ম্মে আস্থাহীন, তাহার পূজাদির অনুষ্ঠানে অধিকার নাই। শাস্ত্রে, ব্রাহ্মণের বৈদিকী সন্ধ্যা ও উপাসনাদির সহিত অনুষ্ঠিত পূজাদির সাফল্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই স্বধর্ম্মবর্ত্তিকার প্রাণ ভক্তি। ভক্তিহীন পূজা প্রাণহীন দেহ তুল্য। তাই "দেবোভূত্বা দেবং যজেৎ।" যিনি ইন্দ্রিয়মনাদি সংযত করিতে না পারিয়াছেন, তিনি হৃদয়দেবতাকে জাগাইতে পারেন না। যাঁহার ভাবনার অভ্যাস হয় নাই, তিনি শুধু উপর উপর বাহিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান জানিলে বা মন্ত্র মুখস্থ করিলে অথবা উহার অর্থ বুঝিলেও যথার্থ পূজকপদবাচ্য হইতে পারেন না। তপস্যা চাই, মন এবং ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ চাই—তবে সে পূজার যথার্থ অধিকারী। তাই উপবাসী হইয়া পূজা করার ব্যবস্থা আবহমানকাল বিধিবদ্ধ আছে।

এ বিষয়ে স্বয়ং শ্রীভগবানের উপদেশ,—বৈদিক সন্ধ্যাহ্নিকের দ্বারা হৃদয়ে ভক্তি আনিতে হইবে। ফলতঃ বর্ণাশ্রমী সদাচারী মাত্রেরই পূজার অধিকার থাকিলেও শাস্ত্রোক্ত প্রাথমিক অনুষ্ঠানগুলি যথাযথ আচরিত ও অভ্যস্ত না হইলে প্রকৃত পূজা হয় না। যথার্থ অর্চ্চকই প্রতিমার যথার্থ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন।

শ্রীভগবানের উক্তি,—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

দ্বিতীয়তঃ—　　"সন্ধ্যোপাস্যাদি কর্ম্মাণি বেদেনাচোদিতানি মে।

পূজাং তৈঃ কল্পয়েৎ সম্যক্ সঙ্কল্পঃ কর্ম্মপাবনীম্ ॥" (শ্রীভাগ. ১১)

বর্ণাশ্রমী সদাচারী হিন্দু গৃহস্থের পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৪ ২য় শ্লোকে মুনিগণ বসুদেবকে বলিয়াছেন,—"দায়, ক্রয়, জয় প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত উপায়ে লব্ধ বিশুদ্ধ অর্থে শ্রীভগবানের পূজা করা দ্বিজাতির পক্ষে শ্রেয়োলাভের প্রশস্ত পন্থা। ভক্তিসন্দর্ভের উক্তি যে,—

সম্পত্তিশালী গৃহস্থের পূজা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যথা—"যে তু সম্পত্তিমন্তো গৃহস্থাস্তেষামর্চ্চনমার্গ এব মুখ্যঃ।"

পূজকের দেবদেবীর প্রতিমাখানি সুদৃশ্য হওয়া আবশ্যক। প্রতিমানির্ম্মাতা যদি সাধক হয়, তবেই প্রতিমাখানি দেখিলেই জগজ্জননী দুর্গা দেবীর স্মৃতি আপনিই স্মরণপথে উদয় হয়, তাহাই যথার্থ পূজার উপযোগী। এখনও এমন এক এক জন সাধক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা স্বয়ং প্রতিমা গড়িয়া পূজা করেন। উহা সাধকহৃদয়ের বাহ্য ভাবময়ী প্রতিমার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

সর্ব্বশেষে দ্রব্যবাহুল্য। অবশ্য এই সকল সামগ্রী বাহ্য পূজা প্রধানতঃ রাজসিক গৃহস্থ ব্যক্তিরই অনুষ্ঠেয় বলিয়া এই দ্রব্যবাহুল্যের কথা শাস্ত্রে উল্লেখ হইয়াছে। ধনী ব্যক্তি পূজার আয়োজনে কখনও যেন বিত্তশাঠ্য না করেন। দেবনিবেদিত প্রসাদে সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ যথার্থ অভাবগ্রস্ত সকলেরই অধিকার; ইহাতে অধিক সংখ্যক দরিদ্রনারায়ণ তৃপ্তিলাভ করিলেই বর্ত্তমান কালের উপযোগী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা। দরিদ্ররূপী নারায়ণ সেবা প্রকৃত কাঙ্গালী ভোজনেই অনুষ্ঠিত হয়। ভগবান্ কপিল তদীয় জননী দেবহূতিকে বলিয়াছিলেন—যে ব্যক্তি অন্য প্রাণীর প্রতি দ্বেষবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া প্রতিমা পূজা করে, তাহার পূজা ভস্মে ঘৃত প্রদানের মত অসার। যে ব্যক্তি জীবন্ত নরনারীকে শ্রীভগবানের প্রতিমা জ্ঞানে তাহাদের অর্চ্চনা করিতে না পারে, কিরূপে সে আবার মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে চিন্ময়ীকে আবাহন করিবে? ভাবই মুখ্য—ভালবাসাই পূজার মূল—সেবাই সেই ভালবাসার অভিব্যক্তি। বাহিরের অনুষ্ঠান যেরূপই হউক—সেই ভাবটি হৃদয়ে আনয়নের চেষ্টাই আসল কথা। এইজন্য প্রথমে মানসপূজা, তাহার পরে বাহ্যপূজা। এই জন্য ভূতশুদ্ধিনামক ক্রিয়ার মূল তাৎপর্য্যই অদ্বৈতভাবনা—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব মূল শক্তির সহিত নিজ কারণ পরমাত্মার বিলীন। ফলতঃ ভূতশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধি পূজার সর্ব্বপ্রধান অধিকারমূলক অঙ্গ। করন্যাস, অঙ্গন্যাস, ঋষ্যাদি ন্যাস, মাতৃকা ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি দ্বারা দেহ শুদ্ধ হইলে ভূতশুদ্ধির সাহায্যে আত্মশুদ্ধি হইবে। সমুদয় ক্রিয়াগুলির মূল শুদ্ধি। পূজক সর্ব্বাগ্রে দেববৎ পবিত্র না হইয়া দেবতার পূজা করিবেন না; এই নিষেধের অতীত হইয়া তবে পূজা আরম্ভ করিলে পূজার যোগ্য হইবেন। শাস্ত্রোক্ত বাক্য যথা:—"নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।"

পূজাপদ্ধতির মধ্যে যে পৌরাণিক উপাদানের কথা আছে, উহা ভক্তিরসাত্মক। ক্রিয়ার মূল যে শুদ্ধি তাহাও ত্রিবিধ। মন্ত্রশুদ্ধি, দেবতাশুদ্ধি ও দ্রব্যশুদ্ধি। প্রত্যেক ক্রিয়ার মূলই ভাবনা অর্থাৎ যোগের এক প্রকার বিভিন্ন অঙ্গ। এই ভাবনার প্রধান সহায়ক মন্ত্র—অন্যান্য স্থূল দ্রব্যাদি আনুষঙ্গিক। ভক্ত চিরকালই ভগবানকে পিতা মাতা প্রভৃতি সাংসারিক সম্বন্ধের কোন একটিতে বাঁধিতে চায়—হৃদয়কেই বড় করিয়া সে দেখে।

এখন দুর্গাপূজা প্রসঙ্গ। ঋগ্বেদের মন্ত্রে দেখিতে পাই যে, মা দুর্গা দেবরাজ ইন্দ্রের পূজায় প্রসন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন,—হে দেবেন্দ্র, তুমি দেববৃন্দের স্তবনীয়, পরমৈশ্বর্য্যশালী, অসুরাদির ভয় ত্যাগ করিয়া নিজ অধিকারে সচ্ছন্দে বাস কর।

"ওঁ দুর্গে চিন্নঃ সুগং কৃধিগৃহান ইন্দ্র গির্ব্বণঃ। তঞ্চ মঘবন্ বশঃ॥"

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সুপ্রাচীন দার্শনিক নিবন্ধ "নারদ পঞ্চরাত্রে" উক্ত হইয়াছে,—ভক্তি অর্থে ভজন সম্পত্তি, প্রকৃতি প্রিয়কে অর্থাৎ আত্মা বা পরমপুরুষকে ভজন করেন। অত্যন্ত দুঃখে

শ্রীভগবানের সেই প্রকৃতিকে জানা যায়। সেই অখণ্ডরসবল্লভা "দুর্গা" এই নামে সাধুগণ কর্তৃক গীত হন। যথা :—

"ভক্তির্ভজন সম্পত্তিঃ ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম্।
জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ॥
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা॥"

অতএব এই প্রমাণমূলে অদ্বিতীয় বৈষ্ণব দার্শনিক প্রখ্যাতনামা শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার সাধনার অফুরন্ত ভাণ্ডার "ভক্তিসন্দর্ভে" সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ;—

শ্রীভগবদভেদেনোক্তং গৌতমীয়কল্পে মা দুর্গা শ্রীভগবানের সহিত অভেদরূপেই উক্ত হইয়াছেন ; "যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ ; হে পরমেশ্বরি, তুমি ইঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।" যথা :—

"যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাৎ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।
কেবলং রূপভেদেন নামভেদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

তাই "রসো বৈ সঃ,"—রসের অনুশীলনের প্রকারভেদেই রসময় ভগবান্ বা রসময়ী ভগবতীর আবির্ভাবের পার্থক্যের নিদান। মূলতঃ ভগবান্ ও ভগবতীর একই বস্তুর দ্বিবিধ প্রকাশ মাত্র। আমরা ভগবানের সন্তান, পুত্রের নিকট "মা বড় কি বাপ বড়" এ প্রশ্নের অবকাশ নাই। নন্দগোপের গৃহে সমকালেই গোপবেশধারী হরি ও কাত্যায়নী দুর্গার আবির্ভাবে মাদৃশ ধর্মান্ধের জ্ঞানদৃষ্টি যদি উন্মীলিত না হয়, তাহা হইলে চিরভাগ্যবিড়ম্বিত হইয়া থাকিতে হইবে। মহামান্য দেবীমাহাত্ম্যের মহামূল্য উপদেশ,—

"নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।"

ফলতঃ আমরা কর্মফলে যে যে ক্ষেত্রেরই কর্মী হই না কেন, একই মায়ের সন্তান, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মতসার সিদ্ধান্ত। বেদান্ত বলেন,—অনুষ্ঠান ক্রিয়া দুই প্রকারে হইতে পারে, —অজ্ঞানপূর্ব্বক ও জ্ঞানপূর্ব্বক। অজ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানেও ফল হয়, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠানে উহা পরিবর্দ্ধিত হয় মাত্র। তথাপি অনুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এতাবৎকাল যাহা অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহাদেরই সেই সনাতন প্রদর্শিত পথানুসরণ করিয়া সমগ্র বিশ্বের সহিত, বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে তদাত্ম্য লাভ করিতে যেন পারি! আমাদের হৃদয় যেন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে পারে,—

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী,
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

আমাদের মন যেন দেবীকে সর্ব্বত্র সাক্ষাৎকার করিয়া বলিতে পারে,—সর্ব্বস্বরূপে! সর্ব্বেশে! সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে! যেন বৈদিক ঋষির স্বরে সুর মিলাইয়া গাহিতে পারি,—সেই মহামায়ার বিশ্বরূপ দ্রষ্টা মহামান্য মহর্ষির অনুভূতির সঙ্গীত—

"ভূতানি দুর্গা ভুবনানি দুর্গা নরাঃ স্ত্রিয়শ্চাপি সুরাসুরাদ্যাঃ।
যদ্দৃশ্যং দৃশ্যং খলু সৈব দুর্গা দুর্গা স্বরূপাদপরং ন কিঞ্চিৎ॥"

আমাদেরও সেই মহাপুরুষের ন্যায় সর্ব্বশেষে হৃদয়ে যেন শান্তি আবির্ভাব হয়। আমরাও যেন স্বীয় মাতৃভাষায় গাহিতে পারি—

দুর্গা চরাচর মূর্ত্তি দেব দৈত্যে দুর্গা স্ফুর্ত্তি
পুরুষ রমণী আর সব দুর্গাময়।
যত্র তত্র দৃষ্টি পড়ে সর্ব্বত্র শ্রীদুর্গা স্ফুরে
দুর্গা বিনা আর কিছু দুই নাহি হয় ॥

ভারত অমর কেন ?

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

"ভারত অমর" ইহা ভারতবাসীদিগের বিশ্বাস। বর্ত্তমানে এই বিশ্বাসটী আরও দৃঢ় হইয়াছে। কারণ, জগতের বহু প্রাচীন জাতিই আজ বিলুপ্ত কিন্তু ভারত সেই প্রাচীন জাতি রূপেই আজও বিদ্যমান। ভারতের উপর রাষ্ট্রীয়, সমাজিক এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত নানারূপ উৎপাত-উৎপীড়ন হইয়া গিয়াছে কিন্তু ভারত তথাপি জীবিত। যে জাতীয় উৎপাতে অন্য জাতি সত্তা রক্ষা করিতে পারে নাই, ভারত সে জাতীয় উৎপাতেও দণ্ডায়মান। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার ব্যবহারে ভারত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মূলরূপের পরিবর্ত্তন হয় নাই। যে "রূপ"টী থাকিলে কোন কিছুকে "সেই" বলিতে পারা যায় ভারতের সে "রূপ"টীর পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত কথা।

এখন ভারতের সেই নিজত্বটুকু যদি রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের সেই "নিজত্ব" সম্বন্ধে পরিচয় লাভ আবশ্যক। কারণ, যাহা রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা যদি না জানা যায়, তাহা হইলে তাহার রক্ষা কার্য্য সম্ভবপর হয় না। অতএব যে জন্য ভারত অমর বলা হয়, আমাদের সেই বিষয়টির সহিত পরিচয় ঘটলে আমরা ভারতের অমরত্ব রক্ষার সহায়তা করিতে পারিব সন্দেহ নাই।

অনুসন্ধান করিলে বা চিন্তা করিলে দেখা যায়, এই জিনিষটা ভারতের নিত্যানুরক্তি বা নিত্যের প্রতি আসক্তি অর্থাৎ নিত্যকে ধরিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি। বিষয় বিশেষে বাধ্য হইয়াও "যখন যেমন তখন তেমন" ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইলেও ভারত এই নিত্যানুরক্তিকে ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি পোষণ করে না। ভারতের ইহাই নিজস্ব, ভারতের ইহাই মজ্জাগত স্বভাব। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, জ্ঞানে—সকল বিষয়ে ভারত এই নিত্যের প্রতি অনুরাগী, এই নিত্যকে ধরিয়া থাকিবার জন্য আগ্রহান্বিত।

ধর্ম্মের মধ্যে নিত্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ ভারত "নিত্য" বেদকে অবলম্বন করিয়াছে, কর্ম্মের মধ্যে নিত্যের প্রতি অনুরাগবশতঃ ভারত এক প্রভু, এক রাজার উপাসক হইতে চাহে।

প্রভুর পুত্র পৌত্র তাহার প্রভু হউক, সে কামনা করে; রাজার বংশ রাজা হউক সে ইচ্ছা করে, ভারতের নারী এক পতিসেবাতেই ইহজীবন পরজীবন উৎসর্গ করে, এক বস্তুর ব্যবসায়ী বংশানুক্রমে সেই ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট থাকে, এক জাতি নিজ জাতিতেই অবস্থান করে। এইরূপে কর্ম্মের মধ্যে এক নিত্যের প্রতি ভারত অনুরক্ত। অবস্থা বিশেষে বিষয়ভেদে পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে মূলে এই একরূপ নিত্যানুরক্তির অন্যথা হয় না। জ্ঞানেও সেই নিত্যানুরক্তি অর্থাৎ সেই একত্বানুরক্তি পরিস্ফুট। জীবজগতের কারণ, নিরবচ্ছিন্ন এক বস্তু, সুতরাং নিত্য বস্তুই তাহার জ্ঞেয় ও উপাস্য। সে, সেই সর্ব্বকারণ কারণ বস্তুকে এক অর্থাৎ নিত্যই—বুঝিয়া থাকে। অধিক কি, সেই মূলকারণের নিত্যতার অনুরোধে অনিত্য যাবৎ, দৃশ্য বা জ্ঞেয় বস্তুকে মিথ্যা বলিতেও কুণ্ঠা করে না। কারণ নিত্য কখন, কোন রূপে বা কোন অংশে অথবা কোন কালেই অনিত্য হইতে পারে না। নিত্য কারণ বস্তুর সহিত অনিত্য কার্য্যবস্তুর সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গিয়া কার্য্যকেই মিথ্যা বলিয়াছে, আর তজ্জন্য কার্য্য কারণের সম্বন্ধকেও মিথ্যা বলিয়াছে। আর মিথ্যা বলিয়া যে, তাহা "নাই" বা তাহা "জ্ঞানের বিষয় হয় না" এ কথাও বলে না। এইরূপে জ্ঞানের মধ্যেও ভারত নিত্য বস্তুকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে, কি জ্ঞানে সকল দিকেই ভারত নিত্যসেবী, নিত্যানুরাগী ও নিত্যাবলম্বী।

ভারত এইরূপে এই নিত্যানুরাগের ফলেই আজ বহু পরিবর্ত্তনের ভিতরও অপরিবর্ত্তিত হইয়া রহিয়াছে। এই জন্যই ভারত অমর, আর এই ভাব যতদিন থাকিবে ভারত ততদিন অমরই থাকিবে।

কবীরের দোঁহা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পাঁচ পহর ধংধে গয়া, তীন পহর রহে সোয়।
একো ঘড়ি ন হরি ভজে, মুক্তি কহাঁ তেঁ হোয় ॥৩৫॥

ধান্ধায় যায় পাঁচটী প্রহর, তিনটী প্রহর ঘুমে যাবে।
এক মুহূর্ত্ত ডাকবে না তায়, কোথা থেকে মুক্তি হ'বে ॥৩৫॥

কবীর মংদির লাখ কা, জড়িয়া হীরা লাল।
দিবস চার কা পেখনা, বিনসি জায়গা কাল ॥৩৬॥

কবীর গালার বাড়ীর উপর, জলছে হীরা মোতি লাল।
দু'চা'র দিবস দেখার এ সব, বিনাশ ক'রে যাবে কাল ॥৩৬॥

সপনে সোয়া মানবা, খোল দেখি জো নৈন।
জীব পরা বহু লূট মেঁ, না কছু লেন ন দেন ॥৩৭॥

স্বপ্ন ঘোরে মগ্ন মানব, যদি দেখে আঁখি খুলে।
দেখ্‌বে আছে লুটের মাঝে, আদান প্রদান নাইক' মূলে ॥৩৭॥

মরো গে মরি জাহুলে, কৌই ন লেগা নাম।
উজড় জায় বসাহুঁগে। ছোড়িকে বসতা গাম ॥৪৮॥

ম'রবে উজোড় হ'য়ে যাবে, কেউ নেবে না তোমার নাম।
মরুর মাঝে প'ড়বে গিয়ে, ছেড়ে এসব নগর গ্রাম ॥৩৮॥

ঘর রখবালা বাহরা, চিড়িয়া খায়া খেত।
আধা পরধা উবরে, চেত সৈকৈ তো চেত ॥৩৯॥

ঘরের মালিক বাইরে গেছে ফসল খেয়ে গেল পাখী।
আধখানা ক্ষেত বাকী আছে, জাগতে হয় ত খোল আঁখি ॥৩৯॥

কবীর জো দিন আজ হৈ, সো দিন নাহী কাল্‌হ।
চেত সকৈ তো চেতিয়া, মীচ রহী হৈ খ্যাল ॥৩০॥

কবীর যে দিন পেয়েছ আজ, পাবে না আর কাল সে দিনে।
জাগ্‌তে হয় ত হুঁসিয়ার হও, খেল্‌ছে মরণ আপন মনে ॥৪০॥

মাটী কহৈ কুম্‌হার কো, তূঁ ক্যা রূঁদৈ মোহিঁ।
একদিন ঐ সা হোয়েগা, মৈঁ রূঁদুঁগী তোহিঁ ॥৪১॥

মাটি কহে কুম্ভকারে, আমারে কি দিচ্ছ চাপা।
এমন দিন এক আস্‌বে যেদিন, আমি তোমায় দেবো চাপা ॥ ৪১ ॥

জিন গুরু কী চোরী করী, গয়ে নাম তন ভূল।
তে বিধনা বাদুর রবে, রহে উরধ মুখ ঝূল ॥৪২।

গুরুর যেবা চুরি করে, নামের গুণ সে যায় ভুলে।
তার পাপেতে বাদুড় হ'য়ে উর্দ্ধমুখে থাকে ঝুলে ॥ ৪২ ॥

সত্তনাম জানা নহীঁ, লাগি মোটী খোরি।
কায়া হাঁড়ী কাঠ কী, না রহ চরৈ বহোরি ॥৪৩॥

সত্যনাম কি জানলে না'ক, মদ লেগেছে তোমার মিঠে।
দু'বার ক'রে আর স'বেনা, কায়া হাঁড়ী তৈরী কাঠে ॥ ৪৩ ॥

—শিবপ্রসাদ

যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ

(৭)

(স্বামী বিশুদ্ধানন্দ)

উদ্দালক আরুণির ন্যায় অত বড় বিদ্বান্ ব্রহ্মবিদ্ যখন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে স্বীয় আসনে গিয়ে উপবেশন ক'ল্লেন, তখন সেই সভাস্থ কোন ব্রাহ্মণই যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হ'তে আর সাহসী হ'লেন না। সভা নীরব। কিন্তু সভার সেই নীরবতা ভঙ্গ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠলেন তেজস্বিনী, ব্রহ্মবাদিনী গার্গী। গার্গী বিনীতভাবে সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক ব'লতে লাগলেন। 'ব্রাহ্মণগণ, আপনারা যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে দুইটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। যাজ্ঞবল্ক্য যদি আমার সেই দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন তাহলে বুঝবেন যে আপনাদের মধ্যে কেহই যাজ্ঞবল্ক্যকে বিচারে পরাস্ত ক'রতে পারবেন না।" ব্রাহ্মণগণ গার্গীকে অনুমতি প্রদান করায় গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখীন হইয়া তেজস্বিতার সহিত বলিতে লাগিলেন, "শোনো, যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি কাশীপ্রদেশের বীর সন্তানকে নিশ্চয়ই দেখেছ, আর এই বিদেহরাজ্যের বীরপুরুষদিগের কীর্ত্তিও তোমার অবিদিত নেই। তাহাদের ধনু কি বিশাল তা দেখেছ ত? সেই বিশাল গুণবিযুক্ত ধনুতে পুনরায় জ্যাযুক্ত ক'রে সেই অধিজ্যধন্বা বীরসন্তান শত্রুসংহারকারী ফলাযুক্ত দুইটী শর দুই হস্তে ধরিয়া যেমন শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেইরূপ, যাজ্ঞবল্ক্য, সেইরূপ আমিও সেইরূপ দুইটী বাণরূপ দুটী প্রশ্ন নিয়ে তোমার সম্মুখে এসেছি; এখন আমার এই প্রশ্ন দুইটীর উত্তর তুমি বল।"

উদ্দালক আরুণির পাণ্ডিত্য, গার্গীর তেজস্বিতা সবই যেন তপোজ্জল মূর্ত্তি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ম্লান নিষ্প্রভ। কিছুই যেন সেই নিবাত নিষ্কম্প সমুদ্রবৎ যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশান্ত হৃদয়কে স্পর্শও ক'রতে পাচ্ছে না। গার্গীর কথায় যাজ্ঞবল্ক্য গম্ভীরভাবে বল্লেন, "গার্গি, তুমি প্রশ্ন কর"। গার্গী তখন ব'লতে লা'গলেন, "ওহে যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি উদ্দালক আরুণির প্রশ্নের উত্তরে যে সূত্রের কথা বলেছিলে, যে সূত্রে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় ভূত বিধৃত হয়ে আছে, যে সূত্র দ্যুলোকেরও উপরে, আর এই যে পৃথিবী, এই পৃথিবীরও নিম্নবর্ত্তী; যে সূত্র এই পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যবর্ত্তী; যে সূত্রকে পণ্ডিতগণ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান বলিয়া নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন, সেই সূত্র, বল দেখি, যাজ্ঞবল্ক্য, সেই সূত্র কোথায় ওতপ্রোত হয়ে আছে।" গার্গীর প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য ধীর ভাবে বলিতে লাগিলেন, "শোনো গার্গি, তুমি যে সূত্রের কথা ব'ল্লে, যে সূত্র দ্যুলোকেরও উপরে, পৃথিবীরও নিম্নবর্ত্তী, যাহা পৃথিবী ও দ্যুলোকের মধ্যেও বিদ্যমান, যাহাকে পণ্ডিতগণ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সূত্র আকাশে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে।"

যাঁহারা মহাত্মা তাঁরা শত্রুর সদ্গুণকেও প্রশংসা করেন, যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা অপরের পাণ্ডিত্যেও মুগ্ধ হন। তাই যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে, গার্গী বলিয়া উঠিলেন, "যাজ্ঞবল্ক্য, তোমায় নমস্কার, তুমি আমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তরই দিয়েছ। আমার এই প্রথম প্রশ্নরূপ প্রথম বাণ থেকে তুমি আত্মরক্ষা করেছ বটে, কিন্তু এখন আমার দ্বিতীয় প্রশ্নরূপ দ্বিতীয় বাণের জন্য প্রস্তুত হও।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'চ্চে এই যে তুমি যে, আকাশের কথা ব'ল্লে, যে আকাশে সেই সূত্র, যাতে আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় ভূত বিধৃত হ'য়ে আছে, এহেন যে সূত্র, সেই সূত্রও যে আকাশে ওত প্রোত হ'য়ে আছে সেই আকাশ আবার কিসে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে?" গার্গী এই প্রশ্ন ক'রে সগর্ব্বে যজ্ঞবল্ক্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। গার্গীর বিশ্বাস যাজ্ঞবল্ক্য আর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না। আমাদের যত কিছু খণ্ডজ্ঞান সব দেশ (space) ও কালে (time) হয়। এখন ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানরূপ এই যে সূত্র আর সর্ব্বব্যাপক এই যে আকাশ, এই দেশ ও কাল কিসে ওত প্রোত হ'য়ে আছে এইটাই, হ'ল গার্গীর প্রশ্ন। এখন যাজ্ঞবল্ক্য যে বস্তুরই নাম করুণ না কেন, সে বস্তুর জ্ঞান তাঁর নিশ্চয়ই থাকা চাই, আর সে বস্তুর জ্ঞান থাকলে সেই জ্ঞান মন, বুদ্ধি দিয়েই তাঁকে ক'রতে হবে, আর মন, বুদ্ধি দিয়ে যা কিছু আমরা জানি সে বস্তু খণ্ড, এবং তার জ্ঞানও বৃত্তিজ্ঞান, আর সেই বস্তু ও সেই বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান দেশ ও কালের মধ্যেই হবে, দেশ এবং কালের অন্তর্গত। সুতরাং যে বস্তু দেশ এবং কালের অন্তর্গত সে বস্তুতে কখনই দেশ ও কাল ওত প্রোত হয়ে থাকতে পারে না।

আরও এক কথা এই যে প্রশ্নের উত্তর এরূপ হওয়া চাই যা সকলে সহজে বুঝতে পারে। এখন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই যে তিন কাল এই তিন কাল যাতে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে, সেই ত্রিকালাতীত আকাশ যে কি, তাই বুঝা কঠিন; তারপর আকাশেরও অতীত যে বস্তু যাতে আকাশও ওতপ্রোত হ'য়ে আছে, সেই বস্তুকে বাক্য দিয়ে প্রকাশ করা কিম্বা মন বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করা সহজসাধ্য নয়। যে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর বাক্য দ্বারা বলা যায় না, যা সহজবোধগম্য নয়, তা যাজ্ঞবল্ক্য নিশ্চয়ই ব'লতে পারবেন না, এই আশায় গার্গী বুক ফুলিয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। সভাস্থ ব্রাহ্মণগণও গার্গীকে প্রশংসাসূচক দৃষ্টিতে দেখতে লা'গলেন।

কিন্তু 'উপর্য্যুপরি বুদ্ধীনাম্ চরন্তীশ্বর বুদ্ধয়ঃ'। এই জগতে একজন যতই বুদ্ধিমান্ হউন না কেন, তাঁর চেয়েও বুদ্ধিমান লোক আছে। গার্গী এমন একটা ফাঁদ যাজ্ঞবল্ক্যের চারিদিকে বিস্তৃত করে রেখেছেন যে যাজ্ঞবল্ক্য যে দিকেই যান সেই দিকেই তাঁকে ফাঁদে পা দিতেই হ'বে। যদি বাক্য দ্বারা কিছু বলেন, তাহলে যে জিনিষটা অবাচ্য, যা বাক্যের অতীত, তাকে বাক্য দিয়ে প্রকাশ করলে একটা দোষ, আর যাজ্ঞবল্ক্য যদি নিরুত্তর হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাহলে ত তিনি পরাজিতই হলেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে কেমন করে যে গার্গীর ফাঁদ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'ল্লেন সেইটে একবার দেখা যাক। যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে সম্বোধন ক'রে বলতে লাগলেন, "গার্গি, যে বস্তুতে আকাশ ওতপ্রোত হ'য়ে থাকে, তোমার জিজ্ঞাসিত সেই বস্তুটিকে ব্রাহ্মণগণ অক্ষর ব'লে নির্দ্দেশ ক'রে থাকেন।" যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তরটী বেশ কৌশলপূর্ব্বকই দেওয়া হইল। যাজ্ঞবল্ক্য নিজের উপর কোন দোষ রাখলেন না। যত দোষ তা চাপিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণগণের উপর। যদি তিনি নিজে বলতেন 'আমি বলচি যে সেই বস্তুটি হ'চ্চে অক্ষর, যা'তে আকাশ ওতপ্রোত হ'য়ে আছে", তাহলে যে জিনিষটা বাক্য দ্বারা প্রকাশের অযোগ্য, তাকেই বাক্য দিয়ে নির্দ্দেশ করার জন্য তাঁর দোষ হ'ত। আর চুপ করে থাকলেও তাঁর অজ্ঞতাই প্রকাশ পেত। তাই যাজ্ঞবল্ক্য ব'ল্লেন "গার্গি, তুমি যে বস্তুটীকে জানতে চাইচ, যাতে আকাশ ওতপ্রোত হ'য়ে আছে, সেই বস্তুটীকে ব্রাহ্মণগণ অক্ষর নামে অভিহিত করেন।"

গার্গী কিন্তু সহজে ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে পুনরায় প্রশ্ন ক'ল্লেন, "আচ্ছা যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যে বল্লে ব্রাহ্মণগণ ব'লে থাকেন যে আকাশ অক্ষরে ওতপ্রোত হ'য়ে আছে, সেই অক্ষর ব'লতে কি বুঝায়?" গার্গীর এই প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য আবার বলতে লা'গলেন "গার্গি! এই অক্ষর সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ যা বলেন তা তোমায় বলছি, তুমি বেশ মনোযোগ দিয়ে শোন। দেখ, গার্গি! আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা কোন বস্তুকে যখন আমরা জানি, তখন সেই বস্তুকে আমরা অন্বয়মুখে বর্ণনা করিতে পারি। আমরা চোখ দিয়ে যা দেখি, কাণ দিয়ে যা শুনি, নাক দিয়ে যা আঘ্রাণ করি, জিভ্ দিয়ে যা আস্বাদ করি এবং ত্বক্ দিয়ে যা স্পর্শ করি, সেই সেই বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর হওয়ায়, আমরা আঙ্গুল দিয়ে অপরের চোখের সামনে সেই সেই বস্তুকে ধরে বলতে পারি, এটা এই বস্তু, ওটা ঐ বস্তু, এটা একটা সুন্দর ফুল, এই ফুলে মৌমাছি ব'সে কেমন গুন্ গুন্ শব্দ করচে, ফুলটীর কি সুন্দর গন্ধ, ফুলের মধু বড় মিষ্ট, ফুলটীর স্পর্শও বেশ কোমল। কিন্তু যে বস্তুকে আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে ধ'রতে পারি না, মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়েও ছুই ছুই ক'রে ছুতে পারি না, সেই বস্তুকে বুঝাতে হ'লে, তার স্বরূপ বর্ণন করতে হ'লে, অন্বয়মুখে বর্ণনা করা যায় না; তাকে তখন নিষেধমুখে ব'লতে হয়। আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে যা জানি, আমাদের সেই বিদিত বস্তু থেকে সেই পদার্থটী সম্পূর্ণ ভিন্ন, সেই জন্য সেটা 'বিদিতাৎ অথ' এবং আমাদের যা কিছু অজ্ঞাত, সে জিনিষটা তারও বাইরে, তাই সেটা 'অবিদিতাৎ অধি'। আমাদের জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততা সবই প্রকাশ করছে সেই জিনিষটা। সুতরাং যে জিনিষটা সকলের অবভাসক, সেই সর্ব্বপ্রকাশককে, এমন কি জিনিষ আছে যা দিয়ে প্রকাশ ক'রতে পারা যায়? তাই সেই বস্তু সম্বন্ধে কিছু ব'লতে গেলে আমাদের ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং ইন্দ্রিয় দিয়ে অর্জ্জিত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে দিয়ে ব'লতে হয়, নিষেধমুখে, নেতি নেতি করে বর্ণন করতে হয়। সেই জন্য ব'লতে হয়, গার্গি! যে বাক্য যাঁকে প্রকাশ ক'রতে পারে না, কিন্তু বাক্য যাঁর দ্বারা প্রকাশিত, এই অক্ষর সেই বস্তু; মন যাঁকে মনন ক'রতে পারে না, মন যাঁর দ্বারা প্রকাশিত, এই অক্ষর সেই বস্তু; বুদ্ধি যাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, বুদ্ধি যাঁর দ্বারা প্রকাশিত এই অক্ষর সেই বস্তু; ইন্দ্রিয় যাঁকে প্রকাশ ক'রতে পারে না ইন্দ্রিয়গণ যাঁর দ্বারা প্রকাশিত, এই অক্ষর সেই বস্তু; এই অক্ষর সেই বস্তু, গার্গি! যাঁকে এই ভূতগণ প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু ভূতসমূহ যাঁর দ্বারা প্রকাশিত। সেই বস্তুই এই অক্ষর যাঁকে নাম রূপ প্রকাশ ক'রতে পারে না, কিন্তু নাম রূপ যাঁর দ্বারা প্রকাশিত; দেশ কাল যাঁকে প্রকাশ ক'রতে পারে না, দেশ কাল যাঁর দ্বারা প্রকাশিত সেই বস্তুই এই অক্ষর। এই অক্ষর যে কি, তা শোনো গার্গি। ব্রাহ্মণগণ ব'লে থাকেন যে, এই অক্ষর অস্থূলং, অনণু, অহ্রস্বং, অদীর্ঘং, অলোহিতম্, অস্নেহম্, অচ্ছায়ং, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশং, অসঙ্গম্, অরসং, অগন্ধম্, অচক্ষুঃ, অশ্রোত্রম্, অবাক্, অমনঃ, অতেজঃ, অপ্রাণম্, অমুখম্, অমাত্রম্, অনন্তরং, অবাহ্যং, অভোক্তৃকম্, অভোগ্যম্।

এই অক্ষর স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন; ইনি হ্রস্বও নন, দীর্ঘও নন; দ্রব্যের যত কিছু পরিমাণ, যত কিছু ধর্ম্ম আছে, এই অক্ষর সেই সমুদয় পরিমাণ, সেই সমুদয় ধর্ম্ম বিরহিত; অগ্নির গুণ যে লৌহিত্য, এই অক্ষর সেই লৌহিত্য নয়, এ অলোহিত; জলের গুণ যে স্নেহ, সে স্নেহও অক্ষর নন, অক্ষর অস্নেহ, এই অক্ষর দ্রব্য নন, তাই ইনি অচ্ছায়, অন্ধকারও ইনি নন। না ইনি

বায়ু; না ইনি আকাশ; এই অক্ষরঅতিরিক্ত এমন কোন দ্বিতীয় বস্তু নেই, যার সঙ্গে ইনি কোন না কোন সম্বন্ধে লিপ্ত হ'য়ে আছেন, তাই ইনি অসঙ্গ। ইনি অরস, অগন্ধ; আমাদের ন্যায় ইহাঁর চক্ষুও নাই, কর্ণও নাই, ইনি অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্ ও অমনঃ; অগ্নি, সূর্য্য চন্দ্রাদির ন্যায় ইনি কোন জ্যোতিষ্কও নন, ইনি অতেজঃ; আমরা যেমন প্রাণবায়ুর সাহায্যে জীবন ধারণ করি এই অক্ষর সেরূপ ভাবে বিদ্যমান থাকেন না, ইনি অপ্রাণ, অমুখ; এই অক্ষরের অতিরিক্ত অন্য কোন বস্তু নেই যে অক্ষর সেই বস্তুকে পরিমিত ক'রবে, এ যে অমাত্র; এতে কোন খণ্ড, কোন অংশভাব নেই, কোন ছিদ্র নেই, এ অক্ষর অনন্ত ; ইহার বাহিরও নেই, অভ্যন্তরও নেই, ইনি অবাহ্য; স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় কোন প্রকার ভেদ এতে নেই, ইনি অভেদ; ইনি কিছু ভক্ষণ করেন না, কিম্বা ইঁহাকেও কেহ ভক্ষণ করে না। ইনি ভোক্তাও নন, ভোগ্যও নন; কোন গুণ দ্বারাই তাঁকে বিশেষিত ক'রতে পারা যায় না, তিনি সমস্ত বিশেষ ধর্ম্ম বিরহিত। এই অক্ষর অখণ্ড, অভেদ, অদ্বিতীয়, একরস, নির্ব্বিশেষ, চিৎস্বরূপ।

শোনো গার্গি! এই অখণ্ড, অভেদ নির্ব্বিশেষ অক্ষর বিশ্বরূপে কল্পিত হ'চ্ছেন; বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, আমাদের স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি আমাদের এই অবস্থাত্রয়, এই সমুদয় বিশ্বই এই নির্ব্বিশেষ অক্ষরে কল্পিত, অধ্যস্ত। যে জিনিষটা যাতে কল্পিত হয়, সেই কল্পিত বস্তু তার অধিষ্ঠান থেকে ন্যূন সত্তার হয়, কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠানকে কল্পিত বস্তু কখনই অতিক্রম ক'রতে পারে না। শোনো গার্গি! রজ্জুতে লোকে ভ্রান্তিবশতঃ সাপ দেখে, সেই যে কল্পিত সর্প, সেই কল্পিত সর্প কখনই রজ্জুকে অতিক্রম ক'রে থাকতে পারে না। আরও দেখ গার্গি, সেই কল্পিত সর্পের সত্তা রজ্জুর সত্তা থেকে ন্যূন, কম, যখন সর্পভ্রান্তি চ'লে যায় তখনও রজ্জু থাকে। এই বিশ্বও সেইরূপ এই অক্ষরে কল্পিত। এই অক্ষরকে অতিক্রম ক'রে বিশ্বের কোন পদার্থই যেতে পারে না। কল্পিত বস্তুর, অনিত্য অসৎ বস্তুর একটা অধিষ্ঠান থাকা চাই। ভ্রান্তি নিরধিষ্ঠান হ'তে পারে না। তাই এই কল্পিত বিশ্বের একটা অধিষ্ঠান নিশ্চয়ই আছে, আর সেই অধিষ্ঠান হ'চ্ছে এই অক্ষর। জগতে এমন কোন বস্তু নেই, যা এই অক্ষরের বাইরে গিয়ে, অক্ষরের সত্তা ছাড়া অন্য সত্তাবিশিষ্ট হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। অক্ষর যেন রাজা; আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত জগতের প্রত্যেক জিনিষটাকেই এই রাজার শাসন মেনে চ'লতে হ'চ্ছে। তাই বলি গার্গি! এই অক্ষরের প্রশাসনে সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হ'য়ে আছে; দ্যুলোক ও পৃথিবী এই অক্ষরের প্রশাসন অমান্য করিতে সমর্থ হয় না, তা'রাও গার্গি, তা'রাও এই অক্ষরের প্রশাসনে বিধৃত। এই অক্ষরের প্রশাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু ও সংবৎসর সমূহ নিয়মিত; কাল এই অক্ষরকে অতিক্রম ক'রতে পারে না, গার্গি। ঐযে তুষারমণ্ডিত শ্বেতবর্ণ পর্ব্বত সকল হইতে নদীসমূহ নির্গত হইয়া কলকলরবে দিগ্‌দিগন্তে ছুটে চলেছে, ঐ যে কোন নদী পূর্ব্ব দিকে, কোন নদী পশ্চিম দিকে, কোন নদী বা অন্য দিকে প্রবহমানা, কেন এইরূপ হয় গার্গি, কেন এইরূপ হয়? অন্য দিকে প্রবাহিত হইবার সামর্থ্য থাকিলেও কেন এই নদী সকল স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট পথে বহমানা? তা কি জান গার্গি? এই যে অক্ষর, এই অক্ষরের প্রশাসনেই গার্গি, ঐ নদীসমূহ তাহাদের স্বস্ব নির্দ্দিষ্ট পথে প্রধাবিতা! অধিক আর তোমায় কি ব'লব গার্গি, জগতে যত কিছু ক্রিয়া, দান বল, ধ্যান বল, উপাসনা বল, দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ বল, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ বল, সব, সব কার্য্যই এই অক্ষরের প্রশাসনে সুনিয়ন্ত্রিত।

শোনো গার্গি! এই অক্ষরকে যে ব্যক্তি আত্মস্বরূপে উপলব্ধি না ক'রে হাজার হাজার বৎসর ধ'রে যজ্ঞ করে, তপস্যা করে, তাহার সেই সহস্র বৎসরের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, সেই সহস্র বৎসরব্যাপী তপস্যা তাহাকে অমৃতত্ব প্রদান ক'রতে পারে না, কারণ তাহার সেই যজ্ঞ, সেই তপস্যা ধ্বংসশীল। যজ্ঞ ক'রে, তপস্যা ক'রে যারা ফল আকাঙ্ক্ষা করে তারা ত কৃপণ। তারা অল্প সুখের জন্য নিজের প্রকৃত স্বরূপ এই অক্ষর, এই ভূমাকে উপলব্ধি না করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আর পরলোকে স্বীয় তপোলব্ধ সুখ ভোগ ক'রে, আবার এই জন্মমৃত্যুরূপ সংসার আবর্ত্তে নিপতিত হয়। আর যিনি এই অক্ষরকে, এই ভূমাকে আত্মরূপে উপলব্ধি করেন তিনিই ব্রাহ্মণ, গার্গি! তিনিই ব্রাহ্মণ। তিনি দেহত্যাগের পর আর জন্মমৃত্যুরূপ সংসারপ্রবাহে পতিত হন না।

এই যে অক্ষর, গার্গি! এই অক্ষর কাহারও কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন না, শ্রুত হন না, মত বা বিজ্ঞাতও হন না। ইনি ব্যতীত আর কোন শ্রোতাও নেই, দ্রষ্টাও নেই, মন্তাও নেই, বিজ্ঞেতাও নেই। এই অক্ষরে গার্গি! এই অক্ষরে আকাশ ওতপ্রোত হ'য়ে আছে। এই অক্ষর স্বপ্রকাশ, চিৎস্বরূপ। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এ সবকে এই অক্ষর প্রকাশ ক'রচে, সেই জন্য এদের কোনটাই এই অক্ষরকে প্রকাশ ক'রতে পারে না। ইনি এদের অগোচর। আবার এই অক্ষরই গার্গি! আমাদের প্রত্যেক চিন্তার, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক খণ্ড জ্ঞানের, প্রত্যেক বৃত্তির সাক্ষী, প্রত্যেক বৃত্তির অবভাসক। ইনি আছেন বলেই আমরা দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা। আমাদের দ্রষ্টৃত্ব শ্রোতৃত্ব, মন্তৃত্ব, বিজ্ঞাতৃত্ব, সবই এই অক্ষরের প্রসাদে। সেই জন্যই বলেছি গার্গি, এই অক্ষর ব্যতীত অন্য কোন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা নেই, এই অক্ষরই সর্ব্ব বিকল্পের অধিষ্ঠান। এই অক্ষরেই গার্গি, আকাশ ওতপ্রোত হ'য়ে আছে।"

যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর শুনে গার্গীর হৃদয়, মন, শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে ভ'রে উঠল। গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে নমস্কারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, যাজ্ঞবল্ক্যকে যদি শুধু নমস্কার ক'রে আপনারা মুক্তিলাভ ক'রতে পারেন, তাহলে সেইটাই আপনাদের পক্ষে যথেষ্ট লাভ ব'লে মনে ক'রবেন। আপনাদের মধ্যে এমন কেহই নেই, যিনি এই ব্রহ্মবিদ্ যাজ্ঞবল্ক্যকে বিচারে পরাজিত ক'রতে পারেন।" এই কথা ব'লে গার্গী স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন। সভা নীরব। সভাস্থ ব্রাহ্মণগণ যাজ্ঞবল্ক্যের পাণ্ডিত্যে, বিচারকৌশলে মুগ্ধ হ'য়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান ক'রতে লাগলেন।

অন্তরা

"একজন ইংরেজ একদিন আমাকে কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—'তোমাদিগের দেবদেবীর এত অধিক হাত কেন, তাহা এতদিনে আমি বুঝিয়াছি',......'কি বুঝিয়াছেন?'......"বুঝিয়াছি যে (এখানে) এক একটী নদীতে অনেকানেক উপনদী আসিয়া পড়ে, তাহা দেখিয়াই (এদেশে) দেবদেবীর শরীরে বহু হস্ত কল্পিত হইয়াছে"......ভৌগোলিক তথ্য হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সামাজিক প্রকৃতি নির্ণয়ের পদ্ধতি এইরূপ ভ্রমসঙ্কুল ও উপহাসাস্পদ।"......৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষাসমস্যা

(ম. ম. পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ)

গত বহুশত বৎসর হইতে বঙ্গদেশে—আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই উহা সুবিদিত, এখনও বঙ্গদেশীয় আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী প্রবীণ চিকিৎসকগণের পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসা-কুশলতার বিমলোজ্জ্বলকীর্ত্তি বাঙ্গালীমাত্রের বক্ষঃস্থলকে গর্ব্বস্ফীত করিতেছে। ভারতের সকল প্রদেশের আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থী বুদ্ধিমান ছাত্রগণ এখনো দলে দলে বাঙ্গালী আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপকগণের নিকট শিক্ষালাভের জন্য প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করিয়া এদেশে আগমন পূর্ব্বক দীর্ঘকাল বাস করিয়া থাকেন। এতকাল ধরিয়া কিন্তু যে প্রণালীতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের পঠন ও পাঠন আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছিল, কয়েক বৎসর হইতে তাহার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। আজকাল সেই পরিবর্ত্তন আবার বড় বেশী ও দ্রুততর হইতেছে। এইরূপ নূতন ভাবের দ্রুততর পরিবর্ত্তন বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উন্নতির অনুকূল বা প্রতিকূল, তাহার অপক্ষপাতে বিচার করিয়া সত্বর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা একান্ত আবশ্যক বলিয়াই মনে হয়।

প্রাচীনতমকাল হইতে এদেশে আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থী ছাত্রগণ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন—তাঁহার গৃহে তাঁহারই প্রদত্ত অন্নে পুত্রবৎ প্রতিপালিত হইয়া—দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহারই নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের আবশ্যক গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিতেন এবং তাঁহারই অনুবৃত্তি করিয়া চিকিৎসাকর্ম্ম ও ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিতেন। এইরূপে গ্রন্থপাঠসমাপ্তি, চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষা ও ঔষধ প্রস্তুত দক্ষতা লাভ করিবার পর সেই ছাত্রগণ অধ্যাপক কবিরাজ মহাশয়ের প্রদত্ত উপাধিলাভ করিয়া নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে গমন পূর্ব্বক অধ্যাপক মহাশয়ের আদর্শে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিতেন ও নিজ সামর্থ্যানুসারে ছাত্রগণকে অন্নাদি দানপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করাইতেন এবং ঔষধাদিও নিজ গৃহে নিজ ব্যয়ে গুরুরই ন্যায় প্রস্তুত করাইতেন। তখনকার আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল—রোগ নিরাকরণ দ্বারা আর্ত্ত ও পীড়িত নরনারীর সেবা, গৌণ উদ্দেশ্য ছিল—গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালনের অনুকূল যথাসম্ভব বৈশ্যবৃত্তি রক্ষাপূর্ব্বক ধনার্জ্জন। প্রাচীন কালের আয়ুর্ব্বেদবিদ্ প্রথিতযশাঃ চিকিৎসকগণের এইভাবে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক ধর্ম্মময় জীবনযাপনই যে চিকিৎসকগণের প্রধানতম কর্ত্তব্য তাহা প্রধান প্রধান সকল আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থেই অল্প বা বিস্তরভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাই চরক সংহিতার প্রথম অধ্যায়েই দেখিতে পাই ;

বরমাশীবিষবিষং ক্বথিতং তাম্রমেব বা।
পীতমত্যগ্নিসন্তপ্তা ভক্ষিতা বাপ্যয়োগুড়াঃ॥
ন তু শ্রুতবতাং বেশং বিভ্রতা শরণাগতাৎ।
গৃহীতমন্নং পানং বা বিত্তং বা রোগপীড়িতাৎ॥
ভিষগ্‌ বুভূষুর্মতিমানতঃ স্বগুণসম্পদি।
পরং প্রযত্নমাতিষ্ঠেৎ প্রাণদঃ স্যাদ্ যথা নৃণাম্॥

কামসর্পের বিষ পান করা বরং ভাল, অথবা কথিত (অগ্নিতুল্য) তাম্র পান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়, সেও ভাল। কিংবা সন্তপ্ত লৌহগুড়িকা ভক্ষণ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাও শ্রেয়ঃ। তথাপি আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বৈদ্যের বেশ পরিগ্রহপূর্ব্বক রোগার্ত্ত শরণাগত ব্যক্তির নিকট হইতে অন্ন, পানীয় বা ধন গ্রহণ করা কিছুতেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। যিনি যথার্থ বৈদ্য হইতে ইচ্ছুক, তাঁহার—চিকিৎসার যাহা গুণ সম্পদ তাহাই লাভ করিবার জন্য প্রযত্ন কর্ত্তব্য অর্থাৎ তিনি যাহাতে লোক সমূহের প্রাণদাতা হইতে পারেন, তাহারই জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন।

একমাত্র দেহাত্মবাদ ভিত্তির উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত, সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার সুতীব্র তাড়িতালোকে—বর্ত্তমান ভারতের নব্য শিক্ষিতবৃন্দের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ পচানব্বই জনের অন্তর্দৃষ্টি আকুল ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহায় পরিণাম কি ভয়াবহ, তাহা তাঁহারা ভাবিতেছেন না এবং ভাবিবার শক্তিও হারাইয়া বসিয়াছেন বলিলে বড় একটা অত্যুক্তি হয় না। দেহাত্মবাদমূলক ঘৃণ্য অহংমুখতা করাল রাক্ষসীর ন্যায় হিন্দুসমাজের যাহা কিছু শোভন, যাহা কিছু সারবান, যাহা কিছু একান্ততঃ রক্ষণীয়, তাহা সকলকেই গ্রাস করিতে চলিয়াছে, এই অবস্থায় হিন্দু সামাজিক জীবনের মূলভিত্তিস্থানীয় আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার রক্ষা ও সমুন্নতি সাধন যে কি কঠিন ব্যাপার, তাহা অল্প কথায় বলিয়া বুঝান সম্ভব নহে। যাঁহাদের হস্তে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার ভার এখনও ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের পাণ্ডিত্য কীর্ত্তি ও কর্ম্মকুশলতা বর্ত্তমান সময়েও বঙ্গের মুখকে যে গৌরবমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন অবসর না থাকিলেও আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা সমস্যার সমন্বয় বিধান কল্পে তাঁহাদের সমুচিত আন্তরিক আগ্রহ এখনও তেমন দেখা যাইতেছে না, ইহা বড়ই দুঃখের কথা। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা ব্যবসায়ী কবিরাজ মহাশয়গণের প্রাচীন আদর্শীভূত বৈদ্য হইবার জন্য আন্তরিক প্রযত্ন ক্রমশঃই পুণ্য বঙ্গভূমিতে বিলুপ্ত হইতেছে, এলোপ্যাথীতে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারগণের অবলম্বিত চিকিৎসা-ব্যপদেশে অর্থার্জ্জননীতির প্রতি পক্ষপাত তাঁহাদের ক্রমেই ভীতিজনকভাবে বাড়িয়া যাইতেছে। প্রাণপ্রদানের পরিবর্ত্তে যেন তেন প্রকারেণ ধনার্জ্জনই যদি চিকিৎসা কর্ম্মের প্রধান প্রয়োজন হইয়া উঠে, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসার আমূল উচ্ছেদ যে অচির কালের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সহিত যাঁহার স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে তিনিই তাহা বেশ জানেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালীর সহিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসা প্রণালীর সমন্বয় করিবার জন্য আজকাল অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই আগ্রহান্বিত হইয়াছেন,—ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সমন্বয় ব্যপদেশে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীর বৈশিষ্ট্যকে বিলুপ্ত করা কিছুতেই স্পৃহণীয়ও নহে! দেহাত্মবাদ হইল পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলভিত্তি; দেহেন্দ্রিয় মনঃ হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক প্রারব্ধ কর্ম্মবশে লোকান্তরে ঐহিক কর্ম্মজনিত ফলভোক্তা আত্মাই এই দেহেন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতা, সেই আত্মার জন্ম বা মরণ স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, কিন্তু তাহা ঔপাধিক—এইরূপ অধ্যাত্ম বিজ্ঞানই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীর মুখ্য অবলম্বন,। এই প্রকার অবস্থায় আয়ুর্ব্বেদের সহিত পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্ব্বাংশে সমন্বয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা ব্যতিরিক্ত আর কি হইতে পারে? চরক সংহিতায় দেখিতে পাই—

ত্রিবিধমৌষধম্ ইতি দৈবব্যপাশ্রয়ং যুক্তিব্যপাশ্রয়ং সত্ত্বাবজয়শ্চেতি। তত্র দৈবব্যপাশ্রয়ং

মন্ত্রৌষধিমণিমঙ্গলবল্যুপহারহোমনিয়ম-প্রায়শ্চিত্তোপ বাসস্বস্ত্যয়নপ্রণিপাতগমনাদি। যুক্তিব্যপাশ্রয়ং পুনরাহারৌষধদ্রব্যাণাং যোজনা। সত্ত্বাবজয়ঃ পুনরাহতেভ্যো হ্যর্থেভ্যো মনোনিগ্রহঃ।

চরক-সংহিতা, সূত্রস্থান, ২১ অধ্যায়।

(রোগ নিরাকরণের হেতু যে ঔষধ, তাহা তিন প্রকার, প্রথম দৈব ব্যপাশ্রয়, দ্বিতীয় যুক্তি ব্যপাশ্রয়, তৃতীয় সত্ত্বাবজয়।

মন্ত্র জপ, ঔষধি ধারণ, রত্ন ধারণ, মঙ্গলা চরণ, পূজা, উপহার-প্রদান, হোম ব্রতাদি নিয়ম, প্রায়শ্চিত্ত, উপবাস, স্বস্ত্যয়ন প্রণিপাত ও তীর্থাদি গমনকে দৈব ব্যপাশ্রয় ঔষধ বলা যায়।

যুক্তি পূর্ব্বক আহার ও ভেষজাদির প্রয়োগকে যুক্তি ব্যপাশ্রয় বলা যায়। অহিতকর বিষয় সমূহ হইতে মনকে নিবৃত্ত কারাকেই সত্ত্বাবজয় ঔষধ বলা যায়।)

এই ত্রিবিধ ঔষধের মধ্যে কেবল যুক্তিব্যপাশ্রয় ঔষধ ও তাহার দ্বারাই চিকিৎসা, পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র ব্যবসায়িগণের বর্ত্তমান সময়ে প্রধানভাবে অনুমত। এইরূপ ঔষধ ব্যবহারে প্রত্যক্ষমূলক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের যথাসম্ভব সমন্বয় করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু দৈবব্যপাশ্রয় ও সত্ত্বাবজয় নামে যে আরও দুই প্রকার রোগনিবারক ঔষধ আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের একান্ত অভিমত, তাহার সহিত পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সমন্বয় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পাশ্চাত্য আদর্শে আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার জন্য যে সকল নূতন বিদ্যালয় সম্প্রতি কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে দৈব ব্যপাশ্রয় এবং সত্ত্বাবজয় নামক দ্বিবিধ আয়ুর্ব্বেদ সম্মত ঔষধের প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন প্রকার শিক্ষারীতি এ পর্য্যন্ত অবলম্বিত হইয়াছে কিনা তাহা সাধারণের বিদিত নহে, আজ এ বিষয়ে দিঙ্‌মাত্রই প্রদর্শিত হইল। পাশ্চাত্যভাবে স্কুল কলেজ যে ভাবে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে পরিচালিত হইতেছে, সেই ভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় নব সংস্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হইলে বাস্তব পক্ষে তাহা আয়ুর্ব্বেদীয় যথার্থ উন্নতির পক্ষে বিশেষ উপকার করিতে পারিবে, ইহা ত মনে হয় না, প্রত্যুত পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালীর অন্ধতম অনুচিকীর্ষার মোহে আমাদের ছাত্রবৃন্দ ও বৈষয়িকগণ যেভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছেন এবং তাহার ফলে সনাতন হিন্দু সভ্যতার মূলভিত্তিস্বরূপ শ্রৌত অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রতি যেরূপ আস্থা-শূন্য হইয়া পড়িতেছেন, তাহাতে বর্ত্তমান সময়ে কেবল পাশ্চাত্য ভাবের বন্যায় ভাসিতে আরম্ভ করিলে আয়ুর্ব্বেদের নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উপকার অপেক্ষা অপকারই যে সমধিক পরিমাণে সাধিত হইবে, এই আশঙ্কা এক্ষণে অনেকেরই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছে, ইহার প্রতিবিধান সত্বর আবশ্যক।

প্রাচীন পদ্ধতিতে গুরুগৃহে বাসপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ক্রমশঃ লুপ্ত হইতে চলিল, সাধারণ বা বদান্য ব্যক্তি বিশেষ বা এই উভয়ের অর্থসাহায্যে পরিচালিত সাধারণ বিদ্যালয় ব্যতিরেকে আয়ুর্ব্বেদ পড়িবার অন্য স্থান দিন দিন দুর্ল্লভ হইতেছে; ঐ সকল সাধারণ বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে; ছাত্রদিগের নৈতিক ও ধার্ম্মিক শিক্ষার জন্য কোন প্রকার সুব্যবস্থা নাই। ইংরাজি স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের ন্যায় এই সকল নবোদিত আয়ুর্ব্বেদ কলেজে ছাত্রদিগের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের জন্য বিশেষ যত্ন নাই। থাকিলেও তাহা ফলপ্রদ হইতেছে বলিয়া

মনে হয় না, চারিদিকে জীবিকার অভাবনিবন্ধন বেকার শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তুল্য কারণেই আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় সমূহেও দিন দিন ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। ঐ সকল ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা নব্বই জনের উদ্দেশ্য কোন রকমে কয়টা বৎসর কাটাইয়া ঐ সকল আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে বৈদ্যত্বের পরিচায়ক একখানা সার্টিফিকেট লাভ করা। লাভ করিবার পরেই এক একখানি কবিরাজী দোকান খুলিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিতে পারিলে দোকান চলিবার খরচা বাদে মাসে যদি অন্ততঃ ত্রিশটি টাকাও জুটে, তাহা হইলে বি-এ এম্ এ পাশ করা বেকারগণ অপেক্ষা ত ভালই হইবে। এই সকল কেবল অর্থার্থী নব্য কবিরাজগণ ক দেখিলে চরক সংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টি স্বতই মনে উদিত হইয়া থাকে।

ভিষক্ ছদ্মচরাঃ সন্তি সন্ত্যেকে সিদ্ধসাধিতাঃ।
সন্তি বৈদ্যগুণৈর্যুক্তাস্ত্রিবিধা ভিষজো ভুবি॥
বৈদ্যভাণ্ডৌষধৈঃ পুস্তৈঃ পল্লবৈরবলোকনৈঃ।
লভন্তে যে ভিষক্‌শব্দমজ্ঞাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
শ্রীযশোজ্ঞানসিদ্ধানাং ব্যবদেশাদতদ্বিধাঃ।
বৈদ্যসংজ্ঞাং লভন্তে যে জ্ঞেয়াস্তে সিদ্ধসাধিতাঃ॥
প্রয়োগজ্ঞানবিজ্ঞান-সিদ্ধিসিদ্ধাঃ সুখপ্রদাঃ।
জীবিতাভিস্তেরাস্তেস্ম্যৈব দাত্বং তেষ্ববস্থিতম্॥ চরক-সংহিতা, সূত্রস্থান, ১১অ।

(এ সংসারে ত্রিবিধ ব্যক্তি বৈ. নামে পরিচিত হইয়া থাকে, যথা ছদ্মচর বৈদ্য, সিদ্ধসাধিত বৈদ্য ও বৈদ্যগুণযুক্ত বৈদ্য।

যাহারা বৈদ্যের ভাণ্ড, ঔষধ পুস্তক অবলোকন ও বৈদ্যোচিত অন্যান্য বাহ্যাড়ম্বর লইয়া ব্যবসায় করে তাহাদিগকে ছদ্মচর বৈদ্য বলা যায়, ইহারা বৈদ্যশাস্ত্রের কিছুই জানে না, নামেই ইহারা বৈদ্য কার্য্যতঃ নহে।

যাহারা প্রকৃত বৈদ্য নহে কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণের বা খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের অথবা যথার্থ বৈদ্যের পরিচয়বলে লোকে বৈদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহাদিগকে সিদ্ধ-সাধিত বৈদ্য বলা যায়।

যাহারা ঔষধপ্রয়োগজ্ঞানে সিদ্ধ, যাহারা শাস্ত্রার্থজ্ঞানসম্পন্ন, যাহারা চিকিৎসাকার্য্যে সুদক্ষ, যাহারা প্রাণদাতা ও আরোগ্যদাতা তাহারাই যথার্থ বৈদ্য।)

যথার্থ বৈদ্য যাহাতে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উপলব্ধ হইতে পারেন, তাহার জন্যই এই জাতীয় দুর্দশার ভয়াবহ যুগে জাতির সদ্‌বুদ্ধিপ্রণোদিত ও সামুদায়িক চেষ্টা হওয়া একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ছদ্মচর বৈদ্য বা সিদ্ধসাধিত বৈদ্যের সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের আকাঙ্ক্ষিত সমুন্নতির কোন সম্পর্ক নাই। প্রত্যুত তাহা দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষা বাড়িয়াই যাইবে, ইহা যেন সর্ব্বদা আয়ুর্ব্বেদ-সমুন্নতিকামী ব্যক্তিগণের স্মৃতিপথে আরূঢ় থাকে। রুটিন্ মত ক্লাসে যাইয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় নবাগত নূতন নূতন অধ্যাপকের লেক্‌চার শুনার উপরই আয়ুর্ব্বেদবিদ্যা নির্ভর করে না, আস্তিকতা সাত্ত্বিকতা আর্ত্তহিতৈষণা ও ত্যাগশীলতা এই চারিটি একান্ত অপেক্ষিত গুণ ছাত্রবৃন্দ যাহাতে অর্জ্জন

করিতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া পাশ্চাত্য স্কুলের ও কলেজের ছাঁচে আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় গুলি চালিয়া নূতন করিয়া গড়িতে পারিলেই যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উন্নতি হইবে বা বর্দ্ধনশীল দারিদ্র্যের করালগ্রাসে নিপতিত ধর্ম্মচ্যুত নীতিচ্যুত ও আত্মবিস্মৃত হিন্দুসমাজের কোন স্থায়ী উপকার হইবে, ইহা আমার মনে হয় না।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের নবীন ভাবে প্রচলিত বিদ্যালয়গুলির সামর্থ্যশালী স্বদেশহিতৈষী ও স্বজাতিমঙ্গলকামী মহোদয়গণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা সকলে পরস্পর পরস্পরের উপর আস্থা ও আদর সম্পন্ন হইয়া ভেদবুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক একত্র সম্মিলিত হউন, আপনাদের সামর্থ্যে অর্থব্যয়ে ও পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় কয়েকটি এক মহান প্রতিষ্ঠানে পরিণত করুণ এবং তাহার দ্বারা সম্মিলিত সমুচিত সাধু চেষ্টায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রকৃত অভ্যুদয় সাধন করুন।

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
নচাপি সর্ব্বংনবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥

(যাহা কিছু পুরাতন তাহা সকলই যে ভাল তাহা নহে, যাহা কিছু নূতন তাহা সকলই দুষ্ট, তাহা নহে, সাধু ব্যক্তিগণ নিজে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া নূতন ও পুরাতনের মধ্যে যাহা কিছু ভাল, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন—মোহগ্রস্ত ব্যক্তিগণই কেবল পরের বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করিয়া পরিচালিত থাকে)। মহাকবি কালিদাসের এই মহান উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া এই মহতী সমস্যার সমাধান করিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যথার্থ অভ্যুদয়সাধনার্থে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হউন। তাঁহাদের এই চেষ্টা ফলবতী হইলে বর্ত্তমান সময়ে ও অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র বঙ্গভূমির চতুর্ব্বর্গ সাধনের কণ্টকাবৃত মার্গ যে আবার সুপরিষ্কৃত সুগম ও সুবিস্তৃত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতি—

প্রতিবিম্ব

"বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করিতেই ভারতের চিন্তা ও কর্ম্ম ধারার তিনটি বিভিন্ন দিক পরিলক্ষিত হয়। অনেক মহৎ প্রকৃতির ভারতসন্তান ভারতের ভবিষ্যত বিষয়ে সম্পূর্ণই নিরাশ—তাঁহারা মনে করেন, ভারত আর উঠিবে না, উঠিতে পারে না; উহাকে নীরবে মরিতে দেওয়াই সঙ্গত, প্রতিকারের চেষ্টা করিতে গিয়া সে মৃত্যুর সময়সীমা বাড়াইয়া লাভ নাই; মৃত্যু ইহার নিশ্চিত। আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের মধ্যে স্বদেশ-প্রীতি আছে কিন্তু তাহারা স্বদেশ সম্বন্ধে অজ্ঞ; দেশকে রক্ষা করিতে গিয়া ইহারা দেশের যাহা কিছু ভাল ও স্মৃতিপূজিত তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ভাবের ঔষধ প্রয়োগে দেশকে রোগমুক্ত করিতে চাহে—কিন্তু ইহাতে প্রকৃত পক্ষে ইহারা তাহার মৃত্যুই আনয়ন করিতেছে। কিন্তু আরও এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা ভারতের অন্তঃশক্তির সন্ধান রাখে, এবং মনে করে সম্মুখে ভারতের এক অতি উজ্জ্বল যুগ আসিতেছে যখন আধ্যাত্মিক জীবন ও পার্থিব উন্নতির পুনঃ উৎকর্ষ সাধন করতঃ, ভারতের প্রাচীন আদর্শের সহিত আধুনিক জীবনযাত্রার উৎকৃষ্ট বিষয়গুলি মিলাইয়া দিয়া, ভারত ধন্য হইবে। আমি এই তৃতীয় শ্রেণীতে স্থান লাভ করিবার অভিলাষী"—এনি বেসেণ্ট।

এতদতিরিক্ত আর একটী শ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা ভারতকে কেবলমাত্র তাহার আপন সাধনার বলেই স্বপ্রতিষ্ঠ দেখিতে চাহে।

ধর্ম্মে পাশ্চাত্য প্রভাব

[৩]

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

যদি বলা হয়—কল্পিত বলিলেও রজ্জুসর্পের ন্যায় কল্পিত বলিব না, কিন্তু মৃদ্‌ঘটের ন্যায় কল্পিত বলিব, মৃদ্‌ঘটের যে কল্পিতভাব তাহাই জগতের পক্ষে প্রযোজ্য। আর তাহাই "বাচারম্ভণ" শ্রুতিতে "বিকার" নামে অভিহিত হইয়াছে। রজ্জুসর্পের কল্পিতভাব ও মৃদ্‌ঘটের কল্পিতভাব এক প্রকার নহে। মৃদ্‌ঘটের কল্পিতত্বে মিথ্যাবোধ থাকে না, কিন্তু রজ্জুসর্পের কল্পিতত্বে মিথ্যাবোধ থাকে? তাহা হইলে বলিব—এই দুইটী স্থলে স্বরূপগত কোন প্রভেদ নাই। কারণ, মৃত্তিকার ঘটকালে যেমন একটা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানে তাহাই হয়। মৃত্তিকার ঘটে জল আনিয়া পিপাসানিবারণ হয়, আর রজ্জুসর্পের দংশনভয়ে লোকের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। তাহার পর মৃদ্‌ঘট ঘটকালে অর্থাৎ জগদ্দর্শনকালে যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয়, রজ্জুসর্পদর্শনকালে তদ্রূপ রজ্জুসর্প সত্য বলিয়াই বোধ হয়। পার্থক্য এই যে, কেবল আলোক আনয়নে, রজ্জুতে সর্প দেখিবার পর ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা আমরা রজ্জুই দেখি, আর অনেক বিচারবিবেচনার পর ঘটকে মৃত্তিকাই বলিয়া বুঝি, সহজে ঘটকে মৃত্তিকা বলিয়া বুঝি না; তদ্রূপ আরও অনেক ধ্যানধারণার পর এই জগৎ আর না দেখিয়া সিদ্ধ মহাত্মাগণ ব্রহ্মই দেখেন। এই জন্য কোথাও রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত দ্বারা, কোথাও মৃদ্‌ঘটের দৃষ্টান্তদ্বারা জগৎ মিথ্যা সিদ্ধ করা হয়। আর "বাচারম্ভণ" পদের দ্বারা বস্তুশূন্য জ্ঞানের বিষয়কে নামমাত্র মৃদ্‌বিকার বলিয়া রজ্জুসর্পের সমতুল্য করিয়াই বলা হইয়াছে। অতএব রজ্জুসর্পের ন্যায় কল্পিত না বলিয়া মৃত্তিকায় ঘটাকারের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া কোন বিশেষ লাভ হইল না। এইরূপে দেখা যাইবে—যতই যুক্তিবিচার করা হউক, "পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" এই শ্রুতির দ্বারা অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধ না হইয়া মিথ্যাদ্বৈতাদ্বৈতই সিদ্ধ হয়, অন্য কথায় অদ্বৈতবাদই সিদ্ধ হয়। যদি কেহ বলেন—জগৎ মিথ্যাপ্রতিপাদনই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে বেদান্তের মধ্যে রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত নাই কেন? কিন্তু সে শঙ্কা ব্যর্থ, কারণ মৃদ্‌ঘটের দৃষ্টান্তে বাচারম্ভণ পদদ্বারা সে শঙ্কার নিবৃত্তি করাই হইয়াছে।

এখন যদি বলা হয় তাহা হইলে রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত দিলে কি দোষ হইত; তাহা হইলে বলিব যে, জগতের সত্যতাবোধ সাধারণতঃ অতি দৃঢ় হয়, এই দৃঢ় সত্যতাবোধকে বিনষ্ট করিতে হইলে, যাহাকে লোকে সত্য বলে, তাহাকে অবলম্বন করিয়াই তাহা করিলে জগৎসত্যতাজ্ঞানীর পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হয়। আর এখানে প্রকরণই "একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান", সুতরাং রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তে শিষ্যের মনে প্রশ্ন হইবে—রজ্জুসর্প মিথ্যা বস্তু, তাহার দ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান কি করিয়া হইতে পারে? এজন্য এইরূপ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা হইল—যাহাতে তাদৃশ সংশয় জন্মিবে না, অথচ এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রধান অংশ যে দৃশ্যমিথ্যাত্ব, তাহাও বুঝাইবার সুবিধা হইবে, এই জন্য মৃত্তিকার জ্ঞানে সকল মৃন্ময়ের জ্ঞান হয় বলিয়া সেই মৃত্তিকাতেই সত্যতাবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া মৃদ্বি-কারে মিথ্যাত্ববুদ্ধির ইঙ্গিত করা হইল। এই জন্য রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্ত গৃহীত হয় নাই।

(৭) অতঃপর ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের কয়েকটী মন্ত্রের উল্লেখ করিয়া বলা হইতেছে—"বেদ ও ব্রাহ্মণের এই সমস্ত মন্ত্রগুলি" ইত্যাদি। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের মন্ত্র কোনটী? ব্রাহ্মণ বাক্যগুলি কি মন্ত্র? মন্ত্র হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিব কেন? বেদের ত দুইটী ভাগই আছে—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। আর বেদাতিরিক্ত ব্রাহ্মণ কি আছে? ব্রাহ্মণ কি বেদ হইতে অতিরিক্ত? কথাটী কি নিতান্ত অসঙ্গত হয় নাই?

যাহাহউক, উপনিষদ্‌ভিন্ন বেদবাক্যদ্বারা স্বমতস্থাপনার্থ যে সব বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতিপয়ের যে অবস্থা তাহা দেখা গেল। এতদ্দ্বারাই সুধীগণ বুঝিবেন—প্রবন্ধ-কর্ত্তার বেদজ্ঞান কিরূপ? ইহাতে না আছে শাস্ত্রীয় রীতি, না আছে যুক্তি; আছে কেবল পাশ্চাত্য পদ্ধতি ও তদনুযায়ী চিত্তবৃত্তি। বাহুল্যভয়ে অপর গুলির বিষয় আলোচনা আর করিলাম না, কেবল সেগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আজকাল কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডের বাক্যদ্বারা তত্ত্বটী দ্বৈত, কি দ্বৈতাদ্বৈত, কি অদ্বৈতসিদ্ধান্ত—ইহা স্থির করিবার জন্য পাশ্চাত্যশিক্ষিতগণের মধ্যে একটা আগ্রহ দেখা যায়। এস্থলেও তাহাই করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার মূল্য কত, তাহা সুধীগণই বিবেচনা করিবেন। এই সকল বেদবাক্যের অনুবাদে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বহু ভ্রমপ্রমাদই দৃষ্ট হইবে, এবং পাছে কেহ সেই সকল ভ্রমপ্রমাদ দেখিয়া কোন রূপ কটাক্ষ করে, সেই ভয়ে "পাদটীকায়" বলা হইয়াছে—"এই প্রবন্ধে বেদ উপনিষদাদির যে সমস্ত বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার যথাশ্রুত তাৎপর্য্যানুবাদ মাত্র দেওয়া হইয়াছে। কোনও বিশেষ মতের অর্থ দেওয়া হয় নাই, ভাষ্যাদিরও অনুসরণ করা হয় নাই, আক্ষরিক অনুবাদের প্রতি প্রয়াস করা হয় নাই।"

প্রবন্ধকর্ত্তার এই ভয় দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা যায় না। আচ্ছা, যথাশ্রুত তাৎপর্য্যানু-বাদ জিনিষটা কিরূপ। "যথাশ্রুত অনুবাদ" হইলে "আক্ষরিক অনুবাদ"ই হয়, কারণ, অক্ষরা-নুযায়ী যে শব্দ, তাহাই ত শ্রুত হয়। তাৎপর্য্যানুবাদ হইলে ছয়রূপ তাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গের সাহায্যে শ্রুতবাক্যের যে অর্থ, তাহাই বুঝায়। ইহাতে 'যথাশ্রুত অর্থ' হইতে কখন কখন অন্যথাও ঘটে, কিন্তু তাহা তাৎপর্য্যের বিরোধী হয় না। অতএব "যথাশ্রুত তাৎপর্য্যানুবাদ" শব্দের অর্থ হইবে—যেমনটী শ্রুত হয় তাহার যে তাৎপর্য্য তাহার কথন। কিন্তু তাহা হইলে যথাশ্রুত পদটী কি ব্যর্থ হইল না! তৎপর্য্যানুবাদ ত যথাশ্রুতেরই হয়! অশ্রুতেরও কি তাৎপর্য্যানুবাদ হয়? আচ্ছা, হউক—ব্যর্থ, উহা না হয় পরিচায়কমাত্রই বলা গেল। কিন্তু এই "তাৎপর্য্যানুবাদ" ভাষ্যাদির অনুসরণদ্বারা করা হয় নাই, অথবা আক্ষরিকও করা হয় নাই—এই কথা বলায় কি বুঝাইল? ইহাতে কি প্রবন্ধকারকে ভাষ্যকারগণের সহিত সমান আসন দিবার দাবি করা হইল না? কিন্তু প্রবন্ধকর্ত্তার পক্ষে এই কার্য্যটা কি হিন্দুসমাজে প্রশংসনীয় হইতে পারে? আর যদি ভাষ্যকার-গণের মতে চলিবার ইচ্ছা না থাকে, স্বয়ংই ভাষ্যকারদিগের মত বা তদপেক্ষা বড় ইত্যাদি হইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাতে আক্ষরিক অনুবাদ করিয়া বিচারদ্বারা তাহার যথার্থতা সিদ্ধ করিয়াই ত করিতে হইবে। আক্ষরিক অনুবাদ সেস্থলে বাদ দেওয়া যায় কি করিয়া? আচ্ছা, তাৎ-পর্য্যানুবাদ কোন মতবাদ দিয়া হয় না কি? তবে কি নিজমতও বাদ গেল? কিন্তু তথাপি বলা হইল— "ইহাতে কোন বিশেষ মতের অর্থ দেওয়া হয় নাই।" এবং "আক্ষরিক অনুবাদের

প্রতি প্রয়াস করা হয় নাই।" ইত্যাদি। অতএব এই সকল কথা হইতেই বুঝা গেল, এস্থলে বেদবেদান্তের যে সব বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহার অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা স্বেচ্ছাচার, তাহা একেবারেই আস্থেয় নহে। যেহেতু ইহা—না আক্ষরিক অনুবাদ, না ইহাতে কোন মতস্থির আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় —প্রবন্ধকারের এতাদৃশ বিকৃত অর্থেও অদ্বৈতবাদের খণ্ডন হয় নাই। কারণ, অদ্বৈতবাদীর নিকট দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অচিন্ত্যভেদাভেদ, অচিন্ত্যাদ্বৈতাদ্বৈত সকল মতবাদেরই অধিকারিভেদে একটা একটা স্থান আছে। অদ্বৈতবাদীর কাহারও সঙ্গে বিরোধ নাই। বিরোধ করেন—দ্বৈতপ্রভৃতিবাদিগণ! অদ্বৈতবাদী কেবল তাঁহাদের আক্রমণের উত্তর দেন এবং স্বমতস্থাপন করেন মাত্র। বেদের কোন বাক্যের দ্বারা দ্বৈতাদিবাদ সিদ্ধ হইলেও যতক্ষণ অদ্বৈতবাদের খণ্ডন না হয়, ততক্ষণ অদ্বৈতবাদীর বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, নিজের উদ্ধৃত বেদবেদান্তের বাক্যগুলির অনুবাদে ভ্রমপ্রমাদজন্য নিন্দার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও অসঙ্গতি ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

অতঃপর যে সব বেদবাক্য ও তাহাদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা এই—

"কস্মিন্নঙ্গে তপোঽস্যাধিতিষ্ঠতি কস্মিন্নঙ্গে ঋতমস্যাধ্যাহিতম্।
ক্ব ব্রতং ক্ব শ্রদ্ধাঽস্য তিষ্ঠতি কস্মিন্নঙ্গে সত্যমস্য প্রতিষ্ঠিতম্॥
কস্মাদঙ্গাৎ দীপ্যতেঽগ্নিরস্য, কস্মাদঙ্গাৎ পবতে মাতরিশ্বা।
কস্মাদঙ্গাৎ বিমিমীতেঽধি চন্দ্রমাঃ মহঃ স্কম্ভস্য মিমানোঽঙ্গম্॥
কস্মিন্নঙ্গে ভূমিরস্য কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি অন্তরীক্ষম্।
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি আহিতা দ্যৌঃ কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি উত্তরং দিবঃ॥

ইহার কোন্ অঙ্গে ঋত শ্রদ্ধা ব্রত ও সত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ইহার কোন্ অঙ্গে অগ্নি দীপ্তি লাভ করিতেছে, বায়ু বহন করিতেছে, চন্দ্রমা আলোক বিতরণ করিতেছে। পৃথিবী অন্তরীক্ষ স্বর্গলোক ও স্বর্গোত্তরলোক ইহার কোন্ অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

ঐ সূক্তেরই ৩৭ মন্ত্রে লিখিত আছে—

কথং বাতো নেলয়তি কথং ন রমতে মনঃ।
কিমাপঃ সত্যং প্রেপ্সন্তী নেলয়ন্তি কদাচন॥
মহদ্ যক্ষং ভুবনস্য মধ্যে তপসিক্রান্তং সলিলস্যপৃষ্ঠে
তস্মিন্ শ্রয়ন্তে যে উ কে চ দেবাঃ বৃক্ষস্য স্কন্ধঃপরিত ইব শাখাঃ

বায়ু কি হেতু সদাই বহমান, আমাদের মন কেন সদাই চঞ্চল, সত্যের অন্বেষণে যে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহার বিশ্রাম নাই কেন? ঐ যে মহা যক্ষ সলিলের মধ্যে আপন তপস্যায় নিমগ্ন রহিয়াছে; বৃক্ষ যেমন শাখাকে তেমনি সমস্ত দেবতারা তাঁহাতেই সম্বদ্ধ রহিয়াছে।

অপ তস্য হতং তমো ব্যাবৃত্তঃ স পাপ্মনা।
সর্ব্বাণি তস্মিন্ জ্যোতীংষি যানি ত্রীণি প্রজাপতৌ॥

তিনি অন্ধকার দূর করিয়াছেন, তিনি পাপনির্ম্মুক্ত এবং যে তিনটি জ্যোতিঃ প্রজাপতির মধ্যে রহিয়াছে তাহারা সকলেই তাহার মধ্যেই নিহিত আছে। অথর্ব্ববেদের দশমমণ্ডলের অষ্টম সূক্তে দেখিতে পাই—

যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্ব্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
স্বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ।
যদেজতি পততি যচ্চ তিষ্ঠতি প্রাণাদ প্রাণাৎ নিমিষচ্চ যদ্ভুবৎ
তদ্দধার পৃথিবীং বিশ্বরূপং তৎসম্ভূয় ভবত্যেকমেব।
অনন্তং বিততং পুরুত্রা অনন্তং অন্তবচ্চ আসমন্তে...
যতঃ সূর্য্য উদেতি অস্তং যত্র চ গচ্ছতি
তদেব মন্যেঽহং জ্যেষ্ঠং তদুনাত্যেতি কিঞ্চন
পুণ্ডরীকং নবদ্বারং ত্রিভিগুণেভিরাবৃতং
তস্মিন্ যদ্ যক্ষং আত্মন্বৎ তদ্বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ
অকামো ধীরোঽমৃতঃ স্বয়ম্ভূঃ রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চিনোনঃ
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যো রাত্মানং ধীরমজরং যুবানং

যিনি অতীত অনাগত ও বিশ্বভুবনকে অধিষ্ঠিত করিয়া রহিয়াছেন, এবং স্বর্লোক কেবল যাহারই আয়ত্তীভূত, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার। যাহা কিছু জঙ্গম, উৎপতনশীল, স্থাবর, যাহা কিছু প্রাণবান্ ও প্রাণহীন, যাহা এই বিশ্বরূপ পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছে, তাহা সমস্ত তাঁহার মধ্যে একীভূত হইয়া রহিয়াছে। বিশ্ববিসারি যাহা কিছু অনন্ত, যাহা কিছু সান্ত, সমস্তই তাঁহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। যে স্থান হইতে সূর্য্য উদিত হয় ও যেখানে অস্ত যায়, তিনিই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্ম তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। ত্রিগুণের দ্বারা আবৃত নবদ্বার পুণ্ডরীকের মধ্যে ব্রহ্মবিদেরা তাঁহার সন্ধান পান। সেই অকাম, অমৃত, ধীর, আত্মরসে পরিতৃপ্ত, স্বয়ম্ভু সর্বতঃ পরিপূর্ণ, অজর, চিরতরুণ আত্মাকে জানিলে মৃত্যুর ভয় থাকে না। আবার শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায়—

ব্রহ্ম বৈ ইদমীগ্রে আসীৎ, তদ্দেবানসৃজত, তদ্দেবান্ সৃষ্ট্বা ত্রিষু লোকেষু ব্যারোহয়ৎ, অস্মিন্নেব লোকে অগ্নিং বায়ুং অন্তরীক্ষে দিবি এব সূর্য্যম্..অথ ব্রহ্মএব পরার্দ্ধমগচ্ছৎ, তৎপরার্দ্ধং গত্বা ঐক্ষত কথং নু ইমান্ লোকান্ প্রত্যবেয়াম্ ইতি। তদ্দ্বাভ্যামেব প্রত্যবৈৎ রূপেণ চৈব নাম্না চ সঃ। যস্য কস্য চ নাম অস্তি তন্নাম। যস্য অপি নাম নাস্তি যদ্বেদ রূপেণ, ইদংরূপমিতি তদ্রূপম্। এতাবদ্বৈ যাবদ্রূপং চৈব নাম চ। তে হ এতে ব্রহ্মণোমহতী অভ্বে। বেদ মহদ্ হ এব অভ্বং ভবতি। স যোহ এতে মহতীযক্ষেবেদ মহদ্ হ এব যক্ষং ভবতি। তয়োরন্যতরজ্জ্যায়োরূপমেব। যদ্ হ্যপি নাম রূপমেব তৎ। স যো হেতয়োর্জ্যায়ো বেদ জ্যায়ান্ হ তস্মাদ্ ভবতি। যস্মাজ্জ্যায়ান্ বুভূষতি "মনো বৈরূপং মনসা হি বেব ইদংরূপমিতি তেন রূপমাপ্নোতি অথ যৎ বাচ আহরয়তি বাগ্ বৈ নাম, বাচা হি নাম গৃহ্নাতি।" এতাবদ্বৈ ইদং সর্ব্বং যাবদ্রূপং চৈব নাম চ। তৎসর্ব্বমাপ্নোতি। সর্ব্বং বৈ অক্ষয্যম্।

প্রথম কেবল ব্রহ্মই ছিলেন। তিনি দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য স্থানে নিবেশিত করিলেন, পৃথিবীতে অগ্নিকে বসাইলেন। অন্তরীক্ষে বসাইলেন বায়ুকে এবং সূর্য্যকে বসাইলেন দ্যুলোকে। সত্যলোকে আরোহণ করিয়া ব্রহ্ম চিন্তা করিলেন, কি উপায়ে আমি বিশ্বলোককে ব্যাপ্ত করিতে পারি, দুই উপায়ে আমি বিশ্বলোককে ব্যাপ্ত করিতে পারি, নামে এব

রূপে। যাহা কিছুর নাম আছে তাহাকেই বলি নাম, যাহা কিছুর নাম নাই, অথচ যাহাকে রূপের দ্বারা জানা যায়, "ইহা এইরূপ" তাহাকেই বলি রূপ। এই উভয়ই লইয়াই নাম এবং রূপ। এই উভয়ের মধ্যেই ব্রহ্ম আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়াছেন। এই উভয় রূপকে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মের মহাব্যাপ্তিকে প্রাপ্ত হন। এই দুইটিই ব্রহ্মের বৃহৎ প্রকাশ। যিনি এই দুইকে জানেন, তিনিই ব্রহ্মের বৃহৎপ্রকাশের সমতা প্রাপ্ত হয়েন। নাম এবং রূপের মধ্যে রূপই বড়। যাহা কিছুর নাম আছে তাহা রূপই। এই বৃহৎস্বরূপ রূপকে যিনি জানেন, তিনি যাহা হইতে বড় হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইতেও বড় হন। মনের দ্বারা "এই রূপ" এইভাবে রূপকে আমরা জানি, সেই জন্য মনকে বলি রূপ। বাক্যের দ্বারা যাহাকে আহরণ করি, তাহাকে বলি নাম। যাহা কিছু আছে, তাহা সমস্তই নাম এবং রূপ। ব্রহ্ম আপনাকে নাম ও রূপের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়াছেন। সেই জন্য এই নামরূপাত্মক সমস্তই অক্ষয়। এই অক্ষয়রূপে যিনি নাম রূপকে জানেন তাঁহার সুকৃত অক্ষয় এবং অক্ষয় লোকে তাঁহার প্রতিষ্ঠা।

বাজসেনেয়ি সংহিতায় ৩১।১৯ লিখিত আছে—

প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে।
তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্ হ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বাঃ।

প্রজাপতি গর্ভের মধ্যে ভ্রমণ করেন, অজাত হইয়াও তিনি বহুবিধ প্রকারে জন্মগ্রহণ করেন। যাহার মধ্যে বিশ্বভুবন নিহিত রহিয়াছে, ব্রহ্মবিদ্গণ সেই কারণ পুরুষকে প্রজ্ঞাদ্বারা দর্শন করেন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তে দেখা যায়—

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।
য আত্মদাঃ বলদাঃ যস্য বিশ্বে উপাসতে প্রশিষম্ যস্য দেবাঃ।
যস্য চ্ছায়া অমৃতম্ যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।
য প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বা একঃ ইদ্ রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।....
যেন দ্যৌ রুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বস্তভিতং যেন নাকঃ।
যোঽন্তরীক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যাঃ যোবা দিবং সত্যধর্ম্মা যজানা।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বিভ্রতীর্যজানাঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

প্রথম হিরণ্যগর্ভই উত্থিত হইয়াছিলেন, তিনি জন্মমাত্রই দেখিলেন, তিনি সমস্ত পৃথিবীরই ঈশ্বর। তিনি পৃথিবী ও দ্যুলোককে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, কোন্ দেবতাকে আমরা যজ্ঞের দ্বারা পরিতুষ্ট করিব। যিনি আত্মাকে আমাদিগকে দান করিয়াছেন, যিনি বল দিয়াছেন, যাহার নির্দ্দেশ দেবতারা পালন করেন, মৃত্যু ও অমৃত যাহার ছায়া, কোন দেবতাকে ইত্যাদি...। যিনি আপন বীর্য্যের দ্বারা সমস্ত প্রাণীলোকের সমস্ত দ্বিপদের ও চতুষ্পদের প্রভুরূপে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রহিয়াছেন, কোন দেবতাকে ইত্যাদি...। যিনি আকাশকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া-

ছেন, পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছেন, স্বর্গলোককে স্তব্ধ রাখিয়াছেন এবং অন্তরীক্ষ লোকের বায়ুমণ্ডলকে স্ববশে রাখিয়াছেন, কোন দেবতাকে ইত্যাদি ...। যিনি পৃথিবীকে উৎপন্ন করিয়াছেন, আপন স্থির নিয়মবর্গের দ্বারা তাহাকে শাসন করিতেছেন, যিনি স্বর্গলোকের জনক, যিনি স্নিগ্ধোজ্জ্বল বৃহৎ জলরাশিকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তিনি যেন আমাদিগকে আঘাত না করেন, কোন্ দেবতাকে ইত্যাদি ...।

আবার ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের ৮২ সূক্তে ৩য় মন্ত্রে—

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা
যো দেবানাং নামধাঃ এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্তি অন্যা
পরো দিবা পরঃ এনা পারো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি...
ন তং বিদাথ যঃ ইমা যজান অন্যদ্ যুষ্মাকং অন্তরং বভুব।
নীহারেণ প্রাবৃতাঃ জল্প্যা চ অসুতৃপঃ উক্থশ সশ্চরন্তি।

যে বিশ্বকর্ম্মা আমাদিগের পিতা, জনিতা ও বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনকে ও বিশ্ব চরাচরকে সম্পূর্ণ অবগত আছেন, যিনি দেবতাদিগের নামকরণ করিয়াছেন, সংশয় ভঞ্জনের জন্য যিনি সকলের শরণ্য, যিনি দ্যুলোকের, পৃথিবী লোকের, অসুর লোকের ও দেবলোকের পরপারে অবস্থিত, যিনি এই সকলকে উৎপন্ন করিয়াছেন, তাহাকে তোমরা জানিতে পার না, তিনিই অন্যরূপে তোমাদের মধ্যে অবস্থিত। যাহারা কেবল বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ফেরে এবং বৃথা বাগ্ জল্পনায় আপন সার্থকতা লাভ করিতে পারে না সেই মন্ত্রপাঠী ব্রাহ্মণেরা কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইয়া রহিয়াছে।"

এইরূপে অথর্ব্ববেদের ১০ মণ্ডলের ৭ম ও ৮ম, সূক্তের কিয়দংশ, শতপথ ব্রাহ্মণের কয়েকটী বাক্য, বাজসনেয়ি সংহিতার ৩১।১৯ মন্ত্র, ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২১ সূক্তে ও ৮২ সূক্তের ৩য় মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া এবং নিজ মনোমত তাহার অনুবাদ করিয়া যে স্বমত স্থাপন করিলেন তাহার সারমর্ম্ম এই—

"মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ অনুভব করিয়াছিলেন, যে * * এই যে বিশ্বভুবন রহিয়াছে, ইহা ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাদের সমস্ত শক্তিই তাঁহা হইতে সমুদ্ভূত, তাঁহারই অলঙ্ঘ্য নিয়মে বিশ্ব সংসার প্রবর্ত্তিত হইতেছে, মৃত্যু অমৃত তাঁহারই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বভুবনরূপে তিনি আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। * * আমাদের মনোরাজ্যের সমস্ত মননক্রিয়া সমস্ত প্রাণস্পন্দন তাঁহারই প্রভাবে তাঁহারই লীলায় সম্পন্ন হইতেছে। * * তিনি আপনাকে নামরূপের মধ্য দিয়া বাক্য ও বস্তুর মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। একদিকে যেমন তিনি বহির্জগদ্রূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি আমাদের অন্তরের মধ্যে আত্মস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। * * এই বিশ্বভুবনের মধ্যে তিনি আপনাকে নিঃশেষে সমাপ্ত করিয়া দেন নাই। * * এই বিশ্ব ভুবন * * তাঁহারই অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাঁহার পরিপূর্ণস্বরূপের একপাদমাত্র এই জগৎরূপে, এই শক্তিচক্রের সংস্থানরূপে উদ্ভাসিত হইতেছে। তাঁহার অবশিষ্ট ত্রিপাদ অমৃতময়-লোকে বিরাজ করিতেছে। বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াও তিনি অব্যাপ্ত, তিনি সকলের পরপারে। প্রাণের কারণ হইয়াও তিনি প্রাণকে অতিক্রম করিয়াছেন, মূর্ত্তির কারণ হইয়াও তিনি মূর্ত্তিকে

অতিক্রম করিয়াছেন, রূপের কারণ হইয়াও রূপকে অতিক্রম করিয়াছেন, নামের কারণ হইয়াও নামকে অতিক্রম করিয়াছেন।" ইত্যাদি।

উদ্ধৃত বেদবাক্য সমূহ হইতে উক্ত মতটী সিদ্ধ হয়, ইহাই এস্থলে বলিবার উদ্দেশ্য। কিন্তু যিনি ঐসকল বেদবাক্যের অর্থ আলোচনা করিবেন, তিনিই দেখিবেন যে, এতাদৃশ মতবাদ উক্ত বেদবাক্য হইতে পাওয়া যায় না। প্রত্যুত এই সব বেদবাক্য হইতে, যদি দুরাগ্রহ থাকে, তবে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত সকল বাদই সিদ্ধ করা যায়। এস্থলে যে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, তিনি সূক্ষ্মজগৎ-অভিমানী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম। তিনি সর্ব্বমূলব্রহ্ম নহেন; কিন্তু প্রবন্ধকর্ত্তা দুরাগ্রহবশতঃ সে দিকে চিন্তা করিতে পারিলেন না। যজ্ঞাদিতে এই ব্রহ্মের স্তুতি প্রয়োজন; এই জন্য ইহা কর্ম্মকাণ্ডের শ্রুতি বলা হয়। দুরাগ্রহবশতঃ একথাও একবার ভাবিতে ইচ্ছা হইল না!

তাহার পর এই কথাগুলি পড়িবামাত্র মনে হইবে কথাগুলি কোনপ্রকারেই যুক্তিসঙ্গতও নহে। কারণ, প্রথম—এই বিষয়গুলি যদি ঋষিদিগের অনুভবমাত্র হয়, তাহা হইলে ইহাদের প্রামাণ্যে সংশয় দূর হয় না। যেহেতু ঋষিগণ যে সর্ব্বজ্ঞ, তাহার প্রমাণ কি? যদি বলা হয়—বেদরূপ শাস্ত্রই প্রমাণ, তাহা হইলে বলিব সেই শাস্ত্র যে প্রমাণ, তাহা কে বলিল? শাস্ত্র ত ঋষির অনুভবমাত্র। অতএব শাস্ত্রদ্বারা ঋষির অনুভবের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। তবে যদি শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ অনাদি অপৌরুষেয় ঈশ্বরপ্রোক্ত মাত্র বলা যায়, তাহা হইলে সেই শাস্ত্রমূলক ঋষির অনুভব বলিয়া ঋষির অনুভবের প্রামাণ্য থাকিতে পারে। কিন্তু এমতে সেই শাস্ত্রই ঋষির অনুভব বলিয়া অর্থাৎ ঋষি-বিরচিত বলায় সে পথ আর থাকিতেছে না। অতএব এ সকল ঋষির কথায় প্রামাণ্যনিশ্চয় হয় না। আর বেদ হইতে এই মতের জন্য যে সব বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাও পণ্ডশ্রম মাত্রই হইয়াছে। যে বেদকে অভ্রান্ত বলা হয় না, তাহার দ্বারা যে মত প্রমাণিত করা হয়, তাহা সুতরাং অভ্রান্ত নহে। ফলতঃ ঋষির অনুভব বলিয়া ইহা অভ্রান্ত হইতে পারিল না।

দ্বিতীয় কথা—যদি বলা যায় এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ আমাদের অনুভব ও যুক্তি। তাহা হইলে বলিব যাঁহাদের অনুভবকে প্রমাণ বলিতে ইচ্ছা হয়, সে জাতীয় জীবনের অনুভব নয় বলিয়া ইহারা অভ্রান্ত হইতে পারিল না। এখন যদি বলা হয়, তবে যুক্তিই ইহার প্রমাণ, তাহা হইলে বলিব—তাহাও অসঙ্গত। কারণ, যাহার একঅংশ বিকৃত হইয়া জগৎ হয়, তাহার সর্ব্বাংশ বিকৃত না হইবার পক্ষে কোন কারণ থাকিতে পারে না। আর বিকৃত হইলে তাহার পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। অতএব "তাঁহার এক অংশ এই জগৎ, তিনি আপনাকে নিঃশেষে সমাপ্ত করিয়া দেন নাই" ইত্যাদি যে সব কথা, তাহা একান্ত যুক্তিহীন। অতএব এস্থলে বেদবাক্য সমূহ উদ্ধৃত করিয়া যে মতটী প্রদর্শিত হইল, তাহা যেমনি বেদবিরুদ্ধ, তেমনি যুক্তিহীন, এবং এক-জন সাধারণ ব্যক্তির অনুভব বলিয়া ততোধিক অনাস্থেয়। আর এই সাধারণ ব্যক্তির যদি পরিচয় দিতে হয়, তাহা হইলে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে—"যাহা কিছু ভূত ভবিষ্যৎ সমস্তই পুরুষের আত্মস্বরূপ" আর উপসংহারে বলা হইল—"তিনি আমাদের অন্তরের মধ্যে আত্মস্বরূপে বিরাজ করিতেছে * * এই বিশ্বভুবন তাঁহারই অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত" ইত্যাদি। অর্থাৎ এই বিশ্বভুবন কখন তাঁহার আত্মা, আর তিনি কখন এই বিশ্বভুবনের আত্মা—ইহাই বলা হইল। অতএব এতাদৃশ ব্যক্তির অনুভবের মূল্য কত তাহা সুধীগণেরই বিবেচ্য।

এস্থলে স্বমতপ্রদর্শনার্থ তিনি প্রথমে কেনোপনিষৎখানিকে অবলম্বন করিয়াছেন। ঈশোপনিষৎখানিকে স্পর্শ করেন নাই। তৎপরে কঠ, প্রশ্ন ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ও তিনি গ্রহণ করেন নাই। মুণ্ডক, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতেই তিনি তাঁহার অভীষ্ট অচিন্ত্যভেদাভেদ বা অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব আমরা তাহাই কেবল আলোচনা করিব। যথা—

(১) কেনোপনিষদের "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ" এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটী বাক্য বাদ দিয়া "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" এই পর্যন্ত বাক্যাবলী উদ্ধার করিয়া ইহাদের একটা যে ভাবার্থ প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে ত' অদ্বৈতবাদেরই সমর্থন হয় এবং প্রবন্ধকর্ত্তার অভীষ্ট অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদের বরং প্রতিকূলতাই হয়। কারণ, অনুবাদমধ্যে বলা হইয়াছে—"তাঁহাকে আমরা জানি না, জানিতে পারি না। তাঁহার কথা আমরা কি করিয়া বলিব? তিনি জানা ও অজানার বাহিরে। চক্ষু যাহাকে দেখিতে পায় না, যিনি চক্ষুর মধ্য দিয়া দেখেন—তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, আর যাহা কিছু উপাসনা কর, তাহা ব্রহ্ম নহে।"

আচ্ছা, এখানে যদি তাঁহার এক পাদ এই জগৎ বলা হয়, তবে তাঁহাকে আমরা জানি না ও জানিতে পারি না—ইহা বলা যায় কিরূপে? জগৎ ত আমরা জানিতেছি, আর এই জগৎ তাঁহার অংশ বলয়া তাঁহাকেও অগত্যাই জানিতেছি। অদ্বৈতমতে শুদ্ধব্রহ্মকে জানা যায় না—বলা হয়, সুতরাং সে মতে উক্ত অনুবাদ অনুকূলই হয়, আর অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে সুতরাং প্রতিকূলই হয়।

তাহার পর উক্ত অনুবাদটীও ভুল হইয়াছে, কারণ, "যৎ চক্ষুষা ন পশ্যতি" অর্থ "চক্ষু যাহাকে দেখিতে পায় না" এরূপ নহে, কিন্তু চক্ষুর দ্বারা লোকে যাহাকে দেখিতে পায় না। আর "যেন চক্ষুংষি পশ্যতি" অর্থ "যিনি চক্ষুর মধ্য দিয়া দেখেন" এরূপ নহে, কিন্তু "লোকে যাহার দ্বারা চক্ষু সকলকে দেখে, অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তিভেদে বিভিন্ন চক্ষুবৃত্তি সকলকে দেখে" ইত্যাদি। অতএব অনুবাদটীও ভুল।

আর এই ভুল করিয়া অদ্বৈতবাদেরই অনুকূলতা ভালরূপেই করা হইয়াছে। কারণ, বলা হইয়াছে—"যিনি চক্ষুর মধ্য দিয়া দেখেন তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে" ইত্যাদি। এখন চক্ষুর মধ্য দিয়া দেখে জীবই, সেই জীবকে তাহা হইলে ব্রহ্ম বলা হইল। বস্তুতঃ অদ্বৈতমতে "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ" ইহা অতি প্রসিদ্ধ কথা। অতএব কেনোপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া অজ্ঞাতসারে অদ্বৈতবাদই বলা হইয়াছে। সত্য এইভাবেই প্রকাশ পায়।

অতঃপর কঠ ও প্রশ্ন উপনিষদ্‌কে বাদ দিয়া মুণ্ডক উপনিষদ্ গ্রহণ করা হইয়াছে। এ দুইটী উপনিষদ্‌কে বাদ দেওয়া হইল কেন, তাহা বলা কঠিন নহে। কারণ ইহাতে তত সুবিধা হইত না। অপব্যাখ্যায় যাঁহাদের ভয় বা সংকোচবোধ নাই, তাহাদের মধ্যে এই উপনিষদ্ দুটীর মধ্যে অনেক স্থলই স্বমতের অনুকূল হইত সন্দেহ নাই। ইহা বোধ হয় প্রৌঢ়িবাদী শঙ্করাচার্য্যের ভাগ্যের বলে প্রবন্ধকর্ত্তার লক্ষ্য বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক—

(২) মুণ্ডকোপনিষদের বিচারস্থলে বলা হইতেছে—"মুণ্ডক উপনিষদে বলা হইয়াছে—"ওঁ ব্রহ্ম দেবানাং প্রথমং সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।" ব্রহ্মই পৃথিবীর কর্ত্তা, তিনিই পৃথিবীর পালয়িতা" ইত্যাদি।

দিগদর্শন

বিবাহ বিচ্ছেদ (ডাইভোর্স)

বিবাহ একটি ব্যাপার, একটি অনুষ্ঠান। ইহা নরনারীর প্রীতির প্রতীকরূপে আবহমান-কাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। মনে হয়, মানবের জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই স্বতঃ সিদ্ধ সত্য মানবের সংস্কার-গোচর হইয়াছে যে প্রণয় অচ্ছেদ্য। কিন্তু বর্তমানে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারা যায় ও তজ্জন্য সভায় বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল উপস্থাপিত হওয়ায় প্রণয়ের অচ্ছেদ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ হইয়াছে এবং তজ্জন্যই এতদ্বিষয়ক আলোচনারও প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, সখ্য, অনুকম্পা কারণ্য প্রভৃতি কমনীয় ভাবগুলি মানবমনের চিরন্তনী বৃত্তি। প্রণয়ের আত্ম-উৎসর্গকামী রূপ বিশ্বজন-গোচর। মানবের জীবন প্রবাহ প্রণয়েরই মহনীয় অবদান।

প্রণয় ও কামে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রণয় উৎসর্গ পরায়ণ, কাম ভোগলিপ্সু। লালসার আধিক্য বশতঃ প্রীতির সত্ত্বার অপ্রতিষ্ঠিততা হেতু কামকে কখন কখন প্রেম বলিয়া ভ্রম হয়। পশু জীবনে প্রীতির স্থান নাই বলিয়াই কামের নাম হইয়াছে পাশব-বৃত্তি। এই জন্যই দেখা যায় পশু দাম্পত্য ক্ষণিক ভোগলালসার প্রতিনিবৃত্তি। কিন্তু পক্ষান্তরে মানবে প্রীতির রূপ উৎসর্গ। উৎসর্গ ক্ষণিকের হয় না—উহা আমরণের।

মানবীয় অন্তরের বৃত্তিগুলি একটা প্রতীকের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হয়—সেইটি হইতেছে পরিণয় বা বিবাহ। বিবাহ ব্যাপারের মধ্য দিয়াই নরের কাছে নারীর উৎসর্গের আকাঙ্খা এবং নারীর কাছে নরের প্রীতির বাসনা অভিব্যক্ত হইয়া আসিতেছে। পশুর বিবাহ নাই তাহাদের যৌন সম্বন্ধও চিরন্তনী নহে। কারণ পশুচিত্তে প্রেম নাই—আছে লালসা। সুতরাং যেখানে লালসার পরিতৃপ্তিই একমাত্র কাম্য সেখানে অচ্ছেদ্য বৈবাহিক সম্বন্ধের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যেখানে প্রীতি ও প্রেম অপরিহার্য্য সেখানে বিবাহ বন্ধনও চিরন্তন ও অচ্ছেদ্য। সুতরাং পশুবৃত্তি যেখানে বলবত্তর সেখানে বিবাহ হয় কাম-বিবাহ এবং সেখানেই বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইতে পারে অর্থাৎ 'ডাইভোর্স' (divorce) সেখানেই প্রযোজ্য হইতে পারে। সুতরাং বিবাহবন্ধনচ্ছেদে মানব মানবীর আত্মার অবমাননার সহিত এক জঘন্য পশুবৃত্তিই তাহার বিকটরূপ প্রকাশ করিয়া চলে।

সুতরাং বিবাহ বন্ধন ছেদনের কথাটা শুনিলেই চক্ষের সমক্ষে পশু ও বর্ব্বর সমাজের একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়া বুঝাইয়া দেয় মানবের অন্তঃকরণে পশুভাব জাগ্রত হইয়াছে।

আত্মার মহিমার পরিচয় স্নেহ, প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধায়। এই আত্মার মহিমা তখনই ঘুচিয়া যায় যখন ভোগ প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। বিবাহ ব্যাপারে স্বৈরভাব অবলম্বিত হইলে নরনারীর মধুর ও পবিত্র সম্বন্ধ জঘন্য হইয়া যাইবে, তখন মানবে পশুতে কোন প্রভেদ থাকিবে না। তখন যৌন ব্যাপারে পশুর ন্যায় মানবও উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিবে। সুতরাং মানবতাকে

অবহেলিত করিয়া মানব সমাজে কুকুর-কুকুরীর অভিনয় করা যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহাদিগকে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু ভারতের নরনারী উজ্জ্বল বুদ্ধিবৃত্তি, সংস্কৃত সংস্কার, বহুদিনের পরম্পরা গত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইয়াও যখন প্রকাশ্য ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা উপস্থাপিত করিবার মনোবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তখনই মনে হয় ভারতে বিজাতীয় শিক্ষা ও সংস্কারজনিত কদর্য্য, বিভ্রান্ত দাস বুদ্ধির কথা—যে দাসবুদ্ধি বহু বিসর্পিত মূর্ত্তি লইয়া রাষ্ট্র ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিয়া চিত্ত ক্ষেত্রেও আবির্ভূত হইয়াছে।

যে ভারত এক সময়ে মনু, মান্ধাতা, পৃথু, ভরত ও রামচন্দ্রাদির ন্যায় ন্যায়বান্ ও সত্যধর্ম্ম পরায়ণ রাজগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ও পালিত হইত, যে ভারত বশিষ্ঠ, ব্যাস প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মর্ষিগণ দ্বারা অনুশাসিত ও শিক্ষিত হইত, যে ভারতবর্ষে প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তগণ লীলা করিয়া গিয়াছেন, যে দেশের নরনারী ঋষি শাসনানুসারে ধর্ম্মকর্ম্ম অবনত মস্তকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিল এবং যেখানে সমাজ ও ধর্ম্ম শাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল এবং যে পবিত্র ভূমিতে ভগবান্ অনেকবার শিক্ষা দিয়া আসিতেছিলেন, সেই পবিত্র ভারত জননীর সন্তান হইয়া আমরা প্রতীচীর শিক্ষা, আচার, ব্যবহার, ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদ, হাবভাব প্রভৃতিকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, রূপোন্মত্ত পতঙ্গকুলের প্রদীপ্ত বহ্নিতে আত্মবিসর্জ্জনের ন্যায়, আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাই দেখা যাইতেছে যে হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি অতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া এতকাল হিন্দু পতিপত্নীর মধ্যে প্রেম ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়াছে, সেই বিবাহ পদ্ধতির উচ্ছেদ কামনায় একদল বিজাতীয় ভাবাপন্ন নরনারী হিন্দু বিবাহ বিল উপস্থাপিত করিতে সাহসী হইয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছে না যে প্রতীচ্য বিবাহ পদ্ধতি পশ্বাচারের এক শোভনীয় সংস্করণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কিন্তু দেশের এক শ্রেণীর মনোভাব এই বিজাতীয় ভাবে ভাবিত হইলেও ভারতের সাধারণ নরনারী বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষপাতী নহে। হিন্দু-ভারতের নারীগণ এখনও বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠে। এবং তাহারা এতাদৃশ কার্য্যকে মহাপাপ বলিয়া মনে করে। ভারতের নরনারী এখনও মনে করে হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ বিল পাশ হইলে হিন্দু ভারতীয় জীবন বিষময় হইয়া যাইবে এবং স্বামী স্ত্রী পরস্পর যে অবিচ্ছিন্ন প্রীতিতে সুখময় জীবন যাপন করিতেছে তাহা নরকে পরিণত হইবে। কিন্তু 'গাঁয় মানে না আপনি মোড়ল' দল বিচার বুদ্ধির দৈন্যতাবশতঃ হিন্দু বিবাহের মর্য্যাদাও মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া, উক্ত বিলখানা ভারতীয় পরিষদ্ হইতে পাশ করাইয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কিন্তু নিরাশার মধ্যেও আশার সঞ্চার এই যে, এই সকল বিজাতীয় ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ যে হিন্দুসমাজের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে এবং হিন্দু ভারতীয় গণের সুখময় জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিতে চাহিতেছে, তাহা এক্ষণে হিন্দু জন সাধারণ ক্রমে বুঝিতে পারিতেছে। এইজন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিবাহ-বিচ্ছেদ বিলের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ণাশ্রম স্বরাজ সংঘ বিবাহ বিচ্ছেদ বিল ও অন্যান্য অনিষ্টকারী বিলসমূহের প্রতিবাদ কল্পে ভারতের সর্ব্বত্র আন্দোলন চালাইতেছে। সংঘের সাধু সংকল্প সিদ্ধ হউক—ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা।

প্রকৃত পক্ষে পতিপত্নীর যদি ধারণা থাকে যে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইবার নয়, তাহা হইলে

তাহারা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে পারে। যদি কখনও তাহাদের মধ্যে কোন অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াও উঠে, তথাপি বিবাহ বন্ধনের অচ্ছেদ্যতার জ্ঞান-বশতঃ তাহাদের প্রীতি টুটতে পারে না এবং তাহাদের জীবনের শান্তি, আনন্দ ও সন্তোষ সহজে নষ্ট হয় না। অধিকন্তু পুরুষ ও নারী কিছুকাল একত্র থাকিবার পর পারিবারিক জীবনে এমনি আবদ্ধ হইয়া পড়ে যে, একের ছাড়াছাড়ি হইবার ইচ্ছা থাকিলেও সহজে তাহা পারে না এবং সাময়িক উত্তেজনা বশতঃ ছাড়াছাড়ি হইলেও পরিণাম শুভাবহ হয় না। বিশেষতঃ বিবাহবিচ্ছেদের ধারণা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে স্বভাবতঃ পুনর্ব্বিবাহের প্রবৃত্তিও হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তখন দেহ ও মনের পরিশুদ্ধি রক্ষা করা দায় হইয়া পড়ে। এই পরিশুদ্ধির অভাব বশতঃ ভবিষ্যৎ বংশ শুধু বিশৃঙ্খল নয়, বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়। সমস্ত দিক্ ভাবিয়া দেখিলে বিবাহ বিচ্ছেদ মানবজাতির পক্ষে কখনও কল্যাণপ্রসূ নহে। এইজন্য বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য সমাজেও বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে মনীষিগণের মধ্যে নানা ভাবের জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। শুনিতে পাই এতদ্বিষয়ে বিলাতে নূতন আইন কানুনের প্রস্তাবও উঠিয়াছে—পার্লামেণ্ট রীতিমত লড়াই বাঁধিবে। যতদূর বুঝা যায় আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে এই বিবাহবিচ্ছেদ সমস্যা আপামর সাধারণকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে ডক্টর ডবলিউ তজ ও ডানাভাল্ মহোদয় ও ইংরাজ বিদুষী মহিলা ম্যাকিন্‌টস্ মহোদয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা হিন্দু ভারতীয়গণের প্রণিধানযোগ্য বলিয়াই তাহাদের কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

"মানব সমাজের সৃষ্টির যুগ হইতে বিবাহকে নরনারীর জীবন কালে একতা বা মিলন বলিয়াই পরিগণিত করা হইতেছে। তাহাতে বহু ক্ষেত্রে প্রভূত অমঙ্গল, অকল্যাণ এবং অনিষ্টও ঘটে নাই, এমন নহে—তবু এ বিধি সনাতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—বিবাহটা সভ্য সমাজের জীবন—অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে।

বিবাহ অর্থে আমরা বুঝি দায়িত্ব বহন বা বন্ধন (wed lock)। ইহার মধ্যে দায়িত্ব-হীনতা বা অবাধ স্বাধীনতার কোন আভাস ইঙ্গিতেও আমরা পাই না। বদ্ধ গৃহ শান্তিময় ও নিরাপদ-ময় তাই বুঝি। দ্বার মুক্ত রাখিলে চোর আসে ডাকাত আসে। নানা ভেজাল, নানা অশান্তি উৎপাত আসিয়া দেখা দেয়। বদ্ধ ঘরের শান্তি শৃঙ্খলা তাহাতে নষ্ট হয়; বন্ধনের সুখ এইখানে। যে গৃহ মুক্তদ্বার অবারিত—সেটা গৃহ নয়, আস্তানা বাঁধা সেখানে চলে না—সে যেন সবাইখানা।

বিবাহের সঙ্গে যদি এই অবারিত দ্বারত্ব জুড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে দুইটি নরনারীর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা চলে না। তাহাতে সম্ভ্রম মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। ক্রমাগত বিবাহ বিচ্ছেদ ও নব নব পতিপত্নী গ্রহণ যদি চালাও তাহা হইলে বহু বিবাহ poly gamy ও polyandry বলিতে নাকসিটকাও কেন? তাহাতেও স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক যা দাঁড়ায় polyandry ও polygamy তেও তো সেই সম্পর্ক -Succession of registered husband and wives.

বিবাহ পাশ্চাত্য সমাজে contract বিবেচিত হইলেও তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে—এসম্পর্ক আমরণ till death us do part"—এ সর্ত্তে স্বামী স্ত্রী উভয় পক্ষকেই নিরাপদ নির্ভর দেওয়া হইতেছে—Peace and security to both partners.

প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা সংস্কার—এ সবের দোহাই মানিয়া কোন ফল পাওয়া যাইবে না।

স্বামী স্ত্রীর মনে যদি গোড় হইতেই ধারণা জাগে যখন খুসী এমিলন টুটিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে দেহ মনের পরিশুদ্ধি রক্ষা করা দায় হইবে। কাহার পুত্র কন্যা কে মানুষ করিবে? ভবিষ্যৎ বংশ যে রসাতলে যাইবে। দেহ ও মনের নিষ্ঠ ও শুদ্ধি আর যে কারণেই না মানো ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্য না মানিলে নর জীবন শুধু বিশৃঙ্খল নয়, বিনষ্ট হইবে। বিবাহ বিচ্ছেদের কথা যখন মনে জাগে তখন তার সঙ্গে পুনর্বিবাহের আশু সম্ভাবনাও জাগিয়া থাকে। এই পুনর্ব্বিবাহ বা অপর যাহাকে খুসী দেহ দান একল্পনায় cultured মনে বিদ্রোহ যদি না জাগে, তাহা হইলে মনের culture লইয়া গর্ব্ব বা গৌরব করা চলে না। সে বিবাহ দাঁড়াইবে, legalised form of concubinage."

বিদুষী ইংরাজ মহিলা মিসেস্ এম্ ম্যাকিন্‌স্, এম, এ ম হাদয়া বলিয়াছেন—

"সকল যুগেই নরনারীর জীবনের দুইটি প্রধান অবলম্বন বিবাহ ও গৃহ। বর্ত্তমানযুগে এই উভয় অবলম্বনই ডাইভোর্শ নামক অকল্যাণজনক প্রেতের প্রভাবে আচ্ছাদিত হইয়াছে। এই প্রেত নরনারী বর্গের হৃদয় আতঙ্কাভিভূত করিয়াছে ডাইভোর্শ প্রথার শক্তি যে সমাজবিধ্বংসী এবং সামাজিক হিতের প্রতিকূল, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেক যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান যুক্তি এই যে ইহার প্রভাবে ঘর ভাঙ্গিয়া যায় ও পরিবার নষ্ট হয়। বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য সন্তান উৎপাদন। এই উদ্দেশ্য পরিপূরণের জন্যই পারিবারিক বন্ধনের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে না—যদি স্বামী স্ত্রী মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দাম্পত্য বন্ধন সুদৃঢ় না রাখে। * * * আজকাল স্বাধীন প্রেমের অভিনব নীতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই সকল প্রতিবাদী আধুনিকেরা বিবাহ বন্ধন শিথিল করিয়া কামজ প্রেমের স্বাভাবিক অধিকারকে অবাধ মুক্তিদানের পক্ষপাতী। এই অভিনব ব্যবস্থার ফলে মানুষের বংশবৃদ্ধি চলিতে থাকিবে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রণালীতে। পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের ধারণা বিলুপ্ত হইবে এবং শিশুর দল কীট পতঙ্গের পন্থায় বর্দ্ধিত হইবে। সব সমান; তাহাদের মধ্যে না থাকিবে ব্যক্তিত্ব না থাকিবে কোন উদ্দেশ্যের বিশিষ্টতা। এই অভিনব শিক্ষা আমেরিকায় ও সোভিয়েট রুশিয়ার পরীক্ষিত হইতেছে। কিন্তু তাহার ফল কল্যাণপ্রদ হয় নাই।"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কার দিকে চাই ?

বর্ত্তমান সময়টা অনেক বিষয়েরই একটা বিষম পরীক্ষার সময়; নানাদিকে নানা স্থানে নানা বিষয়ে লোকের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ—জীবন ও সমাজ সমস্যার বিষম সঙ্কট এই পরীক্ষার কষ্টি পাথর হস্তে বর্ত্তমানের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আর সমুদয় বিষয়ের ন্যায় "বর্ত্তমান বাঙ্গলা" ও যে এই পরীক্ষার এক বস্তু তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গলার দশা দেখিয়া অনেকেই শঙ্কিত ও আতঙ্কিত। বাঙ্গালীর শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও আর্থিক দৈন্যের কথা বলিবনা—যে ভাবসম্পদ, শিক্ষা ও সাহিত্য, তাহার গর্ব্বের কারণ তাহাও যে কতদূর গরলপূর্ণ, তাহাই পরীক্ষণের বিষয়। ইহাদের লইয়াই "বর্ত্তমান বাঙ্গালা"। কার্য্য দেখিয়া যদি কারণের বিচার করা যায়, তবে এই বর্ত্তমান বাঙ্গলার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা ও ঘটনা, এবং যাহারা এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদিগের চরিত্র সর্ব্বাগ্রে আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা করিবার অবসর বড়

কাহারও হয় না ; সে সাহস ও ধৈর্য্য বড় কাহারও নাই ! করিতে গেলে আত্মসংশোধনের একটী সুযোগ আসিতে পারে ; মানুষ তাহা লইতে নারাজ।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তথা বঙ্গীয় সংস্কৃত সংসদের সম্পাদক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ দাস গুপ্ত মহাশয় তাঁহার বার্ষিক অভিভাষণে এই চরিত্র বিশ্লেষণের একটী সুযোগ দান করিয়াছেন। দেশবাসীদিগের এজন্য তাঁহার নিকট ঋণী থাকা উচিত। সকলেই যেন উক্ত অভিভাষণের প্রথম অংশ পাঠ করিয়া দেখেন। পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন দেশপূজ্য মহাপুরুষ। "বর্ত্তমান বাঙ্গলার জন্মদাতা" বলিয়া তাহার খ্যাতি অসাধারণ। বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা রামমোহন রায়কেও অনেকে এ যুগের প্রবর্ত্তক ও জাতির জন্মদাতা বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। দেশের যে অবস্থা, তাহাতে আরও অনেকের ইহার জন্মদানের দাবী কীর্ত্তিত হইতে পারে !

বাস্তবিক ইঁহারা যে সময়ে বাঙ্গলার জনন-ক্রিয়াতে রত ছিলেন, সেই সময়টা সমগ্র মানব ইতিহাসের একটী অতি গুরুতর যুগ। ব্রিটিশ রাজ্যশাসন দেশের বুকের উপর আধিপত্য করিয়া বসিয়াছে। পাশ্চাত্যের প্রভাব বাহিরে ভারতের উপরে বিলক্ষণরূপে বিস্তার করিয়া বসিয়াছে ; ভারতের অন্তরাত্মা তার কাছে আপনাকে বিলাইয়া দিবে কিনা তাহাই প্রশ্ন হইয়াছিল। যে সংস্কৃত শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া উহা চিরন্তন কাল সঞ্জীবিত ছিল তাহার স্থানে পাশ্চাত্য শিক্ষা—ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শন এবং ইংরেজী ভাষার প্রচলন ব্যবস্থা তখন হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এরূপ প্রচণ্ড ঘটনা আর দ্বিতীয় কিছু হয় নাই—ইহা বলিয়া বিদেশীয়েরাও আতঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন ; কিন্তু ভারতের মনীষীরা তখন ইহাতে উৎফুল্লই হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্যের মোহে বিমুগ্ধ হইয়া ভারতের তৎকালীন আত্ম-ভোলা অগ্রণীদের দল কিরূপে পরবর্ত্তী বংশধরগণের সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন পণ্ডিত বিদ্যাসাগর তাঁহার আপন কথাতেই তাহার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন—নিজ নিজ জাতি ও সাধনার উপর শ্রদ্ধা না থাকিলে কেহই জাতির প্রকৃত পথ-প্রদর্শক হইতে পারে না। হিন্দু সমাজের প্রতি যে বিদ্যাসাগরের অশ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধবা বিবাহেই তাহার প্রকাশ ; ধর্ম্মে তাঁহার স্থান কোথায় ছিল তাহা তাঁহার নিজ ভবনে ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের যে আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে, তাহা হইতে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। অবশেষে সংস্কৃত শিক্ষা—যাহাতে তাঁহার নাম ও খ্যাতির সংশ্রব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাতে তাঁহার কিরূপ অনুরাগ ছিল তাহাই আজ প্রকাশ পাইতেছে। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে ; একটী কথা আছে যে, তিনি নাকি বলিয়া থাকিতেন যে দুইটি বস্তু তাহার অতিশয় প্রিয়—মুড়ি ও সেকস্পিয়ার। ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি তাহার কিরূপ প্রীতি ছিল, ইহাতে তাহারই প্রকাশ। অনেকের কিন্তু এই ধারণা যে সেই চাদরপরিহিত ঠনঠনিয়া চটীজুতা পায়ে পণ্ডিতটি বুঝি ইংরেজী জানিতেনই না। এখন দেখিতেছি তিনি কেবল ইংরেজী জানিতেন না তাহা নহে, সংস্কৃত অপেক্ষাও তাঁহার উহাতে অধিক অনুরাগ ছিল—নতুবা সমুদয় সংস্কৃত সাহিত্যে সেকস্পিয়ারের ইংরেজী বহির ন্যায় মুড়ির মতন রসযুক্ত বিষয় পাইলেন না। পাশ্চাত্য মনীষীরাও কিন্তু এ বিষয় ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। জারম্যান মনীষী গেটে ও সোপান হওয়েরের অভিমত এ বিষয়ে স্মরণ-যোগ্য।

কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি যে ইংরেজী প্রীতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করিব—১৮২৪ খৃঃ অব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় -ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন তখনই এদেশের বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতির অঙ্গে স্থান লাভ করিয়াছে। সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠারও উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রচার (the avowed purpose of encouraging the study of Sanskrit and the cultivation of European literature and Science.) ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে রাষ্ট্র সংস্কারে এই নীতি আরও দৃঢ় বদ্ধ হইল—ঘোষিত হইল যে, The great object of the British Governmtet ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India and that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed in English education alone." তৎকালে এক শ্রেণী লোক সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষপাতী ও ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী হইয়াও না দাঁড়াইয়াছিলেন এমত নহে। ফলে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা তালিকায় ইংরেজী শিক্ষা তখন অধিক দিন স্থান পায় নাই—The English classes of the Sanskrit College having gradully dwindled away were abolished in 1835. সংস্কৃত শিক্ষাই তখন পর্য্যন্ত এদেশের উচ্চশিক্ষার সেতু বলিয়া পরিগণিত ছিল। জাতীয় সংস্কার ও প্রতিভা সমূদয়ই উহার অনুকূল ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে এদেশের প্রকৃত শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে সংস্কৃতের সাহচর্য্য করিয়াই চলিতে হইবে, এ কথা তখনকার শাসনকর্ত্তারা ভাল রূপেই বুঝিয়াছিলেন। কাজেই ১৮৪২ অব্দে ইংলণ্ডে কোর্ট অব ডিরেক্টার মনে করিলেন যে, সংস্কৃত কলেজ হইতে ইংরেজী শ্রেণী সমূহ তুলিয়া দেওয়া গর্হিত হইল। "We are doubtful of the advantage of the measure of the abolishment of the English classes of the Sanskrit College because it appears to us that the English class of the Sanskrit College afforded the only channel by which any knowledge of English could be attained by natives of a particuler class. সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশের যাহারা তখন শিক্ষা ও জ্ঞানে অগ্রণী ছিলেন—নিজ বাস্তুভিটা ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া প্রতীচির প্রথম দান ধনসম্পদ ও লোকমান্যতার অনুসন্ধানে ছিলেন. তাহারা এই ক্ষেত্রে ইংরেজীর মোহে কত দূর বিমোহিত হইয়াছিলেন তাহাই ধরা পড়িতেছে। হায়রে সেই মোহই কাল স্বরূপে আসিয়া, জাতীয় জীবনের সকল দিক অধিকার করিয়া, এই কলিতে সমুদয় দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে !

১৮৪৭ খৃঃ অব্দে পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের এ্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত হন। তখন তিনি সংস্কৃত কলেজের পাঠ্য তালিকাতে ইংরেজীকে অন্তর্ভূক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন না। পরে ১৮৫২ অব্দে তিনি যখন ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদে নিযুক্ত হইলেন, তখনই ইংরেজী সংস্কৃত কলেজের বাধ্যতামূলক পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইল। কতিপয় বৎসর পরে বারানসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্যালেন্‌টাইন্ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত শিক্ষা প্রণালী পরীক্ষণ নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হন (বিদ্যাসাগরের

কার্য্যকারিতার উপরে এই পরিদর্শনের কারণ বুঝা যায় না) ; তাঁহার সেই পরিদর্শনের সিদ্ধান্তে যে সত্য দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, আমাদের দেশের মহারথিদিগের মধ্যে তাহা দুর্ঘট। তিনি বলেন, "The teaching of Indian and English Logic to the Sanskritic students was not likely to be useful as students would then think that two kinds of truths were being taught in English Logic and in Hindu Logic : truth would thus be thought as double, and he also recommended that Bishop Berkley's book should be prescribed as a text book.—তাৎপর্য্য ইংরেজী লজিক ও সংস্কৃত ন্যায় শাস্ত্র (Logic) এক সঙ্গে পড়ান সঙ্গত নহে—ইহাদের লক্ষ্য পৃথক্, সত্যাদর্শও বিভিন্ন। বিসপ বার্কলের দর্শনশাস্ত্রের ন্যায় বিষয়—যাহার সহিত সংস্কৃত দর্শনের সাদৃশ্য আছে, তাহাই এ দেশের সংস্কৃত অধ্যায়িদিগকে পড়ান যাইতে পারে। উত্তরে বিদ্যাসাগরের উক্তি এই —"That the Vedanta and Sankhya are false systems of Philosophy is no more a matter of dispute. These systems, false as they are, command unbounded reverence from the Hindus. While teaching these in the Sanskrit course we should oppose them by the sound Philosophy in the English course to counteract their influence. —অর্থাৎ সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন যে মিথ্যার হাঁড়ি ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই ; মিথ্যা হইলেও হিন্দুদের উহাদের প্রতি শ্রদ্ধা অসীম। হিন্দুর মনে ইহাদের এই যে প্রভাব, তাহার প্রতিরোধ কল্পেই সংস্কৃত পাঠ্য বহির সঙ্গে সঙ্গে উহাদিগকে ইংরেজী দর্শনের সংস্কৃত বিরুদ্ধ ভাবের তত্ত্ব সমূহ পড়ান আবশ্যক ; যেন তাহার গভীর প্রভাবের দ্বারা ভারতীয় দর্শনের কুফল সমূহের উচ্ছেদ সাধন হইতে পারে।

ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনাত্মক বিচারে আজকাল একজন অতি সাধারণ পাঠকও বুঝিতে পারেন—ভারতীয় দর্শন কত গভীর ও সারগর্ভ এবং পাশ্চাত্যদর্শন কিরূপ অসার ও শূন্যগর্ভ। ফরাসী পণ্ডিত ভিক্টার কুঁজে, জারম্যান সোপেনহার, মোকস্‌-মুলার প্রভৃতি মনীষীরা ভারতীয় দর্শনের অদ্বিতীয় সারবত্তা সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় যড়দর্শনের প্রত্যেকটি বিষয়ই আপন আপন ক্ষেত্রে চরম তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছে। তন্মধ্যে আবার সাংখ্য প্রকৃতি এবং বেদান্ত পরমাত্মার বিষয়ে পরাতত্ত্বর সন্ধান দিয়া ভারতীয় জীবনের সকল দিকে এমন সত্য সংযোগ করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিলে, ভারতীয় জীবন অসার হইয়া পড়ে। বিদ্যাসাগরের বিদ্যার সীমাহীন পারাবারে এই তত্ত্ব ঠাঁই পায় নাই। এই আত্মঘাতী ব্যক্তিই নাকি অসাধারণ তেজস্বী ও আত্মমর্য্যাদাশীল ছিলেন। এ দুইএর সামঞ্জস্য করা কঠিন। বিদ্যাসাগরের সরল জীবন যাপন— ঠনঠনিয়া চটিজুতা ও উত্তরীয় চাদর মাত্র বসন প্রভৃতির—কথা দেশে প্রচলিত রহিয়াছে ; তাঁহার দানশীলতা, মাতৃভক্তি ও পরোপকার ব্রত অসাধারণ ছিল একথাও অনেকে অবগত আছেন, তবুও দেশের শিক্ষা ও সাধনার প্রতি তিনি কেন এরূপ বীতশ্রদ্ধ ছিলেন, তাহার কারণ খুজিয়া বাহির করিলে, বর্ত্তমান যুগে এদেশের জাতীয় মহাব্যাধিরই এক দুরূহ নিদান পাওয়া যায়—তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতার উপাসনা। বিদ্যাসাগর

তাঁহার বাহ্যিক চালচলন ও পোষাক পরিচ্ছদে যতই সরল ও স্বাধীন ভারতীয় প্রকৃতি পালন করিয়া থাকুন, শিক্ষা দীক্ষা আন্তরিক চরিত্র ও ব্যবহারে তিনি সম্পূর্ণই পাশ্চাত্যের দাস ছিলেন—সাংখ্য ও বেদান্ত সম্বন্ধে তাহার যে অভিমত, ভারতের যাহা কিছু স্বকীয় তাহার সম্বন্ধেও তাহাই। নতুবা তিনি যে দেশে শ্রীভগবান যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতে সামাজিক জীবনের চরম আদর্শ সকল দেখাইয়া দিয়াছেন—অসংখ্য মহাপুরুষ ও সাধ্বী রমণিগণ মানবীয়তার উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন—চিরন্তন কাল ধরিয়া ভারতের নরনারী যে সকল আদর্শ ধরিয়া চলিয়া ইহ জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, সেই দেশের বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত লিখিত পুস্তকে—আখ্যান মঞ্জরী ও চরিতাবলী—আরবদেশ, ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে চরিত্র সংগ্রহ করিতে যাইবেন কেন? সত্যপ্রিয়তা, দান ও আশ্রয় প্রভৃতির উচ্চ আদর্শের জন্য শ্রীরাম, শিবি, দাতাকর্ণ প্রভৃতি জাতির চির সম্পূজিত চরিত্রাবলীতে কিছুই গ্রহণযোগ্য পান নাই। সেই রূপই তিনি তাঁহার সমুদয় হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে কেবল বিধবা বিবাহের পক্ষে আপন পাণ্ডিত্যের নিয়োজন করিয়া তৎকাল সুলভ আপন প্রভাবের দ্বারা ধর্ম্মবিধ্বংসী রাজকানুন প্রবর্ত্তনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর দেশ মধ্যে অসাধারণ সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন। বর্ষে বর্ষে তাঁহার স্মৃতিপূজা হয়। কিন্তু শাস্ত্র, ধর্ম্ম, দেশ ও জাতির লক্ষ্যে তাঁহার জীবনের প্রকৃত কার্য্য বিচার করিতে গেলে, সেই সম্মানে ব্যাঘাত না আসিয়া যায় না। দুঃখের বিষয় এই যুগে এদেশে এ সকল বিষয়ে যে যত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, সেই তত উচ্চ সম্মান ও প্রভাবের অধিকারী হইয়াছে। দেশবাসী অবিচারে তাহাদের পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু সত্য কখনও লুক্কায়িত থাকে না। ক্ষীণ চেষ্টাতেই তাহার সন্ধান মিলে। সংস্কৃত এসোসিয়েসনের অধিবেশনে এবার সম্পাদক সেই সন্ধানের যে কিঞ্চিত অবকাশ দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ। সেই সত্যের বলেই বিদ্যাসাগরের অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও সাংখ্য ও বেদান্ত আজ পর্য্যন্ত সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে, জ্ঞান গরিমার অমোঘ ভাণ্ডার বলিয়া সকলে উহাদের পূজা করে ও করিবে। সেই সত্যের লক্ষ্যেই জাতীয় জীবনের এ কালের সৃজিত অনেক ভ্রম প্রমাদ দূর করিয়া, নানা মোহের তমোজাল ভেদ করিয়া, অনেক প্রতিষ্ঠিত মতবাদের myths বা অলীকতার উচ্ছেদসাধন করিয়া, জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে—তবেই তাহার প্রকৃত কল্যাণ পথ পড়িবে।—দর্শক।

কঃ পন্থা

(১)

সরল পথে, চ'লবে না আর, বক্র পথেই চল্।
সত্য কথায়, ভুলবে না কেউ, মিথ্যাকরেই বল্॥
দুনিয়াটা যে নেহাৎ বোকা'—
পারিস্ যত, দে না ধোঁকা,

লুকিয়ে রেখে, মনের হাসি, ফেল্‌না আঁখি জল্।
সাহস ক'রে, যা' এগিয়ে, ধ'রবে কে তোর ছল ?

(২)

মাথায় রেখে, হজ্জমি টিকি, বল্‌না "হরি হরি" মুখে,
লুকিয়ে খা'না সাহেবি খানা, ধরছে কে আর তোকে ?
　　সমাজ পতির প্রাপ্য যে টা,
　　চুকিয়ে দিলেই, চুক্‌বে লেঠা !
দক্ষিণান্ত, হ'লেই ক্ষান্ত, উঠবে কে আর রুখে !
সাতখুন মাপ্, সব চুপ চাপ্, ধুলো দিলেই চোখে।

(৩)

খুনডাকাতি, পড়বে ঢাকা, গেরুয়া পোষাক্ পর,
সংস্কৃতের, বুক্‌নিছুটো, ধ'রে ক্ষেপা ধর,
　　জবর জটা, মাথায় দে' না,
　　রুদ্রাক্ষটা, গলায় নে' না,
গাঁজার টানে, চক্ষুযুগল, রক্ত জবা কর্
খাতির পাবি, টাকাও পাবি, থাক্‌বে না আর ভয় ॥

(৪)

রোজকারটা, মন্দা যদিই, speech দিয়ে যা ছুটো,
দেশোদ্ধারের নামটি নিয়ে, দেশ্‌টি খাসা লোটো,
　　যা' হক creed এ সই না করে,
　　বাইরে দরদ দেখিয়ে, পরে,
খুব গোপনে, তারি ফাঁকে, অপর দলে ছোটো,
যখন যেমন, তখন তেমন, এই করে নে motto.

(৫)

দেশের কাজে খাঁটি মানুষ আছে কোথায় বল্,
এই ফাঁকে সব, যাচ্ছে ঢুকে, যত ঝুটোর দল্,
জোচ্চুরিতে—ভরা যে দেশ,
বাছতে গেলে, থাক্‌বে কি শেষ— !
ভয় কিরে তোর, তোরই আদর হবে সেথায়, চল্,
দেখ্‌না যেয়ে কি সব লোকে, চালায় দেশের কল

(৬)

দেশোদ্ধার সে মুখের কথা, আসল্ হচ্ছে নাম,
সেই মারফতে, আসবে টাকা, দেশ বিদেশে নাম।

নেহাৎ বেকার ছিল যারা
দেশের সেরা হচ্ছে তারা,
গোপন কথা, বুঝছে কে আর, কার বা আছে প্রাণ !
ধাপ্পাবাজীর, কারসাজিতেই, উঠ্‌ছে গুণ গান ॥

(৭)

মনের দুঃখে, কাজের মানুষ, পড়ছে যে ওই স'রে,
একচ্ছত্র, রাজ্য তোদের, হবেই এ'বার ও'রে !
পোড়া দেশের, নাইক সে চোখ্,
বুঝিয়ে দিলেও, বুঝ্‌বে না লোক্,
নেশার ঝোঁকে, সবাই পাগল, সবাই আছে ম'রে,
এই ফাঁকে তুই, গুছিয়ে নে কাজ, কৌশলে আর জোরে !

(৮)

বল্‌বি মুখে, "অসহযোগ," "সয়তান সরকার"—!
যতদিন না, চিৎকারে তোর, বিরক্তি হয় তার !!
মার ধোর, জেল, জরিমানা, গাল,
তারপর স'হে যাবি কিছু কাল,
দেখ্‌বি, সহসা, ব'নে যাবি নেতা, সস্তা স্বাধীনতার,
জয় জয় রবে, করতালি সবে, দেবে, দেবে ফুলহার !!

(৯)

বন্ধুভাবে যে মোক্ষলাভের বহুৎ দেরীই হয় !
শত্রু রূপেতে, তিন্‌টি জন্মে, মুক্তি সুনিশ্চয় !!
দেখ্‌বি হঠাৎ হাতটি ধ'রে,
কোন গোপনে. সোহাগ ভরে,
ব'লছে হেসে দেবতা এসে, এই লও বরাভয় !
ধনবান যশ্, লুটবে দুহাতে, তখন আর কারে ভয় ?

(১০)

সেদিন থেকে, নরম সুরেই, গাইবি দেশের গান
পাজীর দলে "ডিগ্‌বাজী" তায়, বলুন, ব'লতে চান—
সময় মতে চিকিৎসকে,
ওষুধ বদল, করেই থাকে,
সে সব তত্ত্বের মূর্খলোকে, বুঝ্‌বে কি সন্ধান ?
আজ যেটা ঠিক্, কাল সেটা ভুল, অপমানও হয় মান !!

(১১)

নাম ত জাহির, হ'য়েছে এবার কৌন্‌সিলে যা ঢুকে,
ছেলেগুলা সব, পচুক্ জেলে, দরদ দেখাস্ মুখে,
ইষ্ট পূজার গোপন কথা,
বল্‌বিই কেন যথাতথা,
যে যা'ই ভাবে, ভাবুক না তা,' ধরবে কে আর তোকে ?
—সুযোগ বুঝে, কাঁদিস্ যদি ভারত মাতার দুখে ??

(১২)

রাস্তার আইন, দেখ্‌লি ভাঙ্গা নেহাৎ সোজা নয় !
—সমাজধর্ম্ম, থাক্‌তে তবু, কাজের অভাব হয় ?
মনুর মাথায় মারবি ঘুসি,
স্বেচ্ছাচারী হবেই খুসী,
মূর্খ ঋষির মুণ্ডপাতেই সকল বাধার ক্ষয়,
যাবৎ জীবেৎ, সুখং জীবেৎ, মিথ্যা জুজুর ভয় !!

(১৩)

নিজের টাকায়, কর্ব্বে নেশা, লুটবে মধু ফুলে,
ধর্ম্মধ্বজীর, চোখ্‌রাঙানি, সইবে রে কোন্ foolএ
তাদের মনের মতন ক'রে
ধর্ম্মকে তুই দেনা গ'ড়ে
আচার-বিচার যম-সংযম কোন কাজ জাত কুলে ?
ভাল লাগাটুকু, বেঁচে থাক্ শুধু সব ধরমের মূলে !

(১৪)

"নারীর মুক্তি"—শুন্‌লেই নারী, নিশ্চয় যাবে ভুলে,
বিশ্বপ্রেমের, উদার গানে, প'ড়তেই হবে ঢুলে !
সাধুর বেশে, মধুর কথায়
গণ্ডীর বা'র ক'রে থাস্ তায়,
লঙ্কার দেশে, নিয়ে যাবি হেসে, কেশে ধরি রথে তুলে,
বৃদ্ধ জটায়ু, করিবে কি বল্, কিবা ভয় কোলাহলে ?

(১৫)

এতটা আলোতে' পুতুলের পূজা, গেলনাত দেশ্ থেকে,
মন্দির হ'তে, তাড়াও শুচিতা, যাক্ অনাচারী ঢুকে,
রক্তারক্তি হয় যদি তায়,
দুদশ জনায়, জেলই বা যায়,
পুতুল ব্যাধিটা ক'মবেই শেষে উঠুক দুদিন রুখে,
মা বোন কে আর, ছাড়বে তখন, মাতাল গুণ্ডা দেখে ?

(১৬)

"ছোট লোক"দের, আল্লায় দেশে, বাস করা হ'লো দায়।

যখন তখন, দল বেঁধে সব, কেবলই ভিক্ষা চায়।।

আলস্যেরই প্রশ্রয় এই,

ধর্ম্মের নামে কেন আর দেই,

আইনের বলে, দূর কর সবে, মুখে বল, "হায় হায়",

হরিজন যাবে, হরির মন্দিরে, কেন এত বাধা তায় ??"

(১৭)

Millএ millএ মিলে করে ধর্ম্মঘট—শুধু চাই, আরো চাই—

বাবুগিরি মোর, চলে যে কেমনে ভাবে না বেটারা ছাই !!

সে সব পুতুল মানিনা আমরা,

যা'না বাপু সব, সেই খানে তোরা

এতখানি ত্যাগ, করিলাম আজি, তবু মন নাহি পাই !

সাম্যের গান, গাহিতেছি পাজী, তবু কি বুঝিতে নাই ??

(১৮)

স্বেচ্ছাসেবিকা, স্বেচ্ছায় যদি, দিতে আসে দেহখানি

ছার জাতিকুল, নিয়ে কেন বল, কর এত টানাটানি ?

সহশিক্ষায় অসামাল হ'য়ে,

যবনেই যদি ক'রে ফেলে বিয়ে,

হিন্দুনারীর, লজ্জাটা কি এ, কেন মিছে কানাকানি ?

সহজ প্রেমের অবাধ প্রবাহে, যায় যদি ল'য়ে টানি ?

(১৯)

মিল্ নাহি হয়, ভাল নাহি লাগে দিবেত তখনি ছাড়ি

বিচ্ছেদ আইন, রয়েছে রঙীন, ভাবনা কি আর তারি ?

যেথা যতদিন, লাগে যার ভালো,

সেথা ততদিনই, প্রেমবারি ঢালো,

বিপুল বিশ্বে, র'য়েছে ত আরো, অগণিত নরনারী !

স্বাধীন ভারত, চাহে না বাঁধন হাওয়া যে স্বাধীনতারই !!

(২০)

হায়রে আমার বঙ্গভূমি, হায়রে ভারত মোর,

দুঃখ তোমার, বুঝবে কে মা, সবাই হ'লো যে চোর !

দুই চারিজন ছিল যা'রা ভালো

কোন্ ঠাসা, হায়, তা'রাই যে হ'লো,

সকল দিকেই, মতলবীদের, বেজায় হ'লো জোর !

আসল কর্ম্ম সকলিতো বাকি রহিল, জননি, তোর !!

শ্রীপ্রমথনাথ দে।

বর্ণ-বিভাগ।

শ্রীমদ্‌স্বামী মহাদেবানন্দ জী

বর্ণ—রক্ত, শ্বেত, কৃষ্ণ, পীতাদি ভেদে বিভিন্ন। পৃথিবীতে মনুষ্য মধ্যেও এই বর্ণবিভেদ পরিদৃষ্ট হয়। যদি মানবজাতি একই এডাম ও ইভের (Adam and Eve) পুত্র কন্যাগণের বংশে জন্মিয়া থাকে, তবে বর্ণ একই হওয়া আবশ্যক। আর যদ্যপি বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে বিভিন্ন পিতামাতা হইতে মানবজাতি সমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে বর্ণবিভেদ অনিবার্য্য। মঙ্গোল, নিগ্রো, কাফ্রি, আণ্ডামানী, য়িহুদী, (জু) দ্রাবিড়ী, আর্য্য ইত্যাদি বহুজাতির বহু বর্ণ হইবেই। অর্থাৎ দেশকাল পাত্র ভেদে বর্ণভেদ। শীত গ্রীষ্মাদিভেদ সব দেশ সমান নয়। কোথাও সুজলা, সুফলা, কোথাও বা মরুভূমি, অন্য কোথাও বা পার্ব্বত্যাদি দেশভেদ আছে।

পৃথিবীর প্রথম বয়সে, মধ্য বয়সে বা শেষ বয়সে উৎপন্ন বৃক্ষলতা জীবজন্তুর বিস্তীর্ণ ভেদ জিওলজি (ভূতত্ত্ব) শাস্ত্রে আছে। ইহাই কালভেদ। আর মঙ্গোলের কপালের অস্থি, নিগ্রো বা আণ্ডামনীর কপালাস্থি, আর্য্যগণের কপালাস্থি ও শ্মশ্রু কেশাদি ও পৃথক পৃথক পরিদৃষ্ট হয়। ইহা পাত্রগত ভেদ। অস্মদ্দেশে যেমন চেহারা দৃষ্টে ইনি পাঞ্জাবী, ইনি মারাঠী ইনি মান্দ্রাজী, ইনি বাঙ্গালী বলা সহজ, তেমনি ইনি ব্রাহ্মণ, ইনি ক্ষত্রিয়, ইনি বৈশ্য, ইনি শূদ্র তাহাও অনুমানসাধ্য বটে। এই বিভেদ পাত্রগত বিভেদান্তর্গত বলিতে হয়। শুনিতে পাই সুসভ্য মার্কিন দেশে নিগ্রোকে lynched লিঞ্চড্ করে। জার্ম্মান দেশে য়িহুদিরও সেই দশা উপস্থিত। জুকন্যা বিবাহ বন্ধনে যাঁরা স্বেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে সুস্থশরীরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁদের বিবাহ বন্ধন ছেদন আর্য্য আদালত করিতেছেন। জু সিমেটিক, ও জার্ম্মান শর্ম্মন্ বা ব্রাহ্মণ। মুসলমান জগতেও সৈয়দ, পাঠান মোগল চেহারা দৃষ্টে বলা চলে। চেহারাটা বাহিরের অবস্থা, অস্থি মাংসাদির গঠন তারতম্যের বিভেদ। ভিতরে বুদ্ধির তারতম্যের বিভেদও আছে। তজ্জন্য কপালাদির ভেদও বটে। কেহ তীক্ষ্ণবুদ্ধি নেপোলিয়ন বা প্লেটো, কেহ বার্ক বা বুদ্ধ, কেহ যীশু বা কৃষ্ণ হন, আবার কেহ বা নিরতিশয় মন্দবুদ্ধি হন। সব সমান নয়। বিভেদ সর্ব্বত্র—অন্তরে বাহিরে। বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ অথচ ঘোর চঞ্চল বা স্থির হইয়া থাকে। তদ্দৃষ্টে ত্রিগুণাত্মক বুদ্ধি কেহ কেহ বলেন। ঘোর-কুম্ভকর্ণজাতীয়, চঞ্চলরাবণজাতীয়, স্থির বিভীষণজাতীয় হয়। ভাষান্তরে ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়নামে অভিহিত হয়। এই তিন গুণের বিভিন্ন সমাবেশে বিভিন্ন চরিত্রের লোক হয়; এইটী কার্য্যভেদে, ব্যবহারভেদে বড়ই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সর্ব্বসমাজেই এই প্রকৃতি প্রদত্ত বুদ্ধির তারতম্য; কার্য্যকলাপেরও ধারা বংশপরম্পরায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে আইরিস, স্কচ, ওয়েলস্ ও ইংলিশ চারিটী জাতির চেহারা, ভাষা, ব্যবহারাদি যেমন প্রকৃতিগত, তেমনি রোমের প্যাট্রিসিয়ান্, প্লিবিয়ানের ন্যায় লর্ড ও কমন্ দেখা যায়। সর্ব্বত্রই এই সব বিভেদ লক্ষ্য করুন; চারি প্রকারের লোক চারি প্রকারের সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়—মিশনারী, মিলিটারী, মার্চ্চাণ্ট ও ম্যানুয়াল-লেবারার। ইষ্ট চিন্তক বা পুরোহিতের দল, দেশ রক্ষক ক্ষত্রিয় বা গল্‌কাটার দল

বাণিজ্যদ্বারা দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধিকারী বৈশ্য বা পকেট কাটার দল এবং মোটবহনকারী মজুরের দল। এই প্রকৃতিগত বৈষম্য রোধ করিবে কে?

মার্জ্জিত ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় বৈষম্যই সৃষ্টি, যখন বৈষম্যের অভাব তখন প্রলয়। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির ত্রিগুণের বৈষম্যে সৃষ্টি ও সাম্যে বা সমতায় লয়, ইহা শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে একই ইলেকট্রণের কাঁপ, চাপ ও তাপের বিভিন্নে ইহা সোনা, ইহা রূপা ইহা তামা ইত্যাদি বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত পদার্থ কল্পিত হয়। যেমন একই কারবন কাঁপ, চাপ ও তাপ ভেদে কখনও অত্যুজ্জ্বল হীরক, কখনও গ্রেফাইট (পেন্সিল), কখনও চারকোল (কয়লা) কখনও বা কারবন (গ্যাস)। কাঁপ বা গতি রজোগুণাত্মক, চাপ বা গুরুত্ব তমোগুণাত্মক, এবং তাপ বা বিচার দ্বারা শুদ্ধি সত্বগুণাত্মক। একই প্রকৃতির বিকারে সৃষ্ট অর্থ এই বিভিন্নতাই। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি দেহত্রয়ে সমভাবে ক্রিয়াশীল। যেমন বাহিরে, তেমনি ভিতরেও ত্রিগুণের বিকাশ হয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই সকল লক্ষ্য করতঃ বজ্রসূচিক নামধেয় উপনিষদে এরূপ বর্ণিত আছে।—অজ্ঞান ভেদক, জ্ঞানচক্ষুর ভূষণ স্বরূপ, জ্ঞানহীনের দূষণরূপ বজ্রসূচি নামক শাস্ত্র বলা হইতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিবর্ণ ভেদ প্রসিদ্ধ আছে। এই সকল বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রধান ইহা বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত কথা। এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্য আছে। এই ব্রাহ্মণ কে? তিনি জীব? অথবা দেহ, অথবা জাতি অথবা জ্ঞান, কিম্বা কর্ম্ম, কি ধার্ম্মিক? যদি জীব ব্রাহ্মণ বল, তবে তাহা বলা ঠিক হইবে না। অতীত ও অনাগত অনেক দেহে, জীব একরূপই থাকেন। একেরই কর্ম্মবশে অনেক দেহ লাভ ঘটে, কিন্তু দেহী জীব একইরূপ সদা কাল থাকেন, সুতরাং জীব ব্রাহ্মণ নহেন। [কর্ম্মবশে বিভিন্ন দেহ অর্থ কেবল নর দেহ নয়। বুদ্ধ ও জড়ভারতাদির ন্যায় সিংহ হরিণাদি দেহলাভ বুঝিতে হইবে।] তবে কি দেহ ব্রাহ্মণ? না, তাহাও নয়। কেন না আচণ্ডাল সব মনুষ্যের পাঞ্চভৌতিক দেহ। সেই দেহ সব মনুষ্যের একরূপ। (হস্ত, পদ, মুখ, নাক, কান ইত্যাদি একরূপ)। সকল দেহই একরূপ বাল্য যৌবন, বার্দ্ধক্য, জরা মরণ ধর্ম্মশীল। ধর্ম্মাধর্ম্ম সব দেহেই সমান দৃষ্ট হয়। মোটামুটি ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ ও শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে কিন্তু সর্ব্বত্রই এইরূপ হবে এমন কিছু নিয়ম নাই। অর্থাৎ ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। (এইটী লক্ষ্য করতঃ বঙ্গদেশে একটী প্রবাদ আছে—কাল বামন, কটা শূদ্র বেঁটে মুসলমান ইত্যাদি)। আর দেহ ব্রাহ্মণ হইলে, ব্রাহ্মণ দেহ দাহন জন্য পুত্রাদিতে ব্রহ্মহত্যা পাপ অর্শিত। তাহা কখনও কেহ বলে না, সুতরাং দেহ ব্রাহ্মণ নয়। তবে কি জাতি ব্রাহ্মণ? না তাহাও নয়। কারণ মনুষ্য জাতি বহির্ভূত প্রাণীদেহসম্ভূত অনেক মহর্ষির নাম শ্রুত হয়। ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগী হইতে, কৌশিক কুশ হইতে, জাম্বুক জম্বুক হইতে, বাল্মীকি বল্মীক হইতে, ব্যাস কৈবর্ত্ত কন্যা হইতে, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ, অগস্ত্য কলশ হইতে জাত এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। এঁদের জাতি যাই হোক অন্য ঋষগণের ন্যায় ইহারাও জ্ঞানপ্রদ ব্রাহ্মণ এজন্য জাতি ব্রাহ্মণ হয়? তবে কি জ্ঞান হইলেই ব্রাহ্মণ হয়? ব্রহ্ম জানাতি ইত ব্রাহ্মণঃ। না তাহাও নয় কারণ ক্ষত্রিয়গণ মধ্যে বহু পরমার্থ জ্ঞানসম্পন্ন পরিদৃষ্ট হন্।

[যেমন পঞ্চাল রাজ প্রবহন জৈবলি, কেকয়রাজ অশ্বপতি, মিথিলায় জনক। মনু

ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেও ব্রাহ্মণ বালকগণকে উপদেশ দান করিলেও ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হয়েন নাই সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেই ব্রাহ্মণ তাহাও বলা চলে না। তবে কি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ? না তাহাও নহে। সর্ব্ব প্রাণীর সঞ্চিত প্রারব্ধ ও আগামী কর্ম্মমধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। প্রারব্ধ কর্ম্ম-প্রেরিত হইয়া লোকে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে, এজন্য কর্ম্ম ব্রাহ্মণ নয়। তবে কি ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ? না তাহাও নহে; কারণ ক্ষত্রিয়াদি এমন কি শূদ্রও বহুদান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। সুতরাং ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ নয়। তবে ব্রাহ্মণ কে? উত্তরে—উপনিষদ বলেন—যে কেহ আপনাকে অদ্বিতীয় জাতি গুণক্রিয়াহীন, ষড়ূর্ম্মি ষড়্ভাব ইত্যাদি সর্ব্বদোষরহিত, সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ, স্বয়ং নির্ব্বিকল্প অশেষ কল্পনাধার, অশেষ ভূতান্তর্যামী, স্বরূপে বর্ত্তমান, অন্তর্ব্বহি আকাশবৎ অনুস্যূত, অখণ্ডানন্দস্বভাব, অপ্রমেয় অনুভবৈকগম্য, অপরোক্ষরূপে ভাসমান, করতলে আমলকী ফলের ন্যায় সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ কৃত নিবন্ধন কৃতার্থ, কাম রাগাদি দোষবর্জ্জিত, শমদমাদি সম্পন্ন, মাৎসর্য্য তৃষ্ণা আশা মোহাদি রহিত, দম্ভাহঙ্কারাদি দ্বারা অসংস্পৃষ্টচিত্ত, অন্যথা ব্রাহ্মণ সিদ্ধ হয় না। বংশের ধারাতে উৎকর্ষ থাকে কিনা সে বিষয়ে, ঢাকার মসলিন বলে যে, উহা যে পরিবারে ছিল তন্তুর উৎকর্ষতা ও বয়নের উৎকর্ষ সেই তন্তুবায়বংশই করিয়াছিল, অন্যত্র বা ব্রাহ্মণে করেন নাই। দিল্লীর সেই লৌহময় জয়স্তম্ভ ও কতিপয় কামানাদি যাহা ঢাকা প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমানে সিন্দুর লেপিত দেখা যায়, তাহার লৌহেতে জং পরে না; এই লৌহনির্ম্মাণে কর্ম্মকারবংশ উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। সেই কামার নাই। লোহাও নাই। কাশ্মীরী শালও মুর্শিদাবাদের রেশম বস্ত্র যে সব কারিকরগণ করিতেন তাহাদের বংশ পরম্পরায় উহা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ন্যায়শাস্ত্র নবদ্বীপও ভট্টপল্লীর বংশপরম্পরায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, অন্যত্র তা করে নাই। এমনি এক একটা বংশ পরম্পরায় কোন কোন বিদ্যায় বেশ উৎকর্ষ লাভ দেখা যায়; ইতিহাসে ইহার সাক্ষ্য বহুত আছে এজন্য লিপি হইল না। এবম্প্রকার সর্ব্ব দেশে সর্ব্বকালে প্রকৃতির গুণত্রয়ের বিকাশের তারতম্যে বর্ণাদির ভাগ চলিয়া আসিতেছে। উহা ব্রাহ্মণ বা শাস্ত্রের কারসাজি নহে। প্রকৃতি বেটী ইহার জন্য দায়ী। প্রকৃতি কেন বৈষম্য ত্যাগে সৃষ্টি করেন নাই এ বড় অন্যায়। আমরা সব সমান এটা বড়ই পছন্দ করি কিন্তু প্রকৃতি তাহাতে বাধা দিবে? মারনা ভাই এই প্রকৃতিটাকে তবেই ত সব সমান হওয়া যায়।

শাস্ত্রবলে "ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" তিনগুণের অতীতে নাকি যায়গা আছে, তথায় সব সমান হয়। তাই শাস্ত্র পুনঃ বলে "সমত্বং যোগ উচ্যতে" সমবুদ্ধি বিশিষ্যতে। প্রকৃতির পারে যাইবার ব্যবস্থা ত শাস্ত্রে আছে। এইটী তিন ফণা বিশিষ্ট কালীয় রূপ প্রকৃতির ফণার উপর দাড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বংশীবাদনে আনন্দ করা। উহা বড়ই আনন্দে ভরা। সত্ত্ব রজস্তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই সেই কালীয় সর্প, যার ফণার তলে বাস করিলে অর্থাৎ প্রকৃতির অধীনে থাকিলে সমভাব অসম্ভব। সে বৈষম্য রাখিবেই। তাই প্রকৃতির ফণার বাহিরে গেলে শ্বাস ফেলে বাঁচা যায়। সব সমান আর করিতে হয় না। আপনি সমান হয়ে আছে তাই সমান হয়ে যায়। সে পথে না গিয়া শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথ ত্যাগে চলিলে প্রকৃতিকে জব্দ করা বুঝি যায় না। একে প্রকৃতির অধীনতা তাতে আবার তার পাইক বরকন্দাজ ১০টী ইন্দ্রিয়, এরাও সব অধীন করিয়া রাখিতে চায়। অধীনতার বন্ধনে থাকিয়া প্রকৃতির আইন উল্লঙ্ঘন করা দণ্ডার্হ। ইংরাজের আইন উল্লঙ্ঘনের দণ্ডাপেক্ষা প্রকৃতির দণ্ড আরও ভয়ঙ্কর। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সাম্যই প্রলয়।

কথাটা একটু বিশ্লেষণ করা যাউক। যখন কোন দেশে সব সমানের ধূয়া উঠিয়াছে, খণ্ড প্রলয় তখনি ঘটিয়াছে। উহাকে সিভিলওয়ার বলে। রোমে ব্রুটাসাদি বলিলেন—সিজার is a danger to the republic. He may tak the crown, so Caesar must fall. সিজার বধ ঘটিল, সিভিলওয়ারও ঘটিল, রোম রাজ্য আর রিপাবলিক চায় নাই পায় নাই। ৮ বৎসর যুদ্ধের পর সেই জুলিয়াস সিজারের পোষ্যপুত্র অগষ্টাস সিজার সম্রাট হয়েন। সেই সময়টা রোমের ইতিহাসের অতি উজ্জ্বল পৃষ্ঠা বলিয়া গণ্য হয়। ইংলণ্ডে চার্লস দি ফাষ্ট বড় পাজী, কর তার উচ্ছেদ সাধন, সব প্রজা সমান। ক্রমওয়েলাদি উঠিলেন, চার্লস বধ হইলেন। ১১ বৎসর পর সেই ক্রমওয়েল মৃত, অমনি চার্লস দি সেকেণ্ডের লণ্ডন প্রবেশ, ক্রমওয়েলের হাড়ের ফাঁসি, প্রজা চুপ, কথা কয় নাই। সিভিল ওয়ার খণ্ড প্রলয় নয় কি? এখনও সেই চার্লস বংশ রাজত্ব করে। ফ্রান্সে মিরাবো প্রভৃতি বলিলেন, সব সমান (Equality, Liberty and Fraternity of J. J. Reausseau) অমনি প্রলয়ের বিষাণ বাজিল, লুইর মাথা গেল, রাণী গেল, সব গেল, বহু মুণ্ড গড়াগড়ি গেল। কোথা হতে কার্শিয়ান বালক উঠিল, জয় নেপোলিয়ান ধ্বনিতে ফ্রান্স মুখরিত হইল। সম্রাট নেপোলিয়ান প্রজার হৃদয়ের প্রিয় ছিলেন তাহা তিনি যখন জেলেডিঙ্গীতে পার হয়ে এলবা হতে নিসংসহরে নাবেন, তখন খালি হাতে এক লাটী; আর তার প্যারিসের দিকে অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে ভাইবলি ইম্পিরিয়া ধ্বনি শ্রবণে লুইদি এইটিস্থের প্যারিস ত্যাগে পলায়ন সুবিদিত। নেপোলিয়ানের মৃতদেহ সেণ্ট হেলেনা হইতে ২০ বৎসর পর গৃহে আনয়ন ও তাঁহা সম্রাটোচিত সম্মান সহ মহাসমারোহে প্যারিসের উপকণ্ঠে স্থাপন ফরাসী প্রজার সম্রাটপ্রীতির যথেষ্ট পরিচয় দেয়। আর নেপোলিয়ানিক ওয়ারটা খণ্ড প্রলয় তাহা লিখা বাহুল্য। ইহাতে বলিতে হয় সব সমান বুলি প্রকৃতি রাণী সহ্য করিতে পারেন না। তাই প্রতিহিংসাচ্ছলে ধ্বংস দ্বারা পুনঃ বৈষম্য স্থাপন করেন। ইং ১৯১৮ সালে রাশিয়া রাজ্যে সমতার বিষাণ বাজিয়াছে; ইতিমধ্যেই তাহা কথার কথা হইবার পথ নিয়াছে। শুনিতে পাই লেলিন ষ্টেলিন চিচিরিন ও ট্রট টস্কি ইত্যাদি রুষিয়ার পরম হিতৈষীগণ জার নিকোলাসের মুণ্ডপাত করিয়া সব সমান করেন। সিভিল ওয়ার এখনও ঘটে নাই। গৃহ বিবাদ ঘটে নাই বলা চলে না। লেলিন মৃত, চিচিরিণ অন্তরীনে অবস্থিত, ট্রটটস্কি বহিষ্কৃত। ইউরোপেই স্থান তাঁর মিলিতেছে না। এসিয়ার এক্লোরায় যদি মিলে। কেহ কেহ বলে এক বনে দুটী বাঘ থাকিতে পারে না। সুতরাং ষ্টেলিন ও ট্রটটস্কি বা চিচিরিন এক রাজ্যে স্থান পান কি করিয়া? ষ্টেলিন এখনও জার উপাধি নেন নাই। তবে তাঁর বাক্য অন্যথা করিলে প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য। অহরহ এই প্রাণদণ্ড ব্যাপার রাশিয়ায় নাকি লাগিয়াই আছে। হতে পারে ট্রটটস্কি রুশ জাতির মঙ্গলাকাঙ্খী কিন্তু ষ্টেলিনের ন্যায় জারনিকোলাস তার মতের বিরোধী ব্যক্তি বর্গকে অন্তরীন ও বহিষ্কৃত করিতেন, সময় সময় ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইতেন। তবে জারের সময় freedom of thought and freedom of speech ছিল না, এখন তা বেশ আছে। তুমি শান্তচিত্তে আপন কামরায় বসিয়া বিভুর ধ্যান করিতেছ তাহা ষ্টেলিনের দূতের সহ্য হইবে না, কান পাকড়াইয়া কর্ম্মে লাগাইবে। এটা freedom of thought এর বিরোধী নয়। ট্রটটস্কি বা চিচিরিনের বাক্য freedom of speech এর সামিল হইতে পারে না, কারণ উহা ষ্টেলিনের পথের অন্তরায় কেবল যা ষ্টেলিন

চিন্তা করেন ও বলিবেন, তাই freedom of speech freedom of thought বলিয়া জানিবে। সব সমান, তবে expert কে বেশী না দিলে ভাল কাম দিবে না, এই জন্য কিছু অসমান ভাব য়া দেখ; তাহারা দুই তিন পুরুষ যদি expert থাকে তবে তাহাদের সঞ্চিত অর্থকে capital বলা যাইবে না। সব সমান কল্পনা করিয়া লইবে। কারণ ষ্টেলিন এইটা ব্যবস্থা কারলেন। সব সমান মুখে শতবার কপ চাইলেও সব সমান হইবে না। যখনই লিডার বনিল অমনি slave mentality ঘটিল জানিবে। লিডরের চিন্তার ধারাই সবার চিন্তাধারার পথ রুদ্ধ করিল, যদি কেহ বিরোধী হও তবে সে বিদ্রোহী, দেশের কুসন্তান। তবে সি. আর, দাস বা নেহেরু মত ফলাও হইতে পার তবে অন্য কথা। অর্থ—'যার লাঠী তার মাটী'। যার বুদ্ধি সে মেষের ন্যায় অল্পবুদ্ধিকে দাসবৎ চালাইবেই। উহা প্রকৃতি প্রেরণ। ডাক্তার ডাকিয়া সব ঘটে সমান বুদ্ধির সৃষ্টি করিতে পারিলে সব সমান হইতে পারে। নতুবা যা আছে তাই থাকিবে। চারিবর্ণ থাকিবে। প্রকৃতি আইন বদলাইবে না ধ্রুব নিশ্চয়। অবস্থামতে শ্রুতি যে প্রকৃতিকে স্ববশে আনয়ন করিয়া সমতা স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাই একমাত্র পন্থা। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্য ত অয়নায়। অতএব শাস্ত্র বাক্য উল্লঙ্ঘন না করিয়া বিচার পূর্ব্বক শাস্ত্র প্রদর্শিত পথে চল, সব সমান এই কথার সাফল্য দেখিতে পাইবে। এজন্য যিনি প্রকৃতির পারে গমন করিয়াছেন তেমন expert এর নিকট গিয়া ঐ পথ বিষয় জিজ্ঞাসা করতঃ চলিতে হইবে। অলমিতি।

সমাগতা।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ

কক্ষে প্রবেশ করিয়া সমা মুহূর্ত্তের জন্য একটু বিহ্বল এবং ভীতিসঙ্কুচিতা হইল। তাহার স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী মিষ্টার ভাদুড়ী তাহার সম্মুখে! ন্যূনাধিক দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে সমা তাঁহাকে দেখিয়াছিল, তথাপি, এতদিন পরেও সমা তাঁহার দেহে বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল না। কৌতুকপ্রিয় কাল—সং সাজানই যা'র কায, সে যে খাতির কিম্বা অনুগ্রহ করিয়া মিষ্টার ভাদুড়ীকে স্পর্শ করে নাই, তাহা নয়, সমা একটু লক্ষ্য করিতেই বুঝিল যে, চতুরের উপর চাতুরী করিয়া মিষ্টার ভাদুড়ী পাচ সিকার কলপে কালের সে চাতুরালী ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

সমা ভাদুড়ীকে দেখিবামাত্রই চিনিয়া ফেলিল বটে কিন্তু সে যতই সঙ্কুচিতা হউক, এই কয় বৎসরে তাহার দেহের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা ভেদ করিয়া ভাদুড়ীর তাহাকে চিনিয়া উঠিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না, ঘটিলও তা-ই। মিষ্টার ভাদুড়ী সমাকে চিনিতে পারিলেন না। সমা একটি নমস্কার করিয়া তাঁহার হাতে কাগজটি দিতেই তিনি সমাকে একটি চেয়ারে বসিবার ইঙ্গিৎ করিয়া বলিলেন,—"ব'সো! তুমি কি এখানে থাকতে চাও?" সমা বসিল না, দাঁড়াইয়া রহিল; বলিল—"আজ্ঞে হাঁ, তবে যদি কোনো একটা কিছু কায কর্ম্ম দিতেন, তা'হলে—" মিঃ ভাদুড়ী সমার আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া বলিলেন,—"কাজ কর্ম্ম? তুমি লেখ পড়া কিছু জান?" সমা বলিল,—'আজ্ঞে, লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানি না, ম্যাট্রিক পাস করেছিলাম,

আর fine arts মধ্যে Indian music কিছু শিখেছিলাম—" মিষ্টার আবার একবার ভাল করিয়া সমাকে দেখিয়া লইয়া বলিলেন—"আমাদের এ institution বেশীদিনের নয়, এটা একটা charitable institution বল্লেই হয়, তা' হলেও আমি তোমাকে provide করবার চেষ্টা কর্‌বো; আমার private secretary কুমারী কমলা, তুমি দেখে থাক্‌বে, যিনি বেরিয়ে গেলেন, তিনি এলে, আমাদের rule অনুযায়ী test হ'য়ে গেলে, আর আমাদের rules প'ড়ে দেখে তুমি রাজী হ'লে যা' হয় করা যাবে; তিনি এলেন ব'লে, তুমি ততক্ষণ একটু অপেক্ষা কর,—ব'সো না, ঐ চেয়ারটায়, একটুক্ষণ;" বলিয়া সমার মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দৃষ্টিটা সমার বেশ ভাল লাগিল না। অনেক চাহনি সমার চক্ষের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু বৃদ্ধের চক্ষে এ চাহনি যেন শ্মশানে ক্রোটন গাছের মত সমার চক্ষে বিসদৃশ ঠেকিল। সমা ঈষৎ চিন্তিত ভাবে একটি চেয়ারের উপর বসিল। তৎকালে মিষ্টার ভাতড়ী তাঁহার সম্মুখের টেবিলের উপর প্রসারিত একটি খাতার উপর একটি কবিতা লিখিতেছিলেন, সেটি সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কুমারী কমলা ফিরিয়া আসিলেন। কবিতাটি এই—

'প্রাণের ভিতর সপ্ত সিন্ধু মথিয়া উঠিল।
যেই সুধা, সেই সুধা আকর্ষি আনিলা,
বসাইলা হৃদয় উপরি তোমারে—হে হৃদয় ঈশ্বরি!
পূজা তব প্রীতিপুষ্পে, ভোগ—পূত অমৃত লহরী!!'

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কুমারী কমলা ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট্—শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা। রাঢ়ের অনেক গ্রাম্য পাঠক, বোধ করি, অদ্যাপি সেই পৈতামহিক অমেধ্য গৃহিণী লইয়াই ঘরকর্ণা করেন, শিক্ষিতা বঙ্গমহিলার স্বরূপ তাঁহারা সহসা হৃদ্গত করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ করি না, যেহেতু তাঁহাদের মাহিল্য-বোধই নাই।

ইউনিভারসিটির হেমময় জঠর—রত্নখনি! "কমলা একটি হীরার টুক্‌রা!" বিদ্যা অধ্যয়ন কালে ঐ কথাই সকলে বলিত। কমলার ইউনিভারসিটি ক্যারিয়ার খুবই ব্রীলিয়াণ্ট ছিল। কমলার পিতৃমাতৃহীন এক মাতৃষ্বসাপুত্র কমলার পিত্রালয়ে থাকিত এবং কমলার সহাধ্যায়ী ছিল; তাহারই একটু অসাবধানতার ফলে কমলাকে দিন কতকের জন্য একটি মহিলাশ্রমে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল, সে প্রায় বিশ বৎসরের কথা। স্মৃতির সে কালিমাটুকু আশ্রমকৃপায় সিন্ধু-কুলে বিসর্জ্জিতা, এবং কমলাও তদবধি বৈজ্ঞানিকের গুপ্তদ্বারে শরণাপন্না। কুমারী কমলার নামটি কলিকাতার গোলদিঘি, পদ্মপুকুর, কুমারটুলির মত বিফল নয়, কুমারী বস্তুতঃই অকৃতভর্ত্তা। পুরুষে কুমারীর বিদ্বেষ কিম্বা সারা দুনিয়ায় প্রমীলারাজ্য খুঁজিয়া না পাওয়া বশতঃই পুরুষের সহযোগিতায় বাধ্য হইয়াছেন কি না, এ গূঢ় মনস্তত্ত্বের সন্ধান লই নাই; আর co কো, do ডু; ca কে ce সি আদি করিয়া যে বিদ্যার আরম্ভ, সে বিদ্যার বিদুষীকে যে সর্ব্ব বিষয়ে ব্যবহারিক সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে ইহাই বা কোন্ কথা? তবে, একদেশদর্শী ভগবানের উপর কুমারীর বিদ্বেষ যথেষ্টই ছিল এবং তৎফলে বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে ভগবানের চাতুরী কতকাংশে ব্যর্থ করিয়া দিয়া-

ছিলেন, এ সন্ধান পাইয়াছি। যা-ই তার হেতু মূলে রহুক, কুমারী বিবাহ করেন নাই। তার পর কুজন কর্জ্জনের অভিশপ্ত বালীর বাঁধে যোগ্ পড়িয়া যখন পদ্মার অবরুদ্ধ জলোচ্ছ্বাস প্রবল বলে হতভাগ্য পশ্চিমবঙ্গকে প্লাবিত করিয়া, তাহার শ্বাসরোধ করিতে ছুটিয়া আসিল, সেই কালে চির-কুমারী কমলা ভাসিয়া আসিয়া কবিবরের কাব্যখোঁটায় আটক্ পড়িয়া গেলেন।

দত্তকবি গাহিয়াছেন—"অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কৈকেয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি
নরবর ; কিম্বা দিয়া চূণকালী গালে
খেদাও গহন বনে !"

তা', যদিও নানাবিধ রুক্ষ, তীক্ষ্ণ ভক্ষ্য ভক্ষণ ও রসনার রস কাটাইয়া অদ্যাপি তাঁহার "ঢ"কে "ড" ছাড়াইয়া "ঢ" করাইতে কিম্বা "শ"কে "হ" ঘুচাইয়া "শ" করাইতে পারে নাই, তথাপি, ঐ co কো এবং do ডু বিদ্যা তাঁহার মস্তিষ্কের সমস্ত জড়তাটুকুই নাশ করিয়া দিয়াছিল। ওই যে থিয়েটার এবং অনাথ, অবলা আশ্রম, উহা বস্তুতঃ পক্ষে কমলারই উর্ব্বর মস্তিষ্কের চিন্তার ফল। কিন্তু হইলে কি হয়, "এই পুরুষ জাতি কী বে ইমান্—মাসীর সাওয়াল্রে বিশ্বাস করা জাই না।" আা কবিবর তো পরের পর তস্য পর!' তাই, কুমারী কমলা ফিরিয়া আসিয়া যখন সমাকে মিষ্টার ভাদুড়ীর সম্মুখ-ভাগে চেয়ারে বসিয়া থাকিতে দেখিল এবং মিষ্টারের সম্মুখের সেই কবিতাটির উপর নজর পড়িল, তখন কুমারী কমলা সেই কবিতার খাতাটি উঠাইয়া লইতে লইতে ঐ কথাই ভাবিলেন এবং কবিতাটি পড়িয়া কটূকষায়িতলোচনে মিষ্টার ভাদুড়ীর প্রতি একটি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, একটু বক্র হাস্যসহকারে বলিলেন—"বুড়া বয়সের শোকনা শিন্দু মন্থন্ কর্‌লে শোদা উডে না, গরল উডে।" এই বলিয়া খাতাখানি একটু সশব্দে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন।

মিষ্টার ভাদুড়ী ঈষৎ হাস্য সহকারে নির্ব্বিকার ভাবে কমলার এই অভিনয়টি উপভোগ করিলেন—ইহাতে তিনি বেশ অভ্যস্তই ছিলেন ; এবং বলিলেন,—'কুমারি, ইনি admission চান, একবার test ক'রে দেখুন ; আর ইনি কতকটা লেখা পড়াও জানেন ব'ল্‌চেন, সেটাও দেখুন যদি আপনাকে কোনো রকম assist কর্ত্তে পারেন!' কুমারী ততক্ষণ অন্য একটি টেবিলের উপর কি কাগজ পত্র নাড়াচাড়া করিতেছিলেন ; ভাদুড়ীর কথা শেষ হইতেই কমলা—"আচ্ছা, অবে অ্যানি!" বলিয়া একটি কাগজের ফাইল ভাদুড়ীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—'দেহুন, এই সতর নম্বরের হওদা আজ পাশ অইসে, টু তাউ জান্তে ; আজই ডিলবারি দিতে অইবে। আর অই কয়ডা নম্বর ত্যাহেন্ আজকার নাইট্ কল্ রইসে?' বলিয়াই সমাকে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইবার ইঙ্গিৎ করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

এই অলক্ষ্যা এই বাড়ীতে আসিয়া অবধি সমা যাহা শুনিয়াছিল এবং দেখিয়া ছিল, সমস্তটি মনে মনে আলোচনার ফলে, সমার মনে সন্দেহের একটি মেঘ ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতে ছিল। অনতি-প্রসন্ন মনে সমা কমলার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

যে খণ্ডে আফিস, সেই খণ্ডের সংলগ্ন পৃথক আর একখণ্ড বাড়ী। কমলার পশ্চাতে সমা এই খণ্ডে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এ খণ্ডটি অনেক বড়। ডাকহাঁক, কলরব, বচসা, হাস্যক্রন্দনাদিতে

এ বাড়ীটি ক্রিয়াবাড়ীর ন্যায় সজীব। বাড়ীর দুয়ারে প্রবেশ করিয়া কমলা একজন পরিচারিকা বেশিনকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তিনিরে হাত নম্বর গর কুল্যা দ্যাও, অসুবিধা কিছু অ'তে পাবুবা না!" পরে সমার পানে চাহিয়া বলিলেন;—"জাউন্, আপনে তিনির সাতে জাউন, আমি জাবো অ্যানি?" বলিয়া দ্রুতগতি অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

সারিবন্দী কুঠারী সমা পার হইয়া গেল; সকল গুলির সম্মুখেই পৃথক পৃথক নম্বর লেখা। কোথাও ধাত্রীবেশিনী কেহ দুই তিনটি শিশু লইয়া দুগ্ধ পান করাইতেছে, কোথাও বালক কিম্বা বালিকা পা ছড়াইয়া বসিয়া কিম্বা ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি করিয়া কাঁদিতেছে, কোথাও কিশোরী দৌড়িতেছে, কোথাও সদ্যপ্রাপ্তযৌবনা বেশ বিন্যাস করিতেছে; -কুট্‌না কুটা, বাট্‌না বাঁটা, চা'ল ধোওয়া, জল তুলা, মাছ বাছা,—বঁটি তরকারী সংঘর্ষ, শিল নোড়া সংঘর্ষ, কড়া খন্তি সংঘর্ষ, চাকা বেলুন সংঘর্ষ, ঝি ভাণ্ডারী সংঘর্ষ এবং কুকুর বিড়াল সংঘর্ষাদি শব্দে স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা মুখরিত। তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে—প্রতি ঘরে ইলেক্‌ট্রিকের আলোগুলি এককালে জ্বলিয়া উঠিল।

পরিচারিকা বেশিনী সমাকে যেখানে লইয়া গেল, সেটি আবার—জেলখানায় under trial prisoner অর্থাৎ হাজতি আসামীদের যেমন পৃথক একটি খণ্ড থাকে, তেমনি প্রাচীর দিয়া ঘেরা পৃথক একটি খণ্ড। এ খণ্ডটিও দ্বিতল, কিন্তু ছোট—নীচে উপরে মাত্র ছয়টি কুঠারী এবং তৎসংলগ্ন কল ও পায়খানার কামরা। কুঠারী গুলি সবই তৎকালে তালা দিয়া বন্ধ ছিল। এই খণ্ডের নীচে তলার একটি কুঠারী সাত নম্বর। পরিচারিকাবেশিনী সেই ঘর খুলিয়া ফেলিয়া আলো জ্বালিয়া দিল। ঘরটি ছোট কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আসবাব পত্র কিছুই নাই কেবল, একটি নেয়ারের খাটিয়া, তাহার উপর সামান্য অথচ পরিষ্কার বিছানা, একটি চৌকী, একটি জলের কুঁজা, একটি কাচের গ্লাস এবং একটি আলগুনি। পরিচারিকা বেশিনীর নির্দ্দেশ মত সমা হাতের সেই ব্যাগটি—যেটি লক্ষ্ণৌ হইতে আসিবার কালে সে সঙ্গে আনিয়াছিল, সেইটি -আলগুনিতে ঝুলাইয়া খাটিয়ার উপর বসিতেই সঙ্গিনীর প্রতি স্পষ্ট নজর পড়িতে দেখিল,—সঙ্গিনী অনধিক বয়স্কা, সুন্দরী; দেখিলেই কোনো সম্পন্ন গৃহস্থকন্যা বলিয়াই মনে হয়। সমা কৌতুহলী হইয়াই শুধাইল, -"আপ্‌নি কে ভাই? ঝির মত তো লাগে না।" রমণী একটু হাসিয়া বলিল, -"জী, না। আপ্‌নে জ্যাম্‌নে আস্‌চেন্, আমি ত্যাম্‌নে আস্‌চি!" সমা বুঝিল। বুঝিল, এও তাহারই মত একজন নির্ব্বান্ধব, নিরাশ্রয়; বুঝি এখানের সবাই তাই!' শুধাইল, —"আপ্‌নারও কি কেউ নাই—কিছুই নাই?" রমণী একটু হাসিয়া গর্ব্বিত ভাবে উত্তর দিল,—"মা, বাপ, বাই, বৌন্, দেওর, বাসুর সবই আসে, ক্যাবল্ সোয়ামী মর্‌সে?" সমা আশ্চর্য্যভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে আপ্‌নি এ অনাথ আশ্রয়ে এলেন কেন?" রমণী একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, -"পাওয়ানের মায়া!" সমা বলিল,—"আপ্‌নার ছেলে কি এখানে থাকেন?" বলিতেই, রমণী ঠোঁটের কোণে যেন কেমনতর একটু হাসিয়া এবং সমার মুখের উপর কেমনতর একটি কটাক্ষপাত করিয়া, কোনো উত্তর না দিয়া দ্রুতগতি এমন ভাবে চলিয়া গেল যে, সমা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সেই হাসি, সেই কটাক্ষ, সেই উত্তর দানে কৃপণতা এবং দ্রুত গমনের অর্থ খুঁজিয়া পাইল না। তাহার মনে সন্দেহ এবং কৌতুহলের মেঘটি আরও একটু ঘন হইল মাত্র।

কিছুক্ষণ পরে খাবার ডাক পড়িলে, সমা মুখ হাত ধুইয়া সাধারণ ভোজনাগার—আট-

চালায় গিয়া সেই বিরাট কোলাহল, চেঁচামেচির মাঝখানে এক পার্শ্বে বসিয়া কিছু খাইয়া আসিল। সমা দেখিল,—দুই পাঁচ জন শিশু এবং কিশোর বয়স্ক ব্যতীত পুরুষ নাই, সবই স্ত্রী—শিশু, বালিকা, কিশোরী, যুবতী, কচিৎ প্রৌঢ়া।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সমার খণ্ডটি নির্জ্জন; কক্ষটিও নির্জ্জন। আহারান্তে সমা আপন নির্জ্জন কক্ষে খাটিয়ার উপর বসিয়া, এই আশ্রমে শ্রুত ও দৃষ্ট সমস্ত বিষয় গুলিকে এক জোট্ ক'রয়া, সেগুলির অর্থের সমাধান করিবার চেষ্টা করিতে করিতে শয়নের উদ্যোগ করিতেছে এমন সময়, শার্দ্দূলানুসৃতা, হরিণীর মত চকিত চঞ্চলা একটি কচিৎ-প্রাপ্ত-যৌবনা চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা বালিকা দ্রুতপদে সে কক্ষে প্রবেশ করিল এবং কিছুমাত্র বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া সমার খাটিয়ার অপর প্রান্তে যাইয়া, আপনাকে লুকাইবার চেষ্টায় হামাগুড়ি দিয়া বসিল। সমা কৌতুহল বশতঃ উঠিয়া তাহার দিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছে এমন সময়, মৃগীর পশ্চাদ্ধাবনকারিণী ব্যাঘ্রীর মত কুমারী কমলা—"অউল্যা! অ—অউল্যা!" বলিয়া তর্জ্জন করিতে করিতেসেথানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং—'বগ্নি, অউলারে—বলিতে বলিতে খাটিয়ার পার্শ্বে অর্দ্ধ লুক্কায়িতা বালিকাকে দেখিয়াই হাস্য করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন,—'ই জ্যা এহানে চুপ্যা চুপ্যা লুকাইস অ? অউল্যা! উট, উট? হুন জা কই?' বালিকার নাম অহল্যা, সে তখন খাটিয়ার পার্শ্বে আরও জড় সড় হইয়া, বায়ুতাড়িত তালপত্রের ন্যায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। অহল্যার উঠিয়া আসিবার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া কুমারী কমলা তাহার নিকটে গিয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিলে, বালিকা ফু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—কুলায় হইতে আকৃষ্ট পক্ষীশাবক যেমন পাখা নাড়িয়া, পা ছুড়িয়া কাতর ভাবে চিৎকার করে, তেমনিভাবে কাঁদিয়া উঠিল—'উগু দিদি গু,' আমি যাব না গু! আমারে বেচো না গু—দিদি গু?' এই বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে অহল্যা কুমারীর পায়ের উপর পড়িয়া আছাড় কাছাড় করিতে লাগিল। কুমারী সে করুণ আর্ত্তনাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া,—'আরে সাওয়াল বুদ্দা? তোরে বালই অইবে—তুই বুজিশ্ কী?' বলিতে বলিতে তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন। সমা হতভম্বের মত গালে হাত দিয়া আপনার খাটিয়ায় বসিয়া রহিল। সেই করস্পৃষ্টা লজ্জাবতীলতার ন্যায় ভীত সঙ্কুচিতা, ফুটনোন্মুখী গোলাপ কলিকার ন্যায় লাবণ্যময়ী বালিকটির মর্ম্মস্পর্শী করুণ আর্ত্তনাদ তাহার বুকের উপর চাপাইয়া দিতেছিল।

আধঘণ্টা এইরূপ থাকিয়া সমা দুয়ার বন্ধ করিয়া আলোক নিবাইয়া শুইবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় কুমারী কমলা বাহির হইতে কবাটে ঘা দিয়া ডাকিলেন,—'বগ্নি, গুমাইস নাই? টুক্‌হু কুল্‌বান্ দুয়ারটা—আপনগো সতে দুটা কথা কইবার সাস্থাই!' সমা—'আসুন, আসুন!' বলিতে বলিতে তৎপর উঠিয়া, আলো জ্বালিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। কুমারী কক্ষে প্রবেশ করিয়া চৌকাটির উপর বসিয়া সমাকে বসিতে বলিলেন। সমা খাটিয়ার উপর বসিল।

অহল্যার ক্রন্দনের রেশটা তখনো পর্য্যন্ত সমার কানে বাজিতেছিল, কুমারী আসিতেই, তাহার মনে অহল্যার ক্রন্দনের ভাষা এবং তাহার ভীতি বিহ্বল, ব্যাকুল মুখভাব যে সন্দেহটি গুঞ্জিয়া দিয়া ছিল, সেটির সমাধানেচ্ছায় সে এতটা উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িল যে, কুমারী কোনো কথা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই সমা তাঁহাকে বলিল, 'কুমারি, যদি অফেন্স না নেন্‌তো একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞেস্ করতে চাই—আমার জানবার জন্যে বড়ই আংজাইটি হয়েচে যে,—' সমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কুমারী বলিলেন,—'বুজ্‌সি, আপনে অউল্লার কতা জিজ্ঞাস্ করবার সান্? সমা,—'হাঁ, মেয়েটিকে দেখে যেন খুব সম্ভ্রান্তঘরের মেয়ে ব'লে মনে হয়, ও মেয়ে এ অনাথআশ্রমে এলো কেমন ক'রে, তা'.তা—কুমারি! আমি ভেবে ঠিক ক'রে উঠতে পারি নাই!' কথাগুলি শুনিয়া কুমারী কমলা সমার মুখের উপর সাশ্চর্য্য, প্রশ্নময় এবং সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত ক'রলেন তাহার মর্ম্মার্থ এই,—'আমরা ধারণা ছিল, তুমি বুঝি সকলই জান, জানিয়া বুঝিয়াই এখানে

আসিয়াছ; সত্যই কি তুমি কিছু জাননা? ইত্যাদি। একটু ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কুমারী বলিলেন,—'আপ্‌নে কি অনুমান্ করুসেন, অউল্লার মাদার অ্যাক্‌জন বান্দরের সাবজজের কন্না, তিনি নিজে উ নাহি অ্যাক্‌জন গ্র জুয়েড্; এং সাওয়াল ডা তিনির ননম্যারিটাল ইষু—বুজেন্ তো ও? তক্‌নে তিনি—উইডোনন্—তক্‌নে তিনির ম্যারেজই অয় নি! আপনে জানেন্, সিস্‌টার! অ্যা দ্যাশে নন ম্যারিটাল্ ইযুর প্রটেক্‌শনের জন্নি গবর্ণমেন্টের তরপ অইতে কোনো আরেঞ্জমেণ্ড না তাকার জন্নে, কত্তো জে মিস্‌কারেজ—আমালকুন্ অয় তার কি টিকান্ রয়সে? অ্যাক্ তো সোসাইটি কাবাব, ইশের পরে অন্ন অ্যাজুক্যাটেড্ কাটির মতনে এহানে হর্কারের কোনো প্রোটাক্‌শান্ নাই এয়ার জন্নে এ পারমের কুব্ ইউটিলিটি আসে বুজব্যান্!' সমা একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ, আমারও মনে হয়, এই চাইল্ড কিলিং বন্ধ করা, আর ঐ আন্ ফরচুনেট চাইল্ড গুলোকে এমি হাউ প্রটেক্ট্ করা খুবই ভাল কায! আজ বোধকরি অহল্যার পেরেণ্টস্ এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন?' কুমারী বলিলেন,—'বুল্ করুসেন আপ্‌নে, প্যারেণ্ট্‌স্ কোতাঁয় পান্? হেব্ব কা'বে পাদার টিক্ অয় কি? আর, আন্ ম্যারেড্ অবস্তার সাওয়াল, জদ্দি নাঈ পাদার টিক্‌ঈ অয়, আর সোসাইটির নেয়োমে তার সাতে ম্যারেজ ইম্‌পসেবল্ অয়, তক্‌নে শ্যা ও তো না থাকা! জানবান আমরা দুই রকম কণ্ডিশানে সাওয়াল রে লই,—জদ্দি ক্যাও সাওয়ালের দাবী না রাকে দেই তে ফেনাবে সাওয়ালের জত্তো করচা হব্ দিত্যা অয়, আর জিনি নাঈ দাওয়া আবাও ন্ করা্যা ত্যান্ তেন্‌রে করচা দিত্যো অয় ন। এই নেযোম্ডা কালি পিমেল্ চাইল্ডের লাগে জান্‌বান্; মেল্ চাইল্ডের ক্যাসে করচা দিতে অয়, না অলে ল্যাওয়া জাই না—কুমারীর কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সমা একটু আশ্চর্য্য ভাবে শুধাইল,—'male child আর female child এর মধ্যে এমন distriction কন করেন কুমারি, আমিতো বুঝে উঠ্‌তে পারলুম না?' কুমারী'ও যেন আশ্চর্য্য হইয়াই বলিলেন,—"ঈ আপ্‌নে বুজ্যান্ না বগ্নি, পিমেল চাইল্ডরে আমরা ইচ্ছামত ম্যারেজ দিয়্যা শ্যা শমোয় পারমের করচা ডা কম্‌প্যানস্যাটেড্ করতে পারি, কিন্তু মেল্ চাইল্ড্ অল্যা শ্যা চৌদ্দ বচ্ছর এজ্ অ'তেই পলাবর রাস্তা কুজে, আর তাদেরে পোর্স করা্যা রাকা জাই তো রেবলিউশনারি দল পাকায়ে বসে; কাকেই, যহদ্ তেন্‌রা নাঈ অ্যাকটু ঈ ক'রে, তক্‌নেই তেম্‌রে সাবো দিতে অয়। কাজেই করচাডা কম্‌পেনসেট্ অবার উপাই পাওয়া জাই না। কুমারী কমলার এই কয়টা কথায় সমার মনের ভিতরকার অন্ধকার কাটিয়া গেল। এইবার ম্যানেজারের সহিত মাড়োয়ারীর কথাবার্ত্তা, কুমারীর ফাইল পেশ, পরিচারিকা বেশিনীর ব্যবহার, আশ্রমে পুরুষের সংখ্যাল্পতা এবং অহল্যার আর্ত্তনাদ, এই সমস্ত গুলির অর্থ সে এক মুহূর্ত্তেই হৃদয়ঙ্গম করিল এবং এক মুহূর্ত্তেই এই অনাথ অবলা আশ্রয়ের সত্যমূর্ত্তি তাহার চক্ষে স্পষ্ট হইয়া গেল। এমন কি, ম্যানেজার কথিত 'আজিকার লাট খাওয়া মাল টা' যে কি, তাহাও তাহার চক্ষে অস্পষ্ট রহিল না। সমা একটু সঙ্কুচিত ভাবেই কুমারীকে বলিল,—'তা'হ'লে আমার admision নেওয়া সম্বন্ধে আমি doubt করুচি কুমারি! তবে আপনি যদি অনুগ্রহ করেন তবেই আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি'। কুমারী সমার মুখপানে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন,—'ক্যান্ কন্, আপ্‌নে কি সদস্যা নন্?' সমা হাসিয়া বলিল,—'না।' কুমারী, 'আপ্‌নে আমাগো'র থু দিয়া ম্যারেজ করতি চায়েন্ তো?' সমা আরও একটু হাসিয়া বলিল,—'না, তা'ও চাইনে?' কুমারী ঈষৎ বিরক্ত হইয়াই বলিলেন,—'অ্যাক্‌নে আপ্‌নে সায়েন কী—কউন্ তো?' সমা,—'যদি দয়া ক'রে কোনো কিছু কর্ম্ম দেন তা' হ'লে—' কুমারী বলিলেন,—আরে তাই কন্, কাজ সায়েন্ তো কাজ একডা আপ্‌নারে দিতে চ্যাষ্টা করতে পারি—আহানের ইস্কুলের আড্ড অ্যাডিসনাল টিচারী দিতে পারি, কিন্তু এহানে অ্যাড্‌মিশান নিয়া করতে পার্‌বান্ তার্ জন্য কিসু ইয়া—মায়না দাওয়া করতে পারবান্ না। আমরা বাইরার লোক আন্‌তে দেই না।' সমা বলিল,—'Office work এ ও না? কিন্তু director সাহেব আমায় বলেছিলেন যে আপনার একজন assistant দরকার হ'তে পারে—।' কাহারো গায়ে হাত বুলাইবার কালে তাহার কোনো ব্যথার স্থানে দৈবাৎ হাত ঠেকিয়া গেলে, সে যেমন অকস্মাৎ চম্‌কাইয়া উঠিয়াই অনিচ্ছাকৃত স্বভাব ধর্ম্মবশে, হাতটাকে প্রবল বলে

ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেয়, তেমনি, সমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কুমারী সহসা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটু উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"ও, ও, মিষ্টার বাত্রীর কতা? আপনে তেনরে বিশ্বাস কর্‌তি সান? ওনারে জত্তো নাহি আপেনে বালো বল্যা বোদ করতে স্যান্, তত্তো বালো উনি না আ। জিনি নাঈ এয়ার ডাই দীয়া বয়স লুকাইবার সান্ তিনিরে বিশ্বাস করা জাই না। কুমারী উত্তেজনা বশে আরও যেন কি বলিয়া ফেলিতে যাইতে ছিলেন; সহসা সমার চৈতন্য হইল যে, কুমারীর কোন্ স্থানটায় সে দৈবাৎ হাত দিয়া ফেলিয়াছে, এই ভাবিয়া কুমারী আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যেই বলিল,—না, না, পুরুষ জাতটাকে আমি কোনো দিনই বিশ্বাস করি না জানবেন্, যখন সৌভাগ্যক্রমে আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'য়ে গ্যাছে তখন, আপনার যুক্তিতেই আমি চল্‌তে চাই!' কিন্তু মুখে যা'ই সমা বলুক, তাহার অন্তরাত্মা কুমারীর ব্যবহারে ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া গেল; এমন যে, কুমারীর সংস্পর্শ তাহার অসহ্য বোধ হইতেছিল।

যাহা হউক ঐ কথাটায় যেন আগুনে জল পড়িল। কুমারী একজন পাকা ব্যবসাদার লোক। পাংলা চামড়াবিশিষ্ট লোক কখনও ভাল ব্যবসাদার হয় না, কিন্তু এক এক জনের এক একটা স্থান এতটা অনুভূতিপ্রবণ থাকে যে, সেই স্থানটায় হাত ঠেকিয়া গেলে, তাহাদের আলস্য সংযম, দৃঢ়তা মুহূর্ত্ত মধ্যে চূর্ণ করিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলে। অপিচ যেমন কাহারো দেহের কোনো অংশে কোনো পীড়া থাকিলে তাহার মনের অর্দ্ধেকটা সদা সর্ব্বক্ষণ সেই পীড়ার স্থানটায় পড়িয়া থাকে এবং তাহার প্রহরায় নিযুক্ত থাকিয়া যায়, তেমনি—সেই নিয়মবশেই—বস্তুতঃ পক্ষে কোনো অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকুক না থাকুক, সমাকে আশ্রমে রাখিতে কুমারীর ইচ্ছা ছিল না। যাহা হউক, সমার কথায় কুমারীর স্বভাবসুলভ প্রশান্তভাব তাঁহার মুখের উপর স্বস্থান অধিকার করিয়া বসিল—তিনি স্নিগ্ধচক্ষু সমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন,—"হাঁ, জকনে আপনে অ্যাজ এ ফ্রেণ্ড্ আমার এনষ্ট্রাকশন সান্, তকনে জত্তো লস্ আমাগো্র অউগ্ আমি বালো advice দিবই। জ্ঞানবান্ বগ্নি, আপনারে লইবার কালে জত্তো জাই কই, আপনার personal expenseডা তো আপনগর কাছ অইতে আদায় অইবার সাই? আপনর সাওয়ালে জদ্দি না-ই অয়, তে আপনগর marriage দিয়া টাকাডা উডাবই। marriageএর অর্ত্ত বুজেন্ তো? এ মায় বাপে দাওয়া সে marri ge না—sale, out and out sale!' ঘৃণায়, লজ্জায়, আশঙ্কায় সমার মুখ নীলবর্ণ হইয়া গেল। তথাপি, আত্মসম্বরণ করিয়া সমা বলিল—"দেখুন ভগ্নি, আপনি আমায় অনুগ্রহ করে ছোট ভগ্নীর মত দেখছেন, আমিও আপনাকে বড় ভগ্নীর মতই বোধ কচ্চি। সংসার সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা কিছুই নাই—সে কথা আপনার কাছে স্বীকার কর্ত্তে আমার কিছু মাত্র লজ্জা নাই, আপনার worldly experience অনেক বেশী। আমি নিতান্তই নিঃসম্বল, নিরাশ্রয়; আমায় এক্ষেত্রে কি কর্‌বো যুক্তি দেন বলুন, আমি সেই মতই করবো।" কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কুমারী বলিলেন, "আপনে তো বগ্নি, নেহাইৎ ঈ নন, কতক education পাইসেন্, শুন্যাসি, singing, dancing—musical artsও কতক জানেন, তকনে আপনে একটা তিয়েটারে ডুকা জাউন। আমি ইনপর্‌মেশন্ পাইসি, নতুন diamond theatre বল্যা আকডা তিয়েটার খুল্‌সা স্যাডায় লোক নিচ্ছে কর্‌সে, স্যাদিন্ নিস্তারিণ্‌রে বাঙ্গাই লইসে। হাঁ অই জ্যাহেন নিস্তারিণ্—হাই অ্যাড্রেশান্ নাই—কিছুই নাই আণ্ডেড্ পিপ্‌টি ড্ কর্‌সে, ঘর বাড়ী করসে, বেশ্যাবৃত্তি করে না। জদ্দি chanceএ লগো জায় তো বালুই অয়ে জেতে পা্‌র্‌বানি!"

কুমারীর মূল্যবান যুক্তিলাভে সমা যেন একটু পরিতৃপ্তির ভাব দেখাইয়া বলিল—"ঐ রকম কল্পনা কিছুদিন থেকে আমারও মনে উঠেছে কুমারি! তবে কোনো পাকা মাথার support পাইনি ব'লে কাজটায় এগুই নাই। আজ আমি আপনার support পেয়ে এসম্বন্ধে নিশ্চিত হলুম। আপনি কাল সকালে kindly আমাকে সব information দিয়ে, আমার বেরিয়ে যাবার arrangement করে বাধিত করবেন।" মাত্র একটু মন্দ মধুর হাসিতে কুমারী সমার কথায় সায় দিয়া বলিলেন—"মাপ কর্‌ব্যান্ আপনর্ গুমাবার সময়ডা disturb কর্‌লাম!" বলিয়া একটি নমস্কার করিয়া, কার্য্যসাফল্য জনিত বিজয়োল্লাসদীপ্তমুখে কুমারী সমার কক্ষ ত্যাগ করিলেন এবং

সমাও একটি প্রতিনমস্কার করিয়া একটি স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস দ্বারা কুমারীর অন্তর্দ্ধানকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া আলোক নিবাইয়া শয্যাগ্রহণ করিল।

সমা শুইল, কিন্তু ঘুমাইল না। কেবল এই কথাটা ক্রমাগতঃ তাহার ক্লান্ত মস্তিষ্কটাকে আলোড়িত এবং উত্তপ্ত করিয়া নিদ্রাকে কাছে ঘেঁসিতে দিল না যে, একটা চৌদ্দ বৎসরের বেটা ছেলেকে তা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধরিয়া রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু একটা ছাব্বিশ বৎসরের মেয়েকে তা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে গরু ছাগলের মত বিক্রয় করাও ইহারা অত্যন্ত সাধারণ কায বলিয়া বোধ করে কেন? কি দুর্ব্বল, আত্মরক্ষায় অসমর্থ, নিঃসহায় নিরুপায় এই নারীজীবন!

মাসপঞ্জি—আশ্বিন, ১৩৪১

বিলাতের ব্যাঙ্কিং বিভাগে অভিজ্ঞ স্যার ওসবর্ণ স্মিথ নব প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর পদে নিযুক্ত হইল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গান্ধী-পদবাচ্য আবদুল গফুর খাঁ কলিকাতা করপোরেশন কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইলেন। বোম্বাই সহরে কংগ্রেস অধিবেশনের আয়োজন চলিতেছে, যে স্থানে অধিবেশন হইবে উহা আবদুল গফুরের নামানুসারে কথিত হইতেছে—মাদ্রাজ গভর্ণর স্যার জর্জ্জ ষ্টেনলী অবকাশ গ্রহণ করিতেছেন; তাঁহার স্থানে লর্ড এস্কিন্ ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছে—আগামী এসেম্ব্লী নির্ব্বাচনের জন্য কংগ্রেস পক্ষে ও বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘ পক্ষে প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হইয়াছে, কংগ্রেস পার্লিয়ামেণ্ট বোর্ড ও পণ্ডিত মালব্য কৃত ন্যাসন্যাল কংগ্রেস দলের আপোষ মীমাংসার কথা চলিতেছে—সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান নেতা আগা খাঁ ভারতের এক রাজ্যেশ্বর হইবার যে অনুরোধ ব্রিটিশরাজ সমীপে করিয়াছিলেন তাহা অগ্রাহ্য—বাঙ্গলার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ নিমিত্ত সরকার অবহিত হইতেছিল—ভারত হইতে সুবর্ণ রপ্তানি পুনর্ব্বার আরম্ভ হইল—দার্জ্জিলিং শিলং ও কলিকাতাতে টেলিফোন সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে—দক্ষিণ ভারতের বি, এন, রেল লাইনের এক ভীষণ ট্রেণ সংঘর্ষ ঘটিয়াছে—মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস কার্য্য হইতে অবসর লওয়ার সংবাদ সর্দ্দার বল্লভভাই কর্ত্তৃক স্বীকৃত—বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ উপস্থিত বোম্বাই কংগ্রেসের অধ্যক্ষ পদে বরিত হইয়াছেন—দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে মিউনিসিপ্যাল ও ব্যবস্থা সভাতে কংগ্রেস প্রতিনিধিরা নির্ব্বাচনে পরাভূত—বঙ্গদেশ বাসন্তী কটন মিলস নামে আর একটী নূতন কাপড়ের কল, কলিকাতার নিকটে প্রতিষ্ঠিত হইল—কলিকাতার দক্ষিণ ক্ষিদিরপুর ডকের নিকট একটী নূতন বিমান পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হইতেছে।

বৈদেশিক

নব জারম্যান রাষ্ট্র দেশের শিল্পের উপরে সমুদয় নিয়ন্ত্রণ কার্য্য করিবেন—নাজি দলের বিপ্লব ক্রিয়া অষ্ট্রিয়া রাজ্যে প্রযুক্ত বলিয়া অভিযোগ—দক্ষিণ আমেরিকাতে সামরিক আয়োজন বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সমিতির উপরে নূতন আক্ষেপ—ব্রিটিশ রাজকুমার জর্জ্জ ভাবী পত্নী গ্রীক রাজকুমারী মেরিনাসহ লণ্ডন আসিয়া পিতামাতা কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছেন—ওয়েলস প্রদেশের একটী কয়লার খনিতে আগুন লাগিয়া প্রায় দুই শত লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে—রাষ্ট্রনেতা হিটলার জারম্যান রাজ্যে আপন মনোমত ধর্ম্মব্যবস্থাও করিতে যাইতেছেন, প্রাচীন ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় ইহাতে বিরূপ—জারম্যানীর বহির্বাণিজ্যে লাঘব ঘটিতেছে বলিয়া প্রকাশ—ইংলণ্ডে কুইনমেরী নামে একটী নূতন জাহাজ প্রস্তুত, এত বড় জাহাজ নাকি আর হয় নাই—আমেরিকার সূতার কলের ধর্ম্মঘট অনেক দিন চলিয়া এখন স্থগিত হইল, প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্টকে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল—ইতালী ভারতে একটী বাণিজ্যতত্ত্বাবধায়ক সমিতি প্রেরণ করিতেছেন, প্রসিদ্ধ রাজনীতি বিশারদগণ নাকি ইহাতে আসিতেছেন—একটী ফরাসী বায়বীয় যান ৪৯।৽ ঘণ্টা সময়ে ব্রেজিল হইতে প্যারি নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—ইতালী চীনে স্থায়ী দৌত্য স্থাপন করিল—বর্ত্তমান মাদকবর্জ্জনকারী দেশগুলিকে লইয়া একটী সংঘ স্থাপনের কথা উঠিয়াছে—জাপানে ভীষণ ঝাত্যা বহিয়াছে, তাহাতে প্রায় দেড় হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছে, ছয় হাজার লোক জখম এবং আর চারি শত লোক নিরুদ্দেশ। ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব ও জুগোস্লাভিয়ার রাজা এলেকজাণ্ডার এক যোগে নিহত।